মল্লভূম বিষ্ণুপুর

মনোরঞ্জন চন্দ্র

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ২০০২

প্রচ্ছদপট
কাঞ্চনজঙ্ঘা ও তিস্তা
অঙ্কন : মণি সেন
(শিল্পীর কন্যা শ্রীমতী নীলিমা রায়ের সৌজন্যে)
বিন্যাস : পূর্ণেন্দু রায়

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও পি. এম. বাগচী এন্ড কোং প্রাঃ লিঃ, ১৯ গুলু ওস্তাগর লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৬ হইতে জয়ন্ত বাগচী কর্তৃক মুদ্রিত

সংক্ষিপ্ত পরিচয় সহ লেখকের অন্যান্য বই

ষাঁড়েশ্বর-মাহাত্ম্য (৫০ টাঃ)—গুপ্তবৃন্দাবন বিষ্ণুপুরের *ষাঁড়েশ্বর ও *শৈলেশ্বর শিবের অত্যাশ্চর্য রোমাঞ্চকর সত্য অলৌকিক ঘটনার ঠাস বুননিতে লেখা ১৬টি রঙীন ছবিসহ সর্বজনপ্রিয় গ্রন্থ 'ষাঁড়েশ্বর-মাহাত্ম্য'। ১৮৪ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটিতে রচিত হয়েছে এক স্বর্গীয় আধ্যাত্মিক পরিবেশ। আধ্যাত্মিকতার আলোকে উদ্ভাসিত মন্দির-নগরী বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা পৃথ্বীমল্ল প্রতিষ্ঠিত *ষাঁড়েশ্বর ও *শৈলেশ্বর শিবের মহিমা-কাহিনীর পাশাপাশি লেখক বিষ্ণুপুরের কৃষ্টি, লোকসংস্কৃতি ও লোকোৎসবের প্রাণবন্ত ছবি এঁকেছেন সাবলীল ভাষার কারুকার্যে। রুদ্ধশ্বাসে পড়ার মতো এই বইটি পড়তে পড়তে নিজেরই অজান্তে চলে যাবেন শিবলোকের পরমধামে। ভগবানলাভের ব্যাকুলতায় চোখে নেমে আসবে অশ্রুধারা, থৈ থৈ ঈশ্বরবিশ্বাসে ভ'রে উঠবে হৃদয়। রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, চণ্ডী, বেদ, বেদান্ত, পুরাণ প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের মতোই এই ধর্মগ্রন্থটি একটি অমূল্য সম্পদ বিশেষ।

কে বলে ঈশ্বর নেই? (২৫ টাঃ)—ঈশ্বর-অবিশ্বাসের যুগে নাস্তিকপন্থী এবং যুক্তিবাদী মানুষেরা যখন ঈশ্বরকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চাইছেন পৃথিবী, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তথা বিশ্বমানস থেকে, ঠিক তখনই আজন্ম ঈশ্বরবিশ্বাসী লেখক গর্জে উঠলেন হুঙ্কার দিয়ে, "কে বলে ঈশ্বর নেই?"

ধর্ম, দর্শন, গণিত, বিজ্ঞান, সাহিত্য প্রভৃতি বহুমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে ভক্তি ও যুক্তিবাদের খড়্গ হেনে নাস্তিকপন্থীদের জোরালো সব যুক্তিগুলোকে করেছেন খণ্ড-বিখণ্ডিত। তাঁর প্রবল যুক্তিজালের জোয়ারে খড়কুটোর মতোই ভেসে গেছে যুক্তিবাদীদের ঠুন্‌কো যুক্তিগুলো। ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষের কাছে তিনি আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের 'আপনার চেয়ে আপন যে জন', সেই ঈশ্বরকে। ' কে বলে ঈশ্বর নেই?'—পুস্তকটি ঈশ্বরবিশ্বাসী মানুষের কাছে একটি শাশ্বত আলোকবর্তিকা স্বরূপ।

টাকা-মাহাত্ম্য (৩০ টাঃ)—কঠোর বাস্তববাদ, তীব্র ভাববাদ এবং নিঃশব্দ কল্পনাবিলাসীতার অপূর্ব সংমিশ্রণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ লেখকের 'টাকা-মাহাত্ম্য' কবিতাগ্রন্থ। আধুনিক দুর্বোধ্য-কবিতা-সর্বস্ব যুগে এরকম সহজ-বোধগম্য, সুখপাঠ্য কবিতাগুচ্ছ খুবই বিরল। বাহ্যতঃ সুখপাঠ্য হ'লেও অধিকাংশ কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবধারা কিন্তু বর্তমান যুগের অবক্ষয়, আদর্শহীনতা ও অপসংস্কৃতির সদর্প পদচারণায় ব্যথাহত লেখকের মর্মবেদনার প্রতিক্রিয়া, বিদ্রূপাত্মক খেদোক্তি—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 'নদী আপন বেগে পাগল পারা'-র মতোই কবি এখানে স্বতঃস্ফূর্ত এবং সাবলীল।

প্রসঙ্গ ও প্রস্তাবনা

মল্লভূমের ইতিহাস বঙ্গ অথবা ভারতীয় জাতীয় জীবনের কোন রাজনৈতিক উত্থান-পতনের সঙ্গে জড়িত ঐতিহাসিক বা রাষ্ট্রিক বিবর্তনের কেন্দ্রবিন্দু নয়; রাজ্য-রাজধানীর সংগ্রাম-সংঘর্ষ থেকে এর অবস্থান অনেক দূরবর্তী, তাই এর অবক্ষয়-অবসান বঙ্গের ইতিহাসে ততটা সরব ঘটনা নয়। বংশানুক্রমিক রাজেতিহাসের রাজনৈতিক গৌরবে মল্লভূমি তাবৎ বঙ্গে ততটা গৌরবান্বিত নয়; কিন্তু শিল্প-সংস্কৃতির অসামান্য গৌরবে মল্লভূম বঙ্গের এক অসামান্য কেন্দ্রবিন্দু। তাই রাজনৈতিক লীলাবসানে সে নিঃশেষ হয়ে যায় নাই। বৃন্দাবন থেকে পুরী যাবার তীর্থপথের উপর মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরের অবস্থান—তাই ভারতের রাজনৈতিক প্রবাহ থেকে সাংস্কৃতিক প্রবাহ অধিকতর নির্বাধে প্রবেশ করেছে এখানে।

মন্দির-স্থাপত্য, টেরাকোটা-ভাস্কর্য, মার্গ-সঙ্গীত, চিত্রশিল্পের দুর্লভ গৌরবে মল্লভূম আজও গৌরবান্বিত। বরং বলা চলে আজও বঙ্গের শিল্পজগতে বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূম ক্রমবিকাশশীল, তার সংস্কৃতিগত জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান। রাজা তার সমস্ত রাজত্ব হারালেও রাজধানী তার আকর্ষণ হারায় নাই।

ইংরাজ রাজত্বে হাণ্টারের (W.W.Hunter) 'এ্যানেলস অফ্ রুর‍্যাল বেঙ্গল' এবং স্ট্যাটিস্‌টিক্যাল্ রিপোর্ট ছাড়াও ওমেলির 'ডিস্ট্রিক্ট গেজেট-ইয়ারে' বিষ্ণুপুর তথা বাঁকুড়ার রিপোর্ট পাওয়া যায়। এসময়ে বাঁকুড়া তথা মল্লভূমের উপর একাধিক ইংরাজী-বাংলা (অধুনা দুষ্প্রাপ্য) গ্রন্থও প্রকাশিত হয়। ১৯২১ সালে অভয়াপদ মল্লিকের 'হিস্ট্রি অফ্ বিষ্ণুপুর-রাজ'-এর ভূমিকায় প্রখ্যাত 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—"I invite the attention of all educated persons in the district of Bankura which comprises the greater portion of the ancient Mallabhum, to this book." এ ইতিহাস মল্লভূমের ইতিহাসের পথিকৃৎ গবেষক গঙ্গাগোবিন্দ রায়ের গবেষণার উপর রচিত।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরে একটি সংগ্রহশালা-সহ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৪ সালে এই সংগ্রহশালার নামকরণ হয় 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন'। এই পুরাকৃতি ভবনকে কেন্দ্র করে মল্লভূম তথা রাঢ়বঙ্গের সাংস্কৃতিক-ইতিহাস রচনাই ছিল উদ্যোক্তাদের আকাঙ্ক্ষা। বাঁকুড়া জেলা এবং জেলার বাইরে রাঢ় অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে চলল অনুসন্ধান ও ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ। ক্রমশঃ মল্লযুগ পেরিয়ে পাল-সেন-গুপ্ত যুগের উপাদান একত্রিত হ'ল। অবশেষে বিষ্ণুপুরের সন্নিকটস্থ ডিহর গ্রাম থেকে 'তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতি'র নিদর্শন আবিষ্কার করলেন পুরাকৃতিভবনের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ডঃ মাণিকলাল সিংহ। দেশবিখ্যাত সর্বজনপূজ্য মহাদেব শিবের (শ্রীশ্রীষাঁড়েশ্বর ও শ্রীশ্রীশৈলেশ্বর মহাদেবের) দুটি পালশৈলীর বিখ্যাত রেখ দেউলের সংলগ্ন এবং পাদদেশের ভূমি থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে প্রচুর মূল্যবান নিদর্শন। সেগুলি সংরক্ষিত রয়েছে আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতিভবনে। এর ফলে মল্লভূমের ইতিহাসের নূতন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই এই সংগ্রহালয়কে ঘিরে দেশ-বিদেশের গবেষকদের সমাগম হতে লাগল। মল্লভূম তথা রাঢ়ের গবেষণা নূতন এক মাত্রা পেল। ১৯৫৪ সালেই বিনয় ঘোষ

এখানে এলেন তাঁর লেখার উপাদান সংগ্রহ করতে। এই সংগ্রহশালার কর্মীরা তাঁকে সহযোগিতা করলেন আপ্রাণ ; পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি গ্রন্থের এক বিরাট অংশ জুড়ে যে 'বাঁকুড়া জেলা'র কথা আছে তার অধিকাংশই এই পুরাকৃতি ভবনের কর্মীদের সহযোগিতায় আহৃত। লণ্ডনে বসে 'School of Oriental & African Studies'-এ দেবী মনসা 'GODDESS MANASA'-এর উপর গবেষণারত মেদিনীপুরের ডঃ প্রদ্যোতকুমার মাইতি মহাশয়কে ডাক যোগে দেবীর পূজা-অনুষ্ঠান সম্পর্কে সমস্ত তথ্য পাঠান হয়েছিল পুরাকৃতিভবন থেকেই ১৯৬২ সালে। একাধিক দুর্লভ চিত্রও প্রেরিত হয়েছিল। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বাঁকুড়ার মন্দির', ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চনের 'Temples of Bankura District', মাণিকলাল সিংহের 'পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি', 'রাঢ়ের মন্ত্রযান', 'রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি' (একাধিক খণ্ডে) হিতেশরঞ্জন সান্যালের মল্লভূমের উপর একাধিক গবেষণা-পত্র, গুরুপ্রসাদ সরকারের 'মল্লসংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের রাসোৎসব', চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত লিখিত 'বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা', তারাপদ সাঁতরার একাধিক প্রবন্ধ মূলতঃ আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতিভবনকে কেন্দ্র করে রচিত বা বিকশিত 'রাঢ়-চিন্তা'র ঋদ্ধ বলয়টির প্রেক্ষাপটেই রচিত হয়েছিল। উক্ত পুরাকৃতিভবন রাঢ় সংস্কৃতি-চর্চার এক নূতন দিগন্ত উন্মোচিত করেছিল।

সেই চর্চা-চিন্তার সমৃদ্ধ প্রেক্ষাপটটি ক্রমশঃ প্রসারিত হয়ে অনেক অনুসন্ধানী গবেষককে প্রভাবিত করেছে; এ জেলার উপর অনেক কাজ হয়েছে এবং হচ্ছে। শ্রীমান মনোরঞ্জন চন্দ্র এই ধারারই উত্তরাধিকার থেকে 'মল্লভূম বিষ্ণুপুর' গ্রন্থটি রচনা করেছেন। ছাত্রজীবন ও শিক্ষকজীবনে তিনি আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতিভবন-কেন্দ্রিক রাঢ়-চর্চার উষ্ণ প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই অনুভব করেছেন—উপলব্ধি করেছেন। বিশাল আকারের এই গ্রন্থটিতে তিনি সাধারণ দর্শক এবং গবেষক উভয়ের জন্যই সংস্থান রেখেছেন। একজন দর্শনার্থীকে গাইড করার ছাঁচে রচিত এই গ্রন্থে বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের প্রায় সমস্ত কিছু জ্ঞাতব্য স্থান পেয়েছে। তাঁর এই বিপুল পরিশ্রম যে কোন পাঠককে স্তম্ভিত করবে বলে আমার বিশ্বাস। মনোরঞ্জনবাবু লেখার জগতে নবাগত বা অনভিজ্ঞ নন; ইতিপূর্বে তাঁর শ্রীশ্রী'ষাঁড়েশ্বর-মাহাত্ম্য' ও 'কে বলে ঈশ্বর নেই?' সহ একাধিক গ্রন্থ পাঠকমহলে জনপ্রিয় হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থখানিও অনুরূপ জনপ্রিয়তা লাভ করবে বলে আমার মনে হয়। এটিতে তিনি বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের খুঁটিনাটি তত্ত্ব এবং তথ্য পরিবেশন করেছেন। প্রতি বৎসর মরশুমে বিষ্ণুপুরে প্রচুর দর্শনার্থীর ভিড় জমে। এ ধরনের একটি গ্রন্থের প্রয়োজন ছিল। গ্রন্থখানি যে সে প্রয়োজন মেটাবে সে সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত। মল্লসংস্কৃতির প্রসার-প্রচারের ক্ষেত্রেও গ্রন্থখানি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। পুস্তকখানির বহুল প্রচার কামনা করি।

শুভাকাঙ্ক্ষী
চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত
বিষ্ণুপুর।

'বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা' ও 'ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটা' গ্রন্থদ্বয়ের গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় একাধারে সুলেখক, সুবক্তা, টেরাকোটা শিল্পের গবেষক এবং শিক্ষাবিদ। লেখকের বিদ্যালয়-জীবনের শিক্ষক। এককালে সহকর্মীও ছিলেন। বর্তমানে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' সহ 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন'-এর প্রাণ-প্রদীপ স্বরূপ। বিষ্ণুপুর উচ্চ-বিদ্যালয়ের (উচ্চ মাধ্যমিক) বাংলা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মহাশয় চিত্তরঞ্জনবাবু জীবন যাপনে অত্যন্ত সাদাসিধে প্রকৃতির এক নিরহঙ্কার ব্যক্তিত্ব।

দৃষ্টিকোণ
(লেখকের কথা)

বিষ্ণুপুরকে নিয়ে কোন বই লিখব বা লিখতে হবে—একথা ভাবিনি কোনদিন। তথাপি লিখতে হল 'মল্লভূম বিষ্ণুপুর'। কিন্তু কেন?

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা পৃথ্বীমল্ল প্রতিষ্ঠিত অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা ৺ষাঁড়েশ্বর ও ৺শৈলেশ্বর শিবের দিব্য-মহিমার পাশাপাশি শিবতত্ত্ব নিয়ে লেখা 'ষাঁড়েশ্বর-মাহাত্ম্য' এবং যুক্তি ও ভক্তিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত 'কে বলে ঈশ্বর নেই?'—গ্রন্থ দুটি প্রকাশিত হওয়ার সাথে সাথেই প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পূর্বোক্ত পুস্তক দুটির দ্বিতীয় খণ্ড লেখার জন্য সুধী পাঠকবর্গের কাছ থেকে অনুরোধ আসে চিঠিপত্র মারফৎ। স্থানীয় পাঠকগণ অবশ্য বিষ্ণুপুরকে নিয়ে একটি বই লেখার জন্য প্রেরণা যোগান পুনঃপুনঃ। পুনঃপুনঃ অনুরোধ আসে 'দে'জ পাবলিশিং'-এর পক্ষ থেকে।

পাঠকবর্গের আন্তরিক অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। পারলাম না উপেক্ষিত জন্মভূমি বিষ্ণুপুরকে উপেক্ষা করতে। মনে হল 'জন্মভূমি-ঋণ' বলে একটা কথা আছে। সেই ঋণ শোধ করার এ এক অপূর্ব সুযোগ। কারণ আমি নেতা বা মন্ত্রী বা ক্ষমতাবান নির্বাচিত জন-প্রতিনিধি নই যে বিধানসভায় বা পার্লামেন্টে হৈ চৈ করে জন্মভূমির জন্য কিছু অর্থ, কিছু কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়ে নিয়ে বাস্তবায়িত করতে পারব কোনদিন। মনে হল, আমার মত অক্ষমের যদি কিছু ক্ষমতা থেকে থাকে সেটি হল 'The pen is mightier than the sword' এই সত্যকে আঁকড়ে ধরে কলম তুলে নেওয়া। কলম তুলে নিয়েছিলাম ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। কলম থামল প্রায় পাঁচ বছর পর। জন্ম হল ৬৭২ পৃষ্ঠার 'মল্লভূম বিষ্ণুপুর' পুস্তকের।

প্রসঙ্গতঃ বলি, ৺ফকিরনারায়ণ কর্মকারের 'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী' গ্রন্থটির চাহিদা থাকা সত্ত্বেও পুনর্মুদ্রণ হয়নি দীর্ঘদিন। একইভাবে পুনর্মুদ্রিত হয়নি বিষ্ণুপুরের রাজকাহিনীর উপর রচিত ইতিহাস-ভিত্তিক গ্রন্থ ৺অভয়াপদ মল্লিকের 'History of Bishnupur-Raj'. এদিক থেকে জিজ্ঞাসু পাঠক-মহলে এবং অনুসন্ধিৎসু পর্যটক মহলে বিষ্ণুপুরকে নিয়ে লেখা পূর্ণাঙ্গমানের একটি পুস্তকের অভাব অনুভূত হয়। এই অভাব পূরণের তাগিদেও বইটি লিখতে প্রয়াসী হই। বইটি লিখতে গিয়ে আমার পূর্বসূরীগণ যাঁরা বিষ্ণুপুরের উপর কাজ করেছেন এবং সমসাময়িক কালের লেখকগণ যাঁরা বিষ্ণুপুরকে ভালবেসে বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্য বিশ্বদরবারে তুলে ধরার চেষ্টায় ব্রতী আছেন তাঁদের লেখা প্রায়শই আমি উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করেছি। আবার গুরুত্ব অনুসারে কতিপয় উদ্ধৃতিব বিশেষ অংশে 'বোল্ড টাইপ' ব্যবহার করেছি। বহুল পরিমাণে উদ্ধৃতির প্রয়োগের উদ্দেশ্য হল বিষ্ণুপুর-প্রেমিক প্রত্যেক লেখকের লেখাকেই প্রাধান্য দেওয়া এবং তাঁদের সাথে পাঠকবর্গের একটি মেল-বন্ধন স্থাপন করা। পূর্বসূরীগণের এবং সমসাময়িক কালের লেখকবৃন্দের বিষ্ণুপুরকে দেখার যে বহুমুখী দৃষ্টিকোণ তার সাথে আমার দৃষ্টিকোণকে মিশিয়ে দিয়ে বিষ্ণুপুরকে দেখার চেষ্টা করেছি তেরশ বছরের দূরত্ব থেকে। 'প্রিজম'-এ দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে যেমন দৃশ্যপটে ভেসে ওঠে বর্ণাঢ্য রঙের বিস্তীর্ণ বর্ণচ্ছটা, ঠিক তেমনি অনুসন্ধিৎসার আঙ্গিকে দৃষ্টিকোণের গভীরতায় বহুরূপে উদ্ভাসিত হয়েছে বিষ্ণুপুর, বহুবর্ণে বিধৃত হয়েছে বিষ্ণুপুর। প্রিজমে প্রতিফলিত হয় বর্ণাঢ্য আলোক-বিচ্ছুরণ, 'মল্লভূম বিষ্ণুপুর' পুস্তকটির পাতায় পাতায় চিত্রার্পিত তথা স্পন্দিত হয়েছে মল্লভূমের ঐতিহাসিক, আধ্যাত্মিক, পারমার্থিক, শৈল্পিক, সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও আর্থসামাজিক ঐশ্বর্যের সুষম শব্দ-বিকিরণ। বিষয়বস্তুর গভীরতা সত্ত্বেও ভাষার লাবণ্যকে অম্লান রাখার চেষ্টা করেছি সারল্যের উপাদানে, ভাবের সাথে ভাষার সংগতি সাধনে বক্তব্যবিষয়ে মাধুর্যের মায়াজাল বিস্তারে প্রয়াসী হয়েছি 'সুখপাঠ্য' শব্দটির প্রতি সাবধানী দৃষ্টি রেখে। তথাপি পুস্তকটির অন্দরমহলে প্রবেশ করে অল্পবিস্তর অসংগতি নজরে পড়তে পারে পাঠকবর্গের। নজরে পড়তে পারে অল্পবিস্তর ভুল-ত্রুটি। কারণ প্রামাণ্য তথ্যের অভাবে অনেক ক্ষেত্রেই তথ্য

সংগ্রহের ব্যাপারে জনশ্রুতি-নির্ভর তথ্যের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। নির্ভর করতে হয়েছে যাঁরা তথ্য সরবরাহ করেছেন তাঁদের স্মৃতিশক্তি-ভিত্তিক বিবৃতির উপর। এ ধরনের অনিচ্ছাকৃত ভুলভ্রান্তি যদি কিছু থেকে থাকে সেক্ষেত্রে সচেতন পাঠকের সৃষ্টিধর্মী সমালোচনাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাব 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্' শব্দ তিনটিকে স্মরণ রেখে। সংশোধন করব পরবর্তী সংস্করণে।

আমি যেমন স্বয়ং সম্পূর্ণ নই, আমার এই পুস্তকটিও অনুরূপভাবে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। অনেক নদ-নদীর জলে সাগর পূর্ণ, অনেকানেক বালুকণায় মরুভূমি ধন্য, অনেকানেক সুধীজনের লিখিত, অলিখিত তথা কথিত প্রচেষ্টার চূড়ান্ত পরিণতি 'মল্লভূম বিষ্ণুপুর'। তাই তাঁরা বরেণ্য ও ধন্য। আমি ঋণী—ঋণ স্বীকার করি অকপটে।

ঋণ স্বীকার করি তাঁদের কাছে, যাঁরা পুস্তকটি রচনার ব্যাপারে আমাকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করেছেন এবং সুপরামর্শ দিয়ে সুসমৃদ্ধ ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর করেছেন 'মল্লভূম বিষ্ণুপুর'কে। এঁদের মধ্যে রয়েছেন মাননীয় সর্বশ্রী সুসাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুরের চারণকবি বৈদ্যনাথ ও কবি শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়; বিষ্ণুপুর রামানন্দ মহাবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মিহির কুমার রায়, ডঃ মণীন্দ্রনাথ সান্যাল, পাগল চন্দ্র মাল, তারানন্দন মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা দীপা সান্যাল, বাঁকুড়া জেলা সারদামণি মহিলা মহাবিদ্যালয়ের লেক্‌চারার্ অরূপ কুমার ঘোষ, মুর্শিদাবাদ জেলার ওরঙ্গাবাদের ডি.এন্. মহাবিদ্যালয়ের লেক্‌চারার্ তপন কুমার কর্মকার, আশিস্ বরণ সামন্ত এ.আই.এফ. স্কুলস্. বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক গুরুপ্রসাদ সরকার, প্রদ্যোৎ কুমার দাসরায়, মধুসূদন চক্রবর্তী ও কর্মরত শিক্ষক কালীকিঙ্কর পণ্ডা; শিক্ষক বাদল লক্ষণ (বাল্যবন্ধু), পণ্ডিতপ্রবর আদিত্য কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুর রাসতলা নিবাসী সুখেন্দুবিকাশ ব্যানার্জী, গোকুলনগর নিবাসী শিক্ষক কালীশংকর রায়, বিষ্ণুপুর ঢেলাদুয়ার নিবাসী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সমীর কুমার কর, সহধর্মিণী সাবিত্রী চন্দ্র, ভ্রাতৃবধূ মিঠু কাইতি এবং দে'জ পাবলিশিং-এর সুভাষ দে।

পুস্তকটি প্রকাশের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করে কোলকাতার দে'জ পাবলিশিং এবং ভূমিকা লিখে শ্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন চিরদিনের মতো। অনুরূপভাবে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরের মানচিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে যথাক্রমে জেলা-প্রশাসনের NRDMS দপ্তরের মানচিত্র এবং বিষ্ণুপুর পৌরসভার মানচিত্রগুলির সহায়তায় আমি সমৃদ্ধ। এছাড়া বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসক মাননীয় কৌশিক হালদার মহাশয় 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন' সহ 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর কিছু দুষ্প্রাপ্য আলোকচিত্র সংগ্রহের ও মুদ্রণের অনুমতি দিয়ে পুস্তকটিকে সুসমৃদ্ধ করার সাথে সাথে আমাকেও কৃতকৃতার্থ করেছেন এই কর্মযজ্ঞে সামিল হয়ে। আর যাঁরা পুস্তকটির শংসাপত্র লিখে পুস্তকটিকে গৌরবান্বিত করেছেন তাঁদের কাছেও আমি ঋণী যার-পর-নাই।

পুস্তকটির রচনাকাল প্রসঙ্গে বলি 'মল্লভূম বিষ্ণুপুর' বইটি লিখতে শুরু করি ১৯৯৯-এর জানুয়ারী মাসে এবং বিলম্বিত লয়ে শেষ হয় ২০০৩-এর নভেম্বর মাসে। সুতরাং পুস্তকে উল্লিখিত ঘটনাগুলির বয়স নিরূপণের ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত সময়কে ভিত্তিবর্ষ হিসেবে ধরতে হবে।

আরো বলি, গতানুগতিক রচনাশৈলী পরিহার করে 'মনোলগ'-এর ছাঁচে, ভ্রমণলিপির আদলে পুস্তকটি লিখতে প্রয়াসী হয়েছি। পাঠকবর্গের ভাল লাগলে শ্রম সার্থক মনে করব।

পরিশেষে বলি আমার উপাধি চন্দ্র; যার অর্থ চাঁদ। চাঁদের নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের আলোতে সে আলোকিত। অনুরূপভাবে আমিও সূর্যসম জ্ঞানী ও গুণী জনদের আলোকে আলোকিত। এজন্যই না বলে পারছি না যে পুস্তকের ঝলমলে উজ্জ্বল দিকটি তাঁদেরই জ্যোতিঃপ্রভা, আর ভুলভ্রান্তি-যুক্ত অনুজ্জ্বল দিকটি একান্তভাবে আমার, মানে চাঁদের কলঙ্ক হিসেবেই ধরে নেবেন—এই অনুরোধ।

বিনয়াবনত,
মনোরঞ্জন চন্দ্র।

প্রচ্ছদ-আলোকচিত্র, আলোকচিত্র, মানচিত্র ও উৎসর্গ-অঙ্কন সম্পর্কিত সহযোগিতা-ঋণ

প্রচ্ছদ-আলোকচিত্র-বিবরণ ঃ—

সামনের পৃষ্ঠা ঃ— উপরে কৃষ্ণরায় মন্দির (জোড়বাংলা)
নীচে দলমাদল কামান

পিছনের পৃষ্ঠা ঃ— উপরে রাসমঞ্চ
মাঝে শুশুনিয়ার বিষ্ণুচক্র
নীচে শ্যামরায় মন্দির

পিছনের পৃষ্ঠার অভ্যন্তরভাগে ঃ—লেখক

পাশে (পুটে) ঃ— মুরলীমোহন মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি

আলোকচিত্র ঃ—

আলোকচিত্রের নামের বাম পাশের স্টার (*) চিহ্নিত আলোকচিত্রগুলি 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন' থেকে সংগৃহীত।

'শুশুনিয়ার বিষ্ণুচক্র'-র চিত্রটি শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'ভারতের শিল্প সংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা' গ্রন্থের এবং এক্তেশ্বর শিব মন্দিরের আলোকচিত্রটি শ্রীঅজিত মিশ্র মহাশয়ের 'মহাতীর্থ এক্তেশ্বর' পুস্তকের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আলোকচিত্রে বিশেষ সহযোগিতা ঃ—

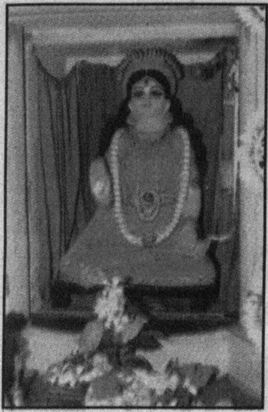
ঁশশাঙ্কশেখর কর্মকার, মটুকগঞ্জ, বিষ্ণুপুর।
শ্রীসুব্রত চন্দ্র, কৈলাসতলা, বিষ্ণুপুর।
শ্রীরণধীর রায় (বাবলু), বিষ্ণুপুর।
শ্রীরণবীর রায় (ডাবলু), বিষ্ণুপুর।
শ্রীনিমাই সরকার, **সুইট সাউণ্ড**, বৈলাপাড়া, বিষ্ণুপুর।
শ্রীনিতাইচন্দ্র দে, **স্টুডিও সীমা**, বৈলাপাড়া, বিষ্ণুপুর।
শ্রীআশিস্ দাস (বুলেট), **ছবিঘর**, চকবাজার, বিষ্ণুপুর।
শ্রীহিমেন্দুবিকাশ দাস (সাতুদা), গড়দরজা, বিষ্ণুপুর।
শ্রীবৈদ্যনাথ গরাই, ওন্দা।

মানচিত্র-রূপায়ণ ঃ—

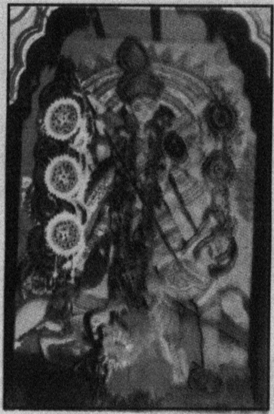
সর্বশ্রী মনোরঞ্জন চন্দ্র (লেখক); কালীশঙ্কর রায়, গোকুলনগর; ভবতোষ দাস, আঁইশবাজার, বিষ্ণুপুর; তুষারকান্তি ভট্টাচার্য (প্রাক্তন পৌরপ্রধান), বৈলাপাড়া, বিষ্ণুপুর; জয়ন্তদাস কর্মকার, ঢেলাদুয়ার, বিষ্ণুপুর এবং আরো অনেকে।

উৎসর্গ অঙ্কন ঃ—

শ্রীমনোরঞ্জন চন্দ্র (লেখক) ও শিল্পী শ্রীঅমর রাণা, হাজরাপাড়া।



মা সর্বমঙ্গলা (পৃঃ ৬৪)



মা মৃন্ময়ী (পৃঃ ১০৭)



ঁশ্মশানকালীমাতা (পৃঃ ১৬১)



ঁমদনমোহনজীউ (পৃঃ ২২৩)



ঁরাধামদনগোপালজীউ (পৃঃ ৪১৭)



ঁরাধালালজীউ (পৃঃ ৪৫৪)



ঁরঘুনাথজীউ (পৃঃ ১৮২)



ষাঁড়েশ্বর শিব জীউ (পৃঃ ৬০৪)



ঁগৌরকিশোর জীউ (পৃঃ ৪২৩)



ঁগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু (পৃঃ ৯০)



ঁরাধারমণজীউ (পৃঃ ২০২)



ঁগৌরাঙ্গমহাপ্রভু (পৃঃ ৯০)



প্রাচীন ঁকালীমূর্তি (পৃঃ ১২৪)



ঁডেঙ্গোরামকৃষ্ণজীউ (পৃঃ ৪২৫)



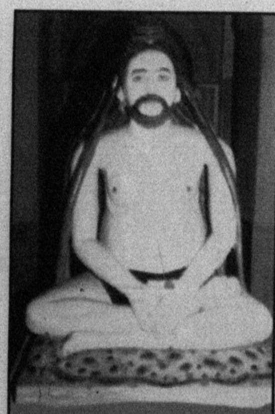
ঁবারাহীমূর্তি (পৃঃ ১২৪)



ঁষড়ভুজজীউ (পৃঃ ২৩৫)



ঁবরাহ অবতার (পৃঃ ১২১)



মৌনীবাবা (পৃঃ ৫৬২)



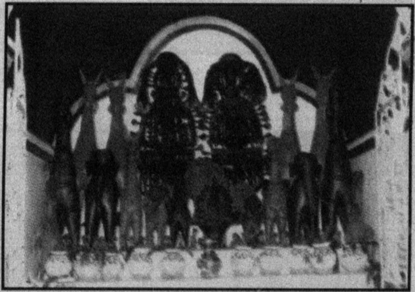
মা দণ্ডেশ্বরী (পৃঃ ৫৬)



মা ছিন্নমস্তা (পৃঃ ২৯)



সাক্ষীগোপালজীউ (পৃঃ ৩৮৩)



মা মনসা, তেঁতুলতলা (পৃঃ ২৬৪)



মা অন্নপূর্ণা (পৃঃ ৪৬৬)



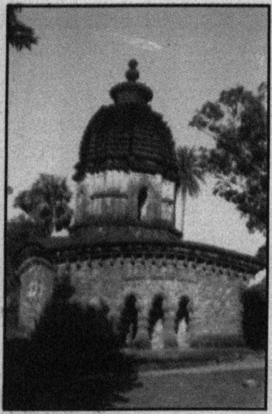
বড়াম ঠাকুর (পৃঃ ৪২৭)

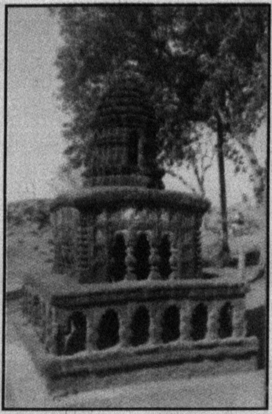


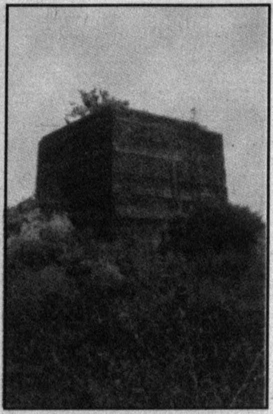
উদাসীন সাধু সম্প্রদায় (পৃঃ ৫৬৩)

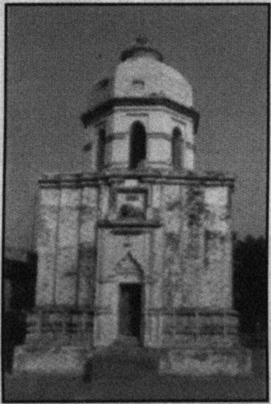


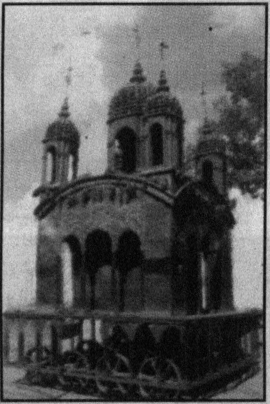
কুরবানবাবার মাজার শরীফ (পৃঃ ৩৫৩)

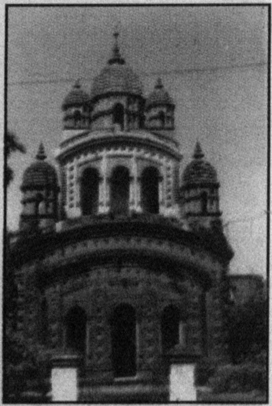

কালাচাঁদ মন্দির (পৃঃ ৩৬)

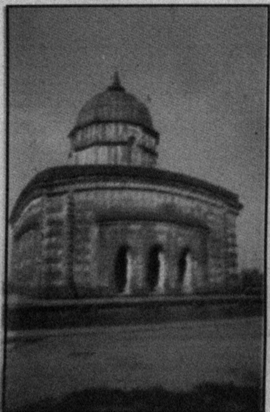

পাথরের রথ (পৃঃ ১৫৪)

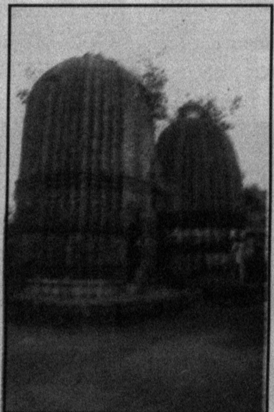

গুম্‌ঘর (পৃঃ ৮১)


মল্লেশ্বর শিবমন্দির (পৃঃ ২৫৯)


ধাতুনির্মিত রথ (কৃষ্ণগঞ্জ) (পৃঃ ৪৬১)


শ্রীধরনারায়ণ মন্দির (পৃঃ ৪৩৭)

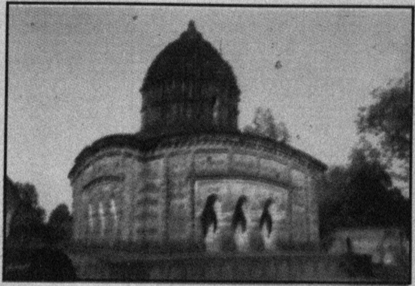

রাধাশ্যাম মন্দির (পৃঃ ১০১)


জোড়া দেউল-মন্দির (পৃঃ ৯৩)


আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন (পৃঃ ৭৫)



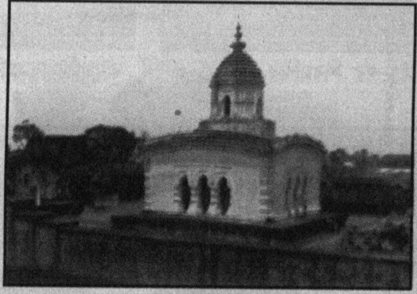
জোড়-মন্দির (পৃঃ ৩৫)



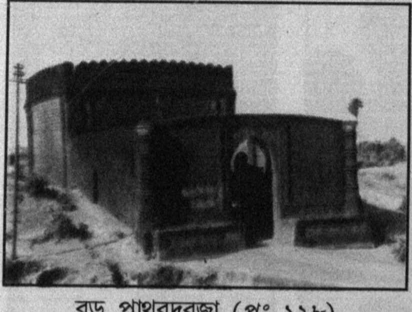
ঁরাধামাধব মন্দির (পৃঃ ৩৫)



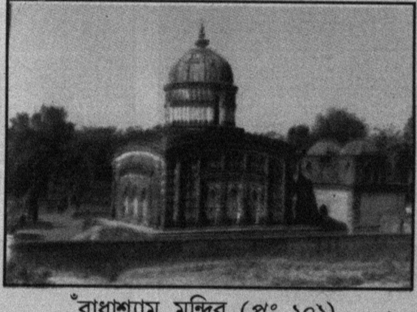
ঁমুরলীমোহন মন্দির (পৃঃ ২৪৭)



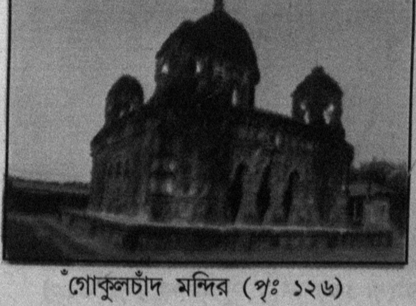
লালজীউমন্দির (পৃঃ ১১৫)



বড় পাথরদরজা (পৃঃ ১২৮)



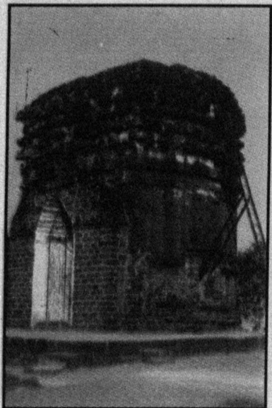
ঁরাধাশ্যাম মন্দির (পৃঃ ১০১)



ঁগোকুলচাঁদ মন্দির (পৃঃ ১২৬)



রাসমঞ্চ (পৃঃ ৬০৫)



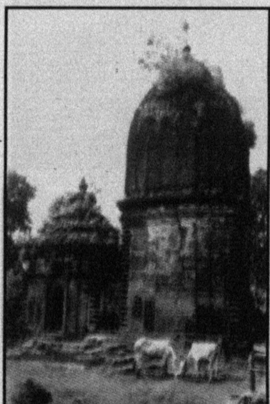
ষঁড়েশ্বর শিবমন্দির (পৃঃ ৬০৪)



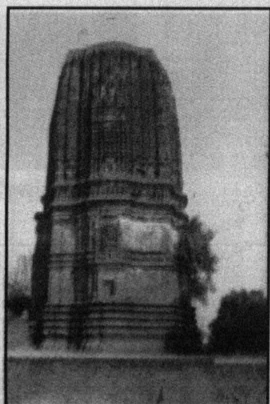
ঘুটগোড়িয়ার মন্দির (পৃঃ ৬২০)



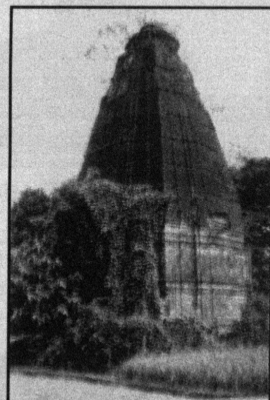
এক্তেশ্বর শিবমন্দির (পৃঃ ৬১৮)



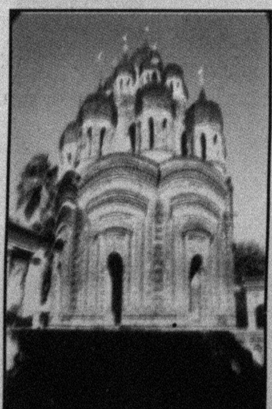
দেউল মন্দির (পৃঃ ৬১৭)



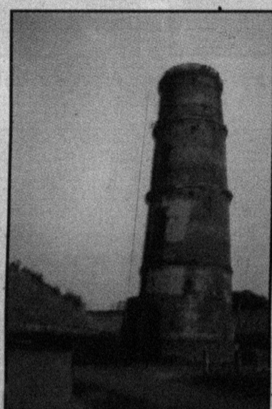
সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির (পৃঃ ৬১৯)



শ্যামসুন্দর মন্দির (পৃঃ ৬০৬)



রাসমঞ্চ (পৃঃ ৬০৫)

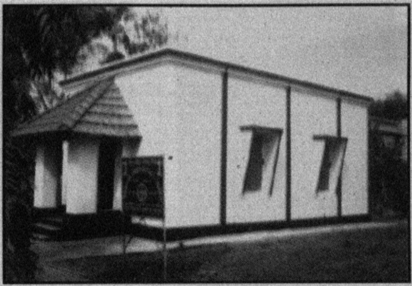


সিমাফোর টাওয়ার (পৃঃ ১৪০)

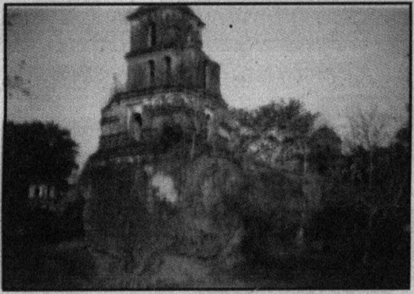


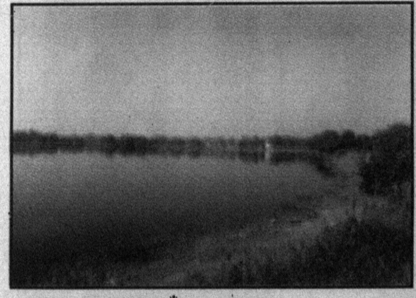
সূর্যমন্দির (পৃঃ ৬২০)

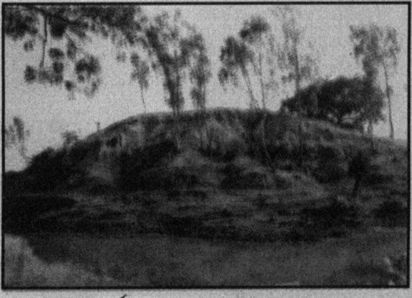

জুম্মা মসজিদ (পৃঃ ৩৭২)


গীর্জা (পৃঃ ৩১৮)


পরিখাসহ পাথরদরজাদ্বয় (পৃঃ ১২৮)


হাওয়ামহল/ভগ্ন রাজপ্রাসাদ (পৃঃ ১১৩)


লালবাঁধ (পৃঃ ৫২)


মূর্চার পাহাড় (পৃঃ ৫০)


শুশুনিয়া পাহাড় (পৃঃ ৬১০)


বর্ষার পরিখা (পৃঃ ৫০)



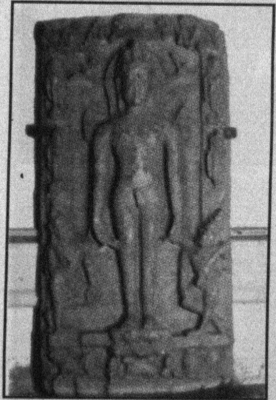
গণেশ (পৃঃ ৭৮)



ত্রিভঙ্গসূর্য (পৃঃ ৭৮)



মহিষমর্দিনী (পৃঃ ৭৮)



আদিনাথ (পৃঃ ৭৯)



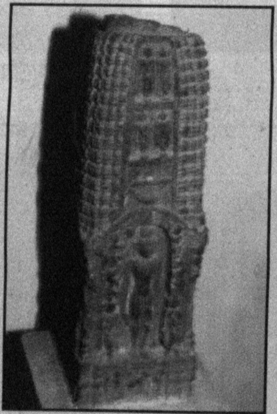
অম্বিকা দেবী (পৃঃ ৭৮)



মহাকাল (পৃঃ ৭৮)



গরুড়ধ্বজ (পৃঃ ৭৮)



দেউলের অনুকৃতি (পৃঃ ৭৮)



কার্তিক (পৃঃ ৭৮)



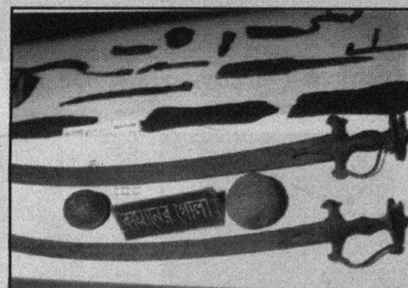
ঢোকরা শিল্প (পৃঃ ৫৯১)



পোড়ামাটির পাল্কি



ল-কুলীশসহ প্রস্তর খিলান (পৃঃ ৭৮)



মল্লযুগে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র (পৃঃ ৭৬)



রামায়ণ কাহিনী, প্রাচীন পাটাচিত্র (পৃঃ ৭৭)



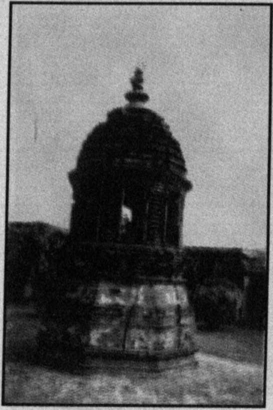
স্বর্ণচরী (শ্রীকৃষ্ণের প্রতিজ্ঞাভঙ্গ) (পৃঃ ৪১৪)



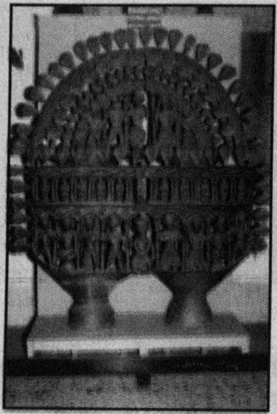
রাবণকাটা লোকোৎসব (পৃঃ ১৮২)



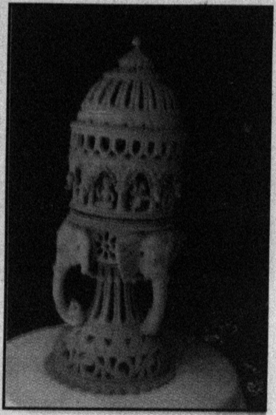
নারকেল খোলার ভাস্কর্য (পৃঃ ২৭১)



তুলসীমঞ্চ (পৃঃ ১০১)



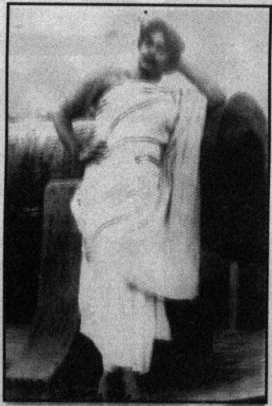
মনসার চালি (পৃঃ ৫৮৫)



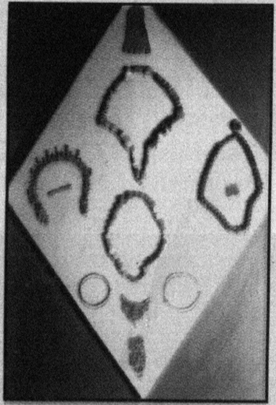
পোড়ামাটির ল্যাম্পশেড (পৃঃ ৫৮৫)



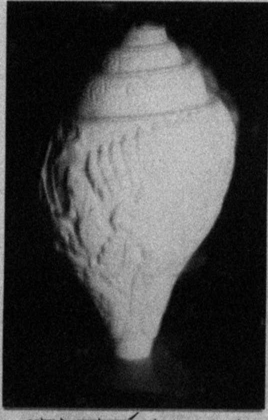
টেরাকোটা মূর্তি ভাস্কর্য



দলমাদলে নজরুল (পৃঃ ৬৩৪)



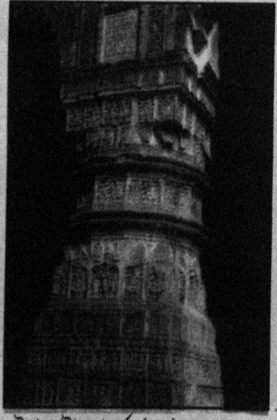
মৌর্যশুঙ্গযুগের উপরত্ন, মালা (পৃঃ ৭৬)



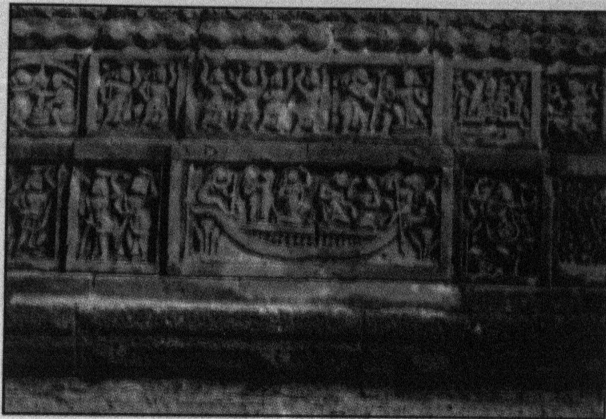
শঙ্খ ভাস্কর্য (পৃঃ ২৭১)



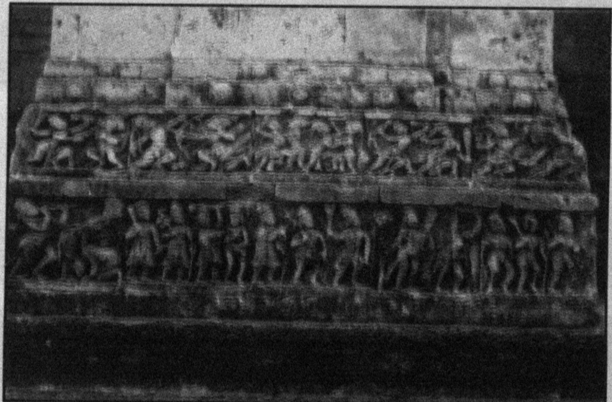
টেরাকোটার ঘোড়া (পৃঃ ৫৮৪)



টেরাকোটা ভাস্কর্য (স্তম্ভ) (পৃঃ ২১৮)



নৌকাবিলাসসহ কর্মময় জনজীবন (পৃঃ ২১৮)



উপরে-যুদ্ধদৃশ্য, নীচে যুদ্ধযাত্রা (পৃঃ ২১৮)



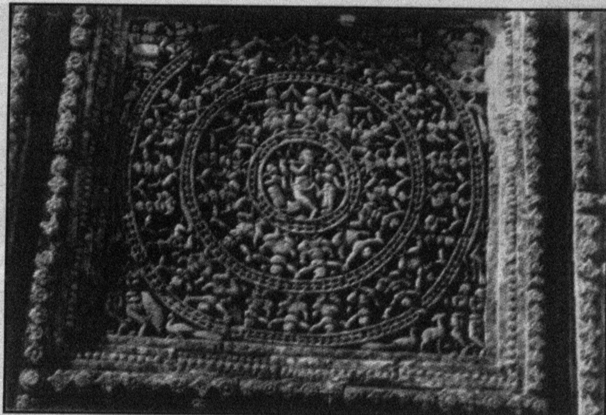
উপরে-হরিণ শিকার, নীচে-হংসলতা (পৃঃ ২১৮)



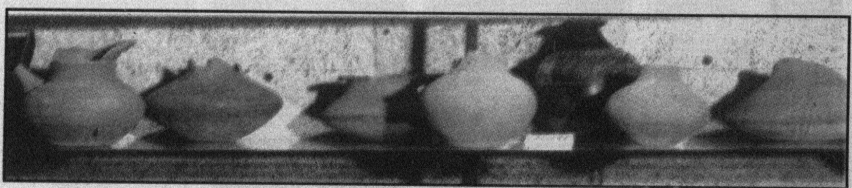
টেরাকোটা ভাস্কর্য (দক্ষিণ দেওয়াল) (পৃঃ ২১৮)



টেরাকোটা খিলান ভাস্কর্য (পৃঃ ৮৮)



রাসচক্র, শ্যামরায় মন্দির (পৃঃ ৮৭)



প্রাচীন মৃৎ-পাত্র (পৃঃ ৭৬)



আলো-আঁধারে আদিবাসীনৃত্য (পৃঃ ৫৫৯)

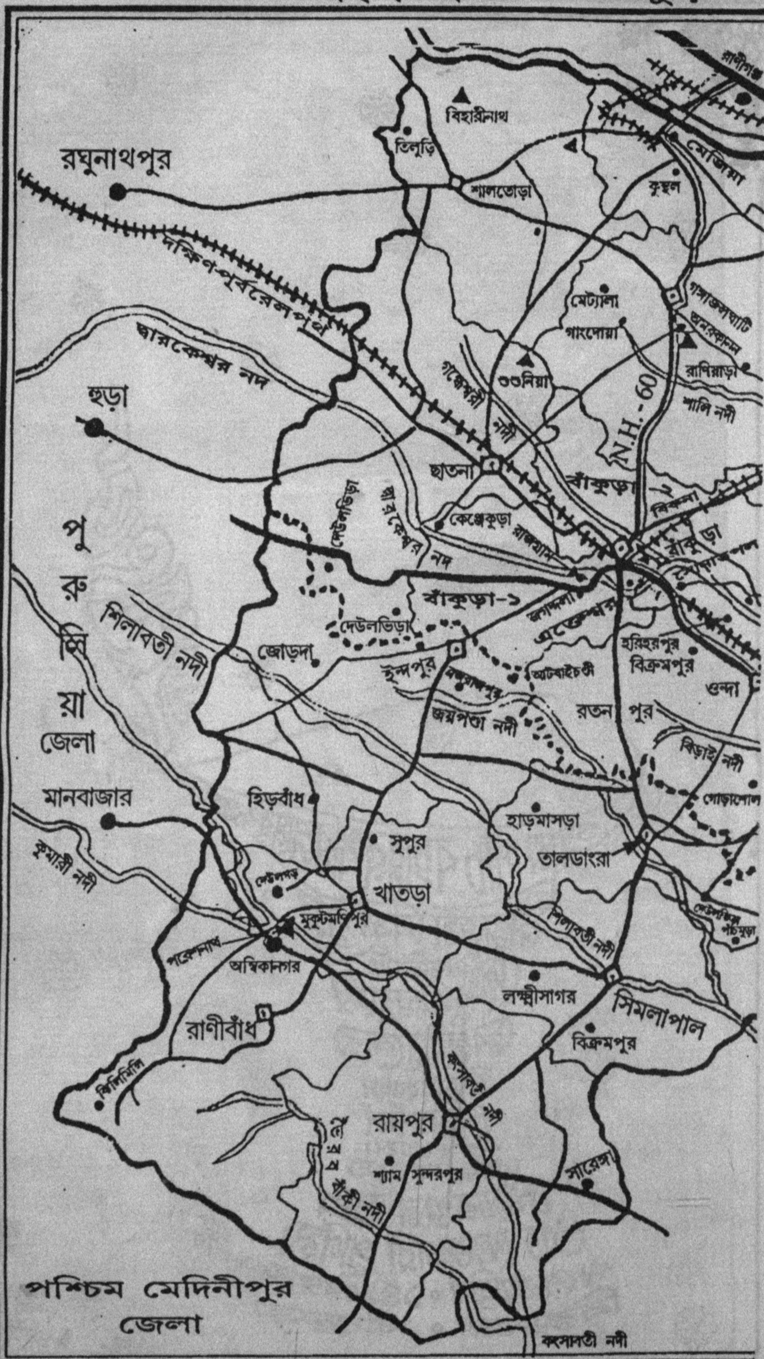


মা কৈলাসেশ্বরী (কৈলাসতলা) (পৃঃ ৪৪৭)

উৎসর্গ

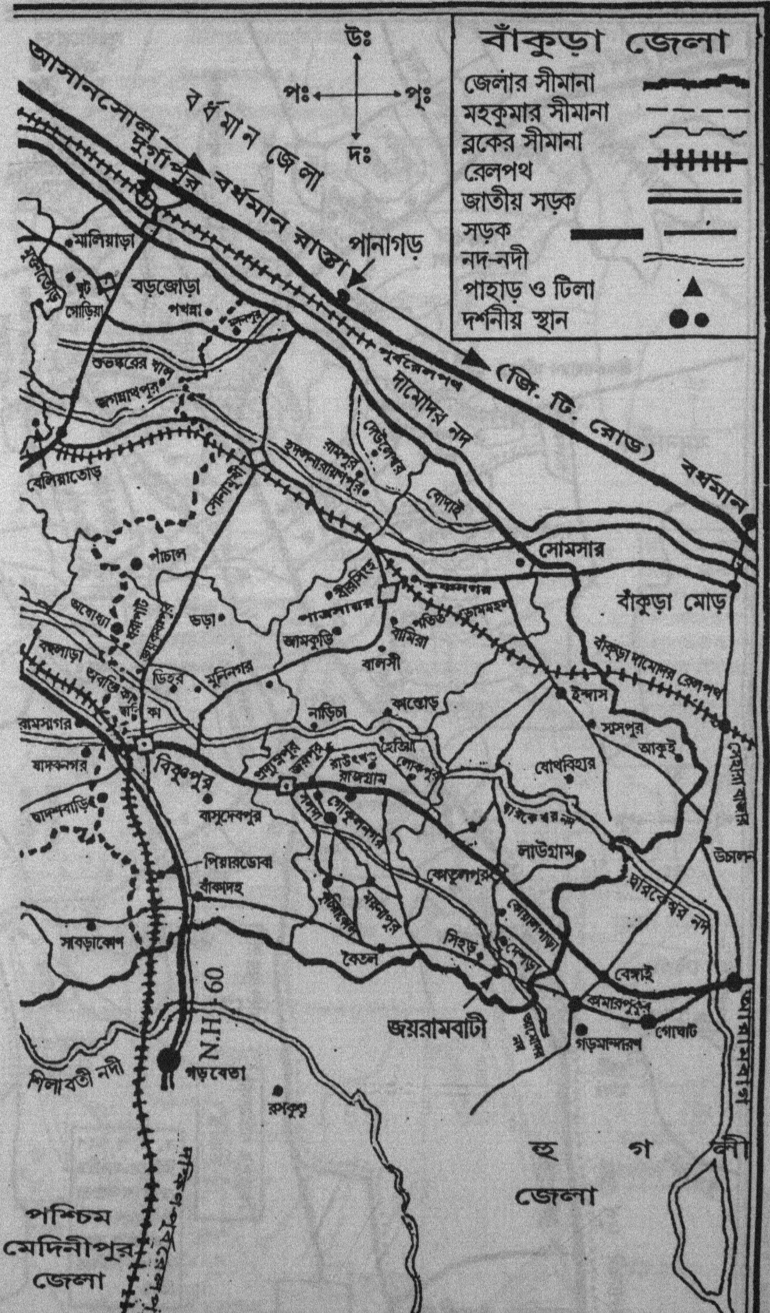
প্রায় পাঁচ বছরের পরিশ্রমের ফসল
মল্লভূম বিষ্ণুপুর
প্রভৃতিকে
দেবভূমি মল্লভূমের
দেবদেবীবৃন্দের
শ্রীচরণকমলে
সমর্পণ
করলাম।
শ্রদ্ধাবনত
মনোরঞ্জন চন্দ্র
শুভ কোজাগরী পূর্ণিমা
২২শে আশ্বিন • ১৪১০ বঙ্গাব্দ
বিষ্ণুপুর • বাঁকুড়া

অংশ-ক বাঁকুড়া -

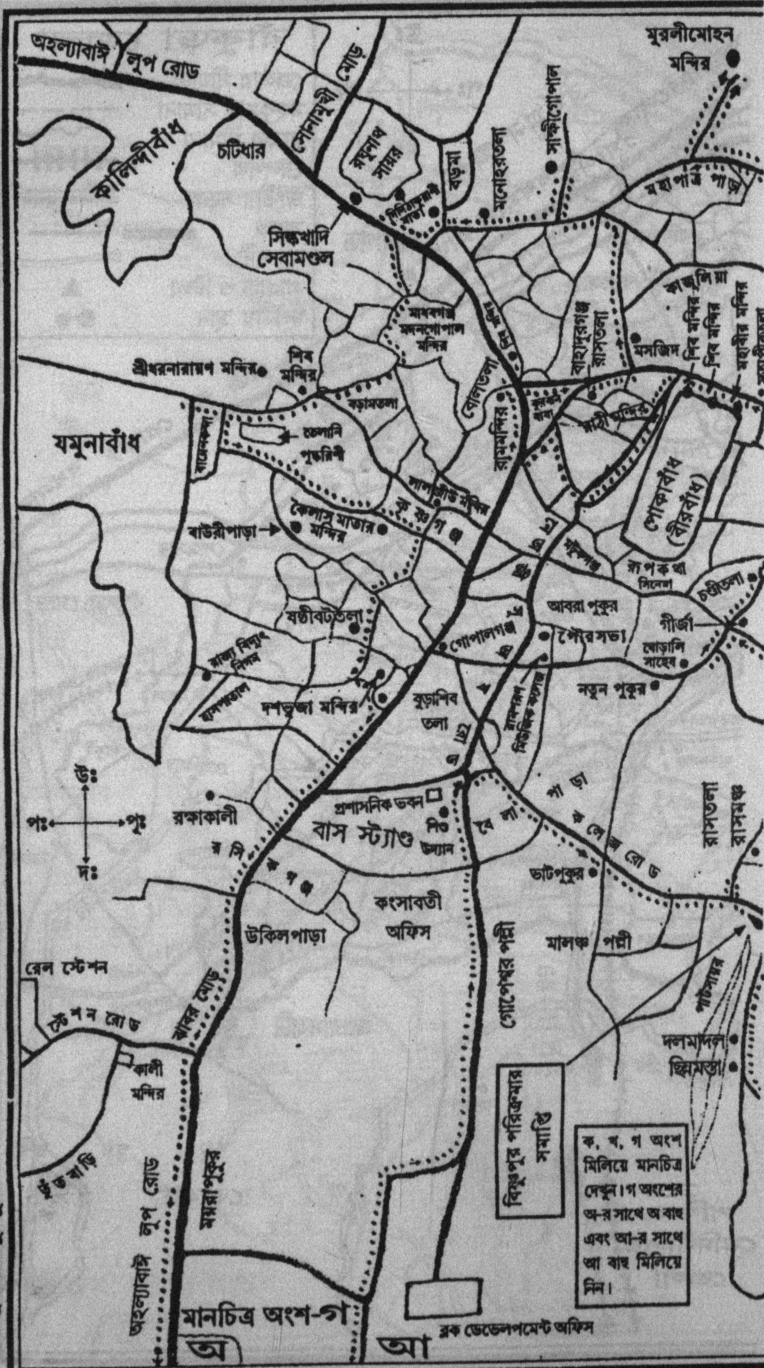


বিহারীনাথ
তিলুড়ি
রঘুনাথপুর
শালতোড়া
মেজিয়া
কুস্থল
দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ
দ্বারকেশ্বর নদ
মেট্যালা
গাংদোয়া
রাণিয়াড়া
শালি নদী
শুশুনিয়া
হুড়া
N.H.-60
ছাতনা
বাঁকুড়া-২
কেঞ্জেকুড়া
বাঁকুড়া
বাঁকুড়া-১
পুরুলিয়া জেলা
শিলাবতী নদী
দেউলভিড়া
জোড়দা
ইন্দপুর
হরিহরপুর
বিক্রমপুর
ওন্দা
জয়পণ্ডা নদী
রতনপুর
বিড়াই নদী
মানবাজার
হিড়বাঁধ
হাড়মাসড়া
গোড়াশোল
সুপুর
তালডাংরা
কুমারী নদী
খাতড়া
মুকুটমণিপুর
পরেশনাথ
অম্বিকানগর
শিলাবতী নদী
লক্ষ্মীসাগর
সিমলাপাল
রাণীবাঁধ
বিক্রমপুর
ঝিলিমিলি
রায়পুর
কংসাবতী নদী
শ্যাম সুন্দরপুর
সারেঙ্গা
বাঁকী নদী
পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা
কংসাবতী নদী

জেলা অংশ-খ (MAP NOT TO SCALE)



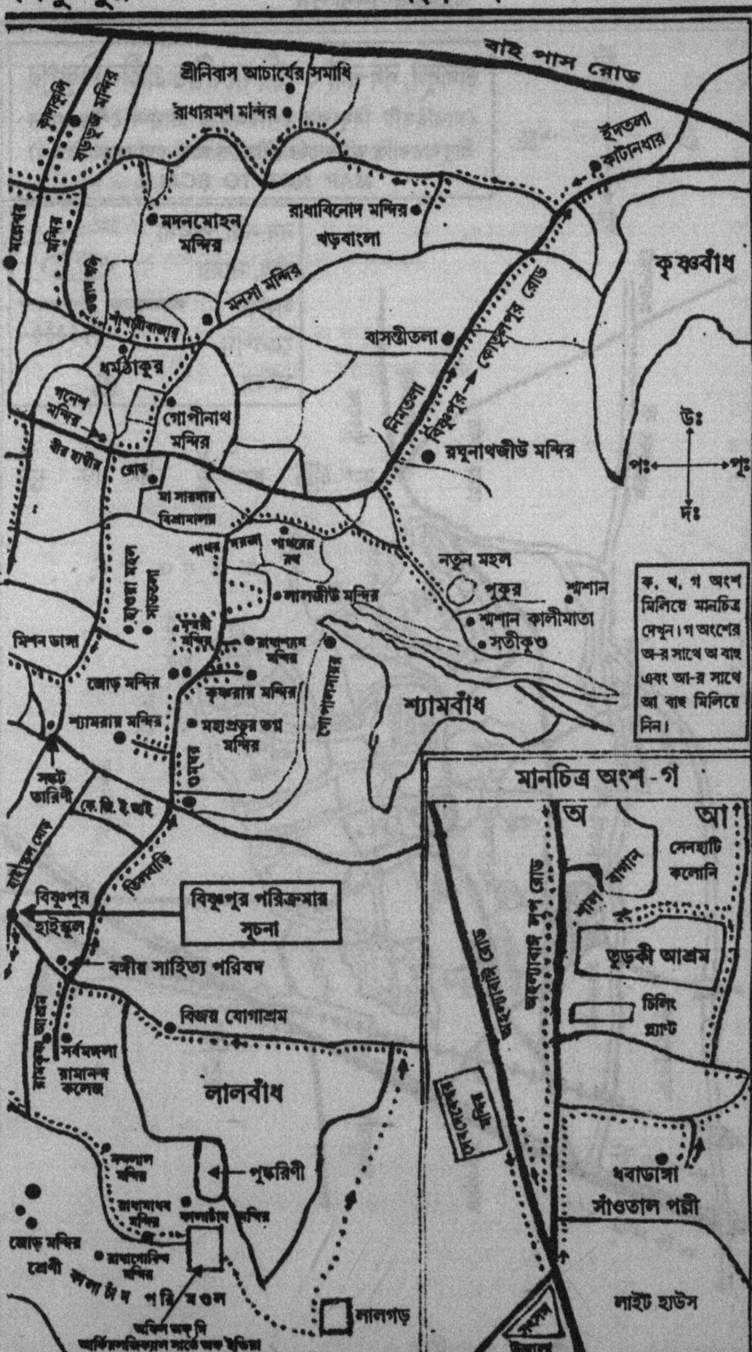
অংশ - ক মানচিত্র-



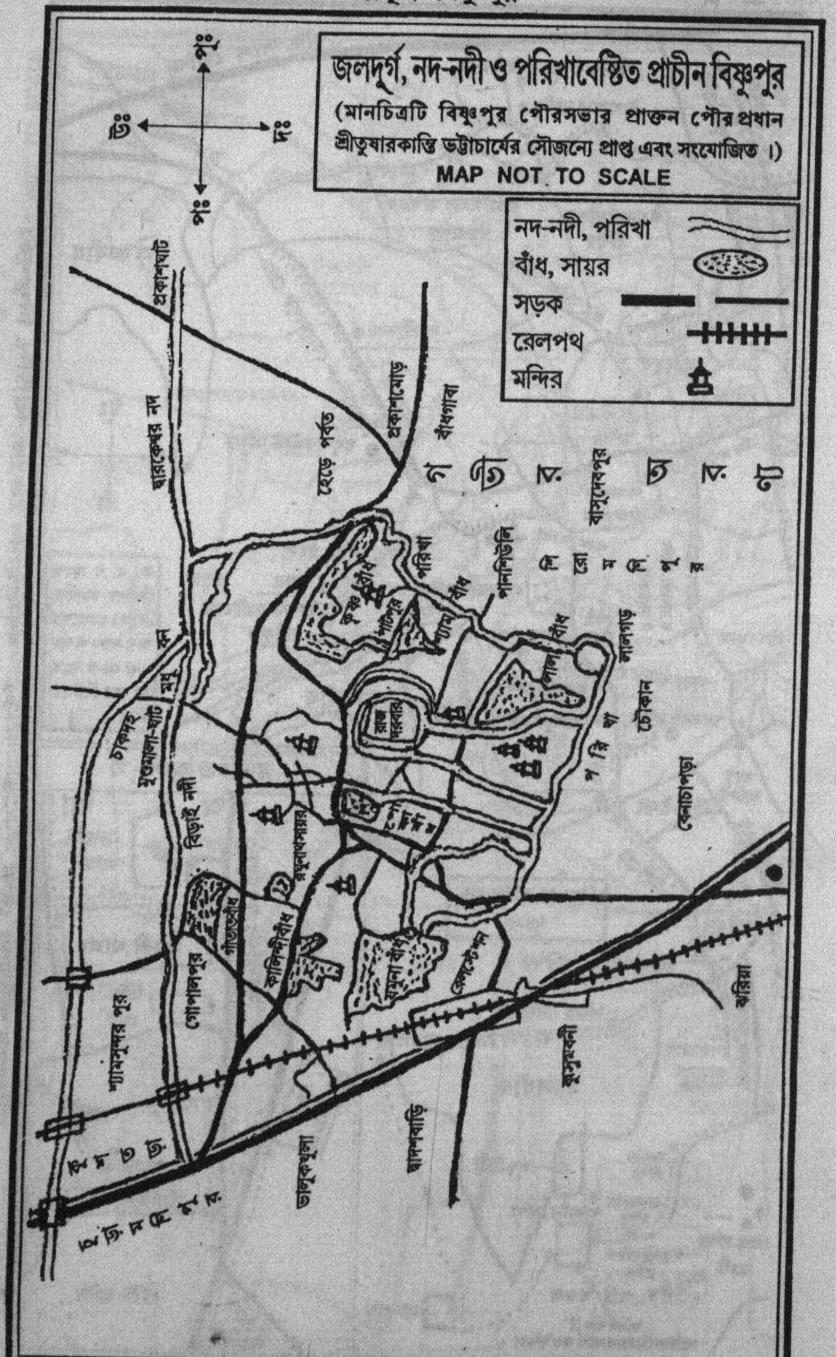
MAP NOT TO SCALE

মানচিত্রটি বিষ্ণুপুর পৌরসভার সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং সংশোধিত।

মল্লভূম বিষ্ণুপুর



(বিষ্ণুপুর পরিক্রমা রেখা ····→····→ বর্ণসংস্থাপন জে.কে. ডিটিপি, বিষ্ণুপুর।)


জলদুর্গ, নদ-নদী ও পরিখাবেষ্টিত প্রাচীন বিষ্ণুপুর
(মানচিত্রটি বিষ্ণুপুর পৌরসভার প্রাক্তন পৌর প্রধান শ্রীতুষারকান্তি ভট্টাচার্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত এবং সংযোজিত।)
MAP NOT TO SCALE
নদ-নদী, পরিখা
বাঁধ, সায়র
সড়ক
রেলপথ
মন্দির

সূচীপত্র

অধ্যায় নং	বিষয়		পৃষ্ঠা
	প্রথম দিনের পরিক্রমা	....	**(২১-১৪৮)**
১	প্রাসঙ্গিক কথা	....	২১
২	দলমাদল কামান	....	২৪
৩	মা ছিন্নমস্তা	....	২৭
৪	কালাচাঁদ পরিমণ্ডল	....	৩০
৫	বিষ্ণুপুর প্রসঙ্গে সুসাহিত্যিক ও সুবক্তা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়	....	৩৮
৬	**রাজকাহিনী-১**, আদি মল্ল বা রঘুনাথ মল্ল	....	৪০
৭	**রাজকাহিনী-২**, প্রদ্যুম্নপুর—মল্লভূমের আদি রাজধানী	....	৪৪
৮	লালগড়	....	৪৭
৯	বাঁধ, সায়র, পুষ্করিণী ও পরিখা	....	৫০
১০	**রাজকাহিনী—৩**, মা দণ্ডেশ্বরী ও লাউগ্রাম ঃ জয় মল্ল, বেণু মল্ল, কিনু মল্ল, ইন্দ্র মল্ল, কানু মল্ল, ধ মল্ল, শূর মল্ল, কনক মল্ল, কন্দর্প মল্ল, সনাতন মল্ল, খড়্গ মল্ল, দুর্জন মল্ল, যাদব মল্ল, জগন্নাথ মল্ল, বিরাট মল্ল, মাধব মল্ল, দুর্গাদাস মল্ল	....	৫৩
১১	শ্রীশ্রীবিজয় যোগাশ্রম	....	৬০
১২	মা সর্বমঙ্গলা	....	৬৪
১৩	রামকৃষ্ণ আশ্রম, (বিষ্ণুপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং বিষ্ণুপুরের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক বশীশ্বর সেন)	....	৬৬
১৪	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন	....	৭৫
১৫	গুম্‌ঘর, গুম্‌গড় বা ফোয়ারাখানা	....	৮০
১৬	কামানঢালা	....	৮২
১৭	টেরাকোটা শিল্প-প্রসঙ্গ	....	৮৪
১৮	শ্যামরায়ের মন্দির	....	৮৬
১৯	মহাপ্রভুতত্ত্ব	....	৯০
২০	মহাপ্রভুর মন্দির	....	৯২
২১	মহাপ্রভুর ভগ্নপ্রায় মন্দির ও মৃন্ময়ী মন্দিরের মধ্যস্থলের জোড়া দেউল-মন্দির, রাজদরবার	....	৯৩
২২	জোড়বাংলা	....	৯৪
২৩	ধর্মপ্রবাহ	....	৯৯
২৪	রাধাশ্যাম মন্দির	....	১০১
২৫	**রাজকাহিনী-৪**, মল্লেশ্বরী মা-মৃন্ময়ী ও মহারাজ জগৎ মল্ল	....	১০৩

২৬ মল্লরাজাদের রাজপ্রাসাদ ও 'সাততলা' পুষ্করিণী ১১১
২৭ লালজীউ মন্দির ও মল্লরাজাদের মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যাবলী ১১৫
২৮ **রাজকাহিনী-৫**, অনন্ত মল্ল, রূপ মল্ল, সুন্দর মল্ল, কুমুদ মল্ল, কৃষ্ণ মল্ল, রূপ মল্ল (২য়), প্রকাশ মল্ল, প্রতাপ মল্ল, সিন্দুর মল্ল, সুখময় মল্ল, বনমালী মল্ল, যদু মল্ল, জীবন মল্ল, রাম মল্ল, গোবিন্দ মল্ল, ভীম মল্ল, কাটার মল্ল, পৃথ্বী মল্ল ১১৮
২৯ **রাজকাহিনী-৬**, সলদা-গোকুলনগর পরিমণ্ডল, তপ মল্ল, দীনবন্ধু মল্ল, কানু মল্ল (২য়), শূর মল্ল (২য়), শিবসিং মল্ল, মদন মল্ল, দুর্জন মল্ল (২য়), উদয় মল্ল ও চন্দ্র মল্ল ১২০
৩০ পাথর-দরজাদ্বয়ের আত্মকথা ১২৮
৩১ **রাজকাহিনী-৭**, বীর মল্ল ১৩২
৩২ **রাজকাহিনী-৮**, ধাড়ী মল্ল ১৩৪
৩৩ **রাজকাহিনী-৯**, হাম্বীর মল্ল দেব বা বীর হাম্বীর দেব ১৩৫

দ্বিতীয় দিনের পরিক্রমা (১৪৯-২৬২)

৩৪ **রাজকাহিনী-১০**, ধাড়ী হাম্বীর দেব ও রঘুনাথ মল্ল দেব (১ম).... ১৪৯
৩৫ পাথরের রথ ১৫৪
৩৬ **রাজকাহিনী-১১**, বীরসিংহ দেব ১৫৫
৩৭ **রাজকাহিনী-১২**, দুর্জন সিংহদেব ১৫৮
৩৮ নতুন মহলের শ্রীশ্রীশ্মশানকালীমাতা ১৬০
৩৯ **রাজকাহিনী-১৩**, রঘুনাথ সিংহদেব (২য়) ও লালবাঈ ১৬৪
৪০ শ্রীশ্রীরঘুনাথ জীউ এবং 'রাবণ-কাটা'—লোকনৃত্য ১৮১
৪১ বাসন্তীতলার বাসন্তীমাতা ১৮৭
৪২ ইঁদ পরব ১৮৯
৪৩ **রাজকাহিনী-১৪**, গোপাল সিংহদেব (প্রথম) ১৯১
৪৪ রাধাবিনোদ মন্দির, খড়বাংলা ১৯৯
৪৫ শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউ মন্দির ও শ্রীনিবাস আচার্যের সমাধি, গোস্বামী পাড়া ২০১
৪৬ **রাজকাহিনী-১৫**, চৈতন্য সিংহদেব ২০৭
৪৭ শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ ২১৪
৪৮ **রাজকাহিনী-১৬**, মাধব সিংহদেব, গোপাল সিংহদেব (২য়) রামকৃষ্ণ সিংহদেব ও নীলমণি সিংহদেব ২৩০
৪৯ শ্রীশ্রীষড়ভূজ জীউ, কাদাকুলি ২৩৪
৫০ **রাজকাহিনী-১৭**, শ্রীশ্রীরাজাকালীপদ সিংহঠাকুর এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বিষ্ণুপুর ২৩৭
৫১ শ্রীশ্রীমুরলীমোহন জীউ, মহাপাত্রপাড়া ২৪৭
৫২ মল্লরাজাদের দেওয়া উপাধি এবং উপাধিগুলির বৈশিষ্ট্য ২৫১
৫৩ জলেশ্বর ও মল্লেশ্বর শিবমন্দির, মল্লেশ্বর পল্লী ২৫৮

তৃতীয় দিনের পরিক্রমা (২৬৩-৩৭৭)

৫৪	মনসা পূজা ও ঝাঁপান উৎসব, শাঁখারীবাজার	....	২৬৩
৫৫	শাঁখা, সিঁদুর, লোহা, আলতা ও শোলার সাজ	....	২৬৮
৫৬	ধর্মঠাকুর, শাঁখারীবাজার	....	২৭৫
৫৭	দশ অবতার তাস বা ওরক	....	২৮৩
৫৮	মনসাতলার মনসামূর্তি, শাঁখারীবাজার	....	২৮৭
৫৯	শাঁখারীবাজার মহল্লা ঃ বিষ্ণুপুরের ওস্তাদপল্লী	....	২৯১
৬০	শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ, যাদবপল্লী, মাড়ুইবাজার	....	২৯২
৬১	মাদুলি শিল্প, শাঁখারীবাজার, সাবিত্রীতলা ও মাড়ুইবাজার	....	২৯৪
৬২	গণেশমেলার গণেশ ঠাকুর, মাড়ুইবাজার	....	২৯৬
৬৩	বিষ্ণুপুরের মিষ্টান্ন ও মতিচুর	....	২৯৮
৬৪	শ্রীশ্রীসঙ্কটতারিণী মাতা, সঙ্কটতলা	....	৩০২
৬৫	মল্লভূমের মল্লরাজারা কি বাগ্দী বংশীয়?	....	৩০৬
৬৬	মল্লভূমে মিশনারী কার্যকলাপ ও খৃষ্টধর্ম প্রচার	....	৩১৫
৬৭	মল্লরাজাদের রাজ্যশাসন প্রণালী	....	৩২১
৬৮	ঘোড়ালি সাহেবের আস্তানা ও চটশাহ বাবা	....	৩২৮
৬৯	বিষ্ণুপুর সম্পর্কে ফরাসী পর্যটক আবে রেনল ও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির গভর্নর হলওয়েল সাহেবের মন্তব্য	....	৩২৯
৭০	শ্রীশ্রীচণ্ডীমাতা, কুন্দকুন্দার বাজার	....	৩৩২
৭১	প্রবাদ-প্রবাহে মল্লভূম	....	৩৩৫
৭২	শ্রীশ্রীসত্যপীর সাহেব, সত্যপীরতলা	....	৩৩৯
৭৩	প্রসঙ্গ পোকাবাঁধ ও পোকাবাঁধের দেব-বিগ্রহ সমূহ, মা শীতলা এবং বিষ্ণুপুরের চব্বিশ প্রহর	....	৩৪২
৭৪	রাঠীগলির রাঠীমন্দির	....	৩৪৫
৭৫	ছড়িয়ে ছড়া মল্লভূমে	....	৩৪৯
৭৬	হজরত কুরবান বাবা, কুরবানতলা	....	৩৫৩
৭৭	ধাঁধার ধোঁয়ায় মল্লভূম	....	৩৫৬
৭৮	বোলতলার রামমন্দির	....	৩৫৮
৭৯	বোলতলার বুড়োশিব	....	৩৬০
৮০	ব্রতকথার আসর	....	৩৬২
৮১	ঈশ্বর-আরাধনায় বাহাদুরগঞ্জের চৌধুরী পরিবার	....	৩৬৮
৮২	মল্লভূমে মুসলমান সম্প্রদায় ও মুসলমানী উৎসব	....	৩৬৯

চতুর্থ দিনের পরিক্রমা .... (৩৭৮-৪৯২)

৮৩	মালা শিল্প, বৈষ্ণব পাড়া	....	৩৭৮
৮৪	শ্রীশ্রীসাক্ষীগোপাল জীউ, সাক্ষীগোপাল পাড়া	....	৩৮১
৮৫	ভাদু—একটি লোক-উৎসব	....	৩৮৭
৮৬	মহাসাধক মনোহর ঠাকুর, মনোহরতলা	....	৩৯২
৮৭	বড়কালীতলার 'বড়-মা'	....	৩৯৪
৮৮	শ্রীশ্রীদিদিঠাকুরাণী মাতা, রঘুনাথ সায়র	....	৩৯৭
৮৯	ইতু ও তুষু পূজা	....	৪০০
৯০	বিষ্ণুপুরের তন্তুবায় সমাজ ঃ সূতা, রেশম, বালুচরী ও স্বর্ণচরী বস্ত্রশিল্প	....	৪০৩
৯১	শ্রীশ্রীরাধামদনগোপাল জীউ, মাধবগঞ্জ	....	৪১৫
৯২	মঙ্গল আরতি	....	৪১৮
৯৩	শ্রীশ্রীরাধামদনগোপাল জীউ-এর মন্দির-প্রাঙ্গণে রাস-উৎসব	....	৪২২
৯৪	বড়াম ঠাকুর, বড়ামতলা	....	৪২৭
৯৫	মল্লভূমের শিকারোৎসব এবং মল্লরাজাদের যুদ্ধযাত্রা	....	৪৩২
৯৬	শ্রী শ্রী শ্রীধরলালজীউ, বসুপাড়া	....	৪৩৫
৯৭	ঘাঁটুপূজা বা ঘণ্টাকর্ণ পূজা	....	৪৪০
৯৮	যমুনাবাঁধ, তেজপাল, কালিন্দীবাঁধ, গন্টনবাঁধ, ভালুক-খুলা, যাদবনগর, অসমের শিবসাগর, জয়সাগর, গৌরীসাগর ও কৃষ্ণগঞ্জের বাউরীপাড়া	....	৪৪৩
৯৯	মা কৈলাসেশ্বরী, কৈলাসতলা	....	৪৪৭
১০০	বিষ্ণুপুরের অম্বরী তামাক	....	৪৫০
১০১	শ্রীশ্রীরাধালালজীউ ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জীউ, কৃষ্ণগঞ্জ	....	৪৫৩
১০২	শ্রীশ্রীরাধালালজীউ ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জীউ-এর কৃষ্ণগঞ্জে আগমনের কাহিনী ও কৃষ্ণগঞ্জে কেমন আছেন এই দু'জোড়া বিগ্রহ	....	৪৫৭
১০৩	বিষ্ণুপুরের রথযাত্রা, উল্টোরথ ও অন্নকূট উৎসব	....	৪৬০
১০৪	শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা প্রসঙ্গ	....	৪৬৫
১০৫	দোলযাত্রা বা হোলি উৎসব	....	৪৭০
১০৬	বিষ্ণুপুরের বাসন শিল্প	....	৪৭৬
১০৭	ষষ্ঠীবটতলার ষষ্ঠীপূজা	....	৪৭৯
১০৮	মা দশভূজা প্রসঙ্গ	....	৪৮১
১০৯	বিষ্ণুপুরের লণ্ঠনশিল্প	....	৪৮৩
১১০	গোপালগঞ্জের বুড়োশিব	....	৪৮৫
১১১	রামশরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়	....	৪৮৯

পঞ্চম দিনের পরিক্রমা			(৪৯৩-৬৪০)
১১২	মা রক্ষাকালী, রসিকগঞ্জ	....	৪৯৩
১১৩	রত্নগর্ভা মল্লভূম ঃ সাহিত্য-সাধনার আসরে	....	৪৯৭
১১৪	রত্নগর্ভা মল্লভূম ঃ সঙ্গীত-সরস্বতীর আরাধনায়	....	৫০৬
১১৫	মন্দির-নগরী বিষ্ণুপুরের নব-নির্মিত দেব-দেবেশ্বর মন্দির	....	৫৩৪
১১৬	রত্নগর্ভা মল্লভূম ঃ শিল্পকলার আঙ্গিনায়	....	৫৩৭
১১৭	শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুরের আশ্রম—সৎসঙ্গ, উজালা কারখানা ও লাইট হাউস	....	৫৩৯
১১৮	রত্নগর্ভা মল্লভূম ঃ ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনে	....	৫৪১
১১৯	রত্নগর্ভা মল্লভূম ঃ তেভাগা থেকে বাঁধগাবা ও নকশাল আন্দোলন	....	৫৫৫
১২০	মল্লভূমের আদিবাসী অঙ্গনে কিছুক্ষণ, ধবাডাঙা, তুড়কী সীতারামপুর মৌজা	....	৫৫৭
১২১	হরিতপোবন আশ্রম, তুড়কী	....	৫৬১
১২২	রত্নগর্ভা মল্লভূম ঃ ঈশ্বরের ঘর-সংসার	....	৫৭২
১২৩	রত্নগর্ভা মল্লভূম ঃ নানা গুণে গুণিজন	....	৫৭৭
১২৪	হাতি-ঘোড়ার দেশে	....	৫৮৩
১২৫	শিল্প-সম্ভারে মল্লভূম তথা বাঁকুড়া	....	৫৯১
১২৬	মল্লভূম তথা বাঁকুড়ার বনজ ও খনিজ সম্পদ	....	৫৯৩
১২৭	বাঁকুড়া তথা মল্লভূমের অবস্থান, আবহাওয়া, ঋতুবৈচিত্র্য, ভূ-প্রকৃতি ও নদনদী	....	৫৯৬
১২৮	অতীতের মল্লভূম এবং বর্তমান বাঁকুড়া জেলার প্রায় যাবতীয় তথ্য	....	৫৯৯
১২৯	উৎসব ওমেলায় মুখর মল্লভূম	....	৬০০
১৩০	দেবভূমি মল্লভূমের দেবদেবী, দেবমন্দির, দর্শনীয় স্থান ও পুরাকীর্তি	....	৬০২
১৩১	রাসমঞ্চ, রাসতলা	....	৬২২
১৩২	জন্মভূমি বিষ্ণুপুর-জননীর আত্মকথা, তথা কাঁদে কেন বিষ্ণুপুর?	....	৬২৮
১৩৩	বিষ্ণুপুর মেলা ও বিষ্ণুপুর পরিক্রমার সমাপ্তি ঘোষণা এবং বিদায় সম্ভাষণ	....	৬৩৬

প্রথম দিনের পরিক্রমা

অধ্যায় - ১

প্রাসঙ্গিক কথা

সুধী ভ্রমণসঙ্গীগণ! প্রিয় পর্যটকবৃন্দ! আজ আমি আপনাদের যে শহরটির ইতিকথা শোনাব, যে শহরটির সঙ্গীত, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও লোকোৎসবের কথা আলোচনা করব, ঐতিহ্যমণ্ডিত যে শহরটির দর্শনীয় বস্তুরাজি তথা অনুপম সব দেব-মন্দির এবং দেব-বিগ্রহ্ সমূহ দেখাব, সেই শহরটির মাটিতে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার বীজ, জলে রয়েছে শুচিস্নিগ্ধ পবিত্রতা, বায়ুমণ্ডলে রচিত হয়েছে ঐশী আবেশ, ঈথার তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হচ্ছে রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, যদু ভট্ট, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সঙ্গীত জগতের দিক্‌পালগণের সুরমাধুরী। আজ আমি আপনাদের যে শহরটির কথকতা শোনাব, সেই শহরটির ধুলিকণাতে মিশে রয়েছে সপার্ষদ শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পদরেণু। কারণ আজ থেকে প্রায় পাঁচশত বছর পূর্বে অহল্যাবাঈ রাস্তা ধরে পুরী থেকে গয়া যাবার পথে চৈতন্যদেব বিষ্ণুপুরের বুকে এঁকে দিয়েছিলেন তাঁর পবিত্র চরণচিহ্ন। সেদিন খোল, করতাল সহযোগে হরিনাম সংকীর্তনে মুখরিত হয়ে উঠেছিল বিষ্ণুপুরের তথা মল্লভূমের আকাশ-বাতাস। মিশে রয়েছে শ্রীনিবাস আচার্য, অভিরাম স্বামী, কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী, মৌনীবাবা, কুরবান বাবা, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মা, স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ সিদ্ধ সাধক-সাধিকাগণের পদরেণু। আজ আমি আপনাদের কাছে যে শহরটির স্মৃতিচারণ করব, সেই শহরটির প্রশস্তিবাণী রচনা করতে গিয়ে কবিকণ্ঠ থেকে উৎসারিত হয়েছে—

> " দেবতা হেথায় অনুরাগে
> দলমাদলের কামান দাগে।"

শুধু কি কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক! না। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে এখানে এসেছিলেন। শিক্ষক সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি আবেগতাড়িত কণ্ঠে উচ্ছ্বসিতভাবে মন্তব্য করেছিলেন, "বাংলার শেষ স্বাধীন রাজ্যে আমি নিঃশ্বাস নিতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে ক'রচি।" আর অবিভক্ত বাংলার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইস্‌লাম সঙ্গীত সাধনার পীঠস্থান এই শহরটিতে সঙ্গীত-সুধা পানের আশায় বার বার ছুটে এসেছিলেন সঙ্গীত জগতের প্রবাদ পুরুষ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর কাছে। রাতের পর রাত কাটিয়েছেন এখানে। আবার ভোটের সময় 'ভোটপাখি' হয়ে উড়ে এসেছেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল সেন, অতুল্য ঘোষ, কমরেড জ্যোতি বসু; উড়ে এসেছেন এশিয়ার 'মুক্তি-সূর্য' রূপে প্রশংসিত ইন্দিরা গান্ধী, এসেছেন রাজীব গান্ধী এবং আরও অনেকে। বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের কণ্ঠে বিষ্ণুপুরের ভূয়সী প্রশংসা শুনেছি। দিয়ে গেছেন অনেকানেক প্রতিশ্রুতি। কিন্তু প্রতিশ্রুতি, প্রতিশ্রুতিই রয়ে গেছে—কাজ হয়নি তেমন কিছু।

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ এবং জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় তাই অনুশোচনা করেছেন, প্রকাশ করেছেন উষ্মা, **"আমাদের বাঙ্গালীদের এই হিসাবে দুর্ভাগ্য—কাশী বা মাদুরা, জয়পুর বা আগরার মত একটি কলা-নগরী বাংলাদেশে গড়িয়া উঠিল না। এইরূপ একটি মাত্র নগরী সারা বাংলাদেশের মধ্যে দেখা যায়, সেটি হইতেছে বিষ্ণুপুর; বিষ্ণুপুর প্রাচীন মন্দিরে ও নানাবিধ শিল্পকার্য্যে বাংলাদেশের সমস্ত নগরগুলির শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু এই বিষ্ণুপুরকে বাঙ্গালী জনসাধারণ চিনিল না, দেখিল না, আদর করিতে শিখিল না।"**

প্রভূত সম্ভাবনাময় এই শহরটি স্বাধীনতার পঞ্চান্ন বৎসর পরেও উপেক্ষিত, অবহেলিত, অনাদৃত এবং মৃতপ্রায়। অথচ ঐতিহ্যশালী এই রাজ্যটির যথাযথ মূল্যায়ন করতে গিয়ে হাণ্টার সাহেব একদিন লিখেছিলেন, **"It was as big as the kingdom of Wales."** বৈষ্ণব সাধক শ্রীনিবাস আচার্য বিষ্ণুপুরের নাম রেখেছেন 'গুপ্তবৃন্দাবন'। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এর মাটিতে পা রেখে ঐশী আবেশে অভিভূত হয়েছেন। বাংলার বীর নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু এই শহরটির মিউনিসিপ্যাল্ ময়দানে ভাষণ দিতে গিয়ে সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, **"যে দেশে দলমাদলের মত কামান তৈয়ারী হয়, আবার মদনমোহনের মত বিগ্রহের বাসস্থান রচিত হয়, যেখানে ভগবানের নামে লোকের চোখে জল পড়ে, যেখানে দেশপ্রেম ও ভক্তির এমন সমন্বয় ঘটে, সে দেশ নিশ্চয়ই বাংলা তথা ভারতকে প্রেরণা দিতে পারে।"**

এমন যে দেশ সেই দেশের মাটিতে ভূমিষ্ঠ হয়ে নিজেকে ধন্য মনে করছি। এমন যে দেশ সেই দেশে লালিত, পালিত, বর্ধিত হতে পেরে গর্ববোধ করছি। এমন যে দেশ সেই দেশের কথাই এখন শোনাব আপনাদের। অবশ্য দেশ মানে শহর, আর শহরটি যে বিষ্ণুপুর সে কথা বলেছি আগেই।

ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গের আর পাঁচটি মহকুমা শহরের মতোই বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরও একটি মহকুমা শহর। অন্যান্য মহকুমা শহরে যা যা থাকে বিষ্ণুপুরেও তাই আছে। আছে একটি পৌরসভা, ডাকঘর, থানা, অফিস, আদালত, হাসপাতাল, কয়েকটি নার্সিং হোম্ এবং মহকুমা শাসক ও মহকুমা শাসকের কার্যালয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত 'প্রবুদ্ধ ভারতী' নামধেয় শিশু শিক্ষায়তনগুলির পাশাপাশি খান ৩৫ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সাথে সঙ্গতি-সাধন করে গড়ে উঠেছে সাতটি মাধ্যমিক এবং তার মধ্যে পাঁচটি উচ্চ-মাধ্যমিক বিদ্যালয়। উচ্চ-শিক্ষার জন্য রয়েছে 'রামানন্দ মহাবিদ্যালয়', বিষ্ণুপুরের প্রাক্তন মহকুমা শাসক মাননীয় কৃষ্ণগোপাল ঘোষ মহাশয়ের নামানুসারে স্থাপিত 'কে. জি. ইন্‌জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউট্' এবং রয়েছে 'নিখিলবঙ্গ শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়' (বি.এড়.; অ্যাণ্ড বি. পি. এড়. কলেজ)। রয়েছে ইংলিশ মিডিয়াম্ স্কুল এবং একটি ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রী কলেজ। এছাড়া শর্টহ্যাণ্ড-টাইপ রাইটিং স্কুল, কম্পিউটার ট্রেনিং সেণ্টার এবং দর্জি-বিজ্ঞান কলেজের অস্তিত্বও পরিলক্ষিত হয়। **'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা'**—এহেন সঙ্গীত সাধনার জন্য শহরের মধ্যস্থলে রয়েছে 'রামশরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়'। চিত্তবিনোদনের জন্য রয়েছে তিন তিনটি সিনেমা হল, কয়েকটি ভি. ডি. ও. হল, একটি স্টেডিয়াম এবং একটি চিলড্রেন পার্ক। শরীর-চর্চার জন্য রয়েছে 'দেবেন্দ্রস্মৃতি ব্যায়ামাগার' এবং 'অনন্তস্মৃতি ব্যায়ামাগার'।

কাঁচা আনাজপাতি ও ফলমূল শাক-সব্জিতে থলি ভর্তি করে বাড়ি ফেরার জন্য রয়েছে

চক-বাজারের পাশাপাশি আরো কয়েকটি সব্জিবাজার। নিত্য প্রয়োজনীয় দৈনন্দিন টুকিটাকির জন্য শহরের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে মুদিখানা থেকে মনোহারী মায় কাপড়-চোপড় এবং ওষুধপত্রের দোকানদানি। বেকারত্বের জ্বালায় পাঁচমিশালী দোকানদানির সাথে সাথে রাস্তার ধারে ধারে পাল্লা দিয়ে অবাধে বংশ বিস্তার করে চলেছে ছোট বড় আকারের গুমটির দল। স্থূল দেহটাকে প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে স্থান থেকে স্থানান্তরে বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এবং মন্দির-নগরী বিষ্ণুপুর-প্রেমিক পর্যটকদের যাতায়াতের জন্য বাসস্ট্যাণ্ডে রয়েছে ঢালাও বাসের ব্যবস্থা, আর রেলস্টেশনে রয়েছে সরীসৃপের মতই রেলগাড়ীর ঝম্ ঝম্ আনাগোনা।

বিষ্ণুপুরে রাজা-রাজড়ার গপ্পো শোনা যায় অনেক, কিন্তু রাজপ্রাসাদ বা রাজপথ বলতে যা বোঝায় তা চোখে পড়ে না আদৌ। দু-পাশে আ-ঢাকা-নালাবিশিষ্ট সংকীর্ণ এবং ক্ষত বিক্ষত 'মেটাল্ রোড্'-গুলির উপর চালা ঘরের পাশাপাশি একতল, দ্বিতল বাড়িগুলিকে হুমড়ি খেয়ে ঝুঁকে পড়তেই লক্ষ্য করা যায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে। আঁকাবাঁকা অপ্রশস্ত ঐ রাস্তাগুলির বুক বিদীর্ণ করে শহরের প্রান্তরেখা অবধি চলে গেছে পাইপ লাইনের ছুটন্ত জল। প্রায় অবস্থাপন্ন ঘরে ঘরে পাইপ লাইনের জল, বিদ্যুতের আলো ঝলমল, টেলিফোনের রিসিভারে কান পেতে এবং মুখ রেখে ছল্ ছল্ কল্ কল্—এসব আধুনিকতার আশীর্বাদেও বঞ্চিত নয় বিষ্ণুপুর।

হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী, অবাঙালী এবং বাংলাদেশী বাঙালীর সাথে সাথে পাশাপাশি গ্রাম থেকে আগত এবং দূরাগত চাকুরীজীবী মানুষের সাথে মানুষ মিশে মিশে আদিবাসী অধিবাসী—সব মিলিয়ে নানান জাতি ও নানান সম্প্রদায়ের প্রায় বাষট্টি হাজার মানুষের মিলনতীর্থ এই শহর বিষ্ণুপুরের কথাই শোনাব এখন।

বিষ্ণপুরে নেই মুম্বই-এর আভিজাত্য, দিল্লীর জাঁকজমক কিংবা কল্লোলিনী কোলকাতার গতিধর্মী জীবনের গতিশীলতা। তবুও মানুষ এখানে আসেন। দিল্লী, মুম্বই, কোলকাতা ছেড়ে প্রায়ই হাজির হন বিষ্ণুপুরে। ঝক্‌ঝকে গাড়িতে চড়ে, ধোপ-দুরস্ত পোশাক-আশাকে সুসজ্জিত ঝলমলে মানুষেরা হঠাৎ হঠাৎ এসে পড়েন বিষ্ণুপুরে। এসে পড়েন বিদেশী পর্যটকগণও। ভরে যায় বিষ্ণুপুরের লজ, 'টুরিস্ট্‌লজ', ডর্‌মিটরি ও হোটেলগুলি। কিন্তু কেন? কি আছে এই বিষ্ণুপুরে? কেনই বা ডাকে বিষ্ণুপুর?

বিষ্ণুপুর দিল্লী নয়, নয় কোলকাতা, মুম্বই কিংবা চেন্নাই। গগনচুম্বী বহুতল বাড়ি, রাশি রাশি গাড়ি, বিশাল বিশাল কল-কারখানা, বন্দর কিংবা বিমান-বন্দর দেখা যাবে না এখানে। শোনা যাবে না কল-কারখানার বিরক্তিকর একঘেয়ে শব্দ, নটার ভোঁ, এরোপ্লেনের গগনবিদারী গোঁ গোঁ আওয়াজ।

কর্মব্যস্ত মানুষের ইতি উতি চাওয়া, হাতে-পায়ে চুম্বক সেঁটে ছুটন্ত গাড়িতে ঝুলতে ঝুলতে যাওয়া—এসব এখনও নেই বিষ্ণুপুরে, বিষ্ণুপুরে নেই এসব কিছু। যা আছে তা হল ভারাক্রান্ত বয়সের অবসাদে এবং ক্লান্তিতে ঝিমিয়ে পড়া ক্ষয়িষ্ণু একটি শহরের গল্প বলার মাদকতা। গল্প বলতে জানা ইতিহাসের গন্ধ মেশানো এই সুপ্রাচীন শহরটির বুকের ভিতরে, মনের গভীরে, হৃদয়-কন্দরে জমে আছে অনেক গল্প, অনেক কথা, অনেকানেক কথকতা। সেই সব কথাই শোনাব আপনাদের। শোনাব বিষ্ণুপুরের বালুচরী-স্বর্ণচরীর কথা, শাঁখা, কাঁসা-পিতল, লণ্ঠন, ও টেরাকোটা শিল্পের কথা। শোনাব কুসংস্কারের অভিযোগে অভিযুক্ত মাদুলি শিল্পের কথা, আর তারই মাঝে শোনাব ভক্তিরসের জোয়ারে

সুদূর আমেরিকা পর্যন্ত ভেসে যাওয়া বস্তাবন্দি বেলমালার গপ্পো। আর শোনাব বিষ্ণুপুরের রাজা-মহারাজাদের চিত্তাকর্ষক রাজকাহিনী। দেখাব তাঁদের তৈরী নানান শিল্পকীর্তির নিদর্শন সমূহ। দেখাব মন্দির নগরীর একচূড়া, পাঁচচূড়া, ন'চূড়া মন্দিরগুলি, দেখাব মন্দিরের গায়ে টেরাকোটা শিল্পের অপরূপ কারুকার্য সমূহ। শোনাব বর্গী তাড়ানোর উদ্দেশ্যে ভয়ঙ্কর রোষে গর্জে ওঠা 'দলমাদল' কামানের গালভরা গল্প। আর শোনাব জল চিক্ চিক্ আলো ঝিক্‌মিক্ মৃতপ্রায় বাঁধগুলির মর্মবেদনার মর্মধ্বনি।

উত্তর ভারতের তীর্থসার রাধাকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র শ্রীবৃন্দাবনে প্রতি বৎসর '**ব্রজ চৌরাশি ক্রোশ পরিক্রমা**' নামে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানটি কোন অভিজ্ঞ সাধু মহাত্মার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। সাধুসন্তগণ ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রকটিত ব্রজধামের বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি—যেমন বৃন্দাবন, মথুরা, গোবর্ধন, কামা, বর্ষাণা, নন্দগাঁও, চীরঘাট, নন্দঘাট, ব্রহ্মাণ্ডঘাট, গোড়েদেউজী, মহাবন, রামণরেতি, গোকুল, কালীয়দমন, তালবন, বিহারবন প্রভৃতি পরিক্রমা করেন।

অনুরূপভাবে আমরাও আজ সকলে মিলে গুপ্তবৃন্দাবন পরিক্রমাতে ব্রতী হব। 'ব্রজ চৌরাশি ক্রোশ পরিক্রমা'র ক্ষেত্রে বিশেষ কতকগুলি ধর্মীয় অনুশাসন এবং নিয়মনীতি মেনে চলতে হয়। আমাদের 'পরিক্রমা' কিন্তু সেই অর্থে পরিক্রমা নয়, বরং বলা চলে গুপ্তবৃন্দাবন ভ্রমণ অর্থাৎ বিষ্ণুপুর ভ্রমণ।

আসুন, এক্ষণে আমরা বেরিয়ে পড়ি বিষ্ণুপুর ভ্রমণে। বিষ্ণুপুর হাইস্কুল এবং টুরিস্ট্‌লজের মোড় থেকে শুরু হবে আমাদের পাঁচদিন ব্যাপী শহর পরিক্রমা। বিশেষ একটি পথরেখা ধরে ছান্দিক গতিতে আমরা এগিয়ে চলব পায়ে পায়ে। শুভলগ্নে শুরু হোক শুভযাত্রা।

অধ্যায় - ২

দলমাদল কামান

বিষ্ণুপুর হাইস্কুল এবং টুরিস্ট্‌লজ্ সংলগ্ন চৌরাস্তার মোড় থেকে দক্ষিণ দিকের পিচে মোড়া রাস্তাটি ধরে টুরিস্ট্‌লজের পশ্চিম দিকের বাউণ্ডারি ওয়াল সংলগ্ন দোকানদানি আর নিম্নভূমিতে নিমজ্জমান বাড়িগুলি এবং ডানদিকের একটি পরিখার উঁচু পাড় কেটে কেটে নব-নির্মিত সুশোভিত একতল, দ্বিতল, ত্রিতল দর্পিত বাড়িগুলি দেখতে দেখতে আমরা ততক্ষণে এসে গেছি ভারতের জাতীয় ফলগাছ রূপে স্বীকৃত একটি আম্রবৃক্ষের ছায়াশীতল পদপ্রান্তে। সেখান থেকেই দেখা গেল সর্বজনবিদিত সেই দলমাদল বা দলমর্দন কামান।

২৪'৩" দৈর্ঘ্য, ১৪'৩" প্রস্থ এবং ২'৬" উচ্চতা বিশিষ্ট মাকড়া পাথরের তৈরী একটি সুদৃশ্য বেদীর উপর রয়েছে অর্ধচন্দ্রাকৃতির দুটি সুপ্রশস্ত স্তম্ভ। ইষ্টক নির্মিত ঐ স্বল্পোচ্চ স্তম্ভ দুটির উপরেই শোভা পাচ্ছে ঐ সুবিশাল কামানটি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, বিষ্ণুপুরের নৃপতিগণ 'মল্ল' উপাধিতে ভূষিত হয়ে সদর্পে রাজত্ব করেছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। তাঁদেরই পদবীগত নামানুসারে তাঁদের রাজ্যের নাম হয়েছে '**মল্লভূম**'।

মল্লভূম রাজ্যের সীমানা নির্দেশ করতে গিয়ে ফকির নারায়ণ কর্মকার লিখেছেন, "পূর্বে বর্তমান বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর, হুগলীর আরামবাগ, জাহানাবাদ হয়ে হাওড়া; পশ্চিমে ছোটনাগপুর; দক্ষিণে মেদিনীপুর জেলার খড়্গপুর, তমলুক ও উত্তরে দামোদর নদ-আসানসোল পর্যন্ত এই মল্লভূম রাজ্যের বিস্তৃতি। এই রাজ্যের রাজধানী বিষ্ণুপুরের নামেই এই রাজ্যের প্রসিদ্ধি।" (বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী, পৃষ্ঠাঃ—১৭)

হান্টার (Hunter) সাহেব লিখেছেন, Mallabhoom in the days of its glory was an extensive country, equal in area to modern Wales. (Bengal Manuscript Record, p.-36)

এই প্রসঙ্গে District Gazetteers Bankura, p.-21 এ লেখা আছে, "To the north it is believed to have stretched as far as the modern Domin-i-koh in the Santal Parganas; to the west it comprised part of Midnapur and to the east part of Burdwan; and the inscriptions found at Panchet in the Manbhoom district show that in the west it included part of Chota Nagpur."

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, মল্লভূম ছিল এককালে এক বিশাল রাজত্ব। এই সুবিশাল রাজ্যটিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য মল্লরাজগণ ছিলেন সদা-সচেষ্ট। গড়ে তুলেছিলেন নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা ব্যবস্থা। নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার উদ্দেশ্যেই তৈরী করা হয়েছিল দলমাদল, গোরক, ঝুলঝাড়া, চড়কবিজলী, বাঘমুয়া প্রভৃতি নামধারী এবং নামবিহীন ছোট বড় বহু কামান। আর এই দলমাদল কামানটি হল মল্লভূমের মল্লরাজাদের সবচেয়ে বড় কামান।

ইতিহাস বলে মহারাজ বীর হাম্বীর এই সুবিশাল কামানটি তৈরী করিয়েছিলেন। তৈরী করেছিলেন জনৈক জগন্নাথ কর্মকার নামক ওস্তাদ কারিগর। কামানটির গায়ে খোদিত ফার্সি লিপি থেকে জানা যায় এটি তৈরি করতে খরচ হয়েছিল একলক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা।

১২'৫" দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এই কামানটির ওজন নাকি ২৯৬ মন। কামানটির পরিধি মধ্যস্থলে ৬'১০", সম্মুখভাগেও ৬'১০' এবং পশ্চাদ্ভাগে ৮'৩$\frac{১}{২}$"। বারুদ ভরবার মুখগহ্বরটির ব্যাস ১১$\frac{১}{২}$"। কামানটির পশ্চাৎ দিকের উপরিভাগে চৌকা আকৃতির একটি খাঁজের মধ্যে ১" ব্যাসযুক্ত একটি ছিদ্র পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় ভাষায় উক্ত ছিদ্রটিকে 'রঞ্জকঘর' বলে। কামান দাগার সময় ঐ ছিদ্রটিও বারুদে পূর্ণ করে তাতে অগ্নি সংযোগ করা হত। কামানটির মধ্যাংশের দুই পাশে ৪' ব্যাসযুক্ত ৬' দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট দুটি লৌহ শলাকা পরিলক্ষিত হয়। উক্ত লৌহ শলাকা বা লৌহদণ্ড দুটিতে বড় বড় চাকা লাগিয়ে হাতির সাহায্যে যুদ্ধস্থলের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হত ঐ বিশাল কামান। এছাড়া নিকটে বা দূরে গোলা নিক্ষেপের প্রয়োজনে কামানের মুখ উঠানো বা নামানোর জন্য ঐ লৌহ শলাকা দুটিকে অক্ষদণ্ডের (axis) মত ব্যবহার করা হত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি মুর্শিদাবাদের জাহানকোষা কামানটি দৈর্ঘ্যে এর থেকে বড় হলেও এত গুরুগম্ভীর নিনাদকারী রাশভারী প্রকৃতির নয়।

বলয় আকৃতির ৬৩টি পেটাই লৌহ ফলককে ঝালাই-পদ্ধতির সাহায্যে পরস্পর সংযুক্ত করে তৈরী করা হয়েছিল এই বিধ্বংসী কামান। ভালভাবে লক্ষ্য করলে দেখা

যায় লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত কামানটির নিম্নাংশ অমসৃণ—যেনবা দীর্ঘদিন মাটিতে প্রোথিত থাকার ফলে হাল্কা ধরনের মরচে ধরেছে নিম্নাংশে, কিন্তু উর্দ্ধাংশটি বেশ মসৃণ এবং তৈলাক্ত উজ্জ্বলতায় নয়নাভিরাম।

এই বেদীতে স্থাপনের পূর্বে কামানটি এই স্থানেই অর্ধপ্রোথিত অবস্থায় মাটিতে পড়েছিল দীর্ঘদিন। পরবর্তীকালে পরাধীন ভারতের অবিভক্ত বাংলার বৃটিশ শাসক এই কামানটিকে উত্তোলন করে বেদীর উপর স্থাপন করেন। বেদীটির উত্তর দিকের দেওয়ালে সন্নিবদ্ধ প্রস্তর ফলকে খোদিত লেখা থেকে বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়। ফলকটিতে লেখা আছে—THE DALMADAL GUN WAS ERECTED ON THIS SPOT BY THE GOVERNMENT OF BENGAL - 1919.

খুবই আশ্চর্যের কথা আমাদের বাল্য বয়সে আমরা ঐ কামানের 'রঞ্জকঘর' থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়তে লক্ষ্য করেছি বাঁকুড়ার লূ-প্রবাহিত গ্রীষ্মকালেও। জনশ্রুতি বলত, 'মদনমোহন-বিরহেই কাঁদছে এই কামান।' ইদানীং অবশ্য এটা আর লক্ষ্য করা যায় না।

উক্ত দলমাদল কামানটির নামকরণের ব্যাপারে নানা জনের নানা মত। এ বিষয়ে বিশিষ্ট প্রত্নতাত্ত্বিক মাণিকলাল সিংহ মহাশয় লিখেছেন, ''মল্লরাজাদের বিখ্যাত দলমাদল কামানটির নাম লইয়া ভিন্ন ভিন্ন মত রহিয়াছে। সাধারণ লোকেরা মনে করেন যে দল এবং মাদল দুইটি কামান। সংস্কৃতজ্ঞ শিক্ষিত মানুষের ধারণা দলমর্দন সংস্কৃত নামটি হইতে অপভ্রংশে দলমাদল হইয়াছে কিন্তু উপরোক্ত দুইটি ধারণাই ভুল। মল্লরাজারা যে অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন সেই মল্লভূম ধর্মঠাকুরের অঞ্চল; একটি ধর্মশিলার নাম দলমাদল। বিষ্ণুপুর শহরের শাঁখারীবাজার মহল্লার বুড়ো ধর্মঠাকুরের পূজারী বিরালই শ্রেণীভুক্ত কর্মকার পরিবারের পূর্বপুরুষ যে কর্মকার দলমাদল কামান নির্মাণ করেন, তিনি ধর্মঠাকুরের নামানুসারে কামানটির নাম রাখেন দলমাদল। এই প্রসঙ্গে রামাই পণ্ডিতের শূন্য পুরাণের নিম্ন উদ্ধৃতিটি দ্রষ্টব্য—'দলমাদল শিলা ছিল কমঠ আকার'— (পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, পৃষ্ঠাঃ—১৬৫)

কামানটির নামকরণের ব্যাপারে আর একটি অভিমতও শোনা যায়। 'দল' অর্থে শত্রুদল এবং 'মর্দন' অর্থে বিনাশ করা। এই কামানের সাহায্যে শত্রুসৈন্য বিনাশ করা হত এজন্য এটি 'দল-মর্দন', অপভ্রংশে দলমাদল নামে পরিচিত। কথিত আছে, আনুমানিক ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা সর্দার ভাস্কর রাও-এর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য মল্লরাজা গোপাল সিংহ এটি ব্যবহার করেন।

এই কামানটি আমাদের কাছে একটি বিস্ময়ের বিষয়, কারণ কামানটির নির্মাণকাল আনুমানিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে, অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর পূর্বে, যখন আকরিক লৌহ থেকে বিশুদ্ধ লৌহ তৈরীর পদ্ধতি এতো সহজসাধ্য ছিল না অথবা লৌহ গলানোর জন্য প্রয়োজনীয় সর্বনিম্ন ১৫৩৯ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড্ তাপমাত্রার যে ফার্নেসের প্রয়োজন তারও অভাব ছিল এবং কয়লাও ছিল অনাবিষ্কৃত। শুধুমাত্র কাঠ-কয়লার আগুনকে হাপরের সাহায্যে লৌহ গলানোর পক্ষে পর্যাপ্ত তাপমাত্রা সৃষ্টি করে লৌহ গলিয়ে এই সুবিশাল কামান তৈরী করা সত্যই আশ্চর্যের ব্যাপার। এছাড়া ৬৩টি লৌহ বলয়ের পরস্পর সংযোজন পদ্ধতিটিও নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ব্যাপার। কারণ ইলেক্ট্রিক ওয়েল্ডিং এবং হীট্ প্রেসার ওয়েল্ডিং এসবও তখন ছিল অনাবিষ্কৃত। বিষ্ণুপুরের

'কামানঢালা' স্থানটিতে আমরা যখন উপনীত হব তখন এসব কথায় ফিরে আসব আবার।

জনশ্রুতি বলে বর্গী আক্রমণের সময় বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করার জন্য নগর-দেবতা স্বয়ং ৺মদনমোহন জীউ স্বহস্তে দলমাদল কামান দেগেছিলেন। এজন্য আজও স্থানীয় জনসাধারণ ৺মদনমোহনের স্পর্শধন্য দলমাদল কামানটিকে শ্রদ্ধাভরে স্পর্শ করে প্রণাম করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কালের কাণ্ডারী' উপন্যাসে এই কামানটিকে 'পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহৎ কামান' বলে মন্তব্য করেছেন।' (শারদীয়া বর্তমান, ১৪০৮ পৃঃ—১৩৮)। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের বা ১৩৩১ বঙ্গাব্দের রাখী-পূর্ণিমার দিন কবি নজরুল এই কামানটির গায়ে ঠেস দিয়ে একটি ফটো তুলিয়েছিলেন। উক্ত চিত্রটি বিষ্ণুপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ভবনে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। মল্লরাজাদের আর সব কীর্তিকলাপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও এই কামানটি বিষ্ণুপুর তথা পৃথিবীর বুকে যতদিন থাকবে, ততদিন মল্লরাজাদের প্রভাব-প্রতিপত্তিসহ শৌর্য-বীর্যের জয়ধ্বনি ঘোষিত হবে মৌন-মুখর ভাষায়।

আপাততঃ কামানের কথায় ইতি টেনে আমরা একটু এগিয়ে গিয়ে উপনীত হই জগন্মাতা শ্রীশ্রীছিন্নমস্তা দেবীর শ্রীমন্দির ও শ্রীমূর্তির পদপ্রান্তে।

অধ্যায় - ৩

মা ছিন্নমস্তা

সাম্প্রতিক কালে গড়ে ওঠা আধুনিক ডিজাইনের ছাদ বিশিষ্ট এই মন্দিরটির গর্ভমন্দিরের মধ্যস্থলে পূর্ব দিকে মুখ করে দণ্ডায়মান অবস্থায় রয়েছেন মা ছিন্নমস্তার প্রমাণ সাইজের শ্রীমূর্তিটি। মাকে প্রদক্ষিণ করার সুবন্দোবস্ত রয়েছে মন্দির নির্মাণ পরিকল্পনায়।

বিষ্ণুপুরের 'হরিতপোবন আশ্রম'-এর আচার্য ৺সাগর স্বামী উদাসীন বিরচিত 'লীলাস্মৃতি' পুস্তিকাতে উল্লেখ আছে, "বিষ্ণুপুরে এই দেবীকে প্রথম স্থাপনা করা হয় বাংলা ১৩৪৯ সালে। অর্থাৎ এই সময়েই দেবীর আদি স্থাপনা।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে ঐ সময়ে দেবী অধিষ্ঠিতা ছিলেন পূর্বোক্ত 'হরিতপোবন আশ্রমে' যা তুড়কী আশ্রম নামেই সমধিক পরিচিত। পরবর্তীকালে উক্ত আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা এবং সিদ্ধ-সাধক শ্রীশ্রীমৌনীবাবার এক গৃহশিষ্য মেদিনীপুর নিবাসী ৺কৃষ্ণচন্দ্র গুঁই মহাশয় দলমাদল অঞ্চলে পূর্বোক্ত মাতৃমন্দির নির্মাণ করে দেবীকে প্রতিষ্ঠা করেন সাড়ম্বরে। বাংলা ১৩৮০ সালের ১৩ই শ্রাবণ শ্রীমন্দির ও শ্রীমূর্তির প্রতিষ্ঠা দিবস। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ফি-বছর ১৩ই শ্রাবণ ধুমধাম সহকারে মায়ের পূজা ও নর-নারায়ণ সেবা অনুষ্ঠিত হয়। প্রাত্যহিক নিত্যপূজা ছাড়াও দুর্গাপূজা, কালীপূজা অমাবস্যা তিথিতে মায়ের বিশেষ পূজাপাঠ হয়ে থাকে এবং প্রতি শনি, মঙ্গলবারে ভক্ত সমাগম হয় প্রচুর।

কথিত আছে মেদিনীপুরের প্রথিতযশাঃ ধনী ব্যবসায়ী ৺কৃষ্ণ চন্দ্র গুঁই মহাশয় দেবীর স্বপ্নাদেশেই উক্ত দেবীমন্দির ও দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। প্রসঙ্গক্রমে বলি যে ভারতবর্ষের মাত্র কয়েকটি স্থানেই 'ছিন্নমস্তা মূর্তি' পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে বিহারের 'রাজারাপ্পা'র মাতৃমূর্তি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

মহামূল্য শ্বেত-পাথরের এই শ্রীমূর্তিটি আনা হয়েছিল রাজস্থানের জয়পুর থেকে। এনেছিলেন ঁকৃষ্ণচন্দ্র গুঁই মহাশয় এবং সঙ্গে ছিলেন আচার্য ঁসাগর স্বামী উদাসীন। বিকশিত এক বিশাল শতদলের উপর রতি ও মদন রয়েছেন শায়িত। রতি ও মদন দেবের এই মিলন-মূর্তির উপর মা ছিন্নমস্তা রয়েছেন দণ্ডায়মান। মায়ের ছিন্নমূল গলদেশ থেকে ফিন্‌কি দিয়ে অবিরত ধারায় উদগত হচ্ছে রক্তধারা। মা স্বয়ং স্বীয় রক্তপানে ব্যস্ত। মায়ের বাম দিকে দণ্ডায়মানা লৌহবর্ণের ডাকিনী এবং দক্ষিণ দিকে দণ্ডায়মানা ধূসরবর্ণের যোগিনী বা বর্ণিনী—এরাও মাতৃ-অঙ্গ নিঃসৃত রক্তপানের নেশায় বিভোর।

মাতৃমন্দিরের সুপ্রশস্ত প্রবেশ দ্বারের উপরিভাগে দশমহাবিদ্যার মূর্তি বিরাজমান। এঁরা হলেন, **কালী**, **তারা**, **ষোড়শী**, **ভুবনেশ্বরী**, **ভৈরবী**, **ছিন্নমস্তা**, **ধূমাবতী**, **বগলা**, **মাতঙ্গী** ও **কমলা**। এই দশ দেবী হলেন মহাদেবীর মূর্তিভেদ মাত্র। এঁরা 'দশমহাবিদ্যা' বা 'সিদ্ধবিদ্যা' নামে খ্যাত। দশমহাবিদ্যার উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা কাহিনী প্রচলিত। তবে নিম্নলিখিত মতটিই সমধিক সমাদৃত।

"সতী দক্ষযজ্ঞে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে মহাদেব তাঁহাকে নিষেধ করেন, তাহাতে ভগবতী প্রথমে কালীমূর্ত্তি দেখাইয়া শিবের ভয়োৎপাদন করেন, তাহাতে ভোলানাথ ভীত হইয়া পলাইতে উদ্যত হন, কিন্তু মহামায়া দশ দিকে দশ মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার পথরোধ করেন। যে দশ মূর্ত্তিতে মহামায়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহাই দশমহাবিদ্যা।" [বাংলা বিশ্বকোষ—৮ম খণ্ড, পৃঃ— ৪০৫]

শাক্তগণের উপাস্য এই দশ ইষ্টদেবীমূর্তি সম্পর্কে 'চামুণ্ডাতন্ত্রে' উল্লেখ আছে—

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী ছিন্নমস্তা চ বিদ্যা ধূমাবতী তথা॥
বগলা সিদ্ধবিদ্যা চ মাতঙ্গী কমলাত্মিকা।
এতা দশমহাবিদ্যাঃ সিদ্ধবিদ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

তন্ত্রমতে উক্ত দশমহাবিদ্যা সম্পর্কে নিম্নলিখিত বর্ণনা শোনা যায়—"মহাদেবী শুক্লা হইলেও কলিতে কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া নীলরূপিণী হইয়াছিলেন, (ইনি) অবলীলাক্রমে বাক্‌শক্তি প্রদান করেন। এই জন্য **নীলসরস্বতী** নামে খ্যাতি লাভ করেন এবং ইনি সকল ভূতকে তারণ করেন, এই জন্য ইঁহার নাম **তারা** বা **তারিণী**। সকল ভুবনকে পালন করেন, এই জন্য **ভুবনেশ্বরী** নাম হইয়াছে এবং সৃষ্টি ও স্থিতিকারিণী বলিয়াও **ভুবনেশী** নামে বিখ্যাত। মহাদেবী শ্রীদান করেন বলিয়া **শ্রীবিদ্যা** এই আখ্যা প্রাপ্ত হন। মহাদেবী ত্রিগুণাতীত এইজন্য ইঁহার নাম **ষোড়শী**। এই দেবী সকল প্রকার দুঃখ নাশ করেন ও যমযন্ত্রণা বিদূরিত করেন এবং ভৈরবের ভার্য্যা, এইজন্য **ভৈরবী** নামে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই দেবী ত্রিশক্তিরূপিণী, ইঁহার মস্তক ছিন্ন, ইনি মোহিনী ও মোক্ষদায়িনী, এইজন্য ইঁহার নাম **ছিন্নমস্তা**। এই মহামায়া ধূম্রাসুর বিনাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার বর্ণ ধূম্র এবং ইনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রদান করেন, এইজন্য ইঁহার **ধূমাবতী** নাম হইয়াছে। **ব** কার শব্দে বারুণী দেবী, **গ** শব্দে সকল প্রকার সিদ্ধিদায়িকা, **ল** শব্দে পৃথিবী এবং স্বয়ং চৈতন্যরূপিণী, এইজন্য **বগলা** নাম হইয়াছে। মহাদেবী অত্যন্ত মদশীলা, তিনি মতঙ্গ অসুরকে বিনাশ করিয়াছেন এবং সকল আপদ্ হইতে উদ্ধার করেন, এই সকল কারণে তাঁহার নাম **মাতঙ্গী** হইয়াছে। মহাদেবী সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠে বাস করেন, এইজন্য ইঁহার নাম **কমলা** এবং পাতালে অবস্থিতি হেতু **লক্ষ্মী** নামেও বিখ্যাত। এই দশমহাবিদ্যা

সিদ্ধবিদ্যা বলিয়া প্রকীর্ত্তিত হন।" [বাংলা বিশ্বকোষ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ— ৪০৯]

"দশমহাবিদ্যা সম্পর্কে শাক্তগণ আরও বলিয়া থাকেন যে দশমহাবিদ্যাই দশাবতার রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। তোড়লতন্ত্রে ১০ম উল্লাসে এ বিষয়ে লেখা আছে—তারাদেবী মৎস্যাবতার, বগলা কূর্ম্ম, ধূমাবতী বরাহ, ছিন্নমস্তা নৃসিংহ, ভুবনেশ্বরী বামন, মাতঙ্গী রাম, ত্রিপুরাসুন্দরী জামদগ্ন্য, ভৈরবী বলভদ্র, মহালক্ষ্মী বুদ্ধ, দুর্গা কল্কি, ও কালী কৃষ্ণমূর্ত্তি পরিগ্রহ করেন।" [বাংলা বিশ্বকোষ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ— ৪১৮]

দশমহাবিদ্যা প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর ফিরে আসি আমাদের নয়নযুগলে উদ্ভাসিত মা ছিন্নমস্তার উৎপত্তি বিষয়ক পৌরাণিক তত্ত্বকথায়।

কথিত আছে, একদিন দেবী পার্বতী মন্দাকিনীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিল দুই সহচরী—ডাকিনী ও বর্ণিনী। স্নানান্তে সহচরী দ্বয় খুবই ক্ষুধা-পীড়িত হয় এবং মহাদেবীর নিকট বার বার খাদ্য প্রার্থনা করে। মহাদেবী তাদের একটু অপেক্ষা করতে বলেন। বলেন, বাড়িতে গিয়ে খেতে দেব। কিন্তু ডাকিনী ও বর্ণিনী মহাদেবীকে মাতৃ সম্বোধন করে সেই মুহূর্তেই অভীষ্ট খাদ্য দাবি করে। দেবী পার্বতী নিজ বিভূতি প্রদর্শনার্থে বাম নখাগ্র দ্বারা নিজ গলদেশ ছিন্ন করেন এবং নিজ ছিন্নমস্তক বাম হস্তে ধারণ করেন। স্বীয় কণ্ঠদেশ হতে নির্গত তিনটি রক্তধারার একটি নিজে পান করেন এবং অপর দুটি ডাকিনী ও বর্ণিনীকে পান করান। প্রচণ্ডচণ্ডিকা নামে খ্যাত এই দেবীর মস্তক ছিন্ন বলিয়া ইনি ছিন্নমস্তা নামেই সর্বজনবিদিত।

বিবিধ কুসুম ও পুষ্পমাল্য শোভিতা, আলুলায়িতকেশা এই দেবীর কেশপাশ ইতস্ততঃ পরিক্ষিপ্তা। দিগম্বরী এই দেবীর দক্ষিণ হস্তে খড়্গ, গলে মুণ্ডমালা এবং কটিদেশ কর্ত্তিত হস্তমালা বিভূষিতা। ষোড়শবর্ষী, পীনোন্নত পয়োধরা, সর্পযজ্ঞ বিভূষিতা ভয়ঙ্করী এই দেবী রতি ও কামের উপর প্রত্যালীঢ় পদে অর্থাৎ বামপদ প্রসারিত করে সংকুচিত দক্ষিণ পদের উপর দণ্ডায়মানা।

এই দেবীর "বাম ও দক্ষিণ পার্শ্বে ডাকিনী ও বর্ণিনী। ডাকিনী দেখিতে কল্পান্ত সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল বিদ্যুজ্জটা, ত্রিনয়না, বিকটদন্তা, মুক্তকেশী ও দিগম্বরী। বাম ও দক্ষিণহস্তে নরকপাল ও কর্ত্তরী, লক্‌লক্ জিহ্বা বিস্তার পূর্বক দেবীর কণ্ঠনির্গত রক্তধারা পান করিতেছে। দক্ষিণ পার্শ্বে বর্ণিনী—দেখিতে লোহিতবর্ণা, মুক্তকেশী, দিগম্বরী, বাম ও দক্ষিণ হস্তে কপাল ও কর্ত্তরী, গলে নাগযজ্ঞোপবীত ও মুণ্ডমালা। প্রত্যালীঢ়পদে অবস্থিত হইয়া দেবীর কণ্ঠনিঃসৃত রুধিরধারা পান করিতেছে। রতি ও কামকে বিপরীত রতিতে আসক্তরূপে ভাবনা করিতে হয়।" [বাংলা বিশ্বকোষ, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ— ৫৩৪]

মা ছিন্নমস্তার বর্ণনা করতে গিয়ে কবি ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন—

> দেখি ভয়ে বিশ্বনাথ হইলা কম্পিত।
> ছিন্নমস্তা হইয়া সতী অতি বিপরীত।।
> বিকসিত পুণ্ডরীক[১] কর্ণিকার[২] মাজে।
> তিন গুণে ত্রিকোণ মণ্ডল ভাল সাজে।।
> বিপরীত রতে রত রতি কামোপরি।

১। পদ্ম ২। পদ্মের বীজকোষ

কোকনদবরণা[১] দ্বিভুজা দিগম্বরী।।
নাগযজ্ঞোপবীত মুণ্ডাস্থিমালা গলে।
খড়্গে কাটি নিজ মুণ্ড ধরি করতলে।।
কণ্ঠ হতে রুধির[২] উঠিছে তিন ধার।
এক ধারা নিজ মুখে করেন আহার।।
দুই দিকে দুই সখী ডাকিনী বর্ণিনী।
দুই ধারা পিয়ে তারা শব আরোহিণী।।
চন্দ্র সূর্য্য অনল শোভিত ত্রিনয়ন।
অর্দ্ধচন্দ্র কপালফলকে সুশোভন।।

প্রচণ্ডচণ্ডিকা নামে খ্যাত হলেও এবং আপাতদৃষ্টিতে অতিভীষণা এই দেবী কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মমতাময়ী মাতৃমূর্তির মূর্ত প্রতীক। ছিন্নমস্তা উপাখ্যান থেকে এই সত্যটুকুই উদ্‌ঘাটিত হয় যে বাৎসল্য প্রেমের প্রাবল্যে জগজ্জননী দেবী ক্ষুধার্ত সন্তানের জন্য নিজ কণ্ঠ ছেদন করে রক্তপান করাতেও যেন দ্বিধাগ্রস্ত নন বিন্দুমাত্র। আশ্রিত ব্যক্তি, ভক্ত এবং সন্তানদের তাঁর অদেয় থাকে না কিছুই। দেবীর কৃপায় লোকে শিবত্ব লাভ করে। মূর্খ হয় বিদ্বান, ভাগ্যহীন হয় সৌভাগ্যবান, নির্ধন হয় ধনী, নিঃসন্তান ব্যক্তি সন্তান লাভ করেন।

এতাদৃশ করুণাঘন মায়ের কাছ থেকে বিদায় নেওয়ার বেদনা-বিধুর সময়ে মাতৃবন্দনা করি সশ্রদ্ধ চিত্তে, অবনত মস্তকে —

"নমঃ রাহুশ্চার্য্যকায় চন্দ্রাদিত্য বিমর্দ্দক।
শ্রীশ্রীছিন্নমস্তাকালীকেতংহি নৃসিংহাঞ্চো নমো নমঃ।।"

অধ্যায় - ৪

কালাচাঁদ পরিমণ্ডল

মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে লাল কাঁকুরে পথ মাড়িয়ে যেই না পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছি দক্ষিণ-পূর্বের দৃশ্যমান মন্দিরগুলির দিকে অমনি হৃদয়-বীণায় ঝংকৃত হয়—

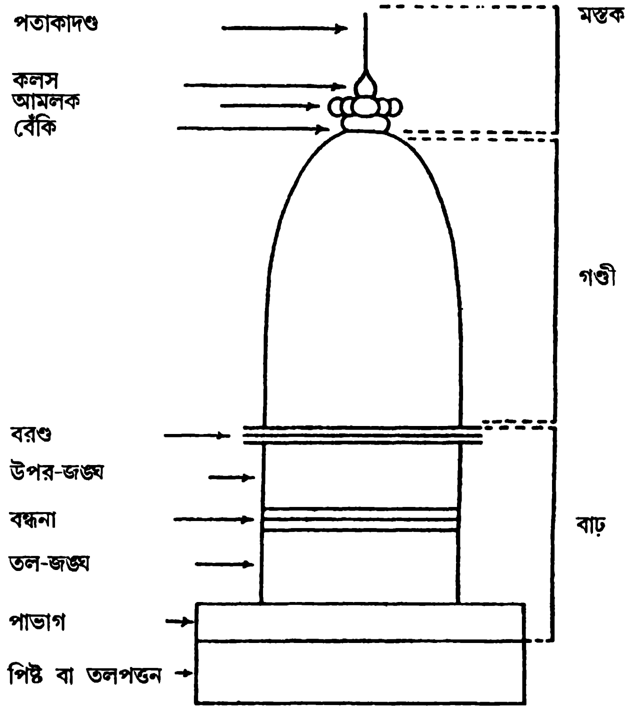
"গ্রাম ছাড়া ঐ রাঙামাটির পথ
আমার মন ভোলায় রে.........."

মাতৃমন্দিরের অনতিদূরে অবস্থিত ছোট বড় আকারের ঐ নিঃসঙ্গ এবং বিগ্রহ-পরিত্যক্ত মন্দিরগুলি যেন আমাদের ডাকছে হাতছানি দিয়ে। বাঁকুড়ার শুষ্ক, রুক্ষ, লাল কাঁকুরে মাটির উপর দৃষ্টিনন্দন মন্দিরগুলি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। বৃক্ষ-তরুলতাহীন ধূ ধূ উন্মুক্ত প্রান্তরের এই মন্দিরগুলি বিষ্ণুপুরের মহামান্য মল্লরাজাদের অমর কীর্তি-কলাপের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় বারংবার, স্মরণের মণিকোঠায় প্রতিধ্বনিত হয়,—'কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি'।

প্রসঙ্গতঃ বলি, মন্দির-স্থাপত্যের গবেষণাগার বিষ্ণুপুরের আর এক নাম 'মন্দির-নগরী'। মন্দিরের ছড়াছড়ি বিষ্ণুপুরে। শুধু বিষ্ণুপুর নয় মল্লভূমের সর্বত্র সরষে-দানার

১। কমলবর্ণা ২। রক্ত

মতো ছড়িয়ে রয়েছে ছোট বড় অসংখ্য দেব-মন্দির। মন্দিরময় মল্লভূমের মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে উড়িষ্যার দেউল বা রেখ-দেউল মন্দির স্থাপত্য রীতির পাশাপাশি বাংলা-মন্দির স্থাপত্য রীতির এক অপূর্ব মেলবন্ধন রচিত হয়েছে।



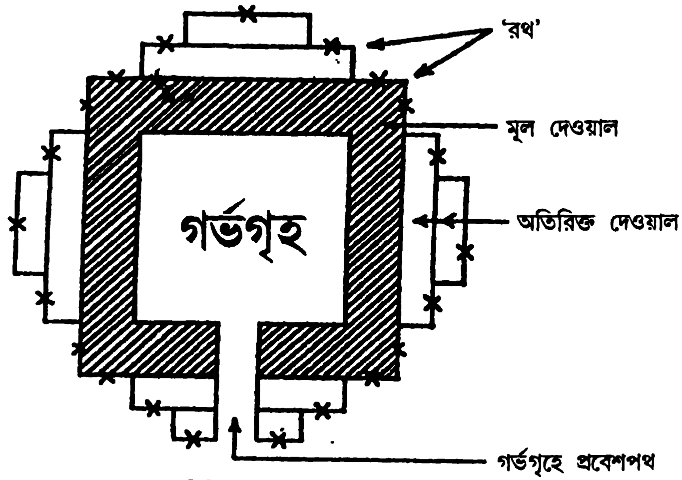
উড়িষ্যা-শৈলীর রেখ-দেউলের অঙ্গ-পরিচয়

দেউল বা রেখ-দেউল মন্দিরের বৈশিষ্ট্য হল এ ধরনের মন্দির-নির্মাণ প্রকল্পে দেবালয়টির প্রায় ৩/৪ অংশ একই সরল রেখায় অবস্থান করে। উর্ধ্বাংশের প্রায় ১/৪ অংশ ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে কেন্দ্রাভিমুখী হয়। শীর্ষস্থলের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে আমলক ও কলস সজ্জিত ধ্বজা।

'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থের গ্রন্থকার তথা গবেষক শ্রদ্ধেয় অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় উড়িষ্যার 'রেখ-দেউল' মন্দির নিয়ে সচিত্র এবং সারগর্ভ আলোচনা করেছেন তাঁর উক্ত পুস্তকের ৮৭ পৃষ্ঠা থেকে ৯০ পৃষ্ঠার মধ্যে। উক্ত অংশটি 'রেখ-দেউল' মন্দির নির্মাণ প্রকল্পের পরিকাঠামো সম্বন্ধে আপনাদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা দেবে, এই বিশ্বাসে আমি অমিয় বাবুর বক্তব্যটি সচিত্র তুলে ধরলাম আপনাদের সামনে। এখন শুনুন তিনি কি বলেছেন, দেখুন কি এঁকেছেন। (চিত্র-দ্বয় দ্রষ্টব্য।)

"রেখ-দেউল নামটির ব্যবহার প্রধানত উড়িষ্যায়। বাঁকুড়ার দেউল-জাতীয় মন্দিরগুলির উপরে যেহেতু উড়িষ্যার আঞ্চলিক মন্দির নির্মাণরীতির প্রভাব সবচেয়ে বেশী করে পড়েছে, সেজন্য উড়িষ্যায় অনুসৃত রেখ-দেউল স্থাপত্যের গঠন-প্রকরণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এখানে প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করি।

উড়িষ্যার মন্দিরগুলি সুউচ্চ রেখ-শিখর ও পীঢ়া-দেউল গঠনের জগমোহন এই দুই মুখ্য অংশে বিভক্ত। রেখ-শিখর নির্মাণের যে-পদ্ধতিটি উড়িষ্যায় অনুসৃত হয়েছে, উত্তর ভারতের রীতি থেকে তা কতকাংশে ভিন্ন। সঙ্গের রেখাচিত্রটি থেকে উড়িষ্যা-শৈলীর দৃষ্টান্তস্থল (typical) এক রেখ-দেউলের বিভিন্ন অংশের পারম্পর্যটি পরিস্ফুট হবে। প্রথাগত নির্মাণরীতি অনুসারে এ-জাতীয় মন্দিরকে, নীচ থেকে উপরে, তিনটি মূল



উড়িষ্যারীতির রেখ-দেউলের 'বাঢ়' এর প্রস্থচ্ছেদ

অংশে—বাঢ়, গণ্ডী ও মস্তক—ভাগ করা হয়ে থাকে। পিষ্ঠ বা তলপত্তন থাকে মাটির তলায় এবং আপাত-অদৃশ্য এ-অঙ্গটি মূল তিনটি অংশের শামিল নয়। বাঢ় অংশটি পা-ভাগ, জঙ্ঘ ও বরণ্ড এই তিনটি প্রধান অঙ্গের সমষ্টি যার জঙ্ঘ অংশটি তল-জঙ্ঘ, বন্ধনা ও উপর-জঙ্ঘ এই তিন উপ-বিভাগে বিভক্ত। মস্তক অংশের প্রত্যঙ্গগুলির নাম—নীচ থেকে উপরে—বেঁকি, আমলক, কলস ও পতাকাদণ্ড। উড়িষ্যার আঞ্চলিক শৈলীতে রেখ-দেউলের বাঢ় অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেখানকার পরবর্তীকালীন যাবতীয় মন্দিরে এই বাঢ় অংশটিকে পঞ্চ-অঙ্গের সমন্বয়ে গঠিত করাই সুদৃঢ় বিধি ছিল। পাভাগ, তল-জঙ্ঘ, বন্ধনা, উপরজঙ্ঘ ও বরণ্ডের সমবায়েই এই 'পঞ্চাঙ্গ বাঢ়' গঠিত হত।

উড়িষ্যার উত্তর-যুগের তাবৎ রেখ-দেউলের আর একটি অতি আবশ্যক অঙ্গের নাম 'রথ'। সঙ্গের রেখাচিত্রটি থেকে 'রথ' ও 'পগ' নামক উড়িষ্যা-শৈলীর অপরিহার্য্য অঙ্গগুলি পরিস্ফুট হবে। চতুষ্কোণ অথবা আয়তক্ষেত্রাকৃতি গর্ভগৃহের বাহিরের দেওয়াল-বরাবর সমতল বাঢ় ও গণ্ডী নির্মাণ না করে, মূল দেওয়ালের অতিরিক্ত উদ্গত অংশের (projections) ব্যবহারের জন্য উড়িষ্যার রেখ-দেউলগুলির বাঢ়ের প্রস্থচ্ছেদ (cross-section) সঙ্গের রেখাচিত্রের অনুরূপ যার '×'-চিহ্নিত অংশগুলি 'রথ' নামে অভিহিত। মন্দিরের প্রত্যেক দেওয়ালে এইভাবে পাঁচটি 'রথ' ('পঞ্চরথ') সন্নিবিষ্ট হওয়াই বিধি। দেবালয়টিকে যে-কোন দিক থেকে সামনাসামনি দেখলে প্রত্যেক দেওয়ালের বাঢ় ও গণ্ডী-বরাবর পাঁচটি খাড়া (vertical) উদ্গত অংশ (band) নজরে পড়বে। বাঢ় ও গণ্ডী-গাত্রে এই উদ্গত অংশগুলির নাম যথাক্রমে 'রথ' ও 'পগ' এবং মন্দির দেওয়ালে

আগাগোড়া প্রলম্বিত এই উদ্গত অংশগুলিকে বলা হয় 'রথ-পগ'। কেন্দ্রীয় 'রথ-পগ'টি দেবালয়ের মূল প্রাচীর থেকে সর্বোন্নত; তার দু'পাশের দু'টি নিম্নতর সমতলে ও প্রান্তীয় 'রথ-পগ' দুটি আরও নিম্ন সমতলে বিন্যস্ত হয়ে থাকে। বিভিন্ন উচ্চতার 'রথ-পগে'র সাহায্যে মন্দিরের বহির্গাত্রে আলোছায়ার বিন্যাসে যে দীর্ঘ প্রলম্ব (vertical) রেখাগুলির সৃষ্টি হয় স্থাপত্যরুচির দিক থেকে তা বিশেষ প্রয়োজনীয় এবং সেজন্যই এ-জাতীয় মন্দিরের নাম রেখ-দেউল। বাস্তুবিদ্যার (engineering) দিক থেকেও, অতিরিক্ত উদ্গত অংশগুলির সাহায্যে গর্ভগৃহের মূল দেওয়ালগুলির গায়ে পার্শ্বচাপ সৃষ্টি করে সেগুলির দৃঢ়তা সম্পাদনের প্রয়োজন আছে। বাড়-এর 'পঞ্চরথ পঞ্চাঙ্গ' বিন্যাস উড়িষ্যার উত্তর-যুগীয় আঞ্চলিক মন্দির-স্থাপত্যের অভ্রান্ত নির্ণায়ক। উড়িষ্যার উল্লেখযোগ্য যাবতীয় অ-প্রাচীন দেবসৌধেই এই বিশিষ্ট নির্মাণরীতিটি প্রযুক্ত হয়েছে। শিখর-শীর্ষের চারদিকে চারটি লম্ফমান সিংহমূর্তির ব্যবহারও উড়িষ্যা-শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। উড়িষ্যার দেবালয়স্থাপত্যরীতির সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ ও পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির। মূল মন্দিরের সম্মুখে জগমোহনের উর্ধ্বাংশ ক্রম-হ্রস্বায়মান স্তর-সহযোগে পীঢ়া-দেউল পদ্ধতিতে নির্মাণ করাও উড়িষ্যারীতির আর এক বিশেষত্ব।...

বাঁকুড়া জেলার রেখ-দেউলের দৃষ্টান্তস্বরূপ বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির, ডিহরের ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর মন্দির, ধরাপাটের 'নেংটা ঠাকুরের মন্দির' ও সোনাতোপলের বিগ্রহহীন জীর্ণ মন্দিরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হাড়মাসড়া ও ঘুটগেড়িয়ার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেবালয় দু'টিও রেখ-দেউলের পর্যায়ে পড়ে।" এছাড়া মল্লভূম তথা বাঁকুড়া জেলাতে রয়েছে আরো অনেক রেখ-দেউল বা দেউল-মন্দির।

বাংলা দেশের নিজস্ব মন্দির-স্থাপত্য-শৈলীটি কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। **চালা-মন্দির, রত্ন-মন্দির, দালান-মন্দির**—এই তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত বাংলা মন্দিরের আদি সংস্করণটি হল চালা-মন্দির। বর্গাকার বা আয়তাকার মাটির দেওয়ালের উপর বাঁশ খড় কাঠ দিয়ে দুদিকে দুটি চালা আচ্ছাদন করে বাঙালীর চিরাচরিত বাসগৃহ তৈরী করার পরিকল্পনা থেকেই প্রথমদিকে বাঁশ, খড়, মাটি দিয়ে কাঁচা **দোচালা মন্দির** এবং পরবর্তীকালে পাকা দোচালা মন্দির নির্মিত হয় বাংলাদেশে। আবার দুটি দোচালার পাশাপাশি অবস্থানের উপর চূড়া নির্মাণ করে **'জোড়বাংলা'** আদলের মন্দিরও নির্মিত হয়েছে।

সাধারণতঃ বর্গাকার এবং ক্ষেত্রবিশেষে আয়তাকার ঘরের দেওয়ালের উপর চার দিকে চারটি চালা নামিয়ে চৌচাল কুঁড়ে ঘরের অনুকরণে মন্দির তৈরী করার চিন্তাধারা থেকেই **চারচালা মন্দিরের** জন্ম।

আটচালা মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে দ্বিস্তর ভিত্তি দেওয়ালের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে বাইরের দেওয়াল চারটি হয় বড়, কিন্তু উচ্চতায় কম। পক্ষান্তরে ভিতরের চারটি দেওয়াল হয় ছোট কিন্তু উচ্চতায় অনেক বেশী। অভ্যন্তরভাগের অপেক্ষাকৃত ছোট চারটি দেওয়াল থেকে বাইরের চার দেওয়ালের উপর ভর রেখে চতুর্দিকে নেমে আসে ঢালু চারটি চালা। প্রথম চারটি চালার কিছুটা উচ্চতায় অভ্যন্তরভাগের দেওয়ালের উপর তৈরী করা হয় অপর চারটি চালা। এইভাবে গ্রাম বাংলার আটচালা ঘরের আদলেই নির্মিত হয় (দ্বিস্তর বিশিষ্ট) আটচালা মন্দির।

বারোচালা মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয় ত্রিস্তর ভিত্তি দেওয়ালের। অতঃপর অনুরূপ পদ্ধতিতে ৪+৪+৪ অর্থাৎ মোট বারোটি চালার সমন্বয়ে নির্মিত হয় (ত্রিস্তর বিশিষ্ট) বারোচালা মন্দির।

রত্ন-মন্দির বলতে বোঝায় চূড়া বা শিখর সংস্থাপিত মন্দির। বর্গাকার এই মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে চারদিকে বাঁকানো কার্নিসসহ ঈষৎ ঢালু ছাদের কেন্দ্রস্থলে একটি শিখর রচনা করে একরত্ন মন্দির তৈরী করা হয়। আবার ঢালু ছাদের চার কোণে চারটি শিখর বিন্যাস করে মধ্যস্থলে নির্মিত হয় অপেক্ষাকৃত উঁচু শিখরটি। তখন এটি পাঁচচূড়া বা পঞ্চরত্ন মন্দির নামে অভিহিত হয়। অনুরূপভাবে প্রথম ছাদের চার কোণাতে চারটি চূড়া স্থাপন করে, দ্বিতীয় তলে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির বর্গাকার দেওয়াল তুলে ছাদ নির্মাণ পূর্বক ঐ ছাদের চার কোণে আবার চারটি চূড়া সংস্থাপন করে চূড়াগুলির মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত উচ্চ বেদীতে রচিত হয় কেন্দ্রীয় চূড়াটি। সেক্ষেত্রে এটি হয় নবরত্ন মন্দির। রত্নমন্দিরের শিখরগুলি আসলে দেউল মন্দিরের ক্ষুদ্র সংস্করণ। পাঁচ চূড়া এবং এক চূড়া মন্দির স্থাপত্যে দ্বিস্তর ভিত্তি দেওয়ালের প্রয়োজন হয়, পক্ষান্তরে ন'চূড়া বা নবরত্ন মন্দির স্থাপত্যে প্রয়োজন হয় ত্রিস্তর ভিত্তি দেওয়াল।

বাংলা মন্দির স্থাপত্যের তৃতীয় পদ্ধতিটি হল **দালান-মন্দির**। চারপাশের দেওয়ালের উপর সমতল ছাদ নির্মাণ করে নির্মিত হয় *দালান-মন্দির।*

এছাড়া আর এক ধরনের মন্দির রয়েছে এখানে। এগুলি হল **রাস-মন্দির**। এগুলি প্রধানতঃ অষ্টকোণ বিশিষ্ট হয়ে থাকে। বহু প্রবেশপথ বিশিষ্ট রাসমন্দিরগুলির ছাদের প্রান্তভাগে থাকে অনেকগুলি এবং মধ্যস্থলে অপেক্ষাকৃত উচ্চ বেদীতে একটি 'কামরাঙা' বা 'আকন্দ' ফুলের আদলের চূড়া বা শিখর। বহু শিখর সমন্বিত দ্বিতল এবং ত্রিতল রাস মন্দিরও রয়েছে মল্লরাজ্যে। **'পিরামিড' আকৃতির মন্দির হিসেবে বিষ্ণুপুরের 'রাসমঞ্চ'টি বাংলা তথা ভারতের মন্দির-স্থাপত্যে একটি অভিনব সংযোজন।**

এসব মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে উপাদান হিসেবে বাঁকুড়ার সহজলভ্য ল্যাটেরাইট্ স্টোন্ বা মাকড়া পাথরের পাশাপাশি তেঁতুল কাঠে পোড়ানো পাতলা ইটের ব্যবহারের বহুল প্রচলন ছিল। গাঁথনির জন্য ব্যবহার করা হত ঘুসিম[১] পোড়ানো চুন ও সুরকি। দীর্ঘায়ু বিশিষ্ট উৎকৃষ্টমানের মশলা তৈরীর জন্য চুন-সুরকির সাথে চিটে গুড়, তেঁতুল বিচির আঠা, পাকা কলা, বিউলি কলাই বাটা, মেথির জল প্রভৃতি নির্দিষ্ট মাত্রায় সংমিশ্রণ করা হত। চুনের বা পঙ্খের পলেস্তারার ক্ষেত্রে নয়নাভিরাম মসৃণতা এবং দুগ্ধ-ফেনিল শুভ্রতার জন্য বাটা চুনের প্রয়োগ ছিল প্রথাসিদ্ধ।

সূত্রধর, পাল, মিস্ত্রী প্রভৃতি উপাধিধারী হিন্দু স্থপতিগণ মল্লভূমের মন্দির রূপায়ণের ক্ষেত্রে মুসলিম স্থাপত্যবিদ্যার দ্বারাও প্রভাবিত হন। ফলে হিন্দু স্থাপত্যকলার সাথে মুসলিম স্থাপত্যশৈলীর আংশিক সংমিশ্রণ ঘটে।

"মুসলমান স্থপতিদের অবদান যে কেবল মূল মন্দিরের ছাদ নির্মাণ-কৌশলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এমন মনে করা ভুল হবে। প্রায় সর্বত্রই ঢাকা বারান্দাগুলির ছাদও, বিরল ক্ষেত্রে হলেও, গর্ভগৃহের ছাদও যে 'ভল্ট্'-এর উপর স্থাপিত হয়েছে, তাও মুসলিম-রীতি দ্বারা প্রভাবিত। প্রবেশ-খিলানগুলির চোখা কৌণিক গড়ন ও ফুলকাটা স্তরবিন্যাস এবং আটকোণা থামগুলির গঠন প্রকরণেও মুসলমানী প্রভাব পড়েছে ব'লে কেউ কেউ মনে করেন।"[২] টেরাকোটা অলংকরণের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ রেখা বিন্যাসের ফুলকারী নক্সা সজ্জাও মুসলিম প্রভাব প্রসূত।

মল্লভূমের মন্দির সম্বন্ধে তত্ত্বগত এবং তথ্যগত এই স্বল্প অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে আমরা এবার দেখব মন্দির-নগরীর মন্দিরগুলি। কথা বলতে বলতে আমরা এসে গেছি

১। এক ধরনের চুনাপাথর, ২। বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, পৃঃ—১৭

কালাচাঁদ শ্রীবিগ্রহের নামে নামাঙ্কিত কালাচাঁদ পরিমণ্ডলে। এখানে ছোট বড় আকৃতির সব মিলিয়ে আটটি মন্দির রয়েছে। ছিন্নমস্তা মন্দির থেকে কালাচাঁদ জীউ-এর মন্দির যাবার রাস্তার দক্ষিণ দিকে একই অঙ্গনে রয়েছে তিন তিনটি শ্রীমন্দির। মন্দিরত্রয় একত্রে 'জোড়-মন্দির' নামে সুবিদিত। এই মন্দিরত্রয় মল্লরাজা গোপাল সিংহ (১ম) অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ তৈরী করান। মন্দির তিনটিতে কি কি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত ছিল তা সঠিকভাবে অনুধাবন করা আজ আর সম্ভব নয়। তবে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল মল্লরাজাদের প্রতিষ্ঠিত প্রায় সমস্ত মন্দিরই দক্ষিণ ও পূর্ব মুখী অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব-মুখী। কিন্তু জোড়-মন্দির শ্রেণীভুক্ত উত্তর-পশ্চিম কোণের শ্রীমন্দিরটি উত্তর-পূর্ব-মুখী। এই মন্দিরটির অভ্যন্তরভাগের কুলঙ্গিতে নারায়ণের খোদাই মূর্তি বিদ্যমান এবং দক্ষিণদিকের বৃহদাকার শ্রীমন্দিরটির কুলঙ্গিতেও একটি খোদাই মূর্তি রয়েছে।

এই মন্দির তিনটি দর্শনের পর আমরা দর্শন করব শ্রীশ্রীনন্দলালজীউ-এর শ্রীমন্দির। রাস্তার বাঁ দিকে অবস্থিত প্রতিষ্ঠাফলক বিহীন নন্দলাল জীউ-এর মন্দিরটি স্থাপত্যশৈলীর নিরিখে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে হয়। শ্রীশ্রীনন্দলালজীউ-এর মন্দির দর্শনের পর রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউ-এর মন্দির প্রাঙ্গণে আমরা উপনীত হব। মন্দিরে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় মন্দিরটি মহারাজ কৃষ্ণসিংহ ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী করান। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে রয়েছে বাঁকুড়ার মাকড়া পাথরের ভিত্তিভূমির উপর ইষ্টক নির্মিত একরত্ন বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতির একটি রথ-মন্দির। রাধাগোবিন্দজীউ মন্দিরের উত্তর পূর্ব কোণে 'চৌবাচ্চা' নামে একটি পুষ্করিণী বিদ্যমান। উক্ত পুষ্করিণী থেকে দেব-বিগ্রহগুলির পূজা-অর্চনার জন্য জল সংগ্রহ করা হত।

রাধাগোবিন্দজীউ-এর মন্দির থেকে কালাচাঁদ জীউ-এর মন্দির প্রাঙ্গণে ঢোকার মুখে বাঁ দিকে অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধামাধব জীউ-এর মন্দিরটি নজর কাড়ে আমাদের। মন্দির-গাত্রে নিবদ্ধ উৎসর্গলিপি হতে জানা যায় যে মল্লরাজা বীরসিংহের পত্নী রাণী শিরোমণি দেবী ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই শ্রীমন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। মন্দিরটির দক্ষিণে নাটমন্দিরের ভগ্নাংশ, পশ্চিমে প্রবেশতোরণ, পূর্বে ভোগ রান্নার ঘরের ভগ্নাংশ এবং অগ্নিকোণে তুলসীমঞ্চ দৃশ্যমান রয়েছে আজও।

শ্রীশ্রীরাধামাধবজীউ-এর মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে রয়েছে 'Archaeological Survey of India'-র অফিস। বাহারি ফুল ও ফলগাছ শোভিত, লতাগুল্ম আচ্ছাদিত, শান্ত-সমাহিত মনোরম পরিবেশের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের এই অফিসটির কাছেপিঠে রয়েছে অফিসের কর্মচারীদের জন্য কতিপয় কোয়ার্টারস্।

'আর্কিয়লজিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া'-র কাজ হল ভারতের ঐতিহাসিক পুরাবস্তুগুলির সংরক্ষণ ও সংস্কার সাধন এবং এগুলির প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ। ভারত সরকারের এই বিভাগীয় দপ্তরটি মন্দির-নগরী বিষ্ণুপুরের নিম্নলিখিত একুশটি পুরাবস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নিয়েছেন সময়ে সময়ে এবং সেগুলিকে সযত্নে সংরক্ষণ করে আসছেন বছরের পর বছর ধরে। উক্ত অফিস কর্তৃক সংরক্ষিত পুরাবস্তুগুলি হল—

(১) কালাচাঁদ মন্দির (২) রাধামাধব মন্দির (৩) রাধাগোবিন্দ মন্দির (৪) নন্দলাল মন্দির (৫,৬,৭) জোড়-মন্দির শ্রেণীভুক্ত তিনটি মন্দির (৮) দলমাদল কামান (৯) রাসমঞ্চ (১০) শ্যামরায় মন্দির (১১) জোড়বাংলা মন্দির (১২) রাধেশ্যাম মন্দির (১৩) লালজীউ মন্দির (১৪) পাথর দরজা (ছোট ও বড়) (১৫) পাথরের রথ

(১৬) পাটপুর মন্দির (নতুন মহলের পূর্ব দিকে অবস্থিত) (১৭) রাধাবিনোদ মন্দির (খড়বাংলা) (১৮) মদনমোহন মন্দির (১৯) মুরলীমোহন মন্দির (২০) মল্লেশ্বর (শিব) মন্দির (২১) মদনগোপাল মন্দির।

খোদ বিষ্ণুপুরের উপরোক্ত একুশটি পুরাবস্তু ছাড়াও বিষ্ণুপুর মহকুমা এবং বাঁকুড়া জেলার আরো পাঁচটি উল্লেখযোগ্য মন্দির প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রযত্নে রয়েছে। যেমন—

(১) ষাঁড়েশ্বর মন্দির (ডিহর) (২) শৈলেশ্বর মন্দির (ডিহর) (৩) শ্যামসুন্দর মন্দির (মদনপুর-পলাশডাঙা) (৪) সিদ্ধেশ্বর (শিব) মন্দির (বহুলাড়া) (৫) গোকুলচাঁদ মন্দির (গোকুলনগর)।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ উক্ত মন্দির এবং পুরাবস্তুগুলির সংরক্ষণ এবং সংস্কার সাধনই নয়, পুরাবস্তুগুলির প্রেক্ষাপটকে আরও চিত্তাকর্ষক এবং দৃষ্টিসুখকর করার অভিমানসে পাকাপোক্ত ফেন্সিং দিয়ে মন্দিরচত্বরে ঘাসের গালিচা রচনা করে বাঁকুড়ার খরাপ্রবণ রুক্ষ্ম-শুষ্ক মাটিতেও ফুল ফুটিয়েছেন হরেক রকমের। নানান প্রজাতির মরশুমী ফুলের বর্ণোজ্জ্বল বর্ণচ্ছটার পটভূমিকায় পুরাবস্তুগুলি হয়ে উঠেছে আরো আরো দৃষ্টিনন্দন। আবার সবকটি পুরাবস্তুর প্রাঙ্গণে না হলেও অনেকগুলিতেই ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে হ্যালোজেনের চোখ ধাঁধানো আলো। হ্যালোজেনের আলো, ফুলের হাসি, মন্দিরের ভাবতন্ময় পরিবেশ এবং স্থাপত্যশিল্পের ঐতিহাসিক মাধুর্য মিলেমিশে পুরাবস্তুগুলিকে করেছে অতীব চিত্তাকর্ষক।

রাজন্যপ্রথা বিলুপ্ত হবার পর এবং 'আর্কিয়লজিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া' কর্তৃক অধিগ্রহণের পূর্বে এইসব পুরাবস্তু ও মন্দিরগুলির অবস্থা হয়েছিল জরাজীর্ণ এবং ধ্বংসোন্মুখ। যেমন রাসমঞ্চের উপর বজ্রপাত হয়ে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল রাসমঞ্চটি। মন্দিরে মন্দিরে গজিয়ে উঠেছিল বিশাল বিশাল গাছ। গাছের বলিষ্ঠ শিকড়-বাকড় দিনে দিনে পুষ্ট হতে হতে মন্দির-গাত্রে এবং মন্দির-শিখরে ফাটল ধরিয়ে ধ্বসিয়ে দিচ্ছিল এইসব অমূল্য সম্পদকে। মন্দিরের পাথর ও ইষ্টকাদি অপহৃত হত ব্যক্তিস্বার্থে। মন্দিরগাত্রে প্রোথিত বিশেষ বিশেষ স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন সমূহের প্যানেলগুলিও অপহৃত এবং স্থানান্তরিত হতে থাকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। জনমানবহীন এবং বিগ্রহহীন কতিপয় দেব-মন্দির দিবাভাগে প্রেমিক-প্রেমিকার এবং রাত্রি নিশীথে দুর্বৃত্তের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয় দিনে দিনে, বছরে বছরে।

সুখের ও আনন্দের বিষয় ভারত সরকারের সুদৃষ্টি পড়েছে এই পুরাবস্তুগুলির উপর। রক্ষা পেয়েছে মল্লভূমের ৩৬০টি মন্দিরের মধ্যে অল্প কয়েকটি। নতুবা বিষ্ণুপুরের অন্যান্য শত শত মন্দিরের মতই এগুলিও অকালে পরিণত হত ধ্বংসস্তূপে। ভারত সরকারকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ 'আর্কিয়লজিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া'র কর্মকর্তাদের।

'আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া'র অফিস কম্পাউণ্ডের মধ্যে অফিসের ঠিক পূর্ব দিকে রয়েছে শ্রীশ্রীকালাচাঁদজীউ-এর শ্রীমন্দির। ইংরাজী ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মল্লরাজা রঘুনাথ সিংহ এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। মাকড়া পাথরে তৈরী একরত্ন মন্দিরগুলির মধ্যে এটিই প্রাচীনতম। অন্যান্য মন্দিরের তুলনায় এই মন্দিরটিতে কারুকার্য উল্লেখযোগ্যভাবে কম। মন্দিরের মূল অংশের উচ্চতার তুলনায় শিখরের উচ্চতা আনুপাতিক হারে বেশী—এজন্য কিছুটা বেমানান মনে হয়। মন্দিরটির গঠন-শৈলীর সাদামাটা ঢং, কাঁচা হাতের খোদাই কাজ এবং আঙ্গিক ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি সত্ত্বেও এই মন্দির চত্বরের চতুর্দিকে বর্গাকৃতি প্রাচীরের সুপ্রশস্ত ভগ্ন ভিত্তিভূমি, ভগ্ন প্রাচীরের অভ্যন্তরভাগের নাটমন্দিরের ভগ্নভিত্তি

এবং অগ্নিকোণে অবস্থিত তুলসীমঞ্চ ইত্যাদি মন্দির বিন্যাসের পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনারই সূচক।

কালাচাঁদ পরিমণ্ডলের ছোট বড় আটটি মন্দিরের উপর সামগ্রিক এবং সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, পূর্বোক্ত আটটি মন্দিরের মধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতির ইষ্টক নির্মিত রথ-মন্দিরটি বাদ দিয়ে অবশিষ্ট সাতটি মন্দিরই গঠনশৈলীর আকৃতি-প্রকৃতির দিক থেকে প্রায় অনুরূপ। প্রতিটি মন্দিরই আগাগোড়া বাঁকুড়ার মাকড়া পাথরে তৈরী। প্রতিটি মন্দিরই একরত্ন বিশিষ্ট মন্দির। প্রতিটি মন্দিরেই পাথরের উপর খোদাই-এর কাজ উল্লেখযোগ্য। প্রতিটি মন্দিরের খিলান-নির্মিত কারুকার্য-শোভিত প্রবেশ-দ্বারগুলি লক্ষণীয়। লতাপাতা, বিকশিত পদ্ম, নর্তকী, বাদ্যকর, যোদ্ধা, রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা এবং পুরাণের কাহিনীর উল্লেখযোগ্য অংশ নিখুঁত খোদাই শিল্পের স্থাপত্যগুণে তৎকালীন শিল্প-ভাবনার উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। সবকটি মন্দিরই বর্গাকার ভিত্তিভূমির উপর গড়ে উঠেছে এবং চারকোণে ঢালু ছাদ দ্বারা আচ্ছাদিত। ছাদের কার্নিসের গঠন-প্রণালী বিশেষভাবে উল্লেখ্য। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই কেন্দ্রস্থ শিখরটি একটি অষ্টকোণ বেদীর উপর নির্মিত। চতুষ্কোণ আকৃতির মন্দির শিখরগুলিতে খিলান নির্মিত চারটি করে উন্মুক্ত দ্বার পরিলক্ষিত হয়। শিখরের ছাদের অংশটি পিরামিডের আকৃতিতে ধাপে ধাপে ক্রমশঃ সংকীর্ণ হতে হতে ছোট বড় আকৃতির আমলক এবং তদুপরে আকন্দ ফুল ও পদ্ম-কুঁড়ির অনুরূপে নির্মিত গঠনশৈলী দ্বারা সুশোভিত। শিখরের শীর্ষদেশে সুদর্শন চক্রের আদলে নির্মিত কারুকার্য শোভিত লৌহচক্র সহ তীক্ষ্ণাগ্র লোহার রড, ক্ষেত্রবিশেষে শুধুমাত্র তীক্ষ্ণাগ্র লোহার রড প্রোথিত অবস্থায় দৃষ্টিগোচর হয়।

কালাচাঁদ পরিমণ্ডলের বিগ্রহহীন এই মন্দিরগুলি দেখে পর্যটকদের প্রশ্ন—'মন্দিরে বিগ্রহ নেই কেন?'

উত্তরে বলি, রাজন্যপ্রথা বিলুপ্ত হওয়ার পর রাজাদের অবস্থা হয়ে ওঠে শোচনীয় এবং দেবোত্তর সম্পত্তি আইনতঃ নিষিদ্ধ হওয়ার পর দেব-বিগ্রহগুলির পূজা-অর্চনা ও উৎসবাদির জন্য নিত্যনৈমিত্তিক এবং বাৎসরিক খরচাদির যে সুবন্দোবস্ত ছিল তা বন্ধ হয় চিরতরে। বড় আদরের দেব-বিগ্রহগুলি একান্ত অনাদরে পড়ে থাকে মন্দিরে মন্দিরে। রাজার ঠাকুরের রাজকীয় মর্যাদায় পূজা-অর্চনা বন্ধ হয়ে যায় অর্থাভাবে। শুধুমাত্র নিত্যপূজাটা হত কোন রকমে। কিন্তু দেখা দিল আর এক সমস্যা। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে মহামূল্য বিগ্রহগুলি চুরি হতে থাকে একের পর এক। এমতাবস্থায় নিরাপত্তার কারণে বিগ্রহগুলি স্থানান্তরিত হয় রাজ-দরবারে এবং পরে বিষ্ণুপুর শহরের বিশেষ বিশেষ পল্লীতে—যেমন, কৃষ্ণগঞ্জ, মাধবগঞ্জ।

প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যশিল্পের উৎকর্ষের নিদর্শন স্বরূপ ভারত সরকার এই মন্দিরগুলিকে অধিগ্রহণ করলেও বিগ্রহগুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা-পূজার দায়-দায়িত্ব নেওয়ার ক্ষেত্রে পরাঙ্মুখ।

দেবতার জন্য মন্দির। মন্দিরের জন্য দেবতা নয়। দেহের সাথে আত্মার যে সম্পর্ক, মন্দিরের সাথে দেবতারও ঠিক সেই সম্পর্ক। মন্দিরের প্রাণ, প্রাণবায়ু এবং প্রাণপ্রদীপ হল বিগ্রহ। বিগ্রহহীন মৃতপ্রায় এই মন্দিরগর্ভগুলি থেকে তাই যেন বারে বারে ধ্বনিত হয় আর্ত মর্মরধ্বনি,—

'শূন্য এ বুকে পাখী মোর আয়,
ফিরে আয় ফিরে আয়।'

অধ্যায় - ৫

বিষ্ণুপুর প্রসঙ্গে সুসাহিত্যিক ও সুবক্তা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

কালাচাঁদ মহল্লার 'জোড়-মন্দির' এবং মন্দিরগুচ্ছ দর্শনের পর আমরা লালবাঈ-এর স্মৃতি-বিজড়িত লালবাঁধের দক্ষিণপাড় বরাবর পায়ে হাঁটা পথ ধরে এগিয়ে যাব লালবাঁধ ও তৎসংলগ্ন 'লালগড়' পরিদর্শনের উদ্দেশ্যে। পথের ক্লান্তি অপনোদনার্থে এখন আমরা বিষ্ণুপুর প্রসঙ্গে সুসাহিত্যিক এবং সুবক্তা সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য শুনব।

বিষ্ণুপুর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবা সংঘের ব্যবস্থাপনায় স্বামী বিবেকানন্দের ১৩৯তম জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে স্থানীয় কে.জি. ইন্‌জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউটের বিরামভবনে গত ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। 'উদ্বোধন' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক **শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ মহারাজ** ও **সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়** মহাশয় উক্ত সভা অলঙ্কৃত করেন। ভাষণ দেন। বিষ্ণুপুরে অবস্থান করেন। বিষ্ণুপুর দেখেন। **সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় লেখেন 'কালের কাণ্ডারী' উপন্যাস। কালের কাণ্ডারীতে সঞ্জীববাবু বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার কিয়দংশ শোনাই এক্ষণে।**

"এদিকে অনেক ইতিহাস আছে। বাঁকুড়া তো যে-সে জায়গা নয়। আকৃতি অনেকটা ত্রিভুজের মতো। পুরুলিয়া, বর্ধমান, হুগলী আর মেদিনীপুরের মাঝখানে আটকে আছে। এবড়ো-খেবড়ো। মল্লভূম। রাজা ছাড়া রাজ্য হয় না। ইতিহাসের শুরুতেই যাঁর নাম পাওয়া যাচ্ছে তিনি হলেন মহারাজা সিংহ বর্মণ, পুশকর্ণের মহান অধিপতি। শুশুনিয়া পাহাড়ের এক পাশে পাথরের গায়ে বিরাট এক জ্বলন্ত চাকার তলায় নিজের কালকে, নিজের রাজত্বের কাহিনীকে কালজয়ী করে রেখে গেছেন। তারপর বহু রাজত্বের উত্থান-পতনের পথে সভ্যতা দানা বেঁধেছে। ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে। প্রাচুর্য আর রিক্ততা যেন সাদা আর কালো দুটো ঘোড়া। বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে বিশাল একটি বৃক্ষ তার ডালপালা বিস্তার করে জেলাটিকে স্নিগ্ধ ছায়ার বেদীতে বসিয়েছে। মানুষকে স্বপ্ন দেখিয়েছে। কোঁচড়ে সম্পদ ভরে দিয়েছে, আবার হঠাৎ পাতা ঝরার দিনে রুক্ষ প্রান্তরের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

দলমাদল আজও উঁচিয়ে আছে পুরনো সেই দিনের কথা বলার জন্যে। রাজা গোপাল সিংহ। সেই রাজপুত ব্রাহ্মণের রাজত্ব সীমা কী ভাবে মাপা যাবে? খুব সহজ। ষোল দিনের ভ্রমণসীমা। সেই রাজত্বের বাৎসরিক রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৩০ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। কোন শত্রুর ক্ষমতা ছিল না সেই রাজ্যসীমার মধ্যে নির্বিবাদে ঢোকার। সুজাখাঁ একবার চেষ্টা করেছিলেন। দলবল নিয়ে হানা দিয়েছিলেন। রাজ্যসীমার কাছাকাছি আসামাত্র জলাধার খুলে দেওয়া হল। প্রচণ্ড জলস্রোতে ভেসে গেল বাহিনী।

কী অপূর্ব ব্যবস্থা ছিল রাজা গোপাল সিংহের। আক্রমণকারী, লুঠেরা, হানাদার নয়, বণিক তুমি এসো। তুমি বছরে আমাকে বিশ লাখ তঙ্কা দাও আমি তোমাকে এখুনি অবাধ বাণিজ্যের অধিকার ছেড়ে দিচ্ছি। এখানে তোমার সম্পদ, তোমার স্বাধীনতায় কেউ ভুলেও হাত দেবে না। তুমি বণিক, তুমি পর্যটক, তুমি যেই হও, আমার রাজ্যে প্রবেশ মাত্রই তোমার রক্ষণাবেক্ষণের, তোমার স্বাচ্ছন্দ্যের সমস্ত দায়িত্ব আমাদের। এখান থেকে কারো কখনো কোনও জিনিস চুরি হয়নি। এ রাজ্যে চোর নেই, ডাকাত নেই, তবু রাজ্যে প্রবেশের

সঙ্গে সঙ্গে নিখরচায় তোমাকে প্রহরী দেওয়া হবে। সেই প্রহরী তোমার সমগ্র ভ্রমণপথে রিলে রেসের মতো তোমাকে তার প্রহরা সীমার শেষে অন্য প্রহরীর হাতে তুলে দিয়ে তার আচরণের সার্টিফিকেট নিয়ে মুখ্য প্রহরীর কাছে ফিরে এসে রেহাই পাবে। মুখ্য প্রহরী আবার রাজার কাছে তুমি কেমন রইলে নিয়মিত সেই খবর পাঠাতে থাকবেন। এমনি করে নির্ভাবনায় পরম নিশ্চিন্তে তুমি এই জেলায়, আমার এই রাজত্বসীমায় ঘুরে বেড়াবে। স্থান থেকে স্থানান্তরে যদি এইভাবে তুমি ভ্রমণ করতে থাক দিনের পর দিন, তোমার থাকার সম্পদ বহন করার জন্য নিখরচায় একজন বাহকও পাবে। যদি তুমি কোনও সম্পদ যেমন টাকার থলি অসাবধানে হারিয়ে ফেলো, তাহলেও চিন্তার কোনো কারণ নেই। যিনিই থলি কুড়িয়ে পান না কেন সবচেয়ে কাছের কোন গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে তিনি নিকটবর্তী চৌকিতে গিয়ে সেই খবর দেবেন। চৌকিরক্ষক সঙ্গে সঙ্গে ঢেঁড়া পিটিয়ে সমস্ত জেলাবাসীকে এই খবর জানিয়ে দেবেন।

এ কী গল্প কথা! রূপকথার রাজ্য! না, না। একদা এমনই ছিল—বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া। পৃথিবীর আশ্চর্য। বিদেশী পর্যটকরা বিভিন্ন সময়ে এসেছেন। সকলেই বিস্ময় নিয়ে ফিরে গিয়ে লিখেছেন তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা। মার্কোপোলো লিখলেন, 'দেখে এলাম সেই দেশ। অধিবাসীদের অধিকাংশই বণিক। সকলেই বিশ্বাসী ও রাজভক্ত। এঁরা কখনো কোন কারণে মিথ্যা কথা বলেন না। জগতে এঁদের মতো সাধু আর দ্বিতীয় কোনো জাতি নেই। এঁরা মাংস খান না। মদ্যপান করেন না। পরস্ত্রীর প্রতি অনুরাগী হন না। এঁদের জীবন সর্বতোভাবে পবিত্র।'

ফরাসী রেনল লিখলেন, 'যে সব সাম্রাজ্য পৃথিবীর পীড়ক, অত্যাচারী রাজাদের দ্বারা স্থাপিত হয়েছে, তাদের সঙ্গে এই বিষ্ণুপুরের কত তফাৎ! এই রাজ্যের ভিত্তি হল সুশৃঙ্খলা আর স্বাভাবিক ধর্মনীতি, যা চিরকাল অক্ষয়। অত্যাচারীদের রাজ্য বুদবুদের মতো। ফোটে আর ফাটে। কিন্তু এইরকম রাজ্যের ধ্বংস নেই।'

এ যে কত প্রাচীন অঞ্চল! মহাভারতের কালে চলে যাই। ফরিদপুর, নদীয়া, যশোহর, খুলনা, বরিশাল, চব্বিশ পরগণা যখন সমুদ্রগর্ভে, এ মল্লভূমি বা মল্লবনি সেই সমুদ্রের উপান্তে মাথা জাগিয়ে ছিল। একদা সমুদ্র ঢেউ ভাঙত এই দেশের তটভূমিতে। প্রাচীন মন্দিরের 'গাত্রে, পাথরে, ইটে বহু রণতরীর ছবি উৎকীর্ণ। সমুদ্রের স্মৃতি।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে সম্রাট অশোক কলিঙ্গ জয় করলেন। অনেকে বলেন, মল্লভূমির একাংশ তখন কলিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে মালব দেশের রাজা চন্দ্রবর্মা মল্লভূমি আক্রমণ করেছিলেন। শুশুনিয়া লিপির পাঠোদ্ধারে এ তথ্য জানা গেছে।

সপ্তম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক রাঢ় দেশ অধিকার করলেন। তখন এই মল্লভূমি ছিল রাঢ়ের এলাকা। এর পরই এসে গেল আদিমল্লের কাল। রামরাজ্যের বাস্তব রূপায়ণ।"[১]

১। শারদীয়া বর্তমান, ১৪০৮, পৃঃ— ১৩৪-১৩৬ (কালের কাণ্ডারী—সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়)।

অধ্যায় - ৬

রাজকাহিনী—১

আদি মল্ল বা রঘুনাথ মল্ল (৬৯৪—৭১০ খৃঃ)[১]

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগের কথা। রাজস্থানের জয়পুর, মতান্তরে বৃন্দাবনের জয়নগর থেকে আগত কতিপয় তীর্থযাত্রী চলেছেন শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দর্শনে। যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন রাজবংশীয় এক পুরুষ ও নারী। আসন্নপ্রসবা রাজবংশীয় রমণী পথিমধ্যে প্রসব করেন এক পুত্র-সন্তান এবং সন্তান প্রসবান্তে মারা যান মুহূর্তে। এমতাবস্থায় 'কিংকর্তব্যবিমূঢ়' স্বামী তাঁর মৃতা স্ত্রী এবং সদ্যোজাত শিশুসন্তানকে পরিত্যাগ করে চলে যান শ্রীক্ষেত্র অভিমুখে। যাবার আগে শিশুটিকে শুইয়ে দেন একটি গাছের নীচে। রেখে যান একটি পরিচয় পত্র এবং **'জয়শঙ্কর'** নামক রাজ-তরবারি। এসব ঘটনা ঘটেছিল জ্যৈষ্ঠমাসের প্রায়ান্ধকার এক গোধূলিলগ্নে। বৃক্ষ-সংলগ্ন মৌচাক থেকে টুপ্ টুপ্ করে ঝরে পড়া মধু পান করে বেঁচে থাকে অসহায় শিশুটি। প্রত্যুষে জঙ্গলে কাঠ কুড়োতে গিয়ে এক বিধবা বাগ্দী রমণী কুড়িয়ে নিয়ে আসে পূর্বোক্ত পরিচয়-পত্র এবং 'জয়শঙ্কর' নামক মন্ত্রপুত তরবারি সহ শিশুটিকে। দুঃখিনী বিধবা মহিলা ভগবৎকৃপাধন্য শিশুটির নাম রাখে **রঘুনাথ** এবং স্বীয় সন্তানজ্ঞানে লালন পালন করতে থাকে বুক ভরা অপত্যস্নেহে। বয়স বাড়তে বাড়তে সাতে পা দেয় রঘুনাথ। আনন্দের জোয়ার আসে বিধবার হৃদয়ে। কিন্তু অভাবের সংসার। নুন আনতে পান্তা ফুরায়। অভাবের তাড়নায় গ্রামের নিষ্ঠাবান **ব্রাহ্মণ পঞ্চানন ঘোষাল** (মতান্তরে **মনোহর পঞ্চানন**)-এর বাড়িতে 'পেটে-ভাতে' রেখে দেয় ছেলেকে। পঞ্চানন ঘোষাল ছিলেন শক্তি-উপাসক, তান্ত্রিক সাধক। 'সাধক-ঠাকুর' নামেই তাঁর খ্যাতি ও পরিচিতি। অন্যান্য গৃহকর্ম ছাড়াও স্বীয় গো-ধন লালন পালন এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজে রঘুনাথকে নিয়োগ করেন তিনি।

> " মাঠে মাঠে বনে বনে চরাইত ধেনু
> সকল রাখাল মিলি বাজাইত বেণু।
> লাফালাফি দাপাদাপি কুস্তি লাঠি খেলা
> বিবিধ খেলায় সবে কাটাইত বেলা।
> অপরাহ্নে ধেনু লয়ে পুলকিত মনে
> ফিরিয়া আসিত সবে যে যার ভবনে।
> এইরূপে প্রতিদিন করি গোচারণ
> খেলায় ধুলায় কাটে রঘুর জীবন।" (জাগ্রত দেবী দণ্ডেশ্বরী, পৃঃ- ৫)

এসব ঘটনা ঘটেছিল বিষ্ণুপুর সন্নিকটস্থ কোতুলপুরের নয় কিলোমিটার দূরে উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত জঙ্গলাকীর্ণ গ্রাম লাউগ্রামে। লাউগ্রাম আজও স্বমহিমায় বিদ্যমান।

একদিনের কথা, গরু চরাতে গিয়ে গরু হারিয়ে ফেলেছে রঘুনাথ। অনেক খোঁজাখুঁজি করে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে প্রহারের ভয়ে বাড়ি ফেরেনি সে। রঘুনাথের খোঁজ করতে গিয়ে সাধক পঞ্চানন দেখেন এক অদ্ভুত দৃশ্য।

> "ইতস্ততঃ চাহি দ্বিজ যাইতে যাইতে
> বৃক্ষতলে দৃষ্টি তার পড়ে আচম্বিতে।

১। রাজাদের নামের পাশে উল্লিখিত সময় সর্বক্ষেত্রেই রাজত্বকালের সূচক।

দেখে তথা রঘুনাথ রয়েছে শায়িত
দুটি ফণী দুই পাশে থাকি অবস্থিত।
বিস্তারিয়া ফণাদ্বয় মাথার উপর
রোধ করি রাখিয়াছে খর সৌরকর।" (জাগ্রতাদেবী দণ্ডেশ্বরী, পৃঃ-৬)

ব্রাহ্মণকে আসতে দেখে সরে যায় নাগ-নাগিনী। ঘরে ফিরে আসে রঘুনাথ। বেড়ে যায় তার সমাদর। এদিকে রঘুনাথকে নিয়ে অজানা আশঙ্কায় ভরে যায় ব্রাহ্মণের মন। ঘুম আসে না চোখে। আসে এক বিস্ময়কর দৈবাদেশ—

" সেই রাত্রে স্বপ্নে দ্বিজে প্রত্যাদেশ হয়
ভাবিস কি বালকের শুভ ভাগ্যোদয়।
সৌভাগ্য সূচনা তাহা, দেখেছ যা তুমি
রাখালে করিয়া রাজা ব্যক্ত হব আমি।
শিক্ষা দীক্ষা দিয়া তারে করহ মানুষ
আমার আদেশ ইহা থাকে যেন হুঁশ।
আর এক শুন তুমি নির্দেশ আমার
এ অঞ্চলে মম পূজা করিও প্রচার।
পঞ্চ মুণ্ড' পরে করি আমার স্থাপনা
সেই বনে গিয়া নিত্য কর আরাধনা।
সাধনায় সিদ্ধি হবে লভিবে মঙ্গল
এত কহি দেবীমূর্ত্তি অন্তর্ধান হ'ল।" (জাগ্রতদেবী দণ্ডেশ্বরী, পৃঃ—৭)

স্বপ্নাদেশ শুনে ব্রাহ্মণের ঘুম ভেঙে যায় চকিতে। দেবীর প্রত্যাদেশ মতো দেবী প্রতিষ্ঠা করে ভক্তিভরে নিয়মিত পূজা-অর্চনা করেন জঙ্গলে গিয়ে। এই ঘটনার অব্যবহিত পরেই ঘটে আর এক ঘটনা। শেষ রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে মুষলধারে। সঙ্গীসাথীদের নিয়ে লাউগ্রামের পৈরাগের মোহনায় মাছ ধরতে গেছে রঘুনাথ। সঙ্গীসাথীরা মাছ ধরেছে প্রচুর। আর রঘুনাথ!

" প্রথমে ফেলিয়া জাল তুলিল যখন
মৎস্য নাই স্বর্ণইট পাইল তখন।
পুনরায় জাল ফেলি তুলিয়া দেখিলা
মাছের বদলে এক শালগ্রাম শিলা।
বিরক্ত হইয়া রঘু গৃহে আসি ফিরে
জলে পাওয়া দ্রব্যগুলি দেখাল প্রভুরে।
নেহারি সাধক তাহা আশ্চর্য্য হইল
ভালভাবে বালকের সর্বাঙ্গ দেখিল।
রাজচিহ্ন দেখি তাহে আহ্লাদিত হয়ে
রঘুরে জড়ায়ে ধরে দুই বাহু দিয়ে।" (জাগ্রতাদেবী দণ্ডেশ্বরী, পৃঃ—৯)

রঘুনাথের রাজ্যলাভের নিশ্চিত সম্ভাবনায় দিন গুণতে থাকেন ঘোষাল মশায়। এমন সময় ঘটে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা। লাউগ্রামের ২৪ কিলোমিটার পশ্চিমে বিষ্ণুপুর সন্নিকটস্থ জয়পুরের মাত্র ১ কিলোমিটার উত্তরে রয়েছে প্রদ্যুম্নপুর (পদুমপুর) গ্রাম। সে সময় প্রদ্যুম্নপুরের প্রবল প্রতাপান্বিত রাজা ছিলেন নৃসিংহদেব। রাজা নৃসিংহদেবের

আমন্ত্রণে শ্রাদ্ধবাসরে মতান্তরে ব্রাহ্মণ-ভোজন উপলক্ষ্যে ভোজ খেতে গেছেন পঞ্চানন ঘোষাল—সঙ্গে রঘুনাথ। ব্রাহ্মণেরা বসেন প্রাসাদে আর রঘুনাথকে বসানো হয় প্রাসাদ সংলগ্ন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। হঠাৎ শুরু হয় ঝড় বৃষ্টি। এমন সময় দৃষ্টিনন্দন এই বালকটির জন্য মমতা হয় রাজা নৃসিংহদেবের। ছুটে এসে ছাতা ধরেন বালকের মাথায়। 'রাজা **যার মাথায় ছাতা ধরেন তাকেও রাজা হতে হয়।'—তৎকালীন নিয়মানুসারে রঘুনাথের রাজছত্র পাওয়ার সম্ভাবনাটি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাৎক্ষণিকভাবে।** এই ঘটনার পরদিন থেকেই ব্রাহ্মণ রঘুনাথের গোচারণের কাজ বন্ধ করে দিয়ে তাকে শাস্ত্র-শিক্ষা দিতে শুরু করেন।

"নীতিশিক্ষা করে রঘু সাধক সকাশে
তীর লাঠি চালা শিখে বাগ্দী পরিবেশে।
অল্পদিনে রঘুনাথ সর্বশ্রেষ্ঠ হল
শৌর্য বীর্য গুণে দলে সরদারী লভিল।
সেই হতে সকলেই করিয়া সম্মান
সরদারমল্ল বলি করিত আহ্বান।
যথাকাল সমাগত দেখিয়া ব্রাহ্মণ
বাগ্দীদের সহ যুক্তি করিয়া তখন।
শুভদিন শুভক্ষণ করি নিরূপণ
করিলা রঘুর অভিষেক আয়োজন।" (জাগ্রতাদেবী দণ্ডেশ্বরী, পৃঃ—৯)

জঙ্গল-মধ্যে অবস্থিত ব্রাহ্মণের উপাস্য দেবী দণ্ডেশ্বরীর সমীপে বিস্তীর্ণ এক ডাঙ্গায় মণ্ডপ নির্মাণ করে রাজ্যাভিষেক হয় রঘুনাথের। প্রদ্যুম্নপুরের রাজা রাজটিকা পরিয়ে দেন ললাটে এবং সেই সাথে উপহার দেন ছয়খানি গ্রাম। **যে স্থানটিতে রঘুনাথের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল লাউগ্রামের সেই বিশেষ স্থানটি অদ্যাবধি 'রাজডাঙা' নামেই** সুবিদিত। গ্রামের বাইরে এক সুরক্ষিত স্থানে রাজা রঘুনাথের জন্য নির্মিত হয় এক পুরী।

"পুরী দেখে খুশী হয়ে সাধক ঠাকুর
রাখিল তাহার নাম রঘুনাথপুর।
এইরূপে দেবতার আদেশ ফলিল
লাউগ্রামে রঘুনাথ রাজত্ব পাতিল।" (জাগ্রতাদেবী দণ্ডেশ্বরী, পৃঃ—৯)

প্রচুর বাগ্দী সৈন্য নিয়ে প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করছিলেন রঘুনাথ। রাজরক্ত বইছে তাঁর শিরা উপশিরা আর ধমনীতে। যুদ্ধবিদ্যা এবং যুদ্ধ যুদ্ধ নেশা রয়েছে তাঁর রক্তে। অতএব 'যুদ্ধং দেহি' ভাব সদাই জাগরুক হৃদয়ে।

সুযোগ বুঝি অপেক্ষা করছিল ওৎপেতে। বিষ্ণুপুর মহকুমার ইন্দাস থানার অন্তর্গত দ্বারকেশ্বর নদের উত্তরে রয়েছে যোতবিহার গ্রাম। তৎকালে **যোতবিহার ছিল প্রদ্যুম্নপুরের শাসনাধীন।** যোতবিহারের সামন্ত নৃপতি **প্রতাপনারায়ণ** এই সময় প্রদ্যুম্নপুরের রাজা নৃসিংহদেবের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেন বিদ্রোহ। **নৃসিংহদেব কিছুতেই তাঁকে দমন করতে না পেরে খুবই অসহায় বোধ করেন। এই সময় বিদ্রোহ দমনের জন্য ডাক পড়ে রঘুনাথের। রঘুনাথ অতি সহজেই বিদ্রোহী প্রতাপনারায়ণকে পরাভূত করে নিয়ে আসেন প্রদ্যুম্নপুরের রাজদরবারে। প্রাণদণ্ড হয় বিশ্বাসঘাতক প্রতাপনারায়ণের আর বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ যোতবিহার রাজ্যলাভ হয় রঘুনাথের।** পঞ্চানন ঘোষালের আশা-কুসুমটি শতদলে

বিকশিত হয় যথাসময়ে এবং ঝটিকাহত হয় পরক্ষণেই। **'চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়'**— কবিকণ্ঠ-উৎসারিত বাণীই সত্য হয় কালক্রমে। কারণ বিদ্রোহ দমন হয়েছে, রাজ্য হয়েছে নিষ্কণ্টক, এই ভেবে সেনাপতিকে সর্বাধিনায়ক পদে ভূষিত করে রাজা নৃসিংহদেব সপরিবারে বেরিয়ে পড়েন তীর্থভ্রমণে। সুযোগ বুঝে দুরভিসন্ধিপূর্ণ সেনাপতি রাজা হবার স্বপ্নে বিভোর। তাঁর এই সুখ-স্বপ্নে বাধা দিতে গিয়ে রাজ্যচ্যুত হয়ে কারাগারে বন্দী হন রঘুনাথ। এদিকে স্বীয় কন্যার অসুস্থতার কারণে নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই তীর্থ-পর্যটনে বিরত হয়ে ফিরে আসেন রাজা। স্তম্ভিত হন সমস্ত ঘটনা শুনে। মুক্তি দেন রঘুনাথকে। ফিরিয়ে দেন তাঁর রাজত্ব। রঘুনাথ অবশ্য সেই দয়ার দানকে প্রত্যাখান করে চলে যান অন্যত্র। তখন রাজা নৃসিংহদেব এসব অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য দায়ী সেনাপতিকে ভর্ৎসনা করেন যারপরনাই। দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন চতুর সেনাপতি রঘুনাথের অনুপস্থিতিতে দুর্বল এবং মর্মাহত রাজাকে উন্মাদ আখ্যা দিয়ে বন্দী করে নিক্ষেপ করেন কারাগারে।

এই দুঃসংবাদে আহত হন রঘুনাথ। সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতার যথোচিত শাস্তি দেবার সংকল্প জেগে ওঠে তাঁর মনে। কিন্তু তিনি নিরুপায়, অসহায়। কি করা যায়, কিভাবে কার্য উদ্ধার করা যায় এই চিন্তায় তাঁর মন ক্ষতবিক্ষত। ঠিক এরকম এক দ্বান্দ্বিক মুহূর্তে প্রবল পরাক্রান্ত এক সাঁওতাল সর্দারের সেনাবাহিনী নিয়ে আক্রমণ করেন প্রদ্যুম্নপুর দুর্গ। নিহত হন বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি। **এদিকে পাগলা অপবাদে কলঙ্কিত বন্দী রাজা দীর্ঘদিন কারাগারে বন্দী থাকার ফলে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে সত্য সত্যই হয়ে যান পাগল এবং অকস্মাৎ একদিন কারাগার সংলগ্ন কানাইসায়রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেন। শোকের কালো ছায়া গ্রাস করে প্রদ্যুম্নপুরকে।**

উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলার্থে বিচক্ষণ মহারাণী তাঁর একমাত্র অনূঢ়া কন্যা চন্দ্রকুমারীকে রঘুনাথের হাতে অর্পণ এবং রঘুনাথকেই প্রদ্যুম্নপুরের শূন্য সিংহাসনে বসানোর নির্দেশ দিয়ে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় সহমৃতা হন স্বেচ্ছায়।

৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ। বাংলা ১০১ সাল। ইন্দ্রদ্বাদশী তিথি। এই শুভ তিথিযোগে সাঁওতাল বন্ধুদের সাথে নিয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করে রাজ্যাভিষিক্ত হন রঘুনাথ। প্রদ্যুম্নপুরের রাজসিংহাসনে শোভা পাচ্ছেন রঘুনাথ। খুশীতে ডগ্‌মগ্ করছেন পঞ্চানন ঘোষাল। বাল্যবয়সের খেলার সাথীদের কাছে প্রাপ্ত **'সর্দারমল্ল'** নামটি স্মরণ রেখে আশীর্বাদ করতে গিয়ে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে **'মল্ল'** উপাধিতে ভূষিত করেন রঘুনাথকে। পদবীহীন রাজা রঘুনাথ হয়ে গেলেন রাজা **রঘুনাথ মল্ল**। তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন পঞ্চানন ঘোষাল রঘুনাথের রাজ্যাভিষেকের কালটিকে স্মরণীয় এবং বরণীয় করে রাখার মহৎ উদ্দেশ্যে সূচনা করলেন এক নতুন অব্দের। **রাজা রঘুনাথের পদবীগত নামানুসারে নতুন অব্দের নাম হল 'মল্লাব্দ'। ইংরাজী ৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে, বাংলা ১০১ সালে জন্ম নিল মল্লাব্দ এক।** পৃথিবীর বুকে আগামী দিনগুলিতে রঘুনাথ মল্লের বংশধররূপে যেসব মল্লবংশীয় রাজা রাজত্ব করবেন **তাঁদেরই প্রথম পুরুষ অর্থাৎ আদি পুরুষ হিসেবে তিনি 'আদি মল্ল' নামে চিহ্নিত হলেন। পঞ্চানন ঘোষালের পরামর্শ মতোই রঘুনাথ মল্ল ওরফে আদি মল্ল শাসিত রাজ্যটির নতুন করে নাম রাখা হল 'মল্লভুম'।**

মল্লভূম ও মল্লভূমের আদি রাজার কথা শোনালাম। এবার আমরা মনে মনে পাড়ি দেবো মল্লভূমের আদি রাজধানী প্রদ্যুম্নপুরের উদ্দেশ্যে।

অধ্যায় - ৭

রাজকাহিনী—২

প্রদ্যুম্নপুর—মল্লভূমের আদি রাজধানী

এই সেই প্রদ্যুম্নপুর। নানান সুখ-দুঃখের স্মৃতি বিজড়িত মল্লভূমের আদি রাজধানী প্রদ্যুম্নপুর। বিষ্ণুপুর কোতুলপুর বাসরুটের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত জয়পুর গ্রামের দেড় দু'কিলোমিটার উত্তরে রয়েছে প্রদ্যুম্নপুর গ্রাম। প্রদ্যুম্নপুর অপভ্রংশে হয়েছে পদুমপুর। বর্তমানের প্রদ্যুম্নপুর গ্রামটি অবশ্য প্রকৃত প্রদ্যুম্নপুর নয়। প্রদ্যুম্নপুর সংলগ্ন দক্ষিণ দিকের 'গড়' নামে পরিচিত স্থানটিই ঐতিহাসিক যুগের প্রদ্যুম্নপুর। 'গড়' শব্দটির অভিধান গত অর্থ হল পরিখা, পরিখায় ঘেরা দুর্গ, কেল্লা ইত্যাদি। সুতরাং শব্দগত অর্থের ভিত্তিতে স্পষ্টই বোঝা যায় 'গড়' নামে চিহ্নিত ঐ বিশেষ স্থানটিই ছিল মল্লভূমের রাজদুর্গ। ঐতিহাসিক অন্বেষাও উক্ত সত্যকেই প্রতিভাত করে। বার কয়েক প্রদ্যুম্নপুরে ঘোরাঘুরি করে যা যা দেখেছিলাম এবং শুনেছিলাম তার ভিত্তিতেই বলি বিষ্ণুপুরের আদি রাজধানী প্রদ্যুম্নপুরের ইতিকথা।

ঐতিহাসিক যুগের নৃপতিগণ তাঁদের রাজ্যকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে কয়েক প্রকারের দুর্গ নির্মাণ করতেন।

দুর্গ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল যেখানে দুঃখে বা কষ্টে গমন করা যায়। দুর্গের নির্মাণ পদ্ধতি এবং গুণগত বৈশিষ্ট্য অনুসারে আচার্য মনু ছয় প্রকার দুর্গের উল্লেখ করেছেন। যেমন (১) ধন্ব বা মরুবেষ্টিত দুর্গ, (২) মহীদুর্গ অর্থাৎ ইঁট ও পাথরের প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ, (৩) জলদুর্গ অর্থাৎ জল দ্বারা পূর্ণ পরিখা বেষ্টিত দুর্গ, (৪) বার্ক্ষদুর্গ মানে বৃক্ষ পরিবেষ্টিত দুর্গ, (৫) নৃ-দুর্গ অর্থাৎ চর্তুদিকে সৈন্য বেষ্টিত দুর্গ, এবং (৬) গিরিদুর্গ, মানে পাহাড়-পর্বত পরিবেষ্টিত দুর্গ।

প্রদ্যুম্নপুরের গড়টি মূলতঃ সুরক্ষিত ছিল জলদুর্গের দ্বারা যদিও এর পশ্চিম দিকে ছিল বার্ক্ষ বা বৃক্ষদুর্গ। পশ্চিমের ছোটনাগপুর থেকে শুরু করে মালভূমি অঞ্চলের বিস্তার ঘটেছে পূর্বে বাঁকুড়া জেলার জয়পুর অবধি। জয়পুর থেকেই সমভূমির সূচনা। মালভূমি অঞ্চলে কিংবা অল্পবিস্তর মালভূমির ক্ষেত্রে স্বল্প ব্যয়ে জলদুর্গ নির্মাণ করাই অধিক সহজসাধ্য। এসব কথা চিন্তা ভাবনা করেই প্রদ্যুম্নপুরের নৃপতিগণ তাঁদের দুর্গটিকে ঘিরে রেখেছিলেন জলে ভরা পরিখা দিয়ে।

ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা এবং সন্ধানী দৃষ্টির প্রেক্ষাপটে আজও যে সত্যটি উদ্ভাসিত হয় তা হল প্রদ্যুম্নপুরের গড়-ধরমপুর অঞ্চলটির (প্রদ্যুম্নপুরের রাজবাড়ি সহ দুর্গ) পূর্ব দিকে ছিল তিনটি, দক্ষিণে যমুনা খাল সহ তিনটি, উত্তরে তিনটি এবং পশ্চিমে ছিল দুটি পরিখা। পূর্ব এবং দক্ষিণের সমতল ভূমির দিক থেকেই শত্রু আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল সর্বাধিক। উত্তর দিকে দ্বারকেশ্বর নদী এবং পশ্চিমে গভীর অরণ্য থাকাতে প্রাকৃতিক ভাবেই রচিত হয়েছিল জলদুর্গ এবং বৃক্ষদুর্গ। **(প্রদ্যুম্নপুরের মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।**

উক্ত পরিখা-বেষ্টিত দুর্গের অভ্যন্তরভাগে সুরক্ষিত ছিল রাজবাড়ি, কোষাগার, শস্যাগার, কারাগার, সৈন্যাগার, অস্ত্রাগার, অশ্বশালা, হস্তীশালা ইত্যাদি, ইত্যাদি। সুরক্ষিত

রাজবাটীর উত্তরে ছিল এবং রয়েছে **কানাইসায়র**, "নির্জন পরিবেশে—অবস্থিত এই সায়রের গভীর জলরাশিকে ঘিরে নানা কিংবদন্তীও প্রচলিত। বিশেষতঃ এর জলের ভেতর থেকে মোহর পাওয়ার জনশ্রুতি আছে।" জনশ্রুতি আছে, মন্দির-গর্ভে রয়েছে লুক্কায়িত এক মন্দির। আরো উল্লেখ্য এই কানাইসায়রের কাকস্বচ্ছ জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন বিকারগ্রস্ত রাজা **নৃসিংহদেব**। কানাইসায়র আজও আছে। আছে বেদনা-বিধুর স্মৃতি, আর আছে কানাইসায়রের মধ্যস্থলে জলমগ্ন অবস্থায় প্রতিষ্ঠাকালীন দেব-মন্দির। নেই কানাইসায়র সংলগ্ন কারাগার, নেই রাজবাড়ি, শস্যাগার, সৈন্যাগার কিংবা কোষাগার। অবশ্য কর্পূরতলা নামে চিহ্নিত একখণ্ড জমি রয়েছে গড়ের মধ্যে। লোকশ্রুতি বলে উক্ত কর্পূরতলাতে আজও লুক্কায়িত রয়েছে ধনরত্নাদি রাজসম্পত্তি এবং মহামূল্য দেববিগ্রহ। তুর্কী আক্রমণের প্রাক্কালে বহিঃশত্রুর ভয়েই নাকি ঐসব ধনসম্পদ এবং বিগ্রহাদি মাটি চাপা রাখা হয়েছিল। **প্রবাদ আছে উক্ত কানাইসায়র বা কর্পূরতলার কোন বস্তু অপহরণ করলে ঘটে অঘটন।**

পরিখা-বেষ্টিত দুর্গের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ছিল '**হনুমান দরজা**' নামক বিশাল প্রবেশ-তোরণ। ঐ প্রবেশতোরণে বৃহদাকার হনুমান মূর্তি ছিল দুর্গ প্রহরার কাজে নিযুক্ত; —তাই তো হনুমান দরজা।

আজ হনুমান নেই, হনুমান দরজা নেই, রাজা নেই, নেই রাজত্ব। বিশাল পরিখাগুলি মজে গিয়ে ধান জমিতে পরিণত হয়ে ক্ষীণ কলেবরে অতীতের স্মৃতি বহন করে চলেছে নিঃশব্দে, নীরবে।

হ্যাঁ, তথাপি আছে, কিছু কিছু আছে। যেমন আছে রাজার সেনাপতি বংশের সেনাপতি পাড়া, ডোম, লোহার, বাগ্দী সৈন্যবাহিনীর বংশধরগণের বাসস্থান স্বরূপ ডোমপাড়া, লোহারপাড়া, বাগ্দীপাড়া। আর আছে লোকমুখে সেইসব স্মৃতিগাথা—

'আগাডোম বাগাডোম ঘোড়াডোম সাজে
ঢাক ঢোল ঘোঙর বাজে
বাজাতে বাজাতে চলল ঢুলি.....' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সাজো সাজো রবে 'যুদ্ধংদেহি' মনোভাব নিয়ে মল্লসৈন্যগণ যখন যুদ্ধযাত্রা করতেন তখন তাদের যুদ্ধভীতি কাটিয়ে সাহস ও শক্তি সঞ্চয়ের জন্য ঐসব ছড়া গাওয়া হত, বাজানো হত রণ-দামামা। আগাডোম অর্থে সৈন্যগণের অগ্রভাগের ডোম বাহিনী, বাগাডোম অর্থে দুই পাশের ডোম বাহিনী (বাগ অর্থে পাশ বা দিক যেমন—কোন বাগে যাব?) এবং 'ঘোড়াডোম সাজে' অর্থে অস্ত্র-শস্ত্র সুসজ্জিত অশ্ববাহিনী। মল্লসৈন্যগণ ঝাঁঝ, ঘণ্টা, কাঁসর, কাড়া-নাকাড়া, ও রণ-দামামা বাজিয়ে এগিয়ে চলত সদর্পে, সগর্বে।

এতো গেল যুদ্ধবিগ্রহের কথা। যুদ্ধবিগ্রহ এবং রাজ্য বিস্তারই মল্লরাজাদের শেষ কথা ছিল না। অধ্যাত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ, ঈশ্বর ভাবনায় আপ্লুত, ঐশী সম্পদে শ্রীমণ্ডিত মল্লরাজগণ ছিলেন প্রধানতঃ ঈশ্বর-উপাসক। তাইতো বর্তমান পদুমপুরে আজও প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন **বৃন্দাবনচন্দ্র জীউ**-এর শ্রীমন্দির এবং শ্রীবিগ্রহ, রয়েছে কোন এক সিদ্ধ সাধক আউলিয়া গোঁসাই-এর ভগ্নপ্রায় সমাধি মন্দির এবং তদীয় শিষ্যদের সমাধি মন্দির। আউলিয়া বাবাকে আজও স্থানীয় মানুষজনেরা সম্মান শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উৎসবাদির মাধ্যমে। আউলিয়া বাবার বহু অলৌকিক ঘটনার কথা এখনও ঘোরাফেরা করে লোক-মুখে।

প্রদ্যুম্নপুর গড়ের দক্ষিণ-পূর্বে রয়েছে শ্যামচাঁদ বিগ্রহের স্মৃতিবহনকারী **শ্যামচাঁদ মন্দিরের ভিত্তিভূমি।**

অনেকে বলেন, প্রদ্যুম্নপুরে কিছুই নেই। আমিও বলি কিছুই নেই। কিন্তু ঐ 'নেই'-এর সাথে 'হ্যাঁ' যোগ করে বলতে চাই, আছে। হ্যাঁ, আছে। মানুষ মরে যায়, রয়ে যায় স্মৃতি। দিন চলে যায়, গড়িয়ে যায় বছর, শেষ হয় শতাব্দী, ঘটে নানান ঘটনা। সময়ের কোলে ভাষার বোলে, অতীতের স্মৃতি মন্থন করে রচিত হয় ইতিহাস। **প্রদ্যুম্নপুর আজ পরিণত হয়েছে ঐতিহাসিক প্রদ্যুম্নপুরে।**

প্রদ্যুম্ন হলেন শ্রীকৃষ্ণ-রুক্মিণীর পুত্র। আবার প্রদ্যুম্ন শব্দের অর্থ হল শালগ্রাম শিলা এবং শালগ্রাম শিলা হল ভগবান বিষ্ণুর প্রতীক। আবার দেখুন মল্লরাজাদের কুল-দেবতা হলেন অনন্তদেব শালগ্রাম শিলা অর্থাৎ কিনা বিষ্ণু। **সুতরাং প্রদ্যুম্নপুর শব্দের অর্থ হয় বিষ্ণুপুর।** পরবর্তীকালে প্রদ্যুম্নপুর থেকে রাজত্ব উঠে এসেছিল বিষ্ণুপুরে। কিন্তু তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় বলা চলে প্রদ্যুম্নপুর ওরফে বিষ্ণুপুর থেকে রাজ্য স্থানান্তরিত হয়েছে বিষ্ণুপুরে। তাই বলছিলাম 'নেই'-এর মধ্যেই লুকিয়ে আছে 'হ্যাঁ'। দেখার মতো চোখ থাকলে, অনুসন্ধিৎসা থাকলে এসব জিনিস দেখা যায়, বোঝা যায় বিলক্ষণ।

মহেঞ্জোদরো এবং হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ যেমন কথা বলে, শিল্প-সংস্কৃতির সাক্ষ্য বহন করে, অনুরূপভাবে প্রদ্যুম্নপুরের লুপ্তপ্রায় ধ্বংসাবশেষও কথা বলে। মজে যাওয়া পরিখা, পরিখার পাড়, ভগ্নপ্রায় সমাধি মন্দির, দেউল, দেবালয়, দেব-বিগ্রহ, কানাইসায়র, গড়ধরমপুর, রাজডাঙ্গা, রাজশোল, কর্পূরতলা, সেনাপতি পাড়া, সৈন্যবাহিনীর ডোম, বাগ্দীগণ, কুম্ভস্থল দুর্গ, দেবসেবায় নিযুক্ত গোস্বামীগণ লুপ্ত স্মৃতির ব্যক্ত প্রকাশ। এছাড়া বর্তমান জয়পুর মৌজার তিন নম্বর শীটের অন্তর্ভুক্ত মুকুন্দপুর, বৈকুণ্ঠপুর, ছোটনন্দনপুর, রামপুর, মদনমোহনপুর, নিকুঞ্জপুর ইত্যাদি প্রাচীন নামগুলিও অধ্যাত্মচেতনার দ্যোতক। এ সব হল মল্ল-সংস্কৃতির স্মৃতি-স্পন্দন, মল্লরাজত্বেরই স্মৃতিরোমন্থন।

অধ্যায় - ৮

লালগড়

কথা বলতে বলতে, মেঠো পথে বুনো পথে চলতে চলতে আমরা এখন এসে পড়েছি বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত **'লালগড়'** সমীপে। প্রবেশপথ-যুক্ত অনুচ্চ প্রাচীরঘেরা এই যে চৌবাচ্চাটি দেখছেন এটিই লালগড় নামে সুবিদিত। ভিতরে ভিতরে ২৪ ফুট ৩ ইঞ্চি×২৪ ফুট মাপের মাকড়া পাথরে নির্মিত সিঁড়ি বিশিষ্ট এই চৌবাচ্চাটি ছিল এক রহস্য। ৬০১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত লালগড়টি ছিল লতাপাতা, ঝোপঝাড় এবং কাঁটাগুল্ম দ্বারা আচ্ছাদিত। তারও পূর্বে অদূর অতীতে এই স্থানটি ছিল মহীরুহ আচ্ছাদিত গভীর অরণ্য। বাঘ, ভালুক, বনশুয়োর এবং বিষাক্ত সর্পাদি জাতীয় সরীসৃপ সারাক্ষণ দাপিয়ে বেড়াত এখানে। এরকম এক ভয়াবহ অঞ্চলে মল্লরাজাগণ তৈরী করিয়েছিলেন এই লালগড়। কিন্তু কেন?

কিংবদন্তী এরূপ :— এখানে ছিল একটি দুর্গ। 'গড়' শব্দটির অর্থ দুর্গ। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় লালগড় মানে 'লালদুর্গ'। জঙ্গলের লালমাটির উপর নির্মিত

হওয়ার সুবাদেই হয়তো বা এটি লালগড়। আবার কেউ কেউ বলেন বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত দেবতা লালজীউ বিগ্রহের নামেই এই গড়ের নামকরণ করা হয়েছিল লালগড়। আবার অনেকে বলেন লালবাঈ-এর স্মৃতি বহন করছে এই লালগড়। অবশ্য শেষোক্ত মতটি সত্য বলে মনে হয় না। কারণ লালবাঈ-এর বিষ্ণুপুরে আগমনের বহু পূর্বেই এই গড় নির্মিত হয়েছিল রাজ্যের নিরাপত্তার কারণে।

আজ থেকে প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে এই চৌবাচ্চাটির উপর দুর্গপ্রাকার অর্থাৎ দুর্গের ঘর-বাড়ির ভগ্নাবশিষ্ট নজরে পড়ত। জনশ্রুতি বলে, রাজবাড়ি থেকে এই দুর্গ পর্যন্ত একটি সুড়ঙ্গ-পথ ছিল। দুরন্ত শত্রুর আক্রমণে পরাজিত হয়ে বন্দী হবার উপক্রম হলে সেই সুড়ঙ্গ-পথ ধরে রাজপরিবারের সদস্যগণ নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে পালিয়ে আসতেন এখানে। এই চৌবাচ্চাটি ছিল একটি ঘরের মধ্যে আবদ্ধ। ঘরের বারান্দা অতিক্রম করে সিঁড়িপথে চৌবাচ্চাতে নামার যে সুব্যবস্থা ছিল, তা দেখাই যাচ্ছে।

এই চৌবাচ্চাটিতে নামতে গিয়ে গা ছম্‌ছম্ করেছে আমাদের। বাল্যবয়সে দুরন্তপনার দৃষ্টান্ত এবং দুঃসাহসিক অভিযানের অভিপ্রায়ে আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু লালবাঁধের পাড়ে পিক্‌নিক্ করতে এসে কয়েকবার সিঁড়িপথে নীচে নামবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু যেই মাত্র কয়েক ধাপ নীচে নেমেছি অমনি জলের মধ্যভাগ থেকে বুদ্‌বুদ্ উঠতে দেখেছি। তথাপি ভীতি-মিশ্রিত সাহসে ভর করে আরো নীচে নামতেই চৌবাচ্চার জলরাশি উপরে উঠে এসেছে ক্রমশঃ। অজানা আতঙ্কে আর নীচে নামতে সাহস হয় না আমাদের। তড়িঘড়ি উঠে আসি উপরে। সাথে সাথে জলস্তর নেমে যায় নীচে এবং বুদবুদ ওঠা বন্ধ হয়ে যায় মুহূর্তে। কিন্তু কেন এমনটা হয়? —এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এজন্যই এই চৌবাচ্চাটিকে **'রহস্য চৌবাচ্চা'** বললেও অত্যুক্তি হবে না বোধ হয়। 'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী' গ্রন্থের লেখক এবং আরো অনেকেরই অনুরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছে এই চৌবাচ্চাতে নামতে গিয়ে।

হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছি একটা কথা, সেটা হল চৌবাচ্চাটির অভ্যন্তরভাগের চার দেওয়ালে লোহার তৈরী বলয় আকৃতির বেশ মোটা মোটা শিকল ছিল খান কয়েক। সময়ে সময়ে অপহৃত হয়েছে ঐসব ঝুলন্ত শিকল। তবে শিকলগুলি কি উদ্দেশ্যে প্রোথিত হয়েছিল? —এ প্রশ্নের উত্তরে ইতিহাস নীরব।

লালগড় বলতে যা বোঝায় আজ আর তার চিহ্ন নেই বিন্দুমাত্র। গড়ের অভাবে গড়ের অভ্যন্তরভাগের জলাধারটিই 'লালগড়' নামে আখ্যায়িত হয়ে লালগড়ের স্মৃতি বহন করছে নিভৃতে নীরবে।

দুঃখের মধ্যেও সুখের কথা হল এই লালগড়টিকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়া জেলা পরিষদ ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বন বিভাগের যৌথ উদ্যোগে গত ৬ই মার্চ, ২০০১ খ্রীষ্টাব্দে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে **'লালগড় প্রকৃতি উদ্যান'** প্রকল্পের শিলান্যাস করা হয়েছে। কাজ চলছে দ্রুতলয়ে। ৩৫ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়েছে এর জন্য। আশা করা হচ্ছে এই 'প্রকৃতি উদ্যান' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিষ্ণুপুর পর্যটক আকর্ষণের ক্ষেত্রে আর একটি নতুন মাত্রা পাবে। 'লালগড় প্রকৃতি উদ্যান' নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি দান করেছেন কোলকাতা নিবাসী উদার চেতা কাশীদেবী মালানি। এজন্য তিনি অবশ্যই স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

২০০১ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চের পর মজে যাওয়া লালগড়ের খনন কার্য শুরু হয় অদম্য

উৎসাহে। খুঁড়তে খুঁড়তে মাকড়া পাথর নির্মিত চৌকা আকৃতির চৌবাচ্চাটির পাথর নির্মিত ৪৮টি সিঁড়ি ভেঙে ৩২ ফুট গভীরতায় তলদেশের সন্ধান মেলে। ৩২ ফুট নীচে একটি সমতল মেঝের মধ্যস্থলে দেখা যায় একটি ইন্দারা। ইন্দারাটির অভ্যন্তরভাগের ব্যাস ১৪ ফুট। বহু-কাঙ্ক্ষিত সুড়ঙ্গপথের সন্ধানে সোৎসাহে চলতে থাকে খননকার্য। বেরিয়ে আসে জলধারা। পাম্প বসিয়ে জল ছিঁচে ছিঁচে কৌতূহলী মন নিয়ে চলতে থাকে আরো গভীরে নেমে যাওয়ার সার্বিক প্রয়াস। ইঁটের তৈরী আরো ৩২টি সিঁড়ি বেয়ে ইন্দারাটি নেমে গেছে ২১ ফুট ৪ ইঞ্চি গভীরে। খুঁড়তে খুঁড়তে ইন্দারার শেষ প্রান্তে পৌঁছে যান খনকেরা। কিন্তু দুঃখের বিষয় সর্বসাকল্যে প্রায় সাড়ে তিপান্ন ফুট গভীরে গিয়েও পাওয়া যায়নি গুহামুখ বা সুড়ঙ্গপথের সন্ধান। লোকশ্রুতিকে মিথ্যে প্রমাণিত করে এবং সমস্ত জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে খননকার্যের সময় মাটির মধ্য থেকে বেরিয়ে আসে তিজেল আকৃতির পোড়ামাটির একটি ছোটপাত্র, চারটি পিতলের ঘট এবং অনেকগুলি তূণীর জাতীয় জিনিস। তূণীর আকৃতির জিনিসগুলির তলদেশে রয়েছে থার্মোকল জাতীয় বস্তু যা মোটেই সহজ-দাহ্য নয় বা দাহ্য-পদার্থ নয়।

লালগড় খনন করার সময় এবং লালগড়ের চতুষ্পার্শ্বের ঝোপঝাড়, লতাগুল্ম কেটে অসমতল অঙ্গনকে সমতল করতে গিয়ে লালগড়ের ঈশান কোণে প্রায় কুড়ি ফুট দূরত্বে ২৫-৩০ ফুট ব্যাস বিশিষ্ট বৃত্তাকৃতি একটি মন্দিরের ভিত্তিভূমি তথা ভিত্তিবেদীর সন্ধান মেলে। ভিত্তিভূমির পূর্বদিকে প্রায় ২৫ ফুট দূরত্বে রয়েছে একটি তুলসীমঞ্চের ভগ্নাংশও। এর থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় অতীতে এ অঞ্চলে একটি দেবমন্দির ছিল। দেববিগ্রহের ভোগরান্না এবং পূজাদি কর্মের প্রয়োজনীয় পানীয় জলের যোগান দেওয়ার সাধু উদ্দেশ্যে তৈরী করা হয়েছিল এই চৌবাচ্চা এবং ইন্দারা। ধাপে ধাপে নেমে গিয়ে চৌবাচ্চা ও ইন্দারা থেকে তুলে নিয়ে আসা হত জল। খননকার্যের সময় পাওয়া পুজোর ঘট জাতীয় পাত্রগুলো এই তথ্যকেই সমর্থন করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে বিষ্ণুপুরের নগর-দেবতা শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউ-এর মন্দির প্রাঙ্গণেও অনুরূপ একটি চৌবাচ্চা রয়েছে। সেখানেও খননকার্য চালালে আশা করা যায় এই ধরনের ইন্দারার অস্তিত্ব নজরে পড়বে। ঐ চৌবাচ্চাটিও একই উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল মনে হয়। আবার লালগড়ে প্রাপ্ত পরিত্যক্ত তূণীরগুলিও এ অঞ্চলে দুর্গের অস্তিত্বের পক্ষেই ভোট দেয় যেন।

সে যাই হোক, লালগড় নামক এই চৌবাচ্চাটির গঠনশৈলী যে অত্যন্ত মজবুত তা অনস্বীকার্য। বর্তমানে এই লালগড়কে কেন্দ্র করে তার চার পাশে পরিখা খনন-পূর্বক নৌকা-ভ্রমণের পরিকল্পনা এবং প্রকৃতি-উদ্যান সৃজনের যে প্রয়াস নেওয়া হয়েছে তা নিঃসন্দেহে বিষ্ণুপুরবাসীর পাশাপাশি পর্যটক মণ্ডলীরও মনোরঞ্জন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

লালগড়ের কথায় ছেদ টেনে লালবাঁধের পাড়ে বসে বসে বিষ্ণুপুরের বাঁধ, সায়র, পুষ্করিণী ও পরিখা প্রসঙ্গে কিছু প্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করব এক্ষণে।

অধ্যায়-৯

বাঁধ, সায়র, পুষ্করিণী ও পরিখা

বিষ্ণুপুরের রাজন্যবর্গের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল বাঁধ, সায়র, পুষ্করিণী ও পরিখা খনন। সর্বসাকুল্যে ন'টি বাঁধ, যথা—**চৌকানবাঁধ** (চৌকনবাঁধ/চৌখনবাঁধ), **লালবাঁধ, শ্যামবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, গন্টনবাঁধ** (গাঁতাতবাঁধ), **বীরবাঁধ** (পোকাবাঁধ) ও **কাজুলেবাঁধ**; রাজা প্রথম রঘুনাথ সিংহের আমলে পাঁচটি সায়র, যথা—**পাটসায়র, লালসায়র, সীতাসায়র, গৌরাঙ্গসায়র** ও **রঘুনাথসায়র**, এছাড়া বিভিন্ন সময়ে **শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, সীতাকুণ্ড, সতীকুণ্ড** এবং বিষ্ণুপুর রাজ্য ও রাজদুর্গের চারপাশে স্তবকে স্তবকে সুগভীর পরিখা খনন করা হয় মল্লরাজত্বে।

এইসব বাঁধ, সায়র, পুষ্করিণী ও পরিখা দ্বারা চতুর্বিধ উদ্দেশ্য চরিতার্থ হত। বিষ্ণুপুর রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান হল অরণ্য আচ্ছাদিত মালভূমি অঞ্চলের প্রত্যন্ত এলাকাতে। বহিঃশত্রুর হাত থেকে বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করার জন্য একটি 'মাস্টার প্ল্যান্' তৈরী করা হয় তৎকালে। অরণ্যাভ্যন্তরে অবস্থানের জন্যে প্রাকৃতিক কারণে বৃক্ষ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকার ফলে বিনা ব্যয়ে রচিত হয়েছিল বার্ক্ষদুর্গ। জঙ্গলাকীর্ণ জঙ্গলের বনঢল নামার মুখে মুখে সুবিশাল নিম্নভূমির সম্মুখভাগে সুদীর্ঘ এবং সুউচ্চ পাড় ও বাঁধ তৈরী করে বনের ঢল আটকে দেওয়া হত। বিপুল জলরাশিকে বাধা দিয়ে বিশাল জলাশয় তৈরীর সুবাদেই এগুলি বাঁধ নামে আখ্যায়িত হয়েছে। এভাবে একটির পর একটি পাড় দিয়ে নগরের পূর্ব দিকে চৌকানবাঁধ, লালবাঁধ, শ্যামবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, পশ্চিম দিকে যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, গাঁতাতবাঁধ এবং শহরের মধ্যস্থলে বীরবাঁধ (পোকাবাঁধ) ও কাজুলেবাঁধ খনন করা হয়। খনন করা হয় শহরের দক্ষিণ দিকে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর সুগভীর পরিখা। এইসব বাঁধ ও পরিখাতে ছাড়া থাকত নরখাদক কুমীর। আমার দাদু বলতেন যে তিনি তাঁর বাল্যবয়সে যমুনাবাঁধের পশ্চিমদিকের মাঠে কুমীরদের রোদ পোহাতে দেখেছেন। উত্তরে রয়েছে প্রকৃতির দান বিড়াই নদী এবং বিড়াই নদীর উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদ। বাঁধ, পরিখা ও নদী দ্বয়ের জলরাশিতে বিষ্ণুপুরকে করে রাখত জলবন্দী। এভাবেই রচিত হয়েছিল জলদুর্গ। পরিখাগুলিকে করা হয়েছিল খরস্রোতা ক্যানেলের মতো। পরিখা খাদের মাটি তুলে তুলে শহরের অভ্যন্তরভাগে নির্মিত হল কৃত্রিম পাহাড়—যেমন পাথর-দরজা সংলগ্ন সুউচ্চ পাড়টিকে বলা হয় মূর্চার পাহাড়, অপভ্রংশে মূর্চার পাড়। পূর্বোক্ত পাড় বা পাহাড়ের উপর থরে থরে সাজানো থাকতো ছোট বড় মাঝারি আকৃতির অসংখ্য কামান। জলদুর্গ অতিক্রম করে শত্রুসৈন্য বিষ্ণুপুর রাজ্যে প্রবেশ করতে চেষ্টা করলেই জলের তোড়ে তারা ভেসে যেত ছিন্নমূল তৃণের মতো। তীরন্দাজ এবং গোলন্দাজ বাহিনীর বিষাক্ত তীরবিদ্ধ ও গুলিবিদ্ধ হয়ে শত্রুসৈন্য নিহত হত কাতারে কাতারে। নিরাপদে এবং নির্ভয়ে থাকত বিষ্ণুপুর রাজ্য এবং রাজ্যবাসীগণ। চরিতার্থ হত পরিকল্পনার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্যটি হল জলকষ্ট নিবারণ। খরাপ্রবণ এলাকা বাঁকুড়া জেলার অন্তর্ভুক্ত এই রাজ্যটির জলকষ্ট নিবারণের মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল এই সুবৃহৎ জলাধারগুলির সাহায্যে। চাষাবাদের জল সরবরাহ ছাড়াও বন্যজন্তু, পাখ-পক্ষী, গবাদি পশু এবং নগরবাসীগণের পানীয় জল ও স্নানের জলের উৎস ছিল এইসব জলাধারগুলি।

তৃতীয়তঃ এই জলাশয়গুলি ছিল বিষ্ণুপুরের রাজন্যবর্গের নৌ-বিহারের বিলাসস্থল। জলাশয় সংলগ্ন এলাকাতে স্থানে স্থানে রচিত হয়েছিল প্রমোদ-উদ্যান। মহারাজ বীর হাম্বীর সুদূর বৃন্দাবন থেকে কিছু নতুন প্রজাতির ফুল ও ফল গাছ এনে প্রমোদ-কাননের শ্রীবৃদ্ধি

করেছিলেন। আয়নার বিস্তীর্ণ ফলকের মত স্বচ্ছ জলরাশির উপর প্রমোদ-কানন, বাতাসের হিন্দোলে ঢেউ-এর তালে তালে পানকৌড়ি প্রজাতির জলচর পাখির জলকেলি, নীল আকাশের বুকে ভাসমান সাদা মেঘের ভেলার সাথে পাল্লা দিয়ে সারসকুলের আকাশ বিহারের প্রতিবিম্বিত দৃশ্য যেন একটি পটে আঁকা ছবির মতোই প্রতিভাত হত। প্রমোদ-উদ্যানের পুষ্পরাজির নিকশিত দেহ-নির্যাস এবং সরোবরগুলির পদ্মগন্ধের সুরভিত সমীরণ বিষ্ণুপুরের বায়ুমণ্ডলে যেন ছড়িয়ে দিত সুগন্ধি আতর।

চতুর্থতঃ বাঙালীর প্রিয় খাদ্য যে 'মাছ-ভাত' সেই ভাতের যোগান আসতো বাঁধের জলসিঞ্চনে সুসমৃদ্ধ কৃষিকার্য থেকে। আর অতি সুস্বাদু মাছ আসতো এই বাঁধ ও জলাশয়গুলি থেকে।

এসব দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বাঁধগুলির গুরুত্ব যথেষ্ট বলেই স্বীকৃত হয়। **কিন্তু সরকারী ঔদাসীন্যে এবং সংরক্ষণের অভাবে এই বাঁধগুলি মজতে মজতে আজ আবাদী জমিতে রূপান্তরিত হয়ে ক্রমে ক্রমে মুছে যেতে বসেছে বিষ্ণুপুরের মানচিত্র থেকে। ইতিমধ্যে মুছে গেছে চৌকানবাঁধ, কাজুলেবাঁধ। অবশিষ্ট বাঁধগুলি মৃতপ্রায় অবস্থায় মৃত্যুর প্রতীক্ষায় প্রহর গুনছে ক্ষণে ক্ষণে। তাই দেখে দুঃখ হয়। বড় দুঃখ হয়। বিষ্ণুপুরের জলাশয়, পরিখা এবং সেচ-প্রণালী দর্শন করে জনৈক বিদেশী পর্যটক মন্তব্য করেছিলেন— To learn the tank irrigation system we must come to Vishnupur. আজ বিষ্ণুপুরের মৃতপ্রায় জলাশয় ও পরিখাগুলি দেখে তিনি কি মন্তব্য করতেন জানি না। তবে হা-হুতাশ করতেন নিশ্চয়।** থাক সে কথা।

পূর্বোক্ত বাঁধগুলি কোন রাজা কখন খনন করিয়েছিলেন এ বিষয়ে ঐতিহাসিক ও গবেষকমহলে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থের লেখক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "রাজধানীর জলকষ্ট দূর করবার জন্য ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সুদৃঢ় করবার উদ্দেশ্যে রাজা দ্বিতীয় বীর সিংহ ১৬৫৭ থেকে ১৬৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শহরের ভিতরে ও আশেপাশে লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, গাঁতাতবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, শ্যামবাঁধ, পোকাবাঁধ (সাবেক নাম বীরবাঁধ) ও চৌখনবাঁধ নামে আটটি বিরাট জলাশয় খনন করান। .....বস্তুতঃ, একটি শহরের কাছাকাছি এতগুলি বড় দীঘি উভয় বাংলার আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ।" গবেষক মানিক লাল সিংহ তাঁর 'সুবর্ণরেখা হইতে ময়ূরাক্ষী' (৩য় খণ্ড) পুস্তকের ১৫১ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "বীরসিংহ মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর গড়কে সুরক্ষিত করার জন্য সাতটি বাঁধ এবং একাধিক স্তবক পরিখা, মূর্চার বেষ্টনী দ্বারা বিষ্ণুপুর কিল্লাকে এক দুর্ভেদ্য জলদুর্গে পরিণত করেন।" ঐতিহাসিক ফকির নারায়ণ কর্মকার 'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী' গ্রন্থের ৪১ পৃষ্ঠাতে বীর হাম্বীর প্রসঙ্গে লিখেছেন, ".....বিষ্ণুপুরকে বৃন্দাবনের অনুকরণে তৈরী করবার ব্রত গ্রহণ করেন তিনি। বিপুল অর্থব্যয়ে বিষ্ণুপুরের বুকে খনন করান যমুনা, কালিন্দী বাঁধ, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, কালীদহ প্রভৃতি।"

আবার অনেকে মনে করেন বীর সিংহ শুধুমাত্র লালবাঁধ এবং বীরবাঁধ (বর্তমানে পোকাবাঁধ) খনন করান, কৃষ্ণবাঁধ খনন করান রাজা রামকৃষ্ণ সিংহ। প্রখ্যাত লেখক রমাপদ চৌধুরী তাঁর 'লালবাঈ' উপন্যাসে যা বলতে চেয়েছেন তার বিষয়বস্তু হল, নৃত্যগীত পটীয়সী মুসলমান রমণী লালবাঈয়ের প্রণয়াসক্ত রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ লালবাঈয়ের ইচ্ছানুসারেই লালবাঁধ খনন করান এবং বিষ্ণুপুরের বুকে লালবাঈকে স্মরণীয় করে রাখার অভীপ্সাতে তার নামানুসারেই বাঁধটির নাম রাখেন লালবাঁধ। 'লালবাঈ' উপন্যাসের ১৩৮ পৃষ্ঠাতে লিপিবদ্ধ আছে—

"লালবাঈ বলেছে, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, গণ্টনবাঁধের পাশে আমাদের পৃথক একটি বাঁধ নির্মাণ করবার আদেশ দিন রাজাবাহাদুর।

রঘুনাথ আদেশ দিয়েছে। বলেছে, তোমাকে চিরস্মরণীয় করে রাখব লালী, এ বাঁধের নাম হবে লালবাঁধ।

খুশি হয়ে উঠেছে লালবাঈ।"

লালবাঁধ প্রসঙ্গে রমাপদ বাবুর উক্ত বক্তব্য ইতিহাস সমর্থিত নয়। কারণ, প্রথমতঃ যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, গণ্টনবাঁধের পাশে লালবাঁধ নেই, লালবাঁধ আছে শ্যামবাঁধের দক্ষিণে। পূর্বোক্ত তিনটি বাঁধ বিষ্ণুপুর শহরের পশ্চিমে অবস্থিত আর লালবাঁধসহ শ্যামবাঁধ এবং কৃষ্ণবাঁধ বিষ্ণুপুরের পূর্বদিকে প্রতিষ্ঠিত। দ্বিতীয়তঃ বিষ্ণুপুরে লালবাঈয়ের আগমন ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকের প্রথমভাগে[১]। বিষ্ণুপুরের বাঁধগুলি খনন করা হয়েছে তারও বহু পূর্বে—বিষ্ণুপুরের কোন এক গৌরবময় অধ্যায়ে অর্থাৎ বিষ্ণুপুরের ৪৯তম রাজা বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল থেকে বিষ্ণুপুরের ৫২তম রাজা বীর সিংহের রাজত্বকালের অন্তর্বর্তী সময়ে।

লালবাঁধের খনন-কর্তা হিসেবে মহারাজ বীরসিংহের নামই ইতিহাস সমর্থিত। কারণ তিনি বৃন্দাবন থেকে নিয়ে আসেন অতীব শ্রীদর্শন লালজীউ বিগ্রহ। শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেন লালজীউ মন্দির এবং বিষ্ণুপুরের পূর্বদিকে খনন করান এক বিশাল বাঁধ। **লালজীউ বিগ্রহের উদ্দেশ্যে বাঁধটি উৎসর্গ করে বাঁধটির নাম রাখেন লালবাঁধ।** আবার অনেকে বলেন, বর্ষাকালে জঙ্গলের লালমাটি ধোয়া লাল জলে লাল হয়ে যেত দীঘির জল—এজন্যই এটি লালবাঁধ।

রমাপদ বাবু লালবাঁধ প্রসঙ্গে যাই লিখুন না কেন, লালবাঈকে নিয়ে তাঁর লেখা পুস্তকটি একটি ঐতিহাসিক দলিল না হলেও রাজকীয় ভাষার লালিত্যে পুষ্ট পুস্তকটি নিঃসন্দেহে একটি প্রথম শ্রেণীর উপভোগ্য উপন্যাস। উক্ত রোমান্টিক উপন্যাসটির যবনিকা টানতে গিয়ে তিনি লিখেছেন—

"১৮৯৬ সাল।

লালবাঁধ দীঘি খনন করে পাওয়া গেল কয়েকটি মুসলমানী ভোজনপাত্র, একটি লৌহশৃঙ্খল, আর একটি নারীর কঙ্কাল।

বিষ্ণুপুরের নুরজাহান লালবাঈয়ের কঙ্কাল প্রায় দুশো বছর পরে পৃথিবীর হালকা বাতাসে নিঃশ্বাস নিল।

ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে এ কাহিনী।

পূর্ণিমার রাত্রে লালবাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়ে বাতাসে কান পাতলে আজও নাকি এক অবোধ্য চাপা দীর্ঘশ্বাস গুমরে মরে। জলের ওপর গাছের শাখা আর জ্যোৎস্নার লুকোচুরি দেখলে হঠাৎ মনে হয়, যেন এক অনিন্দ্যসুন্দরী হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আজও বোধ হয় বিষ্ণুপুর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষে, লালবাঁধের কিনারায়, রঘুনাথ সিংহের ছিন্নতন্ত্রী তানপুরার তারে লালবাঈয়ের নিরুদ্ধ কান্না গুমরে মরে। একটি অতৃপ্ত আত্মা যেন তার দয়িতের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, অকস্মাৎ বাতাসে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনে চমকে ফিরে তাকায় আজকের মানুষ। দুর্গের ভগ্ন-প্রাকারে, অলিন্দে, পরিখায়, মদনমোহন আর মল্লশিবের মন্দির-প্রাঙ্গণ, লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, গণ্টনবাঁধে এক ব্যর্থযৌবন কাঞ্চনীর প্রেতাত্মা যেন তার প্রেমিককে খুঁজে বেড়ায়।" (লালবাঈ, পৃঃ—১৯১)

১। সুবর্ণরেখা হইতে ময়ূরাক্ষী, পৃঃ— ১৫১

লালবাঈয়ের কঙ্কাল পাওয়া গেছে লালবাঁধের জলের গভীরে। তার অতৃপ্ত প্রেতাত্মা যেন আজও খুঁজে বেড়ায় তার প্রেমিককে। কিন্তু কেন? কেন? কেন?

এই কেনর উত্তরে শোনাব লালবাঈয়ের জীবনের উত্থান-পতনের রোমাঞ্চকর জীবনালেখ্য। শোনাব রাজা রঘুনাথ সিংহের (২য়) সাথে তার অবৈধ প্রণয়ের মর্মান্তিক পরিণতির কথা। শোনাব সেই ভয়ঙ্কর পরিণতির ফলে বিষ্ণুপুরের বুকে কিভাবে স্ব-মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছিলেন **'পতিঘাতিনী সতী'**। এসব ঘটনার স্মৃতিচারণ করব বিষ্ণুপুরের 'নতুন মহল' প্রাঙ্গণে উপনীত হয়ে। এখন একটু বিরতি। বিরতির পর আমরা লালবাঁধ পরিক্রমা করতে করতে ফিরে যাব বিষ্ণুপুরের আদি রাজা রঘুনাথ মল্ল ও অন্যান্য রাজাদের কথায়।

অধ্যায়-১০

রাজকাহিনী—৩

মা দণ্ডেশ্বরী ও লাউগ্রাম

জয় মল্ল (৭১০-৭২০খৃঃ), **বেণু মল্ল** (৭২০-৭৩৩খৃঃ), **কিনু মল্ল** (৭৩৩-৭৪২খৃঃ), **ইন্দ্র মল্ল** (৭৪২-৭৫৭খৃঃ), **কানু মল্ল** (৭৫৭-৭৬৪খৃঃ), **ধ মল্ল** (৭৬৪-৭৭৫খৃঃ), **শূর মল্ল** (৭৭৫-৭৯৫খৃঃ), **কনক মল্ল** (৭৯৫-৮০৭খৃঃ), **কন্দর্প মল্ল** (৮০৭-৮২৮খৃঃ), **সনাতন মল্ল** (৮২৮-৮৪১খৃঃ), **খড়্গ মল্ল** (৮৪১-৮৬২খৃঃ), **দুর্জন মল্ল** (৮৬২-৯০৬খৃঃ), **যাদব মল্ল** (৯০৬-৯১৯খৃঃ), **জগন্নাথ মল্ল** (৯১৯-৯৩১খৃঃ), **বিরাট মল্ল** (৯৩১-৯৪৬খৃঃ), **মাধব মল্ল** (৯৪৬-৯৭৭খৃঃ), **দুর্গাদাস মল্ল** (৯৭৭-৯৭৪খৃঃ)।

প্রদ্যুম্নপুরে রাজ্যাভিষেকের অব্যবহিত পরেই **রঘুনাথ মল্ল** তাঁর পূর্বপ্রতিশ্রুতি মতো পঞ্চানন ঘোষালকে আনুষ্ঠানিকভাবে বরণ করেন রাজ-পুরোহিতের পদে এবং সম্মানিত করেন প্রধান উপদেষ্টারূপে। স্বীয় প্রতিপালক ঘোষাল মশায়ের দূরদর্শিতা, তীক্ষ্ণ মেধা ও মহৎ হৃদয়ের পরিচয়ে পরিতৃপ্ত রাজা রঘুনাথ তাঁকে মহৎ পাত্র জ্ঞানে **'মহাপাত্র'** উপাধিতে ভূষিত করেন। শ্রীকৃষ্ণের নির্দেশ মতো অর্জুন যেমন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধ করেছিলেন তদনুরূপে পঞ্চানন ঘোষাল ওরফে পঞ্চানন মহাপাত্র মহাশয়ের নির্দেশ মতোই রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করেছিলেন রঘুনাথ।

তখনকার দিনে প্রতি এক যোজন অর্থাৎ চার ক্রোশ অন্তর গ্রামভিত্তিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজা থাকতেন এক একজন। মাত্র ১৬ বছরের রাজত্বকালে আদি মল্ল এই ধরনের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাকে পরাভূত করে নিজ বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য করেছিলেন এবং আশাতীতভাবে বৃদ্ধি করেছিলেন মল্ল রাজ্যের সীমানা। অনন্তর ৭১০ খ্রীষ্টাব্দে (মল্লাব্দ ১৬) পুত্র **জয়মল্লের** হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে তিনি বিদায় নেন পৃথিবী থেকে।

পিতা রঘুনাথের মতো জয়মল্লের ছিল না রাজ্যাভিলাষ। বরং বলা চলে তিনি ছিলেন অল্পে সন্তুষ্ট অন্তর্মুখী মানুষ। ঈশ্বর-বিশ্বাসী, আত্মীয়-বৎসল, কোমল-হৃদয় সম্পন্ন এই রাজা রাজ্য-বিস্তারের আগ্রাসী মনোভাবকে বিসর্জন দিয়ে আবাহন করেছিলেন মল্ল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাত্রী দেবী দণ্ডেশ্বরীকে। বিষধর নাগ-নাগিনী ফণা বিস্তার করে যে স্থানটিতে তাঁর স্বর্গীয় পিতার মুখমণ্ডলে ছায়া দান করেছিল সেই বিশেষ স্থানটিতে পূর্বোক্ত ঘোষাল

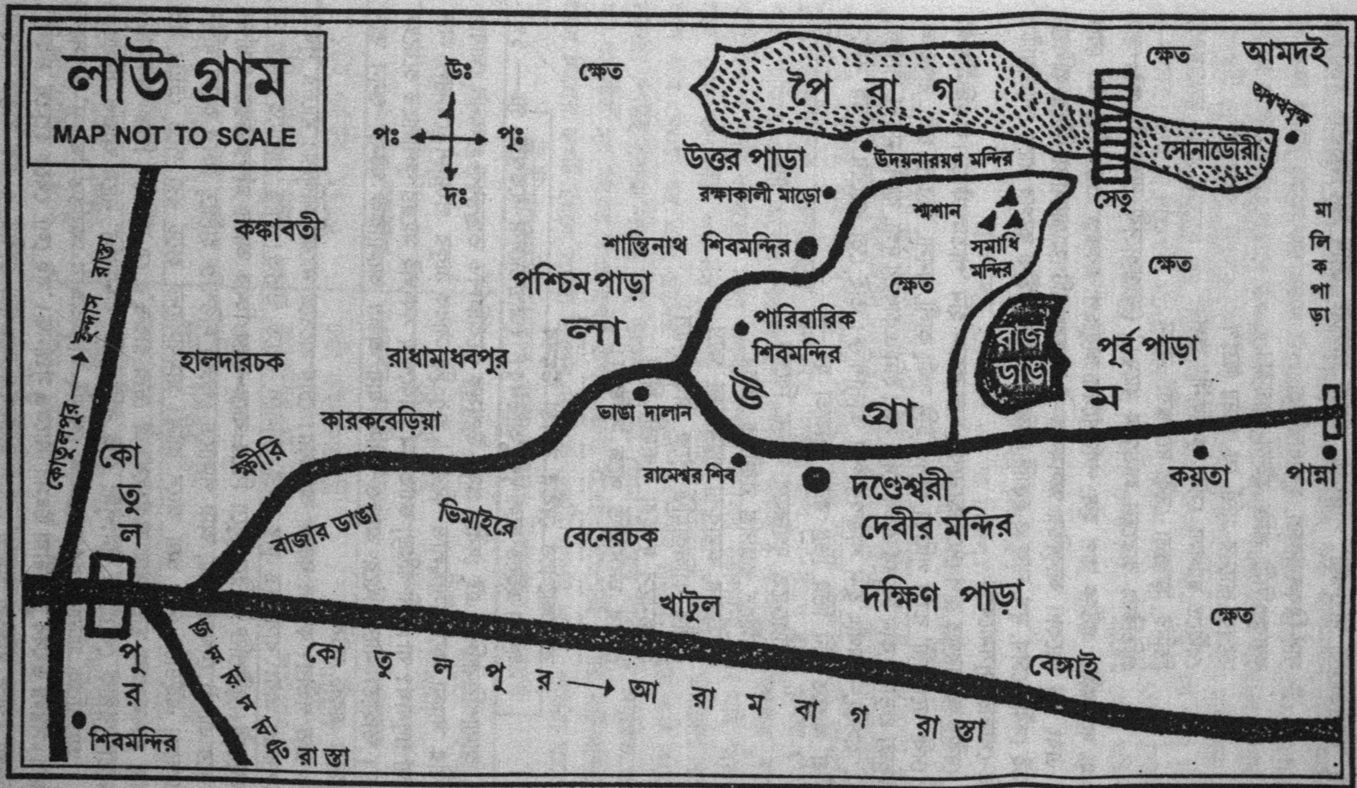
মশায়ের আরাধ্যা দেবী দণ্ডেশ্বরীকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করেন ইনি। **দেব-দেবীর লীলাভূমি মল্লভূমে পরবর্তীকালে আধ্যাত্মিকতার যে জোয়ার এসেছিল তার ভিত্তিভূমি রচনা করেছিলেন মহারাজ জয়মল্ল। শক্তিস্বরূপিণী দেবী দণ্ডেশ্বরীকে প্রতিষ্ঠা করে জয়মল্ল হয়েছেন চিরনমস্য, চির বরেণ্য।**

বালক রঘুনাথ লাউগ্রামের পৈরাগের খালে মাছ ধরতে গিয়ে যে শালগ্রাম শিলাটি পেয়েছিল সেটি হল শালগ্রাম শিলার আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে **'অনন্তদেব'** নারায়ণ শিলা। এই নারায়ণ শিলাটি মল্লরাজ্যের প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই মল্লরাজাদের কুলদেবতারূপে পূজিত হয়ে আসছেন। নারায়ণ শিলা বা শালগ্রাম শিলা হল ভগবান বিষ্ণু। সুতরাং মল্ল রাজাদের কুলদেবতা হলেন অনন্তদেব শালগ্রাম শিলারূপী স্বয়ং বিষ্ণু। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল ভগবান বিষ্ণুর উপাসনার পাশাপাশি দেবী দণ্ডেশ্বরীর পূজা-অর্চনার প্রচলনের মাধ্যমে বৈষ্ণব ও শাক্ত ধর্মের অপূর্ব সমন্বয় ঘটে মল্লভূমের জন্মলগ্নেই। মল্লভূমের দ্বিতীয় রাজা জয়মল্ল খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথমভাগে আনুষ্ঠানিকভাবে দেবী দণ্ডেশ্বরীকে প্রতিষ্ঠা করলেও দেবীর পঞ্চরত্ন বিশিষ্ট নয়নাভিরাম শ্রীমন্দিরটি অবশ্য নির্মিত হয় ১২৪৮ বঙ্গাব্দে।

বিষ্ণুপুরের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই স্মৃতিপটে ভেসে ওঠে লাউগ্রামের মুখচ্ছবি; এসে যায় রাজ-রাজেশ্বরী মা দণ্ডেশ্বরীর কথা। কারণ জঙ্গলাকীর্ণ লাউগ্রামেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন মল্লভূমের আদি রাজা রঘুনাথ মল্ল। জন্মগ্রহণ করেছিলেন, লালিত পালিত বর্ধিত হয়েছিলেন এবং লাউগ্রামের রাজা হয়ে রাজত্বও করেছিলেন। এসব কথা আগেই বলেছি। এসব কথা এখনও মানুষের মুখে মুখে ফেরে গল্প-ছলে। ১৯৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ আমরা লাউগ্রাম এবং লাউগ্রামের অতীব জাগ্রতা দেবী শ্রীশ্রীদণ্ডেশ্বরী মাতার শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ দেখতে গিয়েছিলাম। দেখে এসেছিলাম শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দির, রাজা রঘুনাথের জন্মস্থান এবং পৈরাগের (পৈরাগ দ্বাবকেশ্বর নদের একটি উপনদী) সেই বিশেষ স্থানটি যেখানে মাছ ধরতে গিয়ে রঘুনাথের জালে উঠেছিল **'সোনার ইট'** এবং পূর্বোল্লিখিত **অনন্তদেব 'শালগ্রাম শিলা'**। সোনার ইট উঠেছিল বলে পৈরাগের ঐ বিশেষ স্থানটি আজও **'সোনা ডহরি', 'সোনা ডৌরি'** বা **'সোনা ডুগ্রী'** নামে পরিচিত। দেখে এসেছিলাম পূর্বোল্লিখিত **'রাজডাঙ্গা'** নামে চিহ্নিত রাজা রঘুনাথের রাজ্যাভিষেকের স্মৃতি বিজড়িত স্থানটি এবং সেই পুণ্যতীর্থ যেখানে ঘুমন্ত রঘুনাথের মাথায় ছায়া বিস্তার করে ফণা ধরেছিল নাগ-নাগিনী, দেখেছিলাম সেই বিশেষ স্থানটিতেই প্রতিষ্ঠিতা রয়েছেন **দেবী দণ্ডেশ্বরী**। দেখে এসেছিলাম আরো অনেক কিছু, শুনেছিলাম অনেক কথা। সে সব কথাই বলব এখন। ***(লাউগ্রামের মানচিত্র দ্রষ্টব্য)***।

পূর্বেই বলেছি দণ্ডেশ্বরী দেবীর স্বপ্নাদেশেই এবং কৃপাদৃষ্টিতেই রঘুনাথ লাভ করেন রাজত্ব। উক্ত দেবী বিগত ১৩০০ বছরেরও আগে থেকেই প্রতিষ্ঠিতা রয়েছেন লাউগ্রামে এবং পূজিতা হয়ে আসছেন সেই থেকে। এখন মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, কে এই দেবী? দণ্ডেশ্বরী বলতে ঠিক কি বোঝায়? এবং কাকে বোঝায়?

অভিধান বলে 'দণ্ড' শব্দের অর্থ হল লাঠি, যষ্টি, শাস্তি, শিক্ষা, দমন, শাসন ইত্যাদি। সুতরাং **দণ্ডেশ্বরী শব্দের অর্থ শাসনকর্ত্রী-দেবী বা শাসন-ক্ষমতা প্রদানকারী-দেবী**। রঘুনাথকে দণ্ড অর্থাৎ শাসন-ক্ষমতা প্রদান করে তিনি দণ্ডেশ্বরী নামে ভূষিতা হয়ে উপাসিতা হয়ে আসছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। দেবী দণ্ডেশ্বরীর রূপ বর্ণনা করতে



লাউ গ্রাম
MAP NOT TO SCALE
উঃ
পঃ
পূঃ
দঃ
ক্ষেত
পৈ রা গ
আমদই
সোনাডৌরী
সেতু
মালিকপাড়া
উত্তর পাড়া
উদয়নারয়ণ মন্দির
রক্ষাকালী মাড়ো
শ্মশান
সমাধি মন্দির
শান্তিনাথ শিবমন্দির
কঙ্কাবতী
পশ্চিম পাড়া
ক্ষেত
পারিবারিক শিবমন্দির
লা উ গ্রা ম
রাজ ডাঙা
পূর্ব পাড়া
হালদারচক
রাধামাধবপুর
ভাঙা দালান
কারকবেড়িয়া
ক্ষীরি
রামেশ্বর শিব
দণ্ডেশ্বরী দেবীর মন্দির
কয়তা
পান্না
কোতুলপুর → ইন্দাস রাস্তা
কোতুলপুর
বাজার ডাঙা
ভিমাইরে
বেনেরচক
খাটুল
দক্ষিণ পাড়া
ক্ষেত
বেঙ্গাই
কোতুলপুর → আরামবাগ রাস্তা
জয়রামবাটি রাস্তা
শিবমন্দির

গিয়ে 'জাগ্রতাদেবী দণ্ডেশ্বরী' পুস্তিকার প্রণেতা চাঁরুচন্দ্র সোম লিখেছেন—

" সার্ধ-ত্রিবলয়াকারা মূলাধারস্থিতা
কুলকুণ্ডলিনী শক্তি হইলা জাগ্রতা।
তন্ত্রের ধ্যানের মূর্ত্তি যে আদ্যা স্বরূপ
বেদীতে স্থাপিলা সেই 'কুণ্ডলিনী' রূপ।
তিনিই 'জাগ্রতা দেবী দণ্ডেশ্বরী' নামে
প্রতিষ্ঠিতা রয়েছেন লাউগ্রাম ধামে।" (জাগ্রতাদেবী দণ্ডেশ্বরী, পৃঃ—৮)

মা দণ্ডেশ্বরীর প্রতীক রূপ হল পর্বতশৃঙ্গের অনুরূপ একখণ্ড প্রস্তর বিশেষ। বেশ বড় এবং উঁচু ত্রিকোণ আকৃতির অসমতল ঐ প্রস্তরখণ্ডটি আগাগোড়া সিঁদুর প্রলিপ্ত। ওতেই দেবীর চোখ, মুখ, নাক ও হস্তাদি অঙ্কিত। দেবীর প্রতীক রূপের পাশে পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়ার সুসমাবেশ।

দেবীর অবয়বগত রূপ দেখে অনেকেই মনে করেন ইনি 'পাতালফোঁড়'। কুণ্ডলিনীরূপী এই দেবী 'দণ্ডেশ্বরী' রূপে পূজিতা হলেও ইনি দুর্গা, কালী, মনসা, শীতলা, চণ্ডী, দশভুজা, অষ্টভুজা প্রভৃতি কোন বিশেষ একক দেবী নন। ইনি একাধারে দুর্গা, কালী, মনসা, শীতলা, চণ্ডী, বাসন্তী,—অর্থাৎ ইনি শক্তিস্বরূপিণী আদ্যাশক্তি। তাই তো বছরের বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন ঋতুতে ইনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে পূজিতা হন —

" আশ্বিনেতে দুর্গারূপে অর্চনা বিশেষ
নবমীতে কল্পারম্ভ নবমীতে শেষ।
কার্তিকের অমাবস্যা শ্যামাপূজা ক্ষণে
দেবীর কালিকামূর্তি পূজে দেউলেগণে।
জ্যৈষ্ঠমাসে দশহরা পুণ্যময়ী দিনে
দেবীর মনসামূর্তি পূজে সর্বজনে।
... ...
বসন্তকালেতে দেবীর বাসন্তী উৎসব
ফাল্গুন হইতে চলে দৃশ্য অভিনব।" (জাগ্রতাদেবী দণ্ডেশ্বরী, পৃঃ— ১৭)

আদ্যাশক্তিরূপিণী এই দেবীর প্রথম উপাসক পূর্বোল্লিখিত তন্ত্রসাধক পঞ্চানন ঘোষাল দেবীর সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেন। শুধু কি সাধক-ঠাকুর পঞ্চানন ঘোষাল আর রাজা রঘুনাথ? না। ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই মায়ের কৃপালাভে হয়েছেন ধন্য। তাইতো মাকে ঘিরে আজও শোনা যায় অজস্র অলৌকিক ঘটনা। শুনুন তবে এরকম একটি ঘটনা।

রাত গভীর। কাজল কালো অন্ধকার। চোর এসেছে মায়ের মন্দিরে। মায়ের পূজার উপকরণ এবং বাসনপত্র চুরি করে পালিয়ে যেতে উদ্যত। কিন্তু পালাতে পারে না কিছুতেই। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ঘুরে ফিরে বারে বারে ফিরে আসে মন্দির চত্বরে। মন্দির চত্বরে এলেই দেখতে পায়, আর পালাতে গেলেই দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফিরে আসে মন্দির প্রাঙ্গণে। এইভাবে শেষ হয়ে আসে রাত্রি। গ্রামবাসীদের হাতে ধরা পড়ে চোর। মার খায় বেদম এবং মুক্তি পায় অবশেষে। ঐ চোর রাতভ'র যে কুলিপথ দিয়ে কানামাছির মতো ঘুরপাক খেয়েছিল পুনঃপুনঃ সেই কুলিপথটি 'কানাকুলি' নামে আজও সুবিদিত।

অলৌকিক ঘটনার পর সংক্ষেপে শোনাই মাতৃ-অঙ্গনে অনুষ্ঠিত 'সয়লা' উৎসবের কথা। **সয়লা উৎসব 'শারদীয়া উৎসব' নামেও সুপ্রসিদ্ধ। 'সই লো' থেকে হয়েছে 'সইলা', সইলা থেকে হয়েছে 'সয়লা'।** রাজ-রাজেশ্বরী দণ্ডেশ্বরী দেবীর এ এক অদ্ভুত বাসনা।

আমাদের আরাধ্যা দেব-দেবীরা যে আমাদের কত প্রিয়, কত আপনজন, কত অন্তরঙ্গ সে কথা স্পষ্টই বোঝা যায় সয়লা উৎসবের তাৎপর্যের মাধ্যমে। **ভক্ত যেমন ভগবানের খোঁজে পাগল, অনুরূপভাবে ভগবানেরও ভক্তের জন্য পাগল হতে বাধে না বিন্দুমাত্র।** দণ্ডেশ্বরী দেবীর সয়লা উৎসব যেন সেই সত্যকেই প্রতিপাদিত করে। স্বীয় মন্দিরের চার দেওয়ালের মাঝে বছরের পর বছর বন্ধ হয়ে একা একা থাকতে বোধ হয় ভাল লাগে না মায়ের। তাই মা দণ্ডেশ্বরী মনের মতো 'সই' খোঁজেন মনে মনে, আর পেয়ে গেলেই সেই মহিলাকে স্বপ্নাদেশে জানিয়ে দেন যে তিনি (দেবী) তার (গ্রামের কোন মহিলা) সাথে সই পাতাতে ইচ্ছুক এবং সই-এর প্রীত্যর্থে দেবী স্বয়ং ঘুমন্ত মহিলাটির মাথার কাছে ফুল ও বেলপাতা রেখে আসেন সকলের অগোচরে।

"যে রমণীর প্রতি মা'র হয় প্রত্যাদেশ
মা'র 'সই' সেই হয় এই ত নির্দেশ।"

(জাগ্রতাদেবী দণ্ডেশ্বরী, পৃঃ— ১৯)

স্বপ্নাদেশ ও মায়ের ফুল-বেলপাতা পাওয়ার পর ঐ মহিলা মায়ের স্বপ্নাদেশের কথা পুরোহিত ঠাকুরকে নিবেদন করেন নিভৃতে। পুরোহিত ঠাকুর নিবেদন করেন গ্রামবাসীদের। অতঃপর স্বপ্নাদিষ্ট মহিলার স্বপ্নাদেশের সত্যতা যাচাই করার উদ্দেশ্যে দুটি কাগজের টুকরোর একটিতে 'সয়লা হবে' অন্যটিতে 'সয়লা হবে না' লিখে মুড়ে অথবা গোল করে পাকিয়ে একটি অবোধ শিশুকে স্নান করিয়ে 'লটারী'র অনুকরণে **'ধর্মপত্র'** নামে অভিহিত ঐ দুটি কাগজের মধ্যে একটি কাগজ তিনবার তোলানো হয়। যদি 'সয়লা হবে' লেখা কাগজটি পর পর তিনবার উঠে আসে তাহলে ঐ মহিলার স্বপ্নাদেশ সত্য বলে ধরে নেওয়া হয় এবং গ্রামের মধ্যে সয়লা উৎসবের হাওয়া বইতে শুরু করে। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে এই উৎসব নির্দিষ্ট কোন সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত হয় না। অনুষ্ঠিত হয় মায়ের স্বপ্নাদেশের উপর ভিত্তি করেই। দণ্ডেশ্বরী দেবীর নাট-মন্দিরে প্রদত্ত নিম্নের ছকটি থেকে সয়লা উৎসব সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে।

শ্রীশ্রীদণ্ডেশ্বরী মাতার শুভ সয়লা উৎসবের বিবরণ

অনুষ্ঠিত উৎসবের তারিখ ও সন	মায়ের স্বপ্নাদিষ্ট সই-এর নাম	মায়ের সই-এর ঠিকানা
— ১৩৪০ বঙ্গাব্দ	দেবেন মাজীর মা	হান্দারচক
১৬ই কার্ত্তিক, ১৩৫০	চণ্ডী রুইদাসের স্ত্রী	লাউগ্রাম
১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৬২	পশুপতির মা	লাউগ্রাম
৯ই কার্ত্তিক, ১৩৬৬	যমুনা দুলে	মালিকপাড়া
১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৭৬	কমল পালের স্ত্রী	লাউগ্রাম
১৫ই কার্ত্তিক, ১৩৮৪	শোভাকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী	লাউগ্রাম
১৯শে কার্ত্তিক, ১৩৯২	কানাই মাঝির স্ত্রী	লাউগ্রাম
২১শে কার্ত্তিক, ১৪০১	রামপদ দের স্ত্রী	লাউগ্রাম

(বাংলা ১৩৪০ সালের পূর্বের ঘটনা অজ্ঞাত)

উপরোক্ত সয়লা উৎসবের মূল সুরটি কিন্তু বিশেষ অর্থবহ। স্বপ্নাদেশ পাওয়ার পর 'মায়ের সই' রূপে স্বীকৃত মহিলা তার পছন্দমতো কোন মহিলাকে নিজ সই রূপে মনোনীত করে মনোনীতা মহিলাকে পান, সুপারি, হরিদ্রা, খইচড়া, দধি, নোয়া, শাঁখা, সিন্দুর, আলতা প্রভৃতি মাঙ্গলিক দ্রব্য সম্ভারে একটি বরণডালা সাজিয়ে প্রত্যাশিত ভাবী-সই-এর হাতে তুলে দেয় 'গুয়া' নামে প্রচলিত ঐ বরণডালা। লক্ষণীয় বিষয় হল, শ্রাবণ মাসেই মায়ের স্বপ্নাদেশ হয় এবং শ্রাবণ-সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে শুরু হয় উক্ত 'গুয়া' চালা প্রথা। গ্রামের অন্যান্য মহিলা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তখন নিজ নিজ পছন্দমতো সব দিক থেকে সমপর্যায়ের মহিলার উদ্দেশ্যে গুয়া পাঠান। গুয়া প্রাপ্ত মহিলাগণ তখন উক্ত গুয়াতে আরও কিছু ফল-মূল এবং মাঙ্গলিক দ্রব্য প্রদান করে নতুন বান্ধবীর হাতে ফেরত দিয়ে যান সেই 'গুয়া'। যদি ফিরিয়ে না দেন তাহলে বুঝতে হবে যে, যাঁর উদ্দেশ্যে গুয়া প্রেরিত হয়েছিল সেই ব্যক্তির 'গুয়া-প্রেরক' মহিলার সাথে সই পাতানোর ইচ্ছে নেই। অবশ্য এরকম ঘটনা ঘটে না সচরাচর। অনন্তর গুয়া ফেরৎ দিতে আসা মহিলাকে গুয়া-প্রেরক মহিলা সুমধুর সম্ভাষণ, শিষ্ট ব্যবহার, হলুদ তেল আবাটা প্রভৃতি মাখিয়ে ফল-মূল মিষ্টান্নাদি উপহার দিয়ে তাঁকে বরণ করেন সাদরে। এইভাবে দুই নারীর মধ্যে গড়ে ওঠে হৃদ্যতা ও মিতালী।

ভাদ্র, আশ্বিন এই দু'মাস ধরে গ্রামের মহিলাদের মধ্যে চলতে থাকে 'গুয়া' চালাচালি। রচিত হয় মহামিলন ক্ষেত্র। তারপর কার্তিক মাসের একটি শুভ তিথিযোগে উৎসব সমাপ্তির দিন ঘোষণা করা হয়। কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠেন গ্রামের সকলেই। খাদ্যবস্তু ও নতুন পোশাক-আশাক সংগ্রহ, আত্মীয়-স্বজন আনয়ন, বন্ধু-বান্ধব নিমন্ত্রণ ছাড়াও দ্বারে দ্বারে আম্রপল্লব টাঙানো, পতাকা-তোরণ নির্মাণ, চন্দ্রাতপ খাটানো এবং মণ্ডপ সজ্জার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন গ্রামবাসীগণ। বেজে ওঠে বাদ্যযন্ত্র। ঠিক তখনই—

"তাড়াতাড়ি কাজ সারি যত নরনারী
সাজিয়া বিবিধ সাজে হুলাহুলি করি।
রমণীরা ডালা লয়ে পুরুষেরা মালা
সমবেত হয় তথা করিয়া জটলা।
সকলেরই মুখে হাসি আনন্দ-উচ্ছ্বাস
কত প্রীতি আলাপন কত রসভাষ।"
(জাগ্রতাদেবী দণ্ডেশ্বরী, পৃঃ— ২০)

দর্শক ও ভক্ত সমাগমে তিল ধারণের স্থান থাকে না মণ্ডপে এবং মেলা প্রাঙ্গণে। মনসা মঙ্গলের গান গেয়ে শুরু হয় আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান। তারপর গ্রামবাসীদের মধ্যে ডালা বদল ও কোলাকুলির মাধ্যমে শুরু হয় হৃদয় বদলের পালা।

"কি-মনোজ্ঞ সেই মহামিলনের মেলা
রমণীরা 'সই এ সই এ' বদলায় ডালা।
পুরুষেরা বন্ধু সহ কোলাকুলি করে
মালা ও চন্দন গলে প্রদানে সাদরে।
এরূপে সমাপ্ত করি শারদ উৎসব
দেবীরে প্রণাম করি গৃহে ফিরি সব।
(জাগ্রতাদেবী দণ্ডেশ্বরী, পৃঃ— ২১)

সুতরাং সংক্ষেপে বলা যায় সয়লা উৎসব হল নারীতে নারীতে, পুরুষে পুরুষে তথা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নির্বিশেষে মানুষের সাথে মানুষের মিলন উৎসব অর্থাৎ আধুনিক ভাষায় মানব-বন্ধন উৎসব। তাই বলতে ইচ্ছে করে বর্তমানে ব্যক্তি-স্বার্থ, হিংসা, খুনোখুনি, রাহাজানি আর নোংরা রাজনীতির প্রেক্ষাপটে দূষিত মানব মনে এরকম একটি উৎসব কয়েকদিনের জন্য হলেও প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালবাসার বন্যা বইয়ে দেয় প্রাণে প্রাণে। দেবী দণ্ডেশ্বরীর সয়লা উৎসবের আমেজে লাউগ্রামে রচিত হয় আনন্দধাম। তাইতো এই উৎসব বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

মা দণ্ডেশ্বরীর অপার মহিমা। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ছাড়াও তাঁর কৃপায় দুরারোগ্য সব রোগ নিরাময় হয় চিরতরে। কুকুর, শৃগাল ও সর্প দংশনের বিষ নির্বিষ হয় মায়ের কৃপায়। মায়ের মন্ত্রপূত বালা পরে বদ্ধ উন্মাদ ও পাগলের পাগলামি যায় টুটে। খোস, পাঁচড়া, দাদ, চুলকানিতে মায়ের 'বিষতৈল' ব্যবহারে মহৌষধের মতো কাজ হয়। রোগারোগ্য হয় অচিরে। রোগারোগ্য হয় চিরতরে।

"এক সময় দেবী'র পূজা চলতো মল্লরাজাদের আনুকূল্যে। এ জন্যে তাঁরা 'এক শো' বিঘে সম্পত্তিও দিয়েছিলেন। পরে মল্লরাজ্য বর্ধমানরাজ এস্টেট্‌ভুক্ত হয়। তারপর জমিদারী বিলোপ হয়েছে। সম্পত্তিও নষ্ট হয়েছে নানাভাবে। বর্তমান পূজারীদের হাতে যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তা দিয়েই চলছে দেবীর পূজা।" (রাঢ়ের গ্রামদেবতা, পৃঃ— ১৮০)

রাজা জয়মল্লের কথা বলতে গিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবেই এসে গিয়েছিল মা দণ্ডেশ্বরীর কথা। মায়ের কথায় ছেদ টেনে এক্ষণে আমরা আবার ফিরে যাব রাজা জয়মল্লের রাজকাহিনীতে। দেবী দণ্ডেশ্বরীকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠা করা ছাড়াও রাজা জয়মল্লের আর একটি উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল তিনি নিজ বংশ-পরিচয় অবগত হয়ে সুদূর জয়পুর থেকে আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে আসেন এবং রাজধানী প্রদ্যুম্নপুরের দক্ষিণ দিকে তাঁদের বসবাসের স্থায়ী ব্যবস্থা করেন। স্বীয় পূর্বপুরুষদের জন্মস্থান সুদূর জয়পুরের স্মৃতিকে অক্ষয় করে রাখার অভিমানসে গ্রামটির নাম রাখেন জয়পুর। বিষ্ণুপুর কোতুলপুর বাসরুটের প্রায় মধ্যস্থলে জয়পুর রয়েছে আজও, কিন্তু যাঁদের জন্য জন্ম হয়েছিল এই নতুন গ্রামটির তাঁদের কোন খোঁজ খবর বা অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায় না আজ।

মাত্র বছর দশেক রাজত্ব করে ৭২০ খ্রীষ্টাব্দে মারা যান তিনি। অতঃপর **বেণু মল্ল** মল্লভূমের রাজসিংহাসনে আসীন হন এবং রাজত্ব করেন গতানুগতিকভাবে। কথিত আছে ৪র্থ রাজা **কিনু মল্ল** ৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রহাস গ্রামের নৃপতি ইন্দ্রহাসকে পরাজিত করে ইন্দ্রহাস অঞ্চল জয় করে নেন। ইন্দ্রহাস বর্তমানে ইন্দাস নামে পরিচিত। কিনু মল্লের পর **ইন্দ্র মল্ল** রাজা হন। ষষ্ঠ রাজা **কানু মল্ল** কাকাটিয়া বা কাকটিয়া রাজ্য (বর্তমান পাত্রসায়ের থানা) জয় করে স্বীয় রাজ্য বিস্তার করেন। তারপর সপ্তম রাজা **ধ মল্ল** সিংহাসনে বসেন। ধ মল্লের পর অষ্টম রাজা **শূর মল্ল** রাজা হন। তিনি বর্তমান মেদিনীপুর জেলার 'বগড়ী' রাজ্যের রাজাকে পরাজিত করে বগড়ী রাজ্য মল্লরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর 'শূর' নামটির সার্থকতার পরিচয় দেন। রাজা শূরমল্লের পর **কনক মল্ল**, **কন্দর্প মল্ল** এবং **সনাতন মল্ল**ও গত হন গতানুগতিক গতিতে। অনন্তর আসেন **খড়গ মল্ল**। খড়্গ মল্ল একের পর এক যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে মল্লভূমের সীমানা বিস্তার করেন বর্তমান 'সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে'র উল্লেখযোগ্য জংশন খড়্গপুর অবধি। খড়গপুর খড়গমল্লের স্মৃতি বহন করছে অদ্যাবধি। খড়্গ মল্লের পর রাজা হন **দুর্জন মল্ল**। দুর্জন মল্ল সত্য

সত্যই দুর্জন ছিলেন কিনা এ বিষয়ে ইতিহাসে কোন নজীর নেই। **দুর্জন মল্ল** নাম শুনে প্রাণে যে ভীতির সঞ্চার হয় কার্যক্ষেত্রে তার প্রমাণ মেলে না বিন্দুমাত্র।

দুর্জন মল্লের পর রাজসিংহাসন অলংকৃত করেন **যাদব মল্ল**। যাদব মল্ল বিষ্ণুপুরের পশ্চিমে যাদবনগর নামে একটি গ্রাম এবং ঐ অঞ্চলে তৈরী করেন একটি দুর্গ। কালের প্রকোপে দুর্গটি নিশ্চিহ্ন হলেও যাদব মল্লের স্মৃতি বহনকারী যাদবনগর গ্রাম অদ্যাপি বিদ্যমান স্বমহিমায়।

যাদব মল্লের পর **জগন্নাথ মল্ল** রাজা হন। তিনি সিহড়ে শান্তিনাথ শিব প্রতিষ্ঠা করেন এবং শান্তিনাথ শিবের নিত্যপূজা ও উৎসবাদির জন্য সিহড় মৌজা দান করেন। অতঃপর **বিরাট মল্ল, মাধব মল্ল, দুর্গাদাস মল্ল** মল্লভূমের রাজ-সিংহাসন অলংকৃত করে রাজবংশের ধারাটিকে রাখেন অব্যাহত। প্রদ্যুম্নপুরের রাজ-সিংহাসনে আদি মল্ল রঘুনাথ থেকে শুরু করে মল্লভূমের অষ্টাদশ রাজা দুর্গাদাস মল্লের রাজত্ব কালের অবসান হয় ৯৯৩/৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। **অতঃপর ৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ঊনবিংশতিতম রাজা জগৎ মল্লের রাজত্বকালে মল্লভূমের রাজধানী প্রদ্যুম্নপুর থেকে স্থানান্তরিত হয় বিষ্ণুপুরে।** কিন্তু কেন এই স্থানান্তর? সে অনেক কথা। সময় সুযোগ মতো আমরা আবার ফিরে আসব বিষ্ণুপুরের ইতিহাসের কথায়। লালবাঁধ পরিক্রমা করতে করতে, বিষ্ণুপুরের রাজকাহিনী শুনতে শুনতে আমরা এসে পড়েছি এই বাঁধেরই উত্তর পাড়ে অবস্থিত 'শ্রীশ্রীবিজয় যোগাশ্রম'-এর পুণ্যাঙ্গনে। এখন দেখুন, **'শ্রীশ্রীবিজয় যোগাশ্রম'**। শুনুন, মহাসাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নামে উৎসর্গীকৃত এই আশ্রমটির কথা।

অধ্যায়-১১

শ্রীশ্রীবিজয় যোগাশ্রম

গোস্বামী প্রভুর ভাবাদর্শে এবং সাধনাদর্শে উদ্বুদ্ধ এই আশ্রমটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত। আশ্রমের দক্ষিণে লালবাঁধের আলো ঝিলমিল থৈ থৈ জলরাশির উপর দিয়ে সতত বয়ে আসছে দিগন্ত বিস্তৃত জঙ্গলের জংলী ফুলের সুগন্ধি, স্নিগ্ধ বাতাস; উত্তরে প্রায় মজে যাওয়া শ্যামবাঁধের কোলে বিস্তীর্ণ মাঠের সবুজ শস্যক্ষেত্রের শ্যামলিমা। পূর্বে আদিগন্ত বনানী আর পশ্চিমে মা সর্বমঙ্গলার মঙ্গলচরণ ছুঁয়ে শহরের সূচনা। শহর সংলগ্ন অথচ একান্ত নির্জন শান্ত পরিবেশে অবস্থিত এতাদৃশ আশ্রমটি সত্যই যেন একটি শান্তিসদন তথা ধর্মক্ষেত্র কিংবা পূত-পবিত্র-তীর্থস্থান।

এক্ষণে যাঁর নামে এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই মহাসাধক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনীর উপর আলোকপাত করা যাক সংক্ষেপে। ইং ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের (১২৫৮ বঙ্গাব্দ) ঝুলন পূর্ণিমার শুভ-সন্ধ্যায় গঙ্গাকূলে শ্রীশ্রীঅদ্বৈতবংশে পরম বৈষ্ণব আনন্দ কিশোর গোস্বামী (মতান্তরে আনন্দ চন্দ্র গোস্বামী) ও স্বর্ণময়ী দেবীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ।

"গোঁড়া বৈষ্ণব-বংশে জন্ম বলেই বিজয়কৃষ্ণ শৈশব, কৈশোরে খাঁটি বৈষ্ণবভাবেই প্রতিপালিত হন ; কিন্তু তাঁর চির-বিদ্রোহী অন্তর যৌবনের প্রারম্ভেই দেশাচার এবং জাতিভেদের বিরুদ্ধে এমন ভীষণ প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল যে, তিনি উপবীত ত্যাগ ক'রে

ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করলেন। মেডিকেল কলেজের শেষ পরীক্ষা না দিয়েই ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক হয়ে বহুস্থানে ঘুরে বেড়ালেন। কিন্তু এতেও আত্মতৃপ্ত হতে পারলেন না কুসংস্কার-বিদ্রোহী বিজয়কৃষ্ণ।" ব্রাহ্মসমাজের উপর আস্থা হারাতে বসেছেন এবং পৌত্তলিকতাকেও মেনে নিতে পারছেন না সরল অন্তঃকরণে। মনের এই বিক্ষিপ্ত অবস্থায় তাঁদের কুলদেবতা শ্যামসুন্দর জীউ শয়নে স্বপনে তাঁকে দেখা দেন বারংবার— কখনো মিষ্টি-মধুর হাসি মাখা মুখে, কখনো সর্বাঙ্গে উজ্জ্বল জ্যোতি মেখে জ্যোতির্ময় রূপে, কখনো বা পূজার সময় তাঁকে খাবার জল দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ করে, কখনো বা তাঁর কাছে সোনার চূড়া পরার ইচ্ছা প্রকাশ করে। নিরাকার ব্রহ্মে যিনি বিশ্বাসী, একেশ্বরবাদে যিনি মন প্রাণ সঁপে দিয়েছেন— পৌত্তলিকতা বিরোধী সেই মানুষটি এবার শ্যামসুন্দরের পাল্লায় পড়ে, গৃহদেবতা শ্যামসুন্দরের নির্দেশ মতোই তাঁর কাকিমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে গড়িয়ে দেন সোনার মুকুট। তারপর এমনটা হল যে শ্যামসুন্দরের সাথে বিজয়কৃষ্ণের কথোপকথন পর্যন্ত শুরু হয়। তথাপি পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস করতে চান না বিজয়কৃষ্ণ। মনের এরকম দ্বান্দ্বিক অবস্থায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে পরিচয় হয় তাঁর। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন—ঈশ্বর দর্শন সম্ভব। তিনি সাকার এবং নিরাকারও বটেন। যে যেরূপে চায়, সে তেমনটি পায়। এর জন্য তীব্র বৈরাগ্য চাই। রামকৃষ্ণের মত ও পথ তাঁকে দোলা দিল। পৌত্তলিকতার প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন তিনি। ভক্তিরসে আপ্লুত হল হৃদয়। উদ্‌ভ্রান্তের মতো হয়ে পড়েন তিনি। সতী-সাধ্বী-স্ত্রী যোগমায়া দেবী, ঘর-সংসার সব পিছুটানকে উপেক্ষা করে বেরিয়ে পড়লেন পরিব্রজ্যায়—সদ্‌গুরুর খোঁজে।

"সুগভীর অরণ্য, সুউচ্চ পর্বত, সুদুস্তর মরু—কিছুই তিনি বাদ দিলেন না তাঁর পরিক্রমায়। অবশেষে এই বিপ্লবী ধর্মবীরের জীবনে সহসা দেখা দিল সেই আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্ত। গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে নানকপন্থী মহাযোগী ব্রহ্মানন্দস্বামী তাঁকে দীক্ষিত করলেন যোগধর্মে।" দীক্ষান্তে গভীর সাধনায় মগ্ন হলেন তিনি। অতঃপর আনুষ্ঠানিকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণের বাসনা জাগে মনে। কাশীতে হরিহরানন্দ সরস্বতী তাঁকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষা দেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি ত্যাগব্রত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের সে ইচ্ছা পূর্ণ হল না। গুরুদেব ব্রহ্মানন্দ তাঁকে সংসারে থেকে সমাজের সেবামূলক কাজ করাতে ইচ্ছুক। সুতরাং কাশী ত্যাগ করে আকাশগঙ্গায় ফিরে গিয়ে আবার কঠোর সাধনায় মগ্ন হলেন তিনি। এ সময় তাঁর পূর্বজন্মের সাধন-স্মৃতি ভেসে উঠল। তাঁর জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হল। এখানে অবস্থানকালে তিনি যোগসাধনার উদ্দেশ্যে নাথসম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধযোগী গম্ভীরানন্দজী'র কাছে যোগপদ্ধতি শিক্ষা করেন এবং যোগসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। চোখে-মুখে দিব্যজ্যোতি প্রকাশিত হল। অনন্তর গুরুদেবের অনুমতিক্রমে ফিরে আসেন কোলকাতায়। কোলকাতার **'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে'** তিনি বিশেষ সমাদৃত হলেন। পূর্ববঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার ও প্রসারের গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করে চলে যান ঢাকা। সেখানে গিয়ে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ফাঁকে ফাঁকে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নয়নে সচেষ্ট হন। সগুণ ধ্যানের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিল সর্বাধিক। নারায়ণকে পরম ব্রহ্মরূপে ধ্যান করতে ভাল লাগত। নিরবচ্ছিন্ন সাধনার পুণ্য লগ্নে এসে গেল সিদ্ধি। অনন্ত জ্যোতি বিস্তার করে চতুর্ভুজ নারায়ণ আবির্ভূত হলেন সাধকের সম্মুখে। ব্রহ্মানন্দে পুলকিত বিজয়কৃষ্ণ সেই জ্যোতিঃপ্রভা ও অপরিমেয় তেজ সহ্য করতে না পেরে মূর্ছিত হলেন। এমন সময় তাঁর গুরুদেব ব্রহ্মানন্দ সেখানে আবির্ভূত হয়ে শিষ্যকে বুকে তুলে নেন। "সস্নেহে গায়ে মাথায়

হাত বুলিয়ে বললেন, 'বিজয়, আমি এরই জন্য এতদিন অধীর প্রতীক্ষায় ছিলাম। আজ তুমি নিজেকে তৈরী করতে সক্ষম হয়েছ। অর্জন করেছ দীক্ষাদানের ক্ষমতা। এবার থেকে তুমি ঈশ্বর-সন্ধানীদের দীক্ষা দিতে পার।'' ব্রাহ্মসমাজের একনিষ্ঠ কর্মী নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দীক্ষা নিলেন। এরপর দীক্ষালাভের যোগ্য ক্ষেত্র বুঝে তিনি জাতি বা শ্রেণী নির্বিশেষে দীক্ষা দিতেন অকাতরে। স্বীয় পত্নী যোগমায়া দেবী এবং পুত্র যোগজীবন গোস্বামীও তাঁর দীক্ষিত মন্ত্রশিষ্য।

স্বয়ং লোকনাথ বাবাও বিজয়কৃষ্ণের সাধনৈশ্বর্যে মুগ্ধ এবং অভিভূত হন। ''হরিদ্বারের কুম্ভমেলায় বিজয়কৃষ্ণের ঐ সাধন-ঐশ্বর্য হিমালয়ের সমবেত যোগীদেরও বিস্মিত করেছিল। বহু প্রাচীন সাধুও শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের কাছে গোপনে পঞ্চম পুরুষার্থলাভের যোগদীক্ষা গ্রহণ করলেন।

ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম-বিপ্লবী বিজয়কৃষ্ণ সদ্‌গুরুরূপে পুরীধামেও অসাধারণ জীবনজ্যোতি বিকিরণ করতে লাগলেন। স্বভাবতই এতে ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠলেন ধার্মিকের ছদ্মবেশী এক অপকর্মার দল। তাঁকে শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মহাপ্রসাদের নাম ক'রে মহাবিষ দেওয়া হল। বিজয়কৃষ্ণ সব বুঝতে পারলেন এবং বিশ্বলোকে তাঁর কালাবসানের ঐশ্বরিক ইঙ্গিতটিও বুঝতে পারলেন। জিহ্বায় স্পর্শমাত্রই যে বিষ মুহূর্তে প্রাণঘাতী হয়ে যায়— বিজয়কৃষ্ণ সহাস্যে তা খেয়ে ফেলেও বেশ কিছুদিন বেঁচে রইলেন।

বিজয়কৃষ্ণ দীন, দুঃখী, দরিদ্র, আতুর, অনাথ, কানা, খোঁড়া, অভুক্ত প্রভৃতি ব্যক্তিদের অকাতরে অন্ন বিতরণ করতেন। তাঁর অলৌকিক বিভূতির দ্বারা সকলেরই উপকার সাধনে সদা এগিয়ে আসতেন।

অবশেষে ১৩০৬ সালের ২২ জ্যৈষ্ঠ সকালে যথাবিধি পূজাপাঠ সাঙ্গ ক'রে শিষ্যদের যথাযথ নির্দেশাদি দিয়ে বিষকে উপলক্ষ ক'রে স্বেচ্ছায় ইহলোকের লীলা সম্বরণ করলেন মহাযোগী।'' (শ্রীশ্রীভক্তমাল, পৃঃ— ৬৩৪)

বিভিন্ন পুস্তকের উদ্ধৃতি সহযোগে যোগীরাজ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবনী শোনালাম সংক্ষেপে। এবার ফিরে আসি আশ্রম প্রসঙ্গে।

আগেই বলেছি শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর পুত্র ও দীক্ষিত শিষ্য হলেন শ্রীশ্রীযোগজীবন গোস্বামী। শ্রীশ্রীযোগজীবন গোস্বামীর মন্ত্র-শিষ্য শ্রীশ্রীগুণদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহারাজ ১৯৫১ সালে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর প্রত্যক্ষ নির্দেশে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। **আশ্রমটি 'নামব্রহ্ম'** দেবতায় অর্পিত। নামব্রহ্ম বলতে বোঝায়—

''হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।'' এই মহামন্ত্র।

উক্ত নাম-ব্রহ্মের নামেই মন্দিরের সেবা, পূজা, ভোগ-রাগ প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। গুরু পরম্পরায় গুরুসেবারও বিধি ব্যবস্থা আছে এখানে। **আশ্রমস্থ নবরত্ন মন্দিরটিতে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর তৈলচিত্র ছাড়াও ঠাকুর বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহারাজ, শ্রীমৎ যোগজীবন গোস্বামী প্রভু, মাতা ঠাকুরাণী শ্রীশ্রীযোগমায়া দেবী, মাতা ঠাকুরাণী শ্রীশ্রীগিরিবালা দেবী, আশ্রম প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীগুণদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহারাজ ও তাঁর পত্নী গুরুমাতা শ্রীশ্রীঅমিয় বালা দেবীর ফটো-বিগ্রহ প্রত্যহ যথাযথ নিয়মানুসারে পূজিত হয়ে আসছে।** মঙ্গল আরতি, পূজা, বাল্যভোগ, অন্নভোগ ও রাত্রিতে শীতলভোগ

দেওয়ার ব্যবস্থাও প্রচলিত রয়েছে।

এই আশ্রমের সদ্যঃপ্রয়াত আচার্য *বীরেন্দ্রনাথ দেব তাঁর লেখা 'আশ্রম প্রসঙ্গ' পুস্তকটিতে এই আশ্রমে সকলকে আন্তরিক আমন্ত্রণ জানিয়ে লিখেছেন, "আমাদের ঠাকুর শ্রীমৎ গুণদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মহারাজের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অধীন ইছাপুর নিকটবর্তী পশ্চিমপাড়া গ্রামে এক পবিত্র সাধু পরিবারে আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ঘটনাচক্রে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুর শহরে লালবাঁধ নামীয় ঐতিহাসিক জলাশয়ের উত্তর তীরে তদীয় পিতার (শ্রীমৎ বরদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়) অনুরূপ শ্রীশ্রীবিজয় যোগাশ্রম নামে একটি আশ্রম শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর ইচ্ছায় ও নির্দেশে ইং ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঢাকা গেণ্ডারিয়া আশ্রমে প্রচলিত নিয়মকানুন সেবা পূজা ভোগ রাগ প্রভৃতির সেই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া যাবতীয় অনুষ্ঠান আচরণ প্রচলন করাই ছিল আমাদের ঠাকুরের মুখ্য উদ্দেশ্য।

ঠাকুরের দেহস্থিতিকালে আশ্রম যেরূপ প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ছিল, বাৎসল্য, সখ্য, দাস্য ও মধুর রসের যে প্রস্রবণের প্লাবন আসিয়াছিল, বিচিত্র মহাভাবের যে অগ্ন্যুৎপাত ঘটিয়াছিল, সেই ত্রিকালজ্ঞ মহাভাগের অন্তর্ধানের পর সেই প্রাণচাঞ্চল্য রসধারা, মহাভারত প্রভৃতি বহুলাংশে অন্তর্হিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। তবুও যেটুকু অবশিষ্ট আছে তাহা শান্তিকামী মানুষের তথা ভক্তমণ্ডলীর অশান্ত প্রাণকে শান্ত করিতে, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস জাগাইতে, পবিত্রতায় অন্তঃকরণ পূর্ণ করিতে যথেষ্ট। তাই আমরা সকলকেই সাদর আমন্ত্রণ জানাই—আপনারা আসুন, দেখুন, পরীক্ষা করুন।" (আশ্রম প্রসঙ্গ, পৃঃ—৩৮)

দুঃখের ও অনুতাপের বিষয় আজ আর আচার্য বীরেন্দ্রনাথ দেব আমাদের মধ্যে নেই। রয়েছে তাঁর দিব্য জীবনের পুণ্যস্মৃতি। আর রয়েছে তাঁর লেখা 'শান্তির সন্ধানে' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), 'ইতিহাসের দর্পণে সদ্‌গুরু শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী' (তিন খণ্ডে সম্পূর্ণ), 'জীবন পাথেয় দোঁহাবলী' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), 'আচার্য গুণদাকান্তজীর জীবন পরিক্রমা', 'শ্রীশ্রীব্রজধাম পরিক্রমা', 'ছোটদের ছক্কা', 'গানের খাতা', 'ব্যক্তিত্ব' (প্রকাশ ও বিকাশ), 'শিশু ও ছোটদের শিক্ষায় পিতামাতা বা অভিভাবক', 'কথায় শিল্প', 'আশ্রম প্রসঙ্গ', 'A Practical Guide to Life-Divine' প্রভৃতি গ্রন্থরাজী। তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে আশ্রমের পশ্চিম দিকের প্রবেশদ্বারের সন্নিকটে নির্মিত হয়েছে সুদৃশ্য এক সমাধি মন্দির। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, পূর্ব দিকের প্রবেশদ্বারের নিকটে রয়েছে আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীশ্রীগুণদাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাধি।

এতাদৃশ একটি মনোরম আশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিষ্ণুপুর মোক্তার-বারের প্রাক্তন সভাপতি *সতীশচন্দ্র সরকার, প্রখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী *দিগ্‌বসন বন্দ্যোপাধ্যায়, উকিল *বীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীনিত্যানন্দ দে প্রমুখ ব্যক্তিগণের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি।

সত্য, ধর্ম এবং গুরুতত্ত্বের উপাদানে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীবিজয় যোগাশ্রমের প্রাণপ্রদীপ গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণে সশ্রদ্ধ প্রণামান্তে আমরা এখন সমাগত হব মা সর্বমঙ্গলার স্নেহাঙ্গনে।

অধ্যায়-১২

মা সর্বমঙ্গলা

আজ থেকে প্রায় একশ পনের, কুড়ি বছর আগেরও কোন এক সময়ের কথা। বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বর পল্লীর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ রামরূপ ভট্টাচার্য লালবাঁধে স্নান করতে গেছেন। স্নান-ঘাটের পথের ধারে ইতস্ততঃ গজিয়ে উঠেছে গাছ-আগাছা আর অসংখ্য লতাগুল্ম। সেদিন হঠাৎ ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে থাকা কি যেন একটা জিনিস নজর কাড়ে ব্রাহ্মণের। আপন মনে বলে ওঠেন, "আরে! এ যে দেখছি কোন দেবীমূর্তির মুখমণ্ডল।" স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অনেক কথাই মনে পড়ে যায় রামরূপ ভট্টাচার্যের। বেশ কিছুদিন আগে রাজকুলদেবী বিষ্ণুপুরেশ্বরী মা মৃন্ময়ীর মুণ্ড ভেঙে নিয়ে যায় জনৈক পাগলী। হৈ চৈ পড়ে যায় শহর জুড়ে। অনেক অনুসন্ধানের পরও পাওয়া যায়নি কিন্তু সেই ছিন্নমুণ্ড। অগত্যায় নতুন কলেবরে প্রতিষ্ঠিতা হন মা মৃন্ময়ী।

ভট্টাচার্য মশায় ততক্ষণে ঝোপঝাড় থেকে হাতে তুলে নিয়েছেন মায়ের সেই ছিন্নমস্তক। ভাবতে থাকেন—তবে কি এটিই মা মৃন্ময়ীর মুখমণ্ডল? চাপা স্বভাবের ঈশ্বরনিষ্ঠ মানুষ ভট্টাচার্য মশায়। সুতরাং কাউকে কিছু না বলে লালবাঁধের পশ্চিম দিকের স্নান-ঘাটের নিকটবর্তী একটি বেল গাছের নীচে দেবীর মুখমণ্ডলটিকে স্থাপন করে একটি সরা ঢাকা দিয়ে রেখে দেন এবং প্রতিদিন স্নানান্তে একটু করে ফুল-জল দিয়ে পুজো করতে থাকেন নিয়মিত। পূজান্তে আবার সরা চাপা দিয়ে বাড়ি ফিরতেন।

ভট্টাচার্য মশায় শুধু যে ঈশ্বর-নিষ্ঠ ছিলেন তাই নয়; তিনি ছিলেন আগাগোড়া সাধক প্রকৃতির মানুষ। উনাকে বেল গাছের নীচে পূজা করতে দেখে অনেক আর্তভক্ত মনস্কামনা পূরণার্থে হাতি-ঘোড়া মানসিক করতেন। কালক্রমে স্তূপাকৃতিতে জমে যায় অসংখ্য অগণিত হাতি-ঘোড়া। ঢাকা পড়ে যায় মায়ের ছিন্নমুণ্ড। ইতিমধ্যে দেবীস্থানের উপর একটি করুগেটেড্ টিনের আচ্ছাদনও নির্মিত হয়। শোনা যায় পরবর্তীকালে রামরূপ ভট্টাচার্য ঐখানেই একটি পর্ণ-কুটির নির্মাণ করে মাতৃপূজা ও সাধন-ভজন নিয়েই দিনাতিপাত করতেন। দিন চলত গতানুগতিকভাবে। এমন সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিষ্ণুপুরে এসেছেন একটি মামলাতে সাক্ষী দেওয়ার জন্য। সেই অবকাশে তিনি বিষ্ণুপুর পরিভ্রমণ করেন। **এ প্রসঙ্গে শ্রীম-কথিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পুস্তকের প্রথম ভাগের ৭৮ পৃষ্ঠায় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, "আমি একবার বিষ্ণুপুরে গিছিলুম। রাজার বেশ সব ঠাকুরবাড়ি আছে। সেখানে ভগবতীর মূর্তি আছে, নাম মৃন্ময়ী। ঠাকুরবাড়ির কাছে বড় দীঘি। কৃষ্ণবাঁধ। লালবাঁধ। আচ্ছা, দীঘিতে আবাটার (মাথা ঘসার) গন্ধ পেলুম কেন বল দেখি? আমি ত জানতুম না যে, মেয়েরা মৃন্ময়ীদর্শনের সময় আবাটা তাঁকে দেয়। আর দীঘির কাছে আমার ভাব সমাধি হ'ল, তখন বিগ্রহ দেখি নাই। আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃন্ময়ী দর্শন হ'ল—কোমর পর্যন্ত।"**

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দীঘির কাছে ভাবাবেশে মা মৃন্ময়ীর আবক্ষমূর্তি দর্শনের ঘটনাটি লোকমুখে প্রচারিত হয়ে যাওয়ার পরই মায়ের ছিন্নমুণ্ড সংস্থাপন করে নির্মিত হয় একটি আবক্ষমূর্তি এবং বিগ্রহটি মঙ্গলচণ্ডী নামে পূজিতা হন। পরবর্তীকালে উক্ত মাতৃমূর্তি 'মঙ্গলচণ্ডী' থেকে 'সর্বমঙ্গলা' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিষ্ণুপুরে আগমন, ভ্রমণ ও মা মৃন্ময়ী এবং সর্বমঙ্গলা প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ বিরচিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' পুস্তকের ৫৯১ পৃষ্ঠাতে সর্বমঙ্গলা প্রসঙ্গে ভিন্ন কথা বলা হয়েছে, "মদনমোহন ভিন্ন রাজাদের প্রতিষ্ঠিত ৺মৃন্ময়ী নাম্নী **এক বহু প্রাচীন দেবীমূর্তিও ছিলেন। লোকে বলিত ৺মৃন্ময়ী দেবী বড় জাগ্রতা। রাজবংশীয়দের ভগ্নদশায় ঐ মূর্তি এক সময়ে এক পাগলিনী কর্তৃক ভগ্ন হয়। রাজবংশীয়েরা সেজন্য পূর্বমূর্তির মতো অন্য একটি নতুন মূর্তির পুনঃস্থাপনা করেন।**

ঠাকুর এখানকার অপর দেবস্থান সকল দেখিয়া ৺মৃন্ময়ী দেবীকে দর্শন করিতে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে একস্থানে ভাবাবেশে ৺মৃন্ময়ীর মুখখানি দেখিতে পাইলেন। মন্দিরে যাইয়া নবপ্রতিষ্ঠিত মূর্তিটি দেখিবার কালে দেখিলেন, ঐ মূর্তিটি তাঁহার ভাবকালে দৃষ্ট মূর্তিটির সদৃশ নহে। এইরূপ হইবার কারণ কিছুই বুঝিলেন না। পরে অনুসন্ধানে জানা গেল, বাস্তবিকই নূতন মূর্তিটি পুরাতন মূর্তিটির মতো হয় নাই। নূতন মূর্তির কারিগর নিজ গুণপনা দেখাইবার জন্য উহার মুখখানি বাস্তবিক অন্য ভাবেই গড়িয়াছে এবং **পুরাতন মূর্তিটির ভগ্ন মুখখানি এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক সযত্নে নিজালয়ে রক্ষিত হইতেছে। ইহার কিছুকাল পরে ঐ ভক্তিনিষ্ঠাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ঐ মুখখানি সংযোজিত করিয়া অন্য একটি মূর্তি গড়াইয়া লাল-বাঁধ দীঘির পার্শ্বে এক রমণীয় প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং উহার নিত্যপূজাদি করিতে লাগিলেন।"**

অনুসন্ধানে জানা যায় উক্ত ব্রাহ্মণই হলেন রামরূপ ভট্টাচার্য। রামরূপ ভট্টাচার্য গত হয়েছেন, লালবাঁধ দীঘি তখন কিনে নিয়েছেন বিষ্ণুপুরের তৎকালীন প্রখ্যাত ব্যবসায়ী ৺রামনলিনী চক্রবর্তী। লালবাঁধের মালিকানার সূত্র ধরে লালবাঁধ সংলগ্ন মা সর্বমঙ্গলা দেবীর সেবা-পূজা ভোগরাগের দায় দায়িত্বও গ্রহণ করেন তিনি এবং বিষ্ণুপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম ময়নাপুরের জনৈক ব্রাহ্মণকে বিষ্ণুপুরে আনিয়ে দেবীর নিত্যপূজার জন্য নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ আশ্রম স্থাপিত হয়।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে **স্বামী গিরিশানন্দ মহারাজ** নামে জনৈক জ্ঞানীগুণী সাধু-মহাত্মা বিষ্ণুপুর রামকৃষ্ণ আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত সন্ন্যাসী হিসেবে বিষ্ণুপুরে আসেন এবং যেহেতু রামকৃষ্ণ আশ্রম এবং সর্বমঙ্গলা মাতার পরিচালকবর্গ ছিলেন প্রায় একই ব্যক্তিবর্গ সেজন্য মা সর্বমঙ্গলার দেখ্‌ভালের ব্যাপারটাও মৌখিকভাবে তাঁর উপর অর্পিত হয়। তিনি তো মা সর্বমঙ্গলার আবক্ষমূর্তি দেখে স্তম্ভিত। কারণ আবক্ষমূর্তি পূর্ণাঙ্গ মূর্তি নয়; এবং এরূপ অসম্পূর্ণ খণ্ডমূর্তি পূজা করা বিধেয় নয়। এজন্য তিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে মায়ের পূর্ণাঙ্গ মূর্তি নির্মাণ করে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার পরামর্শ দেন। **সাধু-মহারাজের উপদেশ মতো ৺রামনলিনী চক্রবর্তীর অর্থানুকূল্যে ও তত্ত্বাবধানে মা মৃন্ময়ীর ছিন্ন মুখমণ্ডলের মৃত্তিকা উপাদানের সাথে প্রয়োজন মতো গঙ্গামাটির সংমিশ্রণে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মা সর্বমঙ্গলার পূর্ণাঙ্গ মূর্তি নির্মিত হয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় যথাবিধি নিয়মানুসারে।**

পরবর্তীকালে বেলগাছটিকে কেন্দ্র করে মায়ের জন্য দালানঘর বিশিষ্ট একটি পাকা-মন্দির নির্মিত হয়। বর্তমানের এই মন্দিরটিই সেই মন্দির। কালক্রমে উক্ত দেবীস্থানটি একটি পূর্ণাঙ্গ আশ্রমের রূপ পরিগ্রহ করে। লালবাঁধের পশ্চিম দিকের ঐতিহাসিক 'রাজঘাট' বর্তমানে মাতৃপ্রভাবে 'সর্বমঙ্গলা ঘাট' নামেই সুবিদিত। সর্বমঙ্গলা-ঘাট সংলগ্ন এই দেবীস্থানটি পূর্বোক্ত রামরূপ ভট্টাচার্যের নামানুসারে 'রামরূপ শান্তিনিকেতন' নামেই পরিচিত। রামরূপ ভট্টাচার্যের স্মৃতি-বিজড়িত মা সর্বমঙ্গলার মন্দিরাভ্যন্তরে বরাভয়

প্রদায়িনী, দ্বিভুজ বিশিষ্ট মা সর্বমঙ্গলার পূর্ণাঙ্গ মূর্তি ছাড়াও মাতৃ-অঙ্গনে রয়েছে শ্রীশ্রীশিবদুর্গা (পাথরের মূর্তি), শ্রীশ্রীসিংহবাহিনী দেবী, শ্রীশ্রীশালগ্রাম শিলা, শ্রীশ্রীমহাবীর এবং শ্রীশ্রীঅমরনাথ ও কেদারনাথ নামে শিবলিঙ্গদ্বয়। নিত্য-নৈমিত্তিক পূজাদি ছাড়াও শারদীয়া দুর্গোৎসবে মায়ের বিশেষ পূজা-পাঠ এবং নরনারায়ণ সেবা হয় সাড়ম্বরে।

মা সর্বমঙ্গলা হলেন এক বহুমান্যা দেবী। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে তিনি পূজা পেয়ে থাকেন। কোথাও মহিষমর্দিনী রূপে, কোথাও মহিষমর্দিনী সিংহবাহিনী রূপে, কোথাও বা মা মঙ্গলচণ্ডীরূপে পূজিতা হন তিনি। দ্বিভুজা, চতুর্ভুজা, অষ্টভুজা, দশভুজা বিশিষ্ট মায়ের দারুমূর্তি, প্রস্তরমূর্তি এবং মৃন্ময়মূর্তিও পরিলক্ষিত হয় স্থানে স্থানে। বিষ্ণুপুর ব্যতীত বিষ্ণুপুর মহকুমার নাড়িচা গ্রামে, বর্ধমান শহরের মঙ্গলাপাড়ায়, মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ী ও গড়বেতা ছাড়াও মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া থানার নিশ্চিন্তপুর গ্রামে এবং খোদ কোলকাতা শহরের কাশীপুরে (১৫/১ গান ফাউন্ড্রী রোডে) সর্বমঙ্গলা দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন।

গবেষকগণ মনে করেন সর্বমঙ্গলা দেবী আদিতে লৌকিক দেবী ছিলেন। লৌকিক দেবী থেকে তিনি পৌরাণিক দেবীতে উত্তীর্ণা হয়েছেন। আসলে কিন্তু মা সর্বমঙ্গলা হলেন দেবী দুর্গার দেহ-সম্ভূতা অন্যতমা মহাশক্তি। বিপদ-আপদ, রোগ-শোক, জরা-ব্যাধি, মানসিক অশান্তি দূরকারিণী, বৃষ্টি, ফসল ও সন্তান-দায়িনী দেবী রূপে তাঁর প্রসিদ্ধি। তিনি অভীষ্ট ফলদাত্রী, সর্ব মঙ্গল কারিণী সর্বমঙ্গলা বা 'ফার্টিলিটি গডেস্'। আসুন, মাতৃবন্দনা করি সশ্রদ্ধ চিত্তে—

(ওঁ) সর্বমঙ্গল-মঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

সর্বমঙ্গলা-মন্দিরের সন্নিকটেই রয়েছে **'রামকৃষ্ণ আশ্রম'**। এবার প্রসঙ্গ **'রামকৃষ্ণ আশ্রম'**।

অধ্যায়-১৩

রামকৃষ্ণ আশ্রম

(বিষ্ণুপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীমা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দ এবং বিষ্ণুপুরের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক বশীশ্বর সেন)

রামকৃষ্ণ আশ্রমের ছায়াশীতল পরিবেশে উপবেশন করে এখন আপনাদের পরিবেশন করব বিষ্ণুপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মা ও স্বামী বিবেকানন্দের আগমন-সন্দেশ। আর পরিবেশন করব বিষ্ণুপুরের বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক বশীশ্বর সেন মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রসঙ্গে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা।

প্রথমেই বলি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ একবার মাত্র বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন। এসেছিলেন বিষ্ণুপুরের ফৌজদারী আদালতে একটা মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য। এ বিষয়ে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' পুস্তকের ৫৯১ পৃষ্ঠাতে উল্লেখ আছে—

"ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়ের বাটী কামারপুকুরের অনতিদূরে সিহড় গ্রামে ছিল। ...

একবার ঐ স্থানে ঠাকুর রহিয়াছেন, এমন সময়ে হৃদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজারামের সহিত গ্রামের এক ব্যক্তির বিষয়কর্ম লইয়া বচসা উপস্থিত হইল। বকাবকি ক্রমে হাতাহাতিতে পরিণত হইল এবং রাজারাম হাতের নিকটেই একটি হুঁকা পাইয়া তদ্দ্বারা ঐ ব্যক্তির মস্তকে আঘাত করিল। আহত ব্যক্তি ফৌজদারী মকদ্দমা রুজু করিল এবং ঠাকুরের সম্মুখেই ঐ ঘটনা হওয়ায় এবং তাঁহাকে সাধু সত্যবাদী বলিয়া পূর্ব হইতে জানা থাকায় সে ব্যক্তি ঠাকুরকেই ঐ বিষয়ে সাক্ষী-স্বরূপে নির্বাচিত করিল। কাজেই সাক্ষ্য দিবার জন্য ঠাকুরকে বন-বিষ্ণুপুরে আসিতে হইল। পূর্ব হইতেই ঠাকুর রাজারামকে ঐরূপে ক্রোধান্ধ হইবার জন্য বিশেষরূপে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন ; এখানে আসিয়া আবার বলিলেন, 'ওকে (বাদীকে) টাকাকড়ি দিয়ে যেমন করে পারিস মকদ্দমা মিটিয়ে নে; নয়তো তোর ভাল হবে না; আমি তো আর মিথ্যে বলতে পারব না। জিজ্ঞাসা করলেই যা জানি ও দেখেছি সব কথা বলে দেব।' কাজেই রাজারাম ভয় পাইয়া মামলা আপোসে মিটাইয়া ফেলিতে লাগিল।

ঠাকুরও সেই অবসরে বন-বিষ্ণুপুর শহরটি দেখিতে বাহির হইলেন।"

বিষ্ণুপুর দর্শন করে ঠাকুরের যে দিব্য অনুভূতি হয়েছিল সে কথা বলেছি একটু আগেই। এখন শুনুন অন্য কথা।

শোনা যায়, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বিষ্ণুপুর ফৌজদারী-দেওয়ানী আদালতের খ্যাতনামা উকিল ঈশ্বরচন্দ্র সরকার মহাশয়কে তাঁর মামলা লড়ার কাজে নিযুক্ত করেন। এই ঈশ্বর সরকার সুরমানগরের বাসিন্দা ছিলেন এবং পরবর্তীকালে ইনি বিষ্ণুপুরের কুরবানতলা মহল্লায় জায়গা কিনে বসবাস শুরু করেন। ইনি বিষ্ণুপুরের সুসন্তান স্বামী প্রভবানন্দের মাতামহ ছিলেন। স্বামী প্রভবানন্দের শিষ্যা আনন্দপ্রাণার লিখিত পুস্তকে এই তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এই অমূল্য তথ্য পরিবেশন করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র সরকার মহাশয়ের বংশধর অধ্যাপক অরূপ কুমার ঘোষ।

আরো জানা যায়, বর্তমানে যে স্থানে 'যদুভট্ট মঞ্চ' নির্মিত হচ্ছে সে স্থানে একটি বটবৃক্ষ ছিল। সেই বটবৃক্ষমূলে শ্রীরামকৃষ্ণসহ অন্যান্যেরা মধ্যাহ্নভোজন করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ বিষ্ণুপুরে এসে লালবাঁধের পাড়ের উপর কোন একটি বিশেষ পাথরের উপর বসে বিশ্রামও করেছিলেন। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত উপন্যাস 'সপ্তপদী' পুস্তকের ৫৪ পৃষ্ঠায় এ সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র চিকিৎসক কৃষ্ণস্বামী, রিনা ব্রাউনের কথা ভুলতে পারছেন না কিছুতেই। মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হ'য়ে নিজের আস্তানা পিছনে ফেলে তিনি এসে পড়েছেন বিষ্ণুপুরের যমুনা বাঁধের কাছাকাছি।

"থমকে দাঁড়ালেন কৃষ্ণস্বামী।

ফিরবেন এখান থেকে? না।

একবার যাবেন লাল-বাঁধের ধারে। লাল-বাঁধের পাড়ের উপর সেই পাথরখানাকে স্পর্শ করে যাবেন, যেখানার উপর রামকৃষ্ণ পরমহংস বিশ্রাম করেছিলেন।

মনের মধ্যে অবাধ্য স্মৃতির পীড়ন আর তিনি সহ্য করতে পারছেন না।

মুছে যাক, অতীত কালের সব স্মৃতি মুছে যাক। পরশ পাথরের ছোঁয়াতে লোহা সোনা হয়; ওই বৈরাগী শ্রেষ্ঠের আসনখানার স্পর্শে তাঁর মন বৈরাগ্যে ভরে উঠুক। বৈরাগ্যের গেরুয়ার ছাপে সুখ দুঃখ হাসি-কান্নার রামধনুর সাত রঙ নিঃশেষে ঢেকে থাকে।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বিষ্ণুপুরে আগমনের ঘটনাটি শুধু উপন্যাসের নায়ককে নয়, বিষ্ণুপুরবাসীদেরও দিব্য-ভাবে ভাবিত করেছিল। পক্ষান্তরে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণও বিষ্ণুপুর দর্শনের স্মৃতিকে মুছে দিতে পারেননি মন থেকে। **তাইতো তিনি সারদা মাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "বিষ্ণুপুর গুপ্তবৃন্দাবন অতি পবিত্র স্থান! সারদা, তুমি একবার বিষ্ণুপুর দেখিয়া আসিবে।"** শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজ লিখিত 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ' গ্রন্থে একথার উল্লেখ আছে। আবার স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত 'শ্রীমা সারদা দেবী' পুস্তকের ২১৪ পৃষ্ঠাতেও ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের উক্ত কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায়। **সেখানেও তিনি মাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, "ওগো, বিষ্ণুপুর গুপ্তবৃন্দাবন ; তুমি দেখো।" প্রত্যুত্তরে সারদা মা বলেছিলেন, "আমি মেয়েমানুষ ; কি করে দেখব?" ঠাকুর তথাপি পুনরুক্তি করেছিলেন, "না, গো, দেখবে, দেখবে।"**

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে 'বেঙ্গল নাগপুর রেললাইন' সংক্ষেপে (বি.এন্.আর.) চালু হয়। বিষ্ণুপুরের উপর দিয়ে ট্রেন চলাচল শুরু হয়। সাথে সাথে সারদা মায়ের কোলকাতা যাতায়াতের পথও পরিবর্তিত হয়। পূর্বে তিনি জাহানাবাদ বা আরামবাগের মধ্য দিয়ে তেলোভেলোর মাঠ অতিক্রম করে তারকেশ্বর হয়ে হাঁটা পথে কোলকাতা যাতায়াত করতেন। ট্রেন চালু হবার পর তিনি বিষ্ণুপুর হয়ে কোলকাতা যেতেন। **১৩১২ সালের (১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের) জ্যৈষ্ঠ মাসে তিনি সর্বপ্রথম কোলকাতা থেকে বিষ্ণুপুরে আসেন।** বিষ্ণুপুর থেকে কোতুলপুর যান গরুর গাড়িতে এবং কোতুলপুর থেকে শ্রীমা ও রাধু পালকিতে চড়ে জয়রামবাটীতে উপনীত হন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের দেহরক্ষার পূর্ব পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের পথেই তিনি কোলকাতা যাতায়াত করতেন। এই সময় তিনি অনেককেই মন্ত্রদীক্ষা দেন, বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে এবং ঠাকুরের কথা মতো শ্রীমা বিষ্ণুপুর দর্শন করেন। "একবার বিষ্ণুপুর হইয়া যাইবার সময় শ্রীমা লালবাঁধের ধারে সর্বমঙ্গলার মন্দির প্রাঙ্গণে বসিয়া বলিয়াছিলেন, 'ঠাকুরের কথা তো আজ সত্যি হল।' **বিষ্ণুপুর বর্তমানে হতশ্রী হইলেও প্রাচীন ভক্তিমান রাজাদের বহু কীর্তি অঙ্কে ধারণপূর্বক তাহার স্থাপত্য-শিল্পের গৌরবময় দিনের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং পোকাবাঁধ, লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ প্রভৃতি বিপুল তড়াগ সমূহ এখনও সকলের বিস্ময়োৎপাদন করে। শ্রীমা এই সমস্ত দেখিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন।"**[১] জয়রামবাটী থেকে কোলকাতা এবং কোলকাতা থেকে বিষ্ণুপুর যাতায়াতের পথে শ্রীমা বিষ্ণুপুর রেল-স্টেশনে অবস্থিত একটি কাঁঠাল গাছের তলে বিশ্রাম করতেন। মায়ের স্মৃতিরক্ষার্থে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ উক্ত কাঁঠাল বৃক্ষমূলে মনোরম বেদী নির্মাণ পূর্বক গ্রীল দিয়ে ঘিরে একটি স্মৃতিফলক সংস্থাপন করেছেন। আলোর ব্যবস্থা করেছেন। স্মৃতিফলকটিতে লেখা আছে—**'শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী কলিকাতা যাইবার পথে এই কাঁঠাল বৃক্ষ তলে বিশ্রাম লইতেন।'**

দুঃখের বিষয়, মা যে কাঁঠাল গাছের ছায়াশীতল পরিবেশে বিশ্রাম করতেন সেই কাঁঠাল গাছটি ঝড়ে ভেঙে পড়েছে। দাঁড়িয়ে আছে শুধু বৃক্ষমূল। সেই বৃক্ষমূলকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে তরতর করে বেড়ে উঠছে একটি বটবৃক্ষ। অবশ্য মায়ের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য নতুন একটি কাঁঠাল চারা ঐ স্থানে প্রোথিত হয়েছে। বিষ্ণুপুর স্টেশনে ট্রেনের জন্য প্রতীক্ষারত মাকে কেন্দ্র করে দুটি ঘটনা ঘটে। একটি ঘটনাতে

১। শ্রীমা সারদা দেবী, পৃঃ— ২১৪

মা সীতারূপে প্রতিভাত হন। ঘটনাটি নিম্নরূপ।

"১৯১০ সালে শ্রীশ্রীমা ও গৌরী-মা প্রভৃতি জয়রামবাটী থেকে কলকাতা আসবার পথে বিষ্ণুপুর স্টেশনে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় একটি হিন্দুস্থানী কুলী মাকে দেখে ছুটে এসে বলে ঃ 'তু মেরী জানকী, তুঝে ম্যায়নে কিত্‌নে দিনোঁসে খোঁজা থা। ইত্‌নে রোজ তু কাঁহা থী? (তুমি আমার জানকী মা, কতদিন থেকে তোমাকে আমি খুঁজছি। এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?) মা তাকে সান্ত্বনা দিয়ে একটি ফুল আনতে বলেন। সে তা এনে মায়ের পায়ে দিলে, মা সেখানে বসেই তাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন।"[১]

"শ্রীমাকে দেখে প্রথম কুলিটির অভাবনীয় আচরণ এবং তার প্রতি শ্রীমার অপ্রত্যাশিত কৃপাবর্ষণ স্টেশনের অন্যান্য কুলিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তারা তখন এসে শ্রীমাকে ঘিরে দাঁড়ায়। তাঁকে দর্শনোৎসুক সমবেত ঐ কুলিদের তখন গৌরী-মা বলেছিলেন ঃ 'জানকীমায়ীকে প্রণাম কর।' গৌরী-মার এই বাক্যটি কথার কথা ছিল না। তার মধ্যে তাঁর নিজের উপলব্ধিজাত প্রত্যয়ই প্রতিধ্বনিত হয়েছিল।"[২]

দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে বিষ্ণুপুর মেন্‌ পোস্ট্‌ অফিসের সম্মুখস্থ প্রখ্যাত মণ্ডল পরিবারকে কেন্দ্র করে। উক্ত মণ্ডল পরিবারের বিজয় মণ্ডল আকস্মিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। দুঃসংবাদ শুনে পুত্রশোকাতুরা মা মাখনময়ী দাসী (মণ্ডল) মূর্চ্ছা যান বারংবার। পুত্রশোক ভুলতে পারেন না কিছুতেই। অবশেষে শোক প্রশমনের জন্য তীর্থে যাওয়া মনস্থ করেন। জগন্নাথ দর্শনের জন্য শ্রীক্ষেত্র যাবার উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপুর স্টেশনে বসে আছেন। সেই সময় তিনি দেখেন সারদা মাও বসে আছেন স্টেশনে। যাবেন দক্ষিণেশ্বরে। পূর্বোক্ত মাখনময়ী দাসীকে বিষ্ণুপুর স্টেশনে খুবই বিমর্ষভাবে বসে থাকতে দেখে বিচলিত হন শ্রীমা। তার কাছে যান এবং বলেন, 'মা, তোমাকে এত বিমর্ষ দেখাচ্ছে কেন?' মায়ের সহৃদয় সুমিষ্ট ভাষণে পুত্রশোকাতুরা জননী খুলে বলেন স্বীয় দুঃখের কথা। সব কিছু শুনে মা বলেছিলেন, 'আমি তোমাকে মন্ত্র দেব।' পূর্বাহ্ণে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা হওয়ার কারণে আপত্তি করেছিলেন মাখনময়ী দাসী। মা তাকে নিরস্ত করে বলেছিলেন 'তা হোক, তুমি গুরুর মন্ত্র আগে জপ করবে, তারপর আমার মন্ত্র জপ করবে।' অনন্তর বিষ্ণুপুর স্টেশনের একটি বৃক্ষমূলে নিয়ে গিয়ে সারদা মা পুত্রহারা জননীকে দীক্ষা দিয়েছিলেন সস্নেহে। পরবর্তীকালে সারদা মা নিজে তাঁর বিষ্ণুপুরস্থ বাড়িতে খোঁজ খবর নিতে গিয়েছিলেন অযাচিতভাবে।

সারদা মায়ের এতাদৃশ আচরণের কথা শুনে মাখনময়ী দাসীর আর এক পুত্র ভূদেবচন্দ্র মণ্ডল মন্তব্য করেছিলেন, 'মায়ের কাছে একথা শুনতে শুনতে সারদা মা যে কত করুণাময়ী ছিলেন এবং পরের দুঃখে যে তাঁর প্রাণ কতখানি বিগলিত হত, সেকথা সহজেই বুঝতে পারি।'[৩] প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, উক্ত **ভূদেব চন্দ্র মণ্ডল** স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসেবে কারাবরণ করেন এবং ভারত সরকার প্রদত্ত তাম্রপত্র লাভ করেন। অপ্রতিদ্বন্দ্বী অবস্থায় নির্বাচিত হয়ে তিনি বিষ্ণুপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করেন (৬.৬.১৯৪৭-৩১.১০.১৯৫১)। ১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে পশ্চিমবাংলার M.L.A.-দের মধ্যে সর্বাধিক ভোটে বিষ্ণুপুর কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে জয়লাভ করেন। উক্ত মাখনময়ী দেবীর কনিষ্ঠ পুত্র **ডঃ গোবিন্দচন্দ্র**

১। শতরূপে সারদা, পৃঃ— ২১৬ ২। শতরূপে সারদা, পৃঃ— ৬৬৮

৩। শতরূপে সারদা, পৃঃ— ৫৬৩

মণ্ডল শান্তিনিকেতন বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অর্থনীতি গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর ছিলেন এবং পরবর্তীকালে উক্ত কৃষি-অর্থনীতি বিভাগের প্রফেসর-এর পদও অলঙ্কৃত করেন।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমা উভয়েই বিষ্ণুপুরের রাজকুলদেবী মা মৃন্ময়ীর চিন্ময়ী সত্তায় আস্থাবান ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ মৃন্ময়ী দর্শন হয়। আর মা সারদা মৃন্ময়ীর কথা উল্লেখ করেন পুনঃ পুনঃ। শ্রীমায়ের বিষ্ণুপুরে পোকাবাঁধের চটিতে অবস্থানকালে সর্বাঙ্গ ধবল হয়ে গেছে, এমন একটি লোক মাটি হাতে আসে—শ্রীমার চরণরজঃ করে নেওয়ার অভিপ্রায়ে। কিন্তু চরণরজঃ দিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শ্রীমা বলেছিলেন, "তুমি যাও, মৃন্ময়ীর মাড়োয় হত্যে দাওগে—অসুখ সেরে যাবে।" আর একবার "জনৈক সেবক কোন নির্জন স্থানে তপস্যা করিবার বাসনা প্রকাশ করিয়া অনুমতি চাহিলে শ্রীমা বলেন, '....বিষ্ণুপুরে গিয়ে লালবাঁধে থাকগে। সেখানে মৃন্ময়ীর পূজারী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আছেন—তাঁর কাছে আমার নাম করো—তিনি খুব যত্ন করে রাখবেন।"[১] মা মৃন্ময়ী প্রসঙ্গে সারদা মা আরও বলেছেন, **"পূজারী ব্রাহ্মণের অবস্থা বড় খারাপ ছিল। একদিন মৃন্ময়ী স্বপ্ন দেন, 'আমি লালবাঁধের জলে রয়েছি—তুই তুলে নিয়ে আমার সেবা কর।' ব্রাহ্মণ গিয়ে দেখে, অর্ধেক জলে দেবী রয়েছেন। তখন তাঁকে তুলে নিয়ে লালবাঁধের ঘাটে প্রতিষ্ঠা করে পুজো করতে শুরু করলে। মায়ের কৃপায় এখন ব্রাহ্মণের অবস্থা ভালই হয়েছে, বলতে হবে।"**[২]

বিষ্ণুপুরের উপর দিয়ে শ্রীমার কোলকাতা যাতায়াতের সূত্র ধরে রামকৃষ্ণ সংঘের নারী-পুরুষ ভক্তবৃন্দের পদরেণুতে বিষ্ণুপুরের রজোরাজি পূতপবিত্র হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে গৌরী মা, যোগীন মা, গোলাপ মা, মায়ের ভাইঝি রাধু, মাকু, স্বামী সারদানন্দজী, **স্বামী সদানন্দজী, ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতকার শ্রীমহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রী'ম)-রও বিষ্ণুপুরে আগমন ঘটে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে স্বামী বিবেকানন্দও একবার বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন।** এ প্রসঙ্গে নিম্নোদ্ধৃতিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—

"স্বামী কেশবানন্দ একদিন শ্রীমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন স্বামীজী কামারপুকুরে এসেছিলেন কিনা। উত্তরে মা বললেন, 'না, নরেনের কামারপুকুরে আসা হয়নি। দু'বার আসতে চেয়েছিল, কিন্তু দুবারই হয়নি। প্রথমবার আঁটপুর পর্যন্ত এসেছিল। সেখানে বাবুরামের মা শিলন মাছের ডিম দিয়ে একটি তরকারী করেছিলেন ওদের জন্য। সেটা খেয়ে নরেনের পেট খারাপ হয়। এত বেশী হয় যে আঁটপুর থেকে কলকাতা ফিরে যেতে হয় তাকে। **আরেকবার কামারপুকুর যাওয়ার পথে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত এসে সেখানে রাত্রিবাস করেছিল।** যাত্রার আগে কলকাতা থেকে একটা জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে নরেনকে তক্ষুণি কলকাতায় চলে আসতে হয়। কামারপুকুর আসা আর হল না নরেনের।" (শতরূপে সারদা, পৃঃ— ২৮)

বিষ্ণুপুরের উপর দিয়ে ট্রেন চলাচল শুরু হলে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মায়ের নরলীলা সংবরণের পূর্ব পর্যন্ত তিনি বিষ্ণুপুরের উপর দিয়েই কোলকাতা যাতায়াত করতেন এবং বিষ্ণুপুর থেকে জয়রামবাটি যাবার পথে কখনও চটিতে কখনও পথিপার্শ্বে, কখনও বা কোন দেব-মন্দিরে বিশ্রাম, আহারাদি ও রাত্রিযাপনের কাজ সারতেন। যাতায়াতের জন্য ঘোড়ার গাড়ি, পাল্কি এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে গরুর গাড়ি ব্যবহারের প্রচলন ছিল। অবশ্য ঘোড়ার গাড়ির প্রচলনের পূর্বে বিষ্ণুপুরে উটের গাড়িরও

১। শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে পৃঃ—৪০৩, ২। ঐ

প্রচলন পরিলিক্ষিত হয়।

স্বামী গম্ভীরানন্দ প্রণীত 'শ্রীমা সারদা দেবী' পুস্তকের ২১৪ পৃষ্ঠাতে বলা হয়েছে, "বিষ্ণুপুরে রেল লাইন হওয়ার পরে শ্রীমা ঐ পথেই যাতায়াত করিতেন। প্রথম প্রথম বিষ্ণুপুরে পরিচিত কেহ না থাকায় তিনি পোকাবাঁধ ও লালবাঁধ নামক বিশাল দীর্ঘিকাদ্বয়ের একটির তীরে বিশ্রাম করিতেন এবং চটিতে রন্ধনাদির ব্যবস্থা হইত। পরে সুরেশ্বর সেন মহাশয়ের গড়দরজার বাড়ি শ্রীমা ও ভক্তগণের বিশ্রামস্থানে পরিণত হয়। স্বামী সদানন্দ ১৩১৫ সালের শেষে ও ১৩১৬ সালের প্রারম্ভে যখন বিষ্ণুপুরে প্রায় দুই মাস অবস্থান করেন, তখন সুরেশ্বরবাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে দেহমন অর্পণ করেন। ১৩১৮ সাল হইতে ঐ পথে গমনাগমন কালে শ্রীমা ঐ বাড়িতে দুই-এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিতেন; কোন সময় দুই-এক দিন থাকিয়াও যাইতেন।"

কান টানলে যেমন মাথা আসে অনুরূপভাবে সুরেশ্বর সেনের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় তাঁর ন' ভাই বশীশ্বর সেনের কথা। বশীশ্বর সেনের সংক্ষিপ্ত নাম বশী। বাঁকুড়ার বিভূতি ঘোষ কোলকাতায় আইন পড়তে গেছেন। এদিকে সেণ্ট জেভিয়ার্সে পড়তে গেছেন বশী সেন। সেই সূত্রে দুজনের আলাপ। বিভূতি ঘোষ স্বামী সদানন্দের শিষ্য ছিলেন। তিনিই একদিন বশী সেনকে নিয়ে যান সদানন্দের কাছে। প্রথম দিনে প্রথম আলাপে বশী সেনকে খুব কড়া ভাষায় অপমানজনক কথা বলেন স্বামী সদানন্দ মহারাজ। দ্বিতীয় দিনে একেবারে নরম ব্যবহার। পাশে বসিয়ে হুঁকো খাইয়ে একেবারে আপন করে নেন এবং বিদায় বেলায় বলেন, 'আমার যা কিছু সব তোর।' সেই মুহূর্তে গুরুশিষ্যের সম্পর্কের ভিত্তিপত্তন হয়। শুরু হয় বেলুড় মঠে যাতায়াত, পাশাপাশি চলতে থাকে পড়াশুনা। পরবর্তীকালে "নিবেদিতা বশীকে লেখাপড়া ইত্যাদি ও অন্যান্য ব্যয় বহন করবার জন্য মাসে কুড়ি টাকা দিতেন। নিবেদিতাই বশীকে জগদীশচন্দ্র বোসের সঙ্গে যোগাযোগ করে দিয়েছিলেন। এবারে জগদীশচন্দ্র বশী সেনকে ২০ টাকা বেতনে তাঁর গবেষণাগারে নিযুক্ত করলেন।" (অমৃত, পৃঃ—৪৪) ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে জনৈক গ্লেন ওভারটন আসেন বসু গবেষণাগারে এবং বশী সেনের সাথে পরিচিত হন। তাঁর সাথে যান রামকৃষ্ণ মঠে। ওভারটনের সাথে বশীর পরিচয় প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হয় ক্রমে। এই বন্ধুত্বের সূত্র ধরেই বসু গবেষণাগারে ইস্তফা দিয়ে ওভারটনের সাথে বশী যান আমেরিকাতে।

"বশী সেন অনুভব করেছিলেন বিজ্ঞানের জগতে ভারতবর্ষ পাশ্চাত্য দেশের অনেক পিছনে পড়ে আছে। কেবলমাত্র বড় বড় শহরে বিরাট আয়তনের গুটি কয়েক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান পিপাসাকে জাগিয়ে তোলা যায় না। আধুনিক জগতের বিজ্ঞানের সঙ্গে যদি ভারতবর্ষ পা ফেলে এগিয়ে যেতে চায় তবে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞান-সাধনার ছোট ছোট গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা দরকার।" (অমৃত, পৃঃ—৪৫)

উদ্দেশ্যকে কার্যে পরিণত করার অভিপ্রায়ে তিনি কোলকাতার ৮ নং বোসপাড়া লেনে গবেষণা কার্য শুরু করেন। পরবর্তীকালে আলমোড়াতে বিবেকানন্দের নামে **'বিবেকানন্দ ল্যাবরেটরী'** স্থাপন করেন। এই সময় তিনি আমেরিকার গ্লেন ওভারটন, ইংরাজ-বন্ধু লিয়োনার্ড এলমহার্স্ট ও তাঁর আমেরিকান পত্নী ডরোথি, রাশিয়ান শিল্পী নিকোলাস রোরিখ, মিস জোসেফিন ম্যাকলাউড (ট্যাণ্টিন), আর্ল অফ স্যাণ্ডুইচ এবং নাম প্রকাশে

অনিচ্ছুক জনৈক ভারতীয় বন্ধুর কাছ থেকেও আর্থিক সাহায্য পান গবেষণা কার্যের জন্য।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি, বিষ্ণুপুরের বশীশ্বর সেন প্রতিষ্ঠিত উত্তরভারতের রাণীক্ষেত বা আলমোড়ার 'বিবেকানন্দ ল্যাবরেটরী' অর্থাৎ বিবেকানন্দ কৃষি গবেষণাগার শুধুমাত্র একটি আকর্ষণীয় দর্শনীয় স্থানই নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীরও কৃষি অনুসন্ধান কর্মশালা হিসেবে এটি এক পথিকৃৎ সংস্থা।

গ্রীষ্মকালে আলমোড়া এবং শীতকালে কোলকাতার গবেষণা কেন্দ্রে তিনি কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠাসহকারে কাজ করে চলেন ক্লান্তিহীনভাবে। বিজ্ঞান বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান, অসীম দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা, উচ্চ-শিক্ষিত মহলে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

"অর্থলাভের পর এগিয়ে এল যশ, স্বীকৃতি এবং পরিপূর্ণ সফলতা। পেলেন পদ্মভূষণ, ওয়াটুমল অ্যাওয়ার্ড, মেক্সিকো থেকে ডক্টরেট।

বশী সেনের মৃত্যুর পর সংবাদপত্রের সংবাদ ঃ সুপরিচিত উদ্ভিদ ও শারীরতত্ত্ববিদ অধ্যাপক বশী সেন আজ রাণীক্ষেতের সামরিক হাসপাতালে পরলোকগমন করেছেন। **ভারতীয় কৃষিতে অনন্য অবদানের জন্য অধ্যাপক সেনকে পদ্মভূষণ ও ওয়াটুমল পুরস্কার দেওয়া হয়। বিবেকানন্দ গবেষণাগার ভারতে কৃষি গবেষণার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ সংস্থা।** আলমোড়ার গবেষণাগারেই ভারতে প্রথম সংকর উদ্ভিদ উৎপাদনের কাজ হয়। ভুট্টা (১৯৪৮) পিঁয়াজ (১৯৫৫) জওয়ার (১৯৫৯) ও বাজরার (১৯৬৩) সংকর উৎপাদন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **অধ্যাপক সেনই প্রথম ভারতীয় বৈজ্ঞানিক যিনি ১৯৫৫ সালে ওকরীজ্-এ আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের প্রথম পাঠক্রমে যোগদানের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।** তিনি বেশ কয়েকবার আন্তর্জাতিক শারীরতত্ত্ব ও উদ্ভিদবিদ্যা সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন ফর অ্যাডভান্সমেণ্ট অফ সায়েন্সের ফেলো এবং বৃটেনের ফিজিওলজিক্যাল সোসাইটির সদস্য ও ভারতের বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানেরও সদস্য ছিলেন।" (অমৃত, পৃঃ—৪৫)

ফরাসী মনীষী **রম্যাঁ রল্যাঁ** বশীশ্বর সেনের দৈহিক আকৃতির বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর দিন-পঞ্জী 'ভারতবর্ষ' (INDE)-এ ৩০ আগস্ট, ১৯২৮ তারিখে লিখেছেন, "দুপুরে খেতে এবং কিছুটা সময় কাটাতে এসেছেন রামকৃষ্ণ মিশনের তরুণ পণ্ডিত বশী সেন। মুখখানা উদ্দীপ্ত ও আনন্দোজ্জ্বল, বুদ্ধিতে উদ্ভাসিত, অত্যন্ত আকর্ষণীয় ঃ নিগ্রো-ইতালীয় টাইপ, কালো চাঁচড় চুল,— যেন নৃত্যপর কৃষ্ণ।" {'ভারতবর্ষ' (INDE) পৃঃ—২৩৯}

বিজ্ঞানের একনিষ্ঠ সাধক, স্বামী সদানন্দের ভক্ত এবং স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে উদ্বুদ্ধ বশীশ্বর সেন ছিলেন দয়ালু, পরোপকারী এবং সূক্ষ্ম রসবোধ সম্পন্ন সদা আনন্দময় মানুষ।

'অপ্রকাশিত বিবেকানন্দ ও উপেক্ষিতা ক্রিস্টিন' প্রবন্ধের লেখিকা প্রণতা দে 'অমৃত' পত্রিকাতে তাঁর রসবোধের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন—

"মনে পড়ছে একবার আলমোড়ায় বর্ষা নামছে না। শস্যের ভবিষ্যৎ ভেবে বশীদা চিন্তিত। আমরা গিয়েছি একদিন বিকেলে, বললেন—'ভগবানের কাণ্ড দেখেছ? বৃষ্টি দেবে না! লোকটার বুদ্ধি নেই। লেখাপড়া তো শেখেনি। লেখাপড়া না শিখলে কি বুদ্ধি খোলে। হুঃ।' সদা আনন্দময় সদানন্দের শিষ্য, চিন্তা ভুলে হেসে ফেললেন ভগবান নামক নিরক্ষর নির্বোধ ব্যক্তিটিকে দোষারোপ করে।" প্রসঙ্গতঃ বলি বশীশ্বর সেনের ছোট

ভাই-এর নাম **মতীশ্বর সেন**। ডাক নাম টাবু। একবার ''বশী-টাবু গেলেন শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করতে। কে যেন বললেন, 'বশী, মায়ের কাছে দীক্ষা নাও।' বশী বিপদ্‌গ্রস্ত হলেন। মনে মনে ভাবলেন, 'সদানন্দ তো সবকিছু দিয়ে গিয়েছেন (যদিও দীক্ষা দান করে তিনি বশী সেনকে শিষ্য করেননি) আর দীক্ষা গ্রহণ করে কী হবে?' অথচ মুখে পরিষ্কার করে 'না' বলতে পারছেন না। শ্রীশ্রীমা নিজেই একটু বাদে জানালেন, 'বশীর দীক্ষার দরকার নেই। আর হ্যাঁ টাবুকে বলে দাও কালই ওকে দীক্ষা দেব।'' এদিকে টাবু ওরফে মতীশ্বর সেনের মেয়ে মানুষের কাছে দীক্ষা নিতে আপত্তি। মনোগতভাব স্বামী সদানন্দের কাছে দীক্ষা নেওয়ার। সারদা মা তাকে নিরস্ত করে বলেছিলেন, 'মনে কর সদানন্দই দীক্ষা দিচ্ছে।' এই বলে মা সারদা মতীশ্বর সেনকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়েছিলেন।

বশীশ্বর সেনের সূত্র ধরেই মতীশ্বর সেন, সুরেশ্বর সেন এবং সুরেশ্বর সেনের পরিবারবর্গ রামকৃষ্ণ মঠ মিশন ও সারদা মায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এই যোগাযোগের মাধ্যম ছিলেন সদানন্দ মহারাজ। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে ''স্বামী সদানন্দ ১৩১৫ সালের শেষে ও ১৩১৬ সালের প্রারম্ভে যখন বিষ্ণুপুরে প্রায় দুই মাস অবস্থান করেন তখন সুরেশ্বরবাবু ও তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ-চরণে দেহমন অর্পণ করেন। ১৩১৮ সাল হইতে ঐ পথে গমনাগমনকালে শ্রীমা ঐ বাড়িতে দুই এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিতেন ; কোন সময়ে দুই-এক দিন থাকিয়াও যাইতেন।'' (শ্রীমা সারদাদেবী, পৃঃ—২১৪)

সুরেশ্বর সেন ছিলেন বিষ্ণুপুরের রাজার দেওয়ান। মেজাজী লোক, হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ চেহারা। মদ্যপ কিন্তু ভক্তিমান। সারদা মা আসছেন তাঁদের বাড়িতে। অতএব মাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য ঘর ঝাড়া মোছা চলছে। তাই দেখে সুরেশ্বর সেন জানতে চান, 'কিসের জন্য এই প্রস্তুতি?'

'জয়রামবাটীর মা আসবেন।'

'কখন আসবেন? কিসে আসবেন?'

'এক্ষুনি আসছেন, গরুর গাড়িতে।'

'গরুর গাড়িতে! গরুগুলো এমন কি পুণ্য করেছে যে মাকে টেনে নিয়ে আসবে।' এই বলে সুরেশ্বর বাবু গৃহ-সংলগ্ন পুকুরে স্নান করে ভিজে কাপড়েই চলে যান মাকে আনতে। গাড়ির গরুগুলোকে খুলে দিয়ে একাই টেনে নিয়ে আসেন মায়ের গাড়ি। সুরেশ্বর সেন ছিলেন মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত। অনেকে বলেন শ্রীরামকৃষ্ণের যেমন ছিলেন গিরিশ চন্দ্র ঘোষ, সারদা মায়ের তেমনি সুরেশ্বর সেন। কথিত আছে মায়ের কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে সুরেশ্বর বাবু মদ স্পর্শ করেন নি আজীবন। এই সুরেশ্বর বাবুর বাড়িতেই মায়ের জীবিতাবস্থার শেষ ফটোটি তোলা হয়।

''স্বামী সারদানন্দের ব্যবস্থাপনায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ারি সকাল দশটায় মা তাঁর জন্মভূমি জয়রামবাটী চিরতরে পরিত্যাগ করে কলকাতা রওনা হন। পথে বিষ্ণুপুরে তিনি তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত সুরেশ্বর সেনের বাড়িতে ২৫ ফেব্রুয়ারি মধ্যাহ্ন থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি মধ্যাহ্ন পর্যন্ত অবস্থান করেন। তাঁর এই সাময়িক অবস্থিতির সুযোগে সুরেশ্বরবাবুর ভাই বশীশ্বর সেন একটি ফটো তোলেন। ঐ ফটোতে দেখা যায়, ঐ বাড়ির লম্বা বারান্দায় শ্রীশ্রীমা মধ্যাহ্নভোজনে বসেছেন আর তাঁর অদূরে পঙক্তিতে আহার করছেন সুরবালা (রাধুর মা), নলিনী, নন্দরানী, যামিনী, সুশীলা (মাকু) ও নবাসনের

বউ মন্দা।"[১] ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে মায়ের এই ফটো তোলার সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ছেষট্টি। বিষ্ণুপুরে মায়ের উক্ত আলোকচিত্র গ্রহণের পাঁচ মাস পরেই তিনি তাঁর নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। **মায়ের জীবিতাবস্থার এই শেষ আলোকচিত্রটিকে 'বিষ্ণুপুরে শ্রীশ্রীমা' আখ্যায় ভূষিত করা হয়।**

বিষ্ণুপুরের গড়দরজা মহল্লাতে অবস্থিত সুরেশ্বর সেন মহাশয়দের মাটির দেওয়াল ও খড়ের আচ্ছাদনে আবৃত কোঠাঘরটি শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যস্মৃতি ও পদরেণুতে পূতপবিত্র। সুরেশ্বর বাবুদের উক্ত পর্ণকুটিরটি আজ একটি অলিখিত তীর্থস্থানে সমুত্তীর্ণ। রামকৃষ্ণ-সারদানুরাগী দেশী-বিদেশী ভক্তবৃন্দ এবং সন্ন্যাসীগণ মায়ের স্মৃতিবিজড়িত উক্ত তীর্থস্থানটি দর্শন করে নিজেদের ধন্য মনে করেন। সেন বংশের উত্তরপুরুষগণও উক্ত পর্ণকুটিরে রক্ষিত মায়ের আলোকচিত্রে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করে আসছেন অদ্যাবধি, সযত্নে সংরক্ষণ করে রেখেছেন মায়ের ব্যবহৃত ও স্মৃতি-বিজড়িত বহু দুষ্প্রাপ্য জিনিস।

আরো উল্লেখযোগ্য বিষয় হল যে পূর্বোক্ত সুরেশ্বর বাবুই বিষ্ণুপুরে রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে লালবাঁধ সংলগ্ন মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে প্রায় সাত বিঘা জমি খরিদ করে রামকৃষ্ণ আশ্রমকে দান করেন। কথিত আছে আশ্রমস্থ শ্রীমন্দিরের সম্মুখের একটি টগর ফুলের বৃক্ষমূলে সারদা মা বিশ্রাম করেছিলেন। মায়ের বিশ্রাম স্থানটিকে চিহ্নিত করার জন্য উক্ত বৃক্ষটিকে কেন্দ্র করে বৃত্তাকার এক বেদী নির্মাণ করা হয় উত্তরকালে। উক্ত টগর বা গুলঞ্চ ফুলের গাছটি পড়ে যাওয়ায় সেখানে এখন রয়েছে বৃক্ষহীন বেদীটি মাত্র। এখানে আশ্রম নির্মাণের উদ্দেশ্যে মায়ের কাছে অনুমতি চাওয়া হলে মা সংক্ষেপে বলেছিলেন, 'কালে হবে।'

পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুরের রামকৃষ্ণানুরাগী ভক্তবৃন্দের এবং মায়ের মন্ত্রশিষ্যদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় সুরেশ্বর সেন প্রদত্ত জমির উপরে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্মিত হয় শ্রীমন্দির এবং শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা ও স্বামী বিবেকানন্দের আলোকচিত্রের পূজা চালু হয়।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মায়ের মন্ত্রশিষ্য তথা বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ৺গোকুলচন্দ্র ঘোষ; ৺অমূল্যরতন ঘোষ, ৺সুরেশ্বর সেন, ৺মতীশ্বর সেন, ৺তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (তদানীন্তন অধ্যক্ষ কে. জি. ই. আই.), ৺রামনলিনী চক্রবর্তী, ৺ভূদেবচন্দ্র মণ্ডল, ৺স্বামী পরমেশ্বরানন্দ (কিশোরী মহারাজ) ৺স্বামী মহেশ্বরানন্দ (ডাক্তার মহারাজ), সতীশচন্দ্র সরকার ও জে. কে. গুপ্তরায় (প্রাক্তন মহকুমা শাসকদ্বয়) প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা যায়।

১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী গিরিশানন্দ মহারাজের আগমন ঘটে রামকৃষ্ণ আশ্রমে। অত্যন্ত বেঁটেখাটো এবং স্পষ্টভাষী এই সাধু মহারাজের নিরলস প্রয়াস এবং বুদ্ধিদীপ্ত পদক্ষেপে আশ্রমটি কয়েক বছরের মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ পরিণতির পথে এগিয়ে চলে ধাপে ধাপে। শ্রীমন্দিরে শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদা মা ও স্বামী বিবেকানন্দের আলোকচিত্রের পরিবর্তে মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্মিত হয় সাধুনিবাস এবং ছাত্রাবাস। স্থায়ী আয়ের উৎস হিসেবে আশ্রমের প্রায় চল্লিশ বিঘা জমি চাষবাসের সুবন্দোবস্ত হয় তাঁর তত্ত্বাবধানে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এতাদৃশ একজন নিষ্ঠাবান করিতকর্মা সাধু প্রায় তাঁর নিজে হাতে গড়া ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ, বৃক্ষতরুলতা সুশোভিত প্রভূত সম্ভাবনাময় এই আশ্রম ছেড়ে যেতে বাধ্য হন তৎকালীন

১। উদ্বোধন-পৌষ ১৪০২/১২শ সংখ্যা, পৃঃ— ৬৮৯

কর্তৃপক্ষের সাথে মতবিরোধের ফলে। যাবার সময় তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "বিষ্ণুপুরে অনেক মৃত মন্দির আছে, আজ থেকে তার সাথে আর একটি সংযোজিত হল।"

যা সত্য তা নির্মম এবং কলঙ্কজনক হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই। মহারাজের ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছে।

স্বামী গিরিশানন্দ মহারাজ আশ্রম ত্যাগ করে চলে যাওয়ার পর অনেক অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়ে আশ্রমটি আজ ধ্বংসের পথে পা বাড়িয়ে বুঝিবা অকাল-মৃত্যুর প্রহর গুণছে ক্ষণে ক্ষণে। ভাবতে আরো খারাপ লাগে যে, যে রামকৃষ্ণ ঠাকুর বিষ্ণুপুরকে বলেছিলেন 'গুপ্তবৃন্দাবন' সেই গুপ্তবৃন্দাবনেই রামকৃষ্ণ আশ্রমের এই মর্মান্তিক পরিণতি নিঃসন্দেহে বিষ্ণুপুরবাসীদের পক্ষে পরিতাপ ও লজ্জার কথা।

তথাপি আমার দৃঢ় বিশ্বাস ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের পদরেণুতে রঞ্জিত এবং আশীর্বাদপূত এই পুণ্যভূমির আশ্রমটি আবার স্বমহিমায় পূর্ব-ঐতিহ্য ফিরে পাবে এবং ভক্তগণের ইষ্টলাভে সহায় হবে।

আশ্রমের কথায় ছেদ টেনে বলি, এই আশ্রমের পাশেই রয়েছে বিষ্ণুপুরের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'রামানন্দ মহাবিদ্যালয়'।

রামকৃষ্ণ আশ্রম দর্শনের পর আমাদের দ্রষ্টব্য বস্তু বিষ্ণুপুরের 'মিউজিয়াম' তথা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বা আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন।

অধ্যায়-১৪

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন

রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামানন্দ মহাবিদ্যালয়ের চৌরাস্তার মোড়ের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত কারুকার্য শোভিত ছাদ বিশিষ্ট আধুনিক মন্দিরের আদলে নির্মিত এই ভবনটিই হল বিষ্ণুপুরের 'মিউজিয়াম্' — যার জনপ্রিয় নাম 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' এবং প্রকৃত নাম 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন'। আসলে এটি একটি সংগ্রহশালা। এতদর্থে এটি বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের 'মিউজিয়াম্'। সাধারণ মানুষের কাছে এটি খুব আকর্ষণীয় বা গুরুত্বপূর্ণ মনে না হলেও শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি, ঐতিহাসিক এবং গবেষক মহলে এর গুরুত্ব এবং অবদান অপরিহার্য, এই ভবনটির সমাদর অভাবনীয়। কিন্তু কেন?

অতীত বিষ্ণুপুর তথা ঐতিহাসিক এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের বিষ্ণুপুর ও মল্লভূমকে সত্যের নিরিখে অনুধাবন করতে হলে 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন'-এর ভূমিকা অস্বীকার করার উপায় নেই। সংক্ষেপে বলা যায় এটি হল 'Store house of knowledge.' দূরবীক্ষণ যন্ত্রে চোখ রাখলে দূরের জিনিসকে বৃহৎ ও স্পষ্ট দেখায়, পক্ষান্তরে অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্টি আবদ্ধ হলে নিকটস্থ অতি ক্ষুদ্র জিনিসকে বৃহৎ দেখায়। অনুরূপভাবে যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের সংগ্রহশালাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে সুস্পষ্টরূপে দেখা যাবে সুদূর অতীতের বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমকে। দেখা যাবে ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের মল্লভূমকে। দেখা যাবে সুদূর অতীতের এমন সব বিচিত্র বস্তুসমূহ যার থেকে জানা যাবে মল্লভূমের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, শিল্প, সাহিত্য, ভাস্কর্য ও তৎকালীন

ধর্ম-ভাবনা এবং সমাজ-জীবনের বহু কথা।

এর পরেও যদি কেউ প্রশ্ন করেন, 'কি আছে এখানে?' তাহলে প্রতিপ্রশ্ন হবে, 'কি নেই এখানে?'

দেখার মত চোখ, অনুসন্ধিৎসু মন এবং শিক্ষার প্রতি গভীর অনুরাগ থাকলে, অতীতকে ভালবাসতে পারলে এখানে আত্মহারা হওয়ার মতো অর্থাৎ-এর গর্ভগৃহে সঞ্চিত মহামূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য রত্নরাজির মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলার সম্ভাবনা সতত বিদ্যমান। এখানে সংরক্ষিত জিনিসগুলি আপাতদৃষ্টিতে মৌন, কিন্তু গভীর অর্থে মুখর—তাই এগুলি **'মৌনমুখর'**। কথা বলতে জানা এইসব বস্তুসমূহের সংস্পর্শে এলে বর্তমানকে পিছু ফেলে চলে যাওয়া যাবে দূরে, বহুদূরে— সুদূর অতীতে। দেখা যাবে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের ব্যবহৃত মৃৎ-কৌলাল অর্থাৎ তাদের ব্যবহৃত এবং নির্মিত বহুবিধ মৃন্ময়-পাত্র ও বস্তুসমূহ। আরো দেখা যাবে নবাশ্মর আয়ুধ, টেরাকোটা মূর্তি, ছাব্বিশ ও বাহান্ন পলযুক্ত মাল্যদানা, কাকিনী কার্যাপণ মুদ্রা, শিলীভূত হরিণ শিং, নব্যপ্রস্তর যুগের কুঠার, পাষাণচক্র, পেষণী, বাটালি, তীরের ফলা ইত্যাদি। দেখা যাবে আদিবাসী মানুষজনের ব্যবহৃত পিতলের অলঙ্কারাদি।

মৌর্যশুঙ্গ যুগের কয়েকশত অঙ্কমুদ্রার পাশাপাশি এখানে "বেশ কিছু সুলতানী-মুঘল আমলের এবং ব্রিটিশ আমলের মুদ্রা রয়েছে। এগুলির মধ্যে আদিল শাহ, শেরশাহ, শাহ-আলম, ইব্রাহিম শাহ, নাসিরুদ্দিন, সাজাহান, জাহাঙ্গীর, আউরঙ্গজেবের সময়ের মুদ্রা রয়েছে।"[১]

মহারাজ উত্তর হামিরের লিপি বলে অনুমিত কয়েকটি পোড়ামাটির লিপি-ফলক সহ মল্লরাজাদের তিন চারটি প্রস্তরলিপির পাশাপাশি মল্লরাজাদের ব্যবহৃত তলোয়ার, কামানের গোলা ছাড়াও মধ্যযুগের কিছু অস্ত্রশস্ত্র এবং অধুনা ধ্বংসীভূত কিছু মন্দিরের কারুকার্য খচিত পোড়ামাটির ফলকও এই ভবনটিকে করেছে সমৃদ্ধ।

পুরাকৃতি ভবনটির সব থেকে উল্লেখযোগ্য সংগ্রহ হল প্রাচীন পুঁথি-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ। প্রায় সাত হাজার পুঁথি রয়েছে এখানে। তালপাতা, তুলট কাগজ, ও ভূর্জপত্রের উপর লেখা এই পুঁথিগুলি বাংলা, সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষাতেই লেখা। অবশ্য বাংলা এবং সংস্কৃত ভাষাতে লেখা পুঁথির সংখ্যাই বেশী। দর্শন, ন্যায়, কাব্য জ্যোতিষ, ব্যাকরণ ও আয়ুর্বেদ সংক্রান্ত পুঁথিগুলি ছাড়াও বৈষ্ণব-পুঁথির সংখ্যাধিক্যও পরিলক্ষিত হয় প্রভূত পরিমাণে।

শুধুমাত্র গীতগোবিন্দের পঁয়ষট্টিখানি পুঁথির পাশাপশি রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, সঙ্গীত, রাগ-রাগিণী, জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ক পুঁথি ছাড়াও অমরকোষ জাতীয় 'কোষ' গ্রন্থের পুঁথি এবং প্রচুর ধর্মমঙ্গল পুঁথির পাশাপাশি অল্পসংখ্যক মঙ্গল-সাহিত্যের পুঁথিগুলিও উল্লেখ্য। পুঁথির পাল্লা ভারী করতে আরো যেসব পুঁথি এখানে রয়েছে তার মধ্যে জড়িবটি মন্ত্রতন্ত্রের পুঁথি, সত্যপীরের পাঁচালী, পাঁচালী, পালা গানের পুঁথি এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুঁথির কথা বিশেষভাবে স্মরণীয়। এই পুঁথি সংগ্রহের কলেবর বৃদ্ধি করেছে পুরানো চিঠিপত্র, হিসাবপত্র, টোটকা ওষুধপত্রের খাতা, পুরানো দলিল এবং বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের কিছু নথিপত্র।

প্রসঙ্গক্রমে বলি, বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়া শহর এবং বাঁকুড়া জেলার গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে

১। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত, পৃঃ— ৯-১০

ছিটিয়ে থাকা পুঁথির সঞ্চয়কে পাথেয় করেই সাহিত্য পরিষদের শুভযাত্রা শুরু হয় আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে। এসব পুঁথি সংগ্রহের ব্যাপারে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের আন্তরিক সহযোগিতার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতে হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত হাজার সাতেক পুঁথির এই বিশাল সংগ্রহ থেকে একটি সহজ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে তৎকালে এই অঞ্চলে সর্ব বিষয়ে জ্ঞানচর্চার এবং বহুমুখী বিদ্যানুশীলনের একটি সুষ্ঠু পরিবেশ ছিল। প্রাচীন সাহিত্যের গবেষকদের এবং বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থীদের কাছে এই পুঁথিগুলির মূল্য অসামান্য।

পুঁথির পর আসা যাক পুঁথি-সংলগ্ন অবস্থায় অথবা পুঁথি থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া পাটাচিত্রের কথায়। বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া অনধিক ১৬"×৬" মাপের চল্লিশটিরও বেশী পাটাচিত্র রয়েছে এখানে। সরাসরি পাটার উপর এবং ক্ষেত্রবিশেষে পাটার উপর কাপড়ের আচ্ছাদন সেঁটে আঁকা হয়েছে চিত্র। এজন্যই এগুলি পাটাচিত্র নামে অভিহিত। পুঁথির 'কভার পেজ' হিসেবে ব্যবহৃত হত পাটাচিত্রগুলি। এইসব পাটাচিত্রগুলি এতই উৎকৃষ্ট মানের যে আজ থেকে প্রায় দু'আড়াইশ বছর আগে অঙ্কিত হলেও বর্ণলাবণ্যে এগুলি আজও প্রায় অক্ষত। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর উদ্দাম নাম-সংকীর্তন, গৃহত্যাগ, মস্তক মুণ্ডন, সন্ন্যাস গ্রহণ ও ভাব সমাধি, বিষ্ণুর দশ অবতার, শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অঙ্কিত পাটাচিত্রগুলির অঙ্কনশৈলী নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সূক্ষ্ম মননশীলতা, রেখাঙ্কনের বর্ণবৈচিত্র্য ও পরিমার্জিত রসবোধ, চিত্রগুলিকে মাধুর্য মণ্ডিত করেছে। অঙ্কনশৈলীতে রাজস্থানী প্রভাব এবং নৃত্যশৈলীতে মণিপুরী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ''নারী চিত্রের ক্ষেত্রে দেখা যায় গোল ঢালু প্রশস্ত কপালের বেশ কিছুটা উপর থেকে রেশমের মত মিহি চুল এঁকে বিচিত্র কেশপাশ রচিত হয়েছে। নারী মূর্তিগুলি, সুগোল-সুডৌল কমনীয় দেহের এবং অঙ্কন বৈচিত্র্যে অপরূপ লাবণ্যের অধিকারিণী—নারীর দেহে অসামান্য কমনীয়তা আর লাবণ্য বিস্তারের প্রয়াস বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়।''[১] কিছু কিছু পাটাচিত্রের অঙ্কনশৈলীতে অবশ্য আড়ষ্টতা রুক্ষতা ছন্দহীন অঙ্গভঙ্গী ও দেহসৌষ্ঠব পরিলক্ষিত হয়। গ্রাম্যলোকচিত্র সহ পূর্বোক্ত পাটাচিত্রগুলি বাংলা দেশের পাটাচিত্রের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে।

পাটাচিত্রের সূত্র ধরে আসা যাক পটচিত্র প্রসঙ্গে। কাপড়ের উপর আঁকা চিত্রকে পটচিত্র বলে। বিশেষভাবে তৈরি বস্ত্রখণ্ডের উপর হিন্দু দেবদেবী, আদিবাসী নৃত্য, শিকারোৎসব, দশ অবতার তাস, নক্সাতাস এবং নানান ধর্মীয় ও লৌকিক অনুষ্ঠান পটচিত্রের উপজীব্য বিষয়। বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের দুর্গা পূজায় পটচিত্রের ব্যবহার অদ্যাপি প্রচলিত। চিত্রগুলির অঙ্কনশৈলী প্রশংসনীয় এবং আকর্ষণীয়। বিষ্ণুপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত পাটাচিত্র ও পটচিত্রগুলি যেন একটি লুপ্তপ্রায় শিল্পকলার সাক্ষ্য বহন করছে নিঃশব্দে, নীরবে।

পাটাচিত্র এবং পটচিত্র ছাড়া এখানে রয়েছে কিছু আলোকচিত্র। মার্টিন বার্ণ কোম্পানীর সৌজন্যে প্রাপ্ত কয়েকটি 'সাঁওতাল দেওয়াল চিত্র' ছাড়াও বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতশিল্পী রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের পাশাপাশি মৃদঙ্গ বাদক ঈশ্বরচন্দ্র সরকার, কথক রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোকচিত্রও বর্তমান। আলোকচিত্র ছাড়াও শিল্পীদের

১। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন, পৃঃ— ১৫

ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রাদিও সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে এখানে।

চিত্র থেকে এবার আসা যাক বিষ্ণুপুরের বস্ত্র শিল্প প্রসঙ্গে। বিষ্ণুপুরের রেশম বস্ত্র আজ শুধু ভারত বা এশিয়া নয় সারা পৃথিবীর মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বালুচরী শাড়ির জন্যে আজ সে জগদ্বিখ্যাত। পুরাকৃতি ভবনের সংগ্রহশালায় অবশ্য রয়েছে খান চারেক রেশম বস্ত্রখণ্ড। প্রায় একশত বৎসরের পুরানো ঐ বস্ত্রখণ্ডগুলির শিল্প-সৌকুমার্য, বিষ্ণুপুর নিবাসী শিল্পী গোরাচাঁদ দিয়াসী, বিজয়কুমার দে, ফকির রুদ্র মহাশয়দের শিল্প ভাবনার উৎকৃষ্ট ফসল রূপে পুরাকৃতি ভবনটির শ্রীবৃদ্ধি করেছে। অতীতের রেশম বস্ত্রের সূত্র ধরেই বর্তমানের বালুচরী শাড়ির উত্তরণ।

রেশম বস্ত্র প্রসঙ্গে আরো দু-চার কথা না বললেই নয়। কারণ আজকের মতো তখনকার দিনে তাঁত শিল্পে 'জ্যাকার্ড' মেশিনের প্রবর্তন হয়নি। 'সুপারিটানা' (সছিদ্র সুপারির মধ্যে সুতা পরিয়ে) ঝাঁপ টেনে একজন দুজনে বুনত তাঁত। একজন পড়েন চালাত অন্যজন ঝাঁপ টানত। "ডিজাইন অনুযায়ী এক একটি 'পাখি'তে ৮/১০/১২ টি দড়ি থাকত। এতে 'ব'-এর সুতা লাগত খুব বেশী।"[১] একটি শাড়ি তৈরি করতে ঘাম-ঝরানো পরিশ্রম করতে হত শিল্পীকে। তখনকার দিনে যেসব কাপড় তৈরী হত তার পাড় এবং আঁচলায় মাছ, হাতি-ঘোড়া, লতাপাতা, ফুল-পেখম-মেলা নৃত্যরত ময়ূর, সারিবদ্ধ মানুষ ইত্যাদি চিত্রিত হত। লাল, গোলাপী এবং ময়ূরকণ্ঠী রঙের শাড়ির প্রচলন ছিল সর্বাধিক। শাড়ির রং তৈরি হত সম্পূর্ণ দেশীয় পদ্ধতিতে। গাছের ছাল, পাতা, মাটি, লাক্ষা, বহেড়া, আমলা ও হরিতকীর সাহায্যে তৈরি করা হত দৃষ্টিনন্দন রং এবং রঙের কাজ। পরবর্তীকালে প্রায় ৭৫/৮০ বছর আগে 'জ্যাকার্ড' মেশিনের প্রচলন শুরু হয়। 'জ্যাকার্ড' মেশিনের অসামান্য অবদানে আজ হাজারো ডিজাইনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিখুঁত কারুকার্য-সম্পন্ন বালুচরী শাড়ির উদ্ভাবন হয়েছে। বিষ্ণুপুরের বালুচরী শাড়ির আলোচনা প্রসঙ্গে শোনাব সে সব কথা, এখন দেখাব কতিপয় প্রস্তর ভাস্কর্য।

পাথরের উপর মূর্তি ও অক্ষরাদি খোদাই করার শিল্প-কার্যকে প্রস্তর-ভাস্কর্য বলে। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের বৃহদংশ জুড়ে রয়েছে নানান ধরনের প্রস্তর ভাস্কর্যের নমুনা। এখানে সংরক্ষিত পাথরের মূর্তি, নিবেদন দেউল, কারুকার্যখচিত প্রস্তরখিলান, কুঠারাদি আয়ুধ প্রায় সবই পাওয়া গেছে বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থান থেকে। পুরুলিয়ার মানবাজার অঞ্চল থেকেও পাওয়া গেছে স্বল্প সংখ্যক মূর্তি। তিনটি অনুপম জৈন নিবেদন দেউল ছাড়াও জৈন তীর্থঙ্কর ও যক্ষ-যক্ষীর পাশাপাশি এখানে রয়েছে বেশ কিছু সংখ্যক শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব দেব-দেবীর মূর্তি। "মূর্তিগুলি প্রধানতঃ বিষ্ণুপুর মহকুমার বিষ্ণুপুর এবং জয়পুর থানা (শলদা-গোকুলনগর-রাজগ্রাম অঞ্চল) থেকে এবং বাঁকুড়া সদর মহকুমার রাণীবাঁধ, রাইপুর, ওন্দা বড়জোড়া থেকে সংগৃহীত হয়েছে। দুটি জৈন তীর্থের মূর্তি সংগৃহীত হয়েছে পুরুলিয়া জেলা থেকে।"[২] বিষ্ণুপুর থানার জয়কৃষ্ণপুর গ্রাম থেকেও পাওয়া গেছে একাধিক মূর্তি। এই ভবনে সংরক্ষিত মূর্তিগুলি সংখ্যাতে খুব বেশী না হলেও বৈচিত্র্যে ও বৈশিষ্ট্যে বিশেষ আকর্ষণীয়।

বেলে পাথরের উপর খোদাই করে নির্মিত অনন্তশয়ন বিষ্ণু, সূর্য, ভৈরব, বটুক ভৈরব, শিব, নৃত্যরত শিব, গণেশ, কার্তিক, চামুণ্ডা, মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা, দশভুজা, ত্রিমুখ, চতুর্মুখ বিশিষ্ট দেবী অম্বিকা, হস্তীপৃষ্ঠে ইন্দ্রাণী, উমা-মহেশ্বর প্রভৃতি হিন্দু দেব-দেবীদের

১। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন, পৃঃ— ১৫ ২। ঐ, পৃঃ— ৩৩

মূর্তির পাশাপাশি নবনারীকুঞ্জর ছাড়াও জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথ, নেমিনাথ, পার্শ্বনাথ, শান্তিনাথ, জৈন-জনক-জননী ও শাসন-যক্ষী প্রভৃতির ছোট বড় ক্ষত-অক্ষত মূর্তিগুলির সুসংহত সমাবেশে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয়। হয়ে উঠেছে রত্নগর্ভা। রত্নগর্ভা সাহিত্য পরিষদে বাঁকুড়া জেলার ঢোকরা শিল্পের নিদর্শন স্বরূপ বহু পুরাতন লক্ষ্মীর সাজ ছাড়াও নাড়ুগোপাল, নারীমূর্তি, ধাবমান কুকুর, মাছ, আম প্রভৃতি দ্রব্যের একটি চিত্তাকর্ষক সংগ্রহও পরিষদ শাখাকে সমৃদ্ধ করেছে।

রত্নগর্ভা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রাঙ্গণ থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে বার বার মনে পড়ে সেই সব কর্মযোগীদের কথা যাঁদেব নিরলস এবং নিঃস্বার্থ কর্মপ্রচেষ্টাতে তিলে তিলে গড়ে উঠেছে এরকম একটি মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা। এঁদের মধ্যে রয়েছেন আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সত্যকিঙ্কর সাহানা বিদ্যাবিনোদ, ডাঃ কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক রামশরণ ঘোষ, হেমেন্দ্রনাথ পালিত, গবেষক গঙ্গাগোবিন্দ রায়, গবেষক মাণিকলাল সিংহ, শিক্ষাবিদ তথা সমাজসেবী চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল এ.এল. ডায়াস, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মিউজিওলজি বিভাগের অধ্যাপক শ্রীসন্তোষকুমার বসু, অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন প্রমুখ ব্যক্তিবর্গের নামও এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। এছাড়া আপামর জেলাবাসী এবং স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের সহযোগিতাও উল্লেখ্য। দৈনিক আনন্দবাজার, যুগান্তর, বসুমতী, আকাশবাণী এবং জেলার পত্র-পত্রিকাগুলিও এর প্রচার প্রসারে প্রভূত সাহায্য করেছে। ডঃ গঙ্গাগোবিন্দ রায় প্রতিষ্ঠানটির প্রথম সভাপতি এবং মাণিকলাল সিংহ প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদক নির্বাচিত হন। মুখ্যতঃ মাণিকলাল সিংহ এবং তাঁর সহকর্মী পূর্বোক্ত চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়দের যুগ্ম প্রয়াস এবং অনুসন্ধিৎসা প্রতিষ্ঠানটির উন্নতিকে করেছে ত্বরান্বিত। করেছে সুসমৃদ্ধ।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী প্রতিষ্ঠানটির আনুষ্ঠানিক জন্মলগ্ন সূচিত হলেও পুরাবস্তু সংগ্রহের কাজ পুরোদমে শুরু হয় ১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। প্রতিষ্ঠানটির জন্মস্থান বিষ্ণুপুর হাজরাপাড়া নিবাসী আয়কাত পরিবারের বহির্বাটী। জন্মস্থানে এক বৎসরকাল অবস্থানের পর ১৯৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এটি স্থানান্তরিত হয় বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে।

১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর 'মল্লেশ্বর ভট্টাচার্য পাড়া' নিবাসী কেনারাম ভট্টাচার্য পরিবারের প্রদত্ত ১০ কাঠা জমির উপর ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠানটির স্থায়ী ভবন নির্মাণের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি দপ্তরের তদানীন্তন মন্ত্রী অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর। বিষ্ণুপুরের তৎকালীন মহকুমা শাসক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের অনুপ্রেরণায় এবং কলিকাতা রেঞ্জার্স ক্লাব প্রদত্ত পাঁচ হাজার টাকাকে পাথেয় করে শুরু হয় ভবন নির্মাণের কাজ। পরবর্তীকালে আসতে থাকে সরকারী এবং বে-সরকারী আর্থিক সাহায্য। কে.জি. ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউটের ডেমনস্ট্রেটর (সহকারী অধ্যাপক) ও শিল্পী অনিল কর্মকার মহাশয়ের নক্সা ও পরিকল্পনা মোতাবেক ভবনটি নির্মিত হয় বিলম্বিত লয়ে। অতঃপর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নব-নির্মিত ভবনটি ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে উদ্বোধন করেন ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে প্রায় ২২ বছর অবস্থানের পর প্রতিষ্ঠানটি স্থায়ীভাবে উঠে আসে কলেজ-মোড়ের বর্তমান ভবনটিতে। এবার বলি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' (বিষ্ণুপুর শাখা) 'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন'-এ নামান্তরিত হল কিরূপে।

এ প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় লিখেছেন, "১৯৫৪ সালের বৈশাখ মাসে পরিষৎ শাখার পক্ষ থেকে সভ্যদের একটি দল আচার্য যোগেশ রায় বিদ্যানিধির ভবনে (বাঁকুড়া) গিয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানান। এটি পরিষদ শাখার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন; এই দিনই যোগেশচন্দ্রের সংবর্ধনা সভায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিষ্ণুপুর শাখার সংগ্রহশালাটির নামকরণ হয় **'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন।'**"[১]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের 'যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন' নামকরণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল **আচার্য যোগেশচন্দ্র** ছিলেন বাঁকুড়া জেলার এক গৌরবোজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব। যোগেশচন্দ্র রায়, বিদ্যানিধি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে হুগলী জেলার দিগড়গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। শিক্ষান্তে তিনি কটক র‍্যাভেনশ কলেজে অধ্যাপকের পদ অলংকৃত করেন। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে অবসর গ্রহণের পর বাঁকুড়াতে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন এবং গবেষণা কর্মে আত্মনিয়োগ করেন। বাঙলাভাষা, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষশাস্ত্র বিষয়ে প্রভূত মৌলিক গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করে বাঁকুড়াবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্বে উত্তীর্ণ হন। 'পূজাপার্বণ', 'বাঙলা শব্দকোষ', 'চণ্ডীদাসচরিত' ইত্যাদি তাঁর উল্লেখযোগ্য রচনা। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নাম পরিবর্তন করে 'যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন' নামকরণের মধ্যে দেশের কৃতী সন্তানের স্মৃতিকে সদা জাগরুক রাখার একটি প্রয়াস ছাড়াও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণের ক্ষেত্রে এটি একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক তথা এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন সম্পাদক মাণিকলাল সিংহ মহাশয়ের ছাত্রাবস্থা থেকে সংগৃহীত পুঁথিপত্রকে পাথেয় করে পরিষদ শাখার যে শুভযাত্রা শুরু হয়েছিল একদা, আজ তা এক পূর্ণাঙ্গ মিউজিয়াম্ বা সংগ্রহশালাতে রূপান্তরিত হয়েছে। বহু জ্ঞানীগুণী ও বিদগ্ধ ব্যক্তির সহযোগিতায় ধন্য এবং পদরেণুতে রঞ্জিত আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন থেকে বিদায় নেবার প্রাক্কালে তাই বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই প্রতিষ্ঠানটির সাথে জড়িত কর্মবীরদের। আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই প্রতিষ্ঠানটির প্রবাদপুরুষ প্রয়াত মাণিকলাল সিংহ মহাশয়কে।

এবার মধ্যাহ্ন ভোজের বিরতি। পূর্ব-নির্ধারিত ব্যবস্থামতো আজ আমরা মা সর্বমঙ্গলার প্রসাদ পাব। প্রসাদ পাওয়ার পর যৎসামান্য বিশ্রাম। বিশ্রামের পর প্রথমেই থাকবে **গুম্ঘর বা ফোয়ারাখানা।**

অধ্যায়-১৫

গুম্ঘর, গুম্গড় বা ফোয়ারাখানা

'আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন' দর্শনের পর আমরা দেখব 'গুম্ঘর' বা 'ফোয়ারাখানা'। আমাদের চলার পথের পশ্চিম দিকে রয়েছে বিষ্ণুপুরের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'কে.জি. ইন্‌জিনীয়ারিং ইন্‌স্টিটিউট' এবং রাস্তাটির পূর্ব দিকে রয়েছে 'তিলবাড়ি মহল্লা'। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে এই তিলবাড়িতেই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু জনসভা করেছিলেন। তখন স্থানটি ছিল ঘরবাড়ীবিহীন উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। কথায় কথায় আমরা এসে গেছি আমাদের গন্তব্যস্থলে।

১। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন, পৃঃ—৬

রামানন্দ কলেজ থেকে রাজ-দরবার এবং সঙ্কটতলা থেকে 'নিখিলবঙ্গ শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়'গামী রাস্তা দুটির সংযোগস্থলের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত দরজা, জানালা ও ছাদবিহীন ইষ্টক নির্মিত এই যে ইমারতটি দেখছেন এটিই হল গুম্‌ঘর, গুম্‌গড় বা গুমটগড়। ৩৭ফুট ৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, ৩৫ ফুট ৪ ইঞ্চি প্রস্থ এবং প্রায় ৩০ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট এই ইমারতটি একটি জলাধার বা চৌবাচ্চা। জলাধারটির দক্ষিণ দিকে রয়েছে একটি পরিখা। এই পরিখাটি 'ফোয়ারাখানা' নামে চিহ্নিত। উক্ত জলাধারটি থেকে নীচের ফোয়ারাখানাতে ফোয়ারা লাগানো ছিল। সেই ফোয়ারা থেকে শত ধারায় উৎসারিত জলধারা একদিকে যেমন ছিল দৃষ্টিনন্দন আনন্দের উৎস স্বরূপ, অন্যদিকে তেমনি এই জলধারা সন্নিকটস্থ রাজবাটীর গুমট আবহাওয়াকে সুশীতল রাখার পক্ষে সহায়ক ছিল। উক্ত চৌবাচ্চার অভ্যন্তরভাগের তলদেশে মোটা মোটা কয়েকটি নলের অস্তিত্ব বিদ্যমান। রাজবাটীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের এখানে ওখানে অনুরূপ নলের বা পাইপেরও সন্ধান পাওয়া যায় মৃত্তিকা খননকালে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে এই ইমারতটি থেকে রাজবাটীতে পাইপ সংযোগে জল সরবরাহ করা হত। ইমারত সংলগ্ন পূর্বোক্ত পরিখাটি ছিল লালবাঁধের সাথে সংযুক্ত। লালবাঁধ থেকে জল আসত পরিখাতে এবং পরিখা থেকে জল ভরা হত উক্ত চৌবাচ্চাতে।

উক্ত ইমারতটি সম্বন্ধে ভিন্ন মতও প্রচলিত। শোনা যায় প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের নাকি এই ইমারতের মধ্যে নিক্ষেপ করা হত। ধারালো অস্ত্রশস্ত্র প্রোথিত উক্ত ইমারতের মধ্যে নিক্ষেপিত হয়ে অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত আসামীরা যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে তিলে তিলে এগিয়ে যেত মৃত্যুর দিকে এবং মারা যেত অবশেষে। ইমারতটির অভ্যন্তরভাগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের গুম্ বা খুন করা হত—প্রচলিত এই ধারণা থেকে অনেকে এটিকে 'গুম্‌ঘর' বলে অভিহিত করেন। বিষ্ণুপুর-প্রেমিক জনৈক লক্ষ্মীকান্ত দে 'বিষ্ণুপুরের কথা' কবিতাতে গুম্‌ঘর প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"... ... ...
সাক্ষীস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে
এখনও গুম্‌ঘর,
উপরে উঠে দেখতে গেলে
ভয়ে আসবে জ্বর।
গুম্ ঘরেতে গুম্ করা হয়
উপর থেকে ফেলে,
ছোরা বল্লম পোঁতা আছে
গুম্ ঘরেরই তলে।
এই কথাটি শোনা কথা
কখনও দেখি নাই,
সবার মুখে এই কথাটা
শুনতে শুধু পাই।"[১]

ইমারতটিকে 'গুম্‌ঘর' বলা হলেও বক্তব্যের পক্ষে সমর্থনযোগ্য যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। জনশ্রুতি বলে রাজবাড়ির পশ্চিম দিকে বর্তমান মিলনশ্রী সিনেমার সন্নিকটে

ছিল **'কোতলখানা'** বা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের বধ্যভূমি। পক্ষান্তরে সমাজের বিদগ্ধ ব্যক্তিদের অভিমত, —রাজবাড়ির সন্নিকটে নয়, বধ্যভূমি ছিল রাজবাড়ি থেকে অনেক দূরে বিষ্ণুপুরের বধিলা পাড়াতে। **বধ্যভূমির সুবাদেই ঐ অঞ্চলের নাম হয় বধিলা পাড়া।** বর্তমানে বিকৃত হয়ে হয়েছে বইলা পাড়া। তাঁদের মতে বিষ্ণুপুরের ধর্মপ্রাণ রাজাদের রাজবাড়ির সন্নিকটে নৃশংস নরহত্যার ব্যাপারটা যুক্তিযুক্ত নয়। তাছাড়া বধিলা পাড়াতে **'বধিলা'** উপাধিধারী ঘাতক বা জল্লাদ বংশের উত্তরপুরুষদের অস্তিত্বও এই সত্যকেই সমর্থন করে। আমার মনে হয় লালগড়ের মতো এই গুমঘরের অভ্যন্তরভাগে খননকার্য চালালে হয়তোবা এর রহস্য উদ্ঘাটন সম্ভব হত।

সে যাই হোক, গঠনশৈলীর দিক থেকে বিচার করলে একথা অবশ্যই মানতে হয় যে কয়েক শতাব্দী পূর্বে নির্মিত এই ইষ্টক-ইমারতটির গায়ে বয়সের ছাপ পড়লেও প্রায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে এখনও।

অধ্যায়-১৬

কামানঢালা

গুম্‌গড় বা ফোয়ারাখানা অবলোকনের পর আমরা এখন যে স্থানটিতে উপনীত হয়েছি সে স্থানটি **'কামানঢালা'** নামেই সুবিদিত। পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো আমি এখন আপনাদের শোনাব কামান ঢালার ইতিকথা। এ প্রসঙ্গে বলি দু'চার কথা। আকবরের সেনাপতি অম্বররাজ মানসিংহের পুত্র কুমার জগৎ সিংহ অত্যাচারী পাঠানসেনা কতলু খাঁকে শায়েস্তা করতে জাহানাবাদে (বর্তমানে আরামবাগ) এসে উপস্থিত হন এবং শত্রুসৈন্যকে দুর্বল ভেবে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন না করে কয়েকজন মাত্র সৈন্য নিয়ে মদ্যপ অবস্থায় জাহানবাদ থেকে গড়মান্দারণ যাবার পথে ইং ২১ মে, ১৫৯০ খৃষ্টাব্দে কতলু খাঁয়ের সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে আহত এবং বন্দী হন। দুঃসংবাদ শুনে বিচলিত হন মহারাজ বীর হাম্বীর এবং আকস্মিক আক্রমণে কতলু খাঁয়ের সৈন্যদের হাত থেকে জগৎ সিংহকে ছিনিয়ে নিয়ে আসেন, সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তোলেন এবং পিতা মানসিংহের হাতে জগৎ সিংহকে সমর্পণ করেন।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পাঠান সেনাপতি কতলু খাঁ লোহানী বিষ্ণুপুরের চিরশত্রুতে পরিণত হন। আর জগৎ সিংহের জীবন রক্ষার প্রতিদানে ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে মান সিংহ পেশকুসের অন্তর্গত কিল্লাজাত মহলের অন্যতম জমিদার রূপে হাম্বীর মল্লকে স্বীকৃতি দেন এবং মহিষাদল, বামনভূম, মানভূম ও রায়পুর প্রভৃতি বারটি জমিদারী ও ঊনত্রিশটি কিল্লা প্রদান করেন। আর মহামান্য আকবর বীর হাম্বীরের উপর খুশী হয়ে বিষ্ণুপুরকে মিত্র রাজ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেন এবং রাজা বীর হাম্বীরকে কামান তৈরী করবার অনুমতি দেন। এই ছাড়পত্র পাওয়ার পর বিষ্ণুপুরে ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতির কামান তৈরী হতে থাকে প্রভূত পরিমাণে। ঐসব কামানগুলি নির্মিত হত বিষ্ণুপুরের এই বিশেষ এলাকাটিতে। এজন্য গুম্‌গড় ও জোড়বাংলো মন্দিরের পূর্ব দিকে অবস্থিত পরিখা এবং মূর্চা (ছোটখাটো কৃত্রিম পাহাড়) দ্বারা পরিবেষ্টিত এই অঞ্চলটি **'কামানঢালা'** নামে সুপ্রসিদ্ধ। প্রসঙ্গতঃ বলি, বীর হাম্বীরের পিতা তাঁর রাজত্বকালেই গোপনে কামান ঢালা

শুরু করেছিলেন এখানে।

এখন আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু মাণিকলাল সিংহ মহাশয়ের 'পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি' পুস্তক থেকে প্রাসঙ্গিক কিছু কথা শোনাব। তিনি লিখেছেন, কামান তৈরীর উদ্দেশ্যে "লৌহ নিষ্কাশনের জন্য বীর হাম্বীর সিংভূম হইতে লোহার জাতির মানুষদের আনয়ন করান। বর্তমান বিষ্ণুপুর নগরীর সংলগ্ন পানশিউলি, চৌকান, তেজপাল এবং যাদবনগর ইত্যাদি গ্রামগুলিতে লোহারগণ বসতি স্থাপন করেন। মল্লভূমে যে সমস্ত লোহারগণ বসতি স্থাপন করেন তাহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান থাক বা উপভাগ রহিয়াছে— (১) কাঁসাইকূলা, (২) আঙ্গারা। কাঁসাইকূলা লোহারদের পূর্বপুরুষগণ বহু পূর্বেই সিংভূম হইতে বাঁকুড়া মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁসাইনদী কেন্দ্রে বসতি করিয়াছিল।

আঙ্গারা থাকের লোহারগণ কাঠকয়লা বা অঙ্গার তৈয়ারী করার কাজে সুদক্ষ ছিল— ইহারা অঙ্গার (charcoal)-এর সাহায্যে হাপরে অত্যধিক উত্তাপ সৃষ্টি করিয়া লৌহ গলাইবার পদ্ধতি এবং গলিত লৌহের সঙ্গে বালুকণা (Silica) পরিমাণ মতো মিশাইয়া মজবুত ইস্পাত তৈয়ারী করিবার বিদ্যাও জানিত। ... মল্লভূমের লোহারগণ স্থানীয় মাকড়া পাথর গলাইয়া প্রয়োজনীয় লৌহ নিষ্কাশন করিত। মল্লভূমের রাজারা লোহারদের দ্বারা প্রস্তুত লৌহ পিণ্ডগুলিকে মল্লভূমের বিরালই শ্রেণীর সুদক্ষ কর্মকারদের সাহায্যে গলাইয়া কামানঢালা নামক স্থানে প্রোথিত মাটির ছাঁচে ঢালাইয়া কামানের খোল এবং পেটাইয়া মজবুত কামান তৈয়ারী করাইতেন। মল্ল রাজারা কামান পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং দাগিবার সুকৌশল শিক্ষা দেওয়ার জন্য মোগল দরবার হইতে সুদক্ষ মুসলমান কারিগরও আনাইয়াছিলেন। **কামানের বিষয়ে অভিজ্ঞ এই সব সুদক্ষ কারিগর মিরদাহা (Mirdaha) বলিয়া অভিহিত হইতেন।** দিল্লী বা মুর্শিদাবাদ হইতে আগত এই প্রাচীন মুসলমান মিরদাহা পরিবার মল্লরাজাদের নিকট জমিজমা বৃত্তিরূপে পাইয়া আজও মল্লভূমের বিভিন্ন গ্রামে বসবাস করিতেছেন। .... সুচতুর মল্ল রাজারা শুধুমাত্র মুসলমান কারিগরদের উপরই নির্ভর করিতেন না। এই সমস্ত কারিগরদের দিয়া মল্লভূমের বিভিন্ন জাতির মানুষকে এই কাজে শিক্ষা দেওয়াইয়া সুদক্ষ কারিগর তৈয়ারী করিয়া তোলেন।

বিষ্ণুপুর নগরীর বাঁধপাড় মহল্লায় এক সদ্‌গোপ পরিবার পুরুষানুক্রমে মিরদাহা (Match lock) র কাজ করিতেন। তাঁহারা মিদ্যা বলিয়া সুপরিচিত। মল্লরাজাদের কামান ঢালার কারখানায় বহু কামান নির্মিত হইয়াছিল। **প্রত্যেক কামানেরই নাম ছিল। কয়েকটি কামানের নাম দেওয়া হইল গোরক, ঝুলঝাড়া, চড়কবিজ্‌লী, বাঘমুয়া ইত্যাদি।**"

শত শত কামান ছিল বিষ্ণুপুরে। উক্ত কামানগুলির অনেকগুলিই বিস্ফোরণের ফলে নষ্ট হয়ে যায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বকালে বেশ কিছু কামান বিষ্ণুপুর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের শোভা বর্ধন করেছে বলে কথিত আছে। অপহরণের এই চক্রান্ত থেকে কামানগুলিকে রক্ষা করার জন্য অনেক কামান মাটির গভীরে লুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাৎক্ষণিকভাবে। লুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল ঢাল, তলোয়ার, বল্লম, বন্দুক অস্ত্রাদিও।

কামান তৈয়ারীর পদ্ধতির ইতিকথায় ইতি টেনে চলুন লঘুপদে এগিয়ে যাই শ্যামরায়ের মন্দির অভিমুখে।

অধ্যায়-১৭

টেরাকোটা শিল্প-প্রসঙ্গ

আপাদমস্তক মনোমুগ্ধকর টেরাকোটা শিল্প-সম্ভারের মলাটে মোড়া শ্যামরায়ের মন্দিরটি দর্শনের পূর্বে প্রাসঙ্গিকভাবেই বলতে হয় এই শিল্প সম্বন্ধে দু-চার কথা। কারণ মল্লভূমের বেশ কিছু মন্দির টেরাকোটা স্থাপত্যের নিরুপম নিদর্শন। ইংরাজী (terra) টেরা শব্দের অর্থ পৃথিবী বা মাটি। আর টেরাকোটা (terra-cotta) শিল্প বলতে বোঝায় পোড়ামাটির শিল্পকর্ম।

ইতিহাস বলে এই শিল্প হঠাৎ করে গজিয়ে ওঠা অভিনব কোন শিল্প নয়। এই শিল্পের মূল শিকড়-বাকড় রয়েছে মানব-সভ্যতার সূচনার গভীরে প্রোথিত। একদা নিত্য ব্যবহার্য মৃৎপাত্র তৈরীর মাধ্যমে যে শিল্পের অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল প্রাগৈতিহাসিক যুগে, ক্রমোত্তরণের পথে আজ তা বহুরূপে বিকশিত বিশ্বজয়ী শিল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। টেরাকোটার শিল্প বৈভবের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে যুগ-যুগান্তের শিল্প-সাধনা তথা শিল্প-চেতনার ইতিহাস যা 'এসেছে চলিয়া স্খলিয়া স্খলিয়া রূপ হতে রূপে.....।' "টেরাকোটাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে পৃথিবীর আদিমতম আন্তর্জাতিক শিল্পজগৎ—টেরাকোটার জগতেই লুকিয়ে আছে ভারত-ভাস্কর্যের উৎপত্তি আর ক্রমবিকাশের ইতিহাস। এই জগতেই প্রথম অনুভব করা যায় প্রাচীন ভারতের শিল্পজগতে বহির্ভারতীয় প্রভাবের পদসঞ্চার—সিন্ধু-সভ্যতায় সুমেরীয় প্রভাব, প্রাক্-মৌর্যযুগে পশ্চিম-এশীয় প্রভাব, মৌর্যযুগে গ্রীক পারসিক প্রভাব, সুঙ্গযুগে পশ্চিম এশীয় প্রভাব আর কুষাণযুগে গ্রীক প্রভাব। আবার এইখানেই লক্ষ্য করা যায় সব প্রভাবকে আত্মস্থ আর অতিক্রম করে ভারতের একটি নিজস্ব শিল্প-সত্তার অভিব্যক্তি। টেরাকোটা বিশেষভাবে মাটির মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের সবচেয়ে জনপ্রিয় মাধ্যম, তাই এদেশের মাটির তীব্রতম শক্তি সহজেই টেরাকোটা শিল্পে আত্মপ্রভাব বিস্তার ক'রে বৈদেশিক প্রভাবকে আত্মসাৎ করেছে। ফসিল যেমন মানুষের জৈব অস্তিত্বের আদিমতম সাক্ষী—টেরাকোটাই তেমনি বোধহয় মানব-সংস্কৃতির প্রাচীনতম প্রমাণ।" 'বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা' গ্রন্থে কথাগুলি লিখেছেন গ্রন্থকার চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়।

শুধু ভারতবর্ষ নয়, চীন, মিশর, ক্রীট, সাইপ্রাস, সুমেরিয়া-ব্যাবিলন, গ্রীস, ইটালী, দক্ষিণ আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও এই শিল্পের বহুল প্রচলন ছিল। ঐ সব দেশে যে সমস্ত নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র, শিল্পকলার নিদর্শন, মূর্তি এবং ধর্মপ্রতীক পাওয়া গেছে সে সবই পোড়া মাটির তৈরী।

দাক্ষিণাত্যে প্রাগৈতিহাসিক যুগের অনেক টেরাকোটা মূর্তির সন্ধান মিলেছে। মহেঞ্জোদড়োতে পাওয়া গেছে উন্নতমানের কিছু মূর্তির পাশাপাশি জীবজন্তু সহ খেলনা জাতীয় বস্তু সামগ্রী। তক্ষশীলা, মথুরা, ভিটা, বক্সার, পাটনা প্রভৃতি স্থান থেকে প্রাপ্ত টেরাকোটা মূর্তিগুলি সিন্ধু-সভ্যতার পরবর্তী কিন্তু মৌর্য যুগের অব্যবহিত পূর্বের বলেই প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান।

গুপ্ত পূর্ববর্তী যুগের প্রাপ্ত মূর্তিগুলির প্রায় সবই লোকধর্ম উপাস্য যক্ষ-যক্ষিণীর। অথচ গুপ্ত যুগের ধর্মীয় মূর্তিগুলির প্রায় অধিকাংশই মহাযান সম্প্রদায়ের বৌদ্ধ দেব-

দেবী বা হিন্দু দেব-দেবীদের। ভারত সংস্কৃতির সুবর্ণযুগ রূপে চিহ্নিত গুপ্তযুগে (খ্রীষ্টীয় ৪র্থ-৭ম শতক) চিত্রকলা ও প্রস্তর ভাস্কর্যের পাশাপাশি চিত্তাকর্ষক মৃৎশিল্প তথা টেরাকোটা শিল্পের ব্যাপক অভ্যুত্থান ঘটে। খুব সম্ভবতঃ গুপ্তযুগ থেকেই গৃহসজ্জার কাজে, সামাজিক উৎসবে এবং মন্দির-গাত্রে টেরাকোটা বস্তু বিন্যাসের প্রচলন হয়।

খ্রীষ্টীয় ৮ম শতকের বেশ কিছু টেরাকোটা বস্তুর সন্ধান মেলে অসম, বাংলা এবং কাশ্মীরে। খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতাব্দীতে নির্মিত গ্রামাঞ্চলের লোকশিল্প বিষয়ক এবং মন্দির সজ্জার কাজে ব্যবহৃত বহু সংখ্যক মৃৎফলক পাওয়া যায় রাজশাহী জেলার পাহাড়পুরে। পাহাড়পুরের ন্যায় লোকশিল্পানুগ ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে অসমে এবং বাংলাদেশের ময়নামতী ও সাভারে। খ্রীষ্টীয় ১০ম-১১শ শতাব্দীতে নির্মিত, বিষ্ণুপুরের মাইল দশেক উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত বহুলাড়া গ্রামের প্রায় ৬৩ ফুট উচ্চ ইষ্টক-নির্মিত বিখ্যাত সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির গাত্রে টেরাকোটা ভাস্কর্যের অপূর্ব সমাবেশ পরিলক্ষিত হয়। সমসাময়িক কালে প্রতিষ্ঠিত, বাঁকুড়া বিষ্ণুপুর সড়কের উত্তরে বালিয়াড়া গ্রামের জরাজীর্ণ মন্দিরটিও টেরাকোটা বৈভবের সাক্ষ্য বহন করছে নীরবে। এছাড়া এ সময়ে উত্তর ভারতের বেশ কয়েকটি ইষ্টক-নির্মিত মন্দিরে নক্সা-অলংকরণের কার্যে টেরাকোটা ফলকের সন্নিবেশ হয়েছিল। তুর্কী বিজয়ের পর বাংলাদেশে মন্দির নির্মাণের উৎসাহে ভাটা পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই এই সময় প্রায় পাঁচ শত বছর কালের কোন টেরাকোটা শিল্পের হদিস মেলে না। মুসলিম শাসনকালের দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৪০০ থেকে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মুসলিম স্থাপত্যে টেরাকোটার অভ্যুদয় ঘটে, যার উৎকৃষ্ট ফসলগুলির সন্ধান মেলে মালদহ জেলার গৌড়, আদিনা ও পাণ্ডুয়ায়। তুর্কী বিজয়ের পর দীর্ঘ সময় বয়ে গেছে। শাসক-শাসিতের সম্পর্ক ভুলে গিয়ে হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় পরস্পর পরস্পরের সান্নিধ্যে আসায় উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু সাংস্কৃতিক সমন্বয় ঘটে। হিন্দু শিল্পীগণ মুসলমান শিল্পীদের সংস্পর্শে এসে কয়েক শ বছরের অনভ্যাসের ফলে হারানো দক্ষতা ফিরে পান এবং নতুন উদ্যোগে টেরাকোটা সৃজনে ব্রতী হন। "দ্বিতীয় পর্যায়ে এ কারুকর্মে তাঁরা যখন হাত দিলেন তখন আদর্শ হিসেবে পেলেন সদ্যোনির্মিত বহু মুসলিম ইমারতের জ্যামিতিক বা ফুললতাপাতার নকশা। কঠিন ধর্মীয় নিষেধে মুসলমান শিল্পীরা নরনারী এমন কি পশুপাখিরও মূর্তি রচনা করতে পারেন নি; দেবদেবীর কথা তাঁদের ক্ষেত্রে তো ওঠেই না। কিন্তু হিন্দু ভাস্করদের হাতে প'ড়ে 'টেরাকোটা'—অলংকরণশিল্পের মরা গাঙে যেন দুকূল ছাপানো বান এল। ফুললতাপাতা বা জ্যামিতিক নকশার ক্ষেত্রেও তাঁদের যেমন কোন নিগড় ছিল না, তেমনি ছিল না রামায়ণ, মহাভারত তথা অসংখ্য পৌরাণিক কাহিনীর কল্পলোকে অবাধ বিচরণের।"[১]

খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট বীর হাম্বীরের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণের পর বিষ্ণুপুর তথা মল্লরাজ্যে কৃষ্ণ-বিষ্ণু উপাসনার যে প্রবল ধর্মীয় বাতাবরণ তৈরী হয় তারই সার্থক ফসল হিসেবে মল্লরাজ্যে সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীতে গড়ে ওঠে রাধাকৃষ্ণের অসংখ্য মন্দির। এগুলি হয় বাঁকুড়ার মাকড়া পাথর নয়তো বা ইট দিয়ে তৈরী। আবার ক্ষেত্রবিশেষে একই মন্দিরে ব্যবহৃত হয়েছে পাথর এবং ইট। পাথরের মন্দিরের ক্ষেত্রে খোদাই কার্যের প্রাধান্য। ইটের মন্দিরগুলির গাত্রাভরণ হিসেবে ছাঁচে গড়া টেরাকোটা ফলকের প্রয়োগ হয়েছে প্রভূত পরিমাণে।

১। বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, পৃঃ— ১৯

দেবালয়গুলির অঙ্গসজ্জার ক্ষেত্রে রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণকাহিনীর পাশাপাশি সমকালীন সমাজচিত্র, বাঙালীর অন্দরমহলের ঘরোয়া দৃশ্য, যুদ্ধ-চিত্র, শিকার-দৃশ্য, প্রমোদ-ভ্রমণ, নৌকাবিহার, লোকসংস্কৃতি, বন্য এবং গৃহপালিত জন্তু জানোয়ার ছাড়াও মহান্ত-সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, বেদে বেদেনীদের কসরৎ, এমনকি ফিরিঙ্গী-জীবন-চিত্রও স্থান পেয়েছে টেরাকোটার প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে। এছাড়াও মুসলিম শিল্প ভাবনা প্রসূত ফুললতাপাতা সহ ফুলকারী নক্সা, রেখাবিন্যাস চিত্র এবং জ্যামিতিক নক্সাতো আছেই। **নেই যেটা সেটা হল, উড়িষ্যার মন্দির-গাত্রে মিথুন ভাস্কর্যের ব্যাপকতা সত্ত্বেও উড়িষ্যার মন্দিরশৈলীর প্রভাব-পরিমণ্ডলের মধ্যে থেকেও মিথুন ভাস্কর্যের প্রতি সহজাত দুর্বলতা। এ বিষয়ে মন্দির-ভাস্করদের সংযম এবং শ্লীলতা বোধ অবশ্যই সুরুচির পরিচায়ক।**

মন্দিরের গাত্রাভরণ হিসেবে দেব-দেবীর মূর্তি তথা লীলাকাহিনীর বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখ্য বিষয় হল ধর্মীয় সহিষ্ণুতা তথা মনের উদারতা।

"রাধাকৃষ্ণের মন্দিরগুলিতে একাধারে বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব—সব রকম ভক্তিভাবই স্থান পেয়েছে। প্রবেশ-তোরণের খিলানের বক্ররেখা বরাবর শিবলিঙ্গযুক্ত ছোট ছোট প্রতীক শিবমন্দির উৎকীর্ণ করা একদা প্রথায় পরিণত হয়েছিল মনে হয়। শুধু শিবমন্দিরেই নয়, বৈষ্ণব বা শাক্ত মন্দিরেও এই সজ্জা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। আবার রাধাকৃষ্ণ বা শিবের মন্দিরে দশমহাবিদ্যা, মহিষমর্দিনী বা কালীমূর্তির ব্যবহারে কোন বাধা হয়নি। বঙ্গদেশে রামসীতার আরাধনা বিশেষ জনপ্রিয় না হলেও সভাসীন রামসীতার পোড়ামাটির মূর্তি বহু অলংকৃত মন্দিরে সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। বিবিধ ধর্মমতের প্রতীক এই 'টেরাকোটা' মূর্তিগুলি শুধু কারিগরির দিক দিয়েই অপূর্ব নয়, ধর্মীয় ক্ষেত্রে পরমতসহিষ্ণুতারও বিশিষ্ট নিদর্শন। ধর্মনিরপেক্ষতার এসব দৃষ্টান্তে আরও প্রমাণিত হয় যে, শ্রীগৌরাঙ্গের রাধাকৃষ্ণ পূজার প্লাবনে প্রাচীনতর শৈব ও শাক্ত উপাসনার ধারাগুলি একেবারে বিলুপ্ত হয়নি। বাঁকুড়া তথা বঙ্গদেশের এই মন্দির 'টেরাকোটা' সম্পদ সেজন্য শুধু ধর্মীয় উদারতার প্রতিচ্ছবিই নয়, সমকালীন অধ্যাত্মচিন্তার বিভিন্ন স্রোতগুলিরও মূল্যবান দলিল।"[১]

বিষ্ণুপুর পরিক্রমাকালে টেরাকোটা শিল্প সমৃদ্ধ পাঁচটি মন্দির আমরা দেখব। এগুলি হল শ্যামরায় মন্দির, জোড়বাংলা মন্দির, রাধাবিনোদ মন্দির, মদনমোহন মন্দির এবং শ্রীধর মন্দির। চলার পথে যখন যে দেবালয়ে উপনীত হ'ব তখন সেটি নিয়ে আলোচনা করব। দু'চোখ ভরে দেখব তার শিল্প-সুষমা।

অধ্যায়-১৮

শ্যামরায়ের মন্দির

এখন আমরা এসে গেছি টেরাকোটা তথা পোড়ামাটির শিল্প-সম্ভারের অলংকরণে সুশোভিত ইষ্টক নির্মিত শ্যামরায় জীউ-এর মন্দির প্রাঙ্গণে। ঐ দেখুন আমাদের নয়নযুগলে উদ্ভাসিত পঞ্চরত্ন বিশিষ্ট দৃষ্টিনন্দন শ্যামরায়ের মন্দির। মন্দিরের নামকরণের থেকে সহজেই বোঝা যায় এটি শ্রীশ্রীশ্যামরায়জীউ অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের আনন্দ বিধানের জন্য নির্মিত হয়েছিল। শ্যামরায়জীউ-এর এই দেবালয়টি 'পাঁচচূড়া মন্দির' নামেও লোকমুখে

১। বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, পৃঃ—২২-২৩

প্রসিদ্ধ। অধুনা বিগ্রহহীন টেরাকোটা শিল্পে সর্বাধিক সমৃদ্ধ এই দেবালয়টির প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বীর হাম্বীরের পুত্র প্রথম রঘুনাথ সিংহ। এটির প্রতিষ্ঠাকাল ৯৪৯ মল্লাব্দ, ১০৫০ বঙ্গাব্দ এবং ১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দ।

৪৮ ফুট ১১ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, ৪৮ ফুট ৮ ইঞ্চি প্রস্থ এবং মাত্র ১ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর নির্মিত দক্ষিণমুখী এই শ্রীমন্দিরটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ৩৭ ফুট ১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় প্রায় ৩৫ ফুট। দেব-বিগ্রহদ্বয়ের জন্য সুনির্দিষ্ট বর্গক্ষেত্রাকার গর্ভগৃহের চারকোণে চারটি প্রকোষ্ঠ এবং প্রকোষ্ঠগুলির অন্তর্বর্তী স্থানে পত্রাকৃতির তিনটি করে খিলান বিশিষ্ট প্রবেশপথগুলির উপর বাঁকানো কার্নিসযুক্ত ঢালু ছাদের আচ্ছাদন দিয়ে রচিত হয়েছে মন্দিরটির মূল পরিকাঠামো। প্রকোষ্ঠ চারটির উপর চতুষ্কোণ বিশিষ্ট চারটি চূড়া এবং গর্ভকক্ষের উপর নির্মিত হয়েছে অষ্টকোণ বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় চূড়াটি। গর্ভগৃহের চতুর্দিকে একটি সংকীর্ণ প্রদক্ষিণ পথ ছাড়াও ভক্তমণ্ডলীর প্রদক্ষিণের জন্য রয়েছে অনাবৃত উন্মুক্ত বারান্দা। মন্দিরটির সর্বত্র এবং সর্বাঙ্গ টেরাকোটা ভাস্কর্যের সুষমায় শ্রীমণ্ডিত। এজন্যই গবেষক অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থের ৯০ পৃষ্ঠায় মন্তব্য করেছেন, **"টেরাকোটা'—অলংকরণের উৎকর্ষ ও অজস্রতায় এ মন্দিরটি বঙ্গ-সংস্কৃতির এক মহামূল্যবান সম্পদ। শুধুমাত্র ঢালু ছাদ ও চূড়াশীর্ষগুলি ছাড়া বাইরের ও ভিতরের দেওয়ালের কোন অংশ, এমন কি ছাদের নিম্নতলও ভাস্কর্যবিহীন নয়।"**

ছোট বড় বিভিন্ন মাপের এবং আকৃতির হাজার হাজার টেরাকোটা প্যানেল শুধুমাত্র সংখ্যাধিক্যেই নয়, বিভিন্নতার বৈচিত্র্যে এবং গুণমানের বৈশিষ্ট্যেও এগুলি অতুলনীয়। মন্দিরটির বর্ণনা করতে গিয়ে আমার মাষ্টারমশায় শ্রদ্ধেয় **চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত** মহাশয় তাঁর 'বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা' গ্রন্থের ৬৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "একদিকে যেমন রাসমণ্ডল, পারিজাত হরণ, গরুড়ের আলম্ব হ্রদ থেকে গজ-কচ্ছপ (সুপ্রিয় আর বিভাবসু) হরণ জাতীয় বিশালায়তন চিত্র সদৃশ বড় আকারের টেরাকোটা টালিগুলি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, অন্যদিকে তেমনি এই মন্দিরেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত অতি ক্ষুদ্র সব টেরাকোটা টালি স্তম্ভে, ফ্রিজে, সন্নিবিষ্ট করে অত্যুৎকৃষ্ট গজদন্ত শিল্পের আবেদন সৃষ্টির প্রয়াসও পরিলক্ষিত হয়। রেখা সৌষ্ঠবের প্রসাদগুণে ভূষিত অপূর্ব ছন্দোময় কিছু টেরাকোটা চিত্রও এ মন্দিরে স্থান পেয়েছে। সুললিত ও তরঙ্গায়িত অবিচ্ছিন্ন রেখাবিন্যাসে অঙ্কিত এই চিত্রগুলিতে শিল্পী যেন একটি বিশিষ্ট ছন্দ-হিল্লোল সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। টেরাকোটা অলংকরণের কারিগরিগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও মন্দিরটিতে অন্যান্য কিছু বৈশিষ্ট্যেরও আভাস পাওয়া যায়। যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় বিষ্ণুপুরের এইসব মন্দিরের সৃষ্টি, সেই বিশিষ্ট ধর্ম দর্শনের রূপাভাসও এই মন্দিরেই যেন অধিকতর সুস্পষ্ট।"

সকল লীলার সার রাসলীলার উপরই এখানে রয়েছে প্রায় **চল্লিশটি 'রাসমণ্ডল' প্যানেল**। মন্দিরের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের প্রবেশ পথের খিলানের দুপাশে রয়েছে দু'টি অভিনব এবং বৃহদাকার, চিত্তাকর্ষক 'রাসমণ্ডল' বা 'রাসচক্র'। রাসচক্র ছাড়াও রাসলীলার আরো অসংখ্য হৃদয়গ্রাহী চিত্র রয়েছে এখানে। **"কোথাও গোপীযুগলের স্কন্ধে বাহুভার ন্যস্ত করে বঙ্কিমঠামে দণ্ডায়মান অলস, বিবশ, বনমালী, কোথাও কোন মুগ্ধা গোপীর চিবুক স্পর্শ করে মুগ্ধমাধব তৃষিত নয়নে প্রতীক্ষারত; রাসমণ্ডল থেকে অকস্মাৎ, অন্তর্হিত শ্রীকৃষ্ণের বিরহে বেপথুমতী গোপীরা কোথাও বৃক্ষলতাকে কৃষ্ণ সংবাদ জিজ্ঞাসা ক'রে কপালে করাঘাত করে বিলাপ করছেন—তাঁদের আকুল বিলাপে অকপট**

প্রেমভক্তিই যেন উৎসারিত হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কৃষ্ণ আর গোপীদের নৃত্যগীতের প্রচুর চিত্র, — বংশী শিক্ষা আর যুগলমিলনের চিত্রও রয়েছে একাধিক।"[১] কথাগুলি লিখেছেন পূর্বোক্ত চিত্তরঞ্জন বাবু। মন্দিরটির সঠিক মূল্যায়নে ব্রতী হয়ে টেরাকোটা শিল্পের গবেষক চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত তাঁর সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি, জ্ঞান-গরিমা এবং সূক্ষ্ম মননশীলতা দিয়ে এমন সব কথা লিখেছেন যেগুলি আপনাদের শোনাবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। এই মন্দির প্রসঙ্গে তিনি যা লিখেছেন তাঁর বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃতি হিসেবে শোনাই আপনাদের।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন, "কৃষ্ণলীলার অসংখ্য চিত্র বাদেও এই মন্দিরের টেরাকোটায় বেশ কিছু শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী বিষ্ণু মূর্তি রয়েছে—বিষ্ণুর অবতার মূর্তিও স্থান পেয়েছে মন্দিরের একাধিক স্থানে। বিশিষ্ট ক্রম অনুযায়ী বিন্যস্ত বিভিন্ন আয়ুধে ভূষিত বিষ্ণুর ব্যূহমূর্তি এবং বিভব বা অবতার মূর্তিগুলি ছাড়াও এই মন্দিরের টেরাকোটায় বিষ্ণুর স্থানক, আসন ও শয়ান প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত তিন শ্রেণীরই মূর্তির উপস্থিতি যেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের উপর শাশ্বত ধর্ম এবং পঞ্চরাত্র মতবাদের প্রভাবই সূচিত করে।

এ মন্দিরে বিষ্ণুর স্থানক, আসন, শয়ান সব শ্রেণীর মূর্তিই রয়েছে। সাধারণ আসন মূর্তিগুলি ছাড়াও এ মন্দিরে বিষ্ণুর একাধিক গরুড়াসন বা গরুড়ারূঢ় মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। গরুড়াসন বিষ্ণুমূর্তি বিষ্ণুর আসন মূর্তিরই প্রকারভেদ মাত্র।.... বিষ্ণুপুরের মন্দিরে স্কন্ধারূঢ় বিষ্ণুসহ গরুড়ের ভক্তি বিনম্র মূর্তিগুলিতে যেন 'দাস্য ভাবেরই অভিব্যক্তি। বাহনের (হনুমান?) স্কন্ধারূঢ় একটি ধনুর্বাণধারী রামমূর্তিও এখানের পূর্বদালানে লক্ষ্য করা যায়। এ মন্দিরে এবং অন্যান্য মন্দিরেও বাহনারূঢ় অন্যান্য দেবতার একাধিক মূর্তি লক্ষ্য করা যায়।...

এই মন্দিরে লক্ষ্মণ-ভরত এবং ক্ষেত্রবিশেষে হনুমান জাম্বুবান সেবিত 'রামসীতা বা রামরাজা'র অনেকগুলি টেরাকোটা চিত্র রয়েছে। সেবক ভক্ত পরিবৃত রামসীতার যুগল মূর্তির চিত্রগুলি এখানে যেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রাধাকৃষ্ণ কেন্দ্রিক বিশিষ্ট ভক্তিভাবের একই পরিমণ্ডলে বিধৃত। ষোড়শ শতকে ভক্তিভাবের যে বন্যা বয়েছিল তাতে রামকথা আর কৃষ্ণকথা সমভাবে পরিষিক্ত হয়েছিল।"

মন্দিরের একাধিক স্থানে চিত্রিত রাধাকৃষ্ণ, রামসীতা এবং অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্তির উভয় পার্শ্বে ভক্তবৃন্দের ভক্তি-বিনম্র চিত্তে দণ্ডায়মান অথবা নতজানু হয়ে ভক্তি নিবেদনের দৃশ্য যেন বৈষ্ণবীয় বিনয়ের পাশাপাশি গভীর প্রেমভক্তি প্রকাশের প্রকৃষ্ট প্রতিফলন। রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তির পদপ্রান্তে ভক্তি গদ গদ চিত্তে প্রণিপাত ভক্তমণ্ডলী ও মন্দির প্রতিষ্ঠাতার দৃশ্য সমন্বিত মনোরম প্রতিষ্ঠাফলকটিও যেন বৈষ্ণবীয় বিনয় তথা রাগানুরাগ ভাব-ভক্তির মর্মস্পর্শী নিবেদন চিত্র।

বাংলা দেশের অধিকাংশ মন্দিরের মতোই বিষ্ণুপুরের অনেক মন্দিরেই **'নবনারীকুঞ্জর'** চিত্র-ফলক বিধৃত রয়েছে। এই মন্দিরের পূর্ব দিকের দেওয়ালের একটি স্তম্ভে পূর্বোক্ত জনপ্রিয় চিত্রফলকটি সন্নিবেশিত হয়েছে। **কুঞ্জর অর্থাৎ হস্তী আরূঢ় রাধাকৃষ্ণের মূর্তিকে মোহনীয় দেহ ভঙ্গিমায় ঘিরে রয়েছে ন'জন গোপনারী। ন'জন নারী পরিবেষ্টিত রাধাকৃষ্ণের এই যুগল মূর্তিটিই 'নবনারীকুঞ্জর' নামে অভিহিত। ন'জন নারীর নমনীয়**

১। বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা, পৃঃ— ৭৩

দেহের অঙ্গ সৌষ্ঠবের কলা কৌশলে চিত্রিত এই ফলকটি যেন 'আধা-ধর্মীয়' ক্রীড়া কসরতের প্রতীক রূপে প্রতিভাত।

বৈষ্ণব প্রভাব ছাড়াও এ মন্দির শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্মণ্য, গাণপত্য, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব-পুষ্ট। দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের প্রকোষ্ঠের দেওয়ালে নিবদ্ধ দশহস্ত এবং পঞ্চ আনন বিশিষ্ট পঞ্চবক্ত্র পদ্মাসীন শিবমূর্তিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। শাক্ত ধর্মের নিদর্শন স্বরূপ মন্দির-গাত্রের একাধিক মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গার মূর্তিও উল্লেখ্য। কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীর মূর্তিগুলি দুর্গামেড়ের ক্রম অনুসারে সজ্জিত না হয়ে মহিষাসুরমর্দিনীর আশে পাশে অগভীর কুলঙ্গির মধ্যে নিবদ্ধ রয়েছে মন্দির-গাত্রে। মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা ছাড়াও শাক্ত ধর্মের উপাস্য দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত কয়েকটি **মহাবিদ্যার মূর্তিও এখানে বিদ্যমান। দশমহাবিদ্যার প্যানেলের অনুরূপ বিষ্ণুর দশ অবতার মূর্তিও এ মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালের শোভা বৃদ্ধি করেছে।**

এই দেবালয়ের কেন্দ্রীয় চূড়াটিও অত্যন্ত সূক্ষ্ম কারুকার্য সমন্বিত। খুবই চিত্তাকর্ষক এবং নয়নাভিরাম। কালের প্রকোপে জীর্ণতার দরুন অকস্মাৎ ভেঙে পড়ার ভয়ে 'আর্কিয়লজিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া'র পক্ষ থেকে ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে চূড়াটির শিখরাংশ ভেঙে দিয়ে অত্যন্ত সাদামাটা এবং একান্তই বেমানান একটি বিকল্প শিখরাংশ তৈরী করা হয়েছে।

অষ্টকোণাকৃতির আসল চূড়াটির আগা-গোড়া ভিতর বাহির প্রায় সবই ছিল টেরাকোটা শিল্পের সৌন্দর্য সম্ভারে মোড়া। উক্ত চূড়াটির অভ্যন্তরভাগে মোগলাই সাজে সজ্জিত বৃহদাকার এক ষড়ানন কার্তিক মূর্তির পাশাপাশি ছিল উমা-মহেশ্বর মূর্তি, হরিহর মূর্তি। ছিল সুফী, দরবেশের চিত্র ফলক। সুফী দরবেশদের কাজ ছিল সঙ্গীত ও আবৃত্তির মাধ্যমে ধর্ম প্রচার করা। এখানের টেরাকোটা প্যানেলটিতে আলখাল্লা পরিহিত মালা হাতে দুজন সুফী দরবেশের পাশে একজন সারেঙ্গী বাদককে সঙ্গীত পরিবেশন করতে দেখা গিয়েছিল। চূড়াটির অভ্যন্তরভাগের দেওয়ালে আটজন খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত একটি ক্রীড়া চিত্রের প্যানেলও ছিল। বহুবিধ কারুকার্য সমন্বিত অধুনা অস্তিত্বহীন কেন্দ্রীয় চূড়াটির কথায় তথা স্মৃতি-রোমন্থনে ছেদ টেনে, চিত্তরঞ্জন বাবুর পুস্তকের উদ্ধৃতি সহযোগে পুনরায় ফিরে আসি মূল মন্দিরের কথায়।

"শ্যামরায়ের মন্দিরের দক্ষিণদিকের দালান থেকে গর্ভগৃহে প্রবেশ পথের ডানদিকে ভারতের বিভিন্ন ধর্মের উপাসক সম্প্রদায়ের একাধিক চিত্র রয়েছে। শিল্পী যেন এই মূর্তি-চিত্রগুলির বেশ-বাস ও মুখাবয়বের ভিন্নতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যে-চিহ্নিত করে মূর্তিগুলিকে ভারতের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে নির্দেশ করতে চেয়েছেন। **একই স্থানে মূর্তিগুলির একত্র সমাবেশ যেন সর্বধর্মসমন্বয়েরই দ্যোতক। মধ্যযুগে ভারতের বিভিন্ন অংশে আবির্ভূত নানা ধর্মগুরুর উদ্যোগে ধর্ম সমন্বয়ের যে প্রয়াস চলছিল এখানে যেন তারই ইঙ্গিত।** এই উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি দিগম্বর জৈন-তীর্থঙ্কর মূর্তিও রয়েছে। আলোচ্য মূর্তিগুলির অবয়ব রচনায় শিল্পীর অপূর্ব কৃতি-কুশলতার পরিচয় মেলে।"

এ মন্দিরে শুধু ভারতের বিভিন্ন ধর্ম, ধর্ম সম্প্রদায়ের উপাসকদের সমন্বয়ই নয়, এখানে

একাধিক ভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মানুষেরও সমাবেশ হয়েছে। বিচিত্র ধরনের জামা-পায়জামা, চটি, পাগড়ি, কোমর-বন্ধনী পরিহিত মোঙ্গলজাতীয় মানুষের চিত্রও বিধৃত হয়েছে মন্দির গাত্রে। এর থেকে অনুমান করা যায় মন্দির নির্মাতা ব্যক্তি ছিলেন সমস্ত রকম সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে বিচরণকারী এক সুদক্ষ এবং প্রাজ্ঞ শিল্পী, যাঁর শিল্প ভাবনার উৎকৃষ্ট ফসল হিসেবে শ্যামরায়ের মন্দিরটি আজ **'টেরাকোটার তাজমহল'** আখ্যায় ভূষিত হবার দাবি রাখে।

" 'টেরাকোটা'-অলংকরণের অন্তহীন প্রাচুর্য ও সুকুমার লালিত্যে, উভয় বাংলার আর একটিমাত্র দেবালয় শ্যামরায় মন্দিরের সঙ্গে উপমিত হতে পারে ; সেটি বাংলদেশের দিনাজপুর জেলার কান্তনগরে অবস্থিত। অধুনা বিদেশী, সে দেবগৃহটিকে হিসাবে না ধরলে, **পশ্চিমবঙ্গের যাবতীয় 'টেরাকোটা' মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরটি যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।**"[১] এপার বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ টেরাকোটা মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে পদচারণ করে এবার আমরা উপস্থিত হব মহাপ্রভুর ভগ্নাবশিষ্ট মন্দির-প্রান্তে। চলার পথে শোনাই **মহাপ্রভুর তত্ত্বকথা।**

অধ্যায়-১৯

মহাপ্রভুতত্ত্ব

মহাপ্রভুতত্ত্ব মানে গৌরাঙ্গতত্ত্ব। দুধে আলতায় গোলা গৌর বর্ণ অঙ্গ যাঁর তিনিই গৌরাঙ্গ, কিন্তু শব্দটির অর্থ সংকোচনে বা বিশেষ অর্থে গৌরাঙ্গ মানে নদের নিমাই— উত্তরকালের চৈতন্য মহাপ্রভু। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে কলিতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের কথা। শাস্ত্র-কথা মতো গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এসেছেন এবং লীলা করেছেন ধরাধামে। বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, বৃন্দাবনসহ সমগ্র উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারত। কিন্তু কেন তাঁর অবতারত্ব? কেন তাঁর নরলীলা? উত্তরের সন্ধানে উপনীত হতে হয় রাধা-কৃষ্ণের পদপ্রান্তে। টেনে আনতে হয় রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গ।

রাধা কেন কৃষ্ণ প্রেমে বিভোর? গোপীগণ কেন কৃষ্ণ-পাগলিনী? ভক্তগণ কেনই বা আমার প্রতি এতো বেশী আকৃষ্ট? কি আছে আমার মধ্যে! এসব কথা ভাবতে ভাবতে লীলাময় শ্রীকৃষ্ণ একদিন নবসাজে সজ্জিত হয়ে যমুনার জলে প্রতিবিম্বিত স্বীয় রূপ দর্শন করেন।

স্বীয় মাধুর্য এবং স্বীয় অঙ্গকান্তি সন্দর্শনে তিনি মোহিত হন। ভাবেন অদ্ভুত এবং অনন্ত আমার মাধুরিমা—ত্রিজগতে ইহা অতুলনীয়। এতাদৃশ আমিও কিন্তু শ্রীরাধার প্রেমে মুগ্ধ। রাধারাণীকে দর্শন করে আমার যত আনন্দ হয়, আমাকে দর্শন করে রাধারাণীরও তত আনন্দ হয়। এসব ভাবতে ভাবতে শ্রীকৃষ্ণের মনে হল, আমার মাধুর্য যে এত অপূর্ব, এত চমৎকার এবং এত চিত্তচাঞ্চল্যকর তা তো বুঝিনি আগে। শ্রীরাধার মতো করে স্বীয় মাধুরিমা উপভোগ করার বাসনা পুঞ্জীভূত হয় তাঁর হৃদয় কন্দরে।

শ্রীকৃষ্ণের এই বাসনা ছিল ত্রিবিধ—(১) শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কিরূপ? (২) রাধা আস্বাদিত কৃষ্ণ-প্রেমের মাধুর্য কিরূপ? (৩) কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনে রাধার সুখানুভূতি কিরূপ? এই ত্রিবিধ তৃষ্ণা নিবৃত্তির মহৎ উদ্দেশ্যে কলিতে **'অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর'** *রূপে তিনি গৌরাঙ্গ*

১। বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, পৃঃ—৮৯

অবতার হন। গৌরাঙ্গের উৎপত্তি বিষয়ে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাই বলা হয়েছে —

আমা হৈতে রাধা পায় যে জাতীয় সুখ।
তাহা আস্বাদিতে আমি সদাই উন্মুখ।।
নানা যত্ন করি আমি, নারি আস্বাদিতে।
সে সুখমাধুর্য-ঘ্রাণে লোভ বাঢ়ে চিতে।।
রস আস্বাদিতে আমি কৈল অবতার।
প্রেমরস আস্বাদিব বিবিধ প্রকার।। (১/৪/২৬২-২৬৪)

শ্রীরাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি নিয়ে কৃষ্ণ হলেন গৌরাঙ্গ। **সুতরাং 'রাধাভাব-অঙ্গকান্তি' তত্ত্বটিই গৌর অবতারের আন্তর-তাৎপর্য।** গৌর এলেন এবং কৃষ্ণপ্রেমের প্লাবন পরিলক্ষিত হল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে প্রাণের জোয়ার এল।

পুঁথি লুণ্ঠনের ঘটনাচক্রে পরম বৈষ্ণব শ্রীনিবাস আচার্য বিষ্ণুপুরে এলেন। বিষ্ণুপুরের তৎকালীন মহারাজ বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হলেন। কৃষ্ণ, বিষ্ণু উপাসনার ক্ষেত্রে থৈ থৈ শ্রাবণের বাঁধ ভাঙা প্লাবন এল। গৌরাঙ্গের ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ শ্রীনিবাস আচার্যের ইচ্ছানুসারে উত্তরকালে নির্মিত হল **মহাপ্রভু-মন্দির**। অল্প একটু পরেই ধ্বংসোন্মুখ সেই মন্দিরটি আমি আপনাদের দেখাব। পূর্বোক্ত মহাপ্রভু-মন্দিরে স্থাপিত হলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর যুগল বিগ্রহ। কিন্তু কেন এই যুগল বিগ্রহ?

উত্তরে বলি, **গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর** বাম পাশে যিনি অবস্থান করেন তিনি হলেন **নিত্যানন্দ প্রভু**। সত্যযুগে নারায়ণের পাশে যেমন সঙ্কর্ষণ, ত্রেতাতে রামের পাশে যেমন লক্ষ্মণ, দ্বাপরে কৃষ্ণের পাশে যেমন বলরাম, কলিতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পাশে তেমনি শোভা পান নিত্যানন্দ প্রভু। সুতরাং সত্যযুগে যিনি সঙ্কর্ষণ, ত্রেতাতে যিনি লক্ষ্মণ, দ্বাপরে যিনি বলরাম, কলিতে তিনিই হলেন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু। আরো একটু বিস্তারিতভাবে বললে, বলতে হয় ইনি হলেন চৈতন্যদেবের লীলাবিলাস-তনু। বঙ্গাব্দ ১৪০৬-এর হিসাবে বলা যায় আজ থেকে ৫১৯ বছর আগে বীরভূম জেলার একচক্র গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে এঁর নাম ছিল **কুবের**। পিতার নাম হাড়াই পণ্ডিত, মাতার নাম পদ্মাবতী। শ্রীচৈতন্যদেবের বড় ভাই বিশ্বরূপ সন্ন্যাস জীবনে **শঙ্করারণ্য** নামে পরিচিতি লাভ করেন। কুবেরের বাল্যকালে শঙ্করারণ্য একদিন তাঁর পিতার কাছে এসে ভিক্ষাস্বরূপে কুবেরকে নিয়ে যান এবং দীক্ষা দেন। **দীক্ষোত্তর জীবনে কুবেরের নাম হয় নিত্যানন্দ। তাঁর মধ্যে নিত্য অর্থাৎ সদাসর্বদা বিরাজ করত এক দিব্য আনন্দ—এতদর্থে তিনি যথার্থই নিত্যানন্দ।** বৈষ্ণবশাস্ত্রে চৈতন্যদেবের লীলাবিলাস-তনু রূপে নিত্যানন্দ চিহ্নিত। এজন্যই মন্দিরে মন্দিরে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর পাশে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর যুগল মূর্তি পূজিত হয়ে আসছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর তত্ত্বগত দিকটির প্রতি আলোকপাত করলাম সংক্ষেপে। এবার বলি রাধাশ্যাম মন্দিরে অবস্থানকারী গৌর নিতাই বিগ্রহদ্বয়ের কথা। শোনা যায় শ্রীনিবাস আচার্যের নির্দেশ মতোই গৌর নিতাই-এর রূপাবয়ব খোদিত হয়েছিল আজ থেকে কয়েক শতাব্দী পূর্বে। লোকশ্রুতি বলে নিম কাঠের তৈরী, প্রায় ৬ ফুট উচ্চ অতীব শ্রীদর্শন উক্ত বিগ্রহদ্বয়ের অষ্টাঙ্গের অভ্যন্তরভাগের প্রতি অঙ্গে একটি করে নারায়ণ শিলা সংস্থাপিত আছে। বিগ্রহদ্বয় সদা জাগ্রত এবং চৈতন্য সত্তায় বিরাজিত বলে প্রতীত হয়। বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম পীঠস্থান এই বিষ্ণুপুর শহরের বেশ কিছু পল্লীতে

বৈষ্ণব বাবাজীদের সুললিত কণ্ঠে ব্রাহ্মমুহূর্তে আজও উৎসারিত হয় সেই সুমধুর গৌর বন্দনা—

ভজ গৌরাঙ্গ, জপ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম রে।
যে জনা গৌরাঙ্গ ভজে সে হয় আমার প্রাণ রে।। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কথায় কথায় আমরা এসে গেছি মহাপ্রভু-মন্দির প্রাঙ্গণে।

অধ্যায়-২০

মহাপ্রভুর মন্দির

রাজদরবারগামী রাস্তার পূর্ব দিকে আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত এই বিশাল ধ্বংসস্তূপটিই হল মহাপ্রভুর মন্দির। উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের এবং সংরক্ষণের অভাবে বিষ্ণুপুরের একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পসৌধ অকালে ধ্বংসের সর্বগ্রাসী মুখ-বিবরে আত্মসমর্পণ করেছে নীরবে, নিঃশব্দে। দক্ষ টেরাকোটা শিল্পীর নিপুণ করস্পর্শে এবং শিল্প-ভাবনার অনুপম সৌন্দর্য-সুষমায় একদিন যে দেবালয়টি হয়েছিল তিলে তিলে তিলোত্তমা, আজ সেটি দিনে দিনে ক্ষয়ে ক্ষয়ে লতা-গুল্ম, বৃক্ষরাজির আলিঙ্গনে এবং শিকড়-বাকড়ের মর্মভেদী অত্যাচারে ও দেহ-নিষ্পেষণে প্রাণস্পন্দনটুকু মাত্র বুকে চেপে রেখে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় সময় গুণছে পলে অনুপলে। **বিষ্ণুপুরের প্রতিটি মন্দিরেরই হয়তো হত এই দুরবস্থা, যদি 'আর্কিয়লজিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া' বিষ্ণুপুরের অন্যান্য মন্দিরগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে চাপিয়ে না নিতেন।** বিষ্ণুপুরের শত শত মন্দিরের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মাত্র একুশটি পুরাবস্তুর সংরক্ষণের দায়িত্ব তাঁরা নিয়েছেন। যে সব মন্দির ও পুরাবস্তুর দায়-দায়িত্ব ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ গ্রহণ করেছেন সেসব মন্দির ও পুরাবস্তুগুলি মোটামুটি ভাল আছে, সুখে আছে, আছে নিরাপদে। আর যে সব মন্দির বা পুরাবস্তুগুলির দায়িত্ব নেওয়া এই বিভাগের পক্ষে সম্ভব হয়নি সেগুলি যেন অকালমৃত্যুর পদধ্বনি শুনছে পলে পলে। অবশ্য ব্যক্তিগত মালিকানাধীন দেব-মন্দিরগুলি রয়েছে ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে। সেগুলির মধ্যে কোনটি সুরক্ষিত, কোনটি উপেক্ষিত।

মহাপ্রভুর এই শ্রীমন্দিরটি ছিল 'জোড়বাংলা' আদলের মন্দির। বর্তমানে বিষ্ণুপুরে যে জোড়বাংলা মন্দিরটি রয়েছে, এটি ছিল তার থেকেও বৃহদাকার এবং টেরাকোটা ভাস্কর্যে সুসমৃদ্ধ। সেসব কথা এখন গল্প কথা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে ইতিহাস।

দেবালয়টির নামকরণ থেকেই জানা যায় এটি ছিল মহাপ্রভুর অর্থাৎ চৈতন্য মহাপ্রভুর মন্দির। অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত এই দেবালয়টিতে অদূর অতীতে দারু-নির্মিত প্রমাণ সাইজের চৈতন্য মহাপ্রভু এবং নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর যুগল মূর্তি পূজিত এবং উপাসিত হতেন ধুমধাম এবং ভক্তি-নিষ্ঠা সহকারে। মন্দিরটি ধ্বসে যাওয়ার ফলে উক্ত শ্রীবিগ্রহদ্বয় রাধাশ্যাম মন্দিরে স্থানান্তরিত হয়েছে। রাধাশ্যাম মন্দিরে উপনীত হয়ে বৈষ্ণব-সাধক শ্রীনিবাস আচার্য প্রতিষ্ঠিত উক্ত বিগ্রহদ্বয় আমরা দর্শন করব।

চলুন, এখন এগিয়ে যাই লঘু ছন্দে। রাজদরবার অভিমুখী এই রাস্তাটি বাঁক নিয়েছে অল্প একটু দূরেই। আর ঠিক সেখানেই রাস্তার বাম দিকে অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমিতে রয়েছে ***দুটি দেউল-মন্দির।***

অধ্যায়-২১

মহাপ্রভুর ভগ্নপ্রায় মন্দির ও মৃন্ময়ী মন্দিরের মধ্যস্থলের জোড়া দেউল-মন্দির

রাজদরবার

ঐ দেখুন, যমজ ভাই-এর মতোই একই রকম দেখতে মন্দিরদ্বয় কেমন গুরুগম্ভীর ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। আগাগোড়া ইষ্টক নির্মিত বহুপল সজ্জিত বৃত্তাকার এ মন্দিরদ্বয় ১৯ ফুট ব্যাস সমন্বিত ২$\frac{1}{2}$ ফুট উচ্চ ভিত্তিবেদীর উপর নির্মিত। দক্ষিণমুখী এই মন্দির দুটির ব্যাস ১৫ ফুট এবং উচ্চতা প্রায় ৩০/৩৫ ফুট।

অত্যন্ত সাদামাটা শৈলীর এ মন্দির দুটির পূর্ব দিকের মন্দিরটির নিম্নাংশে হংসলতার পাশাপাশি দু'পাশে দুটি বক রয়েছে। হংসলতার ঈষৎ উর্ধ্বে দরজার দক্ষিণ দিকে সুসজ্জিত একটি হাতি এবং বাম দিকে অন্য একটি হাতির পিঠে উঠে একটি সিংহকে হাতির সাথে যুদ্ধরত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। প্রবেশদ্বারের উপরে বাম দিকে দণ্ডায়মান এক বাদ্যকরকে নৃত্যের ভঙ্গিমায় শিঙা বাজানোর দৃশ্যের পাশাপাশি দক্ষিণ দিকে রয়েছে নতজানু নতশিরে আভূমি প্রণামরত এক ব্যক্তিকে জনৈক ব্রাহ্মণের আশীর্বাদ করার খোদিত চিত্রমূর্তি। এই দৃশ্যটি থেকে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা কোন মল্লরাজাকে সর্বান্তকরণে আশীর্বাদ করছেন শ্রীনিবাস আচার্য। এ অনুমান যদি সত্য হয় তাহলে বুঝতে হবে এ মন্দিরদ্বয় নির্মিত হয়েছিল মল্লরাজা বীর হাম্বীরের রাজত্বকালে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে। নির্মাতা হয়তো বা স্বয়ং বীর হাম্বীর।

পাশ্চিমদিকের দেউলটিতে ফুলকারি নক্সা এবং রেখাচিত্রের অল্পস্বল্প কারুকার্য নজরে পড়ে। পূর্ব দিকের মন্দিরটির শীর্ষাংশের শুধুমাত্র আমলকটি বিদ্যমান। পশ্চিমদিকের মন্দিরটির শিখরাংশ পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। সরকার এবং সর্বসাধারণের অনাদর ও উপেক্ষার সুযোগ নিয়ে দেবালয় দুটির গাত্রদেশে গজিয়ে উঠেছে নানান ধরনের গাছ-গাছড়া। ছুঁচ হ'য়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরিয়ে আসছে তাদের হৃষ্টপুষ্ট মোটাসোটা শিকড়-বাকড়। পঙ্খের পলেস্তারায় চিড় ধরিয়ে, বড় বড় ফাটল সৃষ্টি করে ধ্বসিয়ে দিচ্ছে মন্দিরের দেওয়াল। খসিয়ে দিচ্ছে ইঁট-পাটকেল। **ধ্যানমগ্ন মৌন-মুখর এই মন্দিরদ্বয় যেন মহানির্বাণের প্রহর গুনছে ক্ষণে ক্ষণে।**

পরিশেষে বলি, উড়িষ্যার রেখ-দেউল স্থাপত্যশৈলীর আদলে নির্মিত প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এবং বিগ্রহ পরিত্যক্ত এই মন্দিরদ্বয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্মিত বলেই গবেষকদের অনুমান। শ্রদ্ধেয় অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই দুটি দেব-মন্দিরকে কেশর রায় ও নিকুঞ্জবিহারীর মন্দিররূপে উল্লেখ করেছেন তাঁর 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থের ৮২ পৃষ্ঠাতে। আবার অনেকের মতে কেশর রায় নয়, এ দেবালয় দু'টি কিশোর রায় ও নিকুঞ্জবিহারীর মন্দির ছিল। অন্যদের মতে এ দেবসৌধ দু'টি হল কৃষ্ণ অর্থাৎ জগন্নাথ-বলরামের মন্দির। পক্ষান্তরে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় অবশ্য পাথর-দরজার সন্নিকটস্থ বিগ্রহ-পরিত্যক্ত দেউল-আকৃতির অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভগ্নপ্রায় রেখ-দেউল দু'টিকে কৃষ্ণ তথা জগন্নাথ-বলরামের মন্দির রূপে অভিমত পোষণ করেছেন। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১১ ফুট

এবং উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট ঐ মন্দির দু'টিও প্রতিষ্ঠালিপিবিহীন এবং ঐ দু'টির নির্মাণকালও খুব সম্ভব অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ। ইষ্টক-নির্মিত ঐ মন্দিরদ্বয়ের পশ্চাদভাগে রয়েছে শ্যামকুণ্ড এবং পূর্বভাগে রয়েছে অভিষেক-মঞ্চের ভগ্নস্তূপ। বিষ্ণুপুরের অনেক প্রবীণ ব্যক্তি অবশ্য ঐ মন্দির দুটির একটিকে কৃষ্ণ বা জগন্নাথ বলরামের মন্দির এবং অপরটিকে শ্যামচাঁদের মন্দির রূপে আখ্যায়িত করেন।

তথাপি বলতে হয় যে বিতর্কের জালে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনায় আমাদের সম্মুখস্থ যুগল মন্দিরের সঠিক নামকরণ করা সংগত হবে না। এজন্যই মন্দির দু'টির অবস্থান-কেন্দ্রিক নামকরণ করা হল।

অধ্যায়-২২

জোড়বাংলা

এবার প্রসঙ্গ জোড়বাংলা। জোড়বাংলা একটি মন্দিরের নাম। বাংলাদেশে বহুল প্রচলিত দাওয়া-বিশিষ্ট দোচালা আদলের দুটি চালা ঘরের পাশাপাশি সহাবস্থানকে কেন্দ্র করেই রচিত হয়েছে এই দেবালয়। চালাঘর দুটির মধ্যভাগের সংযোগস্থলের ঊর্ধ্বে চতুষ্কোণ বেদীর উপর চারচালা বিশিষ্ট একটি চূড়া সংস্থাপন করে মন্দির-পরিকল্পনায় আনা হয়েছে পূর্ণতা। দেবালয়ের উপরে উঠার প্রয়োজনে মন্দির অভ্যন্তরে রয়েছে একটি সংকীর্ণ সিঁড়িপথ। **দুটি দোচালা বাংলাঘরকে জুড়ে দিয়ে নির্মিত হওয়ার সুবাদে দেবালয়টি জোড়বাংলা নামে নামাঙ্কিত হয়েছে।** 'মহাপ্রভুর মন্দির' নামে খ্যাত জোড়বাংলা আদলের সেই মন্দিরটি আমি আপনাদের একটু আগেই দেখিয়েছি। এখন দেখুন কৃষ্ণরায় বিগ্রহের আনন্দ বিধানের জন্য নির্মিত এবং উৎসর্গীকৃত **'কৃষ্ণরায় মন্দির'** বা **'জোড়বাংলা মন্দির'**। কৃষ্ণরায়ের মন্দির হলেও বর্তমানে এই যুগল বিগ্রহ কিন্তু এখানে নেই। আছেন বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লায় অবস্থিত শ্রীশ্রীরাধালালজীউ-এর মন্দিরে। এসব ভুবনমোহন দৃষ্টিনন্দন বিগ্রহ আপনাদের দেখাব যথাসময়ে। এখন ফিরে আসি জোড়বাংলা প্রসঙ্গে।

মল্লরাজ্যের রাজধানী বিষ্ণুপুরের দুর্গ এলাকায় অবস্থিত টেরাকোটা শিল্পের অপরূপ অলংকরণে আবৃত ইষ্টক নির্মিত দক্ষিণমুখী **এই মন্দিরটির নির্মাতা এবং প্রতিষ্ঠাতা হলেন বীর হাম্বীর পুত্র প্রথম রঘুনাথ সিংহ। প্রতিষ্ঠাকাল ৯৬১ মল্লাব্দ, ১০৬২ বঙ্গাব্দ এবং ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দ।** প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করিয়ে দিই, পূর্বেই আলোচিত শ্যামরায়ের মন্দিরটিরও প্রতিষ্ঠাতা এবং নির্মাতা হলেন পূর্বোক্ত রাজা রঘুনাথ সিংহ। মন্দির দুটির প্রতিষ্ঠাকালের অন্তর্বর্তী সময়ের ব্যবধান মাত্র ১১ বছর।

টেরাকোটা শিল্প-সম্পদের রত্নাকর রূপে প্রতিভাত পূর্ব-কথিত 'শ্যামরায়ের মন্দির' এবং এই 'জোড়বাংলা' মন্দির দুটি শুধুমাত্র দেবসৌধই নয়, এগুলি এক একটি অতি উন্নতমানের শিল্পসৌধ। আবার এমন ধরনের শিল্পসৌধ যা নিয়ে রীতিমত গবেষণা করা যায় বছরের পর বছর। মৌন-মুখর এই মন্দিরদ্বয় একাধারে তৎকালীন শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য তথা সমাজ-চিত্রের স্মৃতিফলক স্বরূপ। মন্দির-গাত্রে রয়েছে নানান পৌরাণিক ঘটনা সহ রামায়ণ, মহাভারত, রামলীলা, কৃষ্ণলীলা, ভাগবৎ, বিষ্ণুর দশ অবতার, দশ মহাবিদ্যা, মাতৃকা মূর্তি, স্থল ও নৌ-যুদ্ধ, শিকার, বহু বিচিত্র আকৃতি প্রকৃতির জন্তু-

জানোয়ার, লতা-পাতা, ফুলকারী নক্সা, সাধনতত্ত্ব এবং অধ্যাত্ম-বিষয়ক ছোট বড় অজস্র অপূর্ব টেরাকোটা ফলক। এছাড়া আদিরস, বীররস, রৌদ্ররস, বিস্ময় রস, বাৎসল্য রস, বীভৎস রস এবং ভক্তি রসাত্মক চিত্র-মাধুর্যে এ মন্দির সুসমৃদ্ধ, তথাপি উৎকট মিথুন চিত্র বা অশ্লীল যৌন চিত্রে কলঙ্কিত হয়নি এ দেবালয়ের তথা বিষ্ণুপুরের কোন দেবমন্দিরের দিব্য পরিবেশ।

প্রায় সাড়ে তিনশত বছরের পুরানো জোড়বাংলা মন্দিরটির গুণমানের কথা বহুমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বিস্ময় বিমুগ্ধ গবেষক শ্রদ্ধেয় অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে এ মন্দির সম্পর্কে তাই মন্তব্য করেছেন, "…….**স্থাপত্যের অভিনবত্বে ও পোড়ামাটির অলংকরণ-প্রাচুর্যে এটি যে পশ্চিমবঙ্গের 'বাংলা-মন্দির'-স্থাপত্যশৈলীর যাবতীয় দেবালয়ের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাতে সন্দেহ নেই।**"

৩ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চ, ৫১ ফুট ৩ ইঞ্চি বর্গাকার, মাকড়াপাথরের ভিত্তিবেদীর উপর নির্মিত মূল মন্দিরটির দৈর্ঘ্য ৩৮ ফুট ৭ ইঞ্চি, প্রস্থ ৩৮ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট। পূর্ব-পশ্চিমে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত দোচালা ঘর দুটির দক্ষিণ দিকের চালা ঘরটির দক্ষিণ দেওয়ালের তিনটি খিলানযুক্ত তোরণ, মন্দিরের প্রধান প্রবেশ পথ। ঢাকা বারান্দায় আচ্ছাদিত প্রবেশ-তোরণের মধ্য দিয়ে গর্ভগৃহে যাওয়া যায়। গর্ভগৃহে প্রবেশের জন্য উত্তর দিকের দোচালাটির পূর্ব দিকের দেওয়ালে নীচু খিলান যুক্ত আরো একটি দরজা আছে। দেব-বিগ্রহের জন্য নির্দিষ্ট বেদীর পিছনের দেওয়ালে পলেস্তারা-আবৃত প্রায় তিন ফুট উচ্চতা-বিশিষ্ট একটি ষড়ভুজ মূর্তিও বিদ্যমান। দেবালয়টির দো-চালার বাইরের দেওয়াল, সম্মুখভাগের দেওয়াল, ভারবাহী স্তম্ভ, খিলান, খিলানের উর্ধ্বাংশ, ছাদের সিলিং সর্বত্র পোড়ামাটির কারুকৃতির মলাটে আবৃত।

মন্দিরটির দক্ষিণ দেওয়ালের উপরিভাগে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রতিষ্ঠাফলকের প্রতিষ্ঠালিপির ডান দিকে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ এবং বাম দিকে হলধারী বলরাম। দক্ষিণমুখী এই দো-চালাটির পূর্ব দেওয়ালে কংসবধের চিত্র-কাহিনীও রয়েছে সন্নিবেশিত। এসব দেখে মনে হয় এখানে কৃষ্ণ-বলরামের বাল্যলীলাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া রাধাকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত এই দেবালয়ে কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ প্রাধান্য পাওয়াটাই স্বাভাবিক। হয়েছেও তাই। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধাভাজন চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় লিখেছেন, "জোড়বাংলা মন্দিরের রাধাকৃষ্ণ লীলার টেরাকোটা চিত্রগুলি দেখলে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের কথা বারবার মনে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতই রাধাকৃষ্ণলীলা চিত্রের মধ্যে এখানে দানলীলা, নৌকালীলা, জলকেলি ইত্যাদি লীলাচিত্রগুলিই প্রাধান্য পেয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সেই দামাল দুর্নিবার শ্রীকৃষ্ণের অবিকল চিত্ররূপ এখানের দানলীলার একাধিক টেরাকোটা চিত্রে লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরের সম্মুখভাগের দেওয়ালের দক্ষিণ-পূর্ব কোণার একাধিক পটিতে বা ফ্রিজে নৌকালীলা - জলকেলি - কালীয়দমন - বস্ত্রহরণ চিত্রগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছে, ...।" বস্ত্রহরণ চিত্রে আদিরসের প্রাধান্য প্রকটিত। দেবালয়টির সম্মুখভাগের দেওয়ালের স্তম্ভগাত্রে গোপী পরিবেষ্টিত শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যগীতের দৃশ্যও আমাদের নজর কাড়ে। খোল, ঢোল, করতাল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে সুরের ঝংকার তুলে গোপনারীগণ বেণুধারী শ্রীকৃষ্ণের সাথে একাত্ম হয়ে নাচগানের আসরটি করেছেন জমজমাট। নৃত্যগীতের এ দৃশ্যে রাজস্থানী প্রভাব অনুভূত হলেও ক্ষেত্রবিশেষে নতর্কীদের মাথায় মোহন-চূড়ার বিন্যাস বৈষ্ণব-নৃত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আবার কয়েকটি প্যানেলে 'যুক্তকর নর্তকী' এবং তাদের সহযোগী বাদ্যকরগণের বাদনভঙ্গি মণিপুরী

নৃত্যের দ্যোতক বলেও অনুমিত হয়। এছাড়া এ মন্দিরের নৃত্যগীত বিশারদ গন্ধর্বদের কারুকৃতিগুলির সাথে অজন্তার গন্ধর্ব মূর্তিগুলির সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় অনেকাংশেই।

আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল জোড়বাংলা মন্দিরে ছবিতে গল্প বলার সহজ সরল ভঙ্গিমাটি অনুসৃত হয়েছে আগাগোড়া। চিত্রফলকগুলি হয়ে উঠেছে কাহিনীধর্মী, আবার শিল্পীর সূক্ষ্ম মননশীলতার ফলে এগুলিতে এসে গেছে নাটকীয় উপস্থাপন পদ্ধতি। ঘটনা পারম্পর্যের সুবিন্যাসে দৃষ্টিনন্দন এই ভাস্কর্যগুলি সর্বত্রই যেন হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত। কৃষ্ণ-বলরামের কংস বধ, রাম-রাবণের যুদ্ধ, দেবাসুরের যুদ্ধ, দেবী-দানবের যুদ্ধ এবং যুদ্ধের চরম পরিণতিতে দেবশক্তি তথা শুভশক্তির জয় এবং আসুরিক শক্তি তথা অশুভ শক্তির পরাজয়কে কেন্দ্র করে 'যথা ধর্ম তথা জয়' এই পৌরাণিক ধর্মীয় শ্লোগানকে দৃঢ়বদ্ধ করা হয়েছে।

দক্ষিণ দিকের দোচালাটির পশ্চিম দেওয়ালে পুরাণ কথিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, কুমার কার্তিকেয়, ইন্দ্র; বরাহ, নৃসিংহ—এই পঞ্চ দেবতা এবং দুই অবতারের দেহোদ্ভূত সপ্ত মাতৃকামূর্তি যথা ব্রাহ্মী, বৈষ্ণবী, মাহেশ্বরী কৌমারী, ঐন্দ্রী বা ইন্দ্রাণী, বারাহী এবং নারসিংহী, অসুর নিধনের মহতী উদ্দেশ্যে যুদ্ধোন্মাদনায় রণরঙ্গিণীর রূপ ধারণ করে হয়ে উঠেছেন ভীষণা, ভয়ঙ্করী। শিব এবং শবোপরি দণ্ডায়মানা, রোষকষায়িত দৃষ্টি নিক্ষেপকারিণী লোলজিহ্বা, ছিন্নমুণ্ডধৃতা, রক্তলোলুপ ভীতিসঞ্চারী এইসব মাতৃকা মূর্তিগুলির সাথে দানবকুলের যুদ্ধের চিত্র দূরদর্শী শিল্পীর শিল্প-বৈভবে হয়ে উঠেছে বাস্তবানুগ এবং গতিসঞ্চারী।

শিল্পসৌধটির উত্তর দেওয়ালে নিবদ্ধ বিষ্ণুর দশাবতার ভাস্কর্যের ফলকে শ্রীকৃষ্ণের সাথে পুঁথিধারী এক দিব্যকান্তি পুরুষের উপস্থিতি বিশেষ অর্থবহ। গবেষক মহলের ধারণা এই দিব্যকান্তি পুরুষটি স্বয়ং শ্রীনিবাস আচার্য, কারণ পুঁথি-হরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই তাঁর বিষ্ণুপুরে আগমন এবং অধিষ্ঠান। শুধু মহাসাধক শ্রীনিবাস আচার্যই নয়, মন্দিরগাত্রে আধ্যাত্মিক পরিবেশ পরিস্ফুট করার ক্ষেত্রে দেওয়াল-চিত্রে উপাসনারত সাধুসন্তের সমাবেশও লক্ষণীয়। জোড়বাংলা মন্দিরের দেওয়াল জুড়ে রয়েছে বহু সংখ্যক সন্ত-সাধকের ভক্তি-বিনম্র আরাধনা চিত্র। বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসে জারিত এই মন্দিরে ভক্তিভাবটিকে বিধৃত করার জন্য নানা রসের চিত্র-সমাবেশও প্রশংসনীয়। শুধু ভক্তিরস নয়, নানা রসের ভাস্কর্য সমাবেশে এ মন্দির হয়ে উঠেছে রসঘন। এ প্রসঙ্গে আমার মাস্টারমশাই চিত্তরঞ্জন বাবুর বক্তব্যটি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন, "এখানের বিভিন্ন চিত্রকে অবলম্বন করে নানারসেরও স্ফুরণ ঘটেছে; নৌকাবিলাস, জলকেলি জাতীয় চিত্রগুলিতে আদিরস— উদ্দীপনা ও উত্তেজনাময় যুদ্ধচিত্রগুলিতে **বীর ও রৌদ্ররস**—শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের অসুর-দলন আর রাম লক্ষ্মণের রাক্ষসী নিধন জাতীয় লীলাচিত্রগুলিতে **বিস্ময় রস**— গণেশ কোলে গণেশ জননী, রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন কোলে কৌশল্যা-কৈকেয়ী-সুমিত্রা, আর কৃষ্ণ-বলরাম কোলে যশোদা-রোহিণীর চিত্রগুলিতে **বাৎসল্যরস** এবং—সিংহ বা ব্যাঘ্রের দন্তরাজির নিষ্ঠুর আঘাতে বিদীর্ণ-উদর অসহায় হরিণের চিত্রে **বীভৎস রসের** প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়...।"

কৃষ্ণরায়ের মন্দিরে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক চিত্রগুলি প্রাধান্য পেলেও উপেক্ষিত হয়নি রামলীলা। কৃষ্ণলীলার আগাগোড়া অর্থাৎ মাতৃক্রোড়ে স্তন্যপানরত শিশু কৃষ্ণ, ক্রীড়ামত্ত এবং গোচারণরত কিশোর কৃষ্ণ, গোপনারীদের সাথে লীলাবিলাস গোপকৃষ্ণ, কংস বধ

এবং পুতনা বধে তেজোদৃপ্ত বীর কৃষ্ণ—এ সবই যেমন চিত্রিত হয়েছে মন্দিরগাত্রে, তদনুরূপে রামলীলার ক্ষেত্রে দশরথের সিন্ধুমুনি বধ থেকে শুরু করে, রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্নদের জন্ম, চার ভাই-এর মাতৃক্রোড়ে স্তন্যপানরত অবোধ শিশুর চিত্র, রাম-লক্ষ্মণের তাড়কা নিধন, মুনি ঋষিদের যজ্ঞরক্ষা, রামের বিবাহ, বনবাস, সীতাহরণ, রাবণবধ, রামরাজা প্রভৃতি দৃশ্যগুলিও আনুপূর্বিক খচিত রয়েছে মন্দিরের উত্তর দিকের পশ্চিম দেওয়ালে।

রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ বা কৃষ্ণলীলার দৃশ্য ছাড়াও বহুবিচিত্র নয়নাভিরাম লতা-পাতা ফুলকারী নক্সা, রেখাসৌষ্ঠব শোভিত প্যানেল, বিচিত্র সব অলৌকিক এবং অবাস্তব জন্তুজানোয়ার এবং রণোন্মত্ত যুদ্ধের অজস্র প্যানেল মন্দির গাত্রের শ্রীবৃদ্ধি করেছে অনুপম ছন্দে, কৌলীন্যের আভিজাত্যে উন্নীত করেছে দেবালয়টিকে।

ভিত্তিবেদীর ঠিক উপরেই চলমান হস্তীযূথের সুদীর্ঘ প্যানেলটি অনিন্দ্যসুন্দর। ভারতীয় চিন্তাধারায় হস্তী রাজগরিমার প্রতীক এবং সৌভাগ্যের সূচক হলেও এখানে সংস্থাপিত হাতির ফলকগুলিতে অজন্তার মতোই বন্য হস্তীর নির্মম মদমত্ততা এবং উন্মত্ততা প্রকাশিত হয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। হাতির শুঁড়ের দ্বারা উৎক্ষিপ্ত বৃক্ষ এবং বৃক্ষ শাখা অথবা হাতির পদাঘাতে পিষ্ট কুমীরের নিষ্পেষিত দেহের প্যানেলগুলি তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

"জোড়বাংলার পশ্চাৎবর্তী বা দ্বিতীয় দোচালাটির পূর্বদিকের দেওয়ালে বেশ কয়েকটি বিচিত্র দর্শন কৌতূহলোদ্দীপক অলৌকিক জন্তু জানোয়ারের চিত্র রয়েছে। মুরগীর মতো সপুচ্ছ এক অতিকায় পক্ষীর পায়ের নখে গাঁথা রয়েছে একাধিক হস্তী-সপক্ষ, মকরের মত শুঁড় বিশিষ্ট অথচ সিংহাকৃতি এক অদ্ভুত জানোয়ারের থাবাতেও এমনি একাধিক হস্তী বিধৃত; অষ্টপদ বিশিষ্ট সিংহাকৃতি একটি জন্তুর মুখাবয়বে মানুষের মুখের আদল বা আভাস লক্ষ্য করা যায়। মূর্তিটির গলায় রয়েছে মালা। গজসিংহ জাতীয় একটি বিচিত্র'মোটিফ' এখানের শ্যামরায় থেকে শ্রীধর পর্যন্ত প্রায় সব মন্দিরেই লক্ষ্য করা যায়। চিত্রটিতে দেখা যায় দুই পায়ে দুই হস্তী গ্রীবা এবং দুই হাতে দুই সিংহ গ্রীবা সবলে বেষ্টন করে এক বিচিত্র পুরুষ করী শুণ্ড দুটি মুখে পুরেছেন। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতীয় শিল্প ভাস্কর্যে এই ধরনের মিশ্র (Composite) এবং বিচিত্ররূপী জানোয়ারের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। মোহেঞ্জোদাড়োর শিলমোহরেও এরকম একাধিক মূর্তি চিত্রের সন্ধান পেয়েছেন—'ম্যাকে'। একাধিক জন্তুর বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমন্বয়ে এই ধরনের কিম্ভূত-কিমাকার জন্তু-চিত্রগুলি পরিকল্পিত হত।"[১]

জোড়বাংলার মন্দির পরিকল্পনায় বেশ কয়েকটি শিকারের চিত্রও রয়েছে প্রথাগতভাবেই। বাঘ কর্তৃক হরিণ শিকারের মর্মান্তিক দৃশ্যের পাশাপাশি তীরবিদ্ধ অবস্থায় ভূলুণ্ঠিত বাঘের দৃশ্যেরও অভাব নেই এখানে।

রামায়ণ মহাভারতের ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পাশাপাশি তৎকালীন সমাজের যুদ্ধ চিত্রগুলিও শিল্পীর নিপুণ হস্তে বন্দী হয়ে রয়ে গেছে ইতিহাসের সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসেবে। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে মগ এবং পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল বাংলার উপকূল অঞ্চল। আকবরের সময়ে মগ ও পর্তুগীজ দস্যুদের হাত থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করার অভিমানসে নৌ-পাহারাদার প্রতিষ্ঠিত হয়। দক্ষিণদিকের দোচালার পশ্চিম দেওয়ালের নীচের দিকে বৃহদাকার তিনটি নৌকা এবং নৌকাগুলির উপর বন্দুকধারী

১। বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা, পৃঃ— ১০২

সৈন্য তথা জলদস্যুদের চিত্র চোখে পড়ে। পক্ষান্তরে আবার নজরে পড়ে সশস্ত্র যোদ্ধাবাহী এমন কয়েকটি নৌকা যেগুলির অগ্রভাগ বাঘের মুখের আদলে তৈরী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি প্রাচীন ভারতে সম্ভবতঃ শত্রুর ভীতি উৎপাদনার্থে বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারের মুখের আদলে নৌকা বা জাহাজের সম্মুখভাগ তৈরী করার প্রথা প্রচলিত ছিল। নৌকাগুলির নীচের জলরাশির মধ্যে কুমীর জাতীয় জলজন্তুর অস্তিত্ব থেকে অনুমিত হয় বাংলার উপকূলবর্তী বঙ্গোপসাগরেই সংঘঠিত যুদ্ধের দৃশ্য এখানে রূপায়িত হয়েছে।

এ মন্দিরের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল মন্দিরগাত্রে নিবদ্ধ ভাস্কর্যের চিত্র-কাহিনীতে নীরব অথচ বাঙ্ময় অর্থাৎ মৌন-মুখর নাটকীয় সাসপেন্সের অবতারণা। বিষয়টি সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন মাননীয় চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়। তিনি লিখেছেন, "এ মন্দিরের বেশ কিছু টেরাকোটা-কাহিনী-চিত্রে নাটকীয় 'সাসপেন্সের' আভাস পাওয়া যায়। একাধিক নাটকীয় দৃশ্যে কুশীলবের বিচিত্র ভাবভঙ্গী আর মুদ্রাকে অবলম্বন করে শিল্পী আভাসিত করেছেন নীরব সংলাপ। যেখানে সিন্ধুর মৃতদেহ স্কন্ধে নিয়ে অনুশোচনায় ভারাক্রান্ত রাজা দশরথ অন্ধমুনি-দম্পতির সকাশে অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান, তাড়কার বুকে বাণ বিদ্ধ করে উত্তোলিত তর্জনীর বিশিষ্ট মুদ্রায় রামলক্ষ্মণ যেখানে দুরন্ত রাক্ষসীকে 'উচিত শিক্ষা দেওয়ার' ভাব প্রকাশ করছেন—প্রতিজ্ঞাবশে অস্ত্র ত্যাগ করে যেখানে ধনুকের আগায় ন্যস্তচিবুক যুদ্ধক্ষান্ত নিশ্চেষ্ট নির্বিকার ভীষ্ম নিশ্চিত নিয়তির প্রতীক্ষারত — সেইসব দৃশ্যে কুশীলবদের ভাবভঙ্গী আর মুদ্রার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাঙ্ময় ব্যঞ্জনা। এখানের কাহিনী চিত্রগুলির নাটকীয় উপস্থাপনে স্থানে স্থানে শিল্পী অপূর্ব কৃতি-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন; কাহিনীকে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে চালিত করে শিল্পী যে নাটকীয় 'টেম্পো' সৃষ্টি করেছেন, তার ফলে অতীত কাহিনীগুলি যেন ঘটমান বর্তমানে রূপান্তরিত হয়েছে।"[১]

জোড়াবাংলা মন্দির সম্বন্ধে বলা হল অনেক কথা, তথাপি যে কথাগুলি না বললে বক্তব্য পূর্ণতা লাভ করে না সেরকম দু-চারটি বক্তব্য তুলে ধরে জোড়বাংলা থেকে বিদায় নেবো আমরা। আবার জোড়বাংলা মন্দিরের কথা বলতে গিয়ে শ্যামরায় মন্দিরের প্রসঙ্গও এসে যায় প্রাসঙ্গিকভাবেই। কারণ দেবালয় দুটির নির্মাতা এবং প্রতিষ্ঠাতা একই ব্যক্তি — রাজা রঘুনাথ সিংহ (১ম)। মন্দির দুটির প্রতিষ্ঠাকালের অন্তর্বর্তী দূরত্বও মাত্র ১১ বছর। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় বয়সে প্রবীণ শ্যামরায়ের মন্দিরটি প্রতিষ্ঠার অব্যবহিত পরেই বয়ঃকনিষ্ঠ জোড়বাংলা মন্দিরের নির্মাণ-কার্য শুরু হয়েছিল। কারণ এরকম একটি সুপরিকল্পিত এবং সুচিন্তিত শিল্পসৌধ নির্মাণ করতে সময় লাগবে কম করেও বছর পাঁচ। উভয় মন্দিরের কারুকার্য দেখে মনে হয় মন্দির দ্বয়ের স্থপতিও ছিলেন একই ব্যক্তি। এ কারণে দেবালয় দুটিব নির্মাণ কৌশলে যথেষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বৈসাদৃশ্য যেটুকু নজরে পড়ে তা হল শিল্পীর পূর্ব অভিজ্ঞতার উপর প্রলেপ দিয়ে দ্বিতীয় মন্দিরটিতে অভিনবত্ব আনার আকুতি। এ প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত চিত্তরঞ্জন বাবুর জ্ঞানগর্ভ মন্তব্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। এই দেবালয় দ্বয়ের তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর 'বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা' পুস্তকে লিখেছেন, **"শ্যামরায়ের মন্দিরে যেমন প্রাধান্য পেয়েছে 'ইমোশন' আর 'লিরিক', জোড়বাংলা মন্দিরের টেরাকোটা চিত্রে তেমনি ভাস্বর হয়ে উঠেছে 'অ্যাক্সন' আর 'এপিক' ; ঘটনাবহুল পৌরাণিক**

১। বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা, পৃঃ— ১০৪-১০৫

কাহিনীর নাটকীয়তা এবং ঘাত প্রতিঘাত মন্দিরটিতে একটি জঙ্গম পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।" এই পুস্তকের অন্যত্র তিনি আরও লিখেছেন, **"শ্যামরায়-মন্দিরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আকর-গ্রন্থ ভাগবতের চিত্রাবলীই মূলতঃ প্রাধান্য পেয়েছে — জোড়বাংলা-মন্দিরে শিল্পী ভক্তিভাবের চিত্র ছাড়াও নানা ধরনের লোকপ্রিয় চিত্রের সন্নিবেশ করে যেন একটি সার্বজনীন আবেদন সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।"**

এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "কোন কোন ক্ষেত্রে, যেমন রামায়ণের কাহিনী বা বন্য প্রাণীর রূপায়ণে, এ দেবালয়ের অলংকরণগুলি শ্যামরায় মন্দিরের থেকেও সুন্দর।" আবার মন্দির দুটির সার্বিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "...**সমগ্র বাঁকুড়া জেলায় একমাত্র বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়ের মন্দিরটি ছাড়া আর কোথাও 'টেরাকোটা' অলংকরণের এমন বিপুল প্রয়োগ হয়েছে বলে মনে হয় না। শুধু সংখ্যায় নয়, এগুলির চমৎকারিত্বেও বিষ্ণুপুরের জোড়-বাংলা মন্দির বাঁকুড়া তথা তাবৎ রাঢ়দেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবালয়।"**

রাঢ়বঙ্গের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবালয় জোড়বাংলা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বিদায় নিয়ে এবার আমরা সমাগত হব রাধাশ্যাম মন্দিরাঞ্চলে। ইত্যবকাশে স্মৃতিচারণ করব মল্লভূমের **ধর্মপ্রবাহ** প্রসঙ্গে।

অধ্যায়-২৩

ধর্মপ্রবাহ

মল্লভূম রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক কাল থেকেই অদ্যাবধি বিষ্ণুপুরে একটি ধর্মপ্রবাহ পরিলক্ষিত হয়। উক্ত ধর্ম-প্রবাহের ফলে প্রাক্-মল্লযুগের জৈনধর্ম-প্রভাবে ভাটা পড়ে ক্রমশঃ। শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্মণ্য ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ার আসে কালে কালে। ক্ষেত্রবিশেষে জৈন মন্দিরগুলি রূপান্তরিত হয় শিব-মন্দিরে। নরবলি দিয়ে শক্তি পূজার উগ্রভাব প্রশমিত হয়। উত্তরণের পথে শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্মের বিশুদ্ধ ভক্তিভাব গ্রাস করেছে বিষ্ণুপুরকে। **কৃষ্ণ, বিষ্ণু, শিব, কালী, দুর্গা ও ধর্মরাজের মন্দিরে মন্দিরে ছয়লাপ বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূম হয়েছে মন্দিরময়। ধর্মক্ষেত্র হয়েছে মল্লভূম।** ধৃ ধাতু মন্ প্রত্যয় যোগে হয় ধর্ম। যাহা ধারণ করে তাহাই ধর্ম। আবার ধর্ম মানে 'শাস্ত্র নির্দেশিত আচার ব্যবহার', 'বেদবিহিত অনুষ্ঠান'—ইত্যাদি বোঝায়।

বিষ্ণুপুরের রাজন্যবর্গ রাজত্ব স্থাপনের সূচনা থেকেই ধর্মভাবাপন্ন ছিলেন। রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় ধর্মাচরণের স্রোতটি পুষ্টিলাভ করেছে দিনে দিনে। নির্মিত হয়েছে মন্দিরের পর মন্দির, মন্দির-সংলগ্ন নাটমন্দির, ভোগ-মণ্ডপ এবং মন্দিরের প্রবেশ-তোরণ। নিযুক্ত হয়েছেন জ্ঞানী-গুণী সেবক ও পুরোহিত। দেবতার উদ্দেশ্যে দেবত্র-সম্পত্তি এবং সেবক পুরোহিতদের উদ্দেশ্যে নিষ্কর জমি প্রদত্ত হয়েছে রাজবংশ থেকে। প্রধান পুরোহিতের তত্ত্বাবধানে দেব-পূজা, শাস্ত্রপাঠ এবং হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে ধর্মের মর্মকথা প্রচারিত হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। প্রজাসাধারণকে ঈশ্বরমুখী, সৎ, সত্যনিষ্ঠ, ধার্মিক এবং নৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার মহৎ অভিপ্রায়ে ধর্মের শাসনকে জোরদার করা হয়েছিল বিশেষ করে মল্লরাজা গোপাল সিংহের আমলে। বাধ্যতামূলকভাবে 'হরিনাম' করতে বাধ্য

করার প্রচেষ্টাটি 'গোপালের ব্যাগার' আখ্যাতে পর্যবসিত হয়েছিল। বর্গী আক্রমণের সময় রাজ্য রক্ষার ভার নগর-দেবতা মদনমোহনের উপর সমর্পণ করে নগরবাসীসহ রাজা গোপাল সিংহের (১ম) হরিনাম সংকীর্তনের দৃষ্টান্তটি ভগবৎ শক্তির কাছে আত্ম-সমর্পণের একটি অভূতপূর্ব উদাহরণ।

১১৭৬ এর মন্বন্তরের সময় মদনমোহনগতপ্রাণ মহারাজ চৈতন্য সিংহ তাঁর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনকে কোলকাতাতে বন্ধক রেখে টাকা এনে প্রজাবর্গের প্রাণ রক্ষার যে দৃষ্টান্তটি স্থাপন করেছেন তা ঈশ্বর-প্রেম থেকে নির্যাসিত মানব-প্রেমের অপূর্ব উত্তরণ স্বরূপ। শিবজ্ঞানে জীবসেবার এতাদৃশ উদাহরণ চোখে পড়ে না বড় একটা। আবার দেখি ঈশ্বর উপাসনায় বীতশ্রদ্ধ ব্যক্তিদের জন্য **'সহজিয়া সাধন'** পদ্ধতির মাধ্যমে নাস্তিককেও আস্তিক করে তোলার মহতী পরিকল্পনা। হাড়ী, বাউরী, বাগ্দী, ডোম প্রভৃতি নিম্নবর্ণের এবং আদিবাসী মনুষ্য সম্প্রদায়কেও ঈশ্বর-প্রেমী করার সাধু উদ্দেশ্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হল—

'ভর যুবতীর কোল
মাগুর মাছের ঝোল
বোল হরি বোল।'

অর্থাৎ সদ্য যুবতীর কোলে বসে, স্ত্রী-সম্ভোগ করে, মাগুর মাছের ঝোল খেয়েও হরিনাম করা চলে বা করা যায়। হরিনাম করার জন্য স্ত্রী-সম্ভোগ থেকে বিরত থাকতে বা নিরামিষাশী হতে হবে না। এটি হল প্রবাদ বাক্যটির বাহ্য অর্থ। এখানে বলতে চাওয়া হয়েছে, যদি কোন ভাল কাজ শুরু করতে হয় তবে যে যেখানে যে অবস্থায় রয়েছে সেখান থেকেই তাদের শুভ কাজে প্রেরণা দিতে হবে। আগে ত্যাগ, পরে সাধনা— তা নয়। ভোগের সাথে সাথে ঈশ্বরের নাম করতে করতে ভোগের স্পৃহা অবদমিত হয়ে ঈশ্বর-পিপাসা আসবে ধীরে, সন্তর্পণে, চুপিসারে। আসবে সর্বগ্রাসীরূপে। ভোগী-মানব হবে দেব-মানব।

প্রবাদবাক্যটির অন্তর্নিহিত অর্থে সেই সুরই অনুরণিত। 'ভর যুবতী' মানে চিরযৌবনা পৃথিবী। মাগুর মাছের ঝোল হল সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট খাদ্য, আবার অন্য অর্থে 'মাগুর মাছের ঝোল' মানে চোখের জল অর্থাৎ ধরিত্রীর বুকে দুর্লভ মানব জন্ম লাভ করে তোমরা চোখের জলে ভাসতে ভাসতে হরিনাম সংকীর্তন কর। ধন্য কর জীবনকে—একথাই বলতে চাওয়া হয়েছে উক্ত মুখরোচক প্রবাদবাক্যে। তাহলে ভেবে দেখুন ধর্ম-পাগল, ঈশ্বর-পাগল মল্লরাজাদের কাণ্ড কারখানা। **ছলে, বলে, কৌশলে জনগণকে ঈশ্বর-মুখী করাটাই ছিল তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য।**

মল্ল নৃপতিগণের মহৎ উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। বিষ্ণুপুরে তথা মল্লভূমে রামকৃষ্ণ, মা সারদা, মনোহর দাস, হরনাথ-কুসুম কুমারী, ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবা, কুরবান বাবা, আউলিয়া গোঁসাই, শ্রীনিবাস আচার্য, শ্যামানন্দ, নরোত্তম দাস প্রমুখ সাধক-সাধিকাগণের আবির্ভাব ও আগমন হয়েছে। পুণ্যাত্মা সাধক-সাধিকা ও দেব-দেবীদের পদরেণুতে বিষ্ণুপুর তথা সমগ্র মল্লরাজ্য পূত-পবিত্র। **এ জন্যই মল্লরাজ্য ধর্মক্ষেত্র, বিষ্ণুপুর গুপ্তবৃন্দাবন। বিষ্ণুপুর বঙ্গের অন্যতম তীর্থস্থান। বিষ্ণুপুর মন্দির-নগরী।**

এতাদৃশ মন্দির-নগরীর একটি উল্লেখযোগ্য দেবমন্দির হল শ্রীশ্রীরাধাশ্যামজীউ-এর শ্রীমন্দির। এখন আমরা দু'চোখ ভরে দেখব সেই অনুপম শ্রীমন্দির।

অধ্যায়-২৪

রাধাশ্যাম মন্দির

১৫৭ ফুট ২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং ১২৮ ফুট ৫ ইঞ্চি প্রস্থ স্বল্পোচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত আয়তাকার উন্মুক্ত অঙ্গনের মধ্যে অবস্থিত রাধাশ্যাম মন্দিরের প্রবেশ তোরণটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। ৩০ ফুট ৮$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, ২৩ ফুট ৯ ইঞ্চি প্রস্থ আয়তাকার দ্বিতল এই প্রবেশতোরণের প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে দুটি করে চারটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। দ্বিতলে উন্মুক্ত ছাদ এবং ছাদের পূর্ব দিকে রয়েছে পাশাপাশি অবস্থিত চৌচালা ছাদ বিশিষ্ট দুটি নহবত মণ্ডপ। নহবত মণ্ডপ দুটির প্রত্যেকটিতে রয়েছে পাঁচটি করে খিলান প্রবেশ দ্বার। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলির প্রবেশতোরণের উপর নহবত মণ্ডপ, বিশেষ করে এমন সুন্দর নহবত মণ্ডপ আর কোথাও চোখে পড়ে না। নহবত মণ্ডপ সজ্জিত প্রবেশতোরণ ছাড়াও এ মন্দিরের পূর্বে ভোগমণ্ডপের ভগ্নাংশ এবং দক্ষিণে রয়েছে নাটমন্দিরের ভগ্নাংশ। এছাড়া এই দেবালয়ের অগ্নিকোণে ২৫ ফুট ১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, ১১ ফুট ১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি প্রস্থ ও ১ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চ আয়তাকার বেদীর উত্তরাংশে প্রায় ১০ ফুট উচ্চ দেউল-মন্দির আকৃতির আট দরজা বিশিষ্ট তুলসী মঞ্চটিও বিশেষ লক্ষণীয়। কারণ এরকম অভিনব তুলসীমঞ্চ আর কোনো মন্দির প্রাঙ্গণে দেখা যায় না।

মন্দিরের বাউণ্ডারি ওয়াল, প্রবেশতোরণ, ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির এবং তুলসীমঞ্চ এ সবই ইষ্টক নির্মিত। পক্ষান্তরে রাধাশ্যাম জীউ-এর শ্রীমন্দিরটি কিন্তু আগাগোড়া বাঁকুড়ার মাকড়া পাথরে তৈরী। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৫৩ ফুট ৪ ইঞ্চি বর্গাকার ভিত্তিবেদীটির উচ্চতা ৩ ফুট ৭$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। ভিত্তিবেদী নির্মাণের ক্ষেত্রে অন্যান্য মন্দিরের ভিত্তিবেদীর ন্যায় গতানুগতিক সোজা দেওয়াল না তুলে তার পরিবর্তে প্রত্যেক দিকেই পাঁচটি করে খাঁজ কাটা দেওয়াল তুলে এক্ষেত্রে অভিনবত্ব আনার প্রয়াসী হয়েছেন শিল্পী।

ভিত্তিবেদীর মধ্যস্থলে দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৪১ ফুট মাপের বর্গাকার শ্রীমন্দিরটির সর্বসাকল্যে উচ্চতা ৩৫ ফুট ১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি। দক্ষিণমুখী এই দেবালয়টির চর্তুদিকের ত্রিখিলান সজ্জিত বাইরের দেওয়ালের উপর নির্মিত হয়েছে বাঁকানো কার্নিস সমন্বিত বাঁকানো ঢালু ছাদ। ছাদের উপর বহুপলযুক্ত বেশ বৃহদাকার গুরুগম্ভীর প্রকৃতির গম্বুজাকৃতির শিখরটিও অন্যান্য মন্দিরের গতানুগতিক শিখরের থেকে একটু স্বতন্ত্র প্রকৃতির। দেবালয়টির পূর্ব, পশ্চিম ও দক্ষিণে রয়েছে ত্রিখিলানযুক্ত খোলা বারান্দা। উত্তর দিকের ত্রিখিলান দেওয়ালাবদ্ধ। দক্ষিণ ও পূর্বদিকে রয়েছে গর্ভমন্দিরে ঢোকার প্রবেশপথ; পশ্চিমে ছাদে ওঠার জন্য সিঁড়িপথ। গর্ভমন্দিরের অভ্যন্তরভাগে আচ্ছাদিত অলিন্দ সহ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠও নজরে পড়ে। দেবমন্দিরটির পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর দিকের দেওয়ালগাত্রে আগাগোড়া চৌকা আকৃতির খোপ খোপ নক্সা, ত্রিতোরণ এবং কয়েকটি স্তম্ভ রচনার মাধ্যমেই ছিম্‌ছাম্ সৌন্দর্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এ মন্দিরের যাবতীয় শিল্পবৈভব সবই যেন সন্নিবিষ্ট হয়েছে দক্ষিণ দেওয়ালে এবং দক্ষিণ দেওয়ালের

অভ্যন্তরভাগের দেওয়ালে। দক্ষিণ দেওয়ালের নিম্নাংশের একটি ফ্রিজে বা পটিতে যুদ্ধচিত্রের পাশাপাশি রয়েছে শিকার চিত্রের অনুপম খোদাই মূর্তি। দেওয়ালটির দু'পাশে ফুলকারি নক্সা ও রেখাচিত্রের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আর মধ্যস্থলে, তোরণ-ত্রয়ের উপরিভাগে এবং ভিতরের দেওয়ালে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণ কাহিনীর নিরুপম চিত্রমূর্তিগুলি যেন শিল্পীর শিল্প-সুষমার গুণে হয়েছে জীবন্ত এবং অনবদ্য। এ মন্দিরের মূল্যায়ন করতে গিয়ে 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থের লেখক শ্রদ্ধেয় অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, **"পঙ্খের আবরণে ঢাকা পাথরের অলংকরণের জন্যও এ দেবালয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাথরের জ্যামিতিক ও ফুলকারি নকশা কাজের এত প্রাচুর্যও বাঁকুড়া জেলার আর কোন মন্দিরে নেই।** খোপে নিবদ্ধ দুসারি মূর্তি-ভাস্কর্য দেওয়ালের দুপাশে ও কার্নিসের নীচে নিবদ্ধ; অপেক্ষাকৃত ছোট কয়েক সারি অনুরূপ অলংকরণ প্রবেশ-খিলানগুলিরও তিন দিকে দেখা যায়। সামনের ত্রিখিলান দালানের ভিতরের দেওয়ালও অলঙ্কৃত; গর্ভগৃহের দরজার বাঁ পাশে রাজসভায় রামসীতা, ডাইনে দেবগণ পরিবৃত, অনন্তশয্যায় শয়ান বিষ্ণু ও দরজার উপরে, দু-দিকে, রাধাকৃষ্ণ মূর্তি।" অমিয় বাবু তাঁর 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থে এ মন্দির সম্পর্কে আরো বলেছেন, **"ল্যাটেরাইট-ভাস্কর্যের বহুলতার জন্যেও রাধাশ্যাম মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, এত নিপুণ ও এত অধিকসংখ্যক প্রস্তর-অলংকরণ বাঁকুড়া জেলার আর কোন মন্দিরে আছে কিনা সন্দেহ।"**

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের ঠিক এক বছর পর অর্থাৎ ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এ মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন মহারাজ চৈতন্য সিংহ। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য চৈতন্য সিংহ যখন সিংহাসন লাভ করেন তখন মল্লরাজ্য এবং রাজপরিবারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। গৃহবিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা, মন্বন্তর, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপদ্রব এবং বর্গী আক্রমণে তিনি হয়ে পড়েন জর্জরিত। কোম্পানীকে সময়মত রাজস্ব দিতে না পারার অপরাধে কারাবাসও করেছেন তিনি। **এতদসত্ত্বেও তিনি যে রাধাশ্যাম মন্দিরের মতো বিশাল এবং ব্যয়বহুল এক পূর্ণাঙ্গ মন্দির প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছেন তাতে তাঁর গভীর ঈশ্বরানুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়।** পাথরের খোদাই মূর্তি তথা যাবতীয় শিল্প কার্যের উপর পঙ্খের প্রলেপ দিয়ে যে শিল্পসৌধটি তিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন তার গুণগত মান এবং নৈসর্গিক আবেদন মন্দির-নগরী বিষ্ণুপুরের স্থাপত্যশৈলীকে করেছে সমুন্নত এবং মহিমান্বিত, দিয়েছে এক নতুন মাত্রা।

দুঃখের কথা রাধাশ্যামজীউ-এর জন্য এ মন্দির নির্মিত হলেও বর্তমানে এ মন্দিরে শুধু কষ্টি পাথরের কৃষ্ণ অর্থাৎ শ্যাম থাকেন একা একা। শিশু এবং নারী অপহরণের যুগে অষ্টধাতুর শ্রীরাধা অপহৃত হওয়ার আশঙ্কায় তিনি আছেন স্থানান্তরে। এ ছাড়া মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরটি ধ্বসে পড়ার ফলে শ্রীনিবাস আচার্য প্রতিষ্ঠিত দারু নির্মিত নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর বৃহদাকার বিগ্রহদ্বয় ছাড়াও আরও এক জোড়া নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মূর্তি এখানেই অবস্থান করেন এবং পূজিত হন। ঐ দেখুন সেইসব বিগ্রহ। আর এ মন্দিরের শ্রীবিগ্রহ রাধাশ্যামজীউ, বিষ্ণুপুরবাসীগণের নিকট বুড়ো রাধাশ্যাম নামেই বিশেষ পরিচিত। রাধাশ্যাম মন্দিরের পশ্চিমেই রয়েছে **মল্লেশ্বরী মা মৃন্ময়ীর শ্রীমন্দির** ও শ্রীবিগ্রহ।

অধ্যায়-২৫

রাজকাহিনী-৪

মল্লেশ্বরী মা মৃন্ময়ী ও মহারাজ জগৎ মল্ল

এখন দেখুন, আমাদের নয়ন-যুগলে উদ্ভাসিত রাজ-রাজেশ্বরী মা মৃন্ময়ী। মাতৃচরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আসুন উপবেশন করি মন্দির সম্মুখের পঞ্চবটী বেদীমূলে। স্মৃতি-স্নিগ্ধ ভাবালুতায় স্মৃতিচারণ করি মা মৃন্ময়ীর কথা। মায়ের অভ্যুত্থানের কথা, উৎসবাদির কথা। আনুষঙ্গিকভাবেই বলি, আজ এই স্থানটি যেমন দেখছেন হাজার বছর পূর্বে এই স্থানটি কিন্তু এইরকম ছিল না আদৌ। তাহলে ছিল কেমন?

ছিল ঘন সবুজের সমারোহ। গাছের গায়ে গাছ। শাখাপ্রশাখায় লুকোচুরি খেলা। পাতায় পাতায় জড়াজড়ি। মাথার উপর নিবিড় আচ্ছাদন। পায়ের নীচে লতাগুল্মের লুটোপুটি। চেনা-অচেনা, নাম-না-জানা গাছ-গাছালির ঝোপ-ঝাড়। শ্বাপদ জন্তু-জানোয়ারের দাপাদাপি। আলো-আঁধারি সেই নিবিড় অরণ্যে, ভয়ঙ্কর সেই অরণ্যে ছন্দে ছন্দে পা ফেলে চলেছে এক হরিণ। পিছনে ধাবমান এক সুস্থ সবল সাহসী শিকারী। হাতে তাঁর তীর ধনুক। হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে নিজেরই অজান্তে কখন যেন এসে গেছেন গভীর অরণ্যে—শাল, পিয়াশাল, হিজল, মহুয়া, চকলদার ঘন জঙ্গলে। বনকুল, শিঁয়াকুল, ক্ষীরকুল আর বৈঁচি ফলের ঝোপঝাড়ের মাঝে। পায়ে পায়ে জড়িয়ে যাওয়া লতাগুল্মের ফাঁদে পথ হারালেন পথিক। শিকারের নেশায় দিশেহারা শিকারী হরিণের পিছনে ছুটতে ছুটতে হারালেন পথ, হারালেন শিকার—কারণ হরিণ ততক্ষণে হাওয়া অর্থাৎ অদৃশ্য।

অসমসাহসী শিকারী ভাবছেন মায়াবী হরিণের কথা। বাঘ-ভালুকের এই ভয়াল জঙ্গলে বিপদ আপদের অজানা আশঙ্কায় শঙ্কিত তাঁর হৃদয়। এমন সময় শিকারী লক্ষ্য করলেন তাঁর কাঁধের উপর বসে থাকা শিকারী বাজটা গর্জন করছে প্রচণ্ড ক্ষোভে। মাথার উপর বিশাল এক চকলদা গাছ। শিকারী দেখল গাছের মগ ডালে বসে রয়েছে এক বক। শিকারী বাজপাখির বাঁধন খুলে দিলেন তৎক্ষণাৎ। ভয়ঙ্কর সেই বাজপাখি শিকারের আশায় তেড়ে গেল বকের দিকে। বকটি কিন্তু নির্ভয়, নির্বিকার। বাজটি ফিরে এলো শিকারীর কাঁধে। কিন্তু শিকারীর তাড়া খেয়ে আবার সে ধেয়ে গেল বকের দিকে। এবার কিন্তু বকটি ধারণ করেছে ভয়ঙ্কর রূপ। সরোষে আক্রমণ করল খাদক বাজপাখিকে। বকের তীক্ষ্ণ চঞ্চুর আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত এবং রক্তাপ্লুত হয়ে একান্ত অসহায়ভাবে ফিরে এল ঐ বাজ। বক ইতিমধ্যে অদৃশ্য।

এরকম এক নাটকীয় মুহূর্তে বন-মর্মরের নিবিড় নিরালায় আলো-আঁধারি পরিবেশে, মায়াময় স্থানে পথ-হারানো-শিকারী দেখল এক অপরূপা রূপসী রমণীকে। বিস্ময় ও বিহ্বলতার উপান্তে উপনীত হয়ে ভাবলেন ব্যাপার কী? তাজ্জব ব্যাপার! বিস্ময়ের আবেশ স্তিমিত হলে ফিরে পেলেন স্বাভাবিকতা। খুবই সংযতভাবে কয়েকটি প্রশ্ন করলেন লাবণ্যময়ী ললনাকে। কিন্তু কোন সদুত্তর না পেয়ে উদ্ধত খড়্গহস্তে আঘাত করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন বারংবার। হয়ে পড়লেন নিস্তেজ, নিষ্ক্রিয় এবং শক্তিহীন। লাবণ্যময়ী ললনা ইতিমধ্যে অদৃশ্য।

শিকারীর মাথা ঘুরে গেল। ভাবলেন এ আমি কোথায় এলাম। মুহূর্তে ঘটে যাওয়া

ঘটনারাজির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ভাবলেন, 'এ ও কি সম্ভব!' আবার ভাবেন অসম্ভবই বা হবে কেন? নিশ্চয় স্থান-মাহাত্ম্য। সনাতন ধর্মের দেশ ভারতবর্ষে তপঃপ্রভাবে তপঃসিদ্ধ মুনিঋষিদের আশ্রমে আশ্রমে বাঘে বলদে এক ঘাটে জল খাওয়ার দৃষ্টান্তের পাশাপাশি দুর্বলের ভয়ে ভীত হয়ে বলশালী অত্যাচারীর আত্মগোপনের দৃষ্টান্তও তো কম নয়।

এসব ভাবছেন, এমন সময় শুনলেন এক দৈব-বাণী—'হে বৎস! আমি মৃগ নই, বক নই, নারী নই। আমি শক্তিস্বরূপিণী জগদম্বা মা মৃন্ময়ী। এখানে মাটির নীচে প্রোথিত রয়েছে আমার মুখমণ্ডল। তুই তোর রাজধানী তুলে নিয়ে এসে এখানেই রাজধানী স্থাপন কর। আর মাটি চাপা আমার মুখাবয়ব খুঁড়ে বের করে পূর্ণাঙ্গ মৃন্ময়ীমূর্তি স্থাপন করে পূজা-আচ্চা কর্। আমি তোর ওপর সুপ্রসন্ন।'

ঈশ্বর-বিশ্বাসী এই শিকারী হলেন **মল্লরাজ্যের** উনবিংশতিতম রাজা **জগৎ মল্ল**। রাজা জগৎ মল্ল স্থান-মাহাত্ম্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে দৈববাণী অবলম্বনে অনতিবিলম্বে প্রদ্যুম্নপুর থেকে রাজধানী তুলে নিয়ে এলেন এই স্থানে—মা মৃন্ময়ীর পদপ্রান্তে। রাজধানীর উপযুক্ত করে স্থানটিকে গড়ে তোলার জন্য জঙ্গল কাটিয়ে সাফাই করলেন। অসমতল ভূমি হল সমতল। স্থাপিত হল রাজধানী। স্থাপিতা হলেন মা মৃন্ময়ীর শ্রীমূর্তি। পূজিতা হলেন তিনি। **মা মৃন্ময়ীর শক্তিসামর্থে পুষ্ট, তাঁরই ইচ্ছাশক্তিতে স্থানান্তরিত, তাঁরই কৃপাধন্য মল্লভূমের এই নতুন রাজধানীটির নাম রাখা হল 'বিষ্ণুপুর'। মল্লাব্দ ৩০৩, বঙ্গাব্দ ৪০৪, ইংরাজী ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এক পুণ্যলগ্নে প্রদ্যুম্নপুরের পরিবর্তে মল্লরাজ্যের রাজধানী হল বিষ্ণুপুর।** মা মৃন্ময়ীর ছত্র-ছায়ায় দিনে দিনে নব-কলেবর ধারণ করল বিষ্ণুপুর। বাড়ন্ত এক দেব-শিশুর মতোই তিলে তিলে বাড়তে থাকল সে। নবজাতক এই বিষ্ণুপুর নগরীকে বৃত্তাকারে ঘিরে রইল দিগন্ত বিস্তৃত দিগ্‌বলয়ের ঘন জঙ্গল। ঘোমটার অন্তরালে নববধূর লজ্জামাখা মুখশ্রীর মতোই অথবা মেঘে ঢাকা চাঁদের মতোই বনানীর নিবিড় আচ্ছাদনে তৎকালে আবদ্ধ ছিল বিষ্ণুপুর। **লোকে বলত, 'বন-বিষ্ণুপুর'।**

বন ছিল, আর বনে ছিল অজস্র বনফুল ও বনজ ফল। ছিল শাল, পিয়াশাল, সেগুন, মহুয়া, হলদু, অশ্বত্থ, বট, বকুল, কদম্ব, আম, জাম, তাল, খেজুর, অর্জুন, ক্যান্দ ও ভুড়ুরের গাছ। মাধবী, মালতী, মধুমালতী, বন-গোলাপ, কেতকী লতার কুঞ্জবন। ফুলের সৌরভে সুরভিত হয়ে থাকত বনমর্মর। আর ফলের প্রাচুর্যে ছিল থৈ থৈ আমন্ত্রণ। পাখীর কূজন, অলির গুঞ্জন আর কোকিলের কুহু স্বরে মুখর হয়ে থাকত বনানী। বাঘ, ভালুক, নেকড়েবাঘ, বন-বিড়াল, বন-মুরগী, বুনো-শুয়োর প্রভৃতি বন্য জন্তুর দল এবং বিষাক্ত সরীসৃপ অহরহ দাপিয়ে বেড়াত বনভূমি। মধু, লাক্ষা, কাঠ, ভেষজ দ্রব্যাদিতে সমৃদ্ধ ছিল বন-বিষ্ণুপুরের তথা জঙ্গলমহলের অরণ্য। এখন আর নেই সেই জঙ্গলমহল, নেই সেই বন-বিষ্ণুপুর। নেই শাল, পিয়াশাল, মহুয়া, কদম্বের ঘন জঙ্গল। নেই বনকুল, শিঁয়াকুল, ক্ষীরকুল, পিয়াল, বৈঁচির ঘন ঝোপঝাড়। নেই আম, অশ্বত্থ, বটের ছায়া-ঘেরা শীতল প্রাঙ্গণ। নেই সেই পাখীর কল-কাকলীতে মুখরিত রাঙামাটির উপর সোনালী সূর্যের সোনামাখা সকাল, ঘু ঘু ডাকা উদাসী গ্রীষ্মের দুপুর, অথবা শালফুলের গন্ধে ভরা শান্ত-স্নিগ্ধ মায়াময় সন্ধ্যা। এ সবই হারিয়ে গেছে। **কাটা গেছে বন। তাই 'বন-বিষ্ণুপুর' নামের 'বন' শব্দটিও কাটা গিয়ে হয়েছে শুধু 'বিষ্ণুপুর'।**

প্রদ্যুম্নপুর থেকে বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থানান্তরকরণের আধ্যাত্মিক কারণটি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। কিছু কিছু বিদগ্ধ ব্যক্তি, ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানীগণ অবশ্য রাজধানী

স্থানান্তরকরণের বিষয়ে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁদের মতে প্রদ্যুম্নপুর থেকে বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করণের অন্তর্নিহিত সুরটি হল বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে মল্লভূমের রাজধানীকে অধিক নিরাপত্তা দান। কারণ প্রদ্যুম্নপুর হল সমতলভূমি সংলগ্ন মালভূমি অঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চল, কিন্তু বিষ্ণুপুরের অবস্থান হল অসমতল ভূখণ্ডে পরিবেষ্টিত মালভূমি অঞ্চলের অন্তর্বর্তী স্থানে— যেখানে জলদুর্গ নির্মাণ করা অধিকতর সহজ ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য।

প্রদ্যুম্নপুর থেকে বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থানান্তরকরণের আধ্যাত্মিক ও ভৌগোলিক অবস্থানগত যুক্তিভিত্তিক কারণ সংক্ষেপে আলোচনার পর **এবার আসা যাক রাজধানীটির 'বিষ্ণুপুর' নাম করণের তত্ত্বকথায়।** কারো কারো মতে এই স্থানে বিষ্ণুপুর নামে একটি গ্রাম ছিল তৎকালে। সেই গ্রামের উপরেই গড়ে উঠেছিল নতুন রাজধানী,তাই নতুন রাজধানীর নাম রাখা হয়েছিল **বিষ্ণুপুর।** দ্বিতীয় অভিমতটি হল মল্লরাজাদের কুলদেবতা হলেন অনন্তদেব অর্থাৎ ভগবান বিষ্ণু। এজন্যই ঈশ্বরভক্ত রাজা কুলদেবতা বিষ্ণুর নামানুসারেই নতুন রাজ্যটির নাম রাখেন **বিষ্ণুপুর।** আবার 'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী' পুস্তকের লেখক মন্তব্য করেছেন, ''বৈষ্ণবী শক্তি মৃন্ময়ী দেবীর প্রত্যাদেশ মত নগর গঠিত হয়েছে বলে নগরের নাম হয়েছে **বিষ্ণুপুর।**''

প্রখ্যাত লেখক তরুণদেব ভট্টাচার্য নতুন রাজধানী বিষ্ণুপুর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া' পুস্তকের ৭৯ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন, ''নতুন রাজধানী যে চমৎকারভাবে বিন্যস্ত ছিল লোককথা সেদিকেই ইঙ্গিত করে। নির্মিত হয়েছিল প্রাসাদ, উদ্যান, রাজপথ, সজ্জাগৃহ, প্রেক্ষাগৃহ। হাতীশালা, ঘোড়াশালা, অস্ত্রাগার, শস্যাগার, ধনাগার, সেনানিবাস ও মন্দির। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল নতুন রাজধানীর খ্যাতি। বণিক ও শ্রেষ্ঠীরা এসে বসবাস ও বিপণি সাজাতে শুরু করেছিল।''

মল্লভূমের রাজধানীর 'বিষ্ণুপুর' নামকরণের সম্ভাব্য কারণগুলির ওপর আলোকপাত করলাম এবং রাজধানীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। এবার মল্লভূমের পীঠস্থান মা মৃন্ময়ীর পুণ্যাঙ্গনে স্মৃতি-মেদুর ছন্দে ফিরে দেখার ভঙ্গিমায় ফিরে আসি মা মৃন্ময়ীর কথায়, মায়ের পূজাপাঠ ও উৎসবাদির কথায়।

শক্তিস্বরূপিণী মা মৃন্ময়ী হলেন রাজ-রাজেশ্বরী। মল্লরাজ-পরিবারের ইনি কুলদেবী। মল্লভূমের মল্লেশ্বরী। বিষ্ণুপুরের বিষ্ণুপুরেশ্বরী। আবার এই মা মৃন্ময়ী হলেন স্বয়ং দুর্গতিনাশিনী দুর্গা। ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে এই দেবী পূজিতা হন। কাশ্মীরে ও দাক্ষিণাত্যে অম্বা ও অম্বিকা, গুজরাটে হিঙ্গলা ও রুদ্রাণী, কান্যকুব্জে কল্যাণী, মিথিলায় উমা, কুমারিকা অঞ্চলে কন্যাকুমারী ছাড়াও চণ্ডী, কালী, ভদ্রকালী, করালী, দশমহাবিদ্যা প্রভৃতি অসংখ্য নামে তাঁর প্রসিদ্ধি। বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত বহির্ভারতে যেমন চীন, জাপান, কম্বোজ, চম্পা, যবদ্বীপ (যাভা) প্রভৃতি দেশেও এই দেবী পূজিতা হন। জাপানের বৌদ্ধ মন্দিরে 'চনষ্টী' নামে এক দেবী আছেন। ইনি দেবী চণ্ডীর নামান্তর মাত্র। দেবী চনষ্টির আর এক নাম 'কোটীশ্রী'। চীনদেশের ক্যান্টন শহরে শত হস্ত বিশিষ্টা এক দেবী আছেন। ইনিও দেবী দুর্গা তথা মা মৃন্ময়ীর আর এক রূপ। তিব্বত, মহাচীন, জাপান প্রভৃতি দেশে পূজিতা মহাযান বৌদ্ধতন্ত্রের ব্রজতারা দেবীও দুর্গা রূপেই প্রতিভাত।

বৈদিক যুগে হব্যবাহী অগ্নিশিখা রূপে দেবী দুর্গার পূজা হয়েছে। পরবর্তীকালে মূর্তিপূজা প্রচলিত হলে অগ্নিশিখার পীতাভ রঙ দেবীর গাত্রবর্ণরূপে প্রাধান্য লাভ করে। ঋগ্বেদের খিল অংশে দুর্গা 'রাত্রিদেবী' রূপে চিহ্নিত। যজুর্বেদের তৈত্তিরীয়-আরণ্যকে ইনি

'হব্যবাহিনী-অগ্নি'-রূপে পূজা পেয়ে থাকেন। ঋগ্বেদে অগ্নিরূপিণী এই দেবীকে শত্রুহন্তা, রাক্ষসহন্তা অসুরনাশিনীরূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। হিন্দুদের পরমারাধ্যা জগন্মাতা মহামায়া ভারত ও বর্হিভারতের বিভিন্ন দেশে এবং তীর্থস্থানে যুগ যুগ ধরে পূজা পেয়ে আসছেন।

"প্রাচীন পৃথিবীতেও কোন না কোন আকারে মাতৃপূজার প্রচলন দেখা যায়। আমেরিকার মায়াজাতিরা ভূমি কর্ষণের পূর্ব্বে ধরিত্রীমাতার পূজা করত। প্রাচীন মিশরেও দেখা যায় যে মিশরীয়রা আইসিস দেবীর পূজা করত। উইলকিন্স সাহেবের মত অনুযায়ী তিনি দুর্গাতুল্যা দেবজননী সহস্রনাম-ধারিণী। ভেস্তা বা সিবিলরূপে ভবানী আবার বেলনরূপে তিনি দুর্গা। হিকেষ্ট বা প্রসার পাইন রূপে ভয়ঙ্করী প্রলয়ঙ্করী মহাকালী। জুনোরূপে তিনিই আবার গিরিজা বা পার্ব্বতী।"[১]

রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্র অকালে দেবীর বোধন সহকারে ১০৮ নীলপদ্ম অর্ঘ্য দিয়ে দেবীর পূজার্চনা করে কাঙ্ক্ষিত বর লাভ করেন। মহাভারতের বিরাটপর্বে অর্জুন-কথিত দুর্গার স্তব আছে। ভীষ্মপর্বে শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের পূর্বে অর্জুনকে দেবীর নিকট জয় প্রার্থনা করতে উপদেশ দেন।

অগণিত সাধক-সাধিকা ও ভক্তের মনোবাঞ্ছাপূর্ণকারিণী, অর্জুন ও শ্রীরামচন্দ্রের অভীষ্টদায়িনী দেবী দুর্গা তথা মা মৃন্ময়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিষ্ণুপুরে অবস্থান করেন বিষ্ণুপুরে মল্লরাজধানী স্থাপিত হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই। মল্লভূমের ঊনবিংশতিতম রাজা জগৎমল্লকে পূর্বোল্লিখিত অলৌকিক ঘটনাচক্রের মাধ্যমে বশীভূত করে স্বীয় মুখ-নিঃসৃত দৈববাণী শুনিয়ে স্বেচ্ছায় দেবী এখানে অধিষ্ঠিতা হন ৩০৩ মল্লাব্দ, ৪০৪ বঙ্গাব্দ তথা ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দের এক পুণ্য লগ্নে। সেই থেকে অদ্যাবধি ১০০৭ বছর যাবৎ ইনি মল্লরাজবংশের রাজকুলদেবীরূপে পূজিতা হয়ে আসছেন সাড়ম্বরে এবং শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে। প্রসঙ্গতঃ বলি, রাজা জগৎ মল্ল দৈববাণীর নির্দেশমত মৃন্ময়ী মন্দিরের সম্মুখে অবস্থিত এই পঞ্চবটী বৃক্ষমূলের মাটি খুঁড়ে পেয়েছিলেন দেবীমূর্তির একটি আবক্ষ মুখাবয়ব। **পণ্ডিতদের মতে এটি ছিল দেবী দুর্গার ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবী মূর্তি। তাঁদের মতে এ মূর্তির পূজা হয় পাতালে। মর্ত্যে অর্থাৎ পৃথিবীতে নয়। দেবীর ইচ্ছানুসারেই মুখারবিন্দটি মৃৎপ্রতিমার মুখের অন্তরালে আবৃত রেখে নির্মিত হয় গঙ্গামাটির মৃন্ময়মূর্তি। মৃন্ময়মূর্তির সুবাদেই নাম হয় মৃন্ময়ী।**

প্রথম দিকে মা মৃন্ময়ী ছিলেন ভীষণা-চামুণ্ডা। "শোনা যায় খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে মহারাজ বীরহাম্বিরের বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করার পূর্ব্ব পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের অধিষ্ঠাত্রীদেবী মৃন্ময়ী মায়ের শ্রীমন্দিরে ও মুণ্ডমালা ঘাটের পরিখা পাহাড়ের ওপর যে মহাকালী ছিলেন, তাঁর কাছে সময় বিশেষে নরবলি দেওয়া হত এবং সেই মুণ্ড মহাকালীর গলার মুণ্ডমালায় ঝুলিয়ে দেওয়া হত। আর উক্ত উভয় জায়গাতেই মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের বলি দেওয়া হত। তারপর মহারাজ বীরহাম্বির বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করবার পর, তাঁর দীক্ষাগুরু শ্রীনিবাস আচার্য্য ঐ নিষ্ঠুর প্রথা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেন। সেই থেকে বিষ্ণুপুরে নিষ্ঠুর নরবলির প্রথা বন্ধ হয়ে যায়।"[২]

সুদূর অতীতে একটি ক্ষুদ্র মাটির মন্দিরে দেবী অধিষ্ঠাতা ছিলেন। পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুরের ঊনষাটতম রাজা **রামকৃষ্ণ সিংহদেব** খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে পাথরের দেওয়ালের উপর সুবিশাল ছাদ বিশিষ্ট এই দালান-মন্দিরটি নির্মাণ

১। 'মল্লেশ্বরী মা মৃন্ময়ী', পৃঃ— ১, ২। বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী, পৃঃ—১৯০-১৯১

করান। পাঁচটি প্রকোষ্ঠযুক্ত ত্রিস্তরে বিভক্ত এই শ্রীমন্দিরটির দৈর্ঘ্য ৬৮ ৭´´, প্রস্থ ৩৮ ১½´´ এবং উচ্চতা প্রায় ১৮ ফুট। এই মন্দির প্রসঙ্গে ফকির নারায়ণ কর্মকার লিখেছেন, "কিন্তু যে কোন কারণবশতই হোক মাত্র ৭৫ বৎসরের মধ্যে তার ছাদ ধ্বসে পড়ে মন্দির নষ্ট হয়ে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তাই গত বাংলা ১৩৫৪ সালে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মুখোপাধ্যায় বংশের সন্তান, বিষ্ণুপুরের দরদী বন্ধু **শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়** ও তাঁর তিন সহোদর পূজনীয় **রামশরণ মুখোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস মুখোপাধ্যায়** ও **বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়** মশায় আমারই লেখা **'দেবী মৃন্ময়ী'** নামক নাটক টিকিট করে অভিনয় করে মাত্র এক রাত্রিতে ২০৮৫ টাকা সংগ্রহ করেন এবং অভিনয়ের সমস্ত খরচ নিজেরা বহন করেন। তারপর ১৩৫৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে মৃন্ময়ী মন্দিরের ছাদ ভেঙে ফেলে দিয়ে, আরও টাকা সংগ্রহ করে ১৩৫৫ সালেরই শারদীয়া মহাপূজার পূর্ব্বে ছাদ তৈরীর কাজ, আর ভোগ প্রভৃতি তৈরীর জন্য মন্দির সংলগ্ন একটি বৃহৎ রান্নাঘরও তৈরী করেন।

তারপর ১৩৫৭ সালে পুনরায় টাকা সংগ্রহ করে শ্রীমন্দিরের বেষ্টনীর প্রাচীর তৈরী করেন।"[১]

বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস আচার্যের আগমনের পর বীর হাম্বীরের রাজত্বকালেই গঙ্গামাটির দেবীমূর্তি এবং শিব, দুর্গা, গণেশ, কার্তিক, লক্ষ্মী, সরস্বতী সহ পূর্ণাঙ্গ 'দুর্গামেড়' তৈরী হয় বলেই অনুমিত হয়। **শ্রীনিবাস প্রভুর বিষ্ণুপুরে আগমনের পরই মল্লরাজ্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্লাবন আসে। মা মৃন্ময়ীর উগ্রতা কমে গিয়ে শ্যাম-শ্যামা অভেদ রূপে প্রতিভাত হয়। বন্ধ হয় বলিদান। শক্তিরূপিণী মা চামুণ্ডা হয়ে যান পরম বৈষ্ণবী।**

দেবীচাল বা মেড় রচনায় বিশেষত্বও পরিলক্ষিত হয়। দুর্গার চালে প্রায় সর্বক্ষেত্রেই কার্তিক, গণেশের স্থান নীচের সারিতে এবং লক্ষ্মী, সরস্বতীর স্থান তাঁদের উপরিভাগে। এক্ষেত্রে হয়েছে ঠিক তার বিপরীত। মা মৃন্ময়ীর মাথার উপরিভাগে শোভা পাচ্ছেন ধ্যানাসনে উপবিষ্ট দেবাদিদেব মহাদেব। ধ্যানী শিবের মাথায় শোভিতা মা গঙ্গা। মহাদেবের দক্ষিণে ছাগমুণ্ড বিশিষ্ট দক্ষরাজ দণ্ডায়মান। দক্ষরাজের দক্ষিণে কিম্ভূতকিমাকার এক ভূত। আবার মহাদেবের বামে গঞ্জিকাপূর্ণ কলকেধারী শিবানুচর। তাঁর পাশেও এক ভয়ঙ্কর ভূত। এ ছাড়া দেবীর চালে রয়েছে দশমহাবিদ্যার চিত্র। একটি সিংহের মুখমণ্ডল এবং সিংহের দুপাশে দুটি হাতির মুখাবয়বের অস্তিত্ব শত্রুভাবাপন্ন প্রাণীর সহাবস্থান ও বিদ্বেষহীনতার সূচক। এটা যেন স্থান-মাহাত্ম্যের প্রভাব।

মন্দিরগাত্রের স্তম্ভে খোদিত নারীমূর্তি তিনটির মধ্যে যে নারীমূর্তিটি হরিণকে পাতা খাওয়াতে ব্যস্ত আছেন তিনি টোড়ি রাগের—মন্তব্য করেছেন **ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়**। আর মুষলধারী নারীমূর্তিটি হয়তো বা অন্য কোন রাগিণীর প্রতীক। এছাড়া রয়েছে চামর ব্যজনকারী আর এক নারীমূর্তি। এসব থেকে অনুমান করা যায় অতীতে দেবীর পাশাপাশি রাগ-রাগিণীরও পূজা হত। তা না হলেও অন্ততঃপক্ষে "বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী সংযুক্ত সংগীতের ভেতর দিয়ে পূজার মন্ত্র প্রভৃতি আবৃত্তি করার প্রথা ছিল। ....তার প্রমাণ স্বরূপ শারদীয়া দুর্গোৎসবের মহাসপ্তমীর দিন দেবীর বোধনের নবপত্রিকা আসার সময় অষ্টকলসের এক একটিকে গ্রহণ করে তার মন্ত্রের সঙ্গে রাগ-তালের পরিবেশনের ব্যবস্থা..."[২] বিশেষ উল্লেখ্য। যেমন—

১। বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী, পৃঃ—১৮৬-১৮৭ ২। সঙ্গীততীর্থ বিষ্ণুপুর, পৃঃ— ১৪

প্রথম কলস — মালবরাগের সুরে। **মন্ত্রাংশ**—মালবরাগং বিজয়বাদ্যং কৃত্বা গঙ্গাজলপূরিতঘটেন.... ইত্যাদি।

দ্বিতীয় কলস — ললিতরাগের সুরে। **মন্ত্রাংশ**—ললিতরাগং দুন্দুভিবাদ্যং কৃত্বা বৃষ্টিজলপূরিতঘটেন.... ইত্যাদি।

তৃতীয় কলস — বিভাসরাগের সুরে। **মন্ত্রাংশ**—বিভাসরাগং দুন্দুভিবাদ্যং কৃত্বা সরস্বতীজলপূরিতঘটেন.... ইত্যাদি।

চতুর্থ কলস — ভৈরবরাগের সুরে। **মন্ত্রাংশ**—ভৈরবরাগং ভীমবাদ্যং কৃত্বা সাগরোদকপূরিতঘটেন... ইত্যাদি।

পঞ্চম কলস — কোড়ারাগের সুরে। **মন্ত্রাংশ**—কোড়ারাগম্ ইন্দ্রাভিষেকবাদ্যং কৃত্বা পদ্মরজোমিশ্রিতজলপূরিতঘটেন... ইত্যাদি।

ষষ্ঠ কলস — বরাড়ীরাগের সুরে। **মন্ত্রাংশ**—বরাড়ীরাগং শঙ্খবাদ্যং কৃত্বা নির্ঝরোদকপূরিতঘটেন.... ইত্যাদি।

সপ্তম কলস — বসন্তরাগের সুরে। **মন্ত্রাংশ**—বসন্তরাগং পঞ্চশব্দবাদ্যং কৃত্বা সর্ব্বতীর্থাম্বুপূরিত ঘটেন... ইত্যাদি।

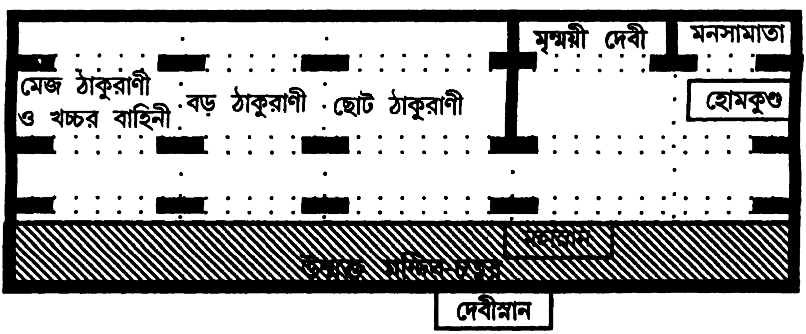
অষ্টম কলস — ধানসীরাগের সুরে। **মন্ত্রাংশ**—ধানসীরাগং বিজয়বাদ্যং কৃত্বা শুদ্ধজলপূরিতঘটেন... ইত্যাদি"

মা মৃন্ময়ীর শারদীয়া উৎসবেই নয়, বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের অন্যান্য পূজা এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানেও বিভিন্ন রাগ-রাগিণী সহকারে মন্ত্রপাঠের প্রথা প্রচলিত ছিল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বিষ্ণুপুরে এসে মা মৃন্ময়ীকে চিন্ময়ী সত্তায় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দেখেছিলেন মায়ের আবক্ষ মূর্তি। আবাটা-মেথির গন্ধে আপ্লুত হয়েছিলেন। **কাজী নজরুল ইসলাম বিষ্ণুপুরে এসে মা মৃন্ময়ী এবং দলমাদল কামান দেখে অভিভূত হয়েছিলেন।**

চিন্ময়ী সত্তায় প্রতিভাত রাজরাজেশ্বরী মা মৃন্ময়ীর দুর্গোৎসবের কথায় আসা যাক এবার। এখানের দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয় তিথি অনুসারে আঠার বা উনিশ দিন ধরে। জিতাষ্টমীর দিনে জীমূতবাহন পূজার পুণ্যলগ্ন থেকেই সূচিত হয় বিষ্ণুপুরের দুর্গাপূজা। ঐ দিনই মায়ের বিল্ববরণ হয়। বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের দুর্গাপূজাতে মা মৃন্ময়ী ছাড়াও আরও তিন দেবীর পূজার্চনা হয় পর্যায়ক্রমে। এঁরা হলেন **বড় ঠাকুরাণী, মেজো ঠাকুরাণী** বা মাইতো ঠাকুরাণী এবং **ছোট ঠাকুরাণী** বা পটেশ্বরী। পটে আঁকা এই তিন দেবী সহ মা মৃন্ময়ী এবং মৃন্ময়ীর-মন্দিরে অধিষ্ঠিতা মা মনসার অবস্থান হল নিম্নরূপ।

রেখাঙ্কনে মৃন্ময়ী মন্দির



জিতাষ্টমীর পরের দিন পিতৃপক্ষের নবমী তিথিতে ঘট ও পট সহ আগমন ও বোধন হয় দনুজদলনী দশভুজা বড় ঠাকুরাণীর। শুরু হয়ে যায় দুর্গাপূজা। দেবীপক্ষের চতুর্থী তিথিতে ঘট ও পট সহ আগমন করেন মেজ ঠাকুরাণী বা মাইতো ঠাকুরাণী। কথিত আছে, মাইতো ঠাকুরাণী মন্দিরে ছোট ঠাকুরাণীকে দেখতে না পেয়ে ঐদিনই চলে যান তাঁকে আনতে। অতঃপর মহাসপ্তমীর দিন প্রভাতে রাজবাড়ির অন্তঃপুর থেকে স্বর্ণপটে আঁকা ছোট ঠাকুরাণী অর্থাৎ পটেশ্বরীকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসেন মাইতো ঠাকুরাণী। পট পূজাতে দেবী সহজেই চেতন হন—এই বিশ্বাস থেকেই পট পূজার প্রচলন।

"একসময় মল্লরাজপুরোহিত রাজা ও রাণীকে মহাষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যার প্রারম্ভে ক্ষীরকুলতলায় দুর্গাপট দর্শন করাতে নিয়ে যেতেন। এই অনুষ্ঠানকে বলা হত '**পটদর্শন**'। রাজবাড়ির পিছনে ক্ষীরকুলতলার কোন নিভৃত কক্ষের অভ্যন্তর থেকে খোপের ফাঁক দিয়ে রাজা ও রাণী পটদর্শন করতেন। অতঃপর দুর্গাপট নিয়ে রাজপুরোহিত বাদ্যভাণ্ডসহ ক্ষীরকুলতলা থেকে শ্যামকুণ্ড পার হয়ে আসতেন বিল্ববৃক্ষতলায়। বিল্ববৃক্ষতলাতেই হয় দেবীর বোধন।"[১] দেবীস্নান হয় দেবীস্নান বেদীতে। মহাসপ্তমীর দিন নব পত্রিকাসহ পটেশ্বরীর আগমনের পরই পূর্ণমানে শুরু হয় মহাপূজা।

মহাষ্টমীর দিন রাজ-অন্তঃপুর থেকে অষ্টধাতুর অষ্টাদশভুজা বিশালাক্ষী দেবীর আগমন ঘটে মৃন্ময়ী মন্দিরে। দেবীর মহাস্নান পর্বের পর এই দেবীকে মৃন্ময়ী সকাশে স্থাপন করা হয়। উগ্রচণ্ডা এই দেবীই মহিষাসুর বধ করেন। মহাষ্টমীর দিন অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণের সন্ধিপূজা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। **বৈষ্ণবমতে অনুষ্ঠিত এই পূজাতে রক্তপাত নিষিদ্ধ।** সন্ধিপূজার সন্ধিক্ষণে মাষকলাই বলি দেওয়া হয়। সন্ধিলগ্ন সূচিত করার জন্য তামীর বা জলঘড়ির ব্যবহার চিরাচরিত প্রথা। তামীর বা জলঘড়ির নির্দেশ অনুসারে মৃন্ময়ী-মন্দির-প্রাঙ্গণ থেকে তোপধ্বনি মারফৎ সময়-সংকেত পাঠানো হয় মূর্চার পাহাড়ের উপর অপেক্ষমাণ মহাদণ্ডধর বা প্রধান গোলন্দাজের কাছে। সংকেত পাওয়া মাত্রই মহাদণ্ডধর কামানে অগ্নিসংযোগ করেন। গর্জে উঠে কামান। রাজবাড়ির এই তোপধ্বনির সংকেত মেনেই মল্লরাজ্যের সমস্ত দুর্গামণ্ডপে একযোগে বলিদান সহ আরত্রিক অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয় মহাসমারোহে। মা মৃন্ময়ীর সন্ধিক্ষণের পূজা এবং মূর্চার পাহাড়ের উপর কামান দাগার দৃশ্য দেখার জন্য মল্লরাজ্যের হাজার হাজার মানুষ তথা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ভিড় জমে রাজদরবার মহল্লায়।

"সবচেয়ে বিচিত্র ও ভয়ঙ্কর মহানবমীর মহাপূজা। রাত বারোটার পর '**খচ্চর বাহিনী**' দেবীর পূজা করা হয়। ঘটেপটে এই পুজো হয়। দুর্গার ধ্যান এই পূজার বৈশিষ্ট্য হলেও ঘটের দিকে পিছন ফিরে বসে পুরোহিত পূজা করেন। **দুজন পুরোহিত ব্যতীত অন্য সকলের অনুপস্থিতি এই পূজার প্রধান বৈশিষ্ট্য।**"[২]

বিজয়া দশমীর দিন শোনা যায় বিসর্জনের সুর। ঘট-পট বিসর্জনের পালা ঐদিন। মল্লরাজাদের রাজত্বকালে চতুর্দোলা, বাজনাবাদ্যি, তোপধ্বনি, হাতিঘোড়ার শোভাযাত্রা সহ সাড়ম্বরে সম্পন্ন হত বিসর্জন পর্ব। আগে বিসর্জন হত কৃষ্ণসায়রে, এখন হয় রাজদরবার মহল্লার গোপালসায়রে। পূজা এবং বিসর্জন সবই হয় প্রায় সাদা-মাটাভাবে। রাজন্যপ্রথা বিলুপ্তির পর আড়ম্বর কমলেও এই পূজার ঐতিহ্য অম্লান আছে আজও।

১। লোক সংস্কৃতি গবেষণা, ১৩ বর্ষ ২ সংখ্যা, পৃঃ—৩৫২
২। লোক সংস্কৃতি গবেষণা, ১৩ বর্ষ ২ সংখ্যা, পৃঃ—৩৫৩

পূজার অঙ্গহানি হয়নি কোন ভাবেই। দশমীর দিন সন্ধ্যায় মাতৃমন্দিরে দীপদান, অপরাজিতা পূজা এবং রামচন্দ্রের পূজাও দুর্গাপূজারই অঙ্গ। দ্বাদশীর দিন বিষ্ণুপুর নিমতলা মহল্লার রঘুনাথ জীউ-এর মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলে মধ্যরাত্রে **'রাবণ-কাটা'** অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই পূজার রেশে ছেদ পড়ে বছরে বছরে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বিষ্ণুপুরের দুর্গাপূজা বাংলার তিনটি ঐতিহ্যবাহী পূজার অন্যতম।

'মল্লে রা
শিখরে পা
সাক্ষাৎ দেখবি যদি নদা শান্তিপুর যা।'

মুখে মুখে প্রচলিত এই জনশ্রুতি থেকে বিষ্ণুপুরের দুর্গাপূজার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় সহজেই। কথিত আছে মহাষ্টমীর সন্ধিপূজার পুণ্যলগ্নে মল্লে অর্থাৎ মল্লভূমের উর্ধ্বাকাশ থেকে আকাশবাণীর মতোই শোনা যেত বহু মানুষের সম্মিলিত 'মা মা' কণ্ঠস্বর। শিখর অর্থে শিখরভূমের (বর্তমানে পুরুলিয়া জেলা) দুর্গাপূজাতে দেবীর সম্মুখে সুরক্ষিত এক থালা সিন্দুরের উপর মহাষ্টমীর সন্ধি পূজার সময় দেবীর রাতুল-চরণ-দ্বয়ের ছাপ পড়ত অলৌকিকভাবে। আর নদীয়া জেলার শান্তিপুরে দেবী ঐ সময় স্বমহিমায় চিন্ময়ী সত্তায় প্রতিভাত হতেন।

রাজ-রাজেশ্বরী মা মৃন্ময়ীর শারদোৎসবে তিন দিন ধরে একান্নটি শাল পাতায় একান্নটি দেবীপীঠের দেবীদের উদ্দেশ্যেও অন্নভোগ নিবেদন করা হয়। চাঁপাফুল মায়ের খুব প্রিয়। তাই পদ্মফুলের মধ্যে স্বর্ণচাঁপা মাকে দেওয়া হয় ফি বছর।

লক্ষণীয় বিষয় হল মল্লভূমের মল্লরাজাদের এই দুর্গাপূজায় "তন্ত্র, বৌদ্ধ সংস্কার, ভাগবতের প্রভাব, কাত্যায়নী পূজা ইত্যাদির ধারা মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ভাগবতে গোপীদের কাত্যায়নী পূজা এবং দক্ষের কন্যাগণের পিত্রালয় আগমন ইত্যাদি বর্ণিত আছে। আবার চণ্ডীতে অষ্টাদশভুজা কর্তৃক মহিষাসুর নিধন করার ব্যাপারটা আছে। মৃন্ময়ী মায়ের পূজায় এই বিভিন্ন মাতৃপূজার ভাবভক্তি মিশে একাকার হয়ে গেছে।"[১]

হাজার বছরেরও বেশী সুপ্রাচীন এই দেবীর হাজারো অলৌকিক কাহিনী মাতৃভক্ত সন্তান সন্ততির মুখে মুখে ছড়িয়ে রয়েছে দিক-দিগন্তে। রাজা জগৎ মল্ল এবং শ্রীরামকৃষ্ণকে চিন্ময়ী সত্তায় দর্শন দেওয়া ছাড়াও অনেক আর্ত ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার পাশাপাশি, বহু দুরারোগ্য রোগ নিরাময় হয়েছে মায়ের কৃপায়। অভাব, অনটন, রোগ, জ্বালা-যন্ত্রণা এবং দুর্গতি-পীড়িত অসহায় মানুষ তাই কবি নজরুলের কণ্ঠে সুর মিলিয়ে মাতৃচরণে আর্তি জানায়—

"মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়।
মৃন্ময়ী রূপ তোর পূজি শ্রীদুর্গা,
তাই দুর্গতি কাটিল না হায়॥"

মাতৃচরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে চলুন মন্দিরের বাইরে গিয়ে একটু চা পান করে আসি। চা-পানের বিরতির পর প্রথমেই দেখব রাজঅন্তঃপুরচারিণীদের জন্য নির্ধারিত 'সাততলা' পুষ্করিণী ; সুখ-দুঃখের, আনন্দ-উল্লাসের বহু স্মৃতি-বিজড়িত রাজপ্রাসাদের ভগ্নাংশ তথা হাওয়া মহল এবং মানসচক্ষে অবলোকন করব অভিজাত রাজবাড়ি।

১। মল্লসংস্কৃতির পটভূমিকায় রাসোৎসব, পৃঃ—৬৫

অধ্যায়-২৬

মল্লরাজাদের রাজপ্রাসাদ ও 'সাততলা' পুষ্করিণী

বিষ্ণুপুরে বেড়াতে এসে অনেক পর্যটক প্রশ্ন করেন, 'রাজবাড়ি কোথায়? রাজপ্রাসাদ কোথায়?' রাজবাড়ি সম্বন্ধে কৌতূহলী এবং উৎসাহী এসব পর্যটকগণ রাজপরিবারের সাম্প্রতিক কালের ঘর-বাড়িগুলির দিকে উঁকি ঝুঁকি মেরে মনে করেন এগুলিই হল বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ি। অবশেষে 'সেরকম কিছু নয়'—এরূপ অবজ্ঞাসূচক মনোভাব পোষণ করে তাঁদের চোখে মুখে অতৃপ্তির আভাস উদ্ভাসিত হয়। সেটাই স্বাভাবিক। কারণ এত যাঁদের নাম-ডাক, ইতিহাস- প্রসিদ্ধি, যুগান্তকারী কীর্তিকলাপ তাঁদের রাজবাড়ির যদি এই হাল হয় তাহলে মনঃক্ষুণ্ণ হওয়া স্বাভাবিক। সুতরাং মনে প্রশ্ন জাগে, মল্লরাজাদের রাজকীয় রাজপ্রাসাদ কি ছিল না? ছিল না রাজদরবার, সাতমহল, রাণীমহল, ছিল না কোষাগার, শস্যাগার, অস্ত্রাগার, কারাগার, ছিল না কোতোয়ালখানা, খাজাঞ্চিখানা, তোশাখানা, হস্তীশালা কিংবা অশ্বশালা? ইত্যাদি? ইত্যাদি?

ছিল।

মৌন-মুখর ইতিহাস বলে, 'ছিল।'

জনশ্রুতি বলে, 'ছিল।'

অন্বেষা বলে, 'খোঁজো। খুঁজলে কিছু না কিছু পাবেই পাবে।'

গত ২৮.১২.২০০০ খ্রীষ্টাব্দে উপভোগ্য শীতের রোদ্দুর গায়ে মেখে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম রাজপ্রাসাদ। গাইডের ভূমিকায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন রাজবংশীয় **পার্থসারথি সিংহদেব** মহাশয়। দেখালেন, বোঝালেন, শোনালেন। প্রশ্ন, প্রতিপ্রশ্নে ঘোচালেন সংশয়। ঘণ্টা তিনের আলোচনায় রাজমহলের একটি জীবন্ত ছবি ভেসে উঠল আমার স্মৃতিপটে। উপর্যুপরি আরো তিন দিন সপুত্র, সস্ত্রীক স্থানটিকে পর্যবেক্ষণ করে মাপজোখ নিয়ে রাজবংশীয় আরো কয়েকজন ব্যক্তির সাথে আলোচনা করে সার্বিক অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করে শব্দের পিঠে শব্দ জুড়ে জুড়ে আঁকব এখন রাজবাড়ির ছবি। অদৃশ্য প্রহরীদের পাশ কাটিয়ে লেখকের ছাড়পত্র নিয়ে ঢুকে যাব রাজদরবার পেরিয়ে অন্দরমহলের রাণীমহলে। রূপকথার গল্পের মতোই শোনাবে সে সব কথা। গল্পের মতো শোনালেও গল্প নয় কিন্তু এসব কথা। সত্যের টানা এবং রাজকাহিনীর পোড়েন দিয়েই বোনা হবে রাজপ্রাসাদের গল্প। এখন শুনুন সেই গল্প। **এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা ভাল যে, ঐতিহাসিকের মন, প্রত্নতাত্ত্বিকের জ্ঞান এবং গবেষকের সুদূরপ্রসারী অন্তর্ভেদী দৃষ্টি নিয়ে রাজদরবার মহল্লায় চিরুণীতল্লাসী চালালে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের রাজবাড়ির একটি দৃষ্টিনন্দন ছবি ভেসে ওঠে মনের ক্যামেরায়।**

মৃন্ময়ী মাতার মন্দিরের পশ্চিমে রয়েছে আয়তাকার একটি পুকুর। রাজ অন্তঃপুরচারিণীগণই ব্যবহার করতে পারতেন এই পুকুর। অন্তঃপুরচারিণীদের আব্রু রক্ষার জন্য সুউচ্চ প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল পুকুরটি। চতুর্দিকের প্রাচীর আজ নিশ্চিহ্ন। শুধুমাত্র পুকুরে যাতায়াতের উদ্দেশ্যে নির্মিত একমাত্র প্রবেশ-তোরণটি মাথা তুলে আজও দাঁড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক নির্দশনের সাক্ষী হিসেবে। পুকুরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত এই প্রবেশদ্বার থেকে ধাপে ধাপে নীচে নেমে গেছে মাকড়া পাথরের সিঁড়িপথ। পাথরে বাঁধানো ২৮

ফুট সুপ্রশস্ত এই স্নানঘাটের সিঁড়িপথ নির্মাণের ক্ষেত্রে গুটিকয়েক অপ্রশস্ত ধাপের পর একটি করে বেশ সুপ্রশস্ত ধাপ বা তল তৈরী করা হয়েছিল। ধাপে ধাপে সাতটি স্তরে বিভক্ত করে খনন করা হয়েছিল পুকুরটি। পুকুরটির খনন কার্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সিঁড়িপথে এরকম স্তর বা তল রচনার সুবাদেই সুগভীর এই পুষ্করিণীটি সাততলা বা সাততালা নামে অভিহিত। স্নানঘাটের নীচের তলার দু'পাশের দু'টি উচ্চ বেদীতে নয়নাভিরাম দু'টি হস্তী মূর্তি ছিল। আজ সেসব অপহৃত। জনশ্রুতি বলে, অপেক্ষাকৃত উঁচু স্থানে অবস্থিত এই পুকুরটিতে শুখা মরসুমে জল সরবরাহের জন্য মাটির নীচে 'পাইপ' বসিয়ে বিষ্ণুপুরের বাঁধগুলির সাথে এই পুকুরটির যোগসূত্র স্থাপন করা হয়েছিল।

সাততলা পুকুরটির পশ্চিম দিকে ছিল রাজপ্রাসাদ। অধুনালুপ্ত রাজপ্রাসাদের স্মৃতিবহন করছে রাজপ্রাসাদের চার কোণার চারটি টুঙ্গি বা মিনার এবং দক্ষিণ দিকের মিনারদ্বয় সংলগ্ন পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রস্থ ও ২২ ফুট উচ্চ দেওয়াল এবং দেওয়ালের মধ্যস্থলের দক্ষিণ ভদ্রক।

আগাগোড়া ইষ্টক নির্মিত দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ২০ ফুট বর্গাকার মিনার চারটির প্রথম তলায় প্রতি মিনারের অভ্যন্তরভাগে রয়েছে একটি করে কেন্দ্রীয় কক্ষ। কক্ষটির চতুর্দিক ঘিরে অত্যন্ত সংকীর্ণ দেওয়ালাবৃত অলিন্দ এবং উপরে উঠার সিঁড়িপথ ছাড়াও রয়েছে প্রবেশদ্বার। দ্বিতীয় তলাতে অনুরূপ নির্মাণপদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। ঈশান কোণের এবং বায়ুকোণের প্রায় ৩৩ ফুট উচ্চ ত্রিতল মিনার দুটির প্রতিটির ত্রিতলে ছোট বড় পরিধির দুই প্রস্থ অষ্টকোণ বিশিষ্ট দেওয়াল তুলে প্রতিটিতে আটটি করে মোট ষোলটি ঈষৎ পত্রাকৃতির খিলান রচনা করা হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে বায়ু চলাচলের জন্য। এই দুটি মিনারের তৃতীয় তলের অর্থাৎ সর্বোপরি ছাদ বৃত্তাকার গম্বুজের মতো। মিনার দুটির গঠন প্রণালীতে যমজ ভাই-এর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে এই টুঙ্গি দুটির অবস্থা খুবই শোচনীয়। ঈশান কোণের মিনারটির উপর গজিয়ে উঠেছে বিশাল বটবৃক্ষসহ অন্যান্য বৃক্ষ এবং লতাগুল্ম। বটবৃক্ষসহ অন্যান্য বৃক্ষাদির শিকড়-বাকড়ের গর্ভভেদী চাপে ভেঙে পড়েছে টুঙ্গিটির উত্তর-পশ্চিমাংশ। ধ্বসে গেছে মধ্যবর্তী ছাদ। টুঙ্গিটি ভেঙে পড়তে পারে যে কোনদিন।

বায়ুকোণের মিনারটির নীচের তলার উত্তর ও পশ্চিম দিকের দেওয়ালের নিম্নাংশের বেশ কিছু অংশ খসে পড়ায় উর্ধ্বাংশের গুরুভার বহনে অক্ষম হয়ে পড়েছে দেওয়ালদ্বয়। ফলে ভারসাম্য হারিয়ে চারদিকেই ফেটে চৌচির হয়ে বাইরের দিকে ঈষৎ ঝুঁকে পড়েছে টুঙ্গিটি। তাছাড়া মিনারগাত্রে গজিয়ে ওঠা বৃক্ষাদির উপদ্রব তো আছেই। মাঝের দুটি ছাদ খসে পড়া এই টুঙ্গিটিও নিশ্চিত ধ্বংসের প্রহর গুণছে।

প্রায় ৪২ ফুট উচ্চ অগ্নি-কোণের চতুর্থ তল বিশিষ্ট মিনারটির ত্রিতল এবং চতুর্থতল ধাপে ধাপে সংকীর্ণ অর্থাৎ ক্ষুদ্রাকৃতির হয়েছে। ত্রিতল পর্যন্ত বর্গাকার এই মিনারটির ত্রিতলের দেওয়াল বহু পল বিশিষ্ট। চতুর্থ তল আয়তাকার। টুঙ্গিটির প্রথম তলার উত্তর ও দক্ষিণে একটি করে, দ্বিতীয় তলার উত্তর ও পশ্চিমে একটি করে, তৃতীয় তলার উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে একটি করে এবং চতুর্থ তলার পূর্বে একটি, উত্তর-দক্ষিণ ও পশ্চিমে ২টি করে ঈষৎ পত্রাকৃতির উন্মুক্ত খিলান দরজা আছে। চতুর্থ তলার ক্ষুদ্রাকৃতির কক্ষটির উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে অনাচ্ছাদিত বারান্দা আছে। মিনারটির উপরের ছাদ আয়তাকার চার চালা ঘরের অনুরূপ। এটির অবস্থা জরাজীর্ণ হলেও কিছুটা ভাল।

নৈঋত কোণের সর্বোচ্চ মিনারটি পাঁচতলা। ঐ টুঙ্গিটির প্রথম তলায় পূর্বে ১টি, দ্বিতীয় তলায় পূর্ব ও উত্তরে ১টি করে, তৃতীয় তলায় চতুর্দিকে ৪টি, চতুর্থ তলায় পূর্ব ও পশ্চিমে ২টি করে, উত্তর দক্ষিণে ১টি করে এবং পঞ্চম তলায় চতুর্দিকে চারটি অনুরূপ উন্মুক্ত দরজা আছে। টুঙ্গিটি তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম তলায় ধাপে ধাপে ত্রিস্তরে সংকুচিত হয়েছে। মিনারটির চতুর্থ তলে পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরে অনাচ্ছাদিত বারান্দা এবং দক্ষিণে ঢাকা বারান্দা আছে। পঞ্চম তলায় শুধুমাত্র দক্ষিণে অনাচ্ছাদিত বারান্দা রয়েছে। প্রায় বাহান্ন ফুট সুউচ্চ এই টুঙ্গিটির পঞ্চম তলার চৌচাল ছাদটি বর্গাকার। সিঁড়ির কিয়দংশ এবং অভ্যন্তরভাগের ছাদ খসে পড়া সত্ত্বেও সামগ্রিক বিচারে অন্য তিনটি টুঙ্গির তুলনায় এটির অবস্থা মন্দের ভাল।

রাজবাড়ির সীমানা নির্দেশাত্মক এই টুঙ্গি চারটি নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল বহুমুখী। **প্রথমতঃ**, এগুলি রাজবাড়ির সৌন্দর্য বৃদ্ধির পাশাপাশি রাজবংশের আভিজাত্যের পরিচায়ক। **দ্বিতীয়তঃ**, রাজপরিবারের সদস্যগণ মিনারে বসে গল্পগুজব, গান-বাজনা করা ছাড়াও পাশা, দাবা, দশাবতার তাস খেলা জাতীয় আমোদ প্রমোদ তথা চিত্ত বিনোদনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারতেন। **তৃতীয়তঃ**, গ্রীষ্মকালের প্রচণ্ড গরমের দিনে, বিশেষতঃ রাত্রিতে প্রাণ-জুড়ানো সুশীতল বায়ু সরবরাহের কার্যে এগুলি ছিল অতুলনীয়। এজন্য মিনারগুলির অপর নাম **'হাওয়ামহল'**। **চতুর্থতঃ**, মিনারগুলির ঊর্ধ্বে আরোহণ করে বিষ্ণুপুর রাজ্যের চতুর্দিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করার পক্ষে এগুলি ছিল বিশেষ সহায়ক। **পঞ্চমতঃ**, জরুরী অবস্থায় গুপ্ত মন্ত্রণার কার্যে এগুলি ব্যবহৃত হত। **ষষ্ঠতঃ**, সর্বোচ্চ নৈঋত কোণের মিনারটি 'অব্জারভেশন্ টাওয়ার্', অর্থাৎ দূর থেকে বহিঃশত্রুর গমনাগমন পর্যবেক্ষণ করার উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হত।

বহুমুখী উদ্দেশ্যে নির্মিত এই মিনারগুলি এবং পূর্বোক্ত দক্ষিণ দিকের দেওয়ালটি ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করলে রাজপ্রাসাদের একটি চিত্র পাওয়া যায়। বোঝা যায় মিনার চারটি দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের অনুরূপ দেওয়াল দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত ছিল। উত্তর দক্ষিণে ২০০ ফুট ৬ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং পূর্ব পশ্চিমে ১৩৭ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রস্থ বিষ্ণুপুরের রাজপ্রাসাদটি ছিল আয়তাকার। চার কোণার চারটি চতুর্ভুজ মিনারের বাইরের এবং ভিতরের দেওয়াল বরাবর ছিল দুই প্রস্ত ভিত্তি-দেওয়াল। আয়তাকার এই দুই প্রস্ত দেওয়ালের অন্তর্বর্তী ব্যবধান ছিল ১৩ ফুট। টানা এই দুই প্রস্ত দেওয়ালের মধ্যে আড়াআড়িভাবে পার্টিশন দেওয়াল তুলে তুলে প্রয়োজনানুসারে ছোট বড় অনেকগুলি কক্ষ এবং প্রবেশ-পথ নির্মিত হয়েছিল। অভ্যন্তরভাগের দেওয়ালটির সম্মুখভাগের নির্দিষ্ট দূরত্বে মেঝে অবধি আর এক প্রস্ত আয়তাকার ভিত্তি দেওয়াল রচনা করে তার উপর সারিবদ্ধ স্তম্ভ এবং স্তম্ভের উপর সৌখিন খিলান দরজা নির্মাণ পূর্বক সর্বসাকল্যে ত্রিস্তর ভিত্তি-দেওয়ালের উপর প্রথম তলার ছাদ নির্মিত হয়েছিল। অনুরূপ পদ্ধতিতে তৈরী হয়েছিল দ্বিতীয় তলাটিও। বিষ্ণুপুরের রাজবাড়িটি ছিল খোলা বারান্দা যুক্ত দ্বিতল ছাদ বিশিষ্ট। চুন-সুরকি আর তেঁতুল কাঠে পোড়ানো পাতলা ইট দিয়ে দেওয়াল তুলে উন্নতমানের কাঠের কড়ি বরগা বিছিয়ে পূর্বোক্ত উপাদান দিয়েই নির্মিত হয়েছিল রাজ-প্রাসাদের ছাদ। পূর্বোক্ত উপাদানেই নির্মিত হয়েছে টুঙ্গিগুলিও। শ্বেত-শুভ্র পঙ্খের পলেস্তারার উপর ফুলকারি নক্সার অলংকরণ ছিল চিত্তাকর্ষক। ২২ ফুট উচ্চ এই দ্বিতল ছাদের অস্তিত্বের পক্ষে সাক্ষ্য বহন করছে মৌন-মুখর মিনারগাত্রে বর্গা স্থাপনের সারিবদ্ধ

খোপগুলি। আরো উল্লেখ করি, রাজবাড়ির মধ্যস্থলে ছিল লক্ষ্মীগৃহ।

রাজঅন্তঃপুরের দক্ষিণ দেওয়ালের মধ্যস্থলে নিবদ্ধ স্বল্পোচ্চ প্রবেশপথটি খিড়কি-দরজা বা **দক্ষিণ-ভদ্রক** নামে চিহ্নিত। অনুরূপভাবে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তরেও ছিল প্রবেশ-পথ। এগুলি **পূর্ব-ভদ্রক, পশ্চিম-ভদ্রক** এবং **উত্তর-ভদ্রক** নামে পরিচিত। রাজবাড়ির উত্তর দিকে ছিল প্রাচীর ঘেরা মুক্তাঙ্গন। অঙ্গন মধ্যে ছিল রাজস্থান থেকে আনীত একটি **ক্ষীরকুল** গাছ। কোন এক রাজার রাজত্বকালে ক্ষীরকুল তলায় বাঁধা থাকত **লোকপাল** এবং **দিকপাল** নামের দুটি হাতী। অঙ্গন মধ্যে ছিল বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত সুদীর্ঘ এক সুড়ঙ্গপথ। আর ছিল ময়ূরমহল, পারাবত কক্ষ, হরিণপিঞ্জর ইত্যাদি। **এক্ষেত্রে স্মরণ করিয়ে দিই যে, মুর্শিদাবাদের কাট্‌রা মসজিদ বা কোচবিহারের রাজপ্রাসাদ দেখলে বিষ্ণুপুরের রাজপ্রাসাদের একটি সুস্পষ্ট ছবি পাওয়া যাবে।**

রাজবাড়ির মুক্তাঙ্গনের উত্তর দিকে ছিল রাজদরবার। কোটাল, মন্ত্রী ও সেনাধ্যক্ষ পরিবেষ্টিত সিংহাসনারূঢ় রাজা রাজকার্য পরিচালনা করতেন সেই দরবারে বসে। রাজদরবার সংলগ্ন অঞ্চলে রয়েছে বৃত্তাকার অভিষেক মঞ্চের ভগ্নাংশ। তারও উত্তরে রয়েছে প্রায় কুড়ি ফুট উচ্চ পাশাপাশি অবস্থিত দেউল আকৃতির দুটি বিগ্রহ-পরিত্যক্ত জরাজীর্ণ মন্দির। কৃষ্ণ তথা জগন্নাথ বলরামের মন্দির ও শ্যামচাঁদের মন্দির নামে খ্যাত এই দেবালয়দ্বয়ের উত্তরে রয়েছে শ্যামকুণ্ড। তারপর রয়েছে টিলা বা মূর্চার পাহাড়।

এবার ফিরে আসি রাজবাড়ির দক্ষিণ দিকের কথায়। রাজবাড়ির দক্ষিণ দিকে রয়েছে **দক্ষিণ-মহল বা হিকিম-মহল**। বিষ্ণুপুরের রাজবংশের নিয়মানুসারে রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হন। দ্বিতীয় পুত্র হিকিম সাহেব এবং তৃতীয় ও তৃতীয়োত্তর পুত্রগণ বাবুসাহেব বা কুমার- সাহেব আখ্যায় ভূষিত হতেন। রাজার জন্য নির্দিষ্ট ছিল রাজবাড়ি আর হিকিম সাহেব ও বাবুসাহেব পর্যায়ের রাজপুত্রগণের জন্য নির্দিষ্ট ছিল হিকিম মহল বা দক্ষিণ মহল। এঁদেরকে আবার অনেক সময় মল্লরাজ্যের বিশেষ বিশেষ এলাকার মালিকানা স্বত্ব দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হত জামকুড়ি, ইন্দাস, কুচিয়াকোল, রায়পুর ও নাটকাঞ্চনপুর প্রভৃতি অঞ্চলে। অনেকগুলি করে মৌজার জমিদার রূপে পরিগণিত হতেন এঁরা। রাজপুত্রগণের মধ্যে রাজসিংহাসন এবং সম্পত্তি নিয়ে গৃহবিবাদের সম্ভাবনাতেই এরূপ নিয়ম প্রচলিত হয়েছিল। **এ প্রসঙ্গে হিকিম সাহেব হিসেবে রামকিশোর সিংহদেব, গৌরীপ্রসাদ সিংহদেব এবং বাবু সাহেব হিসেবে দিবাকর সিংহদেব, অতুলচন্দ্র সিংহদেব, রাজবল্লভ সিংহদেব, বীরেন্দ্র সিংহদেব, অমরেন্দ্র সিংহদেব, অবনীমোহন সিংহদেব প্রমুখের নাম উল্লেখ্য।** হিকিম মহলের পাশাপাশি রাজবংশীয় পুরুষদের ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট হাতি এবং অশ্বের জন্য গড়ে উঠেছিল হাতিশালা এবং অশ্বশালা।

রাজবাড়ি এবং রাজদরবারের পশ্চিম দিকে অনতিদূরেই রয়েছে উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত টিলা এবং এক প্রস্ত পরিখা। পরিখার পশ্চিমে বিস্তীর্ণ এলাকায় ছিল নগরপাল বা কোটাল বা কোতোয়ালের জন্য কোতোয়ালখানা। এখন সেখানে গড়ে উঠেছে মিলনশ্রী সিনেমা হল এবং সিনেমা হলের দক্ষিণে নবনির্মিত জনবসতি।

এই কোতোয়ালখানাকে অনেকে বধ্যভূমি বলে মনে করেন। এটা ভ্রান্ত ধারণা। প্রকৃতপক্ষে এখানে থাকতেন প্রধান নগরপাল বা কোটাল এবং তাঁর আজ্ঞাবাহী প্রহরী, চৌকিদার, ঘাটোয়াল এবং শান্তিরক্ষক বাহিনী। **প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের জন্য বধ্যভূমি ছিল বিষ্ণুপুর শহরের বধিলা পাড়াতে। বধিলা পাড়াতেই বাস করতেন 'বধিলা'**

উপাধি প্রাপ্ত জল্লাদগণ। বাস করতেন এবং আজও তাঁদের বংশধরগণ এই বধিলা পাড়া অপভ্রংশে বইলাপাড়াতে বসবাস করেন। এঁদের নাম **গৌতম সিংহ বধিলা** (বয়স-৪২), **রাম সিংহ বধিলা** (বয়স-৪০)। এঁরা সহোদর ভাই। পিতার নাম ঁসুধীর সিংহ বধিলা এবং ঠাকুরদার নাম ঁহারাধন সিংহ বধিলা। বিষ্ণুপুরের রাজা এঁদের পূর্বপুরুষকে নিষ্কর জমিজমা দিয়েছিলেন প্রচুর। সে সব জমিজমা খুইয়ে বধিলা বংশের উত্তরপুরুষ পূর্বোক্ত গৌতম সিংহ বধিলা এবং রাম সিংহ বধিলা বর্তমানে বিষ্ণুপুরের রিক্সাচালক।

পূর্বভদ্রকটি সম্ভবতঃ অন্তঃপুরচারিণীদের সাততলা পুকুরে গমনাগমনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। প্রাচীর ঘেরা মুক্তাঙ্গনের পূর্ব দিকে একটি প্রবেশ দ্বারের ভগ্নাংশ দেখে মনে হয় এটি ছিল রাজকুলদেবী মা মৃন্ময়ীর মন্দিরে যাতায়াতের পথ।

কালের করাল গ্রাস; গ্রাস করেছে রাজকীয় রাজবাড়িটিকে। উনবিংশ শতকের শেষভাগে সম্ভবতঃ রামকৃষ্ণ সিংহদেবের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছে সাদামাটা নতুন রাজবাড়ি। মৃন্ময়ী মন্দিরের পিছন দিকে রাজপথের পশ্চিমে রাজপথ সংলগ্ন প্রাচীর ঘেরা একতলা বাড়িটি বর্তমানে রাজবাড়িরূপে চিহ্নিত। বিষ্ণুপুরের ৬১ তম রাজা শ্রীশ্রীকালীপদ সিংহ ঠাকুর বাস করতেন ঐ বাড়িতে। এখন বসবাস করেন তাঁর বংশধরগণ।

মানসচক্ষে রাজবাড়ি দেখার পর আমরা এখন দেখব **লালজীউ মন্দির**।

বর্তমান রাজবাটীর পূর্বদিকে রয়েছে রাজপথ। রাজপথের পূর্ব দিকে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ ও লালজীউ-মন্দির। **রাজপথসহ এই মুক্তাঙ্গনেই অনুষ্ঠিত হয় বিষ্ণুপুরের বহুবিশ্রুত ঝাঁপান উৎসব এবং বিষ্ণুপুর মেলা**। ঝাঁপান এবং বিষ্ণুপুর মেলার কথা আলোচনা করব যথাসময়ে। ইতিমধ্যে মুক্তাঙ্গন অতিক্রম করে আমরা এসে গেছি লালজীউ-মন্দির-চত্বরে।

অধ্যায়-২৭

লালজীউ মন্দির ও মল্লরাজাদের মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যাবলী

রাধাশ্যাম মন্দিরের উত্তরে অবস্থিত এই লালজীউ মন্দিরটি সুউচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত। উত্তর-দক্ষিণে ১৬৫ ফুট দৈর্ঘ্য, পূর্ব-পশ্চিমে ১৫৫ ফুট প্রস্থ, উচ্চতায় ১৩ ফুট ৬ ইঞ্চি, ৪ ফুট চওড়া প্রায় বর্গাকার এই প্রাচীরটির নিম্নাংশ মাকড়া পাথর এবং উর্ধ্বাংশ পাতলা ইট দিয়ে তৈরী। পশ্চিম দিকের প্রবেশ তোরণটি অবশ্য আগাগোড়া মাকড়া পাথরে তৈরী। প্রবেশ তোরণটির বাইরের এবং ভিতরের দিকে রয়েছে মাকড়া পাথরের সুপ্রশস্ত বেদী। প্রাচীরের পূর্ব দেওয়াল সংলগ্ন ভোগমণ্ডপটির ভগ্নাংশ অদ্যাপি বিদ্যমান। অনুরূপভাবে দক্ষিণ দেওয়াল সংলগ্ন নাটমন্দিরটিও নষ্ট হয়ে গেছে। আছে শুধু ২৫ ফুট ২ ইঞ্চি প্রস্থ, ৬৩ ফুট ৩ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং ৩ ফুট উচ্চ ভিত্তিবেদীটি। এছাড়া ভোগমণ্ডপের পাশেই রয়েছে একটি কুয়া এবং শ্রীমন্দিরটির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে মাকড়া পাথরের তৈরী সুশ্রী একটি তুলসীমঞ্চ। সব মিলিয়ে লালজীউ মন্দিরটি একটি পূর্ণাঙ্গ দেবালয় নির্মাণের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৫৩ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ৩ ফুট ৯ ইঞ্চি বর্গাকার ভিত্তিবেদীর উপর দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৪০ ফুট ৬ ইঞ্চি মাপের বর্গাকার এই শ্রীমন্দিরটির উচ্চতা ৪০ ফুট ৫ ইঞ্চি। আগাগোড়া মাকড়া পাথরে তৈরী এক-রত্ন বিশিষ্ট এই দেবালয়টি রাধা-লালজীউ

-এর প্রীতির জন্য মহারাজ বীর সিংহ ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন। ত্রিস্তবক বর্গাকার দেওয়াল তুলে নির্মিত হয়েছে গর্ভমন্দির, কয়েকটি প্রকোষ্ঠ, ত্রিখিলান যুক্ত বারান্দা এবং উপরে উঠার সিঁড়িপথ। মন্দিরটির বাইরের দেওয়ালের চতুর্দিকেই রয়েছে স্তম্ভ শোভিত তিনটি করে খিলান দরজা। উত্তর দিকের খিলান দরজাগুলি বন্ধ অর্থাৎ দেওয়ালাবৃত। পশ্চিম দিকের উন্মুক্ত খিলান দরজাগুলি নিয়ে নির্মিত হয়েছে খোলা বারান্দা। পূর্ব এবং দক্ষিণ দিকের উন্মুক্ত খিলান পথগুলিকে নিয়ে রচিত হয়েছে বারান্দা এবং গর্ভমন্দিরের প্রবেশ-পথ। প্রতিষ্ঠালিপিযুক্ত দক্ষিণ দেওয়ালের খিলান ত্রয়ের প্রত্যেকটির উপরিভাগের মধ্যস্থলে রয়েছে একটি করে বৃক্ষশাখা এবং বৃক্ষশাখার দুপাশে মুখোমুখিভাবে বসে থাকা দুটি করে তোতাপাখি। গর্ভমন্দিরের প্রবেশ পথের উপরিভাগে দুটি সারস এবং তার ঊর্ধ্বে চারটি তোতাপাখিকে অনুরূপ ভঙ্গিমায় বসে থাকতে দেখা যায়। পূর্ব দেওয়ালের খিলান ত্রয়ের উপর ফুলকারি নক্সার কাজ খুবই চিত্তাকর্ষক না হলেও নয়নাভিরাম। মন্দিরটির চারচালা ছাদের বাঁকানো কার্নিসের নিম্নাংশে সারিবদ্ধভাবে উপবিষ্ট অবস্থায় করজোড়ে প্রণামরত ভঙ্গিমার ক্ষুদ্রাকৃতির মোটিফগুলি ভক্তি নিবেদনের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ্য। অষ্টকোণ সমন্বিত বেদীর উপর স্থাপিত চতুর্দিকে দরজা বিশিষ্ট বহুপল-যুক্ত বৃত্তাকার চূড়াটি ধাপে ধাপে সংকুচিত হয়ে হয়েছে কেন্দ্রানুগামী। চূড়াটির শীর্ষস্থানের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রোথিত হয়েছে আমলক, কলস ও পদ্মকুঁড়ি-যুক্ত ধ্বজা।

রাধাশ্যাম মন্দিরটির মতো এ মন্দিরে ল্যাটেরাইট ভাস্কর্যের সমারোহ না থাকা সত্ত্বেও বাঁকুড়া জেলার চারচালা ছাদ বিশিষ্ট একচূড়া মন্দিরগুলির মধ্যে এই মন্দিরটি বৃহত্তম— সে দিক থেকে মন্দিরটির গুরুত্ব অনেক বেশী। এছাড়া পঙ্খের আবরণে শ্রীমণ্ডিত নিরলঙ্কার এই দেবালয়টি যেন সহজাত সৌন্দর্যেরই প্রতীক।

এই সৌধটির বর্ণনা করতে গিয়ে 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রদ্ধাভাজন অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "দক্ষিণের দালানের দেওয়ালে একদা বহুবর্ণ 'ফ্রেস্কো' অঙ্কিত ছিল বলে মনে হয়। **এ-অলংকরণ রীতিটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় এই জন্য যে বাঁকুড়ার দেবালয়গুলিতে 'ফ্রেস্কো'-অলংকরণ প্রায় নেই বললেই চলে।** চূড়ার গঠন প্রথাগত। নীচের খাড়া অংশের চারিদিকে চারটি খিলানযুক্ত অলিন্দ ও সাতটি করে 'পগ' আছে; উপরের অংশ, উচ্চাবচ কার্নিসের প্রয়োগে, পীঢ়া দেউলশীর্ষ আকৃতির।" দেবালয়টি প্রসঙ্গে 'Archaeological Survey of India'-র পক্ষ থেকে বলা হয়েছে **"Among the stone-built eka-ratna temple, the Lalji temple has a very imperssive appearance."**

বিগ্রহ-পরিত্যক্ত এই মন্দিরটির উপাস্য দেবতা রাধা-লালজীউ এখন আছেন বিষ্ণুপুরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লায়। সেখানে যখন উপস্থিত হব তখন আপনাদের দেখাব দৃষ্টিনন্দন সেই বিগ্রহ দ্বয়, শোনাব রাধা-লালজীউ-এর কথা। এখন অন্য কথা।

কালাচাঁদ পরিমণ্ডলে পরিভ্রমণকালে আমি আপনাদের উড়িষ্যার রেখ-দেউল এবং বাংলা-মন্দির স্থাপত্যশৈলী প্রসঙ্গে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছি। এখন শোনাব মল্লভূমে মল্লরাজাদের শত শত দেব-মন্দির স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দু'চার কথা।

প্রথমতঃ— গ্রামে, গঞ্জে এবং রাজধানীর পল্লীতে পল্লীতে মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্যটি হল মল্লরাজাদের নিখাদ দেব-প্রীতি। দেব-মন্দির এবং দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা

করে ঈশ্বর উপাসনার মাধ্যমে প্রজাসাধারণকেও ঈশ্বরমুখী করে তোলা ছিল মল্লরাজাদের আর এক মহৎ উদ্দেশ্য। ধর্মের অনুশাসনকে প্রাধান্য দিয়ে সৎ, মহৎ এবং উদার প্রকৃতির নাগরিক গঠনের উদ্দেশ্যটিও সফল হয়ে উঠত ঈশ্বর-প্রীতি এবং পাপ-ভীতির হাত ধরে। যার ফলে চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, নারীর শ্লীলতাহানি মল্লরাজ্যে ছিল একেবারে অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার।

দ্বিতীয়তঃ—এই দেবালয়গুলি ধর্মসাধনার পাশাপাশি যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং বন্যাদি আপৎকালে নিকটস্থ প্রজাকুলের আশ্রয়স্থল হিসেবেও ব্যবহৃত হত। সুউচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত দেবালয়গুলির প্রবেশ-তোরণ বন্ধ করে দেওয়া হত। বাইরে থাকত সশস্ত্র-সৈন্য মোতায়েন, ফলে যুদ্ধকালীন অবস্থায় মন্দিরাভ্যন্তরে প্রজারা থাকতেন নিরাপদে, নির্ভয়ে।

তৃতীয়তঃ—দুর্ভিক্ষের সময় এইসব দেব-মন্দির থেকে বুভুক্ষু মানুষজনদের দেবোত্তর-সম্পত্তির উৎপাদিত ফসল থেকে খাদ্য-শস্য বণ্টন এবং নর-নারায়ণ সেবা করানো হত বিনামূল্যে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, মল্লরাজারা প্রতিটি দেব-বিগ্রহের জন্য শত শত বিঘা জমি এবং পুষ্করিণী দেবোত্তর সম্পত্তি হিসেবে দান করেছিলেন।

চতুর্থতঃ—মন্দির-সংলগ্ন নাট-মন্দিরগুলি ছিল সংস্কৃতিচর্চার ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাগৃহ স্বরূপ। অনেকটা আধুনিক যুগের কমিউনিটি হলের মত। এছাড়া এক একটি অঞ্চলের কর্মশালা তথা শিল্প-চর্চার কেন্দ্রস্থল হিসেবে এগুলি ছিল Industrial School তথা কারিগরী বিদ্যালয় স্বরূপ। Man Making Education-এর পাশাপাশি **'করে খাও', 'স্বনির্ভর হও'**—এই শিক্ষার সুরই অনুরণিত হত এখানে।

পঞ্চমতঃ—তৎকালের 'মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়' (Open University) স্বরূপ এই দেব-মন্দিরগুলিতে ঈশ্বর-উপাসনার পাশাপাশি অধ্যাত্ম-বিদ্যা-চর্চাও চলত পুরোদমে। মন্দিরের নিষ্ঠাবান বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ছিলেন একাধারে পুরোহিত ও আচার্য স্বরূপ। সারাদিন নিজ নিজ কাজ নিষ্পন্ন করে সন্ধ্যার প্রাক্কালে গ্রাম-গঞ্জের প্রজাসাধারণ সন্নিকটস্থ মন্দিরে আসতেন। নাটমন্দিরে সমবেত হয়ে তাঁরা রামায়ণ, মহাভারত, বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, হরিকথা, শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠ শুনতেন। শুনতেন কীর্তন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, রামায়ণ গান, কৃষ্ণযাত্রা, কথকতা, তথা বাউল-গান, পাঁচালী, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, শাস্ত্রীয় মার্গ সঙ্গীত তথা বেদগান। এ সবের মাধ্যমে শিক্ষা ও লোক-সংস্কৃতিকে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে বিশেষ করে অশিক্ষিত, নিরক্ষর নরনারীর মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যটি চরিতার্থ হত সুষ্ঠুভাবে। এছাড়া প্রায় প্রত্যেকটি মন্দিরগাত্রে খোদিত বা পোড়ামাটির নির্মিত শ্রীকৃষ্ণলীলা, রামায়ণ, মহাভারত, শিকার-যাত্রা, সমাজচিত্র প্রভৃতি রূপায়ণের ক্ষেত্রে চিত্রাঙ্কন ও নির্মাণ-পদ্ধতি শিখানো হ'ত হাতে কলমে। এই কারিগরি শিক্ষার মাধ্যমে রুজিরোজগারের সুরাহা হ'ত উত্তর-জীবনে।

পরিশেষে বলি, ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির তথা ভাস্কর্য-বিদ্যার পূর্বোক্ত এতাদৃশ উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলি প্রজাবৎসল মল্লরাজর্ষিগণের পাণ্ডিত্য, প্রেম-ভালবাসা, সুমহান আদর্শ ও সুষম শিল্পচেতনার সুসংস্কৃত রূপ পরিগ্রহ করে আজ প্রায় অবলুপ্ত ধ্রুপদ সঙ্গীত ও সংস্কৃত ভাষার মতোই নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় মল্লরাজাদের মন্দির নির্মাণের এবম্বিধ মহৎ উদ্দেশ্য থাকা সত্ত্বেও বর্তমানকালের দু'একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন—এসব মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্য ছিল প্রভূত অর্থ উপার্জন। মন্দিরগুলি থেকে রাজকোষে উঠে আসত অশেষ

ধন-দৌলত। আপনারা জানেন মহারাজ চৈতন্য সিংহ দেবের রাজত্বকালে ১১৭৬ বঙ্গাব্দে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে নিরন্ন, উপবাসী প্রজাগণের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে মহারাজ চৈতন্য সিংহ রাজ্যের ধনভাণ্ডার ও শস্যভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দেন এবং তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় মদনমোহন জীউকে কোলকাতার লবণ ব্যবসায়ী গোকুল মিত্রের কাছে বন্ধক রেখে আসেন লক্ষাধিক টাকাতে। মহারাজ বীর হাম্বীর তো কৃষ্ণ-প্রেমে বিভোর হয়ে শেষ-জীবনে রাজ্য ছেড়ে চলে যান বৃন্দাবনে। আর গোপাল সিংহ (১ম) ছিলেন পুরোপুরি ঈশ্বর-পাগল। মল্লরাজবংশের সমস্ত রাজাই, এমনকি বীর সিংহের মত নির্মম অত্যাচারী রাজাও ছিলেন ঈশ্বর-প্রেমিক। তাঁদের কাছে দেব-মন্দিরগুলি ছিল পবিত্র তীর্থস্থান, ব্যবসা-স্থান নয়, আয়ের উৎসস্থল তো নয়ই, বরং বলা চলে এগুলি ছিল অশান্ত হৃদয়ে শান্তি-সুধা-সিঞ্চন-কেন্দ্র, ভক্ত-হৃদয়ে ভক্তি-সুধা বিতরণ-কেন্দ্র। এ প্রসঙ্গে বলি, ভারতের অন্যান্য তীর্থস্থানে দেব-দেবী দর্শন করার এবং পুজো দেওয়ার জন্য পুরোহিত ও পাণ্ডা গোষ্ঠীর যে অত্যাচার—এখানে সেসব চিন্তাই করা যায় না, লাগে না কোন দর্শন-দক্ষিণা। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, দেব-দেবীদের উদ্দেশ্যে ভক্তগণের স্বতঃস্ফূর্ত দান (প্রণামী) দেবকার্যেই ব্যয় করা হত। ব্যয় করা হ'ত নরনারায়ণ সেবা এবং ধর্মালোচনার কার্যে। রাজার কোষাগারকে সমৃদ্ধ করত না কখনই।

শ্রীশ্রীরাধালালজীউ মন্দির দর্শন এবং মল্লরাজাদের মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আমাদের দ্রষ্টব্য পুরাবস্তু হল **'পাথর দরজা'**, কিন্তু পাথর দরজা দ্বয় দেখার পূর্বে আমরা এখন দৃষ্টি নিবদ্ধ করব বিষ্ণুপুরের রাজকাহিনীর পাতায়।

অধ্যায়-২৮

রাজকাহিনী—৫

অনন্ত মল্ল (১০০৭-১০১৫ খৃঃ), **রূপ মল্ল** (১০১৫-১০২৯ খৃঃ), **সুন্দর মল্ল** (১০২৯-১০৫৩ খৃঃ), **কুমুদ মল্ল** (১০৫৩-১০৭৪ খৃঃ), **কৃষ্ণ মল্ল** (১০৭৪-১০৮৪ খৃঃ), **রূপ মল্ল (২য়)** (১০৮৪-১০৯৭ খৃঃ), **প্রকাশ মল্ল** (১০৯৭-১১০২ খৃঃ), **প্রতাপ মল্ল** (১১০২-১১১৩ খৃঃ), **সিন্দুর মল্ল** (১১১৩-১১২৯ খৃঃ), **সুখময় মল্ল** (১১২৯-১১৪২ খৃঃ), **বনমালী মল্ল** (১১৪২-১১৫৬ খৃঃ), **যদু মল্ল** (১১৫৬-১১৬৭ খৃঃ), **জীবন মল্ল** (১১৬৭-১১৮৫ খৃঃ), **রাম মল্ল** (১১৮৫-১২০৯ খৃঃ), **গোবিন্দ মল্ল** (১২০৯-১২৪০ খৃঃ), **ভীম মল্ল** (১২৪০-১২৬৩ খৃঃ), **কাটার মল্ল** (১২৬৩-১২৯৫ খৃঃ), **পৃথ্বী মল্ল** (১২৯৫-১৩১৯ খৃঃ)।

রাজকুলোত্তম মহারাজ জগৎ মল্লের দেহাবসানের পর **অনন্ত মল্ল, রূপ মল্ল, সুন্দর মল্ল, কুমুদ মল্ল, কৃষ্ণ মল্ল** ও **রূপ মল্ল (২য়)** রাজত্ব করেন ক্রমান্বয়ে। অনন্তর ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে রাজা হন **প্রকাশ মল্ল**।

বিষ্ণুপুরের উত্তর-পূর্ব কোণে দ্বারকেশ্বর নদীতীরে প্রকাশ মল্লের অবদান স্বরূপ আজও প্রকাশিত রয়েছে প্রকাশ গ্রাম। **উক্ত গ্রাম সংলগ্ন নদী-ঘাটটি প্রকাশ ঘাট নামে পরিচিত।** লোকশ্রুতি বলে তৎকালীন নদীপথের বাণিজ্য বন্দর হিসেবে প্রকাশ ঘাট এবং বাণিজ্য কেন্দ্ররূপে প্রকাশ গ্রাম ছিল সুসমৃদ্ধ। নদীপথে আমদানী রপ্তানির মাধ্যমে বিষ্ণুপুরকে

একটি উল্লেখযোগ্য বাণিজ্য কেন্দ্রে এবং শিল্পনগরে পরিণত করার সদিচ্ছা ছিল প্রকাশ মল্লের। তারই ফলে এসেছিল সমৃদ্ধি। কিন্তু স্বল্পায়ু বশতঃ বেশীদিন রাজত্ব করার সুযোগ পাননি তিনি। ১০৯৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মাত্র বছর পাঁচেক রাজত্ব করার পর নিভে যায় তাঁর জীবন-দীপ। অতঃপর কালের কলস্রোতে **প্রতাপ মল্ল, সিন্দুর মল্ল, সুখময় মল্ল, বনমালী মল্ল, যদু মল্ল, জীবন মল্ল** একের পর এক বিষ্ণুপুরের রাজ-সিংহাসন যদিও অলংকৃত করেন তথাপি উল্লেখ করার মতো উল্লেখযোগ্য কিছু না করেই সরে যান নিঃশব্দে। এসে যায় রাম মল্লের রাজত্বকাল।

রাম মল্ল ছিলেন শৌর্যবান, বীর্যবান, প্রবল পরাক্রান্ত রাজা। রাজা জগৎ মল্লের স্বপ্নের বিষ্ণুপুরকে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করার উদ্দেশ্যে তিনি বহু দুর্গ নির্মাণ করেন। বহুবিধ অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করান। **দুর্গ, অস্ত্রসজ্জা এবং সামরিক শক্তিতে বিষ্ণুপুরকে তিনি এতই উন্নত করেছিলেন যে তাঁর প্রবল প্রতাপান্বিত শত্রুগণও তাঁকে আক্রমণ করার ঔদ্ধত্য দেখাতে সাহস করেননি কদাচিৎ।** রাম মল্ল প্রসঙ্গে তরুণদেব ভট্টাচার্য তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া' পুস্তকের ৯০ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন, "তিনি বিষ্ণুপুর গড়ের ও সৈন্যবাহিনীর সংস্কার করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে। এমন কি সৈন্যদের ইউনিফর্মের দিকেও নজর দিয়েছিলেন। এজন্য আলাদা কর্মচারীও নিযুক্ত হয়েছিল। প্রবাদটি ভিত্তিহীন নাও হতে পারে। তুর্কী আগমনের পর রাজশক্তি নতুন করে সংগঠিত করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল।" ১১৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রায় ২৪ বছর চুটিয়ে রাজত্ব করে ১২০৯ খ্রীষ্টাব্দে ছেদ পড়ে তাঁর গৌরবোজ্জ্বল জীবনে।

রাম মল্লের মৃত্যুর পরই আবার যেন ঝিমিয়ে পড়ে, স্তিমিত হয়ে পড়ে বিষ্ণুপুরের শ্রীবৃদ্ধি, সমৃদ্ধি তথা সার্বিক উন্নতি। কারণ রাম মল্লের উত্তরপুরুষ রূপে **গোবিন্দ মল্ল** রাজা হন। গোবিন্দ মল্লের পর **ভীম মল্ল** সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকলে "ভীম মল্ল পাত্রহাটি গ্রামে শ্যামচাঁদ দেবতার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে প্রবাদ আছে। পাত্রহাটি মৌজাটি নাকি এজন্যে শ্যামচাঁদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়। মৌজাটি দামোদরের তীরবর্তী পখন্না গ্রামের সংলগ্ন ছিল। **প্রবাদটি সত্য হলে ভীম মল্লের সময় মল্লভূমের সীমানা দামোদর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ হয়েছিল।"** ভীম মল্ল সম্বন্ধে এ তথ্য পরিবেশন করেছেন তরুণদেব ভট্টাচার্য। ভীম মল্লের পর **কাটার মল্ল** রাজা হন এবং এঁরা রাজত্ব করেন ১২০৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৯৪ - ৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। প্রায় শত বৎসরের রাজত্বকালে পূর্বোক্ত তিনজন রাজা এমন কিছু করে যান নি যা নিয়ে লেখা যায় ইতিহাস। ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মল্লভূমের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হন সপ্তত্রিংশতম মহারাজ **পৃথ্বী মল্ল।**

মহারাজ পৃথ্বী মল্লের রাজ্যশাসন প্রণালী সম্বন্ধে সেরকম কিছু জানা যায় না। তবে পৃথ্বী মল্লের অমর কীর্তি হল বিষ্ণুপুর শহরের উত্তরে প্রায় ৬/৭ কি. মি. দূরত্বে দ্বারকেশ্বর নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত ডিহর গ্রামে **ষাঁড়েশ্বর** ও **শৈলেশ্বর** শিবলিঙ্গ স্থাপন এবং শিবমন্দির নির্মাণ। মন্দির দুটি নির্মিত হয় ৬০৬ মল্লাব্দে, ইং ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে। আগাগোড়া মাকড়া পাথরের তৈরী চূড়া বিহীন অসম্পূর্ণ এই মন্দির দুটি-ই হল মল্লরাজ নির্মিত সর্বাধিক প্রাচীন মন্দির। মন্দির-নগরী হিসেবে বিষ্ণুপুরের আজ যে সুখ্যাতি তার মর্মমূলে রয়েছে কিন্তু পৃথ্বী মল্লের অমর কীর্তি। মল্লভূমে মন্দির নির্মাণের আদি রাজা এবং পথিকৃৎ হিসেবে তাঁর নাম বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে যুগ যুগ ধরে লেখা থাকবে স্বর্ণাক্ষরে।

অধ্যায়-২৯

রাজকাহিনী—৬

সলদা-গোকুলনগর পরিমণ্ডল

তপ মল্ল (১৩১৯-১৩৩৪ খৃঃ), **দীনবন্ধু মল্ল** (১৩৩৪-১৩৪৫ খৃঃ), **কানু মল্ল** (২য়) (১৩৪৫-১৩৫৮ খৃঃ), **শূর মল্ল** (২য়) (১৩৫৮-১৩৭০ খৃঃ), **শিবসিং মল্ল** (১৩৭০-১৪০৭ খৃঃ), **মদন মল্ল** (১৪০৭-১৪২০ খৃঃ), **দুর্জন মল্ল** (২য়) (১৪২০-১৪৩৭ খৃঃ), **উদয় মল্ল** (১৪৩৭-১৪৬০ খৃঃ) ও **চন্দ্র মল্ল** (১৪৬০-১৫০১ খৃঃ)।

১৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ পৃথ্বী মল্ল গত হবার পর **তপ মল্ল**, এবং তপ মল্লের পর **দীনবন্ধু মল্ল** রাজা হন। দীনবন্ধু মল্ল লোচনপুরে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু-বাসুদেব মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। মূর্তির নামানুসারে মৌজার নতুন নাম হয় বাসুদেবপুর। সেই মূর্তি এখনও বিদ্যমান। অতঃপর **দ্বিতীয় কানু মল্ল** এবং **দ্বিতীয় শূর মল্ল** রাজা হয়ে বৈচিত্র্যহীনভাবে রাজ্যশাসন করে গত হন গতানুগতিক পদ্ধতিতে। সেই একঘেয়ে রাজ্যশাসন প্রণালীতে সুর ও সঙ্গীতের ঝংকার তুলে কিছুটা বৈচিত্র্যের স্বাদ ফিরিয়ে আনেন ৪২তম রাজা **শিবসিং মল্ল। বিষ্ণুপুরকে বলা হয় সুরতীর্থ, সঙ্গীততীর্থ, সঙ্গীতে দ্বিতীয় দিল্লী। তাই সুর ও সঙ্গীত প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় মহারাজ শিবসিং মল্লের নাম, কারণ তিনি ছিলেন সুরের পূজারী, সঙ্গীতের দিশারী। তিনিই প্রথম বিষ্ণুপুরের বুকে সুর-সাধনার আয়োজন করেন আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে।** মহারাজ শিবসিং-এর রাজত্বকালে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে রাজ-আনুকূল্যে সুর ও সঙ্গীতের যে চারাগাছটি বিষ্ণুপুরের মাটিতে প্রোথিত হয়েছিল সেই চারাগাছটি দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের আমলে ফুলে ফুলে, ফলে ফলে ষোলকলায় বিকশিত হয়ে সুরের সৌরভে সুরভিত করেছিল দশ দিক। সুর ও সঙ্গীতের জন্য বিষ্ণুপুরের আজ যে জগৎজোড়া খ্যাতি তার মূলে রয়েছে মহারাজ শিবসিং-এর প্রারম্ভিক প্রয়াস, আন্তরিক উদ্যোগ। **সুরের পূজারী, সঙ্গীতের দিশারীকে তাই বিষ্ণুপুরবাসীগণ বরণ করেছেন সঙ্গীতের নৈবেদ্য সাজিয়ে, সুরের অর্ঘ্য দিয়ে।**

প্রায় ৩৭ বছরকাল রাজত্ব করে ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে দেহ রাখেন শিবসিং মল্ল। শিবসিং মল্লের শূন্য সিংহাসন পূর্ণ করেন প্রথমে **মদন মল্ল**। মদন মল্ল কৃষ্ণনগর গ্রামে মদন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং কৃষ্ণনগর মৌজা দেববিগ্রহের সেবাপূজার জন্য দান করেন। কথিত আছে, তিনি মল্লরাজ্যের সীমা দক্ষিণ বাঁকুড়ার রায়পুর পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। মদন মল্লের পর রাজা হন **দ্বিতীয় দুর্জন মল্ল**, তারপর **উদয় মল্ল**। উত্তেজনাহীন নিরুত্তাপ শাসন প্রণালীর মধ্য দিয়ে বয়ে যায় প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল। উদয় মল্ল অস্তমিত হন ১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে এবং উদিত হন রাজা **চন্দ্র মল্ল**। ১৪৬০ থেকে ১৫০১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৪১ বৎসরকাল চরম ও পরম শান্তিতে রাজত্ব করেন তিনি। তাঁর অমর কীর্তি হল বিষ্ণুপুরের ঠিক পূর্বদিকে প্রায় ১৭/১৮ কি. মি. দূরে ঁগোকুলচাঁদ জীউ-এর শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ স্থাপন। বর্তমানে বিষ্ণুপুর-কোতুলপুর বাস-রুটের কুম্ভস্থল বাস-স্টপের ২ কিলোমিটার দক্ষিণে রয়েছে গোকুলনগর গ্রাম ও ঁগোকুলচাঁদ জীউ-এর শ্রীমন্দির। মহারাজ চন্দ্র মল্ল ঁগোকুলচাঁদ জীউকে প্রতিষ্ঠিত করে গোকুলচাঁদের নামানুসারেই জায়গাটির নাম

রাখেন গোকুলনগর। লক্ষ্য করার বিষয় 'গ্রাম' নয় নগর। হ্যাঁ সত্যই নগর। কারণ গোকুল শব্দের অর্থ 'বৃন্দাবন'। আর গোকুলচাঁদ শব্দের অর্থ হল গোকুলের চাঁদ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরাধাসহ গোকুলচাঁদ অর্থাৎ রাধা কৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠা করে তিনি উক্ত অঞ্চলটিকে শ্রীকৃষ্ণের লীলাভূমি বৃন্দাবনের অনুকরণেই সম্ভবতঃ করতে চেয়েছিলেন আর এক বৃন্দাবন অর্থাৎ কিনা দ্বিতীয় বৃন্দাবন। তাইতো নাম রেখেছিলেন **গোকুলনগর**।

মল্লভূমের কথা আলোচনা করতে গেলেই মল্লসংস্কৃতির পীঠস্থান গোকুলনগরের কথা এসে যায় আপনা-আপনি। শুধু কি মল্লসংস্কৃতি? মল্লভূমের ইতিহাস? মল্লভূমের অধ্যাত্ম চেতনা? না। গোকুলনগর মহেঞ্জোদরো হরপ্পার মতোই তার মাটি চাপা দেহ-বিবরে সযত্নে লুকিয়ে রেখেছে এক বিশাল সম্ভাবনাময় প্রাচীন ঐতিহ্য।

মাটি কথা বলে। শিল্প সংস্কৃতি কথা বলে। ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলি উক্ত বক্তব্যের সত্যতার সাক্ষ্য বহন করে। হ্যাঁ, সত্য। অনুমান বা গালগপ্পের স্থান নেই এখানে। **শুনুন তবে প্রাক্-মল্লযুগের গোকুলনগর সংস্কৃতির ইতিকথা।**

ইতিহাস বলে মল্লরাজত্বের শুভ সূচনা হয় সপ্তম শতাব্দীর একেবারে শেষ ভাগে—৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। কিন্তু গোকুলনগরের মাটি চাপা সভ্যতাকে দেখতে হলে আমাদের দৃষ্টিসীমাকে প্রসারিত করতে হবে সুদূর অতীতের খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে, বৌদ্ধযুগের সমসাময়িক কালে। সেখানে আমরা কি দেখব?

দেখব, রচিত হয়েছে এক বিরাট কৃষ্টি-সংস্কৃতি, যার ভিত্তিভূমি হল আধ্যাত্মিকতা। প্রায় ৫×৪ কি. মি. অর্থাৎ ২০ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত, ভাগবৎ ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ। উক্ত নিদর্শন সমূহ ঘনীভূত আকারে প্রকাশিত হয়েছে বর্তমান গোকুলনগর গ্রাম এবং সুবর্ণদহ ওরফে স্বর্ণদহ অপভ্রংশে সলদা পরিমণ্ডলের দক্ষিণ প্রান্তে। উক্তির সত্যতা প্রমাণার্থে উল্লেখ করি যে বর্তমান গোকুলচাঁদ মন্দিরটির সুবিশাল নাটমন্দিরটিকে সংগ্রহশালা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছিল। উক্ত সংগ্রহশালাতে ছিল বৌদ্ধ মূর্তি, জৈন মূর্তি এবং অনন্তশয্যায় শায়িত ভগবান বিষ্ণুর একটি নিখুঁত এবং সর্বাঙ্গসুন্দর অপরূপ শ্রীমূর্তি। এছাড়া উল্লিখিত ধর্ম-সংস্কৃতির নিদর্শনাত্মক বহু প্রাচীন মূর্তি গোকুলচাঁদমন্দির-চত্বর থেকে স্থানান্তরিত এবং অপহৃত হয়েছে বছরে বছরে—এসব কথা স্থানীয় বয়োবৃদ্ধ মানুষজনের মুখে মুখে ছড়িয়ে রয়েছে জনশ্রুতি আকারে।

গোকুলনগরের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে **'লাট দেওয়ান বেড়া'** এলাকায় বেশ কিছু মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের উপর সংরক্ষিত ছিল ক্ষয়িত দিগম্বর এবং তীর্থঙ্করের বিশাল মূর্তি। এগুলি একের পর এক চুরি হয়েছে দিনে দিনে। ভাগবৎ যুগের যে কয়েকটি নিদর্শন গোকুলনগরের নজরে পড়ে সেগুলির মধ্যে এখনও রয়েছে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষ্ণুর বিশাল বরাহ অবতার মূর্তি ও বামন অবতার মূর্তি। **পূর্বে উল্লিখিত ভগবান বিষ্ণুর অনন্তশয্যায় শায়িত মূর্তি সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে বিষ্ণুপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে।** গোকুলনগরের প্রায় ২ কি. মি. পূর্বে বাসুদেবপুরে (বর্তমানে রাজগ্রাম) রয়েছে নৃসিংহদেবের মূর্তি। **এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল যে এমন পৃথক পৃথকভাবে বরাহ, বামন ও নৃসিংহ অবতারের শ্রীমন্দির ও শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা দাক্ষিণাত্য ছাড়া বাংলাদেশের একমাত্র এই গোকুলনগর পরিমণ্ডলেই পরিলক্ষিত হয়।**

অল্প পরিসরে সীমিত শব্দ সংখ্যায় বৌদ্ধ, জৈন, ভাগবৎ এবং বৈষ্ণব সংস্কৃতির

একটি ছোট মাপের চিত্র তুলে ধরলাম। এবার বলি শৈব এবং শাক্ত সংস্কৃতির কতিপয় নির্দশনের কথা।

শৈব সংস্কৃতির কথা উল্লেখ করতে গেলে প্রথমেই আমাদের উঁকি মারতে হয় গোকুলনগরের **গন্ধেশ্বর শিবমন্দিরের শ্রীঅঙ্গনে**। গন্ধেশ্বর শিবের পুণ্যাঙ্গনে চোখ বুলালেই নজরে পড়ে ধ্বংসস্তুপের বিভীষিকা, স্মৃতিপটে জেগে ওঠে তুর্কী আক্রমণের ভয়াবহতা। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ। আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন লুটেরা তুর্কী সৈন্যের দল বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজধানী প্রদ্যুম্নপুরকে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে আক্রমণ করল তৎসংলগ্ন গোকুলনগরকে।

গোকুলনগরের উত্তর প্রান্তে স্বর্ণদহ অপভ্রংশে সলদাতে ছিল **ভুবনেশ্বর শিবমন্দির**। ভুবনেশ্বর মন্দিরাঞ্চল তছনছ করে অতিকায় ভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গ উৎপাটন করে শিবলিঙ্গের নীচে প্রোথিত প্রতিষ্ঠাকালীন মণি-মাণিক্যাদি নবরত্ন অপহরণ করে তাদের নজর পড়ে গন্ধেশ্বর শিবমন্দিরের ওপর। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, ভুবনেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠাকালীন প্রস্তর নির্মিত রত্নাসনটি অধুনা নির্মীয়মাণ ভুবনেশ্বর শিব-মন্দিরে সংরক্ষিত রয়েছে।

গন্ধেশ্বর শিবমন্দিরের উত্তর দিকে মন্দির সংলগ্ন অবস্থায় রয়েছে কাতরা নামক পুষ্করিণী এবং উক্ত শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে তার চতুষ্পার্শ্বে নির্মিত হয়েছিল, বাণেশ্বর, দানেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, সর্বেশ্বর, পাতালেশ্বর প্রভৃতি নামাঙ্কিত অসংখ্য শিবলিঙ্গের জন্য অসংখ্য ছোট ছোট শিবমন্দির। তুর্কী সৈন্যগণ ঐসব মন্দির ভাঙচুর করে এবং দেবসম্পত্তি অপহরণ করে নির্বিচারে। **এবার পালা গন্ধেশ্বর শিব ও শিবমন্দিরের।**

দৃষ্টিসুখকর কারুকার্য খচিত গৌরীপট্টসহ অত্যন্ত বৃহদাকার এই শিবলিঙ্গ শুধু বাঁকুড়া জেলারই বৃহত্তম নয়, সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম শিবলিঙ্গ। এই শিবলিঙ্গটির দৃশ্যমান অংশের উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট, গৌরীপট্টভেদকারী লিঙ্গটির নিম্নাংশের পরিধি ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং উর্ধ্বাংশের পরিধিও ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। বৃত্তাকার গৌরীপট্টটির পরিধি ১৩ ফুট ৩ ইঞ্চি। এই রকম একটি সুবিশাল শিবলিঙ্গের জন্য নির্মিত হয়েছিল আকারে প্রকারে উচ্চতায় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃহদাকার এক শিবমন্দির। মন্দিরটি যে কত বিশাল এবং কত উঁচু ছিল তা জ্যামিতিক এবং গাণিতিক কল্পনা সাপেক্ষ। কারণ উক্ত মন্দির-চত্বরে মন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ট চূড়ার খোদাই কারুকার্য সমন্বিত যে সব প্রস্তরখণ্ড রয়েছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আকারে, তার ভিত্তিতে প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেই দেবালয়টির আকৃতি, প্রকৃতি এবং উচ্চতা বিষয়ে একটি ধারণা হয়। এরকম একটি অনুসন্ধানী গবেষক দৃষ্টিকোণ থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে সপ্তরথ আকৃতির দেউল রীতির এই মন্দিরটির উচ্চতা ছিল প্রায় ৮০ ফুটের কাছাকাছি।

লোকশ্রুতি বলে স্বর্ণদহ বা সলদার ভুবনেশ্বর এবং গোকুলনগরের গন্ধেশ্বর হলেন দুই ভাই। গন্ধেশ্বর অগ্রজ। ভুবনেশ্বর অনুজ। যে রাত্রিতে ভুবনেশ্বর শিব আক্রান্ত হন এবং তাঁর নবরত্নাদি লুণ্ঠিত হয়, বিপদ বুঝে সে রাত্রিতেই তিনি দাদা গন্ধেশ্বরকে খবর পাঠান এই সাবধান-বাণী শুনিয়ে, 'গোঁদো দাদা আমি লুণ্ঠিত হয়েছি, সর্বস্ব খোয়া গেছে আমার। তুমি সাবধান।' এই সাবধান-বাণী শোনার সাথে সাথেই গন্ধেশ্বর শিব প্রায় ৮০ মন ওজন বা ৩২ কুইন্টাল ওজনের একটি প্রস্তরখণ্ডকে একটি মাত্র দূর্বাদলে বেঁধে ঝুলিয়ে দেন গর্ভমন্দিরের প্রবেশদ্বারে।

আশপাশের মন্দিরাদি ধ্বংস করে, মহামূল্য রত্নাদি লুণ্ঠন করে তুর্কীদস্যুরা গন্ধেশ্বর

শিব-মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করতে গিয়ে দূর্বাদলে দোদুল্যমান পথরোধকারী ঐ বিশাল প্রস্তরখণ্ডটি দেখে বিস্ময়ে হতচকিত হয়। **ঈশ্বরভীতি পেয়ে বসে লুঠেরা দস্যুদের। গন্ধেশ্বর মন্দির-চত্বর সত্বর ত্যাগ করে তারা সদলবলে পাড়ি দেয় মথুরানগর অভিমুখে।**

শুধু তুর্কী আক্রমণই নয়, এ অঞ্চল **'সুলেমান কর্‌রানি, কালাপাহাড় আক্রমণ'** থেকেও রেহাই পায়নি। এ বিষয়ে গবেষক মাণিক লাল সিংহের 'পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি' পুস্তকের নিম্নোদ্ধৃতিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। উক্ত পুস্তকের ১৫৩-১৫৪ পৃষ্ঠায় তিনি লিখেছেন, "১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সুলেমান কর্‌রানি, কালাপাহাড় প্রমুখ প্রবল পরাক্রান্ত আফগান নায়কদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে রাঢ়, বঙ্গ, উড়িষ্যা সর্বদা ত্রস্ত। সমগ্র উড়িষ্যা সুলেমান কর্‌রানি জয় করিয়াছেন; **কালাপাহাড় তথা কালিদাস গজ্‌দানী** হিন্দু-মন্দির, হিন্দু-দেবদেবীর বিগ্রহ ভাঙিয়া তছনছ করিতেছেন....।

সেই দুর্যোগকালে বাঁকুড়া জেলার পূর্বদিকে অবস্থিত ইন্দাস, পাত্রসায়ের, কোতুলপুর, জয়পুর ইত্যাদি থানাগুলির উপর যে প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছিল তাহা স্পষ্ট বোঝা যায় জয়পুর থানার শলদা গ্রামের অগণিত দেবালয়ের ধ্বংসস্তূপ এবং দেবদেবী মূর্তিগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া।"

কথিতআছে, মল্লরাজত্বকালে মল্লরাজা পৃথ্বী মল্লের ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাবের শেষ রেশটুকু ক্রমশঃ অন্তর্হিত হয়ে মল্লভূম পরিমণ্ডলে সর্বপ্রথম শৈব-উপাসনার ভিত্তিভূমি রচিত হয়েছিল ১৩০০ খ্রীষ্টাব্দে বা ৬০৬ মল্লাব্দে। কিন্তু গন্ধেশ্বর, ভূবেনশ্বর শিবলিঙ্গ ও শিবমন্দির প্রাক্ মল্লযুগে শৈব-উপাসনার সাক্ষ্য বহন করে আজও। ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কী আক্রমণের পূর্বেই নির্মিত হয়েছিল পূর্বোক্ত শিবলিঙ্গ ও শিবমন্দির দ্বয়।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে এতদঞ্চলের শিবমন্দির এবং শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠাকাল নিয়ে। গবেষক তথা ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করেন যে এইসব মন্দিরগুলি প্রাক্ মল্ল এবং প্রাক্ মুসলিম যুগের কোন এক সময় প্রতিষ্ঠিত হওয়াই স্বাভাবিক। **বঙ্গদেশের গোকুলনগর সংলগ্ন দেউলভিড়া (দেউলের ভিড়) এলাকায় উল্লেখযোগ্যভাবে শতাধিক (১০৮) শিবমন্দিরের প্রতিষ্ঠা নিশ্চয়ই কোন শিবভক্ত রাজার আনুকূল্য লাভ করেছিল।** প্রাক্ মুসলিম যুগের কাছাকাছি সময়ের গৌড়ের রাজা **শশাঙ্ক** ছিলেন শিবভক্ত। তখন রাঢ় অঞ্চল ছিল গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত। কারো কারো মতে প্রদ্যুম্নপুর, সলদা, গোকুলনগর ছিল গৌড়ের দ্বিতীয় রাজধানী এবং শশাঙ্কের অধীনস্থ প্রদ্যুম্নপুরের সামন্ত রাজারা এই অঞ্চলে তখন রাজত্ব করতেন। সুতরাং অনুমান করা যায় যে শিবভক্ত শশাঙ্কের রাজত্বকাল ৬১৯-৬৩০ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী সময়ে কিংবা তারও পূর্বে এসব প্রতিষ্ঠা হওয়াই স্বাভাবিক।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি, প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সলদা-গেকুলনগর পরিভ্রমণকালে এ অঞ্চলে **লকুলীশ**-এর মূর্তি লক্ষ্য করে বিস্ময়াভিভূত হন। কারণ একমাত্র দাক্ষিণাত্য এবং উড়িষ্যা অঞ্চল ছাড়া বাংলাদেশের কোনো অঞ্চলে এই পাশুপত ধর্মের প্রচারকের মূর্তি দেখা যায় না। **সুতরাং এখানে লকুলীশ মূর্তির অস্তিত্ব এখানকার শৈবধর্ম উপাসনার প্রাচীনত্বকেই প্রমাণিত করে।** (দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের শিল্প ঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 'প্রবাসী' মাঘ, ১৩৩৬ পৃঃ— ৫৬১)।

বৌদ্ধ, জৈন ও শৈব সংস্কৃতির কথায় ইতি টেনে এবার আসি শাক্তধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসঙ্গে। বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব ক্রমশঃ অন্তর্হিত হলেও শৈব সংস্কৃতির ধারাটি রইল

অপ্রতিহত। শৈব সংস্কৃতিকে ছুঁই ছুঁই করে ধীরে ধীরে এসে গেল শাক্ত-সংস্কৃতি। কিন্তু কিভাবে এই শাক্তধর্মের উন্মেষ ঘটল সলদা গোকুলনগর অঞ্চলে তা নিঃসন্দেহে গবেষণার বিষয়।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম, নবম ও দশম শতকের যে সব শাক্ত মূর্তি এখানে পাওয়া যায় তন্মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল গন্ধেশ্বর মন্দিরে সংরক্ষিত মহিষমর্দিনী মূর্তি, শঙ্খসুর মন্দির-গাত্রে প্রোথিত ষড়ভুজা কালীমূর্তি মতান্তরে ভৈরবমূর্তি এবং ভুবনেশ্বর মন্দির-চত্বরে অধুনা প্রাপ্ত বারাহী এবং প্রাচীন কালীমূর্তি। এছাড়া আরও অসংখ্য দেবীমূর্তি, যেগুলি কালে কালে অপহৃত এবং স্থানান্তরিত হয়েছে তার থেকে এবং পূর্বোল্লিখিত শাক্তমন্দিরগুলির ধ্বংসস্তূপ থেকে শাক্ত ধর্মের প্রভাব সুদৃঢ়ভাবে প্রতীয়মান হয় গবেষক-হৃদয়ে। পূর্বোক্ত দেবী মূর্তিগুলির অলংকরণে এবং রূপায়ণে পাল যুগের ও গুপ্ত যুগের নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। **প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষ ভাগে লাউগ্রামে দেবী দণ্ডেশ্বরীর প্রতিষ্ঠা এবং পূজা-অর্চনার প্রচলনও শাক্ত উপাসনার সমর্থক।**

প্রাক্-মল্লযুগের সংস্কৃতির কথায় ইতি টেনে এবার আমরা ফিরে আসি মল্ল-সংস্কৃতির কথায়। ফিরে আসি বৃন্দাবনের অনুকরণে রূপায়িত গোকুলনগরের পরিকাঠামোর পরিকল্পনায়। মল্লভূমের প্রতিষ্ঠাকালীন রাজধানী প্রদ্যুম্নপুরসহ তৎসংলগ্ন জয়পুর এবং স্বর্ণদহ (সলদা) ও গোকুলনগরের এই মানচিত্রটি পাঠকবর্গকে গুপ্তবৃন্দাবন মল্লভূম সম্পর্কে বিশেষভাবে সচেতন করবে এবং একটি সুসংবদ্ধ ধারণাকে পাঠক-মনে প্রোথিত করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। মানচিত্রে দেখুন বিষ্ণুপুর-কোতুলপুর, বাসরুটের জয়পুর বাসস্টপের উত্তর দিকে রয়েছে পরিখা বেষ্টিত দুর্গের মধ্যে প্রদ্যুম্নপুর গড়। পূর্বোক্ত রাস্তার দক্ষিণে এক কিলোমিটার দূরত্বে শোভা পাচ্ছে বিস্তীর্ণ **সমুদ্রবাঁধ**। সমুদ্রবাঁধের দক্ষিণ-পূর্ব কোণ থেকে নদী আকৃতির যমুনার উৎপত্তি। উক্ত **যমুনা** (নদী) গোকুলনগর গ্রামের দক্ষিণদিক বরাবর পূর্বদিকে এগিয়ে চলেছে এঁকেবেঁকে। গোকুলনগর থেকে প্রায় এক কিলোমিটার দূরত্বে পার্শ্ববর্তী গ্রাম কুচিয়াকোল থেকে আগত অপর একটি জলধারা মিলিত হয়েছে যমুনাব সাথে এবং ঐ বিশেষ স্থানটি থেকেই যমুনার নামসহ লিঙ্গ পরিবর্তিত হয়ে যমুনা হয়েছে **আমোদর নদ**। এই আমোদর নদ পূর্বদিক বরাবর বয়ে চলেছে পুণ্যতীর্থ জয়রামবাটীর পাশ দিয়ে। জয়রামবাটীস্থ আমোদর নদ মা সারদার বাল্যস্মৃতিতে স্নেহসিক্ত। থাক সে কথা। আমাদের আলোচ্য গোকুলনগরের দক্ষিণে রয়েছে যমুনা, যমুনার দক্ষিণে দেউলভিড়া অঞ্চলে শৈবসংস্কৃতির ধ্বংসস্তূপের উপর গড়ে উঠেছে যাদবপ্রধান মথুরানগর গ্রাম। গোকুলনগরের দক্ষিণে রয়েছে পুষ্পনগর ওরফে **ফুলনগর**। আবার দেখুন গোকুলনগরস্থ গোকুলচাঁদের শ্রীমন্দিরের উত্তর দিকে ১ কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে পূর্বে উল্লিখিত ঁগন্ধেশ্বর শিবের শ্রীমন্দির এবং শ্রীবিগ্রহ। গন্ধেশ্বর শিব মন্দিরের প্রায় ৪০০ মিটার উত্তরে রয়েছে ভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গ। **ভুবনেশ্বর শিবলিঙ্গের পূর্ব দিকে প্রতিষ্ঠিতা রয়েছেন অধুনা প্রাপ্ত বারাহী ও প্রাচীন কালীমূর্তি।** (পাশের মানচিত্র দ্রষ্টব্য)

শৈব-সংস্কৃতি যেহেতু প্রাচীনত্বের দাবী রাখে সেহেতু নিঃসন্দেহে বলা যায় শতাধিক শিবমন্দিরের মিলনতীর্থ সুদূর অতীতের শৈবপীঠস্থানটি রাজা চন্দ্র মল্লের সময়ে ও তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় এবং কৃষ্ণভক্তির প্রাবল্যে উক্ত অঞ্চলটিকে বৃন্দাবনের পরিকল্পনায় রূপায়িত করার শান্ত মধুর অতিচেতন মানসিকতার আন্তর প্রেরণায় পূর্বোক্ত শৈবপীঠস্থানটি গোকুলনগর নাম পরিগ্রহ করেছিল গোকুলচাঁদের শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

তৈরী হল বৃন্দাবন ধামের গোকুল এবং যমুনা পারের মথুরা। প্রতিষ্ঠিত হলেন **গোকুলচাঁদ**, গোপাল, কালোসোনা, বৃন্দাবন-চন্দ্র প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহ। নির্মিত হল শ্রীমন্দির, দোলমঞ্চ, রাসমঞ্চ, ঝুমুরমঞ্চ, নাম-সংকীর্তন-মঞ্চ ইত্যাদি। যশোদার বাৎসল্য ভাবের সাথে গোপীদের মধুর ভাবের অপূর্ব সমন্বয়ে গোকুলকে আলোকিত করে এলেন যশোদানন্দন দৃষ্টি বিনোদন গোকুলচাঁদ। গোকুলচাঁদ-সহ পূর্বোক্ত শ্রীবিগ্রহগুলির পূজা-অর্চনার মাধ্যমে গোকুলনগর পরিমণ্ডলে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই পঞ্চভাবের ভাব সমাধিতে সমাধিস্থ রাধা-প্রেমেরও বিকাশ ঘটল প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলে। গোকুলচাঁদের শ্রীমন্দিরের সুরক্ষার্থে এবং শোভাবর্ধনার্থে যমুনার জলধারার পাশে খনন করা হল **যমুনাবাঁধ** ও **জবার বাঁধ**। বর্তমান কালের ক্ষয়িত নিষ্ঠুরতায় যমুনা বা জবা বাঁধ নেই। যা আছে তা হল মজে যাওয়া খাদ ও পাড়ের মৃদু চিহ্ন, যা আছে তা হল নামের ঐতিহ্যবাহী সুরভিত স্মৃতি। গোকুলনগরের দেব-দেবীদের জন্য যেখান থেকে রং বাহারি, রাশি রাশি সুগন্ধি ফুল আসতো পুষ্পবিলাসী দেব-দেবীদের জন্য **পুষ্পনগর** নামে নামাঙ্কিত পার্শ্ববর্তী সেই সুপ্রাচীন গ্রামটি আজ চলিত ভাষায় **ফুলনগর** নামে অভিহিত হয়ে উর্বরা জমি বক্ষে নিয়ে অতীতের স্মৃতি বহন করছে আজও।

এ যাবৎ গোকুলনগরের অবয়বগত পরিকাঠামো নিয়ে আলোচনা করলাম সংক্ষেপে। এখন শুনুন গোকুলচাঁদজীউ-এর শ্রীমন্দির, মন্দির-প্রাঙ্গণ এবং শ্রীবিগ্রহের কথা।

বিষ্ণুপুরের লালজীউ এবং মদনমোহন জীউ-এর মন্দিরের মতোই গোকুলনগরের গোকুল-চাঁদ জীউ-এর মন্দিরটিও রয়েছে দুর্গসম সুউচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত। আয়তাকার উক্ত প্রাচীরটির উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত পূর্ব দিকের বাহুটির দৈর্ঘ্য ১৭৯ ফুট এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত উত্তর বাহুটির দৈর্ঘ্য ১৩১ ফুট। ৪ ফুট চওড়া এই প্রাচীরটির উচ্চতা ১২ ফুটেরও বেশী। ১৭৯ ফুট × ১৩১ ফুট প্রাচীর ঘেরা আয়তাকার মন্দির প্রাঙ্গণের প্রধান প্রবেশতোরণটি রয়েছে পূর্ব দিকে অবস্থিত। অবশ্য পূর্ব দিকে আরও একটি প্রবেশদ্বার পরিলক্ষিত হয়। ২৫' × ১৪'১০" দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বিশিষ্ট খোদাই কারুকার্য সমন্বিত খিলান ছাদে আচ্ছাদিত প্রকোষ্ঠ-যুক্ত মূল প্রবেশতোরণটি (বর্তমানে খিলান ধ্বসে পড়েছে) নিঃসন্দেহে আলোচনার অবকাশ রাখে। প্রবেশ তোরণটির খিলান আকৃতির প্রধান প্রবেশদ্বার দুটি প্রস্থে প্রায় চার ফুট এবং উচ্চতায় সাড়ে সাত ফুট। উক্ত প্রবেশ-তোরণের প্রাচীরের উত্তরাংশের অভ্যন্তরভাগে জমিন থেকে প্রায় ৬ ফুট উচ্চতায় ৩'২" প্রস্থ, ৩'৮" উচ্চ এবং ১'৬" গভীর একটি কুলঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। **কুলঙ্গিটিতে সংস্থাপিত ছিল পূর্বোল্লিখিত অনন্তশয্যায় শায়িত বিষ্ণুর শ্রীদর্শন শ্রীমূর্তি।** উক্ত কুলঙ্গির উত্তর পার্শ্বে একটি উপমন্দির বর্তমান। উপমন্দিরটিতে বৌদ্ধ এবং জৈন মূর্তি সংরক্ষিত ছিল এবং পূজিত হত। পরবর্তীকালে এসব মূর্তি অন্তর্হিত হয়েছে একে একে।

প্রাচীর ঘেরা মন্দির-চত্বরের উত্তর দিক চেপে স্থাপিত হয়েছে শ্রীশ্রীগোকুলচাঁদ জীউ-এর শ্রীমন্দির। প্রায় ৩৬" উচ্চ মন্দির-বেদীটির পূর্ব বাহু ৫৭', পশ্চিম বাহু ৫৬'৭", উত্তর বাহু ৫৬'৪" এবং দক্ষিণ বাহু ৫৫'১০"। এরূপ অল্পবিস্তর অসম বাহু বিশিষ্ট বর্গাকার বেদীর উপর গড়ে উঠেছে পঞ্চরত্ন বিশিষ্ট মূল মন্দিরটি—যার পূর্ব বাহু ৪৪'১০", পশ্চিম বাহু ৪৪'১১", উত্তর বাহু ৪৪'৪", এবং দক্ষিণ বাহু ৪৪'৩"। দক্ষিণমুখী এই মন্দিরটির দক্ষিণদিকের দেওয়ালের দুই পাশে রয়েছে দশ অবতার এবং বুদ্ধদেবের খোদাই মূর্তি। মধ্যস্থলে রয়েছে খোদাই কারুকার্য সমন্বিত তিনটি প্রবেশদ্বার। উপরিভাগে রয়েছে ক্ষয়িত

এবং দুর্বোধ্য শিলালিপি। এছাড়া রয়েছে বিকশিত পদ্ম, লতাপাতা এবং জোড়হস্তে শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদনকারী কিছু খোদাই মূর্তি। শ্রীমন্দিরের পূর্বদিকের দেওয়াল- গাত্রের উপরিভাগে একটি রাসলীলার চিত্র এবং পশ্চিম দিকের দেওয়ালের উপরিভাগে তীর্থঙ্কর মূর্তি থাকলেও মন্দিরটিতে ভাগবতীয় ধর্মচেতনাই প্রাধান্য লাভ করেছে। মন্দিরটির উপরিভাগে চারকোণে চারটি চতুষ্কোণ আকৃতির চূড়ার মধ্যে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে অগ্নিকোণের চূড়াটি। অপর তিনটি চূড়া রয়েছে আমলক ও শীর্ষদণ্ড বিহীন অবস্থায়। মন্দিরটির কেন্দ্রস্থলের উপরিভাগে নির্মিত হয়েছে অষ্টকোণ আকৃতির নয়নাভিরাম শীর্ষ চূড়াটি। **প্রায় ৬১ ফুট সুউচ্চ আগাগোড়া ল্যাটেরাইট স্টোনে নির্মিত এই মন্দিরটি মল্লভূমের পঞ্চরত্ন আকৃতির মন্দিরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ।** 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থের লেখক শ্রদ্ধেয় অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ-মন্দির প্রসঙ্গে উক্ত পুস্তকের ১৩৭ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন, **"গোকুলচাঁদের মন্দিরটিই খুব সম্ভবত বাঁকুড়া জেলার প্রাচীনতম 'বাংলা-মন্দির'।"**

শ্রীমন্দিরের পূর্ব দিকে ঠাকুরের ভোগরান্নার জন্য নির্মিত অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত রন্ধনশালার ১৯'৫" × ২৪' ভিত্তিভূমি আজও পরিলক্ষিত হয়। এছাড়া অগ্নিকোণে রয়েছে ঠাকুরের শস্যাগার অর্থাৎ কড়ুই বা মরাই-এর জন্য নির্মিত বেদীর ভগ্নাংশ। প্রবাদ আছে প্রতিদিন এক শলি (কুড়ি পাই) চালের অন্ন নিবেদন করা হত শ্রীবিগ্রহকে। উক্ত অন্নভোগ দেবকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণকে এবং অতিথি ও সাধু-মহন্তদের পরিবেশন করা হত পরম তৃপ্তিতে। শ্রীবিগ্রহের পূজা-অর্চনা, ভোগরান্না, ধৌত-কর্ম ইত্যাদির জন্য প্রয়োজনীয় জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে নৈঋত কোণে সাড়ে পাঁচফুট ব্যাস বিশিষ্ট একটি পাথরের কূপের ভগ্নাংশও পরিলক্ষিত হয়। আর মন্দির-চত্বরের অভ্যন্তরে যে জিনিসটি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেটি হল মন্দিরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ৪৪' × ২৭'৮" দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বিশিষ্ট উন্মুক্ত মঞ্চ সংলগ্ন কীর্তন-মঞ্চ বা অতিথিশালা বা সংগ্রহশালাটি।

পূর্ব-পশ্চিমে ৫৯'৯" দৈর্ঘ্য এবং উত্তর দক্ষিণে ৪৪'৯" প্রস্থ কীর্তনমঞ্চটি রাজার ঠাকুর গোকুলচাঁদের রাজ-আভিজাত্যকেই সূচিত করে। কীর্তনমঞ্চের প্রবেশদ্বার তিনটির মধ্যবর্তী ৯'৪" × ৭'৬" আয়তাকার স্তম্ভ দুটির দুই পাশের মূল দেওয়াল সংলগ্ন স্তম্ভ দুটি নিয়ে রচিত হয়েছে তিনটি বিস্তৃত প্রবেশদ্বার যেগুলির উপরিভাগের খিলানের প্রস্থ ৮'৪" করে। উত্তরমুখী এই সংকীর্তন-মেলার উত্তর দিকের দেওয়াল প্রস্থে ৯'৪" এবং উক্ত কীর্তন-মঞ্চের অভ্যন্তরভাগের উন্মুক্ত অংশের মাপ ২৫'২" × ৪১'২"। ভাবলে অবাক হতে হয় এরকম একটি উল্লেখযোগ্যভাবে উল্লেখ্য দৈর্ঘ্য, প্রস্থ বিশিষ্ট ছাদ রচিত হয়েছিল বিশাল বিশাল পাথরের খিলানের সাহায্যে, অধুনা অবশ্য ছাদ ধ্বসে পড়েছে। কীর্তন-মঞ্চের নির্মাণ পরিকল্পনাটিও অভিনব। কারণ উক্ত কীর্তন-মেলার অভ্যন্তরভাগে ঈশান, নৈঋত ও বায়ু কোণে এক একটি করে তিন তিনটি প্রকোষ্ঠ ছাড়াও অগ্নিকোণে রয়েছে কীর্তনমঞ্চের ছাদে ওঠার জন্য ধাপযুক্ত সিঁড়িপথ। আরও লক্ষণীয় কীর্তন-মঞ্চের দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে রয়েছে আলমারী ধাঁচের বৃহদাকার একটি কুলঙ্গি। উক্ত কুলঙ্গিতে দেব-দেবীর মূর্তি সংস্থাপিত ছিল বলে কথিত আছে।

গোকুলনগরের গোকুলচাঁদ মন্দিরটি সব দিক থেকেই বিস্ময়ের বিষয়। কয়েকটি বিশেষ জিনিস এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন প্রথমতঃ গোকুলচাঁদের মন্দির, মন্দিরের প্রাচীর, তুলসীমঞ্চ, কূপ, রন্ধনশালা, শস্যভাণ্ডার সব কিছুতেই শুধুমাত্র বাঁকুড়ার ল্যাটেরাইট পাথরের কাজ এবং পঙ্খের কাজ পরিলক্ষিত হয়। দ্বিতীয়তঃ এর শিল্পনৈপুণ্য

এবং বিশালত্ব। তৃতীয়তঃ পূর্ণাঙ্গমানের পরিকল্পনা। চতুর্থতঃ গোকুলচাঁদ ওরফে রাধাকৃষ্ণের মন্দিরে ভাগবতীয় চেতনার প্রভাব। পঞ্চমতঃ সংকীর্তন-মঞ্চটি স্থাপত্যবিদ্যায় এবং বিশালতায় অবিভক্ত বাংলার অদ্বিতীয় ভাস্কর্য রূপে চিহ্নিত। ষষ্ঠতঃ বৌদ্ধ, জৈন, শাক্ত এবং প্রাক্‌চৈতন্য বৈষ্ণবধর্মের সুসমন্বয়—যা মন্দিরটির প্রাচীনত্বের দাবিকে তাত্ত্বিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করে। সপ্তমতঃ বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দুধর্মের দেব-দেবীদের পারস্পরিক সহাবস্থান সনাতন হিন্দু ধর্মের ঔদার্যের পরিচয় বহন করে। বহন করে অন্য ধর্মের প্রতি মর্যাদা, সহানুভূতি এবং সহনশীলতার পরিচয়।

এ তো গেল শ্রীমন্দির ও শ্রীঅঙ্গনের বহিরঙ্গের কথা। এবার বলি মন্দির অভ্যন্তরে অবস্থিত অন্তরবিহারী ঠাকুর ঁ**গোকুলচাঁদের কথা**। গোকুলচাঁদ হলেন কষ্টিপাথরের কৃষ্ণ আর শ্রীরাধা হলেন অষ্টধাতু নির্মিতা। পাথর এবং ধাতু নির্মিত হলেও পাথর এবং ধাতুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই কিন্তু শ্রীরাধা এবং শ্রীরাধাবিলাসী ঁগোকুলচাঁদ। ধাতু ও পাথর নির্মিত শ্রীবিগ্রহদ্বয়ের প্রাণবন্ত ও সদাপ্রফুল্ল রূপ ভক্ত হৃদয়ে ভক্তিরসের জোয়ার বহিয়ে দেয় কোন এক সচ্চিদানন্দ সত্তার নেপথ্য উপস্থিতির অনুভবে। তাইতো দোল পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে হাজার হাজার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ও ভক্ত সমাবেশে মুখরিত হয়ে ওঠে ঁগোকুলচাঁদের শ্রীঅঙ্গন। সুগন্ধি ফুলের সৌরভের মতোই উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে চতুর্দিকে। হরিনাম সংকীর্তনে মুখরিত হয়ে ওঠে দশ দিক। মল্লভূমের ঈশ্বর-উপাসনার প্রাচীন ঐতিহ্যটি বস্তুবাদী বিংশ শতাব্দীর প্রান্ত সীমাতেও অপ্রতিহত রয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

ইতিহাসের স্মৃতি রোমন্থন করতে করতে মহারাজ চন্দ্র মল্লের হাত ধরে আমরা মনে মনে চলে গিয়েছিলাম বিষ্ণুপুর ছেড়ে গোকুলনগরে। এখন ফেরার পালা। কারণ বিষ্ণুপুরের রাজদরবারের দুর্গতোরণ বা পাথর দরজা যেন আমাদের ডাকছে বারংবার। **ডাকছে তার আত্মকথা শোনানোর জন্য। তার বুকের মধ্যে অতি সঙ্গোপনে সংরক্ষিত রয়েছে অনেক মর্মান্তিক যুদ্ধের কাহিনী। মৌনমুখর এই পাথর দরজা দুটি কি বলে শোনা যাক কান পেতে।**

অধ্যায়-৩০

পাথর-দরজাদ্বয়ের আত্মকথা

গোকুলনগর থেকে তোমরা এসে গেছ দেখছি। বড় ক্লান্ত, শ্রান্ত দেখাচ্ছে তোমাদের। এসো, এসো। ব'স, আমার কোলে ব'স। কোলে ব'সে ব'সেই শোন আমার কথা। আমার ডাক-নাম বা জনপ্রিয় নাম পাথর-দরজা বা গড় দরজা। আগাগোড়া বাঁকুড়ার মাকড়া পাথরে তৈরী আমার দেহ এবং আমার দেহটিকে একটি প্রবেশ-পথ হিসেবে ব্যবহার করার সুবাদেই আমার নাম পাথর-দরজা। আবার আমাকে একটি দুর্গ হিসেবেও কাজে লাগানো হত—এজন্যই আমার অপর নাম দুর্গতোরণ। দেহখানি পাথরের তৈরী বলে আমাকে নিষ্প্রাণ বা জড়বস্তু ভেবো না যেন। কারণ তোমাদের জগদীশচন্দ্র বসু তো প্রমাণ করেছেন জড় বস্তু বলে পৃথিবীতে কিছু নেই। পাথরের তৈরী হলেও প্রাণস্পন্দনে আমি ভরপুর। কথা বলতে পারি তোমাদের মতোই। ব্যথা, বেদনা ও আনন্দ

অনুভব করি। আবেগ, অনুরাগ সবই আছে আমার। আছে একটি দরদী মন, সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয়। তাইতো তোমাদের কাছে পেয়ে কেমন যেন আবেগ-প্রবণ হয়ে পড়েছি। কেমন যেন বলতে ইচ্ছে করছে নিজের কথা। বয়স হয়েছে প্রায় সাড়ে তিনশত বছর। স্মৃতিভ্রংশ হয়েছে অল্পবিস্তর। তথাপি অনেক কথাই মনে আছে এখনও। শোন সেসব কথা। মন দিয়ে শোন। নতুবা দুঃখ পাব আমি।

আমার অদূরেই রয়েছে ছোট আকারের আর একটি প্রবেশ-তোরণ। ও আকারেও ছোট, বয়সেও ছোট। তাই ওর নাম **ছোট পাথর-দরজা**। 'আর্কিয়লজিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া' আমাদের কোষ্ঠীতে যা লিখেছে তার বিষয়বস্তু হল,—সম্ভবতঃ ৫২তম মল্লরাজা বীর সিংহ্ আমাদের জনক, জন্মলগ্ন সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে। আবার 'চিত্রে ও গল্পে বিষ্ণুপুর' গ্রন্থের গ্রন্থকার বিভূতিভূষণ ঘটক বীর হাম্বীরকেই আমাদের জনক রূপে উল্লেখ করেছেন। আমাদের জন্মলগ্ন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে যথেষ্ট। বয়সের ভারে 'আলঝাইমার' (Alzhimar) রোগে আক্রান্ত হয়ে অত দূর অতীতের কথা এখন আর মনে নেই আমাদেরও। তাই আমাদের জন্মলগ্ন রয়ে গেল চির-রহস্যের কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হয়ে।

জন্মলগ্নের কথা বাদ দিয়ে এখন বলি আমাদের আকৃতি-প্রকৃতির কথা। উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বিভাবে অবস্থিত ৭১ ফুট ৯ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, ৩৮ ফুট ৯ ইঞ্চি প্রস্থ এবং প্রায় ৩৫ ফুট উচ্চ আয়তাকার আমার শরীরটি বর্তমানে মল্লরাজাদের পুরাকীর্তির এক অন্যতম নিদর্শন।

দেহটি আমার পরস্পর সংযুক্ত দুটি স্তবকে নির্মিত। প্রথম স্তবকটি ৩৮ ফুট ৯ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং ২৬ ফুট ৮ ইঞ্চি প্রস্থ বিশিষ্ট আয়তাকার একটি সুউচ্চ ছাদের আদলে তৈরী। এটির উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে রয়েছে ৯ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রস্থ, প্রায় ১৫ ফুট উচ্চ ঈষৎ পত্রাকৃতির খিলান প্রবেশ পথ। পক্ষান্তরে এটির অভ্যন্তরভাগের পূর্ব ও পশ্চিমে রয়েছে প্রায় অনুরূপ উচ্চ, ১০ ফুট ৮ ইঞ্চি প্রস্থ এবং ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি গভীরতা বিশিষ্ট বিশাল দরজার আকৃতির বেদীযুক্ত কুলঙ্গি। সাধারণ অবস্থায় এই কুলঙ্গিদ্বয়ে থাকত দ্বাররক্ষী, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে থাকত সশস্ত্র সৈন্য-সামন্ত। আমার অবয়বের চারপাশের দেওয়াল এবং পূর্বোক্ত চারটি পত্রাকৃতির খিলানের উপরিভাগে নির্মিত হয়েছে ছাদ। ছাদটির নীচের দিক বৃত্তাকার গম্বুজের অনুরূপ। উপরিভাগ প্রায় সমতল। উপরের ছাদের মধ্যস্থলে আবার প্রস্তুত করা হয়েছে ১৩ ফুট বর্গাকার, প্রায় ৪ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চ, ছ'টি সিঁড়ি যুক্ত আর একটি ছাদ বা বেদী। নীচের থেকে এই অংশটি নজরে পড়বে না তোমাদের।

এই বৃহদাকার প্রধান ছাদটির উর্ধ্বাংশের চতুষ্পার্শ্বের প্রান্তভাগে পরস্পর অসংলগ্ন অবস্থায় উল্টো 'ইউ' আকৃতির খোদাই-পাথর বসিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে ছাদের আড়ালি-দেওয়াল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত সমন্বিত 'ইউ' আকৃতির প্রস্তর-দেওয়ালের অভ্যন্তরভাগে নিজেদের সুরক্ষিত রেখে গর্তগুলির ভেতর দিয়ে তীরন্দাজ ও গোলন্দাজ সৈন্যেরা শত্রুপক্ষের সৈন্যদের লক্ষ্য করে ছুঁড়ত বিষাক্ত তীর এবং গোলাগুলি।

স্বীয় দেহের দক্ষিণাংশের বিবরণের পর আসা যাক উত্তরাংশের কথাতে। দক্ষিণাংশের তুলনায় স্বল্পোচ্চ উত্তরাংশটি ৯ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রবেশপথ বিশিষ্ট একটি দ্বিতল ছাদের সদৃশ। এই অংশটির প্রবেশপথের দু'পাশেই রয়েছে চতুর্দিকে দেওয়ালাবৃত ৬ ফুট উচ্চতার ছাদ বিশিষ্ট দীর্ঘায়ত একটি করে কক্ষ। কক্ষ দুটির অভ্যন্তরভাগে উত্তর দিকে রয়েছে আর

একটি করে উপকক্ষ। উপকক্ষ দুটিতে অস্ত্রশস্ত্র মজুত রাখা হত। দীর্ঘায়ত এই কক্ষ দুটিতে ঢোকার জন্য ভিতরের ও বাইরের দেওয়ালে আছে দুটি করে মোট চারটি প্রবেশদ্বার। প্রবেশপথের দুপাশের দুই দেওয়ালের প্রত্যেকটিতে ২৭টি করে ৫৪ টি ছিদ্র রয়েছে। কক্ষদ্বয়ের অভ্যন্তরভাগে লুকিয়ে থাকা মল্লসৈন্যগণ ঐসব ছিদ্র-পথে বিষাক্ত তীর এবং গুলি ছুঁড়ে নিধন করত আগ্রাসী শত্রুসৈন্যদের। প্রবেশ-তোরণের উত্তর দেওয়ালে নিবদ্ধ দুই পাশের বিভিন্ন অ্যাংগেলের ১২টি ছিদ্রও একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হ'ত। পূর্বোক্ত কক্ষদ্বয়ের উপর-তলা ত্রিখিলান সজ্জিত বারান্দা শোভিত ছাদের আদলে তৈরী। বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলে এখানে এবং এর উপরের ছাদেও সৈন্য মোতায়েন করা হত বিপুল সংখ্যায়। এ প্রসঙ্গে বলি, প্রথম তলার ছাদের অংশবিশেষ অবশিষ্ট থাকলেও উপরের ছাদ পুরোপুরি ধ্বসে গিয়ে হয়ে গেছে নিশ্চিহ্ন।

আমার দেহের উত্তর দিকের প্রবেশপথের দুপাশে রয়েছে দুটি বেদী। এই বেদীতে নিযুক্ত থাকত দ্বাররক্ষীগণ। ১৫ ফুট ৬ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, ৪ ফুট ৫ ইঞ্চি প্রস্থ এবং ৪ ফুট উচ্চ বেদী দ্বয়, বেদীদ্বয়ের প্রান্তভাগ-সংলগ্ন দেওয়াল-গাত্রের দু'পাশের দু'টি স্তম্ভ এবং প্রবেশ দ্বারের উর্ধ্বে ঈষৎবক্র ধনুরাকৃতির দেওয়াল আমার দেহটিকে করেছে শ্রীমণ্ডিত। সুপরিকল্পিতভাবে নির্মিত, ছিমছাম্ সৌন্দর্যে ভরা আমার এই পাথরের দেহটি যেন আজ একটি দর্শনীয় পুরাকীর্তি, গবেষকদের গবেষণার বস্তু।

অতীতে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশদ্বারে লাগানো ছিল বেশ শক্তপোক্ত এবং বৃহদাকার দু'জোড়া কপাট। রাত্রি-নিশীথে এবং শত্রু আক্রমণের আশঙ্কায় বন্ধ করে দেওয়া হত প্রবেশদ্বার দ্বয়। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি তার উত্তর দিকে আমারই পদপ্রান্তে ছিল সুগভীর পরিখা। পরিখার ক্ষীণ অস্তিত্ব এখনও বিদ্যমান। পরিখার উপর ছিল কাঠের সেতুপথ। সেতুপথের সংযোগসূত্র স্থাপনকারী মজবুত পাটাতনটি ছিল স্থানান্তরযোগ্য। শত্রু আক্রমণের আশঙ্কা দেখা দিলে উপরের পাটাতন সরিয়ে নিয়ে প্রবেশপথের যোগসূত্র ছিন্ন করা হত। এ ছাড়া আমার দেহের পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল সুউচ্চ মাটির টিলা বা পাড় বা পাহাড়। আজও তার স্মৃতি বহন করছে বর্তমানের স্বল্পোচ্চ টিলা। দুর্গ এবং রাজবাড়ি ঘিরে পরপর অনুরূপ সাতটি পরিখা এবং পরিখা-সংলগ্ন টিলা ছিল। এইসব টিলাতে সারিবদ্ধভাবে সাজানো থাকত অসংখ্য কামান। আমাদের রাজবংশের ২২ শত কামান ছিল, লোকে বলে ২৭ শত। আমাদের দুর্দিনে ব্রিটিশ আমলে শত শত কামান নাকি ওয়াগন বোঝাই করে নিয়ে গেছে বৃটিশ সরকার। ঐ সময় কামান অপহরণের ভয়ে বিষ্ণুপুরের যত্রতত্র মাটির নীচে পুঁতে দেওয়া হয়েছিল অনেকানেক কামান। পুনরুদ্ধার করা হয়নি আর।

পরিখার উত্তর দিকে রয়েছে এক প্রস্থ উঁচু টিলা। 'মূর্চার পাহাড়' নামে আখ্যায়িত ঐ টিলার উপরেই মহাষ্টমীর সন্ধিপূজার সন্ধিক্ষণে কামান দাগা হয় আজও। সেদিন এখানে হাজার হাজার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার সমাবেশ হয় রোমহর্ষক সে দৃশ্য দেখার জন্য। বাসের ছাদে বাম্পারে মানুষ ঝোলার মতোই সেদিনও আমার সর্বাঙ্গে উঠে পড়ে মানুষ। রাজবাড়ির এই কামানের তোপধ্বনি শুনে বিষ্ণুপুরের সমস্ত দুর্গামণ্ডপে সন্ধিপূজা সুসম্পন্ন হয়। তোপধ্বনি শোনার পরই সরষে দানার মতো ছড়িয়ে পড়া মানুষগুলো ছেড়ে চলে যায় আমায়। তখন বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগে আমার। মন খারাপ হয় ভীষণ। সকলের জন্যই মন খারাপ হয় আমার। বিশেষ করে রাজা রঘুনাথের কথা ভেবে গুমরে

গুম্‌রে কেঁদে উঠি আমি। লালবাঈ-এর সাথে অবৈধ প্রণয়ের ফলে সতী-সাধ্বী চন্দ্রপ্রভার হাতে তীরবিদ্ধ হয়ে অকালমৃত্যু হয় তাঁর। শ্মশান-যাত্রার সময় রঘুনাথের মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল আমার দেহপথের মধ্য দিয়ে। শবাধারের অনুগামী ছিল স্বয়ং পতিঘাতিনী সতী চন্দ্রপ্রভা। সতী হয়েছিল শোক সন্তপ্তা চন্দ্রপ্রভা। বড় বেদনা-বিধুর সে দৃশ্য। দূর থেকে আমি দেখেছি সে মর্মান্তিক দৃশ্য। দেখেছি রাজবংশের উত্থান-পতন। দেখেছি রাজা চৈতন্য সিংহের দুর্দশা। ভাবতে মন খারাপ হয় আমার। কিন্তু হয় না শুধু একটা লোকের জন্য। নাম তাঁর পদ্দল খাঁ—বেইমান, বিশ্বাসঘাতক, নিমকহারাম।

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। মহারাজ চৈতন্য সিংহদেব তখন বিষ্ণুপুরের রাজ-সিংহাসনে। চৈতন্য সিংহের সিংহাসন লাভের পর থেকেই তাঁর পিতৃব্যপুত্র দামোদর সিংহ রাজত্বের অর্ধেক দাবী করে শুরু করে গৃহবিবাদ। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সে মারাঠা দস্যু রঘুজী ভোঁসলের সঙ্গে গোপনে হাত মিলিয়েছে। ব্যর্থ হয়ে সিরাজদ্দৌলার শরণাপন্ন হয়েছে। সেখানেও ব্যর্থ হয়ে হাত মিলিয়েছে মীরজাফরের সাথে। মীরজাফরের বাহিনী নিয়ে চৈতন্য সিংহের অনুপস্থিতিতে অতর্কিতে আক্রমণ করেছে বিষ্ণুপুর। বিনা বাধায় নগরে প্রবেশ করে বিষ্ণুপুরের রাজদুর্গে প্রবেশ করার চেষ্টা করতেই নবাবী ফৌজের সাথে বিষ্ণুপুরের দুর্গরক্ষী বাহিনীর শুরু হয়ে যায় তুমুল যুদ্ধ। আমার ছাদে পেটে লুকিয়ে থাকা মল্লসৈন্যদের অবিরাম গোলাগুলি বর্ষণে নবাবী-ফৌজের অবস্থা হয় খুবই শোচনীয়। নিরুপায় দামোদর সিংহ তখন ভারপ্রাপ্ত সেনানায়ক পদ্দল খাঁকে অগাধ উৎকোচের প্রলোভন দেখিয়ে খোলা করায় দুর্গদ্বার। দুর্গমধ্যে ঢুকে পড়ে নবাবী ফৌজ। বিজয়ী দামোদর সিংহ সাময়িকভাবে জয় করে নেন বিষ্ণুপুরের সিংহাসন। আত্মরক্ষার্থে চৈতন্য সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনমোহন সিংহ সপরিবারে পালিয়ে যান বিষ্ণুপুরের পূর্ব দিকে অবস্থিত কুচিয়াকোল দুর্গে। লোভী পদ্দল খাঁ দামোদর সিংহের কাছে ধন-রত্ন উৎকোচ চাইতেই ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে তার ছিন্নমস্তক। কথায় বলে, 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'। শেষমেষ তাই হয়েছিল বিশ্বাসঘাতক পদ্দল খাঁর। আমাদের রাজবংশের সেই শোচনীয় দুরবস্থা দেখে সত্য সত্যই সেদিন পাথর বনে গিয়েছিলাম আমি। তাইতো আমি পাথর দরজা। নতুবা নই।

আমার কথা অনেক শোনালাম। আর না। এবার এসো। আবার এসো। এখন যাও আমার অনুজ 'ছোট পাথর দরজা'র কাছে—ও কি বলে শোন।

আমার নাম **'ছোট পাথর দরজা'**। ভাল কথায় বলে **'ক্ষুদ্র দুর্গতোরণ'** বা **'ক্ষুদ্র প্রবেশ-তোরণ'**। আমাকে পাথর দরজা বলা হলেও আগাগোড়া পাথর দিয়ে তৈরী নয় আমার দেহ। আমার নিম্নাংশ মাকড়া পাথর এবং ঊর্ধ্বাংশ ইষ্টক নির্মিত। আমার গায়ে ছিল পঙ্খের পলেস্তারার সাদা ধব্‌ধবে পোশাক। সে পোশাক এখন খসে পড়েছে টুকরো টুকরো হয়ে। ২৩ ফুট ৮ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য, ১২ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রস্থ এবং প্রায় ২৫ ফুট উচ্চ আমার দেহের মধ্যভাগে রয়েছে ৯ ফুট ৭ ইঞ্চি প্রস্থ প্রবেশদ্বার। এই প্রবেশপথ দিয়েই আমি অতিথি অভ্যাগতদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই। ঈশানকোণের স্তম্ভগাত্রের অভ্যন্তরভাগে রয়েছে আমার ছাদে ওঠার সিঁড়িপথ। ছাদের মধ্যস্থলে রয়েছে চারচালা আকৃতির একটি আয়তাকার স্বল্পোচ্চ গম্বুজ ছাদ। আমার অগ্রজ বৃহৎ দুর্গতোরণটির অনুকরণে ছাদের দুপাশের উল্টো 'ইউ' আকৃতির আড়ালি প্রস্তরগুলিতেও তীর এবং গুলি ছোড়ার জন্য রাখা হয়েছে ছিদ্রপথ।

আকৃতিতে ছোট-খাটো, গড়ন সাদামাটা—এজন্য আমার আকর্ষণ শক্তি কম। আমার

দিকে এক পলক তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নেয় প্রায় সকলেই। কেউ আমার কথা শুনতে চায় না। কাছে আসে না। তোমরা যে এলে, দু'চার কথা শুনলে—এটা আমার খুব ভাল লাগল। বছরে বছরে এসো। ভাল থেকো।

অধ্যায়-৩১

রাজকাহিনী—৭

বীর মল্ল (১৫০১-১৫৫৪ খৃঃ)

পাথর-দরজা দ্বয়কে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে চলুন আপাততঃ আমরা গিয়ে বসি মূর্চার পাহাড়ের উপরের ঠিক সেই স্থানটিতে, যে স্থানটি থেকে বছরে বছরে মহাষ্টমীর সন্ধি-পূজা উপলক্ষ্যে গর্জে ওঠে কামান। মাখনের মতো মোলায়েম পৌষের রোদ মেখে হাত-পা ছড়িয়ে ওখানে বসে বসে শুনি একের পর এক রাজকাহিনী। ইতিমধ্যে আমরা বিষ্ণুপুরের ৪৬তম রাজা চন্দ্র মল্লের কথা শুনেছি। এখন শুনব বিষ্ণুপুরের ৪৭তম রাজা **বীর মল্ল**, ৪৮তম রাজা **ধাড়ী মল্ল**, ৪৯তম রাজা **হাম্বীর মল্ল**, ৫০তম রাজা **ধাড়ী হাম্বীর দেব** ও ৫১তম রাজা **রঘুনাথ মল্ল দেবের** কথা। ক্রম অনুসারে প্রথমেই বলি বীর মল্লের কথা। বীর মল্লের রাজত্বকাল ১৫০১-১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দ। মহারাজ বীর মল্ল প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণ প্রায় নীরব, কিন্তু সরব হয়েছেন গবেষক ঁমাণিকলাল সিংহ। বীর মল্লের কথা বলতে গেলে তাই ঁমাণিক বাবুর কথা এসেই যায়, কারণ বীর মল্লের জীবনালেখ্যের রসদ যুগিয়েছেন তিনি।

তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি-কলাপের মধ্যে রয়েছে বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর নদের তীরে সুর্পানগর গ্রামে বীরবাঁধ পুষ্করিণী খনন। উক্ত নদীর বিপরীত তীরে বাঁকি গ্রাম সংলগ্ন মৌজায় ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে গোপীনাথ বিগ্রহের দেউল নির্মাণ-পূর্বক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, পরবর্তীকালে বাঁকুড়া জেলারই বেলাটুকরী, পিংরুই গ্রামগুলির নিকটে অভিনব গঠনশৈলীর ইটের পীড়া দেউল নির্মাণ-পূর্বক শ্যামচাঁদ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। বাঁকুড়ার বড়জোড়া থানার ঘুটগোড়িয়া গ্রামে উড়িষ্যার খিচিং স্থাপত্যশৈলীর রেখ-দেউল নির্মাণ ও শ্যামচাঁদ নামের আর এক বিগ্রহ স্থাপন এবং পূর্বোক্ত বড়জোড়া থানারই জগন্নাথপুর গ্রামে রত্নেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীমন্দির নির্মাণ।

মহারাজ বীর মল্লের সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় কীর্তি হল বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন দ্বারকেশ্বর নদের উত্তর পাড়ে একেশ্বর শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা এবং শ্রীমন্দির নির্মাণ। উক্ত শিব-মন্দির নির্মাণের ইতিহাসটি নিম্নরূপ।

মল্লাধিপতি বীর মল্ল আক্রমণ করেছেন সামন্তভূম। সামন্তভূমের রাজা তখন উত্তর হামির (২য়)। দুই রাজার মধ্যে ঘোরতর যুদ্ধ চলে দীর্ঘকাল এবং পরিশেষে তাঁরা রণক্লান্ত অবস্থায় সন্ধি বা একতা সূত্রে আবদ্ধ হন। এই সন্ধি স্থাপনের প্রতীক স্বরূপ মল্লভূম ও সামন্তভূমের সীমানা সুনির্দিষ্ট করে বর্তমান বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে একটি শিব-মন্দির নির্মাণ করা হয়। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ধর্মপ্রাণ রাজা বীর মল্ল উক্ত শিবমন্দির নির্মাণ করান এবং যেহেতু এই দেব-বিগ্রহকে কেন্দ্র করে উভয় রাজা মিলন বা একতা বন্ধনে আবদ্ধ হন, সেহেতু উক্ত শিবলিঙ্গের নাম রাখা হয় একেশ্বর শিব। একতা + ঈশ্বর এতদর্থে

একেশ্বর। *"একেশ্বর শিবের নিত্য পূজা এবং উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহার্থে বীরমল্ল বাঁকুড়া, একেশ্বর এবং বেলগড্যা নামক তিনটি মৌজা উৎসর্গ করেন। উক্ত মৌজাগুলি* হইতে তৎকালে ৩৭২ টাকা ৮ আনা আদায় হইত।" (পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, পৃঃ— ১৫১)। **বর্তমানে এটি বাঁকুড়া জেলার একটি প্রসিদ্ধ শৈবতীর্থে সমুত্তীর্ণ হয়েছে। হাজার হাজার পুণ্যার্থী ভক্তগণের সমাগম হয় একেশ্বর শিবমন্দির প্রাঙ্গণে।**

অবশ্য এ প্রসঙ্গে 'পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া' পুস্তকের লেখক তরুণদেব ভট্টাচার্য তাঁর পুস্তকের ১০৩ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন, "বীর মল্লের সময় একেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে। মন্দিরের গঠন ও প্রাচীনত্ব জনশ্রুতি সমর্থন করে না।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি বীর মল্লের রাজত্বকাল ফকির নারায়ণ কর্মকারের মতে ১৫০১-১৫৫৪ খৃষ্টাব্দ, আর মাণিকলাল সিংহের লেখা থেকে বোঝা যায় তাঁর রাজত্বকাল ন্যূনতম ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৫৮১ খৃষ্টাব্দ। এই সময়ের পেক্ষাপটে মাণিক বাবু বীর মল্ল সম্বন্ধে যে তথ্য পরিবেশন করেছেন তা অভিনব। তিনি লিখেছেন, "বীর মল্লের আমলে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কাল অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ। এই মধ্যবর্তী কালের মধ্যেই শেরশাহ এবং তাঁহার বংশধরগণের পতন ঘটিয়াছে। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে সুলেমান কর্‌রানি, কালাপাহাড় প্রমুখ প্রবল পরাক্রান্ত আফগান নায়কদের পুনঃপুনঃ আক্রমণে রাঢ়, বঙ্গ, উড়িষ্যা সর্বদা ত্রস্ত। সমগ্র উড়িষ্যা সুলেমান কর্‌রানি জয় করিয়াছেন ; কালাপাহাড় তথা কালিদাস গজ্‌দানী হিন্দু-মন্দির, হিন্দু-দেবদেবীর বিগ্রহ ভাঙিয়া তছনছ করিতেছেন। এ হেন চরম বিপর্যয়ের মুখে বীর মল্ল যে টিকিয়া ছিলেন এবং তাঁহার পূর্ব-পুরুষদের প্রতিষ্ঠিত দেব-বিগ্রহগুলি রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। **কিন্তু তিনি যে আত্মরক্ষা করিতে এবং দেব-দেবীগুলিকে রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় তাঁহার আমলে নির্মিত ঘুটগড়িয়া, একেশ্বর, গোপীনাথপুর, জগন্নাথপুর, বেলাটুকরীর দেউলগুলি হইতে।**

সেই দুর্যোগকালে বাঁকুড়া জেলার পূর্বদিকে অবস্থিত ইন্দাস, পাত্রসায়ের, কোতুলপুর, জয়পুর, ইত্যাদি থানাগুলির উপর যে প্রবল ঝড় বহিয়া গিয়াছিল তাহা স্পষ্ট বোঝা যায় জয়পুর থানার শলদা গ্রামের অগণিত দেবালয়ের ধ্বংসস্তূপ এবং দেবদেবী মূর্তিগুলির ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া।....

কথিত আছে যে, ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে বীর মল্ল সুনিবিড় অরণ্যের অন্তরালে তাঁহার বনদুর্গ বিষ্ণুপুরের পত্তন করেন। এই অরণ্যদুর্গে মল্লরাজধানী স্থানান্তরিত হওয়ার পর ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে দায়ুদ খাঁ একবার মল্লভূম আক্রমণ করেন, কিন্তু জয় করিতে পারেন নাই। বিষ্ণুপুর বনদুর্গের দুই মাইল উত্তরে বিড়াই নদীর তীরে এই যুদ্ধে দায়ুদ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন। মল্লরাজাদের এই বিজয় কাহিনী অসম্ভব নয়।.... ইহারই অনতিকাল পরে ১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে, ১২ই জুলাই-এর রাজমহলের যুদ্ধে রাজা টোডার মল্ল এবং **খান-ই-খানানের** দ্বারা হতভাগ্য দায়ুদ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত এবং নিহত হন।

বীর মল্ল সুদীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তিনি ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর গড়ের অভ্যন্তরে **তাঁহাদের কুলদেবতা অনন্তবিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা করেন। এই অনন্তবিষ্ণুর নামানুসারেই মল্লরাজাদের নবগঠিত বনদুর্গ বিষ্ণুপুর নামে অভিহিত হয়। উক্ত অনন্তবিষ্ণু ও ইন্দ্রধ্বজ পূজার জন্য বীর মল্ল অনন্তডিহি, চেঁচুড়, রাধাশ্যামপুর, ঘুগিমুড়া, চোরমাসি, মৌজাগুলি প্রদান করেন।" (পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, পৃঃ—১৫৩-১৫৫)**

শ্রদ্ধেয় মাণিক বাবু বীর মল্লের আমলে বিষ্ণুপুরে বনদুর্গ স্থাপনের যে তথ্য পরিবেশন

করেছেন তা কিন্তু বিষ্ণুপুরের তথা মল্লভূমের প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসের সাথে আদৌ মেলে না। কারণ বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল ১৯তম রাজা জগৎ মল্লের আমলে ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে।

বীর মল্লের দেহাবসানের পর রাজা হন তাঁর জ্যেষ্টপুত্র **ধাড়ী মল্ল**। ধাড়ী মল্লের কথা আলোচনার পূর্বে আর একটি কথা বলে নিই সংক্ষেপে। সেটি হল, মল্লভূমের মল্লরাজাদের মতোই মল্লরাজ্যের প্রজাসাধারণ এবং রাজকর্মচারীগণও মন্দির ও দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছন। যেমন বীর মল্লের প্রধানমন্ত্রী ইছেরিয়া গ্রামনিবাসী অনন্তরাম মহাপাত্রের উত্তর পুরুষ **রামায়ণ মহাপাত্র** রামমন্দির নির্মাণ পূর্বক রামবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রগাঢ় রামভক্তির প্রাবল্য হেতু তাঁদের বংশধরদের মধ্যে রাম নামের ছড়াছড়ি। যেমন— রামচরণ, রামনাথ, রামকুমার, রামশঙ্কর, রামমোহন, রামকান্ত, রামবিষ্ণু, রামহরি, রামানুজ, রামগোবিন্দ, গোবিন্দরাম, হরেরাম, শিবরাম, সীতারাম, শ্রীরাম প্রভৃতি। রাম নাম প্রসঙ্গে ছেদ বসিয়ে এবার প্রসঙ্গ মহারাজ **ধাড়ী মল্ল**।

অধ্যায়-৩২

• রাজকাহিনী—৮

ধাড়ী মল্ল (১৫৫৪-১৫৬৫ খৃঃ)

অনুসন্ধিৎসু পর্যটকবৃন্দ, বিষ্ণুপুর-প্রেমিক ভ্রমণসঙ্গীগণ এযাবৎ আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি, বিষ্ণুপুরে যে অধ্যাত্মচেতনার মাধুর্য-মণ্ডিত ভাবধারাটি প্রবাহিত হয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে তার শুভ সূচনা হয় মা দণ্ডেশ্বরীর পূজা-অর্চনার মধ্য দিয়ে অর্থাৎ শক্তি উপাসনার মাধ্যমে। পরবর্তীকালে উক্ত ভাবধারাটির সাথে মিলে মিশে একাকার হয়েছে বিষ্ণু উপাসনা;—এসেছেন অনন্তদেব শালগ্রাম শিলা অর্থাৎ বিষ্ণু। শক্তি উপাসনার ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে এসেছেন মল্লেশ্বরী মা মৃন্ময়ী। রাজা পৃথ্বীমল্লের *ষাঁড়েশ্বর ও *শৈলেশ্বর শিবমন্দির নির্মাণ, শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা ও পূজা-অর্চনার মাধ্যমে এল শৈব-উপাসনা। আবার রাজা চন্দ্রমল্লের গোকুলচাঁদ প্রীতির প্রাবল্যে কৃষ্ণ-বিষ্ণু প্রেমের সূচনা হল মল্লরাজ্যের মৌলিক অধ্যাত্ম-ভাবধারাতে।

পরম বৈষ্ণব শ্রীনিবাস আচার্যের মন্ত্রশিষ্য হাম্বীর মল্ল ওরফে বীর হাম্বীর বিষ্ণুপুরকে দ্বিতীয় বৃন্দাবনে রূপান্তরিত করার যে দিব্য প্রেরণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তার বীজ কিন্তু প্রোথিত করেছিলেন মহারাজ চন্দ্র মল্ল—সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। **এদিক থেকে প্রায় চন্দ্রমার মতোই স্নিগ্ধ, দিব্যভাবে সমৃদ্ধ মহারাজ চন্দ্র মল্ল নিশ্চয়ই নমস্য এবং চিরস্মরণীয়।**

চন্দ্র মল্লের দেহাবসানের পর তাঁর পুত্র বীর মল্লও বৈষ্ণব ভাবধারায় ভাবিত হয়ে ১টি গোপীনাথ বিগ্রহ, ২টি শ্যামচাঁদ বিগ্রহ এবং কুলদেবতা অনন্ত-বিষ্ণুরও প্রতিষ্ঠা করেন। আবার শৈবসাধনায় আপ্লুত হয়ে রত্নেশ্বর শিবলিঙ্গ এবং এক্তেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং তাঁর মধ্যে বৈষ্ণব এবং শৈব ভাবধারার সুসমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। বীর মল্লের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ধাড়ী মল্লের রাজ্যাভিষেক হয় ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। **ধাড়ী মল্ল, বীড়া মল্ল** এবং **বায়ু মল্ল** নামেও পরিচিত ছিলেন। এখন আমরা ফিরে যাব ধাড়ী মল্লের রাজত্বকালে।

আনুষঙ্গিকভাবেই বলি, এ যাবৎ আমি আপনাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছি শুধুমাত্র মল্লভূমের ইতিহাসের পাতায়। দেখেছি মল্লরাজ্যের কয়েকটি দেব-মন্দির, দেব-বিগ্রহ, লাল বাঁধ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রভৃতি। **এক্ষণে প্রয়োজনের খাতিরে আপনাদের দৃষ্টিসীমাকে তৎকালীন ভারতবর্ষের অস্বস্তিকর রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে প্রসারিত করব মাঝে মধ্যে।**

মোগল সম্রাট হুমায়ুন গত হয়েছেন। দিল্লীর সিংহাসনে শোভা পাচ্ছেন সম্রাট আকবর শাহ। আকবর শাহ রাজ্য শাসনের সুবিধার জন্য তার বিশাল সাম্রাজ্যকে ভাগ করেন পনেরটি 'সুবা'তে। বাদশাহের প্রতিনিধি হয়ে এক একটি সুবা শাসন করতেন এক একজন 'নাজিম' বা 'সিপাহশালার'। বাংলা, উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় একটি সুবা। এই সুবার তৎকালীন নাজিম-ই মল্লভূমকে মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন এবং মল্লভূমের বার্ষিক রাজস্ব ধার্য করেন এক লক্ষ সাত হাজার মুদ্রা, মতান্তরে এক লক্ষ আশি হাজার টাকা।

হঠকারিতা না করে ধাড়ী মল্ল নাজিমের ঔদ্ধত্য মেনে নেন নামে মাত্র কিন্তু রাজস্ব আদায় দেননি কোনদিন। আবার দিলেও কৌশলে তা ফিরিয়ে নিতেন। বিষ্ণুপুর থেকে রাজকর আদায় করে বাদশাহের সিপাহী-শান্ত্রীর দল যখন পাড়ি জমাতেন তখন রাজা ধাড়ীমল্ল তাঁর ছদ্মবেশী সৈন্য-সামন্ত নিয়ে তা লুট করিয়ে আনতেন নিজ কোষাগারে।

কৌশলে কর ফাঁকি দিলেও পরাধীনতার গ্লানিতে তিনি বড়ই মর্মাহত হন। ভিতরে ভিতরে চাপা ক্রোধে গর্জাতে থাকেন। সাজো সাজো রব পড়ে গেল রাজ-আদেশে। প্রভূত পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ হল রণসজ্জা ও অস্ত্রনির্মাণ খাতে। তৈরী হল অগণিত বন্দুক, কামান গোলাগুলি আর ভয়ঙ্কর সব আগ্নেয়াস্ত্র।

ধাড়ী মল্ল ছিলেন অত্যন্ত চতুর এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন রাজা। আগামী দিনে মোগল শাসন এবং মোগল আক্রমণের ভয়াবহতার কথা চিন্তা করেই তিনি তাঁর ২৫/২৬ বছরের রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরকে একটি মহাশক্তিশালী সামরিক দুর্গে রূপায়িত করার প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং সফলকামও হয়েছিলেন পুরোমাত্রায়। **মল্লরাজাদের মধ্যে তিনিই প্রথম কামান, বন্দুক এবং আগ্নেয়াস্ত্রের প্রচলন করেন মল্লভূমের মান-ইজ্জত রক্ষার তাগিদে।** বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি খোলামেলা জায়গায় যেখানে কামান ঢালা হত সেই জায়গাটি ধাড়ী মল্লের স্মৃতি বহন করছে আজও। 'কামান ঢালা' স্থানটি ইতিমধ্যেই আমি আপনাদের দেখিয়েছি। ধাড়ী মল্লের পর বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর যোগ্যপুত্র **হাম্বীর মল্ল**।

অধ্যায়-৩৩

রাজকাহিনী—৯

হাম্বীর মল্ল দেব বা বীর হাম্বীর দেব (১৫৬৫-১৬২০ খৃঃ)

কর্মের গরিমায়, ধর্মের মহিমায় মহিমান্বিত ছিলেন মহারাজ হাম্বীর মল্ল। কর্ম ও ধর্ম, ঐশ্বর্য ও পরমৈশ্বর্য, জাগতিক বিষয় বুদ্ধি এবং পারমার্থিক অপার্থিব ঐশী শক্তি—এসব বিপরীতধর্মী গুণাবলীর সুষমায় শ্রীমণ্ডিত নৃপতি হাম্বীর মল্ল হলেন মল্লভূমের প্রাণ-প্রদীপ স্বরূপ। **শিশু যেমন মাতৃক্রোড়ে নিরাপদ, হাম্বীর মল্লের ছত্র-ছায়ায় বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমও ছিল তদনুরূপ নিরাপদ। অবোধ শিশুর যা কিছু দাবি-দাওয়া, চাওয়া-পাওয়া তার**

সিংহভাগই ঘিরে থাকে মমতাময়ী মাকে কেন্দ্র করে। অনুরূপভাবে মল্লভূমের যা কিছু দাবি-দাওয়া, চাওয়া-পাওয়া তার সবই যেন পুষিয়ে দিয়েছেন উদারচেতা অকৃপণহস্ত রাজা হাম্বীর মল্ল। এর জন্য তিনি কলঙ্ক মেখেছেন গায়ে, বন্দী হয়েছেন কারাগারে, হয়েছেন রাজর্ষি এবং জীবন-সায়াহ্নে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। তাই কখনো তিনি 'ডাকাত রাজা', কখনো যুদ্ধবাজ রণবীর, কখনো বা ধর্মাশোকের মতোই ধর্মবীর কিংবা ভক্তবর 'শ্রীচৈতন্য দাস'। প্রিজমের আলোক বিচ্ছুরণে বহুবর্ণে রঞ্জিত আলোক রেখার মতোই বহুগুণে গুণান্বিত, বহুরূপে উদ্ভাসিত বহুরূপীর মতোই বিচিত্র তাঁর চরিত্র।

এসব চারিত্রিক গুণাবলী নিয়ে যেদিন তিনি বিষ্ণুপুরের রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হলেন তখন দিল্লীর সিংহাসনে শোভা পাচ্ছিলেন ভারতবর্ষের জাতীয় সম্রাটরূপে আখ্যায়িত মহামান্য আকবর শাহ। অঙ্কের হিসেবে সময়টা হল ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ। ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর লোকান্তরের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় সুদীর্ঘ ৫৫ বছর রাজত্ব করেন তিনি। **হাম্বীর মল্লের রাজত্বকালকে বলা হয় বিষ্ণুপুরের স্বর্ণযুগ,** আর হাম্বীর মল্লকে বলা হয় **'বীর হাম্বীর'**। কিন্তু কেন?

দিল্লীর বাদশাহ মহামতি আকবর এবং হাম্বীর মল্ল উভয়েই মাত্র বার বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। আকবর শাহকে রাজ্য পরিচালনার কার্যে সর্বতোভাবে সাহায্য করা এবং সময়োপযোগী সদুপদেশ দেওয়ার জন্য ছিলেন তাঁর পিতৃবন্ধু বৈরাম খাঁ। হাম্বীর মল্লের কিন্তু ছিল না সেরকম কেউ। কিন্তু ছিল তাঁর তীক্ষ্ণ মেধা, অসাধারণ সাহস, অটুট ধৈর্য, অদম্য মনোবল, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অশেষ আত্মপ্রত্যয় এবং সুদূরপ্রসারী দূরদৃষ্টি।

বাংলার এক সংকটময় সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন হাম্বীর মল্ল। একদিকে মোগল-পাঠানের লড়াইয়ে বিধ্বস্ত বাংলা। অপরদিকে হাম্বীর মল্ল রাজা হবার কিছুদিন পূর্বে তৎকালীন উড়িষ্যার রাজা মহামান্য **হরিচন্দন মুকুন্দদেব** জয় করে নেন বাংলা দেশের ত্রিবেণী পর্যন্ত। এদিকে কর্‌রানী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা **সুলেমান কর্‌রানী** তখন বাংলা ও বিহারের সুলতান। তাঁর ধর্মদ্বেষী সেনাপতি কালাপাহাড়, মুকুন্দ দেবকে বাংলা থেকে উচ্ছেদ করে জয় করে নেন উড়িষ্যা এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্তি লুণ্ঠন করে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেন চিল্কা হ্রদে। এই রকম এক সর্বনাশা মুহূর্তে কিশোর বয়সে রাজা হলেন হাম্বীর মল্ল। উঠতি বয়সের দুর্দম্য-বাসনা। রক্তে দিগ্বিজয়ের নেশা। **মল্লভূমকে বাংলার স্বাধীন আদর্শ-রাষ্ট্র রূপে গঠনের স্বপ্নে বিভোর।** এদিকে আবার বহিঃশত্রুর আক্রমণের ভয়।

মোগল, পাঠান ও সুলেমান সেনাপতি কালাপাহাড়ের অকস্মাৎ আক্রমণের আশঙ্কায় সদা শঙ্কিত হাম্বীর মল্ল প্রথমেই রাজ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে জোরদার করার জন্য হয়ে উঠলেন তৎপর। মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরের রাজদরবার ও রাজদুর্গকে কেন্দ্র করে স্তরে স্তরে পর পর সাত স্তবক সুগভীর পরিখা কাটিয়ে নির্মাণ করলেন সুপরিকল্পিত জল-দুর্গ। পরিখার পাড়ে পাড়ে বিষাক্ত কণ্টকাদি বৃক্ষ ও লতাগুল্ম রোপণ করালেন স্থানে স্থানে। পাশপাশি নির্মাণ করালেন প্রচুর কামান, আগ্নেয়াস্ত্র ও বন্দুক। পরিখার সুউচ্চ পাড়গুলিতে থরে থরে সাজিয়ে রাখলেন শত শত কামান। **"শুধু বিষ্ণুপুর রাজধানী রক্ষার জন্যই যে এইরকম খানা কাটান ও তার পাড়ে কামান বসান হোল তা নয়, রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় এই রকম গড় তৈয়ারী করা হোল, আর তাদেরও চার ধারে খানা খুঁড়িয়ে, পাড় তৈয়ারী করে, কামান বসানোর ব্যবস্থা হোল। আর এই সব গড়ে বা দুর্গে এক এক জন করে শাসনকর্তা রাখা হোল। (পাশের মানচিত্র দ্রষ্টব্য)**

'আইন-ই-আকবরী' নামে একটি মোগল আমলের বই আছে। এই বইখানিতে লেখা আছে যে বিষ্ণুপুরের রাজার নিজের পনেরটি এবং তাঁর অধীনে বার জন সামন্ত রাজার বারটি, দুর্গ বা গড় ছিল। সব গড়গুলির সঠিক বিবরণ এখনও জানা যায় নাই তবে ওন্দা থানার মধ্যে **করাসুর গড়, কৃষ্ণগড়, অসুরগড়, শ্যামসুন্দর গড়, হোমগড়**; মেদিনীপুর জেলার মধ্যে **রামগড়, বেত্রগড়** (গড়বেতা), **গোহালতোড়, ধরাপাট**; হুগলী জেলার মধ্যে **মন্দারগড়**, কাকটার নিকট **ভুমনীগড়** প্রভৃতি গড়গুলির ধ্বংসাবশেষ বিষ্ণুপুরের অতীতকালের প্রতাপ প্রতিপত্তির এখনও প্রমাণ দিচ্ছে।" (মল্লভূম কাহিনী, পৃঃ— ১৫-১৬)।

"মল্লরাজাদের মধ্যে বীর হাম্বীর সর্বপ্রধান রাজা ছিলেন। তিনি যেমন সাহসী, যোদ্ধা ও বিদ্বান ছিলেন, তেমনি রাজকার্য্যে সুদক্ষ ছিলেন। দেশে তখন মোগল পাঠানে খুব বিরোধ চলছিল। পাঠানেরা সময়ে সময়ে মোগল সম্রাট আকবরের রাজ্য আক্রমণ করে দেশের লোকদের যথাসর্বস্ব লুটপাট করে নিত। মোগল বা পাঠান রাজাদের কেহ মল্লরাজ্য আক্রমণ করতে পারে ভেবে রাজা বীর হাম্বীর রাজধানী বিষ্ণুপুর সুরক্ষিত করবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন। বর্ত্তমানে যে দুটি দুর্গ দেখা যায় সে দুটি তিনি নিজে তৈরী করিয়েছিলেন। প্রধান দুর্গটির নির্ম্মাণের কৌশল দেখলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়! প্রায় তিন শত বৎসর আগে ঐ দুর্গটি তৈরী হয়েছিল। কিন্তু দুর্গের বাইরের সুদৃঢ় দেওয়াল দেখলে মনে হয় না-যে এটি এতকালের পুরাতন! দুর্গের ছাদের উপরে কামান সাজান থাকত এবং সেখানে সুশিক্ষিত সৈন্যরা বন্দুক ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সর্বদা হাজির থাকত। বীর হাম্বীর নিজে সৈন্যদিকে যুদ্ধবিদ্যা ও অস্ত্রচালনা শিক্ষা দিতেন। রাজ্যের তেজস্বী, চতুর যুবকদিগকে সৈন্যদলে ভর্ত্তি করা হত। **বীর হাম্বীরের সময়ে এত সুশিক্ষিত সৈন্য ও যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ছিল যে তাঁর আগের ও পরের কোন মল্লরাজার তত ছিল না।** প্রথম দুর্গটি পার হলেই শত্রুরা সহজে রাজধানীতে ঢুকতে পারত না। প্রথম দুর্গের পরেই একটি গভীর খাদ—তাতে বর্ষাকালের নদীর মত সব সময়ে সোঁ সোঁ করে জলের স্রোত বয়ে যেত—তার পরেই দ্বিতীয় দুর্গ। দ্বিতীয় দুর্গের ছাদের কথা বলেছি। নীচে দু'ধারে সৈন্যেরা বন্দুক নিয়ে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকত। দুর্গটি এমন ভাবে তৈরী যে মল্ল-সৈন্যেরা দুর্গের ভিতর থেকে শত্রু-সৈন্যদের উপর গুলি ছুঁড়ত, কিন্তু খুব কাছে এলেও শত্রু সৈন্যেরা মল্লসৈন্যদিকে দেখতে পেত না। বীর হাম্বীরের সময় পাঠান সেনাপতি দায়ুদ খাঁ বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেন। মল্লরাজার এমন বন্দোবস্ত ছিল যে, শত্রু রাজ্যের সীমানার অনেক দূরে আসতে থাকলেও রাজার নিকটে ঠিক সংবাদ আসত, এবং রাজধানী বিষ্ণুপুরের চার পাঁচ মাইল দূর থেকেই যুদ্ধ আরম্ভ হত। এবারও তাই হল। দায়ুদ খাঁয়ের আসার সংবাদ পেয়েই রাজা বীর হাম্বীর শীঘ্র সৈন্যদিকে সুসজ্জিত করে বন্দুক ও বড় বড় কামান নিয়ে স্বয়ং যুদ্ধ করতে চললেন। শত্রুকে বাধা দিবার স্থান ঠিক করে, সেনাপতিদিকে সৈন্য চালনা ও যুদ্ধ করবার কৌশল শিক্ষা দিয়ে নিজে রাজপুরী রক্ষার জন্যে দুর্গে ফিরে এলেন। দায়ুদ খাঁও প্রচুর সৈন্য নিয়ে মল্লসৈন্যদিকে আক্রমণ করলেন। প্রচণ্ড যুদ্ধ চলল দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। **তেমন যুদ্ধ মল্লসৈন্যেরা কখনও করে নাই—রাজ্যবাসীরাও কখনও দেখে নাই।** রাজধানীর লোকসব ভয়ে ভয়ে দিন কাটাতে লাগল। রাজা প্রজাদিগকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। ঘন ঘন কামানের গুড়ুম গুড়ুম আওয়াজ, বন্দুকের দুম দাম শব্দ, সৈন্যদের কলরোল, বাদ্যকরগণের দামামার ধ্বনি প্রজাদের মনে ভয়ানক ভয়ের সঞ্চার করে দিয়েছিল। রাজা

বীর হাম্বীর রাজপুরী রক্ষার জন্যে দুর্গের মধ্যে ছিলেন—যুদ্ধের সংবাদ জানবার জন্যে মিনিটে মিনিটে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে চর পাঠাতেন। মল্লসৈন্যরা প্রবল বিক্রমে যুদ্ধ করল—তাদের বিক্রম, সাহস ও যুদ্ধের কৌশল দেখে পাঠান সৈন্যেরা অবাক্ হয়ে গেল—শেষে দায়ুদ খাঁ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়ে গেলেন। তাঁর সৈন্যেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যে যেদিকে পারল পালিয়ে গেল।" (চিত্র ও গল্পে বিষ্ণুপুর, পৃঃ— ২১-২৪)

পরাজিত পাঠান সৈন্যদের মৃতদেহ স্তূপাকৃতিতে পড়ে রইল যুঝঘাটি বা মুণ্ডমালা ঘাটের প্রান্তরে।

'দায়ুদ খাঁ—বীর হাম্বীর' যুদ্ধের তীব্রতা এবং ভয়াবহতা বোঝাতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় ঁফকির নারায়ণ কর্মকার তাঁর 'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী' গ্রন্থের ২৭ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন, "প্রায় লক্ষাধিক সৈন্য ও সেই মত রণসম্ভার নিয়ে অতর্কিতে দায়ুদ খাঁ এসে ছাউনি ফেলেন বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী রাণীসাগর নামক গ্রামে।

মহারাজ হাম্বির মল্ল তার জন্যে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত ছিলেন না। সেই আকস্মিক সঙ্কটে কিছু বিব্রত হয়ে পড়েন তিনি। কিন্তু তাঁর চির আরাধ্যা মৃন্ময়ীদেবীর কৃপায় সে ত্রুটি তাঁর পূর্ণ হয়ে যায়। তখন তিনি এমন শোচনীয়ভাবে তাদের ধ্বংস করেন যে পাঠান সৈন্যের মৃতদেহের স্তূপে পূর্ণ হয়ে যায় যুঝঘাটি ও মুণ্ডমালাঘাটের প্রান্তর। অবরুদ্ধ অবস্থায় প্রাণমাত্র সম্বল করে মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা করতে থাকেন দায়ুদ খাঁ। কিন্তু সেই শোচনীয় পরিণতি তাঁর হয় না। মহানুভব হাম্বির মল্ল সসম্মানে তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করেন। পৌঁছে দেন তাঁকে নিরাপদ স্থানে।

কথিত আছে—সেই পাঠান-মুণ্ডমালা অসুর-নাশিনী মৃন্ময়ীদেবীকে উপহার দিয়েছিলেন হাম্বির মল্ল। আর সেই দুঃসাধ্য সাধন করার জন্যে হাম্বির মল্ল থেকে ভূষিত হন তিনি বীরহাম্বির নামে। আবার অনেকে বলেন—তাঁর সেই বীরত্বে ও মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়ে, দায়ুদ খাঁই তাঁকে ভূষিত করেন উক্ত আখ্যায়।

মুণ্ডমালাঘাট বিষ্ণুপরের উত্তর সীমান্তে অবস্থিত শেষ পরিখার পরপারে দেউলি ও চাকদহ নামক গ্রামের মধ্যবর্তী এক প্রান্তর। সেখানে ক্ষুদ্র-বৃহৎ এত যুদ্ধ হয়ে গেছে যার জন্যে সেখানকে বিষ্ণুপুরের নরপতিদের স্থায়ী যুদ্ধক্ষেত্র বলা যেতে পারে। তার মূক-মৃত্তিকায় এখনও যেন শোনা যায় কত বীরের কীর্তিগাথা। কত স্বদেশ প্রেমিকের মহান আত্মত্যাগের কাহিনী।

কিন্তু মুণ্ডমালাঘাট নাম হয়েছে সেখানে অন্য কারণবশত। সেখানে পরিখা পাহাড়ের ওপর এক ভয়ঙ্করী কালী প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর শত্রুর মনে ভয় জাগাবার জন্যে তাঁর কণ্ঠে সত্যকার নরমুণ্ডের মালা দেওয়া থাকত। তাই এখানের নাম **মুণ্ডমালাঘাট**। এর দক্ষিণে বিস্তীর্ণ পরিখা পাহাড়, উত্তর ও পশ্চিমে বিড়াই নদী এবং পূর্বে বিখ্যাত দ্বারকেশ্বর নদ ও বিড়াই নদীর সঙ্গমস্থল উক্তস্থানকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ করে রেখেছে। আর ঐ মুণ্ডমালাঘাটেরই পশ্চিম দিকে অবস্থিত স্থানের নাম **যুঝঘাটি**। এবং দায়ুদ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধের পরবর্তীকাল থেকে অনেকে সেখানকে দায়ুদঘাটা বলে থাকেন। বর্তমানে সেখানের বিড়াই নদীকে খানা বিড়াই বলা হয়।"

আনুষঙ্গিকভাবে উল্লেখ করি, মুণ্ডমালাঘাটের সন্নিকটে একটি দুর্গ ছিল। সেই দুর্গ আজ আর নেই। নেই ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন মাত্র। **তবে কয়েক দশক আগে বন্যার স্রোতে নদীর মাটি ক্ষয়ে ক্ষয়ে বেশ বড় একটি কামান বেরিয়ে পড়ে মাটির নীচ**

থেকে। উক্ত কামানটি বিষ্ণুপুরের বর্তমান 'ট্রেজারি বিল্ডিং'-এর সম্মুখে সযত্নে সংরক্ষিত আছে।

"কথিত আছে—দায়ুদ খাঁর সেই অতর্কিত আক্রমণে বিব্রত হওয়ার জন্য তারপরই মহারাজ বীরহাম্বির মল্লভূমের সীমান্ত থেকে রাজধানী বিষ্ণুপুর পর্যন্ত শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য ও সংকেতে সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করেন। তার জন্যে বিষ্ণুপুর থেকে রাজ্যের সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় ৬ মাইল পর পর উঁচু স্তম্ভ নির্মাণ করান। এখানের চলতি ভাষায় বলা হয় তাকে **মাচান**। এখনও মল্লভূমের স্থানে স্থানে সেই মাচানের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

বাঁকুড়া সহরের মাচানতলা মহল্লায় উক্ত মাচানের ধ্বংসাবশেষ এখনও বর্তমান। আর তাই সেখানের নাম মাচানতলা মহল্লা।" (বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী, পৃঃ—২৮)।

উক্ত সংবাদ প্রেরক স্তম্ভগুলি সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থের ১২৩ পৃষ্ঠাতে সম্পূর্ণ ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, *"১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ও ম্যালীর বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার থেকে (পৃঃ— ১২১), বাংলা তর্জমায়, নীচের উদ্ধৃতিটি অভিনিবেশযোগ্য। 'বিষ্ণুপুরের কয়েক মাইল পশ্চিমে, মিলিটারি গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডের অদূরে, রামসাগরে ও ওন্দা থেকে সামান্য তফাতে, শালঘাটায় দুটি উঁচু স্তম্ভ এখনও দেখা যায়। কলকাতা থেকে বোম্বাই অবধি সবটা পথের প্রতি ৮ মাইল অন্তর ১০০ ফুট উঁচু স্তম্ভ নির্মাণ করে তাদের শীর্ষ থেকে 'সিমাফোর' সংকেতের মারফত বার্তা প্রেরণের যে প্রকল্পটি ভারত সরকার উনিশ শতকের প্রথম দিকে (১৮২০-৩০) গ্রহণ করেছিলেন, এগুলি তার কৌতূহলোদ্দীপক স্মৃতিচিহ্ন।* **'টেলিগ্রাফ' কথাটা সে সময়ে 'সিমাফোর' পদ্ধতিতে এভাবে খবর পাঠানোকে বোঝাত।** সেজন্য পুরাতন মানচিত্রে আমরা এসব স্তম্ভকে টেলিগ্রাফ স্টেশন বলে উল্লেখিত দেখি।' কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ থেকে শুরু করে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলী ও বাঁকুড়া জেলায় এবং বিহারের কিছু অংশে এ সকল স্তম্ভ নির্মিত হবার পর তারবার্তা প্রেরণের আধুনিক উপায়টি অকস্মাৎ আবিষ্কৃত হওয়ায়, এ প্রকল্প মধ্যপথে পরিত্যক্ত হয়। বাঁকুড়া জেলার জয়পুর থানার বেনিয়াপুকুরে, বিষ্ণুপুর থানার রামসাগরে, ওঁদা থানার শালঘাটায়, ছাতনা থানার ছাতনা ও অরড়ায় (ঝাঁটিপাহাড়ির কাছে), ইটের তৈরি, গোল বেড়ের চারতলা ও উপরের দিকে ক্রমশঃ সরু এই 'সিমাফোর' স্তম্ভগুলি অল্প-বিস্তর জীর্ণ অবস্থায় এখনও দেখা যায়। ভিতরের ফাঁপা অংশে নিবদ্ধ সিঁড়ি দিয়ে কাঠের মেঝেযুক্ত প্রতি তলায় উঠে যাওয়া যেত। বাঁকুড়া শহরের মাচানতলায় অবস্থিত আর একটি স্তম্ভ এখন লোপ পেয়েছে। **মানচিত্রে এই ছটি স্তম্ভের অবস্থান পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, পরস্পর থেকে মোটামুটি ৮ মাইল (১৩ কিলোমিটার) দূরত্বে এই 'টেলিগ্রাফ-স্টেশন' -গুলি উত্তর-পশ্চিমমুখী এক সরল রেখায় বাঁকুড়া জেলাকে অতিক্রম করেছে। পরিত্যক্ত এ ইমারতগুলি মন্দিরময় বাঁকুড়া জেলায় সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের এক পুরাকীর্তি।"**

পূর্বোক্ত ফকিরনারায়ণ কর্মকার অবশ্য স্তম্ভাকৃতির মাচানগুলিকে পরাধীন ভারতের ভারত সরকার কর্তৃক নির্মিত বলে মানতে রাজী নন। তাঁর যুক্তি "কেউ কেউ বলেন টেলিফোন, টেলিগ্রাম আবিষ্কৃত হবার পূর্বে সংবাদ আদান প্রদানের ব্যবস্থার জন্যে ঐ সমস্ত মাচান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু তা ভুল। তাঁরা তার ব্যবস্থা করলে তাঁদের সে সময়ের হেড কোয়ার্টার কলকাতা থেকে আরম্ভ করে তাঁদের

প্রয়োজন মতো আর ওসব অন্যান্য দিকে তা সম্প্রসারিত করতেন। বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী তাঁতিপুকুর নামক জায়গা থেকে মল্লভূমের সীমান্তের দিকে তার অগ্রগতি হবে কেন?

তবে টেলিফোন, টেলিগ্রাম আবিষ্কৃত হবার পূর্বে, মাচানের কার্যকরী বিবরণ অবগত হয়ে তাঁরা হয়ত পরীক্ষামূলকভাবে দেখবার জন্যে, ওর মেরামতি ইত্যাদি কিছু করেছিলেন। এ হতে পারে।" (বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী, পৃঃ— .২৮)।

মাচান বা স্তম্ভ প্রসঙ্গে ইতি টেনে এবার বলি অন্য কথা। বীর হাম্বীরের পিতা ধাড়ী মল্ল মোগল অধীনতা মেনে নিয়েছিলেন। রাজস্ব ধার্য হয়েছিল অল্পস্বল্প। দায়ুদ খাঁকে পরাজিত করে বীর হাম্বীর নগর উন্নয়নে মনোনিবেশ করেছেন। এমন সময় শুরু হল এক নতুন উপদ্রব। পাঠান সুলতান দায়ুদ খাঁ-এর পরাজয়ে তাঁরা হয়ে উঠলেন প্রতিহিংসা পরায়ণ। সুযোগের অপেক্ষায় বসে ছিলেন ওৎ পেতে। ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে ১৫৯০/৯১ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর উড়িষ্যার একচ্ছত্র অধিপতি দুর্ধর্ষ আফগান শাসক **কতলু খান লোহানীর** নেতৃত্বে তারা সংঘবদ্ধ হয় এবং মোগল সাম্রাজ্যে শুরু করে নিদারুণ উপদ্রব। কতলু খান ওরফে কোতুল খাঁ অবশেষে ছাউনী ফেলেন বর্তমান বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত কোতুলপুর অঞ্চলে। লুণ্ঠন করেন গ্রামের পর গ্রাম। পাঠান অধিপতি কোতুল খাঁকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য মোগল সম্রাট আকবর শাহের নির্দেশে সেনাপতি **মান সিংহ, পুত্র জগৎ সিংহকে** নিয়ে হাজির হলেন কোতুলপুর সন্নিকটস্থ জাহানাবাদে। **আজকের আরামবাগ শহর অতীতের জাহানাবাদের নামান্তর মাত্র।**

পাঠানের বিরুদ্ধে মোগল সৈন্যেরা রণং দেহি মনোভাব নিয়ে যখন যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরী সেই সময় পাঠান শিবির থেকে আসে সন্ধির প্রস্তাব। পাঠান অধিপতি কোতুল খাঁ-এর এই সন্ধি প্রস্তাবের অন্তরালে লুকিয়ে ছিল এক দুরভিসন্ধি। বিচক্ষণ রাজা বীর হাম্বীর জগৎ সিংহকে এই বিষয়ে সাবধান করে দেন পূর্বেই। কিন্তু স্বীয় শক্তিমত্তায় দর্পিত জগৎ সিংহ বীর হাম্বীরের কথায় কর্ণপাত করেন না। ফলতঃ একদিন **গড়মান্দারণ** যাবার পথে অকস্মাৎ আক্রান্ত হয়ে পাঠানদের হাতে বন্দী হন জগৎ সিংহ। জগৎ সিংহের এই ভয়াবহ পরিণতির খবরে বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন স্বয়ং মান সিংহ। রণবীর বীর হাম্বীর তখন পাঠান অধিপতি কোতুল খাঁকে আক্রমণ করে বন্দীমুক্ত করেন জগৎ সিংহকে। **এর ফলে মান সিংহ তথা মোগল শাসকের সাথে বীর হাম্বীরের গড়ে ওঠে এক সুসম্পর্ক। পক্ষান্তরে কোতুল খাঁ তথা পাঠান সেনাবাহিনী পরিণত হয় চিরশত্রুতে।** এই শত্রুতার বশবর্তী হয়ে তারা বিষ্ণুপুরের অধীনস্থ গড়মান্দারণের সামন্ত সর্দার **বীরেন্দ্র সিংহকে** হত্যা করেন এবং গড়মান্দারণ দুর্গকে সম্পূর্ণরূপে ধূলিসাৎ করেন। **এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের পটভূমিকা রচিত হয় এই গড়মান্দারণের অধুনা বিলুপ্ত শৈলেশ্বর শিবমন্দির ও শিবলিঙ্গকে কেন্দ্র করে।**

গড়মান্দারণ দুর্গ ধ্বংস করার অব্যবহিত পরেই রহস্যজনকভাবে মারা যান কোতুল খাঁ। কোতুল খাঁর সমাধি কোতুলপুরে বিদ্যমান এবং তাঁর নামানুসারেই স্থানটির নাম হয় কোতুলপুর। কোতুলপুর বিষ্ণুপুরের পূর্ব দিকে মাইল ২০ দূরে অবস্থিত। অপ্রত্যাশিত এই বিপর্যয়ে পাঠান সৈন্যদের সাহস ও মনোবল ভেঙে পড়ে। এমতাবস্থায় কোতুল খাঁর অসহায় পুত্র নাসির খাঁ যুদ্ধের পথ পরিহার করে সন্ধি করেন মোগল সেনানায়ক মান সিংহের সঙ্গে। কিন্তু বীর হাম্বীরের ওপর আক্রোশ বশতঃ তাঁরা বিষ্ণুপুর আক্রমণ

করেন। রণনিপুণ রাজা বীর হাম্বীর তাঁদের সমুচিত শিক্ষা দেন। সমূলে বিনাশ করেন পাঠান সেনাদের।

পুত্র জগৎ সিংহের জীবন রক্ষার সুবাদে "মানসিংহের আনুকূল্যে বীর হাম্বিরের রাজ্যের সীমা চতুর্দিক অনেকখানি বিস্তৃত হয়েছিল। বিহার ও উড়িষ্যার জঙ্গলাকীর্ণ গড়জাত মহলের যে সব ছোট ছোট জমিদারী পাঠানদের অনুগত ছিল, মানসিংহ কর্তৃক বিজিত হবার পর তাদের কিছু কিছু মল্লরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। যেমন পঞ্চকোট রাজ্য। বেগলার সাহেব দলবলসহ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে বেরিয়ে যখন পঞ্চকোটে এসেছিলেন, দুয়ারবন্দ্ ও খড়িবাড়ি তোরণের ওপর বীর হাম্বিরের নাম লেখা লিপি তাঁর নজরে পড়েছিল। লিপির সময়কাল ছিল ষোলশো খ্রীষ্টাব্দ। লিপির সাক্ষ্য মল্লরাজ্যের মধ্যে পঞ্চকোট রাজ্যের অন্তর্ভুক্তির দিকেই ইংগিত করে। হাম্বিরের সময়কে মল্লরাজ্যের ব্যাপ্তির যুগ বলা চলে।........

পরবর্তীকালে মল্লরাজ্যের সীমানা সঙ্কুচিত হয়ে এসেছিল। মল্লভূম বলতে তখন ছাতনা বাদে বাঁকুড়া থানা, ওন্দা, বিষ্ণুপুর, কোটালপুর ও ইন্দাস বোঝাত। হাম্বিরের সময় সীমানা ছিল বহু বিস্তৃত। সাঁওতাল পরগণার দামিন-ই-কোহ পর্যন্ত বিস্তীর্ণ ছিল উত্তরসীমা, দক্ষিণসীমা পরিব্যাপ্ত ছিল বর্তমান মেদিনীপুর জেলার উত্তর ও উত্তর পশ্চিমাংশ পর্যন্ত, পূর্বে বর্ধমানের কিছুটা অংশ, পশ্চিমে ছোটনাগপুর সন্নিবিষ্ট পাঁচেট রাজ্য।" (পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া, তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃঃ-১০৬-১০৭)

সিংহাসনে আরোহণের পর থেকেই একটার পর একটা যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছে বীর হাম্বীরকে। মল্লভূমকে একটি আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন হয়েছে স্বপ্নমাত্র। পাঠান শক্তি দারুণভাবে পরাজিত হওয়ার পর যুদ্ধের বিভীষিকা, ভয়াবহতা স্তিমিত হয়। মহারাজ বীর হাম্বীর পুনরায় মল্লভূমকে শৌর্যে, বীর্যে, ঐশ্বর্যে আদর্শ রাষ্ট্রগঠনের স্বপ্নে বিভোর হলেন। এমন সময় ঘটল এক ঘটনা।

"মহারাজ, আপনার রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমের গোপালপুর চটির পাশ দিয়ে মহামূল্যবান রত্ন বোঝাই তিনটি গো-শকট আসছে।" ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন রাজ-জ্যোতিষী দেবনাথ বাচস্পতি। দিন, ক্ষণও উল্লেখ করেছিলেন সাথে সাথে।

রাজা জানতেন জ্যোতিষীর গণনা অভ্রান্ত। সাথে সাথে তিনি সৈন্য-সামন্তদের নির্দেশ দিলেন গোপালপুর চটির কাছাকাছি ওৎ পেতে বসে থাকতে এবং কোনরকম সংঘাত, রক্তপাত বা খুনোখুনির মধ্যে না গিয়ে সুকৌশলে গো-শকটস্থ রত্নরাজী অপহরণ করতে।

কাজও হল রাজার নির্দেশ মতো। লুণ্ঠিত হল মহামূল্যবান রত্নরাজি। রাজসমক্ষে খোলা হল লুণ্ঠিত কাঠের পেটিকাগুলি। কিন্তু কোথায় রত্ন! কোথায় বা ঐশ্বর্য! এ যে হাতে লেখা রাশি রাশি পুঁথি! দুঃখে এবং হতাশায় ভরে গেল হাম্বীরের হৃদয়। অকারণে কলঙ্কিত হলেন তিনি। আখ্যায়িত হলেন 'ডাকাত রাজা'।

এদিকে শ্রীজীব গোস্বামীর নির্দেশে শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম ঠাকুর ও শ্যামানন্দ এই তিন মহাবৈষ্ণব সুদূর বৃন্দাবনধাম থেকে ঐসব পুঁথিগুলি নিয়ে যাচ্ছিলেন তাঁদের গৌড়ীয় মঠে। ব্রজবাসী লাঠিয়াল সহ দলটিতে তাঁরা ছিলেন জনা পনের। বিষ্ণুপুর সংলগ্ন গোপালপুর চটিতে রাত্রিযাপন করছিলেন। শাস্ত্রালাপন ও নাম সংকীর্তনান্তে খাওয়া দাওয়া সেরে পথশ্রমে ক্লান্ত শ্রান্ত ব্রজবাসীগণ যখন গভীর ঘুমে অচেতন সেই অবকাশে লুণ্ঠিত

হয় পুঁথি বোঝাই পেটিকাগুলি। ঘুম ভাঙতেই শূন্য গোশকটগুলি দেখে তাঁরা মর্মাহত হলেন যার-পর-নাই। ভেঙে পড়লেন কান্নায়।

পুঁথি হারানোর শোক কিছুটা প্রশমিত হলে নরোত্তম ঠাকুরকে উত্তরবঙ্গে এবং শ্যামানন্দকে উৎকলে যাবার নির্দেশ দিয়ে **বজ্রাহত শ্রীনিবাস আচার্য হারানো পুঁথির সন্ধানে রয়ে গেলেন বিষ্ণুপুরে।**

আহার নিদ্রা ত্যাগ করে উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘুরতে ঘুরতে দশ দিনের মাথায় বিষ্ণুপুরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত দেউলি গ্রাম-নিবাসী **কৃষ্ণবল্লভ চক্রবর্তী** মহাশয়ের সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। পুঁথি হারানোর আদ্যোপান্ত বিবরণ শুনে তিনি তাঁকে নিয়ে যান বীর হাম্বীরের রাজসভায়। ঘটনাচক্রে সেই সময় সভাপণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবতের **'রাসপঞ্চাধ্যায়'** পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন রাজা ও সমবেত সভাসদবৃন্দকে। **'রাজপণ্ডিতের ব্যাখ্যা ভুল এবং ত্রুটিপূর্ণ'— বলে আপত্তি করেছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। মুহূর্তে মহারাজ বীর হাম্বীরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি এবং রুষ্ট হন রাজপণ্ডিত।** অতঃপর মহারাজের নির্দেশে ভক্তি বিগলিত চিত্তে মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি ব্যাখ্যা করেন 'রাসপঞ্চাধ্যায়'। শুরু হয় অভাবনীয় কাণ্ড। পাঠ শুনতে শুনতে ভাবান্তর হয় ভক্তবৃন্দের। অশ্রু, কম্প, স্বেদ, পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশে উদ্বেলিত হয় ভক্ত-হৃদয়। রাজপণ্ডিত শ্রীব্যাস আচার্যের ক্রোধ রূপান্তরিত হয় গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তিতে। পরবর্তীকালে তিনি সপরিবারে শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং দীক্ষান্তে তাঁর নাম হয় **ব্যাসাচার্য।**

এদিকে মহারাজ বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্যের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ, ঈশ্বর-নিষ্ঠায় অভিভূত, প্রাণস্পর্শী বাচন-ভঙ্গিতে বিস্ময়াবিষ্ট। প্রেমাশ্রু ঝরতে থাকে নয়ন যুগলে, ভাব-ভক্তির উদ্দাম-উচ্ছ্বাসে আপ্লুত হয় তাঁর হৃদয়। এবার বিষ্ণুপুরে তাঁর অগমনের কারণ এবং আলাপ-পরিচয়ের মাধ্যমে পুঁথি হরণের নির্মম সত্যটি উদ্‌ঘাটিত হয় সত্যের স্বচ্ছ আলোকে।

মহামান্য মহারাজ তখন তাঁকে নিয়ে যান সেই গোপন কক্ষে যেখানে রাখা ছিল পেটিকা ভর্তি পুঁথিগুলি। **খোয়া যাওয়া পুঁথিগুলি ফিরে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন আচার্যদেব। আর অপকীর্তির আত্মগ্লানিতে ক্ষতবিক্ষত মহারাজ রাজ-গরিমাকে বিসর্জন দিয়ে স্বকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে লুটিয়ে পড়েন আচার্যদেবের পদপ্রান্তে।**

'কৃষ্ণপদে মতি হোক'—আশীর্বাদ করেন শ্রীনিবাস আচার্য। ভূলুণ্ঠিত মহারাজকে জড়িয়ে ধরেন বুকে। সিদ্ধ সাধকের আশীর্বাদ ফলপ্রসূ হয় নিমেষে।

কোন এক আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে, মতান্তরে কৃষ্ণপক্ষের ৩রা আষাঢ় শ্রীনিবাস আচার্যের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন তিনি, তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ধাড়ি হাম্বীর এবং জ্যেষ্ঠা মহিষী মহারাণী শিরোমণি দেবী। **দীক্ষোত্তর জীবনে তিনি শ্রীচৈতন্যদাস, শ্রীগোবিন্দ দাস এবং হরিচরণ দাস প্রভৃতি নামে ভূষিত হন।** ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে আসে তাঁর ক্ষাত্রশক্তি। মহাপুরুষ সংস্রবে তিনি যেন মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতোই হয়ে পড়েন শান্ত-সমাহিত।

বুদ্ধদেবের সংস্পর্শে দস্যু অঙ্গুলিমাল হয়েছিলেন বৌদ্ধভিক্ষু। উপগুপ্তের সংস্পর্শে চণ্ডাশোক হয়েছিলেন ধর্মাশোক। **তদনুরূপে শ্রীচৈতন্যদেবের আবেশ অবতার রূপে**

চিহ্নিত শ্রীনিবাস আচার্যের সংস্পর্শে রণবীর বীর হাম্বীর হয়ে ওঠেন ধর্মবীর। অসি ছেড়ে ধরেন মসি—

"প্রভু মোর শ্রীনিবাস পুরাইলে মনের আশ
তোয়া বিনে গতি নাহি আর।
আছিনু বিষয় কীট বড়ই লাগিত মিট
ঘুচাইলা রাজ অহঙ্কার।।

দীক্ষোত্তর জীবনে বীর হাম্বীর যেন হয়ে ওঠেন রথ, আর তদীয় গুরুদেব রথী। গুরুদেবের ইচ্ছাশক্তি এবং ঐশীশক্তিতেই চালিত হতে থাকেন তিনি। ভক্তের ভক্তিডোরে বাঁধা পড়েন শ্রীনিবাস আচার্য। তাঁর আর যাওয়া হল না গৌড়, ফেরা হল না বৃন্দাবন। রয়ে গেলেন বন-বৃন্দাবন বিষ্ণুপুরে। পুরোদমে শুরু হল আধ্যাত্মিক সৃষ্টিকর্ম। অঝোরে ঝরে পড়ল কৃষ্ণকৃপা। নির্মিত এবং প্রতিষ্ঠিত হল কালাচাঁদ মন্দির এবং কালাচাঁদ শ্রীবিগ্রহ। স্থানে স্থানে গড়ে উঠল অতিথিশালা, আশ্রম এবং বৈষ্ণব সাধকদের আখড়া।

শ্রীনিবাস আচার্যের আদিনিবাস ছিল নবদ্বীপের চাকন্দি গ্রামে। মাতুলালয় ছিল যাজীগ্রামে। যাজীগ্রামে থাকতেন তাঁর প্রথমা পত্নী এবং পুত্রকন্যা। শিষ্যের সবিনয় অনুরোধে তিনি বিষ্ণুপুরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত গোপালপুর গ্রাম নিবাসী রঘুনাথ চক্রবর্তীর মতান্তরে রাঘব চক্রবর্তীর কন্যা পদ্মাবতী দেবীর পাণিগ্রহণ করে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুরের খড়বাংলা মহল্লাতে রচিত হয় তাঁর বাসভবন। পরবর্তীকালে রাজ-আনুকূল্যে নির্মিত হয় এক শ্রীমন্দির এবং প্রতিষ্ঠিত হয় রাধারমণ শ্রীবিগ্রহ।

কালক্রমে শ্রীনিবাস আচার্যের দ্বিতীয়া-পত্নী পদ্মাদেবীর গর্ভে জন্ম নেয় একটি পুত্র-সন্তান—নাম তাঁর গীতগোবিন্দ মতান্তরে গতিগোবিন্দ। তাঁর পুত্রকন্যাদের মধ্যে পুত্র গীত-গোবিন্দ এবং কন্যা হেমলতা দেবীই ছিলেন সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রচলিত বিশ্বাস, বহু অলৌকিক ঘটনার আলোকে উদ্ভাসিত হেমলতা দেবী ছিলেন স্বয়ংলক্ষ্মী স্বরূপিণী। কথিত আছে, রাধারমণ বিগ্রহের সেবা-পূজায় সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করে সাধনমার্গের শীর্ষাবস্থায় উন্নীত হয়ে শ্রীবিগ্রহের শ্রীঅঙ্গে লীন হয়ে যান তিনি।

শ্রীনিবাস আচার্যের বংশোদ্ভূত বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক জগৎচাঁদ গোস্বামী, কীর্তিচন্দ্র গোস্বামী, প্রথিতযশাঃ সঙ্গীত বিশারদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, প্রফেসর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী বিষ্ণুপুরকে করেছেন ধন্য, করেছেন গৌরবান্বিত।

ভাল এবং মন্দ, শুভ এবং অশুভ থাকে পাশাপাশি। স্রষ্টার সৃষ্টিতত্ত্বের মধ্যে সেই সত্যই যেন বিধৃত। তাই দেখি অশুভের পশ্চাতে লুকিয়ে থাকে শুভ, অমঙ্গলের অন্তরালে লুকিয়ে থাকে মঙ্গল। 'মণিমঞ্জুষা' নামক বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থরাজি অপহরণের ন্যক্কারজনক ঘটনার মধ্যেই বোধ করি লুকিয়ে ছিল বিষ্ণুপুরের আধ্যাত্মিক সম্পদ তথা ঐশীশক্তি।

সেই ঐশীশক্তির যাদুস্পর্শে, আধ্যাত্মিক-সম্পদের গরিমায়, ঈশ্বর-প্রেমের-উন্মাদনায়, বীজমন্ত্রের মহিমায় খসে যায় রাজার রাজসিকভাব। দেখা দেয় রাজকার্যে অনীহা এবং বীতস্পৃহা। এরপর যা ঘটেছিল ফকিরনারায়ণ কর্ম্মকারের লেখা 'কীর্তিভূমি বিষ্ণুপুর' বইটির ৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা থেকে তাই শোনাই আপনাদের।

"মোগল-পাঠান সংঘর্ষে মোগলের সাহায্য করে তাঁদের সঙ্গে মিত্রতার জন্য মোগল সম্রাট আকবরের সময় করের জন্য কোন প্রকার চাপ বিষ্ণুপুরের ওপর দেওয়া হয়নি।

কিন্তু তিনি তখন গত, দিল্লীর সিংহাসনে তখন বাদশাহ জাহাঙ্গীর এবং বাংলার মসনদে কুতবউদ্দীন খাঁ। দিল্লীর নির্দ্দেশ অথবা নিজের ইচ্ছাতেই হোক, নবাব কুতবউদ্দিন খাঁ সেই সুযোগে মহারাজ বীর হাম্বীরকে নিজের দরবারে তলব করে নিয়ে গিয়ে নবাব দরবারকে নিয়মিতভাবে রাজস্ব দিতে স্বীকার করিয়ে নেন। কিন্তু তা নামে মাত্র। আসলে তার কিছুই হয় না। বিষ্ণুপুরে এসে শ্রীগুরুর সঙ্গলাভ করে তিনি সব কিছু বিস্মৃত হয়ে যান। তাঁর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবনধামে চলে যান। আর সেখানের সেই পুণ্যময় পরিবেশের মধ্যে গিয়ে বৈষ্ণবীয় ভাবধারা তাঁর এমন প্রবল ভাবে জেগে ওঠে, ভগবৎ-প্রেমে তিনি এমন বিভোর হয়ে ওঠেন, যার জন্য সেখানের অধ্যক্ষ শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে চৈতন্যদাস নামে অভিহিত করেন। সেখানের বৈষ্ণব সমাজে তিনি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবরূপে পরিগণিত হন এবং সেই সময় সেখানের গোবিন্দ জীউ, গোপীনাথ জীউ ও মদনমোহন জীউ— তিন বিগ্রহের নামে বহু ভূসম্পত্তি উৎসর্গ করেন। ঐ সমস্ত কাজে তাঁর বহুদিন গত হয়ে যায়। তারপর আচার্যদেবের সঙ্গে তিনি বিষ্ণুপুরে ফিরে আসেন।

বৃন্দাবনধাম হতে রাজা ফিরে আসেন। কিন্তু বৃন্দাবনবিহারী শ্রীকৃষ্ণের লীলানিকেতন বৃন্দাবনের চিন্তা তিনি কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারেন না। তাই বিষ্ণুপুরকে তিনি বৃন্দাবনের অনুকরণে তৈরী করবার ব্যবস্থা করেন। বিপুল অর্থব্যয়ে বিষ্ণুপুরের বুকে খনন করান যমুনা বাঁধ, কালিন্দী বাঁধ, শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড, কালীদহ প্রভৃতি এবং বিষ্ণুপুরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করেন মথুরা, দ্বারকা, মধুবন প্রভৃতি গ্রাম ও বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে তৈরী করান বিশাল রাসমঞ্চ। আর তাঁর সেই সৎ ইচ্ছা ও শ্রমকে সার্থক করবার জন্য শ্রীগুরু শ্রীনিবাস আচার্য্য বিষ্ণুপুরকে দেন 'গুপ্ত-বৃন্দাবন' নাম।"

বৃন্দাবনে তীর্থভ্রমণ এবং বিষ্ণুপুরকে গুপ্তবৃন্দাবনে রূপান্তরিত করতে গিয়ে অতিবাহিত হয় বছর সাতেক সময়। নবাব-দরবারে রাজস্ব না দেওয়ার অপরাধে কারাগারে বন্দী হন তিনি। ঈশ্বরগতপ্রাণ বীর হাম্বীরের ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে। কিন্তু সমস্যা হল তাঁর ইষ্টদেবতার চরণামৃত নিয়ে। চরণামৃত পান না করে তাঁর আহার গ্রহণে রুচি হয় না। সুতরাং নবাব দরবারের খানা-পিনা প্রত্যাখ্যান করে উপবাসী শরীরে কারারুদ্ধ অবস্থায় ইষ্টচিন্তায় মগ্ন থাকেন সারাক্ষণ।

কথায় বলে 'ভক্তের ভগবান'। দিন পেরিয়ে রাত আসে। আপনা-আপনি উন্মুক্ত হয়ে যায় কারাগারের দ্বার। বেরিয়ে আসেন মহারাজ বীর হাম্বীর। সংবাদটা পৌঁছে যায় নবাবের কানে। কারারক্ষীদের কর্তব্যে অবহেলা ভেবে নিযুক্ত করা হয় নতুন নতুন কারারক্ষী। বাড়িয়ে দেওয়া হয় নজরদারী। কিন্তু ভীষণ কড়া প্রহরা সত্ত্বেও তিন দিনে উপর্যুপরি বার সাতেক অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটে। চৈতন্যোদয় হয় নবাবের। অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দেন সানন্দে এবং তাঁর মধ্যে দৈবশক্তির স্ফূরণ দেখে 'দেব' উপাধিতে ভূষিত করেন নির্দ্বিধায়।

কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে মুক্ত-বিহঙ্গের আনন্দে তীর্থে তীর্থে ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তিনি এসে পড়েন বীরভূমে। সেখানের বক্রেশ্বরধাম দর্শন করে উপনীত হন বৃষভানুপুর গ্রামে। কথিত আছে বীরভূমের বৃষভানুপুর থেকেই তিনি তাঁর প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউকে নিয়ে আসেন বিষ্ণুপুরে।

মদনমোহন বিগ্রহের বিষ্ণুপুরে আগমনের অপূর্ব ইতিকথা আপনাদের শোনাব 'মদনমোহন মন্দিরের শ্রীঅঙ্গনে উপনীত হয়ে। এখন শোনাই 'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী'

পুস্তকের ৫২ পৃষ্ঠার একটি বিশেষ অংশ। সেখানে বলা হয়েছে, "**মহারাজা বীরহাম্বির বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করার ফলে সে সময়ে বিষ্ণুপুরের ক্ষাত্রশক্তি প্রায় সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায়। যেখানে অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা, অশ্বের হ্রেষা, হস্তীর বৃংহিত ও কামানের গর্জন শোনা যেত, সেখানে জেগে ওঠে কীর্তনের কলরোল। সমস্ত মল্লভূম প্লাবিত হয় প্রেমের বন্যায়।**

একদিক দিয়ে তাতেও কল্যাণ সাধিত হয়েছিল প্রচুর। ঐ সময় থেকে উচ্চ, নীচ সব সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈষ্ণব ধর্ম ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়ার ফলে ঐ সমস্ত অঞ্চলে অস্পৃশ্যতা প্রথা শিথিল হয়ে ক্ষয়িষ্ণু হিন্দু জাতিকে ধর্মান্তর গ্রহণের অভিশাপ থেকে বহুল পরিমাণে রক্ষা করেছিল। একদিক দিয়ে মহারাজ বীর হাম্বিরদেবের সেও এক বিশিষ্ট কীর্তি। **তাঁর আর এক কীর্তি জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সব প্রজাকেই তিনি সমান চোখে দেখতেন।** হিন্দু ব্রাহ্মণ প্রভৃতির মতো মুসলমান পীর-ফকিরেরাও তাঁর কাছে সম্মান ও সমাদর পেতেন সমানভাবে। হিন্দুদের দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তির মতো মুসলমানদের পীরোত্তর সম্পত্তিও তিনি দান করে গেছেন প্রচুর। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত পীর কোরবান সাহেবের আস্তানা তাঁরই মহৎ দান। আর শুধু তাই নয়, তাঁর মহান *ব্যবহারে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর সভায় যাতায়াত করতেন কোরবান সাহেব এবং আউলিয়া* গোঁসাই ছিলেন তাঁর সভালঙ্কৃত।"

জ্ঞানী-গুণী, সিদ্ধ-সাধক এবং ভক্তদের যে তিনি কতখানি সম্মান ও শ্রদ্ধা করতেন সে বিষয়ে শ্রদ্ধেয় মাণিকলাল সিংহ একটি মনোজ্ঞ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। তাঁর পিতামহীর নিকট শোনা ঘটনাটির বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

"বীরহাম্বীর বিষ্ণুপুরের চার/পাঁচ মাইল উত্তরে অবস্থিত ধরাপাট গ্রামে এক **শ্যামচাঁদ বিগ্রহের** প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত শ্যামচাঁদ বিগ্রহটি সেকালে জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের আউলার থানে পূজিত হইত। শ্যামচাঁদ বিগ্রহের জন্য ধরাপাট গ্রামে একটি দেউল নির্মাণের জন্য বীরহাম্বীর জয়কৃষ্ণপুর গ্রামের **রাম দে** নামক এক দ্বাদশ তিলির উপর ভার দেন। কিন্তু সময় মত টাকা না দেওয়ায় দেউলটির নির্মাণ কাজ দীর্ঘ দিন পড়িয়া থাকে। এদিকে মল্লরাজা বীরহাম্বীরের মনে সন্দেহ হইল যে রাম দে নিশ্চয়ই তাঁহার দ্বারা প্রেরিত টাকা তছরূপ করিয়াছে। রাজা বীরহাম্বীর রাম দেকে তলব করিলেন এবং টাকার হিসাব দাখিল করিতে হুকুম করিলেন। রাম দে নির্দোষ এবং সৎ প্রকৃতির লোক। তিনি আদৌ লেখাপড়া জানিতেন না। রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া রাম দে করজোড়ে বলিলেন—'মহারাজ আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ, আমি লেখাপড়া জানি না। টাকার হিসাব আমি ধরাপাটের ঠাকুরের সম্মুখে দিব।'

নির্দিষ্ট দিনে রাজা বীরহাম্বীর পাত্র পারিষদ সহ ধরাপাটে উপনীত হইলেন। রাম দে ও তাঁহার পত্নী **পুষ্প দে** পূর্বেই ধরাপাট গ্রামের শ্যামচাঁদ মন্দিরের সম্মুখে মনসা মেলায় বসিয়া আছেন। তাঁহাদের চক্ষু মুদ্রিত এবং প্রাণপণে তাঁহারা ভগবানকে ডাকিতে-ছিলেন। মল্লরাজা এবং তাঁহার পাত্র পারিষদবর্গের আগমনও তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন না। যখন লোকে লোকারণ্য মহারাজ স্বয়ং উপস্থিত তখন সকলে দেখিল যে, এক বিষধর সর্প মনসার ঘটের আড়াল হইতে বাহির আসিয়া বাহ্যজ্ঞান শূন্য রাম দে'র মাথার ঘাম চাটিতেছে। সমবেত জনতা রাজার পাত্র মিত্র পারিষদ একসঙ্গে বলিয়া উঠিল সাধু! সাধু! রাম দে তুমি ধন্য। রাজা বীরহাম্বীর রাম দেকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, 'সত্যই তুমি সাধু-মানুষ, তুমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। **আজ হইতে আমি তোমাকে বিশ্বাস**

পদবীতে ভূষিত করিলাম। শ্যামচাঁদ মন্দিরের ফলকে আমার নামের পার্শ্বে তোমার এবং তোমার পত্নীর নাম লিখিত থাকিবে।" (পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, পৃঃ—১৫৫-১৫৬)

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণীয়। বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পূর্বেই বিষ্ণুপুরেও একটি **শ্যামচাঁদ বিগ্রহ** প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত বিগ্রহের পূজা 'চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী জয়দেব গোস্বামী প্রবর্তিত'। **এই শ্রীবিগ্রহের ভোগরাগে কচি আমের সাথে শোল মাছের টক দেওয়ার প্রথা প্রচলিত।**

জ্ঞানী, গুণী, আচার্য, পণ্ডিত এবং সিদ্ধ-সাধক মহাপুরুষদের সংস্পর্শে এসে বীর-হাম্বীর হয়ে ওঠেন রাজা থেকে রাজর্ষি, মানব থেকে মহামানব, মহামানব থেকে দেবমানব। উক্ত দেবমানবের দৈবশক্তির অভিব্যক্তি ঘটে স্বরচিত বৈষ্ণব পদাবলীর ললিত-কলাতেও।

"শুনগো মরম সখী কালিয়া কমল আঁখি
কিবা কৈল কিছুই না জানি।
কেমন করয়ে মন সব ভেল উচাটন
প্রেম বিনা খোয়াইনু পরানি॥

শুনিয়া দেখিনু কালা দেখিয়া পাইনু জ্বালা
নিবাইতে নাহি পাই পানি।
অগুরু চন্দন আনি দেহেতে লেপিনু ছানি
না নিভায় হিয়ার আগুনি॥

বসিয়া থাকিয়া যবে আসিয়া উঠায় তবে
লৈয়া যায় যমুনার তীর।
কি করিতে কিনা করি সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেক নাহিক রহি ধীর॥

শাশুড়ী ননদ মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীরহাম্বির চিত শ্রীনিবাস অনুগত
মজি গেল কালাচাঁদের পায়॥"

এছাড়া তাঁর স্বরচিত নিম্নোদ্ধৃত পদাবলী কীর্তনের পরতে পরতে গুরুভক্তি এবং ইষ্টনিষ্ঠার যে সুরটি প্রতিধ্বনিত হয় তাতেই স্পন্দিত হয় তাঁর অম্লান চিত্তনির্মাল্য।

"প্রভু মোর শ্রীনিবাস পুরাইলে মনের আশ
তোয়া বিনে গতি নাহি আর।
আছিনু বিষয় কীট বড়ই লাগিত মিট
ঘুচাইলা রাজ অহঙ্কার॥

করিতু গরল পান সে ভেল ডাহিন বাম
দেখাইলা অমিয়ার ধার।
পিব পিব করে মন সব ভেল উচাটন
এসব তোমার ব্যবহার॥

রাধা পদে সুধা রাশি সে পদে করিলা দাসী
গোরা পদে বাঁধি দিলা চিত।
শ্রীরাধিকাগণসহ দেখাইলা কুঞ্জ গেহ
জানাইলা দুঁহু প্রেম রীত॥

যমুনার কূলে যাই তীরে সখী ধাওয়া ধাই
রাধা কানু বিলসয়ে সুখে।
এ বীর হাম্বির হিয়া ব্রজপুর সদা ধীয়া
যাহা অলি উড়ে লাখে লাখে॥"

জীবনের প্রান্তরেখায় উপনীত হয়ে জ্যেষ্ঠপুত্র ধাড়ি হাম্বীরকে বিষ্ণুপুরের রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করে বীর হাম্বীর চলে যান বৃন্দাবনধাম। বৃন্দাবনের নান্দনিক পরিবেশে উপাস্য দেবতার ইষ্টনাম জপতে জপতে, ইষ্টচিন্তা করতে করতে জীবন-জ্যোতি নিভে আসে তাঁর।

এদিকে দিনের জ্যোতিও ম্লান হয়ে এসেছে। অতএব প্রথম দিনের পরিক্রমার সমাপ্তি ঘোষণা করছি এখানেই। আগামীকাল ঠিক সকাল ছ'টাতে আপনারা এসে যাবেন এই মূর্চার পাহাড়ে বা পাড়ে। এখান থেকেই শুরু হবে দ্বিতীয় দিনের পরিক্রমা। আগামীকাল প্রথমেই থাকবে বীর হাম্বীরের পুত্র ধাড়ী হাম্বীরের কথা। নমস্কার, শুভ সন্ধ্যা।

দ্বিতীয় দিনের পরিক্রমা

অধ্যায়-৩৪

রাজকাহিনী—১০

ধাড়ী হাম্বীর দেব ও রঘুনাথ মল্ল দেব (১ম)
(১৬২০-১৬২৬ খৃঃ ও ১৬২৬-১৬৫৬ খৃঃ)

আপনারা সকলেই যথাসময়ে যথাস্থানে এসে গেছেন দেখছি। সোনালী সূর্যের সোনা-ঝরা আলো মেখে মূর্চার পাড়ে বসে দ্বিতীয় দিনের পরিক্রমার প্রথমেই শোনাই পূর্বপ্রতিশ্রুতি মতো বীর হাম্বীর পুত্র ধাড়ী হাম্বীরের কথা।

মহারাজ বীর হাম্বীরের পর বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ধাড়ী হাম্বীর। ১৬২০ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মাত্র বছর ছয়েক রাজত্ব করেন। ভাগ্য বিরূপ। রাজসুখ সইল না তাঁর। উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হয়ে রাজসিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হন তিনি। 'মল্লভূম-কাহিনী' গ্রন্থের প্রণেতা ঁগঙ্গাগোবিন্দ রায় অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, — "পিতার মৃত্যুর পর তিনি ছয় বছর রাজত্ব করেন। কিন্তু পরে অন্ধ হ'য়ে যান এবং রাজকার্য পরিচালনায় অশক্ত হন।" (পৃঃ—৩২)

ধাড়ী হাম্বীরের রাজত্বকালে ১৬২২ খৃষ্টাব্দে মল্লেশ্বর শিবমন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এছাড়া তাঁর রাজত্বকালে উল্লেখ করার মতো কোন ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না।

ধাড়ী হাম্বীরের পর তাঁর একমাত্র পুত্র কালারাম মল্লের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার কথা। কিন্তু কালারাম ছিলেন বোবা এবং কালা। **এমতাবস্থায় "রাজ্যের কল্যাণ কামনায় মহীয়সী মহারাণী নিজে তাঁর দেবর রঘুনাথ মল্লদেবের মাথায় রাজমুকুট পরিয়ে দিয়ে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে তাঁকে অভিষিক্ত করেন।"**

রঘুনাথ মল্লের সিংহাসনে আরোহণের ব্যাপারে দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়। প্রভাত কুমার সাহা তাঁর "Some Aspects of Malla Rule in Bishnupur' পুস্তকে বীর হাম্বীরের এগারটি পুত্রের নাম উল্লেখ করেছেন। 'মল্লভূম কাহিনী' গ্রন্থ-প্রণেতা পূর্বোল্লিখিত ঁগঙ্গাগোবিন্দ রায় লিখেছেন, "মহারাজ বীরহাম্বীরের ছয়টি পুত্র ছিল—তার মধ্যে ধাড়ী মল্ল জ্যেষ্ঠ ও রঘুনাথ কনিষ্ঠ।" সুতরাং রঘুনাথের রাজা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু তিনি রাজা হয়েছিলেন। কিভাবে হয়েছিলেন? এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "কেহ কেহ বলেন রঘুনাথ বল প্রকাশ পূর্বক অন্য সকল ভাইগুলিকে পরাস্ত ক'রে রাজা হন। ধাড়ী মল্লের মহিষী রঘুনাথকে খুব সাহায্য করেছিলেন। নচেৎ তাঁর পক্ষে সিংহাসন লাভ করা হয়ত সম্ভব হোত না। রঘুনাথের বল প্রকাশে রাজ্যলাভই সত্যি ব'লে মনে হয়। কেন না রঘুনাথের উপরে ধাড়ীমল্ল ছাড়া আরও চার ভাই ছিলেন। ন্যায়তঃ ধাড়ীমল্লের পর তাঁরই

ছোট বীরমল্লের রাজা হবার কথা। কিন্তু বীরমল্লের স্থানে রঘুনাথকেই রাজা দেখি। **সুতরাং বল প্রকাশই রঘুনাথের রাজা হবার অন্যতম কারণ।"** (পৃঃ—৩২)

রঘুনাথ রাজা হওয়ার পর প্রায় চারশত বছর অতিক্রান্ত। চারশত বছরের দূরত্বে দাঁড়িয়ে রঘুনাথের রাজা হওয়ার ব্যাপারে নতুন করে কোন মনগড়া মন্তব্য করাটা হবে অজ্ঞতা এবং ধৃষ্টতার নামান্তর মাত্র। ওসবের মধ্যে না গিয়ে এখন শোনাই রঘুনাথের রাজ্য শাসনের কথা।

১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের পর থেকেই বিষ্ণুপুরকে একটি শক্তিশালী সমৃদ্ধ নগরীতে পরিণত করার স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকতেন তিনি। সোনাঝরা স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন কর্মবীর। শৌর্যে, বীর্যে এবং ঐশী শক্তিতে সমৃদ্ধ ছিলেন তিনি।

বিষ্ণুপুরের ৪৮তম রাজা ধাড়ী মল্ল খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগে দিল্লীর মোগল সম্রাটকে বাৎসরিক এক লক্ষ সাত হাজার টাকা কর দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন বেকায়দায় পড়ে। কিন্তু ধাড়ী মল্ল, বীর হাম্বীর বা ধাড়ী হাম্বীর কেউই দিল্লীর দরবারে কর দেননি কোনদিন। মোগল-পাঠান সংঘর্ষের সময় মহারাজ বীর হাম্বীর পাঠানদের বিরোধিতা করে দিল্লীর বাদশাহের আনুকূল্য লাভ করেছিলেন। তুচ্ছ রাজকরের জন্য দিল্লীর বাদশা মিত্র শক্তির সাথে মিত্রতা নষ্ট করার মানসিকতা পোষণ করতেন না। কিন্তু সাজাহানের পুত্র সুজা বাংলার সুবাদার হয়ে আসার পর নতুন করে কর ধার্য করেন বিষ্ণুপুরের উপর এবং রাজস্ব আদায়ের জন্য পাঠিয়ে দেন এক প্রবল পরাক্রান্ত সেনাবাহিনী। **রণনিপুণ এবং বিচক্ষণ রাজা রঘুনাথের রণকৌশলে বিষ্ণুপুরের জলদুর্গের পরিখার জলপ্লাবনে সলিল সমাধি হয়েছিল সুজার সৈন্যবাহিনীর।** পরাজয়ের গ্লানি এবং রাজস্ব আদায়ের ব্যর্থতার অপমানটা নীরবে হজম করলেন সুজা কিন্তু ভিতরে ভিতরে রঘুনাথকে শায়েস্তা করার সুযোগ খুঁজতে থাকলেন নিরন্তর। সুযোগটা এসে গেল হাতের মুঠোয়।

কুলগুরু শ্রীনিবাস আচার্য গত হয়েছেন। গুরুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র **বৃন্দাবনচন্দ্র** রয়েছেন যাজীগ্রামে। ধর্মপ্রাণ রঘুনাথ চলেছেন গুরুপুত্রের কাছে দীক্ষা নিতে। সুজার তাঁবেদার বর্দ্ধমানের শাসক জানতে পারেন খবরটা এবং অতর্কিতে আক্রমণ করে বন্দী করেন রঘুনাথকে। পাঠিয়ে দেন সুজার কাছে। কারাগারে নিক্ষেপিত হন রঘুনাথ। কারাবন্দী অবস্থায় কাটলো কয়েকদিন। এমন সময় ঘটল এক ঘটনা। রাজমহলের কারাগারে বসে তিনি লক্ষ্য করলেন এক অদ্ভুত দৃশ্য। তিনি দেখলেন বৃহদাকার এক অশ্বকে জনা সতের অশ্বরক্ষী টহল দিয়ে বেড়াচ্ছেন। একটা অশ্বের জন্য সতের জন অশ্বরক্ষী—ভাবতে গিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেলেন তিনি। তাঁর এই বিদ্রূপাত্মক হাসিটা নজরে পড়ে অশ্বরক্ষীদের। রঘুনাথের ওপর ক্ষিপ্ত অশ্বরক্ষীগণ সুজাকে নালিশ করে সাথে সাথে। গর্জে ওঠেন সুজা। তলব করেন রঘুনাথকে। নির্ভয় রঘুনাথ বলেন,—'তুচ্ছ এক ঘোড়া, তার জন্য আবার সতের জন রক্ষী! এই আপনার বীরপুরুষের দল।' তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন সুজা। বলেন, 'পারবে একে সামলাতে? বীরপুরুষের বাচ্চা। আছো তো কারাবন্দী হয়ে, এবার প্রাণে মরতে ইচ্ছে হয়েছে বুঝি।' 'কথায় কাজ কি শাহ্জাদা, পরীক্ষা নেবেন?'—সংক্ষিপ্ত উত্তর অসমসাহসী রঘুনাথের।

'হ্যাঁ, পরীক্ষা। তোমার শক্তি পরীক্ষা। যদি এই ঘোড়ায় চড়ে তুমি এখানে জ্যান্ত ঘুরে আসতে পার তাহলে তুমি মুক্ত, তোমার রাজ্যের রাজস্ব মুক্ত, সঙ্গে নবাবী-

উপহার—' ঘোষণা করেন সুজা।

যেই কথা সেই কাজ। এক লাফে ঘোড়ায় চড়ে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন রঘুনাথ। চলে যান দৃষ্টিসীমার বাইরে। রঘুনাথের মৃতদেহ তুলে আনার জন্য পিছনে পিছনে ছুটল আর এক অশ্বারোহীর দল। কারণ দুরন্ত এই ঘোড়ায় চড়ে আজ পর্যন্ত রক্ষা পায়নি কেউই। পিঠ থেকে ফেলে আরোহীকে পদাঘাতে ক্ষতবিক্ষত করে শেষ করেছে মুহূর্তে। রঘুনাথের কপালেও বোধ করি লেখা আছে সেই ভাগ্যলিপি—ভাবছেন সুজা।

এমন সময় সিংহবিক্রমী সেই তেজী ঘোড়ায় চড়ে সুজার সম্মুখে হাজির হলেন রঘুনাথ। এক লাফে নেমে পড়লেন ঘোড়ার পিঠ থেকে। ক্লান্ত রঘুনাথ শ্রান্ত ঘোড়াকে পায়চারী করাতে থাকেন তার সম্ভাব্য পরিণতির কথা চিন্তা করে।

সমস্ত ক্ষোভ ভুলে গিয়ে বীরের মর্যাদা দিতে এগিয়ে আসেন সুজা, বলেন—যাও বীর, বিশ্রাম কর।

'একটু পরে শাহ্‌জাদা,—ঘোড়াটাকে একটু পায়চারী করানো একান্ত দরকার। নতুবা মারা যাবে বেচারা।' বলেন রঘুনাথ।

'যানে দো।' বলে ওঠেন খেয়ালী সুজা।

একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুজার-আদেশ শিরোধার্য করেন রঘুনাথ। অল্পক্ষণের মধ্যেই মারা যায় ঘোড়াটা।

প্রতিশ্রুতি পালন করেন সুজা। মহামূল্য উপঢৌকন সহ মুক্তি পান রঘুনাথ মল্ল। রঘুনাথের সিংহবিক্রমে সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাঁকে 'সিংহ' উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই থেকে মল্লরাজাগণ স্বীয় নামের পর 'মল্ল' পদবীর পরিবর্তে 'সিংহ' লেখেন। রঘুনাথ মল্ল তাই পরবর্তীকালে হয়েছিলেন রঘুনাথ সিংহ এবং বিষ্ণুপুর হয়েছিল নবাব দরবারের স্বাধীন মিত্ররাজ্য।

এই অসম্ভবকে সম্ভব করে রাজা রঘুনাথের কেমন যেন মনে হল ঈশ্বরের অসীম কৃপাদৃষ্টি আছে তার উপর। বিষ্ণুপুরে ফিরে এসে দেবঋণ শোধ করার অভিমানসে মন্দিরাদি নির্মাণ এবং দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার কাজে মনযোগ দেন। মনোনিবেশ করেন বিষ্ণুপুরকে মনোমত করে সাজাবার কাজে। এ-প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ ঘটক মহাশয়ের লেখা 'চিত্রে ও গল্পে বিষ্ণুপুর' গ্রন্থ থেকে একটুখানি পড়ে শোনাই আপনাদের। তিনি লিখেছেন, ''রাজা রঘুনাথ যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন রাজধানী বিষ্ণুপুরকে যত দিক দিয়ে সম্ভব সাজাতে চেষ্টা করতেন এবং এর জন্যে তিনি কৃপণতা না করে ইচ্ছামত টাকা খরচ করতেন। **রাজধানীর প্রজাদের চাষের সুবিধার জন্যে তিনি বড় বড় পাঁচটি বাঁধ কাটিয়ে দিয়েছিলেন।** কেন তিনি পাঁচ পাঁচটি বড় বড় বাঁধ কাটিয়েছিলেন তার একটি বিশেষ কারণ আছে। .... মল্লভুমের রাজারা রাত্রে গোপনে গোপনে রাজধানী বিষ্ণুপুরের প্রজাদের দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াতেন। সারাদিনের কাজ-কর্মের পর রাত্রিকালে যখন প্রজারা এক এক জায়গায় জমা হ'য়ে গল্প করত সেই সময়ে তারা রাজার কাজের সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করে কিনা তা জানবার জন্যে মল্লরাজারা অনেক সময়ে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। রাজা রঘুনাথ একদিন সন্ধ্যার কিছু পরে একা প্রজাদের আলোচনা শুনবার জন্যে শহরে বেরুলেন। তাঁকে আর বেশীদূর যেতে হ'ল না। সেদিন একটা কি পর্বের দিন ছিল—লোকের সারাদিন কোনই কাজ কর্ম ছিল না, দিনের বেলায় এখানে সেখানে দশ পনের জন মিলে তাসপাশা খেলা করছিল। সন্ধ্যার পর এক জায়গায় প্রায় পঞ্চাশ ষাট জন লোক জমা হ'য়ে খুব হট্টগোল করছিল, একে অপরকে শাসিয়ে খুব জোরে

জোরে কথা বলছিল। ব্যাপার হচ্ছে, সে বছর বৃষ্টি ভাল হয় নাই—বর্ষার প্রথমে কিছু বৃষ্টি হয়েছিল, কিন্তু ভাদ্র মাস থেকে এক বিন্দুও বৃষ্টি পড়ে নাই, ফলে জমি সব শুকিয়ে কাঠ হ'য়ে গেল। বিষ্ণুপুরের চিরকালই প্রধান খাদ্যশস্য ধান—জলের অভাবের জন্যে ধান গাছ যদি মরে গেল তবে সারা বছর লোকে কি খেয়ে বাঁচবে! সেই জন্যে যে যেখানে সুবিধা পায়, পুকুর বা বাঁধ থেকে নালা কেটে নিয়ে গিয়ে জমির ধানে জল দিবার জন্যে চেষ্টা করে। হট্টগোলটা হচ্ছিল একটা বাঁধের জল নিয়ে। সে বছর বিষ্ণুপুরের একটা বাঁধ ছাড়া অন্য বাঁধগুলি প্রায় সব শুকিয়েই গেছল। একদল বল্‌ছিল আগে তাদের জমিতে জল দেবে—অপর দল তার প্রতিবাদ করছিল। এই নিয়ে দু'দলে খুব বচসা হতে লাগল—রাজা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে তাদের কথাবার্তা শুনতে লাগলেন। কথাবার্তার মধ্যে একটি বুড়ো লোক বলে ফেল্লেন—'রাজার পাপে রাজ্যি লষ্ট, রাজাও যেমন হয়েছে, কেবল ঠাকুর, ঠাকুর করেই অস্থির—আর এদিকে যে এক ফোঁটা জলের জন্যে রাজ্যিশুদ্ধ মরে যাচ্ছে, সে দিকে রাজার খেয়াল নাই।'—রাজা এই কথা শুনে মনে মনে খুব বেদনা অনুভব করলেন। সত্যিই তো, তিনি রাজকার্য ভুলে গিয়ে কেবল ঠাকুর নিয়েই ছিলেন। রাজ্যের প্রজাদের যে এমন অবস্থা হয়েছে তা তো তিনি জানতেন না। রাজা আর গেলেন না। অন্তঃপুরে ফিরে এলেন। সকাল হ'তে না হ'তে মন্ত্রীদিকে ডেকে হুকুম দিলেন একমাসের মধ্যে পাঁচটি বাঁধ কাটাতে হবে—তাতে যত টাকা লাগে ধনভাণ্ডার থেকে যেন খরচ করা হয়। দেখ্‌তে দেখ্‌তে একমাসের ভিতর পাঁচ পাঁচটা বাঁধ কাটা হ'য়ে গেল।" (চিত্রে ও গল্পে বিষ্ণুপুর, পৃঃ—৫৬-৫৮)

এই সময় ইনি যে পাঁচটি জলাশয় খনন করিয়েছিলেন সেগুলি হল—**পাটসায়র, লালসায়র, সীতাসায়র, গৌরাঙ্গসায়র ও রঘুনাথসায়র**। এদের মধ্যে পাটসায়র, রঘুনাথ-সায়র আজও বিদ্যমান। বড়কালীতলার রঘুনাথসায়র মহল্লা রাজা রঘুনাথের সাথে সাথে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত রঘুনাথ জীউ-এর কথাই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়।

জলাশয় পাঁচটির পাশাপাশি তিনি কয়েকটি মন্দির নির্মাণ করান। যাদবনগরের মন্দির, বিক্রমপুরের মন্দির ছাড়াও ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে পঞ্চরত্ন বিশিষ্ট শ্যামরায়ের মন্দির, ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে 'জোড়বাংলা' বা কৃষ্ণরায়ের মন্দির এবং ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে একরত্ন বিশিষ্ট কালাচাঁদ মন্দির এবং পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুর নিমতলা মহল্লাতে রঘুনাথ জীউ-এর অস্থল তাঁরই কীর্তি। এগুলির মধ্যে শ্যামরায়ের মন্দির এবং জোড়বাংলা মন্দির টেরাকোটা শিল্পের অপূর্ব সুষমায় শ্রীমণ্ডিত। এসব মন্দির ইতিমধ্যেই আমি আপনাদের দেখিয়েছি এবং শুনিয়েছি মন্দির-গাত্রে নিবদ্ধ শিল্পভাবনার কথা।

'পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া' পুস্তকের গ্রন্থকার তরুণদেব ভট্টাচার্য রাজা রঘুনাথ প্রসঙ্গে যে কথাগুলি লিখেছেন এক্ষেত্রে সেগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, "এ ছাড়া রঘুনাথ সিংহের মহিষী ও রাজস্ব আদায়কারীও দুটি মন্দির তৈরি করিয়েছিলেন। মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার চিত্রগুলি থেকে সমসাময়িক সমাজ ও জনজীবনের অনেক টুকিটাকি খবর জানা যায়।

মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরে সে সময় নানাজাতের মানুষ এসে বসতি গড়ে তুলেছিলেন। বিচিত্র তাদের চেহারা, বিচিত্র সাজ পোশাক। গায়ে লম্বা ডোরাকাটা জামা, পায়ে শুঁড়ওয়ালা জুতো, মাথায় সুচালো ধাঁচের জাহাঙ্গীরীতাজ। রাজপুরুষদের হাতে বাজপাখী, কোথাও মালা হাতে আলখাল্লা পরা সুফী দরবেশ। এদেরই পাশাপাশি ভারী গড়নের নারীপুরুষ। নাকে নথ, স্ফীত চিবুক, কানজোড়া দীর্ঘ নয়ন, ভক্তি বিনম্র প্রশান্ত মুখমণ্ডল।

টেরাকোটা চিত্রগুলিতে এইসব বিচিত্র মানুষের মিছিল শিল্পীর অসাধারণ কুশলতায় স্থির হয়ে আছে। এ যেন রাজপুত ও মোগল চিত্রকলার সঙ্গে গুজরাট ও ত্রিপুরার চিত্ররীতির সহজ ও স্বচ্ছন্দ সংমিশ্রণ।" (পৃঃ—১১৪-১১৫)

রাজা রঘুনাথের আরো কয়েকটি উল্লেখযোগ্য কাজ হল, পাথর দরজা সংলগ্ন মূর্চার পাহাড়ের উত্তর দিকে অবস্থিত পাথরের রথ, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মাসীর বাড়ি এবং অতিথি অভ্যাগতদের জন্য অস্থল বা অতিথিশালা নির্মাণ এবং এগুলি পরিচালনার জন্য মোহান্ত নিয়োগ। এ ধরনের সুবিধা থাকার জন্য সাধু মোহান্ত এবং অতিথি অভ্যাগতের দল হামেশা, আসতেন বিষ্ণুপুরে। দু-চারদিন থাকতেন, আবার চলে যেতেন। সাধু-সন্ন্যাসী, শিষ্য সেবক সহ মোহান্তগণ এবং হাতি, ঘোড়া, উট সমভিব্যাহারে আসতেন রাজকীয় বাহিনী এবং বণিক সম্প্রদায়। আশ্রয়, আহার, নিরাপত্তা কোন কিছুর জন্যই দুর্ভাবনা ছিল না তাঁদের।

আজ আর রঘুনাথ নেই। নেই সেই রাম কিংবা রামরাজত্ব। স্বাধীনতা উত্তর ভারতে রাজনীতির নোংরা আবর্তে অবহেলিত এবং উপেক্ষিত মন্দির-নগরীর ঐতিহ্য বিস্মৃতির প্রান্তরেখায় উপনীত হয়েছে।

কথায় কথায় এসে গেলাম অনেক দূরে। এবার কথা বলি একটু অন্য সুরে। শোনাই রাজা রঘুনাথ সম্পর্কে প্রচলিত একটি কিংবদন্তির কথা।

বাংলার সুবেদার সুজার জন্মদিন উৎসব। 'রাজমহলের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বিশাল চন্দ্রাতপ ও বহু-মূল্যবান উপাদান দিয়ে তৈরী করা হয় এক সুদৃশ্য মণ্ডপ।' রঘুনাথ সহ বাংলার সমস্ত রাজা, মহারাজাগণ সেখানে আমন্ত্রিত। সকলেই চলে গেছেন, আসন গ্রহণ করেছেন আগেভাগে। দেরী হয়েছে রঘুনাথের, আসন নেই বসার। অস্বস্তিতে পড়েন তিনি। অপমান-বোধে বিব্রত হন। নিজের সম্মান নিজে রক্ষা করতে হয়ে ওঠেন সক্রিয়।

তারপর কি ঘটেছিল সে বিষয়টিকে 'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী' পুস্তকের ৬৫ পৃষ্ঠাতে ছবির মতো তুলে ধরেছেন লেখক ৺ফকির নারায়ণ কর্মকার। তিনি লিখেছেন,—

"অসীম শক্তিশালী রাজা তাঁর অপরিসীম শক্তি দিয়ে সেই মণ্ডপের বিশাল এক স্তম্ভকে তুলে ধরে সেখানে বসেন। আর সেই থামকে রাখেন নিজের জানুর ওপর। সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তিত হয়ে যায় সেখানের পরিবেশ। সেই স্তম্ভকে তোলার প্রচণ্ড আলোড়নে নড়ে ওঠে সমগ্র মণ্ডপ। সকলে উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠেন তার কারণ জানবার জন্য। এমন সময় সুজার কাছে গিয়ে পৌঁছায় সেই সংবাদ। সেখানে গিয়ে দেখেন তিনি সেই অলৌকিক দৃশ্য। নির্বিকার রঘুনাথ মল্লদেবের জানুর ওপর সেই বিশাল স্তম্ভ। তাতে যেমন হন তিনি আশ্চর্য—তেমনি হন মুগ্ধ! 'বন্ধু' সম্বোধন করে নিয়ে গিয়ে পাশের আসনে তাঁকে বসান। উচ্ছ্বসিত আবেগে বলেন, তোমার মতন অসীম শক্তিশালী বন্ধু লাভ করে নবাব দরবার ধন্য। **আজ থেকে সম্পূর্ণ করভার মুক্ত সুবে বাংলার স্বাধীন মিত্র রাজা তুমি।"**

দেবভক্ত, দৈবক্ষমতা সম্পন্ন, প্রজাবৎসল রাজা রঘুনাথ বুড়ো রঘুনাথ নামেও পরিচিত ছিলেন। মহারাজ বুড়ো রঘুনাথ প্রায় ত্রিশ বছর রাজত্ব করেন একাদিক্রমে। ১৬৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর শাশ্বত শাসনে নিভে যায় তাঁর জীবন-দীপ—বিষ্ণুপুরের রাজবংশের বিস্তীর্ণ আকাশ থেকে খসে পড়ে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক।

শেষ হল রাজা প্রথম রঘুনাথের কথা। এদিকে আমরাও উপনীত হলাম রাজা রঘুনাথ নির্মিত পাথরের রথের সম্মুখে। ঐ দেখুন সেই রথ।

অধ্যায়-৩৫

পাথরের রথ

পাথর দরজার উত্তর দিকে, বিষ্ণুপুরের ভোজনতলা মহল্লায় অবস্থিত প্রতিষ্ঠালিপি বিহীন এই পাথরের রথটি মহারাজ প্রথম রঘুনাথ মল্লের রাজত্বকালে সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি × ৮ ফুট ৬½ইঞ্চি, প্রায় বর্গাকার ভিত্তিবেদীর উপর সর্বসাকল্যে ১১ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চ ক্ষুদ্রাকৃতি এই রথটি আগাগোড়া বাঁকুড়ার মাকড়া পাথরে তৈরী। রথটির গঠনশৈলীতে শিল্পীর সুষ্ঠু মাত্রাবোধ এবং সুরুচির আভাস সুস্পষ্ট।

১ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চ, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি বর্গাকার ভিত্তি-বেদীর রক-যুক্ত বর্গাকার মেঝেটির মাপ ৮ ফুট ১১ ইঞ্চি। ভিত্তিবেদীর মেঝের থেকে ২ ফুট ১ ইঞ্চি উচ্চতায় রচিত হয়েছে দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৮ ফুট ৩ ইঞ্চি মাপের বর্গাকার ছাদ। প্রথম তলার এই ছাদের উপর ৩ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চ দ্বিতীয় তলের বর্গাকার ছাদটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৬ ফুট। দ্বিতীয় তলের ছাদের উপর ৪ ফুট ৭ ইঞ্চি উচ্চ চূড়াটি বিদ্যমান।

দ্বিতল এই রথ-মন্দিরটির ভিত্তিবেদীর অভ্যন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে দুপাশে তিনটি করে এবং মধ্যভাগে দুটি অর্থাৎ সর্বসাকল্যে আটটি চাকার অর্ধাংশ নজরে পড়ে। **চাকাগুলির সংযোজনই শিল্পসৌধটিকে 'রথ' আখ্যায় ভূষিত করেছে। চাকাগুলির অনুপস্থিতিতে এটি একটি ক্ষুদ্রাকৃতির মন্দির রূপেই স্বীকৃতি লাভ করত।** প্রথম তলের পূর্ব দিকের মধ্যভাগে একটি বৃহদাকার এবং তার উভয় পার্শ্বে দুটি করে চারটি সমান মাপের অর্থাৎ মোট পাঁচটি পত্রাকৃতির খিলান দরজা এবং পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রায় সম-মাপের ৬টি করে অর্থাৎ সর্বসাকল্যে ২৩টি পত্রাকৃতির খিলান দরজা পরিলক্ষিত হয়। সামগ্রিক বিচারে বারান্দা পরিবেষ্টিত রথ-মন্দিরের নিম্নতলাটি দেখতে অনেকটা রাসমঞ্চের খিলানাবৃত চত্বরের অনুরূপ। বারান্দা পরিবেষ্টিত দ্বিতীয় তলে চতুর্দিকেই তিনটি করে মোট বারোটি পত্রাকৃতির খিলান দরজা বিদ্যমান। দ্বিতীয় তলার গর্ভকক্ষের কেন্দ্রস্থলে বিগ্রহ স্থাপনের ভগ্নবেদীর অবশিষ্টাংশটি প্রমাণ করে যে অতীতে এই স্থবির রথ-মন্দিরে কোন দেব-বিগ্রহ পূজিত হতেন অথবা রথ জাতীয় কোন বিশেষ উৎসবে এখানে শ্রীবিগ্রহ স্থাপন করে উৎসবাদি উদ্‌যাপিত হত। বাঁকানো কার্নিসযুক্ত ঢালু ছাদের উপর চর্তুদিকে দরজা বিশিষ্ট বৃত্তাকার চূড়াটি মানিয়ে গেছে বেশ মানানসই ভাবে। সাদামাটা অলংকরণে শোভিত ধ্বজাবিহীন এই স্থাপত্যটির খিলান দরজা সমূহের ভারবাহী স্তম্ভগুলির ক্ষেত্রে এবং আনুষঙ্গিক অঙ্গ-সজ্জার ক্ষেত্রে শিল্পীর সংযত শিল্প-ভাবনার স্বাক্ষর পরিস্ফুট। পঙ্খের পলেস্তারা খসে পড়ায় আংশিক লাবণ্যহীন হওয়া সত্ত্বেও সার্বিক বিচারে ক্ষুদ্রাকৃতির এই রথ তথা রথ-মন্দিরটি শুধু বিষ্ণুপুর নয়, পশ্চিমবঙ্গ নয়, সমগ্র ভারতের স্থাপত্য শিল্পের আঙ্গিনায় নতুন চিন্তাধারার অভিনবত্বে বিশেষ সমাদর এবং স্বীকৃতি লাভ করেছে।

সুদুর অতীতে মল্লরাজবংশে ধুমধাম সহকারে রথযাত্রা উৎসব উদযাপিত হত। ধাতু নির্মিত একটি রথে বিগ্রহ স্থাপন করে পাথর দরজা থেকে গুমঘর অবধি রাজপথে টানা হত সেই রথ। রথযাত্রার সময় এই পাথরের রথে দেব-বিগ্রহ স্থাপন করে হোম, যজ্ঞ, পূজাদি অনুষ্ঠিত হত যথানিয়মে। রথযাত্রা উৎসবে এবং রাজ-পরিবারের অন্যান্য উৎসবে ব্রাহ্মণ এবং প্রজা-সাধারণকে এখানে ভোজন করানো হত। এজন্যই স্থানটি 'ভোজনতলা'

নামে প্রসিদ্ধ। আজ থেকে ১৬৫ বছর আগে বন্ধ হয়েছে সেই রথ উৎসব। **রথ উৎসবের স্মৃতিস্মারক হিসেবে রয়ে গেছে শুধু পাথরের রথটি।**

এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে কালাচাঁদ মহল্লায় রাধাগোবিন্দ মন্দিরের পাশে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৬ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ৮ ফুট মাপের ইষ্টক নির্মিত মনোরম একটি রথ আছে। ইতিমধ্যেই আপনাদের আমি সে রথ দেখিয়েছি।

পাথরের রথটিকে পিছনে রেখে অল্প একটু এগিয়ে যেতেই রাস্তার ডান দিকে রয়েছে 'কালীমাতা স-মিল'। উক্ত 'স-মিল'-এর মালিক **শ্রীনারায়ণচন্দ্র ঘোষ** (বয়স ৪৭) জানালেন এখন যেখানে তাঁর 'কাঠ চেরাই কল'টি রয়েছে মল্লরাজাদের আমলে এটি ছিল একটি **অস্থল** বা **অতিথিশালা**। বিভিন্ন পাল-পার্বণ, উৎসবাদি ছাড়াও সারা বছরই বিষ্ণুপুরে আসতেন বহু সাধু-সন্ন্যাসী ও মহান্ত। মল্লরাজারা তাঁদের থাকার জন্য বানিয়েছিলেন এই অস্থল। অস্থলটির দেখাশোনার দায়িত্বভারপ্রাপ্ত শেষ ব্যক্তি ছিলেন ঁভৈরব মহন্ত। পরবর্তীকালে মালিকানা সূত্রে প্রাপ্ত ভগ্নস্তূপে পরিণত অস্থলটির জমি তিনি বিক্রী করেন পূর্বোক্ত নারায়ণ বাবুকে। মল্লরাজাদের কীর্তির স্মৃতি-বিজড়িত অতীতের এই অস্থলটি ১৯৮১ খৃষ্টাব্দে কাঠ কাটা কলে রূপান্তরিত হয়। একদিন যে স্থানটি সাধু-সমাগমে হরিনাম সংকীর্তনে মুখরিত হয়ে থাকত সদাসর্বদা, আজ সেখানে সর্বংসহা মহীরুহ-বৃক্ষাদির মর্মবিদারী দানবীয় গর্জন শোনা যায় দিনভ'র।

এবার আমাদের গন্তব্যস্থল লালবাঈ-এর স্মৃতি-বিজড়িত 'নতুন মহল' অঞ্চল। এখন পথের পাথেয় মহারাজ বীর সিংহের জীবনালেখ্য।

অধ্যায়-৩৬

রাজকাহিনী—১১

বীরসিংহ দেব (১৬৫৬-১৬৮২ খৃঃ)

রাজা রঘুনাথ সিংহের (১ম) লোকান্তরের পর ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র **বীরসিংহ** বিষ্ণুপুরের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। মিশ্র মানসিকতার মানুষ ছিলেন ইনি। আধ্যাত্মিকতা, নিষ্ঠুরতা, অমানুষিকতা, স্ত্রী-বশবর্তিতা—এসব উপাদানে গঠিত মানুষটি ঐতিহাসিকদের বর্ণনাতে **'বিষ্ণুপুরের বিভীষিকা'** রূপেই সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

রাজ্যলাভের অব্যবহিত পরেই মন্দির নির্মাণ ও দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতে মনোনিবেশ করেন তিনি। সুদূর বৃন্দাবন থেকে রাধালালজীউ বিগ্রহ আনয়ন পূর্বক ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে লালজীউ মন্দির নির্মাণ ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা তাঁরই কীর্তি। ঐতিহাসিকগণের ধারণা বড় ও ছোট পাথর-দরজা দ্বয় তাঁরই তৈরী। ইতিমধ্যেই লালজীউ মন্দির আপনারা দেখেছেন। দেখেছেন বড় ও ছোট পাথর-দরজা দ্বয়। শুনেছেন তাদের আত্মকথা।

লালজীউ মন্দির, বড় ও ছোট পাথর-দরজা ছাড়াও বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত সাবড়াকোণ গ্রামে অত্যন্ত জাগ্রত দেবতা ঁডেঙোরামকৃষ্ণ জীউ-এর মন্দির ও শ্রীবিগ্রহ, বিষ্ণুপুরের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত বীর সিংহ গ্রামে ঁবৃন্দাবনচন্দ্র জীউ-এর শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীমন্দির ছাড়াও রণিয়াড়া, মুনিনগর ও তেজপালের মন্দির ত্রয় তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন। এতদ্‌ব্যতীত তাঁর অত্যন্ত ধর্মপরায়ণা পত্নী শিরোমণি বা চূড়ামণি

দেবীকে দিয়ে তিনি ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করান বিষ্ণুপুরের মহাপাত্রপাড়া মহল্লার মুরলীমোহন মন্দির, মন্দিরের পশ্চাতে 'মা গোঁসাই'-এর পুষ্করিণী এবং মাধবগঞ্জের মদনগোপাল জীউ-এর শ্রীমন্দির।

কেউ কেউ বলেন ঔরঙ্গজেবের সমসাময়িক রাজা বীরসিংহ তাঁর রাজত্বকালে বিষ্ণুপুর থেকে রাজত্ব স্থানান্তরিত করেন বিষ্ণুপুরের উত্তরে অবস্থিত বীরসিংহ গ্রামে। অবশ্য ইতিহাসের আলোকে এ তথ্য সমর্থিত হয় না। তবে মনে হয় বীরসিংহের বিশেষ কোন অবদানের জন্য বিষ্ণুপুরের প্রায় ১৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত জঙ্গলাকীর্ণ ঐ গ্রামটির নাম হয় **বীরসিংহ**। বীরসিংহ গ্রাম আজও রাজা বীরসিংহের স্মৃতি বহন করছে নীরবে।

রাজা বীরসিংহের এইসব কীর্তিকলাপ একদিকে যেমন তাঁর দেবপ্রীতি ও ইষ্টনিষ্ঠার পরিচয় দেয়, অন্যদিকে পানে চুন বেশী হওয়ায় জিভ পুড়ে যাওয়ার তুচ্ছ অপরাধে অধঃস্তন কর্মচারীর প্রাণদণ্ড দেওয়া তাঁর চূড়ান্ত নিষ্ঠুরতা ও অমানবিকতার পরিচয় বহন করে। **এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে এই মর্মান্তিক ঘটনার পর থেকেই বিষ্ণুপুরের রাজবাড়ীর পানে চুন দেওয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল।**

রাজা বীরসিংহের নির্ম্মম নিষ্ঠুরতার কথাচিত্র আঁকতে গিয়ে 'চিত্রে ও গল্পে বিষ্ণুপুর' গ্রন্থের গ্রন্থকার লিখেছেন, "বীরসিংহ খুব হিংসুটে ছিলেন। প্রজাদের উপর তিনি খুব অত্যাচার ও নির্দ্দয় ব্যবহার করতেন। **তাঁর মত অত্যাচারী রাজা মল্লরাজবংশে কেউ ছিলেন না**। তিনি রাজা হয়েই রাজবংশের লোকদিগকে অন্তঃপুর থেকে তাড়িয়ে দিলেন—এবং পিতা, পিতামহ ও পূর্ব্ব পুরুষগণ যে সব নিষ্কর জমি লোকদিগকে দান করে গেছলেন, সে সব জমি তিনি কেড়ে নিলেন।" (পৃঃ—৬৪)

রাজা বীরসিংহ ছিলেন যেন জীবন্ত বিভীষিকা। "যেজন্য তাঁর আত্মীয় স্বজনেরা পর্যন্ত তা সহ্য করতে পারেন না। তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর মাধব সিংহ ও ফতে সিংহ প্রকাশ্যে করেন তার প্রতিবাদ। তাঁরা বলেন, আপনার নির্মমতায় সমস্ত রাজ্য অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। আপনার ঐ অমানুষিক আচরণ আপনি পরিত্যাগ করুন।

কিন্তু তাতে কিছু সুফল হয় না। যা হয়, তা তার বিপরীত। তিনি আরও নির্ম্মম হয়ে ওঠেন। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে তিনি ফতে সিংহ ও মাধব সিংহকে কারাগারে আবদ্ধ করেন এবং সেই অবস্থায় মাধব সিংহকে বিষ দিয়ে হত্যা করেন। কিন্তু ফতে সিংহকে ত করা সম্ভব হয় না। তিনি কোন প্রকারে পলায়ন করে রায়পুর নামক গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হন এবং ধলভূমের রাজকুমারীকে বিবাহ করে সেখানে প্রতিষ্ঠা করেন **রায়পুর** নামে এক ক্ষুদ্র রাজ্য।" মহারাজ বীরসিংহের নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিতে গিয়ে 'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী' গ্রন্থের ৭৩ পৃষ্ঠাতে এসব কথা লিখেছেন লেখক ফকিরনারায়ণ কর্মকার।

স্বামীর এই নিষ্ঠুর আচরণে যার-পর-নাই ব্যথিত হতেন মহারাণী শিরোমণি দেবী। স্বামীকে শান্ত করা, দেব-প্রেম ও মানব-প্রেমের মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার প্রাণান্ত প্রচেষ্টাই ছিল তার জীবনের একমাত্র ব্রত। কিন্তু সে সুযোগ ও সৌভাগ্য তাঁর হয় না। কারণ শারীরিক অসুস্থতার কারণে দুর্জন সিংহ, শূর সিংহ ও কৃষ্ণ সিংহ নামে তিন পুত্রকে রেখে অকালমৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি। প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর রাজকন্যা স্বর্ণময়ী দেবীকে বিবাহ করেন বীরসিংহ। বিবাহের নামে বিষবৃক্ষ আনয়ন করেন অন্দরমহলে।

বিবাহের পর স্বর্ণময়ী দেবী একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দেন। শিশুটির নাম রাখা

হয় বলদেব। জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজ্যলাভের প্রথা বিষ্ণুপুর রাজবংশে স্বীকৃত। সুতরাং আইন অনুসারে স্বামীর অবর্তমানে রাজা হবেন শিরোমণি দেবীর জেষ্ঠ্যপুত্র দুর্জ্জন সিংহ। একথা ভাবতেই রাতের ঘুম টুটে যায় রাজমহিষী স্বর্ণময়ী দেবীর। হিংসায় জ্বলতে থাকেন দাউ দাউ করে, বুনতে থাকেন পৈশাচিক ষড়যন্ত্রের জাল। স্বর্ণময়ীদেবীর প্ররোচনায় রাজা বীরসিংহ নাকি তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভজাত শূর সিংহ ও কৃষ্ণ সিংহকে গৃহবন্দী করে প্রাচীর তুলে জ্যান্ত সমাধি দেবার আদেশ দিয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেন হত্যা করার আদেশ দিয়েছিলেন। যেভাবেই হোক শূর সিংহ ও কৃষ্ণ সিংহ নিহত হয়েছিলেন। তখনকার মত বেঁচে গেলেন দুর্জন সিংহ। চক্রান্ত সফল হয়েছে দেখে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন স্বার্থপর স্বর্ণময়ী। এবার তাঁর বিষদৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হল স্বীয় পুত্র বলদেবের রাজা হওয়ার পক্ষে একমাত্র অন্তরায় দুর্জন সিংহের উপর। কথায় বলে, রাজা করে রাজ্য শাসন, রাজাকে শাসে যে রাণী। স্ত্রৈণ বীরসিংহ শাসিত হলেন। পুনরায় প্ররোচিত হলেন পুত্র-নিধনে। প্রথমে "দুর্জ্জন সিংহকে হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি দিয়ে আট দশ দিন গারদখানায় আটকিয়ে রাখা হ'ল।........তারপর একদিন রাজার হুকুম এল— আজ দুর্জ্জন সিংহকে হত্যা করতে হবে। হত্যা করবার লোক ঠিক করা হল। তাদের বার বার করে বলে দেওয়া হল, লোকালয়ের বাইরে গভীর বনের মাঝে নিয়ে গিয়ে যেন দুর্জ্জন সিংহকে হত্যা করা হয় এবং তার টাট্‌কা রক্ত যেন রাজার কাছে আনা হয়। এ সমস্ত কাজ দেখবার ভার এক সেনাপতিকে দেওয়া হল। সেইদিনই গভীর রাত্রে দুর্জ্জন সিংহকে কারাগার থেকে বার করে সেনাপতি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন। রাজপুত্রকে হত্যা করবার জন্যে যাদের নিযুক্ত করা হয়েছিল তাদিকে সেনাপতি বিস্তর টাকা দিয়ে বললেন—'রাজার মাথা খারাপ, তা না হলে নিজের ছেলেকে বিনা দোষে কেউ হত্যা করবার আদেশ দিতে পারে? রাজা অত্যাচারী, বদখেয়ালী ও নিষ্ঠুর। এমন নিষ্ঠুর রাজার আদেশে রাজপুত্রকে আমরা হত্যা করব না। এঁকে আমরা লুকিয়ে রাখব এবং বনের একটা পশু পাখীর রক্ত নিয়ে রাজাকে বলব যে এই রাজপুত্রের রক্ত। তাহলেই রাজা নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন। রাজা যতদিন না মরবে ততদিন রাজপুত্রকে আমরা বার করব না.........লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা করব।' সেনাপতির এই সব কথা শুনে রাজার লোকদের মন আনন্দে ভরে গেল এবং তারা সেনাপতির কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে ধর্ম্ম সাক্ষী করে শপথ করল।" সেনাপতির পরিকল্পনা মত বন্যপশুর টাটকা রক্ত দেখানো হল বীর সিংহকে। রাণীর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পেরে নিশ্চিন্ত হলেন পুত্রহন্তা রাজা।

নৃশংস বীরসিংহকে সকলেই ঘৃণা করতেন মনে প্রাণে। সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেবার চক্রান্ত করতেন গোপনে গোপনে। কিন্তু সামনা-সামনি তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস ছিল না কারো। কারণ রাজকার্যে অসাধারণ দক্ষতার পাশাপাশি কঠোর ভাবে বিদ্রোহ দমনে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত এবং নিদারুণ নির্মম। এ প্রসঙ্গে অভয়াপদ মল্লিক মহাশয়ের 'হিস্টরি অফ্ বিষ্ণুপুর-রাজ' গ্রন্থের একটি বিশেষ অংশের বাংলা তর্জমা শোনাই আপনাদের। তিনি লিখেছেন—মালিয়াড়ার রাজা মণিরাম অধ্বর্যু একবার প্রজাদের উপর অত্যাচার করেন এবং বিষ্ণুপুরের রাজার আনুগত্য অস্বীকার করেন। এই সংবাদ শুনে বীরসিংহ কয়েকজন বরকন্দাজ সহ রাজস্ব আদায়কারী একজন রাজকর্মচারীকে পাঠিয়ে দেন মালিয়াড়াতে। রাজকর্মচারী হাতিতে চড়ে এগিয়ে গেলেন মণিরামের প্রাসাদ অভিমুখে। তার আগমনের সংবাদ পেয়ে প্রাসাদের প্রবেশ-তোরণ বন্ধ করে দেওয়া

হয় আগেভাগে। তখন রাজকর্মচারীর নির্দেশে বরকন্দাজ সৈন্যগণ প্রবেশ তোরণের দরজা ভাঙতে শুরু করেন। মণিরাম মুর্শিদাবাদের নবাবের কাছে সরাসরি সাহায্য আশা করেছিলেন। সেই আশাতে বলীয়ান হয়ে তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রকে মল্লসৈন্যদের হটিয়ে দেবার নির্দেশ দেন। আদেশ পাওয়া মাত্র মণিরামের ভ্রাতুষ্পুত্র তীরন্দাজ বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসেন এবং এলোপাথাড়ি তীর ছুঁড়ে ক্ষত-বিক্ষত করে দেন বিষ্ণুপুরের বরকন্দাজবাহিনীকে। তীরের আঘাতে মৃতপ্রায় হাতিতে চড়ে প্রাণ নিয়ে কোন রকমে পালিয়ে বাঁচেন রাজকর্মচারী। বীর সিংহকে জানান সব কথা। প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়েন তিনি। উদ্ধত মণিরামকে শায়েস্তা করতে বিশাল এক সেনাবাহিনী দিয়ে পাঠিয়ে দেন সেনাপতিকে। আদেশ দেন মণিরামকে কেটে টুকরো টুকরো করতে।

সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে সেনাপতি ঢুকে পড়েন মণিরামের প্রাসাদে। অতি সহজেই মণিরামকে পরাস্ত করেন। তারপর হাতে পায়ে বেঁধে বন্দী মণিরামকে টানতে টানতে নিয়ে আসেন মালিয়াড়া সন্নিকটস্থ সাবিয়াড়া গ্রামে এবং অক্ষরে অক্ষরে পালন করেন রাজা বীর সিংহের অমানবিক আদেশ। বন্দী মণিরামকে কেটে টুকরো টুকরো করে করেন হাজার টুকরো।

এদিকে পুত্র বলদেবের আকস্মিক মৃত্যুতে স্বর্ণময়ী দেবীর রাজমাতা হওয়ার স্বপ্ন ভঙ্গ হয়। পুত্রশোকে, আশাভঙ্গের হতাশায়, এবং স্বীয় দুষ্কর্মের অনুশোচনায় মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে উন্মাদবৎ হয়ে যান তিনি। **এসব দেখে পাপাচারী রাজার চৈতন্যোদয় হয়। শুরু হয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত।** অনুতাপের আগুনে পুড়তে পুড়তে তিলে তিলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে শেষ হয়ে যান রাজমহিষী। আর স্ত্রী-পুত্র, সহোদর ভাই সকলকে হারিয়ে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েন বীরসিংহ, অনুশোচনায় ভরে যায় মন। বিবেকের দংশনে জর্জরিত হতে হতে দেহে মনে নেমে আসে অবসন্নতা। চিন্তায় রোগগ্রস্ত হয়ে পড়েন তিনি। রাজকার্যে দেখা দেয় চরম বিতৃষ্ণা এবং অনীহা। কিন্তু বংশে এমন কেউ নেই যাকে বসিয়ে দেওয়া যায় সিংহাসনে। তাঁর মনের কথা বুঝতে পেরে যথা সময়ে সত্য কথা প্রকাশ করেন সেনাপতি। জানিয়ে দেন যুবরাজ দুর্জন সিংহ জীবিত আছেন। সাথে সাথে তাঁকে নিয়ে আশা হয় রাজার সম্মুখে। পুত্রকে দেখে তাঁর রোগক্লিষ্ট বিবর্ণ মুখে ফুটে ওঠে অম্লান আনন্দ রেখা—আকাশের চাঁদ যেন নেমে এসেছে মাটিতে। **স্নেহবিগলিত হৃদয়ের স্নেহ-সিঞ্চনে পুত্রের মাথায় পরিয়ে দেন রাজমুকুট।**

জনশ্রুতি বলে, জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তানকে নৃশংসভাবে হত্যা করার অপরাধে ব্রহ্মহত্যার আত্মগ্লানিতে জর্জরিত বীরসিংহ স্বীয় পাপের প্রায়শ্চিত্তের উদ্দেশ্যে বেছে নেন আত্মহত্যার পথ। **মল্লভূমের আকাশ থেকে যেন খসে পড়ে এক খেয়ালী উল্কা।**

•

অধ্যায়-৩৭

রাজকাহিনী—১২

দুর্জন সিংহদেব (১৬৮২-১৭০২ খৃঃ)

পিতা বীর সিংহের জীবিত অবস্থাতেই **দুর্জন সিংহ** বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হন। দিল্লীর মসনদে যখন শেষ শক্তিশালী মোগল সম্রাট ঔরংজেব শোভা

পাচ্ছিলেন, বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসনে তখন শোভা পাচ্ছিলেন মহামান্য মহারাজ দুর্জন সিংহ। এতদর্থে দুর্জন সিংহ ছিলেন সম্রাট ঔরংজেবের সমসাময়িক। বাল্যকালে ইনি ছিলেন শান্ত, নম্র, ভদ্র এবং সর্বজনপ্রিয়। এই সদ্‌গুণগুলির সাহায্যেই সেনাপতি সহ সব রাজকর্মচারীদের হৃদয় কিনে নিয়েছিলেন তিনি এবং রক্ষা পেয়েছিলেন অবধারিত মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে। সেকথা শুনিয়েছি ইতিমধ্যেই। আবার দেখি ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন রাজ-সম্মানে ভূষিত, রাজ্যশাসক রূপে পূর্ণমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, তখন আবাল্য প্রতিপালিত ঐসব গুণাবলী তাঁর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হয়ে তাঁকে করে তুলেছে এক সর্বাঙ্গসুন্দর সর্বজনপ্রিয় মানুষ। এজন্যই ঐতিহাসিকগণ এঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ঐতিহাসিক ফকিরনারায়ণ কর্মকার ১৯৬৭-৬৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী' গ্রন্থের ৮৯ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন, "........**নামে ইনি দুর্জ্জন হলেও পিতা বীরসিংহের মত দুর্জ্জনতার কুখ্যাতি এঁর নেই। ইনি অত্যন্ত ন্যায়বান, সচ্চরিত্র, ধর্ম্মপ্রাণ নরপতি ছিলেন। পিতা বীরসিংহ কর্তৃক বাজেয়াপ্ত প্রজাদের সমস্ত সম্পত্তি ইনি সকলকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল একদিক দিয়ে বিষ্ণুপুর-ইতিহাসের এক স্মরণীয় কাল। এঁর সময় বিষ্ণুপুরে টাকায় চার মণ করে চাল পাওয়া যেত। ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দ ও ১০০০ মল্লাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত মদনমোহনদেবের শ্রীমন্দির এঁরই প্রতিষ্ঠিত কীর্তি।**" শুধুমাত্র মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাই নয়, কারো কারো মতে বিষ্ণুপুরে মদনমোহন শ্রীবিগ্রহ আনয়ন করেন মহারাজ দুর্জন সিংহ। যেমন শ্রদ্ধেয় গঙ্গাগোবিন্দ রায় তাঁর 'মল্লভূম কাহিনী' গ্রন্থের ৪২ পৃষ্ঠাতে বিষ্ণুপুরে মদনমোহন আনয়ন প্রসঙ্গে দুর্জন সিংহের পক্ষেই অভিমত পোষণ করেছেন। লিখেছেন, "বীর হাম্বীর, তাঁর পুত্র রঘুনাথ সিংহ বা পৌত্র বীরসিংহ কিংবা প্রপৌত্র দুর্জ্জন সিংহও হ'তে পারেন। খুব সম্ভব দুর্জ্জন সিংহই হ'বেন। কেন না দুর্জ্জন সিংহই মদনমোহনের মন্দির তৈয়ারী করে তাতে ঐ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন (১৬৯৪ খৃঃ অব্দে)।" শিক্ষক লেখক অভয়াপদ মল্লিক লিখেছেন, "Durjan Singha was not cruel like his father." ডঃ প্রভাত কুমার সাহা তাঁর 'Some Aspects of Malla Rule in Bishnupur' গ্রন্থে দুর্জন সিংহের চরিত্র চিত্রণ করতে গিয়ে উদ্ধৃতি সহযোগে উক্ত পুস্তকের ২৯ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন, "Durjan Singh too was a very competent ruler. He was capable of maintaining an effective control over distant regions like Bogri in modern Midnapur district and Raipore in Orissa. He also exercised authority over Chandrakona and Garbeta (Places in modern Midnapore district). Ramcharan Chakravarty, his court poet, described him as a devoted Vaisnava and also as a great warrior."

দুর্জন সিংহের প্রশস্তি রচনা করতে গিয়ে সভাকবি **রামচন্দ্র চক্রবর্তী** লিখেছেন,—

শ্রীযুক্ত দুর্জনসিংহ নামে নৃপবর।
শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দে উন্মত্ত ভ্রমর।।
মল্লকুল সলিলেতে উৎপত্তি উৎপল।
মহাবলবান অস্ত্রশাস্ত্রেতে কুশল।।

গ্রন্থকার তরুণদেব ভট্টাচার্য তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া' গ্রন্থে দুর্জন সিংহ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "দুর্জন সিংহের আমলেই বিষ্ণুপুরের পার্শ্ববর্তী রাজ্য গড়বেতা মল্লরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। গড়বেতার রাধামাধব মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি এই তথ্য সমর্থন করে।"

৯৯২ মল্লাব্দে বা ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। দুর্জন সিংহের রাজত্বকালের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পটভূমিকা প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন, "বীরসিংহের সময় থেকেই মল্লরাজ্য মুঘলদের প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে এসেছিল।........

দুর্জন সিংহের শাসনকালে বাংলার নানা স্থানে আর এক শক্তি ক্রমশঃ সংঘবদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এঁরা ছিলেন ইউরোপীয় বণিক সম্প্রদায়। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজেরা। ইউরোপীয়দের মধ্যে পর্তুগীজরা এসেছিলেন সর্বপ্রথম। বাংলায় তাঁদের প্রথম ঘাঁটি ছিল চট্টগ্রামে। সেখান থেকে সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণী। পরে গুছিয়ে গাছিয়ে বসেছিলেন হুগলীতে। ওলন্দাজদের ছাউনি ছিল চুঁচুড়ায়। ফরাসীরা ঘাঁটি গেড়েছিলেন চন্দননগরে। ইংরেজদের কুঠি ছিল বালেশ্বর, কাশিমবাজার ও কলকাতায়।"

দুর্জন সিংহ প্রসঙ্গে এসব কথা অবতারণার মধ্যে ঘোষিত হয়েছে—সাবধান বাণী, অনুরণিত হয়েছে অদূর ভবিষ্যতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পদধ্বনির পূর্বসংকেত।

দুর্জন সিংহের রাজত্বকাল অবশ্য কেটেছিল নির্বিঘ্নে। একাদিক্রমে প্রায় বিশ বছর তিনি পরম শান্তিতে রাজত্ব করেন। পিতা বীরসিংহের নিষ্ঠুরতা এবং প্রবল প্রতাপই হয়তো প্রকারান্তরে হয়ে উঠেছিল এই নিরবচ্ছিন্ন শান্তির সূচক। বীরসিংহের পুত্র দুর্জন সিংহ— একে মা মনসাঁ তাই আবার ধুনার গন্ধ। **দুর্জন সিংহ নামের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল আতঙ্ক। নাম শুনেই চুপ্‌সে যেত বহিঃশত্রু। নিরুপদ্রবে রাজত্ব করতেন রাজা।** ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হওয়ার পর থেকে ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন সগৌরবে এবং সসম্মানে। মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান ন'টি পুত্র। এঁরা হলেন রঘুনাথ সিংহ, গোপাল সিংহ, চামর সিংহ, গাজি সিংহ, যশোমন্ত সিংহ, অমর সিংহ, গজরাজ, সিংহ, নরহরি সিংহ, এবং দ্রোণ সিংহ। পিতার মৃত্যুর পর বিষ্ণুপুরের রাজবংশের নিয়মানুসারে রাজ-সিংহাসনে বসেন জ্যেষ্ঠ পুত্র রঘুনাথ সিংহ।

রাজা রঘুনাথ সিংহের কথা শোনাব পরে। এখন শুনুন নতুন মহলের অতীব জাগ্রতা দেবী শ্মশানকালীমাতার কথা।

অধ্যায়-৩৮

নতুন মহলের শ্রীশ্রীশ্মশানকালীমাতা

বাংলা ১৩০৭ সাল। কলেরা এবং বসন্তে মানুষ মরছে কাতারে কাতারে। কান্নার রোল উঠেছে গৃহে গৃহে, পাড়ায় পাড়ায়। অজানা অচেনা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানায় ভীত সন্ত্রস্ত্র বিপদাপন্ন মানুষ,—'রক্ষা করো। রক্ষা করো।' মৌন ঈশ্বর মৌনই থাকেন। আসে না উত্তর। শহরবাসীর এই বিপদের দিনে রক্ষাকর্তা হিসেবে এগিয়ে আসেন এক কাপালিক সাধক।

বিষ্ণুপুরের মাড়ুইবাজার মহল্লায় প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন অতীব শ্রীদর্শন বহু পুরানো একটি গণেশমূর্তি। রয়েছে গণপতির জন্য গণেশমন্দির। বিষ্ণুপুর ময়রা-ষোলআনার উক্ত গণেশ মন্দিরের পর্ণকুটির-বিশিষ্ট অতিথিশালায় প্রায়ই আসতেন বহু সাধুসন্ত। বিষ্ণুপুরের স্থান মাহাত্ম্যের আকর্ষণে সেই সময় উক্ত গণেশমন্দিরে এসেছেন এক তান্ত্রিক-সাধক। নাম

তাঁর **অবধূত সুধীরানন্দ সরস্বতী**। প্রভৃত অলৌকিক শক্তির অধিকারী দিব্যদর্শন এই সাধুর শরণাপন্ন হলেন বিষ্ণুপুরের ঈশ্বরানুরাগী মানুষজন। মহামারী থেকে বিষ্ণুপুরবাসীদের রক্ষা করার জন্য সানুনয়ে অনুরোধ করেন বারংবার। করুণাধারায় বিগলিত হলেন মহাসাধক। বললেন, আমি শ্মশানে কালী প্রতিষ্ঠা করব। কিন্তু এমন শ্মশান হওয়া চাই যেখানে লক্ষাধিক শব দাহ হয়েছে'। বিষ্ণুপুরের চারটি শ্মশান হল যথাক্রমে, (১) বিষ্ণুপুরের পূর্বে নতুন মহল শ্মশান (২) পশ্চিমে কালিন্দী শ্মশান, (৩) উত্তরে সিদ্ধেশ্বরী শ্মশান (৪) দক্ষিণে ভাটপুকুর শ্মশান। এর মধ্যে কোনটিতে লক্ষাধিক নরদাহ হয়েছে জানা যাবে কি করে?—প্রশ্নটা ভক্তবৃন্দের চোখে চোখে ঘুরছে। মুখ খুললেন তন্ত্রসাধক। বললেন, 'আমার হাতের এই ত্রিশূল নিয়ে আমি যাব শ্মশানে শ্মশানে এবং এক কোপে যে শ্মশানে ত্রিশূল প্রোথিত হবে সেখানেই বুঝবে লক্ষাধিক নরদাহ হয়েছে। যদি তা হয় তবেই শ্মশানে বামাকালী প্রতিষ্ঠা করব আমি এবং মড়কজনিত প্রাণহানি বন্ধ হবে। নিবৃত্ত হবে মড়ক।' কাজ করলেন কথামত। চারটি শ্মশানের মধ্যে ত্রিশূল প্রোথিত হল নতুন মহলের শ্মশানে। যে স্থানটিতে ত্রিশূল প্রোথিত হয়েছিল সেখানেই মাতৃমূর্তি প্রতিষ্ঠিতা হয়েছিলেন প্রথমে। বর্তমানের কালীমাতা মন্দিরের উত্তরে রয়েছে লালবাঈয়ের স্মৃতি বিজড়িত চৌবাচ্চা পুষ্করিণী। উক্ত পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত অশ্বত্থ বৃক্ষের নিকটেই একটি খড়ের চালার আচ্ছাদনের নীচে শাঁখারীবাজার মহল্লার ফৌজদার বংশের জনৈক ব্যক্তি ও সাধুমহারাজের যৌথ প্রচেষ্টাতে নির্মিত হয় প্রথম বামাকালী এবং পূজিতা হন রাত্রি নিশীথে।

সাধুমহারাজের নির্দেশ ছিল তিনি প্রজ্বলিত মশাল হস্তে শহর পরিক্রমা করবেন। কিন্তু ঐ সময় তাঁর সম্মুখে যে এসে পড়বে মৃত্যুমুখে পতিত হবে সে। কেউ যেন সে সময় শহরের রাস্তায় বের না হয়। তান্ত্রিক-সাধকের আদেশ শহরময় প্রচার করে দেওয়া হয় ঢোল-শহরতে। নির্ধারিত সময়ে মশাল হস্তে শহর পরিক্রমা করেন কাপালিক-সাধক। **নিবৃত্তি হয় মড়ক। মায়ের মহিমা এবং সিদ্ধ-সাধকের অলৌকিক শক্তিমত্তার পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হন শহরবাসীগণ।** অতঃপর পূর্বোক্ত চৌবাচ্চা পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব কোণে নির্মিত হল মাটির দেওয়াল ও খড়ের ছাউনি বিশিষ্ট মাতৃমন্দির এবং তারও পরে ১৩২৮ সাল থেকে ১৩৩০ সাল এই দু'বছরে বিষ্ণুপুর নিবাসী মাতৃভক্ত মোক্তার রামপ্রসন্ন মোহান্ত মহাশয়ের আর্থিক অনুদানে নির্মিত হয় বর্তমানের পাকা দালান-যুক্ত মন্দিরটি। ১৩৩০ বঙ্গাব্দ থেকে উক্ত শ্রীমন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা হয়ে মা পূজিতা হয়ে আসছেন আজ প্রায় সাতাত্তর বছর। প্রতি তিন বছর অন্তর মা নতুন কলেবর ধারণ করেন। সন্তানবৎসল মমতাময়ীর মাতৃঅঙ্গনে পশুবলি নিষিদ্ধ। দীপান্বিতা কালীপূজা, রটন্তী কালীপূজা এবং ফলহারিণী কালীপূজার রাত্রিতে অর্থাৎ বছরের ৩৬৫ দিনের মধ্যে মাত্র এই তিন রাত্রিতে মাকে খিচুড়ি ভোগ নিবেদন করার রীতি প্রচলিত। অন্যান্য দিন দিবাভাগে ভক্তগণের মানত অনুসারে মাকে খিচুড়ি ভোগ এবং পায়েস নিবেদন করার নিয়মও প্রচলিত। প্রতি শনি, মঙ্গল ও অমাবস্যা তিথিতে পূজার ভিড় হয় সর্বাধিক।

এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে বিষ্ণুপুর মিশন উচ্চ বিদ্যালয়ের পণ্ডিত মশাই **শ্রীযুক্ত আদিত্য কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** গত ৩০/৩১ বছর যাবৎ দীপান্বিতা কালীপূজার রাত্রিতে তন্ত্রধারকের ভূমিকায় মায়ের পুজো হোম ও চণ্ডীপাঠ করে আসছেন একান্ত নিষ্ঠা সহকারে।

অত্যন্ত জাগ্রতা এই দেবীর কৃপায় তথা দৈব-ঔষধে গলিত কুষ্ঠ থেকে অর্শ এবং

বহু দুরারোগ্য রোগ নিরাময় হয়েছে, আজও হয়। বন্ধ্যা নারীরা সন্তানলাভে শ্রীমণ্ডিতা হন। অশান্ত হৃদয়ে শান্তি সুধা বর্ষণ করে মা শ্মশানেশ্বরী অগণিত ভক্তহৃদয়ে সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তিরূপে অধিষ্ঠিতা আছেন।

কথিত আছে, চিন্ময়ী সত্তায় বিরাজিতা এই মা তাঁর ভক্তগণকে কখনো বা লালপাড় সাদা শাড়ি পরিহিতা সধবা রমণীর রূপে, বাচ্চা শিশুর রূপে অথবা সর্পরূপী সরীসৃপের রূপেও দর্শন দেন। বিষ্ণুপুর নিমতলা মহল্লা নিবাসী ৺ক্ষুদিরাম ভাণ্ডারী ছাড়াও মনোমোহন মিত্র (সম্পাদক, শ্মশানকালী মাতা পরিচালক সমিতি), রাধারমণ চন্দ্র, স্ফটিক চন্দ্র গোস্বামী, ৺বিশ্বনাথ দাঁ প্রমুখ ভক্তবৃন্দ মাকে পূর্বোক্ত রমণীর বেশে দর্শন করে পরিতৃপ্ত হয়েছেন। মাকে সর্পরূপে দর্শন করেছেন ৺ক্ষুদিরাম ভাণ্ডারীর জামাতা তথা শ্মশানকালীমাতার পরিচালক সমিতির বর্তমান সভাপতি প্রবীণ আইনজীবী শ্রীশশধর ঘোষ মহাশয়ের পত্নী গীতারাণী ঘোষ মহাশয়া। প্রায় আট নয় বছর আগের ঘটনা। বৈশাখ মাসের সন্ধ্যালগ্নে পরিচালক সমিতির সভা হচ্ছে মাতৃমন্দিরে। শশধরবাবুর সাথে পত্নী গীতারাণীও উপস্থিত সেখানে। বিশেষ এক প্রয়োজনে গীতা দেবী গিয়েছেন মাতৃমন্দিরের পশ্চাতের পুকুরে। ছোটখাটো প্রাকৃতিক কাজ সেরে হাত পা ধুয়ে পুকুরের সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতে গিয়ে দেখেন বিশাল এক সর্প **ফণা** উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। পিছনে সুগভীর পুকুর, সামনে সাক্ষাৎ মৃত্যু। আশে পাশে ঢালু জমি এবং ঝোপ-ঝাড়। পালাবার পথ না পেয়ে ভয়ে চিৎকার করে ওঠেন তিনি, 'মা, মাগো রক্ষা কর মা।' **সাথে সাথে তাঁর মনে হল কে যেন তাঁকে কোলে তুলে নামিয়ে দিল পুকুরের পাড়ে।** চিৎকার শুনে সকলে ছুটে যান নিমেষে। সাপটি ততক্ষণে অন্তর্হিত। ঘটনাটি শুনে পুরোহিত ঠাকুর মন্তব্য করেছিলেন,—'মায়ের নিজস্ব কিছু সাপ আছে এখানে। ঘোরাঘুরি করে রাতের আঁধারে, কিন্তু কারো কোন ক্ষতি করে না।' কেউ কেউ বলেছিলেন,—'মা সর্পরূপে বিহার করেন এখানে।'

বিষ্ণুপুর নিমতলা মহল্লা নিবাসী ৺ক্ষুদিরাম ভাণ্ডারী, ৺রামচন্দ্র ভাণ্ডারী ও ৺সুবল চন্দ্র ভাণ্ডারী মহাশয়ের প্রদত্ত জমির উপরেই গড়ে উঠেছে মাতৃমন্দির এবং তৎসংলগ্ন নাট-মন্দির। পূর্বোক্ত ভাণ্ডারী পরিবারের ৺ভোলানাথ ভাণ্ডারীর পত্নী ৺সুরধনী ভাণ্ডারী উক্ত নাটমন্দিরটি নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করান।

প্রতি বৎসর বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে ঐ নাটমন্দিরে শ্রীনিবাস আচার্য প্রতিষ্ঠিত মহাপ্রভুর (গৌর নিতাই) দারু মূর্তি উপাসনার মাধ্যমে মহাধুমধাম সহকারে নবরাত্রিব্যাপী চব্বিশপ্রহর উৎসব উদযাপিত হয়। জনতার ভিড়ে জমজমাট হয়ে ওঠে শ্মশান-প্রাঙ্গণ। ছোটখাটো মেলার রূপ পরিগ্রহ করে মাতৃ-অঙ্গন। আরো একটি উল্লেখ্য বিষয় হল বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় বাজার মহল্লা নিবাসী শ্রীরাধাকান্ত মণ্ডল পরিবারের আর্থিক অনুদানে দীপান্বিতা কালীপূজার অন্নকূট উৎসবের দিন বিগত তিন বছর যাবৎ দিবাভাগে মহা সমারোহে খিচুড়ি ভোগ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিবজ্ঞানে জীবরূপী নরনারায়ণের সেবা করানো হয় উক্ত মণ্ডল পরিবারের প্রশান্ত মণ্ডল মহাশয় ও নতুন মহল শ্মশানকালীমাতা ষোলআনা কমিটির সদস্যবৃন্দের পরিচালনা এবং তত্ত্বাবধানে। অবশ্য তার পূর্বেও ক্ষুদ্রাকারে নরনারায়ণ সেবা হত ফি-বছর।

বর্তমানে মায়ের পূজারী দুজন—**শ্রীবংশীধর চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।** এঁদের মধ্যে শ্রীবংশীধর চট্টোপাধ্যায় ওরফে কাল ঠাকুর এসব তথ্য জানালেন আমাকে। কথা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন তাঁর বাবার জীবিতাবস্থায় মাঝে মধ্যে তিনি মায়ের পুজো

করতে যেতেন। মন্দিরস্থ সব দেব-দেবীর পুজো করেন, ফুল জল দেন, কিন্তু ফুল জল দেওয়া হয়নি বা পুজো করা হয়নি মা মনসাকে। অর্থাৎ মায়ের পদতলে শায়িত শিবঠাকুরের কণ্ঠলগ্ন দুধে খরিসের ফণাতে ফুল দেন না কোনদিন। একদিন পুজো করতে গিয়ে হঠাৎ দেখেন মায়ের কণ্ঠে বেড়ি দিয়ে রয়েছে এক দুধে খরিস। ভয় না পেয়ে তিনি হাততালি দিয়ে দুধে খরিসটিকে সরে যাওয়ার ইঙ্গিত করেন। মুহূর্তে স্বেদনালী দিয়ে অন্তর্হিত হয় সাপ। ঐ দিন রাত্রে নিদ্রিত অবস্থায় পুরোহিত ঠাকুরকে মা মনসা স্বপ্নযোগে বলেন, 'তুই সব ঠাকুরের পুজো করিস, আমার পুজো করিস না কেন? আমাকেও ফুল জল দিস।' এর পর থেকে তিনি তাই করতেন।

এই নতুন মহল অঞ্চলটিতে জনবসতি ছিল না তখন। শ্মশান ছিল বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। ঝোপঝাড়, কুল, শিঁয়াকুল, বৈঁচি ফলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গাছ-আগাছা, লতাগুল্মের পাশাপাশি বৃহদাকার বৃক্ষেরও অভাব ছিল না। গা ছম্‌ছম্‌ ভয়-ভুতুড়ে পরিবেশ। দিন দুপুরেও একা একা যেতে ভয় পেত অনেকেই। রাস্তা নয়, পায়ে চলা পথ ছিল একটি। সন্ধ্যারাত্রিতে মায়ের সন্ধ্যাপূজা ও আরতি করতে গিয়ে সবদিন ঝাঁঝ, ঘণ্টা বাজাবার লোক পেতেন না পূর্বোক্ত কাল ঠাকুরের পিতা পুরোহিত সৃষ্টিধর চট্টোপাধ্যায়। আরতি করতেন পুরোহিত মশায়। কাঁসর-ঘণ্টা পড়ে থাকতো মন্দিরের দাওয়ায়। **এমন সময় কোথা থেকে ছোট্ট একটি মেয়ে এসে ঝাঁঝ বাজাতো হেসে হেসে। আরতি শেষে মায়ের প্রসাদ দিতে গিয়ে আর খুঁজে পাওয়া যেত না মেয়েটিকে। ঘটনাটি লিখতে গিয়ে মনে পড়ে মহাসাধক রামপ্রসাদের কন্যার রূপ ধরে মা কালীর বেড়া বাঁধার কথা।**

মা শ্মশানেশ্বরীর প্রতিষ্ঠাতা সিদ্ধ-সাধক অবধূত সুধীরানন্দ সরস্বতী আজ নেই। লোক-মুখে ছড়িয়ে আছে তাঁর দিব্য জীবনের কথা। কথিত আছে একপাকে রান্না করে মাকে ভোগ নিবেদনান্তে বামাক্ষেপার মতোই তিনিও বামাভোগ নিবেদন করতেন। অর্থাৎ শিয়ালদের খাওয়াতেন। শিয়ালদের উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করে হুবহু শিয়ালের মতোই 'হুক্কা হুয়া' ডাক ছাড়তেন তিনি। ছুটে আসত শিয়ালের দল। শিয়ালদের সাথে এক সাথে আহার করতেন অবধূত সাধক।

মানুষ মরে যায়। রয়ে যায় নাম ও কীর্তি। মহাসাধক সুধীরানন্দ সরস্বতী আজ আর নেই, কিন্তু আছে তাঁর নাম, আছে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত দেবীমূর্তি। আর সুধীরানন্দ সরস্বতীর ব্যবহৃত সেই ত্রিশূল মায়ের বাম দিকের নীচের শ্রীহস্তে শোভা পাচ্ছে আজও। স্মৃতিবহন করছে ঐ সিদ্ধ-সাধকের।

শ্মশানে শ্মশানে অধিষ্ঠাতা মা কালী হলেন দশমহাবিদ্যার অন্তর্গত এক মহাবিদ্যা। তিনি আদ্যাশক্তি স্বরূপিণী। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, জীবজগৎ সবই শক্তির খেলা। লীলাময়ী আদ্যাশক্তির লীলা খেলা। যাঁর অঙ্গুলি সংকেতে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় সংঘটিত হয় তিনিই কালী। "**কালীই হচ্ছেন ব্রহ্ম, আবার বিপরীতক্রমে ব্রহ্মই কালী। যখন নিষ্ক্রিয় থাকেন অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় কার্য সম্পন্ন করেন না তখন মনে করি তিনি ব্রহ্ম। আবার যখন যাবতীয় কার্য সম্পন্ন করেন তখন মনে হয় কালী হয়ে এসব করছেন। কালী—শক্তি।** অতএব একই ব্যক্তির রূপভেদ, নামভেদ।

কালী আবার কত ভাবেই না লীলা করছেন! **একই কালী, অথচ—শ্যামাকালী, মহাকালী, রক্ষাকালী, শ্মশানকালী, নিত্যকালী এবং কৃষ্ণকালী; কত তাঁর নাম এবং রূপ।**

কেবলমাত্র বিশ্বই নয়, এমন কি চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, উপগ্রহ এমন কি নক্ষত্রও সৃষ্টি হয় নি, শুধুই অন্ধকার, জমাটবাঁধা অন্ধকার সর্বত্র বিরাজ করছিল, তখন নিরাকার মহাকালী মহাকালের সঙ্গে বিরাজিত ছিলেন।"[১]

মা শ্মশানেশ্বরীর কথা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে শোনালাম কালীতত্ত্ব। এখন দেখব লালবাঈ-এর অপরূপ রূপলাবণ্য, শোনাব রাজা রঘুনাথের সাথে তার অবৈধ প্রণয়ের কথা এবং তারই মর্মান্তিক পরিণতিতে **পতিঘাতিনী সতীর আত্মপ্রকাশের নাটকীয় কাহিনী।**

অধ্যায়-৩৯

রাজকাহিনী—১৩

রঘুনাথ সিংহদেব (২য়) (১৭০২-১৭১২ খৃঃ) ও লালবাঈ

পিতা দুর্জন সিংহের জীবিতাবস্থায় রঘুনাথ সিংহের (২য়) অভিষেক হয়। ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং রাজত্ব করেন ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। মাত্র বছর দশ রাজ্য শাসন করেছিলেন তিনি। তাঁর এই স্বল্প পরিসর রাজত্বকালে ঘটনা ঘটেনি অল্প। ঘটনার পর ঘটনা আর কথার পিঠে কথা জমে জমে এমনটা হয়েছে যে তা নিয়ে লেখা যায় সুন্দর গল্প, নাটক এবং উপভোগ্য উপন্যাস। উত্থান-পতন, আনন্দ-বেদনা, গৌরব আর গ্লানি, বেহিসেবী আবেগপ্রবণতা এবং কঠোর বাস্তবের নিষ্ঠুরতা—ইত্যাদি উপাদানগুলি ঘটনাচক্রে রঘুনাথ সিংহের জীবনালেখ্যে এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশে মিশে গিয়ে ইতিহাসের পাতায় পাতায় তাঁকে যেন বিয়োগান্ত নাটকের নায়করূপে চিত্রিত করেছে স্বর্ণাক্ষরে। **গল্পকারগণ তাঁর জীবনীকে নিয়ে লিখেছেন গল্প, ফকিরনারায়ণ কর্মকার লিখেছেন সর্বজনপ্রিয় নাটক 'পতিঘাতিনী সতী' এবং প্রথিতযশাঃ সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী লিখেছেন রোমহর্ষক উপন্যাস 'লালবাঈ'—যার প্রায় প্রতিটি পাতায় রোমান্সের ছোঁয়া, ললিত শিল্পকলার আবেশ, ভাষার মায়াময় কারুকার্য।**

এ পর্যন্ত আমরা লক্ষ্য করেছি বিষ্ণুপুরের প্রায় সমস্ত রাজা মহারাজাগণ হলেন দেবভক্ত এবং ঈশ্বর-উপাসক। সিংহাসনে আরোহণ করার পর তাঁদের প্রথম এবং প্রধান কাজ হল মন্দির নির্মাণ এবং দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেল দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের ক্ষেত্রে। **দেবভক্ত এবং ঈশ্বর-সাধকের পরিবর্তে তিনি হলেন সঙ্গীতভক্ত এবং সুর-সাধক।**

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে মহারাজ শিবসিং মল্লের রাজত্বকালে বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত সাধনার যে বীজটি অঙ্কুরিত হয়ে মৃতপ্রায় অবস্থায় টিকে ছিল কোনরকমে, দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের আমলে সঙ্গীত সাধনার উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে সেই অঙ্কুরিত চারাগাছটি যেনবা বেড়ে উঠল তর্‌তর্‌ করে, হয়ে উঠল মহীরুহ।

দিল্লীর সম্রাট আওরঙ্গজেব ও বাহাদুর শাহের (১ম) সমসাময়িক ছিলেন ইনি। ধর্মের অনুশাসনকে মেনে নিয়ে সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত অত্যন্ত গোঁড়া প্রকৃতির আলমগীর আওরঙ্গজেব সঙ্গীতপ্রিয় এবং সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাঁর সাম্রাজ্যে সঙ্গীত-শাস্ত্র অধ্যয়ন

---

১. ভারতের সাধক-সাধিকা, পৃঃ— ৩১৬, লেখক : সুবোধ চক্রবর্তী, কামিনী প্রকাশালয়।

ও অনুশীলনকে নিষিদ্ধ করেছিলেন সম্পূর্ণরূপে। তাঁর এই আদেশনামার বলে বিষ্ণুপুরে দেখা দিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। রাজা রঘুনাথ তাঁর আদেশকে অমান্য করে বিষ্ণুপুরকে করে তুললেন সঙ্গীত-সাধনার পীঠস্থান। তৎকালে মাসিক পাঁচশত টাকা বেতন দিয়ে দিল্লী থেকে নিয়ে আসেন তানসেনের বংশধর বাহাদুরসেনকে। বিনা ব্যয়ে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। সঙ্গীতানুরাগী দরিদ্র ছাত্রদের ভরণ-পোষণের দায়-দায়িত্বও গ্রহণ করেন তিনি।

বাহাদুরসেনের নিরলস প্রচেষ্টায় এবং রাজ-আনুকূল্যে বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত সাধনার জোয়ার এল। সঙ্গীতের সুর-লহরীতে ভরে উঠল বিষ্ণুপুরের আকাশ বাতাস। বাহাদুরসেনের কৃতী ছাত্রদের মধ্যে গদাধর চক্রবর্তী, দ্বারিকানাথ চক্রবর্তী, অনন্তলাল চক্রবর্তী, বৃন্দাবন নাজির, নিতাই নাজির বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাহাদুরসেনের পর গদাধর চক্রবর্তী সঙ্গীত সাধনায় অসাধারণ দক্ষতা লাভ করেন, ফলে তিনি বিষ্ণুপুর রাজদরবারের সঙ্গীতাচার্যের পদে আসীন হন। পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত সাধনায় যাঁরা আত্মোৎসর্গ করেন তাঁদের মধ্যে পুরোভাগে রয়েছেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্য, যদু ভট্ট, কৃষ্ণমোহন গোস্বামী ও ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী। এঁদের সাধনা এবং এঁদের ছাত্রদের সঙ্গীত উপাসনার রিলে-রেসে বিষ্ণুপুর 'সঙ্গীত-সরস্বতীর উপাসনার ক্ষেত্র' হিসাবে এমন একটি স্তরে উন্নীত হয় যে তার ফলে বিষ্ণুপুর **সঙ্গীতে দ্বিতীয় দিল্লী** আখ্যায় ভূষিত হয়।

বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত সাধনার এই চূড়ান্ত উৎকর্ষ লক্ষ্য করে প্রখ্যাত সঙ্গীত-সাধক রমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় **'বিষ্ণুপুর দ্বিতীয় দিল্লী'** নামে একটি পুস্তক লিখেছেন। উক্ত পুস্তকে বিষ্ণুপুরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসের পাশাপাশি বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত ও বিষ্ণুপুর ঘরানার উপর।

প্রবল প্রতাপান্বিত আওরঙ্গজেবের সঙ্গীতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারীর ফলে ভারতবর্ষের সঙ্গীতশিল্পী এবং সুরসাধকগণ মর্মান্তিক অসহায় অবস্থায় পড়েন। আলমগীরের বিরুদ্ধাচরণের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা চিন্তা করে ভারতবর্ষের কোন জমিদার, রাজা বা মহারাজা কেউই তাঁদের আশ্রয় দেননি বা পৃষ্ঠপোষকতা করেননি। ব্যতিক্রম শুধু রাজা রঘুনাথ। আলমগীরের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করার দুঃসাহস ছিল রঘুনাথের। কারণ তিনি নিজে ছিলেন সর্বান্তঃকরণে সঙ্গীতানুরাগী। সুগায়ক, সুর-সাধক এবং সঙ্গীত-সমঝদার হিসেবে সুখ্যাতি আছে তাঁর।

রঘুনাথ শুধু যে সুর ও সঙ্গীতের সমঝদার ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন রূপেরও সমঝদার, রূপের পূজারী। রূপের পূজারী হিসেবে তিনি লালবাঈ-এর রূপ-লাবণ্যে অবগাহন করেছেন, তার রূপমাধুরী পান করেছেন আকণ্ঠ। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে লালবাঈ-এর অনিন্দ্য-সুন্দর রূপের আগুনে আত্মাহুতি দিয়েছেন।

মনে প্রশ্ন জাগে কে এই **লালবাঈ?**

লালবাঈ-এর কথা শোনার জন্য আমরা এখন আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করব পূর্বোল্লিখিত প্রখ্যাত সাহিত্যিক **রমাপদ চৌধুরীর** প্রখ্যাত উপন্যাস **'লালবাঈ'**-এর পাতায় পাতায়।

লালবাঈ বিষ্ণুপুর-ইতিহাসের এক রোমাঞ্চকর চরিত্র। আজ থেকে প্রায় তিনশ বছর আগের কথা। অন্যান্য গ্রামবাসীদের মতোই লালীকে নিয়ে রহিমগঞ্জের পীরের দরগায় মানত করতে গিয়েছিল লালীর মা। লালবাঈয়ের ঘরোয়া নাম লালী। রাত্রিবেলায় গরুর গাড়িতে চড়ে সকলে মিলে ঘর ফিরছিল দল বেঁধে। হঠাৎ করে 'ঠগী লুঠেরার দল'

ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের উপর। সোনাদানা টাকা পয়সা লুটপাট করে নেয় সবকিছু। বুড়োবুড়ি বাদ দিয়ে দলকে দল চালান করে দেয় বজরায়। খোজা সর্দারের হাত ফেরি হয়ে ওরা এসে যায় নিলামদারের এক্তিয়ারের মধ্যে। মানুষ কেনা-বেচার ব্যবসা করে নিলামদার। প্রত্যেকের পায়ের পাতার উপর এবং হাতের বাজুতে উত্তপ্ত লৌহ-শলাকার ছেঁকা দিয়ে **'বান্দাছাপ'** এঁকে দিয়েছিল নিলামদারের হাবশিটা। যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল লালী এবং আরো অনেকে। তারপর পণ্যবস্তু হিসেবে ওরা একদিন এসেছিল বিবিবাজারের বিশাল মেলায়। বান্দা ও বাঁদী জীবনের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা শুনে শিউরে উঠেছিল লালী। কালো বোরখায় মুখ ঢেকে হাবশি প্রহরীর চোখে ফাঁকি দিয়ে রাতের অন্ধকারে নিজের ভবিষ্যৎ জানার অদম্য কৌতূহল নিয়ে তাই সে ছুটে গিয়েছিল বিবিবাজারের এক জ্যোতিষাচার্যের কাছে। ঠিক ঐ সময় বিষ্ণুপুরের যুবরাজ রঘুনাথ সিংহও উপস্থিত ছিলেন সেখানে।

জ্যোতিষীর নির্দেশে বোরখার মায়াজাল সরিয়ে নিয়েছিল লালী। অপলক নয়নে অনিন্দ্যসুন্দরী লালীর রূপমাধুরী উপভোগ করেছিলেন যুবরাজ রঘুনাথ। আর লালী! রঘুনাথের দিকে তাকিয়ে চোখ ফেরাতে পারেনি সহজে। উভয়েই উভয়ের প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করেন নিমেষে। এদিকে হস্তরেখা ও ললাটরেখা গণনা করে জ্যোতিষাচার্য বলেছিলেন, "তুমি বাঁদী নও কন্যা, রাজরাজেশ্বরীর শক্তি থাকবে তোমার হাতের মুঠোয়। একদিন একটি রাজ্য পরিচালনা করবে তুমি! কিন্তু তোমার মৃত্যুর কারণ হবে তোমার প্রণয়।" (লালবাঈ, পৃঃ—৫১)

ভবিষ্যদ্বাণী শুনে শিউরে উঠেছিল লালী। বুকের মধ্যে শুরু হয়েছিল ভূমিকম্প। নিলামদারের তাঁবুতে ফেরার পথে হাবশি প্রহরীটা তার ইজ্জত নষ্ট করতে উদ্যত হলে ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল লালী। মুহূর্তে এসে গিয়েছিল নিলামদার এবং নিলামদারের খোজা বান্দার দল। নিলামদারের আদেশে বেদম মার খেয়েছিল হাবশি সুলেমান। মুক্তি পেয়ে শাসিয়েছিল লালীকে।

বিবিবাজারের বাঈতল্লাটে হীরাবাঈয়ের নাচের জলসাঘরে নাচের শেষে হীরাবাঈকে 'ইনাম' দেওয়ার প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে বর্ধমান-রাজ **কৃষ্ণরাম** ও মেদিনীপুর জেলার চেতুয়াবরদার ভূস্বামী **শোভা সিংহের** বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হয়। অপমানিত শোভা সিংহ প্রতিশোধ স্পৃহায় বন্ধু রহিম খাঁয়ের কাছে সাহায্যের প্রত্যাশায় ঘোড়া ছুটিয়ে দেন উড়িষ্যার পথে।

এদিকে বিবিবাজারের বাঁদীবাজারে একশত মোহরের বিনিময়ে বাঁদী লালীকে কিনে নেয় **হীরাবাঈ**। নিয়ে যায় আগ্রার হীরামহলে। নাচে গানে তালিম দিয়ে লালীকে সে করে তোলে নৃত্যগীত পটিয়সী সুর-সাধিকা। সম্রাট আওরঙ্গজেব তামাম ভারতবর্ষে নিষিদ্ধ করেছেন নৃত্যগীত অনুশীলন। প্রমাদ গণলেন ভারতবর্ষের সুর-সাধকগণ। ঠিক এই রকম এক অশুভ মুহূর্তে **রহিম খাঁ** ভেট পাঠান হীরাবাঈকে। প্রত্যুৎপন্নমতি **হীরাবাঈ** তখন আশ্রয়ের আশায় সদলবলে ছুটে যায় রহিম খাঁয়ের দরবারে। পাঠান সর্দার রহিম খাঁ সাদরে বরণ করেন তাঁদের। হীরাবাঈ রংমহলে ঢুকেই দেখে রহিম খাঁর পাশে গোপন পরামর্শে রত **শোভা সিংহ**। তার মনে পড়ল বিবিবাজারের জলসাঘরের দুঃখদায়ক ঘটনা। ভাবল এত বছর পরও শোভা সিংহ কি বর্ধমান-রাজ কৃষ্ণরামের বিরুদ্ধে পুষে রেখেছেন সেই পুরানো আক্রোশ? এসব কথা ভাবছে হীরাবাঈ এমন সময় রহিম খাঁ তাকে নাচের

অনুমতি দিলেন। বললেন, 'নাচো, খুশী মনে নাচো হীরা।'

"হীরাবাঈ বললে, এ পূর্ণিমার চাঁদ আর কত নাচ দেখাবে বাদশা! তার চেয়ে গান শুনুন লালবাঈয়েরের। দ্বিতীয়ার চাঁদ সে, তিল তিল করে বাড়ছে তার রূপযৌবন।

লালবাঈ? বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলল রহিম খাঁ।

—হ্যাঁ হুজুর! বলেই ইশারা করলে হীরাবাঈ।

সঙ্গে সঙ্গে পর্দার আড়াল থেকে নাচের তালে তালে রহিম খাঁর সামনে এসে দাঁড়াল লালী।

রহিম খাঁ আর শোভা সিংহ বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে রইল সেদিকে। তাকিয়ে রইল লালবাঈয়ের অপরূপ নৃত্যভঙ্গিমার দিকে!

লাল রেশমের ঘাগরা, রেশমি জমিতে জরি আর পোখরাজের রোশনাই। লাল মখমলের কাঁচুলিতে যৌবনের বহ্নি। সাদা মসলিনের ওড়না লালবাঈয়ের মুখের স্বচ্ছ আবরণ।

মোহগ্রস্তের মতো সেদিকে তাকিয়ে রইল রহিম খাঁ। এ-রূপ যেন কখনও দেখেনি সে, এ-সৌন্দর্য বুঝি বা বেহেস্তের হুরীর শরীরেই সম্ভব।

হীরাবাঈ ফিসফিস করে বললে, ওড়না তুলে দিন বাদশাহ, পহেলি মাইফেল হোক আজ আপনার রংমহলে।

—পহেলি মাইফেল?

লালসালুব্ধ চোখে লালবাঈয়ের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ উঠে দাঁড়িযে নেশার পায়ে টলতে টলতে এসে ওড়না তুলে দিল রহিম খাঁ।

জীবনে এই প্রথম প্রকাশ্যে ওড়না তুলল লালবাঈ। রহিম খাঁ দিল পহেলি মাইফেলের আদেশ। এ-রীতির মর্যাদা রক্ষা করতে হবে তাকে আজীবন! স্বেচ্ছায় মুক্তি না চাইলে বাঈজীব সম্মান আর আশ্রয় দিতে হবে রহিম খাঁকে, যতদিন না লালবাঈ নিজে মুক্তি চায়।"(লালবাঈ, পৃঃ—৫১)

আবার শুরু হয়েছে নাচ। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন শোভা সিংহ আর রহিম খাঁ। এমন সময় সেখানে বিবিবাজারের সেই মসিকৃষ্ণ দৈত্যরূপী হাবশি সুলেমানকে দেখে আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে লালী। তাল কেটে যায় পায়ে। থেমে যায় ঘুঙুর। ভয়ে মুষড়ে পড়ে লালী।

উড়িষ্যার পাঠান দুর্গে শোভা সিংহ যখন রহিম খাঁর সাথে বিদ্রোহের পরামর্শে মশগুল ঠিক সেই সময় চেতুয়াবরদা থেকে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমন্ত সিংহের চিঠি পেয়ে ভীষণ বিব্রত বোধ করেন শোভা সিংহ। বাংলার সুবেদার ইব্রাহিম খাঁ তাঁর কন্যা চন্দ্রপ্রভাকে অন্দরমহলের বেগম করার তাঞ্জাম পাঠিয়েছেন। চন্দ্রপ্রভা অবশ্য সেই তাঞ্জামে পদাঘাত করে সমুচিত উত্তর দিয়েছেন।

হেমন্ত সিংহের আশঙ্কা এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে ইব্রাহিম খাঁ হয়তো নবাবী সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করবেন চেতুয়াবরদা। তাই তড়িঘড়ি খবর পাঠিয়েছেন দাদাকে। শোভা সিংহ তাঁর দুশ্চিন্তার কারণটা জানান রহিম খাঁকে। আসন্ন বিপদের কথা ভেবে পুরানো আক্রোশ ভুলে গিয়ে বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামকেও বিদ্রোহীদের দলে আনার জন্য পরামর্শ দেন রহিম খাঁ। উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার উপায় হিসেবে তিনি বর্ধমান-রাজকন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করারও প্রস্তাব দেন। কারণ রহিম খাঁর মতে, 'আত্মীয়তার চেয়ে বড়

বন্ধন আর নেই।'

উড়িষ্যা থেকে চেতুয়াবরদায় ফেরার সময় পথের আশেপাশে অসংখ্য হিন্দুমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখে ক্রোধে ফেটে পড়েন শোভা সিংহ। শুধু হিন্দু দেবমন্দির ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হলেন না হিন্দুবিদ্বেষী আওরঙ্গজেব।

"সুবা বাংলার বুকেও হিন্দু প্রজাদের উপর জিজিয়া ধার্য হল। পরোয়ানা এসে পৌছল দেববিগ্রহ বিনষ্ট করার নির্দেশ নিয়ে। গৃহস্থবধূর লক্ষ্মীর আসনেও হাত পৌছাল বিধর্মী মনসবদারের। নিষিদ্ধ হল নাচ আর গান, হিন্দুর মেলা, দীপালি উৎসব আর হোলি উৎসব। রাজকর্মে হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করা নিষিদ্ধ হল। পেশকার, দেওয়ানিয়ান, ক্রোরির আসন থেকে অবসর নিতে হল হিন্দু কর্মচারীদের। হিন্দু ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে দ্বিগুণ মাসুল ধার্য হল পণ্যদ্রব্যের ওপর।

দুর্দশার চরম সীমায় গিয়ে পৌছল হিন্দু প্রজারা। দারিদ্র্যের কশাঘাত সহ্য করতে না পেরে লক্ষ লক্ষ প্রজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করল।" (লালবাঈ, পৃঃ—৫৮)

অসহ্য হয়ে উঠল আওরঙ্গজেবের অত্যাচার। বিদ্রোহী শোভা সিংহের হাত শক্ত করল বিদ্রোহী প্রজাগণ। শোভা সিংহ স্বপ্নেও ভাবেননি ইব্রাহিম খাঁ তাঁর কন্যার দিকে হাত বাড়াবেন শেষমেষ। মোগল ঔদ্ধত্যকে শায়েস্তা করার সংকল্প নিয়ে বর্ধমানরাজ কৃষ্ণরামকে সদলে আনার অভিপ্রায়ে রহিম খাঁর পরামর্শ মতো বর্ধমান-রাজকন্যা সত্যবতীকে বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠান শোভা সিংহ। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হয় রূঢ়ভাবে। অপমানিত শোভা সিংহ বর্ধমান আক্রমণ করার জন্য এগিয়ে চলেন সসৈন্য বিদ্রোহী-বাহিনী নিয়ে।

শোভা সিংহের সাথে বিদ্রোহে যোগ দেওয়ার আগে রহিম খাঁ বিষ্ণুপুরে হীরাবাঈকে পাঠিয়ে সুকৌশলে জেনে নেন রাজা রঘুনাথের মনের কথা। জেনে নেন তাঁর যুদ্ধে বীতস্পৃহার ভাব এবং প্রবল সঙ্গীতাসক্তির কথা। আবার রূপসী লালবাঈকে ইনাম দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে হাবশি সুলেমানকে পাঠিয়ে দেন মুর্শিদাবাদের খবর আনতে। ঢাকাই মসলিন ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে ফিরোজা নাম্নী এক মসলিন প্রস্তুতকারক ও বিক্রেতার সাহায্যে সুকৌশলে সে জেনে নেয় **ইব্রাহিম খাঁর** বেগম-মহলের বিদ্রোহের কথা। জেনে নেয় তার ভীরু স্বভাব, যুদ্ধবিমুখতা ও আরামপ্রিয়তার কথা। দুদিক থেকেই নিশ্চিন্ত হন রহিম খাঁ।

'মোগল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের আর দেরী নেই'—হিন্দু জ্যোতিষীদের এরকম একটি ভবিষ্যদ্বাণীকে কেন্দ্র করে রোষে গর্জে ওঠেন পিতৃহন্তা আওরঙ্গজেব। নিষিদ্ধ হয় জ্যোতিষচর্চা, পুড়িয়ে দেওয়া হয় জ্যোতিষশাস্ত্র এবং নির্মমভাবে নির্যাতিত হন জ্যোতিষীগণ। হিন্দু নির্যাতন এবং হিন্দু মন্দির ধ্বংস করার পরোয়ানা জারী হয় সর্বত্র। আদেশ শুনে শঙ্কিত, বিচলিত এবং স্তম্ভিত হন রাজা কৃষ্ণরাম। পড়লেন মানসিক দ্বন্দ্বে। হিন্দু হয়ে হিন্দু নির্যাতন বা হিন্দু ধর্মের পীড়ন সহ্য করতে পারেন না তিনি। পক্ষান্তরে দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করতেও সাহস হয় না তাঁর। সত্যবতীর কানে পৌছে গেল এসব কথা। সত্যবতী আরও জানতে পারলেন যে আলমগীরের এই স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে, এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন একদা তাঁরই পাণিপ্রার্থী বীর শোভা সিংহ এবং শোভা সিংহের হাতকে শক্ত করার জন্য কটক থেকে মেদিনীপুরের দিকে বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছেন তাঁর দোস্ত **রহিম খাঁ।**

চেতুয়াবরদায় পৌছে রহিম খাঁ, লালবাঈ এবং জেনানা-মহলের অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদের

চেতুয়াবরদার দুর্গে রেখে সসৈন্যে এগিয়ে চললেন শোভা সিংহের সাথে মিলিত হতে। গ্রামের পর গ্রাম জয় করে তাঁরা এগিয়ে চললেন বর্ধমান অভিমুখে।

শোভা সিংহের বিদ্রোহের আশঙ্কায় রাজা কৃষ্ণরাম আগেভাগেই নবাবী সৈন্যের সাহায্যের জন্য পুত্র জগৎরামকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন বাংলার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর কাছে। এদিকে শোভা সিংহ এবং রহিম খাঁ বিদ্রোহীদের নিয়ে সসৈন্যে এসে পড়েছেন বর্ধমান-সীমান্তে। বিদ্রোহ দমনের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠেন বর্ধমান-রাজ। কিন্তু নিরুপায় তিনি। কারণ তাঁর সৈন্যবল তুলনামূলকভাবে কম এবং তাঁরই অধীনস্থ তালুকদার, ভৌমিক ও জায়গিরভোগীরা গোপনে শোভা সিংহের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। শোভা সিংহের বিদ্রোহের কথা বিশ্বাস করেননি ইব্রাহিম খাঁ। সুতরাং মুর্শিদাবাদ থেকে শূন্য হস্তে ফিরে এসেছেন জগৎরাম—আসেনি নবাবী সৈন্য। ক্রোধান্ধ কৃষ্ণরাম নগরের কেন্দ্রস্থলে শোভা সিংহের কুশপুত্তলিকা দাহ করার আদেশ দেন। কুশমূর্তিতে অগ্নিসংযোগ করতে উদ্যত হলে বাধা দেন বিদ্রোহীবীর শোভা সিংহের বীরত্বে মুগ্ধ বর্ধমান রাজকন্যা স্বয়ং সত্যবতী। কন্যার বিরুদ্ধাচরণে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন কৃষ্ণরাম। এমন সময় গর্জে ওঠে কামান। বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে বর্ধমান অবরোধ করেন শোভা সিংহ। শোভা সিংহের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে নিহত হন কৃষ্ণরাম। বন্দী হন রাজকুমারী সত্যবতী। জগৎরাম নারীর ছদ্মবেশে পালিয়ে যান মুর্শিদাবাদে।

শোভা সিংহের বিজয়-বার্তায় উল্লসিত হয়েছেন সত্যবতী। কারণ শোভা সিংহের জয় মানে ধর্মের জয়। ধন-সম্পত্তি, মায়া-মমতা, আত্মীয়-স্বজন অপেক্ষা বড় ধর্ম। ধর্মরক্ষকের প্রতীক শোভা সিংহকে মনে মনে শ্রদ্ধা করেন সত্যবতী।

সত্যবতীর এসব সুখ-স্বপ্ন এবং কল্পনাচারিতা ও ভাব-বিলাসিতা ধূলিসাৎ হয় কয়েকদিনের মধ্যেই। কারণ শোভা সিংহের সৈন্যবাহিনী এবং বিদ্রোহীগণ বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত হয়ে শুরু করে লুটপাট এবং নারীধর্ষণ। রাজ্যলাভের উন্মাদনায় শোভা সিংহও হন আদর্শচ্যুত। পশুপ্রবৃত্তি জেগে ওঠে তাঁর। এসব খবরও বন্দী সত্যবতীর কাছে পৌঁছে যায়। যে শোভা সিংহকে তার বীরত্বের জন্য শ্রদ্ধা করেছিলেন সত্যবতী, সেই সত্যবতীর হৃদয়ে এখন শোভা সিংহের জন্য শুধু ঘৃণা আর ঘৃণা।

রাতের আঁধারে খুলে যায় কারাগার। সুরাসক্ত, কামান্ধ শোভা সিংহ লোলুপ দৃষ্টিতে এগিয়ে যান সত্যবতীর দিকে। বাহুবলে আলিঙ্গন করেন সত্যবতীকে এবং পরক্ষণেই সত্যবতীর কটিবন্ধের গুপ্ত ছুরিকাঘাতে তিনি লুটিয়ে পড়েন কারাকক্ষে। পতিত হন মৃত্যুমুখে। অতঃপর আত্মঘাতী হন স্বয়ং সত্যবতী।

পলাতক জগৎরামের মুখে বিদ্রোহের খবর শুনে এবার টনক নড়ল ইব্রাহিম খাঁর। কিছু সংখ্যক সৈন্য দিয়ে ফৌজদার নুরুল্লাকে পাঠিয়ে দেন বিদ্রোহ দমন করতে।

এদিকে শোভা সিংহের মৃত্যুর পর রহিম খাঁ নিজেকে বাংলার বাদশাহ বলে ঘোষণা করেন এবং সসৈন্যে এগিয়ে যান নুরুল্লার নেতৃত্বাধীন নবাবী ফৌজকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে। রহিম খাঁর প্রবল আক্রমণের মুখে পরাজিত হয় নবাব সৈন্য। নুরুল্লা প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচেন। নুরুল্লার পরাজয়ের খবরটা পৌঁছে যায় দিল্লীর দরবারে। আওরঙ্গজেবের নির্দেশে জবরদস্ত খাঁকে বিদ্রোহ দমনের ভার দেওয়া হয়। কিন্তু জবরদস্ত খাঁর উপর বিশ্বাস রাখতে না পেরে আওরঙ্গজেব পৌত্র আজিমুশ্বানকে পাঠালেন বাংলা বিহারের শাসনকর্তার দায়িত্ব দিয়ে। জবরদস্ত খাঁ এবং আজিমুশ্বানের যৌথ আক্রমণের

মুখে পিছু হাঁটল বিদ্রোহীগণ। মৃত্যুমুখে পতিত হলেন রহিম খাঁ।

এই ঘটনার বহু আগের কথা।

রঘুনাথ তখন কিশোর যুবক। বিষ্ণুপুরের রাজপ্রাসাদে মহারাজ দুর্জন সিংহের কাছে গুপ্তচর মারফৎ খবর এল উড়িষ্যার উপকূলে বঙ্গোপসাগরে দেখা গেছে হার্মাদ দস্যুদের পঞ্চাশখানি রণতরী। পর্তুগীজ এবং মগ দস্যুদের অত্যাচারের কথা অজানা ছিল না দুর্জন সিংহের। বালেশ্বরের উপকূলে গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন এবং নারী নির্যাতন ছাড়াও তারা হাজার হাজার নারী পুরুষকে বন্দী করে নিয়ে যেত এবং দাস-ব্যবসায়ীদের কাছে স্বল্পমূল্যে বিক্রী করে দিত অন্য কোথাও। হার্মাদ দস্যুদের অত্যাচার এবং দুঃসাহস বেড়েই চলেছে দিনে দিনে। বালেশ্বর থেকে বিষ্ণুপুরও আক্রমণ করতে পারে হার্মাদ দস্যুর দল। অন্যদিকে বাংলায় বর্গী আক্রমণের আশঙ্কা প্রতি নিয়ত। উভয় সঙ্কটে পড়লেন রাজা দুর্জন সিংহ। বর্গী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য তিনি নিজে সারাক্ষণ সজাগ থাকলেন বিষ্ণুপুরে। কিশোর যুবক যুবরাজ রঘুনাথ সিংহ স্বেচ্ছায় বীরবিক্রমে এগিয়ে চললেন বালেশ্বর অভিমুখে। সঙ্গে মাত্র একশত অশ্বারোহী সৈন্য।

"গ্রামের পর গ্রাম লুঠ করে চলেছে তখন হার্মাদের দল। নৃশংস অত্যাচারের খবর এসে পৌঁছচ্ছে। হাজার হাজার নারী আর পুরুষকে বন্দী করে নিয়ে চলেছে একদল দস্যু, আরেকদল এগিয়ে আসছে তীর্থযাত্রীদের সন্ধানে।

বন্দীদের হাতের তালু ফুটো করে তার মধ্যে সরু বেত চালিয়ে পশুর মতো টানতে টানতে রণপোত বোঝাই করে নিয়ে চলেছে তাদের। হয়ত অন্য কোনও বন্দরে দাস-ব্যবসায়ীদের কাছে বেচে দেবার জন্যে।" (লালবাঈ, পৃঃ—৩৬)

চাঁদবনীর কাছে এসে রঘুনাথের সাথে দেখা হল তীর্থযাত্রীদের। জগন্নাথদেবের রথযাত্রা দর্শন করে তারা ফিরে চলেছে গৃহাভিমুখে। দল বেঁধে চলেছে সকলে মিলে। সুসজ্জিত একটি হাতির পিঠে চড়ে দলের অগ্রভাগে রয়েছে এক কিশোরী। রঘুনাথের কাছে খবর এসেছে হিজলীর বন্দরে জাহাজ রেখে সেদিকেই এগিয়ে আসছে পর্তুগীজ দস্যুর দল। তীর্থযাত্রীদের রক্ষা করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে দূর থেকে তাদের পশ্চাদগামী হন রঘুনাথ। এমন সময় লাল মখমলের কুর্তা, উজ্জ্বল সবুজ রঙের শিরস্ত্রাণ পরিহিত গোরা দস্যুর দল বিকট চিৎকার করতে করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে তীর্থযাত্রীদের উপর। শুরু হয় নৃশংস অত্যাচার এবং লুটপাট। রঘুনাথ দেখলেন হাতির পিঠে হাওদার উপর উন্মুক্ত অসি হস্তে রুখে দাঁড়িয়েছে সেই সুদর্শনা কিশোরী। **রঘুনাথের ইঙ্গিতে অশ্বারোহী মল্লসৈন্যগণ অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল গোরা দস্যুদের উপর। খণ্ডবিখণ্ডিত হয়ে নিহত হল হার্মাদের দল।** রঘুনাথ লক্ষ্য করলেন রণক্লান্ত কোমলাঙ্গী কিশোরীর হাত থেকে খসে পড়েছে অসি। তার দিকে ধেয়ে আসছে দুই দস্যু। মুহূর্তে সেই তরুণীকে ঘোড়ায় তুলে নিয়ে রঘুনাথ ছুটিয়ে দেন ঘোড়া। এমন সময় গর্জে উঠে কামান। এসে গেছে মোগল সৈন্যও। **"মোগলের কামান আর বিষ্ণুপুরের বীরত্বের পায়ে প্রাণ দিল শত শত পর্তুগীজ দস্যু, নিশ্চিহ্ন হল সমগ্র হার্মাদের দল।" (লালবাঈ, পৃঃ—৩৭) কিশোরী চন্দ্রপ্রভার কোমল হৃদয়ে বীর রঘুনাথের ছবিটি আঁকা হয়ে গেল পাকাপাকিভাবে।**

এই ঘটনার অনেক বছর পরের কথা। সত্যবতীর গুপ্তছুরিকাঘাতে নিহত হয়েছেন শোভা সিংহ। পিতা শোভা সিংহের মৃত্যু-সংবাদে মর্মাহত চন্দ্রপ্রভা। এমন সময় তাঁর

কাছে সংবাদ এল ইব্রাহিম খাঁর নির্দেশে চেতুয়াবরদা আক্রমণের উদ্দেশ্যে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসছে দশ হাজার নবাবী সৈন্য। বিচলিত হলেন চন্দ্রপ্রভা। হাতের দিকে তাকাতেই নজরে পড়ল একটি বিশেষ অঙ্গুরীয়। সখী সুরঞ্জাক্ষীকে বললেন, 'চলো যাই পারাবত কক্ষে।' সেখানে গিয়ে বিষ্ণুপুর রাজপ্রাসাদে খবর পাঠানোর জন্য নির্দিষ্ট পারাবতটিকে বুকে তুলে নেন চন্দ্রপ্রভা। পায়ে বেঁধে দেন চিঠি আর রঘুনাথের দেওয়া 'অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়'। বিষ্ণুপুর অভিমুখে ডানা মেলে দেয় পারাবত। আসন্ন বিপদের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনেক কথাই মনে পড়ে যায় অসহায় চন্দ্রপ্রভার।

হার্মাদ দস্যুদের হাত থেকে তীর্থযাত্রী সহ চন্দ্রপ্রভাকে রক্ষা করার দিন থেকেই মনে মনে রঘুনাথকে বীরের আসনে বসিয়ে বীর-পূজা শুরু করেছিলেন চন্দ্রপ্রভা। দিনে দিনে শ্রদ্ধা থেকে ভালবাসা, ভালবাসা থেকে অঙ্কুরিত হয়েছিল প্রেম। দূত মারফৎ যুবরাজ রঘুনাথকে প্রেমপত্র পাঠিয়েছিলেন চন্দ্রপ্রভা। চন্দ্রপ্রভার আমন্ত্রণ উপেক্ষা করতে পারেননি রঘুনাথ। তড়িঘড়ি এসেছিলেন প্রেমিকার আহ্বানে। জানতে চেয়েছিলেন তাঁর হৃদয়ের কথা।

সখী সুরঞ্জাক্ষী জানিয়েছিল, চন্দ্রপ্রভা তাঁর দেহমনপ্রাণ সবই সঁপে দিয়েছেন তাঁর চরণে। তিনি তাঁকে পত্নী রূপে বরণ করে যেন ধন্য করেন। রঘুনাথ সম্মতি দিয়েছিলেন সাথে সাথে। সুরঞ্জাক্ষী আর একটি প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিল।

"সুরঞ্জাক্ষী বললে, সখীর এই রূপ এই যৌবন যেন শত পত্নীর ভিড়ে হারিয়ে না যায়। বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে যেন পাটরানীর গৌরবে অধিষ্ঠিতা হতে পারেন রাজকুমারী চন্দ্রপ্রভা।

রঘুনাথ সহাস্যে বললে, সে-প্রতিশ্রুতিও দিচ্ছি আমি। কোনও দিন যদি অন্য নারীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে তোমার অসম্মান করি, তার আগে যেন তোমার হাতেই আমার মৃত্যু হয় চন্দ্রপ্রভা।

—ছি ছি, এ কি কথা বলছেন যুবরাজ! রঘুনাথের মুখে হাত চাপা দিল চন্দ্রপ্রভা।

মৃদু হেসে চন্দ্রপ্রভার অনামিকায় বিষ্ণুপুর যুবরাজের চিহ্ন-আঁকা অঙ্গুরীয় পরিয়ে দিল রঘুনাথ।" (লালবাঈ, পৃঃ—৪২)

আজ সেই অভিজ্ঞান অঙ্গুরীয়ই বিপদাপন্ন চন্দ্রপ্রভার একমাত্র আশা-ভরসা।

সংবাদবাহী পারাবত মারফৎ রঘুনাথ জানতে পারলেন তাঁর প্রেমিকা চন্দ্রপ্রভার আসন্ন বিপদের কথা। ইব্রাহিম খাঁ দশ হাজার সৈন্য নিয়ে ছুটে আসছেন চেতুয়াবরদা জয় করে চন্দ্রপ্রভাকে লুট করে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বিচলিত হন রঘুনাথ। বীরশ্রেষ্ঠ রঘুনাথ, সত্যাশ্রয়ী রঘুনাথ তানপুরা ফেলে দিয়ে তুলে নেন তলোয়ার। রঘুনাথের আদেশে বেজে উঠল রণদামামা। চেতুয়াবরদা অভিমুখে শুরু হল যুদ্ধযাত্রা। চেতুয়াবরদার সৈন্য এবং দুর্গরক্ষীরা যখন নবাবী সৈন্যের আক্রমণের ভয়ে তটস্থ ঠিক সেই সময় বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে রঘুনাথের চেতুয়াবরদায় আগমনের সংবাদ শুনে একান্ত অসহায় বোধ করল তারা। রাজকুমারী চন্দ্রপ্রভার নির্দেশে রঘুনাথের কাছে আত্মসমর্পণ করল চেতুয়াবরদার সৈন্যসামন্ত ও দুর্গরক্ষীরা। সুতরাং বিনা বাধায় চেতুয়াবরদা জয় করলেন রঘুনাথ এবং স্বীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকেন ইব্রাহিম খাঁর সৈন্যবাহিনীর আগমনের প্রতীক্ষায়। পরে জানা গেল ইব্রাহিম খাঁর চেতুয়াবরদা আক্রমণের সংবাদ মিথ্যা রটনা—গুজব।

বিপদের আশঙ্কা কেটে যেতেই চন্দ্রপ্রভা রাজসিক মর্যাদায় অভিনন্দন জানালেন রঘুনাথকে। সম্ভাব্য যুদ্ধক্ষেত্র রূপান্তরিত হল বিবাহ-বাসরে। বেজে উঠল মঙ্গলশঙ্খ, শোনা গেল উলুধ্বনি। চন্দ্রপ্রভা ও রঘুনাথের বহু-কাঙ্ক্ষিত বহু-প্রতীক্ষিত মিলন সংঘটিত হল রাজনগরে।

রাত্রির শেষযামে স্নিগ্ধ বিশুদ্ধ সঙ্গীতের সুর-মূর্ছনায় ঘুম ভেঙে যায় রঘুনাথের।

"চন্দ্রপ্রভার নিদ্রাজড়িত সুন্দর দুটি চোখের তারায় চোখ রেখে রঘুনাথ প্রশ্ন করলে, এমন কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী কে ওই গায়িকা চন্দ্রপ্রভা?

চন্দ্রপ্রভা মৃদু হাসি ছড়িয়ে দিল রঘুনাথের মুখে। বললে, বিধর্মী।

—বিধর্মী? চমকে উঠল রঘুনাথ। বললে, সঙ্গীতজ্ঞের কাছে সঙ্গীতই একমাত্র ধর্ম চন্দ্রপ্রভা, শিল্পের জগতে ধর্মের ভেদাভেদ নেই।

চন্দ্রপ্রভা বুঝতে পারল না রঘুনাথের কথা। বললে, রহিম খাঁর বেগম বিধর্মী নয়?

মনে মনে হাসল রঘুনাথ। কিন্তু ভুলতে পারল না মুসলমানীর কণ্ঠসুর।

সৈনিকদের আদেশ দিল, রাজনগর দুর্গের বালাখানায় আছে রহিম খাঁর বেগম, তাকেও বন্দী করে নিয়ে যেতে হবে বিষ্ণুপুরে।

মনকে প্রবোধ দিল, এ তো নারীলুণ্ঠন নয়, সুগায়িকার যোগ্য মর্যাদা দেবার জন্যই রহিম খাঁর বেগমকে নিয়ে চলেছি।" (লালবাঈ, পৃঃ—১১৩-১১৪)

চেতুয়াবরদার রাজনগর থেকে রঘুনাথ বিষ্ণুপুরে নিয়ে এলেন দুই নারীরত্ন—লালবাঈ ও চন্দ্রপ্রভা। আর চন্দ্রপ্রভা স্ত্রীধন হিসেবে নিয়ে এলেন 'রাজনগরের যাবতীয় রত্ন-ঐশ্বর্য, শিল্পকলার ও ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি'।

এ যাবৎ 'লালবাঈ' উপন্যাস থেকে শোনালাম লালবাঈ প্রসঙ্গে কিছু কথা। শোনালাম শোভা সিংহ, রহিম খাঁ, কৃষ্ণরাম, ইব্রাহিম খাঁ, চন্দ্রপ্রভা ও রঘুনাথ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক কথা। ঔপন্যাসিক রমাপদ চৌধুরী লালবাঈ ও চন্দ্রপ্রভার বিষ্ণুপুরে আগমনবার্তা বর্ণনা করতে গিয়ে যে তথ্যের অবতারণা করেছেন তার পাশাপাশি অন্য এক ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। এখন সেই তথ্যের আলোকে বিষ্ণুপুরে লালবাঈ-এর আগমন বৃত্তান্ত শোনাব সংক্ষেপে।

সময়টা হল ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দের শেষ, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের শুরু—বাংলার বুকে তখন অরাজকতার রাজত্ব। চেতুয়াবরদার ভৌমিক রাজা শোভা সিংহের, স্বেচ্ছাচার, অত্যাচার এবং লুঠতরাজে সারা বাংলা সন্ত্রস্ত। তার এই যথেচ্ছ লুঠতরাজের হাতকে শক্ত করলেন প্রবল পরাক্রান্ত পাঠান সর্দার রহিম খাঁ। বর্ধমানের রাজকন্যা সত্যবতীর পাণিপ্রার্থী হয়ে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন শোভা সিংহ। অপমানটা হজম করে ভিতরে ভিতরে সুযোগ খুঁজছিলেন তিনি। এবার সুযোগ বুঝে রহিম খাঁর দলবল এবং স্বীয় সৈন্যবাহিনী নিয়ে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন বর্ধমান-রাজ কৃষ্ণরামের উপর। কৃষ্ণরাম প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং সহজেই পরাজিত এবং নিহত হলেন। বন্দী হলেন কৃষ্ণরামের স্ত্রী, কন্যা ও পরিবারবর্গ। লুণ্ঠিত হল ধনরত্ন, লুণ্ঠিতা হলেন রূপবতী রাজকন্যা সত্যবতী।

নিহত কৃষ্ণরামের পুত্র জগৎরাম অন্তঃপুরচারী নারীর ছদ্মবেশে পর্দানসীন পাল্কিতে চড়ে বিদ্রোহীদের নজর এড়িয়ে পালিয়ে গেলেন অবিভক্ত বাংলার তৎকালীন রাজধানী ঢাকা শহরে। ঢাকার মসনদে তখন শোভা পাচ্ছেন বাংলার নবাব ইব্রাহিম খাঁ। জগৎরাম নবাব-দরবারে গিয়ে শোভা সিংহ ও রহিম খাঁর নৃশংস অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ

করে সাহায্য প্রার্থনা করেন। যুদ্ধপরাঙ্মুখ ভীরুপ্রকৃতির ইব্রাহিম খাঁ অনিচ্ছা সত্ত্বেও সামান্য বিদ্রোহ মনে করে জগৎরামের অনুরোধে ফৌজদার নুরুল্লাকে পাঠিয়ে দেন বিদ্রোহ দমন করতে—সঙ্গে দেন অতি অল্পসংখ্যক সৈন্য। শোভা সিংহ ইতিমধ্যেই পরাজিত বর্ধমান রাজার ধনভাণ্ডার লুণ্ঠন করে অর্থবলে বাড়িয়ে নিয়েছিলেন সৈন্যসংখ্যা এবং অস্ত্রশস্ত্র। সুতরাং শোভা সিংহ এবং রহিম খাঁর যৌথ আক্রমণের মুখে নবাব সৈন্যেরা ভেসে গেল খরস্রোতা জলের তোড়ে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র শিলাখণ্ডের মতোই। এসব কথা আগেই উল্লেখ করেছি।

এবার চৈতন্যোদয় হল ইব্রাহিম খাঁর। তখন তাঁর প্রধান সেনাপতি-পুত্র জবরদস্ত খাঁকে বিশাল সৈন্যবাহিনী এবং সমরাস্ত্র দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন বিদ্রোহ দমন করতে। কিন্তু এবারও পরাজিত হল ইব্রাহিম খাঁ প্রেরিত জবরদস্তের নেতৃত্বাধীন সেনাবাহিনী। দুঃসংবাদ শুনে প্রমাদ গণলেন ইব্রাহিম খাঁ। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে খবর পাঠালেন দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেবের কাছে। বৃদ্ধ আলমগীর তখন প্রবল পরাক্রান্ত মারাঠা শক্তির অত্যাচারে জর্জরিত। তথাপি বিদ্রোহদমনার্থে পৌত্র আজীমুশ্বানের নেতৃত্বে পাঠিয়ে দিলেন বিশাল বাদশাহী ফৌজ। যুদ্ধ হল ভয়ঙ্কর কিন্তু এবারও পরাজিত হল দিল্লীশ্বর আওরঙ্গজেবের সেনাবাহিনী।

উপর্যুপরি তিন তিনবার বাদশাহী সৈন্যকে হটিয়ে দিয়ে শোভা সিংহ ও রহিম খাঁর মনে হল তাঁরা অজেয়। সারা বাংলার অধীশ্বর হবার আকাশ-কুসুম স্বপ্ন দেখতে থাকেন ক্ষুদ্র এক ভূস্বামী শোভা সিংহ। রহিম খাঁর সঙ্গে শলাপরামর্শ করে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করার জল্পনা কল্পনা শুরু করেন। গুপ্তচর মারফৎ আগেভাগেই এসব খবর পেয়ে রঘুনাথ বিচলিত হন এবং তাৎক্ষণিকভাবে বীরদর্পে আক্রমণ করেন চেতুয়াবরদা। রঘুনাথের সাংগঠনিক শক্তি এবং নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। নিমেষে হাজার হাজার সৈন্য সমাবেশ করতে পারতেন তিনি। রঘুনাথের শৌর্য বীর্য এবং তেজোদৃপ্ত ক্ষাত্রশক্তির কাছে পরাজিত হলেন ষড়যন্ত্রকারী শোভা সিংহ। এই যুদ্ধে নিহত হলেন শোভা সিংহের ভাই হিম্মৎ সিংহ। পালিয়ে বাঁচেন শোভা সিংহ এবং রহিম খাঁ। কারও কারও মতে পলাতক শোভা সিংহ বর্ধমান রাজকন্যা সত্যবতীর সতীত্ব নষ্ট করতে গিয়ে সত্যবতীর হাতের ছুরিকাঘাতে নিহত হন এবং রহিম খাঁ নিরুদ্দেশ হয়ে যান। মতান্তরে তিনিও নিহত হন বলে কথিত আছে।

রঘুনাথের এই অসমসাহসিক বীরত্বে মুগ্ধ হন ইব্রাহিম খাঁ, খুশী হন খোদ আলমগীর। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে নিপীড়িত বঙ্গবাসীগণ। যুদ্ধজয়ের লুণ্ঠিত দ্রব্য হিসেবে মল্লসৈন্যগণ চেতুয়াবরদা থেকে নিয়ে আসেন প্রভূত ধনরত্ন ; দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ এবং বিশালাক্ষী দেবীর স্বর্ণপ্রতিমা। আর নিয়ে আসেন দুই নারীরত্ন। এই দুই নারীরত্ন হল পূর্বোল্লিখিত লালবাঈ এবং শোভা সিংহের কন্যা চন্দ্রপ্রভা।

* * *

বিষ্ণুপুরের রাজরাণী হয়ে বেশ আনন্দেই দিন কাটছিল চন্দ্রপ্রভার। কখনও রঘুনাথের সাথে প্রেমালাপনে, কখনো তাস খেলে, কখনো নৌকাবিহারে, কখনো বা কোল ভরা শিশু দেবর গোপালকে আদর-যত্ন করে অথবা বিষ্ণুপুরের নগর-দেবতা মদনমোহন মন্দিরে কীর্তন শুনে। বিষ্ণুপুরের রাজ-জ্যোতিষী কিন্তু উপলব্ধি করেছিলেন—এ আনন্দ-হিল্লোল থাকবে না বেশীদিন। কারণ চেতুয়াবরদা থেকে যে দুই নারীর আগমন ঘটেছে বিষ্ণুপুরে তাদের মধ্যে একজন লক্ষ্মী, অন্যজন অলক্ষ্মী। একজন চায় বিষ্ণুপুরকে কিছু

দিতে, অন্যজন চায় কিছু নিতে। একজন ত্যাগী, অপরজন ভোগী। একজন এসেছে বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করতে, অন্যজন এসেছে ধ্বংস করতে। সুতরাং সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এসব কথা ভেবে জ্যোতিষাচার্যের কপালে ফুটে ওঠে চিন্তার রেখা। একজন তুচ্ছ ভূস্বামীর কন্যা চন্দ্রপ্রভাকে যদিও বিষ্ণুপুরের পাটরাণী হিসেবে মেনে নিতে পারছিলেন না জ্যোতিষাচার্য, তথাপি তার কাছ থেকে রাজ্যনাশের আশঙ্কা নেই জেনেই তিনি নিশ্চিন্ত। তাঁর দুশ্চিন্তার কারণ হল সুগায়িকা লালবাঈ ; কাঞ্চনী লালবাঈ। 'কাঞ্চনীকে ত্যাগ না করলে বিষ্ণুপুরের সমূহ বিপদ, অভাবনীয় অমঙ্গল।'—কথায় কথায় একদিন এই কথা কয়টি সরাসরি জানিয়ে দেন চন্দ্রপ্রভাকে।

"মিথ্যা আশঙ্কা আপনার, কাঞ্চনীকে আশ্রয় দেবার জন্যে কোনও দিন যদি অমঙ্গলের ছায়া নামে এ রাজ্যে, তা হলে পতিঘাতিনী হয়েও রাজ্যকে রক্ষা করব।

বলেই চমকে উঠল চন্দ্রপ্রভা। উচ্চারিত শব্দগুলি যেন বিভীষিকার মত ভেসে উঠল চোখের সামনে। এ কি সাংঘাতিক প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হল সে?

দুচোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ল।" (লালবাঈ, পৃঃ—১২২)

রহিম খাঁর মৃত্যু সংবাদে ভীষণ মন মরা হয়ে পড়েছিল লালী। রাজা রঘুনাথের আশ্রয় লাভ করে এখন সে পরম নিশ্চিন্ত এবং পুলকিত। কিন্তু তখনও রাজদর্শনের সৌভাগ্য হয়নি তার। জানতে পারেনি কে সেই রাজা রঘুনাথ, যাঁর আদেশে সে বিষ্ণুপুরে এসেছে বন্দী হয়ে। রঘুনাথকে দেখার জন্য মনে ভীষণ উৎকণ্ঠা। এমন সময় খবর এল গানের আসরে আসছেন রঘুনাথ। খবর শুনে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে হৃদয় উজাড় করে গান ধরল লালবাঈ।

"—সগুন শোহাওঅন আজু লায়ে সুখ ; নয়নন চয়নন সো ভাওএ। পিয়া অবহীঁ আওএজে বহোত চিহ্ন, প্রগট ভয় নিতহ্ উনকী....."

সুরের পরতে পরতে স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের স্পন্দন।

এমন সময় গরদের পোশাকে শরীর ঢেকে ধীর পদক্ষেপে সঙ্গীতভবনে প্রবেশ করেন রঘুনাথ। স্নিগ্ধ মুখমণ্ডলে ভাবালুতার আবেশ। রাজা নন, যেন কোন সাধক। গান থেমে যায় লালীর। মনের ক্যামেরায় সযত্নে ধরে রাখা বিবিবাজারের সেই পুরানো ছবিটি যেন জীবন্ত হয়ে নড়ে চড়ে ওঠে নিমেষে। পুরানো কথা ভাবতে ভাবতে রঘুনাথের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে লালী। তাকিয়ে থাকেন রঘুনাথও। কথা হয় চোখে চোখে। যেন এক দুর্বার আকর্ষণ কাছে টানে ওদের। সেই আকর্ষণকে উপেক্ষা করতে পারে না লালী, পারেন না রঘুনাথ। এরপর থেকে সঙ্গীতভবনেই সন্ধ্যা শুরু হয় রঘুনাথের। সন্ধ্যা থেকে রাত্রি। রাত্রি থেকে গড়িয়ে যায় মধ্যরাত্রি। চকিতে ঘুম ভেঙে যায় লালীর। দেখে জলসা ঘরেই ঘুমিয়ে আছেন রঘুনাথ। আহা! কি সুপুরুষ! কি সুন্দর মুখশ্রী! আলতোভাবে মাথাখানা তুলে সোহাগভরে গুঁজে দেয় বালিশ। নিজের শরীরের মখমল মোলায়েম শালখানা দিয়ে ঢেকে দেয় রঘুনাথের অবলুণ্ঠিত দেহখানি। **"আপন দেহের শীতবস্ত্র রঘুনাথের শরীরের স্পর্শ পেল, আর লালবাঈয়ের মনে হল যেন রঘুনাথের আলিঙ্গন-স্পর্শে শিহরিত হল তার দেহ-মন। বহুক্ষণ একদৃষ্টে রঘুনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল লালবাঈ।"** (লালবাঈ, পৃঃ—১৩০) ঘুমন্ত দাসীদের ডেকে বলল, **'বউরাণীকে গিয়ে বলবে নিশ্চিন্ত থাকতে। বলবে, 'লালী থাকতে রঘুনাথের সেবা যত্নের কোন ত্রুটি হবে না।'**

দাসীদের কাছে লালবাঈয়ের ব্যঙ্গোক্তি শুনে জ্যোতিষাচার্যের সাবধানবাণী মনে পড়ে

যায় চন্দ্রপ্রভার "—বড় ভয়ঙ্কর অদৃষ্ট মা তোমার ললাটে। রাজরানী হয়ে এসেছ তুমি সঙ্গে এক বিষধর নাগিনীকে নিয়ে। এক বিধর্মী পাপিষ্ঠা সুরের জাল ফেলে বসে আছে সঙ্গীত-উন্মাদ রঘুনাথের জন্যে।" (লালবাঈ, পৃঃ—১২৬)

'সুরের জাল' কথা দুটো কানে ধরল চন্দ্রপ্রভার। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন—কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। যে সুরের জাল ফেলে রঘুনাথকে বন্দী করেছে লালী, স্বীয় কণ্ঠ-নিঃসৃত সুরের আর এক মায়াজাল বিস্তার করে তিনি লালীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসবেন তাঁর স্বামীকে। অতএব ডাক পড়ল রাজদরবারের শ্রেষ্ঠ সুরসাধক কৃষ্ণমোহন গোস্বামীর। **সঙ্গীত-সরস্বতীর আরাধনায় ডুব দিলেন চন্দ্রপ্রভা। আর সুর-সাধক রঘুনাথ ডুব দিলেন লালবাঈয়ের রূপসাগরে।** রাতের পর রাত কেটে যায় সঙ্গীতভবনে— লালবাঈয়ের কক্ষে। এদিকে প্রাসাদকক্ষে বিনিদ্র রজনী যাপন করেন চন্দ্রপ্রভা। তাঁর ঘুম কেড়ে নিয়েছে কাঞ্চনী। কেড়ে নিয়েছে তাঁর আপনজন রঘুনাথকে। চন্দ্রপ্রভার গোপন ব্যথা বুঝতে পেরে সান্ত্বনা দেন রঘুনাথ, 'ভয় নেই, ভয় নেই চন্দ্রা। সঙ্গীতই আমার ধ্যান, জ্ঞান, প্রাণ। সঙ্গীতই আমার জীবন। সঙ্গীতভবন আমার সাধনভূমি, সঙ্গীত-সরস্বতীর শ্রীমন্দির।'

আগে ভাগে এসব স্তোকবাক্যে বিশ্বাস করতেন চন্দ্রপ্রভা। আর তার বিশ্বাস আসে না। নানা কথায় কান ভারী হয়েছে চন্দ্রপ্রভার। দেরীতে হলেও ভুল ভেঙেছে রাণীর। তিনি বুঝে নিয়েছেন সুরের সাধনা করে কাঞ্চনীর খপ্পর থেকে ফিরিয়ে আনা যাবে না বিপথগামী স্বামীকে। **কারণ সুরের জালে পা দিয়ে রূপের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে রাজা রঘুনাথ এখন লালবাঈয়ের দেহের খাঁচায় বন্দী হয়েছেন আষ্টেপৃষ্ঠে। তাই রাজকার্যে অনীহা, স্ত্রী-সান্নিধ্যে বীতস্পৃহা।** লালবাঈয়ের মনোরঞ্জনার্থে রাজপ্রাসাদের অদূরে নির্মিত হয়েছে আনন্দভবন— 'নতুন মহল'। নতুন মহলেই দিন কাটে, রাত কাটে রাজার। আর রাতের আঁধারে লালবাঈয়ের দেহবিবরে রঘুনাথের ঔরসে এসেছে সন্তান। পায়ের নীচে মাটি পেয়েছে লালবাঈ। বিবিবাজারের জ্যোতিষাচার্যের কথাটা বার বার মনে পড়ে তার, **'তুমি বাঁদী নও কন্যা, রাজরাজেশ্বরীর শক্তি থাকবে তোমার হাতের মুঠোয়। একদিন একটি রাজ্য পরিচালনা করবে তুমি।'** উচ্চাকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে লালীর। রাজাকে এনেছে হাতের মুঠোয়, এবার আনতে চায় রাজ্যকে। লালীর হাতে ক্রীড়নকে রূপান্তরিত হয়েছেন রঘুনাথ। কোন ইচ্ছাই অপূর্ণ থাকে না লালবাঈয়ের। **লালবাঈ অর্থ চায় না, ঐশ্বর্য চায় না, চায় বিষ্ণুপুরের পাটরাণীর সম্মান।** চন্দ্রপ্রভার মতোই সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত হতে চায় রাণীর মহিমায়। চায় তার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে রাজভ্রাতা গোপালের জন্মদিনের উৎসবের মতো বিশাল উৎসবের আয়োজন। **আর বৈষ্ণবরাজ্য বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে বসাতে চায় তার পুত্রকে।**

রাস উৎসব উপলক্ষ্যে বিষ্ণুপুরের রাজা-রাণী যুগল মূর্তিতে সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় দর্শন দেন প্রজাসাধারণকে। রঘুনাথ সেই রীতি লঙ্ঘন করে রাস উৎসবে লালবাঈকে পাশে নিয়ে বসলেন সিংহাসনে। **চন্দ্রপ্রভার পরিবর্তে একদিনের জন্য হলেও লালবাঈ পেল পাটরাণীর মর্যাদা।** লালবাঈয়ের প্রথম ইচ্ছা পূরণ করলেন রঘুনাথ। অসন্তুষ্ট হল বিষ্ণুপুরের আপামর জনসাধারণ। নিঃসন্তান রঘুনাথের অবর্তমানে একজন মুসলমান বাঈজীর অবৈধ সন্তান কি তবে বিষ্ণুপুর রাজসিংহাসন অলংকৃত করবে?—

এই ভেবে আতঙ্কিত হল প্রজাগণ। পুত্রসম দেবর গোপালের ভবিষ্যৎ চিন্তায় বিচলিত হলেন অপমানিতা রাণী চন্দ্রপ্রভা।

'একটি রাজ্য পরিচালনা করার ক্ষমতা থাকবে তোমার হাতে।'— জ্যোতিষাচার্যের সেই ভবিষ্যদ্বাণীই সত্য হতে চলেছে দিনে দিনে। লালবাঈয়ের কথায় ওঠা বসা করেন রঘুনাথ। লালবাঈয়ের ইচ্ছানুসারেই বিষ্ণুপুরের রাজকার্যে নিযুক্ত হয় মুসলমান কর্মচারী। সৈন্যবিভাগেও অনুপ্রবেশ ঘটে তাদের। কারণ লালবাঈ জানে বিপদের দিনে তার পাশে এসে দাঁড়াবে স্বধর্মের মানুষই। বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে তার সন্তানকে বসাতে হলে তাদের সাহায্য অপরিহার্য।

"ধীরে ধীরে রাজকার্যে মোগল কর্মচারী নিয়োগ করে বিষ্ণুপুরের একতায় বিভেদের প্রাচীর গেঁথে তুলেছে লালবাঈ। সে জানে, কাঞ্চনীর সন্তানকে সিংহাসন দেবে না রাজ্যের পুরাতন কর্মচারীর দল। তাই ধীরে ধীরে তার অনুরোধে ফৌজদার, থানাদার, রিসাল্‌দার, নাওয়ারা সব ক্ষেত্রেই ভিনদেশী মোগল এবং আফগান নিযুক্ত হয়েছে। আমিন, কানুনগো, রাহাদার, ঘাটোয়ালদের মধ্যেও বিধর্মীর সংখ্যা কম নয়।

সিংহাসনকে কেন্দ্র করে ক্রমে ক্রমে দুটি দল গড়ে উঠেছে তখন। একদিকে লালবাঈ-নিযুক্ত ফৌজ আর কর্মচারী; অন্যদিকে হিন্দুপ্রজা, হিন্দু সৈন্য, জ্যোতিষাচার্য, সভাপণ্ডিত, মুখ্য অমাত্য, দেওয়ানজি।" (লালবাঈ, পৃঃ—১৬৮)

সমস্যা সমাধানে লালবাঈকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়ার কথা ভাবা হল প্রথমে। কিন্তু তাতে দেখা দিল অসুবিধা। কারণ সৈন্যবিভাগে তখন লালবাঈয়ের বেশ আধিপত্য। লালবাঈকে হত্যা করলে বিদ্রোহ করতে পারে তারা। তাছাড়া নবাব মুর্শিদকুলি খাঁর মনসবদার সুলেমান খাঁ তখন রাজদরবারের অতিথিশালায় উপস্থিত। লালবাঈকে হত্যা করলে ডামাডোলের সুযোগ নিয়ে বিষ্ণুপুরের স্বাধীনতা হরণ করতে পারেন মুর্শিদকুলি খাঁ। সুতরাং সমস্যা সমাধানের জন্য নতুন করে চিন্তা ভাবনা করতে হয় জ্যোতিষাচার্যকে। তিনি জানেন 'প্রজার শক্তিই রাজশক্তি'। সুতরাং বিষ্ণুপুরের প্রজাগণকে আনতে হবে তাদের স্বপক্ষে, আর সেটা একমাত্র চন্দ্রপ্রভার পক্ষেই সম্ভব।

প্রিয় সখী সুরঙ্গাক্ষী মারফৎ চন্দ্রপ্রভা জানতে পারলেন গোপালকে হত্যা করার জন্য গুপ্তঘাতক নিয়োগ করেছে শয়তানী লালবাঈ। কারণ গোপালকে হত্যা করতে পারলেই তার পুত্রের সিংহাসন লাভের পথ পরিষ্কার। বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করে রাণী চন্দ্রপ্রভা হিন্দুপ্রজা ও রাজকর্মচারীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। লালবাঈকে হত্যা করার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সমবেত জনতা।

এদিকে লালবাঈ স্বীয় সুখ-স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার অভিপ্রায়ে প্রহরীদের চোখে ফাঁকি দিয়ে রাত্রি নিশীথে ছুটে যায় অতিথিশালায়। যেখানে রয়েছে সুলেমান খাঁ—যে তাকে বেগম করার স্বপ্নে বিভোর। লাস্যময়ী ললনার রূপসজ্জায় সজ্জিত হয়ে সুলেমানের শরীরে শরীর ছুঁইয়ে বসে পড়ে পালঙ্কে। অতঃপর সুকোমল বাহুদ্বয়ের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে সুলেমানের দিকে মোহমদির চোখে তাকিয়ে থাকে অনুক্ষণ।

লালীর মোহিনী-শক্তির মোহাচ্ছন্নে বিবশ সুলেমান বলল, 'কি চাও লালী? কি চাও তুমি আমার কাছে?'

—তোমাকে। শুধু তোমাকে। এতোদিন ধরে তুমি চেয়ে এসেছ আমাকে। আজ আমি চাই তোমাকে।

—শুধু একথা জানানোর জন্যই কি তুমি ছুটি এসেছ রাতের আঁধারে?—প্রহরীদের চোখে ধুলো দিয়ে।

—একটা কাজ করতে হবে তোমায়। রঘুনাথ আমার হাতের পুতুল। আমারই ইচ্ছানুসারে 'আমার পুত্রের অন্নপ্রাশনে রাজ্যের সব প্রজা, সব কর্মচারী আর ফৌজ আসবে আমার নফর রঘুনাথের হুকুমে।' সেই সুযোগে তোমার রিসাল্‌হা সৈন্যবাহিনী নিয়ে তুমি আক্রমণ করবে বিষ্ণুপুর। আমার নির্দেশে আমার সৈন্যবাহিনী যোগ দেবে তোমার সাথে। অক্লেশে তুমি জয়ী হবে। তুমি হবে বাদশা, আমি তোমারই বেগম।

—তোমার প্রস্তাব ভেবে দেখব। এখন ফিরে যাও সত্বর।

ফিরে গিয়েছিল লালবাঈ। লালবাঈয়ের এই আকস্মিক পরিবর্তনে যার-পর-নাই বিস্মিত হয়েছে সুলেমান খাঁ। এই সুলেমান খাঁই হল বিবিবাজারের সেই হাবশি প্রহরী—মসি কৃষ্ণরূপী দৈত্যাকৃতির হাবশি সুলেমান। যে লালবাঈকে একদিন জোর করে বলাৎকার করতে গিয়ে বেদম মার খেয়েছিল সে, যে লালবাঈকে 'ইনাম' পাবার লোভে রহিম খাঁর গুপ্তচরের কাজ করেছে, রহিম খাঁর কাছে অপমানিত হয়েছে বারংবার, খুন করেছেন রহিম খাঁকে, যে লালবাঈ তাকে যমের মত ভয় করেছে, কেঁপে উঠেছে, রহিম খাঁর নাচের আসরে যাকে দেখে থেমে গেছে তার নাচ, ভয়ে কাঁটা হয়ে চিৎকার করে উঠেছে, ঘৃণা করেছে আজীবন ; সেই লালবাঈ আজ আযাচিতভাবে ধরা দিতে এসেছে রূপের বহ্নি জ্বেলে, তারই কণ্ঠলগ্ন হয়ে এবং চক্রান্ত করছে তার আশ্রয়দাতা, তারই সন্তানের জন্মদাতা রাজা রঘুনাথের বিরুদ্ধে। 'নারীর সুন্দর মুখের আড়ালে অবিশ্বাসিনীর মূর্তি এমনভাবে লুকিয়ে থাকে জানত না সে।' শুধুমাত্র ক্ষণস্থায়ী রূপের মোহে এই বিশ্বাসঘাতিনীকে বিশ্বাস করা যায় না কিছুতেই।

চোখ খুলে গেল সুলেমানের। বিবেকের দংশনে কর্তব্যবোধ জেগে ওঠে মুহূর্তে। গোপনে চন্দ্রপ্রভার সাথে দেখা করে সুলেমান।

"বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় নত হয়ে তরবারি রাখলে সে চন্দ্রপ্রভার পদপ্রান্তে। লালবাঈয়ের রূপ দেখে মুগ্ধ হয়েছিল সুলেমান, আর স্বচ্ছ পর্দার আবরণের ওপারে এই ভিন্ন রূপ দেখে শ্রদ্ধায় নত হল সে।

বীরাঙ্গনার মূর্তি যেন! মুখে মাতৃস্নেহের অপূর্ব হাস্য, সুধাবর্ষী চোখে কমনীয় রূপ।

সুলেমান বললে, মুর্শিদকুলি খাঁর যে পরোয়ানা নিয়ে এসেছিলাম রাজমহিষী, সে পরোয়ানা ফিরে নিয়ে চলেছি। যে স্বাধীনতা হরণ করতে এসেছিলাম, বিষ্ণুপুর সে স্বাধীনতা হারিয়ে বসে আছে এক তুচ্ছ কাঞ্চনীর কাছে।

চুপ করে রইল চন্দ্রপ্রভা। কি উত্তর দেবে সে এ সত্য উক্তির!

সুলেমান বললে, কাঞ্চনীর চক্রান্ত থেকে বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করুন রানীসাহেবা। রক্ষা করুন আপনার সন্তানতুল্য গোপালের ভবিষ্যৎ সিংহাসন।" (লালবাঈ, পৃঃ—১৭৬)

লালবাঈয়ের চক্রান্তের কথা জ্যোতিষাচার্যকে জানালেন চন্দ্রপ্রভা। সব শুনে স্তম্ভিত হলেন জ্যোতিষাচার্য। বললেন, 'আরও খবর আছে রাণীমা, স্বহস্তে গোপালকে হত্যা করতে চান রঘুনাথ।'

'গোপালকে রক্ষা করার জন্য, রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য পতিঘাতিনী সতী হতেও বাধবে না আমার।' দৃপ্ত কণ্ঠে উত্তর দেন রাণী।

অনুজ গোপালকে বঞ্চিত করে বিধর্মীর অবৈধ সন্তানকে সিংহাসনে বসাতে চান

রঘুনাথ—সহ্য হয় না চন্দ্রপ্রভার।

জ্যোতিষাচার্য আরো জানালেন, 'লালবাঈয়ের পুত্রের অন্নপ্রাশন উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। সেই উৎসবে হিন্দুপ্রজা ও হিন্দুরাজকর্মচারীদের আমন্ত্রণ জানিয়ে নিষিদ্ধ মাংস খাইয়ে হিন্দুর মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে চায় লালবাঈ। **ভোজনতলায় ভোজ খেতে না এলে প্রাণদণ্ডের আদেশ জারী করেছে রঘুনাথ।'**

চমকে উঠেন দেওয়ানজী। সমস্যা সাংঘাতিক। **সাংঘাতিক সমস্যার সমাধানও হবে সাংঘাতিক।** ধর্মপ্রাণা চন্দ্রপ্রভার কাছে ধর্মই বড়। রাজ্য রক্ষা, প্রজাদের রক্ষা, গোপালকে রক্ষা করাই এখন তাঁর সবচেয়ে বড় ধর্ম। ক্ষত্রিয়ের রক্ত বইছে তাঁর শিরায় শিরায়। একদিন হার্মাদ দস্যুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিলেন চন্দ্রপ্রভা। প্রয়োজনে আজ তিনি অস্ত্রধারণ করবেন রাজ্য রক্ষার্থে, পুত্রবৎ গোপালের স্বার্থে, বিষ্ণুপুরের প্রজা সাধারণের স্বার্থে। প্রয়োজনে আত্মত্যাগ করবেন। প্রয়োজনে হবেন পতিঘাতিনী।

প্রাসাদোদ্যানে শবরী দেহরক্ষী নারীগণ সেদিনও তীর ছোঁড়া অভ্যাস করছিল অন্যদিনের মতই। তীর ধনুক হাতে চন্দ্রপ্রভাও শুরু করেছেন লক্ষ্যভেদের খেলা। এমন সময় দূর থেকে লক্ষ্য করলেন গোপালের কক্ষে নিঃশব্দে ঢুকছেন রঘুনাথ। শয্যায় শুয়ে আছে গোপাল। গোপালের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন রঘুনাথ। রঘুনাথের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাঁসিছে গোপাল। সস্নেহে দুটি হাত বাড়িয়ে গোপালের কাছে আরও একটু এগিয়ে যান রঘুনাথ। দূরের অলিন্দে দাঁড়িয়ে এসব লক্ষ্য করছিলেন উদ্বিগ্ন চন্দ্রপ্রভা। ভাবলেন এবার বুঝি গোপালের গলা টিপে মেরে ফেলবেন রঘুনাথ। মাথায় খুন চেপে গেল চন্দ্রপ্রভার। ধনুকে তীর সংযোজন করলেন ত্বরিতে। তীর ছুড়লেন। **বিষাক্ত তীর এসে বিঁধল রঘুনাথের বক্ষদেশে।** যন্ত্রণায় কাতরে উঠে ফিরে তাকালেন রঘুনাথ। কক্ষ থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসে দেখলেন তীর ধনুক হাতে চন্দ্রপ্রভা দাঁড়িয়ে। অস্ফুটে বললেন, 'চন্দ্রা, চন্দ্রা তুমি আমায়.....কথাগুলো আর শেষ হল না। মৃত্যুপথযাত্রী রঘুনাথ পদস্খলনে পড়ে গেলেন নীচের হরিণ-পিঞ্জরে। হরিণ-পিঞ্জরের সূচালো লৌহশলাকাগুলিতে গাঁথা গেল তাঁর মৃতপ্রায় দেহখানা। মারা গেলেন রাজা রঘুনাথ। চন্দ্রপ্রভার কাছে প্রেমাভিসারে গিয়ে কথা প্রসঙ্গে রঘুনাথ একদিন বলেছিলেন, "কোনও দিন যদি অন্য নারীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে তোমার অসম্মান করি, তার আগেই যেন তোমার হাতেই আমার মৃত্যু হয় চন্দ্রপ্রভা।" আজ তা সত্য হল। পক্ষান্তরে লালবাঈয়ের বিষ্ণুপুরে আগমনকে কেন্দ্র করে ঘটনাচক্রে চন্দ্রপ্রভা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন "কাঞ্চনীকে আশ্রয় দেবার জন্যে কোনও দিন যদি অমঙ্গলের ছায়া নামে এ রাজ্যে, তা হলে পতিঘাতিনী হয়েও রাজ্যকে রক্ষা করব।" চন্দ্রপ্রভা তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই কান্নায় ভেঙে পড়েছেন চন্দ্রপ্রভা। কেঁদে উঠলেন চন্দ্রপ্রভা।

দুঃসংবাদ দ্রুতগামী। চন্দ্রপ্রভা পতিঘাতিনী হয়েছেন—খবরটা মুখে মুখে মুহূর্তে রটে গেল নগরময়। শুনল সুলেমান খাঁ, শুনল লালবাঈ। ক্ষিপ্ত জনতা লালবাঈকে হত্যা করার জন্যে এগিয়ে চলে উর্ধ্বশ্বাসে। লালবাঈ ভয়ে তটস্থ। সমূহ বিপদের মুখে দাঁড়িয়ে লালবাঈয়ের আর একবার মনে পড়ল বিবিবাজারের ফকিরসাহেবের সেই মর্মান্তিক ভবিষ্যদ্বাণী। "তুমি বাঁদী নও কন্যা, রাজরাজেশ্বরীর শক্তি থাকবে তোমার হাতের মুঠোয়। একদিন একটি রাজ্য পরিচালনা করবে তুমি! **কিন্তু তোমার মৃত্যুর কারণ হবে তোমার প্রণয়।" ভয়ে শিউরে উঠল লালবাঈ। বাঁচতে হবে। তাঁকে বাঁচতে হবে। বাঁচাতে হবে**

তার সন্তানকে।

রিসাল্‌হা সৈন্যদের বিদায় দিয়ে তখনও বিষ্ণুপুরের অতিথিশালায় রয়েছে সুলেমান খাঁ। লোকচক্ষুর অন্তরালে স্বীয় সন্তানকে বুকে নিয়ে লালবাঈ ছুটে যায় অতিথিশালায়।

হাবশি সুলেমানের 'জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল লালবাঈ'। অথচ সেই লালবাঈ যখন স্বেচ্ছায় তাকে দেহদান করতে এসেছে বেগম হবার স্বপ্ন নিয়ে তখন 'তাকেই ঘৃণা করেছে সে, ফিরিয়ে দিয়েছে তাচ্ছিল্যের অট্টহাস্যে। তার গোপন চক্রান্ত ফাঁস করে দিয়েছে চন্দ্রপ্রভা ও রঘুনাথের কাছে। প্রকারান্তরে সেই ডেকে এনেছে লালবাঈয়ের এই আকস্মিক বিপদ। **বিবেকের দংশন অনুভব করল সুলেমান। আশ্রয়প্রার্থী লালবাঈয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ভয় নেই, ভয় নেই, আমি থাকতে তোমার প্রাণ নিতে পারবে না কেউ। প্রয়োজনে নিজের জীবন দিয়েও রক্ষা করব তোমাকে।'**

ঘোড়ায় লাফিয়ে উঠল সুলেমান, সুলেমানের বিস্তৃত বুকের আড়ালে শিশু কোলে নিয়ে বসল লালবাঈ। ঘোড়া ছুটল তীরবেগে। ক্ষিপ্ত জনতা এবং বিষ্ণুপুরের তীরন্দাজবাহিনীর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারল না সুলেমান। তীরবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ে সুলেমান। মাটিতে ছিটকে পড়ে লালবাঈয়ের শিশুসন্তান। **লৌহশৃঙ্খলে বন্দী হয় উচ্চাকাঙ্ক্ষী লালবাঈ।** জ্যোতিষাচার্যের নির্দেশে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় লালবাঁধের পাড়ে। সাজানো হয় ময়ূরপঙ্খী নৌকা—যে নৌকাতে চড়ে রাত্রি-নিশীথে রঘুনাথের সাথে নৌকাবিলাস করেছে লালবাঈ। তারপর সেই নৌকার সাথে লালবাঈকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে লালবাঁধের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয় ময়ূরপঙ্খী নৌকা। মন্থর গতিতে মাঝ দরিয়ায় পৌঁছে যায় ময়ূরপঙ্খী। খুলে দেওয়া হয় নীচের পাটাতনের নির্দিষ্ট ছিদ্র। ধীরে ধীরে জল ঢুকতে থাকে নৌকায়। ক্রমশঃ জলের তলায় তলিয়ে যেতে থাকে নৌকা। আসন্ন মৃত্যুভয়ে কান্নায় উদ্বেল লালবাঈকে ঘিরে যেন আকাশে, বাতাসে, লালবাঁধের বনমর্মরে বারবার প্রতিধ্বনিত হয় বিবিবাজারের জ্যোতিষাচার্যের ভবিষ্যদ্বাণী, **'তোমার মৃত্যুর কারণ হবে তোমার প্রণয়।' 'তোমার মৃত্যুর কারণ হবে তোমার প্রণয়।' লালবাঁধের লাল জলের তলায় সর্বসমক্ষে তলিয়ে যায় লাবণ্যময়ী লালবাঈয়ের লোভানী দেহ। তলিয়ে যায় তার রূপ, যৌবন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বিলাস-বাসনা, বিষ্ণুপুরের পাটরাণী হওয়ার সুখ-স্বপ্ন।**

এদিকে পাটরাণী চন্দ্রপ্রভা তখন ভেঙে পড়েছেন কান্নায়। কারণ ভুল করেছেন তিনি। ভুল বুঝেছেন রঘুনাথকে। হাবশি সুলেমানের মুখে লালবাঈয়ের চক্রান্তের কথা জানতে পেরে রঘুনাথ অনুতপ্ত হৃদয়ে চন্দ্রপ্রভার কাছে ক্ষমা চাইতে ছুটে এসেছিলেন প্রাসাদকক্ষে। প্রাসাদকক্ষে ছিলেন না চন্দ্রপ্রভা, ছিল দেবোপম অনুজ গোপাল। গোপালের প্রতি অনেক অবিচার করেছেন তিনি। গোপালকে আদর করে অনুতপ্ত হৃদয়ে শান্তি পেতে চেয়েছিলেন একটু। তাই সোহাগভরে সস্নেহে দুহাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিতে চেয়েছিলেন ছোট্ট ভাইকে। কিন্তু সে আশা তাঁর অপূর্ণ রয়ে গেল। তীর-বিদ্ধ হলেন চন্দ্রপ্রভার হাতে। **স্বকৃত ভুলের মাসুল দেবেন চন্দ্রপ্রভা।**

লালবাঈ নিহত হয়েছে। বিষ্ণুপুরের বিপদ কেটে গেছে। শূন্য রয়েছে সিংহাসন। শূন্য সিংহাসনে বসবে কিশোর গোপাল সিংহ। গোপাল সিংহের নেপথ্যে রাজ্য শাসন করবেন রাণী চন্দ্রপ্রভা। এসব আলোচনা চলছে একদিকে, অন্যদিকে রঘুনাথের মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শ্যামবাঁধের উত্তর পাড়ের শ্মশানভূমিতে। সামনে রাজভক্ত প্রজার দল। পিছনে চন্দ্রপ্রভা ও তার প্রিয় সখী সুরঙ্গাক্ষী।

চন্দন কাঠের চিতার উপর ছড়িয়ে দেওয়া হল সুগন্ধি আতর, অগুরু অঙ্গরাগ। চিতার পাশে "সম্রাজ্ঞীর বসন ভূষণে সজ্জিতা রানী চন্দ্রপ্রভা, বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে অলঙ্কৃতা রানী চন্দ্রপ্রভা। সীমন্তে সিন্দুর, হাতে শঙ্খবলয়। উজ্জ্বল রক্তবর্ণ রেশমবস্ত্রের ঈষৎ অবগুণ্ঠনে ঢাকা মুখচন্দ্রমায় হঠাৎ যেন তৃপ্তির হাসি দেখা দিল।

সুরঞ্জাক্ষীর দিকে ফিরে তাকিয়ে অপাঙ্গের ইশারায় হাতছানি দিল চন্দ্রপ্রভা।

গোপালকে চুম্বন করে সুরঞ্জাক্ষীর হাতে তুলে দিল তাকে। বললে, আজ থেকে গোপালের সব ভার তোমার ওপর দিয়ে গেলাম সখী।" (লালবাঈ, পৃঃ—১৮৪)

সুরঞ্জাক্ষীর চোখ বেয়ে নেমে এল অশ্রুধারা।

স্বকৃত ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবেন চন্দ্রপ্রভা। সহমৃতা হবেন তিনি। খবর রটে গেল **'সতী হবে চন্দ্রপ্রভা'**। সতীদাহ দেখার জন্য ভিড়ে উপচে পড়ল শ্মশান-প্রাঙ্গণ।

মন্ত্রপাঠ করতে করতে চিতা প্রদক্ষিণ করে রঘুনাথের মৃতদেহকে আলিঙ্গন করে চিতায় শয়ন করলেন চন্দ্রপ্রভা। যজ্ঞপুরোহিতের ইঙ্গিতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল আগুন। **সতী হলেন চন্দ্রপ্রভা।**

* * *

আজ আর লালবাঈ নেই, আছে তাঁর কলঙ্কময় জীবনের স্মৃতি।

"১৮৯৬ সাল।

লালবাঁধ দীঘি খনন করে পাওয়া গেল কয়েকটি মুসলমানী ভোজনপাত্র, একটি লৌহশৃঙ্খল, আর একটি নারীর কঙ্কাল।

বিষ্ণুপুরের নুরজাহান লালবাঈয়ের কঙ্কাল প্রায় দুশো বছর পরে পৃথিবীর হালকা বাতাসে নিঃশ্বাস নিল।

ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে আছে এ-কাহিনী। পূর্ণিমার রাত্রে লালবাঁধের পাড়ে দাঁড়িয়ে বাতাসে কান পাতলে আজও নাকি এক অবোধ্য চাপা দীর্ঘশ্বাস গুমরে মরে। জলের ওপর গাছের শাখা আর জ্যোৎস্নার লুকোচুরি দেখলে হঠাৎ মনে হয়, যেন এক অনিন্দ্যসুন্দরী হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

আজও বোধ হয় বিষ্ণুপুর-প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষে, লালবাঁধের কিনারায়, রঘুনাথ সিংহের ছিন্নতন্ত্রী তানপুরার তারে লালবাঈয়ের নিরুদ্ধ কান্না গুমরে মরে। **একটি অতৃপ্ত আত্মা যেন তার দয়িতের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়, অকস্মাৎ বাতাসে দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনে চমকে ফিরে তাকায় আজকের মানুষ। দুর্গের ভগ্ন-প্রাকারে, অলিন্দে, পরিখায়, মদনমোহন আর মল্লশিবের মন্দির-প্রাঙ্গণে, লালবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ, শ্যামবাঁধ, যমুনাবাঁধ, কালিন্দীবাঁধ, গন্টনবাঁধে এক ব্যর্থযৌবন কাঞ্চনীর প্রেতাত্মা যেন তার প্রেমিককে খুঁজে বেড়ায়।"** (লালবাঈ, পৃঃ—১৯১)

নেই রাজরাজেশ্বরী চন্দ্রপ্রভা, কিন্তু আছে তাঁর দিব্যস্মৃতি। সতী হয়েছিলেন চন্দ্রপ্রভা। **"মুঠো মুঠো করে সেদিন সতীকুণ্ডের ছাই নিয়ে গিয়েছিল পুরাঙ্গনার দল। পতিঘাতিনী সতীর ভস্মাবশেষ দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোথাও তা রূপ নিয়েছিল দেববিগ্রহের, কোথাও বা ধর্মঠাকুর হয়ে বেঁচে আছে তা আজও।"** (লালবাঈ, পৃঃ—১৮৬) **বৃষ্টির জলে ভেসে গেছে, মুছে গেছে সতীকুণ্ডের চিতাবশেষ। কিন্তু সতীদাহের সেই বিশেষ স্থানটি আজও সতীকুণ্ড নামে চিহ্নময় হয়ে আছে। আগ্রাসী মনোভাবাপন্ন স্বার্থান্বেষী কিছু মানুষ সতীকুণ্ডের জমিতে চাষ দিতে গিয়ে হয়েছেন বিপদাপন্ন। মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন**

সতীকুণ্ডের জমি দখল করতে গিয়ে। যে স্থানটিতে সতীদাহ হয়েছিল সেই স্থানটিতে রয়েছে ছোট্ট একটি পুষ্করিণী। ভোজনতলার মহাশ্মশানের বর্তমান শ্মশানকালী মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ঐ ক্ষুদ্র পুষ্করিণী সহ এই বিশেষ অঞ্চলটি আজ সতীকুণ্ড নামেই প্রসিদ্ধ। আর কালীমন্দিরের উত্তরে অল্প একটু দূরে চৌবাচ্চা নামক একটি সুগভীর পুষ্করিণী সহ বহু-পুরানো দেওয়ালের ভিত ও ঘরবাড়ির কিছু ভগ্নাংশ আমাদের নজর কাড়ে। এখানেই ছিল নুরজাহান লালবাঈ-এর প্রমোদভবন। লালবাঈ-এর জন্য নতুন করে এই মহল তৈরি করার সুবাদে নাম হয়েছিল 'নতুন মহল'। লালবাঈয়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত মারমুখী ক্ষিপ্ত জনতা সেদিন ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল লালবাঈয়ের নতুন মহল। নতুন মহলের ভগ্ন ভিত ও দেওয়ালগুলি আজও রঘুনাথ এবং লালবাঈয়ের অবৈধ প্রণয় ও তার মর্মান্তিক পরিণতির স্মৃতি বহন করছে মৌন-মুখর ভাষায়।

মানুষ মরে যায়, রয়ে যায় নাম। প্রাসাদোপম মনোরম 'নতুন মহল' আজ আর নেই, কিন্তু রয়ে গেছে নাম। বিষ্ণুপুরের এই বিশেষ অঞ্চলটি আজ 'নতুন মহল' নামেই প্রসিদ্ধ। অবশ্য অনেকে এই স্থানকে 'ভুজনটিলা'ও বলে থাকেন। ভোজনতলা অপভ্রংশে হয়েছে 'ভুজনটিলা'। রঘুনাথ-লালবাঈ-এর অবৈধ পুত্রসন্তানের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে মহাভোজের আয়োজন করা হয়েছিল যে স্থানে সেই স্থানটিই ভোজনতলা নামে সর্বজনবিদিত।

অল্প একটু আগে আপনাদের যে পাথরের রথটি দেখিয়েছি সেই পাথরের রথের পশ্চিম দিকের বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তরটি ভোজনতলা নামেই চিহ্নিত। বর্তমানে সেখানে ঘন জনবসতি গড়ে উঠেছে। ভোজনতলার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ তাই চোখে পড়ে না আজ।

নতুন মহলের শ্মশানেশ্বরীর মন্দির-চত্বরে বসে বসে রঘুনাথ, শোভা সিংহ, লালবাঈ ও পতিঘাতিনী সতীর স্মৃতিকথা আলোচনা করলাম মূলতঃ প্রখ্যাত সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরীর 'লালবাঈ' উপন্যাসের কাহিনী অবলম্বনে। এখন মাতৃচরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে সকালের জলযোগটা সেরে নেওয়া যাক বন-বিষ্ণুপুরের শালপাতার খালাভর্তি বাঁকুড়ার মুড়ি ও তেলেভাজা দিয়ে। জলযোগের পর আমরা এগিয়ে যাব শ্রীশ্রীরঘুনাথজীউ-এর শ্রীমন্দির অভিমুখে। সেখানে দেখব সীতা ও লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে রঘুনাথ বিগ্রহ, শোনাব বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত 'রাবণ-কাটা' লোকোৎসবের কথা।

অধ্যায়-৪০

শ্রীশ্রীরঘুনাথজীউ এবং রাবণ-কাটা লোকনৃত্য

পূর্বেই বলেছি, ঈশ্বর-আরাধনার পীঠস্থান বিষ্ণুপুর। ঈশ্বর-উপাসনার আকর্ষণে, ধর্মপিপাসা চরিতার্থ করার অভিপ্রায়ে এবং ধর্মপ্রচারের অভিমানসে নব নব শতাব্দীতে বিষ্ণুপুরে পদার্পণ করেছেন নব নব সিদ্ধ-সাধক। জৈন প্রভাব অবলুপ্তির পর শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্মণ্য এবং বৈষ্ণব ধর্মের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে মল্লভূমে। বিষ্ণুপুরের রূপকার মহারাজ বীর হাম্বীরের আমলে এসেছেন শ্রীনিবাস আচার্য। তাঁর শুভাগমনকে কেন্দ্র করেই বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব ধর্মের জোয়ার আসে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যোত্তর ভাগে। বিষ্ণুপুরের রাজা-প্রজা দীক্ষিত হয়েছেন বৈষ্ণব-ধর্মে এবং মল্লভূমের প্রায় সর্বত্রই গড়ে উঠেছে কৃষ্ণ-বিষ্ণু মন্দির। আবার সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রামায়েত বৈষ্ণব পণ্ডিতের শুভাগমন

হয় মল্লমাটিতে। রামভক্ত অনেকেই তাঁর কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নেন এবং মল্লভূমের কৃষ্ণ-বিষ্ণু উপাসনার মূল স্রোতটির সাথে রাম-সীতা উপাসনার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বৈষ্ণবদের মধ্যে গড়ে ওঠে দু'টি সম্প্রদায়—প্রথম সম্প্রদায়টি হল কৃষ্ণ-বিষ্ণু-ভক্ত বৈষ্ণব আর দ্বিতীয় সম্প্রদায়টি হল রামভক্ত বৈষ্ণব।

১৭০২ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হন **দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ।** মাত্র বছর দশেক রাজত্ব করেন তিনি। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে তিনি বেশ কয়েকটি দেব-মন্দির ও অনেকগুলি অস্থল নির্মাণ করেন। নিমতলা মহল্লার এই অস্থলের মন্দিরে গোপীনাথ, রঘুনাথ, ধ্বজাধারী হনুমান প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষণীয় বিষয় হ'ল কৃষ্ণ-বিষ্ণু উপাসনার পাশাপাশি রাম ও রামভক্ত হনুমানের পূজার বহুল প্রচলন। এদিক থেকে নিমতলা মহল্লার রঘুনাথ জীউ-এর অস্থলটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। **অস্থল অর্থে পান্থশালা। বিষ্ণুপুররাজ নির্মিত এই রকম অস্থলে দেব-উপাসনার পাশাপাশি অতিথি অভ্যাগত, বিশেষতঃ সাধু-সন্তদের থাকার সুব্যবস্থা ছিল।**

বিষ্ণুপুর নিমতলা মহল্লায় অবস্থিত রঘুনাথজীউ-এর অস্থলে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা—এই ত্রয়ী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয়ে পূজিত হয়ে আসছেন সুদূর অতীতকাল থেকে। উক্ত রঘুনাথ জীউকে কেন্দ্র করে বিষ্ণুপুর শহরে **'রাবণ-কাটা'** নামে একটি লোকোৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে গত দুই শতাব্দী যাবৎ। 'রাবণ-কাটা' লোক-নৃত্যের প্রতিপাদ্য বিষয় হল রাম-রাবণের যুদ্ধ এবং যুদ্ধান্তে রাবণ-বধ।

অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র হলেন শুভশক্তির প্রতীক, পক্ষান্তরে লঙ্কাধীশ রাবণ হলেন অশুভ শক্তির দ্যোতক। রাবণ-কাটা লোকোৎসবের মধ্যে শুভশক্তির জয়যাত্রা ঘোষিত হয়। দুর্ধর্ষ এবং দুর্দমনীয় রাবণের সাথে যুদ্ধযাত্রা শুরু করার পূর্বে শ্রীরামচন্দ্র শরৎকালে শক্তিস্বরূপিণী দশভুজা দুর্গার অকাল-বোধন করে সিদ্ধকাম হয়ে নিজের মধ্যে দৈবশক্তি সঞ্চার করেছিলেন। অনন্তর দৈবীশক্তিতে বলীয়ান হয়ে ক্ষাত্রশক্তির বিক্রমে রাবণসহ রাক্ষসকুল সবংশে ধ্বংস করেছিলেন। রামায়ণের এই বিশেষ অধ্যায়টিই রাবণ-কাটা উৎসবের প্রাসঙ্গিক বিষয়।

মল্লরাজাদের রাজদরবারে রাজকুলদেবী মা মৃন্ময়ী (নামান্তরে যিনি দুর্গতিনাশিনী দুর্গা) রয়েছেন অধিষ্ঠিতা। শরতের অকাল-বোধনে দেবীর পূজা হয় ধুমধাম সহকারে এবং এই পূজার ফলস্বরূপে হল রাবণবধ তথা অশুভ শক্তির নাশ। বিষ্ণুপুরের ক্ষাত্রশক্তি সম্পন্ন মল্লরাজাগণ এই দৃষ্টিকোণ থেকেই 'রাবণ-কাটা' উৎসবের প্রবর্তন করেছিলেন আজ থেকে প্রায় ছুঁই ছুঁই দু'শ বছর আগে।

যুগ পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে দৃষ্টিভঙ্গির তারতম্যে বর্তমানে **'রাবণ-কাটার বাঁদর নাচ'** লোকনৃত্যটি বাচ্চাদের কাছে ভীতিপ্রদ কৌতুকোদ্দীপক নৃত্যে এবং বয়স্কদের চোখে এটি একটি আনন্দদায়ক লোকনৃত্যে পর্যবসিত হয়েছে। যদিও পুরুলিয়ার ছৌ-নাচের ব্যাপকতা এবং বিশাল জনপ্রিয়তা এর মধ্যে অনুপস্থিত তথাপি বিষ্ণুপুরের দুর্গোৎসবের আঙ্গিনায় এর ঐতিহ্য অম্লান।

রাবণ-কাটা উৎসবটি হল মূলতঃ একটি মুখোশ নৃত্য। এতে সক্রিয় ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করেন চার অভিনেতা। এঁরা হলেন **হনুমান, জাম্বুবান, বিভীষণ** এবং **সুগ্রীব।** প্রায় দু'শ বছর আগে এক এক খণ্ড গামার কাঠে তৈরি খুবই হালকা এই মুখোশগুলি আজও অক্ষয়, অজর। বছরে বছরে রঙের ছোঁয়ায় বর্ণবৈচিত্র্যে মুখোশগুলি হয়ে ওঠে

ভীতিপ্রদভাবে প্রোজ্জ্বল এবং চিত্তাকর্ষক। মুখোশগুলির মস্তকভাগে থাকে প্রচুর ছিদ্র। ছিদ্রগুলি থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় পাটের চুল। অভিনেতাদের মুখে থাকে মুখোশ, দেহের ঊর্ধ্বাঙ্গে থাকে ফুলহাতা কোট, নিম্নাঙ্গে পায়জামা অথবা আঁটসাঁট করে পরে থাকা ধুতি। দেহস্থিত পোশাকের সাথে সেঁটে থাকে পাটের তৈরি বৃহদাকার সুদৃশ্য কৃত্রিম লোম। অর্থাৎ সামগ্রিকভাবে বন্যজন্তু বা বানরের মতো লোমশ দেহের রূপ পরিগ্রহ করেন হনুমান, জাম্বুবান, বিভীষণ ও সুগ্রীব।

শিল্পীদের অঙ্গসজ্জা পরিকল্পনায় বৈচিত্র্যের স্বাদ বিধৃত। যেমন রামভক্ত হনুমানের পোশাক 'ঘি' রঙের, মুখোশ এবং লোমশ দেহ কিন্তু সাদা। হনুমানের মুখোশের চওড়া কপালে লাল তিলক, তিলকের দু'পাশে তিনটি করে ছটি বলিরেখা। রেখার মধ্যস্থলে রঙে আঁকা ত্রিশূল। কপালের দু'পাশে লেখা আছে 'সীতারাম সীতারাম'। ভ্রূ ও গোঁফ মোটা, নাক চ্যাপ্টা, গোল গোল চোখ দুটি বর্ণবৈচিত্র্যে সুসজ্জিত, বড় বড় দাঁত বিশিষ্ট মুখগহ্বর লাল। দাঁতের গর্ত দিয়ে দেখার সুব্যবস্থা।

জাম্বুবানের মুখোশটি কিন্তু ভালুকের মুখের অনুরূপ। কালো রঙের মুখোশ পরিহিত জাম্বুবানের পোশাক-আশাক সাজ-সজ্জা সবই কৃষ্ণকায় ভল্লুকের মতো। অবশ্য মুখোশের বিভিন্ন অংশে লাল ও হলুদ রঙের নক্সার কাজও উল্লেখ্য। দু'পাশে তিনটি করে ছ'টি ঝক্‌ঝকে সাদা দাঁতের উপর কালো নক্সার কাজ ভীতিসঞ্চারক। দাঁতের ছিদ্রপথেই অভিনেতাকে দেখার কাজ সারতে হয়।

রাক্ষসকুলের বিভীষণ আবার আগাগোড়া লাল। তাঁর মুখোশ লাল, বহির্বাস লাল, চুল এবং লোমশ দেহ সবই লালে লাল। মাথায় পাগড়ি, কপালে সাদা ত্রিশূল, নাকে সাদা তিলক, ভ্রূ কোঁচকানো, গোঁফ পাকানো। দাড়িতে ফুলকাটা নক্সা। রামসীতার একনিষ্ঠ উপাসকের নিদর্শন স্বরূপ কপালের বাঁদিকে 'জয় রাম' আর ডানদিকে 'সীতা রাম' লেখা।

আবার বানরের মুখের আদলে তৈরি সুগ্রীবের মুখোশের অলংকরণের ক্ষেত্রে হনুমানের মুখোশের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। নাক চ্যাপ্টা, চোখ পটল আকৃতির, গোঁফ চওড়া। দাঁতের ফাঁকের ছিদ্রগুলি নৃত্যশিল্পীর দেখার পথ। রক্তিম মুখ-গহ্বর এবং ইতস্ততঃ রক্তিম আভাযুক্ত পাটের চুলে সুগ্রীবকে, হনুমান, জাম্বুবান এবং বিভীষণের পাশে মানিয়ে যায় মন্দ না।

রাবণ-কাটা লোকনৃত্যে অংশগ্রহণকারী নৃত্যশিল্পীদের অবয়বগত সাজ-সজ্জার বর্ণনা দিলাম সংক্ষেপে। এবার বাঁকুড়ার 'লোক-সংস্কৃতি' গবেষক শ্রদ্ধেয় **শ্রীশৈলেন দাস** মহাশয়ের লেখা 'একটি ঐতিহ্যবাহী মুখোশ নৃত্য রাবণ কাটার বাঁদর নাচ' নিবন্ধটির বিশেষ বিশেষ কিছু অংশ উদ্ধৃতি সহযোগে শোনাই আপনাদের। তিনি লিখেছেন—

"বিষ্ণুপুরের মুখোশ নৃত্য গড়ে উঠেছে এক বিশেষ বৈশিষ্ট্যানুযায়ী। এ নাচে অভিনেতাদের মুখের ভাবাভিব্যক্তির প্রকাশ দেখা যায় না। সারা মুখ মুখোশে ঢাকা থাকে। তবে নৃত্যশিল্পীদের অন্যান্য অঙ্গ সঞ্চালনে সে অভাব পূরণ হয়ে যায়। শিল্পীদের অঙ্গ-সঞ্চালন দু-ভাগে বিভক্ত **(১) দেবচাল (২) রাক্ষস চাল**। প্রথমটিতে আছে লালিত্য। দ্বিতীয়টিতে স্থূলতা ও বলিষ্ঠতা। **তবে রাবণ বধের মুখোশ নৃত্যে হনুমান, জাম্বুবান ও সুগ্রীবের নৃত্য কৌশল হল মানবসুলভ পশুনাচ আর বিভীষণের নাচ মানব সুলভ রাক্ষস নাচ।...**

এই নাচে নৃত্যশিল্পীরা এককভাবে অথবা দুজনে এক এক সময় প্রচণ্ড দক্ষতায় বেশ

উঁচুতে লাফ দেয়। কখনও ঘুরপাক খায়, কখনও বা মাটিতে বসে পড়ে। কখনও আবার শূন্য থেকে মাটিতে লাফ দিয়ে প্রতিপক্ষ বিশেষতঃ রাবণ, কুম্ভকর্ণ, ইন্দ্রজিৎ প্রভৃতির দিকে তেড়ে যায়।"

পূর্বেই বলেছি, রাবণ-কাটা লোকনৃত্য বাচ্চা কাচ্চা এবং কিশোর বয়েসী বালক-বালিকাদের কাছে একদিকে যেমন ভীতিপ্রদ অন্যদিকে তেমনি কৌতুকোদ্দীপক। রাবণ-কাটার নাচ দেখার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মধ্যে। বিষ্ণুপুরের দুর্গোৎসবে তাই রাবণ-কাটার নাচ যেন একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বাজনা প্রধান এই নাচে যেসব বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয় সেগুলি হল কাড়া, নাকাড়া, ঢোল, বাঁশী, রোশনচৌকি, টিকরা ইত্যাদি। সংলাপ বিহীন এই নাচে বাজনার সুর ধ্বনিত হয় 'টুং টাং, টুং টাং, টিং টিং, টিং টিং, গুড়ুক্ গুড়ুক্ টুং টাং' ইত্যাদি। বাজনা-বাদ্যি শুনে ছুটে আসে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। উন্মুক্ত আকাশের নীচে শুরু হয় নাচ। ছেলেরা আনন্দে চিৎকার করে গাইতে থাকে **'তোপ জুড়ুব্ জুড়ুব্‌টা রাবণ-কাটার বাঁদরটা, তোপ জুড়ুব্ জুড়ুব্‌টা রাবণ-কাটার বাঁদরটা'** ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পূর্বোক্ত শৈলেন বাবু আরো লিখেছেন, "এই মুখোশ নাচের ঐতিহ্যগত রূপাবয়ব সৃষ্টিতে এই এলাকার সাধারণ, বিশেষত নিম্নবর্ণের মানুষের প্রয়াসই বেশি এবং এঁরাই এই নাচের বড় শিল্পী। এটি অবশ্যই নান্দনিক ও শৈল্পিক সচেতনসম্পন্ন উন্নত সংস্কৃতির অবদান, ও এই নৃত্যের যাবতীয় উপাদান এবং আঙ্গিকগত রূপারোপ ও বিধিবদ্ধতা এইসব শিল্পচৈতন্যের দখল হলেও লৌকিক আবরণ এ নাচের সর্ব্বাঙ্গে। আদিবাসী নৃত্যের বিশৃঙ্খলরূপের সঙ্গে ধ্রুপদী তাণ্ডব নৃত্যের মিল ঘটিয়ে এই মুখোশ নাচের পরিকাঠামো। তবে মুখোশের গঠন ও রঙের উৎকর্ষ বৈচিত্র্যে এর ধ্রুপদী রীতি লোপ পেয়ে লৌকিক রীতিটিই প্রধান হয়ে উঠেছে।"

রাবণ-কাটা অনুষ্ঠানটি তিন দিনের। তিন দিনের এই নৃত্যানুষ্ঠানের সূচনা বিজয়া দশমীতে, সমাপ্তি দ্বাদশীতে। প্রথম দিনে অর্থাৎ বিজয়া দশমীর দিনে শ্রীশ্রীরঘুনাথজীউ-এর অভিষেক এবং যথাবিহিত নিয়মানুসারে পূজা-অর্চনার পর মুখোশ-নৃত্যের শিল্পীগণ মন্দির থেকে বেরিয়ে আসেন অস্থলে। অস্থল প্রাঙ্গণে নৃত্যপ্রদর্শনান্তে এবং অস্থল সংলগ্ন রাস্তাতে বেশ কিছুক্ষণ নৃত্য প্রদর্শনের পর কুম্ভকর্ণ বধের মাধ্যমে বিজয়া দশমীর নৃত্যানুষ্ঠান শেষ হয়। একাদশীর দিন সকাল ৯টা নাগাদ রঘুনাথজীউ-এর আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে ঠাকুরের পাদ্যার্ঘ্য স্নানজল তুলসী গ্রহণ করে রাবণ-কাটার দল বেরিয়ে পড়েন শহরের কাটানধার, মল্লেশ্বর, মহাপাত্রপাড়া, কাদাকুলি, বড়কালীতলা প্রভৃতি অঞ্চলে নাচ দেখাতে। মন্দিরে ফিরতে ফিরতে হয়ে যায় রাত ৯টা। অতঃপর ইন্দ্রজিৎ বধের পর রঘুনাথজীউ-এর আরত্রিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শেষ হয় দ্বিতীয় দিনের উৎসব। দ্বাদশীর দিনও যথারীতি রঘুনাথজীউ-এর পাদোদক গ্রহণ করে দিবাভাগের প্রথম প্রহরেই 'রাবণ-কাটার দল'টি বেরিয়ে পড়েন শহরের অন্যত্র নাচ দেখাতে। ঐদিন রাজদরবার, রাসতলা, সঙ্কটতলা, হাজরাপাড়া, চকবাজার, বোলতলা, মাধবগঞ্জ, বসুপাড়া, কৃষ্ণগঞ্জ, কৈলাসতলা, কাইতিপাড়া, কুন্দকুন্দার বাজার প্রভৃতি অঞ্চলে নৃত্যপ্রদর্শন করে অস্থলে ফিরে আসেন রাত্রির প্রথম প্রহরে। **ঐদিন রাবণ-কাটা হয় রাত্রির দ্বিপ্রহরের শেষভাগে। রাবণ-কাটার সুবাদেই মুখোশ নৃত্যের দলটি 'রাবণ-কাটার দল' নামেই সমধিক পরিচিত।**

অতীব চিত্তাকর্ষক এই রাবণ-কাটা নৃত্যানুষ্ঠানটি দেখার জন্য শহরের বিভিন্ন প্রান্তের

লোক এসে ভিড় জমায় রঘুনাথজীউ-এর মন্দির সংলগ্ন রাস্তায়। বর্তমানে একটি ট্রাক্টারের উপর রণসাজে সজ্জিত প্রায় ছ'ফুট উঁচু বৃহদাকার এবং বলিষ্ঠ রাবণ তৈরি করা হয়। মুণ্ডবিহীন এই মাটির রাবণের গলদেশে প্রোথিত হয় বর্ণাঢ্য রঙ্গে রঞ্জিত ও সুদৃশ্য মুকুট শোভিত গামার কাঠের তৈরি দশমুণ্ডের মুখোশ। সর্বসাকল্যে আট ফুট উঁচু এই মূর্তিটি তৈরি করা হয় বিষ্ণুপুর শহরের বাদামতলার মাটি দিয়ে। প্রায় **"২/৩ গরুর গাড়ি মাটি লাগে এই মূর্তি তৈরি করতে। কাঠামো তৈরির জন্য খড় লাগে ২ পণ এবং বাবুই দড়ি ১০/১২ কেজি।"**

শারদীয়া পূজার দ্বাদশী তিথির রাত্রিনিশীথে রঘুনাথজীউ-এর মন্দির সংলগ্ন নিমতলা মহল্লার সদর রাস্তার দক্ষিণ দিকে উত্তরমুখী অবস্থায় ট্রাক্টারের উপর থাকে 'যুদ্ধং দেহি' রাবণের মূর্তি আর উত্তর দিকে দক্ষিণমুখী অবস্থায় মনোরম চৌদালের উপর লক্ষ্মণ ও সীতা সমভিব্যাহারে রণসাজে সজ্জিত অবস্থায় থাকেন ৺রঘুনাথজীউ। রাম-রাবণের সম্মুখ সমরের মধ্যস্থলে থাকে মানানসই দূরত্ব। সূর্যাস্তের পর থেকেই রাবণবধ উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়ে ঐ অঞ্চলে। তবে রাত্রির প্রথম প্রহরের শেষভাগে জনতার ভিড়ে মেলা জমে জমজমাট। ৺রঘুনাথজীউ-বন্দনা হয় বিধি অনুসারে। বাজনা বাজে 'টুং টাং, টিং টিং গুড়ুক্ গুড়ুক্ টুং টাং'। বাজনার তালে তালে হনুমান, জাম্বুবান, বিভীষণ ও সুগ্রীবের নাচ-কুঁদ চলতে থাকে ছন্দে ছন্দে। ঘণ্টা কয়েক চলে নাচ। আপন গতিতে গড়িয়ে যায় সময়। রাত্রির দ্বিপ্রহরের শেষভাগে ঘনিয়ে আসে রাবণবধের শুভলগ্ন। ৺রঘুনাথজীউ-এর কাছ থেকে রাবণের কাছ পর্যন্ত নাচতে নাচতে হনুমান যাতায়াত করে পুনঃপুনঃ। নাচতে নাচতে হনুমানের অনুগামী হয় জাম্বুবান, বিভীষণ এবং সুগ্রীব। বার বার ধ্বনিত হতে থাকে—**'রাবণ রাখব না কাটব, রাবণ রাখব না কাটব'** ইত্যাদি ইত্যাদি। এইভাবে একুশ বার নৃত্যরত অবস্থায় যাতায়াতের পর জাম্বুবানের নির্দেশে রুদ্রাক্ষের মালা পরিহিত হনুমান রঘুনাথজীর কাছে রাখা তরবারি নিয়ে দ্রুতবেগে দৌড়ে গিয়ে ট্রাক্টারে উঠে রাবণের গলায় তরবারির কোপ বসিয়ে দেয় অভিনয়ের ছলে। রাবণের পিছনে দণ্ডায়মান কোন ব্যক্তি ঠিক সেই মুহূর্তে খুলে নেয় দশমুণ্ডের মুখোশ। ছিন্নমুণ্ড রাবণের গলদেশে ঢেলে দেওয়া হয় রক্তের মতো লাল জল। রাবণকে কাটার সাথে সাথে অশুভ শক্তিকে পরাভূত করার বীরোচিত উল্লাসে হনুমান, জাম্বুবান, বিভীষণ ও সুগ্রীব সহ উল্লসিত জনতা নৃত্য করতে থাকেন অদম্য উৎসাহে। এদিকে ছিন্নমুণ্ড রাবণকে ভূপাতিত করে রাবণের দেহের মাটি নেওয়ার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায় সমবেত দর্শকমহলে। নিমেষে শেষ হয়ে যায় দুই তিন গাড়ি মাটি দিয়ে তৈরি রাবণের মরদেহ। প্রচলিত বিশ্বাস রাবণের দেহের মাটি ঘরে রাখলে গৃহীর মঙ্গল হয়, হয় না রক্তচোষা ছারপোকার উৎপাত। রাবণ-বধের পর অর্থাৎ অশুভ শক্তির পরাজয়ের পর শুভশক্তির প্রতীক বিজয়ী রামচন্দ্র তথা ৺রঘুনাথজীউ-এর পূজা ও আরত্রিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সে বছরের মতো শেষ হয় রাবণ-কাটা লোকনৃত্য।

রাবণ-কাটা লোকনৃত্যে যাঁরা অংশগ্রহণ করেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে পড়ে ৬২ বছর বয়স্ক দলনেতা সুকুমার বারিক মশায়ের কথা। তাঁরই নেতৃত্বে পরিচালিত এই মুখোশনৃত্যের দলটিতে বর্তমানে জাম্বুবানের ভূমিকায় নারায়ণ বারিক (বঃ ১৯), পূর্বে তাঁর পিতা ৺সুবল বারিক, হনুমানের রূপে সুকুমার অধিকারী (বঃ ৪২), সুগ্রীবের অভিনয়ে পঞ্চানন লোহার (বঃ ৪০) এবং বিভীষণের নৃত্যে শিবদাস গরাই (বঃ ৫৫) অংশগ্রহণ

করেন। বাদ্যকরগণের মধ্যে সপুত্রক গোকুল ধাড়া, নকুল ধাড়া বৃহদাকার মৃন্ময় রাবণ তৈরির ক্ষেত্রে খড়বাংলা নিবাসী নারায়ণ চক্রবর্তী এবং সর্বোপরি রঘুনাথজীউ তথা রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও হনুমানের বারোমাসের পূজারী রামপ্রসাদ মিশ্রের (বঃ ৫০) নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

পূর্বেই বলেছি, বিষ্ণুপুরের শারদীয়া দুর্গোৎসবে রাবণ-কাটা নৃত্য একটি অপরিহার্য অঙ্গ। এই মুখোশ-নৃত্য দেখার জন্য শহরের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাগণ উন্মুখ হয়ে থাকেন সারাটি বছর। **একটানা তিনদিন এই মুখোশনৃত্য প্রদর্শন করে যাঁরা শহরবাসীর মনে আনন্দের জোয়ার আনেন, তাঁদের অন্দরমহলে কিন্তু হতাশার কালো ছায়া, নিরানন্দের প্লাবন সারাটি বছর। জীবনযুদ্ধে তিলে তিলে ক্ষয়ে যাচ্ছেন এঁরা, তথাপি এই লোক-সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে আছেন শ্রীকৃষ্ণের বুকে সযত্নে রক্ষিত কৌস্তুভ মণির মতোই।**

খঞ্জ এবং বৃদ্ধ চুনারু সুকুমার বারিক ও নারায়ণ বারিকদের চুনের কাজ আজ অচল। তাই ঠোঙা তৈরি করে পেটের গর্ত বোজাতে হয় ভাতের পিঠে নুন দিয়ে। অনুরূপভাবে সুকুমার অধিকারী লটারির টিকিট বিক্রী, শিবদাস গরাই লণ্ঠন তৈরি, বাকিরা হয় সব্জী বিক্রী, নয়তো বা রাজমিস্ত্রী, কাঠমিস্ত্রী কিংবা ট্রাক, ট্রাক্টরে হেলপারি করেন। অন্যেরা আবার বাঁশের ঝুড়ি, টোকা, পেথা, চালুনি, খাঁচা প্রভৃতি দ্রব্যাদি প্রস্তুত ও বিক্রী করে জীবনযুদ্ধে টিকে আছেন কোন রকমে। জাম্বুবানের রূপে যাঁকে দেখা যেত সদ্যঃপ্রয়াত সেই সুবল বারিকের বিধবা পত্নী তো ঠোঙা তৈরি করতে করতে চোখের জল মুছলেন অভাবের তাড়নায় পেট মোচড়ানো ব্যথায়, অনূঢ়া কন্যার বিয়ে দেওয়ার দুর্ভাবনায়।

শিল্পী সুবল বারিক বছরে মাত্র দু'শ টাকা করে সরকারি সাহায্য পেতেন। তাও বন্ধ হয়েছে বছর পাঁচ-ছয়।

আমরা টি.ভি.-র পর্দায়, সিনেমার রূপোলী পর্দায় এঁদের মেক আপ দেওয়া চাকচিক্য রূপ দেখে, নৃত্যানুষ্ঠান দেখে মুঠো মুঠো আনন্দ লুটে নিই দুহাত ভ'রে। লোকশিল্প ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির বড়াই করি, গল্প করি, প্রচার করি আত্মতৃপ্ত পারাবতের গলা ফোলা বাকুম বাকুম স্বরে কিন্তু এঁদের চরম দুর্দশাতেও আমরা উদাস।

নির্মল আনন্দ যদি জীবনীশক্তির উৎস হয়, তাহলে তাদৃশ আনন্দ-সঞ্চারী মুখোশ নৃত্য, ছৌ-নাচ, কাঠি-নাচ প্রভৃতি লোকশিল্প এবং কৃষ্টি-সংস্কৃতির যাঁরা ধারক ও বাহক তাঁদের প্রতি সহযোগিতার হাত গুটিয়ে নিয়ে এবং ঔদাসীন্য দেখিয়ে আমরা এবং আমাদের সরকার নিষাদ-নির্মমতায় নির্লজ্জ নয় কি?

শিক্ষিত-বেকার-উৎপাদন-কেন্দ্র রূপে প্রতিভাত গণ-শিক্ষায়তনগুলির প্রায় নিষ্ফল বা আংশিক সফল শিক্ষার জন্য এবং অন্যান্য খাতে যেখানে হাজার হাজার কোটি টাকা ব্যয় করতে কার্পণ্য নেই সেখানে অনাবিল আনন্দের উৎসধারা এইসব লোক-সংস্কৃতির সংরক্ষণে এতো ঔদাসীন্য কেন? —বুঝে উঠতে পারেন না প্রায় অশিক্ষিত বা স্বল্প শিক্ষিত বিষ্ণুপুরের সুবল বারিকের মতো দেশময় ছড়িয়ে থাকা লাখো লাখো সুবল বারিকের দল। অথচ মল্লরাজত্বে মল্লরাজারা এইসব লোকোৎসবকে জিইয়ে রাখার জন্য নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করেছিলেন প্রচুর পরিমাণে।

অধ্যায়-৪১

বাসন্তীতলার বাসন্তীমাতা

নিমতলা মহল্লার রঘুনাথজীউ-এর অঙ্গন ছেড়ে আমরা এখন হাজির হয়েছি বাসন্তীতলা পল্লীতে। এখানে অনুষ্ঠিত বাসন্তী দুর্গোৎসবের সুবাদে মহল্লাটির নাম হয়েছে বাসন্তীতলা। এক্ষেত্রে স্মরণ করিয়ে দিই বিষ্ণুপুরের তিনটি পল্লীতে বাসন্তীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এগুলি হল বাসন্তীতলা ষোলআনার বাসন্তীপূজা, ঢেলাদুয়ার মহল্লার কর পরিবারের পারিবারিক বাসন্তীপূজা এবং তুড়কী মৌজার হরিতপোবন আশ্রমের বাসন্তীপূজা।

বাসন্তী, দেবী দুর্গার নামান্তর মাত্র। শরৎকালের দুর্গাপূজা যেমন শারদীয়া দুর্গোৎসব, বসন্তকালের দুর্গোৎসব অনুরূপভাবে বাসন্তী দুর্গোৎসব নামে আখ্যায়িত। শরতের পূজা অকাল পূজা, কারণ শরৎকাল দেব-দেবীগণের রাত্রিকাল অর্থাৎ নিদ্রার সময়—এজন্যই অকাল। শরৎকালে তথা অকালে পূজা করার জন্যই দেবীর বোধন করে পূজা করতে হয়। পক্ষান্তরে বসন্তকাল দেব-দেবীগণের দিবস, এ সময় তাঁরা থাকেন জাগরিত। তাই পূজার প্রকৃষ্ট সময় এবং বোধন নিষ্প্রয়োজন।

চান্দ্রতিথি অনুসারে মীন ও মেষ এই উভয় রাশিতে সূর্যের অবস্থানকালে অর্থাৎ চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাসের মধ্যে চান্দ্র চৈত্র শুক্লা সপ্তমী তিথিতে বাসন্তী পূজার সূচনা এবং দশমীতে সমাপ্তি। তিথি নির্ধারিত পূজা বলে সৌর মাস অনুসারে এ পূজা হয় না। হয় চন্দ্রমাসানুসারে।

শারদীয়া দুর্গাপূজার নিয়মানুসারেই বাসন্তী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শারদীয়া দুর্গাপূজার মতোই এই পূজাও চতুরবয়বী। দুর্গাপূজার ন্যায় বাসন্তী পূজাতেও স্নপন, পূজন, হোম ও বলিদান বিধেয়। ষষ্ঠীতে সন্ধ্যায় বিল্বতরুমূলে আমন্ত্রণ বা বিল্ববরণ, প্রতিমার অধিবাস, সপ্তমীতে আমন্ত্রিত বিল্বশাখা ছেদন এবং চণ্ডীপাঠাদি সবই করতে হয় শারদীয়া দুর্গাপূজার মতোই। এই পূজা করে ভক্ত অভীষ্ট ফল লাভ করেন।

পৌরাণিক যুগে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ গোলোকধামে রাসমণ্ডলে মধুমাসে (চৈত্রমাসে) পরম প্রীত হয়ে দেবী দুর্গার পূজা করেন। সেই থেকে বাসন্তীপূজার প্রচলন। পরে স্বয়ং বিষ্ণু মধুকৈটভ যুদ্ধের প্রাক্কালে দেবীর শরণাপন্ন হন এবং ঐ সময়েই ব্রহ্মাও দেবীর পূজা করেন। অনন্তর সমাধিবৈশ্য ও সুরথরাজা বিপদগ্রস্ত অবস্থায় মেধস মুনির উপদেশ-ক্রমে দেবী দুর্গার পূজা করে সমাধিবৈশ্য নির্বাণমুক্তি এবং সুরথরাজা হৃতরাজ্য ফিরে পান। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে উল্লেখ আছে তাঁরা শরৎকালে এই দুর্গাপূজা করেছিলেন। মার্কণ্ডেয় পুরাণে বলা হয়েছে সুরথ রাজাই পৃথিবীতে প্রথম দুর্গাপূজা করেন।

বিষ্ণুপুর শহরের বাসন্তীদেবীর চালে শোভা পান রণোন্মত্ত সিংহবাহিনী দেবী দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতী সহ দেবীর পদতলে প্রতিপক্ষীয় পরাক্রান্ত মহিষাসুর।

বাসন্তীতলার বাসন্তীপূজার প্রাক্কালে বিষ্ণুপুরের রাজাকে রাজমাল্য দিয়ে পূজার জন্য রাজার অনুমতি নেওয়ার নিয়ম প্রচলিত। এছাড়া এখানের পূজাতে রাজার নামে সংকল্প করা হয়। বর্তমানে রাজা না থাকায় রাজকুলদেবী মা মৃন্ময়ীর নামে সংকল্প হয়। এই প্রথা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় সুদূর অতীতে হয়তো বা এটি ছিল রাজপরিবারের পূজা, নয়তো বা এই পূজাতে ছিল রাজপরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা। অবশ্য বাসন্তীমাতার

এই শ্রীমন্দিরটি নির্মিত হয়েছে ঁঝাবরমল দারুকা, ঁফুলচাঁদ দারুকা, ঁজগন্নাথ দারুকা এবং ঁউমেশ কর মহাশয়দের ধানের আড়তে ঈশ্বরবৃত্তির অর্থে। মন্দির সংলগ্ন আটচালা বা নাটমন্দিরটি নির্মাণ প্রকল্পে নটী ঁউষারাণী দাসী অর্থ দান করেছিলেন অকৃপণ হস্তে। মন্দিরটি শতাধিক বছরের পুরানো হলেও নাটমন্দিরটি নির্মিত হয় ১৩৭৮ বঙ্গাব্দে। এই পূজাতে দ্বারে দ্বারে গিয়ে চাঁদা আদায় করার নিয়ম নেই। পল্লীবাসীগণ নিয়মানুসারে অষ্টমী পূজার দিন পৌঁছে দেন নিজ নিজ দেয় চাঁদা।

এখানের বাসন্তীপূজা উপলক্ষ্যে নবমীর দিন বিকেল বেলায় ভারত সেবাশ্রম সংঘের রক্ষীবৃন্দ বীরত্ব ব্যঞ্জক ও আত্মরক্ষামূলক লাঠি বা ছোরা খেলা দেখিয়ে আসছেন বিগত পাঁচ বছর যাবৎ। এছাড়া দশমীনিশিতে স্থানীয় অভিনেতাগণ মহাসমারোহে যাত্রাভিনয় করেন বছরে বছরে।

কর পরিবারের বাসন্তীপূজা প্রচলনের মূলে রয়েছে দৈবস্বপ্ন। ১৩১২ বঙ্গাব্দ। বিষ্ণুপুরের তৎকালীন ভূস্বামী ও অম্বরীতামাক প্রস্তুত কারক ঁকেশব চন্দ্র কর বাসন্তীপূজার কয়েকদিন পূর্বে স্বপ্ন দেখেন স্বীয় চণ্ডীমণ্ডপে মহাধুমধাম সহকারে বাসন্তীপূজা হচ্ছে। স্বপ্নের অর্থ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর মনে হয় বাসন্তীদেবী যেন পূজা পেতে চাইছেন তাঁর চণ্ডীমণ্ডপেই। এই স্বপ্নদর্শনের আন্তরপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সেই বছর থেকেই অর্থাৎ ১৩১২ বঙ্গাব্দ থেকেই বাসন্তী পূজার প্রচলন হয় কর পরিবারে। আগামী ১৪১১ বঙ্গাব্দে শতবর্ষপূর্তি হবে ঐতিহ্যমণ্ডিত এই দেবীপূজার।

সীতারামপুর-তুড়কী মৌজার হরিতপোবন আশ্রমে সর্বপ্রথম বাসন্তীপূজা হয় আজ থেকে প্রায় ৩৫/৪০ বছর পূর্বে। সিদ্ধ-সাধক মৌনীবাবার মন্ত্রশিষ্যা কোলকাতার কেওড়াতলা নিবাসী ঁমেধাবালা দাসী তাঁর গুরুভাই ও ভগ্নীদের নিয়ে যৌথ উদ্যোগে বছর-দুই বাসন্তী পূজা করেছিলেন এই আশ্রমে। পরবর্তীকালে যে কোন কারণ বশতঃ হোক সে পূজা বন্ধ হয়ে যায়। গত ১৪০৯ বঙ্গাব্দে মা জেগে উঠেছেন আবার। বিষ্ণুপুরের প্রাক্তন পৌরসভাপতি (Ex-Chairman) শ্রীতুষারকান্তি ভট্টাচার্যের উদ্যোগে এবং স্থানীয় ব্যক্তি ও আশ্রম কর্তৃপক্ষের সমবেত প্রয়াসে মহাসমারোহে পুনরায় শুরু হয়েছে শ্রীশ্রীবাসন্তীপূজা।

বাসন্তীপূজা প্রসঙ্গে যে কথাটি না বললে আলোচনা রয়ে যায় অসম্পূর্ণ তা হল **বাসন্তী অষ্টমী তিথিতে অন্নপূর্ণার পূজা বিধেয়।** কথিত আছে এই তিথিযোগে অন্নপূর্ণা পূজা করলে অন্নকষ্ট দূর হয়। অন্তিমকালে হয় স্বর্গলাভ। এই শহরের তিনটি স্থানে অন্নপূর্ণা পূজা হয়। শহরের রঘুনাথসায়র পল্লীতে রয়েছে মা অন্নপূর্ণার শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ। এখানে মা পূজিতা হন বারোমাসই। বিশেষ তিথিযোগে বিশেষ পূজাপাঠ ও হোমযজ্ঞ হয়।

কৃষ্ণগঞ্জ রথতলাতে মা অন্নপূর্ণার মৃন্ময় মূর্তির পূজা হয় দোলপূর্ণিমার দিন থেকে প্রায় মাসাধিককাল। আর রসিকগঞ্জ পল্লীতে শ্রীশিবরাম মুখার্জীর বাড়িতে বাসন্তী-অষ্টমী তিথিযোগে অন্নপূর্ণা পূজা হয় ফি-বছর। এঁর বিষ্ণুপুরের বাড়িতে পূজা হচ্ছে প্রায় ৩৫ বছর। এর আগে সোনামুখী থানার তিউড়া গ্রামের আদিবাড়িতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে পুরুষানুক্রমে। অষ্টমী, নবমী এবং দশমী—তিন দিনের এই পূজার মধ্যম দিনে অর্থাৎ নবমীর দিনে নরনারায়ণ সেবা এবং ব্রাহ্মণ-ভোজনও করানো হয় সামর্থ্যানুসারে।

এখানের দেবী-চালের মধ্যমণি হলেন মা অন্নপূর্ণা। সিংহাসনে উপবিষ্টা দেবী প্রসন্ন

বদনে ভিক্ষা দিচ্ছেন ভিক্ষুক মহেশ্বরকে। মহেশ্বরের দক্ষিণ পাশেই দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকেন ব্রহ্মা। মা অন্নপূর্ণার বাম পাশে দণ্ডায়মান বিষ্ণু। এছাড়া দেবীকে ব্যজন করছেন দুই সখী।

বাসন্তীদেবীর কথা প্রসঙ্গে শোনালাম দেবী অন্নপূর্ণার কথাও। অন্নপূর্ণা প্রসঙ্গে ফিরে আসব আবার। এখন মাতৃচরণে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে চলুন এগিয়ে যাই কাটানধার মহল্লার ইঁদকুড়ি বা ইঁদতলা অভিমুখে।

অধ্যায়-৪২

ইঁদ পরব

লঘু ছন্দে হাঁটতে হাঁটতে আমরা এসে গেছি বিষ্ণুপুর শহরের ঈশানকোণে অবস্থিত কাটানধার মহল্লার ইঁদতলা অঞ্চলে। মল্লরাজাদের রাজত্বকালে এখানে উদ্‌যাপিত হত একটি ঐতিহ্যপূর্ণ উৎসব। অধুনা-বিলুপ্ত সেই উৎসবের স্মৃতিচারণ করব এখন। **উৎসবটি 'ইন্দ্রধ্বজ উৎসব'। চলতি কথায় 'ইঁদ পরব' নামে প্রসিদ্ধ**। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল মল্লভূমের মল্লরাজাদের বাৎসরিক রাজ্যাভিষেক-উৎসব এবং মল্লাব্দ ঘোষণার শুভলগ্ন—এজন্যই উৎসবটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং রাজকীয় আভিজাত্যে অভিজাত। এখন রাজা নেই, রাজত্ব নেই, নেই সেই আড়ম্বরপূর্ণ 'ইঁদ পরব'। ইঁদ পরব হয়েছে পুস্তকের পাতায় কলমবন্দী, 'ইঁদ পরব' হয়েছে ইতিহাসের উপাদান।

ইতিহাস বলে, প্রতি বছর পহেলা ভাদ্র বিষ্ণুপুরের রাজা ইঁদ-কাঠ নির্বাচনের জন্য যেতেন বাসুদেবপুর জঙ্গল সংলগ্ন কানগড় জঙ্গলে। অনুগামী হতেন বিষ্ণুপুর শাঁখারীবাজার মহল্লা নিবাসী ফৌজদার বংশের বিশিষ্ট রাজ-কর্মচারী, বাজনা-বাদ্যি-সহ সৈন্যসামন্ত, পুজোপকরণ সহ পুরোহিত এবং অনুরক্ত প্রজাবৃন্দ। মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে, কটিবন্ধ বেঁধে তলোয়ার উঁচিয়ে কাড়া, নাকাড়া, বাজনা-বাদ্যি বাজিয়ে যুদ্ধ যাত্রার আদলে শুরু হত জঙ্গলযাত্রা। জঙ্গলে গিয়ে নিখুঁত এবং সর্বাঙ্গসুন্দর দুটি শালগাছ বাছাই করা হত সর্বপ্রথমে। গাছ দুটিকে যথাবিহিত নিয়মানুসারে পূজা করতেন রাজপুরোহিত। পূজান্তে বৃক্ষমূলে তলোয়ারের কোপ বসিয়ে দিতেন তলোয়ারধারী ফৌজদার। এভাবে গাছ দুটিকে চিহ্নিতকরণের পর রাজদরবারে ফিরে আসতেন সপার্ষদ রাজা-মহারাজ।

ভাদ্র মাসের শুক্লা-দ্বাদশী তিথিটিই ইন্দ্রদ্বাদশী তিথি। ইন্দ্রদ্বাদশীর প্রত্যুষে রাজপ্রাসাদে বেজে উঠত 'ইঁদ-ভেরী'। রাজকুলদেবতা অনন্তদেবের পূজা হত ধুমধাম সহকারে। পূজান্তে হত রাজ্যাভিষেক। রাজবাড়ির উত্তর দিকে **'অভিষেক-মঞ্চ'**। সেই অভিষেক-মঞ্চে গিয়ে বসতেন রাজা। রাজার মস্তকের উপরিভাগে অনন্তদেবকে স্থাপন করে সুগন্ধি বারি সিঞ্চন করা হত সোনা বা রূপার ঝারিতে করে। কুলদেবতার আশীর্বাদপূত স্নানজল রাজার মাথার উপর ঝরে পড়ত ঝর্ণা ধারার অনুরূপে। সাথে সাথে চলত পুরোহিতের মন্ত্রপাঠ এবং পণ্ডিতবর্গের বেদপাঠ। **সব মিলিয়ে বেশ একটি ভাবগম্ভীর পরিবেশে ফি-বছর বংশ-পরম্পরায় অভিষিক্ত হতেন রাজন্যবর্গ।**

এখন প্রশ্ন হল, ইন্দ্রদ্বাদশী তিথিতে রাজ্যাভিষেক উৎসব উদযাপিত হওয়ার অন্তর্নিহিত অর্থই বা কি?

অন্বেষা বলে, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের আদি রাজা, আদিমল্ল বা রঘুনাথ মল্ল তাঁর শুভাকাঙ্খী এবং সাহায্যকারী সাঁওতাল বন্ধুদের নিয়ে ইন্দ্রদ্বাদশী তিথিযোগে দেবরাজ ইন্দ্রের পূজা করিয়ে রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। যুগপৎভাবে ঐ পুণ্যদিনেই প্রথম মল্লাব্দ (মল্লাব্দ-১) ঘোষণা করা হয়েছিল। মল্লরাজার সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ার প্রথম দিনটিকে এবং মল্লাব্দ ঘোষণার পুণ্য তিথিটিকে রাজ্যবাসীদের হৃদয়ে সদা জাগরুক রাখার অভিপ্রায়ে এই সমারোহপূর্ণ রাজ-উৎসবের সূচনা। বছরে বছরে রাজ্যাভিষেকের পুনর্নবীকরণ হত এই উৎসবের মাধ্যমে।

রাজ্যাভিষেকের পর বিকেল বেলায় ইঁদ পরব হত ইঁদতলায়। বিষ্ণুপুর শহরের কাটানধার মহল্লার—বর্তমানে যেখানে রাজকুমার জালানের বাড়ি ও পাথর ভাঙা কল রয়েছে, সেই স্থানটি ইঁদতলা নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

উৎসবের নির্ধারিত দিনের পূর্বেই জঙ্গল থেকে কেটে আনা হত পূর্বোক্ত ইঁদ-কাঠ বা শাল গাছ দুটি। ডাল পালা কেটে চেঁছে ছুলে গাছের গুড়ি দুটিকে পরিষ্কার করে রাখা হত পূর্বাহ্লেই। অনন্তর গাছ দুটির গুড়ির নিম্নভাগে একটি করে ছিদ্র করে খোঁটা পুঁতে লিগা পরিয়ে ঢেঁকির অনুরূপে শুইয়ে রাখা হত ইঁদ কাঠ দুটিকে। বাঁশ ও বাতার খাঁচা তৈরী করে গুড়ি দুটিকে মন্দিরের চূড়ার আকারে কলস, আমলক ইত্যাদির স্তর-বিন্যাসে সুসজ্জিত করে নতুন বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে দেওয়া হত আগাগোড়া। একেবারে উপরিভাগে থাকত ছাতা কিংবা ধ্বজা বা পতাকা।

বিকেল বেলায় শোভাযাত্রা সহকারে পালকিতে করে ইঁদতলায় নিয়ে যাওয়া হত কুলদেবতা অনন্তদেবকে। হাতিতে চড়ে অনন্তদেবের অনুগামী হতেন স্বয়ং রাজা, ঘোড়ায় চড়ে রাজপুরুষগণ, পদব্রজে রাজকর্মচারী ও প্রজাবৃন্দ। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে থাকত বাউরী, বাগ্দী লাঠিয়ালের দল। চলত লাঠি খেলা। বেজে উঠত কাড়া, নাকাড়া, রণভেরী এবং বাজনাবাদ্যি। সব মিলিয়ে বেশ একটা ভাবগম্ভীর উৎসবের আমেজ তৈরী হত। সাড়ম্বরে শোভাযাত্রাটি গিয়ে থামত ইঁদতলায়। ইঁদ পরব দেখার জন্য উৎসাহী জনতার ভিড়ে জমজমাট হয়ে উঠত ইঁদতলা। রাস্তার দু-পাশে বসত দোকানদানি। ইঁদকাঠে লাগানো দড়ি ছুঁয়ে দিতেন রাজা। তারপর দড়ি টেনে আধাআধিভাবে তোলা হত ইঁদ কাঠ দুটি। মাটির উপর প্রায় ৪৫ ডিগ্রী অ্যাংগেলে শোভা পেত কাঠ দুটি। নাচ গানের মধ্য দিয়ে শেষ হত ইঁদ-মেলা।

ইঁদ তোলার পর **'ইঁদ-সওয়ারী'** দলটি সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরে আসতেন রাজ-দরবারে। **ইঁদতলা থেকে ফিরে পাত্র-মিত্র ও সভাসদগণ পরিবেষ্টিত হয়ে রাজা বসতেন রাজবাড়ির উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। সেই সময় শাঁখারীবাজার মহল্লার বুড়ো ধর্মঠাকুরের পূজারী কর্মকার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি রাজবাড়ির পাকা-মেঝের উপর একটি তামার হাতুড়ির সাহায্যে একাদিক্রমে তিনবার ঘা মেরে মল্লাব্দের প্রথম দিনটি ও সন ঘোষণা করতেন। এজন্য এটিকে 'সনপেটা'** বলা হয়। **প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, মল্লভূমের মল্লাব্দের প্রথম দিনটি 'বামন দ্বাদশী'** তিথি।

ইঁদ পরবে রাজা সাঁওতাল সর্দারদের হলুদ-বস্ত্র ও পাগড়ি প্রদান করতেন এবং সমাগত জনতাকে **'আরসা'** নামক পিঠে জাতীয় মিষ্টান্ন খাইয়ে বিদায় করতেন। পূর্বেই বলেছি

ইঁদ কাঠ পুরোপুরি উত্তোলন করা হত না। তোলা হত আধাআধি। এজন্য বলা হত **'আধাগাছি'**। আধাগাছি শব্দটি অপভ্রংশে হয়েছে আধাখ্যাঁচা বা আধাখ্যাঁচড়া। বিষ্ণুপুরে তথা মল্লভূমে অসম্পূর্ণ কাজকে তাই বলা হয় **'আধাখ্যাঁচা'** বা **'আধাখ্যাঁচড়া কাজ'**। আধাখ্যাঁচা বা আধাখ্যাঁচড়া কথাটি ইঁদপরবেরই স্মারক-শব্দ। বিষ্ণুপুরে প্রচলিত আর একটি প্রবাদ বাক্য হল—**ন্যাড়া খুঁজে ইঁদ পরব**। এর অর্থ হল নিষ্কর্মা বা কুঁড়ে প্রকৃতির লোকেরা হৈ হুল্লোড় খুঁজে বেড়ায়।

বিষ্ণুপুরের ইঁদ পরব হয়েছে ইতিহাস, হয়েছে ইতিকথা। তথাপি ইঁদ পরব বেঁচে আছে 'আধাখ্যাঁচা' শব্দ এবং 'ন্যাড়া খুঁজে ইঁদ পরব' প্রবচনের মধ্যে।

ইঁদ পরবের কথায় ছেদ টেনে আমরা এখন চলে যাব ঈশ্বরগতপ্রাণ রাজর্ষি প্রথম গোপাল সিংহদেবের সমীপে। কথায় বলে, সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। সদাশয় গোপাল সিংহদেবের সান্নিধ্যে এসে আপাততঃ আমরা স্বর্গসুখ অনুভব করার চেষ্টা করব কিছুক্ষণ।

অধ্যায়-৪৩

রাজকাহিনী—১৪

গোপাল সিংহদেব (প্রথম) (১৭১২ - ১৭৪৮ খৃঃ)

অপুত্রক দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ আততায়ীর হাতে নিহত হবার পর ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁর ভাই **গোপাল সিংহ**। অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজ্য রক্ষার্থে এবং প্রজাগণের মঙ্গলার্থে স্বামী-হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছিলেন রাণী চন্দ্রপ্রভা। দাদার অপমৃত্যু এবং জীবনের নশ্বরতা-বোধ গোপাল সিংহকে করেছিল ঈশ্বরমুখী। শ্রীশ্রীমদনমোহন দেবের শ্রীচরণে রাজ্যভার অর্পণ করে ইষ্ট চিন্তায় তন্ময় হয়ে থাকতেন তিনি। দিব্যানন্দে ভাসতে থাকতেন অহর্নিশি। তাঁর এই অভূতপূর্ব দিব্যানন্দের স্বাদ তিনি প্রজাদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, চেয়েছিলেন রাজা প্রজা সকলে মিলে এই ঐশী আনন্দ উপভোগ করতে। তিনি বিশ্বাস করতেন ঈশ্বরের নাম ইচ্ছায় অনিচ্ছায় যেভাবেই হোক জপ করলে পরমার্থলাভ অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং রাজশক্তির প্রয়োগ করে আইন জারি করলেন—**আঠার বছরে উত্তীর্ণ এবং তদোর্দ্ধ বয়সের নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজ্যের সমস্ত নাগরিকদের দিনান্তে একবার অন্ততঃ হরিনাম জপ করতে হবে। অন্যথায় শাস্তি।** প্রথম দিকে এই আইনটি বলবৎ ছিল শুধু মাত্র রাজকর্মচারীদের উপর; অতঃপর আরোপিত হল সমগ্র রাজ্যবাসীর উপর। রাজ্য জুড়ে হরিনাম জপের জোয়ার এল। ঈশ্বর-বীতশ্রদ্ধ ব্যক্তিগণের মনে দেখা দিল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। বাধ্যতামূলক হরিনাম জপের এই গা-জোরি আইনটিকে তারা **'গোপালের ব্যাগার'** আখ্যায় ভূষিত করল। বিনাপারিশ্রমিকে যে কাজ করতে হয় তাকে আঞ্চলিক ভাষায় 'ব্যাগার' বলা হয়। 'গোপালের ব্যাগার' কথাটা কানে উঠল স্বয়ং রাজা গোপাল সিংহের। গুপ্তচরদের মতোই ছদ্মবেশে তিনিও ঘুরে বেড়াতেন রাজ্যজুড়ে—দেখতেন হরিনাম জপ সবাই ঠিক ঠিক করছে কি না। না করলে তলব পড়ত রাজদরবারে, পড়তে হত রাজরোষে। এ নিয়ে অনেক ঘটনা ঘটেছে বিষ্ণুপুরে। শুনুন তবে দু-একটা

মুখরোচক গল্প—না, গল্প নয় সত্য ঘটনা।

পরের ঘরে সারাদিন তাঁতের কাজ করে ক্লান্ত, শ্রান্ত এবং অসুস্থ অবস্থায় সন্ধ্যা বেলায় ঘরে ফেরে এক তাঁতী। অসুস্থতার কারণে খাবার অনিচ্ছা প্রকাশ করে ঢাকাঢুকি দিয়ে শুয়ে পড়ে। এমন সময় তাঁর স্ত্রী এসে জানাল—'শুয়ে পড়লে যে, হরিনাম জপ করবে না?' তাঁতীর হাতে পায়ে সর্ব্বাঙ্গে যন্ত্রণা, তার ওপর মাথা ধরেছে ভীষণ, সেদিন আর হরিনামে মন নেই বিন্দুমাত্র। স্ত্রীর কথা শুনে তেলে বেগুনে জ্বলে গেল সে, চিৎকার ক'রে বললে—গোপালের ব্যাগার আমি খাটতে পারব না রোজ রোজ। তাতে যদি শূলে চড়তে হয় তাও আচ্ছা।'

রাজার গুপ্তচর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনল সব কথা। ঘরটি চিনে রাখল ভাল করে। পরের দিন সকাল হতেই রাজদরবারে ডাক পড়ল তাঁতীর। শিয়রে শমন বুঝতে পেরে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাজার সামনে করজোড়ে এসে দাঁড়াল তাঁতী। রাজা বললেন—'গতকাল রাত্রে তোমার সব কথা শুনেছে আমার চর। এখন যদি বাঁচতে চাও তাহলে সত্য করে বল হরিনাম জপ করাকে **'গোপালের ব্যাগার'** বলছিলে কেন?' লোকটি সাহস পেয়ে জানাল—'আমি খুবই গরীব, পরের ঘরে কাজ করে কোনরকমে দিন চলে আমার। জমি জায়গা নেই একটুও। অভাব, অনটন, দারিদ্র্য, তার উপর শরীরটা ছিল খুবই অসুস্থ। মেজাজ ঠিক ছিল না। নইলে আমি প্রতিদিনই হরিনাম করি। মাথা গরম করে বলে ফেলেছি। এবারের মতো ক্ষমা করে দিন হুজুর। ভুল হবে না আর কোনদিন'—ইত্যাদি, ইত্যাদি। অসহায়ভাবে কাঁদতে থাকে লোকটি। ধর্মপ্রাণ রাজার হৃদয়ে দয়ার উদ্রেক হয়। সত্যবাদিতার জন্য সন্তুষ্ট হয়ে লোকটিকে ২৫ বিঘা নিষ্কর জমি এবং নিজের ঘরে তাঁত করার জন্য নগদ কিছু টাকা দিলেন। বললেন—'আজ থেকে তোমার আর কোন অভাব থাকছে না। মনে প্রাণে হরিনাম জপ্‌বে। কোনরকম অন্যথা যেন না হয়।' **প্রাণ দিতে এসে পুরস্কার নিয়ে ফিরে গেল তাঁতী। কথায় বলে রাজার মেজাজ।**

গঙ্গাগোবিন্দ রায় প্রণীত 'মল্লভূম কাহিনী' গ্রন্থ থেকে এবার শোনাই অনুরূপ একটি গল্প। উপভোগ্য এই গল্পটির নাম—**'একমন আধসের'**। গল্পে বর্ণিত ঘটনাটি নিম্নরূপ।

"মল্লভূমের কোন এক গরীবলোক সারাদিন খেটেখুটে সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরেচে। ক্লান্ত দেহখানি বিছানায় এলিয়ে দিয়ে একটু জিরুচ্চে, এমন সময় তার স্ত্রী খাবার জন্য ডাক্‌লো। স্বামী খেতে যাচ্চে, কিন্তু পত্নী বলে উঠলো 'বাঃ আজ গোপালের বেগার খাট্‌লে না?' ঠিক্ সেই সময় গোপাল সিংহ ছদ্মবেশে ঘুরতে ঘুরতে সেই বাড়ীর কাছে নিজের নাম শুনে দাঁড়ালেন।

স্ত্রীর কথা শুনে, পুরুষটি ব'লে উঠলো, 'দূর খেপী। একমন আধসেরের ব্যবস্থা না হলে বেগার খাটি কি ক'রে, বল দেখি? '

রাজা তখন কথাগুলির মানে বুঝতে পারলেন না; কেবল বাড়িটিকে চিনে রেখে গেলেন।

পরের দিন সকাল বেলায় ঐ লোকটির রাজসভায় ডাক পড়লো। লোকটি ভয়ে ভয়ে রাজার কাছে গেল, কিন্তু যখন রাজা কালকার রাত্রে (তার স্ত্রীর সঙ্গে) খাবারের পূর্বে কি কথা হচ্ছিল জিজ্ঞাসা করলেন, তখন লোকটির মুখ শুকিয়ে গেল, বুক টিপ্ টিপ্ করতে লাগলো।

রাজা তার অবস্থা দেখে বুঝলেন এবং বল্লেন, 'তোমার কোন ভয় নাই, নির্ভয়ে

সত্য কথা বল।'

লোকটি অভয় পেয়ে বল্ল 'মহারাজ! আমি বলছিলাম একমন আধসেরের ব্যবস্থা না হলে কি করে বেগার খাটি।'

রাজা, একমন আধসেরের অর্থ কি জিজ্ঞাসা করলেন।

তখন লোকটি বল্ল, 'বেগার মানে বিনা পয়সায় হরিনাম করা—আর একমন—একাগ্র মন; আধ সের—সকাল, সন্ধ্যা, দুবেলায় ১ পোয়া করে, আধ সের চালের ব্যবস্থা না হলে পেটের অন্ন জুটবে কোথায়? আর পেটে ভাত না পড়লে, খিদে থাকলে হরিনামে মন বসে না।' "

রাজা কথাগুলি শুনে সন্তুষ্ট হোলেন এবং লোকটিকে নিষ্কর জমি দিয়ে চিরদিনের জন্য তার ভাতের ব্যবস্থা করে দিলেন।

বিষ্ণুপুর বাহাদুরগঞ্জ মহল্লা নিবাসী জনৈক গোবিন্দ সূত্রধরের জীবনেও ঘটেছিল অনুরূপ ঘটনা। **বৃদ্ধ গোবিন্দ সূত্রধর 'গোপালের ব্যাগার' বলার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে শেষ অবধি রাজ-বৃত্তি নিয়ে বাড়ি ফিরেছিলেন একই ভাবে।**

মহারাজ গোপাল সিংহ শুধু যে প্রজাদেরকেই হরিনাম করতে বাধ্য করেছিলেন তা নয়, তিনি নিজেও সারা দিনভর হরিনাম জপ করতেন। থাকতেন উপবাসে। সায়াহ্নকালে পাল্কীতে চড়ে লালবাঁধে স্নান করতে যেতেন। স্নান, আহ্নিক শেষে ফিরতেন দরবারে। অনন্তর অনুচরদের মুখে যখন শুনতেন তার রাজ্যে কেউই আর অভুক্ত নেই—তখনই তিনি ইষ্টদেবতার পাদোদক গ্রহণ করে দিনান্তে একবার মাত্র আহার গ্রহণ করতেন।

'তুমি যন্ত্র আমি যন্ত্রী, যেমন চালাও তেমনি চলি'—এই মনোভাব নিয়েই রাজ্য শাসন করতেন তিনি। ঁমদনমোহনদেবের উপর সমস্ত রাজ্যের ভার অর্পণ করে নিশ্চিন্তে থাকতেন তিনি। সংসারী হয়েও, রাজা হয়েও, একটি দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হয়েও মুক্তপুরুষের মতই জীবনযাপন করতেন তিনি। আমিত্ব বর্জিত ঋষিতুল্য নিস্পৃহ জীবনযাপনের জন্যই তিনি হয়েছিলেন **'রাজর্ষি'**।

মহারাজ গোপাল সিংহের কথা বলতে গিয়ে ঁফকির নারায়ণ কর্মকার মহাশয় লিখলেন, **"ইনি পরম ভক্তিমান পুরুষ ও একজন সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া ছিলেন এবং কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ-মঙ্গল নামে তিনি একখানি ভক্তিমূলক কাব্য লিখেছিলেন। আর কবিচন্দ্র নামে এক ব্যক্তিকে দিয়ে পয়ার ছন্দে বিরাট মহাভারত গ্রন্থ রচনা করিয়েছিলেন ....।**

তাঁর সময়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে বহু বৈষ্ণব, বহু ভক্তিমান পুরুষ বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন। তাঁদের ভক্তি আপ্লুত কণ্ঠের সংকীর্ত্তনে বিষ্ণুপুরের আকাশ-বাতাস তখন অহরহঃ মুখরিত হয়ে থাকত। গুপ্তবৃন্দাবন তীর্থ বিষ্ণুপুরের বুকে বৃন্দাবনের মাধুরিমা তখন মূর্ত্ত হয়ে উঠেছিল।"

গবেষক ঁমাণিকলাল সিংহ লিখলেন, **"মল্লরাজা গোপাল সিংহের আমলে মল্লভূমে বহু কবি, পদকর্তা, রামায়ণ, ভাগবত, মহাভারতের অনুবাদক এবং ধর্মমঙ্গল, শীতলামঙ্গল, সত্যপীরের পাঁচালি রচয়িতার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ইঁহাদের প্রায় সকলেই গোপাল সিংহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। এইসব কবিদের ভনিতায় গোপাল সিংহের উল্লেখ রহিয়াছে। ....**

ভারত পাঁচালীর ভনিতায় কবিচন্দ্র লিখিয়াছেন —

শ্রীযুক্ত গোপাল সিংহ প্রবল প্রতাপ
যাঁর কীর্তি দেখিলে ঘুচয়ে মনস্তাপ।
নৃপশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাগ্র সবাকার মান্য
পরম দেবতা সদা মানেন শ্রীচৈতন্য।

....

তারপর মহারাজ দিয়া ভূমিদান
আদেশিলা রচ মহাভারত পুরাণ।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ করিয়া ভাবনা
দ্বিজ কবিচন্দ্র কৈল ভারত বর্ণনা।

বিষ্ণুপুর নিবাসী উত্তমদাস নামক কবি, গোপাল সিংহের রাজত্বকালে ১৬৬১ শকাব্দে রাঘব রচিত শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশ রতনের বাংলা অনুবাদ করেন। উত্তমদাস তাঁহার গ্রন্থের ভূমিকায় নিম্নরূপে গোপাল সিংহের প্রশস্তি করিয়াছেন —

ভুবনে বিদিত এই বিষ্ণুপুর গ্রাম
মদনমোহন তাঁহা সদা অবস্থান।
শ্রীল শ্রীগোপাল সিংহ যাঁহা মহারাজা
শীলবন্ত পুণ্যবান অতি মহাতেজা।

....

প্রতাপে পূজিত তিহোঁ অতি দয়াময়
প্রজার পালন করে সদয় হৃদয়।"

'History of Bishnupur-Raj' গ্রন্থের লেখক অভয়াপদ মল্লিক মহাশয় লিখেছেন —" .... Gopal Singha granted lands to many other inhabitants of Mallabhoom. The Brahmans and Vaishnava singers were specially favoured by him." প্রাসঙ্গিকভাবে তিনি মন্তব্য করেছেন—"In the morning and evening the Vaishnavas sang through the town religious songs, some of which were introduced into Bishnupur from Brindaban. There Vaishnavas were granted rent-free lands by Gopal Singha. Even to the present day they sing religious songs during the three holy months of the Bengali year. One of these songs (probably adopted from a song of Brindaban) is given below :-

আরে ও একবার ভজমন গোবিন্দ হরে
হরে - হরে - হরে
প্রভু নিত্যানন্দ চৈতন্য হরে।।
ভজ গোবিন্দে পরমানন্দে
কহ গোবিন্দে রামাজী।
রাম কৃষ্ণ গোপাল দামোদর
হরে মাধব মধুসূদন জী।"... ইত্যাদি, ইত্যাদি।

গোপাল সিংহের ঈশ্বর-প্রীতির বিধান সাধারণের কাছে ক্রমশঃ হ'য়ে উঠল ঈশ্বর-ভীতির কারণ। হরিনাম জপের মতোই বাধ্যতা মূলক করা হল **'একাদশীর ব্রত'** উদযাপন। একাদশীর দিন রাজা-প্রজা মায় গবাদি পশুরও খাবার নিষিদ্ধ হল। এই চিত্রটি সুন্দরভাবে চিত্রিত হয়েছে **রামরূপ চক্রবর্তীর** কবি প্রতিভায়। তিনি লিখেছেন—

রাজ্যের সহিত রাজা করে একাদশী
পঞ্চবর্ণ দ্বিজ আজি থাকে উপবাসী।
চারা মানা হাথীকে ঘোড়াকে মানা ঘাস
দশমীর বাদ্য বাজে রাজার নিবাস।

আবার দেখি "মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষার পরম সহায়—রাজ্যে প্রচুর পরিমাণে গোদুগ্ধ সরবরাহের জন্য গো-পালনকেও করেছিলেন তিনি বাধ্যতামূলক। **তাঁর রাজ্যে গো-সেবার স্থান ছিল দেব সেবারও উর্ধ্বে। তাঁর রাজ্য মধ্যে কোন আকস্মিক কারণ বশতঃ কোন গরু অপঘাতে মারা গেলে, সেখানের অধিবাসীদের সঙ্গে নিজেও তিনি শাস্ত্রের বিধান মত গোবধ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতেন।"**

সুতরাং দেখা যাচ্ছে গোপাল সিংহের এই ধর্ম পিপাসা ধাপে ধাপে ধর্মান্ধতা ও ধর্মোন্মাদনায় রূপান্তরিত হয় ক্রমশঃ। তাঁর এই ধর্মান্ধতাকে **'ধর্মীয় চক্রান্ত'** বলে অভিহিত করা হয়েছে কোন কোন ক্ষেত্রে। যেমন 'পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া' পুস্তকের ১২২ পৃষ্ঠায় বলা হয়েছে, **"যে ধর্মীয় চক্রান্তের মাধ্যমে গোপাল সিংহ বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন, সিংহাসন বজায় রাখার জন্য তাকে তিনি আঁকড়ে ধরেছিলেন। ক্রমশ এই প্রবণতা উৎকট ধর্মান্ধতায় পরিণত হয়েছিল।"** গোপাল সিংহ ধর্মান্ধ—একথাটা আপত্তিজনক নয়, বরং এটা তাঁর চরিত্রের বিশেষণাত্মক শব্দ। আপত্তি হল ধর্মীয় চক্রান্তে রাজ্য লাভের কথায়। কারণ গোপাল সিংহরা ছিলেন নয় ভাই। তাঁর মধ্যে তিনি নাকি কনিষ্ঠ। তিনি যদি সত্য সত্যই চক্রান্ত করে রাজ্য লাভ করতেন সেক্ষেত্রে অন্যান্য বয়োজ্যেষ্ঠ ভাইরা নীরব দর্শকের মতো হাত পা গুটিয়ে বসে থাকতেন না চুপচাপ। গৃহ-বিবাদ এবং খুনোখুনি শুরু হয়ে যেত রাজ সিংহাসনকে কেন্দ্র করে। **এরকম কোন দৃষ্টান্ত না থাকায় উক্ত মন্তব্য কল্পনা-প্রসূত এবং বিষ্ণুপুরের গৌরবময় অধ্যায়ে কলঙ্ক লেপে দেওয়ার একটি অপচেষ্টা বলেই মনে হয়। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করা যায় যে গোপাল সিংহ যদি সত্যসত্যই ক্ষমতালোভী ব্যক্তি হতেন তাহলে অন্ততঃ সারাটা জীবন অর্থাৎ তাঁর রাজত্বকালের প্রায় ৩৬ বছর কাল সময় একই ভাবে কাটাতে পারতেন না। উদ্দেশ্য সিদ্ধির পর—অর্থাৎ রাজ্য লাভের পর তার আসল স্বরূপ উদঘাটিত হত। গোপাল সিংহের চরিত্রে এরকম কোন বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়নি। আগাগোড়া তিনি নিস্পৃহ এবং সিংহাসন-বিরাগী। পুরোমাত্রায় তিনি রাজর্ষি। সুতরাং ধর্মীয় চক্রান্তের কলঙ্কটি অসত্য, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত এবং বিকৃত। এছাড়া আরো একটা লক্ষ্য করার মত বিষয় হল—ধর্ম, ঈশ্বর-চিন্তা, ঈশ্বর-উপাসনা—এগুলো বিষ্ণুপুরের রাজাদের বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত সম্পত্তি বিশেষ। রাজ্যলাভের জন্য চক্রান্ত করে ধর্ম আমদানী করার কোন প্রয়োজন** দেখি না। বিষ্ণুপুরের রাজা প্রজা সকলের রক্তের মধ্যেই ছিল ধর্ম-ভাবনা। ঈশ্বরীয় আবেশ প্রবাহিত হত শরীরের শিরা উপশিরায়। তাই বলতে ইচ্ছে করে—**Religion is the pulse of Bishnupur. Religion is the heart of Bishnupur. Religion is the**

body and soul of Bishnupur. Religion minus Bishnupur is like a nut without seed, a temple without idol, and above all a body without its soul.

ধর্মের অনুশাসনকেই কায়েম করতে চেয়েছিলেন রাজা গোপাল সিংহ। কারণ তিনি জানতেন একমাত্র ধর্মই পারে ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, বিবেকবান, হৃদয়বান এবং আত্মবিশ্বাসী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ তৈরী করতে। পারে স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে। স্বর্গরাজ্য তৈরীর প্রথম এবং প্রধান উপাদান হল সৎ মানুষ। মল্লরাজ্যে এ ধরনের সৎ মানুষের অভাব ছিল না আদৌ। ছোট্ট একটি ঘটনা থেকে বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যাবে জলের মতোই।

বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত কোতুলপুর থানার কোন এক গ্রামে বাস করত এক বুড়ি। আত্মীয়স্বজন বলতে কেউই ছিল না তার। এর ঘরে একদিন খেয়ে, ওর ঘরে একদিন খেয়ে দিন কাটতো তার। বুড়ি একদিন অসুস্থ হয়ে পড়লে মৃত্যুভয় পেয়ে বসে তাকে। তখন বুড়ি গ্রামের মুখ্যা মোড়লদের ডেকে বললে, 'দেখো বাপু আমি হয়তো মরে যাবো রাতে-ভিতে। তাই তোমাদের বলে যাচ্ছি আমার এই ঘর এবং ঘরের মধ্যে যা কিছু আছে সবই শ্রীপতি রায়ের ছেলেকে দান করলাম। সাক্ষী থাকলে তোমরা।' তখনকার দিনে এভাবেই জমি জায়গা দান করা হত। এই ঘটনার পরই বুড়ি মারা যায়। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে এসে শ্রীপতি রায় বাড়ির দখল নিল। ঘরের ভিতর একটি পেটরাতে পাওয়া গেল ৭০ টাকা। শ্রীপতি রায় ঐ টাকা বুড়ির শ্রাদ্ধ শান্তিতে খরচ করল। এই ঘটনার বেশ কিছুদিন পর বুড়ির পুরানো ঘরটি ভেঙে শ্রীপতি রায় নতুন ঘর তৈরী করতে উদ্যোগ নিল। সেই সময় মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে বেরিয়ে এল এক কলসী টাকা। **টাকা পেয়ে মহা দুশ্চিন্তায় পড়ল ব্রাহ্মণ শ্রীপতি রায়। পাড়ার পাঁচজনকে ডেকে জানালো, 'বুড়ি তার ছেলেকে ঘর এবং ঘরের মধ্যের যাবতীয় জিনিস দান করেছে, কিন্তু মাটির নীচের জিনিস তো দান করেনি। সুতরাং কলসীভর্তি এই টাকাতে তার ছেলের কোন অধিকার নেই। এ টাকার প্রকৃত হকদার হলেন দেশের রাজা।' ব্রাহ্মণের মতেই সহমত পোষণ করেন গ্রামবাসীগণ। ব্রাহ্মণ তখন টাকার কলসী মাথায় নিয়ে হাজির হলেন রাজা গোপাল সিংহের রাজ দরবারে। সসম্ভ্রমে নিবেদন করেন আদ্যোপান্ত ঘটনা। সব শুনে রাজা গোপাল সিংহ কলসী শুদ্ধ টাকা গ্রহণ করে পুনরায় দান করেন ঐ ব্রাহ্মণকেই। সহজ সুন্দর সমাধান। সততার কি অপূর্ব দৃষ্টান্ত।**

মহারাজ গোপাল সিংহ পরধন-পিপাসু যুদ্ধবাজ মানুষ ছিলেন না। অত্যন্ত শান্তিপ্রিয়, অহিংসাব্রতে দীক্ষিত ঈশ্বর-প্রেমিক এই মানুষটির রাজত্বকালে সামরিক ব্যবস্থায় শিথিলতা পরিলক্ষিত হয়। দুর্বল হয়ে পড়ে সমর-সজ্জা তথা সমগ্র সামরিক-ব্যবস্থা।

"সামরিক দিক থেকে হীনবল হলেও আভ্যন্তরীণ প্রশাসনে গোপাল সিংহ রাজ্য শাসনের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসরণ করে চলতেন। অন্ততঃ দুজন বিদেশী পর্যটকের লেখা থেকে তেমনি ধারণা গড়ে ওঠে। এদের ভেতর **হলওয়েল সাহেব** কিছুদিনের জন্য বাংলার অস্থায়ী গভর্ণর হয়েছিলেন। তাঁর বিবরণ সর্বদা বিশ্বাসযোগ্য না হলেও এক্ষেত্রে আর একজন বিদেশী পর্যটক আবে রেঁনা প্রায় একই ধরনের বিবরণের সমর্থন জানিয়েছেন।

মল্লরাজরা মুসলমান শাসন চৌহদ্দির বাইরে থেকে যে আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিলেন, গোপাল সিংহের রাজত্বকালে হলওয়েল সাহেব সাম্ভবতঃ তার শেষ রেশটুকু প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ধনসম্পত্তি ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা তখন নিরাপদ ছিল।

পণ্যসহ বণিকদের যাতায়াত ছিল নির্বিঘ্ন। এমন কি কিছু হারালে, তা যতই দামী হোক না কেন, যিনি পেতেন কাছাকাছি গাছে ঝুলিয়ে রাখতেন। সংবাদ দিতেন নিকটবর্তী চৌকিতে। চৌকির অধিনায়ক ঢোলসহরতের মাধ্যমে সবাইকে হারানো দ্রব্যের সংবাদ জানিয়ে দিতেন। পথে খাওয়া-দাওয়া, যাতায়াত বা বিশ্রামের জন্য পথিককে খরচ-খরচা দিতে হত না।"

হলওয়েল সাহেবের উক্ত বিবরণ পুরোপুরি মেনে নিতে পারেন নি 'পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া' পুস্তকের লেখক তরুণদেব ভট্টাচার্য। তাই তিনি উক্ত উদ্ধৃতির মূল্যায়ন প্রসঙ্গে স্বীয় অভিমত পোষণ করে আরো লিখেছেন—

"হলওয়েল সাহেবের বিবরণের মধ্যে অতিশয়োক্তি থাকলেও, জনজীবন যে তখন সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও মোটামুটি স্বচ্ছন্দ ছিল, সে বিষয়ে কিছুটা আঁচ পাওয়া যায়। সম্ভবত এ অবস্থা বজায় ছিল বর্গীর আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত। মল্লরাজারা যে জনহিতকর কাজের দিকে চোখ বুজে থাকতেন না, গোপাল ও চৈতন্য সিংহের রাজত্বকালের নানা কাজকর্ম তার প্রমাণ দেয়।

গোপাল সিংহের আমলেই বড়জোড়া থানায় **শুভঙ্কর খাল** ও সোনামুখী ও পাত্রসায়ের থানার উত্তর-পশ্চিমাংশের রুক্ষ জমি সরস করে তোলার জন্য **শুভঙ্কর দাঁড়া** খনিত হয়েছিল। যে গাণিতিকের নামে এই কৃত্রিম সেচ প্রণালীর নামকরণ হয়েছিল, তিনি ছিলেন গোপাল সিংহের মন্ত্রী। প্রকৃত নাম **জগন্নাথ দাস**।" খেতাবী নাম **শুভঙ্কর**।

গোপাল সিংহের রাজত্বকালের প্রথম দিকে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থা এবং শান্তি-শৃঙ্খলা ছিল প্রশংসনীয়, সুখ-সমৃদ্ধি ছিল সুনিশ্চিত। কিন্তু তার রাজত্বের একেবারে শেষের দিকে দেখা দিল নানান বিপর্যয়।

সময়টা হল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ। বৃটিশ, ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য বণিকের উপদ্রবের পাশাপাশি শুরু হল মারাঠা দস্যুদের নির্মম অত্যাচার। ভীরু বাঙালী ভীত, সন্ত্রস্ত। বাংলার ক্ষাত্রশক্তি নিষ্প্রভ। বিষ্ণুপুরের রাজশক্তি স্তিমিত।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলী খাঁ-এর মৃত্যুর পর বাংলার নবাব হন তাঁর জামাতা **সুজাউদ্দিন**। মাত্র বছর বার রাজত্ব করে মারা যান তিনি। তখন তাঁর পুত্র **সরফরাজ খাঁ** বাংলার মসনদে বসেন। পিতার মতো যোগ্য শাসক ছিলেন না তিনি। বিহারের শাসনকর্তা **আলিবর্দী খাঁ** অযোগ্য সরফরাজকে পরাজিত এবং হত্যা করে বাহুবলে বাংলার নবাব হয়ে বসেন ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে এবং দিল্লীর দরবারে অগাধ উপঢৌকন দিয়ে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার একছত্র অধিপতি হয়ে বসেন। কিন্তু বেশীদিন সুখে শান্তিতে রাজত্ব করতে হয়নি তাঁকে। কারণ ১৭৪১ খৃষ্টাব্দে বাংলার বুকে শুরু হয় মারাঠা দস্যুদের নির্মম অত্যাচার।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে শিকারী পশুর মতোই অতর্কিতে তারা হানা দিত বাংলার গ্রামে গ্রামে। ঘোড়া ছুটিয়ে, ধুলো উড়িয়ে আসত তারা। হাতে থাকত বর্শা বন্দুক, ঢাল, তলোয়ার। লুটপাট করত যথেচ্ছ। অবোধ শিশু, বালক-বালিকা এবং নারী হত্যা করত নৃশংসভাবে। মারাঠা ছত্রপতি শিবাজী মেয়েদের দেখতেন মায়ের চোখে। শিবাজীর সেই সুমহান আদর্শকে বিসর্জন দিয়ে মারাঠা দস্যুদের নিত্যকর্ম হয়েছিল নারীহরণ এবং নারীধর্ষণ। গ্রামে গ্রামে অগ্নিসংযোগ, ধানের গোলা, বীজ-ধান ও শস্যাদি নষ্ট করে দিয়ে পৈশাচিক আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠত বর্গীর দল। অদের অত্যাচারে শ্মশান হয়ে উঠেছিল

গ্রামের পর গ্রাম। বিপর্যস্ত এবং বিধ্বস্ত হয়েছিল জন-জীবন। নবাবী ফৌজের মুখোমুখি হওয়ার সাহস ছিল না এদের। ঝড়ের বেগে আসত এরা। ক্ষিপ্রহস্তে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে পালিয়ে যেত নবাবী সৈন্য আসার আগেই। নবাব আলিবর্দী খাঁ এদের প্রতিহত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন বারবার। দিল্লীর বাদশাহ **মহম্মদ শাহের** অভিপ্রায়ে বাংলায় বর্গী দমন করতে এসেছিলেন **বালাজী বাজীরাও**, কিন্তু শয়তান ভাস্কর পণ্ডিতের হাতে পরাজিত হন এবং পালিয়ে বাঁচেন কোনরকমে। উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে আলিবর্দী খাঁয়ের অনুপস্থিতিতে **ভাস্কর পণ্ডিত** আক্রমণ করেন মুর্শিদাবাদ এবং নবাবী ফৌজের হাতে বন্দী হন। চতুর ভাস্কর পণ্ডিত শক্তি প্রয়োগে মুক্তির সম্ভাবনা নাই দেখে লোভী কারারক্ষীকে ভাল রকম উৎকোচ দিয়ে বার জন সর্দার সহ পালিয়ে আসেন সুকৌশলে। আক্রমণ করেন বিষ্ণুপুর। পরিণতি কি হয়েছিল তা শোনাব মদনমোহন জীউ-এর কথা প্রসঙ্গে।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একটানা বছর দশ যাবৎ বর্গী আক্রমণে বিধ্বস্ত এবং হতশ্রী হয়ে পড়েছিল বাংলার গ্রামগুলি। সাধারণতঃ শীতের শেষে আসত বর্গীর দল এবং বর্ষা শুরু হওয়ার আগেই পালিয়ে যেত লুটপাট করে। কিন্তু বর্গী আক্রমণের আতঙ্কটা ছড়িয়ে থাকত সারা বছরই। **"১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বার্ষিক বার লক্ষ টাকা চৌথ ও উড়িষ্যার একাংশ ছেড়ে দিয়ে নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ মারাঠা দলপতি রঘুজী ভোঁসলের সঙ্গে সন্ধি করে বাংলার বুক হতে বর্গী উপদ্রবের নিবৃত্তি করেন।"**

আজ আর বর্গী নেই। নেই বর্গী আক্রমণের বিভীষিকা। তাদের অমানুষিক অত্যাচারের ঘটনা ইতিহাসের পাতাকে করেছে কলঙ্কিত। সেই কলঙ্কের রেশ আজও বাংলার ঘরে ঘরে বাচ্চাদের ঘুম-পাড়ানি-গানের সুরে অনুরণিত—

ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এলো দেশে,
বুলবুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দুব কিসে।

রাজা গোপাল সিংহের কথা বলতে গিয়ে ৺গঙ্গাগোবিন্দ রায় তাঁর 'মল্লভূম কাহিনী' গ্রন্থে লিখেছেন, "গোপাল সিংহের রাজত্বকালের প্রথম অবস্থায় মল্লভূমি উন্নতির চরম সীমায় উঠেছিল। নবাবকে কর দিলেও মল্লরাজারা নবাবের কাছে মিত্র রাজার মতই ব্যবহার পেতেন। তাঁদিকে নবাব সরকারে উপস্থিত থাকতে হোত না।

একজন প্রতিনিধি রেখেই রাজ-কার্য্য চালাতেন। **কিন্তু গোপাল সিংহের রাজত্বের শেষের দিক থেকেই মল্লরাজাদের পতন শুরু হোল। বর্দ্ধমানের মহারাজ কীর্ত্তিচন্দ্র মল্লভূমি আক্রমণ করে ফতেপুর মহল ছিনিয়ে নিলেন।** শোনা যায় গোপাল সিংহের সময়েই তাঁর সৈন্যরা একবার কর্ণগড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহের রাজ্যে হানা দেয়। শক্তিমন্ত্রে-সিদ্ধ মহারাজা যশোবন্ত, তখন পূজায় বসেছিলেন। রাজার হুকুম না পাওয়ায়, সৈন্য ও সেনাপতি যুদ্ধ না ক'রেই নগর ছেড়ে পালায়। এদিকে বিষ্ণুপুর-সৈন্য নগরে প্রবেশ করলো। তাদের জয়োল্লাসে যশোবন্ত রায়ের ধ্যান ভাঙলো। তাঁর সৈন্য সামন্ত কেহই নাই দেখে তিনি কাতর কণ্ঠে মহামায়াকে ডাকতে লাগলেন ; মহামায়া মাভৈঃ মাভৈঃ শব্দ করতে করতে শত্রু-সৈন্য ধ্বংসের হুকুম দিলেন। যশোবন্ত একাই শত্রু সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। শত্রু পরাজিত হ'য়ে বিষ্ণুপুরে ফিরে গেল।"

শান্তিপ্রিয়-রাজা-গোপাল সিংহের অজ্ঞাতসারে মল্লসৈন্যদের দ্বারা সংঘটিত উক্ত কর্ণগড়ের যুদ্ধযাত্রা এবং পরাজয়ের ঘটনাটি মসীলিপ্ত করেছে ঈশ্বর-উপাসক গোপাল

সিংহকে। অবশ্য তাঁর এই কলঙ্কিত অধ্যায়ের পাশাপাশি রয়েছে উজ্জ্বল কীর্তি। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে কালাচাঁদ পরিমণ্ডলের জোড়া মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। উক্ত জোড়া মন্দিরের উত্তর দিকে অবস্থিত রাধাগোবিন্দজীউ-এর শ্রীমন্দিরটি তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র **কৃষ্ণ সিংহকে** দিয়ে প্রতিষ্ঠা করান ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দেই। আর ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে রাধামাধব জীউ-এর মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করান জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ **চূড়ামণিদেবী**কে দিয়ে।

ভাস্কর পণ্ডিতের বর্গীবাহিনীকে আক্রমণ করতে গিয়ে আহত হয়েছিলেন গোপাল সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণ সিংহ। বিষাক্ত অস্ত্রের বিষক্রিয়াতে মারা যান তিনি। পুত্রশোকে অবিচল বিচক্ষণ রাজা কনিষ্ঠ পুত্র **গোবিন্দ সিংহকে** বিষ্ণুপুরের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত জামকুড়ি মহল্লার দায় দায়িত্ব অর্পণ করে কৃষ্ণ সিংহের পুত্র চৈতন্য সিংহকে বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে।

পৌত্র চৈতন্য সিংহের হাতে রাজ্যভার অর্পণ করে ঈশ্বর চিন্তায় বিভোর হ'য়ে, হরিনাম জপ করতে করতে ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ গোপাল সিংহ পৃথিবী থেকে বিদায় নেন দিনান্তের অন্তিম সূর্যের মতোই।

রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়েছে। রাজা গোপাল সিংহ গত হয়েছেন। কিন্তু গোপাল সিংহ প্রবর্তিত হরিনাম সংকীর্তনের রেশটুকু আজও বিদ্যমান। বিষ্ণুপুরের মন্দিরে মন্দিরে বিশেষ করে মদনমোহন, মদনগোপাল, রাধালালজীউ, মনোহরজীউ, গোপীনাথজীউ এবং মা দশভুজার নাট মন্দিরগুলিতে ভক্তসমাগমে আজও নিয়মিত ধ্বনিত হয় সুললিত নাম-সংকীর্তন। ব্রাহ্মমুহূর্তে শহরের অলিতে গলিতে, পথে, রাজপথে আজও প্রতিধ্বনিত হয় বৈষ্ণবকণ্ঠ-উৎসারিত মধুর মধুর হরিনাম।

অধ্যায়-৪৪

রাধাবিনোদ মন্দির, খড়বাংলা

বিষ্ণুপুর ভ্রমণের পুণ্যলগ্নে আমরা এই মুহূর্তে এসে পড়েছি এই শহরেরই উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত খড়বাংলা পল্লীতে। পুকুর-ডোবা, গাছ-গাছালিতে ভরা কুহু ডাকা পাখির কলতানে মুখর অথচ শান্ত-সমাহিত এই খড়বাংলা পল্লীর বিশেষ দর্শনীয় পুরাবস্তুটি হল **শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ জীউ-এর শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ**। রাধাবিনোদ জীউ-এর শ্রীমন্দিরটি ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ ৯৬৫ মল্লাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা করেন মহারাজ প্রথম রঘুনাথ সিংহের মহিষী। আটচালা শৈলীর পূর্বমুখী এই দেবালয়টির ভিত্তিবেদীর দৈর্ঘ্য ২৭ ফুট ১০ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ২৭ ফুট ৩ ইঞ্চি। মৃত্তিকা-সংলগ্ন এই ভিত্তিবেদীর উপরই নির্মিত হয়েছে ২০ ফুট ১০ ইঞ্চি × ২০ ফুট ৩ ইঞ্চি মাপের প্রায় বর্গাকার শ্রীমন্দিরটি। মন্দিরটির উচ্চতা ৩৫ ফুট। বিধ্বংসী কালের প্রকোপে দেবালয়ের পূর্বদিকের ছাদসহ দেওয়াল এবং তদুপরের চারচালা আচ্ছাদনের কিয়দংশ-ধ্বসে পড়েছিল। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (আর্কিয়লজিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া) দেবালয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে যথাসময়ে মন্দিরটিকে অধিগ্রহণ করে এটিকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে আপাততঃ রক্ষা করেছেন। সাদামাটাভাবে পুনর্নির্মাণ করে দেবালয়টির দিব্যভাব ফিরিয়ে দিয়েছেন।

মাকড়া পাথরের ভিত্তিবেদীর উপর ইষ্টক-নির্মিত এবং পোড়ামাটির অলংকরণে সুশোভিত

আটচালা শৈলীর এই দেবালয়টির নীচের চারচালা থেকে উপরের চারচালার অন্তর্বর্তী উচ্চতা অল্প হওয়ার ফলে মন্দিরটিকে খর্ব দেখায় এবং আপাতদৃষ্টিতে এটি চারচালা স্থপতি রূপেই প্রতীত হয় অথবা একচূড়া চারচালা মন্দির বলে ভ্রম হয়। আসলে এটি কিন্তু আটচালা মন্দির। পূর্বমুখী এই দেবালয়টির কেবলমাত্র পূর্বদিকেই পত্রাকৃতির ত্রি-খিলানযুক্ত ঢাকা বারান্দা পরিলক্ষিত হয়। দেবালয়টির পূর্বদিক ছাড়াও দক্ষিণে রয়েছে একটি প্রবেশপথ এবং উত্তরের দেওয়ালে টেরাকোটা-ভাস্কর্য সমন্বিত দরজার অনুরূপ কুলঙ্গি।

মন্দিরটির মূল্যায়ন করতে গিয়ে 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থের লেখক মান্যবর অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "**বিষ্ণুপুরের খড়বাংলা পাড়ায় রাধাবিনোদের পূবমুখী, আটচালা-মন্দিরটি গঠন ও অলংকরণে বিশেষ গুরুত্বের দাবী করতে পারে**....। পূবের দালানের ভিতরের দেওয়ালের গায়ে, প্রবেশদ্বারের দুপাশে, রথারূঢ় ধনুর্বাণধারী যোদ্ধার যে আটটি বেশ বড় 'টেরাকোটা'-প্যানেল দেখা যায়, তাদের সঙ্গে জোড়বাংলা (কেষ্টরায়) মন্দিরের অনুরূপ 'প্যানেল'-এর বেশ সাদৃশ্য আছে। পূব ও দক্ষিণের প্রবেশপথ ও উত্তরের এক নকল দরজার তিন দিক ঘিরে ফুল-লতাপাতার যে অলংকরণগুলি নিবদ্ধ, তার তুলনা সারা পশ্চিমবঙ্গে বিরল। উত্তরের দেওয়ালে শিকারদৃশ্য, লঙ্কাযুদ্ধ ও কৃষ্ণলীলার দীর্ঘ 'টেরাকোটা'—সারিগুলিও খুব সুন্দর। বস্তুত, এ দেবালয়ের পোড়ামাটি-সজ্জার কারিগরি প্রসিদ্ধতর শ্যামরায় বা জোড়বাংলা মন্দিরের থেকে খুব হীন নয়....।"

আবার পূর্বোক্ত চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় 'বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা' গ্রন্থে এ মন্দিরের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বর্তমানে মন্দিরটিতে টেরাকোটা ফলকের সংখ্যা যৎসামান্য।..... সংখ্যায় স্বল্প হলেও রাধাবিনোদ মন্দিরের টেরাকোটা চিত্রে কিন্তু অব্যবহিত পূর্ববর্তী শ্যাম রায় আর জোড়বাংলার টেরাকাটা চিত্রের ছন্দোময় মেজাজ প্রায় অক্ষুণ্ণ আছে দেখা যায়। এখানে স্বচ্ছন্দ রেখা প্রবাহে পরিস্ফুট মহাকাব্যের যুদ্ধ চিত্র এবং দশাবতার প্যানেলের চিত্রগুলি, রচনাশৈলীর দিক দিয়ে পূর্ববর্তী মন্দিরগুলিরই উত্তরসুরী। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের দক্ষিণ দিকের অপেক্ষাকৃত অপরিসর দরজাটির মাথায় প্রবহমান লতা আর প্রস্ফুটিত পদ্মের নক্সা অলংকরণ শিল্পীর প্রশংসনীয় কারুকুশলতার পরিচায়ক; মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের প্রধান দরজার মাথার 'শিকল-ঘণ্টা' এবং 'ট্যাসেল' জাতীয় প্রাচীন অলংকরণ-মোটিফও কিছু লক্ষ্য করা যায়। উত্তর-পশ্চিম কোণার সন্নিবিষ্ট একটি টেরাকোটা টালিতে পুঁথি পাঠরত জনৈক গোস্বামীর চিত্র লক্ষ্য করা যায়—সম্মুখে হরিনামের মালা-হাতে, উপবিষ্ট দু'জন মহিলা শ্রোতা। গোস্বামীপাড়ায় অবস্থিত শ্রীনিবাস আচার্যের সাধন-পীঠের সন্নিকটবর্তী এই রাধাবিনোদ আর মদনমোহন মন্দিরে বৈষ্ণব গোস্বামীদের বিভিন্ন ধরনের একাধিক টেরাকোটা চিত্রের সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। রাধাবিনোদের উত্তর দিকের দেওয়ালে, অনেকটা মকর-তোরণের অনুসরণে রচিত শীর্ষদেশযুক্ত নকল দরজাটি তদানীন্তন কালের সমুন্নত দারুশিল্পের স্বাক্ষর বহন করছে। বিভিন্ন মন্দির গাত্রে রচিত এ-জাতীয় নকল দরজাগুলি থেকে বর্তমানে কপাটহীন মন্দিরগুলির বিগত দিনের কারুকার্যখচিত দারু-কপাটের অতীত স্মৃতির আভাস মেলে।"

টেরাকোটা শিল্প-সম্ভারে সুসমৃদ্ধ রাধাবিনোদ মন্দির সম্পর্কে এসব কথা বলার পরও যে কথা না বললে আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে তা হল এ মন্দিরেই "টেরাকোটা শিল্পের

প্রথম-পর্বের গৌরবময় অধ্যায়ের 'ইতি'র আভাস" পরিলক্ষিত হয়।

মন্দির প্রসঙ্গে ছেদ টেনে এবার বলি মন্দিরস্থ শ্রীবিগ্রহের কথা। দেবালয়ের উপাস্য দেবতা রাধাবিনোদ হলেন স্বয়ং রাধাকৃষ্ণ। বিনোদ শব্দটি শ্রীকৃষ্ণেরই নামান্তর মাত্র। এখানে ক্ষুদ্রাকৃতির কষ্টিপাথরের শ্রীকৃষ্ণের পাশে ছিলেন অষ্টধাতুর শ্রীরাধা। ছিলেন বললাম এই কারণে যে বিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে অষ্টধাতুর শ্রীরাধা চুরি হয়ে যায়। পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়নি শ্রীরাধার। সেই থেকে এ যাবৎ দেবালয়টিতে বিনোদ বিগ্রহটি একক ভাবেই পূজিত হয়ে আসছেন বছরের পর বছর। আসুন, এক্ষণে অপহৃতা শ্রীরাধা এবং সম্মুখে দৃশ্যমান বিনোদ জীউ-এর উদ্দেশ্যে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে পাড়ি দিই সন্নিকটস্থ গোস্বামী পল্লীতে বা গোঁসাই পাড়াতে।

অধ্যায়-৪৫

শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউ মন্দির ও শ্রীনিবাস আচার্যের সমাধি

গোস্বামীপাড়া

খড়বাংলা মহল্লার রাধাবিনোদ মন্দির দর্শনের পর এবার আমরা খড়বাংলা সংলগ্ন গোস্বামী পাড়ার রাধারমণ মন্দির প্রাঙ্গণে সমাগত হয়েছি। এদিকে বেলা গড়িয়ে দ্বি-প্রহর শেষ হয়েছে। মনে হচ্ছে আপনারাও ক্ষুধার্ত। সুতরাং 'ড্রাইফুড্'-এর মাধ্যমে আজকের মধ্যাহ্নভোজ সেরে নেওয়া যাক এখন। মধ্যাহ্নভোজের পর আমাদের যাত্রা শুরু হবে। শুরুতেই দেখব রাধারমণ মন্দির। শুনব মন্দিরের কথা।

* * *

ঐ দেখুন আমাদের সম্মুখেই রয়েছে জরাজীর্ণ, হতশ্রী রাধারমণ-মন্দিরটি।

দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৩১ ফুট × ৩১ ফুট এবং উচ্চতায় ১ ফুট ৯ ইঞ্চি মাপের ভগ্নপ্রায় এক মাকড়া পাথরের ভিত্তি-বেদীর উপর ইষ্টক নির্মিত আটচালা বিশিষ্ট বর্গাকার এই দেবালয়টি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ২১ ফুট ৮ ইঞ্চি × ২১ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় প্রায় ৩০ ফুট। পূর্বমুখী এই মন্দিরটির পূর্ব দেওয়ালে রয়েছে পত্রাকৃতির ত্রি-খিলানযুক্ত ভলট্-এর ছাদ বিশিষ্ট বারান্দা। মন্দিরের গর্ভগৃহে ঢোকার জন্য উত্তর দেওয়ালেও রয়েছে একটি প্রবেশপথ এবং বারান্দা সহ ভলট্-এর ছাদ। দেবালয়টির দক্ষিণ ও পশ্চিম দেওয়ালের নৈঋত কোণকে কেন্দ্র করে উত্তর এবং পূর্ব দিকে আর এক স্তবক দেওয়াল তুলে রচিত হয়েছে গর্ভকক্ষ। গর্ভকক্ষের পশ্চিম দেওয়ালে রয়েছে রাধারমণ বিগ্রহের জন্য বেদীযুক্ত কুলঙ্গি।

দেবালয়টির পূর্ব দিকের দেওয়ালের খিলান-ত্রয়ের উপরিভাগে কয়েকটি প্রস্ফুটিত পদ্মের নক্সা এবং স্তম্ভ, খিলান ও চার-দেওয়ালের ছাদের বাঁকানো কার্নিস নির্মাণের ক্ষেত্রে চিরাচরিত স্থাপত্যশৈলী অনুসৃত হয়েছে। উত্তর ও পশ্চিমের দেওয়ালে নেই কোন অলংকরণ। নানান জাতীয় বৃক্ষ এবং লতাগুল্মের যথেচ্ছ অভ্যুত্থানে দেবালয়ের আটচালা ছাদটি যেন ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যানে পরিণত হয়েছে। বৃক্ষরাজির মর্মভেদী এবং গর্ভভেদী সবল সতেজ শিকড়ের তেজ সহ্য করতে না পেরে ধ্বসে পড়েছে পুরো দক্ষিণ দেওয়ালের

একটি পর্দা এবং কোণায় কোণায় বহুমুখী ফাটলগুলি যেন দেবালয়টির অকালমৃত্যু ঘোষণা করছে মুখব্যাদান করে।

শ্রীনিবাস গোস্বামীর পরমারাধ্যদেবতা রাধারমণ বিগ্রহের জন্যই বিষ্ণুপুরের রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় তথা অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়েছিল এই শ্রীমন্দির। ১৬৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাত্রী নাকি শ্রীনিবাস-কন্যা **হেমলতা দেবী**। "এই হেমলতা দেবী পরম ভক্তিমতী রমণী ছিলেন। এঁর সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক প্রবাদবাক্য আছে।

অনেকে বলেন, এই হেমলতা স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী। আচার্য্যদেবের কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আচার্য্যদেবের প্রতিষ্ঠিত রাধারমণ বিগ্রহের সেবায় আত্মনিয়োগ করে শেষে তাঁর শ্রীঅঙ্গে লীন হয়ে গিয়েছিলেন।"

এই হেমলতা দেবীর কথা বলতে গিয়ে 'পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া' গ্রন্থের গ্রন্থকার তরুণদেব ভট্টাচার্য লিখেছেন, "হেমলতা দেবী ছিলেন শ্রীনিবাসের পুত্রকন্যাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা। বিধবা হয়েছিলেন অল্প বয়সে, পিতার জীবিতকালে শিষ্যমণ্ডলীও গড়ে তুলেছিলেন। বাসস্থান ছিল বর্ধমান জেলার বুধুইপাড়া, থাকতেন বেশী বিষ্ণুপুরে। কারণ ছোটভাই গতিগোবিন্দ বা গোবিন্দগতির পুত্র সুবলচন্দ্রকে পোষ্য নিয়েছিলেন। সুবলচন্দ্রের বসবাস ও গদী ছিল বিষ্ণুপুরে। নিজে ছিলেন সাধিকা, কবি ও আচার্যা। পিতা প্রবর্তিত সাধনা ও কাব্যচর্চার ঐতিহ্য রক্ষা করেছিলেন বিষ্ণুপুরে। নিজের রচিত কাব্য ছিল **'মানবি বিলাস'**। বিষয়বস্তু পরকীয়া সাধন-পদ্ধতি। ..... হেমলতা দেবীর শিষ্যদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন **যদুনন্দন দাস**। সে যুগের বড় অনুবাদক। মৌলিক গ্রন্থও রচনা করেছিলেন।"

আজ শ্রীনিবাস গোস্বামী নেই। নেই হেমলতা দেবী। আছে কিন্তু তাঁদের অক্ষয়-অম্লান স্মৃতি। **আর আছেন চঞ্চলমতি তথা ভ্রাম্যমাণ রাধারমণ জীউ।** চঞ্চলমতি এবং ভ্রাম্যমাণ শব্দ দুটি ব্যবহার করলাম এ কারণে যে কষ্টিপাথরের কৃষ্ণ (রমণ) এবং অষ্টধাতুর রাধা স্থির এবং স্থায়ীভাবে অবস্থান করেন না কোন এক বিশেষ স্থানে। শ্রীনিবাস প্রভুর বংশধরদের কুলদেবতারূপে স্বীকৃতি লাভ করে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে ; যেমন বিষ্ণুপুর, গোড়াশোল, নাকাইজুড়ি, কাঁকিলা, চাবড়া, গামিদ্যা, চুয়ামসিনা, হীরাপুর (বার্ণপুর)-এ ছড়িয়ে থাকা গোস্বামী প্রভুর বংশধরদের ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে পালাক্রমে পূজা পেয়ে থাকেন এই যুগল বিগ্রহ—এজন্যই ভ্রাম্যমাণ। এজন্যই আপনাদের দেখাতে পারলাম না বিষ্ণুপুরের প্রবাদপুরুষ শ্রীনিবাস গোস্বামীর ইষ্টদেবতা তথা হেমলতা দেবীর প্রাণাধিক প্রিয় রাধারমণ জীউকে। দেখালাম যুগল বিগ্রহের ছবি।

গোস্বামী বংশের ত্রয়োদশ উত্তরপুরুষ ৮২ বছর বয়স্ক শ্রীবিজনবিহারী গোস্বামী জানালেন এই রাধারমণ জীউকে তাঁরা তাঁদের পরিবারের সর্বময় কর্তা, তথা প্রথম এবং প্রধান সদস্য হিসেবেই মান্য করেন। যদিও ভাগের ঠাকুর হিসেবে তিনি সব সময় স্থূল দেহে সবার ঘরে উপস্থিত থাকেন না তথাপি সূক্ষ্ম সত্তায় তিনি গোস্বামী বংশের ব্যক্তিবর্গের অন্তরে অন্তরে সদা বিরাজিত থাকেন। ঠাকুরের সাথে দূরত্বের ব্যবধান কমিয়ে তাঁরা ঠাকুরকে করে নিয়েছেন একান্ত আপনজন। আপনজনের আত্মিক সম্পর্কের সুবাদেই ঠাকুরের ভোগরাগে অনুসৃত হয় **'আত্মবৎ সেবা'**। আত্মবৎ সেবার অর্থ নিজেরা যেমন সেবা করি অনুরূপ সেবা অর্থাৎ আহার্য নিবেদন করা হয় রাধারমণ জীউকে। এক্ষেত্রে অবশ্য বলে রাখা ভাল যে অধুনা গোস্বামী বংশের অনেকেই আমিষ আহার গ্রহণ করলেও

অতীতে তাঁরা ছিলেন নিরামিষভোজী। ঠাকুরের ক্ষেত্রে আত্মবৎ সেবা অর্থে নিরামিষ আহার্য নিবেদন করা হত এবং হয় আজও।

এতদর্থে প্রত্যুষে মঙ্গল-আরতির সময় লুচি ও টানা মিঠাই ; সকালে স্নানের পর দিবাভাগের প্রথম প্রহরে শাল পাতার থালাতে ঘি, গুড় মাখিয়ে হলদে মুড়ির সাথে ছোলা ভিজা এবং শশাকুচি ; দ্বিপ্রহরের মধ্যাহ্নভোজে শাক-সব্জি ডাল তরকারি ভাজাভুজি চাটনি, পায়েস, দই, টানা মিঠাই, মিষ্টান্নসহ লুচি ও অন্নভোগ ; তৃতীয় প্রহরের বিশ্রামের পর চতুর্থ প্রহরে অর্থাৎ বৈকালে ঋতু অনুসারে দই, বেল, পিয়াল প্রভৃতির সরবৎ এবং ফলাহারে পরিতৃপ্ত করা হয় রাধারমণ জীউকে। সন্ধ্যারতির সময় নিবেদন করা হয় পূর্ববৎ পাতার থালাতে ঘি-গুড় সহ হলদে মুড়ি এবং লুচি-মিষ্টি। রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে অর্থাৎ দশটা সাড়ে দশটার সময় ঋতু অনুসারে গরমের দিনে জলছাঁকা ভাত, তরিতরকারী ও পায়েস এবং শীতকালে খিচুড়ি, বেগুনপোড়া, তরিতরকারীসহ চাটনি এবং পায়েস নিবেদিত হয়। এছাড়া প্রত্যেকবারই ভোগের সাথে নিবেদন করা হয় পানীয় জল এবং খিলিপান। অনন্তর পালঙ্কের উপর সুসজ্জিত বিছানায় মশারী খাটিয়ে ঠাকুরের শয়নানুষ্ঠানের মাধ্যমে গত হয় দিন।

প্রাণের ঠাকুর রাধারমণ জীউ প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত বিজনবিহারীবাবু আরো বললেন, — **আমাদের ঠাকুর সদাই চৈতন্য সত্তায় বিরাজমান।** শুনুন, ঘটনাচক্রে একবার শ্রীবিগ্রহের একটি পা ভেঙে যায়। তখন পুরোহিত ৺**রামজয় চক্রবর্তীর** সাথে শলাপরামর্শ করে ভগ্ন বিগ্রহের স্থলে নতুন বিগ্রহ আনার কথা চিন্তা করেন গোস্বামী বংশীয় ৺**মাখনলাল গোস্বামী।**

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করার বিশেষ প্রয়োজন। সেটি হল, এদিকে রাধারমণ জীউ-এর পা ভেঙেছে, ওদিকে পা ভেঙেছে পূর্বোক্ত ৺মাখনলাল বাবুর বড় জামাইয়ের। পুরোহিত ৺রামজয় চক্রবর্তী এবং ৺মাখনলাল গোস্বামী যেদিন ভগ্ন রাধারমণ জীউ-এর পরিবর্তে নতুন রাধারমণ জীউ আনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেই রাত্রিতেই রাধারমণ জীউ পুরোহিত ঠাকুরকে স্বপ্নযোগে প্রশ্ন করেন, "তোদের আত্মীয় স্বজনের হাত-পা ভেঙে গেলে তোরা কি তার পরিবর্তে নতুন কাউকে নিয়ে আসিস?" আর ৺মাখনলাল বাবুকে স্বপ্নযোগে জিজ্ঞাসা করেন, "আমার পা ভেঙেছে বলে তুই আমাকে ফেলে দিয়ে নতুন বিগ্রহ আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিস, কিন্তু এই যে তোর জামাইয়ের পা ভেঙেছে, পা-ভাঙা জামাইকে ফেলে দিয়ে এখন কি তুই নতুন জামাই আনবি?" এতাদৃশ দৈবস্বপ্নে চৈতন্যোদয় হয় উভয়েরই। নতুন বিগ্রহ আনার পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হয় চিরতরে। রয়ে গেছেন জোড়া দেওয়া রাধারমণ জীউ।

দেব-দেবীগণ যে চিন্ময় সত্তায় সদা বিরাজমান এবং তাঁরা যে নেপথ্যে অবস্থান করে আমাদের সমস্ত আচার-আচরণ লক্ষ্য করেন, এই ঘটনাটি তার একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি গোস্বামী বংশীয় ব্যক্তিবর্গ 'ঠাকুর' সম্বোধনে আপ্যায়িত হন সর্বসাধারণ্যে।

বিগ্রহ প্রসঙ্গে ইতি টেনে এবার বলি মন্দিরের কথা। পূর্বে আলোচিত শ্যামরায় বা জোড়বাংলা মন্দিরের ন্যায় টেরাকোটা ভাস্কর্যের দৃষ্টিনন্দন অপরূপ স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন হিসেবে এ মন্দিরটি আদৌ উল্লেখযোগ্য নয়। বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক **শ্রীনিবাস আচার্য** এবং তদীয় ভক্তিমতী বিদূষী কন্যা হেমলতা দেবীর স্মৃতি-বিজড়িত অত্যন্ত সাদামাটা স্থাপত্যশৈলীর এ দেবালয়টির ঐতিহাসিক মূল্য মোটেই কম নয়। **কিন্তু বড়ই দুঃখ ও লজ্জার কথা এহেন একটি গুরুত্বপূর্ণ** দেবালয়, স্থানীয় মানুষজন, গোস্বামী

পরিবারের সদস্যবর্গ, রাজ্য সরকার এবং সর্বোপরি কেন্দ্রীয় সরকারের 'আর্কিয়লজিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া'র দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়ে সার্বিক অবহেলা, অনাদর এবং ঔদাসীন্যে আজ পার্শ্ববর্তী অধিবাসী বিশেষের গোয়ালঘরে রূপান্তরিত হয়েছে।

গত ২৪. ১২. ২০০১ খৃষ্টাব্দের গোধূলি লগ্নে আমি যখন গোস্বামী পরিবারের চতুর্দশ পুরুষ **শ্রীঅজিতকুমার গোস্বামী** মহাশয়ের সাথে মন্দিরটির মাপজোখ করছিলাম তখন দূর থেকে একজন খেটে খাওয়া স্থানীয় মানুষের কণ্ঠ থেকে বারংবার ধ্বনিত হচ্ছিল, —**"মন্দির লয়, গুয়াল ঘর; মন্দির লয়, গুয়াল ঘর।"**

আপাত-অদৃশ্য দেবতা রাধারমণজীউ-এর উদ্দেশ্যে ভক্তিঅর্ঘ্য নিবেদন করে এক্ষণে দৃষ্টিপাত করুন দেবালয়ের উত্তর দিকে। দেখুন, সম্মুখেই রয়েছে ইষ্টক নির্মিত এক বর্গাকার বেদী। উক্ত বেদীতে গোষ্ঠাষ্টমী তিথিতে চৈতন্য মহাপ্রভুর উদ্দেশ্যে শ্রীনিবাসের ফটো সংস্থাপন করে বছরে বছরে অনুষ্ঠিত হয় মহোৎসব। বেদীর আরোও একটু উত্তরে দেখুন মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রায় সাড়ে তিন শত চার শত বছরের পুরানো বয়োবৃদ্ধ এক বিশাল বটবৃক্ষ। ঝুরি পায়ে পায়ে গাছটি চলে গেছে দূরে, বহুদূরে। বটবৃক্ষটিকে ঘিরে রয়েছে বেদীর অনুকরণে নির্মিত আপাতদৃষ্টিতে বৃত্তাকার কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঈষৎ ডিম্বাকৃতির ইষ্টক নির্মিত অনুচ্চ এক প্রাচীর। ডিম্বাকৃতির এই ইষ্টক বলয়টির উচ্চতা ৪ ফুট এবং ব্যাস উত্তর-দক্ষিণে ৩৩ ফুট ৪ ইঞ্চি এবং পূর্ব পশ্চিমে কোথাও ৩৭ ফুট, আবার কোথাও বা ৩৮ ফুট। খান তিনেক সিঁড়ি ভেঙ্গে বৃত্তটির কেন্দ্রস্থলে গিয়ে বৃক্ষমূলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে আজও নজরে পড়ে ভগ্ন ইঁটের অবশিষ্টাংশ। জনশ্রুতি বলে এইখানেই ছিল বীর হাম্বীরের গুরু শ্রীনিবাস গোস্বামীর সমাধি মন্দির। ইঁটের প্রাচীরটির পূর্বদিকের দেওয়ালে একটি শ্বেতপাথরের ফলকে লেখা আছে,—

বিষ্ণুপুর পৌরসভা
শ্রী শ্রীনিবাস সংঘের সৌজন্যে
গোস্বামী পাড়া
সাল - ১৯৮৯

ইষ্টক বলয়ের অভ্যন্তরে আর একটি সাদামাটা স্মৃতিফলক বিদ্যমান। সেটিতে লেখা আছে—

ভগবান শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শুভ আবির্ভাবের ৫০০তম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে শ্রীনিবাস আচার্য্যদেবের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হইল।

..... চৈত্র
(অংশটি ভগ্ন)

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পঞ্চশত বার্ষিকী
জন্মোৎসব সমিতি।

নবদ্বীপের মায়াপুর ইস্কন সম্প্রদায়ের সাধুগণ এই স্মৃতিফলক স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু কেন? শ্রীনিবাস আচার্যের প্রতি তাঁদের এই শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যই বা কি?

'আমি এসেছিলাম, দেখেছিলাম, জয় করেছিলাম।' জুলিয়াস সীজারের এই বিখ্যাত উক্তিটির উত্তম পুরুষের স্থলে প্রথম পুরুষ বসিয়ে শ্রীনিবাস আচার্য প্রসঙ্গেও উক্তিটি প্রয়োগ করা যায় সুন্দরভাবে। **বলা যায়, 'তিনি এসেছিলেন, দেখেছিলেন, জয় করেছিলেন।'**

শ্রীনিবাস আচার্য বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন মারণাস্ত্র নিয়ে নয়। এসেছিলেন 'মণিমঞ্জুষা' নামক ১২০ খানি বৈষ্ণব-পুঁথি সঙ্গে নিয়ে। আর **তাঁর অস্ত্র ছিল ঐশী শক্তি, ছিল জ্ঞান-গরিমা-দৃপ্ত অসাধারণ মিষ্টি-মধুর ব্যক্তিত্ব। সেই দিব্য পুরুষ তাঁর মর্মভেদী জ্ঞান-গরিমা-দৃপ্ত-অস্ত্রের সুষ্ঠু প্রয়োগে, পুঁথি লুণ্ঠনের অপ্রীতিকর ঘটনার সুযোগে ভাব-ভক্তিতে বিগলিত হয়ে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করে বীর হাম্বীরের মত দোর্দণ্ড-প্রতাপ রাজার হৃদয়ও জয় করেছিলেন অবলীলাক্রমে।** শ্রীমদ্ভাগবত, ভ্রমরগীতা প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের তিনি চৌষট্টি প্রকার ব্যাখ্যা শুনিয়েছিলেন নৃপবর বীর হাম্বীরকে। তেজোজ্জ্বল ক্ষাত্রশক্তি, 'তৃণাদপি সুনীচেন' বৈষ্ণব ভাবধারার পদপ্রান্তে মাথা নত করেছিল ভক্তি-বিনম্র চিত্তে। বিজিত হয়েছিলেন রাজা। "রাজপণ্ডিত শ্রীব্যাস চক্রবর্তী সপরিবারে সর্বপ্রথম শ্রীনিবাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। দীক্ষা নেবার পর ব্যাসাচার্য নামে তিনি পরিচিত হন। বিষ্ণুপুরের সুধীসমাজ কিছুদিনের মধ্যে একে একে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রীরাম মজুমদার, গোপাল মজুমদার, কবিপতি বল্লভী কবিরাজ, বল্লভ ঠাকুর, করুণাকর দাস ও তার দুই পুত্র জানকীরাম ও প্রসাদ।

.... রাজা, রাজদরবার ও সুধীজনের মধ্যে শুধু বৈষ্ণবধর্মের প্রচারকার্য সীমাবদ্ধ ছিল না। ছড়িয়ে পড়েছিল বৃহত্তর জনসমাজের একেবারে নিচুতলা পর্যন্ত। তিনটি ধারায় সাধিত হয়েছিল প্রচার। এক, রাজার সাহায্যে প্রত্যক্ষভাবে জনসাধারণকে দীক্ষা দান। দুই, রাজ-অনুগ্রহ পুষ্ট প্রভাবশালী গোষ্ঠীর অনুকরণে স্বেচ্ছায় দীক্ষা গ্রহণ। তিন, হরিনাম ও ঘরে ঘরে সংকীর্তন প্রচারের ফলে উদ্বুদ্ধ জনসাধারণের ধর্মান্তর গ্রহণ।"

শ্রীনিবাস আচার্যের বিষ্ণুপুরে আগমন ও অবস্থানের ফল বিষ্ণুপুরের অধ্যাত্মজগতে আসে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। শুরু হয় রাধাকৃষ্ণের মন্দির ও রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা ; বিগ্রহগুলির ভোগরাগের জন্য বৃন্দাবনের অনুকরণে ছানার মিষ্টান্নের বহুল ব্যবহার, বিগ্রহগুলির সাজ-সজ্জার জন্য পাটের কাপড়, শোলার সাজ এবং সোনা-রূপার অলঙ্কারাদি নির্মাণ, ভক্ত ও সেবকদের জন্য তসর-কেটার বস্ত্র তৈরী, দেব-দেবীদের প্রীত্যর্থে দেবদাসী প্রথার প্রচলন ; দেব-দেবীদের পূজা, উৎসব ও আনন্দানুষ্ঠানগুলিকে জনপ্রিয় করে তোলার অভিপ্রায়ে ধাতু নির্মিত করতাল, কাঁসর, ঝাঁঝ, ঘণ্টা প্রভৃতি এবং চর্মাচ্ছাদিত ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, খোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন।

এভাবে দিনে দিনে বৈষ্ণবভাবধারায় ভেসে গেল বিষ্ণুপর। স্তিমিত হয়ে পড়ল তার ক্ষাত্রশক্তি।

মল্লভূমের সর্বত্র শুরু হল কৃষ্ণ-বিষ্ণু উপাসনা। গড়ে উঠল শত শত কৃষ্ণ-বিষ্ণু মন্দির। বৈষ্ণব ধর্মের পীঠস্থানরূপে প্রতিভাত হল মল্লরাজ্য। আর শ্রীনিবাস হয়ে উঠলেন তার উৎসমূল তথা প্রাণপুরুষ। কারণ "শ্রীনিবাস আচার্য প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যে স্রোত জেলার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল, সাহিত্যকর্মের সিংহভাগের মূলে ছিল তাঁর প্রভাব ও অনুপ্রেরণা। শ্রীনিবাস আচার্যের আগে **পরমেশ্বর মল্লিক** নামে একজন বৈষ্ণবসাধক ও পদকর্তা মল্লভূমে এসে বসবাস শুরু করেছিলেন বলে কথিত হয়। ....

পরমেশ্বরের বংশধরেরা এখনও বিষ্ণুপুর সহরের কাদাকুলি ও উপকণ্ঠ চাকদহ গ্রামে বসবাস করেন। পরবর্তীকালে বংশধরদের মধ্যে অনেকেই পদ রচনা করেছেন।"

শ্রীনিবাস আচার্য নিজে অবশ্য খুব বেশী পদ রচনা করেননি। তিনি ছিলেন কাব্যামোদী, কাব্যমেজাজী মানুষ। অনুপ্রেরণার উৎস-ধারা। তাঁকে ঘিরে গড়ে উঠেছিল একটি কবি-মণ্ডলী। এই কবি-মণ্ডলীর মধ্যমণি ছিলেন রামচন্দ্র কবিরাজ।

বিষ্ণুপুরের প্রবাদপুরুষ শ্রীনিবাস গোস্বামীর আদি নিবাস ছিল চাকন্দিগ্রাম। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর মাতুলালয় যাজী গ্রামে বসবাস শুরু করেন। সেখানে ছিল তাঁর প্রথমা পত্নী এবং সন্তান-সন্ততি। পূর্বেই বলেছি, বিষ্ণুপুরে আগমনের পর, বিষ্ণুপুরে তাঁকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার অভিমানসে তদীয় শিষ্য বীর হাম্বীর স্বীয় গুরুদেবকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। **শিষ্যের আন্তরিক অনুরোধে তিনি বিষ্ণুপুর সংলগ্ন গোপালপুর গ্রামের রঘুনাথ চক্রবর্তী, মতান্তরে রাঘব চক্রবর্তীর কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর পদ্মাবতীর নতুন নাম হয়েছিল গৌরাঙ্গপ্রিয়া। গৌরাঙ্গপ্রিয়া ছিলেন ধর্মপ্রাণা, বিদুষী এবং আচার্যা।** গৌরাঙ্গপ্রিয়ার শিষ্যদের মধ্যে **গুরুচরণ দাস** ছিলেন একজন কবি তথা পদকর্তা। গৌরাঙ্গপ্রিয়ার নির্দেশে গুরুচরণ **'প্রেমামৃত'** গ্রন্থ রচনা করেন। লুণ্ঠিত পুঁথির খোঁজে ভবঘুরে হয়ে ঘুরতে ঘুরতে তিনি একদিন খড়বাংলা পল্লীর এই বিশেষ স্থানে উপনীত হয়েছিলেন। তখন এই বটবৃক্ষের সম্মুখ ভাগে (পূর্ব দিকে) একটি ছাতিম গাছ ছিল। ছাতিম তলায় বিশ্রাম করছিলেন তিনি। স্থানটির মনোহারিত্ব মুগ্ধ করেছিল তাঁকে। এজন্য বিবাহোত্তর জীবনে শ্রীনিবাস গোস্বামী এই খড়বাংলা মহল্লাতেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। দ্বিতীয়া পত্নী গৌরাঙ্গপ্রিয়ার গর্ভে গীতগোবিন্দ বা গতিগোবিন্দের জন্ম হয়। শ্রীনিবাস প্রভুর পুত্র-কন্যাদের মধ্যে পুত্র গতিগোবিন্দ এবং কন্যা হেমলতা দেবী ছিলেন বহুগুণে গুণান্বিতা। **গতিগোবিন্দ ছিলেন সাধক, কবি ও মহান্ত। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'বীররত্নাবলী'। মল্লরাজ্যের রাজধানী বিষ্ণুপুরকে তিনিই 'বন-বিষ্ণুপুর' আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন।**

বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল থেকে অদ্যাবধি চৌদ্দ পুরুষ ধরে শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধরগণ এই অঞ্চলে বসবাস করছেন। "তাঁরই বংশে জন্মগ্রহণ করেন বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মৃদঙ্গবাদক জগৎচাঁদ গোস্বামী, কীর্ত্তিচন্দ্র গোস্বামী, ভারতবিখ্যাত সঙ্গীত-বিশারদ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, প্রফেসার জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত গগনের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী।"

শ্রীনিবাস আচার্যের বংশধরগণ আজ শুধু বিষ্ণুপুর নয়, ছড়িয়ে আছেন পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। তাঁর বংশধরদের উত্তরোত্তর বংশবিস্তারের ফলে গোস্বামী পরিবারের সংখ্যাধিক্যে এবং সুপ্রভাবে খড়বাংলার এই অঞ্চলটি এখন গোস্বামী পাড়া নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে। সামগ্রিক বিচারে বলা চলে বিষ্ণুপুরে তাঁর পদার্পণ এবং আজীবন অবস্থানের ফলেই এ অঞ্চলে একটি বৈষ্ণবধর্মরাজ্য গড়ে উঠেছিল।

এ প্রসঙ্গে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁর বৃহৎবঙ্গ গ্রন্থে (২য় খণ্ড) লিখেছেন—**"গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান কেন্দ্র সর্বপ্রথম ছিল নবদ্বীপ। চৈতন্যের সন্ন্যাসের পর নবদ্বীপের আলোক নিভিয়া যায়। চৈতন্যদেব অষ্টাদশ বৎসর পুরীতে ছিলেন। তাঁহার তিরোধান পর্যন্ত সেই আলোককেন্দ্র পুরীধামে প্রবর্তিত হয়। তারপর কয়েকবৎসর ১৫৩৩ হইতে ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্দ্ধশতাব্দীর কিছু অধিককাল সেই আলোক বৃন্দাবনে**

জ্বলিতে থাকে। ষট্ গোস্বামীরা এই আলোক জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহাদের স্বর্গারোহণে—বিশেষতঃ জীব গোস্বামীর তিরোধানের সহিত সেই আলোক বৃন্দাবনে নিষ্প্রভ হইলে শ্রীনিবাস আচার্য সেই আলোক বিষ্ণুপুরে প্রজ্জ্বলিত করেন। সেই থেকে পূর্ণ দুই শতাব্দীকাল বিষ্ণুপুর রাজসভাই বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও বৈষ্ণব শিক্ষা-দীক্ষার কেন্দ্র স্বরূপ ছিল।"[১] উক্ত পুস্তকের অন্যত্র তিনি লিখেছেন—**"বন বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে দুই শতাব্দীকাল বাংলার শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ নূতনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এদেশের শিক্ষা দীক্ষার যে ঘৃতের প্রদীপটি নিবু নিবু হইয়া জ্বলিতেছিল, বিষ্ণুপুরের রাজবংশ তাহা প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন।"**[২] ফলে বিষ্ণুপুর হয়ে উঠেছিল শিক্ষা-দীক্ষা তথা জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান। উক্তিটির সমর্থনে মাননীয় চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়ের মন্তব্যটি তুলে দিলাম। তিনি লিখেছেন, **"বিষ্ণুপুরে জ্ঞানচর্চার যে কি বিপুল আয়োজন সে যুগে হয়েছিল তা এখনও অনুমান করা যায় 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ' বিষ্ণুপুর শাখায় সংরক্ষিত সাত হাজারেরও বেশি পুঁথির সংগ্রহ দেখে।** একথা সহজেই বলা যায় ৩/৪শ বছর পরের এই সংগ্রহ মোট পুঁথির সামান্যতম ভগ্নাংশ মাত্র। এই সংগ্রহে শুধু বাংলা বৈষ্ণব পুঁথিই নেই প্রাচীন সংস্কৃত কাব্য, দর্শন, অলঙ্কার আর রসশাস্ত্রের প্রচুর পুঁথি রয়েছে। বৈষ্ণব ধর্মকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে সংস্কৃত কাব্য, দর্শন, পুরাণ, অলঙ্কারশাস্ত্রের যে বিপুল চর্চা হয়েছিল তা সহজেই বুঝা যায়।" (বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা, পৃঃ—১৭)

এসবের মূলে ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য। শ্রীনিবাস আচার্যের অসীম অবদানে বিষ্ণুপুর হয়ে উঠেছিল একটি বৈষ্ণব ধর্মরাজ্য। একটি রাজ্য জয় করার থেকেও এ কাজ অনেক বড় কাজ, অনেক মহান কাজ, এর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। এহেন অসম্ভবকে সম্ভব করেছিলেন তিনি। তাই বলছিলাম, 'তিনি এসেছিলেন, দেখেছিলেন, জয় করেছিলেন।'

অধ্যাত্ম-সম্পদে সমৃদ্ধ এবং শ্রীমণ্ডিত শ্রীনিবাস আচার্যকে চৈতন্য মহাপ্রভুর আবেশ অবতার বলা হয়। এজন্যই মহাপ্রভু-ভক্ত ইস্কনের সাধু সমাজ শ্রীনিবাস আচার্যের সমাধিস্থলে স্মৃতিফলক স্থাপন করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর ৫০০তম জন্মবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে।

অধ্যায়-৪৬

রাজকাহিনী—১৫

চৈতন্য সিংহদেব (১৭৪৮ - ১৮০১ খৃঃ)

রাধারমণ মন্দির এবং শ্রীনিবাস আচার্যের সমাধিস্থল দর্শনের পর আমাদের দর্শনীয় বস্তু বিষ্ণুপুরের নগর-দেবতা শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ। চলার পথে শোনাব মহারাজ চৈতন্য সিংহদেবের বিড়ম্বনাময় জীবনালেখ্য।

চৈতন্য সিংহের কথা বলতে গিয়ে বিদ্রোহী কবি নজরুলের সেই বহুল প্রচারিত গানের ছত্র দুটি স্মৃতির মণিকোঠায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে বারবার—

১.২. বৃহৎবঙ্গ (২য় খণ্ড), দীনেশচন্দ্র সেন, পৃঃ—১১০৮, ১১১৪

চিরদিন কাহারও সমান নাহি যায়
আজকে যে রাজাধিরাজ কাল সে ভিক্ষা চায়।

মল্লরাজগণের মধ্যে যাঁদের জীবনী এবং রাজ্যশাসন-প্রণালীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে উত্থান পতনের ইতিহাস, গড়ে উঠেছে ঘটনাবহুল বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনালেখ্য ; তাঁদের মধ্যে বীর হাম্বীর, ২য় রঘুনাথ সিংহ এবং গোপাল সিংহ (১ম)-এর পরেই যাঁর নাম উল্লেখ করতে হয় তিনি হলেন মহারাজ চৈতন্য সিংহ। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণের পর মাত্র কয়েক বছর শান্তিতে রাজত্ব করেছিলেন তিনি। গোপাল সিংহের ধর্মপ্রবণতা এবং বীর হাম্বীরের কর্মতৎপরতাকে পাথেয় করে রাজ্যশাসনে মনোনিবেশ করেন তিনি। ধর্মচর্চা এবং অধ্যাত্ম অনুশীলনের পাশাপাশি পিতামহ গোপাল সিংহের ঔদাসীন্যে স্তিমিত-প্রায় ক্ষাত্রশক্তি তথা সামরিক শক্তিকে পুনরুজ্জীবিত করতে প্রয়াসী হন মহারাজ চৈতন্যসিংহ।

চৈতন্য সিংহের রক্তে বৈরাগ্য, দেবভক্তি, বৈষ্ণবধর্মে মতি, ব্রাহ্মণ-প্রীতি এবং মাংসপেশীতে ক্ষাত্রশক্তি—এই দ্বৈত মানসিকতায় ক্ষত বিক্ষত হতে থাকেন তিনি। না পারেন রাজমুকুট ত্যাগ করে বীর হাম্বীরের মতো সন্ন্যাস নিতে, না পারেন ষোলআনা মনোনিবেশ করে রাজ্যশাসন করতে। অগত্যায় তিনি দক্ষ সেনাপতি এবং পরম হিতৈষী কমল বিশ্বাসের উপর রাজ্য পরিচালনার দায়-দায়িত্ব অর্পণ করে ঈশ্বর উপাসনায় তন্ময় হয়ে থাকেন সারাক্ষণ। মুক্তহস্ত হয়ে ওঠেন দানকার্যে। দেব-মন্দির, টোল এবং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি ব্রাহ্মণদেরও অকৃপণ হস্তে অকাতরে দান করতে থাকেন নিষ্কর জমি জায়গা। তাঁর আমলে ব্রাহ্মণদের জমি দানের ব্যাপারটা এমন হয়েছিল যে তাঁর রাজ্যে রাজার কাছ থেকে প্রাপ্ত নিষ্কর জমি না থাকলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বে সন্দেহ প্রকাশ করা হত। তাই দেখি District Gazetteer, Bankura-এর ২৯ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে—"He made large grants to Brahmans, so much so that, if a Brahmin in the Raj had no rent-free grant, it was open to question whether he was a true Brahman." বীর হাম্বীর ছিলেন কর্মবীর, গোপাল সিংহ ছিলেন ধর্মবীর আর চৈতন্য সিংহ হলেন দানবীর। দান করতে করতে বিষ্ণুপুরের রাজকোষ প্রায় তলানিতে গিয়ে ঠেকলো। দেব-প্রেম এবং মানব-প্রেমের মাধুর্যে মাধুর্যমণ্ডিত হয়ে ওঠেন তিনি, কিন্তু টান পড়ে পার্থিব ঐশ্বর্যে। রাজ্যের উন্নয়নমূলক কর্মসূচী ব্যাহত হয়। পরিস্থিতির চাপে চৈতন্য সিংহকে তাঁর প্রাণের ঠাকুর ঁমদনমোহন জীউকে কোলকাতার বাগবাজারে বন্ধক রাখতে হয় গোকুল মিত্রের ঘরে। মনের মাধুর্য নষ্ট হয় অভাবের তাড়নায়। এজন্যই বলা হয়েছে—

" ঐশ্বর্য ও মাধুর্য নহে সমতুল,
তথাপি ঐশ্বর্য হয় মাধুর্যের মূল।"

রাজা চৈতন্য সিংহ হয়েছিলেন সর্বস্বান্ত, বারবার হয়েছেন কারারুদ্ধ। কিন্তু কিভাবে?

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। অত্যাচারী ভাস্কর পণ্ডিত পরলোকে। রঘুজী ভোঁসলে হয়েছেন মারাঠাধিপতি। মারাঠাদস্যুদের অত্যাচারে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা হয়েছে শ্মশান। বিষ্ণুপুর লুণ্ঠন করতে এসে ভাস্কর পণ্ডিতের যে মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছিল তার ফলে রঘুজী ভোঁসলে আর বিষ্ণুপুরের দিকে পা বাড়াতে সাহস করেননি। নিরুপদ্রবে রাজ্য শাসন করছিলেন চৈতন্য সিংহ। কিন্তু সে সুখ তাঁর সইল না বেশীদিন। নয়নাভিরাম

ফুলের মধ্যে যেমন কীট থাকে, ঠিক তেমনি বিষ্ণুপুর রাজবংশের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল কীট। **রাজ্যলোভী বিষাক্ত সেই কীটটি হল চৈতন্যসিংহের পিতৃব্যপুত্র দামোদর সিংহ।** গোবিন্দ সিংহের পুত্র দামোদর সিংহ জামকুড়ি মহল্লাতে গ্রাম্য জমিদারের মতো জীবন-যাপনে সন্তুষ্ট নন আদৌ। বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসনে আরোহণ করার স্বপ্নে তিনি বিভোর। শক্তি বা সামর্থে সম্ভব নয় রাজ্যলাভ—এটা ভালভাবেই জানতেন তিনি। তাই ছুটলেন মারাঠা দস্যু রঘুজী ভোঁসলের কাছে। খাল কেটে কুমীর আনলেন বিষ্ণুপুরে। বর্গী আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল মল্লভূমের নিরীহ প্রজাসাধারণ। **চৈতন্য সিংহ বর্গীদের প্রতিহত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছেন পুনঃ পুনঃ। মল্লভূম হয়েছে মৃত্যুভূম।** বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা বর্গী অত্যাচারে জর্জরিত। উপায়ান্তর না দেখে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার তৎকালীন নবাব আলিবর্দী খাঁ মারাঠা সর্দার রঘুজী ভোঁসলের সাথে বাৎসরিক বার লক্ষ টাকা চৌথ দিতে স্বীকৃত হয়ে বর্গী অত্যাচারের নিবৃত্তি করেন। রক্ষা পায় মল্লভূম, মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুর। হতাশ হয়ে পড়েন দুর্বৃত্ত দামোদর সিংহ। এই ঘটনার পর বছর পাঁচেক চুপচাপ থাকেন দামোদর সিংহ। তারপর দুষ্ট বুদ্ধি মাথা চাড়া দেয় আবার। রাজ্যের অর্ধেক দাবী করে বসেন এবং চৈতন্য সিংহের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার কাছে বিষ্ণুপুর রাজ্যের অর্ধাংশ দাবী করে চৈতন্য সিংহের বিরুদ্ধে আর্জি পেশ করেন। **সিরাজউদ্দৌলা** দামোদর সিংহের দাবীকে ন্যায়সংগত মনে করে নবাবী পরোয়ানা সহ দামোদর সিংহের সাথে পাঠিয়ে দেন এক সশস্ত্র সেনাবাহিনী। বিষ্ণুপুরের উত্তরে অবস্থিত দামোদর নদের তীরে **'সাংহাতগোলা'** নামক স্থানে ছত্রপতি **কমল বিশ্বাসের** নেতৃত্বে মল্লসৈন্যদের সাথে নবাব সৈন্যদের বেধে যায় তুমুল যুদ্ধ। মল্লসৈন্যদের হাতে দারুণভাবে পরাজিত এবং নিহত হয় নবাব সৈন্য। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে বাঁচে দামোদর সিংহ। নবাবী ফৌজকে নস্যাৎ করা এবং নবাবের আদেশকে অগ্রাহ্য করার জন্য দামোদর সিংহ সিরাজউদৌল্লাকে পুনরায় উত্তেজিত করতে থাকেন চৈতন্য সিংহের বিরুদ্ধে। দূরদর্শী চৈতন্য সিংহ কিন্তু ইতিপূর্বেই সিরাজউদৌল্লাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে বিষ্ণুপুরের রাজবংশের নিয়মানুসারে জ্যেষ্ঠপুত্রই সিংহাসন লাভের অধিকারী। এদিক থেকে তিনিই বিষ্ণুপুর রাজ্যের ন্যায়সংগত রাজা। বংশের কনিষ্ঠ পুত্রের সন্তান হিসেবে পিতৃব্য দামোদর সিংহের দাবী অন্যায় এবং অসংগত।

দামোদর সিংহের দ্বারা প্ররোচিত হয়ে সিরাজউদ্দৌলা যে ভুল করেছিলেন তার জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন পরে এবং দামোদর সিংহকে যার-পর-নাই তিরস্কার করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন নবাব দরবার থেকে। অপমানটা তখনকার মতো হজম করে নেন দামোদর সিংহ।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দ। দেশদ্রোহীদের চক্রান্তে পলাশীর প্রান্তরে বয়ে গেল রক্তগঙ্গা। স্বাধীনচেতা সিরাজউদ্দৌলা নিহত হলেন। অস্তমিত হল বাংলার স্বাধীনতা-সূর্য। ব্রিটিশদের হাতের পুতুল সেজে বাংলার নবাব হয়ে বসলেন বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য দামোদর সিংহ এবার মীরজাফরের শরণাপন্ন হলেন। বিশাল এক সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী দিয়ে দামোদর সিংহকে সাহায্য করেন মীরজাফর। মহারাজ চৈতন্য সিংহ এবং সেনাপতি কমল বিশ্বাসের অনুপস্থিতির সুযোগে কোন এক দুর্যোগের দিনে দামোদর সিংহ সেই বিশাল ফৌজী সেনা নিয়ে অকস্মাৎ আক্রমণ করে বিষ্ণুপুর। অতর্কিত আক্রমণের জন্য তৈরী না থাকায় নবাবী সেনা অতি সহজেই ঢুকে পড়ে বিষ্ণুপুর রাজ্যে। কিন্তু দুর্গে

প্রবেশ করতে পারে না কিছুতেই। গোলন্দাজ বাহিনীর অবিশ্রান্ত গোলবর্ষণে কাতারে কাতারে নিহত হয় নবাবী সেনা। নিশ্চিত পরাজয় বুঝতে পেরে দামোদর সিংহ **পদ্দল** খাঁ নামক জনৈক সেনাপতিকে উৎকোচ দেবার প্রলোভন দেখিয়ে সসৈন্যে ঢুকে পড়ে বিষ্ণুপুর-দুর্গে। দখল করে নেয় রাজসিংহাসন। ঘরভেদী বিভীষণ দামোদর সিংহের হাতে লাঞ্ছিত হবার ভয়ে চৈতন্য সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র **মদনমোহন সিংহ** সপরিবারে পালিয়ে যান **কুচিয়াকোল দুর্গে**। সেনাপতি পদ্দল খাঁয়ের বিশ্বাসঘাতকতা এবং দামোদর সিংহের বিষ্ণুপুর রাজসিংহাসন ছিনিয়ে নেওয়ার বিস্তারিত বিবরণ তিনি সত্বর পাঠিয়ে দেন ময়ূরভঞ্জে তাঁর পিতার কাছে।

দুঃসংবাদ শোনা মাত্রই চৈতন্য সিংহ, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের সহযোগিতা ও পরামর্শ অনুসারে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আদালত সুপ্রীম কোর্টে দামোদর সিংহের বিরুদ্ধে নালিশ করেন। লর্ড ক্লাইভের বিচারে তিনিই জয়ী হন। সসৈন্য ক্যাপ্টেন লগীন সাহেবের সাহায্যে ফিরে পান তাঁর হৃতরাজ্য। হতাশ দামোদর সিংহকে ফিরে যেতে হয় তার জামকুড়ির বাসায়।

এদিকে বাংলার মসনদে তখন চলছে দ্রুত উত্থান-পতনের খেলা— একের পর এক নবাব পরিবর্তনের পালা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হতে চলেছে ক্রমশঃ। ইংরেজ শাসনের প্রভাব পড়ল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার উপর। লর্ড ক্লাইভের নেতৃত্বে পরিচালিত পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় এবং পরে মীরজাফরের পুত্র **মীরণ**-এর হাতে তাঁর মৃত্যুর পর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নগদ দু কোটি টাকা সেলামী দেওয়ার শর্তে মুর্শিদাবাদের মসনদে বসেন **মীরজাফর**। মীরজাফর সময়মত চুক্তির টাকা দিতে না পারায় গদিচ্যুত হন। সেই সুযোগে কোম্পানীর সপারিষদ গভর্ণরকে প্রায় দু'লক্ষ টাকা উপঢৌকন দিয়ে বাংলার নবাবী খেতাব গ্রহণ করেন মীরজাফরের জামাতা **মীরকাশেম**। কিন্তু মীরকাশেম ছিলেন স্বাধীনচেতা এবং ইংরেজ বিদ্বেষী। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রভাবমুক্ত হওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে স্থানান্তর করেন রাজধানী। বিদেশী কোম্পানীকে উৎখাত করার জন্য তৈরী হতে থাকেন ভিতরে ভিতরে। কিন্তু পুরোপুরিভাবে সংগঠিত হওয়ার পূর্বেই ইংরেজদের সাথে শুরু হয় সংঘর্ষ। কোম্পানী তখন বিদ্রোহী মীরকাশেমকে গদিচ্যুত করে পুনরায় নবাবী খেতাব দেয় মীরজাফরকে। মীরজাফরের মৃত্যুর পর নবাবী পদ লাভ করেন তার পুত্র নজমউদ্দৌলা। এই সময় ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে উৎকোচ, উপঢৌকন, দুর্নীতি, কর্তব্যে অবহেলা এবং ঔদ্ধত্য প্রাধান্য লাভ করে বিপন্ন করে তোলে কোম্পানীকে। কর্মচারীদের ঔদ্ধত্য, কর্তব্যে অবহেলা এবং দুর্নীতি দমনের উদ্দেশ্যে কোম্পানীর ডিরেক্টর পুনরায় ক্লাইভকে পাঠিয়ে দেন বাংলা দেশে। **ক্লাইভ** কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমন করেন, রোধ করেন কর্তব্যে ঔদাসীন্যভাব এবং কর্মচারীদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ। বাংলাদেশে ফিরে এসে তিনি আর যা করেন তা হল অযোধ্যার পরাজিত নবাব সুজাউদ্দৌলার নিকট হতে ছিনিয়ে নেন কারা ও এলাহাবাদ জেলা। হাতে নাতে নগদে নেন পঁচিশ লক্ষ টাকা। আত্মসম্মান খুইয়ে বিদেশী শক্তির প্রতিনিধি লর্ড ক্লাইভের সাথে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হন নবাব সুজাউদ্দৌল্লা। ব্যবসায়ী বুদ্ধি সম্পন্ন চতুর **ক্লাইভ** সদ্য পাওয়া কারা এবং এলাহাবাদ জেলা উপঢৌকন দেন দিল্লীর বাদশাহ **শাহ আলমকে**। এছাড়া বাৎসরিক ছাব্বিশ লক্ষ টাকা রাজস্ব দেবার শর্ত সাপেক্ষে ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার

দেওয়ানী পদ লাভ করেন এবং বাংলার নবাবকে বাৎসরিক তিপান্ন লক্ষ টাকা রাজস্ব দেবার বিনিময়ে রাজস্বের উপর সমস্ত অধিকার ছিনিয়ে নেন। ফলে বাংলার নবাব হয়ে পড়েন বণিক কোম্পানীর রাজস্বভোগী শাসক। বুদ্ধিমান ক্লাইভ রাজস্ব আদায়ের মত তিক্ত কাজের দায়িত্ব দেন নবাবকে, কিন্তু আদায়প্রাপ্ত রাজস্বের উপর নিজ অধিকার বজায় রাখেন পূর্ণমাত্রায়। এর ফলে নবাবের উপর ক্ষমতাহীন দায়িত্ব এবং ইংরেজদের হাতে দায়িত্বহীন ক্ষমতা অর্পিত হয়। **এই দ্বৈত শাসন ব্যবস্থার সরল অর্থ হল, নবাবের হাতে আয়রনচেস্ট কিন্তু ক্লাইভের হাতে চাবি। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের অর্থ হল ইংরেজদের রাজ্যশাসন করার অধিকার আইনসঙ্গতভাবে মেনে নেওয়া। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের ফলেই বিষ্ণুপুরের রাজ-পরিবারে নেমে আসে সর্বনাশা বিপর্যয়।** কারণ দিল্লীর মুঘল সম্রাট বা বাংলার নবাব রাজস্বের জন্য কখনোই জোরজবস্তি করেননি বিষ্ণুপুরের রাজ-পরিবারের ওপর। তাঁরা বিষ্ণুপুরকে মিত্র রাজ্য হিসেবেই পছন্দ করতেন সমধিক। কিন্তু **কোম্পানীর আমলে বিষ্ণুপুর হল 'করদরাজ্য'**। সমূহ বিপদের অশনি সঙ্কেত প্রতিধ্বনিত হল নেপথ্যে। এই বিপদের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে ঐতিহাসিক ফকিরনারায়ণ কর্মকার 'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী' গ্রন্থে লিখেছেন,—

"বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের শোচনীয় সর্ব্বনাশের কারণ—তার গৃহবিবাদ, স্বাধীন ও সৎমনোবৃত্তির জন্য অবস্থানুযায়ী নিজেদের রক্ষার বেপরোয়া ঔদাসীন্য ও সব চাইতে বড় কারণ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক রাজস্ব আদায়ের ভার গ্রহণ।.....

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী পদ নিয়ে যখন রাজস্ব আদায় করতে আরম্ভ করেন, তখন দামোদর সিংহের সঙ্গে মোকদ্দমার ব্যয়-বাহুল্য প্রভৃতিতে চৈতন্য সিংহ নিঃস্ব কিন্তু তার জন্য কোন সহানুভূতি কোম্পানী দেখায় নি। দেওয়ানি পদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজস্ব আদায় করতে আরম্ভ করেই বিষ্ণুপুরের বাকী পড়া রাজস্ব থেকে ৭৪৯৮ টাকা রফা ছাড় বাদ দিয়ে বাকী রাজস্ব দেবার জন্য তাঁরা কঠোর আদেশ জারি করেন।

কিন্তু বিষ্ণুপুরের রাজকোষ তখন একেবারেই শূন্য। তাই চৈতন্য সিংহের পক্ষে সে আদেশ পালন করা সম্ভব হয় না। আর তার জন্য কোম্পানীর কাছে তিনি কিছু সময় চান। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁর সে আবেদন মঞ্জুর করেন না। দেবসেবা ও রাজপরিবারের ভরণপোষণের জন্য মাত্র ৫৫১৪৮ টাকা আয়ের ক্ষুদ্র এক জমিদারী অবশিষ্ট রেখে বাকী সমস্ত সম্পত্তি তাঁরা বাজেয়াপ্ত করেন। **অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে মল্লভূমের ভাগ্যদেবতা মহারাজ চৈতন্য সিংহ পরিণত হন বিদেশী বণিকের অধীনস্থ ক্ষুদ্র এক জমিদারে।**

কিন্তু বেশী দিন সে অবস্থায় থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বার্ষিক তিন লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা রাজস্ব দিতে স্বীকার করে মহারাজ চৈতন্য সিংহ কোম্পানীর কাছ থেকে সমস্ত জমিদারী বন্দোবস্ত নেন। হারানো সম্পত্তি তাঁর ফিরে আসে। কিন্তু তার সঙ্গে আসে বিপদ।

কারণ—**প্রথমতঃ বিষ্ণুপুরের নরপতিগণ চিরকাল প্রজার কল্যাণেই নিজেদের সব কিছু নিয়োজিত করে গেছেন। প্রজার উপর উৎপীড়ন তাঁরা কোন দিন করেননি। তাই রাজস্বের জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁর ওপর উৎপীড়ন করা সত্ত্বেও কোন প্রকার জুলুম জবরদস্তি করে প্রজার কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়**

না। **দ্বিতীয়তঃ** রাজস্ব যে পরিমাণে আদায় হয়, তাতে আবশ্যকীয় খরচ সঙ্কুলান করে বিশেষ কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। ....তাই উপর্য্যুপরি রাজস্ব বাকী পড়ার জন্য চৈতন্য সিংহ চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়েন। অপেক্ষাকৃত কঠোরভাবে রাজস্ব আদায় করবার জন্য তিনি রাজকর্ম্মচারীদের আদেশ দেন।

কিন্তু ভাগ্য যাঁর বিমুখ, দুর্ভাগ্য যাঁর সহচর, তাঁর কোন আশাই পূর্ণ হয় না, মহারাজ চৈতন্য সিংহের ক্ষেত্রেও তাই হয়। **সেই বৎসরই ১৭৬৯/৭০ খৃষ্টাব্দে ও বাংলা ১১৭৬ সালে বাংলার বুকে আসে সর্ব্বনাশা দুর্ভিক্ষ —ছিয়াত্তরের মন্বন্তর!** তাতে অনাহার ও মহামারীতে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়। দেশের জমিদারেরা পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়েন।

বিষ্ণুপুরের বুকেও তখন তারই তাণ্ডব চলেছে। সেখানেও চারিদিকে হাহাকার, চারিদিকে বীভৎসতা, ঘরে ঘরে মৃত্যুর পদধ্বনি। অনাহারক্লিষ্ট, রোগ, শোক জর্জ্জরিত মানুষের মরণ চিৎকার।

বিষ্ণুপুরের রাজকোষ তখন শূন্য প্রায়, কোম্পানীর রাজস্ব বাকী। সকল দিক দিয়েই চৈতন্য সিংহ তখন নিরুপায়, সর্বনাশ তাঁর শিয়রে। কিন্তু তবুও মহৎপ্রাণ, প্রজাবৎসল রাজা তাঁর অনাহারক্লিষ্ট প্রজাদের রক্ষা করবার জন্য তাঁর ধন-ভাণ্ডার, শস্য-ভাণ্ডার সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত করে দেন। তাতে প্রজা রক্ষা পায়। কিন্তু তিনি সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়েন।"

সুযোগ-সন্ধানী দামোদর সিংহ ঝোপ বুঝে কোপ মারে আবার। সম্পত্তির অর্ধেক দাবী করে মুর্শিদাবাদে কোম্পানীর রেসিডেন্টের কাছে চৈতন্য সিংহের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে এবং স্বপক্ষে ডিগ্রি লাভ করে। এমতাবস্থায় দেওয়ান গোবিন্দ সিংহের পরামর্শ মতো চৈতন্য সিংহ কলকাতা গিয়ে কোম্পানীর উচ্চ আদালতে ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাছে দামোদর সিংহের চক্রান্তের বিরুদ্ধে আর্জি করেন। শুরু হয় মামলা। দীর্ঘস্থায়ী সেই মোকদ্দমার তদ্বির করার জন্য কোলকাতার সালিখা অঞ্চলে ঘর ভাড়া নিয়ে দীর্ঘদিন অবস্থান করেন।

মদনমোহন জীউ-এর পাদোদক পান না করে জল গ্রহণ করতেন না মদনমোহন-গত-প্রাণ রাজা চৈতন্য সিংহ। সুতরাং সেবাইত পুরোহিত পাচক সহ দেব-বিগ্রহ নিয়ে যাওয়া হয় কোলকাতায়। জাগ্রত দেবতা মদনমোহন এসেছেন কোলকাতায়—খবরটা ছড়িয়ে পড়ে মুখে মুখে। ভক্ত সমাবেশ হয় দলে দলে। কোন্নগরের লবণ ব্যবসায়ী ভক্ত গোকুল মিত্রও আসেন মদনমোহন দর্শন করতে। মদনমোহন দর্শনে মোহিত গোকুল মিত্রের সাথে বন্ধুত্ব হয় রাজা চৈতন্য সিংহের। রাজার দুরবস্থার কথা শুনে সাধ্যমত অর্থ ও সামর্থ্য দিয়ে তিনি সাহায্য করেন বিপদগ্রস্ত রাজাকে। অবশেষে নিষ্পত্তি হয় মামলার। জয় হয় চৈতন্য সিংহের। বছরের পর বছর ধরে দীর্ঘমেয়াদী মামলা চালাতে গিয়ে আকণ্ঠ দেনাগ্রস্ত হন তিনি। ঋণ পরিশোধের চিন্তায় যখন তিনি যার-পর-নাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ঠিক সেই সময় বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতোই আসে তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনমোহন সিংহের মৃত্যু সংবাদ। **উপর্য্যুপরি আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে তিনি উন্মাদবৎ হয়ে পড়েন। ভাসতে থাকেন শোক সাগরে।** শোকার্ত হৃদয় কিছুটা শান্ত হয় ক্রমশঃ। ঋণ পরিশোধের চিন্তা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে তাঁকে। **কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ঋণ পরিশোধের কোন সদুপায় খুঁজে না পেয়ে গোকুল মিত্রের ঘরে মদনমোহন**

বিগ্রহকে গচ্ছিত রেখে দুই মদনমোহনকে হারিয়ে ব্যথাতুর হৃদয়ে ফিরে আসেন বিষ্ণুপুরে। হয়ে পড়েন দীনের চেয়েও দীন। কোম্পানীর দরবারে জমা দিতে পারেন না রাজস্ব। আবদ্ধ হন কারাগারে। তখন "১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে **হেসিলিজ** নামে এক ইংরেজ বিষ্ণুপুরের রাজস্ব আদায়ের ভার পান। আর তার সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত রাজস্ব ধার্য্য করবার জন্যও কোম্পানী তাঁকে আদেশ দেন। তাই তিনি বিষ্ণুপুরের রাজস্ব বিভাগ পরীক্ষা করে দেখেন, চার লক্ষ ঊনচল্লিশ হাজার পাঁচশত ঊনচল্লিশ টাকা আদায়। তার এক অংশ মালিকানা রেখে তিন লক্ষ একাশী হাজার তিন শত নিরানব্বই টাকা এক আনা ন পাই তিনি ন্যায্য রাজস্ব ধার্য্য করেন। রাজার থাকে মাত্র আটত্রিশ হাজার এক শত ঊনচল্লিশ টাকা চৌদ্দ আনা তিন পাই। তাতে প্রজার কাছ থেকে আদায় করবার তহশীলদার, হিসাব রাখার গোমস্তা, পাইক প্রভৃতির বেতন দিয়ে রাজার কিছুই থাকে না। এই হয় ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ন্যায্য রাজস্ব ধার্য্য! এখানের চলতি ভাষায় এক ছড়া আছে— **'যার ধন তার ধন নয়, নেপোয় মারে দই।' বিষ্ণুপুরের রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী পরিপূর্ণভাবে সেই নেপোর ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল।**"[১]

চৈতন্য সিংহকে কারারুদ্ধ করেও যখন কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ রাজস্ব আদায় হল না তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী **মিষ্টার ফিটিং** নামে জনৈক রাজকর্মচারীকে সঙ্গে দিয়ে চৈতন্য সিংহকে পাঠিয়ে দেন ইন্দাসে। নতুনভাবে জমিদারী বন্দোবস্ত দেবার আদেশ জারি করা হয়। বিষ্ণুপুরের জমিদারী পাছে দামোদর সিংহের হস্তগত হয় এই আশঙ্কাতে শঙ্কিত হয়ে তিনি অবিবেচকের মতোই বার্ষিক চার লক্ষ টাকা রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হয়ে জমিদারী বন্দোবস্ত নেন এবং কারাগার থেকে মুক্তি লাভের অব্যবহিত পরেই স্বীয় পরিবারের বহুমূল্য অলঙ্কারাদি বিক্রয় করে গোকুল মিত্রের ঋণ পরিশোধ করে মদনমোহনকে নিয়ে আসার জন্য চলে যান কোলকাতা। এদিকে মদনমোহন লাভের পর থেকেই দিনে দিনে শ্রীবৃদ্ধি হয় গোকুল মিত্রের এবং তার কন্যা **লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী** মদনমোহনের পরম ভক্ত হয়ে ওঠে। এই দ্বিবিধ কারণের জন্য **গোকুল মিত্র** মদনমোহনকে ফিরিয়ে দেবেন না, আর রাজা চৈতন্য সিংহও মদনমোহনকে ফিরে পাবার জন্য নাছোড়বান্দা। যে মদনমোহনকে কেন্দ্র করে চৈতন্য সিংহ এবং গোকুল মিত্রের মধ্যে হৃদ্যতা ও মিত্রতার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, সেই মদনমোহনকে কেন্দ্র করেই শুরু হল তিক্ততা। শুরু হল মামলা মোকদ্দমা। মোটা অঙ্কের টাকা দাবী করে চৈতন্য সিংহের বিরুদ্ধে **ওয়ারেন হেস্টিংসের** কাছে মামলা করে এক তরফা ডিগ্রী লাভ করেন গোকুল মিত্র। দুরভিসন্ধি-মূলক মিথ্যা মামলার কাছে নতি স্বীকার করে মদনমোহনকে বাগবাজারে রেখে শূন্য হস্তে বিষ্ণুপুরে ফিরে আসেন চৈতন্য সিংহ। মদনমোহন বিগ্রহ এবং পুত্র মদনমোহনকে হারিয়ে তিনি বেঁচে থাকেন মৃতপ্রায় অবস্থায়।

এর পর ১৭৯১ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর ভাগ্যচক্রে এসেছে শুধু বিড়ম্বনা আর বিড়ম্বনা। গৃহ-বিবাদ, অভাব-অনটন, মামলা-মোকদ্দমা, মর্যাদাহানি এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সময় মত রাজস্ব দিতে না পারার অপরাধে বারংবার কারাবাসের ঘটনায় শুধুমাত্র পুষ্ট হয়েছে ইতিহাসের পাতা। প্রকটিত হয়েছে বিদেশী বণিক সম্প্রদায়ের নিষ্ঠুরতা। চরিতার্থ হয়েছে ভাগ্য বিধাতার নির্মম

১। বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী, পৃঃ—১৩৫

বিধিলিপি। ফকিরনারায়ণ কর্মকার তাই যথার্থই লিখেছেন, "....ভগবান যাঁর ওপর বিরূপ হন, দুর্ভাগ্য যখন আঘাত হানতে শুরু করে, তখন সামান্যও তাঁর কাছে অসামান্য হয়, অতি সহজসাধ্যও দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে।" মহারাজ চৈতন্য সিংহের ক্ষেত্রে ঠিক তাই হয়েছে। নিষ্ঠুর নিয়তির হাতের ক্রীড়নক হয়ে সারাটা জীবন বেঁচে থাকতে হয়েছে তাঁকে।

"খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মল্লভূম রাজ্যের প্রতিষ্ঠা থেকে খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে এর ধ্বংস কাল পর্যন্ত যে ষাটজন নরপতি মল্লভূমে রাজত্ব করেন, তার মধ্যে এমন দুঃখপূর্ণ বিড়ম্বিত জীবন আর কারও দেখা যায় না। এঁর রাজ্য ভোগের কালও যেমন দীর্ঘ, দুঃখ ভোগও তেমনি অন্তহীন। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৮০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ৫৩ বৎসর কাল ইনি রাজত্ব করেন। তারপর শেষ জীবনে মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে পৌত্র মাধবসিংহকে বিষ্ণুপুরের সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে মহারাজ চৈতন্য সিংহের বিড়ম্বিত জীবনের অবসান হয়।" তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি হিসেবে মা মৃন্ময়ী মন্দির প্রাঙ্গণের পূর্ব দিকে অবস্থিত ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত (বুড়ো) রাধাশ্যাম জীউ-এর শ্রীমন্দিরটি আজও দাঁড়িয়ে আছে অম্লান ঐতিহ্য নিয়ে। সে মন্দির আমি আপনাদের ইতিমধ্যেই দেখিয়েছি। এখন শোনালাম মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ চৈতন্য সিংহের দুর্বিষহ জীবন-যুদ্ধের কথা।

অধ্যায়-৪৭

শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ

মহারাজ চৈতন্য সিংহের কথা শুনতে শুনতে আপনারা এসে গেছেন মদনমোহনগঞ্জের মদনমোহন দেবের শ্রীঅঙ্গনে। আমার শিক্ষাগুরু শ্রীগুরুপ্রসাদ সরকার মহাশয়ের লেখনীর আঁকিবুঁকিতে এখন আপনাদের শোনাই শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ সম্পর্কে দু'চার কথা। তিনি লিখেছেন, "বিষ্ণুপুরের মদনমোহন সেই বিখ্যাত দেবতা যাঁর স্মৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মল্লভূমের প্রতি ধূলিকণা। ....কারণ মদনমোহন হলেন সেই দেবতা যাঁর মধ্যে ভগবানের প্রকাশ সর্বাধিক। সেই হিসাবে তিনি শ্রেষ্ঠ। মদনমোহনের বৈশিষ্ট্য হোল তিনি প্রস্তর দেহে পূর্ণ ভগবান। মহাপ্রভু, মনুষ্যদেহে যেমন কৃষ্ণ, মদনমোহনও প্রস্তরদেহে কৃষ্ণ স্বয়ং। মদনমোহন ভক্তের প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। সেই টানেই তিনি মল্লভূমই আবির্ভূত।"[১]

মনে প্রশ্ন জাগে ভক্তাধীন মদনমোহন মল্লভূমের মাটিতে এলেন কেমন করে? কোথায় ছিলেন তিনি? উত্তরে বলি, দিল্লীর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে তীর্থ পর্যটন করতে করতে বীরভূমের বক্রেশ্বরধাম দর্শন করে ইলামবাজার সন্নিকটস্থ বৃষভানুপুরে উপনীত হন মহারাজ বীর হাম্বীর। রাত্রি যাপনের উদ্দেশ্যে জনৈক ধরণীধর মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে আশ্রয় নেন তিনি। সেখানে তাঁর পারিবারিক দেবতা শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ-এর অনিন্দ্যসুন্দর রূপ দর্শনে মোহিত হন মুহূর্তে। আকৃষ্ট হন প্রবলভাবে। শ্রীবিগ্রহটিকে আপন করে পাবার ইচ্ছায় তাঁর হৃদয় হয় ব্যাকুল। অতঃপর তিনি স্বীয় পরিচয় জ্ঞাপন করে যে কোন মূল্যের বিনিময়ে উক্ত শ্রীবিগ্রহটিকে তাঁকে দেওয়ার জন্য ব্রাহ্মণকে পীড়াপীড়ি করেন বারংবার। ব্রাহ্মণ রাজী হননি তাঁর এই প্রস্তাবে। ব্যথিত হৃদয়ে আহার-নিদ্রা ত্যাগ

১. মল্লসংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের রাসোৎসব, পৃঃ—২৭

করে শুধুমাত্র শ্রীবিগ্রহের পাদোদক পান করে পড়ে থাকেন মন্দির প্রাঙ্গণে। অন্তর্যামীকে অন্তরের আর্তি জানিয়ে আকুল হৃদয়ে প্রার্থনা করেন রাতভর। রাত্রির শেষ প্রহরে হয় স্বপ্নাদেশ— **'ওঠো রাজন, আমাকে নিয়ে চল বিষ্ণুপুরে।' আদেশ মাত্রই শ্রীবিগ্রহকে বক্ষে ধারণ করে বিষ্ণুপুর অভিমুখে পাড়ি দেন রাজা বীর হাম্বীর।**

এদিকে ব্রাহ্মণ অতি প্রত্যুষে অতিথিসেবা ও দেবসেবায় আত্মনিয়োগ করতে গিয়ে দেখেন অতিথি নেই, নেই তাঁর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহন। একা একা শয্যায় শায়িতা শ্রীমতী। হায়! হায়! করে কেঁদে ওঠেন ব্রাহ্মণ। মদন বিরহে বুক ফেটে যায় তাঁর। এক বস্ত্রে বেরিয়ে পড়েন মদনের খোঁজে। যেন তাঁর হৃদয়বীণায় ঝংকৃত হয়—'শূন্য এ বুকে পাখী মোর আয়, ফিরে আয় ফিরে আয়।'

"পথে যেতে যারে পায় জিজ্ঞাসে ব্রাহ্মণ।
এ পথে দেখেছ কেহ মদনমোহন।"

দিনের পর দিন পাগলের মতো ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে তিনি এসে যান বিষ্ণুপুরের রাজ-দরবারে। 'চোরের মন পুলিশ পুলিশ।' ব্রাহ্মণকে দেখে সিংহাসনোপবিষ্ট বীর হাম্বীর হন হতচকিত। পড়ে যান দারুণ অস্বস্তিতে। রাতের অতিথিকে চিনতে ভুল হয় না ব্রাহ্মণের এবং তিনিই যে এ কাজ করেছেন সে বিষয়েও ব্রাহ্মণ সুনিশ্চিত।

"দ্বিজ কহে মহারাজ করি নিবেদন।
দেখাইয়া রাখ প্রাণ মদনমোহন।"

ধর্মপ্রাণ রাজা স্বীয় অপরাধে ব্রহ্মহত্যার ভয়ে একটি কৌশল অবলম্বন করেন। কথিত আছে রাজ্যের খ্যাতনামা শিল্পীদের ডেকে তড়িঘড়ি করে দিন তিনেকের মধ্যে মদনমোহনের আদলে তিনটি বিগ্রহ, মতান্তরে সাতটি বিগ্রহ নির্মাণ করান। এঁরা হলেন যুগলকিশোর জীউ, গৌরগোবিন্দ জীউ ও রাধাকান্ত জীউ। অতঃপর ব্রাহ্মণকে দেখানো হয় উক্ত বিগ্রহগুলি। কিন্তু ব্রাহ্মণের চোখে ফাঁকি দেওয়া যায় না আদৌ—ধরা পড়ে যায় আসল নকল। হা-হুতাশ করে কেঁদে ওঠেন ব্রাহ্মণ। মদনমোহন বিরহে প্রাণ রাখা দায়। তাই আত্মহত্যার সংকল্প করে রাজবাড়ি থেকে বেরিয়ে চলে যান কোচবিড়াই নদী অভিমুখে। সেখানে রাজ-পুরোহিতের বৃদ্ধা মায়ের কাছে জানতে পারেন তাঁর প্রাণাধিক প্রিয় মদনমোহনের খবর। জানতে পারেন রাজ-অন্তঃপুরের লক্ষ্মীগৃহে লুক্কায়িত রয়েছেন তিনি। অনেক আশায় বুক বেঁধে পুনরায় ফিরে আসেন রাজদরবারে এবং রাজ-অন্তঃপুরে সুরক্ষিত মদনমোহনকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য কাকুতি মিনতি করেন বারংবার। কান্নাকাটি এবং কাকুতি মিনতিতে কাজ হয় না কিছুই। উপায়ান্তর না দেখে মা মৃন্ময়ীর মন্দিরে হত্যা দেন ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণের এই কাণ্ড দেখে প্রমাদ গণলেন ধর্মভীরু বীর হাম্বীর। একদিকে ব্রহ্মহত্যার পাপ, অপরদিকে মদনমোহন বিহনে প্রাণ রাখা দায়। নিরুপায় হয়ে অন্ন-জল ত্যাগ করে তিনিও গিয়ে হত্যা দিলেন জাগ্রত দেবতা মদনমোহনের শ্রীচরণে। **দুই ভক্তের ভক্তির টানে উভয় সঙ্কটে পড়েন মদনমোহন। সঙ্কট মোচনে ধারণ করেন চিন্ময়রূপ।** রাজাকে স্বপ্নাদেশ দেন—তুমি যেভাবে হোক ব্রাহ্মণকে সন্তুষ্ট করে তাঁর কাছ থেকে আমাকে চেয়ে নাও। আবার ব্রাহ্মণকে গিয়ে বলেন—আমি যে ভক্তাধীন। রাজা আমার পরমভক্ত। আমার জন্য মান-সম্মান, রাজমর্যাদা সবকিছু ত্যাগ করে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বন করেছে সে। মিথ্যাচার, কপটাচার, পাপাচার করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেনি সে।

মদ্গতপ্রাণ এরূপ ভক্তকে ত্যাগ করে আমি যাই কি করে? তিনি আরও বোঝান, "সেখানে শ্রীমতী আছেন। শ্রীমতী আর আমি অভিন্ন। তাঁর সেবা করলেই আমার সেবা করা হবে। আর আমিও প্রতিদিন সেখানে যাব। **তার প্রমাণ স্বরূপ একটি করে আমলি ফুলের কাঠি সেখানে রেখে আসব।** এই কথা বলে তিনি অন্তর্ধান হয়ে যান, স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসে ব্রাহ্মণের। চিন্তার ঝড় বইতে থাকে অন্তরে।" (বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী, পৃঃ—৬১)

শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ-এর প্রত্যাদেশ মতো অতি প্রত্যুষে রাজা স্বয়ং ব্রাহ্মণের কাছে এসে করজোড়ে কাকুতি মিনতি করে তাঁকে নিয়ে যান রাজবাটীর লক্ষ্মীগৃহে। উন্মুক্ত করেন দ্বার।

"সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণের অন্তরে যেন শিহরণ বহে যায়। তিনি দেখেন তাঁর সামনেই তাঁর মন-প্রাণ সর্ব্বস্ব হরণ করা মদনমোহন মূর্ত্তি বিরাজিত। প্রাণ ভরে দেখতে থাকেন তিনি, চোখ ভরে আসে তাঁর জলে।

আপাদমস্তক দ্বিজ করি নিরীক্ষণ।
এই আমার মদন বলি করিল রোদন।।

ব্রাহ্মণ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকেন সেই দিকে। চোখ দিয়ে ঝরতে থাকে শ্রাবণের ধারা। বহু সান্ত্বনা-বাক্য, বহু অনুনয় মিনতি করে রাজা সেখানে তাঁকে আসন দিয়ে বসাতে সক্ষম হন। তারপর তাঁর কাছে নিবেদন করেন তাঁর অন্তরের কথা। রাজা বলেন—

ব্রাহ্মণঠাকুর, কহি তোমার ঠাঁই।
বামেতে শ্রীমতী বিনে দর্শনে সুখ নাই।।
দয়া কর গোঁসাই, দিব যত ধন চাও।
কৃপা করে মদন এলেন রাধায় এনে দাও।।

কিন্তু ফল হয় তাতে বিপরীত। সেই কথা শুনে ব্রাহ্মণ পুনরায় কাঁদতে থাকেন। বলেন—

অমূল্য এ ধন পেয়ে আরও ধন চাও।
বুকের মাণিক নিলে হরে এবার প্রাণ নাও।।

তখন রাজা পুনরায় বহু সান্ত্বনা-বাক্য, বহু অনুনয়-মিনতি করতে থাকেন। কিন্তু ব্রাহ্মণের সে অশ্রুধারার আর কিছুতেই নিবৃত্তি হতে চায় না। তাই কোন উপায় স্থির করতে না পেরে অন্তঃপুরের এক কক্ষ থেকে এক থালা মোহর এনে ব্রাহ্মণের পায়ের কাছে রেখে রাজা তাঁকে প্রণাম করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ তা স্পর্শ করেন না।

থালা ভর্ত্তি মোহর এনে ব্রাহ্মণেরে দিল।
বাম পায়ে ঠেলে দ্বিজ কহিতে লাগিল।।

শোন মহারাজ, যে মহারত্ন আজ আমি পরিত্যাগ করে চলেছি, সাধারণ ধন-রত্ন দিয়ে তুমি তার কতটুকু পূর্ণ করবে? সারা বিশ্বের সমস্ত ঐশ্বর্য্য দিলেও ও অভাব আমার পূর্ণ হবে না। **তাই যার জন্য আমি আজ সেই বস্তু হারালাম, যাবার সময় তাকে বলে যাই, মদনমোহন, লোকচক্ষে হও তুমি বিশ্বনিয়ন্তা, হও তুমি সর্বশক্তিমান। কিন্তু আমার চোখে তুমি তা নও। আমার সংসারে একাধারে তুমি ছিলে পুত্র-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন সব কিছু। তুমিই একদিন আমার ছন্দহারা জীবনে এনেছিলে স্বর্গের সুষমা, তোমাকে**

নিয়েই গড়ে উঠেছিল আমার সংসার, তুমিই সেখানে এনেছিলে আলোর অফুরন্ত উৎস। শঠ, নির্দ্দয়, অকৃতজ্ঞ। আজ নিজের হাতে সেই আলো নিভিয়ে দিয়ে, যে বাজ তুমি আমার বুকে হানলে, তার যে কি দুঃসহ বেদনা, অন্তর্যামী তুমি, বেশ ভাল ভাবেই তা বুঝতে পারছ। তাই যাবার সময় আমি বলে যাই, যার মোহে অন্ধ হয়ে আমার এই সর্বনাশ তুমি করলে, সেই বড় সাধের এই লীলাভূমিও তোমাকে একদিন পরিত্যাগ করে যেতে হবে। আর সেদিন তোমার এই প্রিয়ভূমির প্রতিটি নরনারী কাঁদবে ঠিক এমনি আমারই মত অবস্থায়। কেউ তা খণ্ডন করতে পারবে না।" (বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী, পৃঃ—৬৪)

ব্রাহ্মণ চলে গেলেন বিষ্ণুপুর ছেড়ে। অভিশপ্ত মদনমোহন বিগ্রহ রয়ে গেলেন বিষ্ণুপুরে। কালক্রমে ব্রাহ্মণের অভিশাপ সত্য হয়েছে অক্ষরে অক্ষরে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, ঐতিহাসিক ৺গঙ্গাগোবিন্দ রায় তাঁর 'মল্লভূম কাহিনী' পুস্তকে মত পোষণ করেছেন যে মহারাজ দুর্জন সিংহ মদনমোহনকে বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন। শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ-এর বিষ্ণুপুর আগমনের ইতিবৃত্ত শোনালাম। এখন শোনাই মদনমোহন মন্দিরের কথা। 'আর্কিয়লজিক্যাল্ সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া' মন্দিরটির বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন—

"ইষ্টক নির্মিত একরত্ন শৈলীর মন্দিরগুলির মধ্যে মদনমোহন মন্দিরটি অনুপম। মন্দিরের দক্ষিণগাত্রে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপি হইতে জানা যায় ১৬৯৪ খ্রীঃ মল্লরাজ দুর্জন সিংহ কর্তৃক মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটি মল্লরাজাদের রক্ষক ও নগরদেবতা মদনমোহনের উদ্দেশ্যেই নির্মিত। প্রাচীর ঘেরা প্রাঙ্গণে একটি উচ্চ মাকড়া পাথরের ভিত্তিপীঠের উপর মূল মন্দিরটি দণ্ডায়মান। ঢালু ছাদের উপর একমাত্র শিখরটি সংস্থাপিত। মন্দিরের দক্ষিণ দিকে রহিয়াছে একটি দর্শনীয় দোচালা নাটমণ্ডপ। মন্দিরের গাত্রে পোড়ামাটির বহুল অলঙ্করণে উপস্থাপিত হইয়াছে কৃষ্ণলীলা, মহাভারত ও পুরাণ-কাহিনী, সারিবদ্ধ পশুপক্ষী লতাপাতার কারুকার্য এবং সমসাময়িক সমাজ জীবন। যে শিল্প দক্ষতা ও সুষমা এই মন্দিরসজ্জায় উন্মোচিত হইয়াছে তাহা পোড়ামাটির অলঙ্করণ শিল্পের এক অনবদ্য নিদর্শন।" (বিষ্ণুপুর মেলা, স্মরণিকা-১৪০৬)

দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৫২ ফুট ১ ইঞ্চি × ৫২ ফুট ১ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ৪ ফুট ১ ইঞ্চি মাপের বর্গাকার ভিত্তিভূমির উপর গড়ে উঠেছে মূল মন্দিরটি। বর্গাকার মূল মন্দিরটি দৈর্ঘ্য প্রস্থে ৩৯ ফুট ১০ ইঞ্চি× ৩৯ ফুট ১০ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় সর্বসাকল্যে প্রায় ৩৫ ফুট ১½ ইঞ্চি। কারুকার্য সমন্বিত মাকড়া পাথরের ভিত্তিবেদীর উপর অপূর্ব টেরাকোটা শিল্প সমৃদ্ধ এই দেবালয়টি বিষ্ণুপুরের স্থাপত্য শৈলীর এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

শ্রদ্ধেয় অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থে এ মন্দির সম্পর্কে লিখেছেন, "মাকড়া পাথরের ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত ও পূব, পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে তিন খিলানের দালানযুক্ত এ সৌধ 'টেরাকোটা'—অলংকরণের প্রাচুর্যে ও উৎকর্ষে পশ্চিমবঙ্গের এ জাতীয় শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলির সঙ্গে উপমিত হতে পারে। সামনের দেওয়ালে পোড়ামাটির সজ্জার বিন্যাসে লালবাঁধের তীরে কালাচাঁদ প্রভৃতি মন্দিরের রীতি অনুসৃত হয়েছে মনে হয়। খিলানের দু পাশের দেওয়ালে ও কার্নিসের নীচে চার সারি ক'রে 'টেরাকোটা'— অলংকরণ নিবদ্ধ হয়েছে এবং খোপের মধ্যে প্রতিটি মূর্তিকে

ঘিরে আছে অতি সূক্ষ্ম ও অতি সুন্দর ফুলকারি বেষ্টনী। **মিঃ স্পুনার বলেছেন, নকাশি কাজের জন্য যে পরিমাণ শ্রম এখানে ব্যয়িত হয়েছে তার তুলনা রাঢ়দেশে বিরল।** নীচের দিকের 'প্যানেল'গুলিতে পশু-পক্ষী-ভাস্কর্য, কৃষ্ণলীলা, দশাবতার ও অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনী রূপায়িত হয়েছে আর উপরের দিকে স্থান পেয়েছে প্রধানতঃ যুদ্ধদৃশ্য। থামের গায়ে আছে কীর্তন ও বাজিয়ের দল ও খিলানশীর্ষে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ ও মহাভারতের বিভিন্ন কাহিনী। দালানের ভিতরের দেওয়ালও অলংকরণ বর্জিত নয়; সেখানে বহু উৎকৃষ্ট সজ্জার মধ্যে কয়েকটি ড্রাগনসদৃশ পৌরাণিক জীবের ভাস্কর্য খুবই উচ্চাঙ্গের।"১

এ মন্দিরের যথার্থ মূল্যায়ন করতে গিয়ে গবেষক চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর 'বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা' গ্রন্থে যা লিখেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, **"এখানের মন্দিরে টেরাকোটা চিত্রের স্বল্পতা থাকলেও—বিন্যাস বৈচিত্র্যে মন্দিরটি আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে।** সুনির্দিষ্ট ব্যবধানে ফুল লতা পাতার কারুকার্যখচিত এক বা একাধিক স্তবকযুক্ত ফ্রেম বা বন্ধনীর মধ্যে প্রায় প্রতিটি টেরাকোটা চিত্রকে স্থাপন করে শিল্পী এখানে একটি আকর্ষণীয় পরিচ্ছন্নতা এবং সুপরিকল্পিত মাত্রা ও পরিমিতি বোধের পরিচয় দিয়েছেন....।

অন্যান্য মন্দিরের মতোই এখানে স্থান পেয়েছে রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধচিত্র, শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, বাল্যলীলা, অসুরবধ ইত্যাদি। দশাবতারের চিত্র যথানিয়মে এখানেও স্থান পেয়েছে। ....মদনমোহন মন্দিরের দশাবতারের অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধের মূর্তি-চিত্রটির কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে, মূর্তির দুপাশে দুটি পদ্মকলি যেন বুদ্ধের **পদ্মপাণি** নামের ইঙ্গিত বহন করছে; মূর্তিটির মুখমণ্ডল কমনীয় ও লাবণ্যময়।

মদনমোহন মন্দিরের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল এখানের **'হংসলতা বা হংসমালা'** প্যানেলগুলি। এখানের প্রতিষ্ঠালিপিতেও হংসচিত্র উৎকীর্ণ, এখানের হংসলতা প্যানেল শিল্পীর এক অনবদ্য সৃষ্টি।

মদনমোহন মন্দিরের 'হংসলতা' প্যানেলটি যেন হংসের সজীব এবং ধারাবাহিক জীবন চিত্র। হাঁসের নানা অবস্থার ছবি এতে রয়েছে। কোথাও ঊর্ধ্বগ্রীব হংসরাজি কলস্বরে মুখর— কোথাও সোহাগ গদগদ হংস-মিথুন একে অপরের মুখোমুখি— কোথাও আবার এরা খাদ্যান্বেষণে তৎপর— কোনখানে আবার দেখা যায় এদেরই কেউ কেউ অলস মেজাজে পক্ষকণ্ডূয়ণ রত। **সব মিলে হংসজীবনের এমন নিখুঁত 'স্টাডি' খুব কমই চোখে পড়ে...।**

মন্দিরের পশ্চিমদিকের বারান্দার ত্রি-খিলানের ভারবাহী স্তম্ভের পাদদেশে এবং মন্দিরের দক্ষিণের (সম্মুখ ভাগের) দেওয়ালে (দক্ষিণ দালান তথা গর্ভগৃহে প্রবেশের মুখে বাঁদিকের দেওয়ালের নীচের দিকের ফ্রিজে) বেশ কিছু বৈষ্ণব গোস্বামী বা আচার্যের চিত্র রয়েছে। এর মধ্যে একটি 'গোস্বামী-বিষয়ক' টেরাকোটা চিত্র বিশেষ কৌতূহলোদ্দীপক। মন্দিরের সম্মুখভাগে, অর্থাৎ দক্ষিণের দেওয়ালের নীচের দিকের 'ফ্রিজে' চিত্রটি রয়েছে। পুঁথি পাঠরত এক বৈষ্ণব-গোস্বামী বা আচার্যের সন্নিকটে উপবিষ্ট এক রাজপুরুষ। চিত্রটি দেখতে দেখতে অনেক প্রশ্নই মনে ভেসে উঠে—এটি কি গোস্বামী গুরুর সকাশে উপনীত পুঁথি-পাঠ শ্রবণেচ্ছু কোন মল্লরাজার চিত্র? শ্রীনিবাস আর বীর হাম্বীরের কোন স্মৃতি বহন করছে কি এই চিত্রটি? অথবা এটি কি সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতি চিত্র— নবপদ্ধতিতে ভাগবত পাঠ করে শ্রীনিবাস আচার্যের মল্লরাজসভা বিজয়ের স্মরণীয় ঘটনাটিরই চিত্ররূপ?.....

১। বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, পৃঃ—৮৭

মন্দিরের দক্ষিণদিকের দালানে অবস্থিত গর্ভগৃহে প্রবেশের মূল দরজাটিকে বেষ্টন করে একাধিক উচ্চাবচ স্তবকে রচিত সুপ্রশস্ত ফ্রেমটি নক্সা-অলংকরণে পরিপূর্ণ ; এই প্রবেশদ্বারকে কেন্দ্র করে নক্সা অলংকরণের যে বিপুল সমারোহ লক্ষ্য করা যায় তা অত্যুৎকৃষ্ট দারুশিল্পকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এমন কি স্থানে স্থানে অতিসূক্ষ্ম শঙ্খিল (Spiral) রেখার আবর্তনে রচিত বৃত্তাকার মোটিফগুলি এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম রেখার বিচিত্র বিন্যাসে সৃষ্ট জটিল নক্সাগুলি সূক্ষ্মকারিগরিতে যেন উন্নতমানের দারুশিল্পকেও অতিক্রম করে গহনা বা অলঙ্কারের উপর রচিত অত্যুৎকৃষ্ট 'তার বা জালি' কাজের সমগোত্রীয় হয়ে উঠেছে। দরজার ফ্রেমের নক্সা অলংকরণ ছাড়াও এই দক্ষিণের দালানের বিভিন্নস্থানে বিচিত্র সব নক্সা-অলংকরণ লক্ষ্য করা যায় ; কোথাও ফাঁদ-ফাঁস জাতীয় মোটিফের জটিল বিন্যাস আবার কোথাও লতাপাতার অপূর্ব সব ফুলকারি চোখে পড়ে। এখানের ফুলকারি আর নকাশি অলংকরণের অনেকস্থানেই পারসিক মিনিয়েচার বা পাণ্ডুলিপিচিত্রের-বন্ধনী বা 'ফ্রেমে' ব্যবহৃত নক্সার প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। এখানের কয়েকটি টেরাকোটা টালিতে দেখা যায় গুজরাটি চিত্রের মত একই সঙ্গে একটি দৃশ্যের উপর আর একটি দৃশ্য (Superscription) উৎকীর্ণ হয়েছে।"

মন্দিরগাত্রে নিবদ্ধ 'টেরাকোটা শিল্প' সম্ভারের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পূর্বোক্ত চিরন্তরঞ্জন বাবু আরও লিখেছেন, "মন্দিরটির প্রতিষ্ঠাকাল সপ্তদশ-শতাব্দীর শেষ ; সপ্তদশ-শতকের দিগন্তবর্তী এই মন্দিরটি, এই শতকের উত্তরাধিকার লাভ করলেও, এর স্থানে স্থানে গোধূলিরাগের আভাস মেলে।.... **টেরাকোটা চিত্রের রচনাশৈলী অনুযায়ী বিচার করলে মদনমোহন মন্দির যদিও প্রথম পর্যায়ে পড়ে তবুও এই মন্দিরেই মন্দির-টেরাকোটা-শিল্পের প্রথম পর্যায়ের গৌরবময় যুগের অস্তকালের আভাস মেলে** ; পূর্বরীতির অনুবর্তন এবং কারুকৃতিতে পূর্বতন মন্দিরগুলির ঔজ্জ্বল্য অনেকাংশে বজায় থাকলেও এ মন্দিরের স্থানে স্থানে অস্তরাগের আভাস দুর্নিরীক্ষ্য নয় এবং অতি সূক্ষ্মভাবে হলেও এখানে কিছু টেরাকোটা চিত্রে পরবর্তী যুগের (অষ্টাদশ-শতকের) রচনাশৈলীর আভাস মেলে।"

দৃষ্টান্তমূলক প্রবেশতোরণ, প্রবেশতোরণের বহির্ভাগের দক্ষিণে ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া বর্গাকৃতির এক সুবৃহৎ জলাধার জাতীয় চৌবাচ্চা—অতীতে যেটি দেবপূজার জল সরবরাহের জন্য নির্মিত হয়েছিল এবং যেটি বর্তমানে মজে গিয়ে ও অল্পবিস্তর ধ্বসে গিয়ে ধ্বংসের প্রতীক্ষায় দিন গুনছে ; সেটি ছাড়াও ইষ্টক নির্মিত সুউচ্চ প্রাচীর ঘেরা এই দেবমন্দিরের ঈশানকোণে দোচালা আকৃতির ভোগরান্নার ঘর এবং মন্দিরের দক্ষিণে তুলসীমঞ্চের ভগ্নাংশ এবং তুলসীমঞ্চের দক্ষিণে অর্থাৎ দেবালয়ের সম্মুখে মনোরম টেরাকোটা কারুকার্য সম্ভারে সমৃদ্ধ-নাম সংকীর্তন-মন্দির বা নাটমন্দিরটির উপস্থিতি যেন মল্লরাজাদের পূর্ণাঙ্গ মন্দির নির্মাণের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। প্রাসঙ্গিকভাবেই বলি এ দেবালয়ের প্রবেশতোরণ, নাটমন্দির এবং প্রাচীরের কিয়দংশ কালের নির্মম প্রকোপে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। 'আর্কিয়লজিক্যাল্ সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া' এগুলি পুনর্নির্মাণ করে হতশ্রী দেবপ্রাঙ্গণটিকে শ্রীমণ্ডিত করেছেন। সবুজ এবং শ্যামলিমার স্পর্শ এনেছেন নানান জাতীয় সপুষ্পক এবং অপুষ্পক বাহারী গাছের লতাগুল্ম ও বৃক্ষাদি রোপণ করে। থ্যাংকস্ টু দি আর্কিয়লজিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া।

মদনমোহন মন্দিরের আলোচনায় ছেদ টেনে এবার আমরা আবার ফিরে যাব বিষ্ণুপুরের নগর-দেবতা শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ প্রসঙ্গে।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠাফলক থেকে জানা যায় যে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। এদিকে শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন মহারাজ বীর হাম্বীরের শেষ জীবনে। ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দে বীর হাম্বীর তদীয় পুত্র ধাড়ী হাম্বীরকে সিংহাসনে বসিয়ে চলে যান বৃন্দাবনধামে এবং সেখানেই তাঁর লোকান্তর হয়। সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে, ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রায় ৭৫/৮০ বছর এই শ্রীবিগ্রহ রাজ-অন্তঃপুরের লক্ষ্মীগৃহেই পূজিত হতেন এবং অবস্থান করতেন। মন্দির প্রতিষ্ঠার পর তিনি স্বীয় মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হন এবং পূজিত হতে থাকেন। **একটি লক্ষণীয় বিষয় হল, মদনমোহন জীউ বৃষভানুপুর থেকে বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন, আসেন নি কিন্তু রাধারাণী। তাহলে বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের পাশে রাধারাণী এলেন কিভাবে? এবং সেই রাধারানী কি নবনির্মিতা রাধারাণী।** সম্ভবতঃ তাই। কারণ রাজা বীর হাম্বীর ব্রাহ্মণ ঠাকুরকে বলেছিলেন—

ব্রাহ্মণঠাকুর কহি তোমার ঠাঁই।
বামেতে শ্রীমতী বিনে দর্শনে সুখ নাই॥
দয়া কর গোঁসাই দিব যত ধন চাও।
কৃপা করে মদন এলেন রাধায় এনে দাও॥

কিন্তু ব্রাহ্মণ ঠাকুর রাজার এই প্রস্তাবে সম্মত হননি। এদিকে রাজা মদনমোহনের যুগলমূর্তি দর্শনে অভিলাষী। রাজার এই অভিলাষ পূর্ণ করার অভিপ্রায়েই বোধ করি নির্মিত হয়েছিলেন নতুন রাধারাণী। কিন্তু রাধারাণী কিছুটা খর্বাকৃতি হওয়ার ফলে একটি ধাতু নির্মিত চরণদানির উপর শোভা পেতেন তিনি—এ অবস্থায় মদনমোহনের পাশে শ্রীরাধাকে মানিয়ে যেত মন্দ না। **অবশ্য একথাও শোনা যায় যে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পরবর্তীকালে রাধারাণীকে বিষ্ণুপুরে দিয়ে গিয়েছিলেন স্বীয় আন্তরপ্রেরণায়।**

মদনমোহন আর বিষ্ণুপুরে ; বিষ্ণুপুর আর মদনমোহন যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে আর একটির কথা যেন ভাবা যায় না। তার কারণ মদনমোহনের মনোমুগ্ধকর রূপলাবণ্যে মোহিত হয়েছিলেন বিষ্ণুপুরবাসীগণ, অভিভূত হয়েছিলেন তাঁর অত্যাশ্চর্য লীলাকাহিনী দর্শনে এবং শ্রবণে। আসুন, এখন আপনাদের শোনাই সেই অপূর্ব লীলাকাহিনী।

বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসনে তখন শোভা পাচ্ছেন মহারাজ গোপাল-সিংহদেব। (১৭১২-১৭৪৭ খ্রীঃ) মারাঠা দস্যু ভাস্কর পণ্ডিতের বর্গী সৈন্যের অত্যাচারে সারা বাংলা অতিষ্ঠ। মূল্যবান বস্তু অপহরণ, লুণ্ঠন, শিশু হত্যা, নারীধর্ষণ, নারীহরণ, গণহত্যা, ঘরবাড়িতে অগ্নি সংযোগ কোন কিছুতেই বাধতো না তাদের। দিনের পর দিন লুঠতরাজ করে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অপরাজেয় এবং অসমসাহসী। তাঁর আশা হয়েছিল গগনস্পর্শী। উচ্চাকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে নবাব আলিবর্দী খাঁর অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হানা দেন রাজধানী মুর্শিদাবাদে এবং নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্য নবাবী ফৌজের হাতে বন্দী হয়ে কারারুদ্ধ হন। শক্তি প্রয়োগে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজে না পেয়ে নবাবের এক বিশ্বস্ত সেনাপতিকে উৎকোচ দিয়ে বার জন সর্দার সহ তিনি কারাগার থেকে বেরিয়ে পড়েন কোন প্রকারে। মারাঠারা যখন বাংলা দেশে লুটপাট করতে আসত তখন লুটের আশায় এ দেশীয় অনেক নীচজাতীয় দস্যু এবং মুসলমানেরা তাদের দলে যোগ দিয়ে দল-বৃদ্ধি করত ; এবং শক্ত করত তাদের অত্যাচারের হাত। মুর্শিদাবাদ থেকে মুক্তি পেয়ে লুন্ঠন করতে করতে ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল অতিক্রম করে

বর্গীদস্যু অবশেষে প্রবেশ করে মল্লভূমে। ছাউনী ফেলে বিষ্ণুপুরের দক্ষিণে—বিষ্ণুপুরের গড়ের বাইরে।

"এদিকে বর্গী সৈন্যের এক বড় দল তখন বিষ্ণুপুরের প্রায় বত্রিশ-মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত গড়মান্দারণ লুট করে বর্ত্তমান হাওড়া রোড ধরে কোতুলপুর, কুম্ভস্থল, জয়পুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম ছারখার করে এগিয়ে আসতে থাকে।

মাঝখানে কুম্ভস্থল, জয়পুর প্রভৃতি গড়ের অধিনায়কেরা বাধা দেবার চেষ্টা করলে, নির্ম্মমভাবে তাদের হত্যা করে দুর্ব্বার গতিতে এসে তাদের নায়ক ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাঁর আরও শক্তি বৃদ্ধি করে।" (বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী, পৃঃ-১১১)

রাজা গোপাল সিংহের কানে পৌছে যায় সেই দুঃসংবাদ। হরিভক্তিপরায়ণ মদনমোহন-গত-প্রাণ রাজা গোপাল সিংহ বিন্দুমাত্র বিচলিত হন না। মদনমোহনের ধ্যান-ধারণায় মত্ত থাকেন সারাক্ষণ। পিতার এই অবস্থা দেখে **যুবরাজ কৃষ্ণ সিংহ** পিতার অজ্ঞাতসারেই সৈন্যসামন্ত নিয়ে বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত লালবাঁধ সংলগ্ন লালগড় দুর্গে গিয়ে তৈরী থাকেন বর্গী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য।

এদিকে **ভাস্কর পণ্ডিত** লালগড় দুর্গে সৈন্য সমাবেশের খবর জানতে পেরে বর্গীসৈন্যদের সেখানে থেকে সরিয়ে নিয়ে এসে বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে অবস্থিত কাছারী ময়দান ও তৎসংলগ্ন **বীর দরজার** (বর্তমানে নিশ্চিহ্ন) কাছে শিবির স্থাপন করেন এবং বিষ্ণুপুর আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। ইতিমধ্যে বিষ্ণুপুরের একেবারে পশ্চিম দিকে অবস্থিত **যাদবনগর গড়ে** (বর্তমানে নিশ্চিহ্ন) বিষ্ণুপুর রাজার সৈন্য সমাবেশের কথা জানতে পেরে তিনি সমস্ত বর্গীসৈন্যদের সংঘবদ্ধ করে বিষ্ণুপুরের উত্তরে সৈন্যসমাবেশ করলেন কাতারে কাতারে। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের আশঙ্কায় তটস্থ গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে বাঁচেন। সারা বিষ্ণুপুর রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্কের বিভীষিকা। তথাপি ভ্রূক্ষেপ নেই ঈশ্বর-পাগল রাজা গোপাল সিংহের। মহারাজের এই উদাসীনতায় বিচলিত হন মহারাণী। যুবরাজ কৃষ্ণ সিংহ তখন অসুস্থ। উপায়ান্তর না দেখে তিনি কনিষ্ঠপুত্র **গোবিন্দ সিংহকে** বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে পাঠিয়ে দেন ধানগড়ার দক্ষিণে অবস্থিত যুঝঘাটির যুদ্ধঘাটিতে। যুঝঘাটিতে সৈন্য সমাবেশের খবরটা অবিদিত থাকে না ভাস্কর পণ্ডিতের। গুপ্তচর মারফৎ তিনি আরও জানতে পারেন যে যুঝঘাটির নিকটবর্তী মুণ্ডমালা ঘাটের পরিখা পাহাড়ের ওপর অসংখ্য কামান সাজানো আছে সারিবদ্ধভাবে কিন্তু গোলন্দাজবাহিনী নেই। এই সুযোগে রাত্রি-নিশীথে দ্বারকেশ্বর নদী পার হয়ে কামানগুলোকে দখল করে নেওয়ার পরিকল্পনা করেন তিনি। সেনাপতি **কমল বিশ্বাসের** নজরে পড়ে শত্রুর গতিবিধি। বিচলিত হন তিনি। **দুঃসংবাদটা পৌছে দেন রাজার কাছে, কিন্তু অবিচলিত থাকেন মহারাজ গোপাল সিংহ। দ্রৌপদী রাজসভায় বস্ত্রহরণকালে স্বীয় চেষ্টায় লজ্জা নিবারণে ব্যর্থ হয়ে শেষ মুহূর্তে নিশ্চেষ্ট হয়ে সর্বান্তঃকরণে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। পক্ষান্তরে মদনমোহন-গত-প্রাণ গোপাল সিংহ শত্রুকে প্রতিহত করার কোনরূপ চেষ্টা না করে প্রথম থেকেই রাজ্য রক্ষার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন জাগ্রত দেবতা মদনমোহনের শ্রীচরণে।** পিতার এই নিষ্ক্রিয় ভূমিকা দেখে যুবরাজ কৃষ্ণ সিংহ হয়ে ওঠেন বিদ্রোহী। পিতার অজ্ঞাতসারেই সৈন্যসামন্ত নিয়ে এগিয়ে যান মারাঠাদস্যুদের প্রতিহত করতে। তাঁর নির্দেশে গোলন্দাজ-বাহিনী কামানে অগ্নিসংযোগ করে। গর্জে ওঠে কামানের দল। পরিখার খাদে লুক্কায়িত মারাঠা দস্যুদের মাথার উপর

দিয়ে ছুটে যায় গোলাগুলি। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বেকায়দায় পড়ে যান কৃষ্ণ সিংহ। সেই সুযোগে ঝড়ের গতিতে ধেয়ে আসে মারাঠা সৈন্যের দল। অবস্থা আয়ত্তের বাইরে বুঝতে পেরে পিছু হাঁটেন কৃষ্ণ সিংহ এবং তাঁর সেনাবাহিনী।

এদিকে মহারাজের নির্দেশে সারা শহর জুড়ে চলছে শুধু হরিনাম-সংকীর্তন। খোলের বোল, কীর্তনের সুমিষ্ট সুর, করতালের ঝন্‌ঝনা আর ভক্তহৃদয় মথিত শরণাগতির হরিধ্বনিই হয়ে উঠল রাজা প্রজা সহ আপামর বিষ্ণুপুরবাসীর আত্মরক্ষার তথা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার ব্রহ্মাস্ত্র।

শরণাগতিকে উপেক্ষা করতে পারেন না ভগবান। সাধ্য নেই উপেক্ষা করার। উপেক্ষা করেননি কখনো। রাজসভায় অসহায় দ্রৌপদীকে, অগ্নিপরীক্ষাকালে সীতাদেবীকে এবং আপৎকালে ভক্তপ্রহ্লাদকে রক্ষা করতে যেভাবে তিনি সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, ঠিক তদনুরূপেই গুপ্তবৃন্দাবনের মর্যাদা রক্ষার্থে এগিয়ে এলেন ভক্তের ভগবান।

রাত্রির শেষযামে শোনা গেল ভয়ঙ্কর থেকেও ভয়ঙ্কর এক গুরুগম্ভীর গর্জন। ঝল্‌সে উঠল আকাশ। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হল নভোমণ্ডল। বারুদের পোড়া গন্ধে ভরে গেল বাতাস। মারাঠা দস্যুদের মৃতদেহ স্তূপাকৃতির আকারে পড়ে থাকল মুণ্ডমালার ঘাটে। রক্তের বন্যা বয়ে গেল। ভাস্কর পণ্ডিত এবং অল্প কিছু দস্যুসৈন্য রক্ষা পেয়ে পালিয়ে বাঁচল। বিষ্ণুপুর জয়ের আশা চিরতরে প্রতিহত হল ভাস্কর পণ্ডিতের।

এদিকে সরোষে গর্জে উঠলেন **গোপাল সিংহ,** "কার এত বড় সাহস, কার এত স্পর্ধা যে রাজ-আদেশ অমান্য করে কামান দাগে?" গজগজ করতে করতে তিনি এগিয়ে চলেন উত্তর-গড় মুণ্ডমালাঘাটের অভিমুখে। পথিমধ্যে ঘটে এক ঘটনা। রাজার আদেশ মত মদনমোহনের জন্য যে গোয়ালা দই যোগান দিত প্রতিদিন সে এসে মহারাজের পথ অবরোধ করে সবিনয়ে বলতে থাকে, "মহারাজ! অধমের অপরাধ নিজ গুণে মাপ করবেন। আপনার নির্দেশ মতো আমি মদনমোহনের জন্য দই আনছিলাম। হঠাৎ নীল পোশাক পরিহিত কিশোর বয়েসী শ্বেত অশ্বারোহী এক বালক আমার পথরোধ করে বলতে থাকে, 'আমি রাজপুত্র, মারাঠা দস্যুদের সাথে লড়াই করে ক্লান্ত, শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত। আমাকে দই দাও।' এই বলে ছেলেটি সমস্ত দই খেয়ে নেয় নিমেষে। বালকটির অঙ্গে বারুদের গন্ধ, পোশাকে বারুদের কালিঝুলি, সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত। এসব দেখে আমি অবিশ্বাস করতে পারিনি। দিয়ে দিলুম দই। দই খেয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল মুহূর্তে। যাবার বেলায় এই সোনার বালাখানা দিয়ে বলে গেল, 'আমার বাবাকে এই বালাটা দেখিয়ে দাম নিয়ে নিও।' "

সোনার বালাটি দেখে গোপাল সিংহের চোখ তো ছানাবড়া। এ যে স্বয়ং মদনমোহনের বালা। সাথে সাথে তিনি ছুটলেন মদনমোহন মন্দির অভিমুখে। সেখানে গিয়ে দেখেন মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত। রাধারাণী শয্যাতে শায়িতা। মদনমোহন স্বীয় আসনে দণ্ডায়মান। পোশাক-আশাকে কালিঝুলি, গায়ে বারুদের গন্ধ। এক হাতে নেই একটি বালা। গোয়ালার কথা আনুপূর্বিক সত্য। **মুহূর্তে তিনি উপলব্ধি করেন মদনমোহন-মাহাত্ম্য। বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে, আনন্দে আত্মহারা সকলে মিলে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে বারংবার জয়ধ্বনি দিতে থাকেন, জয়, মদনমোহন জীউ জয়। জয়, ভক্তের ভগবানের জয়। জয়, শ্রীশ্রীমদমোহন জীউ জয়।** ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ না করে পারছি না যে আমার শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই মাণিকলাল সিংহ মদনমোহনের কামান দাগার ঘটনাটি দেখেছেন অন্য আঙ্গিকে। মাস্টারমশাই তাঁর

'সুবর্ণরেখা হইতে ময়ূরাক্ষী' পুস্তকের ষষ্ঠ খণ্ডের ১৬-১৭ পৃষ্ঠাতে এ বিষয়ে লিখেছেন, "মধ্যযুগে গ্রাম গ্রামে রাজা থাকিতেন। এক বা একাধিক মৌজা বা গ্রামের মালিক রাজা বলিয়া অভিহিত হইতেন। বর্গীর হাঙ্গামার পরে মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরের **রতন কবিরাজ** তাঁহার মদনমোহন বন্দনার পুঁথিতে বিষ্ণুপুরের পাশ্ববর্তী গ্রাম্য রাজাদের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন, **'আইসে ফৌজ বিলাত লুটিবারে'**। বিদেশী ফৌজের আক্রমণের জন্য গ্রাম্য রাজারা সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছেন। গ্রাম্য রাজাদের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—ধরাপাট, রামসাগর, পাইকপাড়া, যাদবনগরের রাজারা শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। **রতন কবিরাজ** বর্গী হাঙ্গামার সমসাময়িক কবি। তাঁহার পুঁথিতে মদনমোহন দেবের বিষ্ণুপুর গড় রক্ষার ব্যাপারে কোন অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় না। শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ কর্ত্তৃক দলমাদল কামান দাগার কাহিনীও ইহাতে লিপিবদ্ধ হয় নাই। মদনমোহন বন্দনায় লিখিত হইয়াছে যে শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ মারাঠা সর্দার ভাস্কর পণ্ডিতকে স্বপ্নে দেখা দিয়াছিলেন। **ভাস্কর এই স্বপ্ন পরদিন সকালে তাঁহার সৈন্যদের শোনাইয়া বলিলেন, 'এই গড় ঠাকুর কর্ত্তৃক রক্ষিত, চল আমরা এই স্থান ত্যাগ করি।'** ভাস্কর পণ্ডিত স্বপ্নে যেভাবে শ্রীশ্রীমদনমোহন দেবকে দেখিয়াছিলেন তাহা নিম্নভাবে বর্ণিত হইয়াছে। একটি অতি সুদর্শন যুবক নীল জামা পরিয়া সাদা ঘোড়ায় চড়িয়াছেন। তাঁহার বগলে গোরক কামান, কামানের সঙ্গে সোনার ঘণ্টা বাঁধা রহিয়াছে। এই সুদর্শন যুবক আদেশ করিতেছেন—'এই গড় আমার দ্বারা সুরক্ষিত, অবিলম্বে এই গড় ত্যাগ কর।' এই স্বপ্নাদেশ পাইয়া বাইশ জন জমাদারকে লইয়া ভাস্কর পণ্ডিত বিষ্ণুপুর গড় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ-এর সঙ্গে জড়িত দলমাদল কামানের অলৌকিক কাহিনী পরবর্তী আমলের কবিরা অতিরঞ্জিত করিয়া লিখিয়াছেন।"

মদনমোহন দেব ভাস্কর পণ্ডিতকে স্বপ্নাদেশ দিয়ে বা স্বপ্নে ভীতি সঞ্চার করে অথবা মদনমোহন স্বয়ং দলমাদল কামান দেগে রক্ষা করলেন বিষ্ণুপুরবাসীদের। রক্ষা করলেন তার সার্বভৌম ক্ষমতা। **অনন্তশক্তির উৎস তিনি। তাঁর দিব্যশক্তির প্রভাবে অসুর হয় সুর। মানব হয় মহামানব এবং দেবমানব।** মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের নামান্তর মাত্র। কৃষ্ণরূপ দর্শনে, কৃষ্ণ-কীর্তনে, কৃষ্ণ-উপাসনায় ভক্তহৃদয়ে দৈবশক্তি সঞ্চারিত হয়, নষ্ট হয় কাম-প্রবৃত্তি, হৃদয়ে জাগে ইষ্টবৃত্তি। কামের দেবতা মদন—তাই তিনি কামদেব। **দেবাদিদেব মহাদেব ভস্ম করেছিলেন মদনকে, আর মদনকে মোহিত করেছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। মদনের মাদনাশক্তির উৎস হলেন কৃষ্ণ। তাই মদনমোহনের কাছে মদন সদাই মুগ্ধ এবং শিশুবৎ বশীভূত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় মাদনাশক্তিতে মদনকে মোহিত করেছিলেন বলেই শ্রীকৃষ্ণের আর এক নাম মদনমোহন।** মদনমোহন নামের তত্ত্বকথা শোনালাম। এবার শোনাই অন্য কথা।

বিষ্ণুপুর রাজসিংহাসনে তখন চৈতন্য সিংহ। ১৭৬৯/৭০ খ্রীষ্টাব্দ, বাংলা ১১৭৬ সাল। সময়টা ছিল অত্যন্ত দুঃসময়। একদিকে সর্বনাশা দুর্ভিক্ষ—ছিয়াত্তরের মন্বন্তর! ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অত্যাচার। তাই আবার গৃহবিবাদ, দামোদর সিংহের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা। দীর্ঘস্থায়ী সেই মামলা চালানোর জন্য দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পরামর্শে মহারাজ চৈতন্য সিংহ কলকাতার সালিখা অঞ্চলে ভাড়া বাড়িতে অবস্থান করেন দীর্ঘদিন। মদনমোহনের পাদোদক পান না করে জল গ্রহণ করতেন না তিনি। সুতরাং সেবাইত সহ মদনমোহনকেও নিয়ে যাওয়া হল কোলকাতাতে। বঙ্গের বিখ্যাত দেবতা মদনমোহন

এসেছেন কোলকাতায়—খবরটা ছড়িয়ে পড়তেই ভক্ত সমাবেশ হয় কাতারে কাতারে। এদের মধ্যে ছিলেন কোন্নগরের ধনী লবণ-ব্যবসায়ী গোকুল মিত্র। ভক্ত মানুষ— সেই সুবাদে রাজার সাথে গড়ে ওঠে অন্তরঙ্গতা। মামলা মোকদ্দমার কথা শুনে অর্থ, সামর্থ্য ও সহযোগিতা দিয়ে সাহায্য করেন রাজাকে। মোকদ্দমায় জয় হোল রাজার। কিন্তু দীর্ঘদিন কোলকাতায় অবস্থান এবং মামলার খরচ মেটাতে গিয়ে হ'য়ে পড়েন দারুণভাবে ঋণগ্রস্ত। ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাসাধারণের উপর করারোপ করে ঋণশোধ করার মানসিকতা ছিল না রাজার। পরন্তু নিরন্ন এবং উপবাসী প্রজাদের জন্য দানসত্র এবং অন্নসত্র খুলে দিয়ে নিঃস্ব হয়েছিলেন প্রজাবৎসল মহারাজ চৈতন্য সিংহ। **এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকা ঋণের দায়ে গোকুল মিত্রের ঘরে বাঁধা পড়েন মদনমোহন।** এদিকে প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনের বিরহে নিষ্প্রাণ হয়ে বেঁচে থাকেন চৈতন্য সিংহ। ঋণ পরিশোধ করে মদনমোহনকে ফিরিয়ে আনার মহৎ উদ্দেশ্যে রাজ-অলংকার বিক্রী করে টাকা নিয়ে হাজির হন গোকুল মিত্রের বাটিতে—এসব কথা চৈতন্য সিংহ প্রসঙ্গে বলেছি।

এদিকে মদনমোহন লাভের অব্যবহিত পরই উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে গোকুল মিত্রের। তাছাড়া গোকুল মিত্রের কন্যা **লক্ষ্মীপ্রিয়া**, মদনমোহনের প্রতি এতই অনুরক্ত হয়ে পড়ে যে মদনমোহন বিরহে তারও প্রাণ যায় যায় অবস্থা। নিজের শ্রীবৃদ্ধির কথা চিন্তা করে এবং মদনমোহনগতপ্রাণা কন্যার কথা ভেবে **গোকুল মিত্র**, অধর্ম, অন্যায় ও মিথ্যাচারের আশ্রয় নেন। রাজার কাছ থেকে মোটা টাকা দাবি করে **হেস্টিংস** সাহেবের কাছে অভিযোগ করে এক তরফা ডিগ্রি লাভ করেন। নখদন্তহীন বৃদ্ধ সিংহের মতোই অসহায় রাজাকে ফিরে আসতে হয় শূন্য হস্তে। **কোলকাতার বাগবাজারে রয়ে গেলেন বিষ্ণুপুরের মদনমোহন।** রিক্ত হস্তে ফিরে আসার সময় দুঃখে এবং অভিমানে মহারাজ চৈতন্য সিংহ মদনমোহনের পুরোহিত, সেবাইত সকলকেই নিয়ে চলে আসেন বিষ্ণুপুরে। চলে আসেন ঠিকই, কিন্তু তাঁদের অবস্থা হয় মণিহারা ফণীর মতো। দিবারাত্র ভাসতে থাকেন চোখের জলে। আহার নিদ্রা ত্যাগ করে আকুল হয়ে ডাকতে থাকেন অনাথের নাথ মদনমোহনকে। **ঘটে এক অলৌকিক ঘটনা। গোকুল মিত্রের প্রতি মদনমোহনের স্বপ্নাদেশ হয়—'স্বীয় সেবাইত-পুরোহিত ব্যতীত অন্য কারো সেবা-পূজা আমি গ্রহণ করি না। তাদের অনুপস্থিতিতে আমি উপবাসী আছি। সত্বর নিয়ে এস তাদের।'**

টনক নড়ে গোকুল মিত্রের। মহারাজ চৈতন্য সিংহকে তুষ্ট করে মদনমোহনের সেবাইত পুরোহিতদের তিনি কোলকাতায় নিয়ে যান অনতিবিলম্বে। তাদেরই উত্তরপুরুষগণ বংশানুক্রমে মদনমোহনের সেবা পূজা করে আসছেন অদ্যাবধি।

মদনমোহন শ্রীবিগ্রহের বিষ্ণুপুর পরিত্যাগের ঘটনাটির মূল্যায়ন করতে গিয়ে ফকির-নারায়ণ কর্মকার তাঁর 'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী'তে লিখেছেন—"আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে বিচার করে দেখে বলতে গেলে বলতে বাধ্য হতে হয়, বিষ্ণুপুরের রাজা ও বিষ্ণুপুরবাসীদের যে ভক্তির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ভক্তি অন্তঃপ্রাণ মদনমোহন বীরভূমের বৃষভানুপুর হতে বিষ্ণুপুরে আসেন, দীর্ঘকাল ধরে সেখানে অবস্থান করে নিজের লীলা প্রকাশ করেন ; সেখানের রাজা প্রজা সকলকে ধন্য করেন, সেখানের ধূলিকণাকে তীর্থরেণুতে পরিণত করেন, সেই ভক্তির বন্ধন শিথিল হওয়ার জন্য আর এক ভক্তের আকর্ষণে তিনি কোলকাতায় চলে যান। **শেষ হয়ে যায় তাঁর বিষ্ণুপুর-লীলার।** এদিকে মদনমোহনকে ফিরে না পাওয়ার সর্বনাশা সংবাদ সমস্ত বিষ্ণুপুরে ছড়িয়ে পড়ে। সারা

বিষ্ণুপুর হাহাকারে ভরে যায়। **অশ্রুর তুফান বইতে থাকে সেখানে।**" (বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী, পৃঃ—১৩৮)

বাগবাজারে এসে ঠাকুর রইলেন বসে।
বিষ্ণুপুরের শ্রীমন্দিরে পাথর পড়ে খসে।।
রাজা কাঁদে, রাণী কাঁদে, কাঁদে প্রজাগণ।
পূজারী ব্রাহ্মণ কাঁদে হয়ে অচেতন।।
হাতীশালে হাতী কাঁদে, ঘোড়া না খায় পানি।
বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে যতেক রমণী।।
রাস হয় না, দোল হয় না, আসে না আর যাত্রী।
কত প্রেমের বেড়ী তোমা দিয়েছে গোকুল মিত্রি।।

বৃষভানুপুরের ব্রাহ্মণের অভিশাপ সত্য হয়েছিল অক্ষরে অক্ষরে। লীলাচঞ্চল মদনমোহন বিষ্ণুপুর-লীলা সাঙ্গ করে কোলকাতার বাগবাজারে মত্ত হয়ে উঠেন, নিত্যনতুন লীলাখেলায়। তাঁরই দু-একটি শোনাই জনৈক **নিবারণ দে** প্রণীত 'মদনমোহনের আদি মাহাত্ম্য' পুস্তিকা থেকে। পাঁচালীর ছন্দে তিনি লিখেছেন —

গোকুল মিত্রের কন্যা ছিল লক্ষ্মীপ্রিয়া নাম।
তাঁর প্রেমে বাঁধা আছেন স্বয়ং ভগবান।।
অঞ্চল বিছায়ে কন্যা করেছে শয়ন।
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি যায় মদনমোহন।।
উঠ কন্যা বলি তার অঙ্গ পরশিল।
পতিব্রতা কন্যা তখন উঠিয়া বসিল।।
কন্যা বলে কে গো তুমি না চিনি তোমায়।
আত্ম পরিচয় অগ্রে দাও গো আমায়।।
ঠাকুর বলে আমি যে হই শুনহ বচন।
চূড়া বাঁশী আমার বন্ধক রাখহ এখন।।
চূড়া বাঁশী রেখে ঠাকুর অন্তর্ধান হ'ল।
ছল করি শ্রীমন্দিরে শয়ন করিল।।
পূজার সময় দেখিলেন ব্রাহ্মণ ঠাকুর।
চূড়া বাঁশী চুরি করে নিল কোন চোর।।
মিত্রের সম্মুখে ব্রাহ্মণ সব জানাইল।
ঠাকুরের চূড়া বাঁশী কি হইল বল।।
তিরস্কার করে মিত্র যতেক ব্রাহ্মণে।
দৈববাণী ক'রে ক'ন মদনমোহনে।।
ব্রাহ্মণকে তিরস্কার কর মিত্র মিছে।
তোমার কন্যা চূড়া বাঁশী বন্ধক রেখেছে।।
মিত্র বলে লক্ষ্মী তুমি চূড়া বাঁশী দাও।
কতগুলি অর্থ পাবে আমার কাছে নাও।।
এই কথা শুনে লক্ষ্মী চূড়া বাঁশী দিল।

এত দিনে লক্ষ্মীপ্রিয়া শাপে মুক্ত হ'ল।।
বগড়ী গ্রামে যার নাম ছিল সত্যবতী।
বাগবাজারে তার নাম ছিল লক্ষ্মীসতী।।

লীলাময় মদনমোহনের এরূপ অজস্র কাহিনী প্রচলিত আছে বিষ্ণুপুরে। গল্প, কবিতা, পাঁচালী, ব্রতকথা, তুষু, ভাদু লোক সংগীত, এবং পল্লীগীতির মাধ্যমে মদনমোহনের লীলা-মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়ে আসছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। সময় সুযোগ মত সে সব কথাতে ফেরা যাবে আবার। এখন আসি আসল কথায়। **মনে প্রশ্ন জাগে, মদনমোহন তো রয়ে গেলেন বাগবাজারে। তাহলে আজ আমরা বিষ্ণুপুরে যে মদনমোহনকে দেখি, যে মদনমোহনের আরাধনা করি তিনি কোন মদনমোহন? তিনি কি আবার ফিরে এসেছিলেন বিষ্ণুপুরে?** প্রশ্নের উত্তরে শোনাই আর একটি জনশ্রুতি।

জনশ্রুতি বলে ১১৭৬ সালে মন্বন্তরের সময় দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। সর্বনাশা সেই দুর্ভিক্ষের দাপটে অনাহার ও মহামারীতে বাংলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শোনা যায় প্রজাবৎসল মহারাজ চৈতন্য সিংহ মল্লভূমের অনাহার-ক্লিষ্ট প্রজা সাধারণকে রক্ষা করার জন্য প্রাণাধিক প্রিয় মদনমোহনকে গোকুল মিত্রের কাছে বন্ধক রেখে আসেন এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার টাকায়। পরবর্তীকালে অর্থ সংগ্রহ করতে না পেরে মহারাণীর গজমোতি হার বিক্রী করে আসল টাকার উপর সুদ কষে তিন লক্ষ টাকা নিয়ে হাজির হন কোলকাতা নিবাসী গোকুল মিত্রের ভবনে। তারপর যা ঘটেছিল তাই শোনাই 'মদনমোহনের আদি মাহাত্ম্য' পুস্তিকা পাঠ করে —

"
....
শুন শুন গোকুল মিত্র আমার বচন।।
কোথায় রেখেছ বাঁকা মদনমোহন।
তিন লক্ষ টাকা নিয়ে দাও সেই ধন।।
গোকুল মিত্র ফেরেববাজ ফেরেবি করিল।
বন্ধক কোবালা রেখে বিক্রি কোবালা কৈল।।
মিত্র বলে ওগো রাজা কোবালা দেখ কি আছে।
মদনমোহন বন্ধক নয় বিক্রয় করে গেছে।।
এই কথা শুনে রাজা কাঁদিতে লাগিল।
পথিমধ্যে মদনমোহন দরশন দিল।।
শুন শুন ওগো রাজা বলি গো তোমারে।
আলিপুর কোর্টে দরখাস্ত দাও শীঘ্র করে।।
পাগড়ী বেঁধে উকিল বেশে কাছারীতে যায়।
মদন সরকার বলি উকিল নাম লেখায়।।
এই কথা শুনে রাজা কলিকাতায় এল।
আলিপুর কোর্টে একটি দরখাস্ত করিল।।
যে যেমন ভাবে তারে দেখায় তেমন।
উকিল বেশে যাচ্ছেন দেখ মদনমোহন।।
কাছারীর সম্মুখে প্রভু, ঘোড়া থামাইল।
জজ ম্যাজিস্ট্রেট আসি সবে উঠে দাঁড়াইল।।
জজ বলে ওহে উকিল কোথায় তব ঘর।

কার চাক্‌রী কর তুমি কার অনুচর।।
ঠাকুর বলে, ওহে জজ বলতে আমি পারি।
বিষ্ণুপুরে বাড়ী আমার রাজ-চাক্‌রী করি।।
নিজ হাতে একটি তখন দরখাস্ত যে দিল।
রাজার বিচারে তখন ডিগ্রি ক'রে নিল।।
কেঁদে কেঁদে গোকুল মিত্র ঘরে ফিরে এল।
কাঁদিতে কাঁদিতে মিত্র কুমারটুলি গেল।।
নকল ঠাকুর তখন একটি তৈয়ার করাইল।
সেই ঠাকুরটি লয়ে তখন রাজার হাতে দিল।।
নকল ঠাকুর নিয়ে রাজা গঙ্গা পার হ'ল।
শাল্‌কের ঘাটে ব্রাহ্মণবেশে দরশন দিল।।
শুন শুন মহারাজ বলি গো তোমায়।
নকল ঠাকুর লয়ে তুমি যাও গো কোথায়।।
এই কথা শুনে রাজা কাঁদিতে লাগিল।
এত কষ্ট আমার ভাগ্যে আজ লেখা ছিল।।
ঠাকুর বলে, মহারাজ ব'লে রাখি তবে।
বাম অঙ্গ যখন আমার ঘামিতে দেখিবে।।
শ্বেত মাছি রূপ ধরি বসিব নাকেতে।
সেই ঠাকুর তুলে তখন লইবে কোলেতে।।
এই কথা শুনে রাজা বাগবাজারে এল।
গোকুল মিত্র ব'লে তখন ডাকিতে লাগিল।।
শুন শুন গোকুল মিত্র বলি হে বচন।
নকল ঠাকুর দিয়া কেন ভুলাও আমার মন।।
এই কথা শুনে মিত্র কাঁদিতে লাগিল।
এতদিন পরে বুঝি বিধি বাম হ্‌ল।।
আসল নকল দু'টি ঠাকুর বাহির করিল।
যোড়হস্ত করি রাজা দাঁড়ায়ে রহিল।।
দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের অঙ্গ ঘেমে গেল।
শ্বেত মাছি রূপে তখন নাসিকায় বসিল।।
সেই ঠাকুরটি রাজা তখন কোলে তুলে নিল।
গোকুল মিত্র তাহা দেখি কাঁদিতে লাগিল।।
ঠাকুর বলে, শুন মিত্র বলি গো তোমারে।
পূজার সময় আমার দৃষ্টি থাকবে তোমার ঘরে।।
বৎসরান্তে তোমার বাড়ী 'অন্নকূট' হবে।
দ্বাদশদণ্ড তখন আমায় দেখিতে পাইবে।।
এই কথা বলে প্রভু অন্তর্ধান হ'ল।
বাল্যরাজা ঠাকুর লয়ে বিষ্ণুপুরে গেল।।

পূর্বোক্ত ৺নিবারণ চন্দ্র দে লিখিত উক্ত ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটা মানতেই হয় যে কলকাতার বাগবাজারে যে মদনমোহন জীউ পূজিত হচ্ছেন তিনিই কুমোরটুলির শিল্পীর নকল ঠাকুর এবং বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন আসল মদনমোহন। এসেছিলেন এবং পূজিত হচ্ছিলেন যথানিয়মে। **তারপর অত্যন্ত চঞ্চলমতি ঐ আসল মদনমোহন বিষ্ণুপুর ছেড়ে চলে গেলেন আজ থেকে প্রায় ৪০/৪১ বছর আগে।** কারণ বাংলা ১৩৬৯ সালে ২৯শে অগ্রহায়ণ শুধুমাত্র মদনমোহন জীউ-এর শ্রীবিগ্রহটি অপহৃত হয়।

মদনমোহন বিরহে কেঁদে ওঠেন বিষ্ণুপুরবাসীগণ। বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত হোলি গান রচয়িতা ৺অশ্বিনী মাস্টারের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

(ও) মল্লভূমের জীবনসখা, বিষ্ণুপুর-বিহারী বাঁকা, দলমর্দনধারী মদনমোহন।
তোমার বিহনে, কাঁদে গো, সতত প্রাণ-মন॥
(তুমি) মল্লবংশে কৃপা করিয়া মুরারী, আসিয়া বিষ্ণুপুরে।
লীলা প্রকাশিয়া, গিয়াছ চলিয়া, তুমি হে ব্রজপুরে।।
আমাদের বিষ্ণুপুর ছিল গুপ্তবৃন্দাবন, তব শ্রীচরণ বক্ষে করিয়া ধারণ।
লহ লহ বনমালী, মম গীতাঞ্জলি, ও চরণে করি নিবেদন।।
(তব) পরিখা-বিশিষ্ট সুরক্ষিত গড়ে, লক্ষ কামান গর্জন না ছাড়ে,
তব দুর্গতোরণে পতাকা না উড়ে, উজলি আকাশ-মাঝে
তব বর্গীদমনকারী দলমর্দন, পড়িয়া রয়েছে হয়ে অচেতন।
যেথা সারারাতি, নগরীতে বাতি, জ্বালাইত তৈল সাড়ে সাত মন।।

শ্যামকুণ্ড, রাধাকুণ্ড নেহারী, আজিও নয়ন ভরে;
কুঞ্জ-কানন গিরিগোবর্ধন, যমুনা কালিন্দী নীরে।
রয়েছে লিখা, অমর অক্ষরে রয়েছে লিখা,
সে সব নিরখি, অশ্রুসিক্ত আঁখি, চাহিতেছে তব দরশন।।

প্রাতে ও সন্ধ্যায়, তব শ্রীমন্দিরে হায়, খোল-করতাল কেহ না বাজায়,
শাখে নাহি পাখি পরান মাতায়, গাহি তব গুণগান।
(আজ) বনের বানর আজ নৃত্য করে, তব শ্রীরাসমঞ্চরে,
গোপাল সিংহের ব্যাগার, শুধে না কেহ আর, বিষ্ণুপুরের জনগণ॥

তব গুণগানে হ'ত মুখরিত, দিগ্‌দিগন্ত হইয়া ধ্বনিত।
প্রেমানন্দে সবে পুলকে ভাসিত, ভাসিত সুখ-সায়রে,
জ্বালা দূরে যেত গো,
তব মঙ্গলময় নামের গুণে, মনের আঁধার দূরে যেত গো।
তুমি বারেক ফিরিয়া, করুণা করিয়া, বিষ্ণুপুরে কর আগমন॥

ভক্ত-কণ্ঠের আর্তি, কাকুতি-মিনতিতে কাজ হয় না। মদনমোহন আর আগমন করেন নি বিষ্ণুপুরে। ব্রাহ্মণের অভিশাপ সত্য হয় অক্ষরে অক্ষরে। সুতরাং ঐ অবস্থায় শালগ্রাম শিলা সহ শ্রীরাধার পূজা হয়েছে দীর্ঘদিন। এদিকে অনেক অনুসন্ধানের পরও যখন মদনমোহন বিগ্রহের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না তখন বিষ্ণুপুর মল্লেশ্বর মহল্লা নিবাসী

প্রখ্যাত চলচ্চিত্র শিল্পী ঁরাধামোহন ভট্টাচার্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা **মনোমোহন ভট্টাচার্য** মহাশয়ের উৎসাহ উদ্দীপনায় জন-সাধারণের অর্থানুকূল্যে এবং সার্বিক সহযোগিতায় রাজস্থানের জয়পুর থেকে আনানো হয় অষ্টধাতুর মদনমোহন বিগ্রহ। উক্ত শ্রীবিগ্রহটিকে বিরহিণী রাধার পাশে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে ১৩৭২ সালের ২৯ শে আষাঢ় পুণর্যাত্রার পুণ্যলগনে প্রতিষ্ঠা করা হয় মহাসমারোহে। কিন্তু চার পাঁচ মাস যেতে না যেতেই ঐ বছরেই অর্থাৎ বাংলা ১৩৭২ সালের ২৯ শে অগ্রহায়ণ শ্রীরাধার শ্রীমূর্তিটিও অপহৃত হয় রাতের আঁধারে। রাধিকা নিখোঁজ হওয়ার পর শাঁখারীবাজার নিবাসী ঁ**কন্দর্পনাথ দে (দেবভূতি)** মহাশয়ের আর্থিক অনুদানে বিষ্ণুপুর কর্মকার সমিতির তত্ত্বাবধানে, শাঁখারীবাজার নিবাসী শিল্পী **সুদর্শন ফৌজদারের** শিল্প ভাবনায় নির্মিত হয় অষ্টধাতুর রাধারাণী এবং সদ্যঃপ্রতিষ্ঠিত মদনমোহন জীউ-এর পাশে বাংলা ১৩৭৩ সালের ১৮ই আষাঢ় প্রতিষ্ঠিতা হন নব-নির্মিতা রাধারাণী। **সেই থেকে উক্ত বিগ্রহ দ্বয়ই যুগলমূর্তিতে আসল মদনমোহনের স্থলাভিষিক্ত হয়ে পূজিত হয়ে আসছেন অদ্যাবধি।**

ঐতিহাসিক যুগে মদনমোহন ছিলেন রাজার ঠাকুর। এখন তিনি সর্বসাধারণের তথা আমজনতার আদরের ঠাকুর। আবার বিষ্ণুপুরের বাইশ পাড়ার ঠাকুর রূপে তিনি বিশেষভাবে স্বীকৃত। এই বাইশটি পাড়া হল যথাক্রমে ১। মদনমোহনগঞ্জ, ২। শাঁখারীবাজার, ৩। মনসাতলা, ৪। জেলেপাড়া, ৫। দীঘির পাড়, ৬। গোস্বামী পাড়া, ৭। যাদব পল্লী, ৮। বিদ্যাসাগর মহাপাত্র পাড়া, ৯। পোদ্দার পাড়া, ১০। মাড়ুইবাজার, ১১। হাজরাপাড়া, ১২। বৈদ্যপাড়া (কবিরাজপাড়া), ১৩। শ্যামরায়ের বাজার, ১৪। সঙ্কটতলা, ১৫। কুন্দকুন্দার বাজার, ১৬। খড়বাংলা, ১৭। নিমতলা, ১৮। কাটানধার, ১৯। দুয়ারীপাড়া, ২০। মল্লেশ্বর ও কাদাকুলি, ২১। বিশ্বাস পাড়া—মহাপাত্রপাড়া, ২২। রাসতলা।

উক্ত বাইশপাড়ার প্রতিনিধিবর্গদের নিয়ে একটি শক্তিশালী কমিটি, যা **'মদনমোহন উৎসব কমিটি'** (বাইশ পাড়া যোলআনা) আখ্যায় ভূষিত হয়ে মদনমোহন দেবের নিত্যসেবা-পূজা থেকে শুরু করে রাস, ঝুলন, দোলযাত্রা, চব্বিশ প্রহর প্রভৃতি যাবতীয় উৎসবাদি পরিচালনা করে থাকেন সেবাকার্যের মানসিকতা নিয়ে।

আধ্যাত্মিকতার দেশ, ঈশ্বর-উপাসনার দেশ ভারতের তথাকথিত ভারত সরকার দেবোত্তর, পীরোত্তর সম্পতি বাজেয়াপ্ত করে দেবতার মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল পার্লামেন্টের মসনদে বসে; তার ফলে ভারতের অনেক দেব-দেবীর, অনেক পীরসাহেবের নিত্যসেবা পর্যন্ত বন্ধ হয়েছে চিরতরে। অনেক মন্দির, মসজিদ উপেক্ষিত হয়ে পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের 'আর্কিয়লজিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া' নামধেয় বিভাগটি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা শিল্প-সৌকুমার্যে সমৃদ্ধ মন্দির, মসজিদ তথা প্রাচীন সৌধগুলিকে প্রত্নতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে সংরক্ষণের সুব্যবস্থা করে দূরদৃষ্টি ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছে, তথাপি বলতে দ্বিধা নেই দেব-দেবী, পীর, পয়গম্বর হয়েছেন উপেক্ষিত। **বিষ্ণুপুরের দেব-দেবীদের মধ্যে অনেকের ভাগ্যেও জুটেছে সেই উপেক্ষা।**

দেব-দেবীদের সেই উপেক্ষার গ্লানি, উপবাসের কলঙ্কের কালি মুছে দিতে অনেক ক্ষেত্রেই এগিয়ে এসেছেন ঈশ্বর-বিশ্বাসী স্থানীয় জনগণ—যেমন এসেছেন মদনমোহনের ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরবাসীগণ। মদনমোহন জীউ-এর নিত্যসেবা প্রকল্পটিতে (১৪০৬ বঙ্গাব্দ)

সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন মদনমোহন অধ্যুষিত শুধুমাত্র বাইশ পাড়ার অধিবাসীগণই নন, সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন বিষ্ণুপুরের সমস্ত প্রান্তের মানুষ।

একবার মাত্র ৪০১ টাকা জমা দিয়ে বংশ পরম্পরায় উত্তরাধিকারী সূত্রে বছরের একটি নির্ধারিত দিনে স্বীয় নাম-গোত্রে সংকল্প করিয়ে ঠাকুরকে অন্নভোগ নিবেদন করার এবং ঠাকুরের প্রসাদ পাওয়ার মাধ্যমে যে সৌভাগ্যের সূচনা করা হয়েছে উক্ত বুদ্ধিদীপ্ত প্রকল্পে তা সত্যই প্রশংসনীয়। এছাড়া এককালীন মাত্র ৩০১ টাকা জমা দিয়ে উত্তরাধিকারী সূত্রে বৎসরের একটি পুণ্যদিনে ফি-বছর একটি করে রাজভোগ প্রদানের পরিকল্পনাটির পাশাপাশি উন্নয়নমূলক অন্যান্য পরিকল্পনাগুলিও অভিনন্দনযোগ্য।

বিষ্ণুপুরের নগর-দেবতা রূপে আখ্যায়িত শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ-এর কথা-কাহিনী শোনালাম সংক্ষেপে। এবার শ্রীশ্রীরাধামদনমোহন যুগল বিগ্রহের শ্রীচরণে প্রণাম জানাই সশ্রদ্ধচিত্তে,—

বন্দে মদনগোপালং কৈশোরাকারমদ্‌ভুতম্।
যমাহুর্যৌবনোদ্ভিন্নে শ্রীমন্মদনমোহনম্॥

এখন কাঁটায় কাঁটায় বেলা ৩টা ৩০ মিনিট। আধঘণ্টা বিশ্রাম ও চা-পানের বিরতি। বিরতির পর থাকছে বিষ্ণুপুরের রাজকাহিনী।

অধ্যায়-৪৮

রাজকাহিনী—১৬

মাধব সিংহদেব (১৮০১-১৮০৯ খৃঃ), গোপাল সিংহদেব (২য়) (১৮০৯-১৮৭৬ খৃঃ), রামকৃষ্ণ সিংহদেব (১৮৭৬-১৮৮৯ খৃঃ) ও নীলমণি সিংহদেব (১৮৮৯-১৯০৩ খৃঃ)

ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম ভাগের কথা। বাংলার বুকে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী। গ্রাম্য জমিদার থেকে শুরু করে রাজা-প্রজা নবাব বাদশা পর্যন্ত অর্থলোলুপ এবং অত্যাচারী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দাপটে তটস্থ। স্বাধীনচেতা বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের অবস্থা হয়েছে জীবন্মৃত। রাজা আছে রাজত্ব নেই, সিংহাসন আছে নেই শাসন-ক্ষমতা। 'নামকা ওয়াস্তে রাজা' বলতে যা বোঝায়, বিষ্ণুপুরের রাজাদের ঠিক সেই অবস্থাই হয়েছিল কোম্পানীর আমলে। বরং বলা চলে আরো সঙ্গীন অবস্থা হয়েছিল তাঁদের। নামে রাজা হলেও আসলে কিন্তু তাঁরা হয়েছিলেন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৃত্তিভোগী ব্যক্তি বা কর্মচারী। হীনমন্যতায় ভুগতে থাকেন বিষ্ণুপুরের ৫৭তম রাজা মাধব সিংহ। পিতামহ চৈতন্য সিংহ বা প্রপিতামহ গোপাল সিংহের মতো নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন না তিনি। ক্ষাত্রশক্তিতে পুষ্ট তাঁর দেহ, রক্তে বিদ্রোহের বন্যা এবং বহ্নি।

দ্বিতীয় শাহ আলম্ ও দ্বিতীয় আকবর শাহের সমসাময়িক কালের রাজা **মাধব সিংহ** ১৮০১ খৃষ্টাব্দে তাঁর পিতামহের জীবিতাবস্থাতেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু তাঁর এই সিংহাসন লাভের স্মৃতি সুখের স্মৃতি নয়, আনন্দের স্মৃতি নয়; বরং বলা চলে ব্যথাতুর বেদনার স্মৃতি। প্রজাপ্রেমিক রাজা ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অগ্নিগর্ভ ক্ষুধা মেটানোর জন্য নির্লজ্জের মতো প্রজা সাধারণের উপর চাপিয়ে দিতে পারেন না

করভারের বোঝা। "দেশের দুরবস্থার জন্য প্রজার কাছ থেকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণ রাজস্ব আদায় না হয়ে কোম্পানীর রাজস্ব বাকী পড়ার জন্য বর্দ্ধমান আদালতে চৈতন্য সিংহের নামে ডিগ্রির টাকা ও তার পরবর্তী কালের বাকী ১৮৭৯১৬ টাকার জন্য অবশিষ্ট জমিদারী ঘাটোয়ালী মহল ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর নীলামে বিক্রয় হয়। আর ২১৫০০০ টাকায় বর্দ্ধমানের মহারাজা তা খরিদ করেন। **সেই থেকে শেষ সম্বলটুকুও নষ্ট হয়ে বিষ্ণুপুর রাজপরিবার সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে পড়েন। তাই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিঃস্ব রাজা মাধব সিংহকে মাসিক ৪০০ টাকা ও অন্যান্য রাজপরিবারের জন্য ৪৯৭ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেন।**"[১]

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দয়ার দান গ্রহণ করে জীবনধারণ করা দুর্বিষহ হয়ে উঠল স্বাধীনচেতা রাজা মাধব সিংহের। কোম্পানীকে ভারতের মাটি থেকে উচ্ছেদ করার স্বপ্নে বিভোর তিনি, কিন্তু সেই স্বপ্নকে সত্য করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং সামর্থ্য নেই তাঁর। নেই লোকবল কিংবা সৈন্যবল। অনেক চিন্তা ভাবনা করে তিনি কিছু সৈন্য সামন্ত এবং লোকজন নিয়ে রাতের গভীরে বাঁকুড়ার সদর ট্রেজারী অফিসে অতর্কিতে আক্রমণ হানেন এবং অসহায় অবস্থায় কোম্পানীর হাতে বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় কোলকাতার জেলে স্থানান্তরিত হন এবং ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে তিনি কোলকাতার জেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। **তাঁর সমস্ত উচ্চাশা নিভে যায় নিমেষে। মল্লরাজাদের ক্ষাত্রশক্তির শেষ প্রদীপটিও যেন দপ্ করে জ্বলে উঠেই নিভে যায় হঠাৎ।**

পিতা মাধব সিংহের অকালমৃত্যুর ফলে একান্ত অবোধ শিশু **গোপাল সিংহ (২য়)** বিষ্ণুপুরের রাজপদে অভিষিক্ত হন। **দ্বিতীয় আকবর শাহ্** এবং **দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের** সমসাময়িক রাজা দ্বিতীয় গোপাল সিংহ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৃত্তিভোগী ব্যক্তি হয়ে রাজত্ব করেন প্রায় ৬৭ বছর। **রাজা গোপাল সিংহকে আমরা মনে রাখব দুটি কারণে। প্রথমটি হল রাজত্বভোগের সময়-সীমার দিক থেকে ইনি রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। দ্বিতীয়টি হল তাঁর এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালে তাঁকে মনে রাখার জন্য তিনি কিছুই করেননি বলেই আমরা তাঁকে আরো বেশী করে মনে রাখব নিষ্কর্মা রাজা হিসেবে।** মহারাজ গোপাল সিংহের দুই পুত্র। **রামকৃষ্ণ সিংহ** এবং **রামকিশোর সিংহ**। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকৃষ্ণ সিংহকে ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে রাজতিলক পরিয়ে দিয়ে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে গোপাল সিংহের লোকান্তর হয়। আর তদীয় কনিষ্ঠপুত্র **'হিকিম সাহেব'** নামে খ্যাতি অর্জন করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে গোপাল সিংহর প্রাপ্য বৃত্তি দু-ভায়েই উপভোগ করতেন সমানভাবে। রাজা রামকৃষ্ণ সিংহ দেবের রাজত্বকাল একটি বিশেষ কারণে স্মরণীয়— **সেটি হল ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৯ শে আগস্ট যুগাবতার পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের বিষ্ণুপুরের মাটিতে পুণ্য পদার্পণ।** সেদিক থেকে রাজা রামকৃষ্ণ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ কৃপাধন্য, এতদর্থে ভাগ্যবান। **চন্দ্রকুমারী** নামে একটি কন্যাসন্তান ছিল রাজার, ছিল না কোন পুত্রসন্তান। সর্বজনপ্রিয় হিকিমসাহেব রামকিশোর সিংহের **মদনমোহন সিংহ** নামে একটি পুত্র ছিল। আশা করা হয়েছিল যে অপুত্রক রামকৃষ্ণ সিংহের অবর্তমানে ভ্রাতুষ্পুত্র মদনমোহন সিংহ বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসন অলংকৃত করবেন। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস—বর্দ্ধমানের মহারাজার রাজ্যাভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে গিয়ে ফেরার পথে পানাগড়ে বিসূচিকা রোগগ্রস্ত হয়ে অকস্মাৎ নিভে যায় তাঁর জীবনদীপ। পুত্রশোকে

১। বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী, পৃঃ—১৪২

মর্মাহত হয়ে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মারা যান রামকিশোর সিংহ এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে মারা যান রাজা রামকৃষ্ণ সিংহ। এমতাবস্থায় মহারাণী **ধ্বজামণি দেবী** রাজকর্মচারী **নীলমাধব সেনগুপ্ত** ও **সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায়ের** সহযোগিতায় রাজ্য পরিচালনা করেন প্রায় বছর তিনেক। অতঃপর ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে কুচিয়াকোল গ্রাম নিবাসী **নীলমণি সিংহকে** সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হয়। নীলমণি সিংহ ছিলেন মহারাজ চৈতন্য সিংহের দ্বিতীয় পুত্র নিমাই সিংহের বংশধর। বিষ্ণুপুরের রাজবংশের সন্তানের সূত্র ধরেই তিনি সিংহাসন লাভ করেন।

"কথিত আছে কুখ্যাত **গোলোক বক্সী** ও **আনন্দ বক্সী** নামে দুই ব্যক্তি বিরুদ্ধ পক্ষের উৎকোচ নিয়ে ঘোড়া খরিদ করবার লোভ দেখিয়ে তাঁকে হরিহরছত্রের মেলায় নিয়ে যায়। **আর সেই সুযোগে পোকাবাঁধ, কৃষ্ণবাঁধ প্রভৃতি বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের সাতদফা মূল্যবান সম্পত্তি বিনা বাধায় বৰ্দ্ধমানের মহারাজা নীলামে খরিদ করে নেন।** পরে প্রকাণ্ড এক সাদা ঘোড়া, আর বাজবৌরী নামে এক পাখী নিয়ে নীলমণি সিংহ যখন হরিহরছত্র থেকে ফিরে আসেন, তখন আর কোন উপায় থাকে না।"[১] **কারণ বিশ্বাসঘাতক সনাতন বন্দ্যোপাধ্যায় বিরুদ্ধপক্ষের উৎকোচ নিয়ে মোকদ্দমা করার উপযোগী কাগজ পত্র নষ্ট করে দেয়।** অপরিণামদর্শী রাজা নীলমণি সিংহের ক্ষাত্রশক্তির স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় বিশেষ একটি ঘটনায়। তোপধ্বনির মাধ্যমে দুর্গোৎসবে মহাষ্টমীর সন্ধিক্ষণের পূজা উদযাপন করার রীতি বিষ্ণুপুরে প্রচলিত। কিন্তু তৎকালীন মহাকুমা শাসক এই তোপধ্বনির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। মহারাজ নীলমণি সিংহ সেই আদেশ অগ্রাহ্য করে তোপধ্বনি সহযোগে মহাষ্টমীর পূজা অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করেন পুলিশি বাধা সত্ত্বেও। ভারতীয় দণ্ডবিধির আইন মোতাবেক রাজা নীলমণি সিংহকে অভিযুক্ত করা হয় বৃটিশ আদালতে। বিচারান্তে জয় হয় রাজা নীলমণি সিংহের। তোপধ্বনির ছাড়পত্র মেলে পাকাপাকিভাবে। এসব ছোটখাটো ঘটনার মাধ্যমে বইতে থাকে তাঁর জীবন প্রবাহ। অতঃপর রোগগ্রস্ত অবস্থায় ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে কোলকাতার পটলডাঙ্গা হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তিনি রেখে যান মাত্র বছর চার বয়সের একটি অবোধ শিশুপুত্র। নাম তার **রামচন্দ্র**। শৈশব থেকে কৈশোরে উত্তীর্ণ হন রামচন্দ্র। শোনা যায় বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের ছাত্র কান্তিমান কিশোর রামচন্দ্র ছিলেন অত্যন্ত শ্রীদর্শন এবং শক্তিমান। প্রায় পাঁচ-ছ মন ওজনের একখানা ভাঙ্গা কামানকে তার দিয়ে বেঁধে দাঁতে করে তুলে দিতেন অক্লেশে। আবার পাকা বেউড় বাঁশের লাঠিকে শুধুমাত্র কব্জির জোরে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে দিতেন অনায়াসে। অসীম শক্তি, অপরূপ দেহকান্তি এবং রাজোচিত লক্ষ্মণ যুক্ত যুবরাজ রামচন্দ্রের কাছে বিষ্ণুপুরবাসীর প্রত্যাশা ছিল অনেক।

অনেকের আশা ছিল পিতার মৃত্যুর ফলে বিষ্ণুপুরের শূন্য সিংহাসনে পূর্ণমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন যুবরাজ রামচন্দ্র। কিন্তু ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১৯ বছর বয়সে তাঁর আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ঝড় বইল রাজঅন্তঃপুরে, শোকসাগরে নিমজ্জিত হল বিষ্ণুপুরবাসী। শূন্য রাজসিংহাসন রয়ে যায় শূন্য। মহারাণী **চূড়ামণি দেবী** পুত্রশোকে হয়ে পড়েন উন্মাদিনীবৎ। জীবনযাপন করেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। অবস্থান করেন অজ্ঞাতবাসে। কিন্তু একটি অপ্রিয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লোকচক্ষুর অন্তরালে অধিষ্ঠিত থেকেও তিনি স্বীয় মহিমায় উদ্ভাসিত হন সাক্ষাৎ মাতৃমূর্তি রূপে।

ঘটনাটির বর্ণনার পূর্বে বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের প্রকৃত অবস্থার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি

১। বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী, পৃঃ—১৪৮

আকর্ষণ করি সর্বাগ্রে। "মহারাজ রামকৃষ্ণ সিংহের দ্বিতীয়া পত্নী **প্রসন্নময়ী দেবী** বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে মাসিক ৫০ টাকা করে মাসোহারা পেতেন। কিন্তু রাজা নীলমণি সিংহ বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে কিছুই পেতেন না। তিনি মারা যাওয়ার পর তাঁর পত্নী মহারাণী **চূড়ামণি দেবী** ও পুত্র **যুবরাজ রামচন্দ্র সিংহদেব** মাসিক ২৫ টাকা করে মাসোহারা পেতেন।" বিষ্ণুপুরের রাজপরিবার বর্গের যখন এই দুরবস্থা, বৃটিশ সরকারের চোখে যখন তাঁরা মাসিক মাত্র ২৫ টাকা মাসোহারা-ভোগী তুচ্ছ ব্যক্তিতে পর্যবসিত এবং ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনযন্ত্রের জাঁতাকলে যখন তাঁরা নিষ্পেষিত হচ্ছেন তিলে তিলে, পলে পলে, তখনও কিন্তু বিষ্ণুপুরবাসীদের কাছে বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়নি বিন্দুমাত্র, রাজত্ব না থাকলেও রাজপ্রভাব ছিল অলক্ষ্যে বিরাজিত। 'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী' গ্রন্থে লিখিত একটি ঘটনার মধ্যে সেই সত্যই যেন অনুরণিত।

ঘটনাটির বর্ণনা দিতে গিয়ে গ্রন্থকার লিখেছেন, "সেই বৎসর ইন্দ্রদ্বাদশী তিথির ইন্দ্রপূজা ও মুসলমানদের মহরম পর্ব্ব একই দিনে অনুষ্ঠিত হয়।

ইন্দ্রদ্বাদশী তিথির ইন্দ্রপূজা বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের এক বিশিষ্ট উৎসব। সেদিন সেই উৎসব উপলক্ষ্যে বহুদূর হতে সাঁওতাল হিন্দু নরনারী বিষ্ণুপুরে সমবেত হয়। তার ওপর সেই একই দিনে মুসলমানদের মহরম পর্ব্বও ছিল। তাই সেদিন বিষ্ণুপুরে জনসমাগম হয়েছিল অপরিমিত। বিষ্ণুপুরের পথঘাট সেদিন উৎসবমত্ত জনতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেই অবস্থায় রাজদরবার থেকে রাজপুরোহিত **অমূল্য মহাপাত্র** ও বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের কুলদেবতা **ঁঅনন্তদেব**, যেখানে ইন্দপর্ব্ব হয় সেই ইন্দতলায় যাবার সময় মহরম পর্ব্বের উৎসবমত্ত জনতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হন। মুসলমানদের লাঠির আঘাতে ঁঅনন্তদেবের ছাতা ভেঙ্গে যায়, আর রাজপুরোহিতের ওপরও লাঠির আঘাত পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে রাজদরবারে সংবাদ দেওয়া হয়, আর সমস্ত বিষ্ণুপুরেও বিদ্যুৎ গতিতে সেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। উত্তেজিত সাঁওতাল ও হিন্দু জনতা রাজ-দরবারের আদেশের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকে। কিন্তু সেখান থেকে আদেশ আসে বিপরীত। মহারাণী চূড়ামণি দেবীর নাম দিয়ে সকলকে অনুরোধ করা হয়, কোন প্রকার উচ্ছৃঙ্খল আচরণ না করে শান্তভাবে ঘরে ফিরে যাবার জন্য। অগত্যা মনের ক্রোধ মনে চেপে সকলে ঘরে ফিরে যায়। কিন্তু সেদিনের সেই তিক্ত স্মৃতি কারও মন হতে মুছে যায় না। **সমস্ত বিষ্ণুপুরের বুকে থাকে এক তীব্র অসন্তোষ।** তাই মহারাণী চূড়ামণিদেবী তাঁর অজ্ঞাতবাস হতে ফিরে আসেন এবং দিনস্থির করে সমস্ত প্রজাদের আহ্বান করেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে রাজদরবারে গিয়ে সকলে হাজির হয়। বিরাট জনতা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে থাকে মহারাণীর আদেশ শোনবার জন্য। অনেকের মনে অনেক বিরূপ কল্পনারও উদয় হয়। কিন্তু তার কিছুই হয় না। যথা সময়ে মহারাণী চূড়ামণিদেবী যবনিকার অন্তরাল হতে প্রজাদের সম্বোধন করে বলেন, **'বাবা, হিন্দু-মুসলমান জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে মল্লভূমের সব প্রজাই বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের কাছে সন্তানরূপে প্রতিপালিত হয়ে আসছে। কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষের ওপর বিষ্ণুপুর রাজদরবারের কোন পক্ষপাতিত্ব নেই। তাই সেই সম্পর্কে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই তোমরা পরস্পরের কাছে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু মায়ের সব সন্তান, বা ভাইয়ের সব ভাই সমান হয় না। কেউ থাকে শিষ্ট, কেউ থাকে দুষ্ট ; কেউ থাকে জ্ঞানী, কেউ থাকে অজ্ঞ। সেই মত আমার মুসলমান সন্তানেরা ভুল বশতঃ যে অন্যায় সেদিন করেছে, তার জন্য তোমাদের উত্তেজিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তাই বলে সেই উত্তেজনা বশতঃ**

তোমরাও যদি তাদের মত ভুল কর, তাহলে তোমরাও সেই অন্যায়কারী বলেই গণ্য হবে। আর বিদ্বেষ বেড়ে সকলেরই জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠবে। তাই আমি তা করতে নিষেধ করছি। **আমার মুসলমান সন্তানদের সেদিনের সেই ভুলের জন্য মা আমি তাদের হয়ে তোমাদের কাছে ক্ষমা চাইছি। আমার অনুরোধ, সেদিনের সেই দুর্ব্যবহারের কথা ভুলে গিয়ে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায় যে ভালবাসা নিয়ে এতদিন মল্লভূমের বুকে বাস করে আসছ, আজও তার ব্যতিক্রম কর না।** আর আমার মুসলমান সন্তানদের প্রতি আমার অনুরোধ, তারা যেন আর কোন দিনের জন্য ভাই হয়ে ভাইয়ের মনে আঘাত দেবার মত কাজ না করে। ফল হয় তাতে আশাতীত! অসন্তোষের কালো ছায়া সকলের মন হতে মুছে যায়। মহিমাময়ী মহারাণীমায়ের জয়গান করতে করতে সকলে ঘরে ফিরে যায়।"

তাহলে দেখুন রাজ-রাজত্বহীন, মাসিক ২৫ টাকা বৃত্তিভোগী অন্তঃপুরচারিণী এক রাণীর প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং ব্যক্তিত্বপূর্ণ মাধুর্যে যদি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার মতো বড় সমস্যার সমাধান হয় নিমেষে, হয় মুখের কথায় ; তাহলে এঁরা যখন পূর্ণমর্যাদায় সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন তখন এঁদের অসাধ্য কি ছিল সেটাই ভাববার কথা।

অধ্যায়-৪৯

শ্রীশ্রীষড়ভুজ জীউ

কাদাকুলি

মল্লরাজবংশের ভয়াবহ পরিণতির কথা পর্যালোচনা করতে করতে আমরা এখন পদার্পণ করেছি মদনমোহন মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত বিষ্ণুপুর শহরের একেবারে উত্তরপ্রান্তের কাদাকুলি মহল্লায়। বলা চলে পল্লীটি বিষ্ণুপুর শহরের সব থেকে নীচু জায়গা রূপে চিহ্নিত। তৎকালে জল নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় এবং কাঁচা রাস্তার দরুণ অল্প একটু বৃষ্টিপাতেই রাস্তা-ঘাট এবং স্থানীয় অধিবাসীদের গৃহাঙ্গন হয়ে যেত কর্দমাক্ত। বছরের প্রায় সময়ই কাদায় কাদায় কর্দমাক্ত হয়ে থাকত শহরের এই বিশেষ স্থানটি। আঞ্চলিক ভাষাতে গরুর গাড়ি বা ঘোড়ার গাড়ি যাতায়াতের লিগ বিশিষ্ট স্বাভাবিক সরু পথকে 'কুলি' বলে। এজন্যই বোধ করি আঁকাবাঁকা সংকীর্ণ পথ বিশিষ্ট শহরের এই প্রত্যন্ত এলাকার নাম রাখা হয়েছিল 'কাদাকুলি'। অনুরূপভাবে বিষ্ণুপুর শহরের পশ্চিম প্রান্তে কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লার 'রুদ্র' উপাধিধারী অধিবাসীদের বসবাসের এলাকা সংলগ্ন রাস্তাটির নাম 'রুদ্রকুলি'। অপভ্রংশে হয়েছে 'রুদ্‌কুলি'। এখন বলা হয় রুদ্রগলি।

কাদাকুলি মহল্লাতে একটি ভগ্নপ্রায় শ্রীমন্দিরে অধিষ্ঠিত রয়েছেন শ্রীশ্রীষড়ভুজ জীউ-এর এক জোড়া শ্রীবিগ্রহ। এবার প্রসঙ্গ ষড়ভুজ শ্রীবিগ্রহের তত্ত্বকথা। ষড়ভুজ শব্দের অর্থ 'ছয়হস্তযুক্ত'। হিন্দুদের দেব-দেবীদের মধ্যে কোন কোন দেব-দেবীর দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ, অষ্টভুজ ও দশভুজ মূর্তি পরিলক্ষিত হয়। এগুলি কোনো মনগড়া বা কাল্পনিক রূপ নয়। বিশেষ বিশেষ অবস্থায় এবং পরিস্থিতিতে দেব-দেবীগণ বিভিন্নরূপ ধারণ করেন। যেমন মহিষাসুরকে বধ করার জন্য দ্বিভুজা দুর্গা 'দশভুজা' রূপ পরিগ্রহ করেছিলেন।

অষ্টাদশ পুরাণের মার্কণ্ডেয় পুরাণে এ ধরনের রূপ পরিগ্রহের বিস্তারিত বিবরণ আছে। এবার বলি ষড়ভুজের কথা। ষড়ভুজ কোনো পৌরাণিক দেবতা নন। গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মাঝে মধ্যে তাঁর ভক্তদের সন্দেহ নিরসনের জন্য, ক্ষেত্রবিশেষে ভক্তদের ভক্তি-বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করার অভিপ্রায়ে এবং নিজের অবতারত্বকে প্রকটিত করার অভিমানসে স্বীয় দিব্যরূপ প্রকাশ করতেন। অনুরূপ একটি ঘটনাক্রমে তিনি ষড়ভুজ রূপ ধারণ করেন। তাই **ষড়ভুজরূপটি হল শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ছয় হাত বিশিষ্ট দিব্যরূপ। উক্ত ষড়ভুজ দেবের উপরের দু'হাতে শ্রীরামচন্দ্রের ধনুর্বাণ, মাঝের দু'হাতে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী এবং নীচের দু'হাতে শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দণ্ড ও কমণ্ডলু বিদ্যমান। অর্থাৎ একই অঙ্গে রাম, কৃষ্ণ এবং চৈতন্যমহাপ্রভুর সন্ন্যাসরূপের সহাবস্থান। তত্ত্বকথা হল ত্রেতা যুগে যিনি শ্রীরামচন্দ্র, দ্বাপরে তিনি শ্রীকৃষ্ণ এবং কলিতে তিনিই হয়েছেন গৌর-সন্ন্যাসী।** আবার তদীয় অনুচর নিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীচৈতন্যদেব কৃপাপরবশ হয়ে ষড়ভুজ রূপে দর্শন দেন।

প্রথমে ষড়ভুজ তাঁরে দেখাইল ঈশ্বর।
শঙ্খচক্রগদাপদ্ম—শার্ঙ্গবেণুধর।। (চৈঃ চঃ ১/১৭/১৩)

অর্থাৎ—একদিন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ধনুক এবং মুরলীধারী রূপে তাঁর ষড়ভুজ রূপ প্রদর্শন করান।

অন্যত্র দেখি পণ্ডিতপ্রবর সার্বভৌম ভট্টাচার্যের পাণ্ডিত্যের দর্প চূর্ণ করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁকেও ষড়ভুজ রূপে দর্শন দেন। চৈতন্যভাগবত গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ আছে —

শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হুঙ্কার।
আত্মভাবে হইলা ষড়ভুজ অবতার।।

আরও উল্লেখ আছে —

অপূর্ব ষড়ভুজমূর্ত্তি — কোটি সূর্য্যময়।
দেখি মূর্ছা গেল সার্বভৌম মহাশয়।।

* * *

পৌরাণিক দেবতা না হলেও শ্রীশ্রীষড়ভুজ জীউ কলিযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ উপাস্য দেবতারূপে চিহ্নিত। কারণ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর ষড়ভুজ রূপের মধ্যে সত্যযুগের নারায়ণ, ত্রেতার রামচন্দ্র, দ্বাপরের শ্রীকৃষ্ণ এবং কলিতে সন্ন্যাসরূপে শ্রীহস্তে দণ্ড কমণ্ডলু শোভিত গৌরাঙ্গ অবতার; অর্থাৎ চারযুগের চার অবতারের সুষ্ঠু সমন্বয় প্রতিভাত হয়। তার মানে ষড়ভুজ বিগ্রহের উপাসনার মাধ্যমে চারযুগের চার অবতারের আরাধনা করা হয়। সংক্ষেপে এটিই হ'ল ষড়ভুজ তত্ত্ব।

ষড়ভুজ বিগ্রহের তত্ত্বকথা শুনতে শুনতে আপনারা এখন এসে গেছেন ষড়ভুজ মন্দিরের শ্রীঅঙ্গনে। সামনে তাকান, দেখুন আমাদের নয়ন যুগলে উদ্ভাসিত শ্রীশ্রীষড়ভুজ বিগ্রহদ্বয়। ষড়ভুজ ঠাকুরের যুগল মূর্তিই বিষ্ণুপুরে পূজিত হয়ে আসছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এটি একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব অপ্রকট হওয়ার পর বৃন্দাবন ধামে যখন শ্রীজীব গোস্বামী বৈষ্ণবাচার্য পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন তাঁরই নির্দেশে **শ্রীনিবাস আচার্য, নরোত্তম দাস ও শ্যামানন্দ ঠাকুর** উড়িষ্যা এবং গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্যে মহামূল্যবান বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি নিয়ে গৌড় অভিমুখে যাত্রা শুরু করেন। পথিমধ্যে বিষ্ণুপুরে সেই সব ধর্মগ্রন্থ লুণ্ঠিত

হয়। লুণ্ঠন কার্য সুসম্পন্ন হয় বিষ্ণুপুরের তৎকালীন মহারাজ বীর হাম্বীরের নির্দেশে। ঐ পুঁথি অপহরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বীর হাম্বীর প্রবেশ করেন ধর্মজীবনে। তাঁরই ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতে বিষ্ণুপুরে অধ্যাত্ম-সাধনার তথা ঈশ্বর-উপাসনার জোয়ার আসে। নির্মিত হয় নিত্য নতুন দেবমন্দির। প্রতিষ্ঠিত হয় ভিন্ন ভিন্ন নামধেয় শ্রীবিগ্রহ। তারই ফলস্বরূপে নির্মিত হয়েছিল ষড়ভুজ-মন্দির এবং প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল শ্রীবিগ্রহদ্বয়।

বিষ্ণুপুরের **'সোপান'** পত্রিকাতে ১৯৯৮ সালের ১৫ই ডিসেম্বর সংখ্যাতে 'সুপ্রাচীন ষড়ভুজের মন্দির পর্যটকদের চোখের আড়ালে' শিরোনামে একটি লেখা বেরিয়েছিল। লিখেছেন স্থানীয় রামানন্দ কলেজের শিক্ষাকর্মী বিষ্ণুপুর কাদাকুলি মহল্লা নিবাসী **শ্রীমাণিক ব্যানার্জী**। আসুন এক্ষণে উক্ত নিবন্ধটির বিশেষ বিশেষ অংশ লেখকের অনুমতিক্রমে অল্প-স্বল্প সংশোধন করে পড়ে শোনাই আপনাদের। তিনি লিখেছেন, ''মল্লভূমের মন্দিরগুলির মধ্যে সুপ্রাচীন ষড়ভুজের মন্দির ও ষড়ভুজের বিগ্রহ দুটি দেখার মত। .... মন্দিরটি আনুমানিক ১৬৫৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজা প্রথম রঘুনাথ সিংহের সমসাময়িক জোড়বাংলা মন্দিরের সময়েই নির্মিত। কারণ এখানে জোড়বাংলা মন্দিরের গর্ভস্থ একটি ষড়ভুজের মূর্তি খোদাই করা আছে। এর চাতাল সম্পূর্ণ কালো মাকড়া পাথরের তৈরি এবং নকশা আছে খোদাই করা। এই চাতালের পশ্চিম দিকে মন্দিরটি অবস্থিত। সম্পূর্ণ টালি ইটের তৈরি মন্দিরটির উচ্চতা প্রায় ৩১ ফুট, বর্গাকার মন্দিরটির একটি বাহু ১১ ফুট। মন্দিরটির একটি মাত্র চূড়া। চূড়ার উপরে মাকড়া পাথরের পদ্ম, চারিদিকে নকশার কাজ এবং চূড়ার তিনদিকে আছে দরজা। ঐ পদ্মের উপরে একটি প্রাচীন লোহার রড রয়েছে। মন্দিরের অবস্থানকাল থেকেই ঐ রডটি আছে এবং রডটির এখনও কোন ক্ষয়-ক্ষতি হয় নি। চাতালটির দৈর্ঘ্য ৪৭ ফুটের মতো। প্রস্থ ২৩ ফুট, উচ্চতা ২ ফুট ৬ ইঞ্চি। মন্দিরটির গর্ভস্থানটি খুবই মজবুতভাবে খিলানো। ঐখানে দু'টি ষড়ভুজের বিগ্রহ বর্তমান। বিগ্রহের উচ্চতা বেদী বা আসন সহ ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি। বিগ্রহ দু'টি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। এক একটি বিগ্রহের ছ'টি করে মোট বারোটি হাত আছে। **একটি বিগ্রহের যে ছটি হাত আছে সেগুলি রাম, কৃষ্ণ ও বামন অবতারের। আর একটি বিগ্রহের যে ছটি হাত আছে সেগুলি মহাদেব, বলরাম ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর। এই হাতগুলির পরিচয় পাওয়া গেছে প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছ থেকে।** শোনা যায় এগুলি সম্পূর্ণ নিম কাঠের তৈরী। অদ্ভুত আকর্ষণীয় বিগ্রহ দুটি যে শিল্পী তৈরি করেছেন তিনিই জানেন এই বিগ্রহ তৈরি করার কলাকৌশল। একবার দেখলে বার বার দেখার ইচ্ছা জাগে। ছটি হাত আশ্চর্যজনকভাবে একটি কাঠের গুড়ির উপর খিলানো আছে এবং চোখ, নাক, মুখ, আঙুল, পদযুগল অত্যন্ত স্পষ্ট। কোনো জড়তা নেই। বিগ্রহ দুটি পৃথক পৃথক বেদীর উপর শ্রীকৃষ্ণের ভঙ্গিমায় দাঁড়ানো।''

বিগ্রহ দুটির বর্ণনা করতে গিয়ে ষড়ভুজ ঠাকুরের পুরোহিত কাদাকুলি নিবাসী শ্রী **দুলাল চক্রবর্তী** মহাশয় অবশ্য ভিন্নমত পোষণ করেন। **তাঁর মতে, 'দক্ষিণ দিকের শ্রী বিগ্রহের মধ্যে রাম, কৃষ্ণ এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসরূপটিই প্রকটিত।' প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, এটিই হল ষড়ভুজ জীউ-এর আদিরূপ বা প্রকৃত রূপ। বাঁ দিকের বিগ্রহটি প্রসঙ্গে তিনি বললেন, 'এটিতে লক্ষ্মণ, বলরাম, শিব ও গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। কারণ উপরের দু'হাতে রামানুজ লক্ষ্মণের তীর ধনুক, মধ্যস্থলের দক্ষিণ হস্তের লাঙ্গল হলধারী বলরাম ও বাম হস্তের শিঙা শিবঠাকুরের সূচক এবং নীচের দুই হস্তের জপমুদ্রা গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর সাধনাবস্থাকেই সূচিত করে।'** সুতরাং দেখা যাচ্ছে **বিষ্ণুপুরের এই যুগল বিগ্রহের তত্ত্বকথাতে ঐক্যমতের পরিবর্তে পৃথক পৃথক মত প্রচলিত।**

মন্দির প্রতিষ্ঠা ও বিগ্রহ নির্মাণের সমসাময়িক কালের অধ্যাত্ম-চেতনা, ঈশ্বর ভাবনা এবং তৎকালীন শিল্পীর মনোগতভাব আজ কয়েক শতাব্দী পর অনুমান ছাড়া অনুধাবন করার কোনো দ্বিতীয় পথ নেই।

ষড়ভুজ প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত মাণিক ব্যানার্জী আরো লিখেছেন, 'বিগ্রহ দুটি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করাই যায় না কত সুন্দর! বর্তমানে মন্দিরটির দেওয়ালে গাছের শিকড়ের জন্য ফাটল ধরেছে এবং ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ধ্বংসের হাত থেকে মন্দিরটিকে আমাদের সকলকেই রক্ষা করার জন্য এগিয়ে আসতে হবে। বিগ্রহের পূজা প্রতিদিনই হয়। বিশেষ করে দোল উৎসবে মহা সমারোহে উৎসব পালিত হয়। উৎসবটি কাদাকুলি 'চণ্ডীমাতা ষোলআনা' দ্বারা পরিচালিত। ষড়ভুজ মন্দির প্রাঙ্গণে একটি সুপ্রাচীন শিবমন্দির (শিবমন্দিরটি বর্তমানে ভেঙে পড়েছে) ও একটি চণ্ডীমাতার মণ্ডপ আছে। চণ্ডীমাতার নামানুসারে ষোল-আনার নাম 'চণ্ডীমাতা ষোলআনা'। এখানে চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষের মঙ্গলবার বা শনিবার ধরে চণ্ডীমাতার, ষড়ভুজের ও শিবের খুব সমারোহে পূজা ও অন্নভোগ হয় এবং ঐ ভোগ সকলকেই বিতরণ করা হয়। এসব কথা লিখেই মাণিক ভাই ক্ষান্ত হননি, আপনাদের মত ভ্রমণ-পিপাসু পর্যটকদের ষড়ভুজ বিগ্রহদ্বয় দর্শনের জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়ে নিবন্ধটির উপসংহার অংশে তিনি লিখেছেন, "মন্দির নগরী বিষ্ণুপুরে প্রায় প্রতিদিনই পর্যটকরা এখানে আসেন। তাঁদের কাছে আমার নিবেদন, এই মন্দির ও বিগ্রহ দেখতে আসুন। একই সঙ্গে সৌন্দর্য ও ইতিহাসের স্পর্শ পাবেন।" বিষ্ণুপুর-দরদী মাণিক ভাই-এর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে উক্ত কথাগুলির প্রতিধ্বনি করে আমিও আপনাদের জানাই উষ্ণ আমন্ত্রণ।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি, ষড়ভুজ মন্দির-চত্বরের পূর্বাংশে ছিল একটি শিব মন্দির। শিব মন্দিরটি ধ্বসে পড়ায় মন্দিরের উপাস্য শিবলিঙ্গ স্থানান্তরিত হয়েছে ঐ মন্দির প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে অবস্থিত শ্রীশ্রীচণ্ডীদেবীর মন্দিরে। **কাদাকুলি মহল্লার এই ষড়ভুজ মন্দির প্রাঙ্গণে একই সঙ্গে অর্থাৎ সমসাময়িকভাবে পূজিত হয়ে আসছেন শিব, চণ্ডী ও ষড়ভুজ বিগ্রহ। এতদর্থে এটি শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের সুসমন্বয়কেই সূচিত করে।**

আসুন, এক্ষণে দেবাদিদেব মহাদেব, মা চণ্ডী ও শ্রীশ্রীষড়ভুজ জীউ-এর শ্রীচরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করে পাড়ি জমাই জলেশ্বর ও মল্লেশ্বর শিবমন্দির অভিমুখে। পথের সঙ্গী হিসেবে আমরা সঙ্গে নেবো মল্লরাজবংশের ৬১তম রাজা **শ্রীশ্রীকালীপদ সিংহঠাকুরকে।**

অধ্যায়-৫০

রাজকাহিনী—১৭

শ্রীশ্রীরাজাকালীপদ সিংহঠাকুর (১৯৩০ - ১৯৮৩ খৃঃ) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও বিষ্ণুপুর

পূর্বেই বলেছি ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাজ নীলমণি সিংহের লোকান্তর হয়। মাত্র বছর চারেকের শিশুপুত্র যুবরাজ রামচন্দ্র সিংহকে সিংহাসনে বসানো সম্ভব হয়নি। আশা করা হয়েছিল, রামচন্দ্র পরিণত বয়সে উপনীত হলে যথাসম্মানে রাজপদে অভিষিক্ত করা

হবে তাঁকে। কিন্তু মাত্র ১৯ বছর বয়সে ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে হঠাৎ মারা যান তিনি। বিষ্ণুপুরের শূন্য-রাজসিংহাসন রয়ে যায় শূন্য অবস্থায়। ঘটনাচক্রে ১৯০৩ থেকে ১৯২৯ খৃষ্টাব্দের শূন্য সিংহাসন অবশেষে পূর্ণ হয় ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে। বিষ্ণুপুরের রাজ-সিংহাসনে অভিষিক্ত হন **শ্রীযুক্ত কালীপদ সিংহঠাকুর**। ইনি মহারাজ রামকৃষ্ণ সিংহ ও হিকিম সাহেব রামকিশোর সিংহের দৌহিত্র। **রাজবংশের দৌহিত্রের সূত্রে সিংহাসন লাভ করেন ইনি।** এ বিষয়ে নীচের বংশতালিকাটি দ্রষ্টব্য।

গোপাল সিংহদেব (২য়) ৫৮তম রাজা

রামকৃষ্ণ সিংহদেব (১ম পুত্র)
৫৯তম রাজা

রামকিশোর সিংহদেব (২য় পুত্র)
হিকিমসাহেব

ধ্বজামণি দেবী (১মা পত্নী)

নীলমণি সিংহদেব (দত্তক)
৬০তম রাজা
\+
চূড়ামণি দেবী (পত্নী)

রামচন্দ্র সিংহদেব (পুত্র)

প্রসন্নময়ী দেবী (২য়া পত্নী)
বা প্রসন্ন কুমারী

ইন্দুকুমারী (কন্যা)
\+
আনন্দচন্দ্র সিংহঠাকুর (স্বামী)

কালীপদ সিংহঠাকুর (পুত্র)
৬১তম রাজা
(আদি নিবাস পুড়াকন্দা গ্রাম,
থানা-বড়জোড়া, বাঁকুড়া।)

একটু আগেই বলেছি ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে কালীপদ সিংহ ঠাকুরের রাজ্যাভিষেক হয়। কিন্তু কি অবস্থা থেকে কি অবস্থায় তিনি সিংহাসন লাভ করেন তা সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে ফিরে দেখার ভঙ্গিমায় বিষ্ণুপুর তথা মল্ল-রাজবংশের ইতিহাসের পাতায় পূর্বাপর দৃষ্টিপাতের প্রয়োজন আছে।

বাঁকুড়া জেলার আলোচনা প্রসঙ্গে **এল. এস. এস. ও'ম্যালী** তাঁর বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে স্পষ্টভাবেই স্বীকার করেছেন যে, "নির্ভরযোগ্য উপাদানের অভাবে বৃটিশ আমলের পূর্ববর্তী বাঁকুড়া জেলার ইতিহাস স্থানীয় মল্ল-রাজবংশের উত্থানপতনের ইতিহাসের সমার্থক।" ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের **'ক্যালকাটা রিভিউ'** পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে **রমেশচন্দ্র দত্ত** লিখেছিলেন—"বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজারা দাবী করেন যে, তাঁদের রাজবংশের উৎপত্তিকাল সেই সময়ে যখন দিল্লীতে হিন্দু রাজারা সমাসীন এবং ভারতবর্ষে মুসলমানদের নামগন্ধও শোনা যায় নি। বস্তুতঃ, **বখতিয়ার খিল্‌জীর** বঙ্গবিজয়ের পূর্বে অন্যূন পাঁচ শতাব্দীকাল ধ'রে এ রাজবংশ যে বাংলার পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে প্রভুত্ব করেছেন, সেটিই তাঁদের বক্তব্য। **বঙ্গদেশে মুসলমান শাসনের প্রবর্তনের পরেও বিষ্ণুপুর-রাজবংশের প্রতাপের কোন তারতম্য হয়নি।** বিষ্ণুপুরের সুদৃঢ় দুর্গ, দামোদর প্রভৃতির মতো খরস্রোতা নদী ও সুবিস্তৃত শাল অরণ্য দ্বারা সুরক্ষিত এ অঞ্চলের রাজন্যবর্গের সঙ্গে বঙ্গদেশের উর্বর অংশের মালিক মুসলমানরা কদাচিৎ বিবাদে প্রবৃত্ত হয়েছেন। সেজন্য বিষ্ণুপুরের নৃপতিরা তাঁদের নিজ এলাকায় বহু শতাব্দীকাল রাজত্ব করতে পেরেছেন একচ্ছত্র প্রতাপে। মুসলমান শাসনের শেষভাগে যখন মোগলশক্তি প্রায় সর্বব্যাপী ক্ষমতার

অধিকারী হয়ে ওঠে, তখন রণোন্মুখ কোন মোগল সেনাবাহিনী কালেভদ্রে হয়ত বিষ্ণুপুর অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে বশ্যতা-পণ দাবী করেছে এবং এরকম নজরানা সম্ভবতঃ দেওয়াও হয়ে থাকবে। কিন্তু বর্ধমান ও বীরভূমের আধুনিককালের দুটি রাজবংশের উপরে মুর্শিদাবাদের সুবাদাররা যে পরিমাণ যথেচ্ছ কর্তৃত্ব করতে পেরেছেন, বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের উপর তা কখনই পারেননি। মুসলমান শাসনের অবসানকালে, বর্ধমান রাজকুলের ক্ষমতাবৃদ্ধির কারণে, বিষ্ণুপুর-রাজবংশের পতন শুরু হয়। বর্ধমানের মহারাজা কীর্তিচাঁদ বিষ্ণুপুর রাজ্য আক্রমণ ক'রে বিস্তীর্ণ এলাকা নিজের জমিদারির সামিল ক'রে নেন। তার পরে, মারাঠাদের অত্যাচারে প্রাচীন বিষ্ণুপুর-রাজবংশের বিনাশ সম্পূর্ণ হয়। বর্তমানে, হৃতগৌরব বিষ্ণুপুর রাজ্য এক সামান্য দরিদ্র জমিদারি মাত্র।" সে জমিদারিও এখন নেই ; ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জমিদারি বিলোপ আইনে তারও আয়ু ফুরিয়েছে বহুকাল। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর, জামকুঁড়ি, কুচিয়াকোল, ইঁদাস প্রভৃতি স্থানে মল্ল-রাজপরিবারের বিভিন্ন শাখার বংশাবতংসেরা যৎসামান্য ভূসম্পত্তির আয় অবলম্বন করে নিম্নমধ্যবিত্ত নাগরিক হিসাবে এখনও টিকে আছেন কোন গতিকে।[১]

মল্লরাজ্যের তথা মল্লরাজাদের এরকম এক চরম দুর্দিনে ও দুঃসময়ে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনাভিষিক্ত হন **শ্রীশ্রীরাজা কালীপদ সিংহঠাকুর**। সুতরাং রাজা হিসেবে রাজ্য শাসন, রাজ্য বিস্তার, প্রজাপ্রতিপালন এবং বহুজনহিতকর কোন কাজ করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। নামে মাত্র রাজা হয়ে রাজসিংহাসন তিনি অলংকৃত করেছিলেন ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পরলোক গমনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত। স্বাভাবিকভাবেই রাজা হিসেবে সেরকম কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নজরে পড়ে না তাঁর আমলে। তথাপি ব্যক্তি-মানুষ হিসেবে কালীপদ সিংহঠাকুর ছিলেন ক্ষত্রিয় তেজোদৃপ্ত বংশগরিমা সচেতন সৌখিন মিশুকে মানুষ। ইনি বিষ্ণুপুরী সিল্কের পোশাক তথা পাঞ্জাবি, দামী ধুতি ও চাদর জাতীয় সুরুচি সম্পন্ন পোশাক-আশাক পরতে পছন্দ করতেন। ঈষৎ শ্যামবর্ণ পাতলা গড়নের স্বাভাবিক উচ্চতার এই মানুষটির বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতের প্রতি ছিল বিশেষ দুর্বলতা। কথিত আছে ব্যক্তিগত দেহরক্ষী নিয়ে পাল্কিতে চড়ে ইনি প্রায়ই জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর বাড়িতে বিষ্ণুপুর ঘরানার গান শুনতে যেতেন। সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে দশঅবতার তাস খেলাতে আত্মমগ্ন থাকতেন অবসর সময়ে। খেলাতেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। **দেব-দেবীতে ভক্তি ছিল প্রগাঢ়। বিশেষতঃ মা মৃন্ময়ীর ওপর তাঁর ছিল অগাধ বিশ্বাস। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিষেধাজ্ঞাকে অমান্য করে মহাষ্টমীর সন্ধি পূজাতে তিনি কামান দাগার আদেশ দেন সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সম্মুখেই। তাঁর মুখে শোনা গিয়েছিল, 'আগে মায়ের পূজা, পরে আইন। ফাঁসি যেতে হয় তাও আচ্ছা, তবু তোপ দাগা হবেই।' হাজার হাজার মাতৃভক্তের মা মা রবের মধ্যে নির্ধারিত সময়ে গর্জে উঠেছিল কামান। সুসম্পন্ন হয়েছিল চিরকালীন পূজা। আর বৃটিশ সরকারের পুলিশ বাহিনী সেদিন পুতুলের মতোই নীরব দর্শকের ভূমিকায় দাঁড়িয়েছিল সারাক্ষণ।**

মা মৃন্ময়ীর মহাষ্টমীর সন্ধি পূজাতে কামান দাগার প্রসঙ্গে ফকিরনারায়ণ কর্মকার তাঁর 'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী' গ্রন্থে একটি অলৌকিক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ঘটনাটি সংক্ষেপে এরকম। ১৩৬৫ বঙ্গাব্দে তীরবক গ্রাম নিবাসী জনৈক **করালী মহাদণ্ড** (মাদোড়) মহাষ্টমীর সন্ধিপূজাতে কামানে অগ্নিসংযোগ করে তোপধ্বনি করেন এবং ঐ বছরই

১। বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি, পৃঃ—৫

চৈত্র মাসে করালী মারা যান। ফলে অজানা আশঙ্কায় ১৩৬৬ বঙ্গাব্দের মহাষ্টমীতে করালীবাবুর বংশধরগণ কামানে অগ্নিসংযোগ করার অনড় অনিচ্ছা প্রকাশ করেন রাজা কালীপদ সিংহ ঠাকুরের কাছে। রাজা পড়েন মহা দুশ্চিন্তায়। মাদোড় বংশীয় লোকেরাই এ কাজের জন্য বংশপরম্পরায় নির্ধারিত। নতুন কোন মাদোড় বংশীয় লোক খুঁজে পাওয়াও মুশকিল। ২১শে আশ্বিন মহাষ্টমীর সন্ধিপূজা। হাতে আর সময়ও নেই। কি করা যায়—এই চিন্তায় বড়ই চিন্তিত রাজা। মুসলমান কামান দাগিয়ের কথাও উঠল। কিন্তু মহাষ্টমীর পূজাতে কামানে অগ্নিসংযোগের কাজ খুবই শুদ্ধাচার ও নিয়মনিষ্ঠার কাজ। তাছাড়া জাতপাতের বিচারেও অনেকের আপত্তিতেই উক্ত প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। প্রথাগত তোপধ্বনি বন্ধ হবার উপক্রম। **'মায়ের যা ইচ্ছে তাই হবে'—বলে আত্মসমর্পণ করেন রাজাবাহাদুর।** দিন কয়েক পরের ঘটনা ২০শে আশ্বিন রাত না পোহাতেই জনৈক **গোষ্ঠ মহাদণ্ড** এসে হাজির হন রাজসকাশে। বলেন, "মায়ের চরণে আমরা অপরাধ করেছি। আমাদের বংশধর যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন আর তোপ দাগতে আপত্তি করব না আমরা কেউই।" রাজামশায় ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে প্রশ্ন করেন, "কি হয়েছে কি?"

গোষ্ঠ মহাদণ্ড জানায় যে তাঁদেরই আত্মীয় **যমুনাদাস মহাদণ্ড** দ্বারকেশ্বর নদীর পারে বিষ্ণুপুর থেকে ১২ মাইল উত্তরে অবস্থিত আমড়াশোল গ্রামে বাস করে। গতকাল সে যখন একা একা মাঠে চাষ দিচ্ছিল সেই সময় এক অপরিচিত পাগলী এসে তাকে বলে, **'তোরা থাকতে বিষ্ণুপুরের রাজার মহাষ্টমীর পূজায় কামান দাগা হবে না।'** এই বলে সে কোথায় পালিয়ে যায় মুহূর্তে। সাথে সাথে যমুনা নদী পেরিয়ে ছুটে আসে আমার কাছে এবং সব কথা বলে। **আমাদের মনে হয়েছে ঐ পাগলীর ছদ্মবেশে স্বয়ং মা মৃন্ময়ী যমুনাকে তোপ দাগতে নির্দেশ দিয়েছেন। যমুনা ভাগ্যবান। সাক্ষাৎ মায়ের দেখা পেয়েছে। সে মায়ের সম্মুখে হত্যা দিয়েছে। মহাষ্টমীর সন্ধি পূজায় কামানে আগুন দেবে সে-ই।**

মহারাজ অস্ফুটে উচ্চারণ করলেন, 'মা নিজের কাজ নিজেই করিয়ে নিয়েছেন। আমরা নিশ্চিন্ত।'

ঘোড়ায় চড়তে বেশ ভালবাসতেন ইনি। একবার তিনি তাঁদের কুচিয়াকোল রাজবাড়ি থেকে কিছু টাকা-কড়ি, মোহরাদি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বিষ্ণুপুর ফিরছিলেন জয়পুর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে। সন্ধ্যা সমুত্তীর্ণ। রাত্রি সমাগত। এসে গেছেন তাঁতীপুকুর জঙ্গলে। এমন সময় একদল ডাকাত ঘিরে ফেলে তাঁকে। রাজামশায়ের সাথে ছিল বন্দুক। ছুটল গুলি। মরল এক ডাকাত। পালিয়ে বাঁচে বাকি ক'টা।

বিষ্ণুপুরের জনৈক রিক্সাওয়ালার সাথে ভাড়া নিয়ে একবার বচসা হয় রাজার। আত্মাভিমানী রাজার আত্মসম্মানে লাগে যার-পর-নাই। বলেন, "আজ থেকে রাজদরবারের পথ দিয়ে কোন রিক্সাওয়ালাকে আমি যেতে দেবো না। ওটা আমাদের রাস্তা। রাজপরিবারের রাস্তা।" রিক্সাওয়ালারা পড়ল মহাবিপদে। একের দোষে সবার শাস্তি। কারণ প্রচুর টুরিস্ট্ আসেন বিষ্ণুপুরে এবং তাঁরা রিক্সাতে চড়েই ঘুরে দেখেন বিষ্ণুপুর। সেক্ষেত্রে রাজদরবার রিক্সাওয়ালাদের যেতেই হয় এবং হবেই। বিষ্ণুপুরের জনৈক গাঙ্গুলী উপাধিধারী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি রিক্সাওয়ালাদের দলবদ্ধ করে রাজার নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে যাত্রা করেন রাজদরবার অভিমুখে। খবরটা আগেভাগেই পৌঁছে যায় রাজার কানে। তিনি তখন বন্দুক নিয়ে বসে থাকেন রাজদরবারের পাথর দরজার কাছে। রিক্সাওয়ালাদের মিছিল এসে যায় পাথর দরজার কাছাকাছি। রাজা কালীপদ সিংহঠাকুর তখন সরোষে ঘোষণা করেন, 'পাথর দরজা

পেরোনোর চেষ্টা করলেই গুলি। যে আগে আসবে সেই মরবে।' থেমে যায় মিছিল। পিছু হাঁটে ক্রমশঃ। পরবর্তীকালে তৎকালীন মহকুমা শাসকের মধ্যস্থতায় রিক্সাওয়ালারা ক্ষমা চেয়ে রাজপথে প্রবেশাধিকার ফিরে পায়।

১৯৭১-১৯৭৭ খৃষ্টাব্দ। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল তখন এ. এল. ডায়াস। একবার এসেছেন বিষ্ণুপুরে। যাবেন রাজদরবারের রাজপথ দিয়ে। গাড়ির পিছনে গাড়ি। বিরাট 'কন্‌ভয়' আর পুলিশবাহিনী। মা মৃন্ময়ীর সামনের পথ দিয়ে পাথর দরজা অভিমুখে চলেছে দশম রাজ্যপালের গাড়ি। এমন সময় ছোট পাথর দরজা অতিক্রম করে বড় পাথর দরজা দিয়ে রিক্সায় চড়ে আসছেন রাজা কালীপদ সিংহঠাকুর। পুলিশবাহিনী বাধা দেয় তাঁকে। পথ ছেড়ে দিতে বলেন। **সিংহঠাকুরের জেদী জবাব ছিল, "আমি বিষ্ণুপুরের রাজা। এটা আমার রাজপথ। এ পথে আগে যাব আমি, পরে রাজ্যপাল।"**

খবরটা পৌঁছে যায় রাজ্যপালের কাছে। রাজ্যপাল সেদিন মানী রাজার মান রক্ষা করেছিলেন সসম্মানে পথ ছেড়ে দিয়ে।

দারিদ্র্য পীড়িত হলেও প্রকৃতপক্ষে ইনি ছিলেন দানশীল। বিষ্ণুপুরের নগরদেবতা মদনমোহন বিগ্রহ চুরি হয়ে গেলে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন ইনি। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এঁর আমলেই বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যমণ্ডিত লালবাঁধ বিক্রয় সূত্রে হস্তান্তরিত হয়ে চলে যায় বিষ্ণুপুর নিবাসী রামনলিনী চক্রবর্তীর হস্তে। এভাবেই হস্তান্তরিত এবং স্থানান্তরিত হয়েছে আরো আরো রাজসম্পত্তি।

সবশেষে বলতে হয় যে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল মল্লরাজ্যের ৬১ জন রাজার মধ্যে মল্লরাজবংশের রাজা কালীপদ সিংহঠাকুর তাঁর নামের পূর্বে 'শ্রীশ্রী' এবং পরে 'ঠাকুর' লিখে থাকেন। কিন্তু কেন?

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাজস্থানের রাঠোর বংশীয় রাজপুতদের মধ্যে 'ঠাকুর' উপাধি প্রচলিত। কালীপদ সিংহঠাকুর রাঠোর বংশীয় 'ঠাকুর' পদবীধারী রাজপুত—এজন্যে লিখেছেন 'ঠাকুর'। অবশ্য মাণিকলাল সিংহ লিখেছেন মল্লরাজ-পরিবারের জামাতাদের 'ঠাকুর' বলা হত। কালীপদ সিংহঠাকুরের গোত্র 'বিজয়পাণি', এবং অন্যান্য মল্লরাজাদের গোত্র 'রাজর্ষি'। আর নামের পূর্বে শ্রীশ্রী লেখার পিছনে কি যুক্তি থাকতে পারে সেটা অবশ্য গবেষণার বিষয়। কথিত আছে—রাজারা হলেন ঈশ্বরের প্রতিভূ বিশেষ। এতদর্থে ঈশ্বর-স্থানীয়। দেবদেবীর নামের পূর্বে 'শ্রীশ্রী' লেখার যেমন রেওয়াজ আছে এক্ষেত্রেও বোধ করি সেভাবেই এসেছে 'শ্রীশ্রী'। রাজা কালীপদ সিংহঠাকুর—হয়েছেন শ্রীশ্রীকালীপদ সিংহঠাকুর। এছাড়া বিষ্ণুপুরের প্রজাসাধারণ রাজা কালীপদ সিংহঠাকুরকে শুধুমাত্র শ্রী নয়, শ্রীশ্রী রাজা কালীপদ সিংহঠাকুর নামে অভিহিত করতেন।

৬৯৪ খৃষ্টাব্দের এক পুণ্য লগ্নে রঘুনাথ মল্ল বা আদি মল্লের জন্মসূত্রে যে মল্লভূম রাজ্যের সূচনা হয়েছিল রাঢ়বঙ্গের বুকে, ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর মল্লরাজবংশের ৬১তম রাজা শ্রীশ্রীকালীপদ সিংহঠাকুরের দেহাবসানের সাথে সাথে ১২৯০ বছরের সুখ-সমৃদ্ধি এবং উত্থান-পতনের মল্লরাজত্বের অবসান ঘটল আপাতবিচারে। **একই সঙ্গে আপাতবিচারে কালসাগরের বুকে 'মল্লাব্দ' নামক যে বুদ্‌বুদটি ফুটে উঠেছিল ১২৯০ বছর আগে ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে যুগপরিবর্তনের বায়বীয় চাপে ফেটে গিয়ে তা আবার বিলীন হয়ে গেল কালসাগরের সলিলগর্ভে, কারণ শ্রীশ্রীরাজা কালীপদ সিংহ ঠাকুরের দেহান্তরের পরে নতুন করে আর রাজ্যাভিষেক হয়নি এখনও।**

মানুষ থাকে না, থাকে তার নাম। মল্লরাজারা নেই, নেই তাঁদের রাজত্ব কিন্তু আছে তাঁদের অজস্র কীর্তিকলাপ। হয়তো একদিন সেসবও ধ্বংস হয়ে যাবে কালের করাল গ্রাসে, তথাপি মল্লেশ্বরী মা মৃন্ময়ীর আশীর্বাদপূত মল্লনৃপতি এবং মল্লভূম তথা মল্লরাজ্য বেঁচে থাকবে ইতিহাসের হাত ধরে, বেঁচে থাকবে স্বর্ণাক্ষরে। 'আছে' হয়ে যাবে 'ছিল', বর্তমান ঢুকে যাবে অতীতে।

* * *

রাজা শ্রীশ্রীকালীপদ সিংহঠাকুর সিংহাসনে আসীন থাকা কালে—১৯৩০-১৯৮৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। **ভাঙাগড়ার এই সময়ে দেশজুড়ে আন্দোলনের পর আন্দোলন, মন্বন্তর, মহামারী, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, দেশভাগ, দেশের স্বাধীনতালাভ, চীন-ভারত যুদ্ধ, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ; কি না হয়েছে!** এখন আসি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রসঙ্গে। এই যুদ্ধের বলি হয়েছেন ছয় কোটি মানুষ।

প্যারিসের ভার্সাই শহরে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জুন **'ভার্সাই সন্ধি'** স্বাক্ষরিত হওয়ার ফলে ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত একটানা পাঁচ বছরের দীর্ঘমেয়াদী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয় এবং জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা হয়। **জীব-জন্তু-প্রাণী যেমন মারা যাওয়ার পূর্বে বংশরক্ষার ব্যবস্থা করে যায়, অনুরূপভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার তথা মারা যাবার প্রাক্কালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বীজ বপন করে যায় সকলের অলক্ষ্যে।** রাশিয়ার নিজস্ব মত ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির ভার ভাগ করে নেওয়া হোক যুদ্ধে জড়িত সব দেশের মধ্যে। সুচিন্তিত সেই অভিমতকে উপেক্ষা করে **ভার্সাই চুক্তিতে** প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতির ভার তথা ক্ষতিপূরণের ভার একতরফাভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয় জার্মানীর উপর। পরাজিত জার্মানী বেকায়দায় পড়ে এই অন্যায় শর্ত মেনে নিলেও প্রকৃতপক্ষে জার্মানজাতি সন্ধি-শর্তকে রাষ্ট্রীয় অপমানরূপে গণ্য করে। **যুদ্ধসমাপ্তির পর থেকেই উক্ত একপেশে গাজোরি সন্ধি-শর্তের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য মনে মনে প্রস্তুতি নিতে থাকে। তারই ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির বছর কুড়ির মধ্যেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়ঙ্কর বিভীষিকা পৃথিবীর উপর মৃত্যুর-কালো ছায়া বিস্তার করে। ন্যাৎসী হিটলারের পোল্যাণ্ড আক্রমণের সাথে সাথে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা বেজে ওঠে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের ১লা সেপ্টেম্বর।** যুদ্ধে বৃটেনের পক্ষে আমেরিকা, রাশিয়া ও ফ্রান্স যোগ দেয়। **মিত্রশক্তি** নামে আখ্যায়িত এই শক্তির বিরুদ্ধে জার্মানীর পক্ষে **অক্ষশক্তি**-রূপে জাপান ও ইতালি যোগ দেয়। জাপান সমগ্র এশিয়াতে সাম্রাজ্য বিস্তারের আশায় জার্মানীর পক্ষ অবলম্বন করে। এশিয়া থেকে বৃটিশ শক্তিকে উৎখাত করার অভিপ্রায়ে জাপানের হাতে বন্দী বৃটিশ-ভারতীয় সৈন্যদের জাপান স্বপক্ষে কাজে লাগায়। বিপ্লবী **রাসবিহারী বসু** তখন ঐসব সৈন্যদের নিয়ে **আজাদ হিন্দ বাহিনী** গঠন করেন। সুভাষচন্দ্র বৃটিশ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে কোলকাতা থেকে জার্মানী চলে যান এবং রাসবিহারী বসুর আমন্ত্রণে জার্মানী থেকে জাপানে গিয়ে আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে অক্টোবর ইংরেজ ও তার মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ভারত-ব্রহ্মদেশ সীমান্তে এসে তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ভারতের একটি বিরাট এলাকা নিজেদের দখলে নিয়ে আসেন। **পূর্বাপর এসব ঘটনার সম্ভাবনার কথা স্মরণ রেখেই দূরদৃষ্টি-সম্পন্ন ভারতের বৃটিশ সরকার পূর্ব-এশিয়ার নিরাপত্তার জন্য বিশেষ তৎপর হয়ে ওঠে। পূর্ব-ভারতে বিষ্ণুপুর সন্নিকটস্থ বাসুদেবপুর মৌজায় বিষ্ণুপুরের কর**

পরিবার ও ভট্টাচার্য পরিবারের জমিজমাসহ বনভূমির বিস্তৃত অঞ্চল অধিগ্রহণ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে গড়ে তোলে 'এয়ারোড্রোম' বা 'ল্যাণ্ডিং-গ্রাউণ্ড' তথা বিমানঘাঁটি এবং সেনানিবাস। অনুরূপভাবে পিয়ারডোবা সংলগ্ন গামারবনী অঞ্চলেও যুগপৎভাবে তৈরী করা হয় 'ল্যাণ্ডিং-গ্রাউণ্ড' ও সেনানিবাস। যুদ্ধ-বিমান সংরক্ষণের ঘর হিসেবে নির্মিত হয় লোহার ফ্রেমের ওপর করুগেটেড্ টিনের দেওয়াল ও আচ্ছাদন বিশিষ্ট 'হ্যাঙ্গার্'। পিয়ারডোবা থেকে মেদিনীপুরের শালবনী অঞ্চলের ডিগ্রী এলাকা পর্যন্ত এরোপ্লেনের 'রানওয়ে' সহ্ সেখানেও 'হ্যাঙ্গার্' তৈরী হয়। শালবনী অঞ্চলটি ছিল আমেরিকান সৈন্যদের জন্য নির্দিষ্ট সৈন্যশিবির, পক্ষান্তরে বাসুদেবপুর এবং গামারবনী অঞ্চলটি ছিল বৃটিশ সৈন্যদের শিবির। বাসুদেবপুর 'ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডে' থাকত ছোটখাটো 'ফাইটার প্লেন' এবং গামারবনীতে থাকত বৃহদাকার 'বোম্বার প্লেন'। আমেরিকান 'বোম্বার প্লেন' যখন কোন যুদ্ধস্থলে বোমা বর্ষণ করতে যেত বৃটিশ 'ফাইটার প্লেন' তখন তাদের সাথে সাথে থাকত 'সাপোর্টিং ফায়ার' করার জন্য। এতদঞ্চলের যুদ্ধবিমানগুলিকে ব্রহ্মদেশ তথা মায়ানমার ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে বোমা বর্ষণের উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হত। শত্রুপক্ষের বিমান আক্রমণের সংকেত পাওয়া মাত্র এখানের সৈন্য-শিবির থেকে দীর্ঘায়ত করুণ-আর্তির স্বরে শোনা যেতো সাইরেন। সাইরেন-সংকেত বেজে ওঠার সাথে সাথে ট্রেঞ্চের মধ্যে আত্মগোপন করে যুদ্ধার্থে সাজো সাজো রব পড়ে যেত ত্রস্ত সৈন্যমহলে। 'অ্যান্টি-এয়ার্-ক্র্যাফ্‌ট্-গান্'গুলি আকাশের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে শত্রুপক্ষের বিমান-ধ্বংসের জন্য ওৎপেতে অপেক্ষা করত। এয়ারোড্রোমের বিভিন্ন স্থানে তালগাছ কেটে নকল 'অ্যান্টি-এয়ার্-ক্র্যাফ্‌ট্-গান্' নামান্তরে 'ক্যামুফ্লাঝ্' (Camouflage) তৈরী করে সুসজ্জিত রাখা হয়েছিল শত্রুপক্ষের ভীতি সঞ্চারের জন্য। রাত্রি আসতো সর্বাঙ্গে কালো রঙ মেখে। 'Black-out' ছিল যুদ্ধকালীন অবস্থায় অবশ্য পালনীয় আইন। স্থানীয় লোক নিয়োগ করে গঠিত A.R.P. দল গ্রামে, গঞ্জে, পল্লীতে, পল্লীতে ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করত কোন ব্যক্তি আলো নিয়ে ঘোরা-ফেরা করছে কি না, কিংবা ঘরের আলোর জ্যোতি বাইরে বেরোতে দিচ্ছে কি না। দরজা-জানালাতে পর্দা খাটানো ছিল বাধ্যতামূলক। পক্ষান্তরে আলো নিয়ে বাইরে যাওয়া, রাস্তাতে বাতি জ্বালা—সবই নিষিদ্ধ ছিল ব্ল্যাক্-আউটের নিয়মে। আইন অমান্য করলে কঠোর শাস্তি।

কথিত আছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়েই মেদিনীপুর জেলার কলাইকুণ্ডা বিমানক্ষেত্র নির্মিত হয় এবং বর্ধমান জেলার পানাগড়ে বিশাল জায়গা জুড়ে যুদ্ধাস্ত্র তথা 'Arms and Ammunitions' মজুত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। যুদ্ধোপকরণ আনার জন্য বিষ্ণুপুর থেকে পানাগড় পর্যন্ত একটি সংক্ষিপ্ত সোজা রাস্তাও তৈরী করা হয় যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। যুদ্ধকালীন অবস্থায় বাই-সাইকেলে রেজেস্ট্রীকৃত নম্বর লাগানো আইনসিদ্ধ হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের দক্ষিণে অহল্যাবাঈ রোডের উপর যে কুষ্ঠাশ্রমটি রয়েছে সেই কুষ্ঠাশ্রমের দ্বিতল বাড়িতে থাকতেন এক পাদরী সাহেব। কুষ্ঠাশ্রম-সংলগ্ন অঞ্চলে ছিল অফিসারদের কোয়ার্টার্‌স। সৈন্যশিবির ছিল 'ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড'-এর কাছাকাছি বনাঞ্চলে। লালবাঁধের উপর নির্মিত হয়েছিল সৈন্যদের জন্য 'সুইমিং পুল', 'ডাইভিং পুল'। পুল থেকে জলে ঝাঁপ দেওয়ার পাশাপাশি বাবার বোটে চড়ে সাহেব সৈন্যদের লালবাঁধের জলে সাঁতার কাটতে দেখা যেত প্রায়ই। আর দেখা যেত সৈন্যদের সাথে স্থানীয় যুবকদের ফুটবল খেলতে। সৈনিকদের খাদ্যতালিকার পুরোভাগে ছিল পাউরুটি, মাখন, ডিম ও ফল-মূল। ভাতের স্থান ছিল যৎসামান্য। আমেরিকান এবং বৃটিশ সৈন্যদের মধ্যে

আমেরিকান সৈন্যদের ব্যবহার ছিল তুলনামূলকভাবে মন্দের ভাল।

কাজের খোঁজে বিষ্ণুপুর এবং বিষ্ণুপুর সংলগ্ন গ্রামগুলির মানুষজনকে সেনা অফিসারদের অফিসে ভিড় করতে দেখা যেত। কারণ বিষ্ণুপুরের অর্থনৈতিক কাঠামো তখন একেবারে ভেঙে পড়েছিল। দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করতে করতে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ে বেঁচেছিল প্রায় সর্ব-সাধারণ। সুতরাং বৃটিশ ও আমেরিকান সৈন্যদের বাসস্থান থেকে শুরু করে বিছানাপত্র জামা-কাপড় পরিষ্কার করা, রান্না-বান্না করা, বাসন-কোসন ধোওয়া, ফাইফরমাস খাটা সবই করত স্থানীয় লোকেরা। আবার সিভিল অফিসার পদে বহাল ছিলেন বিষ্ণুপুরের রসিকগঞ্জ নিবাসী তারাপদ মুখার্জী (পরবর্তীকালে সহ পৌরসভাপতি হন), কৃষ্ণগঞ্জনিবাসী বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জী, আঁইসবাজার নিবাসী হৃদিরঞ্জন বিশ্বাস, রসিকগঞ্জ নিবাসী দেবী মিত্র প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এছাড়া শ্রমিক, খাদ্য ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য দ্রব্যাদির যোগানদাতা হিসেবে শহরের অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও কাজ করে সৌভাগ্যের সাক্ষাৎ লাভ করেন। **কারণ এই যুদ্ধের সময় টাকার, মানে নোটের ছড়াছড়ি। টাকা উড়তো—ধরতে পারলেই তোমার। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি এই সময়েই বিষ্ণুপুরে প্রথম কাগজের এক টাকার নোটের প্রচলন হয়। খুচরো পয়সার প্রচণ্ড অভাব ছিল। আর অভাব ছিল বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম খাদ্যবস্তুর। টাকা নয়! এক মুঠো চাল, এক গ্রাস অন্নের বিনিময়ে মা-বোনেদের ইজ্জত বিক্রীর প্রশ্নটিও উঠে এসেছিল অনেকানেক কৌতূহল-উদ্দীপক প্রশ্নের পুরোভাগে। 'চাল নাও, দেহ দাও'—শব্দ চারটি নিয়ে সৈন্য শিবিরে চালু হয়েছিল গোপন শ্লোগান।** আর পুরুষেরা, বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরের তন্তুবায় ও কর্মকার সম্প্রদায়ের মানুষজন ছাড়াও বিষ্ণুপুরের অন্যান্য কুটির শিল্পে নিযুক্ত ছেলে বুড়ো সকলেই পেটের গর্ত বোজাতে লেগে পড়ত ক্যাম্পের কাজে—১ নম্বর, ২ নম্বর, ৩ নম্বর ক্যাম্প সহ ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ডের কাজে। গাছ কাটত বড়রা, ছোটরা ঘন ঝোপ-ঝাপ কেটে জঙ্গল সাফাই করত। পর্যাপ্ত পরিমাণে পিয়াল গাছ ছিল বাসুদেবপুর আর গামারবনী-জঙ্গলে। **পিয়াল গাছ হেজে গেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাপটে। সাথে সাথে পিয়াল-বিচি থেকে উৎপাদিত বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মতিচুরও আত্মগোপন করল পিয়াল-বিচির বাদামের বেসনের অভাবে।** শ্রমজীবী বাচ্চারা দিন-মজুরের পারিশ্রমিক হিসেবে চার আনা এবং বয়স্করা পেত আট আনা। এক-একজন সৈন্যের পোশাক-আশাক, বিছানা ইত্যাদি সাফাই করার জন্য সাপ্তাহিক বেতন ছিল দু-টাকা। **এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন ১৯৪০ থেকে ১৯৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর কাল শুধু বিষ্ণুপুর নয়, বাঁকুড়া নয়, অবিভক্ত বাংলার দুরবস্থার পারদরেখাটি উঠে গিয়েছিল তরতরিয়ে। অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মতোই যুদ্ধের বিভীষিকার সাথে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের তথা ১৩৫০ বঙ্গাব্দের মন্বন্তর যৌথভাবে যেন বাঙালি নিধনের পরিকল্পনা করে খুবই সুপরিকল্পিতভাবে। জেলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায় মন্বন্তরের শিকার হয়ে।**

স্বনামধন্য সাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সপ্তপদী' উপন্যাসে পূর্বোক্ত মন্বন্তর সহ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভীষিকার বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "সেবার এখানে দুর্ভিক্ষ মহামারী হয়েছিল। এটা উনিশশো চুয়াল্লিশ সাল। পৃথিবীতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চরম পর্যায়ে উঠেছে।

মহাযুদ্ধের দুর্যোগ একটা সাইক্লোনের মতো পৃথিবীর সঙ্গে ভাগ্যাহত বাংলা দেশের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। দেশ সমাজ ঘর ভেঙেচুরে পড়ে গেল। দুর্ভিক্ষে মহামারীতে মানুষ মরছে—ঝড়ে ঝটকা-খাওয়া পশুপক্ষীর মতো। হাহাকার উঠেছে চারিদিকে।

হাহাকার! হাহাকার আর হাহাকার! দেশ-জোড়া স্বাধীনতা-আন্দোলনও সাময়িকভাবে ক্ষীণ হয়ে এসেছে। ইংরেজ ও আমেরিকার যুদ্ধোদ্যম বাঙলাদেশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়েছে। চট্টগ্রাম-ফেণী-গৌহাটি-ডিগবয়-ডিমাপুর-কোহিমার পরে উখরা-পানাগড়-পিয়ারাডোবা[১] বাসুদেবপুর-খড়্গপুর-মেদিনীপুর নিয়ে যুদ্ধের ঘাঁটির সে এক বিচিত্র বেষ্টনী। পিচঢালা সুগঠিত পথের একটার সঙ্গে অন্যটার যোগাযোগে একটা বিস্তীর্ণ বিরাট ভূখণ্ডব্যাপী মাকড়শার জাল।

গ্রামে গ্রামে অন্নাভাবে হাহাকার, শহরে শহরে ক্ষুধার্ত কঙ্কালসার ভিক্ষুকদের সকরুণ কাতর প্রার্থনা, 'একটু ফ্যান! একমুঠো এঁটো-কাঁটা। মা গো! মা!''

দোকানে চালের বদলে খুদ। তার সঙ্গে বালি ধুলো কাঁকর।

এরই মধ্যে চলে মিলিটারি কনভয়। জীপ-ট্যাঙ্ক-ওয়েপনকেরিয়ার, আরও হরেক রকমের বিচিত্রগঠন অটোমোবিল। মাথার উপরে ওড়ে ইংরেজ আর আমেরিকানদের যুদ্ধের প্লেন। গাড়িগুলোতে বোঝাই হয়ে চলে ইংরেজ এবং আমেরিকান পল্টন। তার সঙ্গে নিগ্রো কাফ্রী। যাবার সময় পথের ধারে মাঠে নেমে পড়ে এ-দেশের দুর্ভিক্ষ-ক্লিষ্ট ক্ষুধার্তদের উপর কমলালেবুর খোসা, চিবানো কোয়া ছুঁড়ে দিয়ে যায়। চিৎকার করে ডেকে যায়, হে—। হাতছানি দিয়েও ডাকে।

হি-হি করে হাসে।

কেউ কেউ আবার টাকা আধুলি ছুঁড়ে দেয়। ওরা দল বেঁধে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে ধুলোর উপর। শুকনো মাটির ধুলো ওড়ে। ওদের সর্বাঙ্গে লাগে। ওদিকে বিদেশী সৈনিকদের ক্যামেরা ক্লিক-ক্লিক শব্দে মুখর হয়ে ওঠে। তাদের মুখে ফুটে ওঠে বিচিত্র হাসি। ঘৃণা অনুকম্পা কৌতুক সব কিছু আছে সে-হাসির মধ্যে।

মধ্যে মধ্যে দেখা যায়, দল বেঁধে শ্বেতাঙ্গ সেপাইরা জীপে চড়ে চলছে। সমস্বরে গান জুড়ে দিয়েছে, অথবা প্রমত্ত কলরব তুলেছে। এবং তাদের ঠিক মাঝখানে শহর থেকে সংগ্রহ করা একটা কি দুটো নিম্নশ্রেণীর দেহ-ব্যবসায়িনী তাদের সকল আনন্দের উৎস, কড়া বিলাতী মদের নেশায় স্খলিতবাসা, অবশদেহে, টলছে বা ঢুলছে, ওদেরই অট্টহাসির সঙ্গে প্রমত্ত উল্লাসে হেসে সুর মেলাতে চাচ্ছে। পথে-ঘাটে যুবতী মেয়ের দেখা পেলেই ডাকে— হ্যালো হনি! মাই হনি! হনি হতভাগিনীরা ভয়ে শুকিয়ে কাঁপতে কাঁপতেও উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালায়। দু চারজন, স্বৈরিণী যারা; তারা দাঁড়িয়ে নির্লজ্জের মতো দাঁত মেলে হাসে।

পিয়ারাডোবায় একটা এরোপ্লেনের আড্ডা তৈরি হয়েছে। কয়েক মাইল দূরে বাসুদেবপুরে ছোটো একটা। মোরারে[২] ওয়েসলিয়ান চার্চের বাঙলোটার সামনে পুরীর রাস্তা আর একটা স্থানীয় রাস্তার মিশবার জায়গাটার পাশেই শালজঙ্গলের কোল ঘেঁষে প্রান্তরটা খুঁড়ে বড়ো বড়ো পেট্রল-ট্যাঙ্ক বসেছে। এখান থেকে পাইপ-লাইন চলে গেছে বাসুদেবপুরে পিয়ারাডোবা পর্যন্ত। বুলডোজার চালিয়ে মাটি কেটে বন কেটে জঙ্গলের মধ্যে কয়েকদিনের মধ্যে গড়ে তুলেছে বিচিত্র সামরিক ঘাঁটি। ময়দানবের হাতের মায়াপুরীর মতো। পিয়ারাডোবা স্টেশন থেকে সাইডিং এসেছে। বড়ো বড়ো ট্রেন এসে থামে। ট্রেন থেকে নামে প্রমত্ত বিদেশী সৈনিকের দল। মার্কিন সৈন্যদের পকেটে নোটের তাড়া। সঙ্গে প্রচুর টিনবন্দী খাদ্য। বিস্কুট রুটি। সাইডিঙের পাশে, স্টেশনের রেললাইনের পাশে—টিনের ছড়াছড়ি নয়—টিনের গাদা।

১। পিয়ারডোবা বা পিয়ালডোবা, ২। মোরারে নয়, হবে মড়ারে। উক্ত বাঙলো মোরারে নেই, আছে ২ নম্বর ক্যাম্পের রাস্তার ধারে।

হতভাগ্য দুর্ভিক্ষপীড়িত অর্ধনগ্ন মানুষেরা টিন কুড়িয়ে নিয়ে যায়, চেটে চেটে খায়। দিবারাত্রি আকাশ মুখরিত করে বম্বার ফাইটারগুলো মাথার উপর ঘুরছে। কোনোটা নামছে, কোনটা উঠছে।

সন্ধ্যের পর ইলেকট্রিক বাতি জ্বলে ওঠে। ঠুঙি পরানো, কিন্তু তবু তার ছটা আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ে। ওদের আড্ডাঘরে বাজনা বাজে, নাচ হয়। হো-হো শব্দে উল্লাসধ্বনি ওঠে। ঝিল্লিমুখর শালবনের মধ্যে নিবিড় অন্ধকার ওঠে। মাঝেমাঝে ঝিল্লিরাও বোধ হয় স্তব্ধ হয়ে যায়। বোধ করি প্রায় দুশো বছর আগের সামন্ত রাজাদের আমলে পাইকদের মশালের আলো, মাদলের বাজনা, হা-রা-রা ধ্বনি-তাণ্ডবের পর বনভূমির অন্ধকার এইভাবে আর চমকায় নি, ঝিঁঝিরাও হঠাৎ থামে নি। বর্গীদের আমলের পর বনভূমির মধ্যে ছড়ানো গ্রামগুলি এমনভাবে আর সভয়ে আলো নিভিয়ে অন্ধকারের আবরণে ঘুমিয়ে পড়ে নি। এসব গ্রামগুলি পাকা রাস্তা থেকে দূরে দূরে। বনের ভিতরের দিকে। সেখানে তারা অন্ধকারের মধ্যেই শোনে, পাকা রাস্তার উপর ঘর্ঘর শব্দ তুলে মোটর চলছেই, চলছেই। কখনও কখনও পল্টনের হৈ হৈ শব্দ। **তারই মধ্যে মেয়ের গলায় খিল্‌খিল হাসি শুনে তারা অন্ধকারের মধ্যেই চোখ বড় করে স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে ভাবে— এ মেয়েরা কারা? কোন দেশের? কোন জাতের?**"(পৃঃ— ৮-১১)

* * * *

যুদ্ধের বিভীষিকা সত্ত্বেও যুদ্ধের কাঁচা-পয়সার ছড়াছড়ি ছিল বিশেষ আকর্ষণীয় টোপ। এক্ষেত্রে আর একটি কথা বিশেষভাবে স্মরণ করা যেতে পারে সেটি হল বিষ্ণুপুরের কে.জি. ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউটের অন্তর্ভুক্ত বিষ্ণুপুর টেকনিক্যাল স্কুলটিকে এই যুদ্ধের সময়, খুব সম্ভব ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে 'War Technician Training Center' তথা যুদ্ধ সংক্রান্ত কারিগরি বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। তখন কম্যাণ্ডণ্ট্ ছিলেন স্কচ্ নাগরিক জি.এ. ওয়াকার এবং রিক্রুটমেণ্ট সেণ্টারের মেডিক্যাল অফিসার ছিলেন বিষ্ণুপুর কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লা নিবাসী ডাক্তার **দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়** (M.B.B.S; Gold Medalist.)। এখান থেকে প্রশিক্ষণ-প্রাপ্ত স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের সৈন্য বিভাগে চাকুরি জুটে যেত সহজেই। **সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিষ্ণুপুরে কর্মসংস্থানের অভিনব সুযোগ করে দিয়েছিল। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই আগস্ট জাপানের হিরোসিমা শহরে একটি এবং ৯ই আগস্ট জাপানের নাগাসাকি শহরে একটি, অর্থাৎ মোট দুটি আণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর এবং ৮ই আগস্ট রাশিয়া জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার পর জাপানের পক্ষে যুদ্ধ চালানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর জাপান মিত্রসৈন্যদের কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে। থেমে যায় বিষ্ণুপুরের উর্ধ্বাকাশে এরোপ্লেনের আনাগোনা, শোনা যায় না কর্ণবিদারী ভোঁ ভোঁ আওয়াজ কিংবা সাইরেনের করুণ আবেদন। বিদায় নেয় চার চাকা থেকে চব্বিশ চাকার ঢাউস গাড়ি, সাহেব-সুবা এবং বোমাতঙ্ক। ঘরে ঘরে রয়ে যায় বোমার খোল, ঝাঁঝর, লোহার বেঞ্চ এবং যুদ্ধের নগ্ন-স্মৃতি।**

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর ১৯৪৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত দ্বিখণ্ডিত হয়ে স্বাধীনতা লাভ করে। ঐ সময় পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) থেকে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য বাসুদেবপুর ও গামারবনী অঞ্চলের সেনাশিবিরগুলি নিয়ে গড়ে ওঠে **'উদ্বাস্তু-শিবির' বা 'শরণার্থী-শিবির'** এবং পূর্বোল্লিখিত পাদরী সাহেবের বাসস্থানটিতে গড়ে ওঠে **কুষ্ঠাশ্রম**। পরবর্তীকালে **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়** এই কুষ্ঠাশ্রম ও দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের বাতাবরণকে কেন্দ্র করে লিখেন পূর্বোক্ত **'সপ্তপদী'** উপন্যাস।

অধ্যায়-৫১
শ্রীশ্রীমুরলীমোহন জীউ
মহাপাত্রপাড়া

বিষ্ণুপুর পরিক্রমার এই পর্যায়ে আমরা উপনীত হয়েছি শহরের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত মুরলীমোহন জীউ-এর মন্দির প্রাঙ্গণে। মহাপাত্রপাড়ায় অবস্থিত আগাগোড়া মাকড়া পাথরে তৈরী মুরলীমোহন জীউ-এর এই শ্রীমন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন মহারাজ বীর সিংহের মহিষী চূড়ামণি দেবী। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই দেবালয়-নির্মাণ পরিকল্পনায় নতুনত্বের আভাস উদ্ভাসিত।

দৈর্ঘ্যে ৪৪ ফুট ২ ইঞ্চি, প্রস্থে ৪৩ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং উচ্চতায় ৩ ফুট,—বর্গাকার এক ভিত্তিবেদীর উপর নির্মিত মূল মন্দিরের দৈর্ঘ্য ৩৩ ফুট ১০ ইঞ্চি এবং প্রস্থ ৩৩ ফুট ৩½ ইঞ্চি। উচ্চতা সর্বসাকল্যে প্রায় ৪০ ফুট। **প্রায় বর্গাকার একরত্ন বিশিষ্ট এই মন্দিরটি নির্মাণের ক্ষেত্রে গতানুগতিক ত্রি-খিলানযুক্ত দালান-ছাদ সংস্থাপনের রীতিটি বর্জন করে তার পরিবর্তে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ প্রতি দিকেই চারটি করে অর্থাৎ মোট বারোটি সুদৃশ্য স্তম্ভের উপর স্বল্প বক্ররেখায় খিলান রচনা করে এখানে নির্মিত হয়েছে চতুষ্পার্শ্বে ঈষৎ ঢালু ছাদের আচ্ছাদন। গর্ভমন্দিরটিকে পরিবেষ্টনকারী স্তম্ভযুক্ত খোলা বারান্দা এ মন্দিরের অভিনবত্ব—যা বিষ্ণুপুরের আর কোন মন্দিরেই দেখা যায় না।**

গর্ভমন্দিরটি আবার দুই প্রস্থ বর্গাকার ভিত্তিদেওয়ালের উপর নির্মিত। গর্ভমন্দিরের অভ্যন্তরভাগে রয়েছে কয়েকটি ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ এবং উপরে উঠার সিঁড়িপথ। দক্ষিণমুখী এই শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরভাগের দেওয়ালে দেবালয়ের উপাস্য দেবতা **রাধামুরলীমোহন** জীউ-এর জন্য কুলঙ্গিযুক্ত বেদীও রয়েছে একটি। মন্দিরের বহির্ভাগের পূর্ব দেওয়ালের মধ্যস্থলে একটি প্রবেশ পথ এবং উত্তর ও পশ্চিম দেওয়ালের মধ্যস্থলে একটি করে বৃহদাকার আলমারি আদলের কুলঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। দক্ষিণ দেওয়ালের নীচের পটিতে হংসলতার চিত্রটিও হয়েছে চিত্তাকর্ষক।

কেন্দ্রীয় চূড়াটি অষ্টকোণ বেদীর উপর সংস্থাপিত। চক্রধ্বজ শিখরের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণে চারটি পত্রাকৃতির খিলান দরজাও নজর কাড়ে আমাদের। পাথরের উপর খোদাই কারুকার্য বিদ্যামান। পঙ্খের পলেস্তারার আভরণ আজও চোখে পড়ে অল্পস্বল্প। কয়েকটি ফুলকারী নক্সা ছাড়া এ মন্দিরের আদি স্তম্ভগুলির উপরিভাগের কোণায় কোণায় রয়েছে এক বিশেষ ভাবব্যঞ্জক মূর্তি। বৃশ্চিকাসনের ভঙ্গিমায় দেহটিকে উল্টোদিকে বৃত্তাকারে ঘুরিয়ে স্বীয় মস্তকে পদদ্বয় সংস্থাপন করে করজোড়ে প্রণামরত অবস্থায় ভক্তি-বিনম্র-চিত্তের ক্ষুদ্রাকৃতির এই খোদিত মূর্তিগুলি বিশেষভাবে উল্লেখ্য। **খোদাই-এর কাজ খুবই চিত্তাকর্ষক না হলেও ছিমছাম সৌন্দর্যে ভরা এ দেবালয়টি সার্বিক বিচারে এক কথায় নয়নাভিরাম।**

এ মন্দিরের কয়েকটি স্তম্ভ এবং ছাদের বেশ কিছু অংশ ভেঙে পড়েছিল কালের করালাঘাতে। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ (আর্কিয়লজিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া) এই স্থাপতিটিকে অধিগ্রহণ করে পুনর্নির্মাণ পূর্বক দেবালয়টিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছে।

বিষ্ণুপুর শহরের এক প্রান্তে অবস্থিত সুনসান শান্ত পরিবেশে নির্মিত এ মন্দিরটির

পশ্চাৎভাগে রয়েছে বর্গাকৃতির এক বৃহৎ জলাশয়। জলাশয়টি খনন করা হয়েছিল দেব-সেবার জল যোগানোর জন্য। দুঃখের বিষয় এ মন্দিরে আজ আর রাধা-মুরলীমোহন জীউ অবস্থান করেন না। **শ্রীবিগ্রহের যুগল মূর্তি এখন আছেন মাধবগঞ্জের মদনগোপাল মন্দিরে।** সামগ্রিকভাবে ঈশ্বর-উপাসনার উপযোগী এই দেবালয়ে দেববিগ্রহ না থাকলেও প্রতিদিন গোধূলি-লগ্নে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের গুটি কয়েক ঈশ্বর-প্রেমী বয়োবৃদ্ধ মানুষ সমবেত হয়ে ধর্ম ও শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করে দেবালয়টির আধ্যাত্মিক পরিবেশকে অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াসে ব্রতী আছেন।

এ মন্দির প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে 'বাঁকুড়া জেলার পুরাকীর্তি' গ্রন্থের লেখক শ্রদ্ধেয় অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "**বিষ্ণুপুরের রাশি রাশি মল্ল-মন্দিরের মধ্যে শুধু মুরলীমোহন ও মদনগোপাল মন্দির দুটির প্রতিষ্ঠাতা কোন মল্ল রাজা নয়, দুই রাজমহিষী। সেকালের ঘোর পর্দাপ্রথার যুগে মল্ল-মহিষীরা যে দেবালয়-প্রতিষ্ঠার মত এক জনহিতকর কাজের সঙ্গে নিজেদের নাম প্রকাশ্যভাবে যুক্ত করতে দ্বিধা করেননি, এ এক আশ্চর্য ঘটনা।** অতি সুন্দরভাবে খোদাই করা এ মন্দিরের চার পঙক্তির পাথরের উৎসর্গ লিপিটির পাঠ নিম্নরূপ ঃ

> শ্রীশ্রীদুর্জন সিংহ ভূপজননী মল্লাবনীবল্লভ
> শ্রীল শ্রীযুত বীরসিংহ মহিষী শ্রীশ্রীল চূড়ামণিঃ
> মল্লাব্দে শশিসপ্তরন্ধ্রবিমিতে শ্রীরাধিকাকৃষ্ণয়োঃ
> প্রীতৌ সৌধগৃহংন্যবেদয়দিদং পূর্ণেন্দুতোঽপ্যুজ্জ্বলম্। ৯৭১।

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণরাধিকার প্রীতির জন্য, রাজা শ্রীদুর্জন সিংহের জননী ও মল্লভূমের রাজা শ্রীবীর সিংহের মহিষী শ্রীমতী চূড়ামণি ৯৭১ মল্লাব্দে (১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে) পূর্ণচন্দ্রের থেকেও উজ্জ্বল এই সৌধগৃহ নিবেদন করলেন।"

মন্দিরের কথার পর আসা যাক উক্ত শ্রীমন্দিরের আরাধ্য দেবতা রাধা-মুরলীমোহন জীউ প্রসঙ্গে দু-চার কথায়। রাধা অর্থে রাধিকা সুন্দরী, আর মুরলীমোহন হলেন বংশীধারী অনিন্দ্যসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ। **কৃষ্ণ এত বেশী রূপবান ছিলেন যে অন্যের কথা কি বলব, তিনি একদিন যমুনার জলে প্রতিবিম্বিত নিজের রূপলাবণ্য দর্শন করে মোহিত হয়েছিলেন। একেই তো নয়নাভিরাম দৃষ্টিনন্দন রূপৈশ্বর্য, তাতে আবার তিনি গুণের আকর স্বরূপে গুণনিধি। রূপ এবং গুণের মূর্ত প্রতীক রূপে প্রতিভাত হয়ে তিনি হয়ে ওঠেন সর্বাঙ্গ সুন্দর।** অতএব তাঁর প্রতি জীবাত্মার সহজাত আকর্ষণ থাকাটাই স্বাভাবিক ; না থাকাটাই অস্বাভাবিক। এছাড়া আর একটি কথা উল্লেখ না করে পারি না— সেটি হল শ্রীকৃষ্ণের অস্ত্র 'সুদর্শন চক্র'। কিন্তু কোন কৃষ্ণ বিগ্রহের হাতে সুদর্শন চক্র নজরে পড়ে না। নজরে পড়ে বাঁশী। মনে প্রশ্ন জাগে অস্ত্র ত্যাগ করে কেন তিনি হাতে তুলে নিলেন বাঁশী; ফুঁ দিয়ে সৃষ্টি করলেন সুরমাধুরী, সুরলহরী। 'সুর' মানে দেবতা আবার 'সুর' অর্থে সুমিষ্ট ধ্বনি বা মধুর শব্দ। 'শব্দ-ব্রহ্ম' বলে একটা কথা আছে আমাদের শাস্ত্রে। শব্দের মধ্যে রয়েছে সেই ব্রহ্মশক্তি। 'আমি আপনাদের ভালোবাসি, শ্রদ্ধা করি'—বললে আপনাদের মধ্যে আনন্দধারা প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যদি বলি, "আমি আপনাদের ঘৃণা করি।"—তাহলে আপনাদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয় ভেবে দেখুন তো। শুধুমাত্র একটা কথার আঘাতে অনেকে আত্মহত্যা করেছেন আবার দুটো উৎসাহ ব্যঞ্জক কথার আনন্দে উল্লসিত হয়ে অনেকের জীবনে এসেছে আমূল পরিবর্তন—মাঙ্গলিক পরিবর্তন। **কথার মধ্যে অসাধারণ শক্তি নিহিত থাকার সুবাদেই শব্দ হয়েছে**

'শব্দ-ব্রহ্ম'। শ্রীকৃষ্ণের হাতের মুরলী শব্দ-ব্রহ্মের সূচক। তাইতো তিনি সুদর্শন চক্র সরিয়ে রেখে তুলে নিয়েছেন বাঁশী। বাঁশীর সুরে তিনি জয় করেছেন জগৎকে। একদিকে তাঁর রূপমাধুরী, অন্যদিকে বাঁশীর দিব্যসুর সব সময় প্রবলভাবে আকর্ষণ করছে জীবাত্মাকে। **জীবাত্মার পরমাত্মার প্রতি এবং পরমাত্মার জীবাত্মার প্রতি কেন এই দুর্বার আকর্ষণ?** উত্তরে বলি, সবই তাঁর ইচ্ছা, তাঁর লীলা।

আপনাদের মতো ভ্রমণসঙ্গী এবং শ্রোতা পেয়ে আমার বলার উৎসাহ বেড়ে গেছে বহুগুণ। আসুন আপনাদের ধৈর্যচ্যুতি না ঘটিয়ে পদাবলী-কীর্তন ও কবিতার মাধ্যমে শোনাই রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব।

কৃষ্ণ কে? বা কি?

সৃষ্টির আদি কারণের কারণ স্বরূপে প্রতিভাত হওয়ার সুবাদে নিরাকার ব্রহ্মের সাকার সত্তায় তিনি কৃষ্ণ। এতাদৃশ কৃষ্ণ স্বীয় লীলা আস্বাদনের জন্য স্বীয় সত্তাকে দুটি শক্তিতে বিভাজিত করেন, যথা পরা শক্তি ও অপরা শক্তি (অন্য অর্থে পরা প্রকৃতি বা অপরা প্রকৃতি)। পরা শক্তি হল পারমাত্মিক শক্তি আর অপরাশক্তি হল জীব ও জড় শক্তি। পরাশক্তি আবার দ্বিধারাতে বিভক্ত হয়ে রাধা ও কৃষ্ণ রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

রাধা কৃষ্ণের উৎপত্তি বিষয়ে **'দীপকোজ্জ্বল-গ্রন্থে'** সেই সুরটিই অনুরণিত হয়েছে দ্ব্যর্থহীন কাব্য সুষমায়,—

এক ব্রহ্ম যখন দ্বিতীয় নাহি আর।
সেই কালে শুনি ঈশ্বর করেন বিচার।।
অপূর্ব রসের চেষ্টা অপূর্ব কারণ।
কেমনে হইব ইহা করেন ভাবন।।
ভাবিতে ভাবিতে এক উদয় হইল।
মনেতে আনন্দ হৈয়া বিভোল হইল।।
অর্ধ অঙ্গ হৈতে আমি প্রকৃতি হইব।
অংশিনী রাধিকা নাম তাহার হইব।।
*　　*　　*
আপনি রসের মূর্তি করিব ধারণ।
রস আস্বাদিব আমি করিয়া যতন।।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে—

রস আস্বাদন লাগি হইলা দুই মূর্তি।
এই হেতু কৃষ্ণ হয় পুরুষ প্রকৃতি।।
প্রকৃতি না হইলে কৃষ্ণ সেবা জন্য নয়।
এই হেতু প্রকৃতি ভাব করয়ে আশ্রয়।।

এইভাবে প্রকৃতি এবং পুরুষ তথা রাধা ও কৃষ্ণের উত্তরণ ঘটল। একটি সত্তা দুটি সত্তাতে বিভক্ত হল—এবার শুরু হল বিরহ যাতনা এবং পরস্পরকে আকর্ষণ করার অদম্য বাসনা। শ্রীকৃষ্ণের মুখে চণ্ডীদাসের পদাবলীতে তাই আমরা শুনতে পাই—

রাই, তুমি যে আমার গতি।
তোমার কারণে　　রসতত্ত্ব লাগি
গোকুলে আমার স্থিতি।।

অন্যত্র আবার শোনা যায়—

প্রেমেতে রাধিকা স্নেহেতে রাধিকা
রাধিকা আরতি পাশে।
রাধারে ভজিয়া রাধাকান্ত নাম
পেয়েছি অনেক আশে।।
জ্ঞানেতে রাধিকা ধ্যানেতে রাধিকা
রূপেতে রাধিকাময়।
সর্ব্বাঙ্গে রাধিকা স্বপ্নেহ রাধিকা
সর্বত্র রাধিকাময়।।

রাধা প্রেমের এই তীব্র ব্যাকুলতা আরো মোহনীয় রূপে চিত্রিত হয়েছে চণ্ডী· ·
'কিশোরী' বিষয়ক পদগুলিতে—

উঠিতে কিশোরী বসিতে কিশোরী
কিশোরী গলার হার।
কিশোরী ভজন কিশোরী পূজন
কিশোরী চরণ সার।।
শয়নে স্বপনে গমনে কিশোরী
ভোজনে কিশোরী আগে।
করে ক'রে বাঁশী ফিরি দিবা নিশি
কিশোরীর অনুরাগে।।
কিশোরী চরণে পরাণ সঁপেছি
ভাবেতে হৃদয় ভরা।
দেখো হে কিশোরী অনুগত জনে
করো না চরণ-ছাড়া।।

কি তীব্র আকুতি! কি দারুণ নিদারুণ বিরহ!
আবার শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শনে শ্রীরাধার কি অবস্থা হল দেখা যাক। রাধারাণী বলছেন—

কি রূপ দেখিনু সই নাগর-শেখর।
আঁখি ঝুরে মন কাঁদে নয়ান ফাঁপর।।
কিবা রাতি কিবা দিন কিছুই না জানি।
জাগিতে স্বপনে দেখি শ্যামরূপখানি।।

আবার অন্যত্র শোনা যায়—

সই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মন প্রাণ।।
না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো
বদন ছাড়িতে না পারে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিলা গো
কেমনে পাইব সই তারে।।

প্রেমের গভীরতায় ডুব দিয়ে রাধারাণীর হৃদয় মথিত ব্যথা যেন নিকষিত হয়েছে

নীচের ছত্র কয়টিতে—

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।

শ্রীরাধার এই কামগন্ধহীন পবিত্র প্রেমের রসাস্বাদন করতে হলে জীবাত্মাকে গোপীভাব অবলম্বন করতে হবে। কারণ,

গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটি গুণ গোপী আস্বাদয়।।

কারণ গোপীগণ যে কৃষ্ণগত প্রাণ, কৃষ্ণের সুখেই তারা সুখী। কৃষ্ণের দুঃখেই তারা দুঃখী। কৃষ্ণ চরণে তারা নিবেদিত প্রাণ, তাই বলা হয়েছে—

অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ-সুখ লাগি মাত্র কৃষ্ণে সে সম্বন্ধ।।
আত্মসুখদুঃখ গোপীর নাহিক বিচার।
কৃষ্ণসুখ হেতু চেষ্টা মনোব্যবহার।।
কৃষ্ণ লাগি আর সব করি পরিত্যাগ।
কৃষ্ণসুখ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ।।

এই 'শুদ্ধ অনুরাগ'-কেই পাথেয় করে জীবের কৃষ্ণ লাভ হয় অর্থাৎ জীবাত্মা পরমাত্মাতে বিলীন হয়। নিবৃত্ত হয় পুনর্জন্ম।

মুরলীমোহন জীউ-এর মন্দির প্রাঙ্গণে বসে বসে সংক্ষেপে শোনালাম রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব; জীবাত্মা পরমাত্মার কথা। এবার আমরা উপনীত হব জলেশ্বর ও মল্লেশ্বর শিব-মন্দির প্রাঙ্গণে। যাওয়ার পথে শোনাব বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের দেওয়া উপাধি এবং উপাধিগুলির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে দু'চার কথা।

অধ্যায়-৫২

মল্লরাজাদের দেওয়া উপাধি এবং উপাধিগুলির বৈশিষ্ট্য

বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের মল্ল-নৃপতিগণ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করেছেন প্রায় ১০০০ বছর যাবৎ। এই সুদীর্ঘ রাজত্বকালে তাঁরা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম সম্পাদনের জন্য রাজকর্মচারী নিয়োগ করেছেন। কাজের গুরুত্ব এবং প্রকৃতি অনুসারে যথাযোগ্য উপাধি বা পদবী দান করেছেন। আবার তাঁরা তাঁদের প্রিয়পাত্র এবং মল্লভূমের অধিবাসীদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ কার্যে বিশেষ দক্ষতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের বিশেষ বিশেষ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। এরকম বহু উপাধির মধ্যে মাত্র কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করব সংক্ষেপে। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য, রাজকর্মচারীগণ এবং রাজা ও রাজপরিবারের প্রিয় পাত্র-মিত্রগণ এসব কাজের জন্য অর্থের পরিবর্তে বহুল পরিমাণে নিষ্কর জমি উপভোগ করতেন বংশ পরম্পরায়।

মহাপাত্র—এঁরা একাধারে রাজপুরোহিত এবং রাজার প্রধান অমাত্য বা উপদেষ্টা। পূজা-অর্চনা, শাস্ত্রপাঠ, রাজ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে সংস্কৃত চতুষ্পাঠী এবং টোল পরিচালনা করা মহাপাত্রদের কর্তব্যকর্ম ছিল। এঁরা জাতিতে ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুপুরের উত্তরে অবস্থিত মহাপাত্র পাড়াতে এঁদের বসবাস।

মহাদানী—মল্লরাজ্যে রাজকর্মচারীদের পারিশ্রমিক হিসেবে অর্থের পরিবর্তে দেওয়া হত নিষ্কর জমি। পদমর্যাদা অনুসারে জমির পরিমাণ নির্ধারিত হত। শুধু রাজকর্মচারী নয়, দেবকার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদের যেমন পুরোহিত, সেবাইত ছাড়াও সাধু-সন্ন্যাসী এবং ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদেরও প্রচুর পরিমাণে নিষ্কর ভূসম্পত্তি দান করা হত। এই দান কার্য সম্পাদনের জন্য নির্ধারিত ব্যক্তিবর্গ 'মহাদানী' পদবীতে ভূষিত হতেন। এঁরা বিষ্ণুপুর শহরের হাজরাপাড়া পল্লীর অধিবাসী।

সেনাপতি—সেনাপতি শব্দটির অর্থ সেনাধ্যক্ষ। সৈন্যবাহিনী-সংগঠন, প্রশিক্ষণ, পরিচালন এবং যুদ্ধকালে যুদ্ধ পরিচালনা করা সেনাপতির প্রধান কাজ। একাধারে সাহসী, সুদক্ষ, অনুগত এবং মল্লরাজ্যের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যাঁরা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত ছিলেন জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সেরকম ব্যক্তিবর্গকেই সেনাপতি পদে মনোনীত করতেন স্বয়ং রাজাধিরাজ। কুচিয়াকোল গ্রামে সেনাপতি পাড়া আছে। এঁরা অধিকাংশই ব্রাহ্মণ এবং তিলি।

ফৌজদার (পারসী)—প্রধান সেনাধ্যক্ষের নির্দেশে ফৌজ তথা সৈন্যবাহিনীর পরিচর্যা তথা দেখভাল করা এঁদের প্রধান কাজ। মল্লরাজ্যের আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজেও এঁরা নিযুক্ত থাকতেন। জরুরী অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে এঁদের তলব করা হত। পরবর্তীকালে ফৌজদার বংশীয় ব্যক্তিবর্গ পটচিত্রের রূপকার হিসেবেও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত দশ অবতার তাস এবং দুর্গার পট-চিত্র এঁরাই তৈরী করেন। বিষ্ণুপুরের শাঁখারী বাজার মহল্লায় এঁদের বসবাস।

সর্বাধিকারী—সর্ব বিষয়ে এবং সর্ব কার্যে অধিকার ছাড়াও সর্বত্র গমন, যেমন রাজবাড়ির অন্দরমহল পর্যন্ত যাঁর যাতায়াতের অবাধ অধিকার অনুমোদিত ছিল তিনিই হলেন সর্বাধিকারী। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরের গড়দরজা মহল্লার পাঠকপাড়া নিবাসী সর্বাধিকারী বংশের বর্তমান পুরুষ **শ্রীসুধাংশুকুমার বসু সর্বাধিকারী** মহাশয়ের নাম উল্লেখ্য। ইনি জাতিতে কায়স্থ।

দেওয়ান (আরবী দিবান্)—রাজস্ব-সচিব অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের প্রধান কর্মচারী। রাজস্ব আদায়, ভূ-সম্পত্তির হিসাব সংরক্ষণ, আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ করা, রাজ-কোষাগারের শ্রীবৃদ্ধি করা এঁদের অন্যতম কাজ। গড়দরজা বাদামতলার নিকটেই রয়েছে দেওয়ানবাটী। প্রয়াত শিক্ষক **সুধেন্দুবিকাশ দাস** ওরফে **লালুবাবু** ছিলেন দেওয়ান বংশীয় ব্যক্তি। এরকম আরো অনেকেই আছেন।

গোমস্তা— দেওয়ানের অধস্তন কর্মচারী। কাছারীতে বসে হিসাব সংরক্ষণ এবং দেওয়ানজীর নির্দেশে রাজ্যের গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে কর সংগ্রহ করাই ছিল গোমস্তাদের প্রধান কাজ। সঙ্গে থাকত পাইক, বরকন্দাজ-বাহিনী।

পাঠক—রাজা এবং রাজপরিবারের সদস্যদের ধর্মগ্রন্থ এবং শাস্ত্রপাঠ করে শোনানোই ছিল এঁদের প্রধান কাজ। ব্রাহ্মণ-গোত্রীয় পাঠক পদবীধারী ব্যক্তিগণ পাঠক পাড়াতে বসবাস করেন।

বাগীশ—সুবক্তা এবং ভাষ্যকার। তর্ক-বিতর্কে এবং আলোচনা-চক্রে অংশগ্রহণ, রাজার বক্তব্যের ভাষ্যকারের ভূমিকায় অংশগ্রহণ ছাড়াও কোন বিষয়ের উপর মনোগ্রাহী বক্তৃতা দেওয়ার দক্ষতার সুবাদে এঁরা বাগীশ উপাধি লাভ করেন। এঁরা জাতিতে ব্রাহ্মণ। বিষ্ণুপুরের বাগীশ পাড়ায় এঁদের বসবাস। এঁরা তন্ত্র-মন্ত্র, ঝাড়ফুঁক ছাড়াও বসন্ত এবং মিলমিলের ওষুধ দিতেন।

ভাণ্ডারী—রাজ্যের শস্য-ভাণ্ডার যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং রাজাজ্ঞানুসারে তা যথাযথ বণ্টন ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করার সুবাদে বিষ্ণুপুররাজ এই কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে ভাণ্ডারী উপাধি দেন। এঁরা জাতিতে বৈশ্য। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, বিষ্ণুপুরের তিলবাড়িতে ছিল রাজার শস্যভাণ্ডার।

কবিরাজ—রাজপরিবারের সদস্য-সদস্যাদের এবং রাজকর্মচারীদের চিকিৎসা ও ঔষধ দেওয়ার সুবাদে এঁরা হন কবিরাজ। রোগ নিরাময়ে বিশেষ দক্ষ কবিরাজগণ রাজবৈদ্য এবং রাজকবিরাজ সম্মানে সম্মানিত হতেন। রাজবাটীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত রয়েছে কবিরাজদের জন্য নির্ধারিত বাসস্থান কবিরাজ পাড়া। এঁরা জাতিতে বৈদ্য বিশেষ। বর্তমানে এঁরা দাশগুপ্ত ও সেনগুপ্ত উপাধি লিখে থাকেন।

মহন্ত, মোহান্ত, মহান্ত—মহৎ অন্তঃকরণ বিশিষ্ট ব্যক্তি। এঁরা দেবমন্দির মঠ বা অস্থলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ সন্ন্যাসী। নয় প্রকারের ভক্তিযুক্ত কৃষ্ণভক্ত-রূপে এঁরা চিহ্নিত। মহন্ত শব্দের অর্থ সন্ন্যাসী হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেছে এঁদের অনেকেই ভোগাসক্তি বশতঃ সংসার জীবনে আবদ্ধ হয়েছেন। মল্লরাজারা মল্লরাজ্যে অনেক অস্থল বা অতিথিশালা নির্মাণ করান। মল্লনৃপতিগণ এবং রাজকর্মচারীগণ রাজকার্যে রাজধানীর বাইরে যাওয়ার অবকাশে ঐসব অস্থলে ভজন, ভোজন এবং বিশ্রামের পর অশ্বপরিবর্তন করে অন্যত্র গমন করতেন। বিষ্ণুপুর শহরের নিমতলা মহল্লা, কুম্ভস্থল, চাতরা গ্রাম এবং পাঁচমুড়ার নিকট লেদার গ্রামে এরূপ অস্থলের সন্ধান মেলে আজও। প্রতিটি অস্থলেই নাকি রঘুনাথ জীউ প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং থাকেন মহন্ত।

দণ্ডপাঠ—অপরাধী ব্যক্তির উদ্দেশ্যে রাজার দণ্ডাদেশ যিনি সর্বসমক্ষে পাঠ করে শুনিয়ে দিতেন তিনিই দণ্ডপাঠ উপাধিতে ভূষিত হতেন। দণ্ডাজ্ঞা যথাযথ পালন করা হল কিনা, এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখা এবং রাজাকে যথা সময়ে তা অবগত করানো দণ্ডপাঠ-এর অন্যতম কাজ। এঁরা জাতিতে গোয়ালা বিশেষ। মহারাজ বীর হাম্বীর দণ্ডপাঠ উপাধি দেন। এ প্রসঙ্গে বাঁকুড়া জেলার দৌনি পোস্টের অন্তর্গত কাশীডাঙা গ্রামে বসবাসকারী **শ্রীমৃত্যুঞ্জয় দণ্ডপাঠের** নাম উল্লেখ্য।

বধিলা—মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত অপরাধীদের বধ্যভূমিতে বধ করাই এঁদের একমাত্র কাজ। এঁরা জাতিতে শূদ্র বিশেষ। বিষ্ণুপুরের বধিলা পাড়া অপভ্রংশে বৈলা বা বইলা পাড়াটিই ছিল বধ্যভূমি। বধিলা পাড়াতে আজও বধিলা উপাধিধারী ব্যক্তিগণ বসবাস করেন।

নটী—রাজা, রাজকর্মচারী এবং রাজ-অতিথিদের নৃত্যগীত দ্বারা চিত্ত বিনোদন, রাজপরিবারের মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান, যেমন—রাজ্যাভিষেক, অন্নপ্রাশন, বিবাহ প্রভৃতি শুভ কর্মে নৃত্যগীত পরিবেশন ছাড়াও রাজরাজেশ্বরী মা মৃন্ময়ীর শারদীয়া দুর্গোৎসবে আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত পরিবেশন করাই ছিল এঁদের কাজ। দুর্গোৎসবে গান গাওয়ার জন্য এঁরা প্রতিদিন মা মৃন্ময়ীর অন্নভোগ পেতেন। এছাড়া স্বয়ং রাজা স্বহস্তে এঁদের এক খিলি করে পান ছাড়াও নববস্ত্র এবং ধনরত্নও উপহার দিতেন। **পণ্ডার বাঈ, কুমুদ বাঈ, লক্ষ্মী**

বাঈ এবং ঐ প্রজন্মের শেষ বাঈ, **উষা বাঈ** (উষারাণী দাসী)-এর নাম স্মরণ করা যেতে পারে। **উষা বাঈ বিষ্ণুপুর নিমতলা মহল্লায় অবস্থিত বাসন্তীমাতার মন্দির সংলগ্ন নাট-মন্দির নির্মাণ প্রকল্পে প্রয়োজনীয় সমস্ত টাকা দান করেছেন।** শহরের ইঁদকুড়ি বা ইঁদতলা, রাণার পুকুর এবং রাঙামাটি অপভ্রংশে রাঙামেটা অঞ্চলে ছিল নটীপল্লী।

গায়েন—সাধারণ মানের গান— যেমন তুষু, ভাদু, ঝুমুর, খেউড়, হাফ্-আখড়াই, তরজা প্রভৃতি অনুষ্ঠানে পেশাদার গায়ক হিসেবে যাঁরা গান গাইতেন তাঁরাই হলেন গায়েন।

বায়েন—সাধারণ বাদ্যযন্ত্র—যেমন কাড়া, নাকাড়া, ঢাক, ঢোল, টিকরা, সানাই, ফ্লুট, ধাম্‌সা প্রভৃতি বাজিয়ে পূজা, রাজ্যাভিষেক, বিবাহাদি মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে এবং শিকারযাত্রা ও যুদ্ধযাত্রাতে যাঁরা অংশগ্রহণ করতেন তাঁরাই হলেন বায়েন। কথিত আছে মহারাজ বীর হাম্বীরের রাজত্বকালে শ্রীনিবাস আচার্য পরিচালিত রাস যাত্রাভিনয়ে জনৈক ব্যক্তি খুব সুন্দর বাজিয়েছিলেন। গুণমুগ্ধ মহারাজ তাঁকে বায়েন উপাধি সহ প্রচুর ভূ-সম্পত্তি দান করেন। সেই থেকে পরিবারটি উত্তরাধিকারী সূত্রে 'বায়েন' আখ্যায় ভূষিত হন।

সরখেল—পূর্বোক্ত অনুষ্ঠান সমূহ ছাড়াও পালাগান, যাত্রাভিনয়, কৌতুকাভিনয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে যাঁরা বিচিত্র ধরনের স্বর সৃষ্টি করে শ্রোতাদের হাস্যরস পরিবেশন পূর্বক আনন্দ দিতেন তাঁরা সরখেল পদবী লাভ করেন।

বায়েন, গায়েন, সরখেল উপাধিধারী ব্যক্তিবর্গ বিষ্ণুপুর এবং বিষ্ণুপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলিতে বসবাস করেন।

মহাদণ্ড—মহাদণ্ড উপাধিটি অপভ্রংশে হয়েছে মাদোড় বা মাডোল। এঁদের কাজ হল বারুদ তৈরী করা এবং পূজা-পার্বন, উৎসব-আনন্দানুষ্ঠানে নির্দিষ্ট দণ্ডে বা সময়ে তোপধ্বনির সংকেত দেওয়া এবং তোপধ্বনি করা। মা মৃন্ময়ীর দুর্গাপূজার সন্ধিপূজাতে তামী বা জলঘড়ির সংকেত অনুসারে, শুদ্ধাচারে এবং উপবাসী অবস্থায় তোপধ্বনি করা এঁদের অন্যতম কাজ। মাদোড়েরা জাতিতে নিম্ন বর্ণের। বংশানুক্রমে ওঁরা অদ্যাবধি এ কাজ করে আসছেন।

পাঞ্জা—রাজার আদেশনামাতে যাঁরা পাঞ্জা বা রাজার করতলের ছাপ বসিয়ে দিতেন তাঁরাই পাঞ্জা পদবীতে সম্মানিত হতেন। এঁদের উত্তর পুরুষগণ রয়েছেন বিষ্ণুপুরে এবং বিষ্ণুপুর সন্নিকটস্থ রাহাগ্রাম ও হীরাপুরে। খুব সম্ভব আকবরের আমলে পাঞ্জা প্রথা চালু হয়। পাঞ্জা শব্দটি অপভ্রংশে হয়েছে পাঁজা।

চক্রবর্তী—রাজাকে চক্রবৎ বেষ্টন করে থাকতেন। অর্থাৎ রাজার আশে পাশেই থাকতেন সদাসর্বদা এবং রাজার মন্ত্রীসভায় মূল্যবান শলাপরামর্শ দিতেন। চক্রবৎ অবস্থানের সুবাদে চক্রবর্তী উপাধি লাভ হয়। এঁরা পূজা-অর্চনা ও বিদ্যাচর্চা করতেন।

আয়কাত—মল্লরাজ্যের চরম দুর্দিনে, বিশেষতঃ রাজার রাজত্ব যখন নিলামে বিক্রী হয়ে যায় সেই সময় কায়স্থ অপভ্রংশে কায়েত পদবীধারী ব্যক্তি 'কায়েতী বুদ্ধি'র দ্বারা রাজাকে নতুন আয়ের উৎসের সন্ধান দিয়ে আয়কাত উপাধি লাভ করেন। এক্ষেত্রে আয়ের উৎসের 'আয়' এবং কায়েতের 'কাত' অংশ নিয়ে আয়কাত উপাধি গঠিত হয়েছে। বর্তমানে বিষ্ণুপুরের বসুপাড়া নিবাসী **শ্রীশ্যামল আয়কাত এবং শ্রীকমল আয়কাত** ছাড়াও বিষ্ণুপুর হাজরাপাড়া মহল্লার আয়কাত ডাঙাতে রয়েছেন **শ্রীবৈদ্যনাথ আয়কাত, শ্রীসুধাংশু আয়কাত, শ্রীঅমিত আয়কাত** প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

হাজরা—এঁরা রাজকর্মচারীদের হাজিরা নিতেন। এছাড়া রাজার কাছ থেকে হাজার

বিঘা জমি বন্দোবস্ত নিয়ে চাষবাস করতেন। হাজিরা নেওয়া এবং হাজার বিঘা জমি চাষ করার সুবাদে এঁরা হাজরা উপাধি প্রাপ্ত হন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে হাজরাপাড়ার কাছেই রয়েছে মাড়ুইবাজার। মাড়ুইবাজার মাড়াই বাজারের বিকৃত উচ্চারণ। শস্য মাড়াই করা হত এই এলাকায়। আবার হাজরাপাড়া এবং মাড়ুইবাজারের নিকটে রয়েছে ভাচাতি পাড়া। ভাচাতি পাড়ার লোকেরা নির্ধারিত বানি বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ধান ভানতো অর্থাৎ ধান থেকে চাল করতো।

বাজারী—নির্ধারিত করের ভিত্তিতে হাট-বাজারের বাৎসরিক বন্দোবস্ত নিতেন এঁরা। সাধারণতঃ জাতিতে এঁরা ছিলেন গোয়ালা।

কলামুড়ি—রাজপরিবারে এবং রাজকর্মচারীদের নিয়মিত কলা ও মুড়ি জাতীয় জলখাবার যোগান দেওয়ার সুবাদে এঁরা কলামুড়ি উপাধি লাভ করেন। মল্লরাজ্যের পিয়ালডোবা (পিয়ারডোবা) অঞ্চলে এঁদের বংশধর রয়েছেন। এ প্রসঙ্গে **পরিমল কলামুড়ির** নাম স্মরণ করা যায়। এঁরা জাতিতে গোয়ালা।

ধামাতকরণি বা ধামাতকর্মী—ধর্মাধিকরণিক পদবীর অপভ্রংশ ধামাতকরণি বা ধামাতকর্মী। এঁরা জাতিতে ব্রাহ্মণ। রাজার বিচারকার্যে অংশগ্রহণের পাশাপাশি বিচারকর্মে ধর্মীয় বিধি যথাযথ পালনের ওপর নজর রাখা ছাড়াও উৎসবাদিতে 'ধামা'-তে করে দেববিগ্রহ স্নান করাতে ও স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়ার সুবাদে এঁরা ধামাতকরণি বা ধামাতকর্মী নামে খ্যাত। দ্বারকেশ্বর নদের উত্তরে স্থিত উলিয়াড়া গ্রামের **যামিনী ধামাতকরণির** পূর্বপুরুষগণ ও গোকুলনগরের ব্রাহ্মণেরা একাজ করতেন।

ঘাটোয়াল (দেশজ শব্দ)—ঘাট, ঘাটি, খেয়াঘাট নির্দিষ্ট এলাকা ও প্রবেশপথ প্রভৃতি রক্ষকদের ঘাটোয়াল বলা হত। রাজ্য রক্ষার জন্য মল্লরাজাদের বাইশ শত ঘাটোয়াল ছিল। ভূমিজ নিম্নবর্ণের এই শ্রেণীর মানুষেরা নিষ্কর জমি ভোগ করতেন।

সদিয়াল—পাঁচজন ঘাটোয়াল প্রতি থাকত এক একজন সদিয়াল। সদিয়াল ঘাটোয়ালদের ঊর্ধ্বতন কর্মচারী।

দিক্‌পতি—কয়েকজন সদিয়ালের উপর থাকত এক এক জন দিক্‌পতি। ঘাটোয়াল অপেক্ষা সদিয়াল এবং দিকপতিগণ অধিক পরিমাণে নিষ্কর জমি ভোগ করতেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি বৃটিশ আমলে ইংরাজ সরকার ঘাটোয়াল-সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে এলে **ঘাটোয়াল বিদ্রোহ** বা **পাইক বিদ্রোহ** হয়। ঘাটোয়াল বিদ্রোহের অপর নাম **চুয়াড় বিদ্রোহ**।

প্রতিহার বা প্রতিহারী—প্রতিহার বা প্রতিহারী শব্দের আভিধানিক অর্থ দারোয়ান, দ্বারপাল, দৌবারিক বা দ্বাররক্ষী। বিষ্ণুপুরের রাজন্যবর্গের প্রতিহার বা প্রতিহারী পদবীধারী রাজকর্মচারীগণ শুধুমাত্র দ্বাররক্ষীই ছিলেন না, এঁরা ছিলেন রাজাধিরাজের আজ্ঞাবাহী সশস্ত্র দেহরক্ষী স্বরূপ। রাজার আদেশ নির্দেশ পালন করার জন্য সদাসর্বদা এঁরা রাজার কাছে কাছে ছায়ার মতো অবস্থান করতেন।

পাত্র— প্রচলিত বিশ্বাস রাজদর্শনে অশেষ পুণ্য হয়। মল্লরাজারা নির্ধারিত সময়ে প্রজা সাধারণকে দর্শন দিতেন। রাজদর্শনে প্রীত রাজভক্ত প্রজাগণ মহারাজকে যেসব উপঢৌকন দিতেন বা ভেট দিতেন সেগুলি পাত্রে ধারণ করে রাজঅন্তঃপুরে যাঁরা পৌঁছে দিতেন তাঁরা পাত্র বলে পরিগণিত হতেন। রাজার পার্শ্বচর, প্রিয়পাত্র এবং পাত্র ধারণের সুবাদে তাঁদের পূর্বোক্ত পদবীতে সম্মানিত করা হত। **পিতাম্বর পাত্র** দুর্জন সিংহদেবের

রাজত্বকাল থেকে প্রথম গোপাল সিংহদেবের রাজত্বকাল পর্যন্ত মন্ত্রীও ছিলেন। ইনি ১০৫ বছর জীবিত ছিলেন। বর্তমানে এঁর বংশধর **শ্রীপ্রিয়ব্রত পাত্র** ইন্দাসের নিকট মেরাল গ্রামের অধিবাসী। এঁরা এখন দাশগুপ্তও লিখে থাকেন।

মুখ্যা—মল্লরাজত্বে বিষ্ণুপুরে ৪১টি পাড়া ছিল। যেমন মদনমোহনগঞ্জ ২২ পাড়া, মাধবগঞ্জ ১১ পাড়া এবং কৃষ্ণগঞ্জ ৮ পাড়া। এই ৪১টি পাড়ার প্রতি পাড়াতে থাকতেন একজন করে মুখ্যা বা গণপ্রতিনিধি। মুখ্যার কাজ ছিল নিজ পল্লীর শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা। গৃহবিবাদের মীমাংসা করা। অনাচার ব্যাভিচারকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া। এসব কাজে মুখ্যা মশাই পল্লীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে সভা ডেকে বাদী এবং বিবাদী উভয় পক্ষের অভিযোগ শুনে সকলের মতামত নিয়ে আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতেন। স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মনোনীত ব্যক্তিকে স্বয়ং রাজা মুখ্যা পদে নির্বাচিত করতেন। এ প্রসঙ্গে কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লার ঁ**সতীশ চন্দ্র দত্তমুখ্যার** নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। ইনি অত্যন্ত সৎ, ধীর, স্থির, শান্ত, নম্র, বিচক্ষণ এবং স্বল্পভাষী মানুষ ছিলেন। ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী **শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী** বিষ্ণুপুরে এলে জেলার কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে ঁসতীশ চন্দ্র দত্ত মুখ্যা মহাশয় ইন্দিরা গান্ধীকে পুষ্পমাল্য দিয়ে বরণ করেন।

খাজাঞ্চী—ধনাধ্যক্ষ বা কোষাগার রক্ষক। ইংরাজী পরিভাষায় বর্তমানে যাকে ট্রেজারার বলে মল্লরাজ্যে তিনিই ছিলেন কোষাধ্যক্ষ বা খাজাঞ্চি।

রাজগুরু—রাজপরিবারের শিশু সন্তানদের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে শিক্ষাদান কার্যে নিযুক্ত ব্যক্তি রাজগুরু মর্যাদা লাভ করেন। রাজগুরু বংশের উত্তরপুরুষ হিসেবে মাধবগঞ্জ বসুপাড়া মহল্লা নিবাসী **শ্রীরাখহরি রাজগুরু** (হাবল ঠাকুর) মহাশয়ের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বিশ্বাস—রাজার অত্যন্ত আস্থাভাজন ব্যক্তি বা বিশ্বাসী ব্যক্তিকে বিশ্বাস উপাধি দেওয়া হয়। এঁরা জাতিতে কায়স্থ। গড়দরজা পাঠকপাড়া মহল্লা নিবাসী ঁ**জগবন্ধু বিশ্বাস** ছিলেন একজন বিশিষ্ট আইনজীবী। রাজ-পরিবারের পক্ষ থেকে 'মল্লভূম ইস্টেট' দেখাশোনার ব্যাপারে এঁকে 'power of attorney' বা ওকালতনামা দেওয়া ছিল।

অগ্রদানী—রাজপরিবারের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উপাধি বা পদবী দান করা হত। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের প্রথম বিধান অশৌচ দোষ কাটানোর জন্য অঙ্গপ্রায়শ্চিত্ত করা হয়। এরপর হয় তিল-কাঞ্চন সহ প্রথম পিণ্ডদান। তিলগুলি স্বর্ণদ্রব্য দিয়ে ঢাকা থাকত। রাজা সেই 'তিল-কাঞ্চন' পাত্র নিয়ে সমবেত ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতমণ্ডলীর উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধবাসরের প্রথম দান বা অগ্রদান গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাতেন। উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতদের মধ্যে যিনি সেই প্রথম দান গ্রহণ করতেন তাঁকেই অগ্রদানী পদে ভূষিত করা হত। অদ্যাবধি উক্ত ব্রাহ্মণের বংশধরগণ অগ্রদানী ব্রাহ্মণের কাজ করে আসছেন। গোকুলনগরের সন্নিকটে অগ্রদানী ব্রাহ্মণ আজও বিদ্যমান।

আচার্য বা গ্রহাচার্য—পূর্বোক্ত বিধানের পর সূর্যপূজা বিধেয়। শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের এই সূর্য-পূজাতে সোনার কোষা নিয়ে দাঁড়িয়ে সূর্যার্ঘ্য দিতেন রাজা। অতঃপর সোনার কোষা দান হিসেবে গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানাতেন।

এমতাবস্থায় উঠে দাঁড়িয়ে সেই দান যিনি গ্রহণ করতেন মহারাজ তাঁকে সূর্য-পূজার অধিকারী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে আচার্য বা গ্রহাচার্য মর্যাদায় ভূষিত করতেন।

হস্তরেখা বিচার, জ্যোতিষশাস্ত্র চর্চা এবং যে কোন পূজার নির্ঘণ্ট তৈরী ছাড়াও মা

মৃন্ময়ীর দুর্গা পূজাতে তামী (জলঘড়ি) ধরার কাজ এঁরা করতেন। শ্রাদ্ধাদি কার্যে প্রধান পুরোহিতের আজ্ঞাবাহী বা সহকারী পুরোহিত রূপেও কাজ করতেন। এখনও করেন। গণনা-কার্যে সুদক্ষ এই ব্রাহ্মণ সমাজের বসবাস বিষ্ণুপুর শহরের উত্তরে অবস্থিত চাকদহ পল্লীতে।

মণ্ডল—অত্যন্ত উৎকৃষ্ট মানের মিষ্টান্ন এবং মতিচুর তৈরী করার জন্য মাড়ুই বাজার মহল্লা নিবাসী শ্রীমহাদেব নাগ মণ্ডলের পূর্বপুরুষ গোপাল নাগকে রাজা মণ্ডল উপাধি দেন। সেই থেকে অদ্যাবধি সাতপুরুষ ধরে তাঁরা স্বীয় পদবী নাগের পাশে মণ্ডল উপাধি লিখে আসছেন।

হাটুই—বিষ্ণুপুরের গড়দরজা মহল্লা নিবাসী ৮৩ বছর বয়স্ক শ্রীগৌরীশঙ্কর হাটুই মহাশয় জানালেন তাঁরা জাতিতে সদগোপ, পূর্বতন উপাধি ছিল ঘোষ। বিষ্ণুপুরের রাজ পরিবারের হাট বাজার করে দেওয়ার জন্যই সম্ভবতঃ তাঁর পূর্বপুরুষেরা হাটুই উপাধি লাভ করেন।

সর্দার—যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত পদাতিক বাহিনীর যাঁরা নেতৃত্ব দিতেন তাঁদেরকে সর্দার উপাধি দেওয়া হত।

লায়েক—লায়েক শব্দটি নায়ক উপাধির অপভ্রংশ। (নায়ক>লায়ক>লায়েক) সর্দারের প্রায় সমগোত্রীয় ব্যক্তিবর্গ লায়েক উপাধি লাভ করেন।

নামহাতা—বিষ্ণুপুরের ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণব রাজাগণ ইষ্টমন্ত্র জপ করার জন্য জপমালা ব্যবহার করতেন। রাজার হাতে যাঁরা নাম জপের মালা তুলে দিতেন তাঁরাই নামহাতা আখ্যা লাভ করেন। বিষ্ণুপুর রাসতলা মহল্লার শ্রীরামপদ নামহাতা তাঁদেরই উত্তরপুরুষ। এঁরা জাতিতে সদ্‌গোপ (চাষা)। আগে এঁদের পদবী ছিল ঘোষ।

ঝারিমুন্না বা ঝারিমুন্যা—এঁরাও জাতিতে সদ্‌গোপ (চাষা)। রাজার ফুলের বাগানে ঝারিতে করে ফুলগাছে জল দেওয়া এবং পূজার ফুল তুলে দেওয়া এঁদের কাজ ছিল। সম্ভবতঃ কিশোর বয়সের বালকেরা এ কাজ করত। হিন্দীতে বাচ্চা ছেলে এবং কিশোর বালকদের মুন্না বলা হয়। ঝারি এবং মুন্না শব্দ দুটির সংযোগে হয়েছে ঝারিমুন্না। অপভ্রংশে ঝারিমুন্যা। বিষ্ণুপুরের দশমাইল উত্তরে অবস্থিত রাধানগর গ্রামে রয়েছেন এঁদের উত্তর-পুরুষ। **শ্রীকার্তিক ঝারিমুন্না, শ্রীপঞ্চানন ঝারিমুন্না, শ্রীগণেশ ঝারিমুন্নার** নাম উল্লেখ্য।

এছাড়াও **পরিখা, চৌধুরী, সুমণ্ডল, দেবঘরিয়া, বাহাদুর, আস্তাড়ি, লাখোটিয়া, ক্রোড়ি, ঘর, বর, বর্ধন, ঘটক** প্রভৃতি পদবীগুলিরও সন্ধান মেলে। এসব উপাধি এবং পদবীগুলি মল্লরাজাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের আভাসের পাশাপাশি তাঁদের রাজ্যশাসন প্রণালীর ওপরও আলোকপাত করে সুস্পষ্টভাবে।

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের দেওয়া বহু উপাধির মধ্যে মাত্র কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করা হল এখানে। **এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালালে বা গবেষণা করলে আরো অনেক নতুন নতুন পদবীর সন্ধান পাওয়া যাবে এখনও। অন্যথায় খরস্রোতা কালের গহ্বরে হয়তো বা হারিয়ে যাবে অর্থ ও তাৎপর্যপূর্ণ উপাধিগুলি। কারণ মল্লরাজত্বের অবসানের সাথে সাথে রাজার দেওয়া উপাধি পরিত্যাগ করে অনেকেই ফিরে যাচ্ছেন নিজ নিজ উপাধিতে। অবশ্য অনেকে আবার ভুলে গেছেন স্বীয় উপাধি। তাঁরা রাজার দেওয়া উপাধিগুলি গ্রহণ করেছেন সর্বান্তঃকরণে।** কথায় কথায় আমরা এসে গেছি **জলেশ্বর ও মল্লেশ্বর** শিবমন্দির প্রাঙ্গণে।

অধ্যায়-৫৩

জলেশ্বর ও মল্লেশ্বর শিবমন্দির

মল্লেশ্বর পল্লী

বিষ্ণুপুর মল্লেশ্বর মহল্লায় রয়েছেন জলেশ্বর ও মল্লেশ্বর শিব। প্রথমেই আসা যাক মল্লেশ্বর শিবের কথায়।

মল্ল + ঈশ্বর = মল্লেশ্বর। মল্লেশ্বর হলেন দেবাদিদেব মহাদেব অর্থাৎ শিব ঠাকুর। আর মল্লেশ্বর স্ত্রীয়াম্ ঈপ্ প্রত্যয় যোগে হয়েছে মল্লেশ্বরী। মল্লেশ্বরী হচ্ছেন বিষ্ণুপুরের রাজ-রাজেশ্বরী মা মৃন্ময়ী অর্থাৎ কিনা স্বয়ং দুর্গা। **সুতরাং মল্লভূম হল গিয়ে শিব-দুর্গারই ঘর-সংসার।** রাজসিক গরিমায় দৃপ্ত দেবী দুর্গা, পক্ষান্তরে ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিত আত্মভোলা ভোলানাথ। দুর্গার মধ্যে রজোগুণ এবং শিবের মধ্যে সত্ত্বগুণ বিশেষভাবে প্রকটিত। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাগণ প্রথমে শক্তি উপাসনা করে শাক্ত হয়েছেন। পরে হয়েছেন শাক্ত এবং শৈব। তারও পরে হয়েছেন কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও রামের উপাসক। অবশ্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে মল্লরাজাদের কুলদেবতা হলেন অনন্তদেব—যিনি নামান্তরে বিষ্ণু। **এতদর্থে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মল্লনৃপতিগণের রক্তে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণবীয় ভাবধারা বিশেষভাবে পরিস্ফুট।** শক্তি স্বরূপিণী দশপ্রহরণধারিণী দশভুজা দুর্গার উপাসনায় তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে ক্ষাত্রশক্তি, শিবের উপাসনায় এসেছে ত্যাগ ও তিতিক্ষা ; কৃষ্ণ-বিষ্ণু উপাসনায় এসেছে প্রেম, মাধুর্য এবং বিনয়। **মল্লাধিপতিগণের এক হাতে তাই অসির ঝঞ্ঝনা, অন্য হাতে অকাতরে ত্যাগের বাসনা। আবার অন্তরে তাঁরা প্রজাসাধারণের হিতার্থে জাহ্নবী-যমুনা বিগলিত-করুণা-স্বরূপ।**

মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরে মা থাকবেন, অথচ থাকবেন না বাবা—এমনটা হতে পারে না। রাজ-রাজেশ্বরী মল্লেশ্বরী মা মৃন্ময়ী স্বীয় পীঠস্থান হিসেবে বেছে নিলেন কিল্লাজাত মহল্লা অর্থাৎ রাজদরবার। আর সত্ত্বগুণ সম্পন্ন ভোলাবাবা নিজ পীঠস্থান হিসেবে বেছে নেন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ অধ্যুষিত এলাকা বিষ্ণুপুরের ভট্টাচার্য পাড়া। **ভোলাবাবার নাম হল মল্লেশ্বর। মল্লাবনীর ঈশ্বর মহেশ্বর—সঙ্গীতের আদি গুরু।**

বিষ্ণুপুরে মা দুর্গার অনেক পরে এসেছেন শিব; যদিও বিষ্ণুপুরের পূর্ব দিকে অবস্থিত সলদা ও গোকুলনগর গ্রামে ভুবনেশ্বর এবং গন্ধেশ্বর শিবলিঙ্গ সহ অসংখ্য ছোট বড় শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রাজা চন্দ্র মল্লের রাজত্বকালের আগে এবং পরে। বিষ্ণুপুরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বহুলাড়া গ্রামে প্রায় আটাত্তোর ফুট সুউচ্চ অসাধারণ কারুকার্যে নয়নাভিরাম জৈন মন্দিরটি শিব-মন্দিরে রূপায়িত হয়েছিল জৈন প্রভাব অবলুপ্তির সাথে সাথে। বিষ্ণুপুরের উত্তরে ডিহর গ্রামে অবস্থিত ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর শিব-মন্দির মহারাজ পৃথ্বীমল্লের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৩৪৬ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৬৫৮ বৎসর আগে। বিষ্ণুপুরের অনতিদূরে এসব শৈবতীর্থ গড়ে উঠলেও খোদ বিষ্ণুপুর শহরে রাজ উদ্যোগে শিবমন্দির এবং শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয় কিন্তু ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে। উক্ত মন্দিরটিই হল এই মল্লেশ্বর মন্দির এবং মন্দিরাভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি হলেন মল্লেশ্বর শিব।

মল্লেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠার বিষয়ে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক মহলে নানা জনের নানা মত। দেবালয়টি ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এ বিষয়ে যদিও সকলেই একমত তথাপি মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় প্রতিষ্ঠাতাকে নিয়ে। মন্দির গাত্রে প্রোথিত প্রতিষ্ঠালিপিটি এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট আলোকপাত করতে পারেনি। লিপিটিতে লেখা আছে—

বসুকর নব গণিতে মল্লশকে শ্রীবীরসিংহেন।
অতি ললিতং দেবকুলং নিহিতং শিবপাদপদ্মেষু।।

[৯২৮ মল্লাব্দে শ্রীবীর সিংহ কর্তৃক অতি ললিত দেবকুল (দেউল) শিবপাদপদ্মে নিহিত (সমর্পিত) হইল।]

কিন্তু কে এই বীর সিংহ?

'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী' গ্রন্থপ্রণেতা এ প্রসঙ্গে তাই লিখেছেন, "উক্ত শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণকর্ত্তা ও প্রতিষ্ঠাতা বীরসিংহ ব্যক্তিটি যে কে, তা বেশ ভালভাবে বোঝা যায় না।

কারণ, বিষ্ণুপুরের আরও সব শ্রীমন্দির নির্ম্মাণকারী ও প্রতিষ্ঠাতা ব্যক্তিদের নামের পূর্ব্বে নৃপতির নাম ও তাঁর পিতৃপরিচয়াদি দেওয়া আছে। কিন্তু এর প্রস্তরফলকে তার কোন উল্লেখ নেই। আর সেই সময় বিষ্ণুপুর রাজবংশের সিংহ উপাধিও ছিল না। সেই জন্য মনে হয় বীরসিংহ নামে বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের কোন নিকট আত্মীয় বিষ্ণুপুর রাজের অনুমতি নিয়ে ঐ মল্লেশ্বর শিব-মন্দির নির্ম্মাণ ও প্রতিষ্ঠা করেন।"

মন্দির সংলগ্ন 'নোটীশ বোর্ডে' 'আর্কিয়জিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া'র পক্ষে যে কথাগুলি লেখা হয়েছে তা হল নিম্নরূপ।

"**পশ্চিমমুখী এই শিবমন্দিরটি বিষ্ণুপুরের প্রাচীনতম মন্দিরগুলির মধ্যে অন্যতম।** মন্দিরের সম্মুখভাগে উৎকীর্ণ উৎসর্গলিপি হইতে জানা যায় এই দেউল-রীতির মাকড়া পাথরের মন্দিরটি রঘুনাথ সিংহ কর্তৃক ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এই বর্গাকৃতি মন্দিরটির মূল শিখরটির পরিবর্ত্তে পরবর্ত্তীকালে একটি অষ্টভুজাকৃতি শিখর পুনঃস্থাপন করা হয়।"

রঘুনাথ সিংহ এবং মল্লেশ্বর শিবমন্দির প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অভয়াপদ মল্লিক লিখেছেন, "The temple of Malleswar was built by him ; .... it was dedicated to the God Shiva in the name of his father Beera Singha (Hambeera). (History of Bishnupur-Raj, P.40)

'পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া' গ্রন্থের রচয়িতা তরুণদেব ভট্টাচার্যও বীর সিংহকে নিয়ে ধাঁধায় পড়েছেন। আবার দেখি 'বাঁকুড়ার মন্দির' পুস্তক প্রণেতা অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই বীর সিংহকে নিয়ে পড়েছেন গোলক-ধাঁধায়। আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় হল বীর হাম্বীর, রঘুনাথ সিংহ, বীর সিংহ প্রভৃতি নৃপতিগণের রাজত্বকালের সময়সীমা নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। মতভেদের এতাদৃশ ঘন ধোঁয়াশা থেকে সঠিক বীর সিংহকে উদ্ধার করার চেষ্টাটি হবে অন্ধের হাতি দেখার মতো ব্যাপার। সুতরাং এপ্রসঙ্গে নীরব থেকে মন্দিরস্থাপত্য এবং শিবতত্ত্ব বিষয়ে সরব হওয়াই বোধ করি শ্রেয়।

বিষ্ণুপুরের অন্যান্য মন্দিরের তুলনায় এ মন্দিরটি একেবারে সাদাসিধা। "প্রবেশ-তোরণের খিলানটি পত্রাকৃতি। খিলান-শীর্ষে ছোট একটি 'আমলক' ও 'কলস' স্থাপিত থাকায় সেটিকে কিছুটা মোসলেম-প্রভাবিত বলে মনে হয়। এর ঠিক উপরে, এক কুলুঙ্গির মধ্যে, হাতি ও মাহুতের প্রস্তর মূর্তিটি সন্নিবিষ্ট। প্রতিষ্ঠাফলকটি তার উর্ধ্বে মন্দিরগাত্রে নিবদ্ধ আছে। বর্তমান সৌধটির ভিত্তি-নকশা, পাদদেশের উদ্গত অংশগুলি

ও প্রবেশদ্বারটি ছাড়া আর কিছুই হয়ত আদি মন্দিরের সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। চুনকাম-করা পলস্তারার প্রয়োগে গোটা ইমারতটিকে বর্তমানে এতই আধুনিক রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে যে এটি যে বিষ্ণুপুরের প্রাচীনতম দেবালয় সেকথা প্রতিষ্ঠালিপিটি না দেখলে অনুমান করা শক্ত।'[১]

মল্লেশ্বর শিবের প্রধান উৎসব গাজন। চৈত্র সংক্রান্তির পরিবর্তে এই গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় অক্ষয় তৃতীয়া তিথিযোগে। গাজনের অন্যতম অঙ্গ চড়ক পূজার সুবাদে মল্লেশ্বর শিব-প্রাঙ্গণ 'চড়কতলা' নামে পরিচিত।

মল্লেশ্বর মন্দির চত্বরের দক্ষিণদিকে ছাদ বিশিষ্ট একটি বাঁধানো জলাশয়ের মধ্যে জলেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। অবহেলা এবং ঔদাসীন্যে জলাধারটি মজে গিয়ে মাটি চাপা পড়েছে জলেশ্বর শিবলিঙ্গটি।

জলেশ্বর শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার তত্ত্বগত অর্থটি বোধ করি জলাধারে শিবলিঙ্গ উপাসনার মাধ্যমে দেবাদিদেব আশুতোষকে তুষ্ট করে কৃষিনির্ভর খরাপ্রবণ বাঁকুড়াতে কাঙ্ক্ষিত বৃষ্টি লাভের অভিপ্রায়ই অনুরণিত। "প্রার্থিত এই জলের আশায় ভক্ত-প্রাণ মানুষেরা দেবাদিদেব মহাদেবের সন্তোষ বিধানার্থে বুঝিবা বাবার মাথায় জল ঢালার ব্রত উদযাপন করেন পুরো শ্রাবণ মাস ধরে। বাবার মাথায় জল দিয়ে জল ফিরে পাওয়ার ব্রতই যেনবা শ্রাবণের জলধারা ব্রতের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। **তারকেশ্বরের তারকনাথ, বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর, বিষ্ণুপুরের ষাঁড়েশ্বর থেকে শুরু করে পশ্চিমবাংলায় কেন, সারা ভারতবর্ষে যেখানে যত শৈবতীর্থ আছে সর্বত্রই এই জল-ধারার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।**

.... শ্রাবণ মাসে শিবলিঙ্গে জল ঢালার আধ্যাত্মিক কারণটি হল—শিব ঠাকুরের জন্ম-মাস নাকি শ্রাবণ মাস। জন্মমাসে বাবাকে স্নান করিয়ে, বাবার মাথায় জল ঢেলে, বাবাকে তৃপ্ত করে বাবার আশীর্বাদ কামনা করেন শিবভক্তগণ। তাই দেখি শ্যাওড়াফুলির গঙ্গা থেকে যেমন ঘুঙুর বাঁধা সুসজ্জিত বাঁকের সাহায্যে কাঁধে করে জল বয়ে এনে পুরুষ ও মহিলা ভক্তেরা ঢালেন তারকেশ্বরের তারকনাথের মাথায়, অনুরূপভাবে শুশুনিয়া পাহাড়ের ঝর্ণার পবিত্র জল নিয়ে এসে ভক্তগণ ঢালেন বাঁকুড়ার বাবা **এক্তেশ্বর** এবং বিষ্ণুপুরের **ষাঁড়েশ্বর** ও **শৈলেশ্বরের** মাথায়। অনেকে আবার শিলাবতী কিংবা দ্বারকেশ্বরের জল নিয়েও ঢালেন বাবার মাথায়। কাঁধে জলের বাঁক নিয়ে দুলকি চালে সারিবদ্ধভাবে কখনো পাকা রাস্তা, কখনো বা কাঁচা রাস্তা ধরে মন্দিরাভিমুখে এগিয়ে যেতে দেখা যায় ভক্তবৃন্দকে। এই সময় রাস্তার ধারে ধারে গড়ে ওঠে অস্থায়ী চটি। সেখানে বিশ্রাম, ভোজন এবং রাত্রি যাপন করেন ভক্তগণ। তারপর ছন্দে ছন্দে আবার শুরু হয় পথ চলা, মুখে মুখে ধ্বনিত হয় সুমধুর বোল ঃ

ভোলে বাবা পার করেগা
ত্রিশূলধারী পার করেগা
খাল বিল পার করেগা
লম্বা রাস্তা পার করেগা
বিপদ্ আপদ্ পার করেগা
বোম্ বোম্ ভোলে বোম্
বোম্ বোম্ তারক বোম্।"

---

১. বাঁকুড়ার মন্দির, পৃঃ—১৮৩

জলেশ্বর শিবের কথা প্রসঙ্গে বললাম জলধারা ব্রতের কথা। এখন মল্লেশ্বর শিবের মন্দির প্রাঙ্গণের শ্যামলা শ্যামলা ঘাসের গালিচায় বসে ফিরে যাই শিবপূজার তত্ত্বকথায়।

শিব এবং শিব-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে **'ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ'**-এর ব্রহ্ম খণ্ডে বলা হয়েছে—

'শি' শব্দেতে পাপ নাশে, 'ব' মুক্তিদায়ক।
সুমঙ্গল শব্দ শিব পাপবিনাশক।।
প্রতি শব্দে যেই জন শিব-নাম করে।
কোটি জন্মার্জিত পাপ দূরে যায় সরে।।

এই সর্বপাপ তাপহারী মঙ্গলময় শিব আদিতে কোন্ দেবতা রূপে চিহ্নিত এবং কতদিন যাবৎ তিনি পূজিত হয়ে আসছেন?—এ প্রশ্নের উত্তরে 'বাঙালি জীবনে বর্ষশেষ' শীর্ষক প্রবন্ধে উপরোক্ত বিষয়ে **অতুল সুর** লিখেছেন, "শিব হচ্ছেন অনার্য দেবতা। শিব কত প্রাচীন দেবতা তা আমাদের জানা নেই। তবে মহেঞ্জোদরোতে আমরা শিবের প্রতিরূপ মূর্তি পেয়েছি। তা থেকে বোঝা যায় যে অন্তত পাঁচ হাজার বছর ধরে আমরা শিবের পূজা করে আসছি।" এখন প্রশ্ন, শিবঠাকুরের মূর্তির পরিবর্তে আমরা শিবলিঙ্গের পুজো করি কেন? উত্তর হল, **'শিবপূজা আসলে প্রতীক পূজা। শিবলিঙ্গটি হল পুরুষ-যৌনাঙ্গ আর গৌরীপট্টটি হল নারী-জননেন্দ্রিয়। দুটির সংযুক্ত রূপের অন্তর্নিহিত অর্থ হল পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন—যার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব বা সৃষ্টির বীজ। শিব ঠাকুরের হাতের ত্রিশূল যেমন ধ্বংসকে সূচিত করে, তেমনি আবার মা গৌরীর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শিব ঠাকুর করে থাকেন সৃষ্টি ও লালন-পালন। তাই মহাদেবকে একাধারে স্রষ্টা, সংরক্ষক ও সংহারক বলা হয়।"** (ষাঁড়েশ্বর-মাহাত্ম্য, পৃঃ—৩৩)

শিবঠাকুরের শরীরী-মূর্তির পরিবর্তে লিঙ্গ-মূর্তি পূজার প্রচলন প্রসঙ্গে 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থের লেখক শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "কোন কোন পণ্ডিতের মতে ভারতীয় শৈবসম্প্রদায় কর্তৃক শিবের উপর সৃষ্টিকর্তার রূপটি আরোপ করবার পর থেকেই, সৃষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লিঙ্গরূপেই, তাঁর রূপ-কল্পনার প্রসার হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও বহু প্রাচীন কাল থেকেই লিঙ্গপূজা সৃষ্টিক্রিয়ার আদিম প্রতীকরূপে কল্পিত। এই বহুল প্রচলিত প্রতীকের মাধ্যমে লিঙ্গপূজা সেজন্য শিবের পিতৃত্বেরই পরিচায়ক। .... **শিবলিঙ্গ জগৎ সৃজনের দায়িত্বশীল এক দেবতার-প্রতীক মাত্র।** শালগ্রাম শিলা যেমন নারায়ণের প্রতীক, তেমনি যোনিপট্টভেদকারী পাথরের এই দণ্ডও সৃষ্টিকর্তা শিবের প্রতীক।" আবার এক শ্রেণীর গবেষক মনে করেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের **'স্তূপ পূজা'** থেকেই শিবলিঙ্গ পূজার উদ্ভব।

লিঙ্গপূজার কথায় ইতি টেনে এবার বলি শিবলিঙ্গের প্রকার ভেদের কথা। শিব-লিঙ্গের প্রকারভেদ বিষয়ে ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মার্চের 'বর্তমান' পত্রিকাতে **জাহ্নবী কুমার চক্রবর্তী** মহাশয় লিখেছেন, **"লিঙ্গ প্রতীকরূপে শিব সর্বভারত ব্যাপ্ত। এই লিঙ্গ প্রতীকগুলি কোথাও অকৃত্রিম, কোথাও বা কৃত্রিম। প্রকৃতি থেকে স্বাভাবিকভাবে যে লিঙ্গমূর্তিগুলি সৃষ্ট হয়েছে, সেগুলিকে বলা হয় অকৃত্রিম লিঙ্গ। অকৃত্রিম লিঙ্গগুলির ভিতর যেগুলি স্থাণু বা অচল সেগুলিকে বলা হয় জ্যোতির্লিঙ্গ। সোমনাথ, কেদারনাথ,**

উজ্জয়িনীর মহাকাল, বারাণসীর বিশ্বেশ্বর প্রভৃতি অকৃত্রিম স্বয়ম্ভু জ্যোতির্লিঙ্গ। আর প্রকৃতিজাত যে অকৃত্রিম লিঙ্গ-মূর্তি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়া যায়, সেগুলিকে বলে বাণলিঙ্গ। বাণলিঙ্গও অকৃত্রিম স্বয়ম্ভু কিন্তু জঙ্গম। আর মানুষেরা কারিগরের সাহায্যে দ্রব্য বিশেষ দ্বারা (প্রস্তর, রজত, স্ফটিক, মৃত্তিকা প্রভৃতি) যে লিঙ্গ প্রতীক তৈরী করে পূজা করে, তাদের বলা হয় কৃত্রিম লিঙ্গ-মূর্তি।"

শিবতত্ত্ব সম্বন্ধে কিছুটা আলোকপাত করলাম অল্প কথায়, সময় সুযোগ মতো আবার ফিরে আসব শিবসাধনার বিষয়ে। এখন আসুন, মল্লাধিপতি মল্লেশ্বর শিবের চরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই সাষ্টাঙ্গে —

প্রভুমীশমনীশমশেষগুণং
গুণহীনমহীশগলাভরণম্।
রণ-নির্জ্জিত-দুর্জ্জয়-দৈত্যপুরং
প্রণমামি শিবং শিবকল্পতরুম্।।

* * *

দিনভর আকাশ-পরিক্রমা করে সতেজ-সূর্য কেমন ক্লান্ত, শ্রান্ত, নিষ্প্রভ। আমরাও সারাদিন শহর-পরিক্রমা করে হয়ে পড়েছি পরিশ্রান্ত, অবসন্ন। সুতরাং দ্বিতীয় দিনের পরিক্রমার পরিসমাপ্তি এখানেই। মল্লেশ্বর মহল্লার পাশেই রয়েছে শাঁখারীবাজার মহল্লা। আগামীকাল ঠিক সকাল ছ'টার সময় আপনারা এসে যাবেন শাঁখারীবাজার মহল্লার ঝাঁপানতলায়। সেখান থেকেই শুরু হবে আমাদের তৃতীয় দিনের পরিক্রমা।

তৃতীয় দিনের পরিক্রমা

অধ্যায়-৫৪

মনসা পূজা ও ঝাঁপান উৎসব

শাঁখারীবাজার

সুপ্রভাত। আপনারা খুবই পাংক্‌চিউয়্যাল্‌ দেখছি। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় এসে গেছেন। তৃতীয় দিনের পরিক্রমার প্রারম্ভেই বিষ্ণুপুরের শাঁখারীবাজার মহল্লার 'দশর কালীমাতা'—প্রাঙ্গণে তথা ঝাঁপানতলায় বসে বসে শোনাই বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যমণ্ডিত ঝাঁপান উৎসবের কথা। রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক, গবেষক, প্রত্নতাত্ত্বিক তথা আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু মাণিকলাল সিংহ মহাশয় তাঁর 'পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি' পুস্তকে মল্লভূমের মনসাপূজা ও ঝাঁপান সম্বন্ধে একটি তথ্যসমৃদ্ধ পূর্ণাঙ্গ এবং মনোজ্ঞ চিত্র এঁকেছেন। উক্ত নিবন্ধটির উল্লেখযোগ্য অংশ সমূহ এক্ষণে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—

"সমগ্র রাঢ়বঙ্গে[১] মনসাদেবীর পূজা প্রচলিত। কিন্তু তাহারই মধ্যে মল্লভূমের মনসাপূজার সঙ্গে কতকগুলি বিশেষ রীতির সংস্কার জড়িত রহিয়াছে। মল্লভূমের মনসাপূজার বৈশিষ্ট্যগুলির সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্বে দেখা দরকার মল্লভূম তথা দক্ষিণরাঢ়ের সর্পদেবতার মূল কোথায়? খৃষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে মহাবীর রাঢ়ে জৈন ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। দক্ষিণ রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া দেখা যায় যে এখানে **আদিনাথ, পার্শ্বনাথ, শান্তিনাথ** এবং **মহাবীর**—এই চারিজন তীর্থঙ্করের মূর্তিই বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। বৌদ্ধ এবং হিন্দু তান্ত্রিকদের মতই পরবর্তীকালে জৈনতন্ত্রের প্রভাব রাঢ়ে প্রসারিত হয়। জৈনতন্ত্র অনুযায়ী **জৈন শাসন যক্ষ যক্ষিণী** এবং অন্যান্য দেবদেবীর প্রচলন ঘটে। পার্শ্বনাথের সর্পবিভূষিত মূর্তি মল্লভূমের বিভিন্ন গ্রামে সর্পদেবতা রূপে পূজিত হইতেছেন। পার্শ্বনাথের শাসনযক্ষিণী **পদ্মাবতী** দেবীর সম্বন্ধে দেখা যায় যে তিনি সর্পবাহনা, কনকবর্ণা, চতুর্ভুজা। তাঁহার দক্ষিণ করদ্বয়ে পদ্ম ও পাশ এবং বাম করদ্বয়ে ফল ও অঙ্কুশ রহিয়াছে। **পদ্মাবতীর একাধিক মূর্তি মল্লভূমে মনসাদেবী রূপে পূজিতা হইতেছেন।** জৈনদেবী গৌরী গোধাসনা—**'গোধাসনা ভবেৎ গৌরী'**। মল্লভূমের জয়পুর থানার মধ্যে (বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত) রাউতখণ্ড গ্রামের **জগৎগৌরী**, অযোধ্যা গ্রামের **কালীবুড়ী**, বিষড়া গ্রামের **বিষহরি** বিখ্যাত সর্পদেবী। বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী লাপুড় গ্রামের **লাপুড়সিনি** এবং বারপেট্যা গ্রামের **মাদানী** প্রভৃতি সর্পদেবী বিখ্যাত। **এই সমস্ত সর্পদেবীর প্রাচীন শিলামূর্তি দেখিয়া স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে মল্লভূমের তথা দক্ষিণ রাঢ়ের সর্পদেবী মনসার মূলে জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ এবং জৈনতন্ত্রোদ্ভূত পদ্মাবতী এবং গৌরীদেবী বিদ্যমান।**

---

১. রাঢ়বঙ্গ — বাঙলার অন্তর্গত গঙ্গার পশ্চিমদিকস্থ দেশ।

মল্লভূমের মৎসজীবী কেওট, জেলে, বাগ্দী, মাঝি, খয়রা ইত্যাদি জাতিগুলির কুলদেবী মনসা। এই জাতিগুলি বাদেও অনুন্নত গোষ্ঠীভুক্ত হাড়ী, লোহার, লায়েক, বাউরী, বারুই ইত্যাদি জাতিগুলির মধ্যেও মনসাপূজার বিশেষ প্রচলন দেখা যায়। মল্লভূমের প্রায় সমস্ত গ্রামেই মনসা গ্রামদেবী এবং লোকদেবী রূপে পূজিতা হন। প্রত্যেক গ্রামেই এক বা একাধিক মনসা মেলা দেখা যায়। মৎসজীবী গোষ্ঠীগুলির এবং অনুন্নত গোষ্ঠীভুক্ত বাউরী, হাড়ী, লোহার, লায়েক, বারুই ইত্যাদি জাতির মানুষের ঘরে ঘরে মনসার প্রতিষ্ঠা। বিষ্ণুপুরের চৌদ্দ-পনের মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত পাঁচমুড়ার কুম্ভকারদের তৈয়ারী পোড়ামাটির হাতি, ঘোড়া, মনসার মেড় বা চাল, বারি এবং সর্পমূর্তি সমন্বিত ঘট-মনসা বিশেষ প্রসিদ্ধ। লোকশিল্পের নিদর্শনরূপে উক্ত পোড়ামাটির দ্রব্যগুলি বর্তমানে পৃথিবীর বহুদেশে সমাদৃত। তাহাদের তৈয়ারী মনসামেড়, বারি, ঘটমনসা ইত্যাদি মল্লভূমের অধিকাংশ অঞ্চলেই পূজিতা হন। কাঁচা মাটি দিয়া মনসা মূর্তি তৈয়ারী করিয়া পূজা করার রীতি এ অঞ্চলে কদাচিৎ দেখা যায়। যাহারা খুবই দরিদ্র তাহারা গৃহের উঠানে তুলসী মঞ্চের নিকট সিজ-মনসার গাছ বা ডাল পুঁতিয়া মনসাদেবী রূপে পূজা করে। মনসার গানের মধ্যে রহিয়াছে—'কেউ বা পূজে সিজের ডাল মা, কেউ ঘট বারি।'....

মল্লভূমের অঞ্চল প্রসিদ্ধা মনসা দেবীদের পূজায় ছাগ বলির রীতি দেখা যায়—কিন্তু অনেক মনসার পূজায় বলি আদৌ হয় না। মল্লভূমের মনসা পূজার আরম্ভ হয় দশহরার দিন এবং সমাপ্তি হয় নলডাকা (আশ্বিন সংক্রান্তি) সংক্রান্তির দিন। দশহরায় গঙ্গাদেবীর পূজা হয়। মাতৃরূপা গঙ্গাদেবী সন্তানদের দশ রকমের পাপ হরণ করেন। এইজন্য তিনি দশহরা নামে অভিহিতা। কিন্তু এই বিশেষ দিনটিতে মনসা পূজার তাৎপর্য কোথায়? দশহরা হইতে বৃষ্টি বা বর্ষার আরম্ভ। বর্ষার প্রারম্ভে প্রথম বন্যার সঙ্গে সঙ্গে পাহাড় অঞ্চলের সর্পকূল সমতল এবং নিম্নভূমিতে নদ-নদী খাল-বিল বাহিয়া নামিয়া আসে। এই নবাগত সর্পকুলের সহিত মল্লভূমের মৎস্যজীবী গোষ্ঠীগুলির প্রথম পরিচয় ঘটে। মৎস্যজীবী গোষ্ঠীভুক্ত নরনারীর জীবনে প্রায়ই সর্পাঘাত জনিত মৃত্যু ঘটে। এই নিত্যবিপর্যয় এবং স্বাভাবিক সর্পভীতি হইতেই মৎসজীবী জাতিগুলির কুলদেবী মনসা এবং দশহরা হইতেই মনসাপূজার আরম্ভ। ...

মল্লভূমের সর্বত্র গৃহস্থগণ দশহরার প্রত্যুষে নিজ নিজ বাসগৃহের দেওয়াল ও প্রাচীরগুলিকে বেষ্টন করিয়া গোময়ের গণ্ডী দেয়। ইহাকে 'গোবর বেড়ি' বলে। প্রচলিত সংস্কার হইল, দশহরার দিন বাস্তুকে ঘিরিয়া 'গোবর বেড়ি' দিলে সারা বৎসরের মধ্যে কোন সর্পই বাড়ীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারিবে না। দশহরার দিন কেলেকঁড়া নামক একরকম বনজ ফল সামান্য দুধের সঙ্গে মিশাইয়া দাঁতে না চিবাইয়া খাওয়ার সংস্কারও এই মল্লভূমে প্রচলিত। মানুষের বিশ্বাস, দশহরার দিন কেলেকঁড়া ফলের টুকরা খাইলে সারা বৎসরের মধ্যে সর্পাঘাতে মৃত্যু হইবে না।

দশহরার দিন মল্লভূমে আর একটি অনুষ্ঠান প্রচলিত। এই দিন ঘুড়ি উড়ান এবং ঘুড়ির সুতা কাটাকাটির রেষারেষি হইয়া থাকে। দশহরার দিন সচরাচরই বৃষ্টি হয়। এই দিন সুবৃষ্টি হওয়া শুভ বলিয়া বিবেচিত। প্রচলিত সংস্কার অনুসারে মানুষ বিশ্বাস করে যে, দশহরার দিন সুবৃষ্টি হইলে বিষধর সর্পগুলির বিষ ধোয়া যায়। অযোধ্যা গ্রামের অঞ্চল-বিখ্যাত সর্পদেবী কালীবুড়ীর দশহরা উপলক্ষ্যে উৎসব হয়। উক্ত দেবী ঐ দিন দ্বারকেশ্বর নদের জলে স্নান করেন। কোন বৎসর দশহরা উপলক্ষ্যে দ্বারকেশ্বরের বন্যা

না হইলে দেবীর স্নানে ত্রুটি রহিয়া গেল বলিয়া মনে করা হয়। দশহরার ঠিক পরবর্তী কৃষ্ণাপঞ্চমীতে মনসাপূজা বা অষ্টনাগ পূজা। এই পূজা রাঢ়বঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত। এইদিন লাপুড় গ্রামের **'লাপুড়সিনি'** এবং বারপেট্যা গ্রামের মাদানী দেবীর (সর্পদেবী) উৎসব মল্লভূমের মনসা পূজাগুলির অন্যতম। কৃষ্ণাপঞ্চমী নাগপঞ্চমী বলিয়া পরিচিত। এই নাগপঞ্চমী দিনে মল্লভূমের তন্তুবায় জাতি এবং সরাক তাঁতিদের উৎপত্তির কিংবদন্তীতে কথিত আছে যে, তন্তুবায় জাতির আদিপুরুষ শিবের মানসপুত্র শিবদাস যখন মহাদেবের আদেশে তাঁত যন্ত্রটি খাটান তখন পৃথিবীতে কোথাও সুতা ছিল না। মহাদেবের আদেশে অষ্টনাগই তাঁত খাটানো ব্যাপারে সুতোর কাজ করিয়াছিল। সেই আদিম সংস্কার বশেই তন্তুবায় এবং সরাক তাঁতিরা তাঁতের পূজার দিন অষ্টনাগেরও পূজা করেন।

রাঢ়বঙ্গে বিদ্যার দেবী সরস্বতী এবং মনসা। সরস্বতী সুবিদ্যার দেবী— সেই জন্য তাঁহার পূজা মাঘ মাসে শুক্লা পঞ্চমীতে আর মনসা জড়ি, বড়ি, ঝাড়-ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র ইত্যাদি কুবিদ্যার দেবী বলিয়া তাঁহার পূজা হয় মেঘাচ্ছন্ন বর্ষাদিনের কৃষ্ণা পঞ্চমীতে। সরস্বতী শ্বেতপদ্মের পক্ষপাতী, কিন্তু মনসার তুষ্টি রক্তপদ্মে বা জবাফুলে। এই দুই বিদ্যাদেবীর পূজার দিনেই **অরন্ধন**। সরস্বতী পূজায় পঞ্চমীর পরদিন ষষ্ঠী দিন বাসি ভাত তরকারি খাওয়ার রীতি। মনসা দেবীর বিশেষ পূজা শ্রাবণ সংক্রান্তিতে — এই দিনটি মল্লভূমে 'মা-খল' বলিয়া অভিহিত। **খলরূপিণী মাতার পূজা—তাই 'মা-খল' বলিয়া পরিচিত।** মল্লভূমের অধিবাসীগণ কেহ কেহ শ্রাবণ সংক্রান্তির পূর্বদিন রান্না করিয়া 'মা-খল' দিনে বাসি ভাত-তরকারি আহার করেন। আবার কেহ কেহ শ্রাবণ সংক্রান্তিতে রান্না করিয়া ১লা ভাদ্র তারিখে বাসি ভাত-তরকারি খায়। **সরস্বতী পূজার অরন্ধন দিনে শিল-নোড়ার বিরতি। মনসাপূজার অরন্ধনের দিন উনোনের বিরতি।** ওই দিন উনোনের মধ্যে পাঁচ বা সাতটি পত্রযুক্ত সিজ-মনসার ডাল রাখিয়া তেল-সিঁন্দুর দিয়া পূজা করা হয়। দুধ ও চিঁড়ার ভোগ দেওয়াও হয়।

নাগপঞ্চমীর পরে যখন মল্লভূমে ধান্য রোপণের কাজ শেষ হয় তখন যে কোন শনি বা মঙ্গলবার ধরিয়া **'খই ধারা'** বা মনসার **'পালন'** অনুষ্ঠান পালিত হয়। এই দিন গৃহস্থগণ খই, দই, মিষ্টি, ফল ইত্যাদি আহার করিয়া থাকেন। এই দিন গরম ভাত, লুচি, রুটি ইত্যাদি খাওয়া নিষিদ্ধ।[১] **সর্পদেবী বংশবৃদ্ধি এবং ধন-বৃদ্ধির সহায়ক। সাপের স্বপ্ন সৌভাগ্যের এবং বংশবৃদ্ধির পরিচায়ক।** 'খই-ধারা' বা 'মনসার পালন' অনুষ্ঠানের মধ্যে উর্বরতা বাদের (ফার্‌টিলিটি কাল্‌ট) আদিম সংস্কার পরিস্ফুট। খই-ধারার অর্থ হইল—**'ধন এবং বংশ ধারার মত বর্ষিত হউক।'** খই ধারার পরবর্তী শনি বা মঙ্গলবারে মল্লভূমের অধিবাসীরা ক্ষীর-*পিঠা* বা মনসার 'পালন' অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ক্ষীর শব্দের অর্থ ঘন দুধ অথবা অমৃত। ক্ষীরোদ সাগর হইতে লক্ষ্মী ও সুধা উঠিয়াছিল। **মনসার উৎপত্তির কিংবদন্তীতে বলা হয়, মনসা ক্ষীর নদী হইতে উদ্ভুত।** মল্লভূমে প্রচলিত মনসার গানের মধ্যে রহিয়াছে—

"মাকে আনতে যাব ক্ষীর নদীর কূলে।"

মল্লভূমের অধিবাসীদের **ক্ষীরপিঠে** (পরমান্ন ও পিষ্টক) বা মনসার 'পালন' অনুষ্ঠানের মধ্যে সর্পদংশন জনিত বিষক্রিয়ার ফলে মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ক্ষীর বা অমৃতের

---

১. *বর্তমানে এই নিয়ম পালনে আংশিক শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়।*

কামনা। মনসা ক্ষীর নদী হইতে জাতা—অতএব তাঁহার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত **'পালন'** অনুষ্ঠানে ক্ষীরপিঠা খাইলে সর্পাঘাতে মৃত্যু হইবে না।

শ্রাবণ সংক্রান্তি বা 'মা-খল' দিনে মল্লভূমে বিভিন্ন গুণী-দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক সাপ-খেলানো হয়। এই উৎসবটিকে **'ঝাঁপান'** বলা হয়। ঝাঁপান শব্দটির অর্থ চতুর্দোলা। গুণীরা চতুর্দোলায় বসিয়া সাপের খেলা দেখায় বলিয়া ইহাকে 'ঝাঁপান' বলে। ঝাঁপানের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হইল **'বাঘ-ঝাঁপান'**। চতুর্দোলার উপর রক্ষিত মাটির বাঘের পিঠের উপর বসিয়া গুণীদের সাপ খেলা দেখাইতে হয়। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী মানুষ বিশ্বাস করে 'বাঘ-ঝাঁপান' করা কঠিন কাজ—সকলের ইহা সহ্য হয় না। নানা অমঙ্গল বা অঘটন ঘটে। খুব বড় গুণী না হইলে **'বাঘ-ঝাঁপান'** করিতে কেউ সাহস করেন না। ঝাঁপান উৎসবে মল্লভূমের বিভিন্ন গুণী-দল চতুর্দোলায় চাপিয়া রাজদরবারে উপস্থিত হন। রাজাকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া গুণীদল পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হন। আপন আপন দলের সংগৃহীত সর্পগুলির নানাবিধ খেলা দেখাইয়া প্রতিটি দল আপনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিতে চান। গুণীদল সাপের খেলা আরম্ভ করার পূর্বে যথাবিধি প্রত্যেকে মনসা দেবীর বন্দনা গাহিয়া দেবীকে আপন আপন আসরে আহ্বান করেন। আবাহনের গান অত্যীব করুণ। ভক্তহৃদয়ের গভীর আকুতি আর্তি ইহার অক্ষরে অক্ষরে যেন ঝরিয়া পড়িতে থাকে।

> "একবার এসো মা আমার আসরে—
> ধুলায় পড়ে কাতর হয়ে ডাকি মা তোমারে।
> একবার এসো মা .... মাগো।" — ইত্যাদি ;

আবাহনের পর গুরু বন্দনা, দেবদেবী বন্দনা, ভাসান ইত্যাদি গীত হয়। তাহার পর গুণীরা প্রথমে এক একটি করিয়া হুড়পী খুলিতে থাকেন। পরে একই সঙ্গে অনেকগুলি বিষধর সাপের কোনটিকে কাঁধে, কোনটিকে বাহুতে জড়াইয়া শিবের মত সাজিয়া খেলা দেখান। সাপ খেলানো অনুষ্ঠানকে আরও আকর্ষণীয় এবং উত্তেজনাপূর্ণ করার জন্য গুণীরা সাপগুলিকে নাকের ডগায়, কানের পাতায়, হাতের আঙুলে এবং ঠোঁটে ঝুলাইয়া দেন। সাপগুলি ওই সব অঙ্গপ্রত্যঙ্গে কামড়াইয়া ধরিয়া ঝুলিতে থাকে। এই সময় গুণীরা খেলার মাঝে আপন আপন বিদ্যার বড়াই করিতে থাকেন আর **'বিষম ঢাকি'** বাজাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে থাকেন—**'বাজুক বিষম ঢাকি চলুক ঝাঁপান।'**

ঝাঁপানে গুণীদের নিজ নিজ বিদ্যার পরীক্ষা অনেকটা একালের ছাত্র-ছাত্রীদের বাৎসরিক পরীক্ষার মত। ঝাঁপানে যে গুণী সাপের খেলা দেখানোতে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতে পারিবেন তিনি সেই বৎসবের শ্রেষ্ঠ গুণী বলিয়া মল্লভূমে পরিগণিত হইবেন। মল্লরাজ তাঁহাকে পুষ্পমাল্য দিয়া সম্মানিত করেন। পূর্বে জমিজমার বৃত্তি দিয়া বা টাকাকড়ি দিয়া সম্মানিত করিতেন। **গুণীদের কৃতিত্ব দুই রকমের—(১) সাপের খেলা দেখানোর সময় সাপগুলিকে ইচ্ছানুযায়ী খেলানো, (২) অন্য দলের সাপ খেলানোতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা।** গুণীরা পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া **মারণ, চালন, কাটান** এবং উড়ান ইত্যাদি মন্ত্র বলিতে থাকেন।....

মল্লভূমের ঝাঁপান উৎসবে মনসামাতার আবাহন, ভাসান ইত্যাদি গানগুলির মধ্যে প্রচলিত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের তাল, লয়, রাগরূপের পরিচয় পাওয়া যায়। ঝাঁপানে গীত গানগুলি জয়জয়ন্তী, ঝিঁঝিট, পাহাড়ী, খাম্বাবতী প্রভৃতি রাগের ছায়াপুষ্ট। উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদ,

আর একদিকে শ্রীনিবাস আচার্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে উদ্ভুত কীর্তন—এই দুইয়ের আবেশে ঝাঁপান সমৃদ্ধ। ঝাঁপান গানে ব্যবহৃত তাল, ধামার তালের অপভ্রংশ। ১৪ মাত্রার ধামারকে ভাঙ্গিয়া বঙ্কিমগতি ১৪ মাত্রার একটি তাল ঝাঁপানে ব্যবহৃত হইয়াছে। কীর্তন গানে ওই সুরের অনুরণন তাই ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে। জয়জয়ন্তী রাগটি বর্ষার মেদুরতা ও কারুণ্য লইয়া সব হারানোর ব্যথা সৃষ্টি করে—পাহাড়ী রাগের মধ্যে সর্বহারাদের উদাস নৈরাশ্য অভিব্যক্ত। মল্লভূমের মৎস্যজীবী নরনারীর জীবনে সর্পাঘাত এবং সর্পাঘাত জনিত মৃত্যু নিত্য ঘটনা। মৃত্যুর আশঙ্কা এবং মৃত্যুকে লইয়া রচিত ঝাঁপান গানে তাই উক্ত রাগ-রাগিণীর ভাবরূপ বার বার মূর্ত হইয়া উঠে। **আসন্ন মৃত্যুর আশঙ্কা আর মৃত্যু লইয়া এমন হৃদয়স্পর্শী, এমন মর্মান্তিক, এমন আকাশ বাতাস কাঁদানো সুর ঝাঁপান গান ছাড়া পৃথিবীর অন্য কোন গানে আছে কি না সন্দেহ।**

মল্লভূমের **'এখান শিকার'** কবে উঠিয়া গিয়াছে। .... ঝাঁপান আজও চলিতেছে — আজও নিয়মিত শ্রাবণ সংক্রান্তিতে মল্লরাজ-কেল্লার মেঘমেদুর সান্ধ্য-আকাশ ঝাঁপান গানের করুণ মূর্ছনায় বেদনাবিধুর হইয়া উঠে। যতদিন মল্লভূমির গুণীরা বাঁচিয়া থাকিবেন ততদিন ঝাঁপান হইবে। মল্লরাজ্য নষ্ট হইয়াছে। ...মল্লরাজাদের অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁপানের আড়ম্বর, জৌলুস কমিয়াছে। কিন্তু আজও ঝাঁপান দিনে গুণীরা মল্লরাজাকে সম্মান দেখান—আর আজও গুণীরা পুষ্পমাল্য ভূষিত হন।"[১]

গত ২০০২ খ্রীষ্টাব্দের ঝাঁপান উৎসব উপলক্ষ্যে বিষ্ণুপুর শাঁখারীবাজার 'দশর কালীমাতা ঝাঁপান উৎসব কমিটি'র পক্ষ থেকে একটি 'হ্যাণ্ডবিল' প্রচার করা হয়। উক্ত হ্যাণ্ডবিলে বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যমণ্ডিত ঝাঁপান উৎসব সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে তার কিয়দংশ পড়ে শোনাই আপনাদের। 'হ্যাণ্ডবিল'টিতে বলা হয়েছে—

"পণ্ডিতেরা অনুমান করেন 'যাপ্য যান' শব্দটি থেকে ঝাঁপান শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। ঝাঁপানের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই।

বিষ্ণুপুরের ঝাঁপানের ইতিহাস যেটুকু উদ্ধার করা যায় তাতে দেখা যায় শাঁখারীবাজারের **রাম নন্দী** অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এর প্রচলন করেছিলেন। তিনি কেওট বা ধীবরদের কাছ থেকে সর্পবিদ্যা শিখতে গিয়ে প্রত্যাখ্যাত হলে নদীর জলে আত্মবিসর্জনের সংকল্প করেন। পরে দেবীর প্রসাদে প্রাপ্ত একটি পুঁথি থেকে সর্পবিদ্যা শিক্ষালাভ করেন। নিঃসন্তান রাম নন্দী ভ্রাতুষ্পুত্র **মদন নন্দীকে** তাঁর অধীত বিদ্যা দান করেছিলেন। রাম নন্দীর সময়কাল সম্ভবতঃ ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, যখন মল্লরাজা চৈতন্য সিংহ জীবিত ছিলেন।

শাঁখারীবাজারের সর্পবিদ্যা বিশারদদের মধ্যে **যুগল নন্দীর** খ্যাতি অসামান্য। যুগল নন্দীর পিতা **চন্দ্র নন্দীও** এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মহিলা সর্পবিদ্যা বিশারদ হিসাবে **কুড়ানী নন্দীর** নামও উল্লেখযোগ্য। এই ধারায় যেসব বিশ্রুত সর্পবিদ্যা বিশারদ বা ওঝার সন্ধান পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে চন্দ্র নন্দী, জয় নন্দী, হারাধন নন্দী, নিমাই নন্দী, গুইরাম নন্দী, দীনবন্ধু নন্দী, সতীশ মহাপাত্র, চণ্ডী সাহা, জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, অকলঙ্ক নন্দী, কৃষ্ণ মাঝি, ভূপতি মাঝি, কালী বাউরী, রাজা বাউরী, গুইরাম দত্ত, চণ্ডী নন্দী, রামপদ লোহার, ভূপতি মেট্যা ও প্রতাপ মাঝি ইত্যাদি এই লোকায়ত সর্পবিদ্যাকে জনপ্রিয় মানবকল্যাণের ব্যবহারে ব্রতী হয়েছিলেন।

---

১. 'পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি', মাণিকলাল সিংহ, পৃঃ— ২১৬-২২৫

ইদানিংকালের সর্পবিশারদদের মধ্যে ঁঅনিল পালুই, ঁপঞ্চানন মালাকার, ঁবলাই বেনে, ধীরেন দেবনাথ, নিমাই মণ্ডল, ধনঞ্জয় চক্রবর্তীর নাম উল্লেখযোগ্য।

শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন রাজদরবার প্রাঙ্গণে ঝাঁপান পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। পরের দিন শাঁখারীবাজারের দশর কালীমাতা মন্দির প্রাঙ্গণে 'দশর কালীমাতা ঝাঁপান উৎসব কমিটি' গত দুই শতাধিক বছর ধরে সংগঠিতভাবে এই পর্বের অনুষ্ঠান সাফল্যের সঙ্গে করে আসছেন।''

মল্লভূমের মনসাপূজা ও ঝাঁপান উৎসবের তত্ত্বকথার সমাপ্তি ঘোষণা করে এখন আমরা শাঁখারীরাজারের শঙ্খশিল্পীদের হাতে তৈরী প্রসিদ্ধ শঙ্খশিল্পের কথায় মন মজাব। সেই সঙ্গে বিষ্ণুপুরের শাঁখা, সিঁদুর, লোহা, আলতা ও শোলা শিল্পের প্রতিও আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব।

অধ্যায়-৫৫

শাঁখা, সিঁদুর, লোহা, আলতা ও শোলার সাজ

শাঁখা, সিঁদুর, লোহা, আলতা ও শোলার সাজ হিন্দু এয়োতী ললনাদের করেছে আরো আরো লাবণ্যময়ী। করেছে অধিক আকর্ষণীয়। কিন্তু নারী-অঙ্গশোভা বর্ধক এসব দ্রব্যের প্রচলন হল কিভাবে? এসব জিনিস ব্যবহারের তাৎপর্যই বা কি?

অনেক অনেক বছর আগের কথা। বিবাহ প্রথা সমাজে চালু ছিল না তখন। চালু ছিল **'জোর যার নারী তার'** রীতি। একই নারীর রূপ-লাবণ্যে আকৃষ্ট হ'য়ে রূপের নেশায়, রূপের আগুনে পুড়ে মরার উগ্র আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্ত হয়ে উঠত দুই বা ততোধিক পুরুষ। একটি নারীকে কেন্দ্র করে পুরুষদের মধ্যে বেধে যেত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ বা আমরণ লড়াই। লড়তে লড়তে শেষ অবধি বেঁচে থাকত একজন মাত্র পুরুষ। বিজয়ী বীরপুরুষ তখন সদ্যোনিহত প্রতিপক্ষের রক্ত নিয়ে সেই বহু-ঈপ্সিত লাবণ্যময়ী ললনার সিঁথিতে পরিয়ে দিত রক্ত-তিলক। হাতে পরিয়ে দিত লোহার বেড়ি। **নারীর পক্ষে ঐ লোহার বেড়ি হল আজীবন বন্ধন বা বন্দীদশার প্রতীক। সিঁথির রক্ত-তিলক হল বিশেষ কোন পুরুষের বশীভূত হওয়ার বা তার আনুগত্য মেনে নেওয়ার স্মারক-চিহ্ন বা স্মৃতি-স্মারক।**

প্রাগৈতিহাসিক যুগের সেই আদিম প্রথার সূত্র ধরেই রাজপুত জাতির মধ্যে বিবাহের সময় আঙ্গুল কেটে রক্ত নিয়ে পাত্রীর সিঁথিতে রক্ততিলক পরিয়ে দেওয়ার নিয়ম একটি চিরাচরিত প্রথায় পরিণত হয়েছে। **এই রক্তের পরিবর্তে পরবর্তীকালে এসেছে সিঁদুর। চিরবন্ধনের প্রতীক লোহার বেড়ি কালক্রমে রূপান্তরিত হয়েছে কারুকার্য খচিত সৌখিন লৌহ-বলয়ে। লৌহ এবং সিঁদুরের পাশাপাশি এসেছে সতীত্বের তথা পবিত্রতার প্রতীক শঙ্খবলয়। এক্ষণে একটি লক্ষণীয় বিষয় হল কুমারী বা বিধবা নয়, শুধুমাত্র সধবা মহিলারাই দুই হাতে শাঁখা পরার অধিকারিণী। কিন্তু কেন? এই কেনর উত্তরে বলতে হয় ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের একটি সুন্দর পৌরাণিক কাহিনী। কাহিনীটি নিম্নরূপ—**

পুরাকালে শঙ্খচূড় নামে প্রবল পরাক্রান্ত এক অসুর ছিল। শঙ্খচূড়ের অত্যাচারে স্বর্গ মর্ত্য পাতাল অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। স্বর্গের দেবতাগণ হয়েছেন রাজ্যচ্যুত। শিবঠাকুর প্রদত্ত কবচ ধারণ করে শঙ্খচূড় হয়েছেন দেবতাদেরও অপরাজেয়। রাজ্যচ্যুত হয়ে দেবগণ হৃতরাজ্য ফিরে পাওয়ার আশায় ছুটলেন দেবাদিদেব মহাদেবের কাছে। দেবতাদের দুর্গতি

দেখে সদাশয় শিবঠাকুর তখন শঙ্খচূড়কে দেবরাজ্য ফিরিয়ে দিতে বললেন। দেবাদিদেবের শক্তিকবচের বলে বলীয়ান দাম্ভিক এবং অকৃতজ্ঞ শঙ্খচূড় কিন্তু শিবঠাকুরের আদেশ অমান্য করেন। অসহায় মহাদেব তখন দেবতাদের সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। কারণ শঙ্খচূড়ের স্ত্রী ধর্মধ্বজ রাজার কন্যা সতী সাধ্বী তুলসীকে ব্রহ্মা বর দিয়েছিলেন— **'তুলসীর সতীত্ব নষ্ট না হলে তার স্বামীকে কেউই হত্যা করতে পারবে না।'** তুলসীকে ব্রহ্মার এই বর দানের কথা অজানা ছিল না দেবতাদের কিংবা মহাদেবের। শিবসহ দেবতাদের কাছে শঙ্খচূড়ের ধৃষ্টতা এবং অত্যাচারের আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত শুনে ব্রহ্মার চক্ষু হল ছানাবড়া। ক্রোধে ফেটে পড়লেন তিনি। কিন্তু এক্ষেত্রে তিনিও নিরুপায়। কেননা তাঁরই বরে তুলসীর সতীত্বগুণে শঙ্খচূড় যে অমর। শঙ্খচূড়কে বধ করার কোন উপায় খুঁজে না পেয়ে অসহায় ব্রহ্মা তখন মহেশ্বর সহ দেবগণকে নিয়ে তড়িঘড়ি করে উপস্থিত হলেন বিষ্ণু-সকাশে। সবকিছু শুনে বিষ্ণুর কপালে দেখা দিল দুশ্চিন্তার বলিরেখা। অবশ্য পরমুহূর্তেই নারায়ণের মুখমণ্ডলে দেখা দিল আত্মতৃপ্তির হাসি-খুশী ভাব। শঙ্খচূড় বধের পরিকল্পনা এসে গেছে তাঁর মাথায়। সমাগত মহাদেব এবং দেবতাদের কতিপয় নির্দেশ দিয়ে এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে দানী শঙ্খচূড়ের সমীপে উপস্থিত হলেন বিষ্ণু। শিব-প্রদত্ত শক্তিকবচটি কৌশলে চেয়ে নিয়ে তিনি চলে গেলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। শক্তিহীন হল শঙ্খচূড়। এমন সময় বিষ্ণুর নির্দেশানুসারে শিবঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে একযোগে অতর্কিতে দেবতাগণ আক্রমণ করেন অসুরকে। **শঙ্খচূড় অসুর যখন দেবগণের সাথে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে লিপ্ত ঠিক তখনই ভগবান বিষ্ণু শঙ্খচূড়ের রূপ ধারণ করে সতী তুলসীর সতীত্ব নাশ করেন।** সাধ্বী রমণী তুলসীর সতীত্ব নষ্ট হওয়ার সাথে সাথে দৈবশক্তি হারিয়ে নিস্তেজ হয়ে পড়ে শঙ্খচূড়। সুযোগ বুঝে বিষ্ণুর নির্দেশমত শূলপাণি শিব তাঁর ত্রিশূলের তীক্ষ্ণাঘাতে বধ করেন শঙ্খচূড়কে। স্বামীর মৃত্যু সংবাদে বিচলিত শোক-বিহ্বল তুলসী বিষ্ণুর কপটরূপের কথা জানতে পেরে সরোষে অভিশাপ দেন নারায়ণকে, **'হে নির্দয়, নিষ্ঠুর, কপট দেবতা! তুমি দেবতা নও, পাষাণ। তুমি পাষাণ হবে। বজ্রকীট তোমাকে খণ্ড বিখণ্ডিত করবে।'**

ভগবান বিষ্ণু স্বকৃত অপরাধের আত্মগ্লানিতে অবনত মস্তকে গ্রহণ করেন সেই অভিশাপ। বলেন, 'তোমার অভিশাপে আজ থেকে আমি শালগ্রাম শিলাতে রূপান্তরিত হব। আর সেই শালগ্রাম শিলারূপী নারায়ণের পূজা হবে তুলসীপাতা দিয়ে। শালগ্রামের মস্তকে অর্থাৎ উপরিভাগে থাকবে তুলসী।' তিনি আরো বলেন, 'তোমার স্বামীকে আমি অন্যায়ভাবে হত্যা করিয়েছি। এজন্য আমার বরে তোমার মৃত-স্বামী সমুদ্রগর্ভে শঙ্খরূপে জন্মগ্রহণ করবে। আর সেই শঙ্খ থেকে যে শঙ্খবলয় তৈরী হবে তা হবে সতী নারীর সতীত্বের প্রতীক, পবিত্রতার প্রতীক এবং অঙ্গভূষণ।'

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করেই বিবাহিতা হিন্দুরমণীদের মধ্যে শাঁখা পরার প্রথা প্রচলিত হয়েছে। এয়োতীর সতীত্বের প্রতীক এই শঙ্খ, নারীর সৌন্দর্য বৃদ্ধি ছাড়াও আরো অনেক কাজে ব্যবহৃত হয়।

নারায়ণের হাতের শঙ্খ অর্থাৎ শঙ্খধ্বনি 'শব্দব্রহ্ম' বা 'নাদব্রহ্ম'-এর প্রতীক। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধস্থলে শ্রীকৃষ্ণের হাতের পাঞ্চজন্য শঙ্খ যুদ্ধের ঘোষক এবং দিনান্তে যুদ্ধ-সমাপ্তির সূচক। দেব-দেবীর আরত্রিক অনুষ্ঠানে জল সহ শঙ্খ-আরতি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গবিশেষ। গৃহস্থের বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যে শাঁখ বাজানোর রীতি চিরাচরিত প্রথা। কথিত

আছে, শঙ্খধ্বনিতে গৃহলক্ষ্মী সন্তুষ্ট হন এবং গৃহের আশেপাশে বিচরণকারী ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষাক্ত কীটসমূহ শঙ্খধ্বনির গুরুগম্ভীর নিনাদে নিহত হয়। ছোট ছোট শিশুদের কণ্ঠে বা কোমরে শঙ্খের পদক বা মাদুলী পরানো হয়। প্রচলিত বিশ্বাস, এতে শিশু সুস্থ থাকে এবং এগুলি কুদৃষ্টি বা নজর-দোষের রক্ষা-কবচ স্বরূপ। এছাড়া শাঁখের গুঁড়ো চর্মরোগের এবং শঙ্খ-বিষ্ঠা প্লীহাবৃদ্ধি এবং রুগ্নযকৃতের মহৌষধ স্বরূপ, আবার শঙ্খভস্ম যেমন আয়ুর্বেদিক ঔষধ তৈরীর উপাদান তেমনি শঙ্খ-গুঁড়ো আল্পনার উপকরণ। শাঁখের পরিত্যক্ত অংশ পুড়িয়ে তৈরী হয় চুন। উক্ত পোড়া চুন পানের সাথে ব্যবহার করা হয় নিয়মিতভাবে। এই পোড়া চুন ক্ষতস্থানে ব্যবহার করা হয়—এটি নাকি পচননিবারক (অ্যান্টিসেপ্‌টিক্)। এবম্বিধ দ্রব্যগুণের জন্যও শঙ্খের ব্যবহারের বহুল প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। **শঙ্খ সতীর সম্পদ, এয়োতীর স্মৃতিচিহ্ন। হিন্দুনারী, বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দু-নারীর বিবাহে শাঁখা অপরিহার্য। শুধু হিন্দু নারী কেন, হিন্দুদের উপাস্য দেবী মহলেও শাঁখা, সিঁদুর, লোহার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়।** তাই দেখি দুর্গা, কালী, শীতলা, লক্ষ্মী, দশভুজা প্রভৃতি দেবীপূজাতে শাঁখা, সিঁদুর, লোহা পূজার অপরিহার্য উপকরণ। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা গেছে দেবী স্বয়ং কন্যা বা মাতৃরূপে দেখা দিয়ে ভক্তের কাছ থেকে শাঁখা পরে শাঁখা পরার সাধ মিটিয়েছেন স্বচ্ছন্দে। যেমন বিষ্ণুপুরেশ্বরী মা মৃন্ময়ী রাজকন্যার ছদ্মবেশে দেখা দিয়ে **হলধর শাঁখারীর** নিকট শাঁখা পরেছেন সানন্দে। আবার দেখি স্বয়ং শিবঠাকুর শাঁখারীর ছদ্মবেশে দক্ষগৃহে গিয়ে শাঁখা পরিয়েছেন দেবী পার্বতীকে। সুতরাং দেব-দেবীর মধ্যে শাঁখা পরা এবং শাঁখা পরানোর আকাঙ্ক্ষা পুঞ্জীভূত।

এতাদৃশ শঙ্খশিল্পের কথা বলতে গিয়ে **জেমস্ হর্ণেল** বলেছেন, 'শাঁখার ব্যবহার মুখ্যতঃ দ্রাবিড় নারীগণের অবদান।' সুপ্রাচীন এই শিল্পটিতে বিষ্ণুপুরের অবদানও কম নয়।

বিষ্ণুপুরের শঙ্খ-শিল্পীগণ শহরের উত্তরে শাঁখারীবাজার মহল্লাতে বসবাস করেন। শঙ্খ-শিল্পীগণের আধিক্য বশতঃ পল্লীটির নাম হয়েছে শাঁখারীবাজার। শঙ্খ-শিল্পীদের উৎস সন্ধানে ব্রতী হয়ে শ্রদ্ধেয় মাণিকলাল সিংহ মহাশয় তাঁর'পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি' পুস্তকে লিখেছেন, "......মধ্যযুগের শিল্পনগরী বিষ্ণুপুরে আরও যেসব শিল্পী ও কারিগর গোষ্ঠীর বসবাস ঘটিয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে শাঁখারী জাতির মানুষ অন্যতম। রাঢ়ীয় শাঁখারী জাতির মূল সন্ধান করিতে গিয়া দেখা যায় যে ইঁহাদের পূর্বপুরুষ সুপ্রাচীনকালে দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল হইতে রাঢ় বঙ্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। সেকালে তাঁহাদের কাজ ছিল সমুদ্র এবং নদনদী হইতে শঙ্খ, ঝিনুক, গুগ্‌লী ইত্যাদির খোলাগুলি পোড়াইয়া চূণ তৈয়ারী করা। চূণারু বলিয়া অভিহিত জাতির মানুষই রাঢ়ীয় শাঁখারী জাতির আদিম রূপ। .... রাঢ়ীয় শঙ্খবণিকদের প্রাচীন পুরুষগণ যে বিষ্ণুপুর নগরীর অনতিদূরবর্তী সুপ্রাচীন ডিহর গ্রামটিতে বসবাস করিতেন তাহা প্রমাণিত হয় ডিহর গ্রামের ক্ষয়িত ঢিবিগুলি হইতে বহু প্রাচীন শঙ্খ, ধর্মচক্রের নক্সাসমন্বিত শঙ্খবলয় এবং নানান উপরত্নের মাল্যদানাগুলির আবিষ্কার হইতে। .... রাঢ়ীয় শাঁখারীগণ সর্বপ্রথম ডিহর গ্রামটিতে বসবাস করিতেন, পরে তাঁহারা দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী রাজহাট বীরসিংহপুরে এবং তথা হইতে তাঁহারা মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরে, শিখরভূমে (পুরুলিয়া জেলার পঞ্চকোটে) এবং বাঁকুড়া জেলার ধল রাজাদের সুপুর অঞ্চলে গিয়া বসবাস করেন। বাঁকুড়া জেলার ইঁদপুর থানার অন্তর্ভুক্ত হাটগ্রাম রাঢ়ীয় শাঁখারীদের একটি

বর্ধিষ্ণু এবং বসতিবহুল গ্রাম। চেতুয়াবরদা হইতে মল্লরাজা রঘুনাথ সিংহের (২য়) সময় ১৭০১ খ্রীষ্টাব্দে কয়েক ঘর শাঁখারী পরিবার আসিয়া বিষ্ণুপুরে বসবাস করিতেছেন।" (পৃঃ—১৭০-১৭১)

বিষ্ণুপুর তথা বাঁকুড়া জেলার শঙ্খশিল্পীদের শিল্প-সাধনার উৎকর্ষের ফলে শঙ্খশিল্প আজ রীতিমতো কারুশিল্পে পরিণত হয়েছে। তারই ফল হিসেবে জন্ম নিয়েছে দৃষ্টিনন্দন কারুকার্য খচিত শঙ্খমালা, শঙ্খবালা, চুড়ি, হার, আংটি, কানের দুল, নাক ফুল, চুল আঁটা ক্লিপ, পদক, কলমদানি, ছাইদানি প্রভৃতি। শঙ্খজাত দ্রব্যের উপর সূক্ষ্ম-কারুকার্য যেমন লতা-পাতা-ফুল, খেজুরছড়ি, ধানশিষ, মটরদানা, বরফিদানা ময়ূরপেখম, প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যের নক্সা ছাড়াও আস্ত শঙ্খের উপর অসুরনাশিনী দুর্গার মূর্তি, গান্ধী, নেতাজী, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মনীষীদের খোদাই মূর্তির কাজ আজ বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শাঁখের টুকরো এবং ঝিনুক দিয়ে প্রতিমা তৈরী যেনবা একটি শিল্প বিপ্লবের মতোই ঘটনা। ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় এবং দরজায় ঝোলানোর জন্য ঝিনুকের তৈরী চিকও এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য।

তিত্‌কুটি, জার্জির, কাচ্চাম, ধলা ও পাটিশঙ্খ এই পাঁচ ধরনের শঙ্খই শিল্পের উপাদান বা কাঁচামাল। "শঙ্খকুলে তিত্‌কুটি কুলীন, রঙ রসুনের মত সাদা, দামও বেশী, দুর্লভ। বাঁকুড়ার শিল্পীরা তার নাগাল পান না। বাকি চার জাতের শঙ্খের ওপর তাঁদের কাজ চলে। জার্জিরের রঙ দুধের ফেনার মত; কাচ্চাম, সাদার সঙ্গে হালকা পীত আভা মেশানো; ধলা ও পাটিশঙ্খ ফিকে হলুদ। কাঁচামাল হিসেবে শঙ্খ আসে দক্ষিণ ভারত থেকে।"[১] কাঁচামালের দাম, শ্রম এবং চাহিদার কথা মনে রেখেই শঙ্খজাত দ্রব্যের দাম নির্ধারণ হয়। তবে শঙ্খজাত দ্রব্যের দাম কম, দেখতেও সুন্দর। **পথে ঘাটে ঘোরা ফেরার সময় সোনার গহনার মতো বিপদের ঝুঁকি নেই এতে। কৃষ্ণবর্ণের মহিলাদের অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করতে শাঁখের গহনার জুড়ি মেলা ভার।** রুচি ও মানসিকতার পরিবর্তনের ফলে এবং ইমিটেশন গহনার ব্যাপক প্রচলনের ফলে শঙ্খশিল্পে ভাঁটা পড়েছে ঠিকই তথাপি কৌলীন্যের আভিজাত্যে এই শিল্প আজও অম্লান।

শিল্পটিতে মন্দাভাব পরিলক্ষিত হলেও বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া এবং বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন গ্রাম যেমন রায়বাঘিনী, শাসপুর, ঘুটগোড়িয়া, হাটগ্রাম ও পাত্রসায়ের প্রভৃতি স্থানে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা মিলে সর্বসাকল্যে প্রায় হাজার পাঁচেক শিল্পী এই ব্যবসায় নিযুক্ত। এঁদের মধ্যে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পীও বিদ্যমান। ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে **অশ্বিনী কুমার নন্দী** শঙ্খের উপর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম খোদাই কার্যের জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন। ঐ বৎসরই শঙ্খশিল্পী **শ্রীগোপাল নন্দী** (জন্মস্থান হাটগ্রাম) নারকেল মালার উপর অনুরূপ শিল্পকর্মের জন্য রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত হন। এঁরা দুজনেই বিষ্ণুপুরের মানুষ।

এবার প্রসঙ্গ সিঁদুর। সিঁদুর শব্দটির অভিধানগত অর্থ হল রক্তবর্ণ চূর্ণ। পূর্বেই বলেছি বিজয়ী পুরুষ বিজিত প্রতিপক্ষের উষ্ণ রক্ত নিয়ে ঈপ্সিত রমণীর সিঁথিতে পরিয়ে দিত রক্ততিলক। সভ্যতার উন্মেষের সাথে সাথে আদিম যুগের রক্ততিলকের স্থান অধিকার করেছে সিঁদুর। সুপ্রাচীন সংস্কারজাত সীমন্তিনীর সিঁথির সিঁদুর এবং বঙ্গললনার ললাটের

১। পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া, তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃঃ—৩৫১

সিঁদুরের টিপ রূপলাবণ্যের অপরিহার্য অঙ্গ ছাড়াও কাব্য-প্রেরণার এক শাশ্বত উৎস।

আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগেও বিষ্ণুপুরে তৈরী হত খুবই উৎকৃষ্ট মানের সিঁদুর। মাধবগঞ্জ গোয়ালাপাড়া মহল্লার নারায়ণ চন্দ্র দাস এবং তাঁর পূর্ব-পুরুষেরা বংশ পরম্পরায় তৈরী করতেন সেই সিঁদুর। সিঁদুরের ব্যবসা করার সুবাদে শহর জুড়ে এঁরা 'সিঁদুর করা' নামে সুবিদিত ছিলেন।

জাপান জার্মানীর শক্ত খনিজ পদার্থ ছিল সিঁদুর তৈরীর মূল উপাদান। কোলকাতা থেকে আসতো সেই কাঁচামাল। অত্যন্ত পিচ্ছিল প্রকৃতির ঐ খনিজ উপাদান পাওয়া যেত দুটি রঙে—রক্তলাল এবং হলুদ। দুই বর্ণের এই উপাদানকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে তৈরী হত তিন রঙের সিঁদুর। রক্তলাল উপাদান থেকে তৈরী গাঢ়লাল বা রক্তের মতো কালচে লাল রঙের সিঁদুরের নাম ছিল **মিনা সিঁদুর**। হলুদ উপাদান থেকে তৈরী হত হলুদ সিঁদুর। একে বলা হত **ভুঁড়ি সিঁদুর**। আবার মিনা সিঁদুর এবং ভুঁড়ি সিঁদুরের সংমিশ্রণে উৎপাদিত হত রক্তলাল সিঁদুরের থেকে তুলনামূলকভাবে হালকা কিন্তু খুবই উজ্জ্বল টক্টকে লাল রঙের সিঁদুর। এটির নাম ছিল **মেটে সিঁদুর**।

তিনটি থালাতে এই তিন রকমের সিঁদুর খুচরা বিক্রীর জন্য সাজিয়ে রাখা হত দোকানের সামনে। আর পাইকারী খরিদ্দারদের জন্য কাগজে মুড়ে প্যাকিং করা হত থান থান সিঁদুর। এক একটি বাণ্ডিলে থাকত ১০টি করে থান। বিষ্ণুপুর বাঁকুড়া বা পশ্চিমবঙ্গ নয়, পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকেও পাইকাররা আসতেন বিষ্ণুপুরে সিঁদুর কিনতে।

দিনে দিনে পশ্চিমবাংলার ব্যবসা কোলকাতা-কেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। **বেলপাতা, রাঙাজবা, শ্রীমতী, দিদিমণি** প্রভৃতি কোলকাতা-কেন্দ্রিক কোম্পানীগুলি ব্যাপক হারে উৎপাদন করতে থাকে সস্তা উপাদানের সিঁদুর। তাতে দামও কম পড়ে, ক্রেতার সংখ্যাও বাড়ে। এমতাবস্থায় বিষ্ণুপুরের অভিজাত এবং উন্নতমানের সিঁদুর তীব্র প্রতিযোগিতায় পরাস্ত হয়ে স্বীয় অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে। **সিঁদুরের পর আসি লোহার কথায়।**

পিঞ্জরাবদ্ধ পাখির ন্যায় গৃহবদ্ধ গৃহবধূর বাম হস্তের লৌহ বলয় যেন তার বন্দীদশার সূচক কিংবা তার পরাধীনতার প্রতীক। কুমারী অবস্থায় পিতার, বিবাহিতা অবস্থায় স্বামীর এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রের অধীনস্থ হয়ে থাকা হিন্দুরমণীর ভাগ্যলিপি। অতীতের স্থূল লৌহবলয় বর্তমানে তার স্থূলতা হারিয়ে সৌখিন শিল্প-সম্ভারে রূপান্তরিত হয়েছে। সোনার পাতে মোড়া লৌহ পরার চলও চালু হয়েছে বিত্তবান সমাজের নারী-মহলে।

লোহার রড বা মোটা তার পিটিয়ে বৃত্তাকৃতির বলয় তৈরী করে উখা দিয়ে ঘসে ঘসে আঁকি-বুঁকি, ফুলকাটা, খেজুরছড়ি প্রভৃতি জাতীয় নক্সা কেটে পালিশ করে তৈরী হয় সৌখিন লৌহ-বলয় বা নোয়া। বিষ্ণুপুরের কর্মকার সম্প্রদায়ের **গৌতম কর্মকার** এবং তাঁদের পূর্বপুরুষগণ যেমন **˚গোবিন্দ দাস কর্মকার, ˚হৃষীকেশ কর্মকার** প্রমুখেরা বংশ পরম্পরায় করে আসছেন নোয়া তৈরীর কাজ। এঁদের মতোই মল্লভূমের অনেক কর্মকার পরিবার এ কাজে নিযুক্ত থাকেন—বিশেষতঃ বিবাহের মাসগুলিতে।

শাঁখা সিঁদুরের মতো লৌহবলয়ও এয়োতী নারীর কাছে একটি পবিত্র মাঙ্গলিক বস্তু। তাই বিয়েবাড়ি উপলক্ষ্যে শঙ্খধ্বনি বাজিয়ে, বাজনাবাদ্যি সহ রমণীকুলের 'কামার ঘর' থেকে লোহা বা নোয়া আনতে যাওয়ার ঘটনাটি বিবাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়। কর্মকার পরিবারকে নোয়ার মূল্য বাবদ পাঁচ-দশ-বিশ টাকা নগদ মূল্য

ছাড়াও মান্য হিসেবে চাল, ডাল, লবণ এবং নানাবিধ সব্জী সহ সিধা দেওয়ার প্রথাও প্রচলিত।

রাতুল-চরণ শুধু হিন্দু দেব-দেবী নয়, হিন্দু ললনার অঙ্গশোভা বর্ধনেও রাতুল-চরণের অবদান কম নয়। তাই দেখি পূজাপার্বণে বা যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে বিধবা ব্যতীত সব বয়সের মেয়েদের আলতা পরার রীতি এক চিরাচরিত প্রথা। বিবাহ অনুষ্ঠানে শুধু ক'নে নয়, বরকেও পরতে হয় আলতা। আবার মৃত ব্যক্তির চরণযুগলে আলতা পরানোর পাশাপাশি আলতা রাঙা পায়ের ছাপ তুলে নিয়ে ফটো বাঁধিয়ে মৃতের বংশধরগণ সেই রাতুল-চরণে শ্রদ্ধা নিবেদন, প্রণাম এবং পূজাও করে থাকেন ক্ষেত্রবিশেষে।

আলতা শব্দটির আভিধানিক অর্থ হল লাক্ষারস। মহিলাদের পায়ের পাতার চতুর্ষ্পার্শ্বে পটি বা ফিতার মতো ডুরে টেনে আলতা পরার প্রথা একটি শুভ-সংস্কার-জাত যুগান্তকারী দৃষ্টান্ত। **আল থেকেই সম্ভবতঃ আলতা শব্দের উৎপত্তি**। মাঠের সীমা নির্দেশাত্মক মাটির উঁচু ভিত্তিভূমিকে বলা হয় আল। আর পায়ের পাতার চর্তুসীমা বন্ধনাত্মক লাক্ষারস-জাত লাল রঙের প্রশস্ত রেখাবন্ধনীকে বলা হয় **আলতা**।

কুটীর শিল্পের পর্যায়ভুক্ত এই আলতা-পাতা তৈরীর চলও বিষ্ণুপুরের এক সুপ্রাচীন শিল্প। বিষ্ণুপুর কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লার ৺**প্রমথনাথ দত্তের** পূর্বপুরুষ এবং উত্তর-পুরুষগণ এই শিল্পের ধারক ও বাহক। লাক্ষারস বা লা পোকার রস নিয়ে এঁদের কারবার বলে এঁরা '**লা করা**' নামে পরিচিত।

পাতা-আলতা তৈরীর উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয় কাপাস তুলা, বিউলি কলাই-এর আঠার জল বা আটার আঠার জল এবং লাক্ষারস। মাটিতে পোঁতা একটি হাড়ির উল্টো পিঠে তুলা রেখে আঠা জল দিয়ে হাত চাপড়ে চাপড়ে তৈরী করা হয় লুচির মতো গোল গোল পাতা। অন্যদিকে আবার লাক্ষাগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ করে জল সহযোগে পুনঃ পুনঃ শীলে বেটে লাল রঙের কস বের করে তুলে রাখা হয় একটি পাত্রে। অতঃপর লালরঙের কসের সাথে পরিমাণমত জল মিশিয়ে পাতলা করে সেই তরল লাল জলে তুলা পাতাগুলোকে ডুবিয়ে রোদে শুকিয়ে নিয়ে তৈরী হয় পাতা আলতা। ২০টি আলতা পাতা নিয়ে হয় একটি 'খোক'। আবার ২০ খোকে হয় এক 'গাছি'। অর্থাৎ এক গাছিতে থাকে ২০ × ২০ = ৪০০ পাতা আলতা। বর্তমানে ছোট আকৃতির এক গাছি পাতা আলতার বাজার দর ২৫ টাকা এবং বড় আকৃতির এক গাছির দাম ৮০ টাকা। এসব কথা জানিয়েছিলেন ৺প্রমথনাথ দত্তর জ্যেষ্ঠপুত্র **শ্রীঅজিতকুমার দত্ত**।

তসর বা রেশম পোকার লালারস যেমন তসর বা রেশমের উপাদান, অনুরূপভাবে লা পোকার লালারস থেকে উৎপন্ন হয় লাক্ষা। লাক্ষার রক্তিম রঙ বের করে নিয়ে তার ছিবড়ে অংশ থেকে প্রস্তুত হয় গালা—যা বার্ণিশের কাজে ব্যবহৃত হয়। কুল, পলাশ, কুসুম, আসন, অশ্বত্থ প্রভৃতি বৃক্ষে লা পোকার চাষ করা হয়। সাধারণতঃ আদিবাসী অধ্যুষিত বনাঞ্চলে লা বা লাক্ষা চাষের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। আদিবাসী মানুষেরা জীবিকার তাগিদে লা চাষকে বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি, বাঁকুড়ার সোনামুখী, মেজিয়া, খাতড়া, রাণীবাঁধ, পুরুলিয়ার বান্দোয়ান, ঝালদা, তুলিন এবং উড়িষ্যার ময়ূরভঞ্জ প্রভৃতি স্থানে লা চাষের প্রচলন আছে।

বর্তমানে বিষ্ণুপুর শহর এবং শহরের পার্শ্ববর্তী দু-চারটি গ্রামে পাতা-আলতা শিল্পের ক্ষীণ প্রচলন থাকলেও শিল্পটি প্রায় অবলুপ্তির পথে। রাসায়নিক রঙের প্রাদুর্ভাব, তার

চাক্‌চিক্য, জৌলুস, স্বল্পমূল্য এবং সহজলভ্যতার ফলে কৃষি নির্ভর দুষ্প্রাপ্য এবং মহামূল্য লাক্ষাজাত ভেষজ আলতার উৎপাদনে ছেদ পড়েছে পুরোপুরি। বর্তমানে পাতা-আলতার পরিবর্তে **শ্রীমতী, দিদিমণি, রাঙাজবা**, প্রভৃতি কোম্পানীজাত শিশি ভরা তরল আলতাতে পা রাঙিয়ে নেন মামণি, দিদিমণি, শ্রীমতীর দল। শুধুমাত্র দেবী পূজার ঘটে, কোলসরাতে, উত্থান থালায় এবং মৃতাদি অশুচে ঘাটে জলধরার কার্যে ব্যবহৃত হয় পাতা-আলতা। দুঃখের বিষয় সে আলতাও আবার লাক্ষারসের রক্তিম রঙে রঞ্জিত নয়, রঞ্জিত হয় মেজেন্টা জাতীয় রাসায়নিক রঙে।

শাঁখা, সিঁদুর, লোহা, আলতার পর এবার শুনুন শোলা শিল্পের কথা। বিষ্ণুপুরের অগণিত দেব-দেবীদের উৎসবাদিতে দেব-বিগ্রহগুলিকে শোলার সাজে সাজানোর জন্যে মল্লরাজারা মালাকার শিল্পীদের বিষ্ণুপুরে আনয়ন এবং তাদের এখানে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। এছাড়া বারো মাসে তেরো পার্বণের দেশ বাংলাদেশে উৎসব ছাড়াও মেলার পিঠে মেলা তো লেগেই আছে। এইসব উৎসব এবং মেলাতে মঞ্চসজ্জা ছাড়াও উৎসবের আনুষঙ্গিক সাজসজ্জা রচনা করাও ছিল মালাকারদের প্রধান কাজ। মল্লভূমের মালাকারগণ মূলতঃ শোলা শিল্পী হলেও মালাকার জাতি প্রধানতঃ পুষ্পজীবী। বক্তব্যের পক্ষে এক্ষণে কৃষ্ণ-বলরামের কৃপাধন্য, সুরুচিসম্পন্ন এই মালাকার জাতির উৎপত্তি সম্পর্কে শোনাব বেশ উপভোগ্য একটি পৌরাণিক কাহিনী।

কৃষ্ণ-বলরামের অন্তরঙ্গ বাল্যবন্ধু সুদামার প্রধান তথা একমাত্র কাজ ছিল দিনভর বনে জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নানান বর্ণের নানান জাতের বনফুল সংগ্রহ করে মালা গেঁথে এবং বহুবিধ পুষ্পালঙ্কার রচনা করে তাঁর প্রাণের ঠাকুর কৃষ্ণ ও বলরামকে মোহন বেশে সাজিয়ে দেওয়া। বাস্তব-বুদ্ধিহীন দীন-দুঃখী সুদামা ছিলেন অত্যন্ত গরীব। কৃষ্ণ-বলরামের প্রেমে বিভোর গৃহকর্ম-বিমুখ সুদামা এই করতে করতে দিনে দিনে হয়ে পড়েন আরো আরো দরিদ্র এবং সহায় সম্বলহীন। ঘর বলতে এক চিলতে কুঁড়েঘরটিও যথাযথ দেখ্‌ভালের অভাবে ভেঙে পড়েছে অকালে। কৃষ্ণ-প্রেমে আত্মভোলা সুদামার দিন কাটে অর্ধাহারে কিংবা অনাহারে। কিছু পেলে খান, না পেলে উপোষ দিয়ে পড়ে থাকেন উঠানের বকুলতলাতে।

এদিকে কংসের অত্যাচার অসহ্য হয়ে উঠেছে। **কৃষ্ণ-বলরাম** মথুরাতে গিয়ে **কংস**-বধের তোড়জোড় করছেন। আজ তাঁদের বীর সাজে সাজতে হবে। কিন্তু কে তাঁদের সাজিয়ে দেবে। মনে পড়ল সুদামাকে। সুদামার দেখা নেই কিন্তু অনেক অনেক দিন। সুদামার খোঁজ করতে করতে অবশেষে কৃষ্ণ-বলরাম এসে হাজির হলেন তাঁর ভগ্ন কুটীরের সম্মুখে। কৃষ্ণ-বলরামকে তাঁর পর্ণ কুটীরে উপস্থিত দেখে আনন্দে অধীর সুদামা কিন্তু যার-পর-নাই বিব্রত বোধ করেন মনে মনে। কারণ তাঁদের বসতে দেওয়ার মতো উপযুক্ত স্থান বা আসন কিছুই নেই তাঁর। কি করি, কি করি, ভাবতে ভাবতে হঠাৎ এক বুদ্ধি এসে যায় প্রত্যুৎপন্নমতি সুদামার মাথায়। বকুল বৃক্ষমূলে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে তাঁর বক্ষাসনে বসে কৃষ্ণ-বলরামকে বিশ্রাম করতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেন পুনঃ পুনঃ। অল্প সময়ের জন্য হলেও আসন গ্রহণ করে ভক্তমনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন ভগবান কৃষ্ণ-বলরাম। অতঃপর দুই ভাই তাঁদেরকে কংসবধের জন্য বীর সাজে সাজিয়ে দেওয়ার আর্জি পেশ করেন বাল্যবন্ধু সুদামার কাছে। সুদামা এতোদিন তাঁদেরকে মোহন বেশেই সাজিয়েছেন, বীর বেশে নয়। তাই পড়লেন সমস্যায়। সমস্যা সমাধানে উপস্থিত বুদ্ধি

খাটিয়ে সুদামা কৃষ্ণ-বলরামের পীত বসন পরিয়ে দিলেন মালকোছা দিয়ে। মাথায় মোহনচূড়ার পরিবর্তে বেঁধে দিলেন পীতবসনের পাগড়ি। আর চার হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম ছাড়াও ধরিয়ে দিলেন তীর-ধনু। গলে বনফুলের বনমালা, নানা অঙ্গে নানান পুষ্পাভরণ। কপালে চন্দন আর কুমকুমের অলকা-তিলক। বীর সাজে সজ্জিত হয়ে বেরিয়ে গেলেন দুই ভাই। সপার্ষদ নিহত হলেন কংস। মথুরা বিজয়ের পর সুদামার কথা মনে পড়ল তাঁদের। সাথে সাথে সুদামাকে ডেকে পাঠালেন মথুরাতে। সানন্দে সুদামা এলেন মথুরাতে। একান্ত প্রীত কৃষ্ণ-বলরাম বন্ধুবর সুদামাকে বক্ষে জড়িয়ে ধরে বললেন, "কি চাও, বল বন্ধু? যা চাইবে তাই পাবে।"

আনন্দে অশ্রুবিগলিত নয়নে সুদামা বললেন, **"তোমাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব চিরস্থায়ী হোক—এই আমার প্রার্থনা। আর 'মাল' উপাধিধারী নীচ জাতির জন্য আমি হীনমন্যতায় ভুগি সর্বদা। আশীর্বাদ করুন আমার বংশধরগণ যেন হীনমন্যতার দরুন মনোকষ্ট না পায়।"**

কৃষ্ণ-বলরাম সমস্বরে বলে উঠলেন, **"তথাস্তু। আজ থেকে তোমার বংশধরগণ 'মাল' নয়, হবে 'মালাকার'। দেব-দেবীর অঙ্গসজ্জা এবং পুষ্পালংকার প্রস্তুত করার অধিকার থাকবে শুধুমাত্র তোমারই বংশধরদের। তোমরা কদাপি অশুচি বা অপবিত্র হবে না। পৃথিবীতে পরম পবিত্র জাতি বলে তোমরা গণ্য হবে।"**

পূর্বেই বলেছি, মল্লভূমের মালাকারগণ মূলতঃ শোলা-শিল্পী। শোলা, রাংতা, রঙ-বেরঙের কাগজ, চিনাকাগজ, সোনালি, রূপালি জরি, পুঁতি, চুমকি, তেঁতুল বিচির আঠা ইত্যাদি উপাদানে এবং করাত, কাঁচি, ছুরি প্রভৃতি কার্যোপকরণ নিয়ে মল্লভূমের মালাকারগণ তৈরী করেন দৃষ্টিনন্দন বস্তু-সামগ্রী। ফুল, ফুলের মালা, চাঁদমালা, পাখপাখালি-খেলনা, দেব-দেবীর চাল বা মেড়, দেব-দেবীর অঙ্গসজ্জার জন্য বুক-আঁচলা, কানপাশা, তাবিজ, নূপুর, মুকুট, চূড়া প্রভৃতি অলংকার ছাড়াও তুষুর ভেলা, ভাদুর চৌদাল, লোকনৃত্যের মুখোশ, বরের মোড় বা টোপর, কনের পাতিমোড় ও শোলার সাজ এবং ঘর সাজানোর নানান দ্রব্য রয়েছে এঁদের উৎপাদিত বস্তুর মধ্যে।

কৃষ্ণ-বলরামের কৃপাধন্য, অত্যন্ত সুরুচিসম্পন্ন এই শিল্পীজাতি কিন্তু আজও উপেক্ষিত এবং অবহেলিত; দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে নিষ্পেষিত।

অধ্যায়-৫৬

ধর্মঠাকুর

শাঁখারীবাজার

এবার প্রসঙ্গ শাঁখারীবাজার মহল্লার ধর্মঠাকুর এবং রাঢ়বঙ্গের ধর্মঠাকুর। ধর্মঠাকুর রাঢ়বঙ্গের অন্যতম লোক-দেবতা তথা গ্রাম-দেবতা। বাংলাদেশের পশ্চিম দিকের ক্ষীণায়মান মালভূমি গঠিত অঞ্চল রাঢ়বঙ্গ নামে পরিচিত। পশ্চিম-বর্ধমান, হুগলীর কিয়দংশ, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম-মেদিনীপুর সহ ছোটনাগপুর পর্যন্ত রাঢ়বঙ্গ বিস্তৃত। মূলতঃ উপজাতি-প্রধান এ অঞ্চল দীর্ঘদিন আর্য-প্রভাব মুক্ত ছিল। ফলতঃ এ অঞ্চলের একান্ত নিজস্ব দেবতা রূপে ধর্মঠাকুরের আত্মপ্রকাশ।

ধর্মঠাকুরকে নিয়ে দু-ধরনের কাব্য রচিত হয়। একটি সৃষ্টিতত্ত্ব ও ধর্মঠাকুরের উৎপত্তি বিষয়ক **রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ'**; অন্যটি ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য বিষয়ক **ধর্মমঙ্গল- কাব্য**। রাঢ়বঙ্গে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার সম্পর্কিত দুটি কাহিনী প্রচলিত। প্রথমটি রাজা হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী। দ্বিতীয়টি রঞ্জাবতী লাউসেনের উপাখ্যান। প্রথম উপাখ্যানটি নিম্নরূপ।

রাজা হরিশ্চন্দ্র ছিলেন নিঃসন্তান। হরিশ্চন্দ্র এবং তাঁর স্ত্রী **মদনা** বল্লুকা নদীতীরে ধর্মঠাকুরের পূজা করে একটি শর্তসাপেক্ষে **লুইচন্দ্র** নামক পুত্র সন্তান লাভ করেন; শর্তটি হল পুত্র লাভের পর প্রথম পুত্রটিকে ধর্মঠাকুরের স্থানে বলি দিতে হবে। পুত্রলাভের পর রাজা ও তাঁর স্ত্রী ভুলে যান শর্তের কথা। ধর্মঠাকুর তখন এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে অতিথি রূপে রাজপ্রাসাদে হাজির হন এবং তাঁদের পুত্রের মাংস খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অতিথি-বৎসল ধর্মপ্রাণ রাজা ও রাণী তৎক্ষণাৎ পুত্র লুইচন্দ্রকে হত্যা করে মাংস রান্না করে ব্রাহ্মণকে খেতে দেন। ব্রাহ্মণ তাঁদের অতিথি পরায়ণতায় মুগ্ধ এবং যার-পর-নাই প্রীত হয়ে ছদ্মবেশ ত্যাগ করে ধর্মঠাকুরের রূপ ধারণ করে তাঁদের মৃত পুত্রকে বাঁচিয়ে দেন। অত্যাশ্চর্য এই ঘটনার পর রাজা-রাণী সাড়ম্বরে ধর্মঠাকুরের পূজা করেন। পুরাণের গল্পের কায়া অবলম্বনে রচিত এই কাহিনীটিই ধর্ম-মঙ্গলের আদি কাহিনী।

দ্বিতীয় কাহিনীটি মল্লভূম রাজ্যের **কামারপুকুর সন্নিকটস্থ** গড়মান্দারণকে কেন্দ্র করে রচিত। সেনরাজা **বল্লাল সেনের** মাতুলালয় ছিল এই গড়মান্দারণ। পূর্বোক্ত সেন বংশের জনৈক **কর্ণ সেন** গৌড়ের রাজার সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। বিদ্রোহী **ইছাই ঘোষকে** দমন করার উদ্দেশ্যে গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে পাঠিয়ে দেন। ইছাই ঘোষের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে কর্ণসেনের ছয় পুত্র নিহত হয়। কর্ণসেনের পত্নী পুত্রশোকে আত্মহত্যা করেন। এমতাবস্থায় গৌড়াধিপতি মর্মাহত কর্ণসেনের সাথে নিজ শ্যালিকা **রঞ্জাবতীর** বিবাহ দেন এবং তাঁকে ময়নাগড়ের রাজা করেন। গৌড়েশ্বরের শ্যালক মহামদের অনুপস্থিতিতে এবং তাঁর অমতে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়। এজন্য **মহামদ** বৃদ্ধ কর্ণসেন ও ভগ্নী রঞ্জাবতীর ওপর ভীষণ চটে যান, হয়ে ওঠেন প্রতিহিংসাপরায়ণ।

দীর্ঘদিন বন্ধ্যা থাকায় রঞ্জাবতী সন্তান কামনায় ধর্মঠাকুরের পূজার্চনা শুরু করেন। অবশেষে ধর্মঠাকুরের কৃপাতে **লাউসেন** নামে একটি পুত্রসন্তান লাভ করেন। মহামদ লাউসেনকে হত্যা করার অভিমানসে অপহরণ করেন। পুত্রশোকে ভেঙে পড়েন রাজা কর্ণসেন ও রাণী রঞ্জাবতী। সন্তানহারা দম্পতিকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য ধর্মঠাকুর এক বিন্দু কর্পূর থেকে কর্পূর ধবল একটি শিশু তৈরী করে রঞ্জাবতীকে উপহার দেন। এদিকে ধর্মঠাকুরের অনুচর **হনুমান** লাউসেনকে উদ্ধার করে রঞ্জাবতীর কোলে তুলে দেন।

ধর্মঠাকুরের কৃপাপুষ্ট লাউসেন দিনে দিনে অসমসাহসিক বীরপুরুষে উত্তীর্ণ হন ক্রমশঃ। শ্যালক মহামদের প্ররোচনায় **গৌড়রাজ** লাউসেনকে যুদ্ধ করতে পাঠান সুদূর কামরূপে। লাউসেন কামরূপের রাজাকে পরাভূত করে রাজকন্যা **কলিঙ্গাকে** বিবাহ করেন। কামরূপ থেকে ফেরার পথে লাউসেন শিমূলা রাজ্যে গিয়ে উপস্থিত হন। শিমূলার পরমা সুন্দরী রাজকন্যার প্রতিজ্ঞা ছিল, যে ব্যক্তি এক কোপে তাঁদের লোহার গণ্ডারটিকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারবেন তিনি তাঁকেই বরমাল্য দেবেন। উল্লেখ থাকে যে লাউসেনের বীরত্বে সাতিশয় প্রীত হয়ে দেবী পার্বতী লাউসেনকে একটি 'বিজয় খড়গ' দিয়েছিলেন। সেই খড়্গের আঘাতে এক কোপে লোহার গণ্ডারটিকে দ্বিখণ্ডিত করে লাউসেন রাজকুমারী কানাড়াকে বিবাহ করেন।

লাউসেনের বিজয় গৌরবে দারুণ খুশী হলেন গৌড়েশ্বর, কিন্তু নিদারুণ অখুশী এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠলেন মামা মহামদ। মহামদের প্ররোচনায় গৌড়াধিপতি এবার ঢেকুরগড়ের রাজা ইছাই ঘোষকে দমন করতে পাঠান। দেবী চণ্ডীর বরপুত্র হওয়া সত্ত্বেও প্রবল পরাক্রান্ত ইছাই ঘোষ কিন্তু মল্লবীর লাউসেনের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। মহামদের ইন্ধনে উৎসাহিত গৌড়েশ্বর এবার লাউসেনকে পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় দেখাতে বলেন। ধর্মের কৃপাপুষ্ট লাউসেন এই অসম্ভব কার্যকে সম্ভব করেন—পশ্চিম আকাশে দেখা দেয় সূর্য। রণক্লান্ত লাউসেন তখন হাকন্দ নদীর তীরে ধর্মঠাকুরের তপস্যায় ধ্যানমগ্ন। সুযোগ বুঝে মাতুল মহামদ লাউসেনের রাজ্য **ময়নাগড়** আক্রমণ করেন। লাউসেনের স্ত্রী কানাড়া অন্যান্য বীরাঙ্গনাদের নিয়ে প্রবল পরাক্রমে যুদ্ধ করে ময়নাগড় রাজ্য রক্ষা করেন। স্বীয় ভক্ত লাউসেনের উপর ক্রমাগত নির্যাতন ও চক্রান্তের ফলে ধর্মঠাকুর মহামদের উপর রুষ্ট হন। মহামদ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হন। ক্ষমাসুন্দর লাউসেনের সানুনয় প্রার্থনায় ধর্মঠাকুরের ক্রোধ প্রশমিত হয় এবং মহামদ রোগমুক্ত হন।

কথিত আছে স্বর্গের নর্তকী **জাম্ববতী** অভিশপ্ত হয়ে ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে পৃথিবীতে আগমন করেন। স্বীয়পুত্র লাউসেন মারফৎ ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচারিত হলে শাপমুক্ত হয়ে পুত্র লাউসেন সহ রঞ্জাবতী সশরীরে স্বর্গধামে গমন করেন। **এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল ধর্মঠাকুর স্বীয় মহিমা প্রচারের ক্ষেত্রস্থল হিসেবে মল্লভূমের মল্লমাটি ও মল্লবাসীকেই মনোনীত করেছেন। মল্লভূমের পক্ষে এটা কম গৌরবের কথা নয়। আরো উল্লেখ্য, 'ধর্মমঙ্গল কাব্য' রাঢ়ের জাতীয়কাব্য রূপে স্বীকৃত।**

মঙ্গলকাব্যের একমাত্র এই পুরুষদেবতা ধর্মরাজ রাঢ়বঙ্গের বহুস্থানে বহুনামে পূজিত হয়ে আসছেন শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। রাঢ়ের পূজিত ধর্মঠাকুরের নামগুলির সাথে রাঢ়ের রাধাকৃষ্ণের নামগুলির মধ্যে অর্থগত দিক থেকে অপরূপ সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। এদেশের ধর্মঠাকুরগণ হলেন মোহনরায়, দোলুরায়, কালুরায়, শ্যামরায়, বুড়োরায়, চাঁদরায়, কেদাররায়, বাঁকারায়, গুপীরায়, সুন্দররায়, বংশীধারী ইত্যাদি। পক্ষান্তরে রাধাকৃষ্ণের নামগুলি হল শ্যামরায়, কৃষ্ণরায়, রাধাগোপীনাথ, রাধামুরলী মনোহর, শ্যামসুন্দর, রাধাদোলগোবিন্দ, বুড়োরাধাশ্যাম, রাধাশ্যামচাঁদ, রাধামদনমোহন প্রভৃতি।

শুধু নামের সাদৃশ্যেই নয়, রাধাকৃষ্ণের যেসব উৎসব উদ্‌যাপিত হয় রাঢ়বঙ্গে তথা মল্লভূমে, ধর্মঠাকুরকে কেন্দ্র করে সেসব উৎসবও অনুষ্ঠিত হয় বহুল পরিমাণে। সাদৃশ্যমূলক উৎসবগুলি হল স্নানযাত্রা, বকুলকুঞ্জ, রথযাত্রা, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, উত্থান-একাদশী, রাসযাত্রা, দোলযাত্রা প্রভৃতি। অবশ্য এসব সাদৃশ্য থেকে ধর্মঠাকুর এবং রাধাকৃষ্ণকে সমগোত্রীয় দেবতা বলে ভাবার অবকাশ নেই। কারণ বৈসাদৃশ্যও আছে অনেকানেক। শিবের গাজনের মতো ধর্মের গাজনও হয় যত্রতত্র। গাজন হয় গ্রামে, গঞ্জে। অবশ্য শিবের গাজনের মতো ধর্মঠাকুরের গাজন হয় না ফি-বছর। নিয়মানুসারে কয়েক বছর অন্তর এবং ক্ষেত্রবিশেষে বার বছর অন্তরও হয়ে থাকে এই গাজন।

"শিবের গাজনের মতই ধর্মঠাকুরের গাজনেও শালে ভর, বাণফোঁড়া, আগুন সন্ন্যাস ইত্যাদি আত্মনির্যাতনমূলক অনুষ্ঠানও হয়। রাঢ়ের রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজায় বলি দেওয়ার কোন দৃষ্টান্ত নাই কিন্তু ধর্মঠাকুরের পূজায় বহু ছাগ বলি দেওয়া হয়। গাজনের সময় ঠাকুরের (মানসিক) ছাগ বলি দেওয়ার রীতি রহিয়াছে। **রাঢ়ের রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহগুলির মধ্যে শ্যামচাঁদ বিগ্রহের পূজায় শোলমাছের সঙ্গে কচি আমের টকও নিবেদিত হয়।**

পুরুলিয়া অঞ্চলে শিবের গাজনে অনেক ক্ষেত্রেই ছাগ বলি দেওয়ার প্রথা রহিয়াছে।"[১] বীরভূমের অনেক ধর্মঠাকুরের পূজায় শূকর বলি দেওয়ার রীতিও প্রচলিত। কোথাও কোথাও আবার পায়রা, মুরগীও বলি দেওয়া হয়।

ধর্মঠাকুরের পূর্বোক্ত নামগুলি ছাড়াও আরও অনেক বিচিত্র নাম রয়েছে। যেমন যাত্রাসিদ্ধি, বাঁকুড়ারায়, মোলারায়, জগৎরায়, এলোরায়, কৌতুকরায়, ফতেসিং, দলমাদল, আঁধারকুলি, কাঁকড়াবিছা, রাজাধিরাজ, শঙ্খসুর প্রভৃতি। নারায়ণের নামে যেসব ধর্মঠাকুর রয়েছেন তাঁরা হলেন স্বরূপনারায়ণ, রূপনারায়ণ, শীতলনারায়ণ, ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করি, ধর্মঠাকুরের 'কামিন্যা' নামে উল্লিখিত জয়দুর্গা, জয়মঙ্গলা, সিদ্ধেশ্বরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতি দেবীও রয়েছেন এবং পূজিত হন।

ধর্মঠাকুরের নামগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রত্যেকটি নামের জ্যোতিষিক ব্যাখ্যা আছে। সূর্য হিন্দুদের উপাস্য দেবতা। ধর্মঠাকুর ক্ষেত্রবিশেষে সূর্যের নামান্তর এবং অবস্থান্তর। সূর্যের বিভিন্ন রাশিতে অবস্থান এবং বিভিন্ন সময়ের অবস্থানকে কেন্দ্র করে ধর্মঠাকুরের নানান নাম পরিলক্ষিত হয়। যেমন বৃশ্চিক রাশির প্রতীক কাঁকড়াবিছা। বৃশ্চিক রাশিস্থ সূর্যকে তাই 'কাঁকড়াবিছা' বলা হয়। কোন রাশিতে কোন গ্রহের অবস্থানকালকে গ্রহের শৈশব, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য দশারূপে চিহ্নিত করা হয়। এজন্যই সংক্রান্তির সূর্য, বৃদ্ধ-সূর্য। সংক্রান্তির সূর্য তাই 'বুড়োরায়'। আবার মকর ক্রান্তিতে সূর্য চরম বক্রগতিতে অবস্থান করেন। সূর্যের বক্রগতিতে বিচরণ হেতু ধর্মঠাকুরের আর এক নাম 'বাঁকুড়ারায়'। "মেঘলা দিনের সূর্য মেঘরায় ধর্মঠাকুর হইয়াছেন। শ্যামরায় বলিতে শ্রাবণ মাসের ঘনশ্যাম মেঘের অন্তরালের সূর্যকে বোঝায়। দোলুরায় বলিতে দোল পূর্ণিমা দিনের সূর্যকে বোঝায়। যাত্রাসিদ্ধি ধর্মঠাকুর বিজয়া দশমী দিনের ধর্মঠাকুর। এই ধর্মঠাকুরকে রামাই পণ্ডিত প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা করিতেন।"[২]

জেনে রাখা ভাল যে, বাঁকুড়া জেলার নামকরণের ক্ষেত্রে নানা জনের নানা মত। তন্মধ্যে কোন কোন গবেষক মনে করেন ধর্মঠাকুর 'বাঁকুড়ারায়ের' নামানুসারেই নাকি এই জেলার নাম হয়েছে 'বাঁকুড়া'।

ধর্মঠাকুরকে নিয়ে পণ্ডিত ও গবেষক মহলে জল্পনা-কল্পনা এবং ভাবনা-চিন্তার অন্ত নেই। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতে ধর্মঠাকুর হলেন বুদ্ধের আবরণ দেবতা। রাঢ়-বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের অবলুপ্তি ঘটে ধর্মঠাকুর উপাসনার মাধ্যমে। এজন্যই বোধ করি ধর্মঠাকুরের শিলামূর্তিগুলি হয়েছে বৌদ্ধস্তূপ সদৃশ। আবার অনেকে মনে করেন 'শূন্য পুরাণ' প্রণেতা রামাই পণ্ডিত সূর্যের সঙ্গে ধর্মঠাকুরের সাজুয্য ঘটিয়েছেন। অপৌরাণিক দেবতা ধর্মঠাকুরের ইতিহাস অনুসন্ধান করতে গিয়ে যে আটজন পণ্ডিতের ধর্মমঙ্গল কাব্যের সন্ধান পাওয়া গেছে তাঁরা হলেন, রামাই পণ্ডিত, ময়ূরভট্ট, রূপরাম, খেলারাম, ঘনরাম, রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিকচন্দ্র গাঙ্গুলী ও সহদেব চক্রবর্তী। এঁদের মধ্যে দ্বিজ ঘনরাম চক্রবর্তী লিখিত 'শ্রীধর্মমঙ্গল কাব্য' থেকে জানা যায়, গৌড়পতি ধর্মপালের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর পুত্র লাউসেন ধর্মঠাকুরের পূজার প্রচলন করেন। ঘনরামের গ্রন্থে ধর্মকে 'ব্রহ্মাতি' বলা হয়েছে। অর্থাৎ ধর্মঠাকুরের উপর ব্রহ্মত্ব আরোপিত হয়েছে। এতদর্থে 'ধর্মঠাকুর শূন্যমূর্তি, নিরঞ্জন, নিরাকার প্রভু।' ধর্মঠাকুরের একটি ধ্যানে ধর্মকে ব্রহ্মা,

১. সুবর্ণরেখা হইতে ময়ূরাক্ষী, ৫ম খণ্ড, পৃঃ—৩৩

২. সুবর্ণরেক্ষা হইতে ময়ূরাক্ষী (৩ খণ্ড) পৃঃ—১৩০, ১৩১,

বিষ্ণু, মহেশ্বর ও পার্বতীর সৃষ্টিকর্তারূপেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। ধর্মপূজার প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে কেহ কেহ পূর্ব-ইরান, শকদ্বীপ তথা মগদেশ থেকে আগত 'গ্রহবিপ্র' সম্প্রদায়ের নামও উল্লেখ করে থাকেন। আবার পশ্চিম-রাঢ়ে ধর্মঠাকুর পূজার প্রবর্তক-রূপে ছান্দাড় অঞ্চলের শীতল মল্ল ও কালুবীর, সেনভূমের অভিরাম সেন এবং গোপভূমের ইছাই ঘোষের নামও উল্লেখ করেন। মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, হুগলী, বর্ধমান এবং বীরভূম জেলাতে ধর্মঠাকুরের বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। শুধুমাত্র বাঁকুড়া জেলাতেই রয়েছেন শত শত ধর্মঠাকুর। বস্তুতঃ বাঁকুড়া জেলার মধ্যযুগের জনজীবনের একটি সমাজচিত্র সুন্দরভাবে বিধৃত হয়েছে ধর্মমঙ্গলে। আবার অনেকে মনে করেন মধ্যযুগের যুগসন্ধিক্ষণের দ্বান্দ্বিক মুহূর্তে দেশের "সামাজিক, রাষ্ট্রিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় উত্থান-পতন, জয়-পরাজয়, বিপ্লব বিপর্য্যয়ের কালে সমস্ত বিষয়ের ভারসাম্য রক্ষার লোক-মানসিকতার মূলেই পশ্চিম-রাঢ়ে ধর্মঠাকুররূপী এই বিচিত্র দেবতার বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।"[১]

এই বিচিত্র দেবতার আকার প্রকারও কিন্তু বিচিত্র ধরনের। "কোথাও তিনি কেবল ঘটে, কোথাও কেবল সিন্দুরমণ্ডিত একখানি পাথরে, কোথাও কোন এক প্রকার প্রতিমায় পূজিত হইয়া থাকেন। প্রতিমার আবার নানাভেদ, কোথাও কচ্ছপাকার, কোথাও উনোনের ঝিকের ন্যায় কোণাকার, কোথাও শিবলিঙ্গের উর্দ্ধভাগের ন্যায়, ইহা ব্যতীত আরও অনেক প্রকার প্রতিমা আছে।"[২]

"ধর্ম্মঠাকুরের শিলার উপরে, নীচে এবং পার্শ্বে নানা জাতীয় নক্সাও দেখা যায় যেমন কুণ্ডলীকৃত সর্প, অষ্টদল, ষোড়শদল, দ্বাদশদল পদ্ম প্রদীপ, যোনি, জোড়াপাদুকা, স্তূপ, মিথুনমূর্তি, সূর্য, চন্দ্র, হনুমান ইত্যাদি।" **বিষ্ণুপুর শহরের শাঁখারীবাজার মহল্লাতে রয়েছে বুড়োধর্মঠাকুরের কূর্মাকৃতি শিলামূর্তি।** উক্ত শিলামূর্তিতে গণেশ জননীর মূর্তিও বিদ্যমান। এসব প্রতীক দেখে কোনটি কি ধর্মঠাকুর তা নির্ণীত হয়। আবার রামাই পণ্ডিতের মতো অনেকেই মনে করেন তাঁর কোন আকার-প্রকার নেই। তিনি নিরাকার। মহাশূন্যে তিনি শূন্যমূর্তিতে অবস্থান করেন এবং শূন্য থেকেই সব কিছু সৃষ্টি করে থাকেন।

এতাদৃশ ধর্মঠাকুর কোথাও মন্দিরে, কোথাও বৃক্ষমূলে, কোথাও পুষ্করিণী তীরে, কোথাও কোন মাঠের মধ্যে উন্মুক্ত প্রান্তর অথবা তেমাথা চৌমাথার সংযোগ স্থলে ঘট পেতে পূজিত হয়ে থাকেন। কোথাও নিত্যপূজা হয়, কোথাও বা পূজা হয় বছরের বিশেষ বিশেষ বার ও তিথি উপলক্ষ্যে। পশ্চিমমুখে বসে ধর্মের পূজা করার নিয়ম, ঠাকুর থাকেন পূর্বমুখে। ধর্মঠাকুরের মূর্তি সাধারণতঃ সোনার বা রূপার টোপর দিয়ে আবৃত থাকে। টোপরে চোখ, মুখ, নাক অঙ্কিত থাকে। পূজার দিন ঠাকুরকে স্নান করান হয়। তিথি উল্লেখ করে সংকল্পও করা হয়। অতঃপর তেল সিন্দুর সহ স্থানভেদে তুলসী বা বেলপাতা দিয়ে পঞ্চোপচারে বা ষোড়শোপচারে পূজা করা হয়। পূজার সময় ধর্মের বীজমন্ত্র, ধ্যানমন্ত্র এবং প্রণামমন্ত্র পঠিত হয়। যেমন একটি প্রণামমন্ত্র হল—

ওঁ নমঃ ধর্মরাজায় নমঃ।
যাত্রাসিদ্ধিরায়ায় নমঃ।।

---

১. পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, পৃঃ—১৩১
২. বাংলা বিশ্বকোষ/৯, পৃঃ—২১৯

ধর্মঠাকুর ধর্মরাজ, ধর্মরায় নামেও প্রসিদ্ধ। ধর্মঠাকুর নিম্নবর্ণের হিন্দুজাতি যেমন হাড়ী, ডোম, পোদ, কেয়ট বা কৈবর্ত, বাউরী, বাগ্দী, জেলে প্রভৃতি সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা। ধর্মরায় নীচজাতির মানুষের মধ্যে প্রভাবশালী দেবতা হলেও ব্রাহ্মণ, কায়স্থাদি উচ্চবর্ণের মানুষজনও এঁকে মানেন। **এমনকি মুসলমানেরাও এঁর পূজাদি দিয়ে থাকেন।**

সাধারণতঃ শনি মঙ্গল বারে, বিশেষতঃ মানসিক শোধের ক্ষেত্রে ঐ দুই বারের দুপুরবেলা ধর্মঠাকুরের পূজা বিশেষ ফলদায়ক। ঐদিন নাকি পূজাস্থলে ঠাকুর সশরীরে উপস্থিত থাকেন এবং পূজা গ্রহণ করেন। মঙ্গলকাব্যকার **রূপরাম চক্রবর্তীর** লেখনীতে সেই সুরই অনুরণিত হয়েছে—

একে শনিবারে তাই ঠিক দুপুরবেলা।
সম্মুখে দাঁড়াইল ধর্ম গলে চন্দ্রমালা।।

ধর্মঠাকুরের পূজায় পুরোহিতের কাজ করেন ডোম সম্প্রদায়ের **'আঁকুড়ে ডোম'** উপজাতির মানুষেরা। এঁরাই ডোমদের ব্রাহ্মণ। 'আঁকুড়ে ডোম' সম্প্রদায় কেমন করে ডোমেদের ব্রাহ্মণ হলেন এবং ধর্মঠাকুরের পূজা করার অধিকার লাভ করেন এই বিষয়ে একটি উপভোগ্য কাহিনী প্রচলিত। কাহিনীটি নিম্নরূপ —

পুরাকালে তিনজন তপোসিদ্ধ ঋষি ছিলেন। এঁরা আবার সহোদর ভ্রাতাও ছিলেন। সাধনার অঙ্গ হিসেবে এঁরা প্রায়শই গোমেধ যজ্ঞ করতেন। যজ্ঞস্থলে গরু বলি দেওয়ার পর মন্ত্রবলে পুনরায় তাঁরা গরুটিকে বাঁচিয়ে তুলতেন। একবার যজ্ঞস্থলে একটি গরুকে বলি দেওয়ার পর মেজ ও ছোট ভাই পুনঃ পুনঃ মন্ত্রশক্তির প্রয়োগ করেও নিহত গরুটির মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে ব্যর্থ হন। তখন তাঁরা ধ্যানবলে জানতে পারেন তাঁদেরই বড়দাদা গো-মাংস খাবার লোভে বলি প্রদত্ত গরুটির মাংস অপহরণ করে পুকুরে পুঁতে রেখেছেন। ক্রোধান্বিত ভ্রাতৃদ্বয় তখন অতি হীনমনোবৃত্তি-সম্পন্ন বড় ভাইকে 'যবন হও' বলে অভিশাপ দেন। বড় ভাই যবন হলেন। **কথিত আছে উক্ত লুক্কায়িত গোমাংস থেকে পেঁয়াজ এবং মাংসের হাড় থেকে রসুন উৎপন্ন হয়। এজন্যই হয়ত পেঁয়াজ, রসুন আমিষ খাদ্যরূপে বিবেচিত হয় হিন্দুধর্মে।** পরবর্তীকালে মেজ ও ছোট ভাই কোন একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে উভয়েই তুমুল ভ্রাতৃকলহে মেতে ওঠেন। ক্রোধান্বিত ছোট ভাই মেজ ভাইয়ের পৈতা ছিঁড়ে দেন। মেজ ভাই তখন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে ছোট ভাইকে 'নীচ জাতির যজমান হও' বলে অভিশাপ দেন। অভিশপ্ত ছোট ভাই তাঁর দাদার পায়ে ধরে ক্ষমা ভিক্ষা চান। মেজ ভাইয়ের ক্রোধ প্রশমিত হয়। বলেন, 'আমার অভিশাপ মিথ্যা হবার নয়। তবে তুমি নীচ জাতির যজমান হলেও তোমার সম্মান হবে আমার উপরে। আমার পৈতাতে থাকবে দশদণ্ডী, আর তোমার পৈতাতে থাকবে একাদশ দণ্ডী। ধর্মঠাকুরের পূজারী হবে তুমি। কোন ব্রাহ্মণ পূজা করতে পারবেন না।'

সেই থেকেই উক্ত ছোট ভাইয়ের বংশধরেরা **'আঁকুড়ে ডোম'** নামে আখ্যায়িত হয়ে ধর্মঠাকুরের পূজা করে আসছেন অদ্যাবধি।

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা রঘুনাথ সিংহের শিকার-যাত্রার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধর্মঠাকুরের একটি মাহাত্ম্য-কাহিনী শোনা যায়। বিষ্ণুপুরের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রায় মাইল দশেক দূরে অবস্থিত ওন্দা, খামারবেড়িয়া অঞ্চলে সদলবলে শিকার করতে গিয়ে একদা রাজা রঘুনাথ সিংহ শিকারীদল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। তাঁর প্রিয় বাজবৈরী পাখিটিও হারিয়ে যায় ঝড়-ঝাপটার দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে। একাকী ঘুরতে ঘুরতে রঘুনাথ সিংহ

এক ধর্মঠাকুরের থানে উপনীত হন। ধর্মঠাকুরের পূজারী (দিয়াসী) রাজাকে রাজোচিত আপ্যায়ন করেন। রাজা বাজবৈরী পাখিটির জন্য অনুশোচনা করেন বারংবার। দিয়াসী তখন বলেন, "অনুশোচনা করবেন না মহারাজ, ঝড়বৃষ্টি থামলেই ধর্মঠাকুরের কৃপায় আপনার সাধের পাখি আপনার কাছে ফিরে আসবে।"

"তাই যদি হয়, তাহলে তোমার ঠাকুরকে আমি প্রভূত ভূ-সম্পত্তি দান করব।" বলেছিলেন রাজা রঘুনাথ সিংহ।

ঝড় থামতেই ফিরে এসেছিল রাজা রঘুনাথের প্রিয় পাখিটি। স্বীয় প্রতিশ্রুতি মতো রাজা ধর্মঠাকুরের পূজা ও উৎসবাদির জন্য প্রচুর নিষ্কর জমি দান করেছিলেন। **এভাবে রাজ-আনুকূল্য লাভ করেন ধর্মঠাকুর।**

স্মরণ রাখা ভাল যে মল্লভূম ধর্মঠাকুরের প্রভাবপুষ্ট রাজ্য। এখানে দলমাদল নামে একটি ধর্মশিলা রয়েছে। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত দলমাদল কামানটির নামকরণ প্রসঙ্গে নানা জনের নানা মত। অনেকে মনে করেন দল ও মাদল নামে দুটি কামান ছিল। আবার অনেকে মনে করেন 'দলমর্দন' (শত্রুকে মর্দন বা দমন) সংস্কৃত শব্দটি থেকেই **'দলমাদল'** নামকরণ হয়েছে। গবেষক মাণিকলাল সিংহ মনে করেন উক্ত ধারণা দুটি ভ্রান্ত ধারণা। তাঁর মতে বিষ্ণুপুর শহরের শাঁখারীবাজার পল্লীর বুড়োধর্মঠাকুরের পূজারী বিরলাই শ্রেণীভুক্ত কর্মকার পরিবারের পূর্ব-পুরুষগণ দলমাদল কামান নির্মাণ করেন এবং **'দলমাদল' নামক ধর্মঠাকুরের নামানুসারে কামানটির নাম রাখেন 'দলমাদল'।**

মল্লভূমের ধর্মঠাকুরের কথা বলতে গেলে যে ধর্মঠাকুরের কথা উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ রয়ে যায় তা হল বিষ্ণুপুর শহরের পূর্বে অবস্থিত গোকুলনগরের **শঙ্খসুর** ঠাকুরের কথা। প্রায় আড়াইশ বছরের সুপ্রাচীন এই ধর্মঠাকুরের মন্দিরে রয়েছে বারটি ধর্মশিলা। একত্রে বারটি ধর্মঠাকুরের মূর্তি এতদঞ্চলে প্রায় দেখা যায় না। মূল দেবতা শঙ্খসুর হলেন এক বিশেষ ধরনের শঙ্খ। এই শঙ্খরূপী ধর্মঠাকুর রূপার তৈরী আবরণে ঢাকা থাকেন। শুধুমাত্র স্নানের সময় দেখা যায়। প্রভু শঙ্খসুরের আসনেই রক্ষিত আছে অপরাপর এগারটি ধর্মশিলা। ধর্মঠাকুরের সিংহাসনের উভয় পার্শ্বে দুটি ভল্লুকী মূর্তিধারী কামিন্যা-ঘট পরিলক্ষিত হয়।

শঙ্খসুর ধর্মঠাকুর নিরাকার ব্রহ্ম বা বিষ্ণু রূপে পূজিত হন। এখানে দেবী দুর্গা ধর্মকে সাক্ষী রেখে উভয় পার্শ্বে ভল্লুকী মূর্তি ধারণ করে রিপুতাড়নকারী পশুরক্ত পান করার জন্য উপস্থিত। এখানেই **ধর্মপুরাণ** এবং **সাংযাত**-এর পদ্ধতি মেনে নিয়মিতভাবে পূজার্চনা হয়ে আসছে আজও। গোকুলনগরের ডোম পণ্ডিতেরা এঁর নিত্যপূজা করেন এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামের ভট্টাচার্য ও রায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণেরা উৎসব অনুষ্ঠানাদির সময় পূজা ও তন্ত্রধারকের কাজ করে থাকেন। গোকুলনগর এবং নামোসলদা এই দুই গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ দুই-ষোল-আনার ঠাকুর হিসেবে প্রভু শঙ্খসুরের উৎসবাদি করে থাকেন বছরে বছরে। এই ঠাকুরের পূর্বতন পূজারী ঁ**গোবিন্দ পণ্ডিত** ধর্মপুরাণের সুগায়ক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এখানে বহু প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাওয়া গেছে। গোকুলনগরের ধর্মঠাকুর ছাড়াও গোকুলনগর সন্নিকটস্থ রাজশোল গ্রামে কশ্যপমূর্তি বিশিষ্ট **আঁধারকুলি** ধর্মঠাকুর রয়েছেন এবং পূজিত হন। **শ্রীরামনবমীতে উক্ত ঠাকুরের রথ উৎসব উদযাপিত হয় সাড়ম্বরে।**

ধর্মঠাকুরকে নিয়ে ব্যাপক এবং গভীর পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে মল্লভূমের

জনজীবনে এঁর প্রভাব অচল, অনড়, সুদৃঢ় এবং শত ধারায় উৎসারিত। তাই ধর্মঠাকুরের কথা বলতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় মাণিকলাল সিংহ লিখেছেন, **"পশ্চিম রাঢ়ের ধর্মঠাকুর এক বিচিত্র দেবতা, পৌরাণিক অনেক দেবতার সমন্বয়ে তিনি গঠিত, তিনি বিষ্ণু, তিনি শিব, তিনি সূর্য, বরুণ তিনি, বৌদ্ধধর্মের ভগবান তথাগত। ....ধর্মঠাকুর পশ্চিম রাঢ়ের মানুষের ইহলোক এবং পরলোকের দেবতা। ভক্তের জন্য তিনি স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হন, ভক্তের জন্য তিনি কবিরাজী ডাক্তারীও করেন। দুরারোগ্য অসুখ—গলিত কুষ্ঠ, বাত, হাঁপানি, যক্ষ্মা, প্লীহা, রক্তামাশয়, গ্রহণী, অপস্মার ইত্যাদি বহু রোগের অব্যর্থ ঔষধ তিনি প্রদান করেন।** পাস্তুরের মত বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসকের আবির্ভাবের বহুপূর্ব হইতেই রাঢ়ের ধর্মঠাকুর ক্ষিপ্ত শৃগাল কুকুরের কামড় হইতে সৃষ্ট জলাতঙ্ক রোগের নিরাময়ের দেবতা। আবার তিনি সর্পবিদ্যা বিশারদ। তাঁহার কৃপায় ঝাড়ফুঁকের মন্ত্রের দ্বারা ভক্ত সর্পবিষ উড়াইয়া দিয়া রোগীকে প্রাণদান করিতেও সমর্থ হইত। বন্ধ্যা নারীর সন্তান বাসনাও তাঁহার কৃপায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। **তিনি স্বয়ং মৃত্যু দেবতা যম। তিনি পার্থিব জীবন দীর্ঘায়িত করেন। মৃত্যুকে জয় করিয়া ভক্তকে অমরত্ব দেন। ধর্মঠাকুরের মত** Cosmic deity **রাঢ় বঙ্গে আর দুইটি নাই, ভারতেও নাই, পৃথিবীর আর কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না। বৈদিক দেবতাদের সঙ্গে তাঁহার সাদৃশ্য রহিয়াছে কিন্তু তিনি বেদাতীত। পৌরাণিক দেবতাদের সকলেরই সঙ্গে তাঁহার মিল রহিয়াছে কিন্তু ধর্মঠাকুর পুরাণাতীত। সমস্ত পৌরাণিক দেবতা তাঁহার তল্পীবাহক। কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারেন নাই।"**[১]

শাঁখারীবাজার মহল্লার এই ধর্মরাজ বর্তমানে **ধর্মদাস পণ্ডিত** ও **শ্রীসুকুমার পণ্ডিত (কর্মকার)** দের পারিবারিক দেবতা। ইনি বুড়ো ধর্মঠাকুর নামেই খ্যাত। বংশ পরম্পরায় এঁরা পূজা করে আসছেন ধর্মঠাকুরের। এঁদের জাতিগত পদবী কর্মকার। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা এঁদের জনৈক পূর্বপুরুষের দলমাদল কামান তৈরীর কারিগরি দক্ষতা, ধর্মঠাকুরের পৌরোহিত্য এবং অন্যান্য বিষয়ে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে পুর্বোক্ত পুর্বপুরুষকে **'পণ্ডিত'** উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন সুদুর অতীতে। সেই সুবাদেই এঁরা পণ্ডিত উপাধি ব্যবহার করে আসছেন পুরুষানুক্রমে।

অতীতে বুড়ো ধর্মঠাকুরের পূজা হত যথেষ্ট আড়ম্বর সহকারে—বিশেষতঃ দোলপূর্ণিমা, মাঘীপূর্ণিমা এবং মকরসংক্রান্তির বিশেষ তিথিযোগে। বর্তমানে পরিবারটির আর্থিক দুরবস্থার দরুন ভাটা পড়েছে সেই আড়ম্বরে। এখন নিত্যপূজা ছাড়া শুধুমাত্র মকরসংক্রান্তির দিন মাছ, পায়েস, বেগুনপোড়া এবং তরিতরকারি সহ অন্নভোগ নিবেদন করা হয় ঠাকুরকে।

রাঢ় অঞ্চলে ধর্মঠাকুর বেশ গাম্ভীর্যপূর্ণ, রাশভারী প্রকৃতির এক মহিমময় দেবতায় উত্তীর্ণ হলেও ধর্মশিলার পাশাপাশি হাতি-ঘোড়ার প্রতীক মূর্তিতে পূজিত এই দেবতা অবোধ শিশুদের বড় আপনজন। তাইতো এই ঠাকুরকে নিয়ে কচিকাঁচাদের আনন্দের সীমা নেই। মুখে মুখে ধ্বনিত হয় স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দবিধৌত ছড়া,—

> **"ধর্মরাজের ঘোড়া**
> **বাঁ পা-টি লটর-পটর ডান পা-টি খোঁড়া।"**

---

১. পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, পৃঃ—১৩১

অধ্যায়-৫৭

দশ অবতার তাস বা ওরক

ধর্মঠাকুর দর্শন এবং ধর্মঠাকুরের তত্ত্বকথার তাত্ত্বিক আলোচনার পর আমরা এখন উকিঝুঁকি মারব বিষ্ণুপুরের তাসের আসরে। মল্লনৃপতিগণ চিত্তবিনোদনের জন্য অবসর সময়ে সপার্ষদ মেতে থাকতেন তাস খেলায়। এই তাস খেলা অবশ্যই হরতন, রুইতন, চিড়িতন, ইস্কাপণ আর সাহেব, বিবি, গোলাম, টেক্কার খেলা নয়। বাতাসের সাথে যেমন মিশে থাকে প্রাণজ উপাদান অক্সিজেন, অনুরূপভাবে বিষ্ণুপুরের জলে স্থলে বায়ুমণ্ডলে এবং বিষ্ণুপুরবাসীদের রক্তে মজ্জায় মিশে আছে অধ্যাত্ম-চেতনা, ঈশ্বর-ভাবালুতা। তাই দেখি শয়নে, স্বপনে, জাগরণে, দৈনন্দিন জীবনে, যুদ্ধক্ষেত্রে এবং খেলাধুলাতেও মূর্ত হয়ে উঠেছে এক অপরূপ দিব্য আবেশ। অঝোরে ঝরে পড়েছে ঈশ্বরকৃপা। এজন্যই যুদ্ধের সময় এসে গেছেন স্বয়ং মদনমোহন। তাস খেলার সময়ও এসে গেছেন বিষ্ণুর দশ অবতার। **মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, বলরাম, পরশুরাম, দাশরথি-রাম, জগন্নাথ (বুদ্ধ) এবং কল্কি**—এই দশ অবতার তাস নিয়ে বিষ্ণুপুরের রাজদরবারে দশ অবতার তাস খেলার প্রচলন হয় আজ থেকে প্রায় চারশত বছর আগে—রাজা বীর হাম্বীরের রাজত্বকালে। প্রসঙ্গতঃ বলে রাখি দশ অবতার তাস কথাটি ভুল এবং আপত্তিকর। **আসলে এগুলি তাস নয় ওরক**। কিন্তু তাস খেলার অনুরূপে খেলাটি সম্পন্ন হওয়ার সুবাদে এবং তাস খেলার সর্বব্যাপকতা ও সর্বজনপ্রিয়তার সুবাদে 'ওরক' শব্দের পরিবর্তে এসে গেছে তাস শব্দটি। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অবশ্য বলতে হয় 'দশ অবতার তাস' কথাটি প্রচলিত শুদ্ধ।

১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে উড়িষ্যার রাজা **গজপতি** এবং বিষ্ণুপুরের রাজা **বীর হাম্বীর** মোঘল-সমাট আকবরের অধীন কিল্লাজাত মহলে জমিদারী লাভ করেন। আকবরের সাথে বীর হাম্বীরের বেশ সুসম্পর্ক ছিল। সেই সূত্রে বীর হাম্বীর মাঝে মাঝে গেছেন দিল্লীর সম্রাট আকবরের নবাব-দরবারে। প্রভাবিত হয়েছেন তাঁর সুদক্ষ শাসন ব্যবস্থার দ্বারা। পরবর্তী-কালে সম্রাট আকবরের রাজ্যশাসন প্রণালীর অনুকরণে তিনিও ফৌজদার, সিকদার, মজুমদার, সরকার, মুন্সী, বক্সী, বিশ্বাস প্রভৃতি পদবীযুক্ত রাজকর্মচারী নিয়োগ করেন এবং আকবরের রাজসভায় তাস খেলার প্রচলন দেখে এসে বিষ্ণুপুর রাজ-দরবারে মোঘল তাসের অনুকরণে বিষ্ণুপুরে দশ অবতার তাস খেলার প্রচলন করেন। অবশ্য কেউ কেউ বলেন মহারাজ বীর হাম্বীর উড়িষ্যা থেকে আমদানী করেন এই খেলা। তাঁদের যুক্তি হল নবম অবতার বুদ্ধের পরিবর্তে এই তাসে জগন্নাথের মূর্তি উড়িষ্যার প্রভাবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। নবম অবতার বুদ্ধদেবের পরিবর্তে জগন্নাথ দেবের মূর্তি অঙ্কিত হওয়ার পিছনে একটি ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে। **কথিত আছে জগন্নাথ দেবের মন্দিরটি বহু পূর্বে বৌদ্ধস্তূপ ছিল। পরবর্তীকালে উহা জগন্নাথদেবের মন্দিরের রূপ পরিগ্রহ করে এবং জগন্নাথ দেবের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় একাদশ শতাব্দীতে। বুদ্ধদেবের তাসের উপর—বুদ্ধের পরিবর্তে অঙ্কিত হল জগন্নাথ দেবের শ্রীমূর্তি**। সুতরাং বিষ্ণুপুরের দশ অবতার তাস খেলার প্রচলনের মূলে উড়িষ্যার প্রভাবকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। **মোঘল নবাব দরবার এবং উড়িষ্যার রাজ দরবারের যৌথ প্রভাবই পরিলক্ষিত**

হয় বিষ্ণুপুরের দশ অবতার তাসগুলির অবয়বগত রূপায়ণে, অঙ্কন প্রণালী এবং নামকরণের মধ্যে।

শোনা যায়, মহারাজ বীর হাম্বীরের নির্দেশে বিষ্ণুপুর নিবাসী শিল্পী **কার্তিক ফৌজদার** দশ অবতার তাস তৈরী করেন। সেই থেকে অদ্যাবধি কার্তিক ফৌজদারের উত্তরপুরুষগণই বংশ পরম্পরায় তৈরী করে আসছেন ঐ ঐতিহাসিক তাস। বর্তমানে বিষ্ণুপুর শাঁখারীবাজার মহল্লা নিবাসী শ্রীভাস্কর ফৌজদার ও তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীশীতল ফৌজদার; এবং শ্রীবিদ্যুৎ ফৌজদার দশ অবতার তাস তৈরী করেন। এই তাস বা ওরক তৈরীর পদ্ধতিটি বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। পর পর তিন পর্দা সুতির কাপড় তেঁতুল বীচির আঠা দিয়ে টান টান করে চিটিয়ে নিয়ে কাপড়ের একটি শীট তৈরী করা হয় প্রথমে। তারপর বেশ ভালভাবে রোদ্দুরে শুকিয়ে নেওয়ার পর পরিমাণ মতো আঠা দিয়ে খড়িমাটি গুলে নিখুঁতভাবে বার ছয়েক প্রলেপ দেওয়া হয় ঐ কাপড়ের শীটটির উভয়পার্শ্বে। খড়িমাটির প্রলেপ দেওয়া কাপড়টিকে পুনরায় শুকিয়ে নিয়ে নোড়া দিয়ে বারংবার ঘসে ঘসে বেশ মসৃণ করে নেওয়া হয়। এবার নির্দিষ্ট মাপ অনুসারে কাপড়ের শীটটিকে লম্বা লম্বা ফালি করে কেটে নিয়ে বর্গ আকৃতির অনেকগুলি টুকরো করা হয়। বর্গাকৃতির টুকরোগুলোকে বৃত্তাকৃতির ডাইসের মাপে কাঁচি দিয়ে কেটে নিয়ে চক্রাকৃতির ঐ কাপড়ের টুকরোগুলোর পার্শ্বদেশে আবার আঠা মিশ্রিত খড়িমাটির প্রলেপ দেওয়া হয় বারকয়েক। এবার আসে রঙের কাজ। শিল্পী তাঁর নিপুণ হস্তে দশ অবতারের মূর্তি এবং অবতারের প্রতীক চিহ্নগুলি এঁকে এঁকে তৈরী করেন একটির পর একটি করে একশ কুড়ি খানা ওরক বা তাস। শিল্প-ভাবনার শেষ পর্যায়ে থাকে বর্ণাঢ্য বার্ণিশের প্রলেপ। এভাবেই তৈরী হয় মূল্যবান ঐ তাসের ঝাল।

তাস তৈরীর গোপন কথা শোনালাম। এবার বলি দশ অবতার তাসের সুষ্ঠু পরিকল্পনার কথা। ১২০টি তাস নিয়ে গঠিত হয় এক প্রস্ত তাস। প্রতি অবতারের জন্য থাকে বারটি করে তাস। সুতরাং দশ অবতারের জন্য ১০×১২=১২০টি তাস থাকে। **প্রতি অবতারের জন্য নির্ধারিত বারটি তাসের মধ্যে প্রথম তাসটি হল রাজা, দ্বিতীয় তাসটি উজির। রাজা তাসটিতে থাকে দেউল মধ্যে উপবিষ্ট অবতারের ছবি। অবতারের দুই পাশে থাকে দণ্ডায়মান দুই সহচর। উজির তাসটিতে শুধুমাত্র অবতারের ছবি থাকে। প্রতি সুটের অন্য দশটি তাসে সেই সেই অবতারের এক থেকে দশটি পর্যন্ত প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। মৎস্য অবতারের প্রতীক মৎস্য, কূর্মের কচ্ছপ, বরাহের শঙ্খ, নৃসিংহের চক্র মতান্তরে কলাফুল, বামনের কমণ্ডলু, বলরামের গদা, পরশুরামের টাঙ্গি দাশরথি-রামের তীর, জগন্নাথের পদ্ম, ও কল্কির খড়্গ। তাসে অঙ্কিত অবতার এবং অবতারের বেশভূষাতে উড়িষ্যার হিন্দু রীতি প্রকটিত, কিন্তু পার্শ্বস্থিত মূর্তিদ্বয়ের পোশাক-আশাকে মোঘল প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আরও লক্ষণীয় বিষয় হল কল্কি অবতারের চিত্রে মোঘল রাজপুরুষের আকৃতিই প্রতিবিম্বিত।**

তাসের পরিচয় দিলাম সংক্ষেপে। এবার বলি এই তাস খেলার নিয়ম কানুনের কথা। পার্টনার বিহীন এই খেলাটিতে পাঁচজন খেলোয়াড় থাকেন। খেলোয়াড়দের মধ্যে এক সঙ্গে চারটি করে তাস বিতরণ করা হয়। প্রত্যেকে পান ২৪টি করে তাস। খেলা কখনও ডান দিক থেকে বাম দিকে, আবার কখনও বাম দিক থেকে ডান দিকে চলে। খেলার স্টার্টার হিসেবে চার অবতারের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। সময় অনুসারে এই স্টার্টার

হন ভিন্ন ভিন্ন অবতার। যেমন (১) দিনের বেলার খেলার স্টার্টার 'রাম অবতার', (২) সন্ধ্যা বেলার স্টার্টার 'নৃসিংহ অবতার', (৩) রাত্রি বেলার স্টার্টার 'মৎস্য অবতার', (৪) বৃষ্টির সময় খেলা শুরু হলে স্টার্টার হন 'কূর্ম অবতার'। মতান্তরে অবশ্য পাঁচজন স্টার্টার-এর কথা বলা হয়েছে। সেক্ষেত্রে ভোর বেলার খেলার স্টার্টার 'জগন্নাথ অবতার'।

দশ অবতার তাস খেলার প্রক্রিয়াটি একটি জটিল প্রক্রিয়া। এই জটিল পদ্ধতিটিকে ভাষ্যরূপ দিতে গিয়ে আমার অনুসন্ধিৎসু ছাত্র **শ্রীমান চঞ্চল কর্মকার** লিখেছেন—

"২৪টি করে তাস পাবার পর পরশুরামের (ভৃগুরাম) সাত, কল্কির আট, পদ্মের নয় এবং দশ রাজার আসনের জন্য দিতে হবে। যিনি প্রথম অবতার বা স্টার্টার পাবেন তিনি তাঁর সুবিধামত খেলা আরম্ভ করবেন। দশ অবতার তাসে প্রথম পাঁচটি অবতাব যেমন—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন প্রভৃতি অবতারগুলির রাজা ও উজিরের পর দশই সর্ব্বোচ্চ স্থান, তারপর যথাক্রমে তিরি, দুরি, টেক্কার স্থান সবচেয়ে কম, বাকী পঞ্চ অবতার অর্থাৎ পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কি প্রভৃতি অবতারগুলির রাজা ও উজিরের পর টেক্কা বা এক সম্মানিত কার্ড। অর্থাৎ টেক্কার স্থান সর্বোচ্চ। দশের মর্যাদা এখানে সবচেয়ে কম। **'টিপসই' 'হাতসই' 'সটিপ' 'জোড়টিপ' ও 'বোজ' প্রভৃতি নামাঙ্কিত খেলাগুলি স্বচক্ষে না দেখলে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।** পয়েন্টের উপর বাজী রেখে এই তাস খেলা হয়ে থাকে। ২৪ পীঠের এই খেলা। প্রতি পীঠে পাঁচ পয়েন্ট বলে গণ্য হয়। পীঠ গুণে এই খেলায় হারজিত নির্ধারণ করা হয়। যেমন ১ পীঠ=৫ পয়েন্ট, যদি কেউ ৭ পীঠ পান তাহলে তাঁর পয়েন্ট হবে ৭×৫=৩৫ পয়েন্ট কিন্তু মূল ২৪ পয়েন্ট বাদ দিয়ে ৩৫-২৪=১১ পয়েণ্টে তাঁর জিত হবে। আবার কেউ যদি ৪ পীঠ পান তাহলে তাঁর পয়েন্ট হবে ৪×৫=২০ পয়েন্ট কিন্তু মূল পয়েন্ট বাদ দিয়ে ২৪-২০=৪ পয়েন্ট তাঁর হার হবে।"

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি দশ অবতার তাস খেলার একটি মনোজ্ঞ আর্যা প্রচলিত আছে। নিম্নোল্লিখিত এই আর্যাটির মধ্যে খেলার নিয়ম কানুন বাঁধা রয়েছে বজ্র আঁটুনির বাঁধনে।

ছবিগুলি চিনে নিয়ে ভাল করে মিশাইয়ে।
গণ্ডা গণ্ডা করে দাও বিলাইয়ে।।
সাত ভৃগু, আট কলি, নয় দশ পদ্ম ফেলি।
প্রভুর আসনখানি দাও সাজাইয়ে।।
প্রথম অবতার যার, দু'দস্ত হবে তার।
আরও হবে জোড় ভেঙে, ঠেক খেয়ে সেরোয়া।।
জোড় টিপ, টিপসই, কিংবা সটিপ হলে।
দু'দস্ত হয় অন্যে পাওয়া।।
তারও হবে জোড়ভেঙে ঠেক খেয়ে সেরোয়া।
না থাকিলে বোজ হয়ে যায় বাঁয়ে পাওয়া।।
হাতসই করে কেউ কিছু পাবার আশায়।
ঠিক ঠিক রেখে বাকী ফেলে দিয়ে যায়।।
পনের দস্ত হলে সেরোয়া আর নাহি চলে।
পাওনা দস্ত নিয়ে বোজ হয়ে যায়।।

হাতসই করাতে ভুল হয় যার।
শেষ পাঁচ দস্তে নাহি তার কোন অধিকার।।
ঠিক ঠিক হাতসইয়ে যদি খেল পড়ে।
অন্য অন্য সব খেলোয়াড় পড়িবে ফাঁপরে।।
এক পয়েন্ট জিত হয় পাঁচ দস্ত হলে।
এই নিয়ে খেলা চলে প্রভুপদে প্রণাম জানিয়ে।।

বিষ্ণুপুরের দশ অবতার তাসের পাশাপাশি 'নক্সতাস' খেলার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। নক্সতাস প্রসঙ্গে গবেষক মাণিকলাল সিংহ কি লিখেছেন তাই শোনাই তাঁর 'পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি' গ্রন্থ থেকে। তিনি লিখেছেন—"নক্সতাস ঝালটি সর্বসাকুল্যে ১২×৪=৪৮টি তাস। নক্সতাসে টেকা তাস চারটিতে এক নর্তকী মূর্তি অঙ্কিত থাকে। দুই বা দুরী তাসগুলিতে দুইজন মল্লযোদ্ধার ছবি, তিন বা তিরি তাসগুলিতে তিনটি পত্রের ছবি, চার বা চৌকা তাসগুলিতে চারটি করিয়া শঙ্খের ছবি; পাঁচ বা পঞ্জা তাসগুলিতে পত্রযুক্ত পাঁচটি করিয়া ফুল; ছয় বা ছক্কা তাসগুলিতে ছয়টি করিয়া চৌকা বা বরফির ছবি; আট বা আঠ্‌ঠা তাসগুলিতে আটটি করিয়া রঙিন পত্র; নয় বা নক্কা তাসগুলিতেও নয়টি করিয়া প্রস্ফুটিত ফুলের ছবি অঙ্কিত থাকে; দশ তাসগুলিতেও দশটি করিয়া ফুলের ছবি থাকে; কিন্তু এগার মানের তাসগুলিতে দশাবতার তাসের অশ্বারোহী মূর্তিটি অঙ্কিত হয়। কল্কি অবতার মূর্তিটি হুবহু এক অশ্বারোহী মূর্তি। বার মানের তাসটি গজারূঢ় উড়িষ্যা-রাজা গজপতির মূর্তি। উড়িষ্যার ও তৎসংলগ্ন বিষ্ণুপুরী নক্সতাসে বার মানের তাস গজপতি কিন্তু অশ্বপতিকে তাহা অপেক্ষা নিম্নমানের তাসরূপে গণ্য করা হইয়াছে।" (পৃঃ—২০৯)

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য যেমন উড়িষ্যা, রাজস্থান, মহীশূর, মহারাষ্ট্র, হিমাচল প্রদেশ অঞ্চলেও বিষ্ণুপুরের মতোই দশ অবতার তাস এবং নক্সতাস খেলার প্রচলন আছে। শুধু ভারত নয় পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই তাস খেলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কবে থেকে পৃথিবীতে তাস খেলার প্রচলন হয় এর সঠিক উত্তর পাওয়া কঠিন। তবে একথা বলা যায় যে তাস, দাবা, পাশা, মোঘল-পাঠান, কবাডি, প্রভৃতি খেলাগুলির উৎস হল যুদ্ধক্ষেত্র। যুদ্ধক্ষেত্রে শিবির সংস্থাপন করে অবসর সময় বিনোদনের জন্য সৈন্যদের মধ্যে এই সব খেলার প্রচলন হয়। খেলার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হত দুই পক্ষের যুদ্ধের মহড়া। প্রতিপক্ষকে বুদ্ধিদীপ্ত কূটনৈতিক চালের মধ্যে বেকায়দায় ফেলে কব্জার মধ্যে এনে পরাজিত করার কৌশলটি আয়ত্ত্ব করাই এইসব খেলার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। প্রাচীন ভারতে পাশা ও দাবা জাতীয় খেলার মূল সুরটির মধ্যে উক্ত সত্যই প্রতিধ্বনিত। **যুদ্ধজাত এই খেলাগুলি 'War game' রূপে চিহ্নিত হলেও পরবর্তীকালে এগুলি 'Money game' অর্থাৎ জুয়াখেলাতে রূপান্তরিত হয়েছে ক্রমশঃ। ভারতের বিভিন্ন স্থানে গঞ্জিফা (Ganjifa) বা গাঞ্জাপ্পা (Ganjappa) নামে আখ্যায়িত এই তাসগুলি ধন বা অর্থ বোধক। এতদর্থে বলা যায় অতীতের 'War game' বর্তমানে অর্থকৌলীন্যের যুগে 'Money game'-এ রূপান্তরিত হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্রের এবং রাজদরবারের খেলা এসে গেছে সর্বসাধারণের ঘরের আঙ্গিনায়।**

তাসের আসর গুটিয়ে রেখে আমরা এখন দেখব শাঁখারীবাজার মনসাতলা মহল্লায় অবস্থিত ঐতিহ্যমণ্ডিত **মনসা মন্দির ও মন্দিরস্থ মনসার চালি।**

অধ্যায়-৫৮

মনসাতলার মনসামূর্তি

শাঁখারীবাজার

কথায় কথায় আমরা এসে গেছি শাঁখারীবাজার মনসাতলায়। ঐ দেখুন সামনেই রয়েছে প্রায় সাড়ে তিনশত চারশত বছরের পুরানো মনসা মন্দির। সুদূর অতীতে মন্দিরস্থ এই দেবী ছিলেন শাঁখারীবাজার নিবাসী শ্রীঅমর নন্দী মহাশয়ের পূর্ব-পুরুষদের পারিবারিক দেবী। পরবর্তীকালে এই দেবী শাঁখারীবাজার মনসাতলা পল্লীর সর্বসাধারণের দেবীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ভাল করে লক্ষ্য করুন, এখানের দেবীচালে কৈলাসে মা মনসার রূপ প্রকটিত।

দেবীচালের নিম্নাংশের মধ্যস্থলে ফণা উত্তোলনকারী দুই শ্বেতসর্প বেষ্টিত অবস্থায় মা মনসার মূর্তি বিদ্যমান। একাদশ নাগের উপর তিনি উপবিষ্টা আছেন প্রসন্নচিত্তে। মায়ের দক্ষিণ দিকে, পদতলে রয়েছেন চাঁদ সদাগরের বৃহদাকার উপবিষ্ট মূর্তি। দেবীর পদমূলের উভয় পার্শ্বে সারিবদ্ধভাবে বিন্যস্ত রয়েছেন চাঁদ সদাগরের সাত পুত্র। উপবিষ্ট পুত্রগণের পশ্চাদ্ভাগে করজোড়ে দণ্ডায়মান অবস্থায় রয়েছেন চন্দ্রধরের সাত পুত্রবধূ ও তাঁদের বাড়ির পরিচারিকাগণ। গর্ভমন্দিরের প্রবেশদ্বারের দুই পাশে বসে আছেন বৃহদাকার দুই পুরোহিত। গৃহবধূগণের পিছনে উভয়পার্শ্বে শ্রদ্ধাসহকারে দণ্ডায়মান দুই কেয়ট সম্প্রদায়ের ব্যক্তির উপস্থিতি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই দুই ব্যক্তির দেবীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের দৃশ্যটি যেন কেয়ট সম্প্রদায় তথা নিম্নশ্রেণীর মানুষের মনসা দেবীর প্রতি আনুগত্যকেই সূচিত করে। মা মনসার জন্য নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠের সম্মুখভাগের দেওয়ালগাত্রে অঙ্কিত হয়েছে দশ অবতারের চিত্র। আবার নৃত্যরত গৌর-নিতাই এর উপস্থিতি বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব এবং প্রাধান্যকেই বিধৃত করে।

দেবীচালের তথা মেড়ের উর্ধ্বাংশের দ্বিতীয় স্তবকে চারটি ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে সন্নিবিষ্ট হয়েছে ধ্যানমগ্ন মুনিঋষিদের মূর্তি। মেড়টির একেবারে উপরিভাগের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান বৃহদাকার মহাদেবের বামে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ চতুরানন ব্রহ্মা, দক্ষিণে উপবিষ্ট চতুর্ভুজ নারায়ণ ও ছাগমুণ্ড বিশিষ্ট দণ্ডায়মান দক্ষ রয়েছেন। এছাড়াও স্থানান্তরে সজ্জিত লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, নারদ, নন্দী, ভৃঙ্গী, ভূত-প্রেতের পাশাপাশি শিবের বাহন ষাঁড় ছাড়াও হরিণ, ময়ূর, সিংহ, বিড়াল, বানর, আহারধৃত অবস্থায় বিশাল দুই সর্প এবং সর্বোপরি দেবাদিদেবের পদমূলে উপবিষ্ট পুত্র গণেশ ও শিব ঠাকুরের বামে ঈষৎ পশ্চাদ্ভাগে লালশাড়ি পরিহিতা অবগুণ্ঠিতা মা দুর্গার লজ্জামাখা মুখাবয়ব যেন কৈলাসে মা দুর্গার ঘরোয়া পরিবেশের চিত্রটিকেই প্রস্ফুটিত করেছে। শুধু তাই নয়, কৈলাসে ব্রহ্মা, নারায়ণ এবং মুনিঋষিদের আপ্যায়নের জন্য মা দুর্গার কাৎ হয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গিমাতে ব্যস্তসমস্ত ভাবটি শিল্পী তাঁর সুদক্ষ শিল্প-চাতুর্যে প্রকটিত করেছেন। 'ওস্তাদপাড়া' নামে খ্যাত শাঁখারীবাজার পল্লীর প্রখ্যাত ফৌজদার বংশীয় শিল্পীগণ মনসার চাল রূপায়ণে যে শিল্পীসত্তার পরিচয় দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়।

মনসার কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে প্রশ্ন জাগে মনসা কে? কি তাঁর পরিচয়? এবং কেনই বা তাঁর মর্ত্যলোকে বিশেষ করে রাঢ়বঙ্গে এত প্রাধান্য?

আর্যেতর জনগোষ্ঠীর দ্বারা পূজিত মনসার খ্যাতি সর্ব-ভারতে। সর্পদেবীরূপে তিনি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে পূজিত হয়ে আসছেন। যুগ পরিবর্তনের সাথে সাথে উত্তরণের পথে অনার্য ও আর্য, লৌকিক ও পৌরাণিক সংস্কারের সুসমন্বয়ে মনসা পুরোমাত্রায় দেবীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন।

"বাংলায় বৌদ্ধ রাজত্বের অবসান ও হিন্দুরাজত্বের প্রতিষ্ঠার যুগেই মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়কর্তৃক পূজিত সর্পদেবী জাঙ্গুলীর মনসা নামকরণ হয়।" রামায়ণ, মহাভারত এবং প্রাচীন পুরাণগুলিতে মনসা নামের উল্লেখ না থাকলেও খৃষ্টীয় একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীতে রচিত সংস্কৃত পুরাণ ও অভিধানে মনসা শব্দটি লক্ষ্য করা যায় এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে মনসা পূজার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। উত্তর ভারতের হরিদ্বারে মনসা পাহাড়ে মনসা মন্দির বিদ্যমান। বিহারের রাজগীর অঞ্চলে মনিয়ার নামক নাগের জন্য রয়েছে 'মনিয়ার মঠ'। এই মনিয়ার শব্দ থেকে মনসা-র উৎপত্তি বলে অনেকে মনে করেন। পাঞ্জাবের গুরগাঁও ও অম্বালা জেলায় অবস্থিত দুটি সর্পমন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নামও মনসা। রাঁচি জেলার ওঁরাও আদিবাসীদের সর্পদেবীর নাম মনসা। সিংভূম জেলার হো জাতির দ্বারা মনসা দেবী পূজিতা হন। দেওঘরে বৈদ্যনাথ শিবমন্দির প্রাঙ্গণে মনসাদেবীর শ্রীমন্দির বিদ্যমান। অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনম থেকে নেলোর জেলা পর্যন্ত নাগাম্বা নামে এক সর্পদেবী পূজিতা হঁন। ইঁহার নিম্নাংশ সর্পের মত উর্ধ্বাংশ নারীর মত।। মহীশূরে মুদামা নামে এক সর্পদেবীর পূজা প্রচলিত। দাক্ষিণাত্যের এই সর্পদেবী মুদামার পাশাপাশি কানাড়া প্রদেশের 'মনে মঞ্চাম্মা' দেবীর নামও উল্লেখ্য।

"মনে মঞ্চাম্মা প্রকৃতপক্ষে কোন দেবদেবীর নাম নহে, ইহা একটি অদৃশ্য সর্পের নাম। তবে নামটি স্ত্রী অর্থ জ্ঞাপক বলিয়া এই দেব-কল্প সর্পকেও স্ত্রীসর্প বলিয়া কল্পনা করা হয়। এই সর্পিণীর উপর দেবত্ব আরোপ করা হইয়া থাকে এবং বৎসরে এক দিন মাত্র (নাগপঞ্চমীর দিন নহে) তাহার উদ্দেশ্যে পূজা নিবেদন করা হয়। তাহার পূজা-স্থানকে 'মনে মঞ্চাম্মার স্থান' বলে,.....।

কেহ কেহ মনে করেন, এই মঞ্চামা প্রাদেশিক উচ্চারণে 'মনচা অম্মা' অর্থাৎ 'মনচা মাতা' হয়। সেখানে 'চ' কে 'স'-র মত উচ্চারণ করা হয়। তাহার ফলেই মন্চা আম্মা, মনসা মা-তে গিয়ে দাঁড়ায়। এই মনসা মা হইতেই বাংলার মনসা মাতা বা মনসাদেবীর উৎপত্তি হইয়াছে।"[১] কোন কোন ঐতিহাসিকের ধারণা দাক্ষিণাত্যের সেন রাজাগণ ছিলেন মঞ্চামা দেবীর উপাসক। একাদশ শতাব্দীতে সেনরাজাগণ দাক্ষিণাত্য থেকে বাংলা দেশে বসতি স্থাপন করলে সম্ভবতঃ সেনরাজাদের উপাস্য দেবী হিসেবে বাংলায় মঞ্চাম্মা তথা মনসা দেবীর পূজার প্রচলন হয়। এইসব কারণে অনেকে মনে করেন, "বাংলার মনসাদেবী দ্রাবিড়, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য এই তিন স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ের ধর্মগত আদর্শের সঙ্কর সৃষ্টি।"

এ যাবৎ আলোচনা থেকে মনসা নামটির উৎপত্তি বিষয়ে দু'রকম তথ্য পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, পাঞ্জাব প্রদেশের মনসা দেবীর প্রত্যক্ষ প্রভাব। দ্বিতীয়তঃ, দক্ষিণভারতের মঞ্চামা দেবীর প্রভাব। তবে এ দুটির কোনটিই হয়তো গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ আনুমানিক দ্বাদশ খৃষ্টাব্দে বা তারও পরে রচিত পদ্মাপুরাণ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি উপপুরাণে

১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস— শ্রী আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃঃ—১৮৬

মনসার নাম এবং সংক্ষিপ্ত পরিচয় থেকে বোঝা যায় যে এই উপপুরাণগুলি রচিত হওয়ার শতাধিক বৎসর পূর্বে এই দেবীর পূজা বঙ্গে প্রচলিত ছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন জেলায় প্রাপ্ত মনসাদেবী বিষয়ক নিদর্শনগুলিও উক্ত সত্যকেই সমর্থন করে।

এ বিষয়ে 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় আশুতোষ ভট্টাচার্য উক্ত পুস্তকের ১৯২ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন—

"একাদশ শতাব্দীর বাংলার ভাস্কর্যে মনসা-মূর্তির ব্যাপক অস্তিত্ব হইতেই জানা যাইতেছে যে, সমাজে এই দেবী ইতিমধ্যেই রীতিমত আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইয়াছেন। সেইজন্য সমসাময়িক সংস্কৃত পুরাণগুলিতেও তাঁহার মহিমা কীর্তিত হইবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়াছে।

কেহ কেহ জৈন দেবী পদ্মাবতীকে মনসার সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। বাংলাদেশে মনসার এক নাম পদ্মা বা পদ্মাবতী। মনে হয় যে, জৈন ধর্ম হইতে পদ্মাবতীর ঐতিহ্যের ধারাটি আসিয়া কালক্রমে মনসার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। তাহার সঙ্গে ক্রমে মহাভারত হইতে জরৎকারুর কাহিনীটিও আসিয়া মিশ্রিত হইয়াছে।"

সর্পকুলের দেবী মনসা জরৎকারু মুনির পত্নী। প্রাচীনকালে সর্পদংশনে অনিবার্য মৃত্যুর ভয়ে সদা সন্ত্রস্ত মনুষ্যজাতির মনে সাহস, শক্তি ও অভয় সঞ্চারের অভিপ্রায়ে ব্রহ্মার উপদেশে মহর্ষি কশ্যপ সর্পমন্ত্রের সৃষ্টি করে তপঃপ্রভাবে মন থেকে মনসাকে সৃষ্টি করেন এবং মন্ত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে তাঁকে চিহ্নিত করেন। **কশ্যপ মুনির মানস-কন্যার সুবাদেই ইনি মনসা।** কুমারী মনসা মহাদেবের নিকট পূজা-আর্চা, স্তব-স্তুতি এবং তন্ত্র-মন্ত্র শিক্ষা করে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন সহজেই। সিদ্ধি লাভের অব্যবহিত পরেই দেব, দানব, মানব সহ সর্পগণও তাঁর অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং পূজা করতে থাকেন। মনসা দেবীত্বে উত্তীর্ণ হন অবলীলাক্রমে। ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে মনসা সম্পর্কে এসব কথা বলা হলেও মনসামঙ্গল কাব্যের কাব্যকারগণ কিন্তু এই দেবী সম্বন্ধে বলেন অন্য কথা।

তাঁদের মতে মনসা শিবের মানসকন্যা। পদ্মবনে মনসার জন্ম হওয়ায় তাঁর অন্য নাম পদ্মা বা পদ্মাবতী। মনসামঙ্গল কাব্যের অপর নাম তাই পদ্মাপুরাণ। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো মনসামঙ্গল কাব্যেও আছে দেবখণ্ড এবং নরখণ্ড।

সর্পগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শিবকন্যা মনসা সর্পকুলের মতোই স্বভাবে উগ্রচণ্ডা। বিমাতা চণ্ডী মনসার কলহ-প্রিয়তার জন্য তাঁর একটি চোখ কানা করে দেন। উগ্র স্বভাবের জন্য স্বামী তাঁকে ত্যাগ করে যান—মনসার গায়ে এ অপবাদ মাখিয়ে দেওয়া হলেও এটি সত্য নয়। বরং বলা চলে দেবীর দায়িত্বজ্ঞানই স্বামীর বিরাগভাজন করেছে তাঁকে। ঘটনাটা হল, স্বামী জরৎকারু একদিন মনসার ক্রোড়ে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছিলেন। এদিকে সন্ধ্যা সমাগত। স্বামীর সন্ধ্যা-আহ্নিকের সময় উত্তীর্ণ হয় দেখে সুষুপ্ত স্বামীর ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেন সতী সাধ্বী মনসা। কাঁচা-ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেওয়ার অপরাধেই জরৎকারু ত্যাগ করেন দেবীকে। গর্ভবতী মনসা পরিত্যক্তা হন তাঁর নিবাস জয়ন্তপুরীতে। জয়ন্তপুরীতে অবস্থান কালে মনসা লক্ষ্য করলেন মর্ত্যে তাঁর পিতা শিবের পূজা হয় ধুমধাম সহকারে অথচ তিনি দেবী হয়েও আছেন উপেক্ষিতা হয়ে। এটা হতে পারে না। মর্ত্যবাসীর পূজা তাঁকে পেতেই হবে। কিন্তু কিভাবে তা পাওয়া যায় এই নিয়ে করলেন এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা। জয়ন্তপুরী ছেড়ে তিনি পাড়ি দিলেন মর্ত্যে। **দেবখণ্ড শেষ হয়ে শুরু হল নরখণ্ড।**

মর্তে অবতরণ করে সমাজের উঁচুস্তরের মানুষের মধ্যে শিবপূজার বহুল প্রচলন দেখে দেবী বুঝে নিলেন যে এখানে বিশেষ সুবিধা করা যাবে না। এই ভেবে তিনি সমাজের

নিম্নস্তরের মানুষের মধ্যে স্বীয় পূজা প্রচারে ব্রতী হলেন। সর্পদংশনে অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবার অভিপ্রায়ে কেয়ট বা জেলে জাতীয় মৎস্যজীবী সম্প্রদায় তাঁর পূজা শুরু করলেও আশানুরূপ সাড়া পাওয়া গেল না দেখে তিনি অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষের পূজা পাওয়ার লোভাতুর প্রয়াস চালালেন। স্বীয় পূজার বহুল প্রচারের উদ্দেশ্যে সমাজের সর্বোচ্চ স্তরের মানুষ বণিকপ্রবর **চাঁদ সদাগরকে** বেছে নিলেন ভক্ত হিসেবে। কিন্তু চাঁদ সদাগর বা চন্দ্রধর ছিলেন শিবের উপাসক তথা শৈব। নারীদেবতা মনসার পূজা করবেন না কিছুতেই। মনসার কোপদৃষ্টিতে পড়লেন চন্দ্রধর। দেব-মানবে শুরু হল সংঘাত।

সদাগরের সখের ফুলবাগান নষ্ট করে দিলেন মনসা। সদাগরপত্নী সনকা মনসার কোপ এড়াতে গোপনে মনসার ঘট পেতে পূজা করতেন। চন্দ্রধর একথা জানতে পেরে পদাঘাতে দেবীর মঙ্গলঘট ভেঙ্গে দেন। মনসার রোষের পারদ উঠে গেল তর্‌তরিয়ে। চাঁদের বাণিজ্যতরী 'মধুকর' সহ সপ্তডিঙা ও ছয়পুত্রের সলিল-সমাধি হল। সদাগরকে বেকায়দায় ফেলে আর একবার পূজা ভিক্ষা চাইলেন দেবী। দেবীর প্রস্তাব ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করেন চাঁদ। ইতিমধ্যে স্ত্রী **সনকার** গর্ভে জন্ম নিয়েছেন **লখিন্দর**। বাণিজ্যযাত্রায় বিব্রত এবং বিপর্যস্ত হয়ে বারো বছর পর ঘরে ফিরেছেন সদাগর। **সাহেব বণিকের** কন্যা বেহুলার সাথে লখিন্দরের বিবাহ স্থির হল। মনসার ভয়ে সাঁতালি পর্বতে নির্মিত হল লোহার বাসর ঘর। কিন্তু দেবীর গোপন নির্দেশে রক্ষিত লোহার বাসর ঘরের ছিদ্রপথে প্রবেশ করে কালনাগিনী লখিন্দরের প্রাণনাশ করে। মর্মাহত চন্দ্রধর পুত্রের মৃতদেহ কলার ভেলায় ভাসিয়ে দেয় নদীর জলে। সহযাত্রী হন সাধ্বী বেহুলা। বহু বাধা-বিপত্তি এবং প্রতিকূল অবস্থাকে প্রতিহত করে অবশেষে একদিন মৃত স্বামীর গলিত শবদেহের হাড় ক'খানি সম্বল করে স্বর্গের দেবসভায় হাজির হন বেহুলা। নৃত্যপটীয়সী বেহুলা দেবাদিদেবের নির্দেশে নৃত্য করে মহাদেব সহ সভায় উপস্থিত দেবতাদের সন্তুষ্ট করেন। পিতা মহাদেবের নির্দেশে মনসা তখন লখিন্দর এবং আর ছয় পুত্রসহ তাঁদের বাণিজ্যতরী এবং যাবতীয় ধনসম্পত্তি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হন। অবশ্য এক্ষেত্রে শর্ত আরোপিত হয়, বেহুলা তাঁর শ্বশুরকে দিয়ে মনসার একমাত্র আশা পূরণ করবেন। **'একচক্ষু কানী'**, **'চেঙমুড়ী কানী'** বলে গালাগালি করলেও বেহুলার কাকুতি মিনতিতে এবং পুত্র ও পুত্রবধূদের ম্লান মুখের দিকে তাকিয়ে অবশেষে ঘৃণাভরে হলেও এই নারীদেবতার দিকে পিছন ফিরে বামহস্তে চন্দ্রধর ছুড়ে দেন একটি ফুল। **রুষ্ট মনসা তাতেই তুষ্ট**। **দেব-মানবের সংঘাতে পরাজিত হন চাঁদ**। অবশ্য কোনো কোনো মনসামঙ্গল-কাব্যে ধ্বনিত হয়েছে চাঁদের মনসা পূজার ভক্তি গদগদ চিত্র, যেমন—

গলায় কাপড় দিয়া সদাগর দণ্ডাইয়া
মনসারে বলে স্তুতিবাণী।
তুমি দেব দেবতা তুমি হরদুহিতা
তুমি দেবী ঈশান-নন্দিনী।।

এখানের দেবীচালে দেখা যাচ্ছে চাঁদ সদাগরের পুত্রগণ সদাগরকে মনসা পূজা করতে অনুরোধ করছেন। পুত্রবধূগণও করজোড়ে দেবীর প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নিবেদন করছেন বিনম্রচিত্তে। সদাগরও মনসার পূজা করতে উৎসাহী এবং উদ্যত। তাও আবার মায়ের দিকে পিছন ফিরে নয়, সামনা-সামনি বসে ফুল ছুঁড়ছেন বাম হস্তে। সদাগরের মনসা পূজা দেখার জন্যই যেন মুনি-ঋষি থেকে দেব-দেবীগণ সকলেই সমবেত হয়েছেন

কৈলাসে। আর পূজা নেওয়ার জন্য কৈলাস থেকে নেমে এসেছেন স্বয়ং মনসা, পূজাও পেয়েছেন অবশেষে।

মনসা পূজা প্রচারের উদ্দেশ্যে আগত শাপগ্রস্ত ও স্বর্গচ্যুত উষা ও অনিরুদ্ধ, তথা বেহুলা ও লখিন্দর মর্ত্যধামে মনসাপূজার প্রচারকার্য সুসম্পন্ন করে ফিরে যান স্বর্গে।

মনসামঙ্গল-কাব্যের বহুল প্রচারিত কাহিনীটি শোনালাম সংক্ষেপে। এবার আমরা শাঁখারীবাজার মহল্লা ছেড়ে এগিয়ে যাব মাড়ুইবাজার, যাদবপল্লী অভিমুখে। বলতে ভুলে গেছি, এই শাঁখারীবাজার পল্লী বিষ্ণুপুরবাসীদের কাছে **'ওস্তাদপাড়া'** নামে সুবিদিত। কিন্তু কেন? চলার পথে সেকথাই বলব এখন। তার আগে আমরা সকালের চা-জলখাবারের কাজটা সেরে নেবো এখানের দোকান থেকেই।

অধ্যায়-৫৯

শাঁখারীবাজার মহল্লা ঃ বিষ্ণুপুরের ওস্তাদপল্লী

শাঁখারীবাজার ঝাঁপানতলা থেকে শাঁখারীবাজার মনসাতলাগামী পথের উত্তর দিকে প্রথম যে গলিপথটি রয়েছে তা **'ওস্তাদগলি'** নামে খ্যাত। এই গলিপথের বাম পার্শ্বে রয়েছে স্বনামধন্য সঙ্গীতশিল্পী **৺গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের** বাড়ি। বর্তমানে বাড়িটি অবশ্য বিক্রয়সূত্রে হস্তান্তরিত হয়েছে। ৺গোপেশ্বর বাবুর স্মৃতি-বিজড়িত ঐ বাড়ি থেকে অল্প একটু এগিয়ে গেলেই গলিপথের ডান দিকে নজরে পড়ে সঙ্গীত জগতের আর এক দিকপাল **৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের** বাড়ি। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোক গমনের পর ঐ বাড়িতে থাকতেন তাঁর একমাত্র কন্যা প্রথিতযশাঃ গায়িকা বালবিধবা **৺বিন্ধ্যবাসিনী দেবী। পূর্বোক্ত সঙ্গীতাচার্যগণ ছাড়াও ৺রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺রামসত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺যোগেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমত্যা গৌরী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, ৺অনাদি দেবঘরিয়া, ও শ্রীঅবনী দেবঘরিয়া প্রমুখ কণ্ঠ ও যন্ত্র-সঙ্গীত বিশারদদের তথা ওস্তাদশিল্পীদের জন্মস্থান ও সঙ্গীত-সাধনার ক্ষেত্রস্থল হিসেবে পল্লীটি বিষ্ণুপুরবাসীদের নিকট ওস্তাদগলি নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।**

ওস্তাদগলি ছাড়াও ওস্তাদপল্লী সংলগ্ন শাঁখারীবাজারে বহু প্রতিভাধর সঙ্গীত-শিল্পীর জন্মস্থান এবং বাসস্থান। সঙ্গীত-সরস্বতীর চরণে আত্ম-নিবেদিত এই সব শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন পাখোয়াজ বাদক ৺নিত্যানন্দ গোস্বামী ও ৺হরিপদ কর্মকার, তবলা ও পাখোয়াজ বাদক ৺বিজন হাজারী ও ৺সুবোধ নন্দী, কণ্ঠ-সঙ্গীতে যশস্বী ৺ভোলানাথ নন্দী, ৺ভাস্কর নন্দী, ৺গোপাল নন্দী ও শ্রীআনন্দ হাজারী, তবলা বাদক ৺গোপাল আঢ্য, কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীমথুর দত্ত, প্রখ্যাত এসরাজ বাদক ৺নেপাল ব্যানার্জী, বিশিষ্ট পাখোয়াজ ও তবলা বাদক শ্রীঅমিয় হাজারী ও প্রখ্যাত যন্ত্রশিল্পী (গীটার) শ্রীহীরক নন্দী প্রমুখ।

বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত-চর্চার যে ধারাটি প্রবাহিত হয়ে চলেছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তার মূলেও এই শাঁখারীবাজার পল্লীর সঙ্গীত ও বাদ্যসঙ্গীত শিল্পীদের অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

সঙ্গীত ছাড়াও বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত 'দশ অবতার তাস' ও 'নক্স তাস' প্রস্তুতকারক হিসেবে এ অঞ্চলের প্রখ্যাত ফৌজদার পরিবারের ৺গঙ্গানারায়ণ ফৌজদার, ৺মানগোবিন্দ

ফৌজদার, ˚সতীশ ফৌজদার, ˚অন্নদা ফৌজদার এবং বর্তমান প্রজন্মের শ্রীভাস্কর ফৌজদার ও তাঁর দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ˚পটল ফৌজদার, ˚ভদ্রেশ্বর ফৌজদার এবং পূর্বোক্ত ˚পটল ফৌজদারের চার পুত্র যথা—শ্রীসুবল ফৌজদার (বঃ[১] ৪০), শ্রীনাড়ু ফৌজদার (বঃ ২৪), শ্রীশীতল ফৌজদার (বঃ ২৮) ও শ্রীতপন ফৌজদার (বঃ ২৪) এবং শ্রীবিদ্যুৎ ফৌজদার মহাশয়দের নাম স্মরণ করা যেতে পারে।

আবার শঙ্খ, নারকেল খোলা এবং লাউ খোলা জাতীয় দ্রব্যের উপর নিখুঁত খোদাই কার্যসহ অভিনব শিল্পসামগ্রী তৈরী করার সুবাদে এখানে জেলা এবং রাজ্যস্তরে পুরস্কার প্রাপ্ত বহু শিল্পীর পাশাপাশি রয়েছেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত প্রখ্যাত শঙ্খশিল্পী **˚অশ্বিনী নন্দী**। ˚অশ্বিনী নন্দীর বসবাস কাদাকুলি মহল্লায় হলেও তিনি বংশসূত্রে শাঁখারীবাজারেরই মানুষ ছিলেন এবং জাতিতেও শাঁখারী। নারকেল খোলার কলসী তৈরী করে, কলসীর উপর সূক্ষ্ম খোদাই কার্যের দ্বারা কৃষ্ণলীলার দৃশ্য রূপায়িত করে ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন শাঁখারীবাজার সংলগ্ন মদনমোহনগঞ্জ নিবাসী শিল্পী **শ্রীগোপাল নন্দী**।

কথা প্রসঙ্গে উল্লেখ করি, বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত দলমাদল কামানের নির্মাতা কর্মকার শিল্পীটিও ছিলেন এই শাঁখারীবাজার মহল্লারই মানুষ। ইনি ছিলেন শাঁখারীবাজারে অবস্থিত ধর্মঠাকুরের বর্তমান পূজারীর পূর্বপুরুষ—সে কথা আগেই বলেছি।

এসব দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, **'শাঁখারীবাজার মহল্লা ঃ বিষ্ণুপুরের ওস্তাদপল্লী**।

ওস্তাদপল্লীর ওস্তাদদের কথা শুনতে শুনতে আপনারা এখন এসে গেছেন মাড়ুই বাজার মহল্লার যাদবপল্লীতে। **এখানে আমরা দেখব রাজার জামাইকে।**

অধ্যায়-৬০

শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ

যাদবপল্লী, মাড়ুইবাজার

এই তো এসে গেছি আমাদের গন্তব্যস্থানে। ঐ দেখুন রাজকন্যাকে পাশে নিয়ে মুরলী হাতে কেমন যেন বঙ্কিমঠামে দাঁড়িয়ে আছেন আত্মতৃপ্তির মাধুর্যে শ্রীমণ্ডিত রাজার জামাই **শ্রীমান গোপীনাথ বাবু,—না; শ্রীশ্রীগোপীনাথ জীউ।**

হ্যাঁ, এই গোপীনাথ জীউ বিষ্ণুপুরের ৬০তম রাজা নীলমণি সিংহদেবের জামাই। অবাক হচ্ছেন! ভাবছেন মিথ্যে কথা? মোটেই না। বিষ্ণুপুরের নানান স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে রয়েছেন অনেক কৃষ্ণবিগ্রহ কিন্তু গোপীনাথ জীউ ছাড়া আর কোন কৃষ্ণ বিগ্রহেরই রাজার জামাই হওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। কারণ বাকী সমস্ত বিগ্রহই মল্লরাজাদের পরমারাধ্য ইষ্টদেবতা।

হেঁয়ালির মায়াজাল সরিয়ে খোলসা করেই বলি তবে কথাটা। আজ থেকে কত বছর আগের কথা কে জানে! হতে পারে দু'শ, আড়াইশ কিংবা তিনশ বছর আগের ঘটনা। মাড়ুইবাজারস্থ যাদবপল্লী মহল্লার এক ছাইগাদা খুঁড়ছিলেন জনৈক ঘোষ বংশীয় ব্যক্তি।

১। বঃ = বয়স

হঠাৎ করে ছাইগাদার ভিতরে তিনি আবিষ্কার করেন কষ্টিপাথরের তৈরী ক্ষুদ্রাকৃতির এক কৃষ্ণমূর্তি। এই কৃষ্ণঠাকুরটিই কালক্রমে হয়ে ওঠে তাঁর মনের ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর, হৃদয়ের ঠাকুর। গোপপল্লীতে প্রাপ্ত, গোপনারী-প্রিয় এই কৃষ্ণ বিগ্রহের তিনি নাম রাখেন গোপীনাথ। সুদূর অতীতে পূর্বোক্ত ঘোষ পরিবারের একান্ত পারিবারিক দেবতারূপেই পূজিত হতেন তিনি। উত্তরকালে সম্ভবতঃ গোপীনাথ-জীউ তাঁর জনপ্রিয়তার গুণে হয়ে পড়েন গোয়ালাপাড়া পল্লীর সর্বসাধারণের উপাস্য দেবতা এবং এই দেব-বিগ্রহকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে 'মাড়ুইবাজার যাদবপল্লী যোলআনা কমিটি'। বর্তমানে এই কমিটির সদস্যবর্গই ঠাকুরের যাবতীয় দেখাশুনা করেন। ভাষান্তরে পরিচালনা করেন।

সময়ের সিঁড়ি বেয়ে ফিরে যাই খেই হারিয়ে ফেলা পুরানো কথায়। ঠাকুরকে স্নান, শয়ন বা স্থানান্তর করণের সময় অনবধানতা বশতঃ পড়ে গিয়ে শ্রীবিগ্রহের হাত, পা ভেঙে যায় শতাধিক বছরেরও পূর্বের কোন এক সময়ে। তখন সেই ভগ্ন বিগ্রহের পরিবর্তে নতুন বিগ্রহ স্থাপনের কথা চিন্তা করেন স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। **এই সময় গোপীনাথ জীউ স্বপ্নাদেশে জানিয়ে দেন—'তোদের ছেলেপুলের হাত পা ভেঙে গেলে তোরা কি তাদের ফেলে দিস?' প্রশ্নটা কাঁটার মতোই বিঁধে গেল সকলের মনে। সু-চেতনার উদয় হল হৃদয়ে। ভগ্ন বিগ্রহ জোড়া দিয়ে যথারীতি চলতে থাকে পূজা-আর্চা।**

পরবর্তীকালে তুলনামূলকভাবে বৃহদাকার এক কৃষ্ণমূর্তি স্থাপনের আন্তরপ্রেরণায় স্থানীয় মানুষজন খিদিরপুর ডক অঞ্চল থেকে নিয়ে আসেন আগেরটির তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড় এবং বেশ শ্রীদর্শন কৃষ্ণ বিগ্রহ। নতুন বিগ্রহটিকে পুরানো বিগ্রহের পাশে রেখে পুরানো বিগ্রহের প্রতীক বা নবকলেবর জ্ঞানে উভয় বিগ্রহেরই পূজা চলতে থাকে সমসাময়িকভাবে। এইভাবেই পার হয়ে যায় বছরের পর বছর। যাদবপল্লীবাসীগণের মনে জন্ম নেয় আর এক দিব্যবাসনা। তাঁরা ভাবতে থাকেন নাম যার গোপীনাথ অর্থাৎ কিনা গোপীজনবল্লভ, আরও সহজ অর্থে গোপীমোহন যে কৃষ্ণ তাঁরই গোপী অর্থাৎ রাধা নেই। বড্ড বেমানান, বড্ড একা একা লাগে ঠাকুরকে। অতএব গোপবালা অর্থাৎ রাধা আনতেই হবে।

যত্র ভাবনা তত্র কাজ। ১৮৮৯ থেকে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী সময়। **নীলমণি সিংহদেব** তখন বিষ্ণুপুরের রাজা। যাদবপল্লীর প্রজাবৃন্দ দলবদ্ধভাবে একদিন ছুটলেন মহারাজের রাজদরবারে। জানালেন তাঁদের গোপীনাথের গোপী নেই। মহারাজ যেন একটি গোপী অর্থাৎ রাধা দেন। কথাটা মহিয়সী **চূড়ামণি দেবীর** কানে উঠেছিল। রাজা এবং রাণী উভয়েই এই প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন কিন্তু শর্ত আরোপিত হল স্বয়ং গোপীনাথকে বরবেশে হাজির হয়ে রাধাকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে হবে। পাত্রপক্ষও মেনে নিলেন এই উত্তম প্রস্তাব। উভয়পক্ষই আলোচনার ভিত্তিতে গোপীনাথ জীউ-এর বিবাহের দিনক্ষণ ও শুভলগ্ন ঠিক করে ফেলেন। বিবাহের নির্ধারিত দিনে গোয়ালাগণ মহাসমারোহে গোপীনাথকে বরবেশে সাজিয়ে পাল্কি চড়িয়ে নিজেরাও বরানুগমনে সামিল হন বাজনা-বাদ্যি ও তোপধ্বনি সহকারে। হাজির হন রাজবাড়ির বিবাহ বাসরে। কন্যাপক্ষের রাজবাড়িতেও পড়ে গিয়েছিল সাজো সাজো রব। সানাই-এর সুরে আকাশ বাতাস মুখরিত করে বিবাহের যথাবিধি নিয়মানুসারে মহারাণী চূড়ামণি দেবী সেদিন কন্যা সম্প্রদান করেছিলেন সোৎসাহে এবং সানন্দে। মানে অষ্টধাতুর রাধার সাথে কষ্টিপাথরের গোপীনাথের বিবাহ দিয়ে যাদবপল্লীর অধিবাসীদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ

হয়েছিলেন। সেই ঘটনার সূত্র ধরেই গোপীনাথ জীউ বিষ্ণুপুর-রাজবাড়ির জামাইরূপে আজও সমাদৃত।

বছর বার হল গোপীনাথ জীউ-এর নব-নির্মিত শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মন্দিরের কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। দৈনন্দিন পূজাদি, প্রাত্যহিক অন্নভোগ ছাড়াও শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথিকে কেন্দ্র করে জন্মাষ্টমীর দিন সাড়ম্বরে বিশেষ পূজাপাঠ, ভোগরাগ ও নামসংকীর্তন হয় অহোরাত্র। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নন্দের গৃহে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করায় শ্রীকৃষ্ণের পালক পিতা নন্দ ঘোষের আনন্দের সীমা ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পরের দিন অর্থাৎ জন্মাষ্টমীর পরের দিন গোকুলে নন্দ ঘোষের বাড়ীর আঙ্গিনায় সমস্ত গোয়ালাসহ স্বয়ং নন্দ ঘোষ কাদায় দই মিশিয়ে আনন্দানুষ্ঠানে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। **উৎসবটি 'দধিকাদা' উৎসব বা নন্দোৎসব নামেই প্রসিদ্ধ।** নন্দঘোষের 'দধিকাদা' উৎসবের অনুকরণে গোপীনাথ মন্দির প্রাঙ্গণেও স্থানীয় যাদবগণ 'দধিকাদা' ও নন্দোৎসব উদযাপন করেন জন্মাষ্টমীর পরের দিন। সর্বসাকল্যে ঐ দু'দিন স্থানীয় গোয়ালাদের ঘরে ঘরে বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসের কলরোলে বয়ে যায় আনন্দের বন্যা। এসব তথ্য আমাকে পরিবেশন করেছিলেন গোপীনাথ জীউ-এর পুরোহিত শ্রীশ্যামাপদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়। সহযোগিতা করেছিলেন যাদবপল্লী নিবাসী ভ্রাতৃপ্রতিম শ্রীগুরুদাস ঘোষ।

শ্রীশ্রীরাধাগোপীনাথ জীউ-এর চরণারবিন্দ বন্দনা করে এখন আমরা পাড়ি দেবো হাজরাপাড়া অভিমুখে। চলার পথে উকিঝুঁকি মারবো **বিষ্ণুপুরের মাদুলি শিল্পীদের পর্ণকুটীরে।**

অধ্যায়-৬১

মাদুলি শিল্প

শাঁখারীবাজার, সাবিত্রীতলা ও মাড়ুইবাজার

বিষ্ণুপুরের একটি মৃতপ্রায় শিল্প হল মাদুলি শিল্প। মল্লভূমের কুটির শিল্পজাত লোহার মাদুলিগুলিকে কিন্তু দেখে বোঝা যাবে না যে এগুলি লোহার না পিতলের। শিল্পীর শিল্পসত্তার এটিই বাহাদুরি, এটিই প্রশংসনীয় দিক। সত্য বলতে কি, পেটে ভাত নেই, পরনে বস্ত্র বলতে যা বোঝায় তা নেই, পরিশ্রমের উপযুক্ত মজুরি বা মুনাফা নেই—নেই-রাজ্যের বাসিন্দা এই সব শিল্পীর কিন্তু আছে তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা এবং মাটি-কামড়ে বেঁচে থাকার তীব্র জীবন-এষণা আর আছে ঈশ্বর-প্রদত্ত শিল্প-প্রতিভা। সেই শিল্প-প্রতিভার স্ফুরণে সুদূর অতীতের কোন এক সময়ে বিষ্ণুপুরের মাটিতে নাম-না-জানা কোন এক কর্মকার পরিবারে জন্ম নিয়েছিল মাদুলি।

ইতিহাসের আঙ্গিনায় সংস্কারের নিরিখে বলা চলে ধর্মীয় আচার এবং জ্যোতিষাচার্যদের বিধানে মালা, ঘুনসি, তাবিজ, মাদুলির ব্যবহার প্রচলিত হয়। ভূতে পাওয়া, হাওয়া পাওয়া, গ্রহদোষ কাটানো ছাড়াও ভাগ্যোন্নতির আশায়, ইষ্ট কামনায় এবং রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে দেব-দেবীর মন্ত্র-সিদ্ধ তাবিজ ও মাদুলির ব্যাপক প্রচলন পরিলক্ষিত হয় স্মরণাতীতকাল থেকেই। মল্লভূমের কর্মকারগণ তৈরী করেন সেই মাদুলি।

২৮/৩০ গেজের ব্ল্যাক্ শীট থেকে তৈরী হয় মাদুলি। একটি মাদুলির তিনটি অংশ।

প্রথম অংশ একটি ফাঁপা নল, দ্বিতীয় অংশ টিকলির মতো একটি চাকি, তৃতীয় অংশ বৃত্তাকার একটি 'বক' বা 'বৃন্ত'।

মাদুলির প্রস্তুত প্রণালীটি বেশ শ্রমসাপেক্ষ। কাতুরির সাহায্যে ব্ল্যাক্‌শীট্‌ থেকে মাপ অনুসারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়তাকার টুকরো কাটা হয় প্রথমে। টুকরোগুলিকে 'আট্‌লা' বা 'সলাই' নামক হাতিয়ারের সাহায্যে ফাঁপা নলে রূপান্তরিত করা হয় একটি একটি করে। এই নলটি হল মাদুলির মূল অংশ। অনুরূপ পদ্ধতিতেই খুব সরু সরু ফালি থেকে তৈরী করা হয় 'বক' বা 'বোঁটা'। টিকলি কাটা হয় টপনার সাহায্যে। বিচ্ছিন্ন এই তিনটি অংশের সংযোগ প্রণালীটি অনুধাবনযোগ্য। ফাঁপা নলটির প্রান্তে একটি চাকি এবং নলটির সংযোগ-স্থলের মধ্যস্থানে বৃত্তাকার 'বক' স্থাপন করে দু'টিকেই নলের সাথে সুতো দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় সুনিপুণ হস্তে। সুতো বাঁধা হলে বকের মধ্যস্থলে এক টুকরো পিতলের ফালি রেখে একটি চৌকা আকৃতির কাগজের টুকরো দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয় এক একটি মাদুলি। কাগজের মোড়কগুলির উপর মাটি-জলের প্রলেপ দেওয়া হয় সযত্নে। এর ফলে পোড়ানোর সময় একটি মাদুলি অন্যটির সাথে জড়িয়ে যায় না কোনমতেই।

এসব কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর তুষ মিশ্রিত ভিজে মাটির গোলক বা ডাবের মধ্যে মাদুলির আকৃতি অনুসারে এক একটি ডাবে ৮০০ থেকে ১১০০ কিংবা ১২৮০টি করে মাদুলি ভরে দেওয়া হয়। ডাবটি হয়ে গেলে ডাবের অভ্যন্তরভাগের উত্তপ্ত বায়ু নিষ্কাশনের জন্য ডাবের উপরিভাগে একটি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিদ্র করে দেওয়া হয়। এর ফলে মাদুলিগুলি পোড়ানোর সময় ডাবটি ফেটে যায় না। মাদুলি-ভর্তি ডাবগুলিকে ভাল ভাবে শুকিয়ে নিয়ে কাঠ-কয়লার আগুনে পুড়িয়ে নেওয়া হয় ঘণ্টাখানেক। আগুনের তাপমাত্রা বাড়ানোর জন্য হাপরের ব্যবহার করা হয়। শেষ পর্যায়ে এক একটি উত্তপ্ত ডাবকে এক একটি ভিজে মাটির গর্তে রেখে ভিজে মাটি চাপা দিয়ে রেখে দেওয়া হয় পুরোপুরি ঠাণ্ডা না হওয়া পর্যন্ত। ঠাণ্ডা ডাবটিকে ভেঙে দেওয়ার সাথে সাথে বেরিয়ে আসে পিতল রঙের চক্‌চকে মাদুলিগুলি।

মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক লোহার মাদুলিগুলি পিতলের মতো হয় কেমন করে? উত্তরে বলি, বকের মধ্যে সংরক্ষিত পিতলের টুকরোটি গলে গিয়ে মাদুলির তিনটি বিচ্ছিন্ন অংশকে সংযুক্ত করে আপনা-আপনি, আর গলন্ত পিতলের প্রলেপ বা কোটিং-এ এগুলি হয়ে ওঠে পিতলের স্বর্ণাভ উজ্জ্বলতায় চক্‌চকে।

আকৃতি অনুসারে মাদুলিগুলির নামও ভারি অদ্ভুত। ছোটর নাম 'মুড়কি', মাঝারির নাম 'বেয়াড়া', বড়র নাম 'ঢাক', আর খুব বড় আকৃতির মাদুলির নাম 'জয়ঢাক'। মাদুলিগুলি গণ্ডা, পণ, কাহন হিসেবে বিক্রী হয় বাজারে।

বিষ্ণুপুর শহরের শাঁখারীবাজার, হাজরাপাড়া, সাবিত্রীতলা ছাড়াও বিষ্ণুপুর মহকুমার পেঁচাকুঁড়া, দেজহাট, বন-বীরসিংহ প্রভৃতি গ্রামে তৈরী হয় মাদুলি। অতঃপর বস্তা-বন্দী হয়ে সেগুলি চলে যায় কোলকাতা এবং কোলকাতা থেকে ছড়িয়ে পড়ে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে।

নানান কারণে মাদুলি শিল্পীদের অবস্থা এখন খুবই শোচনীয়। প্রথমতঃ কাঁচা মালের দাম বেড়েছে হু হু করে, কিন্তু দাম বাড়েনি উৎপাদিত পণ্যের। দ্বিতীয়তঃ রুচি, দৃষ্টি-ভঙ্গী এবং মানসিকতার পরিবর্তনে মাদুলির ব্যবহার কমেছে দিনে দিনে। তৃতীয়তঃ স্টীলের মাদুলির প্রচলনের ফলে বিষ্ণুপুরের লোহার তৈরী মাদুলির চাহিদা এবং বাজার দর কমে গেছে অস্বাভাবিক ভাবে। বর্তমানে প্রতি কাহন (১২৮০টি) মুড়কির দাম সত্তর টাকা,

বেয়াড়ার দাম একশ টাকা এবং ঢাকের দাম একশ পঁচিশ টাকা। এতে শিল্পীর উপযুক্ত পারিশ্রমিক তো দূরের কথা, পেটভরে ভাত জুটে না দুবেলা। অন্নসংস্থানের উদ্দেশ্যে তাই এই ব্যবসাকে চিরতরে বিদায় জানিয়ে অন্য কাজে লেগে পড়তে বাধ্য হচ্ছেন শিল্পীগণ। **আজকের মাদুলি শিল্প আগামীদিনে হয়তো হয়ে যাবে ইতিহাস।**

মাদুলি শিল্পের হাত ধরে এখন আসা যাক **গণেশমেলার গণেশ ঠাকুরের কথায়।**

অধ্যায়-৬২

গণেশমেলার গণেশ ঠাকুর

মাড়ুইবাজার

মাদুলি শিল্পের হাত ধরে আমরা এসে গেছি মাড়ুইবাজার মহল্লার গণেশ মন্দিরে। মন্দিরের বারান্দায় বসে বসে এখন শোনাব গণেশ ঠাকুরের ইতিকথা। গণেশের অপরাপর নাম গণপতি, গজানন, আদিপূজ্যদেব, বিঘ্নবিনাশক, বিনায়ক, সিদ্ধিদাতা প্রভৃতি।

বারো আদিত্য, দশ বিশ্বদেব, আট বসু, ছয় তুষিত, চৌষট্টি আভাস্বর, ঊনপঞ্চাশ বায়ু, দুই শত কুড়ি জন মহরাজিক, বারো জন সাধ্য, এগারো জন রুদ্র—এই গণদেবতাগণ মহাদেবের অনুচর। আর এঁদের অধিপতি হলেন গণেশ। এজন্যই ইনি গণপতি বা গণেশ বা মহাগণেশ। এই দেবতার মস্তকে রয়েছে গজমস্তক, তাই ইনি **গজানন**। হিন্দুদের পূজায় সর্বপ্রথম এঁর পূজা করা হয়, এজন্য ইনি **আদিপূজ্যদেব**। সর্ব কার্যে বাধা বিঘ্ন বিনাশ করার সুবাদে ইনি **বিঘ্নবিনাশক**। মহাদেবের অন্য নাম নায়ক। মহাদেবের পুত্র হিসেবে তিনি হলেন **বিনায়ক**। আবার সকল কার্যে সিদ্ধি তথা সাফল্য প্রদান করেন বলে ইনি **সিদ্ধিদাতা**।

এতাদৃশ গণেশ ঠাকুরের উৎপত্তি নিয়ে মতান্তরের অন্ত নেই। একটি উপাখ্যানে বলা হয়েছে, দেবী পার্বতীর দিব্য গাত্র-মল থেকে মস্তকহীন এবং প্রাণহীন গণেশের জন্ম। দেবাদিদেব মহাদেব পার্বতীকে সন্তুষ্ট করার অভিপ্রায়ে নবজাতকের মস্তকহীন দেহে গজমস্তক এবং প্রাণহীন দেহে প্রাণসঞ্চার করেন। প্রাণলাভের অব্যবহিত পরে গণেশ মাতা পার্বতীকে প্রদক্ষিণ ও পদবন্দনা করে স্বীয় জ্ঞান ও ভক্তির প্রকাশ করেন। **পিতামাতার বরে ইনি সিদ্ধিদাতা, বিঘ্নবিনাশক ও গণপতিরূপে আখ্যায়িত হন।**

স্কন্ধপুরাণের গণেশখণ্ডে বলা হয়েছে পার্বতী যখন গর্ভবতী ছিলেন তখন সিন্দুর নামে এক দৈত্য দেবীর গর্ভে প্রবেশ করে গণেশের মাথা কেটে ফেলে। যথা সময়ে পার্বতী এক মস্তকবিহীন অথচ প্রাণবান সন্তান প্রসব করেন। নারদ সদ্যোজাত গণেশকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করে সবকিছু জেনে নিয়ে জাতককে স্বীয় মস্তক সংগ্রহ করতে উপদেশ দেন। হৃষ্টপুষ্ট বলিষ্ঠ শিশু গণেশ তখন গজাসুরের মস্তক কেটে নিজ মস্তকে স্থাপন করেন। **এজন্য তিনি গজানন।**

এ বিষয়ে অন্য মতটি এরকম। পুরাকালে মালী ও সুমালী নামে দুই পরম শিবভক্ত ছিলেন। কোন কারণে এঁদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে সূর্যদেবতা এঁদেরকে হত্যা করতে উদ্যত হন। স্বীয় ভক্তদ্বয়কে রক্ষার উদ্দেশ্যে মহাদেব সূর্যকে ত্রিশূলাঘাতে অচেতন করে দেন। মুহূর্তে পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। নিস্তেজ, নিষ্প্রভ হতচেতন সূর্যকে দেখে পিতা

মহর্ষি কশ্যপ শিবকে ছিন্নমস্তক পুত্রলাভের অভিশাপ দেন। যথাসময়ে মহর্ষি কশ্যপের অভিশাপ ফলপ্রসূ হয়। ছিন্নমস্তক শিব-পুত্রের স্কন্ধে দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবতের মস্তক ছেদন করে স্থাপন করা হয়—**এতদর্থেও তিনি গজানন।**

সবচেয়ে বহুল প্রচলিত মতবাদটি নিম্নরূপ। দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগের পর তিনি হিমালয়ের স্ত্রী মেনকার গর্ভে পার্বতীরূপে জন্মগ্রহণ করেন। যথাকালে মহাদেবের সাথে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের দীর্ঘদিন পরও কোন সন্তান না হওয়ায় পার্বতী পুণ্যকব্রত উদ্‌যাপন করেন। পুরো এক বছর এই ব্রত উদ্‌যাপনের পরে স্বয়ং বিষ্ণু পার্বতীকে পুত্রলাভের বর দেন। যথাসময়ে পুত্র জন্মগ্রহণ করলে ত্রিলোকের দেবতারা সদলবলে সেই নবজাতককে দর্শন করতে আসেন। এসেছেন স্বয়ং শনি দেবতাও। অন্য দেবতাগণ যখন নবজাতকের মুখদর্শন করছিলেন, শনি দেবতা তখন তা না করে দাঁড়িয়েছিলেন অধোবদনে। তাই দেখে অধোবদন-শনিকে পুত্রের মুখ দর্শন করার জন্য পার্বতী অনুরোধ করেন বারংবার। সহজ, সরল, শনিরাজ অকপটে স্বীকার করেন—তাঁর প্রতি তাঁর স্ত্রীর অভিশাপ আছে যে, তাঁর (শনির) দৃষ্টি যার উপরে পড়বে সে ধ্বংস হয়ে যাবে। শনিরাজের একথা অবিশ্বাস করে পার্বতী তাঁর সন্তানের মুখ-দর্শন করতে গ্রহরাজকে অনুরোধ করেন পুনঃপুনঃ। নিরুপায় শনি তখন নবজাতকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। মুহূর্তে জাতকের মুণ্ড অদৃশ্য হয়ে যায়। এই সংবাদ শ্রবণে উদ্বিগ্ন বিষ্ণু একটি হস্তীর মস্তক ছেদন করে বসিয়ে দেন গণেশের ছিন্নকণ্ঠে এবং দেবাদিদেবের পুত্রের যাতে অবমাননা বা অসম্মান না হয় সেজন্য ত্রিলোকের দেবতাগণ সম্মিলিতভাবে নিয়ম করেন সর্বাগ্রে গণেশের পূজা না করলে তাঁরা পূজা গ্রহণ করবেন না। **প্রথমে পূজা পাওয়ার দাবিদার হিসেবে ইনি আদিপূজ্যদেব নামেও কথিত।**

ব্যাসদেব বিরচিত মহাভারতের লিপিকার গণেশ ঠাকুরের দেহ খর্বাকৃতি এবং হৃষ্টপুষ্ট। ত্রিনয়ন-বিশিষ্ট এই দেবতার চারহস্তে আছে নারায়ণের ন্যায় শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম। আবার কোনো কোনো গণেশ মূর্তির হস্তে লাড্ডু, টাঙি, গদা ও পদ্ম দেখা যায়। "মূষিক এঁর বাহন। কারণ, এই মূষিক বৃষরূপধারী ধর্মের অবতার; মহাবল ও পূজা-সিদ্ধির অনুকূল।"

আবার দক্ষিণ ভারতের অধিকাংশ গণেশমূর্তি একদন্তবিশিষ্ট। কিন্তু কেন? এ প্রসঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। ঘটনাটি নিম্নরূপ। একদা শিব ও পার্বতী অন্দরমহলে নিদ্রিত ছিলেন। বহির্মহলে গণেশ ছিলেন দ্বাররক্ষক। এমন সময় পরশুরাম শিবের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। নিদ্রিত মাতাপিতার ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টির আশঙ্কায় মাতাপিতৃভক্ত গণেশ পরশুরামকে অন্তঃপুরে যেতে বাধা দেন। ক্ষিপ্ত পরশুরামের সাথে গণেশের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সেই যুদ্ধে পরশুরামের কুঠারের আঘাতে গণেশের একটি দাঁত সমূলে উপড়ে যায়। **এজন্য গণেশকে একদন্তও বলা হয়।**

এবার আসা যাক এই গণেশ মন্দিরের গণেশের কথায়। গোলাকৃতি একটি বেদীর উপর এই দিব্যকান্তি গণেশ মূর্তিটি অষ্টধাতুর তৈরী। বেদীর উপর গণেশজীর বসার ভঙ্গিমাতে রয়েছে অপূর্ব মনোহারিত্ব। দক্ষিণ চরণ নিম্নে ঝোলানো। বামপদ দক্ষিণ উরুর উপর সুসংস্থাপিত। স্ফীতোদর এবং ত্রিনয়ন বিশিষ্ট এই গণেশজীর দক্ষিণ দিকের নিম্নহস্তে লাড্ডু, ঊর্ধ্বহস্তে টাঙি, বাম দিকের নিম্নহস্তে পদ্ম ও ঊর্দ্ধহস্তে গদা সুশোভিত। সর্বসাকল্যে শ্রীবিগ্রহের উচ্চতা প্রায় ৩ ফুট। **সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এটিই নাকি অষ্টধাতু নির্মিত**

(সলিড) বৃহত্তম গণেশমূর্তি। বিগ্রহটি তৈরী করেন শিক্ষক শ্রীঅদ্বৈত সিদ্ধান্ত মহাশয়ের শ্বশুর নিত্যানন্দ মুখোপাধ্যায় ওরফে নিতাই মুখুটি মহাশয়ের বংশের জায়গায় বসবাসকারী জনৈক কর্মকার শিল্পী। তৈরী করান ৺**বিপ্রদাস নাগ মণ্ডল**। গণেশ মন্দিরের সন্নিকটেই রয়েছে অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীমহাদেব নাগ মণ্ডলের বাড়ি। এই মহাদেব নাগ মণ্ডলের তিন পুরুষ আগের লোক ছিলেন বিপ্রদাস নাগ মণ্ডল। এঁরা জাতিতে মোদক। মোদকদের উপাস্য দেবতা হলেন গণেশ ঠাকুর। ৺বিপ্রদাস ছিলেন নিঃসন্তান, সৎ এবং ধর্মভীরু। সুতরাং তিনি এক দিব্য প্রেরণায় আপ্লুত হয়ে মোদক জাতির উপাস্য দেবতা গণেশ মূর্তি ও গণেশ মন্দির নির্মাণ পূর্বক শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করে পূজা-অর্চনার মাধ্যমে ভুলে যান নিঃসন্তানের ব্যথা। আজ থেকে প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত এই গণেশঠাকুর ছিলেন পূর্বোক্ত ৺বিপ্রদাসের পরিবারের পারিবারিক দেবতা। পরবর্তীকালে এই শ্রীবিগ্রহ হয়েছেন বিষ্ণুপুরের সমগ্র মোদক জাতির উপাস্য দেবতা। তারও পরে বিষ্ণুপুরের মোদক জাতি হয়েছে দ্বিধারায় বিভক্ত। নতুন একটি মোদক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে বিষ্ণুপুর বোলতলা মহল্লায়। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পাথরের নতুন গণেশ-মূর্তি।

অদূর অতীতে এখানের গণেশমন্দিরে প্রায়ই আসতেন বাঙালী, অবাঙালী বহু সাধু-সন্ন্যাসী। গণেশ মন্দিরের সুম্মুখে একটি বেশ শক্তপোক্ত আটচালা ছিল, আর ছিল অতিথিশালা। সাধু-সন্ন্যাসীগণ আসতেন এবং থাকতেন মাসাধিককাল। ধুনি জ্বালিয়ে জপধ্যান করতেন, করতেন হরিনাম সংকীর্তন। ভক্ত সমাগম হত মন্দ না। এক্ষণে আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিই এই মন্দিরেই আগত প্রভূত অলৌকিক শক্তির অধিকারী **অবধূত সুধীরানন্দ সরস্বতী** বিষ্ণুপুরের নতুন মহল অঞ্চলে শ্মশানকালীমাতার প্রতিষ্ঠা করেন। সে কথা 'নতুন মহলের শ্রীশ্রীশ্মশানকালীমাতা'র কথাপ্রসঙ্গে বলেছি।

আগেভাগে চৈত্র সংক্রান্তি থেকে বৈশাখ সংক্রান্তির দিন পর্যন্ত ঠাকুরকে শীতল-ভোগ নিবেদন করা হত এবং নাম সংকীর্তন হত নিয়মিত। এখন সেসব বন্ধ হয়েছে। হয় শুধু নিত্যপূজা আর শ্রীপঞ্চমী অর্থাৎ শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজার আগের দিন **বিনায়ক-চতুর্থী** তিথিযোগে সারা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য গণেশ ঠাকুরের মতো ঐদিন এই গণেশ ঠাকুরেরও পূজা হয় সাড়ম্বরে। বিশেষ ভোগরাগ সহ নামসংকীর্তন হয় সারাদিন।

মোদক সম্প্রদায়ের উপাস্য দেবতা গণেশ ঠাকুরের তত্ত্বকথার পর আসা যাক **বিষ্ণুপুরের মোদক গোষ্ঠীর উৎপাদিত মিষ্টান্ন এবং মতিচুরের কথায়।**

অধ্যায়-৬৩

বিষ্ণুপুরের মিষ্টান্ন ও মতিচুর

একটি সুগন্ধি ফুলকে যেখানেই নিয়ে যাওয়া হোক না কেন, সকলের অলক্ষ্যে সাথে সাথে যায় তার মনমাতানো সৌরভ। অনুরূপভাবে শ্রীনিবাস আচার্য যখন বৃন্দাবন থেকে বিষ্ণুপুরে এলেন তখন তাঁর সাথে এল তাঁর অগাধ জ্ঞান-গরিমা, গভীর ঈশ্বরানুরাগ এবং অমূল্য ঐশী সম্পদ। এল বৈষ্ণবের বিনয়, ভক্তি-বিগলিত ভাবধারা। এল বৈষ্ণব কবিদের কাব্য, সুললিত পদাবলী, সুমধুর ধ্রুপদ, ধ্রুপদাঙ্গ কীর্তন, আর এল বৃন্দাবনের অনুকরণে রাধাকৃষ্ণের যুগল বিগ্রহের ভোগ-রাগে ছানার মিষ্টান্ন নিবেদনের প্রথা।

দেবসেবার মিষ্টান্ন তৈরীর তাগিদেই মল্লভূমে আগমন ঘটে মোদক জাতির। এই মোদক জাতির উৎপত্তি বিষয়ে একটি বেশ মুখরোচক গল্প শোনা যায়। গল্পটির সার-সংক্ষেপ এরকম।

একদিন শিশু গণেশ ঠাকুর ঝোঁক ধরেছেন বেজায়। মা পার্বতী অশান্ত ছেলেকে কিছুতেই শান্ত করতে না পেরে মহাদেবের শরণাপন্ন হন অবশেষে। মহাদেবও গণেশকে শান্ত করার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন শেষমেষ। গণেশ কান্নাকাটি করে মাটিতে লুটোপুটি খান একাদিক্রমে। এমতাবস্থায় দেবাদিদেব মহাদেব তাঁর জটাজালের অগ্রভাগের একটুখানি ছিঁড়ে নিয়ে নিক্ষেপ করেন ভূমিতে। মুহূর্তে সেই ছিন্ন জটা থেকে এক শ্রীদর্শন সৌম্যকান্তি পুরুষ উদ্ভূত হয়ে একান্ত বিনম্র চিত্তে শিব ঠাকুরকে বলেন, 'কি করতে হবে, আদেশ করুন প্রভু।'

রোরুদ্যমান গণেশের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে মহাদেব বলেন, 'যে কোন উপায়ে শান্ত কর ওকে।'

সুদর্শন পুরুষটি তৎক্ষণাৎ একটি লাড্ডু তৈরী করে ধরিয়ে দেন গণেশ ঠাকুরের হাতে। সুস্বাদু লাড্ডুটির স্বল্পাংশ মুখে দিয়েই গণেশ ভুলে যান কান্নাকাটি। নাচতে থাকেন পরমানন্দে। অতঃপর প্রতিদিনই ঐ পুরুষ গণেশকে লাড্ডু খাওয়াতেন। এই ঘটনার পর থেকেই লাড্ডু হস্তে গণেশ মূর্তি পূজার প্রচলন হয়। **দেবাদিদেব শঙ্করের অংশ সম্ভূত উক্ত পুরুষটিই হলেন মোদক বা ময়রা জাতির আদিপুরুষ এবং গণেশ ঠাকুর হলেন মোদক জাতির উপাস্য দেবতা।**

শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে মহারাজ বীর হাম্বীর বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা নেওয়ার পর মল্লরাজারা বংশানুক্রমে একের পর এক নির্মাণ করেছেন রাধা-কৃষ্ণের মন্দির। প্রতিষ্ঠা করেছেন শতাধিক রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ। বিগ্রহের ভোগরাগে নিয়মিতভাবে ছানার মিষ্টান্ন যোগানোর উদ্দেশ্যে মল্লরাজারা প্রতিটি দেবালয়ের নিকটে এক ঘর মোদক এবং এক ঘর গোপ বা গোয়ালা পরিবারের বসবাসের ব্যবস্থা করেন। গোয়ালার কাজ ছিল দুধ, দৈ, ঘি, ছানা যোগান দেওয়া। আর মোদকের কাজ ছিল দুধ ও ছানা থেকে দেবপূজার জন্য বহুবিধ উপাদেয় মিষ্টান্ন প্রস্তুত করা। এই কাজের জন্য উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা মল্লরাজা প্রদত্ত নিষ্কর ভূসম্পত্তি ভোগ করতেন।

জেনে রাখা ভাল যে, মল্লরাজ্যে বৈষ্ণব ধর্ম প্রসার লাভের পর রাঢ়বঙ্গে খাদ্যরুচি দ্বিধারায় বিভক্ত হয়। প্রথমটি আমিষ এবং দ্বিতীয়টি নিরামিষ। যাঁরা বৌদ্ধতন্ত্রের দেব-দেবীর ভক্ত তাঁদের মধ্যে মদ, মাংস খাওয়ার প্রাচীন খাদ্যরীতি রইল অপরিবর্তিত। পক্ষান্তরে যাঁরা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হলেন তাঁদের নিরামিষ খাদ্য তালিকায় ছানার মিষ্টি, দুধ, ঘি, দধি প্রভৃতি প্রাধান্য লাভ করল। মল্লরাজ্যের অভিজাতদের মধ্যেও নিত্য নতুন মিষ্টি খাওয়ার প্রবণতা দেখা দেয়। **ফলে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে মল্লরাজ্যে মিষ্টান্ন শিল্পে জোয়ার আসে।**

রাঢ়ীয় মোদক জাতির মধ্যে যে বারোটি গোষ্ঠী আছে তাঁদের মধ্যে এক একটি গোষ্ঠী বা পরিবার এক এক রকমের মিষ্টি তৈরীতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। যেমন বরাট উপাধিধারী মোদকগণ ছোলার বেসনের মিঠাই এবং চিনির ওলার জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

দে পদবীধারী মোদকগণ জিলাপি তৈরীতে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, আবার নাগ বংশীয় মোদকগণ বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত মতিচুরের জন্য সর্বজন সমাদৃত ছিলেন।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে মহারাজ চৈতন্য সিংহের দুরবস্থা চরমে ওঠে। আর্থিক দুরবস্থার কারণে সেই সময় তিনি কোলকাতার বাগবাজারের ধনাঢ্য লবণ ব্যবসায়ী গোকুল মিত্রের নিকট বিষ্ণুপুরের নগরদেবতা মদনমোহন-জীউকে বন্ধক রাখেন। বাগবাজারে মদনমোহন জীউ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মদনমোহনের ভোগরাগে নানাবিধ মিষ্টান্ন সরবরাহের জন্য বাগবাজারে **নবীন মোদক** এবং **ভীম নাগ** বসতি স্থাপন করেন। এই দুই মোদক পরিবারকে নিয়মিত দুগ্ধজাত দ্রব্য যেমন—ছানা, মাখন, ঘি, দৈ প্রভৃতি সরবরাহের জন্য ঐ অঞ্চলে **দ্বারিক ঘোষ** নামক এক গোয়ালাও বসবাস শুরু করেন। **কোলকাতাতে রাধামদনমোহনের আগমন এবং উক্ত যুগল বিগ্রহকে নিয়মিত ছানার মিষ্টান্ন নিবেদনের সূত্র ধরেই বাগবাজার সহ সমগ্র কোলকাতাতে ছানাজাত মিষ্টান্ন শিল্পের দ্রুত প্রসার লাভ করে। পরবর্তীকালে কোলকাতা থেকে সারা বাংলা, ভারত এবং বিদেশেও মিষ্টান্ন শিল্পের বহুল প্রচলন হয়।**

সুতরাং বলা যায়, রাঢ়বঙ্গের ঘরে ঘরে খৈ, বাজরা, মুড়িচূর্ণ, চিড়াভাজা চূর্ণের সাথে গুড় বা দোলা-চিনি মিশিয়ে যে মিষ্টান্ন শিল্পের সূচনা হয়েছিল সুদূর প্রাচীনকালে; উত্তরণের পথে মধ্যযুগে তা উত্তীর্ণ হয়েছে বৈষ্ণব কবিদের নামাঙ্কিত **কাঞ্চন-লতিকা**, **লবঙ্গ-লতিকা**, **মৌক্তিকাক্ষ** বা **মতিচুর** জাতীয় রসাল মিষ্টান্নতে। এখন শুনুন মতিচুরের কথা। বিষ্ণুপুরে একটি প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে —

গান বাজনা মতিচুর
এই তিনে বিষ্ণুপুর।

বিদ্যুতের সাথে বজ্রের যে সম্পর্ক, গানের সাথে বাজনারও বোধ করি সেই সম্পর্ক। ফলতঃ সঙ্গীত-সাধনার আনুষঙ্গিক সাধনা হিসেবে বিষ্ণুপুরে হয়েছে বাদ্যযন্ত্রের বহুল প্রচলন। গানের সুরে বাদ্যযন্ত্রের ঝঙ্কার মিশে গিয়ে বিষ্ণুপুর হয়েছে **'সঙ্গীতে দ্বিতীয় দিল্লী'**। সঙ্গীত প্রসঙ্গে আলোচনার অবকাশে সেসব কথায় ফিরব 'খন। রসনা তৃপ্তিকারক রসাল মতিচুরের কথায় মন মজাব এখন।

মতিচুর শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'মিহিদানা', তথাপি মিহিদানা মানে মতিচুর নয় কখনো। মতিচুর মানে মতিচুর। কারণ মতিচুরের একটা নিজস্ব মৌল উপাদান আছে যার সাথে মিহিদানার উপাদানের মিল নেই। মিহিদানা তৈরী হয় 'ডবল বেসন' থেকে আর মতিচুর তৈরী হয় *পিয়াল বিচির বাদামের অর্থাৎ ভ্রূণের* বেসন থেকে। মিহিদানা হল মিহি অর্থাৎ ক্ষুদ্র দানা বিশিষ্ট মিষ্টি, পক্ষান্তরে মতিচুর হল মিহিদানার তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড় কিন্তু বোঁদের দানার তুলনায় ছোট আকৃতির মিষ্টি। মিহিদানাতে পিউড়ি রঙের ব্যবহার প্রথাসিদ্ধ। মতিচুরে রঙের ব্যবহার নিষিদ্ধ। তবে ক্ষেত্রবিশেষে অল্পমাত্রায় বাসন্তী রং ব্যবহার করা হয়। মিহিদানা জলে ভাসে না, মতিচুর কিন্তু জলে ভাসতো।

পিয়ালের বেসনের সাথে আনুপাতিক হারে চালগুঁড়ি মিশিয়ে পরিমাণ মতো জল দিয়ে বেশ ভালভাবে বেসন ফেটে অর্থাৎ পাট করে হালকা আঁচে দেশী ঘিয়ে ভাজা হয় মতিচুরের দানাগুলি। অতঃপর চিনির রসে ডুবিয়ে রেখে ঠাণ্ডা করে নেওয়া হয় পর্যাপ্ত সময় দিয়ে। বিক্রয়োপযোগী রং মেশানো মতিচুরগুলি হয় স্বর্ণচাপা ফুলের মতোই স্বর্ণাভ।

মতি বা মোতি মানে মুক্তা, আর চুর মানে গুঁড়া বা ক্ষুদ্র দানা। সুতরাং শব্দগত অর্থের দিক থেকে মতিচুর বলতে বোঝায় মুক্তার দানা। রঙে, ঢঙে এবং উজ্জ্বলতায় বিনা রঙের মতিচুরগুলির মুক্তার দানার সাথে সৌসাদৃশ্যের গুণেই এই মিষ্টান্নের নাম হয়েছিল মতিচুর। বর্তমানে দুষ্প্রাপ্য অতি সুস্বাদু ঐতিহাসিক যুগের মতিচুর, মিহিদানার তুলনায় ঘি চুষত বেশী, খেতে হত খাস্তা — মুখে দিয়ে অল্প একটু চাপ দিলেই মিলিয়ে যেত নিমেষে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর 'গোবিন্দ লীলামৃত' গ্রন্থে মৌক্তিকাক্ষ নাড়ুর উল্লেখ করেছেন।

মনোরমা কর তুমি নাড়ু মনোহরা।
মৌক্তিকাক্ষ নাড়ু কর তুমি রত্নমালা।।

'গোবিন্দ লীলামৃত' গ্রন্থটি বৃন্দাবনে রচিত হয়েছিল। গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছিলেন যদুনন্দন দাস। **উপরোক্ত মৌক্তিকাক্ষ নাড়ুই বিষ্ণুপুরের মতিচুর।** পূর্বেই বলেছি, বিষ্ণুপুরের নাগবংশীয় মোদকগণ সর্বোৎকৃষ্টমানের মতিচুর তৈরী করতে পারতেন। এক্ষেত্রে একটু পূর্বে কথিত শ্রীমহাদেব নাগ মণ্ডলের পরিবারের কথা এসে যায় স্বাভাবিকভাবেই। মহাদেব বাবুর পরিবার বিষ্ণুপুরে সাত পুরুষ যাবৎ বসবাস করছেন। **সাত পুরুষের আদি পুরুষ গোপাল নাগ মণ্ডল থেকে শুরু করে ষষ্ঠ পুরুষ মহাদেব নাগ মণ্ডল পর্যন্ত এই ছয় পুরুষ ধরে তাঁরা বিষ্ণুপুর-রাজের সমস্ত দেব-দেবীদের জন্য নিয়মিত মিষ্টান্ন, যেমন মুড়কি, মণ্ডা, মতিচুরের মিঠাই সরবরাহ করেছেন একান্ত নিষ্ঠা সহকারে।** মহাদেব বাবু জানালেন বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত গাওয়া-ঘি-এ তৈরী হত সেসব মিষ্টান্ন। তখনকার দিনে কলের তৈরী চিনির প্রচলন ছিল না। শামসাড়া আখ থেকে তৈরী হত শামসাড়া গুড়। অত্যন্ত সুগন্ধি এই গুড় থেকে বেশী পরিমাণে চিনি পাওয়া যেত। গুড়ের পায়ার মুখের গুড়ের উপর পুকুরের কাঁটাদল চাপিয়ে দেওয়া হত গুড়কে ঠাণ্ডাতে জমে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। আবার পায়া বা হাঁড়ির তলদেশে একটি ছিদ্র করে দেওয়া হত। ঐ ছিদ্র পথে রসাল জলীয় অংশ নির্গত হয়ে ৭/৮ দিনের মধ্যেই পায়ার অভ্যন্তরভাগে মোটা বালির দানার আকারে জন্ম নিত চিনির দানা। স্বর্ণচাপা রঙের ঐ চিনির নাম ছিল **'দোলা চিনি'**। দোলা চিনি দিয়ে তৈরী হত যাবতীয় মিষ্টান্ন।

মহাদেব বাবুদের পদবী ছিল নাগ। ৺গোপাল নাগের তৈরী মিষ্টান্ন মোহিত করেছিল বিষ্ণুপুরের দেব-দেবীদের। শুধু দেব-দেবীদের নয়, রাজপরিবারের সকলকেই। **মিষ্টান্ন তৈরীতে ৺গোপাল নাগের বিশেষ পারদর্শিতায় মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণুপুর-রাজ ৺গোপাল নাগ মহাশয়কে 'মণ্ডল' উপাধিতে ভূষিত করেন। সেই থেকে এঁরা বংশগত এবং জাতিগত উপাধি 'নাগ'-এর সাথে 'মণ্ডল' যোগ করে হয়েছেন 'নাগ-মণ্ডল'।** মহাদেব বাবুও আসল মতিচুর তৈরী করেছেন প্রথম জীবনে। পরবর্তীকালে চাকুরি নিয়ে তিনি চলে যান স্থানান্তরে। মহাদেব বাবুর পুত্রগণ মতিচুর মিষ্টান্নে উৎসাহিত হননি ব্যয়-বাহুল্য বশতঃ।

১৯৩৯-১৯৪৫ খৃষ্টাব্দ। এসে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লক্ষ লক্ষ নরহত্যার পাশাপাশি হত্যা করেছে বিষ্ণুপুরের মতিচুরকে। খুলেই বলি কথাটা। এই যুদ্ধের সময় বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পূর্বে বাসুদেবপুর মৌজায় একটি এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত গামারবনী অঞ্চলে একটি অর্থাৎ মোট দুটি 'ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড' নামান্তরে 'এয়ারোড্রাম্' অর্থাৎ বিমানঘাঁটি প্রস্তুত করা হয়। যুদ্ধের গুরুত্ব উপলব্ধি করে ঐ সময় স্থানীয় জমিদারগণের বন-জঙ্গল এবং পতিত জমি 'অ্যাকুইজিশন' বা 'রিকুয়িজিশন্'-এর ভিত্তিতে

অধিগ্রহণ করেন তৎকালীন বৃটিশ শাসিত ভারত সরকার। পিয়াল[১] গাছের প্রাচুর্যের জন্য পিয়ালডোবা অঞ্চল সহ বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মড়ার, ধবনী, বেনাচাপড়া, গামারবনী প্রভৃতি জঙ্গল মৌজাগুলিও সরকার অধিগ্রহণ করেন যুদ্ধকালীন তৎপরতায়। এসব এলাকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে পিয়ালগাছ ছিল। অধিগ্রহণের ফলে স্বাভাবিকভাবেই পিয়ালগাছগুলি কাটা যায় ব্যাপকভাবে এবং পিয়াল ফল তথা বিচির অভাবে মতিচুরের অকালমৃত্যু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দাপটে, বলা চলে বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক কালে।

বর্তমানে বিষ্ণুপুরে মতিচুর নামে যে মিষ্টান্ন পাওয়া যায় তা পিয়াল বিচির বেসনের পরিবর্তে তৈরী হয় রমার বেসনে। কিন্তু পিয়াল বিচির বেসনের উৎপাদিত আসল মতিচুরের স্বাদ বা সুঘ্রাণ তাতে নেই। ঐতিহাসিক যুগের মতিচুর আজ মহাকালের গর্ভে লীন হয়ে গেছে কালের অমোঘ নিয়মে।

আসল মতিচুর অদৃশ্য হলেও সুদৃশ্য সুস্বাদু হরেক রকমের মিষ্টান্নের অভাব নেই বর্তমানে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কলে প্রস্তুত চিনির উৎপাদনের ফলে এবং মিষ্টান্ন শিল্পীদের নিরবচ্ছিন্ন নিত্য নতুন উদ্ভাবনী শক্তির সফল রূপায়ণে মিষ্টান্ন-শিল্পে আসে এক অভাবনীয় পরিবর্তন। যার ফলে আজ জন্ম নিয়েছে রসনা তৃপ্তিদায়ক কাঁচাগোল্লা, রসগোল্লা, রাজভোগ, সীতাভোগ, মণ্ডা, মিঠাই, নাড়ু, পেঁড়া, পান্তুয়া, খাজা, গজা, বোঁদে, বালুশাই, কলাকন্দ, কালোজাম, গোলাপজাম, চিত্রকূট, চিত্তরঞ্জন, ক্ষীরকদম, ক্ষীরের পায়েস, মিল্ক-কেক, মিল্ক-পুরিয়া, সরপুরিয়া, সন্দেশ, ম্যাচাসন্দেশ বা ন্যাচাসন্দেশ, নলেন গুড়ের সন্দেশ প্রভৃতি হরেক রকমের মিষ্টান্ন।

সুদূর পৌরাণিক যুগে ক্রন্দনরত এক দেবশিশুকে শান্ত করার জন্যে সৃষ্টি হয়েছিল মিষ্টি। কালে তা আবালবৃদ্ধবনিতা নির্বিশেষে দেব, দানব, মানব জাতির মন জয় করেছে যুগে যুগে। 'মিষ্টিমুখ করানো' একটি চিরাচরিত মাঙ্গলিক প্রথা। কারণ মিষ্টির জয়-জয়কার এবং জনপ্রিয়তা সর্বত্র। আর অবিভক্ত বঙ্গে এতাদৃশ মিষ্টান্নের জন্মস্থান 'দেব-নগরী-বিষ্ণুপুর' বললেও অত্যুক্তি হয় না আদৌ।

অধ্যায়-৬৪

শ্রীশ্রীসঙ্কটতারিণী মাতা

সঙ্কটতলা

বিষ্ণুপুরের মিষ্টান্ন ও মন-মজানো মতিচুরের স্বাদ আস্বাদন করতে করতে আমরা সমাগত হয়েছি এই শহরের সঙ্কটতলা মহল্লায় অবস্থিত শ্রীশ্রীসঙ্কটতারিণী মাতার শ্রীমন্দির প্রাঙ্গণে।

মন্দিরটির নাট-মন্দিরের উপরিভাগে লিখিত 'শ্রীশ্রীসঙ্কটতারিণী ও শ্রীশ্রীমনসা মাতার মন্দির' লিপি থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে এ মন্দিরটি পূর্বোক্ত দুই দেবীর মন্দির। দুই দেবীর মন্দির হলেও মন্দিরাভ্যন্তরে মা সঙ্কটতারিণীর কোন বিগ্রহ বা প্রতীক নেই

১। পিয়াল—ক্ষুদ্রাকৃতি টক-মিষ্টি বন্য-ফল বিশেষ। সাধারণতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে পাওয়া যায়। বিচি বড়, শাঁস অল্প। গুণে শীতল। পাকা ফলের রং খয়েরী।

এখানে। মা সঙ্কটতারিণীর পূজাও হয় না প্রতিদিন। নিত্যপূজা হয় মা মনসার। অসংখ্য হাতি, ঘোড়া ও মনসার সাজ-সহ মা মনসার চতুর্ভুজ মূর্তি রয়েছে এখানে। মা মনসার নিত্যপূজা ছাড়াও দশহরা, পঞ্চমী এবং চৈত্রমাসে চণ্ডীপূজা উপলক্ষ্যে মায়ের বিশেষ পূজানুষ্ঠানও হয়ে থাকে সাড়ম্বরে। পক্ষান্তরে বছরে মাত্র একদিন মা সঙ্কটতারিণীর পূজা হয়। তাও আবার মন্দিরে নয়, নাট-মন্দিরে। **মাঘী পূর্ণিমার পর কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থী তিথিটি 'সংকট-চতুর্থী' রূপে চিহ্নিত। তিথি অনুসারে কোন বছর মাঘ মাসে আবার কোন বছর ফাল্গুন মাসেও হয় 'সঙ্কট-চতুর্থী'। সঙ্কট-চতুর্থী তিথি-যোগে এই মন্দিরের নাটমন্দিরে সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সঙ্কটতারিণী দেবীর ঘটস্থাপন করে সূর্যোদয় থেকে রাত্রির প্রথম প্রহর পর্যন্ত চলতে থাকে মায়ের পুজো।** ঐ দিন মন্দির-প্রাঙ্গণ পূজারী, পূজারিণী, ভক্ত ও দর্শক সমাগমে ছোটোখাটো মেলার রূপ পরিগ্রহ করে। সারা শহরের এবং শহরের বাইরের বহু দূর-দূরান্ত থেকেও ভক্তগণ এসে থাকেন মায়ের পুজো করিয়ে মনস্কামনা পূরণের আশায়। মায়ের কৃপাধন্য ভক্তগণ আসেন মানসিক শোধ করার অভিপ্রায়ে। দু-চার টাকার বিনিময়ে পূজারিণীদের সহগামী হন বাজনা বাদ্যির দল। পূজার উপকরণ হিসেবে পোড়ামাটির ক্ষুদ্রাকার হাতি, ঘোড়া, চাঁদমালা, ফুল-ফল, মেথি, আবাটা, হরিদ্রা, সুপারি, কড়ি, ধূপ, দীপ, ধান, দূর্বা প্রভৃতি দ্রব্যাদি এবং দোকানের চালু মিষ্টান্ন ছাড়াও **'পাহাড়-পর্বত'** নামক এক বিশেষ ধরনের মিষ্টান্ন সহযোগে ব্রতকারিণীগণ মায়ের পূজা দিয়ে থাকেন নিষ্ঠা সহকারে। ষোড়শোপচারে মায়ের পূজা করানো ছাড়াও মানসিক শোধের ক্ষেত্রে হাতি, ঘোড়া, লালপাড়, শাড়ি, শাঁখা, সিঁদুর, লোহা, আলতা, চাঁদমালা, বিবাহের মোড়, স্বর্ণ, রৌপ্য অলঙ্কারাদিও দেওয়া হয় মাকে।

ব্রতকারিণীগণ আগের দিন হবিষ্যি করে থাকেন। 'সঙ্কট-চতুর্থী'র দিন অর্থাৎ পূজার দিন উপবাসে থেকে ব্রতী পুজো করান এবং রাত্রিবেলা চতুর্থীর চাঁদ দেখে পরে মায়ের স্নানজল গ্রহণান্তে ফলাহার পায়েস কিংবা আটা বা ময়দার খাবার গ্রহণ করেন। **'পাহাড়-পর্বত' নামক বিশেষ প্রসাদ ঢাকা দিয়ে গুপ্তভাবে রাখা হয় ঐ দিন এবং পরের দিন সূর্যোদয়ের পর পাহাড়-পর্বত মিষ্টান্ন-প্রসাদ ভেঙে বিতরণ ও গ্রহণ করার নিয়ম প্রথাসিদ্ধ।**

কথিত আছে কোন এক সন্তানহারা-মা সঙ্কটতারিণী দেবীর শ্রীচরণে সকাতর প্রার্থনা জানিয়ে হন্যে হয়ে সন্তান খুঁজতে খুঁজতে স্বীয় সন্তানকে খুঁজে পান এক পাহাড়ের পাদদেশে। **পাহাড়ের কোলে হারানো সন্তানকে ফিরে পাওয়ার সুবাদে সন্তানহারা জননী দেবীকে 'পাহাড়-পর্বত' নামক মিষ্টান্ন দিয়ে মায়ের পুজো দিয়েছিলেন। সেই থেকেই এই দেবীর পূজাতে পাহাড়-পর্বত মিষ্টান্ন দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত হয়।** পাহাড়-পর্বত মিষ্টান্ন হল, "বেসনের চোনা তেলে ছেঁকে গুড়ে মিশিয়ে তিনটি চূড়া-বিশিষ্ট 'পাহাড়' আকৃতির মিষ্টি। আগেকার দিনে এ মিষ্টি বেশ বড়ো বড়ো হতো, এক একটির ওজন ২০-২৫ সের তো বটেই। এখনো ৪-৫ সের ওজনের হয়।"[১] বাঁকুড়ার ভূতেশ্বর গ্রামের সঙ্কটতারিণী পূজাতে এ ধরনের মিষ্টির নৈবেদ্য দেওয়ার নিয়ম অনুসৃত হয়।

রাত্রির প্রথম প্রহরের শেষে অথবা দ্বিতীয় প্রহরে মায়ের ঘট জলাশয় করে সে বছরের মত সাঙ্গ হয় সঙ্কটতারিণী পূজা।

এখন মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক—কে এই সঙ্কটতারিণী? কেনই বা বছরে মাত্র

১. রাঢ়ের গ্রামদেবতা, পৃঃ—১১১

একদিন পূজা হয় মায়ের? এই দেবীর পূজা করে কি লাভ হয়? কবে থেকেই বা এই দেবীর পূজার প্রচলন হয়?

উত্তরে বলি, বিপদ থেকে তারণ করেন যে দেবী তিনিই বিপত্তারিণী, অনুরূপভাবে শরণাগতের সঙ্কট মোচন করেন যে দেবী তিনিই সঙ্কটতারিণী। বিষ্ণুপুরে সঙ্কটতারিণী মায়ের পূজার প্রচলন প্রসঙ্গে সঙ্কটতারিণী দেবীর পুরোহিত বংশের শ্রীরামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় শোনালেন বেশ অদ্ভুত কথা। যদিও বঙ্গদেশকে পাণ্ডববর্জিত দেশ রূপে আখ্যায়িত করা হয় তথাপি তিনি বললেন, বারণাবতে জতুগৃহ দাহের পর কুন্তীদেবী সহ পঞ্চপাণ্ডব এক বৎসর অজ্ঞাতবাসে ছিলেন। সেই সময় তাঁরা বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন। বর্তমানে যে স্থানে মা সঙ্কটতারিণীর পূজা হয় অতীতে সেই স্থানের উত্তর দিকে একটি বটবৃক্ষ ছিল। অজ্ঞাতবাসে অবস্থানকালে নানা রকম বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাবার ইচ্ছাতে কুন্তীদেবী পূর্বোক্ত বটবৃক্ষমূলে মা সঙ্কটতারিণীর ঘট স্থাপন করে দেবীর পূজা করিয়েছিলেন। বর্তমানে যে স্থানে লালবাঁধ রয়েছে মহাভারতের যুগে অর্থাৎ আজ থেকে ৫০০০ বছরেরও পূর্বে ঐ স্থানটি নাকি 'আনন্দকানন' নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং সেখানে একটি স্রোত ছিল। পূজান্তে উক্ত স্রোতে ঘট বিসর্জন দিয়ে পঞ্চপাণ্ডব সহ কুন্তীদেবী সেই স্রোতে স্নান করে অন্যত্র গমন করেন। কুন্তীদেবীর সঙ্কটতারিণী পূজার দৃষ্টান্ত থেকেই বিষ্ণুপুরে সঙ্কটতারিণী দেবীর পূজার প্রচলন হয় বলেই পুরোহিত বংশের বিশ্বাস। পুরোহিত রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উক্তির সত্যতা প্রমাণার্থে 'স্তবকবচমালা ও ধ্যানমালা' পুস্তকের ১৪৩ পৃষ্ঠার 'সঙ্কটাস্তোত্রম,' অংশটি পাঠ করে শোনালেন। তাতে পূর্বোক্ত ঘটনা সহ 'আনন্দকানন' এবং 'বিষ্ণুপুর' শব্দ দুটির উল্লেখ আছে। অবশ্য এই বিষ্ণুপুর কোন বিষ্ণুপুর তা পরিষ্কার করে বলা নেই।

কুন্তীদেবী যেদিন মা সঙ্কটতারিণীর পূজা করেছিলেন সেদিন ছিল মাঘী-পূর্ণিমার পরের কৃষ্ণাচতুর্থী তিথি। এজন্যই ঐ তিথিযোগে মায়ের পূজারও পত্তন হয় এবং উক্ত তিথি 'সঙ্কট-চতুর্থী' নামে আখ্যায়িত হয়। অবশ্য সঙ্কটতারিণী পূজা প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মতও প্রচলিত। অনেকের মতে রাঢ়বঙ্গে পূজিতা মা সঙ্কটতারিণী হলেন 'গ্রামদেবী' বা 'লৌকিক দেবী'। মহাভারতে উল্লিখিত সঙ্কটতারিণী দেবীর সাথে এই দেবীর কোন সাযুজ্য নেই। এ প্রসঙ্গে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা তাঁর 'রাঢ়ের গ্রাম দেবতা' পুস্তকের ১১২ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন, "সংকটতারিণীর পূজার উৎস নিয়ে বেশ কিছু জনশ্রুতি আছে। একদল বলে, রাজপুতানার রাঠোর বংশীয় কিছু রাজপুত মানসিংহের আমলে এদেশে আসে বারভুঁইঞা দমনে। তারাই এদেশে জমিভূমি পেয়ে নিজেদের দেবীকে প্রতিষ্ঠা করে সংকটতারিণী নামে। আরেক প্রবাদে শোনা যায়, জনৈক রাজপুত যুবা মল্লভূম-রাজ্যের ঘাটোয়াল নিযুক্ত হয় বর্তমান ভূতেশ্বর গ্রামের উত্তরপূর্বে প্রবাহিত দ্বারকেশ্বর-গন্ধেশ্বরীর সংগমস্থলে 'দোমোহনার ঘাটে'। তারই বধূ এই দেবীকে এনে এখানে পূজার্চনা করেছিল। অন্যত্র এক প্রবাদে শুনি, একদা মল্লরাজা দ্বিতীয় রঘুনাথের জনৈক রাজপুত সেনাপতি ছাতনার বিদ্রোহ-দমনে ভূতেশ্বরের পথ দিয়ে যাচ্ছিল। সে এখানে গাছতলায় বিশ্রাম নেয়। হঠাৎ তার চোখে পড়ে একটি কৌটো। সেই কৌটো থেকে যেন এক দেবী বেরিয়ে এসে বললেন, যুদ্ধে তার জয় নিশ্চিত। যুদ্ধজয়ী সেই সেনাপতিই নাকি দেবীকে তাঁর দর্শনীয় স্থানে এসে পূজা করেছিল। সেই থেকেই নাকি তাঁর পূজার প্রচলন। কিন্তু এসব নিছকই লোক-কাহিনী। এগুলির কোন ঐতিহাসিক মূল্য নেই। তবে এসব কাহিনী তাঁর মাহাত্ম্য-প্রচার ও রাজানুকূল্যলাভকে

ইঙ্গিত করে।"[১]

উক্ত পুস্তকের লেখকের মতে কৌটো পূজার মাধ্যমেই রাঢ়বঙ্গে সংকটতারিণী পূজার আদি সূচনা। বিষ্ণুপুর শহরের কুন্দকুন্দার বাজার মহল্লার সেনগলিতেও বছরে মাত্র একদিন 'সঙ্কট-চতুর্থী' তিথিযোগে মা সঙ্কটতারিণীর পূজা হয়। বাঁকুড়া সংলগ্ন ভূতেশ্বর অপভ্রংশে ভূতশহর গ্রামেও রয়েছে মায়ের থান বা অনাচ্ছাদিত বেদী। প্রায় তিন ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত একটি রূপার কৌটোতে মা থাকেন গুপ্ত অবস্থায়। কৌটো খোলা নিষেধ। প্রচলিত বিশ্বাস কৌটোর ভিতর অবস্থিত মায়ের মূর্তি দর্শন করলেই মৃত্যুমুখে পতিত হবে দর্শনকারী। বিষ্ণুপুরের ন্যায় বছরে মাত্র একদিন সঙ্কট-চতুর্থী তিথিতে মায়ের থানে ঘটস্থাপন করে উক্ত কৌটো প্রতীকটিকে সঙ্কটতারিণী রূপে পূজা করা হয় মহাসমারোহে। বছরের অবশিষ্ট দিনগুলিতে কৌটোস্থ দেবী থাকেন সেবাইতদের বাড়িতে, দেবীর নির্দিষ্ট কাঠের সিংহাসনে। গ্রামের সিংহ বংশীয় সেবাইতদের কুলদেবী রূপে তিনি পরিচিত হলেও গ্রামের সব মানুষই মায়ের পূজায় সামিল হন। এজন্য তিনি নিতান্ত পারিবারিক দেবী থেকে গ্রামদেবীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ক্রমশঃ।

রোগারোগ্য, বিপদ-আপদে সংরক্ষণ, শোক-প্রশমন, মামলা-মোকদ্দমায় জয়লাভ, বিবাহ- বাসনায় সফলকাম, বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ প্রভৃতি কামনাগুলি মা চরিতার্থ করেন বলেই ভক্তবৃন্দের বিশ্বাস। এ কারণে দিনে দিনে মায়ের মহিমা ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। সঙ্কটতারিণী পূজা উপলক্ষ্যে তাই বাঁকুড়ার ভূতেশ্বর গ্রামে এবং বিষ্ণুপুরের সঙ্কটতলায় সঙ্কটতারিণী মাতার মন্দির-প্রাঙ্গণে ভক্ত সমাগম হয় কাতারে কাতারে। পুজো করানো এবং মানসিক শোধের হিড়িক পড়ে যায় সেদিন।

পরিশেষে বলি, বিষ্ণুপুরে এবং মল্লভূমের গ্রামে গঞ্জে 'মনসার থান' ও মনসা মন্দির আছে অসংখ্য, অগণিত। কিন্তু সঙ্কটতারিণীর মন্দির নেই বললেই চলে। **বিষ্ণুপুর শহরের কুন্দকুন্দার বাজার মহল্লায় সঙ্কটতারিণী দেবীর ছোটখাটো মন্দির আছে একটি। এটিই বোধ হয় মল্লভূমে সঙ্কটতারিণী দেবীর একমাত্র মন্দির।** এই মন্দিরেও 'সংকট-চতুর্থী' তিথিযোগে দেবীর পূজা হয় সাড়ম্বরে—সে কথা বলেছি একটু আগেই। সঙ্কটতলার এই মন্দিরটি প্রকৃতপক্ষে মনসা মন্দির— সেকথা পূর্বেই বলেছি। কিন্তু আপামর জনমানসে সংকটতারিণী মাতার অসাধারণ প্রভাব প্রতিপত্তি বশতঃ এটি সঙ্কটতারিণী মাতার মন্দিররূপে প্রতিভাত এবং এই অঞ্চলটিও সঙ্কটতলা নামেই সুপ্রসিদ্ধ।

মা মনসার শ্রীচরণযুগলে এবং শ্রীশ্রীসঙ্কটতারিণী মাতার পাদপদ্মে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করি, আপনারা সঙ্কটমুক্ত হয়ে অনাবিল শান্তিতে সমৃদ্ধ জীবনযাপন করুন। এখন আমরা এগিয়ে যাব 'মিশন ডাঙা' অভিমুখে। সেখানে রয়েছে একটি গীর্জা। গীর্জা দেখব, শুনব খৃষ্টধর্ম ও যীশুখৃষ্টের কথা। চলার পথে একটি বিতর্কিত বিষয়ের ওপর আলোকপাত করব। বিতর্কের বিষয়ে হল,—**'বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা কি বাগ্দী বংশীয়?'**

---

১. রাঢ়ের গ্রামদেবতা, পৃঃ—১১২-১১৩

অধ্যায়-৬৫

মল্লভূমের মল্লরাজারা কি বাগ্দী বংশীয়?

পূর্বোক্ত বিষয়ে ঐতিহাসিক, গবেষক, লেখক এবং চিন্তাবিদ্‌গণ দ্বিধারায় বিভক্ত। একদল ভোট দিয়েছেন বাগ্দী রাজার স্বপক্ষে, অপরদল ভোট দিয়েছেন বিপক্ষে। যাঁরা বাগ্দী রাজার পক্ষে রয়েছেন তাঁদের মধ্যে 'পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া' পুস্তকের লেখক **তরুণদেব ভট্টাচার্য** তাঁর পুস্তকের ৭৩ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "ক্ষত্রিয় উপাধি 'সিংহ' ব্যবহার করার আগে বিষ্ণুপুরের রাজারা দীর্ঘদিন ধরে 'মল্ল' পদবী ব্যবহার করে এসেছেন। তাঁরা বাংলার সর্বত্র বাগ্দী রাজা নামে পরিচিত ছিলেন। ভারতে যুদ্ধ ব্যবসায়ী জাতিরা ক্ষত্রিয় হিসেবে পরিচিত। মল্লেরা সুদীর্ঘকাল স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার জন্য ও শৌর্য বীর্যে গৌরবান্বিত হবার ফলে ক্ষত্রিয় হিসেবে মান্য। **জন্মসূত্রে উত্তর ভারতের রাজপুত পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের কথা নেহাতই কিংবদন্তি।**"

এ প্রসঙ্গে 'বাঁকুড়াজনের ইতিহাস—সংস্কৃতি' পুস্তক প্রণেতা **শ্রীরথীন্দ্রমোহন চৌধুরী** উক্ত পুস্তকের ৬২ পৃষ্ঠায় মত পোষণ করেছেন,—

"বর্তমান বাঁকুড়া জেলার পূর্বাংশের বিশাল বিস্তীর্ণ অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল মধ্য যুগের মল্লভূম। দ্বাদশ শতাব্দীতে বীরগুণের কোটাটবী রাজ্য ভেঙে পড়ার পর মল্লভূমে ছোট বড় কয়েকটি স্থানীয় সর্দার শাসিত রাজ্যের উদ্ভব ঘটেছিল বলে মনে হয়। এ ধরনের একটি রাজ্য ছিল জয়পুর থানার প্রদ্যুম্নপুর বা পদুমপুর। পদুমপুরের অধীনস্থ একটি করদ রাজ্যের পত্তন ঘটেছিল ইন্দাস (প্রাচীন ইন্দ্রহাস) থানার যোথবিহারে। কোতুলপুর থানার লাউগ্রামে এক মল্ল বাগদি সর্দারের নেতৃত্বে প্রদ্যুম্নপুরের অনুগত আরেকটি রাজ্য স্থাপিত হয়। দেয় খাজনা আদায় দিতে অস্বীকার করায় প্রদ্যুম্নপুর-রাজের পক্ষ নিয়ে লাউগ্রামের মল্ল বাগদিরাজ সামরিক শক্তিবলে যোথবিহাররাজ্য দখল করে নেন; ও পরে উপরস্থ শক্তি প্রদ্যুম্নপুরের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করে এ অঞ্চলের অবিসংবাদিত শক্তিতে পরিণত হন। এরপর বন-বিষ্ণুপুরে মল্লরাজধানী স্থানান্তরিত হয়।"

'বাঁকুড়ার মন্দির মসজিদ গির্জা' পুস্তকের লেখক শ্রদ্ধেয় **প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়** এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "মল্লরাজবংশের রাজত্বকাল বাঁকুড়ার ঐতিহাসিককাল বলে সূচিত হলেও এই রাজবংশের উৎপত্তি তথ্য কিম্বদন্তি নির্ভর। **উইলিয়াম হান্টার, ডব্লু. বি. ওল্ডম্যান., জে. বার্জেস, সি. স্টুয়ার্ট, ইলিয়াট প্রমুখ গবেষকগণ এই রাজবংশের উৎপত্তি বিষয়ক কিম্বদন্তিগুলির ওপর দীর্ঘ গবেষণা করেছেন। বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে এইসব কিম্বদন্তি অংশবিশেষ প্রকাশিত হয়েছে। কিম্বদন্তিগুলিতে প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে, মল্লরাজবংশ উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয় বংশজাত। কিন্তু নৃতাত্ত্বিক অনুসন্ধান করে দেখেছেন উপাধি 'মল্ল' শব্দটি অনার্য রক্ত মিশ্রিত বাগ্দী ও মাল উপজাতির। এমতাবস্থায় মল্লরাজবংশকে ক্ষত্রিয় বংশজাত বলা যায় না।**" (পৃঃ—৩৪-৩৫)

'পশ্চিমবাংলার তীর্থ' গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রদ্ধেয় **প্রলয় সেন** তাঁর পুস্তকের ২২৯ পৃষ্ঠাতে এ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "**কোন কোন ঐতিহাসিকের মত 'মল্লভূম' শব্দের উৎপত্তি 'মল্ল' জাতি থেকে। 'মল্ল' বা 'মাল' একটি প্রাচীন জাতি। এদেরই একটি সম্প্রদায় পাটলিপুত্রের**

প্রাচী রাজ্যের পূর্বাঞ্চল থেকে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। **বর্ধমান-বাঁকুড়ার 'বাগদী-সম্প্রদায়' এই মল্লজাতিরই একটি শাখা। এই বাগদী সম্প্রদায়ভুক্ত 'মল্ল' জাতি অধ্যুষিত বাঁকুড়ার এতদ্ অঞ্চল কালক্রমে 'মল্লভূম' নামে পরিচিত হয়। যে-কারণে বহুকাল ধরে মল্লরাজারা সাধারণের কাছে 'বাগ্দীরাজা' হিসাবেই পরিচিত ছিলেন।"**

আবার **অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়** তাঁর 'বাঁকুড়ার মন্দির' গ্রন্থের ১৮ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন, " ....বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট্ গেজেটিয়ারে একথা উল্লিখিত হয়েছে যে লাউগ্রাম অঞ্চলের জনসাধারণের কাছে আদি মল্ল অদ্যাবধি 'বাগদী রাজা' নামে পরিচিত এবং 'বাগদী রাজা'র নানা কীর্তি কলাপের জনশ্রুতি লাউগ্রাম পরগনায় আজ অবধি শুনতে পাওয়া যায়। আদি মল্লের ক্ষত্রিয় কুলপরিচয় যদি সন্দেহাতীত হত, তাহলে তার ঘরের লোকের কাছেও তিনি এতদিন ধরে 'বাগদী রাজা' বলে কেন পরিচিত হবেন এ-প্রশ্নের কোন সদুত্তর নেই।

বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারে রক্ষিত পুঁথিপত্র থেকে একথাও জানা যায় যে আদি মল্ল বংশপরম্পরার চতুর্থ পুরুষের নাম ছিল **কালু মল্ল**, ষষ্ঠ পুরুষের **কাউ মল্ল** ও সপ্তম পুরুষের **ঝাউ মল্ল। এগুলি স্পষ্টতই অনার্য** নাম।

কিংবদন্তীতে আদি মল্লের ভূমিষ্ঠ হওয়ার কাল ৬৯৫ অথবা ৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দ বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। তিনি কুড়ি বৎসর বয়সে রাজা হয়ে তেত্রিশ বৎসর রাজত্ব করে থাকলে, এ-বংশের দ্বিতীয় পুরুষের সিংহাসন প্রাপ্তির কাল ৭৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি হওয়া সম্ভব। অতএব, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও সপ্তম পুরুষেরা খ্রীষ্টীয় নবম কি দশম শতাব্দীর লোক। সে-সময়ে উত্তর ভারতের কোনো ক্ষত্রিয় রাজার কালু বা কাউ বা ঝাউ নাম হওয়া এক অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার। অথচ, উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয় রক্ত যে দৈববাহিত হয়ে বিষ্ণুপুরের অরণ্য অঞ্চলে এসে আর এক ক্ষত্রিয় বংশের উৎপত্তির কারণ হয়েছিল, কিংবদন্তীগুলিতে সে-কথাই বলবার চেষ্টা করা হয়েছে।

মল্ল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা যে স্থানীয় আদিবাসী সমাজেরই কোনো প্রতাপশালী নেতা সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। বঙ্গ সীমান্ত অঞ্চলের বাগদী, বাউড়ি, মাল, ধীবর, ডোম প্রভৃতিরা চিরকালই রণনিপুণ। একেবারে আধুনিক কাল ছাড়া, এ-নিপুণতা প্রায় অব্যাহতই ছিল বলা যায়। বাংলাদেশের অন্য অঞ্চলের কৈবর্ত, নমঃশূদ্র প্রভৃতিরাও শৌর্য-বীর্যে একদা প্রসিদ্ধ ছিল। এরাই আবহমানকাল বাঙালীর সেনাবাহিনী গঠন করেছে। এদের লাঠি-সড়কির প্রতাপের কাছে শক্তিশালী প্রতিপক্ষও হার মেনেছে বহু ক্ষেত্রে। দূর অতীতে বাঁকুড়া অঞ্চলের এই সামরিক সম্প্রদায়গুলিকে সংগঠিত করে স্থানীয় কোনো সর্দার হয়তো এক রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁরই বংশ, বিষ্ণুপুরের রাজ-পরিবার, পরবর্তীকালে **পশ্চিমবঙ্গের স্বাধীন রাজবংশগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন।"**

পক্ষান্তরে ফরাসী পর্যটক **আবে রেনল** (Abbe Raynal) বিষ্ণুপুর প্রসঙ্গে বলেছেন, "This fortunate spot, which extends about a hundred and sixty miles, is called Bissenpore. **It has been governed time immemorial by a Brahmin family of the tribes of Rajaputs."**

মিস্টার হলওয়েল (Mr. Holwell) বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির গভর্নর ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে

প্রকাশিত তাঁর Interesting 'Historical Events' গ্রন্থে এ বিষয়ে লিখেছেন, **"To the west of Burdwan, something northerly lie the lands belonging to the family of Raja Gopal Singha, of the Rajpoot Brahmin tribe;...."**.

আবার 'চিত্রে ও গল্পে বিষ্ণুপুর' গ্রন্থের রচয়িতা **বিভূতিভূষণ ঘটক** মহাশয় বিষ্ণুপুরের রাজ পরিবারকে ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত বলে উল্লেখ করেছেন। 'মল্লভূম কাহিনী' গ্রন্থ-প্রণেতা গঙ্গাগোবিন্দ রায় এঁদের বংশ-পরিচয় প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বিষ্ণুপুরের রাজারা নিজেদের নামের শেষে অনেক দিন ধরে '**মল্ল**' এই উপাধি ব্যবহার করতেন কিন্তু শেষের কয়েকজন রাজা 'সিংহ' উপাধি লিখতেন। **ভারতবর্ষের মল্লরা খুব পুরানো যোদ্ধার জাত বলে আমাদের মনুসংহিতা গ্রন্থে লেখা আছে।" নগেন্দ্রনাথ বসু** সম্পাদিত 'বাংলা বিশ্বকোষ' গ্রন্থের ১৯ নম্বর খণ্ডের ১২২ পৃষ্ঠায় বিষ্ণুপুরের রাজবংশের উৎপত্তি বিষয়ক কিংবদন্তীকেই সমর্থন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, "বৃন্দাবনের নিকটবর্তী জয়পুরের এক রাজবংশের শাখা হইতে বিষ্ণুপুরের প্রাচীন রাজবংশ আসিয়াছেন বলিয়া প্রবাদ।" এরপর কিংবদন্তীটি গল্পাকারে তিনি পরিবেশন করেছেন আনুপূর্বিক। **অর্থাৎ বিষ্ণুপুরের রাজ পরিবার যে উত্তর ভারতের জয়পুরের রাজবংশের বংশধর সে বিষয়ে সহমত পোষণ করেছেন মৃদুভাবে।** 'History of Bishnupur-Raj' পুস্তক প্রণেতা শ্রদ্ধেয় **অভয়াপদ মল্লিক** তাঁর পুস্তকের ৯ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, **"It is said that Raghunath was a son of the Kshatriya Raja (Rundel family) of Joynagar (Ranth Bhramar Garh) near Brindaban.** The deposed Raja and the queen were on their way to Puri on pilgrimage. The queen was pregnant and was about to give birth to a child when they were near the old site to Kotalpor. They arrived at a village called Lougram (6 miles from Kotalpur) and there the Raja placed his wife under the care of a Brahman named Manahar Panchanan and a Kayastha named Bhagirath Guha. He also left his sword named Joysankar for the protection of his wife. Then the Raja hurriedly proceeded towards his destination, never to return. The queen gave birth to a son who was named Raghunath and died a few days after her delivery. Raghunath was placed under the care of a Bagdy mother till he attained his boyhood. Then the boy lived with the sons of Manahar Panchanan under the same roof and had his education with them in the same institution. He grew up strong in physique; and in the course of a few years became such a wrestler that there was no match for him in the whole neighbourhood. Thus he was called the first wrestler of Adi Malla."

গবেষক মাণিকলাল সিংহ তাঁর 'পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি' পুস্তকের ১২০ পৃষ্ঠাতে মল্লরাজবংশ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া জেলার মল্লরাজবংশ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে প্রথমতঃ ছান্দাড় পরিমণ্ডলের রাজবংশ এবং তৎপরে

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের কথা বলিতে হয়। পদবী, গোত্র, প্রবর এবং কৌলিক সংস্কারের নজিরে দেখা যায় যে এই দুই মল্লরাজবংশ মূলতঃ এক এবং অভিন্ন। হয় **ছান্দাড়ের মল্লরাজবংশ হইতেই বিষ্ণুপুরের মল্লরাজবংশের উদ্ভব ঘটিয়াছে, নয় একই মল্লরাজবংশের এক শাখা ছান্দাড় পরিমণ্ডলে এবং অপর শাখা বিষ্ণুপুরে রাজত্ব করিয়াছে।** আবার এই মল্লরাজবংশের প্রধানমন্ত্রী মহাপাত্র বংশগুলির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে মল্লরাজাদের মহাপাত্র বংশের সহিত উড়িষ্যার চোড়গঙ্গ রাজাদের প্রধানমন্ত্রী বা মহাপাত্র সাহিত্য দর্পণ প্রণেতা বিশ্বনাথ কবিরাজের বংশ ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। আরও বলা যায় যে বাঁকুড়া জেলার মল্লরাজবংশ এবং তাঁহাদের প্রধানমন্ত্রী বা মহাপাত্র বংশের মধ্যে এমন কতকগুলি কৌলিক সংস্কার প্রচলিত রহিয়াছে যাহার নজিরে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে চোড়গঙ্গ রাজা নরসিংহ ২য়ের অভিভাবক নরহরিতীর্থের পরবর্তী কোন এক সময়ে বাঁকুড়া জেলার মল্লরাজবংশ এবং তৎসঙ্গে তাঁহাদের প্রধানমন্ত্রী—মহাপাত্র বংশের আগমন ঘটিয়াছে।"

'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী' গ্রন্থের লেখক **ফকিরনারায়ণ কর্মকার** 'মল্লভূমের মল্লরাজাগণ যে বাগ্দী বংশীয় নন'—এ বিষয়ে কতকগুলি যুক্তির অবতারণা করেছেন এবং 'মল্লরাজারা বাগ্দী বংশীয়' এই দাবিদারদের মত খণ্ডনে প্রয়াসী হয়ে নিম্নোদ্ধৃত যুক্তিসমূহ স্থাপন করেছেন তাঁর পুস্তকের একুশ পৃষ্ঠায়।

"প্রথমত—বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদিপুরুষ যদি ঐমত বাগ্দী, বাউরী, মাল প্রভৃতি তথা কথিত নিম্নবর্ণের জাতি হতেন, তাহলে বিষ্ণুপুর রাজবংশের কুল-পুরোহিত মহাপাত্র বংশের প্রতিষ্ঠাতা. সৎ ব্রাহ্মণ হয়ে, কিছুতেই ঐমত নিম্নবর্ণের জাতির পুরোহিতের পদ গ্রহণ করতেন না। গ্রহণ করলে, সেকালের ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজ তা মেনে নিতেন না।

দ্বিতীয়ত—কেহ যদি বলেন, নিম্নবর্ণের জাতি হলেও তিনি অতি দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিলেন, জোর করে তিনি ঐ সৎ ব্রাহ্মণকে তাঁর পুরোহিতের পদ গ্রহণ করাতে বাধ্য করেছিলেন এবং জোর করেই তিনি সেকালের ব্রাহ্মণ ও উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজকে তা মেনে নিতে বাধ্য করেছিলেন—এক কথায় যাকে বলা যায় অসম্ভব। কারণ রাজা, মহারাজা দূরের কথা, সেকালের সম্রাটেরা পর্যন্ত ব্রাহ্মণদের শ্রদ্ধা ও ভয় করতেন।

তার ওপর সারা ভারতে তখন হিন্দুর একচ্ছত্র আধিপত্য। আর আদি মল্লের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী বড় রাজা তখন ভারতবর্ষের বহুস্থানে ছিলেন। আর তাঁরাই ছিলেন হিন্দুজাতির সমাজ, ধর্ম প্রভৃতির রক্ষাকর্তা। তাই জোর করে কোন ধর্ম বিরুদ্ধ বা অসামাজিক আচরণ করা কারও পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না।

তৃতীয়ত—তাই যদি কেহ ধারণা করে থাকেন, জোর করেই তিনি সব কিছু করেছিলেন, তাহলে সেখানেইত উচ্চবর্ণের অধিকার অর্জন করে উচ্চ জাতিতে তিনি পরিণত হয়েছিলেন। তাহলে অলৌকিক উপায়ে স্থানীয় বাগ্দী রাজাদের আধিপত্যের বিলোপ ঘটিয়ে, সেখানে উত্তর ভারতের ক্ষত্রিয় বংশের কষ্টকল্পিত কাহিনী সৃষ্টি করা হয়েছে বলে উক্ত গ্রন্থে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

চতুর্থত—তিনি যদি সব কিছু জোর করেই করে থাকেন, তাহলে লাউগ্রামের অধিবাসীরা তাঁকে যে 'বাগ্দী রাজা' বলে থাকে বলা হয়েছে, জোর করে তাও তিনি বন্ধ করে দিতে পারতেন।

কিন্তু তা নয়। ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই তিনি মা হারা হয়ে, তাঁর পালনকারিণী বাগ্দী মায়ের কোলে, বাগ্দী জাতির গৃহে প্রতিপালিত হয়েছিলেন বলে কেহ কেহ তাঁকে 'বাগ্দী রাজা' বলে থাকেন।

কিন্তু বিষ্ণুপুর রাজবংশের ঐমত বাগ্দী, বাউরী, মাল প্রভৃতি তথাকথিত নিম্নবর্ণের জাতি হতে উদ্ভব হলে, রাজপুত জাতি বা রাজপুত রাজাদের মধ্যে তা গোপন থাকত না। আর তাহলে ময়ূরভঞ্জ, মহেশপুর, বরাহভূম প্রভৃতির নামকরা রাজপুত রাজারাও তাঁদের সঙ্গে সামাজিক আদান-প্রদান করতে আগ্রহ প্রকাশ করতেন না, বা আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হতেন না। মহারাজ বীরসিংহদেব বরাহভূমের রাজকন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, মহারাজ চৈতন্যসিংহদেব ময়ূরভঞ্জের রাজদুহিতাকে বিবাহ করেছিলেন। তারপর গোড়ার দিকেও দেখা যায়, দ্বিতীয় রাজা জয়মল্ল চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা দীনুসিংহের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন, তৃতীয় রাজা বেণুমল্ল মতিহার সিংহের কন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন প্রভৃতি।

পঞ্চমত—বিষ্ণুপুর রাজবংশ, রাজপরিবার ও তাঁদের আত্মীয় স্বজনদের রাজপুত আচার-ব্যবহার, রীতি নীতি এখনও সম্পূর্ণভাবে বর্তমান। কেহ যদি বলেন হাজার বারশ বৎসর ধরে এসবই তাঁদের পরিকল্পিত ব্যাপার, তাহলে বিষ্ণুপুর রাজবংশের ষষ্ঠ ও সপ্তম পুরুষ প্রভৃতির নাম ধরে তাঁদের যে অনার্য জাতি বলে মন্তব্য করা হয়েছে, পরিকল্পনা করে সে নাম বদলে অন্য ভাল নাম তাঁরা দিতে পারতেন. আর নাম ধরে জাতি নিরূপণ করাও সম্ভব বলে মনে হয় না। কারণ আমাদের এখানেই বহু হিন্দুর নাম এবং উপাধি মুসলমান সূচক আছে। তাহলে তাদের কি আমরা মুসলমান বলব? তা নয়। অনেকের অনেক কারণবশত খাপছাড়া নাম থাকে। **আসল সত্য হচ্ছে বিষ্ণুপুর রাজবংশের আদিপুরুষ আদিমল্ল রাজপুত সন্তান**। তাই, দেখতে তিনি খুবই প্রিয়দর্শন ছিলেন। আর অতি কিশোর বয়স হতেই তার রাজপুত-সুলভ স্বভাব পরিস্ফুট হয়। বিষ্ণুপুরের মহাপাত্রবংশের আদি পুরুষ, তাঁর প্রতিপালক পঞ্চানন ঘোষালের গোচারণ করতে গিয়ে তাঁর সহচর আরও সব রাখাল বালকদের নিয়ে সেখানে তিনি শরীরচর্চা ও যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করতে আরম্ভ করেন এবং সেই বিদ্যায় আশ্চর্যজনকভাবে সফলতাও অর্জন করেন। যার জন্য দুর্ধর্ষ যোদ্ধার জাতি সাঁওতালেরা পর্যন্ত তাঁর প্রতি এমন আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, যার ফলে পরবর্তীকালে তাদের সাহায্যে তিনি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আর তার জন্য সাঁওতালদের নিয়ে ইন্দ্রদ্বাদশী তিথির ইন্দ্রপূজা বা ইন্দপর্ব, বিষ্ণুপুর রাজপরিবারের এক বিশিষ্ট উৎসব। এবং তাদের নিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠার উপরোক্ত কাহিনী যে সত্যতার প্রমাণ, ঐ ইন্দ্রপূজা বা ইন্দপর্ব উৎসবে সমবেত সাঁওতালদের কাছ থেকে রাজা হিসেবে ভেট্ নেওয়ার পরিবর্তে, তাদের সাহায্যে মল্লভূম রাজ্য প্রতিষ্ঠার কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁদের সর্দারদের হলদে রংয়ের পাগড়ী উপহার দেওয়ার প্রথা। আর ঐ ইন্দ্রদ্বাদশী তিথিতে আদিমল্লের মল্লভূম রাজ্য প্রতিষ্ঠার দিন থেকে মল্লাব্দ আরম্ভ হয়েছিল বলে, সেই দিনে বিষ্ণুপুর রাজ-দরবারে আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত মল্লাব্দ ঘোষণা করা হত। এখানের চলতি ভাষায় তাকে বলা হয় **'সনপেটা'**। এখানের পণ্ডিত উপাধিধারী বুড়োধর্মরাজ দেবতার পূজারী কর্মকার মহাশয়েরা ঘোষণা করতেন উক্ত অব্দ। ....

সেইজন্য সব দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায় বিষ্ণুপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা স্থানীয় আদিবাসী সমাজের কোন একজন প্রতাপশালী নেতা, বাগ্দী, বাউরী, মাল, ধীবর,

ডোম প্রভৃতি রণনিপুণ সম্প্রদায়গুলিকে সংগঠিত করে তাদের নিয়ে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে বলে যে মন্তব্য করা হয়েছে—তা 'সম্পূর্ণ অবাস্তব'। অন্যান্য দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতি বিভিন্ন দিক দিয়ে বাংলার সংস্কৃতি ভাণ্ডারকে যেভাবে তাঁরা পূর্ণ করে গেছেন এবং ধর্ম, দান, সুশিক্ষা, সুবিচার, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে পক্ষপাতিত্বশূন্যভাবে প্রজাপালন প্রভৃতি যে মহৎ দৃষ্টান্ত তাঁরা রেখে গেছেন, সেও জন্মসূত্রে প্রাপ্ত কোনো গৌরবময় উত্তরাধিকার ব্যতীত সম্ভব হয় না।"(পৃঃ— ২১-২৩)

প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় মল্লরাজাদের 'রাজপুত ব্রাহ্মণ' বলেছেন। তাঁর 'কালের কাণ্ডারী' উপন্যাসে এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "রাজা গোপাল সিংহ। সেই রাজপুত ব্রাহ্মণের রাজত্ব সীমা কীভাবে মাপা যাবে? খুব সহজে। ষোল দিনের ভ্রমণসীমা।"

এখন দেখা যাক, যে মল্লরাজবংশকে বাগ্দী বংশীয় বলা হয়েছে সেই বাগ্দী জাতির দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সাথে মল্লরাজবংশীয়দের দৈহিক এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কতখানি সাদৃশ্য আছে। গবেষক **মাণিকলাল সিংহ** তাঁর লেখা 'রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি' পুস্তকের প্রথম খণ্ডে বাগ্দী জাতি সম্বন্ধে যা লিখেছেন তার সারমর্ম এরূপ—

নিকষ কালো পাথরের কুঁন্দার মত তৈলচিক্কন দেহ, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরী চুল, হাতে নিরেট বাঁশের লাঠি ইত্যাদি। রাঢ়ের বিভিন্ন জাতিগুলির মধ্যে বাগ্দীরা অত্যন্ত স্বাধীনতা প্রিয়। বাগ্দী জাতির মানুষ কারো তাঁবেদার হয়ে বসবাস করে না। তাই বলা হয়েছে—

বাঘ বাগতি হড়িয়াল পাখী।
পোষ মানে না এ তিন জাতি॥

মৎস্যজীবী কেয়ট জাতিরই একটি উপভাগ হল বাগ্দী জাতি। রাঢ়ের বাগ্দীদের মধ্যে রাউত, লাঢ়া, লাড়ু, প্রতিহার, দিগর, সর্দার প্রভৃতি পদ-পদবী প্রচলিত। বাগ্দীদের মধ্যে প্রচলিত গোত্র শাণ্ডিল্য, কশ্যপ, শঙ্খ, পলাশ, বাঘ, কাল, পুকুড়ি, বক, কাঠ-ফড়িং, চড়ুই, চাঁদ ইত্যাদি।

উপরোক্ত প্রবাদ থেকে এবং উক্ত জাতির মধ্যে প্রচলিত পদ-পদবীতে এবং টোটেমে[১] বাগ বা বাঘ শব্দের ব্যবহার হতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে বাঘের সঙ্গে বাগ্দীর প্রকৃতির সাদৃশ্য বিদ্যমান। **বাগ + তি = বাগতি বা বাগ্দী। অষ্ট্রীক ভাষাতে তি শব্দটির অর্থ নদী। এজন্যই বলা হয় বাগ আর নদীর হিংস্র ক্রুর চরিত্রই বাগ্তিদের পদবীর মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। বাগতিদের মত দুঃসাহসী, দুর্ধর্ষ জাতি রাঢ়ে আর দুটি নাই।**

সাধারণতঃ নদ-নদী, খাল-বিলের তীরে বাগ্দীদের বসবাস ছিল। পরবর্তীকালে জাতি-হিন্দুদের বাসগৃহের ধারেপাশেও বাগ্দীরা বসবাস করেছে। মৎস্যশিকারী জাতি হিসেবে খাল-বিল, নদ-নদী, ঝোপঝাড়ের মধ্যে সর্বদা বিচরণের জন্য বাগ্দী নর-নারীর ভাগ্যে সর্প-দংশন জনিত মৃত্যু হত হামেশা। সর্পভীতির জন্য মৎস্যজীবী বাগ্দীদের কুলদেবী হলেন মনসা। রাঢ়বঙ্গের সর্বাপেক্ষা বিষধর সর্প কেউটে সাপের নামানুসারে মৎস্য-শিকারী এক বাগ্দী গোষ্ঠীর পদবী হয়েছে কেয়ট বা কেওট। মনসা ছাড়াও বাগ্দীরা লুইচাঁদ,

১. টোটেম (totem)—বৃক্ষ, জন্তু ইত্যাদির যে মূর্তি মানুষেরা কুসংস্কার বশে পূজা করে থাকে।

ক্ষেত্রপাল, কুদ্রা প্রভৃতির পূজা করে থাকে। শিব ও ধর্মের গাজনে বাগ্দীরা চড়ক, বাণফোঁড়, আগুন-সন্ন্যাস ইত্যাদি নির্যাতন মূলক ধর্মীয় আচার পালন করে। বাগ্দীরা মধ্যযুগে রাঢ়বঙ্গের সামন্ত রাজাদের সৈন্যবিভাগে কাজ করত। সামন্ততন্ত্রের অবসানের সাথে সাথে ওরা বাংলার জমিদার গোষ্ঠীগুলির সম্পত্তি ও দেহরক্ষীর কাজে নিযুক্ত ছিল। লাঠি খেলা, লগী ঠেলাতে এরা বিশেষ পারদর্শী ছিল। বর্তমানে **"দেশের কোটি কোটি নিরন্ন লোকের মতই শীর্ণ দেহে ন্যুব্জপৃষ্ঠে বাগ্দী যুবক-যুবতী জীবনের ভার বহন করিতেছে। শুধু নামটি ভেঙচি কাটিয়া বলিতেছে, বাগ + তি = বাগতি।"** রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (১ম খণ্ড), (পৃঃ—২২৯)

এবার আসা যাক মল্লরাজবংশীয়দের দৈহিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথায়। **প্রথমতঃ**—এঁরা সুশ্রী, সুঠাম, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ এবং দিব্যকান্তিযুক্ত দেহাবয়বের অধিকারী। বিষ্ণুপুর রাজবংশ এবং বিষ্ণুপুর রাজবংশের একটি শাখা কুচিয়াকোল রাজবংশের ব্যক্তিবর্গকে দেখলেই উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়। **দ্বিতীয়তঃ**—এঁদের মূল উপাধি মল্ল। মল্ল-যোদ্ধা থেকেই এসেছে এই উপাধি, বর্ণেতর মাল জাতি থেকে নয়। এঁদের গোত্র **রাজর্ষি** এবং দৌহিত্র সূত্রে রাজা কালীপদ সিংহ ঠাকুরের গোত্র **বিজয়পাণি**। এঁরা উপবীত ধারণ করেন। **তৃতীয়তঃ**—মল্লরাজ্যের গোড়াপত্তনের কাল থেকেই এঁদের কুলদেবতা অনন্তদেব অর্থাৎ স্বয়ং বিষ্ণু এবং কুলদেবী হলেন মা মৃন্ময়ী, অর্থাৎ দেবী দুর্গা,—বাগ্দী জাতি পূজিত কোন অনার্য দেবদেবী নন। **চতুর্থতঃ**—এঁরা ক্রুর বা হিংস্র প্রকৃতির নন আদৌ। বরং এঁরা সৃষ্টিধর্মী। **পঞ্চমতঃ**—এঁরা জেদী বা অকারণে একগুঁয়ে প্রকৃতির নন। এঁদের চরিত্রে নমনীয়তা, কমনীয়তা এবং গ্রহণ-যোগ্যতা প্রভৃতি মহৎগুণ বিদ্যমান। যার জন্য মহারাজ বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে মাথা নত করে দীক্ষা গ্রহণান্তে পরম বৈষ্ণবে রূপান্তরিত হয়েছেন অনায়াসে। যা কিছু ভাল, আদরণীয়, গ্রহণীয় এবং বরণীয় তা এঁরা গ্রহণ এবং বরণ করতে দ্বিধা করেননি জেদের বশবর্তী হয়ে। **ষষ্ঠতঃ**—এঁদের রুচি, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, শিল্পানুরাগ, সহনশীলতা, চারিত্রিক মাধুর্য সবই খুবই উন্নত ধরনের। **সপ্তমতঃ**—এঁদের পারিবারিক ভাষা রাজস্থান প্রভাবিত হিন্দী। তাই দেখা যায় এঁরা নিজেদের মধ্যে অদ্যাপি যে সব সম্বোধন-সূচক শব্দ ব্যবহার করেন তা হল এরূপ—পিতাজী, মাতাজী, দাদাজী, দাদীজী, নানাজী, নানীজী, মুসাজী, মুসীজী, ফুফাজী, ফুফীজী, দুলহাজী, দুলহনজী, ভাভীজী, চাচাজী, চাচীজী, নুনু, মুন্না, প্রভৃতি। **অষ্টমতঃ**—এঁদের গভীর ঈশ্বর-প্রেম তথা কৃষ্ণ-বিষ্ণু-প্রেম, প্রগাঢ় প্রজা-প্রেম—যেমন দুর্ভিক্ষের সময় মহারাজ চৈতন্য সিংহদেবের নগরদেবতা মদনমোহনকে বন্ধক রেখে টাকা এনে প্রজা-সাধারণের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া, প্রজাসাধারণের কল্যাণার্থে এবং রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে রাণী চন্দ্রপ্রভার চারিত্রিক দৃঢ়তা, পতিঘাতিনী সতী হওয়ার দৃষ্টান্ত, এবং দানশীলতা প্রভৃতি রাজোচিত মহৎগুণাবলী এঁদেরকে প্রজাপালক তথা রাজার জাতি হিসেবেই স্বীকৃতি দেয় নির্দ্বিধায়।

বিষ্ণুপুরের রাজবংশীয়গণ যে জাতিতে রাজপুত তা প্রমাণ করতে সচেষ্ট হয়ে **ফকির-নারায়ণ কর্মকার** তাঁর 'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী' গ্রন্থের আটাশ পৃষ্ঠাতে আরো লিখেছেন, "....তাঁরা যে রাজপুত, রাজপুতনা থেকে এসেছেন, তার প্রমাণ এই বর্তমানকালেও প্রচুর।

রাজপুতদের মধ্যে শিশোদীয়, চৌহান, রাঠোর, চান্দেল, প্রমার প্রভৃতি বিভিন্ন গোষ্ঠী বর্তমান। বিষ্ণুপুরের মূল রাজবংশের অধিপতিদের রাজত্বকালে তাঁদের অনেক গোষ্ঠী এখানে এসেছেন, এঁদের সঙ্গে আত্মীয়তা সূত্রে আবদ্ধ হয়ে এখানে বসতি স্থাপন করেছেন। **তার প্রমাণ, মহারাণা প্রতাপ সিংহের শিশোদীয় গোষ্ঠীর সন্তান বর্তমান রাজা বাহাদুর মহামান্য কালীপদ সিংহঠাকুর, বিষ্ণুপুর রামশরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ দেবব্রত সিংহঠাকুর। এখনও এঁরা রাজস্থানে উদয়পুরের ঠাকুর সাহেব বলে পরিচিত।** কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত এঁদের পরস্পর গোষ্ঠীর সংযোগ সাধনকারী যে ভাট রাজস্থান থেকে এখানে আসতেন, তাঁদের কাছেও এঁরা ঐ নামে পরিচিত। **এঁরা মহারাণা প্রতাপসিংহের শিশোদীয় গোষ্ঠীভুক্ত। এঁদের গোত্র বিজয়পাণি। বিষ্ণুপুরের মূল রাজবংশ চৌহান। এঁদের গোত্র রাজর্ষি।** তারপর বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থান ময়নাপুর, রঘুনাথপুরে রাঠোর; দাঁতনে, মেদিনীপুরে চান্দেল ; হরেকৃষ্ণপুরে প্রমার এবং পুড়াকোন্দায় শিশোদীয় গোষ্ঠী বর্তমান। এবং এখনও এঁরা রাজস্থানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। বিষ্ণুপুরের মূল রাজবংশের সন্তান, বিষ্ণুপুর কেল্লার অধিবাসী মাননীয় **বীরেন্দ্রসিংহদেব**[১] আত্মীয়তার সূত্র নিয়ে এখনও রাজস্থান যাতায়াত করেন।"

এসব দৃষ্টান্ত থেকে সহজ-সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মল্লভূমের মল্লরাজারা বাগ্দীবংশীয় নন আদৌ।

এ বিষয়ে মাননীয় **অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য** মহাশয় তাঁর **'মৌন-মুখর বিষ্ণুপুর'** গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন **'কিংবদন্তীর অন্তরালে'** অধ্যায়ে। উক্ত অধ্যায় থেকে 'বাগ্দী রাজা' প্রসঙ্গে আরো কিছু কথা শোনাই আপনাদের।

আদি মল্ল বা রঘুনাথ মল্লের প্রতিপালক ছিলেন পঞ্চানন ঘোষাল নামক জনৈক ব্রাহ্মণ। আদি মল্লের রাজত্বকাল ছিল ৬৯৪-৭১০ খৃষ্টাব্দ। ঐ সময় বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের বসবাস ছিল না বলে অভিমত পোষণ করেছেন কয়েকজন ঐতিহাসিক সহ শ্রদ্ধেয় অভয়াপদ মল্লিক মহাশয়ও। এই যুক্তি খণ্ডনে প্রয়াসী হয়ে পূর্বোক্ত অমরশঙ্কর ভট্টাচার্য মহাশয় লিখেছেন—"অভয়াপদ মল্লিক তাঁর 'History of Bishnupur Raj' গ্রন্থে আদি মল্লের আমলে বাংলা দেশে ব্রাহ্মণের অস্তিত্বেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক বিচারে এ সন্দেহ অমূলক। **নীহাররঞ্জন রায়** তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' (আদিপর্ব) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে নানা তথ্য প্রমাণ সহযোগে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন—'আদি শূরই বাঙলায় প্রথম ব্রাহ্মণ আনিলেন, তাহার আগে ব্রাহ্মণ ছিল না, বেদের চর্চা ছিল না, কুলজী গ্রন্থগুলির এই তথ্য একান্তই অনৈতিহাসিক, অথচ ইহারই উপর সমস্ত কুলজী কাহিনী নির্ভর। অন্তত পঞ্চম শতক হইতে আরম্ভ করিয়া বাংলাদেশে ব্রাহ্মণের কিছু অভাব ছিল না, বেদ-বেদাঙ্গচর্চাও যথেষ্ট ছিল ; অষ্টম শতকের আগেই বাঙলার সর্বত্র অসংখ্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বসবাস হইয়াছিল।' ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের সিদ্ধান্তও অনুরূপ। [দ্রষ্টব্য ঃ 'বাংলাদেশের ইতিহাস—প্রাচীন যুগ']"

মল্লভূমের মল্লরাজারা যে নিম্নবর্ণীয় বাগ্দী বংশীয় নন-এ সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে তিনি লিখেছেন, "মল্ল শব্দটিকে 'aboriginal title' বলে চিহ্নিত করে

১. বীরেন্দ্রসিংহদেব ১৯৮০ খৃষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর পরলোক গমন করেছেন।

মল্লরাজগণকে 'বাগ্দী রাজা' অর্থাৎ অনার্য উপজাতীয় রূপে আখ্যাত করেন **R. C. Dutta** তাঁর 'The aboriginal elements in the population of Bengal' নামক রচনায়। প্রসঙ্গত তিনি এ মন্তব্যও করেন যে মল্লরাজগণ যখন ঐশ্বর্যবান ও পরাক্রমশালী হয়ে ওঠেন, নিজেদের বংশকে উত্তর ভারতীয় ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য অনুরূপ গল্প রচনা করেন। কালক্রমে তা কিংবদন্তীতে পরিণত হয়।

W. B. Oldham তাঁর 'Some Historical and Ethical Aspects of the Burdwan District' রচনাতেও বিষ্ণুপুর-মল্লরাজগণকে 'the acknowledged kings of the Bagdis' বলে আখ্যাত করেছেন এবং 'মল্ল' আর 'মাল' যে একই, এরকম ইঙ্গিত দিয়েছেন ও 'মাল' বা 'বাগ্দী' যে একই গোষ্ঠীভুক্ত ও অতি ঘনিষ্ঠ জাতি—একথা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন।

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঁকুড়ার মন্দির'-এ স্পষ্টভাবেই বলেছেন যে 'মল্ল' শব্দ এসেছে 'মাল' থেকে।

R. C. Dutta 'মল্ল' শব্দটিকে কেন 'aboriginal title' বলেছেন, এ প্রশ্ন অভয়াপদ মল্লিক তাঁর গ্রন্থে উত্থাপন করেছেন। **'মল্ল' শব্দের বহুল প্রয়োগ মহাভারতে আছে**—গ্রন্থের পাদটীকায় তিনি সেকথা উল্লেখ করেছেন।

'মাল' শব্দ থেকে 'মল্ল' শব্দ এসেছে—অমিয়বাবুর এই সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য নয়। বাংলা ভাষার ধর্ম অনুসারে সংস্কৃত (তৎসম) শব্দই বিকৃত বা পরিবর্তিত আকারে তদ্ভব শব্দে পরিণত হয়। কাজেই 'মল্ল' শব্দই কালক্রমে 'মাল' হতে পারে, কিন্তু 'মাল' শব্দ পরিবর্তিত হয়ে 'মল্ল' শব্দে পরিণত হয় না।

'শব্দকল্পদ্রুম্' নামক গ্রন্থে 'মল্ল' শব্দের যে আভিধানিক ব্যাখ্যা আছে, তাতে শব্দটির অর্থ হল—'ব্রাত্যক্ষত্রিয়'—'স চ ব্রাত্যক্ষত্রিয়াৎ সবর্ণায়াং জাতঃ'। 'ব্রাত্য' শব্দের তাৎপর্য—নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবার পর উপনয়ন-জনিত দোষ। এটি একটি লক্ষণীয় বিষয়। এ থেকে আমরা 'মল্ল'দের একটি পৃথক জাতি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি। অধিকন্তু উক্ত কোষগ্রন্থে 'মল্ল' শব্দের অন্য অর্থ দেওয়া আছে—'বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষঃ'। এটিও ভাববার বিষয়।"

'বাগ্দী রাজা' প্রসঙ্গে বহুমুখী দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করে তিনি মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন,—**"সবদিক বিবেচনা করে মনে হয়, যুদ্ধবিদ্যা যাদের পেশা ছিল, এমন এক জাতি বা সম্প্রদায়ই 'মল্ল'। এরা ব্যাপক অর্থে ক্ষত্রিয় রূপেই পরিচিত। জন্মসূত্রে উত্তর ভারতীয় ক্ষত্রিয় শোণিতজাত না হলেও মল্লরাজাগণও এই অর্থে নিজেদের শৌর্যবীর্যের গরিমায় ক্ষত্রিয়রূপে গণ্য হতে পারেন।"**

অয়ঃপাত্রে পয়ঃপানং শালপত্রে তু ভোজনম্।
শয়নমশ্বপৃষ্ঠে চ মল্লজাতীনাং লক্ষণম্।।

অর্থাৎ লোহার পাত্রে জলপান, শালপাতাতে ভোজন এবং অশ্বপৃষ্ঠে শয়নই হল মল্লজাতিদের লক্ষণ।

মল্লরাজ্যে বহুল প্রচলিত প্রবাদ জাতীয় এই শ্লোকটিও কিন্তু মল্লজাতি তথা মল্লরাজাদের যুদ্ধ-প্রিয় ক্ষত্রিয় জাতির পক্ষেই ভোট দেয় ; বাগ্দী-রাজার পক্ষে নয়।

অধ্যায়-৬৬

মল্লভূমে মিশনারী কার্যকলাপ ও খৃষ্টধর্ম প্রচার

মল্লরাজবংশের উৎস-সন্ধানে ব্রতী হয়ে যে বাক্‌যুদ্ধ তথা বুদ্ধির কচ্‌কচানি শুরু হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি হয়েছে আপাততঃ। এদিকে আমরাও এসে গেছি মিশনডাঙ্গার গীর্জার পদপ্রান্তে। এখন শুনুন মল্লভূমে মিশনারী কার্যকলাপ ও খৃষ্টধর্ম প্রসঙ্গে দু-চার কথা।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে অর্থাৎ ৬৯৪ খৃষ্টাব্দে মল্লরাজ্যের উদ্ভব। অতঃপর প্রায় এক হাজার বছর যাবৎ মল্লনৃপতিগণ রাজত্ব করেছেন সগৌরবে। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে এ রাজ্যের পতন শুরু হয় এবং মহারাজ চৈতন্য সিংহদেবের রাজত্বকালে (১৭৪৮—১৮০০ খৃঃ) এ রাজ্যের অবস্থা হয়ে ওঠে মর্মান্তিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর ছ'এর দশকে বৃটিশ সরকার তার থাবা বসিয়ে দেয় মল্লভূমে। ১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে মল্লরাজ্য বৃটিশ শাসনের বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। মল্লরাজ্য বৃটিশের করায়ত্ত হয়। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে মল্লভূম ও বীরভূমকে নিয়ে বড়লাট লর্ড কর্ণওয়ালিশ একটি জেলা গঠন করেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের চুয়াড় বিদ্রোহের উদ্বেগজনক পরিস্থিতিতে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ১৮ নম্বর রেগুলেশন বলে বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের বিশেষ বিশেষ এলাকা নিয়ে বাঁকুড়াকে সদর দপ্তর করে গঠিত হয় **জঙ্গল মহল**। এদিকে ১৮০৬ খৃষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর ২ লক্ষ ১৫ হাজার টাকার বিনিময়ে বিষ্ণুপুর জমিদারি নিলামে বিক্রয় হয়। কিনে নেন বর্ধমানরাজ। পরবর্তীকালে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে **'গঙ্গানারায়ণী হাঙ্গামা'** নামক আদিবাসী অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে **জঙ্গল মহল জেলা** ভেঙে দেওয়া হয়। এরকম এক ভাঙাগড়ার অস্থিরতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ বর্তমান বাঁকুড়া জেলায় শুরু হয় মিশনারী কার্যকলাপ ও খৃষ্টধর্মপ্রচার। "অন্যান্য স্থানের মত এ জেলাতেও মিশনারীদের আগমনের প্রধানতম উদ্দেশ্য ছিল এ দেশীয়দের মধ্যে খৃষ্টান ধর্ম প্রচার বা ধর্মান্তরকরণ, তবে বহিরাবরণ হিসাবে উপজীব্য ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার এবং সেবামূলক উদ্যোগ, যেমন কুষ্ঠ রোগীদের জন্য হাসপাতাল স্থাপন, অনাথ আশ্রম পরিচালনা ইত্যাদি।" (বাঁকুড়াজনের ইতিহাস—সংস্কৃতি, পৃঃ—২০০)

খুব সম্ভব বৃটিশ কর্মচারী এবং নীলকর সাহেবদের সাথে সংযোগ স্থাপন করে চার্চ মিশনারী সোসাইটির বৃটিশ ধর্মযাজক রেভাঃ **জে. জে. ওয়েইটব্রেক্ট** (Rev. J. J. Weitbrecht) বাঁকুড়া জেলায় সর্বপ্রথম খৃষ্টধর্ম প্রচারে ব্রতী হন এবং বাঁকুড়া শহরের মাচানতলায় একটি গির্জা নির্মাণ করেন। বর্তমানে সেখানে রয়েছে সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক। **ধর্মান্তরকরণের বিষয়ে ওয়েইটব্রেক্ট-এর সাফল্যের নিদর্শন না থাকলেও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে তাঁর প্রচেষ্টায় নির্মিত জিলা স্কুলটি জেলার গৌরব।** অতীতে এটির নাম ছিল ফ্রি স্কুল। চার্চ মিশনারী সোসাইটি কোলকাতা ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলে ধর্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে চলে গেলে ওয়েস্‌লিয়ান মেথডিস্ট সোসাইটি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়ায় তাঁদের কার্যকলাপ শুরু করেন।

মেথডিস্ট মিশন সোসাইটি পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর,

সোনামুখী, ওন্দা, মেজিয়া, ছাতনা, সারেঙ্গা প্রভৃতি স্থানে স্কুল বা মিডল ইংলিশ স্কুল স্থাপন করেন। স্ত্রী শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যেও বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুরে পাঁচটি করে এবং ওন্দাতে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এই সোসাইটির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ওয়েস্‌লিয়ান কলেজ প্রতিষ্ঠা। উচ্চশিক্ষার জন্য নির্মিত এই কলেজটিই বর্তমানে বাঁকুড়ার খৃষ্টান কলেজ। এ কলেজের কৃতী ছাত্রদের পরিচয় দিতে গিয়ে শ্রীরথীন্দ্রমোহন চৌধুরী লিখেছেন, "এ কলেজের স্বনামধন্য ও খ্যাতিমান ছাত্ররা হলেন ভারতের প্রথম নির্বাচন কমিশনার ও বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য **সুকুমার সেন**, সাহিত্যিক **সজনীকান্ত দাস** ও **মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়**, চলচ্চিত্র অভিনেতা **রাধিকামোহন ভট্টাচার্য**, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যে প্রথম গবেষক ও ডি. লিট. **রামতনু লাহিড়ি**, অধ্যাপক **ক্ষুদিরাম দাস**, পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যৎ-এর প্রাক্তন সভাপতি **সত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়** প্রমুখ।"(বাঁকুড়াজনের ইতিহাস-সংস্কৃতি, পৃঃ—২১২)। প্রসঙ্গতঃ বলি, উপরোক্ত রাধিকামোহন নামটি রাধামোহন হবে।

আরো জানা যায় হিন্দী ও বাংলা ছায়াছবির স্বানামধন্য পরিচালক **শক্তি সামন্ত** এবং প্রখ্যাত সাহিত্যিক **শক্তিপদ** রাজগুরুও এই কলেজেরই ছাত্র ছিলেন। **বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানার গোপবান্দি পল্লীর সুসন্তান শক্তিপদ রাজগুরু জেলার গৌরব।**

মেথডিস্ট মিশন ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আর একটি প্রশংসনীয় কাজ করেন। **সেটা হল এখানে বালিকা ও মহিলাদের জন্য সূচীশিল্প বিভাগের শুভ-সূচনা।** এই বিভাগে কাজ শিখে ধর্মান্তরিত বালিকা ও মহিলাগণ যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে রুজিরোজগারে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে প্রস্তুত সূচীশিল্পজাত বস্তুসামগ্রীর যথেষ্ট চাহিদা ছিল ইংলণ্ডে।

শিক্ষাবিস্তার ছাড়াও মেথডিস্ট মিশনারীগণ আধুনিক চিকিৎসা প্রসারের বিষয়েও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে **বদরা** গ্রামে ইংলণ্ডের **মিসেস ব্রায়ান** প্রদত্ত অর্থে নির্মিত হয় ব্রায়ান কুষ্ঠাশ্রম। পরবর্তীকালে এ কুষ্ঠাশ্রমে এডিথ হোম নামে একটি বিভাগ খোলা হয়। সেখানে কুষ্ঠরোগীদের সুস্থ ছেলে মেয়েদের হাতের কাজ শিক্ষা দেওয়ার সুব্যবস্থা ছিল। **এঁদের আর একটি স্মরণীয় কাজ হল বাঁকুড়া জেলার সারেঙ্গা-র মতো পিছিয়ে পড়া অঞ্চলে খৃষ্টীয় সেবানিকেতন নামে একটি উন্নতমানের হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা।** সর্বজনপ্রিয় এই হাসপাতালটি মল্লভূম তথা বাঁকুড়া জেলার গৌরব। অতীতে সারেঙ্গা মিশনারী কার্যকলাপের গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল।

মেথডিস্ট মিশনের মতোই আমেরিকার ব্যাপটিস্ট মিশনারীরাও সারেঙ্গার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এবং মেজিয়ার নিকটে **প্রেমানন্দ অরফেনেজ** নামক একটি অনাথ আশ্রম স্থাপন করে শিশু-সন্তান প্রতিপালনের ব্যবস্থা করেন। এ অনাথ আশ্রমে প্রতিপালিত শিশু সন্তানেরা পরবর্তীকালে অবশ্য খৃষ্টান হয়েছেন।

শিক্ষাবিস্তার ও সেবামূলক কার্যের সাথে সাথে খৃষ্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত অঞ্চলগুলিতে মেথডিস্ট মিশন গীর্জা নির্মাণপূর্বক যীশুখৃষ্টের উপাসনার মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসী এবং আদিবাসীদের ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

ব্রাহ্মণ এবং উচ্চবর্ণের মানুষজনের ধর্মান্তরকরণের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাঁকুড়া জেলায় কয়েকটি মিশন-বিরোধী দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে সমাজের উচ্চস্তরের মানুষের মধ্যে ধর্মান্তরকরণের ব্যাপারে হতাশ হয়ে মল্লভূমের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষজন—যেমন

সাঁওতাল, বাউরী, হাড়ী, ডোম প্রভৃতি সম্প্রদায়কে খৃষ্টধর্মে আকৃষ্ট করার ব্যাপারে সচেষ্ট হন এবং আংশিকভাবে সফল হন মিশনারীগণ।

এক্ষেত্রে আরো একটি উল্লেখ্য বিষয় হল তৎকালে কুষ্ঠ ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিদের স্থান ছিল না ঘরে বাইরে। নিদারুণ আতঙ্কের প্রতিমূর্তি হয়ে সমাজের বিভীষিকা রূপে চিহ্নিত হয়ে একান্ত অবহেলিতভাবে বেঁচে থাকতে হত তাঁদের। অবাঞ্ছিত এই ব্যক্তিবর্গের আশ্রয় মিলত মিশনের কুষ্ঠাশ্রমে। **ধর্মান্তরিত হয়ে খ্রীষ্টানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে ঈশ্বর-পুত্র-যীশুর চরণে আশ্রয় নিয়ে তাঁরা কাটিয়ে দিতেন অবশিষ্ট জীবনটুকু।**

সমাজের শোষিত মানুষের প্রতিভূ হিসেবে অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষেরা এবং সাঁওতালেরা সহজেই গ্রহণ করেছেন খৃষ্টধর্ম। এছাড়া ব্রাহ্মণ ও বর্ণ হিন্দুদের ঘৃণা ও উপেক্ষার পাত্ররূপে চিহ্নিত বাউরী, বাগ্দী, হাড়ী, ডোম প্রভৃতি নিম্নবর্ণের লোকেরাও ধর্মান্তরিত হয়েছেন। **উচ্চবর্ণের মানুষের চিরস্থায়ী শোষণ, নিপীড়ন ও অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে এই শ্রেণীর মানুষেরা শাসক-শ্রেণীর ধর্মের প্রতি দুর্বলতা দেখিয়েছেন স্বাভাবিকভাবেই। ধর্মান্তরকরণের ক্ষেত্রে আর্থিক অস্ত্রেরও প্রয়োগ করা হয়েছিল সুপরিকল্পিতভাবে। শিক্ষান্তে চাকুরির প্রলোভন ছাড়াও শাসক গোষ্ঠীর ছত্র-ছায়ার নিরাপত্তা বলয়ে বিচরণ করার অভিপ্রায়ে অন্ত্যজ শ্রেণীর পাশাপাশি উচ্চবর্ণের লোকজনও খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল সমভাবে।**

বস্তুতঃপক্ষে চার্চ মিশনারী সোসাইটি, ওয়েস্‌লিয়ান মেথডিস্ট মিশন সোসাইটি ও আমেরিকান ব্যাপটিস্ট মিশন— এই তিনটি প্রোটেস্ট্যান্ট মিশনারী সংস্থা মল্লভূমে মিশনারী কার্যকলাপ ও খৃষ্টধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হলেও ওয়েস্‌লিয়ান মেথডিস্ট মিশন সোসাইটিই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

মল্লভূমে মিশনারী কার্য-কলাপ প্রসঙ্গে, শ্রদ্ধেয় প্রশান্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঁকুড়ার মন্দির-মসজিদ-গীর্জ্জা' পুস্তকের ৫৪ পৃষ্ঠায় লিখেছেন, "ওয়েস্লীয়ান মেথাডিস্ট মিশনারী সোসাইটি বাঁকুড়া খ্রীষ্টান মণ্ডলীর যাবতীয় দায়িত্ব গ্রহণের পর মিশনের প্রধান **রেভারেণ্ড উইলিয়াম স্পিঙ্ক** একটি সুন্দর সুবিস্তৃত স্থানে উপাসনালয় বা গীর্জ্জা নির্মাণের উদ্দেশ্যে বাঁকুড়া, পুরুলিয়া অহল্যাবাঈ সড়কের পাশে খ্রীষ্টান কলেজের সম্মুখে বর্তমান স্কুলডাঙ্গা মোড়ের পাশে আট'শ তিরিশ ডেসিমল্ জমি ক্রয় করে। এখানে ১৮৮০ খ্রীঃ নির্মিত হয় গীর্জ্জা এবং পাদরীর থাকার বাসস্থান।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মধ্যপ্রদেশ থেকে একদল হিন্দীভাষী লোক আসে রেলওয়ে শ্রমিক হয়ে। এরা খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়। এদের জন্য বাঁকুড়া শহরের পশ্চিম অঞ্চলে নতুনচটিতে দেড়'শ বিঘা জমি ক্রয় করে। এখানে একশ'টি পরিবারের জন্য কাঁচাঘর তৈরী করে গড়ে ওঠে খ্রীষ্টানপল্লী। বর্তমানে যা খ্রীষ্টানডাঙ্গা নামে পরিচিত। ১৯১২ খ্রীঃ এই পল্লীতে একটি গীর্জ্জা নির্মিত হয়।

বাঁকুড়ার খ্রীষ্টমতাবলম্বীরা ১৯৭৭ খ্রীঃ দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ১) Church of North India — পূর্বেকার ওয়েস্লীয়ান মেথাডিস্ট মিশনারী চার্চ—এর নাম পরিবর্তিত হয়। ২) Assembly God Church — এরা ১৯৮০ খ্রীঃ একটি গীর্জ্জা নির্মাণ করে।"

বিষ্ণুপুরে মিশনারী কার্যকলাপ শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে। এ প্রসঙ্গে 'বাঁকুড়া জনের ইতিহাস—সংস্কৃতি' পুস্তকের ২০৭ পৃষ্ঠাতে লিখিত হয়েছে, "১৮৮০

খৃষ্টাব্দে রেভাঃ জে. আর. ব্রডহেড বিষ্ণুপুরে ওয়েসলিয়ান মিডল ইংলিশ স্কুল ও বাঁকুড়া মিশনের সদর দপ্তর চত্বরে ফিমেল ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বাঁকুড়া শহরে সাঁওতালদের জন্য একটি বোর্ডিং স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বলে গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে স্কুলটি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম স্থাপিত হয়েছিল বিষ্ণুপুরে, তারপর স্থানান্তরিত হয় বাঁকুড়ায়, অবশেষে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে উঠে যায় সারেঙ্গায়।" এ প্রসঙ্গে ঐ পুস্তকের ২১৩ পৃষ্ঠাতে আরো বলা হয়েছে, **"রেভাঃ জে. আর. ব্রডহেড কর্তৃক ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর মিশন হাইস্কুলের জন্য ছত্রীবংশীয় জমিদার বংশের কাছ থেকে ইমালি বিহারবাড়ী এলাকায় জমি ক্রয় দলিলে খৃষ্টধর্ম প্রচার ও শিক্ষাবিস্তার জমি ক্রয়ের উদ্দেশ্যরূপে উল্লিখিত। ধর্মান্তরকরণ মিশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।"**

উপরোক্ত উদ্ধৃতিটিতে দেখা যাচ্ছে যে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জমি খরিদ হয় এবং বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তার পূর্বে ১৮৭৮ এবং ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে জমিটি দুটি পর্যায়ে কেনা হয়েছিল— ১৮৭৮ এর পূর্বে এবং ১৮৮৪ তে। মিশন হাই স্কুল ও গীর্জা সংলগ্ন অঞ্চলটি বর্তমানে মিশনডাঙা নামে পরিচিত। অতীতে বুয়ান গাছের আধিক্যবশতঃ এটি বুয়ানবাড়ি নামে এবং তারও পূর্বে এটি হয়তো ইমালি বিহারবাড়ি নামে প্রসিদ্ধ ছিল।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত 'মিশন প্রাথমিক বিদ্যালয়' এখানে আজও বিদ্যমান। পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুর পৌরসভা পরিচালিত এই বিদ্যালয়টি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষাপর্ষদের নিয়ন্ত্রণাধীন। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত মিডিল ইংলিশ স্কুলটি ১৯৫৭ খৃষ্টাব্দে জুনিয়র হাই স্কুলে এবং ১৯৬৩ খৃষ্টাব্দে হাই স্কুলে অর্থাৎ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সাহায্যপ্রাপ্ত একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং চার্চ অফ নর্থ ইণ্ডিয়ার দুর্গাপুর ডাইয়সিসের পরিচালনাধীন। অনুরূপভাবে গীর্জাটির তত্ত্বাবধানেও রয়েছে ডাইয়সিস্ অফ দুর্গাপুর।

বিষ্ণুপুর চার্চের Pastor অর্থাৎ পুরোহিত জানালেন ভারতে মিশনারী কার্যকলাপ এবং খৃষ্টধর্ম প্রচার-প্রসারের সুবিধার্থে ভারতের গীর্জাগুলিকে দ্বিধারায় বিভক্ত করা হয় বিংশ শতাব্দীর ছ'য়ের দশকে। এ দুটি বিভাগ হল চার্চেস অফ সাউথ ইণ্ডিয়া এবং চার্চেস অফ নর্থ ইণ্ডিয়া। চার্চেস অফ্ সাউথ ইণ্ডিয়ার প্রধান কার্যালয় হল মাদ্রাজ বা চেন্নাই এবং চার্চেস অফ্ নর্থ ইণ্ডিয়ার প্রধান কার্যালয় হল দিল্লী। ভারতীয় গীর্জাগুলি আবার তিনটি পর্যায়ে বা স্তরে বিভক্ত। উপরের স্তরে রয়েছে DIOCESE CHURCH বা ডাইয়সিস গীর্জ্জা। Church of North India-র অধীনে পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর, দার্জিলিং, কোলকাতা ও ব্যারাকপুরে রয়েছে Diocese Church. মধ্য স্তরে রয়েছে PASTORATE CHURCH বা পাস্টরেট গীর্জা। বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া, সারেঙ্গা সামাডি-তে রয়েছে এ ধরনের গীর্জা। শেষ স্তরে রয়েছে CONGREGATIONAL CHURCH বা কংগ্রিগেশন্যাল গীর্জা। বাঁকুড়া শহরের খ্রীষ্টানডাঙাতে ১টি, সারেঙ্গাতে ২০/২২টি এবং বিষ্ণুপুরে ১টি এ ধরনের গীর্জা রয়েছে। **বিষ্ণুপুরের এই গীর্জাটির প্রতিষ্ঠা ফলক থেকে জানা যায় যে এটি Church of North India-র দুর্গাপুর Diocese-এর অধীনস্থ ধর্মসভাবিষয়ক একটি গীর্জা। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরে গীর্জা প্রতিষ্ঠিত হলেও এই পাকা-দালান বিশিষ্ট গীর্জাটি নির্মিত হয় ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে।**

৯১ ফুট ৬ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য এবং ৮৯ ফুট ৫ ইঞ্চি প্রস্থ বিশিষ্ট প্রায় বর্গাকার বাউণ্ডারি

ওয়ালের মধ্যস্থলে অবস্থিত একান্ত সাদামাটা অথচ ছিমছাম সৌন্দর্যে ভরা ১৮ ফুট ৮ ইঞ্চি প্রস্থ এবং ৩০ ফুট ৭ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য আয়তাকার এই গীর্জাটির সর্বসাকল্যে উচ্চতা ১৯ ফুট ৬ ইঞ্চি। দক্ষিণে আচ্ছাদিত প্রবেশপথসহ একতলা দালান আদলের এই গীর্জাটি শহরে খ্রীষ্টানধর্ম উপাসনার একমাত্র কেন্দ্রস্থল।

গীর্জাটির অভ্যন্তরভাগের পশ্চিম দেওয়ালের মধ্যস্থলে রয়েছে পত্রাকৃতির (কলাপাতা আদলের) তিনটি কুলঙ্গি। মধ্যস্থলের অপেক্ষাকৃত বড় কুলঙ্গিটিতে রয়েছে পবিত্র ক্রশ চিহ্ন। এটি ক্রুশবিদ্ধ যীশুর প্রতীক এবং দুই পাশের ঈষৎ ছোট কুলঙ্গি দুটি যীশুর সাথে ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় নিহত দুই অপরাধী দস্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। পশ্চিম দেওয়ালের কুলঙ্গি ত্রয়ের পাদদেশে **'লাস্ট সাপার'** বেদী নির্মিত এবং সুসজ্জিত রয়েছে। বেদীর বাম দিকে রয়েছে বাইবেল পাঠের জন্য 'বাইবেল স্ট্যাণ্ড' এবং দক্ষিণ দিকে রয়েছে 'প্রেয়ার স্ট্যাণ্ড'। ধর্মপ্রচার মঞ্চ বা Pulpit-এর সম্মুখে রয়েছে প্রভু যীশুর ভক্ত ও আশ্রিতদের বসবার জন্য প্রত্যেক সারিতে পাঁচটি করে দুটি সারিতে মোট দশটি বেঞ্চ। আর দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে একটি টেবিলের উপর রয়েছে খৃষ্টধর্মের কিছু পুস্তক-পুস্তিকা।

বিষ্ণুপুর শহর ও শহরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের খৃষ্টধর্মাবলম্বীব্যক্তিবর্গ এবং যীশু-প্রেমিকগণ প্রতি রবিবার সকাল ৯টায় এখানে সমবেত হয়ে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন ঈশ্বরপুত্র-যীশুর চরণে। মোমের আলোয় আলোকিত, ধূপের ধোঁয়ায় সুরভিত, একান্ত শান্ত পরিবেশে অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গাওয়া হয় ক্ষমার প্রতিমূর্তি যীশুর বন্দনা-গীত। যেমন—

চল সকলে যাই যীশুর সদনে,
ডাকিতেছেন দয়াল যীশু মধুর বচনে।

ওহে পরিশ্রান্ত ভারাক্রান্ত সর্ব পাপী জন,
আমার নিকটে আইস পাবে শান্ত মন,
মোর যোঁয়ালি সহজ ভার লঘু-বহনে। ......

চল সকলে যাই যীশুর সদনে,
ডাকিতেছেন দয়াল যীশু মধুর বচনে। ..... ইত্যাদি।

যীশু-বন্দনার পর বাইবেলের বিশেষ একটি অংশ, 'বাইবেল স্ট্যাণ্ড' থেকে পাঠ করে শোনান হয় এবং তার যথাযথ ব্যাখ্যাও করা হয়।

বাইবেল পাঠের পর ঈশ্বর আরাধনামূলক গান গাওয়া হয় সমবেত কণ্ঠে এবং ঐ সময় অর্থাৎ সঙ্গীত চলাকালীন অবস্থায় সমবেত ভক্তমণ্ডলীর কাছ থেকে স্বেচ্ছাদান গ্রহণ করা হয় নিঃশব্দে। অতঃপর অনুষ্ঠিত হয় সামগ্রিক প্রার্থনা বা প্রভুর প্রার্থনা এবং সব শেষে আশিস-বচন পাঠের মাধ্যমে সেদিনের মতো সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় ধর্ম-সভার।

প্রতি মাসের শেষ রবিবার প্রার্থনা সভাতে 'লাস্ট সাপার'-এর স্মরণে প্রভু যীশুকে নিবেদন করা হয় রুটি ও দ্রাক্ষারস। এছাড়া যীশুর জন্মোৎসবের প্রাক্কালে ২৪শে ডিসেম্বর বিকেল ৫টা ৬টার সময় গীর্জায় সমবেত ভক্তমণ্ডলী পরস্পর পরস্পরকে উপহার দেন। বড়দের মধ্যে কলম, রুমাল, তোয়ালে প্রভৃতি এবং ছোটদের মধ্যে বেলুন, বল, ব্যাটবল জাতীয় খেলনাপাতি উপহার আদান-প্রদানের প্রথা প্রচলিত। ২৫শে ডিসেম্বর সকাল ৯টায়

বিশেষ ধর্মসভা, অনুষ্ঠিত হয়। যীশুর জন্ম বৃত্তান্তের ঘটনাই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে ঐ দিন। সাধারণতঃ এইসব ধর্মসভা পরিচালনা করেন Cassock (ক্যাসক) পরিহিত Pastor.

বিষ্ণুপুরের এই গীর্জাটির প্রতিষ্ঠা-ফলকের একেবারে নীচের দিকে মানব-প্রেমিক যীশুর একটি বাণী আমাদের নজর কাড়ে। সেটি হল—

> **"হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল আমার**
> **নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে শান্তি দিব।"** মথিঃ ১১ঃ২৮

কিন্তু দুঃখের বিষয় পরম দয়ালু যীশুর এই উদার ও আন্তরিক আহ্বানে মল্লভূমবাসীগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে আসতে পারেননি একযোগে, দলে দলে। কারণ খৃষ্টধর্ম প্রবর্তক যীশু যতখানি আন্তরিক, সহৃদয়, করুণাঘন, উদার, মহানুভব, মানব-প্রেমিক এবং ক্ষমাসুন্দর ছিলেন; খৃষ্ট-ধর্মাবলম্বী নীলকর সাহেবগণ এবং বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী ছিলেন ততখানি নির্দয়, নিষ্ঠুর, স্বার্থপর, পরধনলোভী, ক্ষমতালিপ্সু এবং অত্যাচারী। আপামর ভারতবাসীর কাছে তাঁরা শাসক নয়, শোষক সম্প্রদায়রূপে চিহ্নিত। এছাড়া স্বীয় সম্প্রদায়ের হাতে যীশুর নির্মমভাবে নিহত হওয়ার তিক্ত স্মৃতিটুকু খৃষ্টধর্মের গরিমায় গরল ঢেলে দিয়ে এখানের সাধারণ মানুষের মনে যে বিভীষিকার সঞ্চার করেছে, বোধ করি তার ওপরেই গড়ে উঠেছে খৃষ্টানদের প্রতি গভীর অবিশ্বাসের দুর্লঙ্ঘ্য বাতাবরণ।

পক্ষান্তরে মল্লভূম সনাতন হিন্দু ধর্মের শাশ্বত পীঠস্থান। এখানে প্রাক্-মল্লযুগে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং মল্লযুগে রাজানুকূল্যে শৈব, শাক্ত, ব্রাহ্মণ্য ও বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার-প্রসার ঘটেছে আশাতীতভাবে। মানুষের মন, প্রাণ, হৃদয় জয় করে নিয়েছে সনাতন হিন্দু ধর্মের ভক্তিরসাপ্লুত ভাবধারা। অধিকন্তু এই ধর্মে শান্ত, দাস্য, সখ্য, মধুর ও বাৎসল্য এই পাঁচটি মহাভাবের যে কোন একটি ভাব অবলম্বন করে ঈশ্বর-লাভের যে পথ-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে ঈশ্বর-উপাসনার পথটি একাধারে যেমন হয়েছে সহজ, সরল, সাবলীল ও হৃদয়গ্রাহী তেমনি হয়েছে মর্মস্পর্শী ও প্রাণসঞ্চারী। **তাই শুধু বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া বা মল্লভূম নয়, সমগ্র ভারতেই মিশনারী সংস্থাগুলি খৃষ্টধর্ম প্রচার-প্রসারে আশানুরূপ ফললাভ করতে পারেনি।** আবার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনের ধর্মীয় গোঁড়ামি এবং কঠোর রক্ষণশীল মনোভাবের পাশাপাশি-ইসলাম-ধর্মগুরুদের অপ্রতিহত মনোভাবের প্রভাববশতঃ মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও খৃষ্টধর্ম প্রচার করা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়ে ওঠেনি মহানুভব মিশনারীদের পক্ষে। পক্ষান্তরে তাঁদের সেবামূলক কার্য, যেমন চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষাসহ পুঁথিগত শিক্ষাবিস্তার-জাতীয় প্রয়াস দোলা দিয়েছে মল্লভূমের পাশাপাশি সমগ্রভারতবাসীকে। **এ বিষয়ে মিশনারী সংস্থাগুলি আপামর ভারতবাসীর পথ-প্রদর্শক। তাই আমরা তাঁদের কাছে ঋণী। ঋণ স্বীকার করি অকপটে।**

'মল্লভূমে মিশনারী কার্যকলাপ ও খৃষ্টধর্ম প্রচার' প্রসঙ্গে ছেদ বসিয়ে আপাততঃ আমরা আজকের দুপুরের আহার সেরে নেবো নিকটস্থ রূপকথা সিনেমাহলের স্টলে। তারপর রওনা হব মিশন-ডাঙার চৌরাস্তার অনতিদূরে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত মুসলমান সাধক ঘোড়ালি সাহেবের আস্তানা-অভিমুখে। পথে যেতে যেতে শোনাব মল্লরাজাদের রাজ্যশাসন প্রণালীর কথা।

অধ্যায় - ৬৭

মল্লরাজাদের রাজ্যশাসন প্রণালী

দ্বিতীয় দিনের পরিক্রমাকালে আমি আপনাদের কাছে 'মল্লরাজাদের দেওয়া উপাধি এবং উপাধিগুলির বৈশিষ্ট্য' প্রসঙ্গে স্বল্পবিস্তর আলোচনা করেছি। উপাধিগুলির বৈশিষ্ট্য থেকেই মল্লরাজাদের রাজ্যশাসন পদ্ধতি সম্পর্কে একটি পূর্বাভাস ইতিমধ্যেই আপনারা পেয়েছেন। এখন সেই অস্পষ্ট ধারণাকে সুস্পষ্ট করার অভিপ্রায়ে শোনাব মল্লরাজাদের রাজ্যশাসন প্রণালী প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক কথা।

রাজতন্ত্রের পরিকাঠামোতে গড়ে ওঠা এই শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে বুঝিবা গণতন্ত্রের সুরই অনুরণিত। রাজতন্ত্রের নিয়মানুসারে এখানেও রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজা হন। অবশ্য একাধিক পুত্রের ক্ষেত্রে মধ্যম পুত্র **'হিকিম সাহেব'** এবং অন্যান্য পুত্রগণ **'বাবু সাহেব'** আখ্যায় ভূষিত হয়ে মল্লরাজ্যেরই স্থানান্তরে পৃথকভাবে বসবাস করেন। রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকার সূত্রে বিধ্বংসী গৃহবিবাদকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্যই এই সুচিন্তিত নিয়ম প্রচলিত হয়। অবশ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র বিকলাঙ্গ বা অযোগ্য হলে দ্বিতীয় পুত্র রাজসিংহাসন অলংকৃত করতেন প্রথানুসারে। রাজমহিষীগণ পদ-মর্যাদানুসারে গৌরবাত্মক **শিরোমণি, চূড়ামণি, পট্টমহাদেবী** বা **পট্টমহীয়সী** আখ্যাতে অভিরঞ্জিত হতেন। রাজার আকস্মিক মৃত্যুতে বা অকালমৃত্যুতে রাজমহীয়সী প্রধান অমাত্যের সাথে পরামর্শ করে রাজ্য পরিচালনা করতেন সাময়িকভাবে—এরকম দৃষ্টান্তও নজীরবিহীন নয়।

রাজ্য শাসনের সুবিধার্থে ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের মতোই মল্লরাজাদের শাসনতন্ত্রটি ছিল দ্বি-ধারায় বিভক্ত। মল্লরাজার অধীনস্থ সামন্তরাজাগণ ছিলেন এক একটি নির্দিষ্ট এলাকার সর্বেসর্বা। অনেকগুলি সামন্তরাজ্য নিয়ে গঠিত মল্লরাজ্যের সামন্ত-শাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে কয়েকটি হল— বগড়ী, বেত্রগড় (গড়বেতা), রায়পুর, সিমলাপাল, ভিলাইডিহা, চন্দ্রকোণা, গোয়ালতোড়, ছাতনা, মালিয়াড়া, ভুমনী, শূরভূম, ধরাপাট, জামকুড়ি, ইন্দাস প্রভৃতি। এসব অঞ্চলের সামন্ত রাজাগণ প্রায় স্বাধীনভাবে স্বীয় মর্যাদায় নিজ নিজ অঞ্চলে প্রভুত্ব বিস্তার করে রাজত্ব করতেন সগৌরবে। এঁদের দুর্গ, সৈন্য, অস্ত্রশস্ত্র সবই ছিল, কিন্তু ছিল না সার্বভৌম ক্ষমতা। তাই তাঁদের কেন্দ্রীয় সরকার অর্থাৎ বিষ্ণুপুর রাজদরবারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করতে হত সদাসর্বদা এবং যে কোনো জরুরী তলবে আজ্ঞাবাহী রাজকর্মচারীর মতই সামন্ত রাজাদের বিষ্ণুপুরের রাজদরবারে হাজিরা দিতে হত। **এছাড়া রাজ্যাভিষেকের দিন এবং প্রতি বৎসর পৌষ মাসের পুষ্যা নক্ষত্র তিথিযোগে যে বাৎসরিক অভিষেক উৎসব হত সেই সময় সমস্ত সামন্ত রাজাদের বিষ্ণুপুরের রাজদরবারে উপস্থিত হয়ে রাজাকে উপঢৌকন দেওয়ার প্রথা ছিল প্রায় বাধ্যতামূলক। ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিনিধি প্রেরণ করা যেত।**

নির্ধারিত বাৎসরিক কর ছাড়াও যুদ্ধ এবং আপৎকালীন সময়ে এই সব সামন্ত রাজারা নিজ নিজ সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে বিষ্ণুপুরের নৃপতির সাথে মল্লরাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে একযোগে যুদ্ধ করে শত্রুসৈন্য নিধন করতেন। পক্ষান্তরে সামন্ত রাজার রাজ্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা বা গুরুতর সমস্যা দেখা দিলে মল্লরাজা অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার সেই সমস্যা সমাধানে হস্তক্ষেপ করতেন সামন্ত রাজার পদ-মর্যাদা বজায় রেখে। অবশ্য

সামন্ত রাজাদের মধ্যে যদি কেউ বিষ্ণুপুর-রাজের বিরুদ্ধাচরণ করতেন বা বিদ্রোহী হয়ে উঠতেন তাহলে মল্লরাজাগণ কঠোর হস্তে সে বিদ্রোহ দমন করতেন এবং বিদ্রোহীকে প্রাণদণ্ড জাতীয় দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতেন। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরের ৫২তম রাজা বীর সিংহের রাজত্বকালে মালিয়াড়ার সামন্ত রাজা **মণিরাম অধ্বর্যুর** রাজদ্রোহিতা এবং তাঁর মর্মান্তিক মৃত্যুদণ্ডের কথা, তথা হত্যাকাণ্ডের কথা স্মরণ করিয়ে দিই আর একবার।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান বা সর্বময় কর্তা ছিলেন রাজা স্বয়ং। তিনি অমাত্যবর্গের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ সহকারে রাজকার্য পরিচালনা করতেন বিচক্ষণতার সাথে। রাজকার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন বিভাগ বা দপ্তরের দায়িত্বে থাকতেন বিশেষ বিশেষ উপাধিতে ভূষিত ব্যক্তিবর্গ। যেমন সৈন্য বিভাগের প্রধান সেনাপতি, রাজস্ব বিভাগের প্রধান দেওয়ান। অনুরূপভাবে কৃষি, বাণিজ্য, ধর্ম ও নীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা প্রভৃতি বিভাগগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সুদক্ষ ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ করতেন মহারাজ স্বয়ং। বিচারবিভাগের দায়িত্বে থাকতেন স্বয়ং মল্লাধিপতি। অবশ্য ছোটখাটো বিবাদ বিসংবাদের বিচার করতেন রাজার দ্বারা মনোনীত পঞ্চায়েত প্রধান, পাত্রধারী, মুখ্যা অথবা মোড়ল জাতীয় সুধীজন। আবার যুদ্ধ-বিগ্রহাদির সম্ভাবনা দেখা দিলে এবং দুর্ভিক্ষ, মহামারী, খরা ও বন্যা জাতীয় প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় মহারাজ অমাত্যবর্গ সহ সামন্ত রাজাদের মতামত এবং শলাপরামর্শের ভিত্তিতে রাজ্যরক্ষা ও প্রজারক্ষার কর্মসূচী গ্রহণ করতেন সাথে সাথে। কোনরূপ হঠকারিতা বা গোঁয়ার্তুমি করতেন না ক্ষমতার দম্ভে মদমত্ত হয়ে। কথিত আছে, যুদ্ধকালে মল্লরাজারা তাৎক্ষণিকভাবে লক্ষাধিক সৈন্য সমাবেশ করতে পারতেন। এখানে উল্লেখ করা যায় যে এক একজন সামন্ত রাজার অধীনে প্রায় ২০/২২ হাজার সৈন্য থাকত। **মল্লরাজাদের গজারোহী, অশ্বারোহী, পদাতিক সৈন্যবাহিনীর পাশাপাশি নৌসেনাও ছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে। এদের মধ্যে তীরন্দাজ ও গোলন্দাজ সৈন্যেরা ছিল খুবই সুদক্ষ।** কৈবর্ত বা কেয়ট সম্প্রদায়ের লোকেরা নৌ-বাহিনীতে; বাগ্দী, খয়রা, মেটে ও মল জাতির মানুষেরা পদাতিক লেঠেল বাহিনীতে; ডোমেরা পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈন্য হিসেবে ঢাল, তলোয়ার, বর্ম দ্বারা সুসজ্জিত হয়ে কাড়া-নাকাড়া, ধামসা, কাঁসর-ঘণ্টা বাজিয়ে গুরুগম্ভীর রণ-নিনাদে রণক্ষেত্রে উপস্থিত হতেন। সাঁওতাল, হাড়ি ও বাউরী জাতির মানুষেরা তীরধনুক, বল্লম নিয়ে যুদ্ধ করতেন। গেরিলা সৈন্যবাহিনীও ছিল মল্লরাজাদের। মোগল, পাঠান, মারাঠা ও তুর্কী আক্রমণের আশঙ্কায় বিপুল সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন অনুভূত হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে। ঐ সময় স্থায়ী সৈন্যবাহিনী ছাড়াও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে প্রাপ্তবয়স্ক যুবকবৃন্দও যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করতেন। জন্মভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তাঁরা প্রাণ দিতেও কুণ্ঠা বোধ করতেন না এবং সদাসর্বদা সজাগ থাকতেন শত্রু আক্রমণের আশঙ্কায়। তাই একটি শ্লোকে বলা হয়েছে—

> **অয়ঃপাত্রে পয়ঃপানং শালপত্রে তু ভোজনম্।**
> **শয়নমশ্বপৃষ্ঠে চ মল্লজাতীনাং লক্ষণম্।।**

অর্থাৎ, লৌহপাত্রে জলপান ও শালপাতাতে ভোজন এবং অশ্বপৃষ্ঠে শয়ন— এই হল মল্লজাতিদের লক্ষণ।

রাজধানী বিষ্ণুপুর শহরটি ছিল সাতটি স্তবকে রচিত গভীর পরিখা এবং পরিখার

সুউচ্চ পাড় পরিবেষ্টিত। পরিখা এবং পরিখার পাড় যথাযথভাবে সংরক্ষণের জন্য হাজার হাজার কর্মচারী ছিল। এদের বলা হত **'মুলকী চাকর'**। পরিখার পাড়গুলি ছিল বিষাক্ত কণ্টকাদি জাতীয় দুর্ভেদ্য লতাগুল্ম বৃক্ষরাজি পরিবৃত। আর তারই মাঝে মাঝে লুক্কায়িত ভাবে থরে থরে সাজানো থাকতো গোলাভরা ছোট বড় অসংখ্য কামান। শোনা যায় মল্লরাজাদের বাইশ শত কামান ছিল।

রাজধানীতে প্রবেশের জন্য তিনটি প্রবেশ পথ বা প্রবেশ তোরণ ছিল। এই প্রবেশ তোরণগুলি ছিল সশস্ত্র সৈন্যবাহিনী নিযুক্ত এক একটি সুরক্ষিত দুর্গ। রাজধানীর দক্ষিণে রসিকগঞ্জ মহল্লার মূল সড়কের উপর **'বীরদরজা'**, পশ্চিমে কালিন্দী বাঁধের পাকা রাস্তার উপর **'লাল দরজা'** এবং পূর্বে কৃষ্ণবাঁধ সংলগ্ন পিচ রাস্তার উপর ছিল **'হলদি দরজা'**, আর রাজধানীর বাইরে জঙ্গলাকীর্ণ মল্লরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছিল অনেকগুলি গড়। তার মধ্যে **বেত্রগড়, হুমগড়, অসুরগড়, করাসুরগড়, কৃষ্ণগড়, শ্যামসুন্দরগড়** বিশেষ উল্লেখ্য। আবার রাজ্যশাসনের সুবিধার্থে মল্লরাজ্য কতকগুলি ঘাটিতে বিভক্ত ছিল। এক একটি ঘাটি দেখ্‌ভাল করার তত্ত্বাবধানে ছিলেন এক একজন **সর্দার**। সর্দারের অধীনে **ঘাটোয়াল, সদিয়াল, তাবেদার, দিগর** পদাভিষিক্ত রাজকর্মচারীগণ ঘাটি সংরক্ষণের কাজে নিযুক্ত ছিলেন অতন্দ্র প্রহরীর মতো। ঘাটোয়াল বাহিনী ছিল খুবই দুরন্ত প্রকৃতির। রাজ্য রক্ষার জন্য তাঁরা প্রাণ বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না বিন্দুমাত্র। "আভ্যন্তরীণ শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মল্লরাজারা ঘাটোয়াল, সদিয়াল, দিগর, দিকপতি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা ২২০০ ঘাটোয়ালদের প্রত্যেককে ১৫ বিঘা হিসাবে সর্বসাকল্যে ৩৩০০০ বিঘা জমি দিয়েছিলেন। এই ঘাটোয়ালগণ ঘাটরক্ষা করিত, বহিরাগত মানুষদের গতিবিধি লক্ষ্য করিত এবং মল্লরাজার উদ্দেশ্যে প্রেরিত চিঠিপত্র সেন্সার করিত। গঙ্গাজলঘাটি থানার বাইশ গ্রাম তরফের জন্য ২২ জন, ছান্দাড় তরফের জন্য সাতাইশ জন, চুয়ামসিনা তরফের জন্য চুয়ান্ন জন ঘাটোয়াল নিযুক্ত ছিল। পাঁচজন ঘাটোয়ালের উপর একজন করিয়া সদিয়াল এবং তাহাদের উপর **দিকপতি বা দিগর** থাকিত।" (পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, পৃঃ-১৭৬-১৭৭)

মল্লরাজ্যের স্বায়ত্ত শাসন প্রথাটি ছিল একটি সুপ্রাচীন গ্রাম্য প্রথা। জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত পঞ্চায়েৎ প্রতিনিধিগণ তাঁদের মধ্যে একজনকে প্রধান নির্বাচন করতেন। তাঁর উপাধি ছিল **'শিরোমণি'**। শিরোমণি সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি হিসেবে সম্মানিত হতেন। গ্রামের মধ্যে সংঘটিত দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিবাদের মীমাংসার ব্যাপারে তাঁর সিদ্ধান্তই ছিল চূড়ান্ত। বিবাহ, অন্নপ্রাশন বা অন্যান্য সামাজিক এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদির অনুমতি লাভের জন্য শিরোমণির মান্য হিসেবে কিছু ভেট বা উপঢৌকন দেওয়ার নিয়ম ছিল প্রথাসিদ্ধ। উক্ত সংগৃহীত দাদনের অর্থ তিনি আবার দরিদ্র-নারায়ণ সেবা এবং ভাগবৎ পাঠাদি অনুষ্ঠানের জন্য ব্যয় করতেন। পরবর্তীকালে সমাজের ব্যাপ্তির সাথে সাথে শিরোমণির সহায়ক হিসেবে **'মুখ্যা'** উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ মনোনীত হতেন। পক্ষান্তরে মুখ্যাগণও শিরোমণি নির্বাচন করতেন ক্ষেত্রবিশেষে। মুখ্যা মশায়ের কাজ ছিল শিরোমণির অনুরূপ। আজ থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বেও বিষ্ণুপুর শহরের পল্লীতে পল্লীতে এক একজন মুখ্যা ছিলেন। মুখ্যা পল্লীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বাদী এবং বিবাদী উভয় পক্ষের অভিযোগ শুনে সমবেত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মতামত নিয়ে বিবাদ বিসংবাদের মীমাংসা করতেন। এছাড়াও তিনি পল্লীর দেবমন্দিরের যাবতীয় বস্তুরাজির সংরক্ষণ ও পূজা-আর্চার

ব্যবস্থাদির দায়িত্ব পালন করতেন। শিরোমণি বা মুখ্যা মহাশয়গণ যখন কোন বিবাদ বিসংবাদের মীমাংসা করতে ব্যর্থ হতেন তখন স্বয়ং রাজা তার বিচার করে চূড়ান্ত রায় দিতেন।

রাজস্ব ও পঞ্চক মহল ঃ মল্লরাজাদের রাজস্ব বিভাগের প্রধান ছিলেন দেওয়ান। রাজস্ব আদায়ের উৎস, যেমন— কৃষি-জমি, বাস্তু এবং উদ্বাস্তু-ভূমি, জঙ্গল, অরণ্য সম্পদ, পুষ্করিণী প্রভৃতি থেকে খাজনা আদায়ের মাধ্যমে রাজ্যের কোষাগার সমৃদ্ধ হয়ে উঠত। এছাড়া সামন্ত রাজাদের নির্ধারিত উপঢৌকন এবং বণিক সম্প্রদায়ের কাছ থেকে প্রাপ্ত বাণিজ্য শুল্ক থেকেও পরিপূর্ণ হত রাজ্যের ধনভাণ্ডার। ষোড়শ খৃষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত দেয় খাজনা এবং শুল্কের মাধ্যম ছিল বস্তু বিনিময় প্রথা। কারণ মল্লরাজাদের নিজস্ব কোন মুদ্রা ছিল না। ষোড়শ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মল্লরাজ্য যখন মুসলমান শাসক গোষ্ঠীর বশ্যতা স্বীকার করে এটি করদ রাজ্যে রূপান্তরিত হয় তখন থেকেই মুসলিম শাসক সম্প্রদায় প্রবর্তিত মুদ্রা, শ্রম ও বস্তু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

বিভিন্ন প্রকার শ্রম দানের জন্য মল্লরাজাগণ রাজকর্মচারীদের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে নিষ্কর জমি দান করতেন। সেবার বিনিময়ে নিষ্কর জমি দানের পাশাপাশি নামমাত্র খাজনাতে জমি তথা ভূসম্পত্তি বন্দোবস্তের ব্যবস্থাও ছিল বহুল পরিমাণে। পূর্বেই বলেছি এই করদ বা রায়তী স্বত্ব আরোপিত জমি, জঙ্গল, বনজ-সম্পদ, পুষ্করিণী প্রভৃতি ছিল আয়ের প্রধান উৎস। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের রাজা বাহাদুর বাঁকুড়ার জজ সাহেবকে একখানি পত্র লিখেছিলেন। সেই পত্রে ঐসব পঞ্চক বা রায়তী জমির বণ্টন ব্যবস্থার তালিকা লিপিবদ্ধ হয়েছে। '**পঞ্চক মহল**' নামাভিষিক্ত উক্ত তালিকাটি নিম্নরূপ— (১) সেনাধ্যক্ষের জন্য সেনাপতি মহল, (২) বিষ্ণুপুরের দুর্গ-রক্ষীদের জন্য মহলবেরা মহল, (৩) দণ্ডধারীদের জন্য ছড়িদার মহল, (৪) সৈন্যদের বেতন প্রদানকারীদের জন্য বক্সী মহল, (৫) রাজ পরিবারে জ্বালানী সরবরাহকারীদের জন্য কাষ্ঠভাণ্ডার মহল, (৬) রাজ- পরিবারের একান্ত পারিবারিক কাজ-কর্ম সম্পাদনকারী কর্মচারীদের জন্য সাইগিরদী পেশা মহল, (৭) রাজদরবারের রাজকর্মচারীদের জন্য কোর্ট মহল, (৮) গোলন্দাজদের জন্য তোপখানা মহল, (৯) গায়ক ও বাদ্যকরদের জন্য ডোমমহল, (১০) পাল্কী বাহকদের জন্য কাহারাণ মহল, (১১) রাজদুর্গগুলিতে কর্মরত শ্রমিক ও কুলিদের জন্য খাটালি মহল, (১২) রাজ্যের হাটবাজার তত্ত্বাবধানকারীদের জন্য হাটিলা মহল, (১৩) রাজার দ্বারা অনুমোদিত ভূমিদান এবং ধর্মকর্ম সম্পাদনকারীদের জন্য বি-তলাবী মহল প্রভৃতি। উক্ত পঞ্চক মহলের বিবরণ থেকেও মল্লরাজাদের রাজ্য-শাসন-প্রণালী সম্পর্কে একটি প্রত্যয়পূর্ণ ধারণা জন্মে।

বিচার ঃ হিন্দুপ্রধান এবং হিন্দু-শাসিত রাজ্যের সুবাদে হিন্দু-আইন অনুসারে অপরাধীদের বিচার হত। এক্ষেত্রে হিন্দু-শাস্ত্রের বিধান এবং প্রধান পুরোহিতের বিধান কঠোরভাবে মেনে চলা হত। দেবালয় সংলগ্ন নাটমন্দির ও আটচালাগুলি ছিল সাধারণ বিচারসভার স্থান। আইনের শাসন অপেক্ষা ধর্মের অনুশাসনেরই প্রাধান্য ছিল সমধিক। দেব-বিগ্রহের সম্মুখে বাদী এবং বিবাদী উভয় পক্ষকেই শপথ করিয়ে নিয়ে সত্য কথার ভিত্তিতে যথাযথ বিচার-কার্য নিষ্পন্ন করতেন প্রধান পুরোহিত। পূর্বেই বলেছি সাধারণ বিচার-আচারের ক্ষেত্রে শিরোমণি, মুখ্যা এঁদের ভূমিকাও ছিল প্রশংসনীয়। নারী-ধর্ষণ বা নারীর সতীত্ব হরণ জাতীয় অপরাধ গুরুতর অপরাধ বলে বিবেচিত হত। এ ধরনের

অপরাধীদের চক্ষু দুটি উৎপাটন করে নেওয়া হত অথবা জীবন্ত অবস্থায় পুড়িয়ে মারা হত। চুরি, ডাকাতি, লুণ্ঠন, কর্তব্য-কর্মে অবহেলা, খাদ্যে ভেজাল জাতীয় অমানবিক অপরাধসমূহকে ঘৃণ্য এবং জঘন্য অপরাধজ্ঞানে কঠোর শাস্তির বিধান বলবৎ থাকত। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থাই ছিল মল্লভূমের বিচার ব্যবস্থার সার কথা।

ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ঃ ধর্মই ছিল মল্লরাজাদের রাজ্যশাসন প্রণালীর অটুট বর্ম। ধর্মভিত্তিক ও ধর্মকেন্দ্রিক মল্লরাজ্যের সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষা দানের মাধ্যমে মানুষের মনুষ্যত্ব, বিবেক ও নীতিবোধকে জাগ্রত করে অন্যায় কর্ম করতে বিরত রাখার প্রথা অনুসৃত হত সর্বতোভাবে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিদের দেব-মন্দির-সংলগ্ন নাটমন্দিরে বা আটচালাতে সমবেত হওয়ার নিয়ম ছিল প্রায় বাধ্যতামূলক। সন্ধ্যারতির পর সেখানে গীতা, ভাগবত, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থের অংশবিশেষ নিয়মিত পাঠ করা হত। **এক্ষেত্রে মানুষের নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক চরিত্র গঠনে বিশেষ সহায়ক অংশগুলি প্রধান পুরোহিত পূর্বাহ্ণেই নির্বাচন করে দিতেন। ধর্মের মর্মকথা শ্রবণে মল্লবাসীগণ মনুষ্যেতর গুণাবলী তথা পাশবিক প্রবৃত্তিগুলিকে চিরতরে বিসর্জন দিয়ে আদর্শ এবং অনুকরণযোগ্য চরিত্রে উন্নীত হতেন। পারস্পরিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা এবং অকৃত্রিম আন্তরিকতার মাধুর্যে শ্রীমণ্ডিত হয়ে মল্লবাসীগণ সুসভ্য নাগরিক হিসেবে সুষ্ঠু সামাজিক জীবনযাপন করতেন। এজন্য মল্লরাজ্যের সমাজ ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা, ব্যভিচার, পরশ্রীকাতরতা, সন্ত্রাসবাদ-জাতীয় বহু-নিন্দিত ক্রিয়া-কর্মের প্রবেশাধিকার ছিল পুরোপুরি নিষিদ্ধ। ত্যাগ, তিতিক্ষা, ধৈর্য, স্থৈর্য, কষ্টসহিষ্ণুতা এবং ঈশ্বর-প্রেমের অনাবিল মাধুর্য ছিল মল্লবাসীদের চরিত্রের মৌল উপাদান।**

বর্ণাশ্রম ধর্মের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল তৎকালীন মল্লসমাজ ব্যবস্থা। বর্ণাশ্রম ধর্ম-ব্যবস্থা প্রচলিত থাকলেও বর্ণবৈষম্যের অপকারিতা বা বর্ণবিদ্বেষ ছিল না বিন্দুমাত্র। যে যার বৃত্তি নিয়ে বেঁচে থাকত স্বচ্ছন্দে। বস্তু বিনিময় প্রথা ছিল পারস্পরিক লেন-দেনের বা শ্রম আদান-প্রদানের একমাত্র মাধ্যম। গুরুজন এবং বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ ছিলেন দেবতুল্য; তথা সম্মান এবং শ্রদ্ধার পাত্র। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই ছিলেন পরিবারের সর্বেসর্বা। **মল্লরাজাদের রাজত্বকালে এসব সুশিক্ষাই দেওয়া হত টোল, মক্তব ও পাঠশালাগুলিতে।** গ্রাম এবং শহরের দেবালয় সংলগ্ন আটচালা বা নাটমন্দিরগুলি দিবাভাগে শিশু ও কিশোর শিক্ষানিকেতন হিসেবে পরিগণিত হত। শ্রুতি এবং স্মৃতি নির্ভর এই শিক্ষা ব্যবস্থার মূল লক্ষ্য ছিল জ্ঞানবান, গুণবান, চরিত্রবান এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক তৈরী করা। এছাড়া সামরিক বিভাগের সেনাধক্ষ্যের তত্ত্বাবধানে যুদ্ধাস্ত্র প্রস্তুত প্রণালীর পাশাপাশি যুদ্ধবিদ্যাও শিক্ষা দেওয়া হত। শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যয়ভার বহন করত রাজভাণ্ডার। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষার্থীদের অভিভাবকগণ টোল, মক্তব এবং পাঠশালার আচার্যদের পারিশ্রমিক হিসেবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্বীয়-উৎপাদিত কৃষিজাত দ্রব্য বা কুটিরশিল্প জাত বস্তু-সামগ্রী উপহার দিতেন মাঝেমধ্যে। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে ধাতু-মুদ্রা প্রচলনের পর বস্তু-সামগ্রীর সাথে যৎকিঞ্চিৎ অর্থমূল্যও দেওয়া হত গুরু-মান্য হিসেবে। শিক্ষক-শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে ছিল পিতা-পুত্রের অনুরূপ ভাবগম্ভীর মধুর সম্পর্ক।

মল্লাধিপতিগণ বোধ করি 'শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম সাধনম্'—এই সংস্কৃত প্রবাদ বাক্যটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবন করেছিলেন মর্মে মর্মে। নগরবাসীদের মধ্যে 'স্বাস্থ্যই সম্পদ'

এই শুভ চেতনার উন্মেষ ঘটিয়ে চিররুগ্ন বাঙালী জাতিকে শরীরচর্চায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন। সুষম-খাদ্য হিসেবে স্বীকৃত গোদুগ্ধ যে সুস্বাস্থ্যের জন্য পরম হিতকারী তথা বলকারী— এই সত্য উপলব্ধি করে গো-পালনে উৎসাহিত করতেন রাজ্যবাসীকে। গো-হত্যা ছিল এ রাজ্যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। **গো-ধন রক্ষার্থে গবাদি পশুর ওপর দেবত্ব আরোপিত হয়েছিল।** এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে মল্লসৈন্যবাহিনীতে বাগ্দী, বাউরী, হাড়ী, ডোম, খয়রা, মাদোড় প্রভৃতি নিম্নবর্ণের এবং সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রাচুর্যই পরিলক্ষিত হয়; কারণ এরা সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং কষ্ট-সহিষ্ণু হওয়ার ফলে খুবই রণনিপুণ ছিল। লাঠি, সড়কি, বল্লম, বর্শা, তীর-ধনুক এবং তরবারি সঞ্চালনে এরা অত্যন্ত সুদক্ষ ছিল।

পোশাক পরিচ্ছদ ঃ মল্লরাজাদের পোশাক পরিচ্ছদ ছিল মোগল এবং রাজপুত প্রভাব-পুষ্ট। রাজন্যবর্গের এবং সৈন্যবাহিনীসহ রাজকর্মচারীদের পোশাক পরিচ্ছদ তৈরী করার জন্য মল্লরাজারা মল্লভূমে মুসলমান দর্জি আনয়ন করেন। সুদক্ষ হিন্দু দর্জিরাও রাজানুকূল্য লাভ করে বিষ্ণুপুরে বসবাস শুরু করেন। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় মাণিকলাল সিংহ মহাশয় লিখেছেন, "বিষ্ণুপুর গড়ের নিকটেই সঙ্কটতলা মহল্লায় এক দর্জি পরিবারকে ভূ-সম্পত্তি দান করিয়া বসান হয়। এই পরিবার জাতিতে কায়স্থ এবং ইহারা মল্লরাজাদের দ্বারা বিশ্বাস পদবীতে ভূষিত হন। জোড়বাংলা মন্দিরের টেরাকোটায় মল্লরাজ-পরিবারে মোগল রীতির পোশাক পরিচ্ছদের অনুপ্রবেশের দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। পাঁচচূড়া মন্দিরের টেরাকোটায় নারী পুরুষদের সাজ-পোশাকে রাজস্থানী-রীতি অনুসৃত হইয়াছে।" (সুবর্ণরেখা হইতে ময়ূরাক্ষী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ— ১৪৭)

মল্লরাজাদের রাজপোশাকের মধ্যে ছিল চুড়িদার পাজামা, আচকান্ বা সেরোয়ানী (সৌখিন কাজ করা বোতাম দেওয়া ঢিলেঢালা পাঞ্জাবী) ও শিরস্ত্রাণ বা মুকুট। রাজার মুকুটের সাথে হীরাখচিত একটি শির-প্যাঁচ থাকত। উজ্জ্বল হীরাটি কপালের উপরে শোভা পেত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পায়ে নাগরা জুতো এবং কোমরে তলোয়ারও রাজপোশাকের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হত। ঘরোয়া পোশাক ছিল ধুতি এবং সিল্কের পাঞ্জাবী। রাজপরিবারের মহিলাদের ক্ষেত্রে চুড়িদার পাজামা, শাড়ি, ফুলহাতা ব্লাউজ, ওড়না, কাশ্মীরী শাল এবং চাদরের ব্যবহার ছিল সমধিক। রাণীর মাথায় থাকত মুকুট। বাবুসাহেবদের কাঁধে পরিপাটি করে ভাঁজ করা চাদর, পরনে ধুতি, পাঞ্জাবী অথবা ফুলহাতা জামা দেখা গেছে। পুরোহিত ও আচার্যদের ক্ষেত্রে ধুতি, চাদর, নামাবলী এবং সৈন্য-বাহিনীর নির্ধারিত পোশাক ছিল পাজামা, জামা, বুটজুতা, পাগড়ি ও বর্ম। গোমস্তাদের জন্য ছিল ধুতি এবং হাফহাতা ফতুয়া; আটপৌরী, পাইক, বরকন্দাজ ও লেঠেলদের পোশাক ছিল কাচাধুতি পাগড়ি এবং ক্ষেত্রবিশেষে ফতুয়া জাতীয় জামা। সাধারণ নাগরিক সম্প্রদায়ের মধ্যে ধুতি, চাদর এবং মেয়েদের শাড়ি ও চাদর ছিল বহুল ব্যবহৃত পোশাক।

কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প ঃ জঙ্গল-মহল নামে পরিচিত মল্লরাজ্যটি ছিল গভীর অরণ্যের মধ্যে নির্বাসিত। বহির্জগতের সাথে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন থাকায় মল্ল-নৃপতিগণ কৃষি ও কুটীরশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা স্বনির্ভর হওয়ার বাস্তব প্রয়োজনে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ শিল্পীজাতিদের আনয়ন করেন বিষ্ণুপুরে এবং নিষ্কর জমি বা নামমাত্র খাজনা দিয়ে এখানে তাদের স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। তারই ফলস্বরূপে উত্তরকালে বিষ্ণুপুরে শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ হয় এবং সামগ্রিকভাবে বিষ্ণুপুর

কৃষিসহ একটি শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্রে পর্যবসিত হয়।

এ রাজ্যে অতীতকালে প্রভূত পরিমাণে চাল, গুড়, তুলা এবং বৃটিশ আমলে নীল প্রভৃতি কৃষিজাত দ্রব্য ; প্রচুর পরিমাণে উন্নতমানের কাষ্ঠ ছাড়াও মোম, মধু, লাক্ষা প্রভৃতি বনজাত দ্রব্য ; কাঁসা পিতলের বাসনপত্রসহ কৃষিকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও নিত্য প্রয়োজনীয় ধাতব দ্রব্য এবং তামাক, রেশম, শঙ্খজাত দ্রব্যাদির প্রচুর পরিমাণে উৎপাদনের ফলে এখানে কুটির-শিল্পের বিকেন্দ্রীকরণ হয়। নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত বস্তুরাশি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রপ্তানি করা হত। পক্ষান্তরে সুগন্ধি মশলাপাতি, লবণ ও কয়লা আমদানী করা হত দূর-দূরান্তের ভিন্ রাজ্য থেকে। এভাবে মল্লরাজ্য একটি সুপ্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্রে উন্নীত হয়েছিল। মহারাজা প্রকাশ মল্ল বিষ্ণুপুরের উত্তরে অবস্থিত দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে একটি বাণিজ্যবন্দর স্থাপন করেন। প্রকাশ মল্লের নামানুসারে সেই অবলুপ্ত বিপনন কেন্দ্রটি আজও **প্রকাশঘাট** নামে প্রসিদ্ধ। বর্তমানে বিষ্ণুপুরের বালুচরী, স্বর্ণচরী, কাঁসা-পিতলের দ্রব্যাদি, বেলমালা, মাদুলি, শঙ্খজাত দ্রব্যাদি, সোনামুখীর তসর, কেটে ও রেশম-জাত বস্ত্রাদি, পাঁচমুড়ার টেরাকোটার শিল্প-সম্ভার, বিকনার ঢোকরা শিল্প-সামগ্রী আজও উপহার দিয়ে আসছে বিশ্ব-দরবারে। এ ছাড়া মন্দির স্থপতি-বিদ্যা এবং মন্দির-গাত্রে খচিত টেরাকোটা ভাস্কর্যের অপূর্ব স্থাপত্যশৈলী চিরদিনই শাশ্বত সৌন্দর্যের নিদর্শন হিসেবে আকর্ষণ করে আসছে দেশ-বিদেশের পর্যটকবৃন্দকে, আর এসব অবদানের মূলে রয়েছে মল্লরাজাদের রাজ্যশাসন প্রণালীর বুদ্ধিদীপ্ত ভাস্বর প্রয়াস, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

পরিশেষে বলি শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, বিদগ্ধ গুণিজন, ধর্মপ্রাণ পুরোহিতবর্গ, খ্যাতনামা সংগীতজ্ঞ, অন্তর্দৃষ্টি-প্রসারী জ্যোতিষী, নির্মল হাস্যরস পরিবেশনকারী তথা উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন বিদূষক বা ভাঁড়, বিচক্ষণ সেনাধ্যক্ষ, সুধী অমাত্যবর্গ এবং প্রিয় পাত্র-মিত্রগণ পরিবেষ্টিত হয়ে বংশানুক্রমে মল্লরাজাগণ সুদীর্ঘ হাজার বছর কাল ধরে একচ্ছত্র আধিপত্যে রাজত্ব করেছেন মল্লভূমে। **মল্লরাজাদের রাজ্যশাসন প্রণালীর গুণে এই রাজ্যটি অবিভক্ত বাংলার এক বৃহত্তম রাজ্যে পরিণত হয়েছিল এবং বৈষ্ণবধর্মের পীঠস্থান ছাড়াও সর্ব-বিষয়ে চরম সমৃদ্ধির শীর্ষ-শিখরে সমুন্নত হয়েছিল। হয়ে উঠেছিল রত্নগর্ভা। 'রত্নগর্ভা মল্লভূম'** অধ্যায়ে এ রাজ্যের সাহিত্য, শিল্প-কলা, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে শোনাব আরো আরো অনেক কথা। ইতিমধ্যেই শুনিয়েছি অনেক কথা।

সবশেষে বলি, ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত আবে রেনল তাঁর 'History of the East and West Indies' গ্রন্থের মানচিত্রে লেফ্টেন্যান্ট গভর্নরের শাসনাধীন বাংলার দুটি বৃহৎ শহরের নাম উল্লেখ করেছেন। উক্ত পুস্তকে **'বিষ্ণুপুর'** ও **'কলকাতা'**র নাম উল্লিখিত হয়েছে বড় বড় হরফে। শুধু তাই নয় এ রাজ্য পরিদর্শন ও পরিভ্রমণ করে পূর্বোক্ত ফরাসী পর্যটক আবে রেনল এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনাধীনে তৎকালীন Bengal Presidency-র গভর্নর হলওয়েল সাহেব এ রাজ্যের যে মূল্যায়ন করেছেন তা মল্লরাজাদের রাজ্য শাসনপ্রণালীর দলিল হিসেবে বিবেচিত হতে পারে নিঃসন্দেহে। মল্লরাজা এবং মল্লরাজ্যের রাজধানী বিষ্ণুপুর প্রসঙ্গে তাঁরা কি মন্তব্য করেছেন সেকথাও শোনাব একটু পরেই। আপাততঃ আমরা এসে গেছি পীর **'ঘোড়ালি সাহেবের আস্তানায়'**। এখন শুনুন সেই সিদ্ধ পীরের কথা।

অধ্যায়-৬৮

ঘোড়ালি সাহেবের আস্তানা ও চটশাহ্ বাবা

এই পীর বাবার প্রকৃত নাম জানা যায়নি। জানা যায়নি কোথা থেকে তিনি এখানে এসেছিলেন। জানা যায়নি তাঁর সাধনৈশ্বর্যের বিস্তারিত বিবরণ। তবে এটুকু জানা যায় যে তিনি এখানে এসেছিলেন প্রায় ২৫০/৩০০ বছর পূর্বে। নির্জন এই স্থানটিকেই বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সাধনক্ষেত্র রূপে। ছোট্ট একটি ঝুপড়ি বানিয়ে থাকতেন তিনি। আকাশবৃত্তির উপর নির্ভর করেই দিন চলে যেত তাঁর। এখানে থাকতেন তিনি আর তাঁর অনুগত এক অশ্ব। এই অশ্বপৃষ্ঠে বা ঘোড়ায় চড়ে ফকির বাবা ঘোরাঘুরি করতেন বিষ্ণুপুরে এবং যাতায়াত করতেন স্থানান্তরে। **ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ানোর সুবাদে তাঁর নাম হয়েছিল ঘোড়ালি সাহেব**। ঘোড়ালি সাহেবকে অনেকে আবার ঘড়িয়াল সাহেবও বলে থাকেন। লোকশ্রুতি বলে, বাবা ছিলেন খুবই উগ্র প্রকৃতির। হৈ-হট্টগোল, ফালতু ঝুট্-ঝামেলা, অহেতুক জন-সমাগম এসব কিছুই পছন্দ করতেন না তিনি। একান্ত সুন্সান্ পরিবেশে গভীর মনোনিবেশ সহকারে খোদাতাল্লার সাধনায় তন্ময় হয়ে থাকার অভিপ্রায়ে পুকুর-ডোবা, ঝোপ-ঝাড়, কৃষিজমি পরিবেষ্টিত এই জনমানবশূন্য স্থানটিতেই সাধনকুঠি বানিয়েছিলেন তিনি। খোদাতাল্লার উপাসনা করেই জীবন উৎসর্গ করেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। তাই তাঁর দিব্যজীবনের প্রায় পুরোটাই রয়ে গেছে অজানা, অচেনা। **তথাপি বলা যায় আত্মপ্রচার-বিমুখ এই সিদ্ধ সাধকের দিব্যজীবনের সুরভিতে আজও সুরভিত দশদিক।**

ঘোড়ালি সাহেবের বিশেষ ভক্ত ছিলেন **চটশাহ্দাতা** নামে পরিচিত জনৈক মুসলমান সাধক। সদাসর্বদা চট গায়ে দিয়ে থাকার সুবাদে ভ্রাম্যমাণ এই ফকির-সাধক **চটশাহ বাবা** নামেই প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। মেদিনীপুর, বিষ্ণুপুর, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে অবস্থান করতেন তিনি। বিষ্ণুপুরে আসতেন প্রায়ই। থাকতেন এই শহরের কুরবান তলার কুরবান বাবার আস্তানাতে এবং মাঝে মধ্যে আসতেন ঘোড়ালি বাবার সাধনকুঠিতে। খুবই সহজ, সরল, ক্ষমাসুন্দর চটশাহ্ বাবাকে প্রায়ই কান্নাকাটি করতে দেখা যেত। উদারচেতা এই সাধক ছিলেন খুবই দানী প্রকৃতির। এজন্যই তাঁর অপর নাম '**চটশাহ্দাতা**'। তিনি বিষ্ণুপুরে এলে হৈ-চৈ পড়ে যেত শহরে। কারণ এখানে এসে তিনি প্রায়ই নর-নারায়ণ সেবা করাতেন। খেয়ালখুশী মতো পোলাও, খিচুড়ি, জিলাপি খাওয়াতেন হামেশা। টাকা পয়সার কথা ভাবতেন না কদাচিৎ এবং কারও দানও গ্রহণ করতেন না কোনদিন। অর্থাভাব দেখা দিলে চটবাবা চট্ করে নিঃশব্দে ঢুকে যেতেন কুরবান বাবার আস্তানাতে। আস্তানার এক কোণে ঝুম্ মেরে বসে অবোধ শিশুর মতো কান্নাকাটি করতনে অঝোরে। বেশ কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে আসতেন বাইরে। ঝেড়ে দিতেন গায়ে জড়িয়ে থাকা চট। গাছের থেকে পাকা ফল পড়ার মতোই টুং টাং, টুং টাং শব্দে ঝরে পড়তো বেশ কিছু মুদ্রা। ভক্তদের বলতেন, 'গুণে দেখত কত হল।' তারপর মন মন (৩৭ কে.জি.-তে এক মণ) জিলাপির যোগান দাতা বিনোদ ময়রার মতো আর সব পাওনাদারদের বলতেন টাকা পয়সা গুণে নিতে। ফকির সাহেবের স্নেহধন্য ছিলেন সকলেই। তবে তিনি বিশেষ সমাদর করতেন গুণ্ডা, বদমাস, মস্তান জাতীয় লোকেদের। এ প্রসঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলতেন, **"আচ্ছাকে লিয়ে তো সব কোই হ্যায়, বুরেকে[১] লিয়েভি কোইতো হোনা চাহিয়ে।"** গুণ্ডা, বদমাস ও মস্তান

১। বুরেকে — দুষ্টের।

জাতীয় সমাজবিরোধীরা তাঁর একান্ত অনুগত এবং বশীভূত ছিলেন। তাঁর সংস্পর্শে এসে অনেক অসৎ এবং সমাজবিরোধী মানুষেরাও হয়েছেন শান্ত-শিষ্ট ভালমানুষ।

এই চটশাহ বাবাই ঘোড়ালি সাহেবের পাকা আস্তানা নির্মাণ করান। ইনিই ঘোড়ালি সাহেবের আস্তানাতে ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির দিন মহোৎসবের প্রচলন করেন। চটশাহ বাবার জীবিতাবস্থায় বছরে বছরে মহোৎসব হয়েছে ধুমধাম সহকারে। বাবার দেহাবসানের পর সে সমারোহে ভাটা পড়ে সাময়িকভাবে। বর্তমানে আবার বিষ্ণুপুরের ধর্মপ্রাণ মুসলমান ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষজনের সার্বিক প্রচেষ্টায় সেই সমারোহ এবং ঐতিহ্য ফিরে এসেছে পূর্ববৎ। ঐদিন ঘোড়ালি সাহেবের পুণ্যাঙ্গণে পোলাও ভোগ নিবেদন, নর-নারায়ণ সেবা ও প্রসাদ বিতরণের পাশাপাশি ধর্মালোচনাও চলতে থাকে গভীর রাত অবধি। এছাড়া মহরমের দিন তাজিয়া নিয়ে শহর পরিক্রমা করা হয় উৎসবের সার্বিক মেজাজে। ঘোড়ালি সাহেবের তাজিয়া থাকে শোভাযাত্রার সম্মুখভাগে তথা সর্বাগ্রে। সার্বিক কল্যাণ কামনায় স্বেচ্ছাদান পূর্বক এই তাজিয়ার তলে অনেককেই গলাগলি করতে দেখা যায়।

কখনো হাসি, কখনো কান্না আবার কখনো রঙ্গরসে মাতোয়ারা হয়ে থাকতেন চটশাহ বাবা। রঙ্গরস-প্রিয় এই ফকির বাবাকে তাই অনেকে **রঙ্গিলা ফকির** বা **রঙ্গিলা-পীর** বলেও আনন্দ পেতেন নিরতিশয়। রঙ্গিলা ফকির বিষ্ণুপুরেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর সমাধি আছে কুরবান বাবার আস্তানাতে। যথাসময়ে দেখাব সেই সমাধি। এখন আমরা এগিয়ে যাব কুন্দকুন্দার বাজার মহল্লার চণ্ডীমাতার প্রাঙ্গণ অভিমুখে।

যাওয়ার পথে পূর্ব প্রতিশ্রুতি মতো আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব মল্লরাজ্যের রাজধানী বিষ্ণুপুর সম্পর্কে পূর্বোক্ত ফরাসী পর্যটক আবে রেনল এবং অবিভক্ত বাংলার গর্ভনর হলওয়েল সাহেবের স্মরণীয় মন্তব্যের প্রতি।

অধ্যায় - ৬৯

বিষ্ণুপুর সম্পর্কে ফরাসী পর্যটক আবে রেনল ও বেঙ্গল প্রেসিডেন্সির গভর্নর হলওয়েল সাহেবের মন্তব্য

প্রথমে শুনুন আবে রেনল (Abbe Raynal)-এর বক্তব্য—

This fortunate spot, which extends about a hundred and sixty miles, is called Bissenpore. It has been governed time immemorial by a Brahmin family of the tribes of Rajahputs. Here the purity and equity of the ancient political system of the Indians is found unadulterated. This singular Government, the finest and striking monument in the world, has till now, been beheld with too much indifference. We have no remains of ancient nations but brass and marble, which speak only to imagination and conjecture, those uncertain interpreters of manners and customs that no longer exist. Were a Philosopher transported to Bissenpore he would immediately be a witness of the life led by the first inhabitants of Indian many thousand years ago; he would converse with them; he would trace the progress of this nation, celebrated as it were, from its very infancy;

he would see the rise of a government, which, being founded in happy prejudices, in a simplicity and purity of manners, in the mild temper of the people, and the integrity of the chieftains, has survived those innumerable system of legislation, which have made only a transitory appearance upon the stage of the world with the generations they were destined to torment. More solid and durable than those political structures, which raised by imposture and enthusiasm, are the scourages of human kind, and are doomed to perish with the foolish opinions that gave them birth, the Government of Bissenpore, the offspring of a just attention to order and the laws of nature, has been established and maintained upon unchangeable principles, and has undergone no more alteration than those principles themselves. The singular situation of this country has preserved to the inhabitants their primitive happiness and the gentleness of their character, by securing them from the danger of being conquered, or imbruing their hands in the blood of their fellow-creature. Nature has surrounded them with water; and they need only open the sluices of their rivers to overflow the whole country. The armies sent to subdue them have so frequently been drowned, that the plan of enslaving them has been laid aside; that the projectors of it have thought proper to content themselves with an appearance of submission.

Liberty and property are sacred in Bissenpore. Robbery either public or private, is never heard of. As soon as any stranger enters the territory he comes under the protection of the laws, which provide for his security. He is furnished with guides at free cost, who conduct him from place to place, and are answerable for his persons and effects. When he changes his conductors, the new ones deliver to those they relieve an attestation of their conduct, which is registered and afterwards sent to the Raja. All the time he remains in the country he is maintained and conveyed with his merchandise, at the expense of the state, unless he desires leave to stay longer than three days in the same place. In that case he is obliged to defray his own expenses, unless he is detained by any disorder, or other unavoidable accident. This beneficence to strangers is the consequence of the warmth with which the citizens enter into each other's interests. They are so far from being guilty of an injury to each other, that whoever finds a purse or other thing of value, hangs it upon the first tree he meets with, and informs the nearest guard, who gives notice of it to the public by beat of drum. These maxims of probity are so generally received, that they direct even the operations of Government. Out of between seven and eight millions (about 330,000l. on an average) it annually receives, without injury to agriculture or trade, what is not wanted to supply the unavoidable expenses of the state, is fade out in improvements. The Raja is enabled to engage in these humane employments, as he pays the Moguls only what tribute, and at what

times, he thinks proper.

পূর্বোক্ত শ্রদ্ধেয় আবে রেনলের চেয়েও আরো বেশী গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি পূর্বোক্ত গভর্নর মিস্টার হলওয়েল তাঁর স্বরচিত 'Interesting Historical Events' পুস্তকে বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে লিখেছেন—

To the west of Burdwan, something northerly lie the lands belonging to the family of Raja Gopal Singha, of the Rajpoot Brahmin tribe; they possess an extent of sixteen days travel, this district produces an annual revenue of between thirty and forty lac; but from the happiness of his situation he is perhaps the most independant Raja of Indostan, having it always in his power to overflow his country, and drown any enemy that comes against him; as happened at the beginning of Sujah Khan's Government, who sent a strong body of horse to reduce him, these he suffered to advance far into his country, then opening the dams of the rivers destroyed them to a man; this action deterred any subsequent attempts to reduce him, but if the frontiers of the district were so invested, as to prevent the exit of the merchandise of his country, which might easily be done he would be presently brought to obedience, and glad to compound for a tribute of twenty lac per annum ; as it is, he can hardly be said to acknowledge any allegiance to the Mogul or Subah, he some year deigns to sent to the Subah an acknowledgment by way of salaamy (or present) of Rs. 15,000, sometimes Rs. 20,000 and some years not anything at all, as he happens to be disposed.

But in truth, it would be almost cruelty to molest these happy people, for in this district, are the only vestiges of the beauty, purity, regularity, equity and strictness of the ancient Indostan Government. Here the property as well as the liberty of the people are inviolate, here no robberies are heard of, either private or public; the traveller either with or without merchandise, on his entering this district, becomes the immediate care of Government, which allots him guards without any expense, to conduct him, from stage to stage, and these are accountable for the safety and accommodation of his person and effects. At the end of the first stage he is delivered over with certain benevolent formalities to the guards of the next; who after interrogating the traveller, as to the usage he had received in his journey, dismisses the first guard with a written certificate of their behaviour and a receipt for the traveller and his effects which certificate and receipt are returnable to the commanding officer of the first stage, who registers the same, and regularly reports it to the Rajah.

In this form the traveller is passed through the country, and if he only passes, he is not suffered to be at any expense for food, accommodation or carriage for his merchandise or baggage; but it is otherwise, if he is permitted to make any residence in one place above

three days, unless occasioned by sickness or any unavoidable accident. If anything is lost in this district, for instance a bag of money or other valuable, the person who finds it, hangs it upon the next tree, and gives notice to the nearest chowkey or place of guard, the officer of which orders immediate publication of the same by beat of tomtom or drum.

There are in this precinct, no less than three hundred and sixty considerable Pagodas, or place of public worship, erected by the Rajah, and his ancestors. The worship of the cow is here carried to so great and extreme, that, if that animal meets with a violent death, the city or village to which it belonged, go to a general mourning and fast, for three days and are obliged from the Rajah to the meanest of the people, to remain on the spot, where they first heard the publication of the accident; and are employed during that space in performing various expiations, as directed in the Shastra; but more of this under a subsequent general head.

Bissenpore the capital and chief residence of the Rajah, and which gives a name to the whole district, is also the chief seat of trade; and produce of the country of Sal timbers (a wood equal in quality to the best of oak) dammer laccas, an inferior sortment of raw silk, and coposs, and grain sufficient only for their consumption; it is from this district that the East India Companies are chiefly supplied with the article of shell lacca. (pp. 197-200, Part I.)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, হলওয়েল সাহেবের পূর্বোক্ত পুস্তকটি ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হয়েছিল।

অধ্যায়-৭০

শ্রীশ্রীচণ্ডীমাতা

কুন্দকুন্দার বাজার

বিদেশী দুই সাহেবের মুখে বিষ্ণুপুরের ভূয়সী প্রশস্তি-বাণী শুনতে শুনতে আমরা এসে গেলাম কুন্দকুন্দার বাজার মহল্লায় অবস্থিত একটি বয়োবৃদ্ধ বটবৃক্ষের মূলে নব-নির্মিত বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীচণ্ডীমাতার পদপ্রান্তে। এবার শোনাই দেবী চণ্ডীর পৌরাণিক তত্ত্বকথা।

'চণ্ড' শব্দের সাথে ঈপ্ প্রত্যয় যোগে হয় চণ্ডী। চণ্ড শব্দের অর্থ অতি কোপন স্বভাব। চণ্ডী শব্দের অর্থ অতি কোপন স্বভাব বিশিষ্টা নারী। বিশেষ অর্থে চণ্ডী, দেবী পার্বতীর নামান্তর মাত্র বা ভিন্নরূপ মাত্র। ইনি মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি কার্যের অধিষ্ঠাত্রী যোগিনী প্রধানা দেবী। দেবী চণ্ডী উগ্র স্বভাবা হলেও মূলতঃ মঙ্গলকারিণী, মঙ্গলদায়িনী তথা মঙ্গলময়ী। এজন্যই এই দেবী মঙ্গলচণ্ডী রূপেও পূজিতা হয়ে থাকেন।

দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, আশ্রিতের সংরক্ষণ দেবীর কর্তব্য-কর্ম। বিষয়টি পরিষ্কার

করার জন্য আমাদের উঁকি দিতে হবে মার্কণ্ডেয় পুরাণের 'দেবী মাহাত্ম্য' অংশে। এখানে দেবাসুরের যুদ্ধ প্রাধান্য লাভ করেছে পাতায় পাতায়। প্রবল পরাক্রান্ত অসুরকুলের হাতে পরাজিত, নিগৃহীত এবং বিতাড়িত হয়ে দেবরাজ ইন্দ্র সহ অসহায় দেবতাগণ বার বার ছুটে গেছেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের কাছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সম্মিলিত প্রয়াসে,. কখনো বা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং দেবতাগণের যৌথ শক্তিতে আবার কখনো ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, দেবকুল এবং আদ্যাশক্তি তথা স্ত্রীশক্তি বা দেবীশক্তির সার্বিক রণোন্মত্ততায় পরাজিত এবং নিহত হয়েছে অসুরকুল। এই দেবীশক্তি হলেন নামান্তরে স্বয়ং দুর্গা বা পার্বতী। মায়া-প্রভাবে দৈত্য মধু ও কৈটভের বুদ্ধি হরণ করে দেবী হয়েছেন মধু-কৈটভ হত্যার নিমিত্ত-কারণ। দেবীর মহা মায়ার প্রভাবে বিষ্ণুর চক্র দ্বারা নিহত হন মধু-কৈটভ। এজন্যও দেবী 'মহামায়া' নামে অভিহিত। মহিষাসুরকে বধ করে ইনি হয়েছেন মহিষাসুরমর্দিনী। আবার দৈত্যরাজ শুম্ভের প্রধান সেনাধ্যক্ষ তথা অনুচর চণ্ডকে হত্যা করে পার্বতী হয়েছেন চণ্ডী।

দেবীর হস্তে মহিষাসুর নিহত হওয়ার পর বিশ্ব হয়ে ওঠে শান্তিধাম! কিন্তু সেই সুখ-শান্তি হল নিতান্তই ক্ষণস্থায়ী। কারণ ইতিমধ্যে শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামে দুই দুর্দান্ত অসুর হাজার হাজার, লাখো লাখো অসুরবাহিনী নিয়ে নির্মম অত্যাচারে অতিষ্ঠ করে তুলল ত্রিভুবন। দেবগণ সহ ইন্দ্র হলেন স্বর্গচ্যুত। শুম্ভ, নিশুম্ভের হাতে সব কিছু খুইয়ে দীনবেশে তাঁরা উপনীত হলেন পাবর্তী-সকাশে। নিবেদন করলেন তাঁদের চরম দুর্দশার কথা। অসুরকুলের অকথ্য অত্যাচারের কথা। এই সময় পার্বতীর দেহ থেকে বেরিয়ে আসেন এক অপরূপা রমণী। নাম তাঁর কৌষিকী। মতান্তরে অম্বিকা। **পার্বতীর দেহ থেকে কৌষিকী আবির্ভূতা হতেই তাঁর দেহের রং বিবর্ণ হয়ে, হয়ে যায় কালো। এজন্যই দেবীর অপর নাম হয় কালী।**

দেবতাগণের সাথে কৌষিকীর কথোপকথনের সময় হিমালয়ের ঐ স্থানে ঘোরাঘুরি করছিল শুম্ভ আর নিশুম্ভের দুই অনুচর চণ্ড আর মুণ্ড। চণ্ড-মুণ্ড পরমা সুন্দরী কৌষিকীর রূপলাবণ্যের কথা জানায় দৈত্যরাজ শুম্ভকে। দৈত্যরাজ শুম্ভের নির্দেশে অসুর সুগ্রীব গেল দেবীর নিকটে। দৈত্যরাজের ধন-সম্পত্তি এবং তার ত্রিভূবন রাজত্বের প্রলোভন দেখিয়েও কৌষিকীকে ভুলিয়ে ফুসলিয়ে ধরে আনতে ব্যর্থ হল। গিরিরাজ হিমালয়ের কন্যা ধন-সম্পত্তির প্রলোভনে প্রলুব্ধ হওয়ার পাত্রী ছিলেন না। পরন্তু তিনি দৈত্যরাজের উদ্দেশ্যে 'চ্যালেঞ্জ' জানিয়ে বলেছিলেন, 'নিয়ে যেতে হয় তো, তাঁকে যুদ্ধে পরাজিত করে নিয়ে যেতে হবে।'

আপন অনুচর সুগ্রীবের মুখে সামান্য এক নারীর এরূপ স্পর্ধার কথা শুনে ক্রোধে ফেটে পড়েন দৈত্যরাজ শুম্ভ। প্রবল পরাক্রান্ত অসুর ধূম্রলোচনকে পাঠিয়ে দেয় কৌষিকীর চুলের মুঠি ধরে টেনে আনতে। কিন্তু হতভাগ্য ধূম্রলোচন কৌষিকীকে ধরতে গিয়ে তাঁর ক্রোধান্বিত নয়নাগ্নিতে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এবার ক্ষিপ্ত অসুররাজ শুম্ভের আদেশে হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক—এই চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী নিয়ে শিঙা ফুঁকতে ফুঁকতে কৌষিকী সমীপে রণং দেহি মূর্তিতে হু-হুঙ্কার রবে হাজির হল চণ্ড ও মুণ্ড।

এদিকে চণ্ড-মুণ্ডের আগমন-বার্তা জানতে পেরে দেবী কৌষিকী স্বীয় শরীর থেকে সৃষ্টি করেন কদাকার এবং বিকটাকার কালো মিশমিশে এক নারীমূর্তি। গায়ে মাংস নেই বললেই চলে। অস্থিচর্মসার সেই কিম্ভূতকিমাকার নারীর কণ্ঠে নৃমুণ্ডমালা, পরণে বাঘছাল।

লেলিহান জিহ্বা। কোটরগত চক্ষুদ্বয় থেকে ঠিক্‌রে পড়ছে আগুন। **নাম তাঁর চামুণ্ডা।** শারদীয়া দুর্গাপূজার মহাষ্টমীর সন্ধিপূজাতে অর্থাৎ সন্ধিক্ষণের সময় এই চামুণ্ডা দেবীরই পূজা হয়।

চণ্ড-মুণ্ডের চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী দেবী কৌষিকীর কাছাকাছি আসতেই দেবীর দেহোদ্ভূতা চামুণ্ডা সবেগে ধেয়ে যায় অসুর সৈন্যদের উদ্দেশ্যে। এক একটাকে ধরে আর মুখে পুরে মুহূর্তে। অশ্ব সহ অশ্বারোহী-সৈন্য, হাতী সহ মাহুত ও যোদ্ধা—এভাবে চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনীর সকলেই চামুণ্ডার মুখ-গহ্বরে চলে যায় অবলীলাক্রমে। আবার অনেকেই মারা যায় তাঁর পদপিষ্ট হ'য়ে।

এ দৃশ্য দেখে আর স্থির থাকতে পারে না চণ্ড বা মুণ্ড কেউই। চামুণ্ডাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়তে থাকে রাশি রাশি তীর। তীরের ঘনজালে ঢাকা পড়ে সূর্যের আলো। কিন্তু অনতিবিলম্বে সেসব তীর হাড় চিবানোর কৌশলে চিবিয়ে চিবিয়ে গিলে ফেলেন দেবী। কেটে যায় অন্ধকার। সিংহবাহিনী পার্বতী বা অম্বিকা এসব দৃশ্য দেখে হাসতে থাকেন মৃদু-মন্দ। চণ্ড এবং মুণ্ড প্রবল পরাক্রমে ধেয়ে যায় দেবীর দিকে। দেবী চামুণ্ডা তখন স্বীয় হস্তস্থিত খড়্গের এক এক কোপে শেষ করে দেয় চণ্ড ও মুণ্ডকে। কবন্ধ হ'য়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে তাদের মৃতদেহ। তাঁদের মুণ্ডদ্বয় দেবীর পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় **চামুণ্ডা।**

চণ্ডকে বধ করে দেবী হলেন চণ্ডী, বা চণ্ডিকা। আবার চামুণ্ডারূপে তিনি চণ্ড-মুণ্ডকে বধ করেছিলেন বলে তাঁর আর এক নাম হল চামুণ্ডা। চণ্ড-মুণ্ডকে বধ করার পর রক্তবীজ সহ শুম্ভ, নিশুম্ভকেও বধ করেন দেবী চণ্ডী। **আবার 'দুর্গম' নামক অসুরকে বধ করে মা হয়েছেন দুর্গা।**

অসুরকুল সহ শুম্ভ-নিশুম্ভ নিহত হওয়ার পর বিশ্বভুবন আবার হয়ে ওঠে শান্তিনিলয়। দুষ্টের দমন করে এবং শিষ্টের মঙ্গল সাধন করে মা চণ্ডী আবার হয়েছেন **মঙ্গলচণ্ডী।**

"সকল বিশ্বের মূলস্বরূপ প্রকৃতিদেবীর মুখ হতে মঙ্গলচণ্ডী দেবীর জন্ম। ইনি সৃষ্টি কার্যে মঙ্গলরূপ এবং সংহারকার্যে কোপনরূপিণী। এই জন্য এঁর নাম মঙ্গলচণ্ডী। মঙ্গলবারে পূজনীয়া চণ্ডিকা। ভগবতী, দ্বিভুজা, রক্তপদ্মাসনা, গৌরবর্ণা দেবী। অভীষ্ট সিদ্ধির মানসে হিন্দু স্ত্রীরা এই দেবীর অর্চনা ও ব্রত উপবাসাদি করে থাকেন। ধনপতি সওদাগরের স্ত্রী প্রথম মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রবর্তন করেন।" (পৌরাণিক অভিধান পৃঃ— ৩৯৯)

আজ থেকে প্রায় ৫০/৬০ বছর পূর্বে কলেরা, বসন্ত রোগের প্রকোপ ছিল প্রবল। সুদূর অতীতে এই দুই রোগ দেখা দিত মড়ক এবং মহামারীরূপে। মানুষ মরত কাতারে কাতারে। এরকম এক দুঃসময়ে কুন্দ্‌কুন্দার বাজার মহল্লায় বসবাসকারী সেবাইত, তাম্বুলী, কায়স্থ, বৈদ্য ও তন্তুবায় সমাজের ব্যক্তিবর্গ যৌথভাবে মা চণ্ডীর পূজার প্রবর্তন করেন কলেরা ও বসন্তের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে। আনুমানিক কয়েকশ বছর পূর্বে এখানে দেবীর প্রতিষ্ঠাপূর্বক পূজার প্রচলন হয়। শরীরীমূর্তির পরিবর্তে হাতি-ঘোড়ার প্রতীকরূপেই দেবী এখানে পূজা পেয়ে থাকেন। এই দেবী, চণ্ডী এবং মঙ্গলচণ্ডী উভয় রূপেই বিদ্যমান। অতীতে ইনি শুধু চণ্ডীরূপেই পূজিতা হতেন। এখনও সারা বছরই চণ্ডীদেবীর পূজা হয়। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের একটি মঙ্গলবারে হোম-যজ্ঞ, চণ্ডীপাঠ সহ বিশেষ পূজা ও ভোগরাগ হয়ে থাকে। ঐদিন প্রভাতে সানাই বাজিয়ে পল্লী পরিক্রমা, রাত্রিতে কীর্তন ও বাউলগান হয়। আবার জ্যৈষ্ঠ মাসের মঙ্গলবারেই দেবীর মঙ্গলচণ্ডী

রূপের পূজা হয়। এক কথায় কুন্দ্‌কুন্দার বাজার মহল্লার ইনি বহুমান্যা, লোকমান্যা দেবী।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করি শুধু কুন্দ্‌কুন্দার বাজারই নয়, বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমে চণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডীর বিশেষ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কোন কোন স্থানে দেবীর মূর্তি পূজা প্রচলিত থাকলেও অধিকাংশ স্থানেই হাতি-ঘোড়ার প্রতীক পূজাই প্রচলিত। চৈত্র মাসের শনি ও মঙ্গলবারগুলিতে বিষ্ণুপুরের দুর্গা, কালী, দশভুজা, কৈলাস, সঙ্কটতারিণী, শীতলা ও মনসা মন্দিরগুলি ছাড়াও রাধাকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গণেও চণ্ডী-দেবীর বিশেষ পূজা পূর্বক সারা রাত্রি-ব্যাপি নাম-সংকীর্তনের আয়োজনও নজরে পড়ে।

মল্লভূমে দেবী চণ্ডীর প্রভাব অসামান্য। তাই মল্লরাজ্যের প্রায় সর্বত্রই চণ্ডীমণ্ডপের ছড়াছড়ি। চণ্ডীপূজার সমারোহ। মা চণ্ডীর কথায় ছেদ বসিয়ে এখন আপনাদের ভাসিয়ে দেবো মল্লভূমের প্রবাদ প্রবাহে।

অধ্যায়-৭১

প্রবাদ-প্রবাহে মল্লভূম

পৃথিবীর ৬০০ কোটি মানুষের মধ্যে মাত্র ২০/২৫ কোটি মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। ভারতের দুটি রাজ্য, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার প্রধান ভাষা বাংলা। পৃথিবীর একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা এবং তা হল বাংলাদেশ। সর্বসাকল্যে মাত্র ২০/২৫ কোটি মানুষের ভাষা হলেও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরে নোবেল পুরস্কার লাভ করে আন্তর্জাতিক জগতে একটি বিশেষ স্থান করে নিয়েছে এই ভাষা। কবি অতুলপ্রসাদ সেন তাই গেয়ে উঠেছেন—

"মোদের গরব মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!"

বাংলা ভাষার তথা বাংলা সাহিত্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ লোক-সাহিত্য। সাহিত্য বাসরে লোক-সাহিত্যের অবদান কম নয়। বরং বলা চলে লোক-সাহিত্যের ভিত্তিভূমির উপরেই গড়ে ওঠে সাহিত্য-সৌধ। তাই যে দেশের লোক-সাহিত্য যত সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যময়, সে দেশের সাহিত্যও তত সমৃদ্ধ এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ। এ হেন লোক-সাহিত্যের অন্যতম তিনটি শাখা হল প্রবাদ, ছড়া, ও ধাঁধা। প্রবাদ শব্দটির অর্থ পরম্পরাগত উক্তি। ব্যাকরণের ভাষায় প্রকৃষ্ট বাদ (বচন) = প্রবাদ। অতীতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রবাদের প্রচলন ছিল আখ্‌ছার। এখন ব্যবহারিক জগতে এদের প্রয়োগ কমে গেলেও সাহিত্যের স্বর্ণাসনে এদের স্থান। কারণ এগুলি মানুষের দীর্ঘজীবনের কষ্টার্জিত অভিজ্ঞতার নির্যাস স্বরূপ। তাই বলা হয়েছে—'A proverb is a short sentence based on long experience.' প্রবাদবাক্যের মধ্যে একাধারে মানুষের সূক্ষ্ম মনস্তত্ব ও আচরণগত বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি তার সমগ্র জীবন দর্শনের প্রতিফলন ঘটে। জীব-জন্তু, পশু-পাখি, গাছপালা, ফুল-ফল, প্রাকৃতিক নিয়মাবলী সবই স্থান পেয়েছে প্রবাদে। স্থান করে নিয়েছে অমার্জিত অশ্লীল শব্দগুলিও। এবার আমরা মল্লভূমের মৌলিক প্রবাদের জগতে প্রবেশ করব। এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার প্রচার মিডিয়ার বহুল প্রচলন ও যন্ত্রযানের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে দূরের মানুষ এসেছেন কাছে, কাছের মানুষ সরে গেছেন দূরে।

মানুষজনের সাথে সাথে প্রবাদগুলিও হয়েছে স্থানান্তরিত। হয়েছে সার্বজনীন। তাই প্রবাদগুলির জন্মস্থান নিয়ে দেখা দেয় বিভ্রান্তি। সেই বিভ্রান্তির বেড়াজাল কাটিয়ে আমরা এখন অবগাহন করব মল্লভূমের প্রবাদ-প্রবাহে।

* বিষ্ণুপুরী মধুপুরী, ঢুকলে বেরাতে লারি।
* গোপালের ব্যাগার বা গোপাল সিং-এর ব্যাগার।
* ন্যাড়া খুঁজে ইঁদ পরব।
* মা খায় ভাচা ভেনে / ব্যাটা খায় এলাচ কিনে। (ভাচা ভেনে = ধান ভানিয়ে)
* উঠ ছুঁড়ি, তোর বিয়া কেস্তা বাঁধা দিয়া।
* উঠল বাই, কটক যাই।
* মাগের বিয়া দিয়ে কুটুম বাড়িয়ে লাভ নাই। (মাগ = স্ত্রী)
* গুমা হলেও ময়দা ভাল / বেদা হলেও বনাদী বটে।
* ভজকৃষ্ণ, ভজকষ্ট, ভজকট।
* আর কি আমার সেদিন আছে / এক খিলি পানে দু'দিন গেছে।
* পচা আদার ঝাল বেশী / ফঁপরা ঢেঁকির আওয়াজ বেশী।
* ঢেঁকি যতই মাথা লাড়ুক, গড়ে এসে পড়বেক।
* বাঘে যখন খেতে না পায়, তখন কাঁকড়িও খায়।
* ন্যাংটার নাই বাটপাড়ের ভয়।
* চোরের চৌষট্টি বুদ্ধি, ঢ্যামনার আশি, বেশ্যার বিরাশি।
* বাঁকুড়াবাসী; মুড়ি খায় রাশি রাশি, আবার জজ হবার অভিলাষী।
* নিজের কাঠ উই-এ খায় / কাঠ কুড়াতে বনকে যায়।
* গরজে ধান ভেনে খায় মরদে।
* গরজে গয়লা পাথর বয়।
* গাই আনবি ঝাপড়ি, বউ আনবি ফেতড়ি। (ফেতড়ি = সাদাসিধা)
* গোকুলের ঘর আর বার।
* যাচলে জামাই খায় নাই রুই মাছের মুড়া,
শেষকালে পায় নাই ঢেঁকশালের কুড়া।
* আঁচ খর খর আঁসকা পিঠা, মন্দ জ্বালে রুটি,
তার অদ্ধেক সরুচুকলি, করবে গুটি গুটি।
* চোর ঢ্যামনের মুখে দড়, বিষ্টু-বাড়ি যায় ঘন ঘন।
* পিঠা পরব ম্যায়াদের গরব; ভুঁইয়ে না পড়ে পা,
মরদদিকে গটা গটা দিয়ে, নিজেরা ভাঙা ভাঙা গুলা খা।
* বেহায়ার নাই লাজ, নাই অপমান ;
সুজনকে এক কথা মরণ সমান।

* ভালবাসার এমনি গুণ, পানের সঙ্গে যেমন চুন
  বেশী হলে পুড়ে গাল, কম হলে লাগে ঝাল।
* অতি পিরিতি যেথা, নিত্যি যেও না সেথা
  নিত্যি যদি যাবে, ঝাঁটার বাড়ি খাবে।
* পেটে পড়ে না শাক চচ্চড়ি, গপ্পে মারে দই
  কলকে খাবার ঠিকরে নাই, বলে গড়গড়াটা কই।
* ভগবান কাউকে চুমো খেয়ে পৃথিবীতে পাঠায়
  কাউকে পাঠায় পাছায় লাথ মেরে।
* রাখব আমি দুধে-ভাতে, দেখব আমি বাঘের চোখে।
* কপাল যখন হয় মন্দ / জুলাপ খেয়েও পায়খানা বন্ধ।
* চোখ মিট্‌মিট্‌ করে খালি / নাম রেখেছে নজরআলী।
* বাদলে-সন্ন্যাসী পিঁয়াজ-মুড়িও খায়।
* ভগবান যাকে বড় করে সে বড় হয়।
* একুশ টাকার চাকরি করে মুখে রেখেছে মচ,
  সেই গরবে গরব করে মাগে দেয়না ছঁচ।
* ভাতার আমার ভাত দেয় নাই গেলম পরের ঘরে,
  পেটের জ্বালায় সব বিকালম তাও বলছে ধারে।
* যেখানে নাই গতি / বরাই ভগবতী।
* বাড়লে চাষা বামুন খায়, কমলে খায় গরু।
  মধ্যবিত্ত হ'লে চাষা, মাঠকে পাঠায় জরু।
  (১-ম খায় মানে অগ্রাহ্য করে, ২-খায় মানে বেচে, জরু মানে স্ত্রী)
* হিঁয়ায় নাই হুঁয়ায় দড় / আহাম্মকের পাত্‌তাড়িটা বড়।
* মাপতে নাই, পাইটা ডাগর।
* অ্যাং লাফ দেয়, ব্যাঙ লাফ দেয়
  খইসা বলে আমিও এক লাফ দিই। (খইসা মানে খোস-পাঁচড়া হওয়া রুগ্ন লোক)
* ছেলা খেয়ে জনম গেল, আজকে বলে ডান।
* শ'য়ে সুপারী, হাজারে পান, লাখ টাকা চাবি দিয়ে তবে বিড়ি টান।
* বাড়ুইয়ের চালে খড় নাই বা বাড়ুইয়েরই চাল ছেঁদা।
* চাল-চুলা নাই যার, নাম তার জমিদার।
* ন্যাড়া নেড়ি খুঁজে খোল / পেদো মেয়ে খুঁজে গোল।
* বিরাল ব্যবসায় হাঁঞ্জুড় লাভ। (বিরাল = বিড়াল, হাঁঞ্জুড় = নখের আঁচড়)
* লাগাও খুঁটি বাইরে শুব।
* কি করবেক বেতনে / মেরে দুব খ্যাটনে।

* পদি আবার ম্যায়া, তার দুপায়ে আলতা।
* কানা কন্যার নানা রোগ / চোখে ছানি পায়ে গোদ।
* কত রঙ্গ দেখালি গুইয়ে, তুলসী তলায় শুয়ে শুয়ে।
  (ফন্দিবাজ লোকের নানা ফন্দি-ফিকির)
* নিমুস্কা ডান, সবস্ব খান। (সবস্ব = সর্বস্ব)
* ছুতাহাঁড়িতে বাজ পড়েছে। (আজগুবি কথা)
* ঝোড়ের ভৈরব পূজা পায় না।
* রামায়ণ ছিঁড়ে ডাঁস ঘুড়ি। (তুচ্ছ জিনিসের জন্য মূল্যবান জিনিস নষ্ট করা)
* তেল, তামাক, ময়দা / যতই মাখবে ততই ফয়দা। (ফয়দা = লাভ)
* মদুনিতে খড় নাই, ঝিঁট-চালার বাহার।
* কুঠার আবার চানজলের ভয়। (কুঠার = কুষ্ঠরোগীর, চানজল = স্নানজল)
* ল্যাকা ল্যাকা পেয়াদা, আসামী ধরার যম।
* চাস যদি তুই সুখের দিন / দুটা ধাড়ি ছাগল কিন।
* বড়লোকের খেয়াল, ফাটা দেয়াল আর ক্ষ্যাপা শিয়াল—তিন শালাই সমান।
* বাউরীর যখন লক্ষ্মী ছাড়ে / বরাকে তখন ঝাঁটা মারে।
* পঁদে নাই রিংগি, ভজরে গোবিন্দি।
* পঁদে নাই চাম, সেনাপতি নাম।
* ঘণ্ডায় তেল নাই, আলোয় খিরখুট্টি।
* ঢ্যামনার ঢেউ, বুঝতে লারে কেউ।
* উপরে হরি হরি, ভিতরে ডিঙলা চুরি।
* অভাগার বাপ মরে ভাদ্র মাসে
  ভাগ্যবানের বাপ মরে পৌষ মাসে
* ভাদ্র মাসের কচুর লতি / বুড়ি হলে সবাই সতী।
* মাঘের জাড় বাঘ। (জাড় = শীত)
* আম গাছেই আম ফলে।
* ম্যায়াছেলার প্রাণ, কই মাছের সমান।
* সাপ জব্দ সিজের মূলে / বউ জব্দ কিলে।
* গরীবের চালে বীর লড়াই।
* পঁদ ন্যাংটা, মাথায় ঘোমটা।
* বারহাত কাপড়েও ম্যায়া ন্যাংটা।
* মরে ম্যায়া, উড়ে ছাই / তবে তার গুণ গাই।
* পিঠে বেঁধেছি কুলা, যত কিলাবি কিলা।

* ধেনাই বেচে ধান, পেনাই বেচে পান
লয়-লচ্ছারে কথা বলবেক, কত দিবি তাই কান।
* টাকা নিবি গুণে, পথ চলবি চিনে, থেমে থাকবি তিনে।
* যাচা ধন, কাচা- কাপড় ছাড়তে নাই।
* মাতালের বউ লক্ষ্মী হয়।
* পোদ্দারের ঠুকুর ঠুকুর, কামারের এক ঘা।
* জাতের বকা ময়রা, পাখির বকা পায়রা।
* শুঁড়ির নাই কান, মুচির নাই নাক।
* গয়লা, আশি বছর বয়সেও নাবালক।
* গন্ধক বেণা উত্তম জাত / সকালে সিনান্ সন্ধ্যায় ভাত।
* জাতের মধ্যে তিলি, গুড়ের মধ্যে ভেলি,
ঠাকুরের মধ্যে কালী, কুটুমের মধ্যে শালি।
* বামুন, গরু, ছাগল, তিনই দড়ির পাগল।
* দেখলে রতি, ছুঁলে আনা, তবে জানবি সোনার বেনা।
* ল'টিকে বল না ল'টি, উলটে ধরবেক চুলের মুঠি। (ল'টি = বেশ্যা)
* কলির বামুন ঢোঁড়া সাপ।
* বোষ্টম টম্ টম্, হাঁড়ির ভিতর মালা রেখে কাঁকড়ি খাবার যম।
* মরা তামলী ভাসে জলে, কাক বলে আছে কুন ছলে।
* হাতি ঠেলা ধান চাল, তবে জানবি পাঁচাল। (পাঁচাল একটি গ্রামের নাম)
* ও ছুঁড়ি তোর লাজ কেমন? লাজ থাকলে কি হই ঢ্যামন।
* ও আহ্লাদী মরিস না, লোক হাসিটা করিস না। (শাশুড়ি বউকে বলছে)
* কুন বউকে বলব ভাল, ভাত দিয়ে বউ হাগতে গেল।
* পর পুরুষের ঘর করচু শুনে কেমন করে।
ভাসুরের সঙ্গে থেকেই আমি লজ্জায় যাই মরে।

মল্লরাজ্যে ছড়িয়ে থাকা অগণিত প্রবচন-বাক্যের মধ্যে প্রায় শ'খানেক শোনালাম।

অধ্যায়-৭২

শ্রীশ্রীসত্যপীর সাহেব, সত্যপীরতলা

মুখরোচক এবং বুদ্ধিদৃপ্ত প্রবাদ বাক্যগুলির রসাস্বাদন করতে করতে আমরা এসে গেছি সত্যপীরতলার শ্রীশ্রীসত্যপীর সাহেবের আস্তানার সম্মুখে। সুপ্রাচীন এই বটবৃক্ষমূলে অবস্থিত অতি সাধারণ মানের পঞ্চরত্ন-মন্দিরের আদলে নির্মিত এই দেবস্থানটিই বাবা সত্যপীর সাহেবের আস্তানা। এ প্রসঙ্গে বলি, সত্যপীর সাহেব অবশ্যই সত্যনারায়ণ ঠাকুর

নন। ইনি ছিলেন একজন সিদ্ধ-মুসলমান ফকির। সুদূর অতীতে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ৭৫০/৮৫০ বছর পূর্বে ইনি লালবাঁধের পূর্বপাড়ের শ্বাপদ-সঙ্কুল ঘন-জঙ্গলে অবস্থান করতেন। এঁর আস্তানা বলতে কোন কিছুই ছিল না। ছিল দেওয়াল এবং আচ্ছাদন-বিহীন স্বল্পোচ্চ এক মাটির বেদী। বারোমাসই খোলা আকাশের নীচে সেই মাটির বেদীর উপর উপবেশন করে আল্লার উপাসনা করতেন ফকির সাহেব। কথিত আছে, প্রবল বর্ষণে চারদিক যখন ভেসে যেত জলে তখনও ঐ বেদীর উপর বৃষ্টি পড়ত না এক ফোঁটাও। হাড় কাঁপানো শীত, কিংবা কাঠ-ফাটা রোদ্দুরে বিন্দুমাত্র বিচলিত হতেন না তিনি। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সব ঋতুতেই ছিল তাঁর সমভাব। এই সিদ্ধ ফকির কখন আহার করতেন এবং কখনই বা নিদ্রা যেতেন—সবই ছিল সর্বসাধারণের অজ্ঞাত।

কথিত আছে একবার একটি গরু ফকির সাহেবের আস্তানার চাউল খেয়ে ফেলে। ক্রোধান্বিত ফকির সাহেব গরুটিকে জবাই করেন সাথে সাথে। অবশ্য ধড় থেকে মুণ্ডটি পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন না হয়ে লেগে ছিল যৎসামান্য অংশ। সদ্যঃপ্রসূতা ঐ গাভীটি ছিল বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের। ফকিরের কাণ্ড-কারখানা শুনে বিষ্ণুপুর-রাজ স্বয়ং মাহুত সহ হাতিতে চড়ে রওনা হন ক্ষেত্রস্থলের উদ্দেশ্যে। কাছাকাছি গিয়ে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে পথিমধ্যে বসে পড়ে হাতিটি। রাজ-নির্দেশে মাহুত ক্ষেত্রস্থলে হাজির হয়ে স্বচক্ষে দেখেন সেই মর্মান্তিক দৃশ্য এবং মহারাজের আগমন-বার্তা সবিনয়ে নিবেদন করেন ফকির সাহেবকে। হাতিতে চড়ে ফকির সাহেবের সাথে দেখা করতে আসার স্পর্ধা মনঃপূত হয়নি অন্তর্যামী সাধকের। সাধক-ফকিরের উপদেশ মতো পাদুকা পরিত্যাগ পূর্বক পদব্রজে ভক্তি-বিনম্র অন্তঃকরণে তাঁর সকাশে আসেন স্বয়ং রাজাধিরাজ। জবাইকৃত রক্তাপ্লুত গরুটির দিকে তাকিয়ে ব্যথিত হন যার-পর-নাই। রাজার গোয়ালঘরে বাঁধা মা-হারা দুগ্ধপোষ্য গো-শাবকটির সকরুণ আর্তনাদের কথা নিবেদন করা হয় সত্যপীর সাহেবকে। একথা শুনে ক্রোধ প্রশমিত হয়ে ফকির সাহেবের হৃদয়ে তৎক্ষণাৎ উৎসারিত হয় অন্তঃসলিলা দয়ার ফল্গুধারা। সম্মুখে দণ্ডায়মান মহারাজকে বলেন, 'বৎস! কালবিলম্ব না করে ফিরে যাও রাজপ্রাসাদে। তোমার পিছনে পিছনেই গিয়ে হাজির হবে গাভীটি।' মহারাজের বিশ্বাস হয় না এই অবিশ্বাস্য কথা। ভাবেন, এও কি সম্ভব! মৃত গরুটি যাবেই বা কি ভাবে! প্রাণ ফিরে পাবেই বা কেমন করে!

সত্যপীর সাহেব রাজার মনের কথা বুঝতে পেরে জবাই করা গরুটির নিকটে গিয়ে গরুটির গায়ে টুসি মারেন তিনটি। অস্ফুটে উচ্চারণ করেন দু-চারটি শব্দ। সাথে সাথে জুড়ে যায় ক্ষতস্থান। গরুটি ফিরে পায় প্রাণ। নড়েচড়ে উঠে চকিতে এবং বিস্ময় বিমূঢ় মহারাজের পশ্চাদনুসরণ করে মন্ত্রচালিতের মতো।

কথিত আছে, এহেন সিদ্ধ-সাধক সত্যপীর সাহেব একদিন উষাকালে বটবৃক্ষের একটি দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজতে মাজতে এবং পদচারণা করতে করতে এসে হাজির হন এই স্থানে এবং পরিত্যক্ত সেই দাঁতনটি সযত্নে পুঁতে দেন এখানেই। স্থানীয় জনগণকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'জল বা বেড়া দেওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। গাছ হবে। গরু-ছাগলে মুখও দেবে না।' হয়েছিলও তাই। এই সেই বটবৃক্ষ। না, সেই বটবৃক্ষ নয়, সেই বটবৃক্ষের কয়েকটি ঝুরি-নামা-গাছ। কারণ মূল কাণ্ডটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে কবে কে জানে।

ফকির সাহেব সেদিন উচ্ছিষ্ট সেই দাঁতনটি রোপণ করেছিলেন সত্যপীর সাহেবের বর্তমান পূজারী সেখ আহম্মদ সাহেবের কোন এক পূর্বপুরুষের জমিতে। পীর সাহেবের অলৌকিক শক্তির কথা জানা ছিল বিষ্ণুপুরবাসীদের তথা সর্বসাধারণের। সকলের ভক্তি-

শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তিনি। ফকির সাহেব যেহেতু স্বহস্তে ঐ দাঁতন কাঠিটি পুঁতেছিলেন এইখানে সেহেতু তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধাভক্তির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে বর্তমান পূজারী সেখ আহম্মদের জনৈক পূর্বপুরুষ এই বিশেষ স্থানটিকে সত্যপীর সাহেবের নামে মনে মনে উৎসর্গ করে শুরু করেন সত্যপীর সাহেবের পূজা।

প্রথমে বৃক্ষমূলেই পূজা হত। পরে হয়েছিল মাটির মন্দির, তারও পরে আজ থেকে প্রায় শ-দেড়েক বছর আগে নির্মিত হয়েছে ক্ষুদ্রাকৃতির এই পাকা আস্তানা। কথিত আছে, এই আস্তানার প্রবেশ-পথের দু'পাশে অবস্থিত বর্তমানের সিমেণ্ট নির্মিত ব্যাঘ্রমূর্তি দুটি মাটি ভেদ করে উঠে এসেছিল আপনা-আপনি। বংশপরম্পরায় চৌদ্দ পুরুষ যাবৎ সত্যপীর সাহেবের পূজা করে আসছেন এঁরা।

সত্যপীর সাহেবের বিশেষ পূজা হয় বৃহস্পতিবার। ঐদিন সকাল থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত দফায় দফায় পূজা করা হয় সত্যপীর সাহেবকে। হিন্দু সাধু-সন্তদের মতোই মুসলমান পীর, ফকিরদের কাছেও বৃহস্পতিবার অতি পবিত্র দিন। এজন্যই হয়তো বৃহস্পতিবারে এই বিশেষ পূজা। আবার এমনও হতে পারে বৃহস্পতিবারেরই এক প্রত্যুষে হয়তো এই স্থানে আগমন-পূর্বক দাঁত মাজা কাঠি পুঁতেছিলেন ফকির সাহেব। সেজন্যই হয়তো বৃহস্পতিবারে সারা দিনই পূজা।

আহম্মদ সাহেব জানালেন, প্রতি বৃহস্পতিবার বাবা সত্যপীর সাহেব তাঁর সূক্ষ্মদেহে এখানে আগমন করেন, থাকেন সারারাত্রি এবং শুক্রবার এই স্থান ত্যাগ করে চলে যান। এজন্যই বৃহস্পতিবারের পূজা বিশেষ ফলদায়ক। আবার ঐদিন সন্ধ্যার দিকে চাঁদোয়া টাঙ্গিয়ে হয় বাবার বিশেষ সাম্মানিক পূজা।

সত্যপীর সাহেবের কাছে মানত করে অনেক নিঃসন্তান দম্পতি লাভ করেছেন বংশে বাতি দেওয়ার জন্য পুত্র-সন্তানের মতো সম্পত্তি। গরু, বাছুর জাতীয় গবাদি পশু এবং কাচ্চা-বাচ্চা ছেলে মেয়েদের নজর দোষ, কুদৃষ্টি, হাওয়া লাগা প্রভৃতি ছাড়াও দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ের জন্য বাবার কাছে হাতি-ঘোড়া, সিন্নিভোগ, বা মণ্ডা-পাটালি সহ ধূপ, দীপ, মোমবাতি জ্বালিয়ে পুজো দেওয়ার মানত করে অনেকেই হয়েছেন সফলকাম। অনুগত ভক্তবৃন্দের প্রতি বাবা অল্পেই সন্তুষ্ট। পক্ষান্তরে দুর্বিনীত ব্যক্তি, অবিচারী এবং ব্যভিচারী-অপরাধীদের প্রতি বাবা আবার বড়ই রুষ্ট। এতাদৃশ অপরাধীরা অকালে মৃত্যুমুখেও পতিত হয়েছেন বাবার রোষে। এ প্রসঙ্গে সেখ আহম্মদ জানালেন, একবার রাস্তার উপর দিয়ে বৈদ্যুতিক তার নিয়ে যাওয়ার জন্য পীরসাহেবের আস্তানার বটগাছটির কিছু ডালপালা ছাঁটার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কেউই কাটতে রাজী হননি ঐ ডালপালা। শেষ পর্যন্ত জনৈক ব্যক্তি পুরোহিত আহম্মদ সাহেবের নিষেধ সত্ত্বেও ঐ গাছের ডালপালা কাটেন হামবড়িয়া ভাব দেখিয়ে। দেখা গেল, মাস খানেকের মধ্যেই অসাধ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি। আর একটি ঘটনা ঃ জনৈক রিক্সাওয়ালা মদ্যপান করে বৃহস্পতিবার রাত্রিতে পীরবাবার মন্দির-চত্বরে রাত্রি যাপন করেন যথারীতি পুরোহিতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে। দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁরও পরলোক প্রাপ্তি হয় অল্প কিছুদিনের মধ্যেই। এরকম আরো অনেক ঘটনা শোনা যায়। এসব থেকে মনে হতে পারে যে বাবা খুবই উগ্র। কিন্তু তা নয়। তিনি ভক্তবৎসল। আশ্রিত বৎসল। এ বিষয়ে ৬২ বছর বয়স্ক পূজারী আহম্মদ সাহেব একটি ঘটনার উল্লেখ করলেন। ঘটনাটি নিম্নরূপ ঃ—

বাবার ক্ষুদ্র পাঁচচূড়া মন্দিরটির ভিতরে অর্থাৎ বাবার আস্তানার অভ্যন্তরে সেবার

একটি কুকুর কয়েকটি বাচ্চা দেয়। দারুণ অস্বস্তিতে পড়ে যান পূজারী ঠাকুর। ভাবছেন, বাবার আস্তানায় কুকুর, কুকুরের বাচ্চা! এটা ঠিক নয়। তাড়িয়ে দেবো কাল সকালেই। কিন্তু তাড়ানোর আর সুযোগ হল না। বাবার নির্দেশ এসে গেল,—'ওরা আছে, থাকবে। সময়ে আপনা-আপনিই চলে যাবে আবার। তুই তাড়িয়ে দেওয়ার কে?'

আহম্মদ সাহেব অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেন বাবার আদেশ-নির্দেশ। ভক্তবৎসল বাবা সত্যপীরের শ্রীচরণযুগলে শত সহস্র সেলাম জানিয়ে এখন আমরা পাড়ি দেব পোকাবাঁধের উত্তর পাড়ে।

অধ্যায়-৭৩

প্রসঙ্গ পোকাবাঁধ ও পোকাবাঁধের দেব-বিগ্রহ সমূহ, মা শীতলা এবং বিষ্ণুপুরের চব্বিশ প্রহর

বিষ্ণুপুরের সাতটি বাঁধের মধ্যে শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত এই পোকাবাঁধ। পূর্বেই বলেছি, বাঁধটির প্রকৃত নাম ছিল বীরবাঁধ। এটি খনন করান সম্ভবতঃ মহারাজ বীর মল্ল বা বীরসিংহ দেব। অতীতে কোন এক সময়ে পোকাবাঁধের জলে অজস্র পোকা হয়। জলে পোকার প্রবল প্রাদুর্ভাবের জন্য বীরবাঁধ হয়ে যায় পোকাবাঁধ। এই বাঁধের উত্তরপাড় সংলগ্ন উত্তর দিকের নিম্নভূমিতে ছিল কাজুলে বাঁধ। বর্তমানে কাজুলে বাঁধের অস্তিত্ব অবলুপ্ত। কাজুলে বাঁধকে অনেকেই অবশ্য বাঁধ হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। সংস্কারের অভাবে পোকাবাঁধও ক্রমশঃ মজে যাচ্ছে দিনে দিনে।

বাঁধের উত্তরপাড়ের ঈশান কোণে রয়েছে **মহাবীরজী** তথা **হনুমানজীর** সাদামাটা ছোট-খাটো শ্রীমন্দির। সত্যপীরতলা নিবাসী মহাবীর দারুকা নির্মিত মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় হাজরাপাড়া নিবাসী শম্ভু কর্মকারের হাতের খোদাই মূর্তি। বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব বশতঃ এখানে রামায়েত বৈষ্ণব এবং রাম-ভক্তের অভাব ছিল না, আজও নেই। পূর্বেই উল্লেখ করেছি মল্লরাজাদের অস্থলগুলিতে রাম-সীতার উপাসনা ছিল সুনির্ধারিত। অস্থল ছাড়াও বিষ্ণুপুর শহরের বোলতলা মহল্লায় রয়েছে একটি রাম-মন্দির। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্রের পূজা-অর্চনার পাশাপাশি এখানে রামভক্ত হনুমানজীর মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা হওয়াটাই স্বাভাবিক। তাই শুধু পোকাবাঁধ নয়, বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন স্থানে—যেমন মাধবগঞ্জ, কৃষ্ণগঞ্জ, ষ্টেশনরোড, হরিতপোবন আশ্রম (তুড়কী) প্রভৃতি পল্লীতে মহাবীর পূজার প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। এসব স্থানে হয় মকর-সংক্রান্তি, নয়তো এখান উৎসবের দিন, নয়তো বা মাকরী-সপ্তমীর দিন মহাবীরের বিশেষ পূজার বিধি আছে। ঐদিন ঠাকুরকে ঘি-সিন্দুর মাখিয়ে ঘি-খিচুড়ি নিবেদন করে বালক-ভোজন এবং নরনারায়ণ সেবার প্রথা নিয়মসিদ্ধ। পোকাবাঁধের মহাবীরের বিশেষ পূজা হয় মকর-সংক্রান্তির দিন, কৃষ্ণগঞ্জে হয় এখান উৎসবের দিন, মাধবগঞ্জে হয় মাকরী-সপ্তমীর দিন এবং হরিতপোবন আশ্রমে হয় শ্রীরামনবমীর উৎসবের সময়।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করি, সুস্বাস্থ্য কামনায় এবং মহাবীরের মতো বলশালী অটুট স্বাস্থ্য-সম্পদ কামনায় মল্লভূমের ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের মধ্যেও বছরে একদিন; বিশেষতঃ পৌষ-মাঘ মাসে ঘি-খিচুড়ির ভোগরাগ সহকারে মহাবীর পূজার প্রথা ছিল। সে প্রথা

প্রায় গা-ঢাকা দিয়েছে এখন।

এখানে মহাবীরজী ছাড়াও তিন **তিনটি শিবলিঙ্গ** প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন। একটি মহাবীরজীর পশ্চিমদিকের বটবৃক্ষমূলের সিমেন্টের বেদীর উপর, অন্য দুটি মন্দিরাভ্যন্তরে। প্রায় একশত দশ বছর পূর্বে নির্মিত এই শিবমন্দিরদ্বয় গঠন-শৈলীতে একেবারে অনুরূপ। বৈষম্য হল পূর্বদিকের মন্দিরটি পশ্চিমমুখী, পক্ষান্তরে পশ্চিমদিকের মন্দিরটি পূর্বমুখী। পূর্বদিকের মন্দিরে আছে শ্বেতপাথরের ক্ষুদ্রাকৃতির শিবলিঙ্গ, পশ্চিমদিকের মন্দিরটিতে রয়েছে তুলনামূলকভাবে বৃহদাকার কালো পাথরের শিবলিঙ্গ। কথিত আছে, মল্লেশ্বর মহল্লা নিবাসী ঁঅপূর্ব চন্দ্র ভট্টাচার্য এই মন্দিরদ্বয় প্রতিষ্ঠা করান।

'পোকাবাঁধ উত্তরপাড় সংস্কার কমিটি'র সম্পাদক শ্রীমধুসূদন দত্ত জানালেন, এই দুই শিব-মন্দিরে নিত্যপূজা ছাড়াও শিবরাত্রি তিথিযোগে বিশেষ পূজা হয় এবং সারারাত্রি ব্যাপী চলে শিবপূজা ও নাম-সংকীর্তন।

এই বাঁধটির উত্তরপাড় আর একটি কারণে যথেষ্ট গুরুত্ব লাভ করেছে। অতীতে অর্থাৎ মল্লরাজত্বকালে নির্মিত একটি চটি বা অতিথিশালা ছিল এখানে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে 'বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে' চালু হওয়ার পর সারদা মা জয়রামবাটি থেকে বিষ্ণুপুর হয়ে রেলগাড়িতে চড়ে দক্ষিণেশ্বর যাতায়াত করতেন। প্রথম দিকে যাতায়াতের পথে মা পোকাবাঁধের চটিতে বিশ্রাম নিতেন সদলবলে। সেই সময় ঘটে এক ঘটনা। সে ঘটনাটি পূর্বেই উল্লেখ করেছি। প্রয়োজনে আর একবার স্মরণ করিয়ে দিই। ঘটনাটির বর্ণনা দিতে গিয়ে স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ মহারাজ সম্পাদিত **'শ্রীশ্রীমায়ের পদপ্রান্তে'** পুস্তকে লেখা হয়েছে, "শ্রীমার বিষ্ণুপুরে পোকাবাঁধের চটিতে অবস্থানকালে সর্বাঙ্গ ধবল হয়ে গেছে, এমন একটি লোক মাটি হাতে আসে—শ্রীমার চরণরজঃ করে নেওয়ার অভিপ্রায়ে। কিন্তু চরণরজঃ দিতে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে শ্রীমা বলেছিলেন, 'তুমি যাও, মৃন্ময়ীর মাড়োয় হত্যে দাওগে—অসুখ সেরে যাবে।' " (২য় খণ্ড, পৃঃ—৪১১)

সারদা মা যে চটিতে বিশ্রাম করতেন তা ধ্বংস হয়ে যাবার পর যাত্রীসাধারণের বিশ্রামস্থলের অভাব অনুভব করে বিষ্ণুপুর বোলতলা নিবাসী প্রখ্যাত সূতা-ব্যবসায়ী ঁমাখন লাল দে ওরফে **'সূতা মাখন'** ১৩৪৩ বঙ্গাব্দে উক্ত শিবমন্দির দ্বয়ের মধ্যস্থলে সর্ব-সাধারণের সুবিধার্থে এই চাঁদনি বা যাত্রীনিবাস নির্মাণ করিয়ে দেন স্বীয় অর্থে। ঁমাখনলাল মহাশয়ের বংশধরগণের মধ্যে শ্রীতপন কুমার দে (পঞ্চু দে), শ্রীঅশোক কুমার দে ও শ্রীসাধন কুমার দের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তাঁরা এখন বস্ত্র ও রেডিমেড পোশাকের ব্যবসায় নিযুক্ত।

এই বাঁধটির উত্তরপাড়ে যেমন রয়েছে বাসস্ট্যাণ্ড, তেমনিই পশ্চিমপাড়ে আছে চকবাজার অর্থাৎ বিষ্ণুপুরের 'বড় বাজার'। বাজারের মধ্যে রয়েছে **মা শীতলার** থান বা শীতলামাড়ো। মল্লভূমে শীতলা দেবীর প্রভাব প্রতিপত্তি প্রভূত। বসন্ত রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন শীতলা। এই রোগের প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই দেবীর পূজার প্রচলন। গাধা-বাহিনী এই দেবী চণ্ডীর ধ্যানে পূজিতা হয়ে থাকেন। শীতলা দেবী প্রসঙ্গে গবেষক মাণিকলাল সিংহ তাঁর 'সুবর্ণরেখা হইতে ময়ূরাক্ষী'—২য় খণ্ডের ১১৫ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন, "পূর্বেই বলিয়াছি যে বাঁকুড়া জেলার রাইপুর থানার অন্তর্গত মণ্ডলকুলী গ্রামে অঞ্চল বিখ্যাত শীতলামূর্তি রহিয়াছে। শীতলা দেবী সব গ্রামেই প্রতিষ্ঠিতা। মড়ক মহামারীর সময় শনি/মঙ্গলবার ধরিয়া শীতলা পূজা হয়। শীতলা ঝাড়গ্রামের সীমানা

অতিক্রম করার পর কাঁসাই মেদিনীপুর সদর থানায় প্রবেশ করিয়াছে। নদীর অগ্রগতির সঙ্গে মনসার ঘটপূজার তুলনায় শীতলার ঘটপূজার মাত্রা বাড়িতেছে দেখা যায়। কলাইকুণ্ডা গ্রামের জনৈক কবিশঙ্কর শীতলা মঙ্গলের পুঁথি রচনা করিয়াছেন। কবি শীতলা দেবীর যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে শীতলা দেবীও এক ডাকিনী। ডাকিনীর মত তিনি নগ্না, তাঁহার হাতে ঝাঁটা, কোমরে চুবড়ি। ডাকিনীরা রোগের বীজ ছড়াইয়া দেয় ইহাই লোক সংস্কার। শীতলা দেবীর ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে তিনি মড়ক মহামারীর (বসন্ত, কলেরার) বীজ ছড়াইয়াছেন। তাহারই ফলে গ্রামে গ্রামে মড়ক/মহামারীর প্রাদুর্ভাব হইতেছে।"

শীতলা দেবী অপদেবী এ যুক্তি মানতে চান না মল্লভূমবাসীগণ। তাই দেখি খোদ শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বপুরুষগণ থেকে শুরু করে সমাজের উচ্চ, মধ্য এবং নিম্নস্তরের মানুষেরাও এই দেবীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। মল্লরাজ্যে তাই শীতলা দেবীর ছড়াছড়ি।

১৪১০ বঙ্গাব্দের হিসেবে প্রায় ৯০ বছরের পুরানো, চকবাজারে অধিষ্ঠাত্রী এই শীতলা দেবীর নিত্যপূজা ছাড়াও দোলপূর্ণিমার আগের শনি অথবা মঙ্গলবার দেবীর বাৎসরিক বিশেষ পূজা অনুষ্ঠিত হয় ভোগরাগ ও চণ্ডীপাঠ সহকারে। মানসিক অনুসারে ঐ দিন **'দণ্ডি-ভক্ত'** হন অনেকেই। বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যমণ্ডিত হোলিগানের ফি-বছর বাৎসরিক উদ্বোধন হয় এই দেবী-মাড়োতেই। চকবাজার ষোলআনা দ্বারা পরিচালিত শীতলা পূজার প্রসঙ্গে ইতি টেনে আমরা এখন দেখব পোকাবাঁধের পশ্চিমপাড়ের বাঁধের ঘাটে নামার মুখে একটি নব-নির্মিত পাকাপোক্ত সুদৃশ্য আটচালা এবং আটচালার উত্তর দিকে সদ্যনির্মিত মার্বেল পাথরের ক্ষুদ্রাকৃতির শ্রীমন্দিরে সদ্য প্রতিষ্ঠিত মার্বেল পাথরের গৌর-নিতাই জীউ-এর যুগল বিগ্রহ। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ। চকবাজার যুবগোষ্ঠী দ্বারা নির্মিত এই মন্দির সংলগ্ন নাটমন্দিরে প্রতি বছরই জ্যৈষ্ঠ মাসে হয় চব্বিশ প্রহর উৎসব।

মল্লরাজ্যে **'চব্বিশ-প্রহর'** শব্দটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ এবং বিশেষ অর্থবহ। কারণ অঙ্কের হিসেবে আট প্রহরে হয় দিবারাত্রি। সে হিসেবে চব্বিশ প্রহর মানে তিন দিন তিন রাত্রি। তাই এখানে 'চব্বিশ-প্রহর' বলতে বোঝায় সংকল্প-পূর্বক তিন দিন ও তিন রাত্রি ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন। আরো লক্ষণীয়, 'চব্বিশ-প্রহর' শব্দটি এই অঞ্চলে অর্থ-সংকোচন এবং অর্থ-সম্প্রসারণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। যেমন সূর্যের উদয়াস্ত চার প্রহরের নাম সংকীর্তনকেও চব্বিশ প্রহর বলে, অহোরাত্রের অষ্টম-প্রহরের নাম-সংকীর্তনকেও চব্বিশ প্রহর; আবার তিন দিন, পাঁচ দিন, সাত দিন, ন'দিন, এমনকি চৌদ্দ দিন ব্যাপী হরিনাম-সংকীর্তনও 'চব্বিশ প্রহর' নামেই অভিহিত।

দোল-পূর্ণিমার পর থেকে রথযাত্রার আগে পর্যন্ত অমাবস্যা, পূর্ণিমা, শিবরাত্রি, শ্রীরামনবমী, অক্ষয়তৃতীয়া, বুদ্ধপূর্ণিমা প্রভৃতি বিভিন্ন তিথিযোগে অনুষ্ঠিত হয় 'চব্বিশ-প্রহর' উৎসব। তবে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসেই গ্রামে-গঞ্জে-শহরে চব্বিশ-প্রহরের ছড়াছড়ি। প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের মূর্তি অথবা গৌর-নিতাই-এর যুগল মূর্তির উপাসনা করে উদযাপিত হয় এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এই উৎসবের আনুষঙ্গিক অঙ্গ হিসেবে শহর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামের বিভিন্ন নাম-সংকীর্তনের দলকে আহ্বান করা হয় কীর্তন করার জন্য। সংকীর্তন দলগুলি পালাক্রমে নিরবচ্ছিন্নভাবে হরিনামে তথা রাধানাম, রাধাকৃষ্ণনাম, রামনাম ও গৌর-নিতাই বন্দনা-মূলক ভক্তিগীতির মাধ্যমে দেব-বন্দনা করেন অনুষ্ঠানের শুরু অর্থাৎ অধিবাসের

পর থেকে ধুলোট অর্থাৎ শেষ অবধি। এ উৎসবে জনসমাগম হয় বিকেল থেকে রাত্রি ১১টা, ১২টা পর্যন্ত। ঐ সময় 'চব্বিশ-প্রহর' প্রাঙ্গণ ছোটখাটো মেলার রূপ পরিগ্রহ করে। পুষ্প-সজ্জা, আলোক-সজ্জা, মানুষ-ছবি, রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক ঘটনার কাহিনী অবলম্বনে চিত্তাকর্ষক মৃন্ময় মূর্তি ছাড়াও যুগোপযোগী ব্যঙ্গমূর্তির উপস্থিতি উৎসবের আড়ম্বরকে ধনাঢ্য করে তোলে। দই-চিঁড়া, ফল-মূল ও মিষ্টান্ন এ উৎসবের ভোগরাগের প্রধান অঙ্গ।

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে কাঁটাবাড়ির সাধুআশ্রমে, শ্রীরামনবমী উপলক্ষ্যে তুড়কির হরিতপোবন আশ্রমে, অক্ষয়তৃতীয়া উপলক্ষ্যে রক্ষাকালী প্রাঙ্গণে, বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে নতুন মহলের শ্মশানকালীমাতার অঙ্গনে ছাড়াও শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউ প্রাঙ্গণে, সিদ্ধেশ্বরী শ্মশানকালী, ভাটপুকুর শ্মশানকালী, গোপালগঞ্জ, চকবাজার, বকুলতলা প্রভৃতি বহু স্থানে চব্বিশ-প্রহর হয় ফি-বছর। অনেকের ধারণা হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে দেবতাকে তুষ্ট করে সুবৃষ্টি কামনাই চব্বিশ-প্রহর উৎসবের অন্যতম উদ্দেশ্য।

'চব্বিশ-প্রহর' উৎসব মল্লভূমের গ্রামাঞ্চলে **'হরিসভা'**, **'হরিবাসর'**, **'হরিবোল'** নামেও সুপ্রসিদ্ধ। স্থানীয় লোকজনের মুখে শোনা যায়—**'খোল, বোল, জোল/ তিনে মিলে হরিবোল'** অর্থাৎ অবিরত শ্রীখোল বাজবে, হরিনাম বা হরিবোল ধ্বনিতে আকাশ, বাতাস মুখরিত হবে এবং জোল অর্থাৎ সারাক্ষণ উনোন জ্বলবে—মানে নরনারায়ণ সেবার ঢালাও ব্যবস্থা থাকবে। তবেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হবে হরিবাসর বা হরিসভা। বিষ্ণুপুর তথা মল্লরাজ্যে 'চব্বিশ-প্রহর' নামক এই বৈষ্ণবীয় ধর্মানুষ্ঠানটির প্রচার প্রসারের মূলে রয়েছে মল্লরাজাদের এবং মল্লভূমবাসীদের বৈষ্ণবধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা-ভক্তি তথা আনুগত্য। চৈতন্যোত্তর যুগে বিষ্ণুপুর প্রায় দু'শবছর যাবৎ বৈষ্ণব-ধর্মের প্রচার প্রসারের প্রধান কেন্দ্র ছিল। বৈষ্ণবতীর্থ বিষ্ণুপুরে তাই চব্বিশ-প্রহর তথা হরিনাম-সংকীর্তনের এতো ধুমধাম। কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রাম ও নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গ ভক্তের ছড়াছড়ি।

চব্বিশ-প্রহরের কথায় ছেদ টেনে আমরা এখন এগিয়ে যাব পোকাবাঁধের পশ্চিমপাড় সংলগ্ন চকবাজার সন্নিকটস্থ রাঠীগলিতে অবস্থিত রাঠীমন্দিরে।

অধ্যায় - ৭৪

রাঠীগলির রাঠীমন্দির

এই সেই রাঠীমন্দির। মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি থেকে জানা যায় যে এটি হ'ল শ্রী শ্রীগোপাললালজীউ-এর শ্রীমন্দির। গোপাললাল মানে নাড়ুগোপাল। গোপাললালজীউ-এর মন্দির হলেও রাঠী পরিবারের পারিবারিক মন্দির হিসেবে এটি রাঠী-মন্দির নামেই সর্বজনবিদিত। এই রাঠী-মন্দির নির্মাণের ইতিহাস সংক্ষেপে এরকম।

আজ থেকে প্রায় ১০০/১১০ বছর আগের কথা। বিষ্ণুপুরে এসেছেন একটি মাড়োয়ারী পরিবার। জগন্নাথ রাঠী, শিবদাস রাঠী ও নরসিংহ রাঠী—এই তিন ভাইয়ের যৌথ পরিবার। বিষ্ণুপুরে আসার পূর্বে এঁরা এবং এঁদের পূর্বপুরুষেরা বাঁকুড়া শহরে বসবাস করেছেন। রাজস্থানের বিকানীর জেলার এই পরিবারটি ভাগ্যান্বেষণে প্রথমে বাঁকুড়া শহরে এবং তারও পরে ব্যবসা সূত্রে এসেছেন বিষ্ণুপুরে। কেউ কেউ রয়ে গেছেন বাঁকুড়াতেই।

কোলকাতার খ্যাংরাপটিতে পূর্বোক্ত জগন্নাথ বাবুদের নিজস্ব গদি ছিল। খ্যাংরাপটির কাছাকাছি রয়েছে রাজাকাটরা বা রাজাকাটা। রাজাকাটরার রাজাবাবুর সাথে ব্যবসা-সূত্রে জগন্নাথ বাবুর বন্ধুত্ব হয়। সেই বন্ধুত্ব এবং হৃদ্যতার সূত্র ধরে ধর্মপ্রাণ জগন্নাথ বাবু রাজাকাটরার রাজাবাবুদের সাঁওরিয়া মন্দিরে বা শ্যামরায় মন্দিরে যাতায়াত করতেন ব্যস্তসমস্ত কর্মজীবনের ফাঁকে ফাঁকে। শ্যামরায় মন্দিরের দিব্য পরিবেশের প্রভাবে ঐশী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বীয় বাসস্থান বিষ্ণুপুরে একটি অনুরূপ শ্রীমন্দির নির্মাণের বাসনা তাঁর মধ্যে ঘনীভূত হয়। এছাড়া গুপ্তবৃন্দাবন বিষ্ণুপুরের স্থান-মাহাত্ম্য তথা কৃষ্ণ-বিষ্ণু উপাসনার দিব্যভাবধারাটিও তাঁর মনে ঈশ্বর-প্রেমের জোয়ার আনে। সৌভাগ্যের বিষয় জগন্নাথ বাবু পেয়েছিলেন লক্ষ্মণের মতোই ভাই। দাদার মন্দির নির্মাণের প্রস্তাবে সাগ্রহে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন ভক্ত সহোদর শিবদাস রাঠীও। নরসিংহ রাঠীর অকাল-মৃত্যুর কারণে তিনি রয়ে গেলেন নেপথ্যে। দুই ভাই-এর অনাবিল ভগবৎপ্রেমের ফল্গুধারার উৎকৃষ্ট ফসলরূপে তাঁদের বসতবাটি-সংলগ্ন উন্মুক্ত স্থানে নির্মিত হয় গোপাল-লালজীউ-এর শ্রীমন্দির। প্রতিষ্ঠিত হন ধাতু নির্মিত অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির নাড়ুগোপাল বিগ্রহ। দিন যায়। দিনের পিঠে দিন জমে জমে পেরিয়ে যায় বছরের পর বছর। কিন্তু শুধুমাত্র নাড়ুগোপাল অর্থাৎ নাড়ু বা লাড্ডু-প্রার্থী শিশু-কৃষ্ণের আরাধনা করে মন ভরে না ষোল-আনা। রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি উপাসনার জন্য ব্যাকুল হয় হৃদয়। সুতরাং রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তিও প্রতিষ্ঠিত হলেন শ্রীমন্দিরে। উত্তরণের পথে গোপাললালের হাত ধরে এলেন কৃষ্ণ, কৃষ্ণের হাত ধরে পরবর্তীকালে এলেন বিষ্ণু। বিষ্ণু মানে যুগ্ম নারায়ণ শিলা। দামোদর এবং গিরিরাজ নামক এই দুই বিষ্ণুশিলাও প্রতিষ্ঠিত হয়ে পূজিত হয়ে আসছেন রাধাকৃষ্ণ ও গোপাললালের সাথে। বল্লভাচারিয়া সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব ভাবধারার নিয়মানুসারে পূজা-অর্চনা হয় এখানের বিষ্ণুশিলাদ্বয়ের। এদিকে কৃষ্ণ-বিষ্ণুর প্রভাবাধিক্যে বালকৃষ্ণ গোপাললালের মন্দিরটি নামান্তরিত হ'য়ে **'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ঠাকুর-জীউ এবং শ্রীশ্রীশালগ্রামশিলা ঠাকুর-জীউ মন্দির'** আখ্যায় ভূষিত হল।

শ্রীবিগ্রহ-সমূহ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি তাঁরা পূজা পেয়ে 'আসছেন ভক্তি-নিষ্ঠা সহকারে। আড়ম্বরে ভাঁটা পড়লেও লঙ্ঘিত হয়নি পূজা-আর্চার নিয়মকানুন। তাই দেখি প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, দিবাভাগের প্রথম প্রহরে স্নান ও সাজবেশ অর্থাৎ শিঙারপর্ব। দুপুরে গোপালভোগ চালের অন্নভোগ, সাথে ভাজাভুজি, তরিতরকারি, পায়েস প্রভৃতি। বৈকালে ফল ও মিষ্টান্নভোগ, সন্ধ্যায় লুচি /পরোটা মিষ্টান্ন এবং শেষে দুধ নিবেদনের পর শয্যাগ্রহণ। একাদশীর দিন অন্নভোগ নিষিদ্ধ। গতানুগতিক দৈনন্দিন পূজা ছাড়াও জন্মাষ্টমী, অন্নকূট, উত্থান-একাদশী, দীপাবলী, শ্রীরামনবমী, রথযাত্রা এবং ঝুলন-যাত্রা উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজার ব্যবস্থা আছে। **এ মন্দিরের সবচেয়ে বড় উৎসব ঝুলনযাত্রা।** একমাস ধরে হয় ঠাকুরের ঝুলন-উৎসব—ঝুলনে দোল খান ঠাকুর। ঝুলন-পূর্ণিমার আগের পূর্ণিমা থেকে ঝুলন-পূর্ণিমা দিন পর্যন্ত চলে এ উৎসব। কিন্তু সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য ঠাকুরকে সুন্দরভাবে ঝুলনের সাজে সাজিয়ে মন্দির খুলে দেওয়া হয় শেষ তিনদিন। অর্থাৎ আড়ম্বর সহকারে ঝুলন-উৎসব বর্তমানে পালিত হয় তিনদিন। আগে হত পাঁচদিন। শ্রাবণের শুক্লা একাদশীতে শুরু হয়ে শেষ হ'ত পূর্ণিমার দিন।

রাঠী মন্দিরের ঝুলনযাত্রার বেশ নাম আছে শহরে। তাই দেখি ঐ তিন দিন বৈকাল থেকে রাত্রি অবধি শ্রীকৃষ্ণের ঝুলন দর্শনার্থী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার ঠাসাঠাসি ভিড়ে গম্‌গম্

করে রাঠী-মন্দির। **পল্লব** ও পুষ্পাদিতে শোভিত তিনটি ঝুলনের একটিতে **গোপাললাল,** আর একটিতে **রাধাকৃষ্ণ** এবং অন্যটিতে **দামোদর ও গিরিরাজ নারায়ণ শিলাদ্বয়** দোল খান ছান্দিক হিন্দোলে। আলোকসজ্জার পাশাপাশি ভূমি-সজ্জার মধ্যেও থাকে অভিনবত্বের ছাপ। নানা রঙে রঞ্জিত তুষ বা কাঠগুঁড়ির আলপনার অলংকরণে রচিত হয় ঘাসের গালিচা, নদী-নির্ঝর, পথ-ঘাট প্রভৃতি। তার উপর বাহারি পাতাবাহার গাছের সমারোহে গড়ে ওঠে কুঞ্জবন, বনবীথিকা। থাকে ফোয়ারা, থাকে জলাশয়, জলাশয়ের উপর সেতু, গিরি এবং গিরিগুহা। রূপার বহুবিধ খেলনাপাতি—যেমন জন্তু-জানোয়ার, পাখ-পক্ষী, সরীসৃপ, পুতুল, গাড়ি-ঘোড়া প্রভৃতি। কৃষ্ণলীলার নৌকাবিলাস, কালীয়-দমন, কংসবধ, বস্ত্রহরণ, হোলির রং ও আবীর খেলার দৃশ্যাবলীও পৌরাণিক প্রেক্ষাপটকে করে তুলে প্রাণবন্ত। এক কথায়, ছিমছাম সৌন্দর্যে ভরা এখানের ঝুলন-উৎসব বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। **প্রাসঙ্গিকভাবেই উল্লেখ করি, শুধু রাঠী-মন্দিরেই নয়; কৃষ্ণ-বিষ্ণুর লীলাক্ষেত্র বিষ্ণুপুরের প্রতিটি রাধাকৃষ্ণ মন্দিরেই ঝুলন-উৎসব উদ্‌যাপিত হয় সগৌরবে। রাধামদনমোহন, রাধামদনগোপাল, রাধালালজীউ এবং কৃষ্ণরায় জীউ-এর ঝুলন উৎসবও স্মরণীয়।** এছাড়া বিষ্ণুপুরবাসী কচি-কাঁচাদের মধ্যেও ঝুলন-উৎসবের সমারোহ নজরে পড়ে। পল্লীতে পল্লীতে দেখা যায়—রাই দোলে ঝুলনায়, শ্যাম দোলে ঝুলনায়।

রাঠী-মন্দিরটি আর একটি বিশেষ কারণে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে। সেটি হল, এখানের **হরিসভার আসর**। শ্রীমন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ২৫শে আষাঢ়। মন্দির-প্রতিষ্ঠার ঠিক ৩০ বছর পর থেকে অর্থাৎ ১৩৬১ সাল থেকে শুরু হয় হরিসভা তথা হরিকথার আসর। বিষ্ণুপুরের গোপেশ্বর পল্লী নিবাসী ৯১ বছর বয়স্ক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় এই হরিকথা আসরের উদ্যোক্তা। ১৩৬১ থেকে ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ একটানা ৩৭/৩৮ বছর ধরে তিনি এই হরিবাসরে হরিকথা শুনিয়ে হরিভক্তবৃন্দের হৃদয় হরণ করেছেন ভাগবত, গীতা, চৈতন্যচরিতামৃত, রামায়ণ ও মহাভারতের ভক্তিসুধা বিতরণ করে। প্রতি রবিবার সন্ধ্যা ৬টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত হরিনামকীর্তনে মুখরিত হয়ে ওঠে রাঠী-মন্দির। ইহজগতের দেনা-পাওনা শেষ করে জীবন সায়াহ্নে সমুত্তীর্ণ ভক্তমণ্ডলী এখানে সমাগত হয়ে কুড়িয়ে নেন পরপারের অক্ষয় পাথেয়—তথা ঈশ্বর-প্রেম-স্বরূপ অমূল্য সম্পদ। পণ্ডিতপ্রবর ভক্তশ্রেষ্ঠ নারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী মহাশয় শারীরিক দিক থেকে অসুস্থ হ'য়ে পড়ায় ১৩৯৮ সালের কার্তিক মাস থেকে তাঁর শূন্যস্থান পূরণ করেছেন বিষ্ণুপুর মিশনডাঙা নিবাসী শ্রীসুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায়। বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রাক্তন শিক্ষক ভক্তবর সুধাংশুবাবু ভাগবত, ভক্তমাল, চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করে ভক্তিরসে আপ্লুত করেন ভক্ত-হৃদয়। সুধাংশু বাবুর শারীরিক অসুস্থতার কারণে আবার ২০০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে ডিসেম্বরের পর থেকে বিষ্ণুপুর মিশন উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক পণ্ডিত-প্রবর শ্রীআদিত্য কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীমদ্ভগবদগীতার ভক্তিসুধা বিতরণ করে ভক্তমণ্ডলীর হৃদয়ে ভক্তিরস সিঞ্চন করে আসছেন অদ্যাবধি।

শহরের কেন্দ্রস্থলে শ্রীমন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সুবাদে এখানে ভক্ত-সমাগম হওয়ার অনুকূল পরিবেশ রয়েছে। শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত অথচ নেই শহরের কোলাহল বা হই হট্টগোল। এছাড়া মন্দির-নির্মাণের গঠনশৈলীতে রয়েছে ভক্ত-সমাবেশের সুব্যবস্থা। বর্গাকৃতির নাট-মন্দিরটির চারদিকেই রয়েছে আচ্ছাদিত উন্মুক্ত বারান্দা। মধ্যস্থলের

আচ্ছাদিত অংশ সভাভবন রূপে প্রতিভাত। পূর্বমুখী এই নাটমন্দিরের পশ্চিম দিকের মধ্যস্থলে রয়েছে গর্ভমন্দির। গর্ভমন্দিরে স্থাপিত আছেন শ্রীবিগ্রহবৃন্দ। গর্ভগৃহের পিছনে আছে ঠাকুরের ভোগ-রান্নার ঘর। পুরোহিত এবং বিশিষ্ট অতিথি অভ্যাগত তথা সাধু-সন্তের জন্য নাটমন্দিরের ঈশান ও অগ্নিকোণে রয়েছে একটি করে দুটি কক্ষ। মার্বেল-পাথরে মোড়া মসৃণ মেঝে। বারান্দার দেওয়ালে দেব-দেবী এবং সাধক সাধিকাগণের সারিবদ্ধ সুবিন্যস্ত আলোকচিত্র সমূহ দেব-মন্দিরটির ভাবগম্ভীর আধ্যাত্মিক পরিবেশ রচনায় বিশেষ মাত্রা দিয়েছে।

এরকম মনোরম শ্রীমন্দিরটি ধর্মসভার কেন্দ্ররূপেও স্বীকৃতি লাভ করেছে। বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ ধর্মসভা, আধ্যাত্মিক আলোচনাচক্র সবই অনুষ্ঠিত হয় এখানে। সেই সুবাদে **শ্রীশ্রীসীতারাম ওঁকারনাথ, মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, শ্রীসুধাংশুকান্তি ভক্তিবিলাস** প্রমুখ মহাত্মাগণের পদরেণুতে রঞ্জিত হয়েছে মল্লভূম বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুরস্থ রাঠীমন্দির। ১৩৬২ সালে শ্রী শ্রী শতশ্রীখোলসহ নগর-সংকীর্তন তথা শহর পরিক্রমা উৎসব উদযাপিত হয় হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ নিয়ে। এরকম একটি শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের নাতি তুষারকান্তি ঘোষের পুত্র **তরুণকান্তি ঘোষ ও স্বামী চিন্ময়ানন্দ মহারাজজী।**

১৩৬২ সালের পর অতিক্রান্ত হয়েছে আরো ৪৬টি বর্ষা, বসন্ত, শীত। কিন্তু ভাটা পড়েনি ঈশ্বর-প্রেমে। এখনও প্রায় ফি-বছর মহাত্মা-সমাগমে, ভক্ত-সমাগমে হরিগুণগান-কীর্তনে, আধ্যাত্মিক অনুশীলনে মুখরিত থাকে রাঠী-মন্দির। যাগযজ্ঞ, জপতপ, ইষ্ট-নিষ্ঠা উপাসনা সবই চলতে থাকে ছান্দিক গতিতে। মাঝে মাঝে এসে থাকেন এবং ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করেন পণ্ডিতপ্রবর, সুশাস্ত্রজ্ঞ **সর্বেশ্বর গোস্বামী মহাশয়, শ্রীনামজী ব্রহ্মচারী মহোদয়** এবং জগদ্‌গুরু স্বামী শ্রীকৃপালুজী মহারাজের অন্যতম শিষ্য **স্বামী যুগলশরণজী** প্রমুখ ধর্মাচার্যগণ। সুতরাং আজও ঐতিহ্য আছে অম্লান হয়ে।

এক্ষণে সার্বিক বিচারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে এই মন্দিরটি শুধু মন্দির নয়, এটি যেন একটি ধর্মক্ষেত্র, যেন একটি পুণ্যতীর্থ।

এরকম একটি শ্রীমন্দিরের সংরক্ষণ, পরিচালন তথা ব্যয়ভার বহন সবই করে আসছেন রাঠী-পরিবারের উত্তরপুরুষগণ। এ প্রসঙ্গে জগন্নাথ রাঠীর দ্বিতীয় পুত্রের পুত্র শ্রীগোবর্দ্ধন দাস রাঠী (মন্দিরের প্রাক্তন পরিচালক) এবং শিবদাস রাঠীর পৌত্রগণ শ্রীগোবিন্দদাস রাঠী, শ্রীঘনশ্যামদাস রাঠী ও শ্রীওম্‌প্রকাশ রাঠী মহাশয়দের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।

শ্রীবিগ্রহবৃন্দের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করে পুণ্যতীর্থ রাঠী-মন্দিরের স্মৃতিচারণ করতে করতে এগিয়ে যাব সিদ্ধ-সাধক কুরবান বাবার আস্তানা অভিমুখে। বিষ্ণুপুর-থানা এবং শিবদাস বালিকা বিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী পথ অতিক্রম করার অবকাশে আমরা কুড়িয়ে নেবো মল্লভুমের মাটিতে ছড়িয়ে থাকা ছড়াগুলিকে।

এখন বিষ্ণুপুর টাউন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের নীচের তলার টী-স্টলে চা পান করে খোশমেজাজে প্রবেশ করব সাহিত্য জগতের ছড়ার বাসরে।

অধ্যায়-৭৫

ছড়িয়ে ছড়া মল্লভূমে

সাহিত্য-জগতে ছড়ার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাহিত্যের সূচনাতেই ছড়া বা শ্লোকের জন্ম। **সাধারণতঃ ছন্দোবদ্ধ-বাক্য ছড়া বা শ্লোক নামে অভিহিত। শোক থেকে শ্লোকের জন্ম।** এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে, মহর্ষি বাল্মীকি এক সময় কামমোহিত ক্রৌঞ্চদম্পতির পুরুষ ক্রৌঞ্চটিকে বাণবিদ্ধ করে মেরে ফেলতে দেখে শোকাবেগে বিহ্বল হয়ে নিষ্ঠুর ব্যাধকে ছন্দোবদ্ধ ভাষায় অভিশাপ দেন,—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।।"

এখানেই শ্লোকের জন্ম। পরবর্তীকালে শ্লোক তার ভাব-গাম্ভীর্য হারিয়ে রূপান্তরিত হয়েছে ছড়ায়। শোকের কথা ভুলে গিয়ে শ্লোক এবং ছড়া ছড়িয়ে পড়েছে জীবনের সর্বক্ষেত্রে। সহজ সরল প্রকাশভঙ্গির সুবাদে ছড়ার প্রভাব নগরে, শহরে, গ্রামে। শিক্ষিত অশিক্ষিত সবার মধ্যে। আবার কচি-কাঁচাদের ভাঙা ভাঙা বোলে ছড়ার ছড়াছড়ি। সব দেশে, সব ভাষাতেই আছে ছড়া। এক একটি অঞ্চলে আছে আবার আঞ্চলিক ছড়া। **এই ছড়াগুলি আবার সমাজের দর্পণ, শিক্ষার বাহন।** এখন মল্লরাজ্যের কিছু মৌলিক ছড়ার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করব আপনাদের।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলা দরকার। সেটি হল 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র সংকলক স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন ও কবি জসীমউদ্দিনের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের ছড়া সংগৃহীত হয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে। পশ্চিমবঙ্গের ছড়া-সংগ্রহের কাজও চলছে ক্রমাগতভাবে। মল্লভূমের ছড়া সংগ্রহের ব্যাপারে গবেষক মাণিকলাল সিংহ, অধ্যাপক রমাপ্রসাদ পাত্র কর্মকার, মাধবী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শঙ্করীপদ নায়ক প্রমুখ ব্যক্তিগণের প্রয়াস পর্যাপ্ত না হলেও প্রশংসনীয়। পূর্বোক্ত সাহিত্য-সাধক-সাধিকাদের এবং আমার ব্যক্তিগত সংকলনের কিছু ছড়া শোনাব এখন।

ছড়া	বিষয়
* গান বাজনা মতিচুর, এই তিনে বিষ্ণুপুর।	(সংজ্ঞাবাচক)
* ছেলে ঘুমালো, পাড়া জুড়ালো, বর্গী এল দেশে বুলবুলিতে ধান খেয়েছে খাজনা দুব কিসে?	(সমাজ চিত্র ও ছেলে ঘুম পাড়ানো বিষয়ক)
* মল্লে রা, শিখরে পা, সাক্ষাৎ দেখবি যদি নদা শান্তিপুর যা।	(দেবী দুর্গার মাহাত্ম্য বিষয়ক) নদা = নদীয়া
* আগাডোম, বাগাডোম, ঘোড়া ডোম সাজে কাঁসর ঘণ্টা দামামা বাজে ... ইত্যাদি।	(মল্লরাজাদের যুদ্ধযাত্রা সম্পর্কিত)

* পুই, পোস্ত, কাঁকড়া / তিন নিয়ে বাঁকুড়া।
* কানা, কুঠে, খোঁড়া / এই তিনে বাঁকুড়া।
* বাউরী, বাগ্দী, খয়রা / এই নিয়ে বাঁকুড়া।
* হাতে লঙ্কা, মুড়ির কাঁসি / তবে জানবি বাঁকুড়াবাসী।

* বাঁকুড়ার পান, বিষ্ণুপুরের গান।

বাঁকুড়া জেলা তথা মল্লভূমের কয়েকটি গ্রামের নাম সম্পর্কিত অনেক ছড়া আছে। এগুলির মধ্যে নিহিত রয়েছে গ্রামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য, আছে সত্যাভাস। যেমন—

ন্যাড়া মাথা কানের দুল, / তবে জানবি গাঁ ভাদুল।

ছড়াটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর সংলগ্ন ভাদুল গ্রাম সুপ্রাচীন। এক্তেশ্বর একদা বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের পীঠস্থান ছিল। বৌদ্ধ-তান্ত্রিকেরা মাথা ন্যাড়া করতেন এবং দুলও পরতেন। তাই দেখে গ্রামের বৌদ্ধধর্ম ভাবাপন্ন মানুষেরাও মাথা ন্যাড়া করতে এবং কানে দুল পরতে শুরু করেন। সেই থেকে প্রচলিত হয়েছে এই ছড়া। ছড়াটি প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করে।

পরবর্তীকালে ভাদুল গ্রামে শিক্ষিতের সংখ্যা এবং চাকুরিজীবী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে নতুন ছড়া তৈরী হয়।

* কানে কলম লম্বা চুল / জানবি তবে গাঁ ভাদুল।
  বড়ু চণ্ডীদাস ছাতনার গর্ব। তাই বলা হল—
* চণ্ডীদাসের আস্তানা / গরব করে ছাতনা।

আরো কয়েকটি গ্রাম-ভিত্তিক ছড়া শোনাই এখন।

* কালি, কলম, মাছের ঘর
  তিন নিয়ে রামসাগর।
  (কে, কে. হাজরার জন্মস্থান এবং মাছের ডিম-পোনা চাষের জন্য প্রসিদ্ধ)
* কুষ্ঠব্যাধির ছড়াছড়ি
  গৌরীপুর ছাড় তাড়াতাড়ি।
  (গৌরীপুরে কুষ্ঠ হাসপাতাল আছে)
* ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর / তিন নিয়ে শাসপুর।
* দাড়ি, আল, মোল্লা, / এই তিনে ইদ্‌গা-মহল্লা।
* বারো নদী তেরো খাল / পার হলেই সিমলাপাল।
* বসন্তরঞ্জন আর ন্যাচা সন্দেশ / বেলেতোড়ের গুণ আছে অশেষ।
* হরনাথ-কুসুমকুমারী, মনোহর আর স্বর্ণমুখী দেবী
  সোনামুখী গেলেই তোরা দেখতে শুধু পাবি।
* পোড়ামাটির হাতি-ঘোড়া,
  ছড়িয়ে আছে বিশ্বজোড়া,
  ধন্য গ্রাম পাঁচমুড়া।
* খুন-খারাপি মাথাভাঙা / জানবি তবে কেঠারডাঙা।
* পাতলা কাপড় ফুর্‌ফুর্ / তবে জানবি পাটপুর।
* আদা, মুলা, কাঁচকলা / এই নিয়ে জগদল্লা।
* গ্রামের মাথায় হরিধ্বনি / তবে জানবি শালবনী।

* কালো কাপড় রুখু গা / জানবি তবে নামো-গাঁ।

* নাক লম্বা, গলা ঢেঙা / দেখে চিনবি পলাশডাঙা।

* ঢোকরা শিল্পের জন্মস্থান / বিক্‌না গ্রামের বাড়ল মান।

* মা দণ্ডেশ্বরীর পুণ্যধাম
গ্রামটির নাম লাউগ্রাম। (এই লাউগ্রামই বিষ্ণুপুরের আদি রাজার জন্মস্থান)

* ইতিহাস প্রসিদ্ধ গ্রাম হয় পদুম্‌পুর,
তার পশ্চিমে মল্লরাজ্য আছে বিষ্ণুপুর।

* গ্রামটির নাম গোকুলনগর
জাঁকিয়ে আছেন গন্ধেশ্বর। (পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম বৃহত্তম শিবলিঙ্গ এবং খুবই জাগ্রত রূপে এঁর প্রসিদ্ধি)

* গাঁ ঢুকতে মদের ভাটি / তবে জানবি কদমঘাটি।

* গাঁয়ের নাম জয়রামবাটী / তার যে গৌরব সারদামা-টি।

গ্রামের নাম ছাড়াও আরো অন্যান্য বিষয়ে রয়েছে প্রচুর ছড়া।

* রায়বাঘিনী ননদিনী পাড়ায় কুচ্ছা গায়.
পোড়ারমুখী মরলে পরে সুখের বাতাস লাগবে আমার গায়।

* মায়ের বুন মাসি, কাদায় ফেলে থাসি,
বাপের বুন পিসি, ভাত-কাপড়ে পুষি।

* শাশুড়ী ম'ল সকালে,
নেয়ে খেয়ে সময় পেলে
কাঁদব আমি বিকালে।

শাশুড়ী ও বৌ-এর মধ্যে কথার কসরতে অভিশাপ দেওয়া —

* শাশুড়ী — হাই দেখে তুলে হাই,
মরুক বউয়ের বড় ভাই।
বৌ— ভাই মরা বড় জ্বালা
মরুক শ্বশুরের বড় শালা।

ভাদর-বৌ ও ভাশুর এর মধ্যে কথোপকথন নিষিদ্ধ ছিল। এখন সে প্রথা শিথিল হয়েছে। অতীতে ভাদর-বৌ ও ভাশুরের মধ্যে কাঁথকে (দেওয়াল) মাধ্যম করে ছড়ার সুরে কথোপকথনের একটি নমুনা—

* ভাদর বৌ — কাঁথ, ওরে কাঁথ, বট্‌ঠাকুর কি প্যাকাল মাছ খান?
বট্‌ঠাকুর — খান, কি না খান পাতে দিয়ে যান।

একটি ভোজনপ্রিয় বধূর আত্মশাসনমূলক ছড়া —

* ললা করে ঠক্‌ঠক্‌, ও ললা তুই সবুর কর
এটা আমার শ্বশুর ঘর;
যখন যাবি বাপের ঘর, তুলে খাবি দুধের সর।

* একটি মায়ের সাধের বিটি, চুল নাইত দড়ির ঝুঁটি।

* ইঁঙ্গলা পিঁঙ্গলা ধা মশা ধা
যতগুলা মশা আছে কালীতলা দিকে যা।
(দীপাবলী উৎসবে পাটকাঠি পোড়ানোর ছড়া)

* আজ চাঁউড়ি, কাল বাঁউড়ি;
পরশু দিনে বড়ম তলায় দৌড়াদৌড়ি। (বড়াম পূজার প্রাক্কালের ছড়া)

মকর সংক্রান্তির সময় একজন মনিব ক্ষেতমজুর ডাকতে গেছেন। মল্লভূমের নিম্নবর্ণের মানুষের পৌষ-পরব খুব বড় উৎসব। কাজে মন নেই। তাই মনিবকে ছড়া কেটে উত্তর দিচ্ছে দিনমজুর। আসতে বলছে আট দিন পরে।

* দিনমজুর—চাঁউড়ি, বাঁউড়ি, মকর, এখান, সেখান, ঘেগান, সাঁই, সুঁই,
তার পরদিন আসবি তুই।

বাঙালী সমাজে মেয়েদের অনাদর এবং প্রকৃত অবস্থা বোঝাতে বলা হয়—

* ভাইটি টাকার পাইটি, বুনটি টাকার খুন্‌টি। (পণ প্রথার প্রতি কটাক্ষ)
* শাকের মধ্যে পুঁই, মাছের মধ্যে রুই, ছাতুর মধ্যে উই।
* আমড়া তোর আছে কি! আঁঠি-চামড়ায় করব কি?
* যতই কর হাই ফাই, বাঁজা ম্যায়ার ছেলা নাই।
* হায় তরমুজ করব কি, বোঁটা নাই ত ধরব কি!
* ফলের মধ্যে আম, মানুষের মধ্যে শ্যাম,
কাপড়ের মধ্যে সাদা, নারীর মধ্যে রাধা।
* এই বাঁদরী কলাই খাবি, দাঁত গিঁজুড়ে মরে যাবি।
* রোদ হচ্ছে, জল হচ্ছে, শিয়াল-শুকনির বিয়া হচ্ছে।
* এই হনুমান কলা খাবি, জয় জগন্নাথ দেখতে যাবি।
* হাতি তোর গদা পা, তুই রথ দেখতে যা।
* কপালগুণে কাপাস ফুটে, বরাতগুণে বউ জুটে।
* একলা ঘরের গিন্নি হ'ব, চাবি ঝুলিয়ে লাইতে যাব।
* শাশুড়ী নাই, ননদ নাই, কাকে করব ডর?
আগে খাই পান্তাভাত, শেষে লেপি ঘর।
* বিষ্ণুপুর গ্রামখানি চাকুলদার বন।
সন্ধ্যা দিতে তেল পুড়ত সাড়ে সাত মন।
* সংসারের ফুল দেখতে ভাল, ওরে অবোধ ছেলে;
দেখে রেখো ছুঁয়ো নাকো, ছুঁলেই যাবে জ্বলে। (এখানে রমণী হল সংসারের ফুল)
* ইতিহাসে পাতিহাঁস, ভূগোলেতে গোল,
অঙ্কেতে মাথা নাই, হয়েছে পাগল।
* বাপের কালে নাইকো চাষ, ধানকে বলে দুব্বা ঘাস। (বৌকে ব্যঙ্গোক্তি)
* লাউ কাটতে লারে বউড়ি, ডিংলা কাটতে দৌড়াদৌড়ি। (বৌকে ব্যঙ্গোক্তি)

* যদি শ্বশুর ঘরের সাত লাঙলের চাষ (বাপের ঘরের প্রতি মেয়েদের
তবু বাপের ঘরের পাটরাঁ কুঁড়ার আশ। টানকে কটাক্ষ করে)

এরকম অজস্র ছড়া ছড়িয়ে রয়েছে মল্লভূমে। তার মধ্যে মাত্র কয়েকটি তুলে ধরলাম আপনাদের কাছে। এখন ন'টে গাছটি মুড়োলো, আমার ছড়া ফুরোলো। মল্লভূমের মাটিতে ছড়িয়ে থাকা ছড়া কুড়োতে কুড়োতে আমরা এসে গেছি সিদ্ধ-সাধক হজরত কুরবান বাবার আস্তানাতে। ঐ দেখুন, কুরবান বাবার আস্তানা। শুনুন কুরবান বাবার কথা।

অধ্যায়-৭৬

হজরত কুরবান বাবা

কুরবানতলা

সময়টা ছিল বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল। অর্থাৎ ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬১৯ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তী কোন এক সময়ে উত্তর ভারত থেকে জনাকয়েক শিষ্য নিয়ে বিষ্ণুপুরে পদার্পণ করেন এক সিদ্ধপীর। ভিন্‌দেশী এবং ভিন্ ভাষাভাষী এই নবাগত ফকির ও তাঁর সঙ্গীসাথীদের স্থানীয় জনসাধারণ সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন প্রথমদিকে। কিন্তু এই নবাগত অতিথিদের আন্তরিকতা, সহজ সরল ব্যবহার এবং সর্বোপরি সাধক মহাপুরুষের অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ অচিরেই দূরের মানুষকে করলো আপন, ভাষার ব্যবধান গেল ঘুচে। সাক্ষাৎ করুণার প্রতিমূর্তি এই সিদ্ধ পীরের কথা মুখে মুখে ফিরতে ফিরতে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা বীর হাম্বীরেরও রইল না অবিদিত। মহারাজ বীর হাম্বীর উক্ত ফকিরের আধ্যাত্মিক কথাবার্তা শুনে এবং অলৌকিক শক্তি সন্দর্শনে মুগ্ধ হয়ে বিষ্ণুপুরেই তাঁর থাকার ব্যবস্থা করেন পাকাপাকিভাবে। দান করেন নিষ্কর জমি। বিষ্ণুপুর শহরের যে বিশেষ স্থানটিতে সিদ্ধপীর হজরত কুরবান শাহ্ বসবাস করতেন, তাঁরই নামানুসারে আজও ঐ এলাকাটি 'কুরবানতলা' নামেই প্রসিদ্ধ।

মহারাজ বীর হাম্বীর কুরবান বাবার একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন, তাঁকে যথাযথ সম্মান করতেন এবং বিপদে আপদে তাঁর শরণাপন্ন হতেন। লোকশ্রুতি বলে রাজা বীর হাম্বীর কুরবান বাবার কৃপাতেই পুত্র সন্তান লাভ করেন। কুরবান বাবা সচরাচর বাঘের পিঠে চড়েই যত্রতত্র যাতায়াত করতেন।

কুরবান বাবার বহু অলৌকিক ঘটনার কথা আজও শোনা যায় লোকমুখে। একদিনের কথা, জনৈক নাপিত বাবার চুল কাটছিল আপন মনে। এমন সময় কুরবান বাবা হঠাৎ কি ভেবে নাপিতকে চুল কাটতে নিষেধ করে সাদা চাদরে গা-মাথা সর্বাঙ্গ ঢেকে ফেলেন নিমেষে। নড়ন চড়ন নেই, নেই কোনো সাড়া-শব্দ। নাপিত তো অবাক! ব্যাপার কি?—কিছুই বুঝতে পারে না সে। এভাবে কেটে যায় বেশ কিছুটা সময়। হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে চাদর খুলে মাথা বের করে পুনরায় চুল কাটতে আদেশ করেন বাবা। নাপিত কাঁচি চালাতে গিয়ে বাবার মাথার থেকে টস্ টস্ করে জল পড়তে দেখে এবং চুলের ফাঁকে ফাঁকে নদীর বালি জমে থাকতে দেখে বিস্ময়ে স্তম্ভিত। কৌতূহলী নাপিত এ বিষয়ে বাবাকে বারবার পীড়াপীড়ি করতে থাকলে বাবা সত্য ঘটনাটি সংক্ষেপে বলেছিলেন নাপিতকে। কুরবান বাবার নিষেধ সত্ত্বেও নাপিত কিন্তু মৃত্যুর পূর্বে ঘটনাটি প্রকাশ করে

দেন ভক্তসমাজে। ঘটনাটি প্রকাশিত হবার অব্যবহিত পরেই এক দূর-দেশী সওদাগর আসেন কুরবান বাবার কাছে এবং তিনি সর্বসমক্ষে স্বীকার করেন যে সেদিন প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টিতে উত্তাল তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে মাঝদরিয়াতে নিমজ্জমান তাঁকে রক্ষা করেন কুরবান বাবা স্বয়ং। ভক্তাধীন বাবার মাথার জল ও বালি-রহস্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল এইভাবে।

আর একদিনের কথা, দরিদ্র এক ভক্তের একটি আর্জি নিয়ে বাবা গিয়েছেন রাজ-দরবারে। এক বাক্যে বাবার আর্জি মঞ্জুর করে কুরবান বাবাকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি শুকনো কাঁঠালিচাঁপা গাছকে দেখিয়ে মহারাজ বলেছিলেন, 'বাবা, সুশ্রী এই গাছটিতে ফুল হত প্রচুর। সুগন্ধে ভ'রে যেত দশদিক। গাছটি কি আর বাঁচবে না, ফুল হবে না একটিও।' উত্তরে বাবা বলেছিলেন, 'হবে, হবে। নিশ্চয় হবে'।

আশ্চর্যের বিষয় পরের দিন সকালে মহারাজ বাগানে পায়চারী করতে গিয়ে দেখেন গাছটি নয়নাভিরাম পাতা আর ফুলে ফুলে ফুলময়। গন্ধে দশদিক আমোদিত। এই ঘটনাটি এই সত্যই প্রমাণ করে যে বাক্‌সিদ্ধ পুরুষ যাঁরা তাঁদের কথা আনুপূর্বিক সত্য হয়। কুরবান বাবা যে বাক্‌সিদ্ধ ছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ নেই বিন্দুমাত্র।

সিদ্ধ-পুরুষেরা যে অমর, তাঁদের স্থূল দেহের বিনাশ হলেও সূক্ষ্ম দেহে যে তাঁরা বেঁচে থাকেন যুগ যুগ ধরে সেরকম একটি সত্য ঘটনার উল্লেখ করব এক্ষণে।

কুরবান বাবার নাম-ডাক শুনে **'উরস মোবারক'** মহোৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য জ্যৈষ্ঠ মাসের ভর দুপুরে বাঁকুড়ার নিকটবর্তী বাদুলাড়া গ্রাম থেকে এসেছেন এক মৌলবী—নাম আব্দুল রসিদ। কিন্তু ভুলক্রমে তিনি এসেছেন উৎসবের আগের দিন। ভর দুপুর। ঝাঁ ঝাঁ রোদ। কেউ কোথাও নেই। কুরবান বাবার আস্তানার বটবৃক্ষের নীচে একাকী দাঁড়িয়ে ক্লান্ত, শ্রান্ত, ক্ষুধার্ত পথিক। ভাবছেন, 'না এলেই ভাল করতাম। ভুল করেছি, এখন তার মাসুল দিচ্ছি।' রাগ এবং বিরক্তি ভাবটা উপচে পড়েছে চোখে মুখে। এমন সময় এক সুদর্শন জ্যোতির্ময় পুরুষ এক থালা সুগন্ধি পোলাও এনে বলেন, 'বাবা, খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি, তুমি বড়ই ক্ষুধার্ত। নাও, নাও, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।' মৌলবী সাহেব পরমানন্দে উদরস্থ করলেন সেই পরম উপাদেয় খাবার। খালি প্লেট নিয়ে জ্যোতির্ময় পুরুষ কুরবান বাবার মাজারের দিকে অগ্রসর হতেই মৌলবী সাহেব চাইতে থাকেন পানীয় জল। উত্তরে সুদর্শন পুরুষটি বলেন, একটু অপেক্ষা করুন, আর একজন জল নিয়ে আসছে।' কিন্তু জল কই! কেউ তো জল নিয়ে এল না। অগত্যা পথিক সেই সুদর্শন পুরুষটির খোঁজে কুরবান বাবার মাজারের মধ্যে উঁকি মারতে গিয়ে দেখেন কেউ কোথাও নেই। রয়েছে একটি পবিত্র সমাধি। মনে প্রশ্ন জাগলো, 'এই সমাধি-মন্দিরেই তো ঢুকলেন ঐ পুরুষ। কিন্তু গেলেন কোথা?' এমন সময় বালতি ভর্তি জল নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন কুরবান বাবার তৎকালীন সেবক—খাদেম খোদাবক্স সাহেব। পথিকের মুখে আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা শুনে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, 'আপনি অত্যন্ত ভাগ্যবান। স্বয়ং বাবা আপনাকে নিজ হাতে খানা খাইয়েছেন।' মৌলবী সাহেব তো আনন্দে আত্মহারা, বিস্ময়ে দিশেহারা।

কুরবান বাবা শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন—দুইই করে থাকেন যুগপৎভাবে। বছর চল্লিশ আগের কথা—এক ফকির এসেছেন কুরবান বাবার আঙ্গিনায়। সঙ্গে একখানা নতুন চাদর। চাদরখানা বাবার উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে বলতে থাকেন, 'এই নাও বাবা

নতুন চাদর। আমাকে রক্ষা কর, রক্ষা কর আমাকে।' সর্বাঙ্গে অসহ্য জ্বালা এবং চুলকানির প্রকোপে প্রাণ যায় যায় অবস্থা। কুরবান বাবার বর্তমান সেবক দিল মহম্মদের কাছে তিনি স্বীকার করেন যে সে রাত্রে বাবার মাজারের চাদরখানি সে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল এবং ঐ চাদরখানি গায়ে দেওয়ার পর থেকেই তার এই দুরবস্থা। এই বলে সে কান্নাকাটি করতে থাকে অঝোরে। আর ক্ষমা চাইতে থাকে বারংবার। কৃপা-বৎসল বাবা তাঁকে উচিত শিক্ষা দিয়েই ক্ষমা করেন নিজ মহিমায়। ফকির আরোগ্য লাভ করেন শেষমেষ।

বীর হাম্বীরের মতোই মহারাজ শ্রীচৈতন্য সিংহদেব ছিলেন কুরবান বাবার পরম ভক্ত। তাই দেখি কুরবান বাবার সমাধি ক্ষেত্রের উপর তিনি একটি সমাধি মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন এবং নিয়মিত সেবা-পূজা ও দূরাগত ভক্তদের থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থার জন্য ১৭৫ বিঘা নিষ্কর জমি দান করেন। পরবর্তীকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী উক্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেন। বিষ্ণুপুরের হিন্দু রাজাদের মতোই হিন্দু প্রজাগণও বাবার পরম ভক্ত। তাই দেখি রাজা শ্রীচৈতন্য সিংহদেব নির্মিত সমাধি মন্দিরটি সংস্কারের প্রয়োজন দেখা দিলে জনসাধারণের কাছে অর্থ সাহায্যের আবেদনকারী ৯জন বিশিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে প্রথম ৬জন ছিলেন হিন্দু। ১। রাজা শ্রী শ্রী কালীপদ সিংহঠাকুর, ২। শ্রীরাধাগোবিন্দ রায় (প্রাক্তন মন্ত্রী)৩। শ্রীরামনলিনী চক্রবর্তী (জেলা কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট) ৪। শ্রীগোকুল চন্দ্র ঘোষ (প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, বিষ্ণুপুর উচ্চবিদ্যালয়) ৫। শ্রীসজনী কান্ত রায় (প্রাক্তন সেক্রেটারী উকিলবার এসোসিয়েশান।) ৬। শ্রীসতীশচন্দ্র সরকার (প্রাক্তন সেক্রেটারী মোক্তারবার এসোসিয়েশন) ৭। জনাব হাজী আবদুল গফুর আখুঞ্জি (বিষ্ণুপুর) ৮। হাজী রায়হান উদ্দিন মণ্ডল (হাট আশুড়িয়া) ৯। সেখ মঞ্জুর আহমদ (সাং-বাদুলাড়া)

উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে কুরবান বাবা হলেন জাতিধর্মের উর্ধ্বে সমস্ত মানুষের জন্য মনুষ্যরূপী দেবতা। হিন্দুদের উপাস্য দেবতা অল্পে তুষ্ট আশুতোষের মতোই তিনিও অল্পেই তুষ্ট। ষোল আনার পাটালি আর চার আনা দক্ষিণাই যথেষ্ট। গুড়ের পাটালি কুরবান বাবার খুবই প্রিয়—এজন্য **'কুরবান বাবার পাটালি'** কথাটা যেন প্রথাসিদ্ধ হয়ে গেছে বিষ্ণুপুরে। বৃহস্পতিবার হল বাবার প্রিয় বার এবং বাবার পুজো দেওয়ার প্রশস্ত বার। তাই বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে রাত্রি অবধি বাবার মাড়োতে পুজো দেওয়ার ভিড় জমে প্রচুর।

সন্তান কামনায়, দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ের আশায়, কর্মক্ষেত্রে সাফল্য, বিপদ-আপদে রক্ষা পাওয়া, নিরুদ্দিষ্ট শিশু-সন্তান, আত্মীয় স্বজন এবং গৃহপালিত জীব-জন্তুর পুনরাগমন, হারানো বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি ইত্যাদি, ইত্যাদি সব কামনা-বাসনা অকাতরে পূরণ করেন বাবা। কুরবান বাবা ছিলেন, আছেন, থাকবেন। তাই দেখি জাতিবর্ণ নির্বিশেষে আজও বাবার পদপ্রান্তে হাজারো আর্ত মানুষের আনাগোনা। পূজা, প্রার্থনা, উপাসনা চলছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। চলবে সুদূর ভবিষ্যতেও।

কুরবান বাবার আস্তানার সম্মুখভাগে ডান দিকে রয়েছে ফকির বাবার সমাধিস্থল। ফকির বাবা ছিলেন বাবার চেলা। বাবার সেবাশুশ্রূষা করে ধন্য হয়েছিলেন তিনি।

পরিশেষে বলি কুরবান বাবা স্থূল দেহে আজ আর আমাদের মাঝে নেই। আছেন সূক্ষ্ম শরীরে, আছেন আর্ত-ভক্তের হৃদয়-কন্দরে। কুরবান বাবার শ্রীচরণে হাজারো সেলাম আর লাখো প্রণাম জানিয়ে আমরা এখন পাড়ি দেবো বোলতলা অভিমুখে।

পথের পাথেয় হিসেবে আমরা সঙ্গে নেবো ধাঁধার পোটলা পুঁটলি। এই মুহূর্তে ধাঁধার ধোঁয়ায় আপনাদের আচ্ছন্ন করে দেবো অন্ততঃ অল্প সময়ের জন্যেও।

অধ্যায় - ৭৭

ধাঁধার ধোঁয়ায় মল্লভূম

লোকসাহিত্যের একটি অপরিহার্য অঙ্গ ধাঁধা। ধাঁধা বলতে বোঝায় কৌতূহলজনক দুরূহ প্রশ্নোত্তরের খেলা। ধাঁধার অপর নাম হেঁয়ালি। এই খেলায় বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ হয়। চিন্তাশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটে। লোকের মুখে মুখে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে মুখে ফেরে ধাঁধার ছড়া। শিশু থেকে বৃদ্ধ সকলের মধ্যেই আছে ধাঁধার প্রতি বিশেষ দুর্বলতা। ধাঁধার প্রশ্নোত্তরে আদি-রস এবং হাস্য-রসের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। এগুলি যেহেতু অঞ্চল-ভিত্তিক লোকসাহিত্য সেহেতু আঞ্চলিক ভাষার পাশপাশি এতে স্থানীয় সমাজচিত্রও প্রতিফলিত হয় প্রায় ক্ষেত্রেই। মল্লভূমের ধাঁধার মধ্যেও এসব লক্ষণ বিদ্যমান। আবহমান কাল থেকে চলে আসা এরকম কয়েকটি ধাঁধার ধোঁয়ায় মন মজাব আপনাদের।

ধাঁধার প্রশ্ন	উত্তর
* এতটুকু ডালে কেষ্ট ঠাকুর দোলে।	.... কালো বেগুন
* এক মন্দির দু'দুয়ার, ধর শালাকে মার কাছাড়।	.... নাক ও সিক্‌নি
* এ ঘরে বুড়ি মোল (মরল), ও ঘরে গন্ধ গেল।	.... কাঁঠাল
* তিন ত্যারেঙ্গা গাছটি তিতা / ফলটি কিন্তু ঠাণ্ডামিঠা।	.... পানিফল
* এ ঘর যায়, ও ঘর যায় / দুম্ দুম্ কাছাড় খায়।	.... ঝাঁটা
* আমার একটি লাল গাই দুধ দেয় ঘোল পাই জল দিলেই মরে যায়।	.... আগুন
* বনের থেকে বেরাল হাতি হাতির লটকা লটকা কান, ব্যাত্ (মুখ), দিকে ছেলা হচ্ছে দেখ্‌রে ভগবান।	.... ফলন্ত কলাগাছ
* অলি অলি পাখিগুলি, গলি বাগে যায়, সর্বাঙ্গ ছেড়ে তারা চক্ষু দুটি খায়।	.... ধোঁয়া
* ঢাক ঢোল ভিতর খোল, দাড়ি বেয়ে পড়ছে ঝোল।	.... খড়ের ঘর ও খড়ের চালার জল
* চিরি চিরি পাতা, গোলমরিচের খাতা, আমাদের বাড়ি যাতা, ঠাণ্ডাপানি (ঠাণ্ডাফল) খাতা,	.... পেঁপে পাকা
* এল রে কালো বীর, বসল রে ডালে, এমন কারো সাধ্য নাই, টেনে ফেলতে পারে।	.... কালো মেঘ
* লালেতে টগবগ কালোরই ফোঁটা, যে না বলতে পারে সে বকা ছাগলের ব্যাটা।	.... লালকাঁচ বা কাঁচফল

* যাইতে লদ পদ, আসিতে ধীর,
মাঝখানে পড়ে রইল এক মহাবীর। .... বিষ্ঠা

* ভঁ ভঁ করে, ভ্রমর লয়, কাঁধে পৈতা বামুন লয়। .... চরকা

* প্রথম বক্তা ঃ রূপ সনাতন টুপ্ করিলে,
কেন সনাতন গায়ে পড়িলে? .... ছাগল
দ্বিতীয় বক্তা ঃ অত যদি তুমার হিং ঝরঝর
তবে কেন আমার তলায় চর? .... আমগাছ

* গাছটির নাম হীরা, তাই ধরেছে, গুড়, বেগুন, জিরা। .... মহুয়া ফল

* লালার পাখি লালায় চরে, ঘুরে ঘুরে তার পেটটি ভরে।. চরকা

* চুন ধব্‌ধবে মন্দিরটি, ভাঙতে পারি গড়তে লারি। .... ডিম

* প্রথম বক্তা ঃ ওরে এক পা, ... এক পা—ছাতা
তোর দু'পা কুথা গেছে? .... দু'পা—মানুষ
দ্বিতীয় বক্তা ঃ তোরা তো চার পা, ... চার পা—বাঘ
সে ছ'পা ধরতে গেছে। .... ছপা—কাঁকড়ি

* সাঁই, সুঁই সটকা / তিনটা মাথা দশটা পা। .... গরু, বাছুর ও গোয়ালা (দুধ দোয়ার দৃশ্য)

* টিপ্ টিপানি সই, তাদের বাড়ি কই? .... কামার শালে লৌহ
কালোটি পুরে, লালটি বার করে। পুড়িয়ে কাজ করার দৃশ্য

* সিজাই, শুকাই, খাই না
অনেক হলেও মন ভরেনা। .... কাপড়/শাড়ী

* লতানে লতিই লতিই যায়
সর্বাঙ্গ ছেড়ে দিয়ে চোখ দুটি যে খায়। .... ধোঁয়া

* কাঁচায় লদপদ পাকলে সিন্দুর, ... মাটির হাঁড়ি, খোলা
যে না বলতে পারে সে ধেড়া ইঁদুর। ইত্যাদি

* এতটুকু কানি, না শুকাতে জানি। .... জিভ

* ও পিসা তামুক খেসা। তামুক খাব কি;
একটা বুড়ি তিনটা মাথা ভাবতে বসেছি। .... তিন আঁঠি তাল

* শ্যাওড়া তলায় মিটিক্ মিটিক্
মিটিক্ তলায় ফোঁ .... মাথা, চোখ,
ফোঁয়ের তলায় ফোঁপর ফোঁপর নাক ও মুখ
কি বল ভাইপো?

* মা লতা, বাবা ছাতা, দিদি ধাকুড়-ধামা-ধাই
আমার কলকা-মুখো ভাই। উত্তর দেওয়া চাই। .... কুমড়া গাছ

* আসছে, যাচ্ছে, যাচ্ছে তাই ;
তার দ্বারে যে কপাট নাই। .... চঞ্চল মন

* যার জন্য খাই, সে কোথা রে ভাই?
  যার খাই, তার খবর রাখি নাই। .... শ্রাদ্ধঘরে খাওয়া

* পাপিষ্ঠ মাথাটা, দুহাত কুড়ি আঙুল নাকটা
  চোখ কান নাই। এমন কী জীব আছে বল দেখি ভাই?... মানুষ

এসব ধাঁধার অপর নাম **'জামাই ঠকানো প্রশ্ন'**। বিবাহের রাত্রে বাসর-ঘরে নববধূর বান্ধবীগণ, বৌদিগণ সহ দিদিমা ও ঠাকুমারা হেঁয়ালির ছলে এরকম অজস্র প্রশ্ন করে নতুন জামাই-এর বুদ্ধি পরীক্ষা করতেন। উত্তর দিতে না পারলে বেচারা জামাই-বাবাজীবনকে অন্যান্য উপাদেয় খাবারের সাথে কানমলাও খেতে হত বিয়ের রাতে। এসব ধাঁধাগুলিকে কালিদাসের হেঁয়ালি বলে চালিয়ে দেওয়া হলেও এগুলি মোটেই কালিদাসের মস্তিষ্কজাত নয়।

আজ থেকে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে যখন ঘরে ঘরে রেডিও ছিল না, ছিল না টেলিভিশন, টেপ্‌রেকর্ড প্রভৃতি আনন্দ উপকরণ সমূহ তখন ধাঁধা, হেঁয়ালি ও ছড়ার আসর বসত অবসর সময়ে। পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মনোভাব নিয়ে কথার কৌশলে তথা বাক্‌চাতুর্যে জন্ম নিত নিত্য-নতুন ধাঁধা। সেই সব ধাঁধা এবং ছড়া প্রায়ই প্রতিধ্বনিত হত অবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে মুখে। এখন কর্মব্যস্ত মানুষ ও পড়াশুনার চাপে পিষ্ট শিশু-সমাজের কাছ থেকে ক্রমশঃ সরে গিয়ে পুস্তকের পাতায় বন্দী হয়েছে এসব সাহিত্য-সম্ভার। মল্লভূমের ধাঁধার ধোঁয়াশার আচ্ছন্নভাব কাটিয়ে এখন আমরা স্মৃতিচারণ করব বোলতলার রাম-মন্দিরের কথা।

অধ্যায় - ৭৮

বোলতলার রামমন্দির

দশরথ-নন্দন রাজা রাম।
জানকী-বল্লভ রাজা রাম।।
রঘুপতি-রাঘব রাজা রাম।
পতিত-পাবন সীতা রাম।।

রামনাম মুখরিত বিষ্ণুপুরের এই পবিত্র স্থানটির নাম বোলতলা। চকবাজার এবং আঁইসবাজার থেকে বোলতলাগামী রাস্তা দুটির সংযোগস্থলের মধ্যভাগে এই যে নয়নাভিরাম সৌধটি দেখছেন এটিই হল 'রামমন্দির'। পশ্চিমমুখী এই রামমন্দিরটির পূর্বদিকের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ছোট্ট রাস্তাটি পূর্বোক্ত রাস্তা দুটির সাথে সংযুক্ত হয়ে, হয়েছে একটি ত্রিভুজ। আর এই ত্রিভুজের মধ্যস্থলে শোভা পাচ্ছে রাম নাম মুখরিত রামমন্দিরটি।

আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এর মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় এক গভীর অর্থ। উক্ত তিনটি রাস্তা, ত্রিভুজের তিনটি বাহু ; যেন— সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণের সূচক। আর আমরা হলাম সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ গুণযুক্ত বদ্ধজীব। অসহায় বদ্ধজীবের মুক্তি লাভের একমাত্র পথ হল ঈশ্বর-চিন্তা—সে ঈশ্বর রাম, কৃষ্ণ, কালী, শিব, দুর্গা, বিষ্ণু যে কেউ

হতে পারেন। ত্রিগুণাবদ্ধ মায়াসক্ত জীবের মুক্তির একমাত্র উপায় হরিনাম কিংবা রামনাম সংকীর্তন— এই সত্যই যেন উদ্ভাসিত হয় উক্ত রামমন্দিরের অবস্থান থেকে।

আসুন এক্ষণে শোনাই রাম-মন্দিরের ইতিকথা। জনশ্রুতি বলে আজ থেকে আনুমানিক শতাধিক বৎসর পূর্বে 'বিষ্ণুপুর মাধবগঞ্জ মহল্লায় শ্রীশ্রীমদনগোপালজীউ-এর মন্দির প্রাঙ্গণে সে বছর খুবই ধুমধাম সহকারে 'চব্বিশ প্রহর' অনুষ্ঠিত হয়। চব্বিশ প্রহরের সময় আজকের ন্যায় তৎকালেও পাড়ায় পাড়ায় মাটির ছবি তৈরী করা হত। মাধবগঞ্জ এগার পাড়ার অন্তর্ভুক্ত বোলতলাতেও সেই সময় প্রদর্শনীর জন্য প্রমাণ সাইজের রাম-সীতার মৃন্ময় মূর্তি তৈরী করা হয়। বর্তমান রাম-মন্দিরটির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে একটি বকুল গাছ ছিল তৎকালে। বকুল গাছটির নামানুসারে জায়গাটির নাম হয়েছিল **'বকুলতলা'। অপভ্রংশে আজ হয়েছে 'বোলতলা'।** সে যাই হোক, বকুল গাছের নীচেই স্থাপন করা হয়েছিল রাম-সীতার যুগল মূর্তি। নির্ধারিত সময়ে চব্বিশ প্রহর শেষ হয়। কিন্তু স্থানীয় জন-মানসে রাম-সীতার সেই যুগল মূর্তি প্রবলভাবে রেখাপাত করে। শুরু হয় রামায়ণ-গান এবং গায়ক-বাদকদের জন্য নির্মিত হয় বাঁশের খুঁটি দেওয়া খড়ের চালা। সেই অবধি শুভ অক্ষয়-তৃতীয়ার দিন থেকে মাসাধিককাল ধরে বছরের পর বছর হয়ে আসছে রামায়ণ-গান। আজকাল অবশ্য টি.ভি., রেডিও-র প্রকোপে এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসের অভাবে রামায়ণ-গানের আকর্ষণ কমেছে। কমেছে রামায়ণ-গানের শ্রোতা। বৈদ্যুতিক আলোর প্রচলনের আগে রামায়ণ-গান হত সন্ধ্যা রাতে। **মিউনিসিপ্যালিটির 'উল্টো পিরামিড' আকৃতির ঢাউস লণ্ঠন জ্বলতো আলো-খুঁটির মাথায়।** ধর্মপ্রাণ রামভক্ত মানুষজনের ভিড় জমতো রাস্তা ছাপিয়ে। থিক্ থিক্ মানুষের সমাবেশে সাদা-কালো মাথাগুলি সরষে দানার মত ছড়িয়ে থাকতো শ্রুতিগোচর দূরত্ব অবধি। প্রাণ জুড়ানো রামায়ণ-গান শুনতে শুনতে তাঁদের মন চলে যেত রাম-রাজত্বের স্বর্ণযুগে। রামের বিয়ের দিন ভক্তিমান শ্রোতারা আনতেন ধুতি, শাড়ী লুচি, মিষ্টি, মণ্ডা-মিঠাই। লক্ষ্মণের ফল ভক্ষণের দিন জমা পড়তো ঝুড়ি ঝুড়ি ফল, আর সীতা হরণের দিন কিংবা অশোক বনে সীতার নির্যাতনের করুণ কাহিনী অথবা যুদ্ধক্ষেত্রে রাম-লক্ষ্মণের মূর্ছা যাওয়ার কথায় 'হায়, হায়' করে কেঁদে উঠত রামভক্ত শ্রোতাগণ, চোখ করত ছলছল, অঝোরে ঝরে পড়তো অশ্রুজল। আবার সূর্পনখার নাক, কান কাটার দিন কিংবা হনুমানের লঙ্কাতে আগুন লাগানোর দিন সেই কান্নার সুরে রাশ টেনে অজস্রধারায় উৎসারিত হত হাসির ফুলঝুরি। মেঘনাদ, কুম্ভকর্ণ কিংবা রাবণ-বধের দিন পরম শান্তিতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতেন শ্রোতৃবৃন্দ। শ্রীরামের রাজ্যাভিষেকের দিন নানা বস্ত্র-সামগ্রীর উপহার, রাশি রাশি ফুলের মালা, শঙ্খ-নিনাদ এবং উলুধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠত বোলতলার রামায়ণ-গানের আসর।

দিন যায়। বদলে যায় মানুষ। বদলে যায় সমাজ, শাসন ব্যবস্থা এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশ। বাঁশের খুঁটি আর খড়ের চালের বদলে তৈরী হয় শালের খুঁটির উপর গুড়ের টিনের চালা। কালক্রমে শালের খুঁটির উপর গুড়ের টিনের চালাকে হটিয়ে দিয়ে এসে যায় ইঁটের পিলারের উপর করুগেটেড্ টিনের চালা। সমানে চলতে থাকে রামায়ণ-গান এবং রাম-বন্দনা—

ভয়হর মঙ্গল দশরথ রাম।
জয় জয় মঙ্গল সীতা রাম।।

মঙ্গল কর জয় মঙ্গল রাম।
আশ্রিত বৎসল জয় জয় রাম।।
রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।
পতিত-পাবন সীতা রাম।। ..... ইত্যাদি, ইত্যাদি।

এসে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বেজে ওঠে রণদামামা। বিষ্ণুপুরের সন্নিকটে বাসুদেবপুর ও গামারবনী মৌজায় তৈরী হয় 'ল্যাণ্ডিং গ্রাউণ্ড'। বিপদসূচক সাইরেনের ভোঁ ভোঁ, এরোপ্লেনের গোঁ গোঁ এবং বোমাতঙ্কে আতঙ্কিত মানুষ শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের দাপাদাপিতে তটস্থ। ২২, ২৪, ২৬ চাকার মিলিটারী গাড়ির রাস্তা কাঁপিয়ে ছুটে যাওয়া, ভয়ার্ত মানুষের ইতিউতি চাওয়া এবং খেতে না পাওয়া — সে এক দিন গেছে ভয়ঙ্কর।

ঐতিহাসিক যুগের এমনই একদিনে বিশাল এক মিলিটারী গাড়ি এসে ধাক্কা মারে রামায়ণ-গানের আটচালার পিলারে। ভেঙে পড়ে আটচালা। বৃটিশ রাজত্ব। ভয়ে ভয়ে সসংকোচে নালিশ করা হয় বৃটিশ সরকারের কাছে। দাবী করা হয় ক্ষতিপূরণের টাকা। দেরীতে হলেও টাকা অবশ্য আসে। ব্রিটিশ সরকারের টাকা ও স্থানীয় লোকের আর্থিক সাহায্যে এবং আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলা ১৩৫৭ সালে নির্মিত হয় একতলা ছাদবিশিষ্ট সুদৃশ্য এক চাঁদনি। চারটি চৌকাকৃতি এবং এগারটি বৃত্তাকার অর্থাৎ মোট পনেরটি স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান এই চাঁদনীটির জাফ্‌রিকাটা নক্সা নজর কাড়ে পথিকের। চাঁদনীটির শীর্ষস্থানের চূড়ার কুলঙ্গিতে উপবিষ্ট রয়েছেন রাম-সীতার যুগল মূর্তি। সম্মুখভাগে রামভক্ত হনুমান করজোড়ে প্রণাম করছেন তাঁর পরমারাধ্য দেবতা রাম-সীতাকে।

উপরের মূর্তিগুলির অনুরূপেই বিগত ১৪০৩ সালে চাঁদনীর অভ্যন্তরে নির্মিত হল সিংহাসনারূঢ় রাম-সীতার যুগল মূর্তি। নিমির্ত হল এবং গত ১৪০৩ সালের ৬ই বৈশাখ শুভ অক্ষয় তৃতীয়ার দিন প্রতিষ্ঠিত হল। সাথে সাথে চাঁদনীটির সংস্কার হল আগাগোড়া। মোজাইকের নয়নাভিরাম উজ্জ্বলতা, শিলিং-এর সুরুচিকর সৌখিন মসৃণতা আর রঙের তুলির বর্ণচ্ছটায় নবকলেবর ধারণ করে বিগত ৪০/৪৫ বছরের হতশ্রী চাঁদনীটি রূপান্তরিত হয় বিগ্রহ-সমন্বিত একটি শ্রীমন্দিরে— যার নাম বোলতলার 'রামমন্দির'।

খরচ হল অনেক টাকা। কোন এক আন্তর-প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে পিতা সুখময় দে-র স্মৃতিরক্ষার্থে টাকা যোগালেন বোলতলার 'স্টাইলো টেলারিং হাউস'-এর মালিক শ্রীমথুর চন্দ্র দে। মূর্তি তৈরী করলেন শিল্পী অশোক সূত্রধর। পুরো কাজটির তত্ত্বাবধান করলেন বোলতলা 'লক্ষ্মীমাতা ষোল আনা কমিটি'র পরিচালক বর্গ আর বলার মতো একটি ভাল বিষয় পেয়ে আমিও হুড়্ হুড়্ করে বলে দিলাম সেসব কথা। আসুন, রাম-সীতার জয়ধ্বনি দিয়ে বলুন— 'জয় জয় রঘুপতি রাজা রাম, পতিত পাবন সীতা রাম।'

অধ্যায় - ৭৯

বোলতলার বুড়োশিব

বোলতলার রাম-মন্দির দর্শনের পর আমরা দর্শন করব বোলতলার শ্রীশ্রীবুড়োশিব-জীউ-এর শিবলিঙ্গ। বুড়োশিবের কথা বলার পূর্বে বলব কিছু ব্যক্তিগত অনুভূতির কথা।

পাশ্চাত্য সভ্যতার ছোঁয়াচে প্রাদুর্ভাব, উগ্র আধুনিকতার চূড়ান্ত বস্তুবাদ এবং হিপি-

কালচারের বিকৃত রুচির সংক্রমণ আমাদের সমাজে এনেছে তরল-বিলাসের ঢেউ। বেদ-বেদান্ত উপনিষদের ভারত আজ নেপথ্যচারী। উপনিষদের ঋষি আজ উপেক্ষিত। দেব-দেবী অবহেলিত। এমনটা ছিল না ভারতে। এমনটা ছিল না বিষ্ণুপুরে। আজ থেকে একশ দেড়শ বছর পূর্বেও ভক্তিমার্গের ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ ব্যক্তি-উদ্যোগে অথবা পল্লীবাসীর যৌথ প্রয়াসে কিংবা সমবৃত্তি-সম্পন্ন স্বজাতীয় মানুষজন তাঁদের সার্বিক প্রচেষ্টায় নির্মাণ করতেন দেব-মন্দির, প্রতিষ্ঠা করতেন দেব-বিগ্রহ, প্রতিষ্ঠা করতেন গাছ, কুয়ো, পুকুর, পুকুরঘাট ইত্যাদি। আজকের জমিবিহীন নয়া জমিদারের দল এবং ধনবান ব্যক্তিগণ কিন্তু ব্যাঙ্কে টাকা জমাতে, চক্রবৃদ্ধিহারে টাকার সুদ গুণতেই অভ্যস্ত। টাকার নাতি-পুতিরা জন্মগ্রহণ করে ব্যাঙ্কের লেজারের খাতায় এবং পাস বুকে। সঞ্চয় প্রবৃত্তির উগ্র বাসনায় কোটিপতি হওয়ার উৎকট নেশা পেয়ে বসেছে এক শ্রেণীর চাকুরিজীবী শিক্ষিত মানুষকে। তাঁদের চিন্তাধারা—টাকা জমাব, ছেলে পুলে চাকরি বাকরি না পেলে পাহাড়-প্রমাণ টাকার সুদে খাবে বসে বসে। খাবে বংশ পরম্পরায়। এই যেখানে মানসিকতা সেখানে নতুন সৃষ্টির সম্ভাবনা কোথায়!

অথচ অল্প কিছুদিন আগেও মানুষের চিন্তা-ভাবনা ধ্রুপদী গতিতে প্রবাহিত হত। ছিল না এত সংকীর্ণতা। বস্তুবাদের পাশাপাশি, ভাববাদ এবং ঈশ্বরবাদেরও একটা মূল্য ছিল তখন। অর্থ থাকবে, থাকবে পরমার্থ—তবেই জীবন হবে সুষম— তৎকালীন অশিক্ষিত মানুষের মধ্যেও এই জীবন-দর্শনই প্রতিবিম্বিত হয়েছে জীবনের পরতে পরতে।

পূর্বেই বলেছি, বিষ্ণুপুরের নৃপতিগণ ছিলেন ঈশ্বরভক্ত। দেব-মন্দির এবং দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করাটা ছিল তাঁদের রাজকার্যেরই একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাজ-আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিষ্ণুপুরের ঈশ্বরভক্ত সক্ষম প্রজা সাধারণ দেবমন্দির ও দেব-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতে উৎসাহিত হতেন দারুণভাবে। তারই ফল হিসেবে বিষ্ণুপুরের ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায় শিব, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী ও মনসার ছড়াছড়ি। তারই ফসল হল বিষ্ণুপুরের বোলতলার শিবমন্দিরের মতোই আরো অনেকানেক দেব-মন্দির এবং দেব-বিগ্রহ। বিষ্ণুপুরের 'অতুরকুল তন্তুবায় যোলআনা'র সমষ্টিগত উদ্যোগে আনুমানিক আজ থেকে প্রায় দেড়শ, দু'শ বছর পূর্বে নির্মিত হয় এই মন্দির এবং প্রতিষ্ঠিত হন শিবলিঙ্গ সহ ভৈরবরাজ। পরবর্তীকালে নির্মিত হয় নাটমন্দির। বর্তমানে এই শিবঠাকুরের পূজা-অর্চনা ও উৎসবাদি পরিচালিত হয় 'বোলতলা শিবতলা কমিটি'র দ্বারা। বৈশাখী-পূর্ণিমা বা বুদ্ধ-পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে শিবের গাজন এবং চৈত্র মাসে শিবরাত্রি ব্রত উদ্‌যাপন এখানের উল্লেখযোগ্য উৎসব। ১৪১০ বঙ্গাব্দের হিসেবে গাজনের বয়স ৮৮ বছর। বোলতলা শিবতলা কমিটির হাতে পূজা ও উৎসবাদির দায়িত্ব স্থানান্তরিত হওয়া সত্ত্বেও বিজয়া দশমীর পরের দিন অর্থাৎ একাদশীর দিন কুলপূজার নিয়মানুসারে বিষ্ণুপুরের অতুরকুল তন্তুবায় শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ আজও স্বীয় সম্প্রদায়ের কুলদেবতা জ্ঞানে এই দেবতার পুজো করিয়ে ধন্য হন, হন কৃতকৃতার্থ। এই শিবমন্দিরের পাশেই রয়েছে আর একটি পারিবারিক শিবমন্দির। বোলতলা নিবাসী ৺অখিল চন্দ্র দত্ত ঈশ্বর-প্রীতির প্রাবল্যে দেবঋণ শোধের অভিমানসে এই মন্দির নির্মাণ পূর্বক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্বে।

শিবমন্দিরের ঈশানকোণে শিবলিঙ্গের সন্নিকটে শোভা পাচ্ছে সিঁদুর প্রলিপ্ত একটি বৃহদাকার ত্রিশূল। আপনারা সকলেই জানেন বিষ্ণুর-আয়ুধ সুদর্শনচক্র, রামচন্দ্রের তীর-ধনুক, হনুমানের গদা এবং শিবের আয়ুধ ত্রিশূল। এখন প্রশ্ন হল, শিবের হাতে ত্রিশূল

কেন? ত্রিশূলের প্রকৃত তাৎপর্য কি?

উত্তরের খোঁজে স্বামী নির্ম্মলানন্দ বিরচিত 'দেবদেবী ও তাঁদের বাহন' পুস্তকের ২০৩ পৃষ্ঠায় কিয়দংশ স্মৃতিচারণ করি এই মর্মে। তিনি বলেছেন, শিবের হাতের "ত্রিশূল কেবল আয়ুধবিশেষ নহে, এটিকে শাস্ত্রে বলা হয়েছে শিবকোষের কুঞ্চিকা বা চাবিকাঠি স্বরূপ। মঞ্জুষা বা সিন্দুকে মানুষ মূল্যবান্ ধন-রত্ন গচ্ছিত রাখে। যখন সেই ধন-রত্নের প্রয়োজন হয়, তখন উপযুক্ত চাবিকাঠির সহায়তায় উক্ত ধনকোষ উন্মুক্ত করলে তবে তা পাওয়া যায়। **তেমনি শিবেরও কোষ বা ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার আছে। সেই ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার তত্ত্বময়। সে তত্ত্ব গুণময় এবং গুণাতীত উভয়তঃ। সেই তত্ত্বমঞ্জুষার কুঞ্চিকা বা চাবিকাঠি হলো ত্রিশূল।** গুণময় এবং গুণাতীত— এ দু'টি ভাব নিয়েই ত্রিশূলের উৎপত্তি। ত্রিশূলের তিনটি ফলক— সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের প্রতীক, কিন্তু এই তিনটি ফলক একটি মাত্র ঋজু দণ্ড থেকেই উদ্ভূত। ঐ একক ঋজু দণ্ডটিই গুণাতীত তত্ত্বের প্রকাশক। ত্রিশূলের ত্রিগুণাত্মিক তিনটি ফলকে সৃষ্টি, স্থিতি, লয়। সত্ত্বগুণময় ফলকে আছেন বিষ্ণু, রজোগুণময় ফলকে ব্রহ্মা এবং তমোগুণময় ফলকে রুদ্র। শিবের ত্রিশূল এই ত্রিশক্তির আধারস্বরূপ। ত্রিশূলের একটি বিশেষ ফলকে সংহারদেবতা রূপে স্বয়ং মহাদেব অবস্থিত। কিন্তু অপর দুই ফলকে যথাক্রমে সৃষ্টি ও স্থিতিবিধাতা ব্রহ্মা ও বিষ্ণুকে সহযোগীরূপে রেখেছেন। **এক শিবতত্ত্বেই ত্রয়ীতত্ত্বের সমাহার—যেন এক গুণাতীত উৎস থেকে নিঃসারিত তিনটি গুণসমৃদ্ধ অত্যাশ্চর্য্য প্রকাশ। একটি ঋজুদণ্ডে বিধৃত তিনটি ফলকযুক্ত ত্রিশূল শিবকোষের কুঞ্চিকারূপে উপরোক্ত তত্ত্বসম্পদের সন্ধানই আমাদিগকে দান করে।...**

প্রতিটি জীবই চায়— শিবত্ব লাভ। কিন্তু বদ্ধাবস্থায় ত্রিগুণের অধীন সে। তিনটি সুদৃঢ় গ্রন্থি দিয়ে সে জীবভাবে আবদ্ধ। ব্রহ্মা জীবকে বেঁধেছেন রজোগুণের গ্রন্থিতে, বিষ্ণু তাঁকে বেঁধেছেন সত্ত্বগুণের গ্রন্থিতে, রুদ্র তাঁকে বেঁধেছেন তমোগুণের গ্রন্থিতে— ত্রিপুরান্তক শিবের ত্রিশূলের শাণিত আঘাতে এ তিনটি গ্রন্থিই অবলীলাক্রমে ছিন্ন হলে সত্তা মুক্তি পায় জীবভাব থেকে— শিবতত্ত্বের সিংহদ্বার তখন তার সমীপে হয় স্বতঃ উন্মুক্ত।"

বোলতলার বুড়ো-শিবের নাটমন্দিরে বসে বসে শোনালাম শিবের ত্রিশূল-তত্ত্বের কথা এবার আমরা মনোনিবেশ করব মল্লভূমের ব্রতকথার আসরে।

অধ্যায় - ৮০

ব্রতকথার আসর

পুণ্যিপুকুর

আমাদের দেশে প্রচলিত ব্রতকথাগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথমতঃ পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় ব্রতকথা, দ্বিতীয়তঃ মেয়েলি ব্রতকথা। মেয়েলি ব্রতকথাগুলি আবার কুমারী ব্রত এবং এয়োব্রত নামে বিভক্ত। এছাড়া এমন কিছু ব্রত রয়েছে যেগুলি কুমারী এবং এয়ো অর্থাৎ সধবা নারী— উভয়েই উদযাপন করে। এমনি একটি ব্রতের নাম পুণ্যিপুকুর বা পুর্ণিপুকুর। চৈত্র-সংক্রান্তিতে এই ব্রতের সূচনা, বৈশাখের শেষে সমাপ্তি। ঘরের উঠোনে

চৌকাকৃতি বা ডিম্বাকৃতির উনোনের মতো ছোট একটি পুকুর করা হয়। মাটির আল বেঁধে পুকুরের পাড় তৈরী করে পাড়টিকে কড়ি দিয়ে সাজানো হয়। পুকুরের মধ্যস্থলে একটি বেলগাছের চারা বা বেলকাঁটা বা তুলসীচারা রোপণ করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে ঘট স্থাপন করে পুজো করার রীতিও প্রচলিত। পুজোর উপকরণ হিসেবে সাদা ফুল, দূর্বা, চন্দন, গোটামুগ ভিজে বা ছোলা ভিজে, ফল ও মিষ্টান্ন ব্যবহার করা হয়। পুকুরের পাশে উত্তর বা পূর্ব দিকে মুখ করে ফুল, ফল, মিষ্টান্ন সহযোগে পূজা করা হয়। পূজান্তে জলপূর্ণ ঘটি হাতে নিয়ে নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক বিল্ব বা তুলসী মূলে জল দেওয়া হয়।

কুমারী মেয়েরা বলে—

"পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা, কে পূজে রে দুপুর বেলা?
আমি সতী লীলাবতী, সাত ভাইয়ের বোন ভাগ্যবতী।।
পূজি চন্দন দূর্বা ফুলে, বাড়ুক লক্ষ্মী বাপের কুলে
পুণ্যি পুকুরে ঢালি জল, বাপ ভায়ের হোক অশেষ মঙ্গল।।

অথবা—

"তুমাকে পূজলাম দুব্বোফুলে, বাড়ুক লক্ষ্মী বাপের কুলে।
পুণ্যি পুকুরে ঢাললাম জল, বাপ ভায়ের যেন হয় মঙ্গল।।"

বিবাহিতা সধবা মেয়েরা বলেন—

" পুণ্যি পুকুর পুষ্পমালা কে পূজেরে দুপুরবেলা।
আমি সতী ভাগ্যবতী সাত ভাইয়ের বোন লীলাবতী।।
জল ঢালি তুলসী বিল্বমূলে শ্বশুর কুল ভরুক ফলে ফুলে।
পুণ্যি পুকুরে ঢালি জল বাপ শ্বশুরের হোক মঙ্গল।।"

অথবা শোনা যায় পুত্রলাভের তীব্র বাসনা—

"পুর্ণি পুকুর পুষ্পমালা কে পূজেরে দুপুরবেলা?
আমি সতী লীলাবতী ভাইয়ের বোন পুত্রবতী।
হয়ে পুত্র মরবে না ধরিত্রীতে ধরবে না।"

উক্ত মন্ত্রগুলির যে কোন একটি মন্ত্র তিনবার বলতে হয় এবং প্রত্যেকবার মন্ত্রোচ্চারণের পর জল ঢালতে হয়।

পুণ্যিপুকুর ব্রতকথার মূল সুরটি হল খরতপা বৈশাখ মাসে যখন নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-ডোবা শুকিয়ে খাঁ খাঁ করে, তখন বৃষ্টি কামনায় এই ব্রত পালন করা হয়; কারণ পরিমিত বৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে সমৃদ্ধি। বলা হয় জলই জীবন। জল না হলে সব কিছু জ্বলে যায়। পুড়ে ছারখার হয়ে যায় পৃথিবী। **মূলতঃ বৃষ্টি কামনাতে এই ব্রত উদ্‌যাপিত হলেও এই ব্রতের মন্ত্রের মধ্যে কুমারী বা নারী হৃদয়ের অব্যক্ত কামনা-বাসনাগুলির অভিনব অভিব্যক্তি ঘটেছে।** পুরুষের কামনা বহির্মুখী এবং বাহ্যজগৎকেন্দ্রিক। নারীর কুসুমিত কামনা-বাসনাগুলি কিন্তু গৃহকোণ এবং পরিবার-কেন্দ্রিক। পুণ্যিপুকুর ব্রতের মধ্যে নারী-মনের প্রতিচ্ছবিটিই যেন সুচারু রূপে চিত্রিত হয়েছে। এ ব্রত একাধারে ব্যক্তিকেন্দ্রিক, পরিবার-কেন্দ্রিক এবং বৃহত্তর অর্থে সমাজ-কেন্দ্রিক।

ব্রতটির নামকরণ করা হয়েছে পুণ্যিপুকুর বা পুর্ণিপুকুর। দুটি অর্থেই নামকরণ সার্থক ও সুন্দর। এই ব্রত উদ্‌যাপনে পুণ্য সঞ্চয় হয়। যে পুণ্যের ফলে নিজের কল্যাণ, বাপের কুল ও শ্বশুর-কুলের কল্যাণের পাশপাশি দেশের কল্যাণও সম্ভব। এজন্যই এটি পুণ্যিপুকুর; আবার পুর্ণিপুকুর অর্থে বোঝায় এই ব্রতের ফলে শুষ্ক পুকুর-ডোবা, খাল-বিল, নদী-নালা সুষম বারিসিঞ্চনে হয়ে উঠবে পূর্ণ অথবা পরিপূর্ণ পুকুরের মতই নারী হৃদয়ের শুভ কামনাগুলি পূর্ণতা লাভ করবে দিনে দিনে।

এই ব্রত পরপর চার বছর করার নিয়ম। চার বছর পূর্ণ হলে দক্ষিণা সহকারে ব্রাহ্মণ-ভোজন করিয়ে ব্রত উদ্‌যাপন করতে হয়।

বিপত্তারিণী ব্রত

পুণ্যিপুকুরের পর আসা যাক বিপত্তারিণী ব্রতের কথায়। **বিপদ থেকে তারণ করেন যে দেবী তিনিই বিপত্তারিণী।** কিন্তু এখানে বিপত্তারিণী বলতে বোঝানো হয়েছে বিপদাপদনাশিনী দেবী দুর্গাকে।

কথিত আছে পুরাকালে বিদর্ভ নগরে একজন সত্যনিষ্ঠ ধার্মিক রাজা ছিলেন। তাঁর স্ত্রীও ছিলেন বহুগুণে গুণান্বিতা। কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে তিনি একবার রাজ-অনভিপ্রেত একটা কাজ করে বসেন। এতে রাজা, রাণীর উপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হন এবং প্রাণদণ্ডেরও হুমকি দেন। রাণী ভীষণ ভয় পেয়ে এই সমূহ বিপদ থেকে রক্ষা পাবার উদ্দেশ্যে দেবী দুর্গার কাছে বারংবার প্রার্থনা করতে থাকেন। বলেন, "মা, তুমি যদি দয়া করে এই বিপদ থেকে আমাকে রক্ষা কর তাহলে আমি সারা জীবন তোমার পূজা করব। বিপত্তারিণীব্রত পালন করব।" রাণীর পুনঃপুনঃ সকাতর প্রার্থনাতে সন্তুষ্ট হয়ে দেবী রাণীকে সেই বিপদ থেকে রক্ষা করেন। সেই থেকে রাণী বছরে বছরে সাড়ম্বরে বিপত্তারিণী ব্রত করতেন। দিনে দিনে বিপত্তারিণীর মহিমা প্রচারিত হয় এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। **প্রচলিত বিশ্বাস বিপত্তারিণী ব্রত করলে মা বিপত্তারিণী ওরফে দেবী দুর্গা তার ভক্তকে সমস্ত বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন।**

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া থেকে দশমীর মধ্যে যে কোন শনি, মঙ্গলবার এই ব্রত করার নিয়ম। ব্রতকারিণীকে আগের দিন হবিষ্যি করে থাকতে হবে। পুজোর দিন ছোট, বড় নৈবেদ্যসহ ১৩ রকম ফুল, ১৩ রকম ফল ও পিঠে দেবার নিয়ম। ১৩ গাছা লাল সুতো, পৈতে, পান, সুপারি, চুন, খয়ের, দূর্বা, ঘি, ময়দা উপকরণ ছাড়াও অঙ্কুরিত গোটামুগ ও মিষ্টান্ন সহযোগে পূজা দেওয়ার রীতি প্রচলিত। পূজান্তে ১৩ গাছা লাল সুতো ১৩টি গ্রন্থি সহযোগে বিপত্তারিণীর তাগা হিসেবে দক্ষিণ হস্তে পরতে হয়। ব্রতকারিণীকে ঐ দিন নিরন্ন ভোজন করতে হয়।

বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লার অন্তর্ভুক্ত গড়গড়ান পল্লীতে বিপত্তারিণী মন্দির রয়েছে। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুর্গা, কালী বা চণ্ডী মন্দিরে বিপত্তারিণী পূজা করানো হয়ে থাকে।

জিতাষ্টমী ব্রত

বিপত্তারিণী ব্রতকথার পর শোনাব জিতাষ্টমী ব্রতের কথা। জিতাষ্টমী ব্রত জীমূতবাহনের পুজো নামেও প্রচলিত। বিষ্ণুপুর শহরের শিশু ও কিশোর মহলে এটি আবার 'শিয়াল-

শকুনি' উৎসব নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ।

জিতাষ্টমী ব্রতটিও নারীব্রত। সধবা মেয়েরা এই ব্রত পালনের অধিকারিণী। বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে জিতাষ্টমীর সাথে 'শিয়াল-শকুনি' পর্ব সংযোজিত হওয়ার ফলে শিশু ও কিশোর বয়সের বালক বালিকাগণও এই পূজার পুরোহিতের মর্যাদায় সমুত্তীর্ণ হয়েছে।

জিতাষ্টমী ব্রতের তত্ত্বকথায় কান পাতা যাক এবার। শোনা যায় কোন এক দেশে শালিবাহন নামে ধর্মপ্রাণ এক রাজা ছিলেন। রাজার সবই ছিল, ছিল না কোন সন্তান সন্ততি। সন্তান কামনায় বহু যাগযজ্ঞ করেও সন্তানলাভে ব্যর্থ হন তিনি। দুঃখে ম্রিয়মাণ রাণী একরাত্রিতে স্বপ্ন দেখলেন কোন এক হংসবাহন দেবতা যেন তাকে এসে বলছেন, "রাণী! তুমি জিতাষ্টমীর ব্রত কর। তোমার মনোবাসনা পূর্ণ হবে।" এই বলে তিনি ব্রতের নিয়ম-কানুন বলে দেন। স্বপ্নের কথা রাণী জানালেন রাজাকে। রাজাও খুশি মনে রাণীকে ব্রত পালনে উৎসাহিত করলেন। দৈব স্বপ্নাদেশমত ব্রত উদ্‌যাপন করে রাণী একটি ছেলে ও একটি মেয়ে লাভ করেন। ছেলেটির নাম জীমূতবাহন এবং মেয়েটির নাম সুশীলা। যথাসময়ে জীমূতবাহনের বিয়ে হয় একটি রাজকন্যার সাথে। জীমূতবাহনের সন্তানাদি হয় কিন্তু একটিও টিকে না। রাণী তখন বউমাকে জিতাষ্টমী ব্রত করতে উপদেশ দেন। বউমা কিন্তু রাণীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করে এবং উপহাস করে শাশুড়ীকে। পরবর্তীকালে শাশুড়ীর সদুপদেশ মেনে নিয়ে জিতাষ্টমী ব্রত করে এবং আয়ুষ্মান সন্তান সন্ততি লাভে সক্ষম হয়। রাণীর পুত্র-কন্যা লাভ এবং জীমূতবাহনের সন্তান সন্ততি লাভের দৈব ঘটনাকে কেন্দ্র করেই জিতাষ্টমী ব্রতের সূত্রপাত। মৃতবৎসা নারী এবং সন্তান পিপাসু রমণীদের ক্ষেত্রে তাই এই ব্রত অপরিহার্য। সন্তান লাভ এবং সন্তান-সন্ততির কল্যাণ কামনাই যেহেতু এই ব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য সেজন্যই বোধ করি কচিকাঁচা শিশু সন্তানগুলি যেন এই ব্রতের প্রাণস্পন্দন। তাই তো তাদের আনন্দ বিধানের জন্য এই ব্রতে 'শিয়াল-শকুনি' উৎসবটি সংযোজিত হয়েছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। মাটির তৈরী শিয়াল, শকুনি, ব্যাঙ, কচ্ছপ, মাহুত শোভিত হাতি ইত্যাদি ব্রতাঙ্গনে পূজিত হয় বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়াতে। ব্যক্তিগতভাবে গৃহাঙ্গনে এবং ক্ষেত্রবিশেষে বারোয়ারিভাবে এই ব্রত উদ্‌যাপিত হয় পল্লীতে পল্লীতে।

আশ্বিন মাসের কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। পূজাঙ্গনে একটি বটবৃক্ষের শাখা পোঁতা হয়। বৃক্ষ শাখাটিকে শালুক ফুলের মালার দ্বারা সুশোভিত করে বৃক্ষমূলে প্রত্যেকটি শিশুর জন্য নির্ধারিত শিয়াল-শকুনিগুলিকে সুন্দরভাবে সংস্থাপিত করে ধূপ, দীপ, আলপনা সহযোগে উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে একটি আধ্যাত্মিক পরিবেশ রচনা করা হয়। ছেলে মেয়েদের কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে ওঠে ব্রত-প্রাঙ্গণ। পুত্রলাভেচ্ছু রমণীগণও শিয়াল-শকুনি সহ গোটা শশা, কলসী ভর্তি ভিজে মটর কলাই এবং সাধ্যমত ফলমূল ও মিষ্টান্ন সহযোগে উপবাসী অবস্থায় জীমূতবাহনের পূজা করিয়ে সন্তান কামনা এবং সন্তান-সন্ততির মঙ্গল কামনা করে কায়মনোবাক্যে। সন্ধ্যারাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয় পুজো। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষেত্রবিশেষে বাচ্চা ছেলেরাও এই পুজোর পৌরোহিত্য করে থাকে। রাত্রি-প্রভাতে দুধ, গুড়, চিঁড়ে দিয়ে পূজা করার রীতি প্রচলিত। এই পূজার পর যে যার পুজোপকরণ নিয়ে যায় নিজ নিজ বাড়িতে। প্রসাদ বিতরণ এবং গ্রহণের মাধ্যমে সাঙ্গ হয় পূজানুষ্ঠান। বাচ্চা-কাচ্চারা তাদের শিয়াল-শকুনিগুলি নিয়ে যায় সন্নিকটস্থ পুকুরে কিংবা নদীতে। সেখানে তারা *'শিয়াল গেল খালে, শকুনি গেল ডালে'* ইত্যাদি ধ্বনি তুলে শিয়াল-শকুনিগুলিকে একে একে ছুঁড়ে দেয় জলে। শিয়াল এবং শকুনিগুলিকে জলে

ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার মর্মকথা হল শিয়াল ও শকুনি অশুভ শক্তির প্রতীক। দেশে মড়ক ও মহামারী হলে এদের খুব আনন্দ হয়। তাই এই পৈশাচিক প্রাণীগুলিকে বিসর্জন দিয়ে সুখ, সমৃদ্ধি দীর্ঘায়ু কামনা করা হয় জিতাষ্টমীর জীমূতবাহন পূজার মাধ্যমে। অতঃপর স্নানান্তে শশা ও দুধ, গুড়, চিঁড়ে খেয়ে বাড়ি ফিরে সানন্দে। বটবৃক্ষশাখাটিকে জলাশয় করার মাধ্যমে সে বছরের মত সাঙ্গ হয় ব্রত। ব্রতকারিণী মহিলাগণও শিয়াল-শকুনিগুলি জলাশয় করে দুধ-চিঁড়ে ও প্রসাদ গ্রহণান্তে সাঙ্গ করে ব্রত। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, জিতাষ্টমী ব্রতটি খুব কঠিন ব্রত। কারণ ব্রতকারিণীকে জিতাষ্টমীর দিন অহোরাত্র উপবাসে থাকতে হয়। এছাড়া **'ঝিঙেফুলে জিতাষ্টমী'** ব্রতও প্রচলিত রয়েছে। 'ঝিঙেফুল জিতাষ্টমী'র ব্রতকারিণীকে জিতাষ্টমীর দিন দিবারাত্র উপবাসে থাকার পরও পরের দিন সারা দিবস উপবাসে থাকতে হয়। অর্থাৎ দুই দিন একরাত্রি একটানা উপবাসী থাকতে হয়। অতঃপর সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঝিঙে-ফুল ফুটলে প্রস্ফুটিত ঝিঙে-ফুল দেখে প্রসাদ গ্রহণান্তে ব্রতকারিণীর ব্রত সাঙ্গ হয়।

নলসংক্রান্তি বা নলপুজো বা ডাকসংক্রান্তি

জিতাষ্টমী ব্রতের পর আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের কৃষিজীবী মানুষজনের মধ্যে প্রচলিত দুটি লোকাচারের প্রতি। আশ্বিন মাসের সংক্রান্তিকে নলসংক্রান্তি বলা হয়। নলসংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হয় নলপুজো। ধান আমাদের প্রাণ। আর আমন ধানই ছিল আমাদের প্রধান চাষ। আশ্বিনের শেষে এবং কার্তিকের শুরুতে আমন ধান হয় গর্ভবতী। **ধান-গর্ভবতী হওয়ার সময় ধানগাছকে 'সাধ' খাওয়ানোর প্রচলিত রীতি থেকেই নলপুজোর প্রচলন।** "ওল, মানকচু, সর্ষে, আলোচাল, ঘি, মধু ইত্যাদি উপহার দেওয়া হয় মাঠে। কোথাও সারকুঁড় বা সারগাদায় নলকাঠি বা সরগাছ পুঁতে দেওয়া হয়।"[১] এটিই নলপুজোর নিয়ম।

ধানকে সাধ খাওয়ানোর এই চিরাচরিত প্রথাটি আপাতদৃষ্টিতে একটি কুসংস্কার রূপে প্রতিভাত হয়। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে হলে ফিরে যেতে হবে আমাদের একান্ত উপেক্ষিতা নারী-সমাজে। যতদূর জানা যায় বৈদিক যুগে নারীরা উপেক্ষিতা ছিল না। বৈদিক যুগের অব্যবহিত পরেই অন্তঃসত্ত্বা রমণীদের ক্ষেত্রে সাধভক্ষণের রীতি প্রচলিত হয়। কিন্তু কেন? অনুসন্ধিৎসা বলে বৈদিক যুগের পরবর্তীকাল হতেই পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় নারীর প্রভাব কমতে থাকে ক্রমশঃ। তারা উপেক্ষিতা এবং অবহেলিতা হতে থাকে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এবং প্রবল প্রতাপান্বিতা শাশুড়ী-শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় গৃহবধু নির্যাতন চলতে থাকে প্রাণে না মেরে পেটে মেরে। এ প্রসঙ্গে দুটি প্রবাদ বাক্য মনে পড়ে। যেমন—

ছোট সরাটি ভেঙে গেছে বড় সরাটি আছে
গুনুর গুনুর করনা বৌরা হাতের আটকাল আছে।

শাশুড়ী ছোট সরাতে মাপ করে বৌদের খেতে দেয়। ছোট সরাটি ভেঙে যাওয়ায় বৌরা উৎফুল্ল, কারণ তাদের আশা এবার তারা বড় সরার মাপে খাবার পাবে। শাশুড়ী বউদের মনের কথা বুঝতে পেরে বলে ওঠে, 'সরা ভাঙলে কি হবে, আমার হাতের মাপ আছে।'

১। পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া, পৃঃ— ২৬৬

অন্য প্রবাদটিতেও উক্ত সুরই অনুরণিত—

সাত বৌকে এক আঁস্কা, খড়কার ডগে ঘি,
গুঁজুর গুঁজুর করছ বৌরা, খেতে লারছ কি?

অর্থাৎ সাত বৌকে একটি মাত্র আঁস্কে পিঠে নামমাত্র ঘি দিয়ে খেতে দেওয়া হয়েছে। তাই দেখে বৌদের মধ্যে অসন্তোষের গুঞ্জন উঠেছে। শাশুড়ী তখন বৌদের উদ্দেশ্যে বলে ওঠে, 'এতোটা পিঠে তোমরা কি খেতে পারছ না যে এত কথা বলছ?'

শাশুড়ীর শাসন এবং দারিদ্র্যের নিপীড়নে উপেক্ষিতা গৃহবধূরা অপুষ্টি রোগে আক্রান্ত হয়ে রোগগ্রস্ত অপুষ্ট সন্তান প্রসব করত। প্রায় ক্ষেত্রেই সদ্যঃপ্রসূত শিশু এবং মা উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হত। অপুষ্টিজনিত শিশু ও মায়ের অকালমৃত্যুকে রোধ করার মহৎ উদ্দেশ্যেই সমাজের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাধভক্ষণ প্রথার প্রচলন করেন। গর্ভবতী নারীর সু-সন্তান কামনায় পাঁচ মাসে পুজো এবং সাত ও নয় মাসে সাধ খাওয়ানোর রীতি অনুসৃত হয়। সাত মাসে শ্বশুরালয়ে সাধভক্ষণের পর থেকেই আসন্ন-প্রসবা রমণীকে আত্মীয় স্বজনগণ নিমন্ত্রণ করে পুষ্টিকর উপাদেয় খাবার খাইয়ে থাকে ক্রমান্বয়ে। এতে গর্ভস্থ সন্তান এবং হবু-মা উভয়েই পুষ্টি লাভ করে। মায়ের পুষ্টিজনিত নবজাত সন্তানও পুষ্ট হয়ে ওঠে। **মেয়েদের সাধ খাওয়ানো রীতির অনুকরণেই ধানগাছ গর্ভবতী হওয়ার সময় ধানকে সাধ খাওয়ানোর সংস্কারের জন্ম।** পূর্বেই বলেছি ধানই আমাদের প্রাণ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে অপুষ্টিজনিত অনেক সময় পুষ্ট ধানের পরিবর্তে ভুঁয়ো ধান বা আখড়া ধান হয় গাছে গাছে। ভুঁয়ো ধানের পরিবর্তে সুপুষ্ট শস্য লাভের আশায় ধানকে সাধ খাওয়ানোর নিয়মের প্রবর্তন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে বিচার করলে এটি একটি কুসংস্কার বলেই প্রতিভাত হয়। কৃষিজীবী মানুষের কাছে নলপুজো ওরফে ধানকে সাধ খাওয়ানোর রীতি মানসিক শান্তির দ্যোতক।

আবার "কার্তিক সংক্রান্তির দিনে ধানক্ষেতে গিয়ে ধানকে ডাক দিতে হয়। অনুষ্ঠানটিকে কোথাও বলে **মাথানষষ্ঠী**, কোথাও **'ডাকসংক্রান্তি'**। ডাক দেবার মন্ত্র আছে ছড়ায়।

আয় ফুল ফুল ঝিঙের পাত, গজলক্ষ্মী দুধু ভাত।
লোকের বাড়ি আলখাল, আমার বাড়ি শুধুই চাল।।

সেদিন এক আঁটি ধানের গাছ নতুন গামছায় জড়িয়ে আনতে হয়। মেদিনীপুরেও এ প্রথা আছে। নাম **শরপুজো**। গাছের আঁটিকে বলে মুঠ। মুঠ এনে মরাই তলায় রাখতে হয়। গৃহিণী তা বরণ করে পৌষ-সংক্রান্তি পর্যন্ত রক্ষা করেন। মুঠের খড় দিয়ে সংক্রান্তির দিন বাঁউড়ি বা বাউনি বাঁধা হয়।[১]" **ডাকসংক্রান্তি হল ধান্যলক্ষ্মীকে সাদরে আহ্বান করে স্বগৃহে বরণ করার একটি মাঙ্গলিক লোকাচার।**

ব্রতকথার উৎস সন্ধানে ব্রতী হয়ে পূর্বা সেনগুপ্ত লিখেছেন—

"ব্রতকথার সাতকাহন বর্ণনায় ইতিহাসের প্রসঙ্গ এসেই যায়। সেই সুদূরকালের কথা, ভারতে তখন সবে এসেছে আর্যরা। ভারতে প্রবেশ করেই তাদের মিলিত হতে হল ভারতের আদি মানুষের সঙ্গে। আর্য-অনার্য সংস্কৃতি মিলে মিশে তৈরী হল নানা আনুষ্ঠান আচার। ব্রতকথা তারই ফসল।"[২]

১। পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া, পৃঃ — ২৬৬, ২। সুখী গৃহকোণ, মে ২০০০ সংখ্যা, পৃঃ — ২৪

অধ্যায়-৮১

ঈশ্বর-আরাধনায় বাহাদুরগঞ্জের চৌধুরী পরিবার

মল্লভূমের ব্রতকথার মাধুর্য উপভোগ করতে করতে বোলতলার রাম-মন্দির ও বুড়োশিবের মন্দিরকে পিছনে রেখে আমরা এসে গেছি ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ-এর নামে নামাঙ্কিত বাহাদুরগঞ্জ পল্লীতে। এখানের রাস্তার তেমাথার সংযোগস্থলের অগ্নিকোণে রয়েছে দুটি শিবমন্দির। শিবমন্দিরদ্বয়ের মধ্যস্থলে একটি রাসমন্দির। শিবমন্দিরদ্বয় এবং রাসমন্দিরের কথা বলতে গেলেই এসে যায় এখানের চৌধুরী পরিবারের কথা।

আজ থেকে প্রায় তিনশ সাড়ে তিনশ বছর আগের কথা। গোপাল দত্ত এবং গোবিন্দ দত্ত — এই দুই সহোদর ভাই কামারপুকুর থেকে বাহাদুরগঞ্জ মহল্লায় এসে বাসন-ব্যবসা শুরু করেছেন। দিনে দিনে ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছে। লক্ষ্মীলাভ হয়েছে আশাতীত। অতএব নির্মিত হয় সুশোভিত দ্বিতল বসতবাটি।

পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ধনাঢ্য ব্যক্তি হিসেবে ৺গোপালবাবুর নাতি কেশব দত্তের সাথে বিষ্ণুপুরের রাজ পরিবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সময়টা ছিল দ্বিতীয় গোপাল সিংহের রাজত্বকাল (১৮০৯-১৮৭৫ খৃঃ)। বিষ্ণুপুরের রাজবংশের একেবারে দৈন্য অবস্থা। মহারাজের নির্দেশে কেশব দত্ত রাজপরিবার ও রাজকর্মচারীদের অর্থমূল্যের বিনিময়ে রসদ যোগান দেওয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় রাজ্যের প্রধান ব্যবসায়ী হিসেবে রাজা কেশব দত্তকে 'চৌধুরী' উপাধিতে ভূষিত করেন। কেশব চৌধুরী বছরের পর বছর যোগান দেন রসদ, কিন্তু অর্থ দিতে পারেন না রাজা। তাই মূল্য হিসেবে অর্থের বিনিময়ে লিখে দেন বাঁধ, পুষ্করিণী সহ জমি-জায়গা। তারপরে রাজার মুকুট এবং রাজপরিবারের মহামূল্য বরাসনও চিরদিনের মতো বন্ধক পড়ে চৌধুরী পরিবারে। ব্রিটিশ রাজত্বকালে গোপাল সিংহের আমলে মল্লরাজ্যের ভূসম্পত্তি যখন নিলামে বিক্রী হয়ে যায় সেই সময় কেশব চৌধুরী জয়পুর, গোবিন্দপুর, আধকড়া, কুলুবন মৌজা এবং যমুনাবাঁধ মৌজা, ভালুকখুলা জঙ্গল প্রভৃতিসহ ৮টি মৌজা নিলামে ক্রয় করে নেন।

কেশবচন্দ্র ছিলেন সৌভাগ্যবান ব্যবসায়ী এবং ঈশ্বর-প্রেমিক। অর্থ এবং পরমার্থ-প্রিয় এই মানুষটি বিশাল ভূসম্পত্তি লাভের পর ভগবত-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বীয় বসতবাটীর উন্মুক্ত স্থানে দামোদর ও দুর্গা মন্দির এবং এই রাসতলা প্রাঙ্গণে দুটি শিবমন্দির ও পরবর্তীকালে একটি রাসমন্দির নির্মাণপূর্বক দামোদর শিলা এবং শিবলিঙ্গাদি প্রতিষ্ঠা করেন। দামোদর শালগ্রাম শিলা নামান্তরে বিষ্ণু বা কৃষ্ণ। কৃষ্ণ-বিষ্ণুরূপী এই নারায়ণশিলার রথ উৎসবের জন্য নির্মাণ করান পিতলের এক বৃহদাকার রথ এবং রাসোৎসবের জন্য রাসমন্দির। দুর্গাপূজা চৌধুরী পরিবারের প্রধান উৎসব। কোজাগরী লক্ষ্মীপূজাও করেন এঁরা। ৺গোপাল ও ৺গোবিন্দ দত্তের উত্তরপুরুষগণ তাঁদের পারিবারিক ঐতিহ্যকে বজায় রেখে আজও রথযাত্রা, ঝুলন, জন্মাষ্টমী, দুর্গাপূজা, রাস, দোল, শিবরাত্রি উৎসবাদি উদ্‌যাপন করেন যৌথভাবে এবং নিষ্ঠাসহকারে। **গুপ্তবৃন্দাবন বিষ্ণুপুরের দেব-মাহাত্ম্যের ঐতিহ্যটিকে গৌরবান্বিত করেছেন বিষ্ণুপুরের এই চৌধুরী পরিবার। এজন্যই এঁরা স্মরণীয়। শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবধর্মের সুষ্ঠু সমন্বয় ঘটেছে এখানে।**

মল্লরাজাদের প্রবল ঈশ্বর-প্রীতির ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে মল্লরাজ্যের, বিশেষ করে বিষ্ণুপুরের প্রজাসাধারণও পল্লীতে পল্লীতে এবং ঘরে ঘরে দেব-দেবী প্রতিষ্ঠা-পূর্বক ঈশ্বর-

আরাধনায় জীবন উৎসর্গ করেন। এরকম কিছু পারিবারিক এবং পল্লীভিত্তিক দেব-দেবীর কথাও শোনাব আপনাদের। বাহাদুরগঞ্জ ছেড়ে আমরা এখন হাজির হয়েছি মুসলিম সম্প্রদায় অধ্যুষিত সেখপাড়াতে। সেখপাড়ায় রয়েছে জুম্মা মসজিদ। ঐ দেখুন সেই বর্ণাঢ্য, পবিত্র মসজিদ। এখন আমি স্মৃতিচারণ করব মল্লভূমের মুসলমান সম্প্রদায় ও মুসলমানী উৎসবের কথা।

অধ্যায় - ৮২

মল্লভূমে মুসলমান সম্প্রদায় ও মুসলমানী উৎসব

১১৯২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরীর সঙ্গে ইতিহাস প্রসিদ্ধ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হলে ভারতে স্থায়ীভাবে মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। মহম্মদ ঘুরী তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত অনুচর ও ক্রীতদাস কুতব-উদ্দিন আইবককে দিল্লীর মসনদে বসিয়ে স্বদেশে ফিরে যান। দ্বাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষ এবং ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাঞ্জাব, বিহার, গুজরাট, কালিঞ্জর ও বাংলার একাংশ পর্যন্ত তিনি রাজ্য বিস্তার করেন। বিষ্ণুপুরের তেত্রিশতম রাজা রাম মল্লের রাজত্বকালে (১১৮৫-১২০৯ খৃঃ) মল্লরাজ্যের প্রায় কাছাকাছি পর্যন্ত এসে পড়েছিল মুসলিম শাসনের আধিপত্য। ১২৬৬-১২৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে গিয়াসুদ্দিন বলবন বাংলার স্বাধীন সুলতান তুঘরিল খাঁকে পরাজিত করে দিল্লীর সুলতানি ভিত্তি সুদৃঢ় করেছিলেন। "ও'ম্যালি জানিয়েছেন বীর হাম্বীরের পিতা ধাড়ীমল্ল বা ধরমল্ল রাজাদের মধ্যে প্রথম মুসলমান অধীনতা স্বীকার করেছিলেন। সে সময় বার্ষিক কর ধার্য হয়েছিল এক লক্ষ সাত হাজার টাকা। এর আগে আনুগত্য স্বীকার করলেও তা ছিল নামে মাত্র।" (পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া, পৃঃ — ১০৩) মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে এ ঘটনা ঘটেছিল। আবুল ফজল আকবরনামা গ্রন্থে ধাড়ী হাম্বীরের পুত্র বীর হাম্বীরকে মোগল সম্রাটের অনুগত জমিদার বলে উল্লেখ করেছেন।

ক্ষমতার দম্ভ এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের লড়াইয়ে মোগল-পাঠান যুদ্ধে মহারাজ বীর হাম্বীর জড়িয়ে পড়েন। গড়মান্দারণে মোগল সেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগৎ সিংহ পাঠানদের হাতে বন্দী হলে বীর হাম্বীর স্বীয় শক্তি প্রয়োগে জগৎ সিংহকে মুক্ত করে বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন ও মোগল সম্রাটের সুনজরে পড়েন এবং দিল্লীর বাদশা ও মুর্শিদাবাদের নবাব বংশের সাথে মল্লরাজবংশের একটি সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সুসম্পর্কের সূত্র ধরেই বিষ্ণুপুরে বা মল্লভূমে মুসলিম সংস্কৃতির হাত ধরে বিশিষ্ট মুসলমান সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে সময়ে সময়ে। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে তখন ফার্সী ভাষাই ছিল রাষ্ট্রভাষা। মল্লভূমে ফার্সী ভাষা শিক্ষা দানের জন্য বিষ্ণুপুরের রাজা নিয়ে আসেন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত এক আকুঞ্জী পরিবারকে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি পদবীটি আকুঞ্জী নয়— শুদ্ধ শব্দটি হল আখুন্দ। এটি ফার্সী শব্দ। আখুন্দ শব্দের অর্থ হল ওস্তাদ বা শিক্ষক বা বিশেষ কোন শিল্পকলায় পারদর্শী ব্যক্তি। দিল্লীর সম্রাট এবং মুর্শিদাবাদের নবাবের সাথে রাজকার্য পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় যোগসূত্র স্থাপনার্থে ফার্সী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন অনুভব করে খুব সম্ভব মহারাজ বীর হাম্বীর, নয়তো বা বীর হাম্বীর-পুত্র ধাড়ী হাম্বীর এই আখুন্দ পরিবারকে বিষ্ণুপুরে নিয়ে আসেন যথাবিহিত সম্মান সহকারে। বিষ্ণুপুরে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য উক্ত আখুন্দ পরিবারকে বিষ্ণুপুর-রাজ প্রভূত

পরিমাণে নিষ্কর জমিদান পূর্বক স্বচ্ছন্দে বসবাস করার সুবন্দোবস্ত করেন।

রাজকার্য পরিচালনার জন্য ফার্সী ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন ছাড়াও হিন্দুদের মধ্যে ফার্সী ভাষা শিক্ষার প্রবণতা লক্ষ্য করা গিয়েছিল আর একটি কারণে — সেটি হল এই ভাষা শিক্ষা করলে সহজেই রাজ-দরবার, নবাব-দরবার ছাড়াও স্বয়ং দিল্লীর বাদশার দরবারেও চাকুরি পাওয়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠত। সুদূর পারস্য থেকে দিল্লী ও মুর্শিদাবাদ হয়ে আগত এই অভিজাত আখুন্দ পরিবার বিষ্ণুপুরে বসবাস করছেন সাত পুরুষেরও অধিক কাল। ফার্সী ভাষা শিক্ষা দানের সূত্র ধরে এই আখুন্দ পরিবারের সাথে বিষ্ণুপুরের রাজ-পরিবারের বেশ মিষ্টি-মধুর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। রাজন্যপ্রথা বিলুপ্তির সাথে সাথে মল্লরাজ-পরিবারে নেমে আসে দারিদ্র্য। রাজকর্মচারীগণও হয়ে পড়েন উদ্বৃত্ত তথা অবাঞ্ছিত। অতঃপর ভাগ্যান্বেষণে প্রবৃত্ত হয়ে আধুনিক শিক্ষা-দীক্ষায় নিজেদের সুসজ্জিত করে সাত পুরুষ দূরত্বের বাসেদ আখুন্দ মহাশয়ের বর্তমান বংশধরগণ ভারত, বাংলাদেশ, লণ্ডন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে কর্মসূত্রে বসবাস করেন। এঁদের মধ্যে খ্যাতনামা ডাক্তার, অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদও আছেন। **আখুন্দ উপাধিটি সাত পুরুষের ব্যবধানে পরিবর্তিত হয়েছে ক্রমশঃ। আখুন্দ থেকে হয়েছে আকুঞ্জ। আকুঞ্জ থেকে হয়েছে আকুঞ্জী।** বর্তমানে বিষ্ণুপুরের উত্তরে অবস্থিত আকুঞ্জী পল্লীতে এঁরা বসবাস করেন। এসব তথ্য আমাকে জানিয়েছিলেন ৫৭ বছর বয়স্ক স্বাস্থ্যবান, শ্রীমান ও সৌম্যদর্শন ইকবাল আকুঞ্জী মহাশয়।

আবার মল্লরাজাদের অমায়িক ব্যবহার, সমদৃষ্টি এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতার মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে **হজরত কুরবান বাবা, ঘোড়ালি সাহেব, চটশাহ বাবা, সত্যপীর সাহেব** প্রমুখ বহু সিদ্ধ পীর, ফকিরেরও অগামন ঘটে মল্লভূমে। তাই দেখি মল্লরাজ্যের প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছে পীরের দরগা, ফকির সাহেবদের আস্তানা। আবার সঙ্গীতসাধক রাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ মল্লের রাজত্বকালে আগমন ঘটেছে ওস্তাদ **বাহাদুর খাঁ** ও তাঁর অনুচর বর্গের। আগমন ঘটেছে লেলিহান রূপের হলকা লাস্যময়ী ললনা লালবাঈয়ের। ব্যবসা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে দূরাগত মুসলিম বণিক সম্প্রদায়ের পাশাপাশি স্থপতি বিদ্যায় সুদক্ষ শিল্পীগোষ্ঠীর সাথে সাথে আগমন ঘটেছে শ্রমজীবী মুসলমান সম্প্রদায়েরও। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বংশ বিস্তারের ফলে মল্লভূমের গ্রামে, গঞ্জে, শহরে শহরে আজ মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষের ছড়াছড়ি। এ ছাড়াও রয়েছেন শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে নানাভাবে ধর্মান্তরিত মুসলমান গোষ্ঠী এবং বৈবাহিক সূত্রে ধর্মান্তরিত মুসলমান নাগরিকবৃন্দ।

'বাঁকুড়ার মন্দির মসজিদ গীর্জ্জা' পুস্তকের লেখক শ্রদ্ধেয় প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পুস্তকের ৫১ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন —

"মল্লভূম বাঁকুড়ায় মুসলমান সম্প্রদায়ের আগমন, বসতি স্থাপন সম্পর্কে ১৯৫১ সালের আদমসুমারী রিপোর্টে জানা যায় ঃ—

Census 1951
West Bengal
District Hand Book BANKURA
By A. Mitra. Page – XXV.
* Religions in Bankura, 1951.

Mahammadans are found in greatest strength in the Vishnupur Sub-Division, and especially in the Thanas bordering on Burdwan, viz.

Kotulpur and Indas, which account for nearly one-half of the total number. They are Sunnis belonging to the Hainfi sect, and the majority are believed to be the descendant of local converts.

এই বিবরণী থেকে বোঝা যাচ্ছে বর্দ্ধমান জেলার মধ্য দিয়ে বাঁকুড়ার পূর্বসীমান্ত থানা ইন্দাস হয়ে মুসলমানরা বাঁকুড়ায় প্রবেশ করে। সঙ্গে তাদের ধর্মীয় নেতা বা গুরু বা ফকিররা আসেন ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে। তাঁরা কিভাবে স্থানীয় মানুষদের ধর্মান্তরিত করতে সক্ষম হলেন তার কিছু কিছু কারণ জানতে পারি ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারীর বিবরণী থেকে।

The veneration of Pirs Saints is common among the local Mahammadans, who frequent their shrines and make offering of sweetmeats, in order that the pirs may look with favour upon them and grant them the fulfilment of their desires. It is reported that many Hindus have the same belief in the supernatural powers of pirs, and also make offerings at their shrines. The following are reported to be the shrines of the pirs who hold the highest place in popular esteem. In the Indas thana there are no less than eight shrines viz. that of Shah Madar in Rol, Bandegi Shah Mustapha in Chichinga, Saiyad Mahammad Husain and Shah Kabir in Karisunda, Satya pir in a field south of Hayatnaga, Bura Pir in Chak Sukur, Shah Bandegi in Bihar and Shah Ismail Ganj Lashkar in Lakhipur. There are also shrines of the pir last named at Palharchati in the Kotulpur thana and at Pirpuskarini Fakirbera in the Gangajalghati thana and in the town of Vishnupur there is a shrine of a pir called Shah Kauban Ali.

এর থেকে বোঝা যায় বাঁকুড়ার মাটিতে ধর্মান্তরিতকরণ ঘটেছিল সহজ সরল ধর্মীয় বিশ্বাসের ভিত্তিতে। এ পথেই সুন্নি সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানরা বাঁকুড়ায় সংখ্যাধিক্য লাভ করেছে। মল্লভূম-বাঁকুড়ায় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রভাব বিস্তার ঘটে মল্লভূমের ইন্দাস, কোতুলপুর ও বিষ্ণুপুর শহরাঞ্চলে, তার মূলে রয়েছে মল্লরাজাদের আনুকূল্য ও মুসলমানদের বসতি স্থাপনে সহায়তা দান।" (পৃঃ— ৫১-৫৩)

প্রাসঙ্গিকভাবেই বলি, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ মল্লরাজ্যে বসবাস করলেও এখানে নেই সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা, বরং দীর্ঘকাল ধরে কাছাকাছি সহাবস্থানের ফলে সব ধর্মের মিলনতীর্থ হয়েছে মল্লভূম। ইসলামীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে হিন্দু সভ্যতা-সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছে এখানে। হিন্দুর মন্দিরে মুসলমান, মুসলমানের পীর দরগার স্থানে ঢল নেমেছে হিন্দুর। হিন্দু-মুসলমানের উৎসবাদিতেও পারস্পরিক ভাব-বিনিময় হয়েছে সরল অন্তঃকরণে। হিন্দুর সত্যনারায়ণ এবং মুসলমানের পীর মিলেমিশে হয়েছে সত্যনারায়ণের পাঁচালী। অতীতকাল থেকে অদ্যাবধি বাংলা মায়ের এই দুই সন্তান এ রাজ্যে একই বৃন্তে দুটি কুসুমের মতই সহাবস্থান করেছেন পরস্পরের প্রতি সৌজন্যসূত্রে আবদ্ধ হয়ে। বিষ্ণুপুর-দরদী কবি কাজী নজরুল ইসলামের কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়েছে সেই সুর, অনুরণিত হয়েছে সেই সত্য—

"মোরা, একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান
মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।"

মল্লভূম তথা বাঁকুড়ায় হিন্দু দেব-মন্দিরের যেমন ছড়াছড়ি ঠিক তেমনি রয়েছে মুসলমানদের উপাসনা-কেন্দ্র মসজিদ ও ইদ্‌গার প্রাচুর্য। খোদ বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, মড়ার, দ্বারিকা, শ্যামসুন্দরপুর, সোনামুখী, ছাতনা, নতুনগ্রাম, বাদুলাড়া, পুণিশোল, পুণ্যপাণি, ধলগড়া, খাতড়া, পাঁচমুড়া, পখন্না, পানপুকুর, রাজপুর, আগুড়িয়া, বেলাড়া, কাঁটাদীঘি, ইন্দাস, রসুলপুর, রোল, লদ্দা, খুশবাগ, মুকুনপুর, কুমরুল, বেলুট, পাথরডাঙা প্রভৃতি স্থানে রয়েছে মসজিদ। আর ইদ্‌গা রয়েছে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, রাইপুর, সিমলাপাল, ধগড়া প্রকাশঘাট, পাত্রসায়ের, জামকুঁড়ি, কাপিষ্ঠা, কোতুলপুর, লালবাজার (বেলিয়াতোড়), বাহাদুরপুর (বেলিয়াতোড়) কাঁটাবাঁধ, চাঁদা, চকাই, সাপাগাড়া, ফকিরডাঙা প্রভৃতি স্থানে।

এখন বলি, **মসজিদ** ও **ইদ্‌গা**-র কথা। মসজিদ হল মুসলমানদের সার্বজনীন উপাসনালয়। সর্বসাধারণের অর্থানুকূল্যে গড়ে ওঠা মসজিদের গঠন প্রণালী খুবই সাদাসিধে। সাধারণতঃ তিনটি দ্বার বিশিষ্ট একটি কক্ষ বা কক্ষসহ্ হলঘর নিয়ে রচিত হয় মসজিদের মূল কাঠামো। সমতল ছাদ বিশিষ্ট মসজিদের ছাদের উপর থাকে তিনটি গম্বুজ এবং ছোট বড় আকৃতির কয়েকটি মিনার। হিন্দু-মন্দিরের স্থাপত্যশৈলীতে অলংকরণ-প্রাচুর্যের ঘনঘটা, পক্ষান্তরে মসজিদের বহিরঙ্গে থাকে গাঢ় রঙে রঞ্জিত দৃষ্টিনন্দন লতাপাতা-ফুল সহ ফুলকারী নক্সা। মসজিদ পরিচালনা করেন একটি পরিচালকমণ্ডলী। আবার নির্দিষ্ট একটি অঞ্চলের অনেকগুলি মসজিদ পরিচালনা করেন একটি কেন্দ্রীয় পরিচালকমণ্ডলী। উক্ত পরিচালকমণ্ডলী নির্দিষ্ট বেতনে এক একটি মসজিদের জন্য এক একজন ইমাম (ধর্মগুরু) নিযুক্ত করেন। তিনটি দ্বার বিশিষ্ট মসজিদের মধ্যস্থলটি ইমামের নামাজ পড়ার আসন রূপে চিহ্নিত। এছাড়া মসজিদে খুত্‌বা (ভাষণ) পাঠের জন্য থাকে নির্ধারিত স্থান বা মঞ্চ।

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের জন্মস্থান বর্তমানে সৌদি আরবের মক্কা নগরীতে। মক্কা মুসলমানদের পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে কাবা শরীফ নামে একটি মসজিদ আছে। মক্কার পূর্বদিকে বসবাসকারী মুসলমান সম্প্রদায় পূর্বমুখী মসজিদ নির্মাণ করেন। অনুরূপভাবে পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে বসবাসকারী মুসলমানগণ যথাক্রমে পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণমুখী মসজিদ নির্মাণ করে থাকেন। **উদ্দেশ্য হল এতে নামাজ পড়ার সময় বিশ্বের সব দেশের সকল মুসলমানের মুখ থাকবে ইসলামের পবিত্র তীর্থস্থান মক্কার অন্তর্গত কাবা-শরীফের দিকে।**

মসজিদের পর আসি ইদ্‌গা-র কথায়। তিন দিকে প্রাচীর ঘেরা অনাচ্ছাদিত উপাসনা-স্থলের নাম ইদ্‌গা। সঠিক উচ্চারণ ইদ্‌গাহ। দুই ঈদ্ উৎসবের দিন ইদ্‌গাতে আল্লার উপাসনা করা হয় ইসলাম ধর্মের নিয়মানুসারে।

বিষ্ণুপুর শহরের সেখপাড়া মহল্লায় অবস্থিত এই মসজিদটির দেওয়াল-গাত্রে দেখুন লেখা রয়েছে 'জুম্মা মসজিদ'। কিন্তু কেন? উত্তরে বলি, খোদাতায়ালার উপাসনার জন্য ইসলাম ধর্মাবলম্বী সকলেরই এখানে জমায়েত হওয়ার সুবাদে মসজিদটির নাম হয়েছে জুম্মা মসজিদ। বিষ্ণুপুরে তিনটি মসজিদ ও পাঁচটি ইদ্‌গা আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ইদ্‌গাটি আছে সত্যপীরতলাতে। মসজিদ তিনটির মধ্যে একটি আছে বিষ্ণুপুরের স্টেশন

রোডে, একটি নিমতলা মহল্লায় আর একটি হল সেখপাড়া মহল্লার এই মসজিদটি। তিনটি মসজিদের মধ্যে এটিই সব থেকে পুরানো, বয়স আনুমানিক দেড়শ বছর হবে, এবং অবয়বগত আকৃতিতেও এটিই সবচেয়ে বড়। প্রায় দেড়শত বছর পূর্বে সর্বসাধারণের উদ্যোগে সেখপাড়া নিবাসী মুন্সী আসদ আলি প্রদত্ত জমির উপর গড়ে ওঠে এই মসজিদটি।

এখানে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত অর্থাৎ দিবারাত্রির মধ্যে পূর্বনির্ধারিত সময়ে সমবেতভাবে পাঁচবার নামাজ পাঠ করে আল্লাহ্‌র উপাসনা করা হয়। প্রতি শুক্রবার ১২-৪৫ মিনিটে সমবেতভাবে নামাজ পড়া হয়। নিয়মিত নামাজ পড়া ছাড়াও বছরের দুটি ঈদ্‌ উৎসব— ঈদ্‌-উল্‌-ফিত্‌র ও ঈদ্‌-উজ্‌-জোহা মহা সমারোহে উদযাপিত হয় এখানে। ঈদ্‌-উল্‌-ফিত্‌র উৎসব উপলক্ষ্যে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে গরীব-দুঃখীদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। দুটি ঈদ্‌ ছাড়াও শবে বরাত, শবে মেরাজ, শবে কদর, আশুরা উৎসবও পালিত হয় সাদাসিধেভাবে। অধিকন্তু **'বিশ্ব-নবী-দিবস'**-এ মিলাদ মেহ্‌ফিল অর্থাৎ সকলের উপস্থিতিতে ধর্ম আলোচনা হয় ইসলাম ধর্মের নিয়ম মোতাবেক। ঐ দিন দুপুরে তরিতরকারী সহ খিচুড়ি ভোগের প্রসাদ বিতরণ করে নরনারায়ণ সেবা করানো হয় মহা উদ্দীপনায়।

মসজিদ ও ইদ্‌গা প্রসঙ্গে ইতি টেনে এখন শোনাব ইসলাম-উৎসবের কথা। তার পূর্বে শোনাই আরবী বারো মাসের নাম। এগুলি হল— ১। **মহরম**, ২। **সফর**, ৩। **রবি উল্‌ আওয়াল**, ৪। **রবি উল্‌ আখের**, ৫। **জমাদি উল্‌ আওয়াল**, ৬। **জমাদি উল্‌ আখের**, ৭। **রজব**, ৮। **শাবান**, ৯। **রমজান্‌**, ১০। **শওয়াল**, ১১। **জিলকাদ্‌**, ১২। **জিলহজ্জ**। এ প্রসঙ্গে আরো বলতে হয়, যে আরবী মতে চন্দ্র তিথি ধরে মাস গণনা করা হয় এবং ৩৫৪ দিনেরও একটু বেশী সময় নিয়ে হয় বছরপূর্তি বা এক বৎসর। ২০০৩ খৃষ্টাব্দের ৫ই মার্চ, বাংলা ১৪০৯ সালের ২০শে ফাল্গুন থেকে শুরু হয়েছে ১৪২৪ হিজরী সন। মাস, বছরের কথায় ইতি টেনে এবার বলি উৎসবের কথা।

মহরম — হিজরী প্রথম মাসের নাম মহরম। এই মাসে অনুষ্ঠিত উৎসবের নামও মহরম। মহরম সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানদের প্রধান উৎসব হলেও এখানের সুন্নী সম্প্রদায়ের মুসলমানগণও এ উৎসব উদ্‌যাপন করেন। মহরম মাসের ১০ তারিখে অনুষ্ঠিত এই উৎসবের পিছনে রয়েছে একাধারে আধ্যাত্মিক ও ঐতিহাসিক পটভূমি। ইসলাম ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আছে, ঐ বিশেষ দিনে বছরে বছরে বারে বারে বহু শুভ অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। এগুলির দু-চারটি হল — (১) প্রথম বৃষ্টিপাত, (২) আদম ও হবার মর্ত্যলোকে আগমন ও প্রজাসৃষ্টির সূচনা, (৩) প্রাণের উৎপত্তি, (৪) দশ সহস্র পয়গম্বরের পবিত্র আত্মার আল্লার দূত হবার সৌভাগ্য অর্জন, (৫) স্বর্গ, নরক, আল্লার স্ফটিক নির্মিত বিচারাসন, ও বিচারের রায় লিখিবার লেখনী ছাড়াও মৃত্যুর উৎপত্তি প্রভৃতি। এসব কারণে ১০ তারিখটি খুবই আনন্দের দিন। পক্ষান্তরে বহু পরে মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক হজরত মহম্মদের জামাতা হজরত আলির দুই পুত্র অর্থাৎ হজরত মহম্মদের দুই নাতি হাসান ও হোসেন-এর সাথে দামাস্কাসের অধিপতি এজিদের ঘোরতর বিবাদ বাধে। এজিদ বিষ প্রয়োগে সুকৌশলে হত্যা করেন হাসানকে। পরবর্তীকালে হোসেনের কুফা অভিমুখে যাত্রাকালে কারাবালা প্রান্তরে এজিদ-সৈন্য কর্তৃক অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে অসম যুদ্ধে পরাজিত হন এবং শত্রুসৈন্য পরিবেষ্টিত হয়ে রসদ ও পানীয় জলের অভাবে স্বীয়

অনুচরবর্গ সহ স্বয়ং হোসেন কারাবালা প্রান্তরে ফোরাত নদীর তীরে বুকফাটা তৃষ্ণা নিয়ে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন ১০ই মহরমের দিন। হজরত মহম্মদ (দঃ) এর নাতি হোসেনের মর্মান্তিক মৃত্যুর কথা স্মরণ করে মহরম মাসের দশ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় মহরম।

মহরমের পূর্বেই তৈরী করা হয় **'ইমামবাড়া'** নামে একটি ঘর, আর হোসেনের সমাধির উপর নির্মিত স্মৃতিসৌধের অনুকরণে তৈরী হয় **তাজিয়া**। মহরম মাসের প্রথম দিন থেকেই মুসলমানেরা ইমামবাড়ার সম্মুখে রক্ষিত তাজিয়ার কাছে শোকপ্রকাশ করেন হোসেনকে স্মরণ করে। সন্ধ্যার দিকে লাঠি, তরবারি, মশাল নিয়ে পরস্পরের মধ্যে চলে কৃত্রিম যুদ্ধাভিনয়। দশম দিনে তাজিয়া সহ বের হয় শোভাযাত্রা। হাসান হোসেনের মৃত্যুকে স্মরণ করে কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয় **'হায় হাসান, হায় হোসেন।'** বক্ষে বক্ষে করাঘাত করে কান্নায় ভেঙে পড়েন অনেকেই। তাজিয়াসহ শোভাযাত্রার মাধ্যমে শেষ হয় উৎসব। একাধারে আনন্দ ও শোকের উৎসব হলেও এটি শোক-উৎসব রূপেই উদ্‌যাপিত হয় বর্তমানে। **বিষ্ণুপুর সহ বিশ্ব-মুসলমান সম্প্রদায় মহরম উপলক্ষ্যে রোজা বা উপবাসসহ দান-ধ্যান, কোরান পাঠ করে পুণ্য সঞ্চয় করেন।** আবার মহরম চাঁদের ১০ই তারিখকে **আশুরা** বলে। আশুরা দিবসের মহিমা অপরাপর দিবারাত্র অপেক্ষা অধিক।

আখেরী চাহার শাম্বা — আরবী বা হিজরী সনের দ্বিতীয় মাসের নাম 'সফর'। 'সফর' চাঁদের শেষ বুধবারকে 'আখেরী চাহার শাম্বা' বলে। ঐদিন হজরত মহম্মদ (দঃ) রোগমুক্ত হয়ে গোসল অর্থাৎ পুণ্যস্নান করেছিলেন। মহম্মদের রোগমুক্তি জনিত পুণ্যস্নানের ঘটনাটিকে স্মরণ করে ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ আল্লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্বক পবিত্র-স্নান করে ঐদিন নামাজ পাঠ করেন। এতে তাঁদের মনোবল বৃদ্ধির পাশাপাশি অন্তঃকরণ শুদ্ধ এবং উজ্জ্বল হয়। মালিন্য যায় মুছে। হিন্দুদের মকর-স্নানের মতোই এই পবিত্র স্নান সমগ্র ইসলাম দুনিয়ার একটি ছোটখাটো উৎসব।

ফাতেহা দোয়াজ দহম বা **বিশ্বনবী দিবস** — হিজরী সনের তৃতীয় মাস 'রবি-উল্ আওয়াল'-এর ১২ তারিখে হজরত মহম্মদ ভূমিষ্ঠ হন এবং ঐ তারিখেই তাঁর তিরোধান হয়। ইসলাম সম্প্রদায়ের নিকট এটি একটি অত্যন্ত শুভ দিন। ঐ তারিখে মুসলমানগণ সমবেতভাবে পবিত্র কোরান পাঠ করেন এবং দীন-দুঃখীদের দান-দাক্ষিণ্য করে থাকেন। ধর্মীয় বিশ্বাস, এতে অশেষ পুণ্য অর্জন হয়। বিশ্বনবী রূপে স্বীকৃত **হজরত মহম্মদ (দঃ)** এর আবির্ভাব ও মহাপ্রয়াণের ঘটনাটিকে স্মরণ করে পূর্বোক্ত তারিখে পালিত পর্বটি তাই তামাম দুনিয়ার মুসলমানদের কাছে 'বিশ্বনবী দিবস' বা 'ফাতেহা দোয়াজ দহম' নামে সমাদৃত।

ফাতেহা ইয়াজ দহম — চতুর্থ মাস 'রবি-উল্ আখের'-এর ১১ তারিখে প্রখ্যাত সিদ্ধ সাধক **হজরত বড়পীর আবদুল কাদির জিলানী (রহঃ)**-এর মহাপ্রয়াণ হয়। উক্ত আউলিয়া পীর সাহেবের তিরোধান দিবস উপলক্ষ্যে পালিত উৎসবটি 'ফাতেহা ইয়াজ দহম' নামে চিহ্নিত। ঐ দিন দান-ধ্যান ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে উপাসনা করলে অশেষপুণ্য সঞ্চয় হয়।

শবে মিরাজ — শব মানে রাত্রি, আর মিরাজ মানে দর্শন লাভ করা। সুতরাং 'শবে মিরাজ' শব্দ দুটির যৌথ অর্থ হল রাত্রিকালে দর্শন লাভ। ইসলাম ধর্ম-গ্রন্থে উল্লেখ আছে, আল্লার নির্দেশানুসারে তাঁর প্রধান সেনাপতি **হজরত জিব্রাইল** ও আর এক সেনানায়ক **হজরত মীকাইল**— এই দু'জনে মিলে 'রজব' মাসের ২৭ তারিখের রাত্রিবেলা হজরত মহম্মদ (দঃ) কে **বুরাক** নামক পক্ষীরাজ ঘোড়া জাতীয় এক দ্রুতগামী প্রাণীর সাহায্যে স্বর্গ, নরক ভ্রমণ করিয়ে পরম দয়ালু আল্লার সমীপে হাজির করেন। এই ঘটনাটি হজরত মহম্মদের মক্কা থেকে মদিনাতে পলায়ন করবার এক বছর আগে ঘটেছিল। হজরত মহম্মদের স্বর্গ, নরক ও সর্বোপরি আল্লার সাক্ষাৎলাভের সুমহান ঘটনাটির গুরুত্ব উপলব্ধি করে আরবী সপ্তম মাসের ২৭ তারিখে অনুষ্ঠিত আনন্দানুষ্ঠানটি 'শবে মিরাজ' পর্ব নামে আখ্যায়িত হয়েছে। প্রচলিত বিশ্বাস, ঐদিন উপবাসে থেকে ঐচ্ছিক উপাসনা করলে অসীম পূণ্য লাভ হয় এবং নরকের বিধ্বংসী অগ্নিও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না।

শবে বরাত — পূর্বেই বলেছি শব মানে রাত্রি, আর বরাত মানে ভাগ্য। সুতরাং 'শবে বরাত' মানে সৌভাগ্যসূচক রাত্রি বা ভাগ্য নির্ণায়ক রাত্রি। অষ্টম মাস 'শাবান'-এর চৌদ্দ তারিখের দিবাগতে রাত্রি আগত হলে ঐ রাত্রে ভাগ্য-বিধাতা-আল্লার নির্দেশ মোতাবেক তাঁর ফিরিশতাগণ অর্থাৎ আজ্ঞাবাহী অনুচরগণ প্রত্যেক মানুষের জীবন-জীবিকা ও আয়ুবন্টন বা নিরূপণ করে থাকেন, অর্থাৎ ললাট-লিপি লিখিয়ে দেন। এ কারণে পূর্বোল্লিখিত উৎসবগুলির থেকে এ উৎসবের আকর্ষণ ও গুরুত্ব বেশী। ইসলামের বিধান অনুসারে ঐ রাত্রে নামাজ ও কোরানশরীফ পাঠ করলে অন্যান্য দিনের উপাসনার থেকে অধিক পুণ্য লাভ হয়। আল্লাহ প্রীত হয়ে প্রার্থনাকারীদের অধিক সৌভাগ্যের অধিকারী করেন। সুতরাং **'শবে বরাত' হল সৌভাগ্য অর্জনের উৎসব**। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ থাকে যে ১৪ তারিখের রাত্রি গতে ১৫ তারিখের সারা দিনই 'শবে বরাত' উৎসব পালিত হয়।

শবে কদর — 'শবে কদর' রমজান মাসের উৎসব। একটু আগেই বলেছি, শব মানে রাত্রি, পক্ষান্তরে কদর মানে আদর, সমাদর, সম্মান। সুতরাং 'শবে কদর' মানে আদরণীয়, বা সম্মানীয় মহান-রাত্রি। রমজান মাসের ২৭ তারিখে আবার মতান্তরে ঐ মাসের শেষ দশ দিনের কোন এক বিজোড় তারিখের অর্থাৎ ২১, ২৩, ২৫, ২৭ বা ২৯ তারিখের যে কোন এক রাত্রিতে 'শবে কদর' অনুষ্ঠিত হয়। ঐ এক রাত্রির ফল হাজার মাসের সামগ্রিক উপাসনার ফল অপেক্ষা বেশী। মহিমময় আল্লাহ্ এই রাত্রিটি সাধারণের নিকট বা মানুষের নিকট গোপন রাখেন। পূর্বোক্ত রাত্রিগুলির কোন এক রাত্রে আল্লাহ্ কোরান শরীফ নাজেল অর্থাৎ প্রকাশ বা দান করেছিলেন। আল্লাহ 'শবে কদর' রাত্রে স্বীয় বান্দাগণের অর্থাৎ তাঁর অনুগত মানবগণের প্রতি সত্তর বার কৃপা-দৃষ্টি করেন। সুতরাং পূর্বোক্ত বিজোড় তারিখের রাত্রিগুলিকে অবহেলা না করে 'শবে কদর' রাত্রির আশাতিরিক্ত দিব্য করুণা লাভের প্রত্যাশায় উক্ত রাত্রিগুলিতে সজাগ থেকে আল্লাহ্র উপাসনা করা বিধেয়। **ঐ রাত্রিতে আল্লাহ্র উপাসনা এবং কোরান শরীফ পাঠ করলে সর্ব পাপ মুক্ত হয়ে স্বর্গলাভ হয়।**

ঈদ্-উল্-ফিত্‌র — আমাদের দুর্গাপূজার মতোই ইস্‌লাম দুনিয়ার সর্বপ্রধান, সার্বজনীন উৎসব হল ঈদ্। ঈদ্ শব্দের অর্থ 'বারবার ফিরে আসা খুশীর দিন'। বছরে দুবার ঈদ্ অনুষ্ঠিত হয়। দুটি ঈদ্ উৎসবের প্রথমটির নাম ঈদ্-উল্-ফিত্‌র এবং দ্বিতীয়টির নাম ঈদ্-উজ্-জোহা বা বকরী ঈদ্। দুই ঈদের মধ্যে প্রথমটির গুরুত্ব অনেক বেশী। তাই ঈদ্-উল্-ফিত্‌রকে বলে বড় ঈদ্ আর চলতি ভাষায় ঈদ্-উজ্-জোহা ছোট ঈদ্।

রমজান মাস নবম মাস। ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা গোটা রমজান মাসে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নিরম্বু-উপবাস থেকে অর্থাৎ রোজা রেখে আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করে কাটান। এই এক মাস জুড়ে কঠোর সংযমের মধ্যে থেকে খোদার মহিমা স্মরণ-মনন করে আত্মশুদ্ধি ঘটিয়ে ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন করেন। 'রমজ্' শব্দের অর্থ পুড়িয়ে দেওয়া। মাসাবধি কালের কঠোর সাধনায় পুড়ে যায় সমস্ত পাপ-পরিতাপ, আত্মগ্লানি। রমজান মাসের শেষে শওয়াল মাসের শুরুতে ঈদের অকলঙ্ক চাঁদ দেখে খুশীর আনন্দে ভরে যায় হৃদয়। ফকির ও দীন-দুঃখীদের ফিত্‌রা অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ দান দিয়ে ঈদের আনন্দে মেতে ওঠেন বিশ্বের আপামর মুসলমান সম্প্রদায়। শওয়াল মাসের প্রথম দিনের দ্বিপ্রহরের মধ্যেই ঈদ্-উল্-ফিত্‌রের নামাজ পাঠ সুসম্পন্ন হয় ইদ্‌গাহে ইদ্‌গাহে এবং ইদ্‌গাহ্‌র অভাবে মসজিদে। ঐদিন ধনী-দরিদ্র, আমীর-ভিখারী, মনিব-ভৃত্য, শত্রু-মিত্র সব রকম ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে মুসলমান সমাজ ঐক্যের মেল-বন্ধন রচনা করেন। ঈদ্-উল্-ফিত্‌র দিনটিকে সর্বাঙ্গসুন্দর তথা আনন্দমুখর করে তোলার সব রকম প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এ উৎসব প্রেম-প্রীতির উৎসব। ত্যাগের উৎসব, হৃদয়ের উৎসব, আল্লাহ্‌র অশেষ আশীর্বাদ লাভের উৎসব।

ঈদ্-উজ্-জোহা বা বকরী ঈদ্ — এ উৎসবের পিছনে রয়েছে হজরত ইব্রাহিম নামক জনৈক মুসলমান ধর্মসাধকের সাধন-কাহিনী। এক রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় তিনি আল্লাহ্‌র বাণী শুনেন, 'ওহে ইব্রাহিম, তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু আমায় উপহার দাও।' ইব্রাহিম সাথে সাথে তাঁর খামারের সব থেকে ভাল একটি দুম্বা (ভেড়া বা মেষ) আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কুরবানি অর্থাৎ বলিদান করেন। দ্বিতীয় রাত্রিতে পুনরায় অনুরূপ দৈবাদেশ শ্রবণ করে আরো ভাল, হৃষ্টপুষ্ট একটি দুম্বা খোদার উদ্দেশ্যে কুরবানি করেন। কিন্তু তৃতীয় রাত্রিতে আবার অনুরূপ দৈবাদেশ শুনে যার-পর-নাই বিচলিত হন। ভাবতে থাকেন তাঁর সর্বাধিক প্রিয় জিনিস কি? অন্তর থেকে যেন উত্তর আসে — **ইস্‌মাইল**। অনতিবিলম্বে মনস্থির করেন তিনি এবং স্ত্রী-পুত্রের সম্মতিক্রমে তাঁর একমাত্র পুত্র ইস্‌মাইলের গলায় ছুরি বসিয়ে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কুরবানি করেন। প্রাণাধিক প্রিয় পুত্রকে কুরবানি করার সময় পাছে স্নেহ বা মায়ার মায়াজালে আবদ্ধ হয়ে বিফল হন, সেই আশঙ্কায় পুত্রকে কুরবানি করার সময় তিনি তাঁর চোখ দুটি বেঁধে নিয়েছিলেন এক খণ্ড বস্ত্র দিয়ে। পুত্রকে কুরবানি করার পর চোখ খুলতেই অবাক বিস্ময়ে তিনি দেখেন যে কুরবানি হয়েছে একটি দুম্বা, তাঁর পুত্র নয়। এ সময় পুনরায় তিনি দৈববাণী শুনতে পান, 'ওহে ইব্রাহিম, তোমার ত্যাগের দৃষ্টান্তে আমি পরম প্রীত হয়েছি। আজ থেকে তুমি আমার কৃপাধন্য প্রিয় পাত্র।' উক্ত ঘটনাটি ঘটেছিল 'জিলহজ' মাসের ১০ তারিখে।

ইব্রাহিমের এই মহান ত্যাগের স্মৃতিকে হৃদয়ে সদা জাগরুক রাখার মহৎ উদ্দেশ্যেই

মল্লভূমের মুসলিম সমাজের মতোই সারা দুনিয়ার ইসলাম সম্প্রদায় উক্ত দিবসটিকে খুশীর দিন হিসেবে তথা আল্লাহ্‌র আশীর্বাদ লাভের পবিত্র দিন হিসেবে চিহ্নিত করে ঐদিন ঈদ্-উজ্-জোহা বা বকরী ঈদ্ উৎসব উদ্‌যাপন করেন পরমানন্দে। ঐদিন ঈদ্‌গাহে সমবেতভাবে নামাজ পাঠ করা হয় এবং কুরবানির খুত্‌বা বা বলিদানের মাহাত্ম্য-কথা শোনানো হয়। শোনানো হয় প্রকৃত সাধকেরা আল্লার জন্য সন্তানের মত প্রিয়তম বস্তুকেও বলি দিতে কুণ্ঠা বোধ করেন না। নামাজ পাঠ এবং খুত্‌বা পাঠ শেষ হলে পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন। অতঃপর গরু, ছাগ, মেষ বা উট জাতীয় পশু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে বলি দান করে বা কুরবানি করে সেই পশু মাংস আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও দীন-দুঃখীদের মধ্যে বিতরণ করে নিজেরাও গ্রহণ করেন আল্লাহ্‌র প্রসাদ জ্ঞানে।

ঈদ্-উজ্-জোহা ইসলাম-ধর্মাবলম্বীদের ধর্মের জন্য, ন্যায়ের জন্য এবং সর্বোপরি খোদার আনন্দ বিধানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের মানসিকতা গড়ে তোলার আহ্বানসূচক মহান উৎসব। মল্লভূমের মুসলমান পল্লীতে পল্লীতে বছরে বছরে অনুষ্ঠিত হয় এসব উৎসব। আর আমন্ত্রিত হয়ে সে উৎসবে সানন্দে সামিল হন হিন্দু জনগণও। নেপথ্যে যেন প্রতিধ্বনিত হয়— 'মোরা, একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান .....'।

মল্লভূমের মুসলমান সম্প্রদায় ও মুসলমানী উৎসবের কথা শোনালাম সংক্ষেপে। ইসলাম ধর্মগুরু বিশ্বনবী হজরত মহম্মদ (দঃ) ও মহাসাধক হজরত ইব্রাহিম সাহেবকে লাখো সেলাম জানিয়ে আমি এখন আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নেবো আজকের মতো। আগামীকাল আমাদের চতুর্থ দিনের পরিক্রমা শুরু হবে এখান থেকেই। এসে যাবেন যথাসময়ে। নমস্কার।

চতুর্থ দিনের পরিক্রমা

অধ্যায় - ৮৩

মালা শিল্প

বৈষ্ণবপাড়া

চতুর্থ দিনের পরিক্রমার প্রথমেই আপনাদের জানাই সুপ্রভাত। এখন এই সেখপাড়া থেকে আমরা রওনা হব বৈষ্ণবপাড়া অভিমুখে। পথের পাথেয় হিসেবে আমরা তুলে নেবো বৈষ্ণবের কণ্ঠভূষণ পবিত্র মালাকে।

সনাতন হিন্দু ধর্মের বিধান অনুসারে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ এবং যে কোন মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে মালা অপরিহার্য। কিন্তু কেন?

কথিত আছে—

মা শব্দে অভীষ্ট ফল মুক্তিকে বুঝায়।
লা শব্দেতে দান করা দাতা ধরা যায়।।

অতএব মালা অর্থে বুঝহ সন্ধান।
সর্ব্বাভীষ্ট ফলদাতা সেই ভগবান।।[১]

অর্থাৎ 'মালা' ইহলোকে সর্ব অভীষ্ট এবং পরলোকে মুক্তি বা মোক্ষ প্রদায়ক ইষ্ট বস্তু। কারণ মালার উৎপত্তির মধ্যে রয়েছে দেবতত্ত্ব নিহিত। মালা উৎপত্তির পৌরাণিক তত্ত্বটি বেশ উপভোগ্য।

পৌরাণিক যুগের কোন এক সময়ে স্বাতী নক্ষত্রের জল বিন্দু বিন্দু করে ঝরে পড়ে সাগরে। শক্তি আদির সংস্পর্শে সিন্ধু মধ্যে পতিত বিন্দু বিন্দু জলকণা রূপান্তরিত হয় মুক্তাদানাতে। মহর্ষি বিশ্বামিত্র সেই মুক্তা আহরণ করে উপহার দেন নারায়ণকে। নারায়ণ উপহার দেন লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মীদেবী মুক্তার মালা গেঁথে দুলিয়ে দেন নারায়ণের গলে। নারায়ণ আবার সেই মালা পরিয়ে দেন লক্ষ্মীদেবীকে। অবশিষ্ট মুক্তাদানাগুলি দেবীর কেশপাশের শোভা বৃদ্ধি করে। এমন সময় তুলসী তথায় উপস্থিত হয়ে কয়েকটি মুক্তা কামনা করেন। কিন্তু লক্ষ্মীদেবীর অনীহা বশতঃ তাঁর সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় না। ব্যথিত তুলসীকে সান্ত্বনা দেন নারায়ণ—

শুন গো তুলসী প্রিয়ে বলে নারায়ণ।
মুকুতা মালার জন্য না কর ভাবন।।

তোমার অঙ্গেতে হবে মালার জনম।
বিশ্বামিত্র সেই মালা করিবে কর্ত্তন।।

---

১. 'তত্ত্বরসামৃত জ্ঞানমঞ্জরী'—শ্রী শ্রীচরণ দাস। পৃঃ— ১৫১

তারপর গেঁথে এনে দিবে শিবস্থান।
নারদের শিক্ষাকালে মুনি পাবে দান।।

নারদ করিবে সর্ব্ব বৈষ্ণবে প্রদান।
হইবে তুলসী তায় তোমার সম্মান।। [১]

এভাবেই একদিন জন্ম হয়েছিল মালার এবং পবিত্র তুলসী মালার। এজন্যই তুলসী মালার মাহাত্ম্য সর্বাধিক। এই মালার মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে তাই বলা হয়েছে—

অপবিত্র অনাচারী হয় যেই জন।
তুলসীর মাল্য কণ্ঠে করয়ে ধারণ।।

দেহস্থিত পাপ তার কভু নাহি রয়।
অশুচি হইবে শুচি শাস্ত্রে হেন কয়।। [২]

মালা শব্দের অন্তর্নিহিত অর্থ, তুলসী মালার পৌরাণিক তত্ত্ব এবং তুলসী মালা মাহাত্ম্যের কথা স্মরণ করে কৃষ্ণ, বিষ্ণু ও নারায়ণ-ভক্তবৃন্দের কণ্ঠে তুলসী মালা ধারণের প্রথা প্রচলিত হয়। আবার শৈব, শাক্ত ও তন্ত্রসাধকদের কাছে রুদ্রাক্ষের মালা সাধনমার্গে বিশেষ ফলদায়ক।

মহারাজ বীর হাম্বীরের রাজত্বকালে মহাবৈষ্ণব শ্রীনিবাস আচার্যের বিষ্ণুপুরে আগমনকে কেন্দ্র করে বিষ্ণুপুর কৃষ্ণ, বিষ্ণু উপাসনার পীঠস্থানে পরিণত হয়। শাক্ত এবং শৈব উপাসনার ক্ষেত্রস্থলে আসে বৈষ্ণব ধর্মের বাঁধভাঙ্গা বন্যা। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন বিষ্ণুপুরের রাজা-প্রজা। বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হল—

তিলক, তুলসীমালা, শিখা ও কৌপিন।
বহির্বাস মুখে হরি নাম নিশিদিন।।

বৈষ্ণবের হয় এই পাঁচটি লক্ষ্মণ।
শাস্ত্রমতে সেই তত্ত্ব করিনু বর্ণন।।

বৈষ্ণবের পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
বৈষ্ণব লক্ষণ কহে শ্রীচরণ দাস।। [৩]

সুতরাং সহজেই অনুমান করা যায় যে বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তনের সাথে সাথে তুলসী মালার প্রয়োজনে এখানে মালা ব্যবসার ভিত্তি পত্তন হয় আজ থেকে প্রায় চারশত বছর পূর্বে। পরবর্তীকালে তুলসী গাছের অপ্রতুলতার দরুন বেল, অঠেল, কুড়চি, পড়াশী ও ঝাঁটি (শাল গাছের সরু সরু কাঠি)র মালার প্রচলন হয় বিভিন্ন উদ্দেশ্যে। মালা শিল্পের প্রারম্ভিক স্তরে ব্যবসাটি বৈষ্ণব-সমাজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান, সকল সম্প্রদায়ের মানুষ, বিশেষতঃ শিশু এবং মহিলাগণ দু'পয়সা উপার্জনের আশায় এই শিল্পে আত্মনিয়োগ করেন। বিষ্ণুপুর ছাড়াও বাঁকুড়া জেলার প্রায় তিরিশটি গ্রামের হাজার তিনেক মানুষ এই ব্যবসার উপর নির্ভরশীল। বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্ভুক্ত মথুরা, বৃন্দাবনপুর, দ্বারিকা, বনকাটী, বেলিয়াড়া, পাণ্ডুয়া, জামডহরা প্রভৃতি গ্রামে তৈরি হয় মোটা দানার মালা। আর সৌখিন বা সরু দানার মালাগুলি তৈরি হয় বাঁকুড়া জেলার রাইপুর, রাণীপুর, সুবিয়াড়া, মালাতোড়,

১, ২, ৩. 'তত্ত্বরসামৃত জ্ঞানমঞ্জরী', —শ্রী শ্রীচরণ দাস। পৃঃ— ১৫৪, ১৫৩, ৯২

ছান্দাড় [১], হামিরহাটি, গঙ্গাজলঘাটি, রামপুর, হারাকোণা, ভিলাইডিহা, কোতুলপুর প্রভৃতি গ্রামে।

বেল, তুলসী অঠেল, ঝাঁটি (শাল গাছের সরু সরু ডাল), কুড়চি ও পড়াশি—এই ছ'রকম গাছের কাঠ থেকে তৈরি হয় মালা। তবে বেলখোলার মালার চাহিদা এবং জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। বেল মালা সাদা, সৌখিন এবং সুন্দর। লকেট বা পদক লাগিয়ে হারের মতো পরলে মানিয়ে যায় মন্দ না। বেল মালা হয় গোল, কাটতে সময় লাগে কম, দামেও সস্তা। তুলসী ও ঝাঁটির মালার দানাগুলি লম্বা, এবং আকৃতিতে বড়। কুড়চি ও অঠেল মালার দানাগুলি দেখতে অনেকটা মৃদঙ্গের মতো। কুড়চি ও অঠেল মালার চাহিদা কম, দাম কম কিন্তু শ্রম লাগে বেশি। বেল, কুড়চি ও অঠেল মালা হয় সাদা। পড়াশি, তুলসী এবং ঝাঁটির মালা হয় লাল্‌চে।

অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, জামাইষষ্ঠী, গাজন প্রভৃতি যে কোন ধর্মীয় এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে মালার ব্যবহার শাস্ত্রসম্মত এবং ধর্মসম্মত। মাল্যদানার আকৃতি, দৈর্ঘ্য, উপাদান, শ্রম এবং চাহিদার ভিত্তিতে মালার দাম নির্ধারিত হয়।

পূজাদি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে এবং মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বেল মালার প্রচলনই সর্বাধিক। ছোটদানার তুলসী মালা কণ্ঠীমালা হিসেবেই বহুল প্রচলিত। উপাদানের অভাবে তুলসী মালা আজ আর খুব একটা তৈরি হয় না বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়াতে। তুলসী মালা আসে মথুরা, বৃন্দাবন থেকে। ঝাঁটি, কুড়চি, পড়াশি ও তুলসীর বড় দানার মালাগুলি প্রধানতঃ 'জপমালা' হিসেবেই ব্যবহৃত হয়। জপমালাতে ১০৮টি দানা এবং ১টি সুমের অর্থাৎ সর্বসাকল্যে ১০৯টি মাল্যদানা থাকে। কণ্ঠীমালাগুলি সাধারণতঃ ১২", ১৪", ১৬" দীর্ঘ্য হয়। ছোট দানা এবং মিহি সৌখিন দানাগুলি কাটা হয় 'ছক' ও 'ধনুক' নামক হস্তচালিত হাতিয়ার বা যন্ত্রের সাহায্যে। আর বড় আকৃতির মাল্যদানাগুলি কাটা হয় কুঁদে।

মালা বিক্রি হয় সাবেকী হিসেব-পদ্ধতি অনুসারে। প্রতি ২০টি মালাতে হয় একটি গোছা। গোছা, পণ, কাহন হিসেবে দাম নির্ধারিত হয়। অতঃপর পণ্য বস্তু হিসেবে বস্তা বন্দী হয়ে বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরের মালা বেরিয়ে পড়ে ভারত-ভ্রমণে। উত্তরপ্রদেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রের মহাজনগণ বিষ্ণুপুরে এসে মালা নিয়ে যেতেন আগেভাগে—আসেন এখনও অল্প স্বল্প।

১৯৯০-১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে বেল মালার চাহিদার পারদ-রেখা উঠেছিল তুঙ্গে। ঐ সময় বিষ্ণুপুর বাঁকুড়ার বেল মালা স্বদেশের সীমানা অতিক্রম করে সাগরপারের আমেরিকা থেকে আরম্ভ করে আরব, ইরাক, ইরান, জাপান, জার্মানী, পর্যন্ত চলে গিয়েছিল বোম্বাই বন্দরের জাহাজে চড়ে এবং দিল্লীর বিমান বন্দরের উড়ানে উড়ে। তখন বেল মালার সে কি চাহিদা। নিম্নবিত্ত শ্রমজীবী মানুষের ঘরে ঘরে মালা কাটার সে কি ধুম! শোনা যায়, এসব শ্বেতশুভ্র সৌখিন মালাগুলিকে বর্ণাঢ্য সুষমায় রঞ্জিত করে পালিশের চাক্‌চিক্যে নয়নাভিরাম উজ্জ্বলতায় শ্রীমণ্ডিত করে তৈরি করা হত দরজা-জানালার পর্দা, লকেট সহ বাহারি নেক্‌লেস এবং বহুবিধ উপহার সামগ্রী। ঐ সময়ে বেল মালার দৌলতে ভারত প্রচুর বিদেশী অর্থ উপার্জন করেছিল—যে অর্থ ভারতের ভেঙে পড়া অর্থনীতিকে রামচন্দ্রের সেতু বন্ধনের সময় কাঠবিড়ালীর বালি বহনের অনুকরণে কথঞ্চিৎ পরিমাণে সাহায্য করেছিল বললেও অত্যুক্তি করা হবে না নিশ্চয়।

১. ছান্দাড় (চন্দ্রহার > ছান্দার > ছান্দাড় —অপভ্রংশ)

অধ্যায় - ৮৪

শ্রীশ্রীসাক্ষীগোপাল-জীউ

সাক্ষীগোপাল পাড়া

প্রিয় ভ্রমণসঙ্গীগণ, লঘুছন্দে পদচারণ করতে করতে এবং বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যমণ্ডিত মালা শিল্পের কথা হৃদয়ঙ্গম করবার অবকাশে আমরা এসে গেছি বিষ্ণুপুরের সাক্ষীগোপাল পাড়া বা বৈষ্ণবপাড়াতে। বিষ্ণুপুরের এই অঞ্চলটি হল বৈষ্ণব-প্রধান পল্লী, এজন্য এটি বৈষ্ণবপাড়া নামে পরিচিত। অপরদিকে বিষ্ণুপুরের প্রখ্যাত মহন্ত বা মোহান্ত পরিবারের পারিবারিক কুলদেবতা শ্রীশ্রীসাক্ষীগোপালদেব এখানে অধিষ্ঠিত থাকায় সাক্ষীগোপালের প্রভাবে পল্লীটি সাক্ষীগোপাল পাড়া নামেও সুবিদিত।

আপনারা নিশ্চয় জানেন বৃন্দাবনের 'পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবনে' বিশাল এক শ্রীমন্দিরে গোপালদেব প্রতিষ্ঠিত হয়ে পূজিত হচ্ছিলেন। তারপর সেই গোপাল চলে এলেন পুরীর সন্নিকটস্থ 'সত্যবাদী' গ্রামে এবং সেখানে হলেন প্রতিষ্ঠিত। নাম হল 'সাক্ষীগোপাল'। কিন্তু গোপাল কেন সাক্ষীগোপাল হলেন, আর কেনই বা তিনি 'পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবন' থেকে উড়িষ্যার 'সত্যবাদী' গ্রামে এলেন সে কথা শোনাই গল্পচ্ছলে।

বেশ কয়েক শতাব্দী আগের কথা। দক্ষিণ ভারতের দুজন ব্রাহ্মণ গেছেন তীর্থভ্রমণে। গয়া, বারাণসী, প্রয়াগ, মথুরা প্রভৃতি বহু তীর্থস্থান ঘুরে ঘুরে তাঁরা এলেন বৃন্দাবনের 'পঞ্চক্রোশী বৃন্দাবনে'। তথায় অপরূপ রূপলাবণ্যময় গোপালের শ্রীমূর্তি দর্শন করে তাঁরা দিব্য আবেশে আপ্লুত হলেন এবং সেখানে কয়েকদিন থাকার মনস্থ করলেন। লোকশ্রুতি বলে, ঐ সময় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অসুস্থ হয়ে পড়েন, কেউ কেউ বলেন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গী যুবা-ব্রাহ্মণ-কুমার নিরন্তর সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। তীর্থ-পর্যটন-কালে এবং অসুস্থ অবস্থায় ব্রাহ্মণ কুমারের একনিষ্ঠ সেবাতে পরম সন্তুষ্ট হয়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর কন্যার সাথে ব্রাহ্মণ-কুমারের বিবাহের প্রস্তাব দেন। একথা শুনে ছোট বিপ্র বলেন—

"কন্যাদান-পাত্র আমি না হই তোমার।
কৃষ্ণপ্রীত্যে করি তোমার সেবা-ব্যবহার।।"

অর্থাৎ—"মহাশয়, আমি আপনার কন্যার যোগ্য পাত্র নই। আমি যে আপনার সেবা করছি—তা কেবল শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদনের জন্য।"

বড়-বিপ্র কুলীন, বিদ্বান এবং ধনবান। পক্ষান্তরে ছোট-বিপ্র অকুলীন, অশিক্ষিত এবং দরিদ্র। এজন্য ছোট-বিপ্র নিজেকে বড়-বিপ্রের কন্যার অযোগ্য পাত্র ভেবে বৃদ্ধকে নিরস্ত করার চেষ্টা করেন বারংবার। বলেন, "ঘরে আপনার স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়স্বজন আছেন। তাঁরা এ প্রস্তাবে সম্মতি দেবেন না। আপনার উপর অসন্তুষ্ট হবেন। অপমানিত এবং লাঞ্ছিত হবেন আপনি"—ইত্যাদি, ইত্যাদি। ব্রাহ্মণ কিন্তু নাছোড়বান্দা। বলেন—

"......................কন্যা মোর নিজ-ধন।
নিজ-ধন দিতে নিষেধিবে কোন্ জন।।

তোমাকে কন্যা দিব, সবাকে করি তিরস্কার।
সংশয় না কর তুমি, করহ স্বীকার।।"

একথা শুনে ছোট বিপ্র বলেন—

"....................যদি কন্যা দিতে মন।
গোপালের আগে কহ এ সত্যবচন।।"

গোপালের আগে বিপ্র কহিতে লাগিল।
'তুমি জান, নিজ কন্যা ইহারে আমি দিল।।'

কন্যাদানের শপথ-বাক্য শুনে ছোট-বিপ্র গোপাল ঠাকুরকে সাক্ষী রেখে বলেন—

"......................ঠাকুর, তুমি মোর সাক্ষী।
তোমা সাক্ষী বোলাইমু, যদি অন্যথা দেখি।"

এই ঘটনার পর তীর্থভ্রমণান্তে বড়-বিপ্র এবং ছোট-বিপ্র উভয়েই বিদ্যানগর গ্রামে ফিরে আসেন। দিন যায়, মাস যায়, কিন্তু বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষার কোন উদ্যোগই নেন না। উপায়ান্তর না দেখে ব্রাহ্মণ-যুবক একদিন বৃদ্ধের বাড়িতে গিয়ে তার হাতে 'কন্যাদানের প্রতিশ্রুতি' রক্ষার অনুরোধ করেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কিন্তু স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়স্বজনের প্ররোচনায় কন্যাদানের অঙ্গীকার অস্বীকার করেন। পরন্তু তাঁর পুত্র ছোট-বিপ্রকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেন এবং লাঠি নিয়ে মারতে উদ্যত হন।

"আরে অধম! মোর ভগ্নী চাহ বিবাহিতে।
বামন হঞা চাঁদ চাহ ত' ধরিতে।।"

ঠেঞা দেখি' সেই বিপ্র পলাঞা গেল।
আর দিন গ্রামের লোক একত্র করিল।।

গ্রামের গণ্য-মান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ একত্রিত হলে ব্রাহ্মণ-কুমার তীর্থভ্রমণ কালে যা যা ঘটেছিল সবই বললেন খোলাখুলিভাবে। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কিন্তু গোপাল সম্মুখে কন্যাদানের প্রতিশ্রুতির কথা অস্বীকার করেন প্রকারান্তরে।

".................শুন, লোক, মোর নিবেদন।
কবে কি বলিয়াছি, মোর নাহিক স্মরণ।।"

সুযোগ বুঝে কন্যার ভ্রাতা ছোট-বিপ্রকে নানাভাবে অভিযুক্ত করেন। বলেন, তীর্থভ্রমণ-কালে ঐ যুবক তার পিতার সমস্ত টাকাকড়ি চুরি করে নিয়েছে। ধুতুরা খাইয়ে তার পিতাকে পাগল করে দিয়েছে। এখন এই দুর্বৃত্ত তার বোনকে বিয়ে করতে চায়। একথা শুনে ব্রাহ্মণ-ছোকরাকে সকলেই সন্দেহ করতে থাকেন। ছোট-বিপ্র তখন এই মিথ্যা কথার তীব্র প্রতিবাদ করেন। বলেন—

"এই বাক্যে সাক্ষী মোর আছে মহাজন।
যাঁর বাক্য সত্য করি মানে ত্রিভুবন।।"

প্রত্যুত্তরে উৎফুল্ল চিত্তে বড়-বিপ্র বলেন—

"..এই সত্য কথা।
গোপাল যদি সাক্ষী দেন, আপনি আসি' এথা।।

তবে কন্যা দিব আমি, জানিহ নিশ্চয়।"
তাঁর পুত্র কহে,—'এই ভাল বাত হয়।।'

ক্ষোভে, দুঃখে নিরতিশয় অনুতপ্ত হয়ে ছোট-বিপ্র বৃন্দাবন চলে গেলেন এবং গোপালকে সমস্ত ঘটনা নিবেদনান্তে বললেন--

"এত জানি' তুমি সাক্ষী দেহ, দয়াময়।
জানি' সাক্ষী নাহি দেয়, তার পাপ হয়।।"

"এই মূর্তি গিয়া যদি এই শ্রীবদনে।
সাক্ষী দেহ যদি—তবে সর্বলোক শুনে।।"

হাসিঞা গোপাল কহে,—"শুনহ, ব্রাহ্মণ।
তোমার পাছে পাছে আমি করিব গমন।।"

এইভাবে গোপালরূপী শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষী দেওয়ার অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণ কুমারের সাথে বিদ্যানগরের অভিমুখে রওনা হলেন। শর্ত হল, ছোট-বিপ্র যাবেন আগে আগে এবং গোপাল যাবেন পিছনে পিছনে। গোপালের নূপুরের ধ্বনি শুনে ছোট-বিপ্র শ্রীকৃষ্ণের আগমন সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকবেন। কিন্তু কোন কারণ বশতঃ ছোট-বিপ্র যদি পিছন ফিরে তাকান তাহলেই গোপাল রয়ে যাবেন সেই স্থানেই, আর নড়বেন না এক পাও। উক্ত শর্ত-সাপেক্ষে শুরু হয় ভক্ত ও ভগবানের সুদীর্ঘ পথযাত্রা। কথামতো ব্রাহ্মণ-কুমার প্রতিদিন এক সের সুগন্ধি চালের অন্ন নিবেদন করেন গোপালকে। তাই খেয়ে প্রতিদিন পথ হাঁটেন গোপাল। এইভাবে চলতে চলতে তাঁরা যখন বিদ্যানগর গ্রামের প্রান্তভাগে উপস্থিত হলেন তখন গোপালের নূপুরের ধ্বনি শুনতে না পেয়ে গোপালের উপস্থিতি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়ার জন্য ব্রাহ্মণ যুবক ফিরে তাকান পিছনের দিকে। আর সেই অপরাধে পূর্ব শর্ত অনুসারে গোপাল রয়ে গেলেন সেখানেই। অগত্যা ছোট-বিপ্র, বড়-বিপ্র সহ গ্রামাবাসীগণকে ডেকে আনেন সাক্ষী নেওয়ার জন্য।

"আইল সকল লোক সাক্ষী দেখিবারে।
গোপাল দেখিঞা লোক দণ্ডবৎ করে।।

গোপাল-সৌন্দর্য দেখি' লোকে আনন্দিত।
প্রতিমা চলিঞা আইলা,—শুনিঞা বিস্মিত।।"

"সকল লোকের আগে গোপাল সাক্ষী দিল।
বড়বিপ্র ছোটবিপ্রে কন্যাদান কৈল।।"

ভক্তাধীন গোপাল সেদিন সুদূর বৃন্দাবন থেকে বিদ্যানগরে এসেছিলেন বিপদগ্রস্ত অসহায় ভক্তের পক্ষ অবলম্বন করে সাক্ষী দিতে। তাই বৃন্দাবনের গোপাল বিদ্যানগরে 'সাক্ষীগোপাল' নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পরবর্তীকালে ঘটনাচক্রে সাক্ষীগোপাল আসেন কটকে; পরে কটক থেকে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমন্দিরে। কিন্তু জগন্নাথদেবের সাথে প্রেম-কলহের কারণে পুরী থেকে ন্যূনধিক পাঁচক্রোশ দূরে 'সত্যবাদী' গ্রামে মন্দির তৈরি করে সাক্ষীগোপালকে অধিষ্ঠিত করা হয় স্থায়ীভাবে।

পুরীর সাক্ষীগোপাল ঠাকুরের পূর্বকথা শোনালাম। এবার শোনাই গুপ্তবৃন্দাবন বিষ্ণুপুরের সাক্ষীগোপাল ঠাকুরের কথকতা। সামনে তাকান, দেখুন, কি অপরূপ রূপমাধুরীতে মাধুর্য মণ্ডিত হয়ে শোভা পাচ্ছেন মুরলীধর নীলাম্বর-শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ। প্রমাণ সাইজের এই শ্রীবিগ্রহের বামদিকে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গজাত বাসন্তী-বর্ণা-শ্রীরাধার শ্রীবিগ্রহও

বিদ্যমান। **বলতে দ্বিধা নেই, মল্লভূমে রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের ছড়াছড়ি কিন্তু উল্লেখযোগ্যভাবে এতো বড় আকৃতির রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ নজরে পড়ে না কোথাও।** রাধাকৃষ্ণের এই যুগল মূর্তিই বিষ্ণুপুরে সাক্ষীগোপাল রূপে পূজিত হয়ে আসছেন প্রায় সাড়ে তিনশত চারশত বছর যাবৎ। সত্যই ভাববার কথা! পৌরাণিক ঠাকুর আজ ঐতিহাসিক ঠাকুরে রূপান্তরিত হয়েছেন সময়ের অপ্রতিরোধ্য গতিপ্রবাহে।

ইতিহাস বলে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে 'সিপাহী বিদ্রোহ'। তার ঠিক একশ বছর আগে, অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে হয় রক্তক্ষয়ী 'পলাশীর যুদ্ধ'। বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসনে তখন উপবিষ্ট ছিলেন মহারাজ চৈতন্যসিংহ (১৭৪৮-১৮০০ খ্রীঃ)। লোকশ্রুতি বলে পলাশির যুদ্ধের প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে কোন এক সময়ে বিষ্ণুপুরের কোন এক রাজা বিষ্ণুপুরের বর্তমান সাক্ষীগোপাল পাড়াতে একটি শ্রীমন্দির নির্মাণ করে সাক্ষীগোপাল বিগ্রহ স্থাপন করেন এবং দেবোত্তর সম্পত্তিও দান করেন প্রভূত পরিমাণে।

শ্রীবিগ্রহের পূজা আদি ভোগরাগ এবং দেখাশোনার জন্য নিষ্ঠাবান ও ধর্মপ্রাণ এক বৈষ্ণবকে সেবাইত নিযুক্ত করেন এবং মহান্ত পদবীতে ভূষিত করেন। উক্ত মহান্ত পরিবারের শেষ উত্তরপুরুষ হলেন ঁকেশব দাস মহান্ত। ঁকেশব দাস ছিলেন অপুত্রক। এজন্য তিনি তাঁর একমাত্র কন্যা ঁযোগীন্দ্র বালা দাসীর সাথে বিষ্ণুপুর বিশ্বাসপাড়া নিবাসী ঁরাইচরণ দাসের বিবাহ দিয়ে তাঁকে ঘর-জামাই হিসেবে বরণ করেন। সে প্রায় একশ পঁচিশ ত্রিশ বছর আগের কথা। তৎকালীন বিষ্ণুপুরের রাজা রাইচরণ দাসকে 'মহান্ত' উপাধিতে অভিষিক্ত করে শ্রীশ্রীসাক্ষীগোপাল ঠাকুরের সেবাইতের স্বীকৃতি দেন। সুতরাং এটা পরিষ্কার যে মহান্ত পরিবারের বর্তমান বংশধরগণ উক্ত শ্রীবিগ্রহের সেবাইতের পদাধিকার পেয়েছেন দৌহিত্র অর্থাৎ মাতৃকুলের উত্তরাধিকার সূত্রে।

অনুমান করা যায় ধর্মপ্রাণ বীর হাম্বীরই উক্ত শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা। কারণ শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার অব্যবহিত পরেই বৃন্দাবন, মথুরা, গয়া, কাশী, পুরী প্রভৃতি স্থানে তীর্থভ্রমণে যান মহারাজ বীর হাম্বীর। শ্রীবৃন্দাবনের স্বর্গীয় সুষমাতে আকৃষ্ট হয়ে উত্তর ভারতের বৃন্দাবনের অনুকরণে পূর্ব ভারতে অবস্থিত নিজ রাজধানী বিষ্ণুপুরকেও তিনি বৃন্দাবনে পরিণত করার স্বপ্নে হন বিভোর। যমুনা ও কালিন্দী বাঁধের সাথে সাথে খনন করান রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড। তৈরি করাতে থাকেন মন্দিরের পর মন্দির। প্রতিষ্ঠা করেন বিগ্রহ। সুতরাং সিদ্ধান্তে আসা যায় বৃন্দাবনের গোপাল তথা পুরীর সাক্ষীগোপালের অপূর্ব লীলাকাহিনী শ্রবণে প্রভাবিত হয়ে মহারাজ বীর হাম্বীরই উক্ত সাক্ষীগোপাল ঠাকুরের শ্রীমন্দির এবং শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কালের প্রকোপে রাজার মন্দির ধ্বসে পড়াতে শ্রীবিগ্রহ এখন উক্ত ভগ্নমন্দিরের সন্নিকটেই মহন্ত পরিবার কর্তৃক নির্মিত একটি ছোট আকারের দালান মন্দিরেই অবস্থান করছেন এবং পূজিত হচ্ছেন যথানিয়মে। আর মাঝে মধ্যে অলৌকিক ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়ে নিজের অস্তিত্ব প্রমাণে আছেন সচেষ্ট।

গোপাল মানে গোপাল। মানে বাচ্চা ছেলে, অবুঝ সন্তান। পাশে শ্রীরাধা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পত্নীর উপস্থিতির কথা ভুলে গিয়ে মাঝে মধ্যে নাবালক অবোধ শিশুর মতোই আচরণ করেন গোপাল। মান-অভিমান তো আছেই—যেটা নেই, সেটা হল লজ্জাবোধ। খুলেই বলি ঘটনাটা।

ঁরাইচরণ দাস মহন্তের পুত্র ঁচৈতন্যচরণ দাস মহন্ত গোপাল ঠাকুরের পরম ভক্ত।

প্রত্যহ প্রত্যুষে স্নানান্তে ঘরে বাইরে পাড়ায় বেপাড়ায় ফুল তুলে বেড়ানো তাঁর অভ্যেস। গোপালকে ফুলে ফুলে সাজিয়ে আর পূজা-আচ্চা করে তাঁর চরম তৃপ্তি, পরম শান্তি। ঠাকুরকে সাজাতে গিয়ে 'ফুলচোর' অপবাদটা তাঁর হয়ে গিয়েছিল অঙ্গভূষণ। একদিন তাঁর নাতি গৌতমের বাগানে ফুল চুরি করতেই ঘটল মহাবিভ্রাট।

পুষ্প-প্রেমিক গৌতমের সাজানো বাগানে হরেক রকম গোলাপের সমাবেশ। নয়নাভিরাম গোলাপগুলো যেন হাতছানি দিয়ে ডাকে ভক্তবর বৃদ্ধ চৈতন্য দাসকে। চৈতন্য দাস আপন মনে ভগবানের নাম জপতে জপতে তুলতে থাকেন ফুল। বাগানের প্রায় সবকটি ফুল তুলে নিয়ে ফিরে আসেন চৈতন্যবাবু। ঠাকুরকে ফুলে ফুলে সাজাতে সাজাতে মন চলে যায় দেবলোকে, না গোলোকধামে, কে বলতে পারে!

আঠার বছরের গৌতম বাড়ি ফিরে সখের বাগানে উঁকি মারতেই চমকে উঠল। বুঝতে দেরি হয়না এ তার দাদুর কাণ্ড। দিন দিন, বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। সহ্য করা যায় না। 'ঠাকুর, ঠাকুর, খুব হয়েছে ঠাকুর'—বাড়ন্ত বয়সের উঠতি রাগটাকে চেপে রাখতে পারে না গৌতম। শিকড়-বাকড় সহ আস্ত গোটাকয়েক গোলাপ গাছকে তুলে এনে সাক্ষীগোপালের শ্রীমন্দিরে উপাসনা রত দাদুর সামনে ছুঁড়ে ফেলে সবশুদ্ধ। নাতি-ঠাকুরদায় হেস্তনেস্ত হয় এক হাত। দাদু বলেন, 'ফুল তো ঠাকুরের তাই নিয়েছি, বেশ করেছি, তাতে দোষটা হয়েছে কি?' নাতি প্রতিবাদ করে, 'এ ফুল আমার। আমার ফুল নেবে কেন দিন দিন?' নাতি ঠাকুরদার এই উপভোগ্য কোন্দল উপভোগ করার জন্য সেখানে ঘরের লোক জমতে শুরু করেছে একে একে। এদিকে যাঁর জন্য এত কাণ্ড, যাঁর জন্য ফুল-চুরি—তিনি তো তখন ফুলে ফুলে ফুলেশ্বর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন নির্বিকার। কিন্তু সত্যই কি নির্বিকার ছিলেন তিনি? না।

ভক্তের অপমানে অপমানিত হয়েছেন। আহত হয়েছেন, ব্যথিত হয়েছেন যার-পর-নাই।

গভীর রাত। রাত গভীর। ঘুমোচ্ছে গৌতম। ঘুমোতে ঘুমোতে দেখে একটা 'ন্যাংটাপুটো' ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। বোধকরি স্নান করেছে এইমাত্র। গা-মাথা থেকে জল ঝরছে টস্ টস্ করে। অভিমানে মুখ ভারি করে বলতে থাকে, 'আমি চলে যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি এখান থেকে।'

'কে তুমি?'

'আমাকে চিনিস না, আমি তোদের গোপাল।'

'তা চলে যাচ্ছ কেন? তোমার সাথে তো আমার ঝগড়া নেই?'

'তুই যে আমায় ফুল দিতে চাস নি।''

'দেবো, দেবো বাগানের সব ফুল দেবো—তবু তুমি যেও না, যেও না।'

ঘুম ভেঙে যায় গৌতমের। ঘটনাচক্রে নাস্তিক গৌতমও হয়ে ওঠে আস্তিক। আমি ভাবি লীলাময়ের কি অপূর্ব লীলা!

বিচিত্র এই ঘটনাটি শুনে আমরা হেসে মরি এইভেবে যে বিষ্ণুপুরে গোয়ালাদের সম্পর্কে একটা কথা শোনা যায়—'গয়লা আশি বছরেও নাবালক।' আর এখানে দেখছি পাঁচশ বছরেও সাক্ষীগোপাল হতে পারেননি সাবালক কিংবা সুবোধ বালক। তাইতো 'ন্যাংটাপুটো'—আর অল্পেতেই অভিমান, অল্পেতেই তুষ্ট। এজন্যই বলছিলাম, 'গোপাল সহজ-সরল, নিলাজ-নাবালক, অবোধ শিশু।

গোপালের কথা শুনলেন। এবার শোনাই গোপালের রাধার কথা। গোপাল-ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন থেকে বিদ্যানগরে এসেছিলেন একা একা—সঙ্গে ছিলেন না শ্রীরাধা। কিন্তু 'সত্যবাদী' গ্রামের সাক্ষীগোপালের পাশে শ্রীরাধা শোভিতা। এখন প্রশ্ন হল এই রাধা এলেন কোথা থেকে এবং কিভাবে?

উত্তরে বলি, সত্যবাদী গ্রামে বসবাসকারী বড়-বিপ্রের বংশধরদের মধ্যে কারো বংশে লক্ষ্মী নামে এক কন্যা ছিলেন। কন্যাটি শৈশবাবস্থা থেকেই সাক্ষীগোপালের প্রতি অনুরক্তা হন। কালক্রমে লক্ষ্মী বিবাহযোগ্যা হলে সাক্ষীগোপালকে স্বামীরূপে বরণ করেন মনে মনে। একদিনের কথা, ভোরবেলা মন্দিরের দরজা খুলে পুরোহিত ঠাকুর দেখেন ঠাকুরের হাতের বাঁশি এবং পায়ের নূপুর খোয়া গেছে। খোঁজাখুঁজি করতে করতে বাঁশি আর নূপুর পাওয়া গেল লক্ষ্মীদেবীর ঘরে। তখন লক্ষ্মীর বাবাকে চোর ভেবে রাজা দেন রাজদণ্ড। ঐদিন রাত্রেই রাজার প্রতি স্বপ্নাদেশ হয়, "লক্ষ্মীদেবীর পিতা নিরপরাধ। আরো জেনে রাখো ব্রাহ্মণ কন্যা আমাকে পতিত্বে বরণ করে আমাতেই নিবেদিত প্রাণ। তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং অকৃত্রিম সরল বিশ্বাসের প্রাবল্যে আমি তাঁকে পত্নীত্বে বরণ করেছি। নিশুতি রাতে আমি তাঁর শয়নকক্ষে নিয়মিত যাতায়াত করি। গতরাত্রে আমি অসাবধানতা বশতঃ বাঁশি এবং নূপুর ভুলে এসেছি। নিরপরাধ ব্রাহ্মণের দণ্ডাদেশ প্রত্যাহার করে আমার বামদিকে শ্রীরাধার শ্রীবিগ্রহ স্থাপন কর অবিলম্বে।"

স্বপ্নাদেশের ফলে মুক্তি পেলেন ব্রাহ্মণ। স্থাপিত হল স্বর্ণরাধা। কথিত আছে স্বর্ণরাধা স্থাপনের অব্যবহিত পরেই লক্ষ্মীদেবীর তিরোধান হয়। কারণ লক্ষ্মীদেবী ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপাশক্তি।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে পুরীর বিদ্যানগরের সাক্ষীগোপাল এবং বিষ্ণুপুরের সাক্ষীগোপাল উভয়েই প্রমাণ আকৃতির বিগ্রহ। উভয়েই মনোহর দর্শন, উভয়েরই শ্রীরাধা সুবর্ণবর্ণা। পুরীর সাক্ষীগোপালের রাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের আত্মশক্তির অংশবিশেষ আর বিষ্ণুপুরের সাক্ষীগোপালের শ্রীরাধা হলেন সাক্ষীগোপালের অঙ্গোদ্ভুত। কারণ জনশ্রুতি বলে যে বিশাল এক নিমগাছের প্রকাণ্ড কাণ্ড থেকেই প্রথমে সাক্ষীগোপালের এবং পরে শ্রীরাধার শ্রীবিগ্রহ নির্মিত হয়েছিল।

আসুন, নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে দেখুন, গোপালের মুখমণ্ডলে কি অদ্ভুত আত্মতৃপ্তির হাসির দ্যুতি—বুঝিবা সত্যসাক্ষী দিয়ে সত্যরক্ষার আনন্দে আনন্দিত—শিশুর সারল্যে শ্রীমণ্ডিত, আর রাধারাণী যেন ব্রাহ্মণ কন্যা লক্ষ্মীদেবীরই জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। আসুন, মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে বিদায় বেলার প্রাক্কালে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে শ্রীশ্রীসাক্ষীগোপাল বন্দনা করি হৃদয় মথিত শ্রদ্ধার্ঘ্য দিয়ে—

পদ্ভ্যাং চলন্ যঃ প্রতিমা-স্বরূপো, ব্রাহ্মণ্যদেবো হি শতাহগম্যম্।
দেশং যযৌ বিপ্রকৃতেঽদ্ভুতেহং, তং সাক্ষীগোপালমহং নতোঽস্মি।।

অর্থাৎ, যে প্রতিমাস্বরূপ ব্রাহ্মণ্যদেব পদযুগল চালনা করিয়া ব্রাহ্মণের উপকারার্থ শতদিবস-প্রাপ্য দেশ অর্থাৎ মথুরামণ্ডল হইতে বিদ্যানগর গমন করিয়াছিলেন, আমি সেই অপূর্ব-চেষ্টাযুক্ত শ্রীশ্রীসাক্ষীগোপালদেবকে প্রণাম করি।

অধ্যায়-৮৫

ভাদু—একটি লোক-উৎসব

সাক্ষীগোপালের আঙ্গিনা ত্যাগ করে এবার আমি আপনাদের বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া ও পুরুলিয়ার একটি লোক-উৎসবের আঙ্গিনায় উপস্থিত করব। উৎসবটি 'ভাদু-পূজা' নামেই জনপ্রিয়। এককালে পশ্চিম-বর্ধমান, দক্ষিণ-বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এবং বিহারের অন্তর্ভুক্ত ধানবাদ ও রাঁচি জেলার পুরুলিয়া সংলগ্ন অঞ্চল ছাড়াও সিংভূম এবং উড়িষ্যার কিয়দংশে ভাদু-পূজা প্রচলিত ছিল। বর্তমানে এটি সংকুচিত হ'তে হ'তে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে।

ভাদু নিয়ে গবেষক মহলে ভীষণ কৌতূহল। ভাদু কে? এবং কেনই বা এই ভাদুপূজা? এই নিয়ে রহস্যের মায়াজাল সৃষ্টি হয়েছে, বহু মত প্রচলিত হয়েছে কিন্তু মতৈক্যে পৌছানো সম্ভব হয়নি।

বহুল প্রচলিত প্রথম মতটি হল, কাশীপুরের রাজার ভদ্রেশ্বরী (মতান্তরে ভদ্রাবতী) নামে এক অপরূপা রূপসী কন্যা ছিল। ভদ্রেশ্বরীর বিবাহের দিন বরানুগমনকালে তাঁর হবু স্বামী ডাকাতদের হাতে নিহত হন। লগ্নভ্রষ্টা কন্যা তখন আত্মহত্যা করেন। ভদ্রেশ্বরী ছিলেন রাজ্যবাসীর আদরের পাত্রী। তাই তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে পঞ্চকোটের রাজ-উদ্যোগে এবং প্রজা-সাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্তরিকতায় ভাদুপূজা উদযাপিত হয় সর্বপ্রথম।

দ্বিতীয় মতটি হল, ভাদু ছিলেন খুবই দয়ালু প্রকৃতির। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ যেমন বাউরী, বাগ্দী, ডোম, হাড়ী প্রভৃতি নিম্নবর্ণের মানুষের অসহনীয় দুঃখ কষ্টে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। তাদের পক্ষাবলম্বনে তিনি রাজরোষে পড়েন এবং অন্ত্যজ শ্রেণীর ঐসব মানুষের দুঃখ-কষ্ট মোচনে ব্যর্থ হয়ে আত্মহননের পথ বেছে নেন। নিম্নবর্ণের মানুষেরা তখন ভাদুর স্মৃতিকে অম্লান রাখার জন্য ভাদু-পূজার প্রবর্তন করে।

তৃতীয় মতটি হল, ভাদু ছিলেন দেব-দ্বিজে ভক্তিপরায়ণা রাজকন্যা। যখন তখন দেবমন্দিরে যাতায়াত এবং দেবদেউলে রাত্রিযাপনও করতেন রাজার ইচ্ছার বিরুদ্ধে। এ ধরনের আচরণ রাজপরিবারের পক্ষে অশোভনীয় হয়ে ওঠে। রাজরোষে মানসিক দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে ভাদু আত্মহত্যা করেন অথবা তাঁকে মেরে ফেলা হয়।

আবার অনেকে বলেন, বিবাহিতা ভাদু মীরা বাঈ-এর মতোই দিব্যপ্রেমে উম্মাদ হয়ে স্বামীর ঘর না করে দিবারাত্রি ঘুরে বেড়াতেন দেবালয়ে দেবালয়ে। রাত্রিযাপন করতেন দেবমন্দিরে। এই দিব্য-প্রেমোন্মাদনাই নাকি তাঁর অকাল-মৃত্যুর কারণ।

ভাদু সম্পর্কে আর একটি অভিনব কিংবদন্তী শোনা যায়। সেখানে বলা হয়েছে "মর্তশোভাদর্শন অভিলাষী দেবী দুর্গা কিছুদিনের জন্য নিরুদ্দিষ্ট হন এবং বনমধ্যে রাজা একটি সুন্দরী কন্যা দেখে তাকে গৃহে আনেন। তার নাম হয় ভাদুরাণী। কন্যাহীনা রাজার রাজপুরীতে ধুমধাম, অন্যদিকে উপবাসী শিব ও কার্তিক, গণেশের মাতৃব্যাকুলতায় দেবতাদের অনুরোধে মর্তে এসে নারদ দেবী দুর্গাকে চিনতে পারেন এবং স্বর্গের অবস্থা জানান। ভাদ্র মাসের সেই শেষ দিনটিতে দেবী রাজাকে আপন পরিচয় সহ পূজার পরামর্শ দিয়ে স্বর্গে ফিরে যান। সেই থেকে ভাদু উৎসবের সূচনা।"[১]

আবার অনেকে মনে করেন তুষুর মতোই ভাদুও একটি কৃষি-উৎসব। ভাদ্র মাসে আউশ ধান পাকে। ভাদ্র মাসে পাকে বলে এই ধানের আর এক নাম ভাদোই ধান।

১. ভাদু — সুব্রত চক্রবর্তী, লোকশ্রুতি —১১, পৃঃ— ৯৪

নিরন্ন দুঃখী মানুষের মুখে প্রথম অন্ন যোগায় ভাদোই ধান। তাই ভাদোই ধানকে সাদরে বরণ করার জন্য ১লা ভাদ্র থেকে ভাদ্র-সংক্রান্তির দিন অবধি চলে ভাদোই পূজা বা ভাদুপূজা। এই সময় আকাশও থাকে মেঘলা। বাদলা-বতরে ভাদুপূজা জমে ভাল।

এমন মেঘ বাদলে,...
পানের খিলি রইল ভাদুর আঁচলে।।
মাগো আমি ফুল পাতাব, ফুলকে আমি কি দিব
বাজার যাব পয়সা পাব, ফুলকে ফুলেল তেল দিব।।
আঁচিরে পাঁচিরে পদ্ম, ও ভ্রমর তুই বসিস না
আমার ভাদুর জড়া পদ্ম, ভ্রমর বই আর বসে না।।
মাগো আমি কাপড় লিব, ধারে ধারে ধাদ্‌কি ফুল
শ্বশুর ঘরের লোকে বলে, গেল বউ-এর জাতি কুল।।
কাশীপুরের মহারাজা, সে করে ভাদুর পূজা
সকাল সন্ধ্যা ঝারল বাজায়, শীতল দেয় জিলপী খাজা।।

আর একটি ভাদু-গানে আছে --

কাশীপুরের মহল ছিল ছিল সুখের বৃন্দাবন
সে মহলে ঘাস বেরালো কি কর হে নীলমোহন।

অনেকে এই নীলমোহনকেই ভাদুর পিতা বলে অনুমান করেন। কিন্তু যতদূর জানা যায় তাতে দেখা যায় নীলমোহন সিংহের বার তিনেক বিবাহ এবং তেরটি পুত্র ছিল। ছিল না কোন কন্যাসন্তান। অনেকের ধারণা দেবী দুর্গা মর্ত্যধামে এসে কাশীপুরের রাজা নীলমোহনকে বনমধ্যে কন্যারূপে ধরা দিয়েছিলেন। এই কন্যাই ভাদুরাণী। ভাদু-রূপী দেবী দুর্গা স্বর্গে ফিরে যাওয়ার পর কাশীপুরের সুখের বৃন্দাবনে তাই বুঝি নিরানন্দের ঘাস গজালো।

ভাদুপূজা, 'পূজা'র আক্ষরিক অর্থে পূজা নয়। এই পূজা যাগযজ্ঞ, মন্ত্রতন্ত্র ও পুরোহিত-বিহীন পূজা। গানের নৈবেদ্য সাজিয়ে এ পূজার শুরু এবং সমাপ্তি। কুমারী, কিশোরী, সধবা, বিধবা, বৃদ্ধা সকলেই এ পূজায় সামিল হন। গানে গানে লাগামহীন আনন্দ উপভোগ করাই এ পূজার উদ্দেশ্য। রান্নাঘর এবং গৃহের চৌহদ্দি থেকে এ উৎসব যেন নারীমুক্তির সূচক। তাই গাওয়া হয়—

ভাদু পূজার দিনে
সারারাত উড়াব ফুর্তি হে, কাটাব জাগরণে
বাকি আজ রাইখো না কিছু, যা ইচ্ছা আছে মনে
রাখ লোকলজ্জা, দাও দরজা, মহাপূজা এইখানে।

আবার নারী-হৃদয়ের অবদমিত কামনা-বাসনাগুলির স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি পরিলক্ষিত হয় ঝুমুরের সুরে গাওয়া নীচের ভাদু-গানটিতে।

তিং দাং দাং তিনাং নিদাং
পিন্দাড়ে হাত লাগালি
ভাদুলো তুই নাগরে ভুলালি।
ধন্য ধন্য রূপ তোর
(বঁধুর) করে দিলি নিশি ভোর
সাবাস মাইরি মধু তোর
ঐ মুখে কি মধু চাটালি।

ভাদু এবং ভাদু পূজার উৎস-রহস্যের বেড়াজাল কেটে এবার আমরা ভাদু দেখব এবং শোনাব আরো আরো ভাদুগান ও ভাদুপূজা পদ্ধতির তত্ত্বকথা।

ভাদু অতীব সুশ্রী, অতীব ফর্সা, রাজকীয় সাজে সুসজ্জিতা, সিঁথিতে সিঁদুর শোভিতা, প্রিয়দর্শনা রমণী। পদ্মাসীনা অবস্থায় অথবা দণ্ডায়মানা অবস্থায় স্বমহিমায় গানে গানে পূজিতা হন তিনি। এক একটি পল্লীর মহিলা-মহল সমবেতভাবে কারো বাড়িতে মণ্ডপ সাজিয়ে ফল-মূল ও বহুবিধ মিষ্টান্ন, বিশেষতঃ জিলাপি ও খাজা থালায় থালায় সাজিয়ে ভাদু পূজায় সামিল হন। ১লা ভাদ্র থেকে ভাদুপূজা অনুষ্ঠিত হলেও সংক্রান্তির রাত্রিতে অর্থাৎ ভাদু জাগরণের রাত্রিটিতে ভাদু পূজার ধুমধাম পরিলক্ষিত হয়। ঐদিন ময়রা দোকানে যে মিষ্টি তৈরি হয় তা 'ভাদুর মিষ্টি' নামেই প্রসিদ্ধ। ভাদুর হাতে থাকে পদ্ম, ধানের শীষ, মিষ্টান্ন ও পান। আলতা, সিঁদুর, সুগন্ধি তেল এবং নানাবিধ প্রসাধন দ্রব্যও উপহার দেওয়া হয় ভাদুকে।

ভাদু পূজার প্রারম্ভে আগমনী গানের সুরে ভাদু বরণের উদ্দেশ্যে গাওয়া হয়—

এসো এসো ভাদু ধন আমরা করি আমন্ত্রণ
হৃদয় মন্দিরে এসো গো রেখেছি পেতে আসন।

সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালিয়ে, শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে ভাদু-বরণের রীতিও পরিলক্ষিত হয় ভাদু-গানে—

সব সঙ্গতি পরাণগতি, সন্ধ্যা দাও ভাদুর কাছে
শঙ্খ বাজাও, ঘণ্টা বাজাও, ঘরে ভাদু ধন আছে।

আরো শোনা যায়—

কাশীপুরের মহারাজা করেন ওগো ভাদু পূজা
হাতেতে মা জিলিপি খাজা পায়েতে ফুল বাতাসা...।

বাঁকুড়া শহরের গণিকা-মহলে কৃষ্ণ-বিরহিনী রাধার কণ্ঠ-নিঃসৃত গানও গাওয়া হয় ভাদু উৎসবে—

সারা নিশি কেটে গেল, কালশশী এল না
শুকাল ফুলের বাসর, মালা দেওয়া হল না।

একটি লক্ষণীয় বিষয় হল কাশীপুরের রাজা, উচ্চমধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত এবং নিম্নবর্ণের প্রজা, এমনকি গণিকাগণও ভাদু-পূজায় অংশগ্রহণ করেন—এতদর্থে ভাদু শ্রেণীবৈষম্যের উর্ধ্বে ভেদাভেদহীন একটি সার্বজনীন উৎসব।

ভাদুর সাথে প্রিয়সখীর ন্যায় আচরণ করার রীতিও বহুল প্রচলিত—

প্রাণের ও ভাদুধন
আয়লো তোরে সাজাব মনের মতন
পায়ে আলতা সিঁথায় সিন্দুর লো, নয়নে দিব অঞ্জন
চাঁচর চুলে ঢেউ খেলিয়ে কবরী করি বন্ধন
চুড়ি আর্মলেট, সিঁথি নেকলেস গো, কানে কুণ্ডল আভরণ

আকাশ রঙের ফিরিপি[১] শাড়ি হবে গায়ে আবরণ
সেন্ট এসেন্সের ভাসা বাসে লো ভাসাবে সবার মন
(হবে) ত্যাগী-যোগী অনুরাগী, পেয়ে তোমার দরশন।

দুর্গা-পূজা, কালী-পূজা, সরস্বতী-পূজার ন্যায় ভাদু-পূজাতেও চাঁদা দেওয়ার প্রথা লক্ষণীয়—

লাগবে ভাদুর চাঁদা
ও ঠাকুরপো ঘরে নেই তোমার দাদা
ভাল করে লিখবে চিঠি হে, যেন টাকা পাঠায় তাগাদা[২]
বছর বছর ভাদু পূজায় দিতে হয় গয়না বাঁধা।

গানে গানে আর প্রাণ-খোলা আনন্দানুষ্ঠানে প্রভাত হয়ে আসে রাত্রি। ভাদু বিসর্জনের বিদায়-বেলায় বেজে ওঠে বিজয়ার সুর—

সাধের ভাদু ধনে, বল্ মালতী বিদায় দিব কেমনে
সারা রাতি হাসি ফূর্তি লো, আবার আসবে বছর দিনে
কেন্দনা কেন্দনা ভাদু গো, এবার মরিব মন কেমনে
বুক ফেটে যায় দিতে বিদায় লো, আজ পহলা আশ্বিনে...।

পরিশেষে বলি, রক্তমাংসে গড়া কিছু মানব-মানবী বিশেষ চারিত্রিক গুণে অথবা কোন বিশেষ ঘটনার সূত্র ধরে দেব-দেবীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন। ভাদুর কিংবদন্তীতে দেবী দুর্গার কাহিনী সংযোজনের ফলে ভাদুগানে কখনও কখনও দেবীত্ব আরোপ করা হ'লেও, ভাদু মূলতঃ মানবী রূপেই পূজিতা হন। ভাদু তাই মানবী। ভাদু মহিলা। ভাদু উৎসব মহিলা-মহলের মিলন-মেলা। শুধু হিন্দু মহিলা নয়, বাঁকুড়া জেলার গুন্নাথ গ্রামের মুসলমান মেয়েদেরও ভাদু উৎসবের সামিল হতে দেখা গেছে।

ভাদু যেহেতু একান্তভাবে মহিলাদের উৎসব তাই ভাদুপূজায় পুরুষেরা থাকে বঞ্চিত। পুরুষেরা ভাদুপূজার শখ মেটায় অন্যভাবে—ভাদুর পরিবর্তে ভাদা পূজা করে। "ভাদুর 'জাগ্রণ' রাতে কোথাও কোথাও পুরুষদের দ্বারা উদ্‌যাপিত হয় 'ভাদা'। পুরুষ কণ্ঠের বিকৃত সুরের ভাদুগানের মাধ্যমে ভাদা উদ্‌যাপিত হয়। পুরুষ বিশেষত বালক বা যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে এর প্রচলন যৎসামান্য দেখা যায়। যে কোন পুরুষ-মূর্তি বসিয়ে খানিকটা সরস পরিবেশের উদ্দেশ্যে উদ্‌যাপিত ভাদার সংখ্যা কিন্তু খুবই নগণ্য।"[৩]

মহিলা-মহলের ভাদু পূজা এবং তারই অনুকরণে পুরুষদের ভাদা পূজা—এই ধরনের প্রতিযোগিতামূলক সীমারেখা অতিক্রম করে ভাদুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় কৃষিভিত্তিক নর-নারীর সমাজ জীবনে। **অনেকে মনে করেন ভাদু-পূজা 'ফসল ফলানোর উৎসব'।** প্রভূত ফসলের আশায় আষাঢ়-শ্রাবণে চলে রোয়াপোঁতার কাজ। ভাদ্রের শেষে এবং আশ্বিনের প্রথমে কাটা হয় ভাদোই ধান। তারপর অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত চলতে থাকে ধান কাটার পালা। ভাদ্র মাস মোটামুটিভাবে বিশ্রামের মাস। এই মাসে তাই বাঁকুড়া পুরুলিয়ার গ্রামে গ্রামে আসন্ন ফসলের সম্ভাবনায় শুরু হয় ভাদু-পূজা। গানে গানে

১. ফিরিপি—পাতলা ফিন্‌ফিনে। ২. তাগাদা—তাড়াতাড়ি।
৩. ভাদু—সুব্রত চক্রবর্তী, লোকশ্রুতি ১১, পৃঃ—১১৪

মুখরিত হয়ে ওঠে গ্রাম্য-সন্ধ্যা।

ই বছর লিয়েছি জমি, ভাগে চাষ কৈরব
বাসমতী চালের কুচুড়ি ঘরে পুরে রাখব।
ভাদু যাবেক শ্বশুরবাড়ি দিব মিঠাই মণ্ডা
গামছা বাঁধা দই দিব, কড়ি চার গণ্ডা।

আবার বৃষ্টির অভাবে মাঠভরা ধানগাছগুলো যখন শুকিয়ে যায় তখন শোনা যায় বুক-ভরা হতাশার সুর।

মেঘ কৈর়্যেছে চাখা চাখা, ই মেঘে কি জল হবে।
বাইদের গুছি বাইদে থাইক্‌ল, আর কি ভাদুর চাষ হবে।।

আবার শোনা যায় আশার কথা—

এ বছরের মত ভাদুগো তুষ্ট রহ অল্পেতে।
ধান্য হলে আর বছরে পূজব তোমায় ভাল মতে।।

কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙক্ষা, কামনা-বাসনার প্রতিফলন ছাড়াও ভাদুগানের সুরে অনুরণিত হয় বৃহত্তর সমাজ চেতনা, ফুটে ওঠে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, ধরা পড়ে স্বাধীনতা এবং স্বদেশী আন্দোলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্ররূপ, প্রতিবিম্বিত হয় দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও বন্যার বিভীষিকা। যেমন স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে চাষীবাসী মানুষের প্রত্যাশা ছিল—

আর ভেবো না ভাদুমণি, ওগো মা জননী
জনে জনে জমি পাবেক গো, যাবেক ঘুচে হয়রানি।

"আবার এই ভাদুগানেই লাভ করা যায় স্বাধীনতা সম্পর্কে কৃষকদের মোহভঙ্গের কথা। বস্তুতঃ আমাদের সমাজ, স্বাধীনতা ও রাজনীতি সম্পর্কে একেবারে সাধারণ মানুষের মূল্যায়ন ভাদুগানে খুব স্পষ্টভাবেই ধরা পড়েছে।"[১]

কিন্তু দুঃখের কথা যতই দিন যাচ্ছে ভাদু-তুষুও পিছিয়ে পড়ছে ক্রমশঃ। যন্ত্র-সভ্যতার যুগে যন্ত্রের সংস্পর্শে এসে মানব-মানবীও হয়ে পড়েছে যন্ত্রবৎ। যুগান্তরের পুরানো উৎসব, প্রাচীন সংস্কৃতি, মানব মনের সুকুমার প্রবৃত্তি লুপ্ত হতে চলেছে দিনে দিনে। ভাদুপূজার সীমানা সংকুচিত হচ্ছে ক্রমশঃ; অদূর ভবিষ্যতে 'ভাদুগানের বই' বাজারে আর হয়তো পাওয়া যাবে না। ভাদুগানও শোনা যাবে না, দেখা যাবে না ভাদু। **'ভাদু' লেখক-লেখিকার কলমবন্দী হয়ে রয়ে যাবে পুস্তকের পাতায় পাতায় কিংবা ভাদু-গবেষকদের মনের আঙ্গিনায়।**

আরো স্পষ্ট কথায় বলতে গেলে বলতে হয় বিষ্ণুপুরবাসীগণ ভুলে গেছেন ভাদুকে। কিন্তু ভোলেননি ভাদুর মিষ্টিকে। তাই আজও ভাদ্রমাসের সংক্রান্তির দিন অর্থাৎ ভাদু-পূজার দিন শহরের মিষ্টির দোকানগুলিতে বিক্রি হয় ভাদুর-মিষ্টি।

হারিয়ে যাওয়া ভাদুর কথা ভাবতে ভাবতে আমরা হাজির হয়েছি বিষ্ণুপুরের মনোহর তলায়। সাধক মনোহর ঠাকুরের মহিমা-গাথায় মন মজাব এখন।

---

১. 'ভাদুগান এবং রাঢ়ের কৃষি ও কৃষক'—সুজিত চট্টোপাধ্যায়। স্মরণিকা, বিষ্ণুপুর মেলা, ১৯৯৩.

অধ্যায়-৮৬

মহাসাধক মনোহর ঠাকুর

মনোহরতলা

মল্লভূমের অধ্যাত্ম জগতের আর এক প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হলেন সিদ্ধ-সাধক মনোহর দাস। শোনা যায়, ইনি সোনামুখীর তন্তুবায় সমাজের এক সুসন্তান। বাল্যাবস্থায় ইনি তাঁত বুনতে বুনতে হরিনাম সংকীর্তন করতেন ভক্তিভাবে আপ্লুত হয়ে। উত্তরজীবনে ইনি নিত্যানন্দ শাখাভুক্ত জাহ্নবী দেবীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং ধর্মশাস্ত্রের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করেন। অবশ্য আর একটি মতে বলা হয়েছে, 'ইনি চৈতন্যের ভক্ত ও সুহৃদ রামানন্দ রায়ের ভাই বাণী পট্টনায়কের প্রপৌত্র।' সুতরাং দেখা যাচ্ছে ধোঁয়াশায় আচ্ছন্ন মনোহর দাসের জীবনী। এই ধোঁয়াশাকে দূরে হটিয়ে কি পাওয়া যায় দেখা যাক।

মহারাজ বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল (১৫৬৫-১৬২০ খৃষ্টাব্দ)। শ্রীনিবাস আচার্য আনীত 'বৈষ্ণব পুঁথি' লুণ্ঠনের মাধ্যমে মহারাজ হাম্বীর মল্ল মহাবৈষ্ণবে রূপান্তরিত হন। বীর হাম্বীরের পৃষ্ঠপোষকতায় মল্লরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মহান্তদের অস্থল, বৈরাগীদের আখড়া গড়ে ওঠে। বৈষ্ণবপুঁথি রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্যে রাজদরবারে গড়ে ওঠে গ্রন্থাগার। মনোহর দাস প্রথম জীবনে উক্ত গ্রন্থাগারের ভাণ্ডারী ছিলেন বলে কথিত আছে। ভাণ্ডারী থাকা কালে ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে তিনি বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। একাধারে ভক্তিভাব ও ধর্মশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বীর হাম্বীর তাঁকে রাজদরবারের সভাপণ্ডিতের সম্মানে ভূষিত করেন। খুব সম্ভব বিষ্ণুপুর রাজদরবারের গ্রন্থাগারের ভাণ্ডারী এবং রাজসভার সভাপণ্ডিত থাকাকালে ইনি বিষ্ণুপুর শহরের উত্তরে অবস্থিত গাঁতাতবাঁধ সন্নিকটস্থ গাবডোবা পল্লী লাগোয়া আবদলপাঠ গ্রামে ভজনকুঠি বানিয়ে সাধন-ভজন করতেন এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে হয়ে ওঠেন বাক্‌সিদ্ধ মহাপুরুষ। হজরত কুরবান বাবা বিষ্ণুপুর রাজসভায় যাতায়াত করতেন হামেশা। সেই সূত্রে দুই সাধকের পরিচয় ক্রমশঃ হয়ে ওঠে অন্তরঙ্গ। কথিত আছে, সাধক মনোহর দাস তাঁর ভজনকুঠি সংলগ্ন অনুচ্চ একটি মাটির ভগ্ন দেওয়ালের উপর বসে বসে স্বীয় ভক্তদের সাথে ধর্মচর্চা করছিলেন ভক্তি-বিগলিত কণ্ঠে। এমন সময় কুরবান বাবাকে একটি বাঘের পিঠে চড়ে আসতে দেখে ভক্তগণ মনোহর বাবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, এবং তাঁকেও কিছু একটা অলৌকিক দেখাতে বারংবার অনুরোধ করেন। ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করার অভিপ্রায়ে তিনি পরম-পূজ্য-অতিথি কুরবান বাবাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তাঁর কাছাকাছি এগিয়ে যাওয়ার সদিচ্ছায় উপবিষ্ট মাটির দেওয়ালে টোকা মারতে মারতে বলেন, 'এই দেওয়াল চল্, চল্, এগিয়ে চল্।' আশ্চর্যের বিষয় দেওয়ালটিও এগিয়ে যেতে থাকে মন্থর গতিতে। অতঃপর রতনে রতন চেনার পালা। কুরবান বাবা এবং মনোহর বাবা—এই দুই সিদ্ধ-সাধকের যোগ-বিভূতি সন্দর্শনে সমবেত ভক্তগণ তাঁদের নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকেন পুনঃপুনঃ। বিষ্ণুপুরের তন্তুবায় সমাজ মনোহর বাবার বিশেষ ভক্ত হয়ে পড়েন। পরবর্তীকালে ইনি ঈশ্বর-প্রেম তথা কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে রাজসভার সভাপণ্ডিতের পদ পরিত্যাগ করে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ান অস্থলে অস্থলে, আখড়ায় আখড়ায়। ছুটে যান শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল বৃন্দাবনধামে। বৃন্দাবন সমেত

ঐ অঞ্চলের তীর্থস্থান ও দেববিগ্রহ সমূহ দর্শন করে ফিরে আসেন সোনামুখীতে এবং সোনামুখীর শ্যামচাঁদ বিগ্রহের প্রেমডোরে বাঁধা পড়েন। সোনামুখীর তন্তুবায় সমাজ তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। মনোহর বাবার বহু অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত। শুনুন তবে দু'একটা।

একবার তাঁত-কাটা পোকার প্রাদুর্ভাব ঘটে। তাঁতীদের তাঁত কেটে দেয় প্রায়ই। হতাশ তাঁতীরা ছুটলেন মনোহর বাবার কাছে। নিবেদন করলেন তাঁদের সমস্যার কথা। সব শুনে মনোহর ঠাকুর বিধান দিয়েছিলেন—তাঁতের গাঁতার (একটি গাঁতাতে ১০/১৫ টি কাপড়ের টানা থাকে) প্রথম কাপড়ের এক টুকরো শ্যামচাঁদকে দিয়ে যাস, দেখিস আর পোকাতে কাটবে না কাপড়। তাঁতীরা ঠাকুরের বিধান মেনে নিয়েছিলেন এবং সাথে সাথে সমস্যারও সমাধান হয়েছিল।

আর একবার এক ছুতোর মিস্ত্রী এক দেবমন্দিরের নাটমন্দিরের ছাদের কড়িকাঠ কাটছিলেন। ভুলবশতঃ তিনি কাঠগুলি ছোট করে কেটে ফেলেছিলেন। নিজের ভুল এবং বিপদের কথা বুঝতে পেরে মালিকপক্ষের ভয়ে কান্নাকাটি করছিলেন। যাবার পথে মনোহর বাবা তাঁকে কাঁদতে দেখে তাঁর দুঃখের কথা জানতে চেয়েছিলেন। মিস্ত্রীর কথা শুনে তিনি শালকাঠের কড়িগুলিকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, 'তোরা তো জঙ্গলে বেড়ে যাস। এখানেও একটু বড় হয়ে যা।' **অবিশ্বাস্য হলেও সত্য ঘটনাটি হল কাঠগুলি বেড়ে গিয়েছিল যতটা প্রয়োজন ছিল ঠিক ততটাই।**

বাচ্চা ছেলেদের খুব ভাল বাসতেন মনোহর ঠাকুর। মাঝে মধ্যে ছেলেদের সাথে খেলাধূলা করতেও দেখা যেত তাঁকে। একদিনের কথা স্তূপাকৃতি বালি নিয়ে খেলায় মেতেছে ছেলেরা। মনোহর বাবা তাঁদের কাছে এলেন, বালির পাশে ধ্যানাসনে বসে পড়লেন। ছেলেমেয়েদের বললেন, 'তোরা আমাকে বালি দিয়ে ঢেকে দে, তারপর দেখবি কি মজা হয়।' ছেলেমেয়ের দল হৈ হৈ করে মহানন্দে মুহূর্তে বালি দিয়ে ঢেকে দেয় সাধকের আপাদমস্তক। ঐ সময় পথচারীগণ বাচ্চাকাচ্চাদের বেয়াদপি দেখে তাদের বকাবকি করেন এবং শশব্যস্তে ভেঙে ফেলেন বালির স্তূপ। কিন্তু কোথায় সেই সিদ্ধ-সাধক? হায়! হায়! করে কেঁদে ওঠেন সকলে। **লোকশ্রুতি বলে, 'এই ভাবেই স্বেচ্ছা-সমাধি নিয়েছিলেন সাধক ঠাকুর।'** ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দের পুণ্য শ্রীরামনবমী তিথিতে তাঁর তিরোধানের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে উক্ত তিথিযোগে বছরে বছরে শ্যামচাঁদ মন্দির প্রাঙ্গণে মহাধুমধাম সহকারে তিনদিন ব্যাপী উদ্‌যাপিত হয় মহোৎসব। বাউল মেলা এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ। ঈশ্বর-লাভের ব্যাকুলতায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ানোর সুবাদে আউলিয়া আখ্যায় ভূষিত 'দিনমণি চন্দ্রোদয়' গ্রন্থপ্রণেতা মনোহর দাস মল্লভূমের এক মহাসাধক। ইনি জন্মসূত্রে অথবা বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সুবাদে—যেভাবেই হোক না কেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সাধক রূপেও চিহ্নিত এবং প্রসিদ্ধ।

বিষ্ণুপুরের পশ্চিমে বর্তমানে যে স্থানটি চটিধার নামে চিহ্নিত সুদূর অতীতে ঐ স্থানটির নাম ছিল 'সোনামুখী বেড়া।' ঐ অঞ্চলে কতিপয় তন্তুবায় পরিবার বসবাস করতেন। এঁরাই ছিলেন মনোহর ঠাকুরের ভক্ত। তাই মনোহর ঠাকুরের অন্তর্ধানের পর তাঁর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাবশতঃ এঁরা সোনামুখী বেড়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল শালবনে মনোহর ঠাকুরের শ্রীমন্দির নির্মাণ করেন। পরবর্তীকালে তন্তুবায় পরিবারগুলি উঠে আসেন রঘুনাথ সায়র মহল্লাতে এবং উক্ত মহল্লাতে নির্মাণ করেন মনোহর ঠাকুরের এই শ্রীমন্দির।

স্থানটির নাম হয় মনোহরতলা। এইভাবে মনোহর ঠাকুরের দুটি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হয় বিষ্ণুপুরে। বর্তমানে শালবনের প্রাচীন মন্দির বা আদি মন্দির ও মন্দিরস্থ দেবপূজার তত্ত্বাবধান করেন রঘুনাথ সায়রের পাটরা তন্তুবায় সম্প্রদায় এবং মনোহরতলার এই মন্দির সংরক্ষণ, পূজা ও উৎসবাদি পরিচালনা করেন এই অঞ্চলের আশ্বিন তন্তুবায় সম্প্রদায়। উভয় মন্দিরেই গৌর নিতাই-এর শ্রীবিগ্রহ সহ মনোহর ঠাকুরের পাদুকা-পূজা হয় নিয়মিতভাবে। এখানে শ্রীরামনবমীর দিন থেকে 'চব্বিশ প্রহর' শুরু হয় এবং দশমীর দিন মহাসমারোহে মহোৎসব হয়। এছাড়া প্রতি সন্ধ্যায় হরিনাম সংকীর্তন হয়। পক্ষান্তরে শালবনের মনোহর মন্দির-প্রাঙ্গণে দ্বাদশীর দিন মহোৎসব সহ বাউলগানের আসর বসে। মনোহর ঠাকুরের কৃপায় দুরারোগ্য রোগ নিরাময়, নিঃসন্তানের সন্তান লাভ জাতীয় বহু অসাধ্য-সাধন হয়ে থাকে আজও। সিদ্ধ-সাধক মনোহর ঠাকুরের পাদপদ্মে প্রণাম জানাই ভক্তিঅর্ঘ্য দিয়ে।

অধ্যায়-৮৭

বড়কালীতলার 'বড়-মা'

সাধক মনোহর ঠাকুরের জীবনালেখ্য শ্রবণান্তে আমরা সমাগত হয়েছি বড়কালীতলার বড় মায়ের স্নেহাঙ্গনে। 'বড়-মা' মানে 'বড় কালী মাতা'। নাম থেকে সহজেই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ইনিই বিষ্ণুপুরের সমস্ত কালী ঠাকুরের মধ্যে বড়। হ্যাঁ; সত্যিই বড়। রূপোর জরি বসানো ডাকে সুসজ্জিতা হয়ে এলোকেশী মা যখন কার্তিক মাসে কালীপুজোর দিন স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন তখন মায়ের মুকুটের প্রান্তভাগ ছাদ ছুঁয়ে থাকলেও তিনি কিন্তু মাপজোখের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। শিব ঠাকুরের বুকে পা রেখে তাকিয়ে থাকেন সলজ্জ দৃষ্টিতে। আজানুলম্বিত ঘন কৃষ্ণ বর্ণের কেশরাশির মাঝে মেঘবরণ কাল কুচ্‌কুচে মা যেন সমাহিত শান্তির জীবন্ত প্রতিরূপ। শ্মশানকালীর ভয়ঙ্করী উগ্রমূর্তি পরিত্যাগ করে এখানে মা হয়েছেন করুণাঘন মাতৃমূর্তি। রঘুনাথসায়র, পাটরা পাড়া, মনোহরতলা প্রভৃতি অঞ্চলে মায়ের প্রভাব তুঙ্গে। ছোট ছোট দাবি দাওয়া থেকে শুরু করে বড় বড় কামনা-বাসনা, বিপদ-আপদ, মানসিক এবং পারিবারিক অশান্তি, অভাব, অনটন, রোগ, জ্বালা, যন্ত্রণা সব কিছুতেই স্থানীয় অধিবাসীরা মায়ের শরণাপন্ন। তিনি আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের মা। তিনি 'ছা'-এর মা, মায়ের মা, বাবার মা, ঠাকুমার মা, ঠাকুরদার মা—মানে সবার মা। তাই তো তিনি শুধু মা নন, হয়েছেন বড়মা, সবার বড়মা।

বড়মা তাঁর মৃন্ময় মূর্তিতে এই শ্রীমন্দিরে অবস্থান করেন একমাসেরও বেশি সময়। ঐ সময় মাতৃমন্দির ভক্তসমাগমে মুখরিত হয়ে ওঠে—বিশেষতঃ সন্ধ্যারতির সময়। সন্ধ্যার দিকে চলতে থাকে যাত্রাগান, পালাকীর্তন, রামায়ণ গান, বাউল গান কিংবা বসে জলসার আসর। এইভাবে দিনের পিঠে একটি করে দিন খরচ হতে হতে অতিক্রান্ত হয় একমাস। বেজে ওঠে বিসর্জনের ঢাক। নানান আড়ম্বর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শোভাযাত্রা সহকারে বিষ্ণুপুর শহর পরিক্রমা করে হৃদয়-বিদারী এক নিদারুণ অন্তিম লগ্নে মাকে সে বছরের মতো বিসর্জন দেওয়া হয় রঘুনাথসায়রের নীল জলে। মাকে জলাশয় করা হলেও মায়ের মূল কাঠামোর সম্মুখে ঘট স্থাপন করে বছরের অবশিষ্ট সময়ে প্রতিদিনই হয় সকাল সন্ধ্যা নিত্যপূজা। বংশানুক্রমে পূজা করে আসছেন হারাধন মুখোপাধ্যায়ের বংশধরগণ।

জনশ্রুতি বলে, মমতাময়ী এই বড়মা ওরফে বড় কালী আসলে কিন্তু **ডাকাত-কালী**। যেমন তেমন ডাকাত নয়, ডাকাতের মতো ডাকাত—মানে দুর্ধর্ষ ডাকাত। বড় কালীতলার পশ্চিমে রয়েছে রঘুনাথসায়র। সেই সায়রের উত্তরদিকে ভুঁইয়ার বাড়িতে থাকত এক ডাকাত। নাম তার রাম মল্ল। প্রথম জীবনে সে ছিল হনুমান ভক্ত এবং বীর হনুমানের কৃপাসিদ্ধ হয়ে হয়েছিল সর্বশক্তিমান। হনুমানের জপ-ধ্যান, পূজা-আচ্চা করতে করতে হনুমানের লেজের মতো দীর্ঘ না হলেও ছোট্ট একটা লেজ গজিয়েছিল তার। চেহারাটা ছিল দৈত্যের মতো, আর শরীরে বল ছিল অসুরের মতো। ভয় জিনিসটা ছিল অজানা। ডাকাতি করতে যেত রণ-পায়ে চড়ে। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই বিশ-ত্রিশ মাইল দূর থেকে ফিরে আসত লুটপাট করে। লুণ্ঠিত ধন-সম্পদ যেমন সোনা-দানা গহনা-গাঁটি, টাকাকড়ি প্রভৃতি কলসিতে ভরে পুঁতে রাখত মাটিতে, গাছের কোটরে কিংবা বিশাল এক মহীরুহের নীচে সাজানো ধর্মঠাকুর কিংবা ভৈরব ঠাকুরের ফাঁপা হাতি ঘোড়ার ভিতরে।

হাতের তালুতে একমুঠো সরষে পিষে তেল বের করতো অক্লেশে। সেই তেল মেখে স্নান করত পুকুরের জল ফাল ফাল করে। গাছের এক বিশাল ডালকে টান মেরে ধনুকের মত বাঁকিয়ে পাতা খাওয়াতো ছাগলকে। ডালটা ছেড়ে দিলে স্প্রিংয়ের মতো ছিটকে যেত সজোরে। গুড় খেত একবারে এক পায়া (মাটির হাঁড়ি)। গোটা আট দশ গুড়পায়া আষ্টেপৃষ্ঠে এবং দুই বাহুতে ঝুলিয়ে লুটপাট করে আনত অসমসাহসিক এই কুস্তিগীর। তার সাথে কুস্তি লড়তে সাহস করত না কেউই। বিশ পঁচিশ জনেও রুখতে পারত না তাকে। অলৌকিক শক্তির অধিকারী ছিল এই ডাকাত। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে **'গাছ-চালা বিদ্যা'** হয়েছিল করতলগত। নেহাত বেকায়দায় পড়লে এই বিদ্যার প্রয়োগ করে আত্মরক্ষা করত সে। **ঝুপ্ করে গাছে উঠে মন্ত্রশক্তিবলে বিশাল এক গাছকে স্থান থেকে স্থানান্তরে নিয়ে যেতে পারত।** শোনা যায়, বিষ্ণুপুর থেকে সোনামুখী যাবার মেটেপাথর স্টপেজে রাস্তার ধারে সকাল বেলাতে একটি বিশাল অশ্বত্থ গাছকে দেখে তৎকালীন স্থানীয় লোক তো অবাক। অবিশ্যি তাদের বুঝতে দেরি হয়নি যে একাজ ডাকাত রাম মলের। **রাম মল** মানে রাম মল্ল। শোনা যায় রাম মল্ল ছিলেন মল্লরাজ বংশের লোক। জাতিতে ক্ষত্রিয়। গলায় উপবীত। হলে কি হয়—পেশায় ডাকাত, অবিবাহিত কিন্তু টাকার নেশা—নেশা মানুষ মারার। চাকদহতে (বিষ্ণুপুরের উত্তরে অবস্থিত একটি গ্রাম) ডাকাতি করতে গিয়ে নিয়ে এল এক কালীমূর্তি। সেই থেকে বনে গেল কালীসাধক।

বড়কালীতলার মুখুজ্যে বংশের লোকেদের সাথে তার ছিল সুসম্পর্ক, মানে ভাব-ভালবাসার সম্পর্ক। শুনেছি মুখুজ্যে পরিবারের ঁহারাধন মুখুজ্যে এবং তাঁর সমবয়স্ক বন্ধুস্থানীয় লোকেদের সাথে তাস খেলত রাম মল এবং 'ফিস্ট্' করত একসাথে। 'ফিস্টের' মাংসের জন্য রণপায়ে চোঁ চোঁ দৌড় মেরে জলজ্যান্ত আস্ত ছাগল চুরি করে আনত নিমেষে। তারপর কোন এক অজ্ঞাত কারণে আজ থেকে আনুমানিক ১৫০/১৬০ বছর আগে মা কালীকে দিয়ে দেয় মুখুজ্যে বংশের ঁহারাধন মুখুজ্যেকে। সেই থেকে মুখুজ্যে পরিবারের একটি মন্দিরে ধুমধাম সহকারে শুরু হয় কালীপূজা। কালীপূজার আগে থেকেই হত ঐ মন্দিরে দুর্গাপূজা। এদিকে বড়কালীতলা মহল্লায় তখন উল্লেখ করার মতো কোন পূজার প্রচলন ছিল না। তাই স্থানীয় জনসাধারণের অনুরোধে এবং পীড়াপীড়িতে ঁহারাধন মুখুজ্যের পুত্র ঁবৈদ্যনাথ মুখুজ্যের সাথে স্থানীয় লোকের (১৮৭৭

খ্রীষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর, বাংলা ১২৮৪ সালের ১৭ই কার্তিক) চুক্তি সাপেক্ষে মা উঠে আসেন বড়কালীতলার তাম্বুলী ষোলআনার শিবমন্দির সংলগ্ন বৈঠকখানায় অর্থাৎ তাম্বুলী ষোলআনার সভাগৃহে। উক্ত বৈঠকখানা ঘরেই মায়ের পুজো হত প্রথম প্রথম। অতঃপর অপস্রিয়মাণ সময়ের কোলে লুটোপুটি খায় সমৃদ্ধি। মায়ের জন্য নির্মিত হয় সুউচ্চ পাকা মন্দির। সেই মন্দিরেই মা পূজিতা হয়ে আসছেন অদ্যাবধি। বর্তমানে পালাক্রমে এক বছর পুজো করেন শ্রীগৌতম মুখোপাধ্যয় ও শ্রীসোমনাথ মুখোপাধ্যায় এবং পরের বছর পুজো করেন শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়। ঠাকুরের সাজ-সজ্জা, উৎসব অনুষ্ঠান, পালাপার্বণ, মন্দির-সংস্কার ইত্যাদি করে থাকেন 'বড়কালীতলা পল্লী ষোলআনা উন্নয়ন সমিতি'। বড়কালীতলার বড়মা ছিলেন ডাকাত রাম মলের উপাস্য দেবী। তাই প্রথা অনুসারে আজও রাম মলের দূর সম্পর্কের আত্মীয় শ্রীনিত্যানন্দ রায়ের বাড়ি থেকে কালীপূজার দিন মায়ের জন্য সিধা আসে। এটি যেন মায়ের পুজোর একটা অপরিহার্য অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়।

মায়ের পুজো-পাঠের কথা শুনলেন। এবার শুনুন মা কালীর তত্ত্বকথা। সর্বশক্তিমান শিবের শক্তিডোরে বাঁধা পড়ে মা হয়েছেন শক্তিস্বরূপিণী আর সন্তান-সন্ততির ভক্তি-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে মা পেয়েছেন স্থিতি। শাস্ত্রে বলে, 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্', অর্থাৎ যা সুন্দর তা মঙ্গলময়, যা মঙ্গলময় তা সত্য। শিব হলেন সত্য-স্বরূপ। এই সত্যই শক্তির উৎস। শক্তিস্বরূপিণী মা কালীর শক্তির উৎস হলেন দেবাদিদেব মহাদেব। মা কালী সত্যস্বরূপ শিবের উপর দণ্ডায়মানা অর্থাৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিতা এবং সত্যে প্রতিষ্ঠিতা বলেই তিনি শক্তিস্বরূপিণী।

তত্ত্বকথায় ইতি টেনে এবার বলি মনের কথা। শ্মশান-কালী, তন্ত্রকালী ও ডাকাতকালী সাধারণতঃ হন উগ্রমূর্তি, ভয়ঙ্কর-দর্শনা। কিন্তু এখানে দেখি ডাকাতকালী হয়েও মা হয়েছেন শান্ত, সৌম্য, ধীর, স্থির। কিন্তু কেন? ভাবতে ভাবতে উত্তর এসে যায় হঠাৎ। রাম মল দিনের পর দিন হয়ে উঠেছিলেন অত্যন্ত নিষ্ঠুর এবং নৃশংস। তার নিষ্ঠুরতায় অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন সকলে। এমনকি তার পরমারাধ্যা দেবী মা কালীও বোধ করি হয়েছিলেন রুষ্ট। তাই তিনি প্রকারান্তরে সরে পড়লেন ধর্মপরায়ণ মুখুজ্যে পরিবারে। **এভাবেই 'কর্ণের কবচকুণ্ডল' হরণের মতই রাম মলের শক্তি হরণ হল।** ভিতরে ভিতরে হীনবল হয়ে পড়ে রাম মল। তথাপি তার মুখোমুখি হতে সাহস করত না কেউই। একদিনের কথা, কুটুমবাড়ি গিয়ে নিশুতি রাতে খোলা আকাশের নীচে অঘোরে ঘুমোচ্ছে রাম। এমন সময় তার অত্যাচারে নিপীড়িত শত্রুপক্ষীয় জনা দশ বারো লোক অতর্কিতে আক্রমণ করে নৃশংসভাবে হত্যা করে তাকে। ভয়ার্ত এবং অত্যাচারিত মানুষ তার মৃত্যু-সংবাদে হাফ ছেড়ে বাঁচে, শ্বাস ফেলে স্বস্তির—ফিরে আসে শান্তি। আর বড়-মাও বুঝি দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালন করে ডাকাত কালীর উগ্রমূর্তি ত্যাগ করে হয়ে ওঠেন শান্ত, সমাহিত। মূর্তিময়ী কল্যাণের জীবন্ত প্রতিমূর্তি হয়ে প্রতিভাত হন কালী কল্যাণেশ্বরী রূপে। আসুন, মাতৃবন্দনা করি অনুরাগের অর্ঘ্য দিয়ে—

(ওঁ) কালি কালি মহাকালি কালিকে পাপহারিণি।
ধর্ম্মকামপ্রদে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥

বড়মাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে আমরা এখন 'কথা-বলা-দেবী' দিদি ঠাকুরাণী মাতার কথা শুনব এবং দেখব সেই অদ্ভুত দেবীকে।

অধ্যায়-৮৮

শ্রীশ্রীদিদিঠাকুরাণী মাতা

রঘুনাথসায়র

গোস্বামী প্রভু শ্রীনিবাস আচার্য বিষ্ণুপুরকে বলেছেন, 'গুপ্তবৃন্দাবন'। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন। অর্থাৎ মনীষীদের অন্তর্দৃষ্টিতে বিষ্ণুপুর 'গুপ্তবৃন্দাবন'। শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বৃন্দাবনধামে যে সাধনৈশ্বর্য রয়েছে বিশেষভাবে প্রকটিত অবস্থায়, বিষ্ণুপুরে সেই ঐশ্বর্য মূলতঃ রয়েছে গুপ্তভাবে।

বিষ্ণুপুরের জলে ঈশ্বর, স্থলে ঈশ্বর, অন্তরীক্ষে ঈশ্বর, ঘরে ঈশ্বর, বাইরে ঈশ্বর, সর্বত্র ঈশ্বর। ঈশ্বরময় বিষ্ণুপুর—এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন বৈষ্ণব-সাধক শ্রীনিবাস আচার্য আর বিষ্ণুপুরে দেবীদর্শন করেছিলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ। শ্রীরামকৃষ্ণের সাথে কথা হত মা কালীর। বিষ্ণুপুরের দিদিঠাকুরাণীর সাথে কথা হয় ভক্তবৃন্দের। **'কথা বলা ঠাকুর'**—নামে বিশেষ পরিচিতি আছে দিদিঠাকুরাণীর। ঠাকুরের যেমন নাম, আচার-আচরণও তদনুরূপ। শিব, দুর্গা, কালী, কৃষ্ণ, বিষ্ণু, মনসা প্রভৃতি নামে অনেক দেবদেবী আছেন বিষ্ণুপুরে। কিন্তু দিদিঠাকুরাণী নামে একটিই মাত্র দেবী আছেন এখানে। বিষ্ণুপুরস্থ রঘুনাথ সায়রের পূর্বপাড়ের পাথর বাঁধানো স্নানঘাটের পূর্বদিকের বটবৃক্ষমূলে একটি ছাদ-মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা রয়েছেন বিষহরী দেবী এবং দিদিঠাকুরাণী মাতা।

বিষহর শব্দের অর্থ বিষনাশক। বিষহর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে হয় বিষহরী। বিষহরী বলতে বোঝায় মা মনসাকে। বিষহরী নামে চিহ্নিত মা মনসার চতুর্ভুজ দেবীমূর্তি রয়েছে এখানে এবং বিষহরী দেবীর দক্ষিণে রয়েছেন দিদিঠাকুরাণী।

কিন্তু কে এই দিদিঠাকুরণ? কি তাঁর স্বরূপ?

দিদিঠাকরুণ হলেন গ্রামদেবী। "দিদিঠাকরুণ বেশ প্রাচীন ও বহুমান্যা গ্রামদেবী হলেও তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি কলেরা, বসন্ত, হাম প্রভৃতি নিবারণকারিণী। এক সময় এই সমস্ত রোগ গ্রামীণ সমাজকে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। অজ্ঞ জনসাধারণ রোগের প্রতিকার করতে না পেরে দিদিঠাকরুণ নামক গ্রামদেবীকে রক্ষাকারিণী ভেবেছিল। সাধারণত গ্রামবৃদ্ধার দল সেকালে নানা রোগে ওষুধপত্র দিত, তুকতাক ঝাড়ফুঁক করত। তাগা তাবিজ মাদুলি পরাত। **এই বয়োবৃদ্ধারা সমাজে দিদিমা ঠাকুমার বয়সী বলেই এ দেবতার নাম দিদিঠাকরুণ হওয়া অসম্ভব নয়। দিদিঠাকরুণ আসলে মড়ক মহামারী কলেরা বসন্তের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। শীতলারই গ্রামীণ সংস্করণ। শীতলাও বুড়ি। তাঁর বৃদ্ধত্বের সঙ্গে তুলনা করেই এই দেবী দিদিঠাকরুণ নাম পেতে পারেন।"**[1]

বিষ্ণুপুরে কিন্তু দিদিঠাকরুণ নামে কোন দেবী ছিলেন না আগেভাগে। তাহলে তিনি এলেন কিভাবে?

অনুসন্ধানে জানা যায় যে আজ থেকে প্রায় ১৩৫-১৪০ বছর আগে কলেরার দাপট, রূপ নিয়েছিল মড়কের। মানুষ মরছিল কাতারে কাতারে। এদিকে এসে গেছে শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তি। এই তিথিযোগে মা মনসার তথা বিষহরী দেবীর ঝাঁপান উৎসব উদ্‌যাপিত হচ্ছে আড়ম্বর সহকারে। ঢাক বাজছে, ধুনো পুড়ছে, মায়ের সামনে ভরম

১. রাঢ়ের গ্রামদেবতা, ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা। পৃঃ—১৬৫-১৬৬

চালছেন রাজারাম দিয়াসী। হঠাৎ করে ঘটে যায় এক বিস্ময়কর ঘটনা। ভরম চালতে চালতে ভর আসে রাজারাম দিয়াসীর। ভরগ্রস্ত অবস্থায় বলতে থাকেন—'চল্, আমার সাথে চল্, ঢাক বাজিয়ে ধূপ-ধুনো নিয়ে চল্ আমার সাথে, চল্ বিড়াই নদীর ধারে।' তারপর টলতে টলতে আপন মনে উদ্‌ভ্রান্তের মতো চলতে থাকেন রাজারাম দিয়াসী। বাজনা-বাদ্যি নিয়ে অনুগামী হন আর সকলেই। চলতে চলতে অবশেষে তাঁরা এসে যান বিড়াই নদীর তীরে। পূর্বেই বলেছি তখন শ্রাবণ মাস। ভরা নদী, কানায় কানায় বান। হঠাৎ সেই বান ডাকা জলে ঝপাং করে ঝাঁপ দেন রাজারাম দিয়াসী। ঝাঁপ দিলেন তো জলে, কিন্তু জল থেকে উঠার আর নাম নেই। বয়ে যায় সময়। মিনিটে মিনিটে হয়ে যায় ঘণ্টা। তখনও রাজারাম জলের তলে তলিয়ে। 'তলিয়ে গেল, না স্রোতের টানে ভেসে গেল'—এসব ভাবনায় এবং অজানা আশঙ্কায় উৎকণ্ঠিত হয়ে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে অনুগামীদের। বিষণ্ণ-চিত্তে পিছু হাঁটতে উদ্যত সকলে। এমন সময় জল থেকে হুস্ করে উঠে আসেন রাজারাম এবং তাঁর হাতে দেখা যায় 'না-হাতি না ঘোড়া' আকৃতির খুবই ছোট্ট একটি টেরাকোটা আদলের প্রতীক-ঠাকুর। উক্ত ঠাকুরটিই দিদিঠাকরুণ বা দিদিঠাকুরাণী। দিদিঠাকুরাণীকে মাথায় করে নিয়ে এসে প্রতিষ্ঠা করা হয় পূর্বোক্ত বটবৃক্ষমূলে। তেরাস্তাব সংযোগস্থলে। পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে মন্দির এবং দিদিঠাকুরাণীর প্রাধান্য বশতঃই মা মনসা ওরফে বিষহরী দেবীর প্রাচীনত্ব সত্ত্বেও মন্দিরটির নামকরণ করা হয় দিদিঠাকুরাণীর নামে।

আজ থেকে প্রায় ১৩৫-১৪০ বছর আগে বিষ্ণুপুরের বিড়াই-নদীগর্ভ থেকে বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন দিদিঠাকুরাণী। কিন্তু কেন এলেন বিষ্ণুপুরে? কোথা থেকে এলেন? কিভাবে এলেন নদীগর্ভে?

'আমি বর্ধমান জেলার বোঁয়াই চণ্ডীগ্রাম সন্নিকটস্থ রামচন্দ্রপুর থেকে ঝড়ে উড়ে এসে বিষ্ণুপুরের বিড়াই নদীগর্ভের বালিদ্বীপের মধ্যে পড়ে রয়েছি। আমাকে নিয়ে গিয়ে তেমাথার মোড়ে স্থাপন করে পুজো কর। তোদের কল্যাণ হবে। মড়কের নিবৃত্তি হবে।' ভরপ্রাপ্ত অবস্থায় এরকম একটি দৈবনির্দেশ শুনতে পান রাজারাম দিয়াসী এবং কাজ করেন নির্দেশানুসারে।

বিংশ শতাব্দীর শেষে বিজ্ঞানের চূড়ান্ত সফলতার যুগে এসব কথা অবিশ্বাস্য এবং বানানো গল্প বলে মনে হতে পারে, কিন্তু মিথ্যে বলে উড়িয়ে দেওয়ার উপায় নেই আদপে। কারণ বস্তুজগতে বিজ্ঞানের যুক্তি খাটে, কিন্তু ভক্তি-বিশ্বাস এবং সূক্ষ্ম মননশীলতার ক্ষেত্রে, ভক্তের সাথে ভগবানের সহজ সরল সম্পর্কের ক্ষেত্রে, মনোজগতের মাধুর্য বিশ্লেষণে বিজ্ঞান আজও অসহায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বর্ধমান থেকে বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে এসেছেন দিদিঠাকরুণ। বর্ধমান জেলার রায়না থানার ছোটবৈনান গ্রামের গ্রামদেবী দিদিঠাকরুণ। ঐ "জেলার আরো কোনো কোনো গ্রামে দিদিঠাকরুণ প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়। বর্ধমান থানার ভিটা (বাসুদেবপুর), গলসী থানার আমড়া, মেমারী থানার সাতগাছিয়া, ভাতার থানার ভাতার, আউশগ্রাম থানার ছোটোরামচন্দ্রপুর, মন্তেশ্বর থানার শুশুনী ও আসানপুর এবং মঙ্গলকোট থানার পিলসোঁয়া প্রভৃতি গ্রামে দিদিঠাকরুণের যথেষ্ট নামডাক আছে।"[১]

১. রাঢ়ের গ্রামদেবতা, ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্যা, পৃঃ—১৬৫

এখন প্রশ্ন হল সুদূর বর্ধমান জেলার রামচন্দ্রপুর থেকে দিদিঠাকরুণ বিষ্ণুপুরে এলেন কিসের আকর্ষণে? নিশ্চয় স্থান-মাহাত্ম্য। নিঃসন্দেহে বলা যায় বিষ্ণুপুরের দিব্য-চেতনা, ঈশ্বর-সাধনা তথা ভগবৎ-প্রেমের দুর্বার আকর্ষণেই তিনি এসেছেন বিষ্ণুপুরে। এসেছেন এবং তাঁর মনোমত স্থান ও ভক্ত বেছে নিয়েছেন।

বিষ্ণুপুরের রঘুনাথসায়র মহল্লার বড়কালীতলা পল্লী নিবাসী ৺রাজারাম দিয়াসী, ৺সীতারাম দিয়াসী, ৺প্রেম কীত, ৺সীতারাম পাল প্রমুখ ব্যক্তিগণই ছিলেন দেবীর মনোনীত সেবক। অর্থাৎ দিদিঠাকুরাণী এঁদের পারিবারিক দেবী। এই চারটি পরিবারের সদস্যবর্গের সাথে দেবীর রয়েছে একান্ত ঘরোয়া সম্পর্ক। বেশ একটু হৃদয়-খোলা মাখামাখি ভাব। দেওয়া নেওয়া এবং চাওয়া পাওয়ার সহজ সরল সম্পর্ক। দেবী তাঁর প্রয়োজনীয় জিনিস-পত্র এঁদের কাছে চেয়ে নেন মাঝে মধ্যে। নিজের সখ-সাধ মিটিয়ে থাকেন। যেমন প্রতি পূর্ণিমা-তিথিতে বিশেষভাবে পূজা পাওয়ার বাসনাটি জানিয়ে দেন কথার ছলে। আবার ঝাঁপান দিনে ছাগবলি সহকারে খিচুড়ি ভোগের নিয়মও নাকি তাঁরই নির্দেশ।

ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তাদের স্নেহভাজন অভিভাবকদের কাছে যেমন এটা সেটা কিনে দেবার দাবি পেশ করে অকাতরে, অনুরূপভাবে দিদিঠাকুরাণীও এটা ওটা প্রায়ই চেয়ে বসেন তাঁর ভক্তবৃন্দের কাছে।

পূর্বোক্ত ৺সীতারাম পালের নাতনী শ্রীমতী ভারতী (পাল) দাসের কাছে স্বপ্নযোগে একবার তিনি কানের দুল চেয়ে বসেন। ভারতী দেবী তখন জানালেন, দিদিঠাকুরাণী তোমার তো কান নেই, দুল পরবে কোথায়? তথাপি গোঁ ছাড়েন না দিদিঠাকুরাণী। কানের দুল তাঁকে দিতেই হবে। অবুঝ শিশুর মতো আব্দার। ভারতীদেবী তখন তাঁর বাবা আশুতোষ পালকে জানালেন দিদিঠাকুরাণীর আব্দারের কথা এবং গড়িয়ে দিলেন কানের দুল।

ভাবলে অবাক হতে হয় যে দিদিঠাকুরাণী তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছার কথা আভাসে ইঙ্গিতে নয়, একেবারে সবাক মানুষের মতো কথা বলে এবং ক্ষেত্রবিশেষে স্বরূপে দেখা দিয়ে জানিয়ে দেন নির্দ্বিধায়। যেমন একটি ঘটনার কথা বলি—শ্রাবণ মাসের সংক্রান্তির দিন দিদিঠাকুরাণীর অঙ্গনে ঝাঁপান উৎসব উদ্‌যাপিত হয় পূজাপাঠ, খিচুড়ি ভোগ এবং ছাগবলির মাধ্যমে। এই উৎসব উপলক্ষ্যে কিছু কিছু ভক্ত তাঁদের মনোগত সংকল্প অনুসারে আগের দিন হবিষ্যি করে থাকেন শুদ্ধাচারে, পুজো করান, ধুনো পোড়ান এবং মানত শোধ করেন। বছর কুড়ি আগের কথা, শ্রাবণ সংক্রান্তির ঠিক আগের দিন বিষ্ণুপুর বড়কালীতলা নিবাসী শ্রীতুলসী রুদ্র মহাশয়ের পত্নী শ্রীমতী চণ্ডীবালা রুদ্র হবিষ্যি করে শুদ্ধাচারে আছেন সারাদিন। সন্ধ্যার সময় ক্লান্তি এবং আলস্য বশতঃ তিনি তাঁদের বাড়ির রাস্তার ধারের ঘরটিতে শুয়ে আছেন আলো-আঁধারি পরিবেশে। এমন সময় হঠাৎ করে কারো যেন পদশব্দে সচকিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'কে? কে ওখানে?'

'আমার চন্দন কাঠ নেই। আমাকে চন্দন কাঠ দিতে বলিস।'—কথাগুলি শুনে হতচকিত হয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখেন যে একটি বুড়ি মেয়ে যেন সরে গেল মুহূর্তে।

চণ্ডীবালার বুঝতে দেরি হল না ব্যাপারটা। তিনি তাঁর বাবার কাছে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারেন যে দিদিঠাকুরাণীর শ্বেতচন্দন কাঠ নেই অনেকদিন। পরের দিনই শ্বেতচন্দন এনে দেওয়া হয়েছিল ঠাকুরাণীকে। আর একবার হয়েছে কি পূর্বোক্ত চণ্ডীবালা

রুদ্র সন্তান প্রসবান্তে ডাঃ বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের নার্সিংহোমে (বিষ্ণুপুর থানার নিকট এই নার্সিংহোম ছিল) অবস্থান করছিলেন। চণ্ডীবালার মা মেয়ের জন্য নিয়ে এসেছিলেন দিদিঠাকুরাণীর প্রসাদ ও স্নানজল। প্রসবকালীন অশুচ অবস্থার জন্য প্রসাদ ও স্নানজল প্রত্যাখ্যান করেন চণ্ডীবালা এবং ঐ দিনই রাত্রির প্রথম প্রহরে তন্দ্রালু অবস্থায় শুনতে পান, 'তুই আমার প্রসাদ ও স্নানজল ফিরিয়ে দিলি।' শশব্যস্তে উঠে পড়েন চণ্ডীবালা। দেখেন কেউ কোথাও নেই। উপলব্ধি করেন, 'প্রসাদ প্রত্যাখ্যান করে দিদিঠাকুরাণীর চরণে অপরাধ হয়েছে তার।' পরের দিনই প্রসাদ ও স্নানজল গ্রহণ করে ভ্রম সংশোধন করেন সশ্রদ্ধ চিত্তে। শান্ত হয় অশান্ত মন। আবার দেখি তাঁদের একটি টেবিল ফ্যান্ চুরি গেলে চণ্ডীবালা দেবী অভিযোগ দাখিল্ করেন দিদিঠাকুরাণীর দরবারে। দিদিঠাকুরাণী জানিয়ে দেন, 'তোর ফ্যান্ তুই ফিরে পাবি।' সত্য সত্যই টেবিল ফ্যান্ ফিরে পেয়েছিলেন শ্রীমতী চণ্ডীবালা রুদ্র।

এসব দেওয়া নেওয়া বা চাওয়া পাওয়ার সম্পর্ক থেকে মনে হয় দিদিঠাকুরাণী যেন কোন ঠাকুর বা দেবী নন। তিনি যেন ভক্তপরিবারেরই এক বিশিষ্ট-সদস্যা। সুখ-দুঃখের দোসর এবং অভিভাবিকা। তাইতো তিনি দিদিঠাকরুণ। দিদিঠাকরুণের প্রতি ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধা বশতঃ শুধুমাত্র দিদিঠাকুরাণী বলতে বোধ হয় বাধে ভক্তদের। তাই তিনি হয়ে গেলেন দিদিঠাকুরাণী মাতা। দিনে দিনে তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়তে বাড়তে চার পরিবারের বন্ধন অতিক্রম করে এখন তিনি হয়ে গেছেন বিষ্ণুপুর রঘুনাথসায়র মহল্লার সকলেরই দিদিঠাকুরাণী। নিতান্তই এক পারিবারিক দেবী জনপ্রিয়তার গুণে আজ হয়েছেন পাড়া-পড়শীর সার্বজনীন দেবী। খুবই সংক্ষেপে শোনালাম দিদিঠাকুরাণীর কথা। এক্ষণে এই **'কথা বলা ঠাকুর'**-এর কাছে নিজের নিজের মনের কথা নিবেদন করে নিজেদের দাবি-দাওয়া পেশ করে সেই দাবি-দাওয়া পূরণের আর্জি রেখে **'কথা-বলা-দেবী'**র কথায় ইতি বসিয়ে শুরু করব মল্লভূমের **ইতু ও তুষু পূজার কথা।**

অধ্যায়-৮৯

ইতু ও তুষু পূজা

বিষ্ণুপুর পরিক্রমার এই পর্যায়ে বাঁকুড়া জেলার দুটি লোক-উৎসব তথা ব্রত-উৎসবের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি এবার। লোক-উৎসব দুটি হল ইতু পূজা ও তুষু পূজা।

ইতু পূজা হয় অগ্রহায়ণে, আর তুষু পূজা হয় পৌষে। মল্লভূমে প্রচলিত এই দুটি পূজার বিশেষ অর্থ এবং তাৎপর্য আছে। প্রথমে বলি ইতুর কথা। 'ইতু' এসেছে 'মিতু' থেকে, 'মিতু' এসেছে 'মিত্র' থেকে। আবার 'মিত্র' মানে সূর্য। কারণ ভিন্ন ভিন্ন রাশিতে অবস্থানকালে সূর্য ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। অগ্রহায়ণ মাসে সূর্য বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করেন। বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থানকারী অগ্রহায়ণের সূর্যের নাম 'মিত্র'। অগ্রহায়ণ মাসে হৈমন্তিক ফসল প্রদানের দ্বারা সূর্য সকল জীবকে রক্ষা করেন বলে সর্বজনের মিত্রত্বহেতু তিনি মিত্র এবং পূর্বেই বলেছি 'মিত্র' থেকে 'মিতু', 'মিতু' থেকে হয়েছে 'ইতু'। আবার দেখুন, 'ইতুবার' মানে রবিবার। সুতরাং ইতু মানে রবি আর ইতু-পূজা মানে সূর্য-পূজা।

একটি সুদৃশ্য মাটির খোলাতে মাঠের মাটি ভর্তি করে মান, ধান, কচু, কলমীলতা, হলুদ, আখ, শুষণি, সোনার টোপর, রূপার টোপর, জামাই-নাড়ু, শিবের জটা, কাজল-লতা প্রভৃতি বিচিত্র নামের লতা-গুল্ম এবং চারাগাছ রোপণ করে ফুলের মালা ধূপ-দীপ-সিঁদুর প্রভৃতি পুজোপকরণ এবং ফল-মিষ্টান্ন ও নবান্ন সহযোগে শঙ্খধ্বনি সহকারে নারায়ণ জ্ঞানে ইতু-অর্চনা করেন মহিলাগণ। **ইতুর রাসভারি নাম ইঁয়তি।** ইতু পূজার সময় মন্ত্রোচারণ করা হয়—

ইঁয়তি ইঁয়তি নারায়ণ,
তুমি ইঁয়তি ব্রাহ্মণ।
তোমার শিরে ঢালি জল,
অন্তিম কালে দিও ফল।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রতি রবিবারে ইহলোকে শস্যবৃদ্ধিকামনায় এবং পরলোকে মোক্ষ লাভের বাসনায় এই ইতু বা ইঁয়তি-আরাধনা। কার্তিক সংক্রান্তিতে ইতু পূজা শুরু এবং অগ্রহায়ণ সংক্রান্তিতে সমাপ্তি। ইতুকে নবান্ন ভোগ নিবেদনের পাশাপাশি অগ্রহায়ণ সংক্রান্তির সন্ধ্যারাত্রে দুধ-আঁসকে পিঠে দিয়া পূজা করা হয় এবং রাত্রি-প্রভাতে হয় ইতুর বিসর্জন। **ইতুর অভাব পুষিয়ে দিতে এসে যান তুষু।** জলে ভাসিয়ে দেওয়া ইতুর ফুল কুড়িয়ে নিয়ে ১লা পৌষ থেকে শুরু হয় তুষু পূজা। ইতু পূজা মূলতঃ সধবা-বিধবা বয়স্কাদের পূজা, পক্ষান্তরে তুষু প্রধানতঃ বালিকাদের পূজা হলেও ছোট ছোট বালকেরাও এই পূজার অংশীদার। ইতু পূজা হয় সকাল বেলা, তুষু পূজা হয় সন্ধ্যেবেলা। ইতু পূজায় ভক্তিরসের প্রাধান্য, তুষু পূজায় লোকগীতির প্রাবল্য। গানের আঁটসাঁট বাঁধনে বাঁধা থাকেন তুষু।

আমার **'ষাঁড়েশ্বর-মাহাত্ম্য'** গ্রন্থটির উদ্ধৃতি সহযোগে ক্ষেত্রবিশেষে অল্প স্বল্প পরিবর্তন করে এবং নতুন কিছু সংযোজন করে এখন আপনাদের শোনাব তুষু পূজার বাকি কথা।

একটি মাটির ঘটের মধ্যে নতুন ধানের তুষ ভর্তি করে গাঁদা, চন্দ্রমল্লিকা ইত্যাদি ফুল এবং ফুলের মালা দিয়ে সাজিয়ে, সিঁদুর পরিয়ে তৈরি করা হয় **'তুষু-খোলা'**। তারপর গ্রাম বাংলার ছোট ছোট মেয়েরা গোল হয়ে ঘিরে বসে ঐ তুষুটির চারপাশে। রাত্রির প্রথম প্রহরে খই বা ভুট্টার নাড়ু, মিঠাই ইত্যাদির নৈবেদ্য সাজিয়ে গানে গানে চলে তুষুপূজা। সারা পৌষ মাস ধরে চলতে থকে এই তুষু পূজা। সন্ধ্যার প্রাক্কালে তুষু পূজার প্রারম্ভে গাওয়া হয়—

উঠ উঠ উঠ তুষু, উঠ্ করাতে এসেছি
আমরা সবাই তোমার সখি, তুষু পুজতে বসেছি।

নিত্য সান্ধ্যপূজা ছাড়াও তুষুপূজারিণীরা ঘি-খিচুড়ি, তরিতরকারী ও পায়েস সহযোগে মধ্যাহ্নে অন্ততঃ একটি দিনও তুষু পূজা করে থাকে।

কিন্তু মকর সংক্রান্তির আগের দিন এই পূজা হয় 'ভেলা' সহযোগে। চৌকা আকৃতির একটি শোলার বেদি তৈরি করে তাতে বাঁশকাঠি পুঁতে সাদা ও রঙীন কাগজ সহযোগে এবং শোলায় কারুকার্য করে বিষ্ণুপুর শহরের শিল্পী-মালাকারগণ তৈরি করেন পাঁচচূড়া কিংবা ন'চূড়া মন্দির আকারের এক চিত্তাকর্ষক চৌদাল এবং সেটিই 'ভেলা' নামে পরিচিত।

তুষু পূজারিণীরা ঐসব ভেলা কিনে এনে ভেলার অভ্যন্তরভাগে কুল, লেবু, খেজুর ইত্যাদি ফল এবং মণ্ডা, মিঠাই, জিলাপি ঝুলিয়ে দেয় সুতোতে বেঁধে। ভেলার মধ্যস্থলে তেলের প্রদীপে ঘেরা একটি মাটির খোলার উপর বসিয়ে দেয় তুষুটিকে। সারা রাত ধরে চলতে থাকে গানে গানে তুষু পূজা।

রাত্রির প্রথম প্রহরের শেষে এবং দ্বিতীয় প্রহরের প্রারম্ভে তুষু পূজারিণীরা তুষুটিকে ভেলাতে চাপিয়ে পাড়া বেড়িয়ে নিয়ে আসে শোভাযাত্রার অনুকরণে, আর গাইতে থাকে গান—

তিরিশ দিন রাখলম মাকে তিরিশ সলতা দিয়ে গো,
আর রাখতে লাল্লম মাকে মকর আইচেন লিতে গো।
চাঁছি খাও মা, ছেনা খাও মা আনন্দে পেট ভরিয়ে,
কাল সকালে চলে যাবে দেশের লোককে কাঁদিয়ে।

এইভাবে রাত শেষ হতেই পৌষ সংক্রান্তির দিন ভোর থেকে শুরু করে এক প্রহর, দ্বি-প্রহর বেলা অবধি চলতে থাকে তুষু ভাসানোর পালা। তুষু পূজারিণীরা তুষু সহ ভেলা নিয়ে পথ চলতে চলতে গানে গানে ভরিয়ে দেয় ভুবন—

আমার তুষুর বিয়া দুব ইষ্টিশানের বাবুকে,
ওলো তুষু ভালই হবে চাপবি কত গাড়িতে।

আবার শোনা যায় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা মূলক গান—

আমার তুষু মুড়ি ভাজে চুড়ি ঝল্‌মল্‌ করে গো,
উয়ার তুষু মুড়ি ভাজে পোকা ল্যাড়্‌ব্যাড়্‌ করে গো।

অথবা আরও একটু পরিমার্জিত করে গাওয়া হয়—

আমার তুষু মুড়ি ভাজে, চুড়ি ঝল্‌মল্‌ করে গো
উয়ার তুষু হ্যাংলা মেয়ে, আঁচল পেতে মাগে গো।

তুষু গানে বৈচিত্র্য ফুটিয়ে তোলার জন্য গাওয়া হয় ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের গান—

এ চালে ধান, ও চালে ধান সকল খেল হাঁসে গো
আমার তুষু নাক বিঁধালো গ্যান্দা ফুলের বাসে গো।

এইভাবে গান গাইতে গাইতে তুষু সহ ভেলা ভাসিয়ে দেওয়া হয় নিকটস্থ জলাশয়ে কিংবা নদীতে। তখন তুষু সোহাগিনীরা গেয়ে ওঠে বিদায় সঙ্গীত—

বড় নদীর হড়হড়ানি, ছোট নদীর ফেনানি
আম কাঁঠালের বাগান দুব ছাওয়ায় ছাওয়ায় যেতে গো।
ভালই ভালই এসো মকর, তুষু রাখবে যতনে,
আমরা সবাই আনতে যাব পৌষ মাসের প্রথমে।

তুষু ভাসানোর সাথে সাথে শেষ হয় তুষু পূজা। এখন মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, এই তুষু কে? তুষু হলেন শস্য-সমৃদ্ধির দেবী—লক্ষ্মী স্বরূপিণী। অগ্রহায়ণ থেকে শুরু করে পৌষ মাস অবধি আমন ধান ঘরে তোলার পালা। ধানকে আমরা মা লক্ষ্মী জ্ঞানে পূজা করি। এ কারণে পৌষ মাসের লক্ষ্মী পূজায় নতুন ধান অপরিহার্য। নতুন ধানের তুষ থেকেই তৈরি হয় তুষু। এহেন তুষুকে পৌষ সংক্রান্তির ভেলায় চাপিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হয় জলাশয়ে এবং গান গাওয়া হয় 'মকর আইচেন লিতে গো।' এই 'মকর' শব্দটি একটি প্রতীক অর্থে ব্যবহৃত হয়। তখনকার দিনে গো-যান ছাড়া এত বহুল

পরিমাণে স্থলযানের ব্যবহার বা প্রচলন ছিল না। তাই নদীপথেই নৌকাযোগেই বাণিজ্য যাত্রা চলত দেশ থেকে দেশান্তরে। অগ্রহায়ণ-পৌষে যে শস্য তোলা হত ঘরে সেই শস্যই পৌষ-সংক্রান্তির পর থেকে বেচে দেওয়া হত পণ্য বস্তু হিসেবে। **অনেকেরই মতে 'তুষু ভাসান' হল কৃষি-লক্ষ্মীর বাণিজ্যযাত্রা।"**

নতুন ধানের তুষ থেকে তৈরী তুষু হলেন লক্ষ্মীস্বরূপা। পৌষ মাস লক্ষ্মী মাস। পৌষ মাসের প্রতি সন্ধ্যায় তুষু পূজার মাধ্যমে লক্ষ্মী পূজার সুরই অনুরণিত। এছাড়া পৌষ মাসে বাঙালীর ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজার প্রচলন প্রথাসিদ্ধ। আবার পৌষ সংক্রান্তির দিন তুষু বিসর্জনের পাশাপাশি ঘরে ঘরে লক্ষ্মী পূজার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। পৌষ সংক্রান্তির দিন সকালে এবং ১লা মাঘ বিকালে **'এখান-লক্ষ্মী'**র পূজার মাধ্যমে লক্ষ্মীকে ঘরে বেঁধে রাখার মানসিকতাই পরিস্ফুট। আয় খান = এখান। অর্থাৎ পৌষ মাসে শস্য ঘরে তুলে সেই শস্য সারা বছর ধরে বিক্রি করে, মানে আয় করে খান নিশ্চিন্তে। এছাড়া আরো লক্ষণীয় বিষয় হল মকর সংক্রান্তির পিঠে পরবে বাঁউড়ির দিন রাত্রিতে পিঠের নেচি, সবরকম পিঠে, পিঠের পুর, তরিতরকারী মাছ-ভাত সবকিছু নিয়ে নতুন খড় দিয়ে বাঁউড়ি বাঁধার নিয়মের মধ্যে এবং পৌষ সংক্রান্তির প্রত্যুষে তুলসী তলায় মকরের জল দিয়ে চাল-গুঁড়ি এবং পিঠেপুলির উপকরণে 'পৌষ-আগুলা'-র মাঙ্গলিক লোকাচারের মধ্যেও শস্য-সমৃদ্ধিকে ধরে রাখার ধর্মীয় প্রয়াসটিই সূচিত হয়।

ইতু ও তুষু পূজার বৃত্তান্ত শুনতে শুনতে আমরা এসে গেছি বিষ্ণুপুর শহরের পশ্চিম প্রান্তের চটিধার মহল্লায়। এখন অপরাহ্নকালীন চা পানের বিরতি। বিরতির পর আমরা ঢুকে পড়ব বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত **'সিল্ক খাদি সেবা মণ্ডল'** প্রতিষ্ঠানে এবং সেখানেই শোনাব বিষ্ণুপুরের বস্ত্রশিল্পের কথা।

অধ্যায় - ৯০

বিষ্ণুপুরের তন্তুবায় সমাজ ঃ সূতা, রেশম, বালুচরী ও স্বর্ণচরী বস্ত্রশিল্প

এই সেই **'সিল্ক খাদি সেবা মণ্ডল'** প্রতিষ্ঠান। ইচ্ছে করলে এখান থেকে আপনারা সূতা, খাদি, বল্কল, রেশম প্রভৃতির ড্রেস মেটিরিয়েল ছাড়াও বালুচরী, স্বর্ণচরী শাড়িও কিনে নিয়ে যেতে পারেন বিষ্ণুপুর ভ্রমণের স্মৃতি হিসেবে। এবার শুনুন মল্লভূম তথা বিষ্ণুপুরের তন্তুবায় সমাজ ও তন্তুবায় সমাজের বস্ত্র-শিল্পের কথা।

মানুষের বেঁচে থাকার জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান এবং চিকিৎসা অপরিহার্য। অন্নগতপ্রাণ মানব সমাজকে যুগ যুগ ধরে অন্ন যুগিয়েছে কৃষক সম্প্রদায়, লজ্জা নিবারণের বস্ত্র সরবরাহ্ করেছে তন্তুবায় সমাজ। উলঙ্গ, অসভ্য মানুষকে বস্ত্রাবৃত ও সুসভ্য করেছে তন্তুবায় জাতি, এনেছে সভ্যতার আদি আলোকবর্তিকা। এতাদৃশ তন্তুবায় জাতির উৎপত্তি বিষয়ে একটি বেশ উপভোগ্য গল্প প্রচলিত আছে। গল্পটি নিম্নরূপ—

একদা মা দুর্গা গেছেন স্নান করতে। পরনের একমাত্র বল্কলখানি ডাঙাতে খুলে রেখে নেমেছেন নদীতে। এমন সময় দুষ্ট এক ঝোড়ো বাতাস এসে উড়িয়ে নিয়ে যায় বাকলটি। বিবস্ত্রা-দেবী উঠতে পারেন না জল থেকে। দিন গড়িয়ে অস্বস্তিতে বয়ে যায় বেলা। ঘরে ফেরেননি পার্বতী। দুশ্চিন্তার বলিরেখা ফুটে ওঠে শিবঠাকুরের কপালে। শশব্যস্তে ডাকেন জ্যেষ্ঠপুত্র গণপতিকে। স্নান করতে গিয়ে তার মায়ের বাড়ি না ফেরার ঘটনাটাও

জানিয়ে দিলেন সংবাদ আকারে। মহাগণক গণপতি তৎক্ষণাৎ খড়ি পেতে গণনা করে মায়ের সমূহ বিপদের কথা জানিয়ে দেন পিতাকে। ব্যথিত শিবঠাকুর প্রতিকার বিধানার্থে সাথে সাথে স্বীয় অঙ্গ থেকে সৃষ্টি করলেন এক সুপুরুষ এবং স্বয়ং শিবের অংশজাত বলে পুরুষটির নাম রাখলেন শিবদাস। আর কুশ থেকে তৈরি করলেন এক রূপসী রমণী। কুশগাছ থেকে জন্ম হওয়ার সুবাদে রমণীটির নাম রাখলেন কুশবতী। অতঃপর শিবদাসের সাথে কুশবতীর বিবাহ দিলেন। কৃতজ্ঞচিত্তে আনত মস্তকে শিবদাস দেবাদিদেবকে সবিনয়ে বললেন, 'প্রভু, আদেশ করুন আমায় কি করতে হবে?'

মহাদেব বললেন, 'তোমরা দুজনে মিলে একখানা বস্ত্র তৈরি কর এক্ষুণি। এই বলে মহেশ্বর শিবদাসকে তাঁত তৈরির যন্ত্রপাতি দিয়ে তাঁতবোনার কলা-কৌশলও শিখিয়ে দেন তৎক্ষণাৎ। অতঃপর পদ্ম-মৃণালের তন্তু থেকে মিহি সুতো কাটেন কুশবতী এবং তন্তুজাত সুতো দিয়ে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রয়াসে উৎপন্ন হয় বাতাসের মতো ফুর্‌ফুরে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বস্ত্রখণ্ড। অবশেষে সেই বস্ত্র পরিধানান্তে লজ্জা নিবারণ করে কাঁপতে কাঁপতে জল থেকে উঠে আসেন উমা। শিব-দুর্গার কৃপাধন্য শিবদাস এবং কুশবতীই হলেন রাঢ়ীয় তন্তুবায় বা মল্লভূমের তন্তুবায় জাতির আদি পিতা-মাতা।

মৌর্য-শুঙ্গ যুগেও বস্ত্রের নিদারুণ অভাব ছিল বলে মনে হয়। কারণ মৌর্য-শুঙ্গ যুগের প্রস্তরমূর্তি এবং টেরাকোটা মূর্তিগুলি বর্ণাঢ্য অলংকারে শোভিত থাকলেও সেগুলি হল নগ্নমূর্তি। আজ থেকে ৬০/৭০ বছর পূর্বেও বঙ্গদেশ তথা ভারতে অন্ন-বস্ত্রের অভাব ছিল অভাবনীয়। অন্ন-বস্ত্রের অভাবনীয় অভাবকে কেন্দ্র করে বেশ মুখরোচক একটি গল্প মুখে মুখে প্রচলিত আছে মল্লরাজ্যে। কথিত আছে, পুরাকালে কমলা দেবীর কৃপায় ধানগাছে ধানের পরিবর্তে চাল ফলত পর্যাপ্ত পরিমাণে। অভাব ছিল না অন্নের। আর ধবলা দেবীর কৃপাতে নাকি কাপাস গাছে উৎপন্ন হত বহুল পরিমাণে বস্ত্র। এই প্রাচুর্যের জন্য অন্ন-বস্ত্রের অনাদর এবং অপব্যবহার করতে শুরু করে মনুষ্য-সমাজ। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ঘটল এক অঘটন।

একদিন কমলা এবং ধবলা দেবী আকাশমার্গে বিচরণকালে দেখলেন এক ব্যক্তি চালগাছ থেকে চালের শিষ তুলে নিয়ে সেটি চিবোতে চিবোতে বিষ্ঠা ত্যাগ করছে। ব্যথিত এবং রুষ্ট হলেন ঐশ্বর্যের দেবী কমলা। অভিশাপ দিলেন—আজ থেকে চালগাছে চালের পরিবর্তে ফলবে খোসাযুক্ত ধান। সেই ধান থেকে চাল তৈরি করতে অনেক বেগ পেতে হবে মানুষকে। কষ্টার্জিত দ্রব্যের মর্ম বুঝবে মানুষ। আরও একটু এগিয়ে যেতেই ধবলা দেবী দেখেন তাঁর দেওয়া বস্ত্ররাশি পথে-ঘাটে যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। সেই কাপড়-চোপড় পায়ে মাড়িয়ে যাতায়াত করছে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। ক্ষুব্ধ হলেন ধবলা। বললেন, 'আজ থেকে কাপাস গাছে সরাসরি বস্ত্রের পরিবর্তে তৈরি হবে তুলা। সেই তুলা থেকে বীজ ছাড়িয়ে সুতা কেটে তাঁত বুনে যথেষ্ট পরিশ্রম করে তৈরি করতে হবে বস্ত্র। কষ্টার্জিত কাপড়ের কদর করতে শিখবে শ্রমবিমুখ মানুষ।'

বাক্‌সিদ্ধা দেবীদ্বয়ের বাক্য তথা অভিশাপ সত্য হল বর্ণে বর্ণে। চালগাছ হয়ে গেল ধানগাছ, কাপাস গাছে ধরলো তুলা। সুখে খেতে ভুতে কিলোয়। মানুষের হল মহা- বিপদ। অন্নবস্ত্রের অভাব দেখা দিল ঘরে ঘরে। যুগে যুগে অন্নবস্ত্রের অভাবের কথা কারো অবিদিত নয়। ১১৭৬-এর মন্বন্তর (ইং ১৭৭০ খ্রীঃ) এবং ১৯৬০-৭০ খ্রীষ্টাব্দের তীব্র খাদ্যাভাবের কথা লেখা আছে ইতিহাসের পাতায় পাতায়। বস্ত্রের অপ্রতুলতার কথা বলতে গিয়ে

গবেষক মাণিকলাল সিংহ মহাশয় লিখেছেন—

"প্রাচীন এবং মধ্যযুগে বস্ত্রের স্বল্পতা খুব বেশি ছিল। এই স্বল্পতার মূলেই উপরোক্ত কাহিনীটি গড়িয়া উঠিয়া থাকিবে। রাঢ়-বঙ্গেও সাধারণ নরনারীর ক্ষেত্রে বস্ত্রের অভাব অত্যন্ত বেশি ছিল। মাত্র একশত বৎসর পূর্বে রাঢ়বঙ্গের পুরুষেরা কাচা (মোটা এবং খাটো ধুতি) আর মেয়েরা লইয়া (মোটা শাড়ি) পরিত। ছোট ছোট বালক-বালিকারা অধিকাংশই নগ্ন থাকিত, অবস্থাপন্ন ঘরের বালক-বালিকারা কানি (গামছার টুকরো) পরিত। শীত নিবারণের জন্য পাটের পাছড়া, গিলাপ এবং দোলাই ব্যবহৃত হইত। ধনীরা বালাপোষ (তুলাভরা জ্যাকেট) পরিধান করিতেন।

কাপড়ের অভাব দূর করার জন্য প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়ির মেয়েদের সংসারের যাবতীয় কাজ সারার পর চরখায় আধ-পুয়া হিসাবে সূতা কাটিতে হইত। পরিবারের বধূদের মধ্যে কেহ না পারিলে নিন্দিতা এবং লাঞ্ছিতা হইতেন।"[১]

কথিত আছে মল্লরাজ্যের এই নিদারুণ বস্ত্রাভাব দূর করার অভিপ্রায়ে মল্লরাজারা মুর্শিদাবাদ থেকে কয়েকটি পাটরা তন্তুবায় পরিবারকে আনয়ন করে বিষ্ণুপুর এবং সোনামুখীতে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। বর্তমানে হুগলী জেলার অন্তর্গত গড়-মান্দারণের শূর রাজ-পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভের আশায় দূরাগত তন্তুবায় শিল্পীগণও মান্দারণে বসতি স্থাপন করেন। পরবর্তীকালে মান্দারণের তন্তুবায় সমাজ বিষ্ণুপুরে এসে বসবাস শুরু করেন। মান্দারণ থেকে উঠে আসার সুবাদে তাঁরা 'মান্দারণ্যা তাঁতি' বলে পরিচিত হন। মান্দারণ্যা শব্দটি বিকৃত হয়ে হয়েছে মান্দার। মান্দার তাঁতিগণ তসর ও রেশমের কাপড় বোনার কাজে খুবই পটু। অনুরূপভাবে পাটরা, পাটনি, পাটরাঙা থাকের তন্তুবায়গণ রং করার কাজে বিশেষ পারদর্শী। গাছ-গাছড়ার ছাল, লতাপাতা, ফুল-ফলের নির্যাস থেকে নানা রং তৈরি হত। যেমন লাক্ষারস থেকে লাল রং, কৃষিজাত নীল থেকে নীল রং এবং দুই বা ততোধিক রঙের সংমিশ্রণে সবুজ, বেগুনী, চকোলেট, খয়েরী, গোলাপী প্রভৃতি রং তৈরি হত। রঙকে পাকা করবার উদ্দেশ্যে তেঁতুল, আকন্দ, কলা, শাল প্রভৃতি গাছের ক্ষার বা অম্ল এবং লবনও ব্যবহৃত হত প্রয়োজনমত মাত্রায়। পাট রং করার কাজে বিশেষ পারদর্শী তন্তুবায়গণ—'পাটরাঙা' পদবী প্রাপ্ত হন।

কাপড় বোনার বুদ্ধি কিভাবে মানুষের মাথায় এল এ সম্পর্কে আরো দু-চার কথা না বললে আলোচনা হয়ে যায় অসম্পূর্ণ। রাঢ়বঙ্গের সাপ খেলানো বা সর্পবিদ্যার মন্ত্রগুলিতে শোনা যায়—

দুগ্গা কাটিয়াছেন সরু সুতা
মহাদেব বুনিয়াছেন জাল।

কৈবর্ত (জেলে) জাতির মানুষজনেরা মাছ ধরার জন্য শণ বা পাটের তন্তু পাকিয়ে সূতা প্রস্তুত করে জাল বুনেন প্রথমে। পরবর্তীকালে ঐ জালের বুননকে আরো ঘন করে কাপড় তৈরির চিন্তাধারা দানা বাঁধে মানুষের মস্তিষ্কে এবং জাল থেকে জন্ম হয় বস্ত্রের। পূর্বেই বলেছি তন্তুবায় জাতির আদি পুরুষ এবং নারী—শিবদাস ও কুশবতী পদ্মের মৃণাল-তন্তু দিয়ে প্রথম বস্ত্র তৈরি করে লজ্জা নিবারণ করেছিল মা দুর্গার। সেই থেকে পদ্মের মৃণাল-তন্তু-জাত ছোট কাপড় দেওয়া হত দেবী-পূজাতে। প্রায় একশ বছর আগেও

১. রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি, (৩য় খণ্ড) পৃঃ—২

প্রচলিত ছিল এ প্রথা।

শিবঠাকুরের দেহোদ্ভূত তন্তুবায় জাতির শিব-দুর্গার প্রতি আনুগত্য অপরিসীম। এক একটি তসর গুটির এক এক খি সূতা নিয়ে একাধিক তসরের একাধিক সূতাকে একসাথে পাকিয়ে তৈরি করা হয় বুননযোগ্য সূতা। আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ ঐ সূতার খিগুলিকে শিব এবং দুর্গা নামে অভিহিত করে আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন তন্তুবায় সমাজ। ঐ সূতা দিয়ে তৈরি হয় তসরের বস্ত্র। শিব-দুর্গার নামাঙ্কিত উপাদানে উৎপন্ন হওয়ার সুবাদে তসর বা পট্টবস্ত্র চিরপবিত্র। এজন্যই অন্নপ্রাশনের শিশুর বস্ত্রখণ্ড, বিবাহ বাসরের বর-কনের ধুতি-চাদর ও শাড়ি, যাগ-যজ্ঞ এবং পূজাদি যে কোন ধর্মীয় মাঙ্গলিক ক্রিয়াকলাপে যজমান এবং পুরোহিতের ক্ষেত্রে পট্টবস্ত্রের ব্যবহার প্রায় প্রথাসিদ্ধ।

কাপড় বোনার জন্য সূতা কাটা তন্তুবায় জাতির মহিলাগণের একটি ঐতিহ্যবাহী চিরাচরিত প্রথা। স্বদেশী আন্দোলনের সময় কলে বোনা বিদেশী বস্ত্র পরিহার করার আহ্বান জানিয়ে দেশবাসীকে উৎসাহিত করার অভিমানসে জাতির জনক গান্ধীজী সহ জওহরলাল নেহরু প্রমুখ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ চরকায় সূতা কাটার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তার ফলে জাতিধর্ম নির্বিশেষে আপামর ভারতবাসীগণের মধ্যে চরকায় সূতা কেটে তাঁত বুনে স্বদেশী কাঁপড় উৎপাদনের পাশাপাশি দেশপ্রেমের বাঁধভাঙা জোয়ার এসেছিল ভারত জুড়ে। এতদ্ব্যতীত তসর, রেশম ও সূতার বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে তন্তুবায় সমাজ স্থানীয় রাজন্যবর্গ, সামন্ত এবং জমিদার পর্যায়ের বিত্তবান মানুষজনের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। ফলে বঙ্গদেশের এক একটি অঞ্চলে তন্তুবায় জাতির জনবসতি গড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে মল্লরাজাদের আনুকূল্যে মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে তাঁতজাত বস্ত্রাদি উৎপাদনে এক সুদূরপ্রসারী সমৃদ্ধি পরিলক্ষিত হয়।

সূতীবয়নের ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, পাত্রসায়ের, বাঁকুড়া শহরের গোপীনাথপুর, রাজগ্রাম, জয়পুর, মদনমোহনপুর, পাঁচমুড়া, কেঞ্জাকুড়া, রায়পুর, ভালুকবাসা, রাঙামাটি প্রভৃতি রয়েছে পুরোভাগে। সূতীজাত দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে শাড়ি, সার্টিং (জামার ছিট), কাচা ধুতি, লুঙ্গি, গামছা, তোয়ালে, বেড্‌শীট, বেড্‌কভার, দরজা জানালার পর্দা, চাদর, লেডিস স্কার্ফ ইত্যাদি। উপরোক্ত দ্রব্যগুলির মধ্যে আবার গামছা, বেড্‌শীট, বেড্‌কভার, চাদর এবং লেডিস্ স্কার্ফ-এর সমাদর সর্বত্র।

এবার বলি রেশম বা সিল্ক-জাত বস্ত্রসম্ভারের কথা। ইংরাজী Silk শব্দটির অভিধানগত অর্থ রেশম বা তসর। গুণমান এবং উপাদানগত মানদণ্ডে রেশম চার রকমের। যেমন মুগা সিল্ক, মালবারী সিল্ক, তসর সিল্ক এবং এণ্ডি সিল্ক। রেশম গুটি থেকে মালবারী সিল্ক উৎপন্ন হয়, পক্ষান্তরে তসর গুটি থেকে তসর সিল্ক পাওয়া যায়। মুগা গুটি থেকে পাওয়া যায় মুগা সিল্ক। মুগা সর্বাপেক্ষা দামী, এজন্য তুলনামূলকভাবে স্বল্প দামের মালবারী সিল্কের বহুল ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। এরি (Eri) গুটি থেকে এণ্ডি সিল্ক উৎপন্ন হয়।

এছাড়া মটকা, কেটিয়া (কেটে), বাপ্তা, সাপ্তা, বল্কল, তাপ্তা নামে চিহ্নিত উপাদানের বস্ত্র সম্ভারও সমৃদ্ধ করেছে বিষ্ণুপুরের তাঁত শিল্পকে। রেশমগুটি কেটে পোকা বেরিয়ে যাওয়া কাটা রেশমগুটি থেকে উৎপাদিত রেশম সূতাকে মটকা বলে। অনুরূপভাবে তসরগুটি থেকে তসরপোকা পালিয়ে গেলে সছিদ্র তসরগুটি থেকে উৎপাদিত তসরসূতাকে কেটিয়া বা কেটে বলে। আবার টানা—তসরের এবং ভরণা বা পোড়েন—

সূতা (খাদি সূতা)র হলে উৎপাদিত বস্ত্র খণ্ডটি হয় বাপ্তা, পক্ষান্তরে রেশমের টানা এবং ভরণা বা পোড়েন যদি সূতার হয় তাহলে সেটির নাম হয় সাপ্তা। বক্কল হল তসরগুটি সমূহের বোঁটাগুলিকে সিদ্ধ করে বিশেষ পদ্ধতিতে উৎপাদিত সূতা। মুগা এবং সূতার সংমিশ্রণে উৎপাদিত বস্ত্রের নাম হয় তাপ্তা।

বাপ্তা, সাপ্তা, তাপ্তা, বক্কল, কেটিয়া (কেটে), মটকা থেকে প্রধানতঃ 'ড্রেস মেটিরিয়েল' এবং সার্টিং এর কাপড় তৈরি হয়। অবশ্য কেটের চাদরের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখা দরকার, সেটি হল খাদি—মানে হাতে কাটা সূতা বা রেশম; এবং খাদি বস্ত্র মানে হাতে কাটা সূতা বা রেশম থেকে হস্ত চালিত তাঁতে উৎপাদিত তাঁতবস্ত্র।

মল্লরাজ্যে উন্নতমানের অভিনব রেশম-শাড়ি উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুর শহরের কাদাকুলি, মনসাতলা মহল্লার **বিষ্ণুচরণ** দে (১২৮১-১৩৩৮ বঙ্গাব্দ) মহাশয়ের অবদান অসামান্য। প্রখ্যাত বয়নশিল্পী শ্রীনাথ চন্দ্র দে-র সুযোগ্য পুত্র বিষ্ণুবাবুই প্রথম স্বীয় উদ্ভাবনী শক্তিতে তাঁতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির পরিবর্তন এবং পরিবর্ধন করে 'সুপারি টানা' তাঁতের প্রচলন করে রেশম বস্ত্রের আঁচলে নানান ধরনের নক্সা—যেমন লতাপাতা, ফুল, কল্কা, হাতিঘোড়া, হরিণ, ময়ূর জাতীয় পশুপাখি এবং জলচর প্রাণী প্রভৃতির নিখুঁত বুননে এবং রঙের বর্ণাঢ্য বাহারে রেশম-শাড়ি-শিল্পের ক্ষেত্রে অভাবনীয় পরিবর্তন আনেন। বিষ্ণুবাবুর তৈরি বিষ্ণুপুরী-শাড়ি শুধু অবিভক্ত বাংলা নয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যেও প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। **দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পাইকার ব্যবসায়ীগণ বিষ্ণুপুরে এসে নিয়ে যেতেন আনারকলি, ধূপছায়া, চন্দ্রলেখা, চন্দ্রহার, ফুলম্, পারিজাত, পথে হল দেরি প্রভৃতি নামাঙ্কিত শাড়ি।**

সর্বভারতীয় স্তরের বস্ত্র-প্রতিযোগিতায় বহু মানপত্র এবং রৌপ্যপদক প্রাপ্ত এই শিল্পীর উত্তরসূরী কৃষ্ণগঞ্জ গড়গড়ান সংলগ্ন পাটরাঙা লেন মহল্লার অক্ষয় কুমার দাস (১২৯৮-১৩৮৫ বঙ্গাব্দ) দিগ্বিজয়ী বালুচরী শাড়ির পুনর্জন্মদাতা হিসেবে এক ভাস্বর ব্যক্তিত্ব।

'মন্দির-নগরী' বিষ্ণুপুর একদিকে যেমন তার স্থাপত্য শিল্পের জন্য সুপ্রসিদ্ধ অপরদিকে তেমনি সুবিদিত তার বালুচরী বস্ত্রশিল্পের জন্য। তথাপি সত্যের খাতিরে অবশ্যই বলতে হয় যে এই রমণীরঞ্জন মহার্ঘ বালুচরী শাড়ির জন্ম কিন্তু বিষ্ণুপুরে নয়। জন্ম হ'ল মুর্শিদাবাদ জেলার জিয়াগঞ্জ সন্নিকটস্থ অধুনা বিলুপ্ত **বালুচর** গ্রামে। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের কথা, ঢাকা থেকে মুখসুদাবাদে রাজধানী তুলে আনেন নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ। নবাবের নামানুসারে জায়গাটির নাম হল মুখসুদাবাদের পরিবর্তে মুর্শিদাবাদ। মুর্শিদাবাদের নিকটে গঙ্গাতীরে ছিল নিরালা গ্রাম বালুচর। বালুচর আজ গঙ্গাগর্ভে লীন হয়ে গেছে, কিন্তু রয়ে গেছে বালুচরী।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কোন এক অজ্ঞাত কারণে বেনারস থেকে কতিপয় সুদক্ষ তন্তুবায় বস্ত্রশিল্পী চলে আসেন বাংলার বালুচর গ্রামে এবং বাসা বাঁধেন স্থায়ীভাবে। অবশ্য কারো কারো মতে ঔরঙ্গজেবের অমানুষিক অত্যাচারে নিপীড়িত হয়ে বালুচরী শিল্পীরা ছড়িয়ে পড়েছিলেন ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে। এমনই একদল শিল্পী এসেছিলেন বালুচর গ্রামে। ঐ নবাগত তন্তুবায় গোষ্ঠী তসর বস্ত্রে চিত্তাকর্ষক দৃষ্টিনন্দন কারুকার্য করতে পারতেন অবলীলাক্রমে।

মুর্শিদকুলী খাঁ মুর্শিদাবাদে রাজধানী স্থাপনের অব্যবহিত পরেই জানতে পারেন ঐসব

তন্তুবায় শিল্পীদের কথা। তৎকালে জনপ্রিয় শাড়ি বলতে বোঝাত 'ঢাকাই মসলিন' ও 'জামদানি' শাড়িকে। নবাব বাহাদুর কিন্তু ঐসব তন্তুবায়দের 'ঢাকাই মসলিন' ও 'জামদানি'র পরিবর্তে নতুন ধরনের শাড়ি তৈরি করতে নির্দেশ দেন। নবাবের নির্দেশে এবং পৃষ্ঠপোষকতায় অন্দরমহলের বেগমসাহেবাদের জন্য তৈরি হল নয়নাভিরাম নতুন শাড়ি। খুশি হলেন স্বয়ং নবাব, খুশি হলেন পর্দানশীন বেগমসাহেবারাও। বালুচর গ্রামে জাত—এই সুবাদেই ঐ বাহারি শাড়ির নাম হয় বালুচরী।

নিঃশব্দ-ক্ষুরধার-স্রোতে বয়ে যায় সময়। নবাবী আমলের অবসানের সাথে সাথে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে সাময়িকভাবে অবলুপ্ত হয় বালুচরী শিল্প কিংবা সুপ্ত অবস্থায় লুপ্ত থাকে বালুচরী। অতঃপর বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকে মল্লরাজ্য বিষ্ণুপুরে পুনরায় স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করে বালুচরী। বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকে বালুচরী শিল্পের পুনর্জাগরণ ঘটলেও বালুচরী শিল্পীরা ঠিক কবে যে বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন সেকথা সঠিক করে বলা যায় না। তবে মনে হয় বালুচর গ্রাম নদীগর্ভে ডুবে যাওয়ার অব্যবহিত পরই বালুচরী শিল্পীরা চলে আসেন বিষ্ণুপুরে। এছাড়া বালুচরী শিল্পীদের বিষ্ণুপুরে আগমনের আর একটি যুক্তিভিত্তিক কারণ হল নবাবী আমলে বালুচরী শিল্পীদের উপর অকথ্য অত্যাচার। স্বীয় পরিবারের বেগমসাহেবাদের জন্য প্রয়োজনীয় শাড়ি তৈরি করিয়ে নেওয়ার পর নবাবের নির্দেশে শিল্পীর ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল কেটে দেওয়া হত যাতে করে সে অন্যত্র গিয়ে এ ধরনের শাড়ি আর তৈরি করতে না পারে। ইংরেজ রাজত্বকালেও কলে বোনা বস্ত্র ভারতে বিক্রী করার উদ্দেশ্যে তন্তুবায় শিল্পীদের বুড়ো আঙ্গুল কেটে দেওয়া হত।

বিষ্ণুপুরে বালুচরী বস্ত্র বোনা শুরু হয় অক্ষয় কুমার দাস (পাটরাঙা) মহাশয়ের উদ্ভাবনী শক্তিতে। বছর পঞ্চাশ আগের কথা। অক্ষয়বাবু বিষ্ণুপুর মহকুমার সোনামুখী শহরে গেছেন মনোহর ঠাকুরের মেলা দেখতে। সেখানে জনতার ভিড়ে এক মহিলার পরনে অপরূপ নক্সাখচিত একটি শাড়ি দেখে তিনি মুগ্ধ হন যার-পর-নাই। অনুসন্ধানে জানতে পারেন যে ঐ শাড়িটি হল বহুপ্রসিদ্ধ বালুচরী শাড়ি। তিনি তখনই মনে মনে ঐরকম নক্সাদার শাড়ি তৈরি করার স্বপ্ন দেখেন। এসে যায় সুযোগ। এবিষয়ে দুরকম তথ্য পাওয়া যায়।

গবেষক মাণিকলাল সিংহ লিখেছেন, "ভারত স্বাধীন হওয়ার পর বালুচরী শাড়ির পুনরুদ্ধারের জন্য জাতীয় সরকার সচেষ্ট হন। সরকারের আনুগত্যে Regional Design Culture-এর তৎকালীন Asstt Director **শ্রীশ্যামাদাসবাবু** এই অবলুপ্ত বালুচরী তাঁত-শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরকে স্থান নির্বাচন করেন। বিষ্ণুপুরের প্রবীণ খ্যাতিমান শিল্পী ৺**অক্ষয় কুমার দাস (পাটরাঙ্গা)** মহাশয় এর নিগূঢ় শিল্পচাতুর্থ অনুভব করে এর বুনন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। এই বিষয়ে তাঁহাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেন নিখিল ভারত খাদি ও গ্রামোদ্যোগ কমিশন কর্তৃক প্রত্যয়িত বিষ্ণুপুরের সিল্ক খাদি সেবা মণ্ডলের স্থানীয় পরিচালক ৺**হনুমান দাস সারদা**। এইভাবে ৺অক্ষয়বাবুর অক্লান্ত পরিশ্রমে এবং অভিনব বুদ্ধি-বিদ্যার যাদুস্পর্শে বালুচরী শাড়ির পুনর্জন্ম সূচিত হয়।"[১]

দ্বিতীয় মতটি একটু ভিন্ন রকম। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হওয়ার পরই ভারত

---

১. রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি, (৩য় খণ্ড) পৃঃ—৩৫।

সরকারের 'ডিজাইন সেণ্টার' পুরানো বস্ত্রশিল্পের পুনরুজ্জীবনে ব্রতী হন। রিজিওন্যাল 'ডিজাইন সেণ্টার' (কলিকাতা)-এর তৎকালীন ডিরেক্টর **শুভো ঠাকুর** ছিলেন একজন চারু, কারু ও স্থাপত্য শিল্পী। বিষ্ণুপুরের তসর ও রেশম শিল্পজাত দ্রব্যের উৎকর্ষের কথা জানতে পেরে তিনি একখানি জরাজীর্ণ বালুচরী শাড়ি নিয়ে বিষ্ণুপুরে আসেন শিল্পীর সন্ধানে এবং পূর্বোক্ত অক্ষয় কুমার দাস মহাশয়ের সান্নিধ্য লাভ করেন। অক্ষয়বাবুর শিল্প-সত্তার পরিচয় পেয়ে তিনি তাঁকে 'ডিজাইন সেণ্টার'-এ নিয়ে যান। ডিজাইন সেণ্টারে তিনি 'গভর্ণমেণ্ট ডিজাইনার' পদে নিযুক্ত হন। ভারত সরকারের 'ডিজাইন সেণ্টার' পশ্চিমবঙ্গে এবং দক্ষিণ ভারতে বালুচরী শিল্পের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করেও সফলকাম হতে পারেননি। এদিকে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে অক্ষয়বাবু কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে ফিরে আসেন বিষ্ণুপুরে।

১৯৫৩ খ্রীষ্টব্দে খাদি গ্রামোদ্যোগের প্রয়াসে বিষ্ণুপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে **'সিল্ক খাদি সেবা মণ্ডল'**। ৺হনুমান দাস সারদা ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্যোক্তা ও সর্বময় কর্তা। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, " ৺হনুমান দাস সারদা একজন দক্ষশিল্পী ছিলেন। তাঁর দ্বারা নির্মিত যন্ত্রের সাহায্যে তসরগুটির বোঁটা থেকে তন্তু বের করে বল্কল বস্ত্রের উৎপাদন এই সেবা মণ্ডলে করা হত। সেই সময় এই নতুন ধরনের বস্ত্রের সর্বভারতীয় চাহিদা এতবেশী ছিল যে তা পূরণ করা যেতো না।"[১]

অক্ষয়বাবু ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর ফিরে এলে হনুমান দাস সারদা মহাশয় তাঁর সাথে যোগাযোগ করে সিল্ক খাদি প্রতিষ্ঠানের সাথে তাঁকে যুক্ত করেন এবং বালুচরী শাড়ির নব রূপায়ণে ব্রতী হন। এই প্রতিষ্ঠান তৎকালে (১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে) নক্সা তৈরি, পাঞ্চিং কার্ড ও কাঁচা মাল বাবদ পাঁচ হাজার টাকা খরচ করেন। অতঃপর শুভো ঠাকুরের প্রেরণা, ৺হনুমান দাস সারদার কর্মোদ্যোগ ও অক্ষয়বাবুর শিল্প-প্রতিভার সার্বিক প্রয়াসে ঐতিহাসিক যুগের বালুচরী শাড়ি পুনর্জন্ম লাভ করল বিংশ শতাব্দীর পাঁচের দশকের একেবারে শেষভাগে। সিল্ক খাদি সেবা মণ্ডলের বানিদার কর্মী হিসেবে বিষ্ণুপুর বড় কালীতলা মহল্লা নিবাসী ৺গোরাচাঁদ দিয়াসী ইংলণ্ড-এর তৈরি জেকার্ড (Jacquard) মেশিনের সাহায্যে পাঞ্চিং কার্ডে তোলা নক্সার ঠাস বুনুনিতে ১৯৫৮/৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বালুচরী শাড়ি তৈরি করে অমর হয়ে রইলেন বালুচরী শিল্পের ইতিহাসে।

৺গোরাচাঁদ দিয়াসীর তৈরি প্রথম বালুচরী শাড়ি সহ ক্রমান্বয়ে উৎপাদিত আরো কয়েকটি শাড়ির আঁচলের নমুনা সিল্ক খাদি সেবা মণ্ডলের হেড অফিস, বিষ্ণুপুরে সযত্নে সংরক্ষিত রয়েছে দেখলাম। **'স্মৃতিরেখা'** নামের উক্ত ১ নং শাড়িটিতে নবাব বাহাদুরের দৈনন্দিন জীবনের ১টি চিত্র চিত্রিত হয়েছে। চিত্রটিতে দেখা যাচ্ছে বাম হস্তে একটি ফুলের তোড়া ধারণ করে সিংহাসনারূঢ় নবাব, নবাবী মেজাজে পাখা ব্যজন করছেন দক্ষিণ হস্তে। এছাড়া ছোট বড় কল্কা, ফুল, লতাপাতা এবং উপবিষ্ট গোটা ছয়েক ময়ূরের সুষ্ঠু সমাবেশ আঁচলের অঙ্গসজ্জায় এনেছে দৃষ্টিনন্দন পূর্ণতা।

দ্বিতীয় বালুচরী শাড়িটির নাম 'অগ্নিবীণা'। এটি তৈরি করেন পূর্বোক্ত ৺গোরাচাঁদ দিয়াসীর পত্নী ৺ক্ষুদুবালা দিয়াসী। 'মাধবী মঞ্জরী' নামের তৃতীয় শাড়িটির শিল্পী দেবদাস খাঁ। ৺ধরণীধর পাল বুনেন 'মালঞ্চ' নামাঙ্কিত চতুর্থ শাড়িটি। পঞ্চম শাড়ি 'মালবিকা' পৃথিবীর মুখ দেখে ৺রাধিকাপ্রসাদ দত্ত-র ঠাস বুননে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, ইনি ছিলেন

---

১. অভিযান—৭.২.৯৯ সংখ্যা (বিষ্ণুপুর)

আমার মাতামহ। এরপর এসেছে 'রঙ্গিণী', 'রুচিরেখা', 'ময়ূখমালা', 'মোনালিসা', 'তনুশ্রী', 'অসিতাম্বু', 'অনিন্দিতা', 'সুচরিতা' প্রভৃতি রমণীরঞ্জন বালুচরী।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় জাতীয় প্রতিরক্ষা তহবিলে জনসাধারণের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু বিষ্ণুপুরে একটি সভা করেছিলেন। ঐ সভাতে বিষ্ণুপুর সিল্ক খাদি সেবা মণ্ডলের পক্ষ থেকে ৺হনুমান দাস সারদার পুত্র ৺ভগবান দাস সারদা 'স্মৃতিরেখা' বালুচরী শাড়িটি তুলে দেন শ্রীমতী নাইডুর হাতে। ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিষ্ণুপুরে নির্বাচনী জনসভা করতে এলে তাঁকে উপহার দেওয়া হয় 'মালবিকা' বালুচরী এবং ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ (২য়) ভারতভ্রমণে এলে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে তাঁর হাতেও তুলে দেওয়া হয় একটি বালুচরী।

পূর্বোক্ত সমস্ত শাড়িগুলির নক্সা করেছিলেন ডিজাইনার অক্ষয় কুমার দাস। বালুচরী শিল্পের পুনর্জন্মদাতা ৺অক্ষয় কুমার দাস প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত মাণিকলাল সিংহ লিখেছেন, **"অদৃষ্টের নিষ্ঠুর পরিহাসে বালুচরী শাড়ির স্রষ্টা তন্তুবায়দের নাম অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে আর তাহারই পুনর্জন্মদাতা অক্ষয় কুমার দাসও বঞ্চনালাভ করিয়াছেন। আমাদের জাতীয় সরকার কত খুদে শিল্পীকে জাতীয় সম্মান, জাতীয় পুরস্কার দিয়াছেন কিন্তু অক্ষয়বাবুর মত অতুলনীয় শিল্পীকে তাহা দিতে কুণ্ঠাবোধ করিয়াছেন।"**[১]

বলতে দ্বিধা নেই, ৺হনুমান দাস সারদার জীয়নকাঠির স্পর্শে লুপ্তপ্রায় বালুচরী শিল্প নবকলেবরে আত্মপ্রকাশ করে, অনুভূত হয় প্রাণস্পন্দন, আর সেই কলেবর এবং সেই প্রাণস্পন্দনে পুষ্টি এবং সমৃদ্ধির সৌধ রচনা করেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র সদ্যঃপ্রয়াত ৺ভগবান দাস সারদা।

আসন্ন ২০০৩ খ্রীষ্টাব্দে সিল্ক খাদি সেবা মণ্ডলের 'সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব' উদ্‌যাপিত হবে। সেদিন কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানটির প্রাণ-প্রদীপ স্বরূপ তীক্ষ্মবুদ্ধি সম্পন্ন অতীব ধীর, স্থির, মৃদুভাষী, মিষ্টব্যবহারযুক্ত সৌম্য-দর্শন এই মানুষটির অভাব অনুভব করবে জ্বলন্ত প্রদীপের নীচে রসদের অপ্রতুলতার মতই। কারণ ভগবানবাবু গত ইং ২২/১২/১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন পরলোকে।

অনেকের ধারণা ছিল অক্ষয়বাবুর পরলোক গমনের সাথে সাথে বালুচরী শিল্পেরও পরলোক প্রাপ্তি হবে। কিন্তু তা হয়নি। অক্ষয়বাবুর মৃত্যুর পর তাঁর শূন্যস্থান পুরণ করেন বড়কালীতলা মহল্লা নিবাসী **৺গুণসিন্ধু খাঁ**-এর ভাগ্নে **শঙ্করলাল আশ**। গুণসিন্ধু খাঁ মহাশয়ও ছিলেন একজন নামকরা 'ডিজাইনার'। শঙ্করলাল প্রথমে মামা গুণসিন্ধু খাঁ এবং পরে অক্ষয়বাবুর কাছে নিজ অধ্যবসায়গুণে এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নক্সা-অঙ্কণ-বিদ্যা করায়ত্ত করেন। বরং বলা চলে অক্ষয়বাবুকে গুরু হিসেবে বরণ করে একলব্যের মতোই স্বীয় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন তিনি এবং তাঁর নক্সাগুলি আরো আরো বেশি চিত্তাকর্ষক এবং উন্নতমানের হয়। মৃত্যুর শাশ্বত নিয়মে শিল্পী শঙ্করলাল আজ আর আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর প্রোজ্জ্বল স্মৃতি হিসেবে রয়ে গেছে তাঁর অমর-শিল্পকর্ম। এ প্রসঙ্গে আর একজন শিল্পীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি হলেন বিষ্ণুপুর পাটরাপাড়া মহল্লা নিবাসী **৺শঙ্কর কর**। শঙ্কর কর পূর্বকথিত শঙ্কর আশের বাড়িতে বেতনভুক কর্মচারী হিসেবে কাজ করতেন প্রথম দিকে। পরবর্তীকালে তিনিও

১. রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি, (৩য় খণ্ড) পৃঃ—৩৭

একজন প্রথম শ্রেণীর নক্সা শিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। শঙ্কর আশ এবং শঙ্কর কর ছিলেন প্রায় সমসাময়িক কালের শিল্পী। এই দুই শিল্পীর পরলোক গমনের পর তাঁদের শূন্যস্থান পূর্ণ করেছেন শ্রদ্ধেয় **প্রভাকর খাঁ**, **তাপস দাস**, **কার্তিক আশ**, **ভীম দাস (বাপী)** এবং **চন্দন দে**।

পূর্বোক্ত প্রভাকর খাঁ-এর জন্ম ১৩৩৩ বঙ্গাব্দে। ১৪০৯ বঙ্গাব্দে বয়স ছিয়াত্তর। এই বয়সেও ধীর স্থির মস্তিষ্কে, শান্ত মনে নিরুদ্বেগচিত্তে, চাটাই-এ বসে এঁকে চলেছেন একের পর এক ছবি। এক্ষণে বালুচরী শিল্পীদের মধ্যে তিনি একাধারে বয়োজ্যেষ্ঠ এবং সবচেয়ে বড় শিল্পী। আর শঙ্করলাল রেখে গেছেন তাঁর সুযোগ্য পুত্র শিল্পী **কার্তিক আশকে**। বর্তমানে তাঁর বয়স ২৯ বছর। এই বয়সেই তিনি শিল্পী হিসেবে যথেষ্ট নাম কিনেছেন। মাধবগঞ্জের বড়ামতলা নিবাসী **ভীম দাসের** বয়সও ২৯। অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ এই শিল্পী ১৮ বছর বয়স থেকে নক্সা করছেন। 'মীরার বঁধুয়া', 'হরধনু ভঙ্গ', 'পঞ্চপাণ্ডব', 'আদিবাসী নৃত্য', 'বিবাহ বাসর' তাঁর উল্লেখযোগ্য শিল্পকীর্তি। গোপালগঞ্জ, তাঁতীপাড়া নিবাসী শ্রীবাদল চন্দ্র দে-র পুত্র **চন্দন দে**-র বয়স মাত্র তেইশ। বয়োকনিষ্ঠ এই শিল্পী 'কাঠিনাচ' নক্সা রচনা করেই নজর কেড়েছেন বালুচরী প্রেমিকদের। এবার বলি, বিষ্ণুপুর ধূলাপাড়া মহল্লা নিবাসী শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাসের পুত্র শিল্পী **তাপস দাসের** কথা। নিম্নাঙ্গ বিকলাঙ্গ এই শিল্পীর বয়স বর্তমানে সাঁইত্রিশ। গত ২৮/৪/৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বালুচরী বস্ত্রবয়নের নক্সা রচনার ক্ষেত্রে এক অনবদ্য সৃষ্টির স্বাক্ষর রেখেছেন। এযাবৎ সব শিল্পীই ফুল, লতাপাতা, পশু-পাখি, কল্কা, আলপনা, নবাব-বাদশা, বিবি-বেগম-সাহেবার ছবি, রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণলীলা এবং অজন্তা, ইলোরার আর্টের অনুকরণে বিচ্ছিন্ন মূর্তি জাতীয় ছবি চিত্রিত করে বয়নশিল্পে রূপ দিয়েছেন। কিন্তু কোন **'কাহিনী-ধর্মী'** অর্থাৎ **'Story Type'** নক্সার জন্ম হয়নি। **বালুচরী শাড়ির আঁচলে সর্বপ্রথম Story বা কাহিনী-চিত্র সংযোজন করেন তাপসবাবু।**

ছ'টি স্তরে বিন্যস্ত এই শাড়ির আঁচলটির প্রথম সারিতে চারদিক ঘিরে রচিত হয়েছে পঞ্চবটী বনের বৃক্ষ মূলে-মূলে হরিণরাজির চরে বেড়ানোর দৃশ্য। দ্বিতীয় সারিতে রয়েছে রাম, লক্ষ্মণ, সীতার বনবাসে যাওয়ার সকরুণ দৃশ্য। তৃতীয় স্তরে চিত্রিত হয়েছে রাম, লক্ষ্মণ, সীতার কুটিরে বসবাসকালে কুটির-প্রান্তে মায়ামৃগের ছদ্মবেশে মারীচের আগমন এবং সীতার প্রলুব্ধ হওয়ার দৃশ্য। চতুর্থ স্তবকে দেখা যাচ্ছে রামচন্দ্র স্বর্ণমৃগকে ধাওয়া করে তীর-বিদ্ধ করেছেন। পঞ্চম সারিতে রয়েছে, 'ভাই লক্ষ্মণ বাঁচাও, বাঁচাও'—রামের কণ্ঠস্বর নকল করে মারীচের এই আহ্বানে সীতাদেবীকে গণ্ডি দিয়ে বিপদ্‌গ্রস্ত দাদাকে রক্ষা করার সাধু উদ্দেশ্যে তীরধনু হাতে লক্ষ্মণের বেরিয়ে যাওয়ার চিত্র। ষষ্ঠ বা শেষ পংক্তিতে অঙ্কিত হয়েছে সীতাকে হরণ করে রথে চড়িয়ে আকাশপথে উড়ে যাচ্ছেন রাবণ এবং বাধা দিচ্ছে রামভক্ত জটায়ু। জটায়ুর পক্ষছেদন করছেন রাবণ। অবশেষে সীতাহরণ। সীতাহরণের এই দৃশ্যেই কাহিনীর সমাপ্তি। বালুচরীতে আঁচল সজ্জার নিয়মানুসারে প্রধান ছবিটি অর্থাৎ শেষ ছবিটি হয় বৃহদাকার এবং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ সারি ছবির পর ৫, ৪, ৩, ২, ১ এই উল্টো পদ্ধতিতে পুনরায় চিত্রিত হয় ছবিগুলি। মুখ্য দৃশ্যটি থাকে আঁচলের মধ্যাংশে। **সাধারণতঃ শাড়িটির নামকরণ হয় প্রধান বা শেষ দৃশ্যের প্রতিপাদ্য বিষয়ের ওপর। যেমন এক্ষেত্রে এ শাড়িটির নাম 'সীতাহরণ'।**

সীতাহরণ 'Story'-র নক্সা অংকন করলেন জনৈক **ফকির রুদ্র** ও শঙ্কর আশের

কাছে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কুড়ি বছর বয়সের তরুণ তাপস দাস। আর সেই নক্সাকে শাড়ির আঁচলে নয়নাভিরাম রূপ দিলেন চল্লিশোত্তর প্রৌঢ় **গুরুদাস লক্ষণ**। শাড়ি পরলেন সুচিত্রা সেনের কন্যা অভিনেত্রী তথা মডেলার সুন্দরী মুনমুন সেন। সেই ছবি বেরুল 'শারদীয়া বর্তমান' পত্রিকার 'পূজার ফ্যাশন্' কলামে। কথায় বলে, 'একে মা মনসা, তায় আবার ধুনার গন্ধ'। এক্ষেত্রেও ব্যাপারটা হল তাই। একে বিষ্ণুপুরের বালুচরী, তাই আবার মুনমুন সেনের ছন্দোময় রূপ লাবণ্য। সব মিলিয়ে মনে হল, 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে...'। প্রচার হয়ে গেল এখন আর গতানুগতিক পুরানো ডিজাইনের নয়, পাওয়া যাচ্ছে Storyতে বালুচরী। মধ্যবিত্ত এবং উচ্চ মধ্যবিত্ত মহিলারা মুখর হয়ে উঠলেন ঐ শাড়ির কথায়। মহিলামহলে মুখে মুখে ঐ শাড়ির কথা ফিরতে ফিরতে অবশেষে ধনাঢ্য বাঙালী ললনাদের একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায় 'স্টোরি বালুচরী' বা 'কাহিনীধর্মী বালুচরী'।

বঙ্গনারীর অঙ্গশোভা বাতাসের মতো ফুর্‌ফুরে, রামধনুর মতো বর্ণাঢ্য সেই বালুচরী পরে কল্লোলিনী কোলকাতার কলস্বরা কামিনীগণ ঘুরে বেড়ান দুর্গা পূজার মণ্ডপে মণ্ডপে। গড়ের মাঠ, ইডেন গার্ডেন, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম্, যাদুঘর, রবীন্দ্রসদন, চিড়িয়াখানা, বোটানিক্যাল গার্ডেনস, বিবাহ-বাসর এবং অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে বালুচরী পরিহিতা অবলার দল দৃষ্টিসুখকর প্রজাপতির স্বচ্ছন্দ গতিতে ঘুরে বেড়ান আপন মনে। সরবে, নীরবে প্রচার হয়ে যায় শহর থেকে গ্রামে গঞ্জে 'স্টোরি বালুচরী'র কথা।

পূর্বেই বলেছি, বিষ্ণুপুরে বালুচরীর জন্ম হয় ১৯৫৮-১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে। ঐ সময় থেকে ১৯৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ২৭/২৮ বছর যাবৎ বালুচরী বস্ত্রের চাহিদা ছিল যাকে বলে মন্দের ভাল। সর্বসাকল্যে খান ৩০ বালুচরী তাঁত ছিল বিষ্ণুপুরে। নয়ের দশকের প্রথমার্ধে চাহিদাও সেরকম ছিল না। কিন্তু ১৯৮৬/৮৭ খ্রীষ্টাব্দে Story বালুচরীর ব্যাপক প্রচার হয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই যেন মরা গাঙে জোয়ার আসে। অথবা যেন শুকনো নদীতে হঠাৎ করে এসে যায় বাঁধ ভাঙা বান। বালুচরীর চাহিদা ওঠে তুঙ্গে। এখন শুনুন Story বালুচরী তথা কাহিনী বালুচরীর জন্মলাভের গোপন-কথা।

১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দ। সবেমাত্র বালুচরী শাড়ির জন্য রাজ্য-স্তরে পুরস্কার লাভ করেছেন কৃষ্ণগঞ্জ গড়গড়ান মহল্লা নিবাসী ৺গোকুল চন্দ্র লক্ষণ মহাশয়ের মধ্যম পুত্র **শ্রীগুরুদাস লক্ষণ**। পুরস্কার প্রাপ্ত এই শিল্পীকে এবং তাঁর শিল্পকর্মকে স্বচক্ষে দেখার অভিমানসে বিষ্ণুপুরের তৎকালীন মহকুমা শাসক মাননীয়া **নন্দিতা চ্যাটার্জী**কে সঙ্গে নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তৎকালীন কুটীর শিল্প অধিকর্তা শ্রদ্ধেয় **জহর সরকার** এসেছেন গুরুদাস বাবুর বাড়িতে। শিল্পীকে এবং তাঁর শিল্পকর্মকে দেখলেন জহর বাবু। কিন্তু পুরোপুরি পরিতৃপ্ত হননি তিনি। বলেন, "বালুচরীর নক্সাতে কোন Story পেলাম না তো।"

"তার মানে?" জানতে চান গুরুদাস বাবু।

"মানে ধরুন রামায়ণ, মহাভারতের কোন বিশেষ ঘটনাকে বা কোন জনপ্রিয় গল্পকে চিত্ররূপ দেওয়া যায় না কি শাড়ির আঁচলে?" বলেন জহরবাবু।

ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে গুরুদাসবাবু বলেছিলেন, "হ্যাঁ, করা যায়। কিন্তু খরচ অনেক। টাকা দেবে কে?"

টাকা পেয়েছিলেন শিল্পী—অবশ্য লোন হিসেবে। জহরবাবুর কথায় প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়ে মাথা খাটিয়ে মনে মনে সীতাহরণ কাহিনীর ছবি আঁকলেন ছটি পর্যায়ে। অতঃপর দৌড়ালেন ডিজাইনার তাপস দাসের কাছে। তারপর কি হয়েছিল সে সবই জেনে গেছেন আগেভাগে। এখন শুনুন অবশিষ্ট অংশের কথা।

বালুচরী শাড়ির বিরাট চাহিদা সৃষ্টি হল। এদিকে চাহিদার তুলনায় যোগান খুবই কম। দাম বাড়ল বালুচরীর। অভাবনীয় চাহিদা মেটাতে বিষ্ণুপুরের মৃতপ্রায় রেশম শাড়ির ব্যবসা Story বালুচরীর হাত ধরে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। তাঁতের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যেসব তন্তুবায়-শিল্পী গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য জাতবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন পরবৃত্তি তাঁদের অনেকেই আবার ফিরে আসেন স্ববৃত্তিতে। শুরু করেন তাঁতের কাজ। সন্ধ্যার আকাশে একটি একটি করে তারা ফোটার মতোই ১৯৮৭-১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিষ্ণুপুর শহরে প্রায় সাড়ে পাঁচশত বালুচরী তাঁত জন্মলাভ করে। নিত্য-নতুন কাহিনী ভিত্তিক ডিজাইনের বালুচরী ছড়িয়ে পড়ে বাজারে। এগুলির মধ্যে রামায়ণের 'সীতাহরণ', 'রাম রাবণের যুদ্ধ', 'রামরাজা', 'হরধনুভঙ্গ ও রামের বিবাহ', 'অহল্যা-উদ্ধার', 'হনুমানের লঙ্কাদহন' ; মহাভারতের 'দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভা', 'কুরুপাণ্ডবের পাশাখেলা ও দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ', 'কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ', 'অভিমন্যু-বধ', 'ভীষ্মের শরশয্যা', 'দুষ্মন্ত-শকুন্তলা', 'একলব্যের গুরুদক্ষিণা', 'মহাপ্রস্থানের পথে' ; রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক 'শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা', 'কংসবধ', 'নৌকাবিলাস', 'রাসলীলা', 'গোপীদের বস্ত্রহরণ', 'কালীয়-দমন', 'তারকাসুর বধ', 'শ্রীকৃষ্ণের দোলযাত্রা', 'কৃষ্ণলীলা' ; ঈশপের গল্প বিষয়ক 'আঙ্গুরফল টক', 'কাঠুরিয়া ও জলদেবতা', 'একতাই বল', 'মিথ্যেবাদী রাখাল' ; লোক-সংস্কৃতি বিষয়ক 'আদিবাসী-নৃত্য', 'কাঠিনাচ', 'রাবণকাটা-নৃত্য', এছাড়া 'বিবাহ-বাসর' প্রভৃতি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এসব বালুচরীতে কি ধরনের ছবি থাকে সেকথা বলি সংক্ষেপে। প্রভাকর খাঁ মহাশয়ের আঁকা নক্সার 'বিবাহ-বাসর' শাড়িতে দেখা যায় শঙ্খ বাজিয়ে বরকে বরণ করার পাশাপাশি ছাদনা তলায় বর-বধূর হস্ত-বন্ধনী, অগ্নিসাক্ষী রেখে বর-ক'নের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া, মালাবদল, সিঁদুর-দান, বাজনা বাদ্যিসহ পাল্কিতে বর-ক'নে বিদায়, ফুলশয্যা প্রভৃতির নিখুঁত চিত্র। অনুরূপভাবে কার্তিক আশ অঙ্কিত কৃষ্ণলীলা Story-তে নজরে পড়ে শ্রীরাধার মানভঞ্জন, রাধাকৃষ্ণের হোলিখেলা, নৌকাবিলাস, ঝুলনযাত্রা এবং সবশেষে রাধাকৃষ্ণের মিলন। শাড়িটি তৈরি করেছেন কৃষ্ণগঞ্জ গড়গড়ান মহল্লার **সুরেন্দ্রনাথ লক্ষণ**। বিষ্ণুপুর শহরের পাটরাপাড়ার বাগান মহল্লাতে **অজিত খাঁ** মহাশয়ের হাতে বোনা 'আদিবাসী-নৃত্য' শাড়িটিতে অন্তিম-সূর্যের প্রেক্ষাপটে নীল আকাশের নীচে গাছপালা হরিণ পরিবৃত জংলী পরিবেশে নাকাড়া ও মাদল বাজিয়ে দুজন সাঁওতাল এবং কয়েকজন সাঁওতাল মহিলার ছন্দোময় নৃত্যের জীবন্ত দৃশ্যটি চিত্রিত হয়েছে চারটি পর্যায়ে। মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রূপায়িত 'দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভা' শাড়িটির প্রথমে রয়েছে বধূবেশে সুসজ্জিতা বরমাল্য হস্তে ভ্রাতা ধৃষ্টদ্যুম্নের সাথে স্বয়ংবর সভাতে দ্রৌপদীর প্রবেশ-চিত্র। দ্বিতীয় স্তরে অর্জুনের লক্ষ্যভেদ করার সার্থক চিত্র। তৃতীয় সারিতে দেখা যাচ্ছে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশধারী বিজয়ী অর্জুনের গলায় বরমাল্য পরিয়ে দিচ্ছেন পাঞ্চালী। চতুর্থ সারিতে রয়েছে লক্ষ্যভেদে ব্যর্থ ক্ষিপ্ত রাজাদের সাথে ভীম ও অর্জুনের ভয়ঙ্কর যুদ্ধ-দৃশ্য। শেষ স্তবকে চিত্রিত হয়েছে রাজাদের পরাজিত করে দ্রৌপদীকে নিয়ে পঞ্চপাণ্ডবের স্বয়ংবর-সভা পরিত্যাগের চিত্র।

রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক, সামাজিক, লোকসংস্কৃতি এবং লোক-শিক্ষা-বিষয়ক এসব শাড়ি জনপ্রিয়তার গুণে বাংলা জয়ের পর সহজেই জয় করল সারা ভারত, অতঃপর পাড়ি দিল বিশ্বভুবন জয় করার অভিপ্রায়ে। বিশ্ববাজারেও বালুচরী সমাদর লাভ করল আশাতীতভাবে। পূর্বেই বলেছি, সেই চাহিদা মেটাতে সন্ধ্যার আকাশে একটি একটি করে তারা ফোটার মতো প্রায় সাড়ে পাঁচশত বালুচরী তাঁতের জন্ম হয় বিষ্ণুপুরে। এক একটি

তাঁতের পিছনে কমপক্ষে পাঁচজন কর্মীর প্রয়োজন হয়। তাঁত-বোনা-তাঁতীর অভাব দেখা দেয়। অভাব দেখা দেয় সাহায্যকারী শ্রমিকেরও। কর্মীর শূন্যস্থান পূরণ করতে বিষ্ণুপুরের বামুন, বাউরী, কায়স্থ, কর্মকার, কুম্ভকার, স্বর্ণকার, সূত্রধর, ধোপা প্রভৃতি প্রায় সর্বজাতের মানুষেরা নেমে পড়েন বালুচরী বয়নে ও ব্যবসায়। উৎপন্ন হল নিত্য নতুন ডিজাইনের বালুচরী। রেশমের টানার সাথে রেশমের পোড়েন এবং নানান রঙের রেশম সূতার নক্সা-কাজের সুসজ্জায় সেজে ওঠে বালুচরী তথা মিনাবালুচরী। পক্ষান্তরে রেশমের জমিনের উপর আগাগোড়া জরির কারুকার্যের স্বর্ণাভ সৌন্দর্যে ভরা শাড়ীর নাম স্বর্ণচরী। স্বর্ণচরী ও বালুচরীর বুনন-প্রক্রিয়া এবং নক্সা-অলঙ্করণ সবই কিন্তু এক এবং অনুরূপ। স্বর্ণচরীর মূল্যবান উপাদান জরি। সাধারণ জরি এবং সোনার জল ধরানো উচ্চমানের জরির গুণমানের এবং কারুকার্যের বহরের ভিত্তিতে এক একটি স্বর্ণচরীর দাম বর্তমান বাজারে ৫ হাজার থেকে ১১ হাজার টাকা। পক্ষান্তরে বালুচরীর দাম ২ হাজার থেকে ৫ হাজার।

বালুচরী শাড়ীর মধ্যে রয়েছে ভাবগম্ভীর আভিজাত্যে ভরা শান্ত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য। স্বর্ণচরীর মধ্যে রয়েছে ঝল্‌মলে উজ্জ্বলতা ; উঠতি যৌবনের চোখ ঝলসানো দীপ্তি। বালুচরী যেন ছায়াপথ বিস্তীর্ণ নক্ষত্র-খচিত অমারাত্রির উন্মুক্ত আকাশ। আর স্বর্ণচরী বোধ করি থৈ থৈ চন্দ্রালোকিত কোজাগরী পূর্ণিমার দিগন্ত প্রসারিত নভোমণ্ডল। রামায়ণের যুগে সীতাদেবীর মন চুরি করেছিল স্বর্ণমৃগ আর আধুনিক যুগের দেবীদের মন নয়, হৃদয় চুরি করেছে বালুচরীর বোন স্বর্ণচরী। তাই স্বর্ণচরীর এখন জয় জয়কার। আবার স্বর্ণচরীর কোলেপিঠে জন্ম নিল বেনারসী ও বালুচরী নক্সার সংমিশ্রণে জাত 'বেনারসী-বালুচরী' শাড়ী। তুলনামূলকভাবে স্বল্পমূল্যে শাড়ীবিলাসিনীদের কাছে 'শাড়ীর স্বপ্ন, স্বপ্নের শাড়ী বালুচরী'কে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তৈরী হল ছোট আঁচলের শাড়ী। এভাবেই জামদানী, টাঙ্গাইল, ধনেখালি, বেগমপুরী, শান্তিপুরী, আনারসী, বেনারসী শাড়ীকে পিছনে রেখে নারী হৃদয়ের স্বর্ণ-সিংহাসনে আসীন হল বালুচরী, স্বর্ণচরী ও বেনারসী-বালুচরী। এখন বালুচরী, স্বর্ণচরী এবং বেনারসী-বালুচরী—এই তিন বোনের হাত ধরেই আমরা ফিরে যাবো বিষ্ণুপুরের তন্তুবায় পল্লীতে। ফিরো যাবো খেই হারিয়ে ফেলা কথায়।

১৯৮৭ থেকে ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ সময়টা ছিল বিষ্ণুপুরের তন্তুবায় সমাজের সুসময়—মানে বৃহস্পতির দশা। ঐ সময়-সীমার মধ্যে একটি পরিবারের নারী-পুরুষ, কচি-কাঁচা সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং প্রাণান্ত পরিশ্রমের বিনিময়ে দু'পয়সার মুখ দেখেন খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষ—না, মানুষ নয় শিবঠাকুরের অঙ্গোদ্ভূত শিল্পী-সমাজ।

১৯৯৬ এর পর থেকেই সম্ভবতঃ বিষ্ণুপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রামে, গঞ্জে এবং বিষ্ণুপুর মহকুমার প্রায় সর্বত্রই বালুচরী তাঁতের সংখ্যা আরো বেড়ে যাওয়ায় এবং সেই অনুপাতে চাহিদা না থাকায় বাজারে যেন একটু ঢিলেঢালা ভাব। তাই আবার এই শিল্পে নিযুক্ত জেলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষের কপালে কপালে দুশ্চিন্তার বলিরেখা উঁকি-ঝুঁকি মারছে অতীত দিনের দৈন্যদশার কথা চিন্তা করে, অতীতের সেই অনাহার, অর্ধাহার- ক্লিষ্ট দিনগুলির স্মৃতি রোমন্থন করে।

তাঁতীদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়, 'তাঁতী তাঁত বুন্ বুন্ বুন্, তাঁতী কিষ্ট-র কথা শুন।' এই ব্যঙ্গোক্তির অন্তরালে যে সত্যটি লুকিয়ে আছে তার থেকে মনে হয় কৃষ্ণ-বিষ্ণুর পূজাতে ব্যবহৃত বিষ্ণুর জোড় (ছোট কাপড়) এবং শ্রীকৃষ্ণের কাপড় তৈরির জন্যই সম্ভবতঃ মল্লভূমে এঁদের আগমন ঘটে। কৃষ্ণ-বিষ্ণুভক্ত তন্তুবায় সমাজ কৃষ্ণ-বিষ্ণুর বস্ত্র তৈরি করতে ভালবাসতেন বলেই তাঁদের আনুগত্যের প্রতি এই কটাক্ষ। এঁদেরকে আবার

'বোকা তাঁতী'ও বলা হয়ে থাকে। আসলে কিন্তু এঁরা বোকা নন, এঁরা সহজ, সরল, সৎ। এঁদের সহজাত সারল্য এবং সততার জন্যই দুষ্টবুদ্ধি সম্পন্ন চতুর মানুষজনের চোখে এঁরা বোকা রূপে প্রতিভাত। **চতুর মনুষ্য সমাজের চোখে এঁরা বোকা রূপে প্রতিভাত হলেও গবেষক মাণিকলাল সিংহ মহাশয়ের চোখে এঁরা কিন্তু বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান এবং মহান।** এঁরা মল্লভূমের গৌরব, শিল্পীসমাজের সৌরভ। এঁদের কথা বলতে গিয়ে তাই তিনি লিখেছেন,—"...হয়ত কূট বিষয় বুদ্ধি, ছলনা, চাতুরী, শঠতা এবং পর-প্রবঞ্চনার প্রবৃত্তি না থাকার জন্য তাঁতিদের প্রতি এই জাতীয় অবজ্ঞার মনোবৃত্তি রাঢ়বঙ্গের জনসমাজে গড়িয়া উঠিয়াছিল।

কিন্তু তাঁত-যন্ত্রের জটিলতা, ইহার উদ্ভাবন এবং পরিচালনার দক্ষতা, বস্ত্র-শিল্পের সূক্ষ্মতা, রাসায়নিক প্রক্রিয়ার অনুশীলন এবং প্রযুক্তি, রেশম শাড়ীর পাড় আঁচলায় নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ নক্সার বুননে ফলিত গণিতের অতি দুরূহ হিসাব পদ্ধতি কি নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে না যে রাঢ়-বঙ্গের তন্তুবায়গণের মধ্যে বিষ্ণুচরণ দাস, অক্ষয় কুমার দাস, শংকরলাল আসের মতো বহু প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটিয়াছে?"[১] "...বিষ্ণুবাবু, অক্ষয়বাবু, শঙ্করবাবু স্কুল-কলেজে পড়েন নাই—তিনজনের বিদ্যার দৌড় পাঠশালা পর্যন্ত। **প্রতিভা—বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরেই জন্মলাভ করে না। পদ্মফুলের মতই পাঁকেই জন্মায়, পঙ্কিল সরোবরেই প্রস্ফুটিত হয়।**"[২]

"মৌর্য-শুঙ্গ আমলে বা তাহারও পূর্ব হইতে আধুনিককাল পর্যন্ত এই তাঁতিদেরই সৃষ্ট পণ্যের বিনিময়ে অবিভক্ত বঙ্গে তথা ভারতে প্রভূত ধনরত্ন এবং বৈদেশিক মুদ্রার আমদানি ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে।..... দেবাদিদেব মহাদেবের মানসপুত্র শিবদাসের বংশধরগণ ভোলানাথের মতই আত্মভোলা। ইঁহাদের প্রণাম করিয়া এসো, আমরা আমাদেরই অজ্ঞতার পাপমুক্ত হই। ইঁহারা আমাদের গৌরব, ইঁহাদের তৈয়ারি মসলিন, বালুচরী শাড়ি জগতের মানুষের নিকট বিস্ময়ের বস্তু, তাজমহলের মতই অত্যাশ্চর্য নিদর্শন।"[৩]

বিষ্ণুপুর ভ্রমণের স্মৃতি হিসেবে আপনারা এখান থেকে কিনে নিয়ে যেতে পারেন বালুচরী, স্বর্ণচরীর মতো অত্যাশ্চর্য শাড়ি ছাড়াও তাঁতশিল্পজাত অন্যান্য দ্রব্যাদি।

বিষ্ণুপুরের চটিধার মহল্লায় অবস্থিত এই প্রতিষ্ঠান থেকে নেমে গিয়ে আমরা যাবো মাধবগঞ্জ অভিমুখে। মাধবগঞ্জ মহল্লার শ্রীশ্রীরাধামদনগোপাল-জীউ-এর শ্রীমন্দির এবং শ্রীবিগ্রহ দর্শন করে ধন্য হব আমরা।

অধ্যায়-৯১

শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালজীউ

মাধবগঞ্জ

সামনে তাকান, দেখুন আমাদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে এসে গেছে শ্রীমন্দিরের শীর্ষচূড়াটি। বিষ্ণুপুরে একরত্ন মন্দিরের ছড়াছড়ি, পঞ্চরত্ন মন্দিরও আছে অনেক কিন্তু উল্লেখ করার মতো পঞ্চরত্ন মন্দির বিষ্ণুপুরে আছে মাত্র দুটি। তার মধ্যে একটি হল গড়জাত মহল্লাতে

১ ও ৩. রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি, (৩য় খণ্ড) পৃঃ—৩৮
২. রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি, (৩য় খণ্ড) পৃঃ—৩৭

শ্যামরায়ের মন্দির। ইতিপূর্বেই সেই মন্দির আপনাদের দেখিয়েছি। ইষ্টক নির্মিত সেই মন্দিরটি পোড়ামাটির কারুকার্যের অলংকরণের জন্য নয়নাভিরাম। আর এই যে মদনগোপাল-জীউ-এর মন্দিরটি দেখছেন এটিও একটি উল্লেখ করার মতো পঞ্চরত্ন মন্দির। তবে এটি আগাগোড়া বাঁকুড়ার মাকড়া পাথরে এবং পাথরের উপর হালকা খোদাই কার্যের অলংকরণে শোভিত। মন্দিরটির পরিচিতি প্রসঙ্গে 'আর্কিয়লজিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া' মন্তব্য করেছেন—

"মন্দিরের সম্মুখগাত্রে নিবদ্ধ উৎসর্গলিপি হইতে জানা যায় যে মাকড়া পাথরের এই দক্ষিণমুখী পঞ্চরত্ন মন্দিরটি বীর সিংহের পত্নী রাণী শিরোমণি দেবী ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বর্গাকৃতি ভিত্তিপীঠের উপর প্রতিষ্ঠিত মূল মন্দিরটির ঢালু ছাদের উপর রহিয়াছে পঞ্চশিখর। কেন্দ্রীয় শিখরটি অষ্টভুজাকার এবং চারিকোণের চারটি শিখর বর্গাকার। কয়েকটি পদ্মফুলের অলংকরণ ব্যতীত অন্য বিশেষ কোন ভাস্কর্য এই মন্দিরে দৃষ্ট হয় না।"

'আর্কিয়লজিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া' মন্দিরটি সম্পর্কে যা বলেছেন তার পরেও আরো দু'চার কথা বলার অপেক্ষা রাখে। যেমন মন্দিরের পূর্ব দেওয়ালের প্রবেশ খিলানের উপর দুটি পদ্মফুলের অলংকরণ ছাড়াও বালি-সুগ্রীব এবং রাম-রাবণের যুদ্ধের মূর্তি পরিলক্ষিত হয়। মাকড়া পাথরের উপর পঙ্খের পলেস্তারার নিদর্শন এবং প্রাচীনত্ব সত্ত্বেও এর অস্তিত্বের বিষয়টি প্রশংসনীয়ভাবে উল্লেখ্য। প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথা উল্লেখ করি এখানে। এই শ্রীমন্দিরটি মদনগোপাল-এর মন্দির রূপে স্বীকৃত হলেও জনশ্রুতি বলে অন্য কথা।

জনশ্রুতি বলে, অতীতে এটি ছিল শ্রীশ্রীরঘুনাথজীউ-এর মন্দির। রাম, লক্ষ্মণ, সীতা —হনুমান সমভিব্যাহারে পূজিত হতেন এখানে। কিন্তু কিল্লাজাত মহল্লা থেকে দূরত্বের দরুন এবং শ্রীমন্দিরের সেবক সন্ন্যাসী রঘুনাথ দাস মহন্তের ইচ্ছানুসারে কিল্লাজাত মহল্লা সংলগ্ন নিমতলা মহল্লাতে একটি অস্থল নির্মাণ পূর্বক উক্ত বিগ্রহসমূহ স্থানান্তরিত হন। নিমতলায় স্থানান্তরিত উক্ত বিগ্রহগুলি আপনারা ইতিমধ্যেই দর্শন করেছেন এবং শুনেছেন সেখানের রাবণকাটা উৎসবের কথা।

ইতিহাস বলে, প্রথম রঘুনাথ সিংহ উক্ত অস্থল নির্মাণ করান। মদনগোপাল মন্দিরটিকে রঘুনাথ-জীউ-এর মন্দির বলে দাবি করার পক্ষে আরো দুটি যুক্তি দেখানো হয়েছে। প্রথমটি হল মদনগোপাল মন্দিরের পূর্বদিকের দেওয়ালে প্রবেশ খিলানের উপরিভাগে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি। দ্বিতীয়টি হল মদনগোপাল-মন্দিরের অল্প একটু দূরে উত্তর-পশ্চিম কোণে রঘুনাথ সায়রের অস্তিত্ব।

অদ্যকার মদনগোপাল-মন্দির থেকে রঘুনাথজীউ নিমতলার অস্থলে স্থানান্তরিত হওয়ার পর বেশ কিছুকাল বিগ্রহহীন অবস্থায় বিরাজ করে মন্দিরটি। অতঃপর প্রথম রঘুনাথের লোকান্তরের পর তাঁর পুত্র বীরসিংহ রাজা হন। বীরসিংহ-পত্নী শিরোমণি দেবী প্রদ্যুম্নপুরের একটি ভগ্নপ্রায় মন্দির থেকে মদনগোপাল বিগ্রহ আনয়ন করেন। উক্ত শ্রীবিগ্রহ রাজ-অন্তঃপুরে রক্ষিত ছিল। মাধবগঞ্জের প্রজাসাধারণের অনুরোধে এবং স্বীয় আন্তরপ্রেরণায় রাধা-মদনগোপাল যুগল বিগ্রহ তিনি এই রঘুনাথ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেন এবং মন্দিরটি মদনগোপাল জীউ-এর নামে উৎসর্গ করেন। তারপর থেকেই এটি হয় মদনগোপাল মন্দির।

'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী' গ্রন্থপ্রণেতা ফকিরনারায়ণ কর্মকার রঘুনাথ জীউ সম্পর্কে

ভিন্ন মত পোষণ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "বিষ্ণুপুর নিমতলা মহল্লায় অবস্থিত রঘুনাথ জীউয়ের অস্থল, তার ব্যয় নির্বাহের জন্য উপযুক্ত জমিদারী, সেখানে অধিষ্ঠিত রঘুনাথ জীউ, জানকী জীউ ও লক্ষ্মণ জীউ বিগ্রহ, সেই সমস্ত পরিচালনার জন্য রঘুনাথ দাস মোহান্ত নামে সন্ন্যাসী জাতীয় পরিচালক নিয়োগ,.....প্রভৃতি তাঁরই প্রতিষ্ঠিত কীর্তি।" (পৃঃ—৮১) পরন্তু মদনগোপাল মন্দিরের নির্মাতা হিসেবে তিনি রঘুনাথ পুত্র বীরসিংহের নাম উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে উক্ত পুস্তকে তিনি লিখেছেন, "...উক্ত ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দ বা ৯৭১ মল্লাব্দে বিষ্ণুপুর মাধবগঞ্জ মহল্লায় মদনগোপাল জীউ বিগ্রহ ও তাঁর শ্রীমন্দিরও এঁর পুণ্যময় অবদান। এর প্রতিষ্ঠাফলকে লিখিত আছে—

রাধাকৃষ্ণ পদপ্রান্তে সোমসপ্তাঙ্ক গেশকে।
রঘুনাথ মহীনাথ তনয়োস্যোন্নতাশ্রয়ঃ।।
বীরসিংহ নরেশস্য ভীরবমানসংশয়া।
মহিষ্যাতি প্রমোদে নবরত্নংসমর্পিতং।।

এই মদনগোপাল জীউ বিগ্রহের শ্রীমন্দির তৈরি হয়েছিল মহারাজ বীরসিংহের দ্বিতীয় সহোদর মাধবসিংহের তত্ত্বাবধানে। তাই তাঁর নামে ঐ মহল্লার নাম করা হয়েছে মাধবগঞ্জ মহল্লা।" (পৃঃ—৮৬)।

মদনগোপালমন্দির এবং শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 'আর্কিয়লজিক্যাল্ সার্ভে অফ্ ইণ্ডিয়া' এবং অন্যান্য পুস্তকেও প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করা হয়েছে। তাছাড়া মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে দেখা যাচ্ছে এটি প্রথম থেকেই রাধাকৃষ্ণের মন্দির। সুতরাং এটি প্রথম থেকেই মদনগোপালের মন্দির ছিল বলেই অনুমিত হয়। জনশ্রুতির পিছনে সেরকম বলিষ্ঠ যুক্তি পরিলক্ষিত হয় না।

এ প্রসঙ্গে ইতি টেনে ফিরে আসি মদনগোপাল প্রসঙ্গে। মদনগোপাল হলেন গোপাল-কৃষ্ণ, কিশোর কৃষ্ণ। আর গোপালরূপী কৃষ্ণের অসাধারণ মাদনা শক্তির জন্যই তিনি মদনগোপাল, তথাপি এই বিগ্রহের রূপাবয়বে ঐশ্বর্যভাব প্রবল। মদনগোপাল সম্পর্কে কিছু বলতে গিয়ে শ্রীগুরুপ্রসাদ সরকার মহাশয় বলেছেন, "মদনগোপাল যেন বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর, প্রভু নারায়ণ, আর লালজীউ যেন গোপবালকের ভূমিকায় অবতীর্ণ।

উল্টোরথের রাত্রিতে মদনগোপাল জীউকে যখন পথে চতুর্দোলায় বার করা হয় তখন মনে হয় এক দণ্ডমুণ্ডের কর্তা রাজাধিরাজ যেন নগর পরিক্রমায় বেরিয়েছেন। বিগ্রহ ছোট হ'লে কি হয় ওঁর চোখ দুটি অপূর্ব। বিশেষ করে দাঁড়াবার ভঙ্গিটী অপূর্ব। মদনগোপাল জীউ দারিদ্র্য দশা ভোগ ক'রতে নারাজ। তাই ওঁর বেশভূষা থেকে ভোগরাগ সবই বেশ মূল্য দিয়েই যোগাড় ক'রতে হয়। মদনগোপাল জীউকে রাসপর্বের সময় যেভাবে সাজান হয় তাতে মনে হয় এইসব বিগ্রহকে কেন্দ্র করে এক জাতীয় শিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছিল মল্লভূমে। ঐভাবে কাপড় ও অঙ্গবস্ত্র পরানো কী সূক্ষ্মরুচি জ্ঞানের যে পরিচয় দেয়, তা চোখে না দেখলে বুঝা যায় না। বিষ্ণুপুরের বিগ্রহ সজ্জার সংগে বৃন্দাবনের বিগ্রহ সজ্জার অনেক মিল আছে কেবল একটি জায়গায় অমিল, সে হোল বিগ্রহের রূপসজ্জায় বাঙ্গালীয়ানা আরোপ করা। বাংলার ঘরের আনন্দদুলাল যেন ঐ বিগ্রহগুলি।" (মল্লসংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের রাসোৎসব, পৃঃ—৩৩)

এবার তাকিয়ে দেখুন কতগুলি বিগ্রহ রয়েছে এখানে। (১) শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালজীউ (বড়কর্তা), (২) শ্রীশ্রীরাধামদনমনোহরজীউ (মেজকর্তা), (৩) শ্রীশ্রীরাধামুরলীমনোহরজীউ

(ছোটকর্তা), (৪) শ্রীশ্রীরাধাজীবনজীউ, (৫) শ্রীশ্রীনাড়ুগোপালজীউ (২টি), (৬) শ্রীশ্রীগৌরনিতাইজীউ, (৭) রাম-লক্ষ্মণ-সীতা, এছাড়াও আছেন কয়েকটি শালগ্রাম শিলা। শ্রীবিগ্রহগুলির বর্ণনা দিতে গিয়ে গুরুপ্রসাদবাবু বলেছেন, "বাংলার ঘরের আনন্দদুলাল যেন ঐ বিগ্রহগুলি।" আবার পুরোহিত ঠাকুরগণ এবং বিষ্ণুপুরবাসীগণ যেন 'তুমি কর্তা আমি দাস' এই মহতী ভাবনায় আপ্লুত হয়ে গৃহকর্তার সম্মান দিয়ে তাঁদেরকে বড়কর্তা, মেজকর্তা, ছোটকর্তা প্রভৃতি ঘরোয়া সম্পর্কে আবদ্ধ করেছেন। কি আত্মিক সম্পর্ক! ভেবে দেখুন তো।

আপনাদের মনে হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে একই মন্দিরে এতো বিগ্রহের সমাবেশ কেন? উত্তরে বলি, বিষ্ণুপুরে তথা মল্লভূমে ছিল ৩৬০টি মন্দির এবং শত শত বিগ্রহ। পরবর্তীকালে অনেক মন্দিরই ভেঙে পড়েছে, দেবোত্তর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার পর মন্দিরের আয়ের উৎস কমেছে। মন্দির সংস্কার এবং শ্রীবিগ্রহগুলির ভোগরাগ, উৎসবাদির খরচ খরচা নির্বাহের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে বিরাট সমস্যা। মন্দির সংস্কার হয় না। নিত্যসেবাদি বন্ধ হবার উপক্রম। ভেঙে পড়া দেউল থেকে উপেক্ষিত বিগ্রহগুলি বিভিন্ন সময়ে এসেছেন এই শ্রীমন্দিরে এবং স্থানান্তরিত হয়েছেন অন্যান্য শ্রীমন্দিরে, আবার ক্ষেত্রবিশেষে স্থান পেয়েছেন রাজ-পরিবারে। যেমন রাধামুরলীমোহন-জীউ এসেছেন মহাপাত্র পাড়াতে অবস্থিত মুরলীমোহন-জীউ-এর মন্দির থেকে এবং পারিবারিক দেবতা রাধাজীবন জীউ এসেছেন বিষ্ণুপুরের রঘুনাথ সায়র মহল্লার অপুত্রক গোরাচাঁদ দিয়াসীর ঘর থেকে। আবার অনেক বিগ্রহ চুরি হয়ে চলে গেছেন অন্যত্র।

উপরোক্ত বিগ্রহগুলি ছাড়াও মদনগোপাল-মন্দিরের শ্রীঅঙ্গনের অগ্নিকোণে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন প্রস্তর নির্মিত বিশাল কলেবরের মহাবীর-মূর্তি। জনৈক সাধুমোহান্ত উক্ত শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে কথিত আছে। মহাবীর-মন্দিরের পশ্চিম দিকে রয়েছে বিষ্ণুপুর বোলতলা নিবাসী ঁনিমাই কর মহাশয়দের পারিবারিক শিব-মন্দির এবং শিবলিঙ্গ। মদনগোপাল-মন্দির সংলগ্ন পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি শোভিত এই যে নাটমন্দিরটি দেখছেন এখানে প্রতি সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতির পর নিয়মিতভাবে ভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, রামায়ণ, মহাভারত পাঠ এবং ঈশ্বরতত্ত্বের মনোজ্ঞ আলোচনা হয় আজও। ভক্ত সমাবেশ হয় মন্দ না।

মদনগোপাল-মন্দির প্রাঙ্গণে রয়েছে মহীরূহ আকৃতির একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ এবং তিনটি বকুল বৃক্ষ। সামগ্রিকভাবে এই মন্দির প্রাঙ্গণটি যেন কুঞ্জবিহারী শ্রীকৃষ্ণের বহু ঈপ্সিত বকুলকুঞ্জের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় বারংবার। আসুন এতাদৃশ একটি মনোরম পরিবেশে ছায়াশীতল বকুল বৃক্ষের বেদীমূলে বসে বসে শোনাই মঙ্গল আরতির কথা।

অধ্যায় - ৯২

মঙ্গল আরতি

প্রসঙ্গতঃ বলি, বিষ্ণুপুরে বেড়াতে আসা অল্পবয়স্ক কতিপয় পর্যটককে বলতে শুনেছি, 'কি আছে বিষ্ণুপুরে? বিগ্রহহীন গোটা কয়েক একই ধাঁচের মন্দির আর মজে যাওয়া গোটা কয়েক পুকুর।'

আপাতদৃষ্টিতে কিন্তু বিষ্ণুপুরকে তাই মনে হয়। স্থূল দৃষ্টিসম্পন্ন লোকেরা মাটির প্রতিমাতে মাটি, রং, কাপড়-চোপড়, গহনা এবং সাজ-সজ্জার পরিপাটিই দেখে থাকেন। অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন সিদ্ধ-সাধক কিন্তু তাঁর মর্মভেদী অন্তরপ্রসারী দৃষ্টিশক্তিবলে মৃন্ময় মূর্তিতে চিন্ময় সত্তার প্রকাশ অনুভব করেন, অভিভূত হন দৈবরূপ সন্দর্শনে। তাই বলি বিষ্ণুপুর মূলতঃ ঐতিহাসিক শহর, যার ভিত্তিভূমি হল অধ্যাত্মচেতনা ; যার মর্মমূলে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার অনুরণন। **তাই বিষ্ণুপুরকে দেখতে হলে দেখতে হবে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে, দেখতে হবে আধ্যাত্মিকতার আলোকে।**

ইতিহাস বলে শ্রীনিবাস আচার্যের কাছে দীক্ষা নেওয়ার পর মহারাজ বীর হাম্বীর গিয়েছিলেন বৃন্দাবন দর্শনে এবং শ্রীবৃন্দাবন দর্শনে মুগ্ধ হয়ে কোন এক দিব্য-ভাবে আপ্লুত হ'য়ে বিষ্ণুপুরকে বৃন্দাবনের ধাঁচে গড়তে চেয়েছিলেন আগাগোড়া। তারই ফলস্বরূপে বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমে দেব-মন্দিরের ছড়াছড়ি ; যেগুলিতে আবার শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের প্রাধান্যই পরিলক্ষিত হয় প্রভূত পরিমাণে। শ্রীকৃষ্ণ উপাসনার কেন্দ্রভূমি বিষ্ণুপুরে শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের ছড়াছড়ি। শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন নামানুসারে তাই তিনি মদনমোহন, রাধাকৃষ্ণ, কৃষ্ণরায়, মদনগোপাল, রাধাজীবনজীউ, রাধাযুগলকিশোর, রাধামদনমনোহর, রাধারসিক-নাগর, রাধামুরলীমোহন, রাধাগোপীনাথ, রাধারমণ, রাধাগোবিন্দ, রাধাশ্যাম, শ্যামরায়, রাধালালজী, বেণীমাধব, ডেঙ্গোরামকৃষ্ণ, নাড়ুগোপালজীউ, সাক্ষীগোপাল প্রভৃতি হয়েছেন। বহুনামে বহুরূপে বিষ্ণুপুরের শ্রীমন্দিরগুলিতে তিনি বিরাজিত।

বিষ্ণু-মন্ত্রে দীক্ষিত কৃষ্ণ-উপাসক রাজাধিরাজদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে বিষ্ণুপুরের রাজভক্ত প্রজা সাধারণের মধ্যে ঈশ্বর-চেতনার উন্মেষ হয় নিভৃতে নীরবে। এজন্যই অনেক পারিবারিক দেব-মন্দিরও পরিলক্ষিত হয় প্রায় সর্বত্র। রাজা থেকে ঈশ্বরভক্ত প্রজাগণ, ঈশ্বরভক্ত প্রজাগণ থেকে সর্বসাধারণের মধ্যে নিঃশব্দে নীরবে ক্রমশঃ সংক্রামিত হয় ঈশ্বরপ্রেমের মাধুর্যময় সুষমা। বৃন্দাবনের আলাভোলা গোপীগণের মতো গুপ্ত-বৃন্দাবন বিষ্ণুপুরে আজও এমন কিছু মানুষ লক্ষ্য করা যায় যাঁরা ঈশ্বর-উপাসক গৈরিকধারী সাধু-সন্ন্যাসী নন অথচ যাঁদের শ্বাসে-প্রশ্বাসে কৃষ্ণ, রক্তে কৃষ্ণ, মজ্জায় মজ্জায় কৃষ্ণ—এক কথায় কৃষ্ণগত-প্রাণ। থাক সেসব কথা। শুনুন মঙ্গল আরতির কথা।

বিষ্ণুপুরের মদনমোহন, মদনগোপাল এবং রাধালালজীউ মন্দির-প্রাঙ্গণে ফি-বছর বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ মাসে ভোর সাড়ে চারটা, পাঁচটার সময় মঙ্গল আরতি হয় নিয়মিত।

মঙ্গল আরতির এই ক্ষুদ্র মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানটি এমনই চিত্তাকর্ষক, এমনই মাধুর্যমণ্ডিত এবং এতো বেশি ভক্তিরসসমৃদ্ধ যে এর আকর্ষণ এক দুর্বার আকর্ষণ।

মঙ্গল আরতির প্রাক্কালে শ্রীমন্দিরের বদ্ধ দরজার সম্মুখে নাটমন্দিরে উপবিষ্ট এবং প্রতীক্ষমাণ কৃষ্ণগতপ্রাণ ভক্তগণ মন্দিরাভ্যন্তরে নিদ্রামগ্ন রাধাকৃষ্ণের ঘুম ভাঙানোর জন্য শ্রীখোল, করতাল, মৃদঙ্গ সহকারে সুললিত কণ্ঠে গাইতে থাকেন—

গা তুল হরি বংশীধারী
দ্যাখ বিভাবরী হইল ভোর।
অলস ত্যজিয়ে বসন পরিয়ে
মাখন খাও হে মাখন-চোর॥
গা তুল হরি...............হইল ভোর।

প্রভাত হইল সুখের নিশি
জাগিল জাগিল যত ব্রজবাসী
ডাকে কোকিলা শাখা-নিবাসী
শুকসারী নামে হইল ভোর।
গা তুল হরি..................হইল ভোর।।
ঐ দ্যাখ পূবে উদিত ভানু
হাম্বা হাম্বা রবে ডাকিছে ধেনু
গোষ্ঠে চলরে জীবন কানু কিশোর।
গা তুল হরি..................হইল ভোর।।
নয়ন মেলিয়া দ্যাখ গোপাল
আঙ্গিনায় কত ব্রজ রাখাল
শ্রীদাম সুদাম মধু মঙ্গলরাম
ডাকে হলধর দাদা রে তোর।
গা তুল হরি..................হইল ভোর।।
যশোমতী পদে প্রেমদাস ভাসে
জাগায়ে দে মা তোর পীতবাসে
পাপ দূর করি ওপদ পরশে
উঠ উঠ উঠ নন্দকিশোর।
গা তুল হরি................হইল ভোর।।

অথবা গাইতে থাকেন—

রাই জাগো, রাই জাগো
শুকসারী বলে।
(তুমি) কত নিদ্রা যাও গো রাধে
শ্যাম নাগরের কোলে।।
রাই জাগো, রাই জাগো
শুকসারী বলে।....................ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘুম-ভাঙানো-গান শেষ হয়ে আসে। অকস্মাৎ খুলে যায় শ্রীমন্দিরের দরজা। বিদ্যুতের আলো ঝলমল উজ্জ্বলতায় সমবেত ভক্তগণের নয়নযুগলে উদ্ভাসিত হন সদ্যোত্থিত রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি—আহা! কি জীবন জুড়ানো ভুবন-মোহন রূপ। আহা! কি প্রাণ জুড়ানো মিষ্টিমধুর রূপ, মনে হয় যেন সাক্ষাৎ দর্শন, মনে হয় যেন দেব-দেবীর প্রাণময় কোষের প্রাণবন্ত প্রকাশ।

শ্রীমন্দিরের দরজা খুলে যাওয়ার সাথে সাথে উপবিষ্ট ভক্তগণ শ্রীবিগ্রহদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থে দাঁড়িয়ে পড়েন শশব্যস্তে। পদকর্তা কৃষ্ণদাস কবিরাজের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দণ্ডায়মান ভক্তগণের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয় আরত্রিক গীতি।

আরতি জয় যুগলকিশোর
অতি শোভা বলিহারি।। (২)

দুই করে ধরি কনক-ঝারিরে..... হের রে.....(২)
তারা যে যার সেবা যোগায়িছে।
সেবা করা সখী সকলে যে যার সেবা যোগায়িছে।
আতর গোলাপ দিয়ে যে যার সেবা যোগায়িছে।
কিবা আতর গোলাপ ভারী ভরি
যুগল-অঙ্গে দেয় মিশাইয়ে
কত সৌরভ বলিহারি।।

তাল মান করত গান রে.....হের রে.....(২)
তারা গায়রে মনের অনুরাগে
শ্রীরাধা গোবিন্দ গুণ গায়রে মনের অনুরাগে।
বেণু, বীণা বাজে বিষাণ
মৃদঙ্গ মনোহরে।।

নব সহচরী সারি সারি রে.....হের রে (২)
তারা শ্যামকে ঘিরে দাঁড়াওল।
নব নব ব্রজগোপী রাধা শ্যামকে ঘিরে দাঁড়াওল।
করে করে ধরাধরি করি তারা শ্যামকে ঘিরে দাঁড়াওল।
চাঁদকে যেমন তারায় ঘিরে তেমনি করে দাঁড়াওল।
কিবা নৃত্য করত ঘেরি ঘেরি,
ঘেরি ঘেরি মুখ হেরি
আর কত গুণ গাওয়ে।।

হেম কমলিনী নীল কমলে
কিবা প্রফুল্ল বদনে অতীব উজল
এক মৃণালে দুটি কমল
কতই শোভা হয়েছে রে
দ্যাখ ললিতা, দ্যাখ সখী ঐ
কতই শোভা হয়েছে রে
গোলোকের প্রীত হয় নিরমল
কিবা আরতি-শঙ্খ বাজে।।

দুঁহু মুখ হেরি বাড়িল আনন্দ
কিবা চকোর-ভ্রমরে লাগালো দ্বন্দ্ব
গোপীবৃন্দ হই আনন্দ দ্বন্দ্ব হেরিবারে।
হাসিয়া ললিতে বিজনে কয়
তোদের দ্বন্দ্ব করা উচিত নয়
চাঁদ চকোর এক হয়
কপালে চন্দনের চাঁদ রমণীমোহন ফাঁদ।।

দুঁহু মুখ হেরি বাড়িল আনন্দ
কিবা চকোর-ভ্রমরে লাগালো দ্বন্দ্ব
তাদের আনন্দের আর সীমা নাই রে
রাধামাধবের বদন হেরি
আনন্দের আর সীমা নাই রে
রাধামদনগোপালের বদন হেরি
আনন্দের আর সীমা নাই রে
কৃষ্ণদাস করত আশ, পদ-পঙ্কজ তুহারি
আরতি জয় যুগলকিশোর অতিশোভা বলিহারি।। (২)

মন্দির অভ্যন্তরে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পুরোহিত ঠাকুরের শ্রীহস্তে দীপশিখা-প্রজ্বলিত ঝাড়-আরতি, পুষ্প, শঙ্খ ও চামর বীজনে চলতে থাকে নয়নাভিরাম আরত্রিক অনুষ্ঠান আর এদিকে ভক্তিগীতির কলিতে কলিতে ঝরতে থাকে ভক্তিসুধা। কষ্টিপাথরের কাল কুচ্‌কুচে কৃষ্ণ-বিগ্রহ এবং অষ্টধাতু নির্মিত সোনার বরণ শ্রীমতীও বোধ করি সেই ভক্তিরসে দ্রবীভূত হন ক্রমশঃ। আপাদমস্তক প্রাণবন্ত হ'য়ে ওঠেন শ্রীবিগ্রহদ্বয়।

জাগ্রত দেবতা বলতে কিঁ বোঝায় আমি জানি না, তবে মঙ্গল আরতির ঐ পুণ্যলগ্নে শ্রীশ্রীরাধামদনগোপাল-জীউ কিন্তু আমার নয়ন-যুগলে প্রাণময় সত্তায় উদ্ভাসিত হয়েছেন বারংবার।

এজন্যই বলি বিষ্ণুপুরকে জানতে হলে, বিষ্ণুপুরের আন্তর-সৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হলে, বিষ্ণুপুরের ঈশ্বরামৃত পান করতে হলে হতে হবে মধু-সঞ্চয়ী মধুমক্ষিকার মতোই আন্তরিক, অনুসন্ধিৎসু এবং নিষ্ঠাবান।

মঙ্গলারতির মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের আলোচনান্তে আমরা মানসচক্ষে দেখব এই মন্দির-চত্বরে উদ্‌যাপিত রাস-উৎসব। রাধামদনগোপাল-মন্দিরের শ্রীঅঙ্গনের সুরম্য বেদীমূলে বসে বসে শোনাব রাস-উৎসবের কথা।

অধ্যায় - ৯৩

শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালজীউ-এর মন্দির-প্রাঙ্গণে রাস উৎসব

রাধাকৃষ্ণের রাস উৎসব একটি পৌরাণিক উৎসব। রাসলীলা রাধা ও কৃষ্ণের মিলনোৎসব রূপে চিহ্নিত হলেও এ উৎসব প্রকৃতপক্ষে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার মিলনোৎসব। শ্রীবৃন্দাবনের ন্যায় গুপ্তবৃন্দাবনেও রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে সুদূর অতীত কাল থেকে। রাস উৎসব উদ্‌যাপনের জন্যই বিষ্ণুপুরে নির্মিত হয়েছিল সুবিশাল **'রাসমঞ্চ'**। অবশ্য এখন আর উক্ত রাসমঞ্চে কোন রাস উৎসব উদ্‌যাপিত হয় না। রাজদরবার সংলগ্ন মা মৃন্ময়ীর প্রাচীর ঘেরা উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হত আজ থেকে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে। সে সব এখন হয়ে গেছে ইতিহাস। বর্তমানে রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হয় দামোদর, বিষ্ণু, কৃষ্ণ ও রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহগুলির নিজ নিজ মন্দিরে বা রাস-মন্দিরে। ইদানিং অবশ্য এই মাধবগঞ্জ মহল্লায় শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালজীউ ও শ্রীশ্রীরাধালালজীউ-এর মন্দির প্রাঙ্গণে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের

রাসলীলা। কার্তিক অগ্রহায়ণ মাসের রাস-পূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে উদ্‌যাপিত হয় রাস উৎসব। চলতে থাকে পর পর পাঁচদিন। এই উপলক্ষ্যে বিষ্ণুপুর এবং বিষ্ণুপুরের সন্নিকটস্থ বহু রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ সহ গৌরনিতাই-আদি দেব-বিগ্রহের সমাগম হয়। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঐসব দেববিগ্রহগুলিকে শ্রীশ্রীমদনগোপাল জীউ-এর সুউচ্চ মন্দির চত্বরে 'বারাম'[১] দেওয়া হয়। সুদৃশ্য প্যাণ্ডেলের নীচে আলো-ঝলমল পরিবেশে, ফুলে ফুলে ফুলময় হয়ে অলঙ্কারাদিতে ভূষিত শ্রীবিগ্রহগুলি যখন ভক্তদের দর্শন দেন তখন এক স্বর্গীয় পরিবেশ রচিত হয় মন্দিরময় বিষ্ণুপুরে। ঁরাধামদনগোপাল জীউ, ঁমুরলীমোহন জীউ, ঁরাধামদনমোহন জীউ, ঁরাধারসিকনাগর জীউ, ঁরাধাগোপীনাথ জীউ, ঁরঘুনাথ জীউ, ঁডেঙোরামকৃষ্ণ জীউ, ঁনাড়ুগোপাল জীউ, ঁগৌরকিশোর জীউ এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু প্রভৃতি শ্রীবিগ্রহগুলির নয়নাভিরাম দৈবরূপ সন্দর্শনে ঈশ্বর-প্রেমিক মানুষেরা ধন্য হন। হন কৃতকৃতার্থ। উৎসবের সময় প্রত্যহ রাত্রি ন'টার সময় খোল করতাল এবং নামসংকীর্তন সহযোগে যখন সমবেতভাবে আরত্রিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তখন দেব-বিগ্রহগুলি যেন জীবন্ত এবং প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ঈশ্বর-বিশ্বাসী মানুষজনের নয়নযুগলে।

একক বা যুগলমূর্তি হিসেবে এখানে প্রায় ২৫ প্রস্ত দেব-বিগ্রহের সমাবেশ হয়। এসব বিগ্রহাদির প্রত্যেকটিরই রয়েছে আধ্যাত্মিক এবং ঐতিহাসিক পটভূমি। এখানে সমবেত সমস্ত দেব-বিগ্রহের বিষয়ে আলোচনার অবকাশের সুযোগের অভাবে মাত্র দুটি বিগ্রহের কথা শোনাব আপনাদের। প্রথমে শুনুন ঁগৌরকিশোর জীউ-এর কথা। পরে শোনাব ঁডেঙ্গোরামকৃষ্ণ জীউ-এর কথা।

গৌরকিশোর সত্য সত্যই গৌরকিশোর। চোখ জুড়ানো চমকপ্রদ সুঠাম চেহারা। অপরূপ রূপমাধুরী।

অষ্টধাতু নির্মিত প্রায় ২১ ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট এই গৌরকিশোর জীউ আসলে কৃষ্ণবিগ্রহ। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে কেন তিনি গৌরকিশোর? বা গৌরকৃষ্ণ? অভিধান বলে গৌর মানে শ্বেত বা শুভ্র, আর কিশোর মানে এগার থেকে পনের বছর বয়সের বালক বা শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং গৌরকিশোর বলতে বোঝায় শ্বেত-শুভ্র বর্ণের কিশোর-বয়সী কৃষ্ণ। ভাবতে গিয়ে ভাবনায় হোঁচট খাই এখানেই, কারণ কৃষ্ণ তো কালো—শ্বেত বর্ণ হবেন কোন দুঃখে। তাৎক্ষণিকভাবে ভেতর থেকে উত্তর আসে— **কৃষ্ণ কালো নন, কৃষ্ণ সব সময় শ্বেত অর্থাৎ সাদা অর্থাৎ আলো অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ। বহিরঙ্গে তিনি কালো, অন্তরঙ্গে তিনি আলো। জীবের সমস্ত কালিমা গ্রাস করেন বলেই বহিরঙ্গে তিনি কালো, আবার কৃষ্ণ উপাসনায় জীবের কালিমা নাশ হয়, হৃদয়ে জ্বলে জ্ঞানের আলো—এই সুবাদেই তিনি আলো, তাই তো তিনি শ্বেত।** উক্ত বিগ্রহটিতে যেহেতু কিশোর কৃষ্ণের মাধুর্য বিধৃত হয়েছে সেহেতু তিনি যুগ্মভাবে গৌরকিশোর জীউ।

পারিবারিক দেবতা হিসেবে গুপ্তবৃন্দাবনে সারা বছরই গুপ্ত অবস্থায় থাকেন শ্রীশ্রী-গৌরকিশোর জীউ। শুধুমাত্র কার্তিক/অগ্রহায়ণ মাসের রাস উৎসব উপলক্ষ্যে মাত্র পাঁচদিনের জন্য তিনি তাঁর দৃষ্টিনন্দন ভুবনমোহন রূপ নিয়ে সমাগত হন বিষ্ণুপুর মাধবগঞ্জ মহল্লার শ্রীশ্রীমদনগোপাল জীউ-এর শ্রীমন্দিরে। ভক্তদের দর্শন দেন বহুরূপে

---

১ বারাম—জনসাধারণের দর্শনার্থে কোন মন্দির-চত্বরে, মণ্ডপে বা বিশেষ স্থানে সুসজ্জিত বিগ্রহগুলি সুউচ্চ বেদীতে সংস্থাপন করা।

রূপবান হয়ে। পাঁচদিনের প্রতিদিনই নিত্য নতুন রূপ পরিগ্রহ করেন তিনি। প্রথম দিনে হয়তো বংশীধারী দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ। দ্বিতীয় দিনে তীর-ধনু ও বংশীধারী চতুর্ভুজ বিশিষ্ট রামকৃষ্ণ। তৃতীয় দিনে হয়তো বা রামচন্দ্রের তীর-ধনু, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশি এবং গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর শ্রীহস্তশোভিত দণ্ড-কমণ্ডলুধারী ষড়ভুজ। চতুর্থ দিনে আর এক রূপ। পায়ে নূপুর, কোমরে বটফল এবং বাঁশি, দু'হাতের বাহুতে এবং গলায় সোনার মাদুলি আর মাথায় পাগড়ি বেঁধে রাখাল সাজে সুসজ্জিত হয়ে বক্ষস্থলে একটি ধাতুনির্মিত গোবৎস ধারণ করে চলেছেন গোচারণে। পঞ্চম দিনে হয়তো দেখা যায় বর্গী তাড়ানোর উদ্দেশ্যে শ্রীশ্রীমদনমোহনের রূপ পরিগ্রহ করে সর্বাঙ্গে বারুদের কালিঝুলি মেখে ঘোড়ায় চড়ে দলমাদল কামানে আগুন দিচ্ছেন রোষ-কষায়িত নয়নে। আবার কখনো হয়তো বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট বংশীধারী চপল-কৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্রহরণের লীলাখেলায় মত্ত। গৌরকিশোর জীউ-এর একই অঙ্গে কত রূপ। তাই বলছিলাম বহুরূপে বহুরূপী তিনি।

এ ধরনের বহুরূপী বিগ্রহ বড় একটা চোখে পড়ে না বিষ্ণুপুরে কিংবা বিষ্ণুপুরের বাইরে। এতদর্থে গৌরকিশোর জীউ অসাধারণ, অভিনব। এরকম একটি সুচারু বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পিছনে রয়েছে আনন্দাশ্রু মেশানো বেদনা-বিধুর কিছু স্মৃতিকথা।

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগের কথা। বিষ্ণুপুরের রঘুনাথসায়র পাটরাপাড়া মহল্লাতে অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ এবং বিষ্ণুভক্ত মানুষ ছিলেন একজন। তিনি হলেন পূর্বোল্লিখিত বিষ্ণুচরণ খাঁ। খাঁ মশায় প্রতিপত্তি সম্পন্ন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। জাতিতে তন্তুবায় এবং পেশাতে ব্যবসায়ী এই মানুষটির রেশম-বস্ত্রের ব্যবসা ছিল। ছিল জমি-জায়গা আর অন্তরে ছিল বিষ্ণুভক্তি-রূপ অপরিমেয় অপার্থিব ঐশ্বর্য। বিষ্ণুভক্ত রূপে বিশেষ পরিচিতি থাকার দরুন সাধু-সন্ত এবং বিষ্ণু-উপাসক বৈষ্ণবগণের প্রায়ই শুভাগমন ঘটতো তাঁর বাটিতে। সুদূর বৃন্দাবন থেকে মাঝে মধ্যে আসতেন স্বরূপ দাস বাবাজী। এভাবে চার দেওয়ালের মাঝে ঘরে বসে বসেই সাধু-সঙ্গ লাভ করতেন ভক্তপ্রবর ঁবিষ্ণুচরণ খাঁ। পরবর্তীকালে স্বরূপ দাস বাবাজীর সঙ্গে তিনি যান বৃন্দাবনধামে। বৃন্দাবনের গৌরকিশোর জীউ-এর অনিন্দ্যসুন্দর রূপ গেঁথে যায় তাঁর অন্তরে। যথাসময়ে ফিরে এলেন বৃন্দাবনধাম থেকে, কিন্তু কিছুতেই আর ভুলতে পারেন না নয়ন-মনোহর গৌরকিশোরকে। শ্রীবৃন্দাবনের গৌরকিশোর জীউ যেন তার নয়ন যুগলে উদ্ভাসিত হয়ে থাকেন সারাক্ষণ। চুম্বক যেমন লৌহকে টানে, গৌরকিশের জীউও যেন তাঁকে টানতে থাকেন দিবানিশি। গৌরকিশোর জীউ বিহনে প্রাণ যায় যায় অবস্থা তাঁর। সুতরাং গৌরকিশোর চাই-ই চাই।

বৃন্দাবনের গৌরকিশোরের অনুরূপ অষ্টধাতুর গৌরকিশোর নির্মিত হল বিষ্ণুপুরে। নির্মাণ করলেন বিষ্ণুপুর কাইতিপাড়া নিবাসী ওস্তাদ শিল্পী ঁগোষ্ঠ কাঁসারী। শিল্পীর মতো শিল্পী ছিলেন গোষ্ঠবাবু। গৌরকিশোর জীউ-এর মূল মূর্তিটি হল বংশীধারী দ্বিভুজ কৃষ্ণের অনুরূপ। এই বিগ্রহের শ্রীঅঙ্গের অপরাপর চারটি হাত এবং একজোড়া পা জুড়ে দেওয়া বা খুলে নেওয়া যায় সহজ সরল পদ্ধতিতে। কথিত আছে অত্যন্ত শ্রীদর্শন এবং সুঠাম এই শ্রীবিগ্রহ ঢালাই করার অব্যবহিত পরেই গোষ্ঠবাবু নাকি অন্ধ হয়ে যান চিরতরে। আজ আর সেই শিল্পী নেই, কিন্তু শিল্পীর শিল্পকর্মের নিদর্শন স্বরূপ রয়ে গেছেন গৌরকিশোর জীউ। ১৩২৯ বঙ্গাব্দের ১৫ই ফাল্গুন মাঘীপূর্ণিমার পুণ্য লগনে উক্ত শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় মহাধুমধাম সহকারে।

নিরামিষাশী এবং নিঃসন্তান বিষ্ণুচরণ খাঁ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করার পর গৌরকিশোরকে নিয়েই মেতে থাকেন জীবনের বেশির ভাগ সময়ই। দিবারাত্রির প্রহরে প্রহরে ঠাকুরের সেবা, পূজা এবং ভোগরাগ আরতি চলত রাজকীয়ভাবে। নিয়মিত নিত্যসেবাদি ছাড়াও ঝুলন, রাস, দোলযাত্রা, অন্নকূট উৎসব উদ্‌যাপিত হত মহাসমারোহে। সেসব কথা গল্প হয়ে গেছে এখন। পরবর্তীকালে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ২২শে ফাল্গুন শ্রীশ্রীগৌরকিশোর জীউ-এর জন্য নির্মিত হয় বৃহদাকার নাটমন্দির সহ দোলমঞ্চ। দোলমঞ্চ সহ নাটমন্দিরটি নির্মাণ করতে গিয়ে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। দেখা দেয় অর্থাভাব। তৎকালে বিষ্ণুপুর বোলতলা মহল্লাতে মালদহের মুন্সীদের একটি রেশম সুতোর দোকান ছিল। দোকানটির নাম 'ইমারৎ উল্লা নাদাব করিম মুন্সী'। রেশম বস্ত্রের ব্যবসার সূত্রে কাঁচা মাল অর্থাৎ রেশম কেনার সূত্রে ঁবিষ্ণুচরণ খাঁ মহাশয়ের সাথে অর্থ আদান প্রদানের সম্পর্ক ছিল তাঁদের। নাটমন্দির নির্মাণ করতে গিয়ে অর্থাভাব দেখা দিলে পূর্বোক্ত দোকানের মালিক মুন্সীদের নিকট চড়া সুদে টাকা ধার নেন। বন্ধক রাখেন দেবোত্তর জমি। কিন্তু সময়মত টাকা শোধ দিতে না পারায় শুরু হয় মামলা মোকদ্দমা। ঠাকুরের জমির উৎপাদিত ফসল থেকে বাৎসরিক সাড়ে সাত মাপ সাজার ধান দিতে স্বীকৃত হওয়ায় সাময়িকভাবে মামলার নিষ্পত্তি হয়। কথিত আছে লীলাময় ঠাকুরের এই অগ্নিপরীক্ষায় অর্থাৎ কিনা দেবোত্তর জমির ধান অপরের হাতে তুলে দেওয়ার মর্মবেদনায় ঈশ্বরগতপ্রাণ বিষ্ণুচরণ খাঁ দিনের পর দিন আহার নিদ্রা ত্যাগ করে শ্রীশ্রীগৌরকিশোর জীউ-এর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করে বিষ্ণুচরণ নামের সার্থকতা বজায় রেখে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার পুণ্যতিথিতে অর্থাৎ মাঘী-পূর্ণিমার দিনে শ্রীবিগ্রহের চরণতুলসী মুখে নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, বোধ করি ভগবান বিষ্ণুর চরণে বিলীন হয়ে যায় ভক্তবর বিষ্ণুচরণের পবিত্র আত্মা। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।।

পরবর্তীকালে বিষ্ণুচরণ খাঁ মহাশয়ের পত্নী ঁরাই কিশোরী, মুন্সীদের বিরুদ্ধে মামলা করে ফিরে পান জমি এবং জমির ধান। বর্তমানে এই শ্রীবিগ্রহটি রয়েছে ঁবিষ্ণুচরণ খাঁয়ের পারিবারিক সূত্রে উত্তরাধিকারী গৌরদাস খাঁ এবং শ্রীকৃষ্ণদাস খাঁ মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে।

আজ আর বিষ্ণুচরণ খাঁ নেই। কিন্তু রয়ে গেছেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত গৌরকিশোর জীউ। প্রবাদ-পুরুষ হয়ে রয়ে গেছেন ঁবিষ্ণুচরণ খাঁ। গৌরকিশোর জীউ এর শ্রীবিগ্রহটিই যেন আজ ঁবিষ্ণুচরণ খাঁ মহাশয়ের স্মৃতিস্মারক রূপে রয়েছেন দেদীপ্যমান অবস্থায়।

ঁগৌরকিশোর জীউ-এর প্রসঙ্গে ইতি টেনে এবার সংক্ষেপে শোনাই শ্রীশ্রীডেঙ্গোরামকৃষ্ণ জীউ-এর কথা। বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে রয়েছে সাবড়াকোণ গ্রাম। মহারাজ বীরসিংহদেব (১৬৫৬-১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দ) সাবড়াকোণ গ্রামে শ্রীশ্রীডেঙ্গোরামকৃষ্ণ জীউ-এর শ্রীমন্দির এবং শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু শ্রীগুরুপ্রসাদ সরকার মহাশয় ডেঙ্গোরামকৃষ্ণ জীউ সম্বন্ধে তাঁর 'মল্লসংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের রাসোৎসব' গ্রন্থে লিখেছেন—

"....বিষ্ণুপুরের রাসোৎসবে যেসব বিখ্যাত এবং প্রবল প্রতাপান্বিত কৃষ্ণবিগ্রহের সমাবেশ হয় তাঁদের মধ্যে শ্রীশ্রীডেঙ্গোরামকৃষ্ণ জীউ বড়ই দৃষ্টি আকর্ষক। এক সময় ইনি বড়ই জাগ্রত ছিলেন। প্রবাদ আছে এঁর মন্দিরের চূড়াকে পরিক্রমা করে তবে আকাশের পাখি পার হ'তে পারত। এঁকে লঙ্ঘন করার সাধ্য উড্ডীয়মান বিহঙ্গকুলেরও ছিল না।

মল্লভূমের সাবড়াকোণ গ্রাম। তখন ছিল ঘন অরণ্যে ঢাকা। কয়েক শতাব্দী পূর্বে ওখানে এলেন পশ্চিমদেশীয় এক সন্ন্যাসী। পুরন্দর নদীর তীরে তিনি নির্মাণ করলেন এক পাতার কুটির। শুধু লোটাকম্বল সম্বল সন্ন্যাসী। তাঁর ছিল দুটি বিগ্রহ একটি ঝুলির ভিতর। লোকালয়ে মাধুকরী করে তিনি জুটাতেন ঐ দুটি বিগ্রহের ভোগ। ভোগ লাগিয়ে তিনি প'ড়তি বেলায় আহার ক'রতেন তাঁদের প্রসাদ। সাধু যখন ভিক্ষায় যেতেন তখন রামকৃষ্ণ বিগ্রহদ্বয় হয় খেলা করতেন, না হয় কাষ্ঠাহরণে যেতেন নবীন কিশোর মূর্তি পরিগ্রহ করে। রাজা শ্রী বীরসিংহ এলেন মৃগয়াতে। সে সময় মল্লভূমের চতুর্দিকে গভীর জঙ্গল ছিল। ঐসব জঙ্গলে চিতাবাঘ, হরিণ, ভালুক, ঘোড়া ও হাতি পর্যন্ত পাওয়া যেত। রাজা মৃগয়ায় এসে সাধুর কুটির প্রান্তে বিশ্রাম ক'রছিলেন। তিনি একা এবং বড় ক্লান্ত ছিলেন। ঘাসের উপর শুয়ে পড়লেন মহারাজ বীরসিংহ। হঠাৎ কাদের কথা শুনে তিনি জেগে উঠলেন। সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন দুই চিরসুন্দর নবীন কিশোরকে। ছেলে দুটি কাদের?—ভাবছেন রাজা। ঠিক সেই সময় একটি আম এনে ওদের একজন দিলেন রাজাকে। রাজা সেই আমটি খেয়ে যেন প্রাণ পেলেন। তাঁর অন্তরে কি এক ভাবের সৃষ্টি হলো তা কে ব'লবে? আম খেয়ে রাজা নদীতে হাত-মুখ ধুয়ে যখন পিছন ফিরলেন দেখলেন কেউ কোথাও নাই। এমন সময় সাধু এলেন সেখানে। সাধুকে দেখে তিনি দুটি অন্তর্ধানী কিশোরের সম্বন্ধে জানতে চাইলেন তাঁর কাছ থেকে। কিন্তু কে বলবে তাদের কথা? সাধু ভিক্ষান্ন এনে রন্ধন শুরু ক'রলেন। তৈয়ারি ক'রলেন ভোগ। এরপর ভোগ নিবেদন করে প্রসাদ পেলেন নিজে আর রাজাকেও দিলেন সেই মহাপ্রসাদ। কিন্তু একি? রাজার বাক্‌শক্তি যেন কে হরণ করে নিয়েছে? রাজা কাদের দেখছেন অক্ষির সম্মুখে? এরা যে সেই বালকদ্বয়। তাদেরও যে পরণে এই বেশ, তাদেরও যে চাউনী এমনি ছলনায় ভরা। এবার রাজা পরিচয় দিলেন তিনি মহারাজ বীরসিংহ। তিনি বিগ্রহ দুটি চাইলেন সাধুর কাছে। সাধু দিতে চাইলেন না কোনমতে। অবশেষে পরদিন একটি বিগ্রহ রাজার হাতে অর্পণ করে বল্লেন, 'এঁরা দুই ভাই—কৃষ্ণ আর বলরাম। এঁদের এক ভাইকে দিয়ে গেলাম।' যাবার সময় বিগ্রহটির নামটি বলতে ভুললেন সাধু। রাজা মন্দির প্রতিষ্ঠা করে বিগ্রহটিকে স্থাপন করতে যেয়ে মহা সমস্যায় প'ড়লেন। ইনি কে? রাম? না কৃষ্ণ? অবশেষে রামকৃষ্ণ নাম দিয়েই ওঁকে স্থাপন করা হল মহান ঘটা করে। **পরবর্তীকালে ওঁর রাধা নাই বলে প্রাকৃতজন ওঁর নাম রাখলো ডেঙ্গোরামকৃষ্ণ।** ডেঙ্গোরামকৃষ্ণ সাধুর কাছে চোঁয়াপড়া খেতেন বলে আজও ভোগের সঙ্গে ওঁর পায়েসান্নকে চোঁয়াপড়া করে দেওয়া হয়। এই চোঁয়া ভোগ না হলে ঠাকুর খেতে পারেন না। বোধ হয় ঐ চোঁয়া পায়েস খেতে খেতে তিনি তাঁর প্রয়াত-পিতা অর্থাৎ সাধুকে স্মরণ করেন।" (পৃষ্ঠাঃ— ৩৫-৩৬)

মাধবগঞ্জ মহল্লার রাস উৎসব প্রসঙ্গে দুটি দেব বিগ্রহের বর্ণনা করলাম সংক্ষেপে। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলতেই হয়। **সেটি হল গত ২০০১ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ ১৪০৮ বঙ্গাব্দ থেকে কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লাতেও রাস উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে সাড়ম্বরে। আগে হত সাদামাটাভাবে। সেখানেও বহু রাধা-কৃষ্ণ ও গৌর-নিতাই বিগ্রহের সমাবেশ হয়।**

ঐ শুনুন মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং ঢং। ঠাকুরকে অন্নভোগ নিবেদন করা হবে এখন। আমরা আজ এখানেই ঠাকুরের প্রসাদ পাব যৎসামান্য প্রণামীর বিনিময়ে। প্রসাদ পাওয়ার পর নতুন উদ্যমে আমরা এগিয়ে যাব বড়ামতলা অভিমুখে।

অধ্যায়-৯৪

বড়াম ঠাকুর

বড়ামতলা

এই সেই বড়ামতলা। একটি আঁকড় গাছ, একটি বন্না গাছ ও একটি অশ্বত্থ গাছ— এই তিনটি গাছকে কেন্দ্র করে দুটি রাস্তার সংযোগস্থলের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের ছায়া-শীতল বৃক্ষমূলে রচিত হয়েছে বড়মতলা বা বড়ম পূজার থান। বড়ম ঠাকুরের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তার গুণে মহল্লাটির নাম হয়েছে বড়মতলা। লোকমুখে বড়মতলা, বড়ম পূজা বা বড়ম ঠাকুর কথাগুলি শোনা গেলেও এটি হল বড়ামতলা, পূজাটি হল বড়াম পূজা, কারণ ঠাকুরের নাম বড়ম নয়, বড়াম। বড়াম শব্দটি অপভ্রংশে হয়েছে বড়ম।

বড়ামতলার পূর্বোক্ত বৃক্ষত্রয়ীর নিম্নে নির্মিত হয়েছে সিমেন্টের বেদী। তন্মধ্যে আঁকড় গাছের নীচের বেদীটি দেবস্থান-রূপে চিহ্নিত। বছরে মাত্র একটি দিন অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির দিন পূর্বোক্ত আঁকড় বৃক্ষমূলে অনুষ্ঠিত হয় বড়াম পূজা। এই অঞ্চলের বড়াম ঠাকুর হলেন বিষ্ণুপুর কৃষ্ণগঞ্জ নিবাসী বাউরী পাড়ার বাউরী সম্প্রদায়ের পরমারাধ্য দেবতা। প্রায় চার ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট ধাতুনির্মিত একটি হাতি মূর্তি হল বড়াম ঠাকুরের প্রতীক। উক্ত ঠাকুরের প্রতীকের সাথে এখানে পূজিত হয় ঢোকরা শিল্পীদের তৈরি ধাতুনির্মিত ছোট বড় আকৃতির তিন থেকে নয় ইঞ্চি উচ্চতা বিশিষ্ট আরো আটটি হাতিঘোড়া মূর্তি। মকর সংক্রান্তির দিন দিবাভাগের তৃতীয় প্রহরের শেষ যামে পুরোহিতের ঘর থেকে পূর্বোক্ত বড়াম ঠাকুরের সাজ মাদল বাজিয়ে এবং বাবার নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে নিয়ে আসা হয় বড়াম তলায়। স্থাপন করা হয় শত শত চাঁদমালা সুশোভিত বৃক্ষত্রয়ের পাদদেশের আল্পনা অঙ্কিত বেদীর উপর। অতঃপর শুরু হয় পূজা। অতীতেও এইভাবেই শুরু হত পূজা। তখন পূজা করতেন ৺রাম বাউরী।

৺রাম বাউরীই বড়াম ঠাকুরের আদি পুরোহিত। রাম বাউরীর পর বংশানুক্রমে পূজা করেছেন ৺মহান্তি বাউরী, ৺ইন্দ্র বাউরী, ৺নিতাই বাউরী। বর্তমানে পূজা করেন নিতাই বাউরীর পুত্র ঝণ্টু বাউরী। ৺রাম বাউরীর বংশধরগণ পাঁচ পুরুষ যাবৎ অত্যন্ত শিষ্টাচার এবং নিষ্ঠা সহকারে পূজা করে আসছেন বড়াম ঠাকুরের। বয়সের হিসাবে বড়াম ঠাকুর কত দিনের পুরানো সে কথার উত্তরে শুধু জানা গেল বড়াম ঠাকুর হলেন তাঁদের পাঁচ পুরুষের পুরানো ঠাকুর। অর্থাৎ বড়াম ঠাকুর মোটামুটিভাবে শ'দেড়েক বছরের পুরানো ঠাকুর।

আদি পুরোহিত ৺রাম বাউরীর সময়ের কথা। বড়াম পূজা করছিলেন তিনি। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সহ ভক্তজনের ভিড়ে থিক্ থিক্ করছিল পূজাঙ্গন। মাদল বাজছিল 'ধিন চাক্ ধিন চাক্' বোল তুলে। ধূপ-ধুনার গন্ধে, মাদলের বোলে আর কিশোর কিশোরীদের কোলাহলে মেতে উঠেছিল পূজা-প্রাঙ্গণ। এমন সময় পাইক পেয়াদা নিয়ে হাতিতে চড়ে বড়াম তলার রাস্তা দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিলেন বিষ্ণুপুরের রাজা। হাতিতে চড়ে রাজা মহাশয়কে আসতে দেখে সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দেন বয়োজ্যেষ্ঠগণ। পথ ছাড়ে না বালক-বালিকাগণ। পরন্তু হস্তীপৃষ্ঠারোহী মহারাজের গায়ে ছুঁড়তে থাকে রাস্তার ধুলোবালি। ধুলোবালির আবীরে কিম্ভূতকিমাকার রাজা তো রেগে অগ্নিশর্মা। রুষ্ট রাজা উদ্ধত

ছেলেদের রাজদরবারে বেঁধে নিয়ে যেতে আদেশ দেন। পাইক পেয়াদাগণ রাজ-আদেশে তৎক্ষণাৎ দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলে ছেলেদের। এবার নিয়ে যাবে রাজদরবারে। কিন্তু বিপত্তি ঘটল হাতিকে নিয়ে। হাতি সেই যে বসে পড়েছে হাঁটু মুড়ে, ওঠে না আর কিছুতেই। ক্রুদ্ধ মাহুতের তীক্ষ্ণ অঙ্কুশের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে প-অ-ক প-অ-ক আওয়াজ তুলে প্রকাশ করে আর্তনাদ, প্রকাশ করে তীব্র যন্ত্রণা। অনড় অচল হাতিকে আর ওঠানো যায় না কিছুতেই। ব্যাপার দেখে মাহুত, মহারাজ, পাইক, পেয়াদা এবং সমবেত লোকজন সকলেই তো অবাক। ওদিকে ফুল পড়ে না ঠাকুরের। এমতাবস্থায় বড়ামতলা-নিবাসী রক্ষিত পরিবারের জনৈক অশীতিপর বৃদ্ধ সাহসে ভর করে এগিয়ে যান রাজার কাছে। সানুনয়ে নিবেদন করেন মনের কথা। বলেন, 'ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা বড়াম ঠাকুরের খুবই প্রিয়। শিশু-প্রেমিক বড়াম ঠাকুরের পূজার অপরিহার্য অঙ্গ হল 'ধুলো-কম্বল' খেলা। পূজার সময় রুমাল মাপের কম্বলের টুকরো, অভাবে কাপড়ের টুকরোতে ধুলো ভরে ঠাকুরের গায়ে ছোঁড়া হয় ধুলো, আর জাতিধর্ম এবং পদমর্যাদার পার্থক্য ভুলে দর্শনার্থীদের গায়েও ছোঁড়া হয় ধুলো-বালি। সুতরাং এটা শিশুদের অপরাধ নয়—পূজারই অঙ্গ। হুজুর যেন নিজ গুণে মাপ করে দেন নিরপরাধ শিশুদের।'

কথাগুলি শুনে চৈতন্যোদয় হয় রাজার। রাজ-আজ্ঞায় খুলে দেওয়া হয় ছেলেদের বাঁধন। মুক্তি পেয়ে বালকবর্গ করতালি দিয়ে সমবেত ভাবে মুখে 'ওবো' 'ওবো' ধ্বনি তুলে নাচতে থাকে সানন্দে। ঠাকুরের মাথার ফুল খসে পড়ে নিমেষে। অনেকে হয়তো মনে করতে পারেন 'ওবো' 'ওবো' দিয়ে ছেলেরা রাজাকে অপমান করেছে। মোটেই তা নয়। বড়াম ঠাকুর ফুল না দিলে ছেলেরা পুনঃ পুনঃ 'ওবো' 'ওবো' দিলেই ঠাকুর লজ্জা পান এবং ফুল না দিয়ে পারেন না। ডিহরের (ষাঁড়েশ্বরের) মা ভবানীর সাথে ন্যাংটাপুটো ছেলেপুলেদের যেমন নিবিড় সম্পর্ক, বিষ্ণুপুরের বড়াম ঠাকুরের সাথে ছোট ছেলেদের যেন তার থেকেও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। মা তো ছেলেদের ভালবাসবেনই। কারণ ছেলে যে মায়ের নাড়ি-কাটা-ধন। কিন্তু বুড়া বাবার বাৎসল্য-রস তথা শিশুপ্রীতি সত্যই বিস্ময়কর ঘটনা।

ছেলেপুলেদের 'ওবো' 'ওবো' ধ্বনিতে ওদিকে ফুল পড়ে ঠাকুরের, আর এদিকে মুহূর্তে নড়েচড়ে উঠে দাঁড়ায় হাতি। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান রাজা। বিস্ময়ের ঘোর কাটতেই তিনি বড়াম পূজাতে সমবেত বাউরী সম্প্রদায়ের দু-তিনজন ব্যক্তিকে ডেকে দু-একদিনের মধ্যে তাঁর সাথে রাজদরবারে দেখা করতে বলেন। আদেশ শুনে সকলেই ভয়ে জড়সড়। কিন্তু অমান্য করার উপায় নেই। ভয়ে ভয়ে উপস্থিত হলেন রাজপ্রাসাদে। রাজা স্বয়ং সাদর আমন্ত্রণ জানান তাঁদের। জানতে চান বড়াম ঠাকুরের জন্য কি কি চাই তাদের—নিষ্কর জমি, জঙ্গল, টাকা-কড়ি?

"ওসব কিছুই চাই না আমাদের।"

"কিছুই চাই না!" বিস্ময় প্রকাশ করেন রাজাবাহাদুর।

"হুজুরের যখন কিছু না কিছু দেবার একান্ত ইচ্ছা, তখন বড়াম পূজার সময় ফি বছর একজোড়া পোড়া মাটির ঘোড়া ও একটি বড়-সড় হাতি দিলেই আমরা খুশি।" নিবেদন করেন আর একজন।

রাজা মহারাজ সাথে সাথে কুমোর ডাকিয়ে কুমোরকে প্রচুর নিষ্কর জমি দান করে তার বিনিময়ে প্রতি বছর বড়াম পূজাতে হাতি-ঘোড়া দেওয়ার বন্দোবস্ত করে দেন

পাকাপাকিভাবে। এই ঘটনার পর থেকেই রাজানুকূল্য লাভ করে বড়াম পূজা। হাতি ঘোড়ার পাশাপাশি, খই, নাড়ু, খড়্গ ইত্যাদিও দান করেন তিনি। বড়াম পূজার একটি গানে তাই গাওয়া হয়—

ধন্য বাবা বড়াম ঠাকুর
প্রণাম করি শ্রীচরণে
রাজার মানসিক হাতি-ঘোড়া
খই-লাড়ু আর চাঁদমালা
বলিদানে দিলেন খাড়া
রুধির পান কর বদনে।
ধন্য বাবা বড়াম ঠাকুর
প্রণাম করি শ্রীচরণে।
বনফুলে তার পূজা দিলেন
আবার গঙ্গাজলে গেঁদা ফুলে
মাখাইলে চুয়া-চন্দনে
কে বুঝিবে তোমার লীলা
বালক সঙ্গে কর খেলা
আবার সকলেতে ধুলা-বালি
ওবো ওবো দেয় এখানে।
ধন্য বাবা বড়াম ঠাকুর
প্রণাম করি শ্রীচরণে।

পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে বড়াম ঠাকুর হলেন বহুমান্য লৌকিক দেবতা। তাঁর পূজার প্রধান উপকরণ হল চাঁদমালা, খই-নাড়ু, তিল ও নারকেল-নাড়ু। সিধা হিসেবে সিদ্ধ চাল, ডাল, আলু, বেগুন, পটল, ঝিঙে, পেঁপে প্রভৃতি সব্জি এবং ফল-মূল দেওয়া হয়। এছাড়া বাজারে চালু হরেক রকমের মিষ্টান্ন তো আছেই। মানসিক শোধ হিসাবে সোনা-রূপার গহনা ছাড়াও বাবার থানে জমা পড়ে পোড়ামাটির অসংখ্য ছোট ছোট হাতি-ঘোড়া। বাবা-বুড়া বড়মের পূজার বিশেষ আকর্ষণ হল বরা বা শুয়োর বলিদান। প্রায় আট দশটি শুয়োর বলি দেওয়া হয় বছরে বছরে।

পূজার আমেজ বা ছোঁয়া লাগে চাঁউড়ি দিন থেকেই। বাচ্চাদের মুখে মুখে ধ্বনিত হয়—

আজ চাঁউড়ি কাল বাঁউড়ি
পরশু দিনে বড়ম তলায় দৌড়াদৌড়ি।

পুরোহিতকে চাঁউড়ির দিনে নিরামিষ আহার করতে হয়। বাঁউড়ির দিন সারাদিনই নির্জলা উপবাসে থেকে রাত্রি নিশীথে (রাত্রি বারোটার সময়) পুকুরে স্নান করে পুকুরের জল এনে ভিজে কাপড়ে একপাকে রান্না করে হবিষান্ন গ্রহণ করার নিয়ম। পূজার দিন অর্থাৎ মকর সংক্রান্তির দিন রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে পূজা শেষ না হওয়া পর্যন্ত উপবাসে থাকতে হয়। বড়াম পূজায় পুরোহিতকে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেন 'বারো-বেড়া' আখ্যায় ভূষিত আরো বারো জন ব্যক্তি। পূজার দিন উপবাসে থাকেন তাঁরাও।

সমবেত ভক্তমণ্ডলীর অনুমতি নিয়ে শুরু হয় পূজা। এখানের পূজায় বাঁধাধরা কোন মন্ত্র নেই। পুরোহিতের আত্মনিবেদনের ভাষাই পূজার মন্ত্র। ভক্তগণের নানান কামনা-বাসনাকে কেন্দ্র করে ঠাকুরের মাথায় ফুল চাপানো হয়। মনস্কামনা পূর্ণ হলে মানৎ শোধের ক্ষেত্রে চাঁদমালা, হাতি-ঘোড়া, টোপর, খই-নাড়ু, তিল-নাড়ু, নারকেল-নাড়ু, সোনা-রূপার গহনা দেওয়ার রীতি প্রচলিত। শিশুপ্রেমিক এই দেবতা অবোধ শিশুদের উপর সর্বদাই সদয়। শিশুদের অসাধ্য দুঃসাধ্য রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে তিনি উদারহস্ত। শিশুদের দোষ ধরেন না কদাপি। বড়দের নিয়ম বিরুদ্ধ আচরণে তিনি কিন্তু বড়ই বিরূপ। ভীষণ রুষ্ট। প্রতিক্রিয়া (অ্যাক্‌শন্‌) শুরু হয় সাথে সাথে।

'ধূলা-কম্বল', 'ফুল-পড়া', 'ঘোড়া-লুট' প্রভৃতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে পূজা। ফুল পড়ার সাথে সাথে বড়াম ঠাকুরের নিকট স্তূপাকৃতিতে জমে থাকা হাতি-ঘোড়া লুট করে নেয় আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। প্রচলিত বিশ্বাস, ঐ হাতি-ঘোড়া ঘরে রাখলে ঘরের কল্যাণ হয়। অতঃপর সন্ধ্যার প্রাক্কালে বলিদানের সাথে সাথে সমাপ্তির দিকে এগিয়ে চলে পূজানুষ্ঠান। শুরু হয় ভোগরান্না। অন্নভোগের সাথে শুয়োরের মাংস সহ দেশী মদও নিবেদন করা হয় বুড়া বাবাকে। বাবার মাথায় মদ না ঢাললে নাকি ফুল পড়ে না ঠাকুরের।

পূজান্তে ধাতু নির্মিত বড়াম ঠাকুরের সাজটিকে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে আসা হয় পুরোহিত ঠাকুরের ঘরে। সেখানেই ঠাকুর থাকেন সারা বছর। বড়ামতলায় রয়ে যায় পোড়ামাটির বৃহদাকার হাতি-ঘোড়াগুলি। ঐ হাতি-ঘোড়াগুলি তখন হয়ে ওঠে পাড়ার কচি-কাঁচাদের খেলার সাথী। খেলতে খেলতে খেলার ছলে ছেলেরাই একদিন ভেঙে দেয় ঐসব হাতিঘোড়া। তখন মনের গভীরে শুধু স্মৃতি হয়ে রয়ে যান বড়াম ঠাকুর।

বড়াম পূজার উৎস প্রসঙ্গে গবেষক মাণিকলাল সিংহ তাঁর 'পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি' পুস্তকের ১৪২ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন, "চেদি-রাজ্যের গঁদ আদিম জাতির মধ্যে বড়াম দেবতার পূজা প্রচলিত এবং এই দেবতার পূজায় তাহারা শূকর বলি দিয়া থাকে। **মল্লভূমের মল্ল বাউরীদের মধ্যে বড়াম পূজার সংস্কারটি চেদিরাজ্য হইতে আগত।"**

এখন কৌতূহলী মানুষজনের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, কোমলে কঠোরে অতীব জাগ্রত এই বড়াম ঠাকুর কোন্ দেবতা?

বড়াম ঠাকুর হলেন স্বয়ং বলরাম। শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। অনন্তনাগের অংশে এঁর জন্ম বলে ইনি অনন্তাবতার। মতান্তরে ইনি বিষ্ণুর দশ অবতারের অষ্টম অবতার। দুষ্টের অত্যাচারে পৃথিবী জর্জরিত হলে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনার্থে ভগবান বিষ্ণু, কৃষ্ণ- বলরামের যুগল মূর্তিতে পৃথিবীতে অবতার রূপে অবতীর্ণ হন। বলরাম শ্রীকৃষ্ণের লীলাসহচর ছিলেন। তাঁর গায়ের রং সাদা ; অস্ত্র গদা, হল ও মুষল। হল বা লাঙ্গল বলরামের বিশেষ অস্ত্র। এতদর্থে তিনি হলধারী এবং হলায়ুধ। দেবকীর গর্ভাবস্থায় বিষ্ণুর আদেশে যোগমায়া বলরামের ভ্রূণটিকে দেবকীর গর্ভ থেকে সংকর্ষণ করে রোহিণীর গর্ভে সংস্থাপন করেন। রোহিণী-গর্ভজাত বলরামের আর এক নাম তাই সংকর্ষণ। বলরাম অত্যন্ত বলশালী ছিলেন এজন্য তিনি বলভদ্র এবং বলদেব নামেও প্রসিদ্ধ। ক্ষাত্রতেজ সম্পন্ন অত্যন্ত পরাক্রমশালী হলধারী বলরাম হলেন মূলতঃ শক্তি ও উর্বরতাবাদের দেবতা। তিনি গদাযুদ্ধে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। দুর্যোধন ও মধ্য পাণ্ডব ভীমকে তিনি গদাযুদ্ধ শিক্ষা দেন। যুদ্ধস্থলে শক্তিলাভ, অস্ত্রচালনায় পটুতা এবং যুদ্ধজয়ের জন্যই বলরামের পূজা করা হয় বলে অনেকের ধারণা। এছাড়া হল্ বা লাঙ্গলধারী বলরাম হলকর্ষণ, সুবৃষ্টি, চাষাবাদ এবং উর্বরতাবাদের দেবতা রূপেও পূজিত

হন। অনন্ত নাগের অংশোদ্ভূত, বলরাম শ্রীকৃষ্ণের তিরোধানের ঠিক পূর্বে দ্বারকাতে এক বটবৃক্ষমূলে সমাধিস্থ হন। সমাধিস্থ অবস্থায় তাঁর মুখ থেকে সহস্রফণা বিশিষ্ট অত্যন্ত বৃহদাকার এক রক্তবর্ণ সর্প নির্গত হয়ে সাগর-সলিলে অন্তর্হিত হয়। তখন বলরামের তিরোধান হয়।

বলরামের ন্যায় রাশভারী পৌরাণিক দেবতা শুধুমাত্র এই বড়ামতলাতেই নয় পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন শহরে, গ্রামে, গঞ্জে, পল্লীতে পল্লীতে লৌকিক-দেবতা তথা গ্রাম দেবতারূপে পূজিত হন। এই বড়ামতলা ছাড়াও বিষ্ণুপুরের বিভিন্ন স্থানে যেমন বদিরপুকুর, রাণারপুকুর, শালবন (সোনামুখী মোড়), কাদাকুলি মহল্লার বাউরীপাড়া, বাসন্তীতলার বাগানবাড়ি, কাটানধার তল্লাটের বাগানবাড়ি, গড়দরজা পল্লীর ভোজনতলা, রাসতলা এবং হাসপাতাল সন্নিকটস্থ কুড়চিবন প্রভৃতি স্থানে বড়াম পূজা হয় ফি বছর। হয় ধুমধাম সহকারে। সর্বত্রই বলরামের মূর্তির পরিবর্তে হাতি-ঘোড়ার প্রতীক মূর্তিই পূজিত হয় শূকর বলি সহযোগে। লক্ষণীয় বিষয় হ'ল বিষ্ণুপুরের যেখানেই মল্লব বাউরী বা মলা বাউরীদের বসবাস, দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া সেখানেই হয় বড়াম পূজা। **বড়াম বা বলরাম যেন মলা বাউরীদেরই দেবতা।** মল্ল বা মল্লব বাউরীদের সাথে তাঁর মাখামাখি সম্পর্কের উৎসমূলে রয়েছে কয়েকটি কারণ। মদ্যপ বলরামের মতোই এই সম্প্রদায়টিও মদ্যপ জাতি। বলরাম হলেন শক্তির দেবতা। বাউরীগণ জীবিকার্জনের ক্ষেত্রে দৈহিক শক্তির উপর নির্ভরশীল। অতীতে এঁরা কাহার অর্থাৎ পাল্কী-বাহক ছিলেন। বর্তমানে এঁদের প্রধান পেশা রিক্সা চালানো। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের সৈন্যবিভাগে বাউরী-যোদ্ধার প্রাধান্য ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াও চাষবাসের কাজেও নিযুক্ত থাকতেন এঁরা। শক্তিস্বরূপিণী মা দুর্গার গায়ের মলা (ময়লা) থেকে সঞ্জাত কালো কালো বলিষ্ঠ প্রকৃতির শ্রমজীবী এই মানুষগুলি যুদ্ধক্ষেত্রে শক্তিলাভ, যুদ্ধে জয়লাভ, চাষবাসে শস্যলাভ এবং জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে অটুট দৈহিক শক্তিলাভ প্রভৃতি কারণেই শক্তির দেবতা বলরাম ওরফে বড়াম ঠাকুরের একনিষ্ঠ উপাসক বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় দেশী মদ তৈরি ও শূকর চাষ বাউরী জাতির বিশেষ এক সম্প্রদায়ের অর্থ উপার্জনের উৎস। এজন্য মল্লভূমের একটি প্রচলিত প্রবাদ হল—**'বাউরীর যখন লক্ষ্মী ছাড়ে, বরাকে তখন ঝাঁটা মারে।'** অবশ্য শূকর চাষ করেন শুধুমাত্র মল্লভূমের মলা বা মল্লব বাউরী নামক উপজাতিটি। আরো উল্লেখ করি মল্লভূমের বাউরীদের মল্লব, মলা বা **মোলা বাউরী**, ধলভূমের বাউরীদের **ধূল্যা বাউরী**, পঞ্চকোট বা শিখরভূমের বাউরীদের **শিখর্‌্যা বাউরী** এবং মানভূমের বাউরীদের **মানা বাউরী** বলা হয়। এছাড়া **গোবর্‌্যা, পাথর্‌্যা, পাততুলা** প্রভৃতি উপজাতিও বিদ্যমান। প্রাণের ঠাকুর বলরাম তথা বড়াম ঠাকুরকে মদ ও শূকর মাংস নিবেদন করার মধ্যে উক্ত ব্যবসায় সমৃদ্ধি লাভের বাসনা বিধৃত।

বিষ্ণুপুরে বলরামের প্রতীক মূর্তি-পূজিত হলেও পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন স্থানে বহুমান্য বলরামের মূর্তি-পূজা প্রচলিত। "তন্মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য পূজানুষ্ঠান হলো—বর্ধমান জেলার বোড়োগ্রাম, গড়ুই ও পাঁইটা গ্রামে; মেদিনীপুর জেলার বাগপুরা গ্রামে ; বাঁকুড়া জেলার সাবড়াকোণ, তেলিসায়র ও রসপাল গ্রামে, পুরুলিয়া জেলার পাথরমহড়া ও বলরামপুর গ্রামে এবং মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি ও গয়েসাবাদে।"[১]

---

১ রাঢ়ের গ্রামদেবতা, পৃঃ—২০৯,

"নিমকাঠের তৈরি সর্বশ্রেষ্ঠ বিগ্রহ আছে বর্ধমান জেলার বোড়োগ্রামে। বোড়োগ্রাম—এখন 'বোড়ো-বলরাম' নামে প্রসিদ্ধ। বর্ধমান জেলার জামালপুর থানায় এই গ্রাম। বর্ধমান থেকে শক্তিগড় বা মশাগ্রাম বা জৌগ্রাম রেলস্টেশনে নেমে বাসে বা হাঁটাপথে যাওয়া যায়। গ্রামের মাঝে ২০ ফুট উঁচু এক চাতালে বলরামের মন্দির। পাশেই দামোদর নদী। বোধ হয় তার বন্যার ভয়েই এত উঁচুতে মন্দির নির্মিত। চওড়া সিঁড়ি। সিঁড়ি যেন গ্যালারি। অজস্র লোক তাতে নির্বিবাদে বসে থাকে উৎসবের দিনে। প্রবেশপথে বিরাট তোরণ। দেওয়ালে চমৎকার কারুকার্যের ক্ষয়িষ্ণু রূপ। বিশাল প্রাঙ্গণ (৮২ ফুট × ৬৫ ফুট)। মন্দিরও বিশাল। ...মন্দিরের ভেতরে বিশালকায় বলরাম—উঁচু প্রায় ১৫ ফুট। ৭টি করে দুদিকে ১৪টি হাত। ডানদিকের ৩টি হাতে চক্র, গদা ও মুষল (আয়ুধ-বিশেষ)। বাঁদিকের ২টি হাতে শাঁখ ও লাঙ্গল। বাকি ৯টি হাত মুদ্রাযুক্ত। তন্মধ্যে ৭টিতে পদ্ম আঁকা। গায়ের রঙ সম্পূর্ণ সাদা। সুন্দর মুখে চমৎকার গোঁফ, মুখে যেন দুধ গড়িয়ে পড়ছে—এমনি এক দাগ। গোল চোখ। গলায় মালা। পায়ে নূপুর। পরণে অপরূপ কাপড়। মাথায় ১৩ ফণাযুক্ত সাপের ছাতা, (শয্যাশায়ী অনন্তের মতো)।.....

পূজারীতিতেও বোড়োর বলরাম তুলনাহীন। নিত্যপূজা ছাড়া আর কিছু দিনে তাঁর সাড়ম্বর পূজার্চনা হয়। তাঁর বিশেষ পূজা বছরে ৪দিন—বৈশাখ মাসের শুক্লাচতুর্দশী বা নৃসিংহ-চতুর্দশী, ভাদ্রের অনন্ত-চতুর্দশী, পৌষে মকর-সংক্রান্তি এবং মাঘে মাকরী-সপ্তমী।.....মাকরী-সপ্তমীতে এঁর উৎসব চলে এগারো দিন। বৈশাখে নৃসিংহ-চতুর্দশীতে তাঁর চক্ষুদান গাজন চলে ১০-১৫ দিন ধরে। .....মকর-সংক্রান্তির উৎসবে প্রহরে প্রহরে বলরামকে নতুন ভোগ দেওয়া হয়। সারাদিনে তাঁকে ভোগ দেওয়া হয় ৫২ রকম।"[১]

বহুমান্য বড়াম ওরফে বলরামের শ্রীচরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমরা এবার পাড়ি দেবো বসুপাড়ার শ্রীধরনারায়ণের শ্রীমন্দির অভিমুখে। বিষ্ণুপুর-ভ্রমণে বৈচিত্র্য আনতে আমরা এখন মল্লভূমের শিকারোৎসব এবং সেই সঙ্গে মল্লরাজাদের যুদ্ধযাত্রার স্মৃতি-রোমন্থন করব।

অধ্যায়-৯৫

মল্লভূমের শিকারোৎসব এবং মল্লরাজাদের যুদ্ধযাত্রা

প্রতি বছর ১লা মাঘ বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের মানুষজনের মধ্যে মাংস খাওয়ার রীতি প্রচলিত। কিন্তু কেন?

কেনর উত্তরে ফিরে যেতে হয় মল্লরাজাদের বীরত্বব্যঞ্জক শিকারোৎসবের বা 'এখান শিকার'-এর পটভূমিকায়। **'চাঁউড়ি, বাঁউড়ি, মকর, এখান, সেখান, ঘেগান, সাঁই, সুঁই—তার পর দিনে আসবি তুই'**—এরকম একটি কথা শোনা যায় মল্লভূমের দিনমজুর ও ক্ষেতমজুরদের কণ্ঠে কণ্ঠে। উক্তিটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হল ২৭শে পৌষ চাঁউড়ি, ২৮শে পৌষ বাঁউড়ি, ২৯শে পৌষ মকর সংক্রান্তি, ১লা মাঘ এখান, ২রা মাঘ সেখান, ৩রা মাঘ ঘেগান, ৪ঠা মাঘ সাঁই, ৫ই মাঘ সুঁই—অথাৎ ২৭শে পৌষ থেকে ৫ই মাঘ এই আটদিন 'মকর সংক্রান্তি' উৎসব[২] এবং ১লা মাঘের **'এখান শিকার'** উৎসব উদ্‌যাপনের

১. রাঢ়ের গ্রামদেবতা, পৃঃ—২১০-২১২, ২. ৩০শে মাস হলে সেইমত হয়।

প্রস্তুতি, উৎসব উদ্‌যাপন এবং উৎসবের আমেজের জন্য আমরা তোদের ঘরে কাজ করতে যাব না। আটদিন পরে আসবি ডাকতে তখন কাজে যাব।

সুতরাং মল্লরাজত্বে কি রকম আড়ম্বর অনুষ্ঠান ও উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে মকর-সংক্রান্তি ও এখান উৎসব উদ্‌যাপিত হত সেকথা উক্ত উক্তিটির মধ্যেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে আক্ষরিক অর্থে।

দলবদ্ধ হয়ে শিকার করতে যেতেন প্রাচীন ভারতের রাজা মহারাজাগণ। রামায়ণ, মহাভারতে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত রয়েছে। **এই শিকার অভিযানকে কেন্দ্র করেই দশরথের পুত্রলাভ, রাজা দুষ্মন্তের শকুন্তলা লাভ, পরীক্ষিতের মুক্তিলাভ আর মল্লরাজাদের মন্দিরগাত্রে টেরাকোটা শিল্পের উৎকর্ষ লাভ।**

শাল, সেগুন, মহুয়া, পলাশ, পিয়াশাল, আবলুস, অশ্বত্থ, বট, চকলদা, কেঁদ, ভুড়ুর, বৈঁচি, পিয়াল, কুল, শিঁয়াকুল, ক্ষীরকুল প্রভৃতি বৃক্ষলতার নিবিড় অরণ্যের অন্তরালে অবগুণ্ঠিত ছিল বিষ্ণুপুর। অবগুণ্ঠিত ছিল মল্লভূম। শ্বাপদ-সঙ্কুল বনভূমিতে বন্যপ্রাণী দাপিয়ে বেড়াত সারাক্ষণ। হিংস্র জন্তু জানোয়ারের তর্জন গর্জন শোনা যেত মুহূর্তে মুহূর্তে। শীতের ঠিক মধ্যভাগে পাতাঝরা বনমর্মরে ১লা মাঘ **'এখান শিকার'** উৎসব উদ্‌যাপিত হত মহা সমারোহে। শিকার উৎসবের বর্ণনা দিতে গিয়ে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু প্রয়াত মাণিকলাল সিংহ মহাশয় 'পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি' গ্রন্থের ২১৪ পৃষ্ঠাতে কি লিখেছেন তাই শোনাই আপনাদের। তিনি লিখেছেন—"....মল্লভূমের রাজারা সুপ্রাচীন কাল হইতে **'এখান শিকার'** করিতেন। খানদানের সমারোহের সহিত উহা অনুষ্ঠিত হইত। মল্লরাজারাই সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন। সাত আট দিন পূর্ব হইতে সেনাপতি, ফৌজদার, দিকপতি, দিগর, সদিয়াল, ঘাটোয়াল, পাইক, সর্দার, প্রতিহারগণের নিকট শিকারের বার্তা প্রেরণ করা হইত। মহাসমারোহে হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মহারাজা যাইতেন আর সেনাপতি, ফৌজদার, দিকপতি, দিগর ইত্যাদি মহারাজার দুই পার্শ্বে অশ্বারোহণে চলিতেন—পাইক, বরকন্দাজ, ঘাটোয়াল ইত্যাদি পদব্রজে যাইতেন। ডোমসৈন্য এবং সাঁওতাল ইত্যাদি সৈন্য সামনে পিছনে পার্শ্বে দামামা, কাড়া-নাকাড়া, ঢাক, ঢোল, কাঁসর, ঘণ্টা বাজাইয়া চলিত। সে এক এলাহি ব্যাপার।.....

বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাটরার জঙ্গলে মহারাজা এবং সৈন্যসামন্তদের শিকারের ছাউনি পড়িত। পানীয় জল এবং রসদ সঙ্গে থাকিত। একদিকে মহারাজের সৈন্যসামন্তের কলরবে, দামামা, কাড়া-নাকাড়া, কাঁসর-ঘণ্টা, ঢাক-ঢোলের নিনাদে আকাশ বিদীর্ণ হইত আর একদিকে অরণ্য মধ্যে হিংস্রশ্বাপদের ঘন ঘন গর্জন—বন্যবরাহ, ভল্লুক, বন্যহস্তী এবং বন্যমহিষের ছুটোছুটি দাপাদাপিতে সমস্ত অরণ্য বিকম্পিত হইত। সারাদিন ধরিয়া শিকার-পর্ব চলিত—মধ্যে দুই এক ঘণ্টার মত মধ্যাহ্ন আহারের জন্য বিশ্রাম। দিবা অবসানের কিঞ্চিৎ পূর্বে শিকারপর্ব সমাপ্ত হইত—ভারে ভারে শিকার লইয়া শিকারী প্রজারা রাজার চারিদিকে জড় হইত।

শিকার পর্বের শেষে মহারাজা দলবল লইয়া জগঝম্প, দামামা, কাড়া-নাকাড়া বাজাইয়া রাজধানীতে ফিরিতেন। শিকারলব্ধ পশুপক্ষীর মাংস জাতি ও মর্যাদা অনুসারে বণ্টন করা হইত। বিষ্ণুপুর রাজধানীর যাঁহারা শিকারে যাইতে অক্ষম—যাঁহারা শিকারে যোগদান করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের বাড়িতে বাড়িতেও মাংস প্রেরিত হইত। স্বাধীন মল্লভূমের রঘুনাথ সিংহ, বীর সিংহ, দুর্জন সিংহ প্রমুখ বিখ্যাত মল্লনৃপতিগণ কতখানি সমারোহ

এবং জাঁকজমকের সহিত এইভাবে ১লা মাঘ তারিখে মৃগয়া করিতেন তাহা আজ কল্পনার বস্তু।"

তিনি উক্ত পুস্তকের ২১২ পৃষ্ঠাতে আরও লিখেছেন, "মল্লরাজাদের অমর কীর্তি জোড়বাংলা এবং মদনমোহন মন্দিরের পোড়ামাটির ফলকগুলির মধ্যে সেকালের শিকারের বিক্ষিপ্ত চিত্র দেখা যায়। কোথাও দলবদ্ধ হরিণ ছুটিয়াছে পশ্চাতে শিকারী তীর নিক্ষেপে তৎপর। কোথাও হস্তিযূথ পরস্পরকে জড়াইয়া নানাভাবে কেলি কবিতেছে—কোথাও বাঘে মানুষে মল্লযুদ্ধ। কোথাও শিকারীর বর্শাফলকে বিদ্ধ আহত ব্যাঘ্রের মুখব্যাদানে তাহার মৃত্যুকালীন বীভৎস চিৎকার ফুটিয়া উঠিয়াছে—কোথাও শিকারীরা ব্যাঘ্র কিংবা বন্যবরাহ মারিয়া কাঁধে করিয়া চলিয়াছে, কোথাও বা হংসলতা পদ্মবনে বিচরণশীল। এই সমস্ত পোড়ামাটির ফলকে বিধৃত শিকার উৎসবের বিচিত্র বিন্যাস আজ শুধু ছবি। কিন্তু একদা সমস্তই সত্য ছিল।"

মল্লরাজ্যের শেষ স্বাধীন রাজা হলেন চৈতন্য সিংহ। পরবর্তীকালের নরপতিগণ হয়েছেন ব্রিটিশের বৃত্তিভোগী ব্যক্তি—নামকা ওয়াস্তে রাজা। এহেন পরাধীন রাজা দ্বিতীয় গোপাল সিংহের আমলেও ধুমধাম সহকারে শিকারোৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে যথানিয়মে। অবশ্য এই শিকার অভিযানের জন্য তৎকালে বাঁকুড়া জেলার ম্যাজিস্ট্রেট ও বিভাগীয় প্রধানের নিকট অনুমতি নিতে হত মল্লরাজাদের। গোপাল সিংহের রাজত্বের শেষের দিকে শিকার উৎসবের জৌলুস কমে যায়, ক্রমশঃ স্তিমিত হয়ে যায় প্রাণস্পন্দন। আজ আর মল্লরাজাও নেই, নেই শিকার উৎসবের অস্তিত্ব। আছে শুধু শিকার উৎসবের স্মৃতি। **মল্লভূমের অধিবাসীগণ ১লা মাঘ অর্থাৎ এখান শিকারের দিন ধনী-দরিদ্র, জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে মাংস ভক্ষণ করে এখান শিকারের ক্ষয়িত স্মৃতিটুকুকে আজও বুকে ধরে রেখেছে সযত্নে।**

মল্লভূমের শিকারোৎসবের সূত্র ধরে এখন আসা যাক মল্লরাজাদের বীরত্বব্যঞ্জক যুদ্ধযাত্রার কথায়। জলবাহিনী এবং স্থলবাহিনী নিয়ে গঠিত সৈন্যবাহিনীর নৌ-বাহিনীতে নিযুক্ত হতেন কৈবর্ত বা কেয়ট সম্প্রসায়ের সৈন্যগণ। পক্ষান্তরে স্থলবাহিনীর মধ্যে পদাতিক সৈন্যদের পুরোভাগে থাকতেন ডোম সৈনিকগণ। এজন্যই মল্লরাজ্যে বহুল প্রচলিত ছেলে ভুলানো একটি ছড়াতে বলা হয়েছে—

আগাডোম বাগাডোম ঘোড়াডোম সাজে
কাঁসর ঘণ্টা দামামা বাজে....ইত্যাদি ইত্যাদি।

ডোমেরা যে শুধুমাত্র পদাতিক সৈন্য ছিলেন, তা নয়; এঁরা অশ্বারোহী সৈন্য হিসাবেও ঢাল, তলোয়ারে সজ্জিত হয়ে কাড়া-নাকাড়া, ধামসা ও কাঁসর-ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে মহাপরাক্রমে যুদ্ধযাত্রায় অংশ গ্রহণ করতেন। আবার সাঁওতাল, হাড়ী, বাউরী, বাগ্দী, মেটে, খয়রা প্রভৃতি জাতির মানুষেরা লাঠি, সড়কি, বল্লম্, তীর-ধনুক এবং বহনযোগ্য আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করতেন তাণ্ডব-বিক্রমে।

মল্লরাজাদের যুদ্ধযাত্রা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় মাণিকলাল সিংহ এক মনোজ্ঞ তথ্য পরিবেশন করেছেন। তিনি লিখেছেন—

"যুদ্ধ ব্যাপারে মল্লরাজারা গোপ, সদ্গোপ, কৈবর্ত, বাগ্দী, সাঁওতাল, তিলি, মাঝি, মেটে, লায়েক, খয়রা, বাউরী, হাড়ী, আকুড়েডোম ইত্যাদি জাতির মানুষকে নিয়োগ করিতেন। ....পদাতিক, অশ্বারোহী, তীরন্দাজ এবং গোলন্দাজ এই চার শ্রেণীর সৈন্যই

সাধারণভাবে ব্যবহৃত হইত।...

সেকালে যুদ্ধবিদ্যা বিশেষভাবে শিক্ষা করিতে হইত। রণনিপুণ না হইলে যুদ্ধ জয় হয় না। প্রয়োজন মত ব্যূহ সজ্জা করিতে হইত। সংখ্যানুসারে সেনাবাহিনী নানান সংজ্ঞায় অভিহিত হইত, যেমন—সেনামুখ, বাহিনী, ব্যূহ, চমূ, অনীকিনী এবং অক্ষৌহিণী। প্রত্যেক রথের জন্য তিনটি রণহস্তী, প্রত্যেক রণহস্তীর জন্য তিন অশ্বারোহী, প্রত্যেক অশ্বারোহীর জন্য তিন জন পদাতিক ন্যূনতম এই সংখ্যায় সেনামুখ গঠিত হইত ; সেনামুখের তিনগুণে এক বাহিনী, বাহিনীর তিনগুণে এক ব্যূহ, ব্যূহের তিনগুণে এক চমূ, চমূর তিনগুণে এক অনীকিনী, অনীকিনীর তিনগুণে এক অক্ষৌহিণী। কখনও কখনও প্রত্যেকটির চারগুণ করিয়াও ধরা হইত। এক অক্ষৌহিণী তাই অনেক সৈন্য।"

গেরিলা যুদ্ধ কৌশলটি ছিল মল্লরাজাদের শত্রু-আক্রমণের আর একটি মোক্ষম তথা মারাত্মক রণবিদ্যা। মল্লরাজাদের নির্মিত মন্দিরগুলিতে শিকারযাত্রা এবং যুদ্ধযাত্রার যে সব চিত্রমূর্তি খোদিত হয়ে আছে সেগুলিতে পদাতিক, অশ্বারোহী এবং গজারোহী সৈন্যসামন্তের পাশাপাশি পতাকাবাহী পদাতিক সৈন্যও পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধতন্ত্রের ডোম্বীদেবীর দক্ষিণ হস্তে পতাকা আছে। তাই দেখে গবেষকগণের ধারণা পতাকাবাহী ডোম সৈন্যগণ ডোম্বীদেবীর প্রভাবপুষ্ট।

মল্লরাজাদের আপৎকালে মল্লরাজ্যাধীন সামন্তরাজাগণও বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে মল্লরাজাদের যুদ্ধযাত্রায় যোগ দিতেন কাতারে কাতারে। অশ্বের হ্রেষাধ্বনি, হস্তীর বৃংহন, অসির বঞ্ঝনা, তীরের সোঁ সোঁ গতিবেগ, লাঠি-সড়কির ঠক্ঠাক্ শব্দ, কামানের গর্জন, কাড়া-নাকাড়া ও রণদামামার গুরুগম্ভীর নিনাদে এবং মল্লসৈন্যদের বীরত্বব্যঞ্জক আস্ফালনে মল্লরাজাদের যুদ্ধযাত্রা সহ সমুদয় যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠত ভয়ঙ্কর রোমাঞ্চকর।

অধ্যায়-৯৬

শ্রী শ্রী শ্রীধরলালজীউ

বসুপাড়া

মল্লভূমের শিকারোৎসব এবং যুদ্ধযাত্রার স্বাদ আস্বাদন করতে করতে আমরা এসে পড়েছি বিষ্ণুপুর শহরের একেবারে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত মাধবগঞ্জের বসুপাড়া পল্লীতে। বসুপাড়াতে রয়েছে সর্বসাকল্যে চার-চারটি দেবমন্দির। এখানের দেউল আকৃতির শিব-মন্দিরটি শান্তিনাথ-শিব-মন্দির নামেই পরিচিত। অবিশ্যি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গটি যেহেতু দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বর শৈবতীর্থ থেকে আনা হয়েছিল সেই সুবাদে ইনি রামেশ্বর-শিব নামেও সুবিদিত। উক্ত শান্তিনাথ শিব বা রামেশ্বর শিব বসুপাড়া সংলগ্ন সিংহ পাড়া অপভ্রংশে সিংপাড়ার সিংহ পরিবারের পারিবারিক কুলদেবতা।

দেখুন, শিব-মন্দিরের উত্তর দিকে রয়েছে একটি ছোটখাটো পঞ্চরত্ন মন্দির। এটি আয়কাত পরিবারের রঘুনাথ জীউ-এর মন্দির। মন্দির অভ্যন্তরে রঘুনাথ শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠিত হয়ে পূজিত হয়ে আসছেন মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক কাল থেকেই। রামভক্ত হনুমানের একটি অষ্টধাতু নির্মিত মূর্তি ছিল এখানে। কোন এক সময়ে মূর্তিটি অপহৃত হয়েছে।

ঁরঘুনাথ জীউ-এর মন্দিরের পশ্চিম-দিকে বসুপাড়ার একেবারে অভ্যন্তরে নবনির্মিত দালান আকৃতির এই মন্দিরটি হল ঁদুর্গামন্দির। মন্দিরটি নবনির্মিত হলেও দেবী এখানে বছরে বছরে পূজিতা হয়ে আসছেন ১২০০ বঙ্গাব্দেরও পূর্ব থেকে।

এক্ষণে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি মল্লভূমের একটি উল্লেখযোগ্য মন্দিরের দিকে। পোড়ামাটির অলংকরণে সুশোভিত নবরত্ন বিশিষ্ট এই মন্দিরটি বিষ্ণুপুরের গৌরব স্বরূপ। কারণ বিষ্ণুপুরে নবরত্ন বিশিষ্ট মন্দির খুব একটা দেখা যায় না। শ্যামরায়ের বাজারে বর্তমান মিলনশ্রী সিনেমার সন্নিকটে ভগ্নপ্রায় একটি নবরত্ন মন্দির রয়েছে, আর একটি রয়েছে বিষ্ণুপুরের উত্তরে অবস্থিত অবন্তিকা গ্রামে। পূর্বোক্ত তিনটি নবরত্ন মন্দিরের মধ্যে এই মন্দিরটিই আকারে বড় এবং অবয়বগত সাজ-সজ্জাতেও নয়নাভিরাম। এতাদৃশ একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা এবং মন্দিরের উপাস্য দেবতা ঁশ্রীধরলালজীউ-এর বিষ্ণুপুরে আগমন সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় শ্রীশান্তি বসু ১৯৮৬-র শারদীয়া 'অভিযান' সংখ্যাতে বাঙ্ময় হয়ে উঠেছেন। তাঁর কথায় "**বিষ্ণুপুর গোয়ালাপাড়া মহল্লার অন্তর্গত বসুপাড়ার বসু পরিবারের প্রতিষ্ঠা-পুরুষ বীরেশ্বর বসু নবদ্বীপ শান্তিপুর হইতে তাঁহার উপাস্য দেবতা শ্রীধর জীউকে (শালগ্রাম শিলা) লাল শালুতে জড়াইয়া গলায় পরিয়া বিষ্ণুপুরে আসেন।** বীরেশ্বর বসু সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং শ্রীমৎ ভাগবত পাঠে সুদক্ষ ছিলেন। বিষ্ণুপুরে আসিয়া তিনি প্রথমে গোপালগঞ্জ কুমারপাড়ার এক কুম্ভকারের বাড়িতে আশ্রয় লন। তৎকালীন মল্লরাজা গোপাল সিংহের রাজদরবারে ভাগবত পাঠ করিয়া বীরেশ্বর বসু রাজা গোপাল সিংহ এবং তৎকালীন বিষ্ণুপুর বাসীদের মুগ্ধ করেন। রাজা গোপাল সিংহ বীরেশ্বর বাবুকে কিল্লার মধ্যেই আশ্রয় দেন। স্থানীয় বৈষ্ণব ভক্তদের অনুরোধে রাজা গোপাল সিংহ বীরেশ্বর বসুকে গৃহী হইতে বলেন। সহায় সম্বলহীন বীরেশ্বর বসু এই প্রস্তাবে প্রথমে রাজী হন নাই। কিন্তু রাজা গোপাল সিংহের আজ্ঞাও লঙ্ঘন করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য, তাই বাধ্য হইয়া গোয়ালাপাড়া মহল্লার মাধবগঞ্জ সংলগ্ন বিশ্বাসপাড়ার পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাসের কন্যাকে বিবাহ করেন।

বসবাস করিবার জন্য মহারাজা গোপাল সিংহ বীরেশ্বর বসুকে যমুনা এবং কালিন্দী বাঁধের মধ্যবর্তী জমি দান করেন। শ্রীধর ঠাকুরের সেবাপূজার জন্য কেলেমেলে মৌজা দান করা হয়। বীরেশ্বর বসু আনুমানিক ২৫০ বৎসর পূর্বে টেরাকোটা সমন্বিত শ্রীধর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। **অষ্টাদশ শতাব্দীর টেরাকোটা মন্দিরগুলির মধ্যে শ্রীধর মন্দির অন্যতম।**

বীরেশ্বর বসুর বংশধরগণ পালা করিয়া শ্রীধর ঠাকুরের উৎসব অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।..."

এখন আপনাদের মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, 'কে এই শ্রীধর ঠাকুর? কি তার পরিচয়? নারায়ণ শিলার সাথে এই শ্রীধর শালগ্রাম শিলার সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্যই বা কি? আরো প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক রঘুনাথ জীউ-এর মন্দিরে রামচন্দ্রের মূর্তির পরিবর্তে রঘুনাথ শিলার পূজা করা হয় কেন?'

আপনাদের এসব প্রশ্নের উত্তরে শোনাই শালগ্রাম শিলার তত্ত্বকথা। **শালগ্রাম শিলা হলেন, 'বিষ্ণুমূর্তি বিশেষ; বজ্রকীট দ্বারা কর্তিত চক্রযুক্ত শিলা। গণ্ডকী নদীজাত বজ্রকীট কর্তৃক কর্তিত চক্রযুক্ত যে শিলা পাওয়া যায়, তাকে শালগ্রাম শিলা বলে।"** কথিত আছে, হিমালয়ের দক্ষিণে ও গণ্ডকী নদীর উত্তরে দশ যোজনব্যাপী বিস্তীর্ণ

মহাক্ষেত্রে বিষ্ণু শালগ্রামে পরিণত হন। এই শালগ্রাম গণ্ডকী নদীজাত এবং অষ্টাদশ প্রকার। গঠন-রূপের বিভেদে ও লক্ষণ অনুসারে শাল-গ্রামের বিভিন্ন নাম প্রচলিত— **লক্ষ্মী-নারায়ণ, লক্ষ্মীজনার্দন, রঘুনাথ, দধিবামন, শ্রীধর, দামোদর, বলরাম, রাজ-রাজেশ্বর, অনন্ত, মধুসূদন, গদাধর, হয়গ্রীব, নরসিংহ, লক্ষ্মীনরসিংহ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সুদর্শন, অনিরুদ্ধ**। এই বিভিন্ন আখ্যার দ্বারা শালগ্রাম-শিলার ছিদ্রদ্বার, চক্র, চিহ্ন, আকার, বর্ণ এবং ভিন্ন ভিন্ন আকার ও প্রকারভেদে সুফল বা কুফল নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে লিখিত আছে—ভগবান্ কৌশলে বা ছলে শঙ্খচূড়কে নিহত করেন। শঙ্খচূড় বেশে তাঁর স্ত্রী তুলসীকে সম্ভোগ করলে তুলসী ভগবানকে অভিশাপ দেন, আপনি দয়ামায়াহীন পাষাণ হৃদয় ; পাষাণ রূপে আপনি এই পৃথিবীতে বাস করুন। তুলসীর এই কথায় ভগবান বলেছিলেন, তোমার শাপ ভোগের জন্যে আমি গণ্ডকীর নিকট শিলারূপে বসবাস করবো। বজ্রকীট ও কৃমি ইত্যাদি আমার শিলার ভিতর চক্র কর্তন করবে।"[১] 'প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, **রঘুনাথ** শালগ্রাম শিলাতে থাকে দুটি দ্বার, চারটি চক্র এবং বনমালা ও গোষ্পদ চিহ্ন এবং **শ্রীধর** শালগ্রাম শিলাতে থাকে দুটি ক্ষুদ্র চক্র ও বনমালাচিহ্ন।

ভগবান বিষ্ণুর শিলামূর্তি উপাসনার তত্ত্বকথায় ছেদ টেনে এবার আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি মন্দির নির্মাণের স্থাপত্য শিল্পের দিকে। বাঁকুড়ার ল্যাটেরাইট স্টোনের তৈরি দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় ২০´ ৬˝ মাপের একটি বর্গাকৃতি বেদির উপর, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ১৭´ ৩˝ মাপের মূল মন্দিরটি ইষ্টক নির্মিত। সৌধটির উচ্চতা প্রায় ৩৪। পোড়ামাটির অলংকরণে শোভিত প্রতিষ্ঠাফলকহীন দেবালয়টির পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রত্যেক দিকেই রয়েছে ছাদবিশিষ্ট তিনটি করে প্রবেশপথ। অবশ্য গর্ভমন্দিরের প্রবেশপথ রয়েছে শুধুমাত্র পূর্বদিকে। দেবালয়টির পশ্চিম দেওয়াল একেবারে সাদামাটা, উত্তর এবং দক্ষিণ দেওয়ালের কারুকার্য নজর কাড়ার মত নয়। সৌধটির সম্মুখভাগে অর্থাৎ পূর্বদিকেই "যাবতীয় পোড়ামাটির ভাস্কর্য উৎকীর্ণ হয়েছে। অলংকরণগুলি সংখ্যায় বেশি নয়। কৃষ্ণলীলা, রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী ও পৌরাণিক চিত্রকল্প ছাড়াও সঙ্গীন-বন্দুকধারী গোরা সৈন্যের 'মোটিফ্'ও কিছু কিছু ব্যবহৃত হয়েছে।"[২]

নবরত্ন-শ্রীমণ্ডিত এই সৌধটির রত্ন-বিন্যাস যথাক্রমে ৪+৪+১ হওয়ার ফলে এটি ত্রিতল মন্দিররূপে প্রতিভাত। মন্দির-গাত্রের পঙ্খের পলেস্তারার নিখুঁত রূপায়ণও লক্ষণীয়।

শ্রীধর-নারায়ণের মন্দির প্রসঙ্গে এসে যায় এমন কিছু কথা যা না বললে আলোচনা রয়ে যায় অসম্পূর্ণ। পর্যবেক্ষণ পূর্ণতা লাভ করে না। দৃষ্টি হয় সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট। **কারণ মন্দির শুধু দেবালয় নয়, বিষ্ণুপুরের মৌন-মুখর দেবালয়গুলি হল সমকালীন সমাজের দর্পণ। আবার শুধু সমকালীন সমাজের দর্পণই নয়, এই দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয় নিকট এবং সুদূর অতীতের ইতিকথা তথা কথকতা।**

মন্দির কথা বলে, বলে অনেক অনেক কথা। শিল্প, সাহিত্য, কৃষ্টি, লোক-সংস্কৃতি, ধর্ম-ভাবনা, সমাজ-চেতনা, সমকালীন রাজনীতি এবং অর্থনীতি এ সবের প্রতিফলনে মন্দির হয়ে ওঠে প্রামাণ্য ইতিহাস তথা ঐতিহাসিক দলিল। এ মন্দিরের মূল্যায়ন করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয় তাঁর অন্তর্ভেদী রঞ্জন-রশ্মি (X-rays) দৃষ্টি নিক্ষেপ

---

১. পৌরাণক অভিধান, পৃঃ—৫০৩ ২ বাঁকুড়ার মন্দির, পৃঃ—১৭৬

করে কথার গায়ে কথা জুড়ে জুড়ে ডুবে গেছেন ইতিহাসের গোপন-গহীন গভীরতায়। চিত্তরঞ্জন বাবু তাঁর 'বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা' গ্রন্থে পূর্বোক্ত মন্দির সম্পর্কে যে মনোগ্রাহী আলোচনা করেছেন তার নির্যাসটুকুই এখন সংক্ষেপে পরিবেশন করব আপনাদের। প্রয়োজনে শোনাব বিশেষ বিশেষ উদ্ধৃতাংশ।

১৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'শ্যামরায়ের মন্দিরে' এবং তার মাত্র ১১ বছরের ব্যবধানে ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'জোড়বাংলা মন্দিরে' টেরাকোটা শিল্পের যে গৌরবময় অধ্যায়ের সুবর্ণযুগ সূচিত হয়েছিল তার অবক্ষয় ক্রমান্বয়ে প্রথমে 'রাধাবিনোদ মন্দিরে' (খড়বাংলা), পরে 'মদনমোহন মন্দিরে' এবং তারও পরে 'শ্রীধর নারায়ণ মন্দিরে' প্রতিফলিত হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক পালা-বদলকে কেন্দ্র করে যে নতুন যুগের সূচনা হয়েছিল তাতে মল্লভূমের গ্রাম-কেন্দ্রিক, কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে ধস নামে নিঃশব্দে। বিপাকে পড়েন শিল্পী সম্প্রদায়ও। ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড ক্রমশঃ রাজদণ্ডে রূপান্তরিত হওয়ার প্রেক্ষাপটে রাজন্যবর্গ ক্রমশঃ তাঁদের ক্রীড়নকে পর্যবসিত হয়। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে শিল্পীসমাজের শিল্প-সাধনায় আসে ঝিমিয়ে পড়া অবসাদ। ইংরেজ বণিকের ব্যবসায়ী বুদ্ধি ধীরে ধীরে গ্রাস করে সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে। যে ভক্তি বিগলিত ভাবধারায় সপ্তদশ শতকে বিষ্ণুপুরে মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল সেই ভক্তিরসের ভাটা পড়ল পাশ্চাত্য প্রভাবে।

"সুপ্রাচীনকাল থেকে ভক্তিই ছিল মূলতঃ ভারতের ধর্মকেন্দ্রিক স্থাপত্য ভাস্কর্যের মূল প্রেরণা। শুধু ভারত নয়, সর্বত্রই এ ধরণের ধর্মীয় শিল্পকলার প্রেরণা যুগিয়েছে 'ভক্তি'। শ্রদ্ধেয় ই. বি. হ্যাভেলের মতে—**'Bhakti is the moving spirit in all great religious art, in the West as in the East'** ...পাশ্চাত্য প্রভাবে ভারতীয় শিল্পকলার অন্যতম ভিত্তি এই ভক্তির অন্তর্ধানের ফলে শিল্পকলার শ্রীহীন অবস্থার কথা বলতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় হ্যাভেল তাঁর উপরোক্ত গ্রন্থেরই অন্যত্র বলেছেন—'It is only when bhakti is lost and the whole spiritual basis of Indian art is superseded by the modern commercial instinct...that it becomes incoherent and meretricious.'

এক কথায়, আধ্যাত্মিক নৈরাজ্য ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে এবং নূতন ভাবধারার আবির্ভাবে পূর্ববর্তী প্রেক্ষাপটের দ্রুত পরিবর্তন হতে লাগল।

এমনি একটি ভিন্ন যুগের পরিবর্তিত পটভূমিকায় শ্রীধর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা। তবু ইংরাজের বাণিজ্য কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী হওয়ায় এবং অনেকটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় দুর্গম পরিবেশে অবস্থিত থাকায় পুরোপুরি পাশ্চাত্য প্রভাব এখানে এসে পৌছাতে সময় লেগেছে ; তাই দেখা যায় অষ্টাদশ শতকের মধ্যবর্তীকালে নির্মিত হুগলী, হাওড়া আর চব্বিশপরগনার মন্দিরগুলিতে যেখানে 'সাহেব-টেরাকোটা'র বিপুল সমারোহ, সেখানে অষ্টাদশ শতকের শেষে বা উনবিংশ শতকের প্রথমে নির্মিত শ্রীধর মন্দিরে, ঐ জাতীয় টেরাকোটার সংখ্যা তুলনায় নগণ্য। কিন্তু তাহলেও শ্রীধর মন্দিরে পালা বদলের চিহ্ন সুস্পষ্ট। টেরাকোটার মোটিফ নির্বাচনে যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পূর্ববর্তী মন্দিরগুলিকেই অনুসরণ করা হয়েছে—সেই 'রাইরাজা' 'রামরাজা', 'রাসলীলা', 'শ্রীকৃষ্ণের-মথুরাযাত্রা' জাতীয় চিত্রগুলিই যথারীতি এ মন্দিরেও সন্নিবিষ্ট হয়েছে, তবুও রচনাশৈলীর তারতম্যে এইসব চিত্রগুলিতে পূর্বদিনের সেই তান প্রধান আবেদন এখানে যেন অনেকাংশেই

অনুপস্থিত। কারণ যে-সব ব্যঞ্জনাময় মুদ্রা আর ছন্দোময় আঙ্গিকের সার্থক প্রয়োগ করে শিল্পী পূর্ববর্তী মন্দিরগুলির ঐ জাতীয় চিত্রগুলিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন—আলোচ্য শ্রীধর মন্দিরে তা অনেকাংশেই অনুপস্থিত। তাছাড়া বিশেষভাবে কলামার্গ-আশ্রয়ী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেমভক্তির আবেগময় যে ভাবাদর্শের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় কৃষ্ণলীলার শত শত ছন্দ আর তান-প্রধান চিত্রকল্পের সৃষ্টি সেযুগে সম্ভব হয়েছিল, শ্রীধর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকালে অর্থাৎ অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে সে ভাবাদর্শও হয়ে পড়েছিল একান্তভাবে প্রভাবহীন। পূর্ববর্তী মন্দিরের চিত্রকল্পগুলি রূপায়ণের ক্ষেত্রে ছন্দই ছিল মূলতঃ প্রাণবস্তু—কোথাও গীতির ছন্দ আর কোথাও গতির ছন্দ রচনা করে শিল্পী সেকালের মৃন্ময় চিত্রগুলিতে প্রাণসঞ্চার করেছিলেন; বিষয়বস্তুর ভিন্নতা সত্ত্বেও ছন্দের বন্ধনে হাজার হাজার চিত্রকে একত্র আবদ্ধ করে শিল্পী সপ্তদশ শতকের মন্দিরগুলিতে একটা ঐক্যতান রচনায় সক্ষম হয়েছেন—বিশিষ্ট মুদ্রাগুলির প্রয়োগে মৃন্ময়পট্টের নীরব মূর্তিগুলিকে সমধিক বাঙ্ময় করে তুলেছেন। শুধু ইঙ্গিত আর ব্যঞ্জনায় শিল্পী অনেক ভাবকেই মুখর করে ঐসব মন্দিরে পরিবেশন করেছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূলমন্ত্র 'আকুতি আর শরণাগতি' শিল্পী মন্দিরে মন্দিরে, ভক্তদের নানা ভাবব্যঞ্জক চিত্রের মাধ্যমে পরিস্ফুট করেছেন। দৃশ্যপটে ঈশ্বরকে অপ্রকট রেখেও বদ্ধাঞ্জলি মুদ্রায় উপবিষ্ট বা দণ্ডায়মান তপোমগ্ন সাধুসন্তের শতশত আকুতিময় চিত্রের মাধ্যমে শিল্পী ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সার্থকতার সঙ্গে ব্যঞ্জিত করেছেন। শ্রীধর মন্দিরে কিন্তু এই 'ছন্দ' আর 'মুদ্রা'র লীলা অবর্তমান।........

........বরং এ মন্দিরের সম্মুখভাগের একেবারে নীচের দিকের ফ্রিজে সন্নিবিষ্ট যুগোপযোগী বাস্তব চিত্রগুলি অনেক বেশী প্রাণবন্ত; এখানে শিল্পীর প্রত্যক্ষ ধারণা তাঁকে যেন অনেকখানি সাহায্য করেছে। সাধারণতঃ মন্দিরের নীচের দিকের (প্রায় ভিত্তিবেদীর সংলগ্ন) ফ্রিজগুলি যেন সমসাময়িক বাস্তবজীবনচিত্রের জন্যই সংরক্ষিত থাকে। শ্রীধর মন্দিরের এই ফ্রিজ বা পটিতে রয়েছে নানা চিত্র—বন্দুক হাতে, প্যাণ্ট আর বিলাতী 'সু' পরা সাহেব, হস্তী পৃষ্ঠ থেকে চিতাবাঘ শিকাররত সম্রাট বা রাজা; পাশেই রয়েছে গড়গড়া বহনকারী ভৃত্য, অঙ্গে চাপকান জাতীয় পোষাক, মাথায় অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে প্রচলিত পাগড়ী-টুপি। কোথাও দেখা যায় কীর্তন পরিবেশন রত বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী আবার কোথাও নজরে পড়ে কোন ভ্রাম্যমাণ 'নাচ-গানে'র দল পরমোৎসাহে আসর জমিয়েছে; নর্তকী নাচছে, সঙ্গে তবলায় সহযোগিতা করছে তবলচী, —ডুগি তবলা কাপড় দিয়ে তার কোমরে বাঁধা; সারেঙ্গীওয়ালা আর বেহালাদারও রয়েছে যথারীতি দলটিতে; এই ফ্রিজেরই একাংশে আধুনিক মশারি সজ্জিত পালঙ্কে উপবিষ্ট জনৈক রাজা বা নবাবই এই সঙ্গীত নিবেদনের লক্ষ্য বলে মনে হয়। কাপড় দিয়ে কোমরে বাঁধা ডুগি-তবলা বাদনরত তবলচীসহ নাচ-গানের দলটি দেখে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকের কিছু রাজপুত চিত্রের কথা মনে পড়ে। 'প্যানেল'টিতে কিছু কিছু বাদশাহী আমলের মধ্যযুগীয় 'মোটিফ' থাকলেও পাশ্চাত্য প্রভাব এখানে সুস্পষ্ট। পূর্ববর্তী মন্দিরের 'জাহাঙ্গীরী তাজ' আর বিচিত্র সব মুকুটের পরিবর্তে এখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শোভা পাচ্ছে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে প্রচলিত বিশেষ ধরনের পাগড়ী-টুপি—পূর্বেকার নক্সা করা শুঁড়ওয়ালা বিশেষ ধরনের বুটের পরিবর্তে এসেছে বিলাতী 'সু' বা 'বুট'। বাদ্যযন্ত্র হিসাবে বেহালার ব্যবহারও যুগোপযোগী; সঙ্গীত ঐতিহাসিকরা মনে করেন ষোড়শ শতকের মধ্যভাগে পাশ্চাত্য দেশে 'বেহালা'র উৎপত্তি। এই ফ্রিজেরই প্রান্তদেশে চেয়ারে

উপবিষ্ট জনৈক ব্যক্তিকে বিচিত্র ধরনের গড়গড়ায় ধূমপান রত অবস্থায় দেখা যায়; এ যেন কোন 'সাহেব-নবাবের' চিত্র—এ সময়কার অনেক কুঠীয়াল সাহেব এক একটি ক্ষুদে-নবাবে পরিণত হয়েছিলেন। এমন কি 'রাইরাজা' চিত্রে দেখা যায় 'রাইবিনোদিনী' একটি 'ইজিচেয়ার' জাতীয় কেদারায় উপবিষ্ট; এক কথায়, সারা পটটিতে যেন অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের সাহেবী আর নবাবী মিশ্রকালচারের সুস্পষ্ট প্রভাব পড়েছে।"

'উটের পিঠে দামামা বাদক', 'বাজপাখী হাতে রাজপুরুষ' প্রভৃতি চিত্রগুলিও মুঘল-পারসিক কালচারের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। চিত্রাবয়বে এবং রূপসজ্জায় রাজস্থানী প্রভাবও অনুসৃত হয়েছে স্থানে স্থানে। সামগ্রিকভাবে বলা যায় টেরাকোটা শিল্পের অবক্ষয়ের যুগে নির্মিত শ্রীধর মন্দিরটি হল মিশ্রকালচারের এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

পরিশেষে বলি বসুপাড়াতে অবস্থিত, শিব, দুর্গা, রঘুনাথ ও শ্রীধর নারায়ণ ঠাকুরের সহাবস্থান যেন শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মের সুষ্ঠু সমন্বয়কেই সূচিত করে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, বসুপাড়ার পূর্বে রয়েছে মলডাঙা পল্লী। দীপান্বিতা কালীপূজার সময় বিষ্ণুপুরের মলডাঙাপল্লীতে পল্লীবাসীদের উদ্যোগে ১টি এবং বোলতলা সন্নিকটস্থ পাটরা পাড়াতে রক্ষিত পরিবারের ২টি অর্থাৎ মোট ৩টি শিব-দুর্গা চালের পূজা একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত।

বিষ্ণুপুর শহরের একেবারে পশ্চিমদিকে অবস্থিত বসুপাড়া মহল্লা পরিত্যাগ করে আরো একটু দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে এগিয়ে গিয়ে আমরা দেখব বিষ্ণুপুরের বৃহত্তম বাঁধ যমুনাবাঁধ। আপাততঃ পর্যালোচনা করব বিষ্ণুপুরের ঘণ্টাকর্ণ পূজা বা ঘাঁটু পূজা নিয়ে।

অধ্যায়-৯৭

ঘাঁটু পূজা বা ঘণ্টাকর্ণ পূজা

ফাল্গুন সংক্রান্তির প্রত্যূষে বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের প্রায় ঘরে ঘরে অনাড়ম্বরভাবে অনুষ্ঠিত হয় ঘাঁটু পূজা বা ঘেঁটু পূজা। লাজ-দুয়ার বা সদর দরজার সম্মুখে গৃহকর্ত্রী ঘাঁটু পূজায় ব্রতী হন ঐদিন। দরজার সম্মুখে মাড়ুলি দিয়ে তন্মধ্যে একটি নারকেল খোলা বা মাটির খোলার উপর ঘাঁটুর প্রতীকটি স্থাপন করেন। ঘাঁটুর প্রতীকটি নিম্নরূপ। প্রথমে পান্তুয়া আকৃতির পাঁচটি গোবরের ডেলা তৈরি করা হয়। অতঃপর চারটি গোবরের ডেলাকে লম্বালম্বিভাবে একত্রে সন্নিবিষ্ট করে সুতো দিয়ে বেঁধে তদুপরে পঞ্চম ডেলাটি স্থাপন করা হয়। উক্ত পঞ্চম ডেলাটিতে দুটি কড়ি বসিয়ে চক্ষুদান করা হয়। ঘাঁটুর এই প্রতীক মূর্তিটিকে নারকেল খোলা বা মাটির খোলাতে বসিয়ে ঘাঁটুর গায়ে জড়িয়ে দেওয়া হয় এক টুকরো হলুদ কাপড়। অনন্তর ঘাঁটুর প্রতীকটিকে কেন্দ্র করে জলধারা দিয়ে ঘাঁটু বরণ করা হয়। শুরু হয় পূজানুষ্ঠান। ধূপ, দীপ জ্বালিয়ে চাল ও গুড়ের নৈবেদ্য সহ ফল, মূল মিষ্টান্ন সহযোগে ঘাঁটুফুল দিয়ে ঘাঁটু পূজার রীতি প্রচলিত। ঘাঁটুর পাশে মুড়িভাজার জন্য ব্যবহৃত একটি মাটির খোলা রাখা হয় উপুড় করে। পূজান্তে ঘাঁটু পূজা দর্শনের জন্য সমবেত বালক বালিকাদের মধ্যে কোন এক চোখ বাঁধা বাচ্চা ছেলেকে দিয়ে লাঠির আঘাতে ঐ খোলাটি ভাঙার নিয়ম। পূজার সময় মন্ত্র পাঠ করা হয়—

ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্বব্যাধি বিনাশন।
বিস্ফোটক ভয়ে প্রাপ্ত রক্ষ রক্ষ মহাবল।

পূজারতির পর শাঁখ, ঘণ্টা বাজিয়ে উলুধ্বনি সহকারে ঘাঁটুর প্রতীকটিকে তুলসী-তলায় অথবা মরাই-তলায় রেখে দেওয়া হয় সযত্নে। ফাল্গুন-সংক্রান্তির দিন থেকে পুরো চৈত্রমাস ঘাঁটু থাকেন তুলসীমূলে অথবা মরাই-তলায়। বৈশাখ মাসের প্রারম্ভে জলাশয় করা হয় ঘাঁটুর প্রতীকটিকে।

ফাল্গুন সংক্রান্তি তথা ঘাঁটু সংক্রান্তির দিন গোধূলি-লগ্নে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা দল বেঁধে পাড়া প্রতিবেশীদের ঘরে ঘরে মাধুকরী করে। গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে উপনীত হয়ে সুর করে বলতে থাকে—

আলুর মালুর চাল দাও গো,
না দিবে তো খোস লাও গো।

ছড়ার সুরে সচকিত গৃহকর্ত্রী ক্ষিপ্রপদে বেরিয়ে আসেন মূলতঃ চাল, আলু ও পয়সা নিয়ে। খুশী করে বিদায় করেন সখের ভিখারীদের। ভিক্ষালব্ধ চাল, আলু ও পয়সা নিয়ে ছেলে মেয়েরা ছোটখাটো ভোজের উৎসবে মেতে ওঠে রাত্রি নিশীথে।

প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় ঘাঁটু-সংক্রান্তির দিন সন্ধেবেলা বিষ্ণুপুরে **ফুট-কলাই, গুড়মুড়কি, কড়েনা** বা **কানজিলাপি** এবং **গুপচুপ্** মিষ্টান্ন খাওয়ার রীতি একটি চিরাচরিত প্রথা। ছোট দানার দেশী মটর কলাইকে বিশেষ প্রক্রিয়াতে এমনভাবে ভাজা হয় যা আধফোটা রূপ ধারণ করে,— এজন্য এটি ফুট কলাই। কড়েনা বা কান-জিলাপি মানে ক্ষুদ্রাকৃতির জিলাপি। তেলে ভেজে কড়া পাকের গুড়ের রসে ডুবিয়ে রেখে হয় কড়েনা। গুপ্‌চুপ্‌ও ক্ষুদ্রাকৃতির জিলাপি। তবে এটি ঘিয়ে ভেজে চিনির রসে ডুবিয়ে তৈরী করা হয়। কড়েনা হয় বেশ শক্ত প্রকৃতির এবং খয়েরী রঙের। পক্ষান্তরে গুপ্‌চুপ্ হয় হালকা হলুদ আভাযুক্ত তুল্‌তুলে নরম প্রকৃতির। কড়েনা এবং গুপ্‌চপের মূল উপাদান হল চালগুঁড়ি এবং বিউলির বেসন। শুধুমাত্র ঘাঁটু-সংক্রান্তির সময়ই এসব মিষ্টান্ন তৈরী হয়। অবশ্য ফুট-কলাই, কড়েনা এবং মুড়কি দিয়ে ষাঁড়েশ্বরের গাজনে চৈত্র-সংক্রান্তিতে মা ভবানীর পূজা দেওয়ার প্রথাও প্রচলিত।

ঘাঁটু পূজা সম্বন্ধে এসব কথা শোনার পর যে সব প্রশ্নগুলি মনের আঙ্গিনায় ঢেউ খেলে যায় সেগুলি হল, কে এই ঘাঁটু? কেনই বা ফাল্গুন সংক্রান্তির প্রত্যূষে তাঁর পূজার প্রচলন? ঐদিন বাচ্চাদের মাধুকরীর সাথে ঘাঁটু পূজার সম্পর্কই বা কি?

উত্তরে বলি, **ঘাঁটু হলেন ঘণ্টেশ্বর। মেধার গর্ভজাত মঙ্গলের পুত্র ঘণ্টেশ্বর কোন কারণে অভিশপ্ত হয়ে উজ্জয়িনী নগরে মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করেন।** মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সভারত্নের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন হবার উগ্র বাসনায় তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে শিব-সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ঘণ্টেশ্বরের সাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবাদিদেব মহাদেব তাঁকে ইপ্সিত বর প্রার্থনা করতে বলেন। মহাসাধক ঘণ্টেশ্বর তাঁর পূর্বোক্ত বাসনা নিবেদন করেন শিব-সকাশে। শিবঠাকুর তাঁকে অন্য বর চাইতে বলেন। কারণ বিক্রমাদিত্যের সভাকবি কালিদাস ইতিমধ্যেই শ্রেষ্ঠরত্ন হিসেবে পরিগণিত। কালিদাস সরস্বতীর কৃপাধন্য। অতএব ঘণ্টেশ্বরকে শ্রেষ্ঠ রত্নের বা পণ্ডিতের বরদান করার অর্থ হল স্বীয় কন্যা সরস্বতীকে অসন্তুষ্ট করা। এসব কথা শোনার পরও অত্যন্ত একগুঁয়ে প্রকৃতির ঘণ্টাকর্ণ কিন্তু অবুঝ এবং নাছোড়বান্দা। প্রথমবার বিফল মনোরথ হয়ে তিনি আশা পূরণের আশায় পুনরায় মহাদেবের তপস্যায় আত্মমগ্ন হন। এবারও পূর্ণ হয়না তাঁর মনস্কামনা।

ঘণ্টেশ্বর তখন তাঁর আরাধ্য দেবতা শিবঠাকুরের উপর দারুণ অসন্তুষ্ট হয়ে প্রতিজ্ঞা

করেন, প্রাণ থাকতে তিনি আর শিব নাম উচ্চারণ করবেন না। শিব ঠাকুরের নামোচ্চারণ করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করলেও ঘণ্টেশ্বর তাঁর উপাস্য দেবতার উপর দৃঢ় বিশ্বাসকে পাথেয় করেই এগিয়ে চললেন বিক্রমাদিত্যের রাজসভার নবরত্নকে পরাজিত করার অভিমানসে। রাজসভায় কালিদাস ব্যতীত আর সকলকে পরাজিত করেন অনায়াসে। পণ্ডিতপ্রবর কালিদাস তখন বেগতিক অবস্থা দেখে একটি কৌশলের আশ্রয় নেন। ঘণ্টেশ্বর যে এ জীবনে আর শিব-নাম উচ্চারণ করবেন না একথা কালিদাস সহ সকলেই জেনে গেছেন আগেভাগেই। সুতরাং সুযোগ বুঝে চতুর কালিদাস ঘণ্টেশ্বরকে বললেন, 'আপনি যদি দীর্ঘছন্দে শিবের স্তব করেন তবেই আমি আপনার সাথে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হব, নতুবা নয়।' ঘণ্টেশ্বর কালিদাসের এই প্রস্তাবে বিব্রত বোধ করলেও সম্মত হয়ে যান তাৎক্ষণিকভাবে এবং একবারও মহাদেবের নাম উচ্চারণ না করে শিব-বন্দনা করেন দীর্ঘছন্দে। তাই শুনে মহারাজ বিক্রমাদিত্য সহ অন্যান্য সভারত্নগণ সকলেই বেজায় খুশী। কালিদাস স্বয়ং ঘণ্টেশ্বরের অসাধারণ পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়ে বিনা বিচারেই তাঁর কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। সর্বত্র বিরাজমান অন্তর্যামী আশুতোষ নেপথ্যে উপস্থিত থেকে ভক্ত ঘণ্টেশ্বরের অচলা-ভক্তি এবং বীরত্ব দর্শনে পরিতৃপ্ত হয়ে তাঁকে শাপ মুক্ত করেন। **ঘণ্টেশ্বরের এতাদৃশ বীরত্বের জন্য তিনি মহাবীর ঘণ্টেশ্বর নামেও সুপ্রসিদ্ধ।**

ঘণ্টেশ্বরের আর এক নাম ঘণ্টাকর্ণ। ঘণ্টাকর্ণ প্রসঙ্গে 'হরিবংশে' বলা হয়েছে, তিনি হলেন বিষ্ণুবিদ্বেষী শিবভক্ত। অসাবধানতা বশতঃ পাছে বিষ্ণুর নাম তথা হরিনাম তাঁর কর্ণে প্রবেশ করে সেই ভয়ে তিনি তাঁর দুই কানে দুটি ঘণ্টা বেঁধে রেখেছিলেন এবং সর্বক্ষণ সেই ঘণ্টা দুটি দোলাতে থাকতেন। এজন্যে তাঁর নাম হয় ঘণ্টাকর্ণ। কথিত আছে, শ্রীকৃষ্ণ একবার পুত্রলাভের বাসনায় শিবের বর লাভের উদ্দেশ্যে বদরিকা আশ্রমে শিবদুর্গার নিকট উপস্থিত হন। সেই সময় অভিশপ্ত জীবন থেকে মুক্তিলাভের অভিপ্রায়ে শিবভক্ত ঘণ্টাকর্ণও শিব সমীপে সমাগত হন। মহাদেব তখন স্বীয় ভক্তকে অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভের জন্য বিষ্ণুর আরাধনা করতে নির্দেশ দেন। শিবভক্ত ঘণ্টেশ্বর তখন স্বীয় আরাধ্য দেবতা আশুতোষের আদেশে বদরিকা আশ্রমে উপনীত শ্রীকৃষ্ণরূপী বিষ্ণুর স্তবস্তুতি করে মুক্তিলাভ করেন।

ঘণ্টাকর্ণের এই পৌরাণিক কাহিনীর সাথে ঘাঁটুপূজার সাযুজ্য নেই বললেই চলে। তথাপি ঘাঁটু পূজা মানে ঘণ্টাকর্ণেরই পূজা। ঘণ্টাকর্ণের পূজাতে যে মন্ত্র উচ্চারণ করা হয় তার অর্থ হল ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর এবং সর্ব রোগ বিনাশকারী; বিশেষতঃ ফোঁড়া, বিষফোঁড়া, খোস প্রভৃতি চর্মরোগ থেকে আরোগ্যলাভের জন্য তাঁর পূজা করা হয়ে থাকে, অর্থাৎ তিনি চর্মরোগের দেবতা। এজন্যই ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা ভিক্ষা করতে গিয়ে বলে, **'আলুর মালুর চাল দাও গো, না দিবে তো খোস লাও গো।'**

'ঘেঁটু পূজার পদ্ধতি' পুস্তিকার প্রণেতা শ্রীধনপতি হালদার মনে করেন ঘাঁটু পূজা হল ঘণ্টাকর্ণের বিবাহ উৎসব। ঘাঁটু সংক্রান্তির দিন কচি-কাঁচাদের পূর্বোলিখিত 'আলুর মালুর' অনুষ্ঠানটিকে কেন্দ্র করে শোনা যায় ভিন্ন ভিন্ন মত। জনশ্রুতি বলে, জনৈক রাজা স্বীয় পুত্রের আচরণে ক্ষুব্ধ হয়ে ঘাঁটু সংক্রান্তির বিশেষ দিনে রাজপুত্রকে রাজভবন থেকে তাড়িয়ে দিয়ে ভিক্ষা করে খেতে বলেছিলেন। পিতৃভক্ত-রামচন্দ্রের মতো রাজপুত্রও পিতৃ-আদেশ শিরোধার্য করে বেরিয়ে পড়েন ঘর থেকে এবং ভিক্ষা করেছিলেন দ্বারে দ্বারে। রাজপুত্রের ভিক্ষা করার দৃষ্টান্তটিকে কেন্দ্র করেই নাকি গৃহস্থ ঘরের ছেলে পুলেরা বছরে বছরে ঐ বিশেষ দিনটিতে ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে—সখের ভিখারী সেজে।

আবার কারো কারো মতে 'আলুর মালুর' অনুষ্ঠানটি এসেছে মনসা মঙ্গলের **'ঝালুর মালুর'** উপাখ্যান থেকে। ঝালু, মালু হল অত্যন্ত গরীব মৎস্যজীবী দুই ভাই। তাদের করুণ অবস্থা প্রতিফলিত হয় মনসামঙ্গলের গানের সুরে—

ঝালু মালু দুটি ভাই, মাছ ধরিতে চলো যাই
ছেঁড়া জালে মাছ ওঠে না, এখন করি কি উপায়।

দীন-দুঃখী ঝালু, মালু যখন অভাব অনটনে জর্জরিত তখন একদিন মনসা দেবী মর্ত্যধামে স্বীয় পূজা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে স্বরূপে আবির্ভূত হয়ে ঝালু, মালুকে মনসা পূজা করতে বলেন। তিনি বলেন, 'মনসার পূজা করলে তারা প্রভূত ধন-দৌলত, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সৌভাগ্যের অধিকারী হবে।' ঝালু, মালু তখন মনসা পূজার সাহায্যার্থে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে থাকে, 'ঝালুর, মালুর চাল দাও গো' বলে। অতঃপর তারা ভিক্ষালব্ধ বস্তুসমূহ সহ পূজোপকরণ দিয়ে মনসা দেবীর পূজা করে সৌভাগ্যবান হয়। মনসা পূজা করার উদ্দেশ্যে ঝালু, মালুর ভিক্ষা করার প্রেরণা থেকেই কিশোর বয়েসী বালক-বালিকাদের মধ্যে ভিক্ষা করার প্রবণতা প্রচলিত হয় কালক্রমে। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হল ঝালু শব্দটি পরিবর্তিত হয়ে, হয়েছে আলু।

ঘণ্টাকর্ণ পূজা ও তৎপ্রসঙ্গে 'আলুর মালুর' মাধুকরী পর্বের রহস্য উন্মোচন করে এবার আমরা আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করব যমুনা বাঁধের জল ছপ্‌ছপ্ জলরাশির গভীরে।

অধ্যায় - ৯৮

যমুনাবাঁধ,

তেজপাল, কালিন্দীবাঁধ, গণ্টনবাঁধ, ভালুক-খুলা, যাদবনগর, অসমের শিবসাগর, জয়সাগর, গৌরীসাগর ও কৃষ্ণগঞ্জের বাউরী পাড়া

মল্লরাজাদের স্মৃতি-স্মারক রূপে প্রতিভাত এই সেই **যমুনাবাঁধ**। এটিই বিষ্ণুপুরের সবচেয়ে বড় জলাশয়। প্রতিষ্ঠাকালে বাঁধটির জলঘর ছিল দেড় হাজার বিঘারও বেশী। দাদুর মুখে শুনেছি আজ থেকে প্রায় একশ' বছর আগেও বাঁধটির জলঘরের এলাকা ছিল সাতশ বিঘা। ১৯৫৩ সালের R. S. Record অনুসারে পাড় সহ বাঁধটির জল-ঘরের পরিমাণ ১০৭ একর ৩৫ শতক এবং ১৯৫৫ সালের Land Reforms Act-এর রেকর্ড Record অনুসারে বাঁধটির জমির পরিমাণ কমে গিয়ে হয়েছে মাত্র ৩৯ একর ১০ শতক। সরকারী ঔদাসীন্য, উপযুক্ত সংরক্ষণ এবং সংস্কারের অভাবে ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীন বাঁধটি আজ হতশ্রী হয়ে মজে যেতে বসেছে। জংলী-জলা-ঘাসের দলের আর কচুরিপানার উপদ্রবে নিপীড়িত বাঁধটি আজও তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে মৃতপ্রায় হয়ে। যমুনাবাঁধের খণ্ডাংশ থেকে যেমন জন্ম হয়েছে বায়েনকোন্দা পুষ্করিণীর, তেমনি এর মজে যাওয়া পার্শ্ববর্তী অংশ সমূহ বিক্রয় সূত্রে হস্তান্তরিত হয়ে হয়েছে কৃষিজমি। এভাবে ক্রমশঃ ক্ষুদ্র হতে হতে বাঁধটি হয়তো একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। অনুরূপ পদ্ধতিতেই যমুনাবাঁধের লাগোয়া উত্তর দিকের **কালিন্দীবাঁধ** এবং কালিন্দীবাঁধের উত্তর দিকের **গণ্টনবাঁধ** ইতিমধ্যেই তাঁদের বিশাল অস্তিত্ব হারিয়ে ছোটখাটো পুষ্করিণীর রূপ পরিগ্রহ করেছে। মল্লরাজত্বকালে পাশাপাশি অবস্থিত এই তিনটি বাঁধ

এবং গণ্টনবাঁধের উত্তরের ব্রীড়াবতী বা খরস্রোতা বিড়াই নদী নিয়ে নির্মিত হয়েছিল রাজধানী বিষ্ণুপুরের পশ্চিম ও উত্তর দিকের জল-দুর্গ। বিড়াই নদীটিও ক্রমশঃ মজে যাচ্ছে প্রাকৃতিক নিয়মের কাছে মাথা নত করে। বিড়াই নদীর মাইল দুই উত্তরে প্রবাহিত দ্বারকেশ্বর নদীটিও বিষ্ণুপুরের জল-দুর্গের এবং জল-পথে বাণিজ্য যাত্রার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হত। সে নদীও জলের গভীরতা এবং স্রোতের তীব্রতা হারিয়ে রাশি রাশি বালুকণার মাঝে তন্বী এক স্রোতস্বিনীর রূপ পরিগ্রহ করেছে প্রাকৃতিক অনুশাসনে।

আজ থেকে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বেও এই যমুনাবাঁধটি ছিল পদ্মগন্ধ সুরভিত জল চিক্‌চিক্, আলো ঝিক্‌মিক্ সৌন্দর্যে ভরা, বাতাসের হিল্লোলে, তরঙ্গ-ভঙ্গিমার কল্লোলে নয়নাভিরাম সুরম্য এক জলাশয়। জলাশয়টির পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের প্রান্তরেখা বরাবর রাশি রাশি সাদা ও লাল পদ্মের শোভা দেখে মনে হত রূপসী যমুনাদেবীর কণ্ঠে প্রকৃতিদেবী যেন পরিয়ে দিয়েছেন সুগন্ধি পদ্মমালা। পানকৌড়ি সহ অসংখ্য জলচর পাখি দূর দূরান্ত থেকে উড়ে এসে যমুনার কাজল-কালো জলরাশির গালিচাতে আসর জমাতো জাঁকিয়ে। জলকেলি করত মন মজিয়ে। আর আমরাও পিছিয়ে ছিলাম না কোন অংশে। বন্ধু-বান্ধবসহ জল ফালি ফালি করে সাঁতার কাটা, স্নানের ঘাটে বৈমুখ এবং উলথা বা উলটি দেওয়া, নৌকা-বিহার এবং পদ্মবনে পদ্মফুল তুলে নৌকা ডুবিয়ে দিয়ে সাঁতার কেটে ফিরে আসা, গ্রীষ্মের রাত্রিতে কুঁড়োজালি পেতে চিংড়ি মাছ ধরা, জ্যোৎস্না রাত্রিতে সবান্ধব নৌকাবিলাস এবং পাড়ে বসে প্রাণ জুড়ানো বাতাসে গা এলিয়ে দিয়ে ঢেউভাঙা জলরাশির সাথে চাঁদের স্নিগ্ধ আলোর লুকোচুরি খেলা দেখে মনে হত 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'। আবার জীবন-এষণার পাশাপাশি মরণ-এষণাও মাথা চাড়া দিয়ে উঠত মাঝে মাঝে। মনে হত 'এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো সে মরণ স্বরগ সমান'। আবার বর্ষাকালে আকাশের বুকে কালো মেঘের ঘনঘটায় যমুনার কাজল-কালো জল যখন আরো বেশী কালো হয়ে উঠত ঠিক সেই সময় আকাশের বুকে শ্বেত শুভ্র বকের ঝাঁক দেখে মনে হত— কালো মেঘের বুকে কে উড়ালো সাদা বকের ঘুড়ি রে ভাই, সাদা বকের ঘুড়ি।

যমুনাবাঁধের পশ্চিমে রয়েছে লোহার জাতি অধ্যুষিত **তেজপাল গ্রাম**। তেজপালে আছে মল্লরাজা ২য় বীর সিংহ প্রতিষ্ঠিত ফুলকাটা নক্সা ও পদ্মের কাজ সমন্বিত মাকড়া পাথরের তৈরী আটচালা আদলের একটি মন্দির। রাধা-কৃষ্ণের আনন্দ বিধানের জন্য ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে কালিন্দীবাঁধের পাড়ে এটি নির্মিত হয়। তেজপালের দক্ষিণ দিকে, যমুনাবাঁধের উত্তর পাড়ের নীচেই ছিল একটি আমবাগান। ঝরা পাতা পায়ে মাড়িয়ে আমের দিনে আম কুড়ানো এবং সরস্বতী পূজার আগের দিন বিকেল বেলাতে যমুনা বাঁধের পশ্চিমের জঙ্গলে আমফুল ও বনফুল পাড়তে যাওয়ার কিশোর বয়সের কচি-কাঁচা দুঃসাহসিক স্মৃতিগুলো প্রায় চল্লিশ বছরের দূরত্বে দাঁড়িয়ে যেন উদাত্ত আহ্বান জানায়, 'ফিরে আয়, ফিরে আয়'। বয়সের সিঁড়ি ভাঙা ছোঁয়াচে-বার্ধক্য হতাশ কণ্ঠে উত্তর দেয়, 'উপায় নেই, উপায় নেই।'

দাদু-দিদাদের মুখে শুনেছি শীতকালে যমুনাবাঁধের পশ্চিমপাড়ে কুমীরদের রোদ পোহানোর গল্প। আজ সেখানে সাউথ ইর্স্টান রেলের উপর শিস্ দিতে দিতে ঝম্‌ঝমিয়ে সরীসৃপের মতো রেলগাড়ি ছুটে চলে। রেল লাইনের পশ্চিমের জঙ্গলে বা **ভালুকখুলা** অঞ্চলে আজ আর দেখা যায় না ভালুক। ভালুক-খুলার পশ্চিমে আমলাই খাল। খালের উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে রাজা যাদব মল্লের নামাঙ্কিত **যাদবনগর** গ্রাম। বাঁধটির দক্ষিণ-

পশ্চিম কোণে রয়েছে রেলস্টেশন। আর বাঁধের পশ্চিমের রেললাইনের পাশেই এখন গড়ে উঠেছে বিস্কুট কারখানা, রাইস মিল এবং 'ওয়েরহাউস' অর্থাৎ শস্যাগার। এদিকে সংস্কারের অভাবে বিষ্ণুপুরের বাঁধগুলিতে বছরে বছরে পলি এবং ঢলের মাটি জমে জমে ভিটে যাচ্ছে বাঁধগুলি। তৈরী হচ্ছে আবাদী জমি। আবাদী জমিগুলি আবার হয়ে যাচ্ছে বাস্তু-জমি। গড়ে উঠছে নিত্যনতুন ঘরবাড়ি। বাড়ছে শহর, ছোট হচ্ছে বাঁধ, ক্রমশঃ মরে যাচ্ছে বাঁধগুলি। অথচ খরাপ্রবণ বাঁকুড়া জেলাতে এই ধরনের বাঁধ বা জলাধারগুলির গুরুত্ব যে অনেক বেশী সে কথা ভুলে গেছি আমরা, আমাদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ এবং আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী সরকার বাহাদুরও। অথচ ব্যাঙে পেচ্ছাব করে দিলে যেখানে বন্যা হয়, আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য সেই অসমের জনগণ এবং সরকার কিন্তু সে বিষয়ে বিশেষ সচেতন। আপার অসমের শিবসাগর জেলা ছিল আহোম রাজাদের রাজধানী। তখন শিবসাগরের নাম ছিল রংপুর। আহোম রাজারা একাদিক্রমে ৬০০ বছর রাজত্ব করেছিলেন রংপুরকে রাজধানী করে। বিষ্ণুপুরের রাজাদের মতোই মন্দির প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বিশাল বিশাল জলাশয় কাটিয়েছিলেন এঁরাও। খোদ শিবসাগরেই রয়েছে **শিবসাগর, জয়সাগর** ও **গৌরীসাগর** নামাঙ্কিত তিনটি জলাশয়। কথিত আছে এক একজন রাজা এক একটি জলাশয় কাটিয়ে জলাশয়ের পাড়ের উপর দেবালয় নির্মাণ-পূর্বক দেববিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন।

পূর্বোল্লিখিত তিনটি জলাশয়ের মধ্যে গৌরীসাগর আকৃতিতে পোকাবাঁধের মতো, আর জয়সাগর এবং শিবসাগর প্রায় সমান সমান,—মানে যাকে বলে উনিশ-বিশ। শিবসাগর জেলা শহরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। চার শত বিঘা জমি নিয়ে খনন করা নিখুঁত আয়তাকার এই জলাধারটির সমতল চারটি পাড় যেন চারটি সমকোণ সরল রেখা দিয়ে তৈরী। পাড় চারটি পিচের রাস্তা এবং একই সরল রেখায় ল্যাম্প-পোস্ট বসিয়ে বৈদ্যুতিক আলো দিয়ে সুসজ্জিত। শুধু তাই নয় পশ্চিম দিকের পাড় কংক্রীট্ করে বাঁধানো আর দক্ষিণ দিকের পাড়টি শুধু কংক্রীট্ করে বাঁধানোই নয় কংক্রীটের উপর কাস্ট্-আয়রনের-জাফরি দিয়ে সুসজ্জিত। পূর্বপাড়ের মধ্যস্থলের পাড় থেকে জলাশয় অবধি বিস্তৃত এক বাঁধানো ঘাট। বিশাল বিশাল শালের খুঁটি এবং শাল কাঠ ও পাটা দিয়ে আগাগোড়া তৈরী ঘাটটির উপর করুগেটেড্ টিনের আচ্ছাদন, নীচে বিছানো কাঠের পাটাতন ক্রমশঃ ঢালু হয়ে চলে গেছে জল অবধি। বসে বসে চিত্ত বিনোদনের জন্য দু'পাশে দু'সারি লম্বা চেয়ার। জলের প্রয়োজনে কলসী বা বালতি দিয়ে জল নেওয়া যেতে পারে, জলে না নেমেই। জলে নামা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কারণ এই জলাধার থেকেই শহরের পানীয় জল সরবরাহ করা হয়। সকলেই নিষেধাজ্ঞা মেনে চলেন অক্ষরে অক্ষরে। কদাচ জলে নামতে চোখে পড়ে না কাউকে। কোথাও নেই একটুও নোংরা। কি অপূর্ব ব্যবস্থা! আমাদের এখানে এসব ভাবাই যায় না। জলাশয় মানেই যেন যত্রতত্র পায়খানা প্রস্রাব করার জায়গা। প্রমোদ ভ্রমণের জন্য আছে মোটর-বোট। বাঁধের দক্ষিণ পাড়ে বিশাল এক শিবমন্দির। শিবমন্দিরের শীর্ষে সোনার পাতে মোড়া বিরাট এক সোনার কলস। কলসের গায়ে অনেকগুলি ছিদ্র। ছিদ্রগুলিতে পায়রারা বাসা বেঁধেছে। কথিত আছে মোগল আক্রমণের সময় ঐ সোনার কলসের সোনার পাত খুলে নেওয়ার জন্য মোগলবাহিনী গোলাগুলি চালিয়েছিল নির্বিচারে। তার জন্যই হয়েছে ঐসব ছিদ্র। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে অসমে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের সময় ঐ কলস নাকি নীচে পড়ে গিয়েছিল। পরে নতুন করে কলসটি সংস্থাপন করা হয় মন্দির-শীর্ষে। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে কয়েকদিনের জন্য জমিয়ে মেলা বসে এখানে। উক্ত শিব-দেউলের এক পাশে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির দেবী-দেউল

অর্থাৎ দুর্গা মন্দির, অপর পাশে বিষ্ণু-দেউল। শিবসাগরের মতই জয়সাগরে এবং গৌরীসাগরেও আছে অনুরূপ দেব-মন্দির। দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর মতোই সাগর দেখার দুর্বার আকর্ষণে বিশাল বিশাল জলাশয় খনন করিয়ে নাম দেওয়া হয়েছে সাগর।

বাঁধের পাড়ের বাইরের দিকের ঢালু জমিতে বহু পুরানো একটি কুটির দেখেছিলাম। কৌতূহলী হয়ে আমার ভ্রমণসঙ্গী নিতাইপুখুরী গ্রামের হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষককে প্রশ্ন করে জানতে পেরেছিলাম যে উক্ত কুটিরটি মন্দির-স্থাপত্য-শিল্পীর সমাধিস্থল। কথিত আছে কোচবিহারের এক সুদক্ষ শিল্পী তৈরী করেছিলেন ঐ মন্দির ত্রয়। পাছে ঐ শিল্পী অন্যত্র গিয়ে ঐসব মন্দিরের থেকেও আরো ভাল এবং আরো বৃহৎ মন্দির নির্মাণ করে দেন—গৌরবহানির এই আশঙ্কায় নিষ্ঠুর আহোম নৃপতিগণ মন্দির নির্মাণের কাজ সুসম্পন্ন হলেই শিল্পীকে একটি কাঁটাপাল্লাতে চাপিয়ে তাঁর সম পরিমাণ অর্থ ও সোনা-দানা শিল্পীর পরিবারবর্গের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য পাঠিয়ে দিয়ে শিল্পীকে জীবন্ত-সমাধি দিতেন শিল্পীর স্বহস্তে নির্মিত সমাধি-কক্ষে। কি ভীষণ অমানবিক আচরণ!

এছাড়া পাড়ের ধারে ধারে স্থাপিত হয়েছে উইমেনস্ কলেজ, টুরিস্ট্ লজ, মহকুমা শাসকের বাংলো। মহকুমা শাসকের বাংলোতে দেখেছিলাম সুরক্ষিত রয়েছে বিষ্ণুপুরের দলমাদলের মতোই বিশাল এক কামান। শিবসাগর প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলে পারছি না। তা হল, শিবসাগর থেকে আঠারো কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত নিতাইপুখুরী গ্রামের হেমচন্দ্র দেবগোস্বামী কলেজে অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত থাকা কালে হামেশাই বেড়াতে যেতাম শিবসাগরে। ডিসেম্বর মাসে একবার গিয়ে দূর থেকে দেখি, জলাশয়ের জল চোখে পড়ে না আদৌ। পরিবর্তে রয়েছে কালো রঙের একটি আস্তরণ। ভাবতে থাকি 'ব্যাঙে মুতে দিলে যেখানে বন্যা হয়', সেই অসমের এই বিশাল জলাধারের জল শুকিয়ে যাবে ডিসেম্বরে ; এটা ভাবা যায় না কোনমতেই। তাহলে হল কি? এসব ভাবতে ভাবতে পাড়ের কাছাকাছি হতেই আমার গায়ে ঝড়ের মতো একটু বাতাস লাগতেই হতচকিত হয়ে উপর দিকে তাকাতেই দেখি যেন একটা কালো মেঘ উড়ে চলেছে আমার মাথার উপর দিয়ে। ভাল করে লক্ষ্য করতেই বোঝা গেল মেঘ নয়, হাজার হাজার পানিহাঁস একসাথে দল বেঁধে উড়ে চলেছে—শিবসাগর জলাশয়ে জলকেলি সাঙ্গ করে। আর নীচে তাকাতেই দেখি নিখুঁত আয়তাকার একটি আয়নার উজ্জ্বল কাঁচের ফলার মতোই থৈ থৈ করছে অগাধ জলরাশি। ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে দেখা এই দৃশ্যটি এক টুকরো আনন্দের স্মৃতি হয়ে আজও বেঁচে আছে মনের গভীরে। শিবসাগর পুষ্করিণী পরিক্রমা করতে সময় লাগে প্রায় ১ ঘণ্টা ২০/২৫ মিনিট।

আমি যখন অসমে যাই তখন কৌতূহলী পরিচিত মহলের কৌতূহল চরিতার্থ করার জন্য বিষ্ণুপুরের মন্দির, মল্লরাজাদের রাজকাহিনী, এবং সাতখানি বাঁধের গপ্পো শুনিয়েছি খুশীতে টগ্‌বগ্ বকম্ বকম্ পায়রার মতোই। পক্ষান্তরে তাঁরাও আমাকে উপহার দিয়েছেন আহোম রাজাদের কীর্তিকলাপ—তথা জলাশয়, মন্দির, রংঘর, কারেংঘর, গড়গাঁও-প্রাসাদের অপরূপ পুরাকীর্তির নৈবেদ্য। সার্বিক বিচারে বলা চলে স্থাপত্য-শৈলীতে বিষ্ণুপুর রয়েছে পুরোভাগে। পক্ষান্তরে জলাশয়ের ক্ষেত্রে গৌরীসাগর, জয়সাগর এবং সর্বোপরি শিবসাগরের স্বর্গীয় সৌন্দর্যের কাছে হার মেনেছে বিষ্ণুপুরের বাঁধগুলি। দুঃখ হয় এই ভেবে যে স্বাধীনতা লাভের পর প্রায় ৫৬ বছর অতিক্রান্ত হল। এই ছাপান্ন বছরের মধ্যে বিষ্ণুপুরের বাঁধগুলিকে সরকারের পক্ষে অধিগ্রহণ করে শিবসাগরের মতো দৃষ্টিনন্দন জলাশয়ের রূপ দিতে প্রয়াসী হননি রাজ্য সরকার বা কেন্দ্রীয় সরকার। এমন কি এই জেলার প্রশাসনিক দপ্তরের

'পুষ্করিণী উন্নয়ন বিভাগ' থেকেও সেরকম উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। আরো অনুতাপের বিষয় বিষ্ণুপুরের জনপ্রতিনিধিগণও এই বিষয়ে খুব সচেতন নন বলেই আমার মনে হয়। বিষ্ণুপুরের অন্ততঃ তিনটি বাঁধ, যথা লালবাঁধ, পোকাবাঁধ এবং যমুনাবাঁধকে সরকারের পক্ষ থেকে অধিগ্রহণ করে তিনটি **'বিউটি স্পট'** তৈরী করার উদ্যোগ নিলে মন্দ হত না। মাছ চাষ করে আয়ের উৎস ছাড়াও খরাপ্রবণ বাঁকুড়া জেলাতে জল-যোগানের পাশাপাশি পর্যটকবৃন্দকে কাছে টানতো দুর্বার আকর্ষণে। পাড়গুলি বৃক্ষাদি শোভিত হয়ে এই জলাশয়গুলি হয়ে উঠতো আপনাদের এবং বিষ্ণুপুরবাসীদের নয়নমণি।

যমুনাবাঁধের কথা প্রসঙ্গে আমরা চলে গিয়েছিলাম সুদূর অসমের শিবসাগর জেলাতে। যমুনাবাঁধ ও শিবসাগরের কথার খেই ধরে আমরা হাজির হয়েছি কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লার বাউরী জাতি অধ্যুষিত **বাউরী পাড়ার** কাছাকাছি। আদিবাসী অধ্যুষিত বিষ্ণুপুরে বাউরী জাতির মানুষরা ছড়িয়ে রয়েছেন প্রায় সর্বত্রই। মল্লরাজত্বকালে এঁরা সৈন্য বিভাগে, জমিদার আমলে জমিদারদের পুষ্করিণী সংরক্ষক, দেহরক্ষী ও পাল্কীবাহক রূপে এবং বর্তমানে এঁরা রিক্সাচালক রূপে জীবিকা নির্বাহ করেন। এছাড়া দিনমজুর, ক্ষেতমজুরের কাজও করে থাকেন অনেকেই। বাউরী জাতির একটি গোষ্ঠী আবার শূকর চাষের পাশাপাশি দেশী মদ তৈরীতে সিদ্ধহস্ত। পূর্বোল্লিখিত বড়াম পূজা হল কৃষ্ণগঞ্জ বাউরী পাড়ার অধিবাসীদের সার্বজনীন এবং সর্বপ্রধান পূজা তথা লোকোৎসব। এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা না বলে পারছি না—সেটি হল আমাদের প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসু যখন তাঁর 'টানা-পোড়েন' উপন্যাসটি লিখেন তখন তিনি বিষ্ণুপুরে প্রায়ই আসতেন এবং থাকতেন সপ্তাহের পর সপ্তাহ। তখন সমরেশ বসুকে প্রায়ই দেখা যেত বিষ্ণুপুরের বদিরপুকুর বাউরী পাড়া মহল্লায় এবং তন্তুবায় পল্লীর ঘরে ঘরে। বিষ্ণুপুরের তাঁত শিল্পকে নিয়ে লেখা 'টানা-পোড়েন' উপন্যাসের সূত্র ধরে সমরেশ বসুর কথা স্মৃতিচারণ করতে করতে আমরা হাজির হয়েছি কৈলাসতলা মহল্লায়। কৈলাসেশ্বরী দেবীর নামেই পল্লীটির নাম হয়েছে কৈলাসতলা। এখন আমরা দর্শন করব কৈলাসেশ্বরীর মন্দির ও উক্ত দেবালয়ের দেববিগ্রহসমূহ এবং মন্দির সংলগ্ন নাট-মন্দিরে বসে বসে হৃদয়ঙ্গম করব দেবালয় প্রতিষ্ঠার ইতিকথা এবং এই পৌরাণিক দেবীর তত্ত্বকথা।

অধ্যায় - ৯৯

মা কৈলাসেশ্বরী

কৈলাসতলা

কৈলাসেশ্বরী আসলে কৈলাসবাসিনী মা দুর্গা। কিন্তু লোকমুখে এবং জনশ্রুতিতে তিনি হয়েছেন 'মা কৈলাস'। ব্যাকরণগত দিক থেকে শুদ্ধ না হলেও মায়ের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে ভক্তদের বলতে শুনেছি, 'জয় মা কৈলাস', 'কৈলাস মায়ী কি জয়' ইত্যাদি, ইত্যাদি। থাক সে সব কথা। আসুন আমরা এক্ষণে 'হরপার্বতী' মন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা মা কৈলাসেশ্বরীর শ্রীমূর্তি দর্শন করে ধন্য করি জীবন। নয়নাভিরাম এই মাতৃমূর্তি ও শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠার মহিমাময় ইতিকথা শুনে হই পরিতৃপ্ত।

বিগত ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে শ্রীমন্দির ও শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠার শতবর্ষ উৎসব উদযাপিত

হয়ে গেল মহা ধুমধাম সহকারে। প্রকাশিত হল শ্রীবিগ্রহের সচিত্র 'স্মরণিকা' পুস্তিকা। উক্ত 'স্মরণিকা', স্মরণিকার অন্তর্ভুক্ত সমীর কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'কৈলাসেশ্বরী মা', কিছু লোকশ্রুতি এবং আমার ব্যক্তিগত স্মৃতিকথাকে পাথেয় করেই আপনাদের উপহার দেবো মা কৈলাসেশ্বরীর চিত্তাকর্ষক কথকতা।

ইতিহাস বলে ১২৯৬ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয় এই শ্রীমন্দির এবং শ্রীবিগ্রহ। স্বাভাবিকভাবেই মনে প্রশ্ন জাগে,—তার আগে কি ছিল এখানে? কেনই বা প্রতিষ্ঠা করা হল এই শ্রীবিগ্রহ এবং শ্রীমন্দির? প্রতিষ্ঠাতাই বা কে?

আপনাদের কৌতূহল প্রশমনার্থে বলি,—১২৯৬ এর পূর্বে কোন এক সময়ে এখানে ছিল একটি বেল গাছ। পার্শ্ববর্তী এলাকা ছিল না এত ঘন বসতিপূর্ণ। ঝোপঝাড় আর লতাগুল্মের অন্তরালে আত্মগোপন করে থাকতো সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীরা। রাতের অন্ধকারে শ্বাপদ জন্তু জানোয়ারের আনাগোনাও অসম্ভব ছিল না। অদূরেই ছিল যমুনা বাঁধ। সর্বসাকল্যে পরিবেশটি ছিল ঈশ্বর সাধনার অনুকূল। আর সেই অনুকূল পরিবেশের সদ্ব্যবহার করেছিলেন কৃপারাম রায়। পূর্বোক্ত বেলগাছের নীচে 'কামার মুচী' আর মাটি দিয়ে তৈরী এক বেদীর উপর সংস্থাপিত তাঁর আরাধ্যা দেবীর পুজো-আচ্চা করে, ধ্যান ধারণায় নিমগ্ন থেকে উৎসর্গ করেন জীবন। **জনশ্রুতি বলে কৃপারাম ছিলেন শক্তি-সাধক এবং সিদ্ধসাধক। কৃপারামের সাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী দুর্গা তাঁকে দর্শন দেন, কথাবার্তা বলেন এবং তার হাত থেকে চিঁড়া, মুড়ি, মুড়কি এবং শীতল-প্রসাদ খান পরমানন্দে। এসব অপ্রকাশ্য কথা প্রকাশ করে ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন কৃপারাম রায়—এহেন কৃপারাম আবার কৃপানাথ, কেরপনাথ, কল্পনাথ, কৃপাব্রাম, ক্যারপারাম নামেও পরিচিত ছিলেন।**

ক্ষেত্রনাথ রায়ের দুই পুত্র—**কৃপারাম রায়** এবং **ভৈরব রায়**। দু'ভায়েই ছিলেন সাধক এবং শক্তি উপাসক। এক সাথেই চলত তাঁদের সাধন ভজন উপাসনা। সাধনকালে সিদ্ধাবস্থায় কৃপারাম ইচ্ছামৃত্যু বরণ করলেন, রয়ে গেলেন ভৈরব। **ভৈরবের একনিষ্ঠ সাধনায় তুষ্ট হয়ে মা তাঁকে সশরীরে দর্শন দিয়ে স্বপ্নাদেশ দেন, 'আচ্ছাদনহীন এই বিল্ববৃক্ষের নীচে আমার থাকতে কষ্ট হয়, তুই আচ্ছাদনের ব্যবস্থা কর।'**

ভৈরব তো ভেবে অস্থির। একে দরিদ্র, তার ওপর সাধন-ভজন পূজা-আচ্চা আর জপ-ধ্যান করে দিন কাটে যার সে আর আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করবে কি? তবুও মায়ের আদেশ—না করে উপায় কি! ভৈরব ছুটলো দ্বারকেশ্বর নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত অযোধ্যা গ্রামের লালমোহন জমিদারের বাড়ি। নিঃসন্তান লালমোহন বাবুর স্ত্রী দ্রবময়ী দেবী ছিলেন তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। দ্রবময়ী দেবী মারফৎ লালমোহন বাবুর কানে উঠল দেবীর স্বপ্নাদেশের কথা, আচ্ছাদনের কথা তথা মন্দিরের কথা। **হিতৈষী দ্রবময়ীদেবীর উপদেশ মতো ভৈরব দেখা করলেন বিষ্ণুপুর কৃষ্ণগঞ্জ নিবাসী তাঁরই অপর ভগ্নী বরদাসুন্দরী দেবী ও তাঁর স্বামী জমিদার চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাথে। চন্দ্রশেখর বাবুর সুপরামর্শ মতো ভৈরব রায় আবার হরেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং অক্ষয় কুমার মুখোপাধ্যায়ের সাথে যোগাযোগ করেন।**

অতঃপর ধর্মপ্রাণ বরদাসুন্দরী এবং রায়, বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখোপাধ্যায় পরিবারের সম্মিলিত উদ্যোগে ও অর্থানুকূল্যে নির্মিত হল শ্রীশ্রীকৈলাসেশ্বরী মায়ের শ্রীমন্দির ও নাটমন্দির। বর্ধমান জেলার অমরপুর গ্রাম থেকে এলেন প্রখ্যাত মৃৎশিল্পী নবকুমার সূত্রধর। এল গঙ্গামাটি, গঙ্গাজল, কুশের খড়, তুষ, ধুনা, গুগ্গুল—এসব উপাদান দিয়ে রূপায়িত

হল হর-পার্বতীর যুগলমূর্তি। সঙ্গে এলেন লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ। আর এল ভূত-প্রেত, রক্ষ-যক্ষ, কিন্নর-কিন্নরী, দেব-দেবী, গায়ক-বাদক, শ্রমিক এবং বিচিত্র সব জীব-জন্তু ও সরীসৃপ। হিমালয়ের কৈলাস পর্বতের অনুকরণে স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত হয়ে শোভা পেতে থাকল আপামর জীবজগৎ। রচিত হল কৈলাসধাম। শাক্ত এবং শৈব ধর্মের অপূর্ব সমন্বয়ে শ্রীমণ্ডিতা হয়ে মা কৈলাসেশ্বরী কৈলাসতলা মহল্লার একচ্ছত্র দেবী হিসেবে সেই ১২৯৬ বঙ্গাব্দ থেকে অদ্যাবধি পূজিতা হয়ে আসছেন সগৌরবে।

শুধু কি শাক্ত এবং শৈব ধর্মের সমন্বয়ই পরিলক্ষিত হয় এই দেবস্থানে? না, ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন হরগৌরীর উপরিভাগে রয়েছেন 'হরিহর' মূর্তি। হরি অর্থে বিষ্ণু, হর অর্থে মহাদেব বা শিব—সুতরাং উক্ত হরিহর মূর্তিটি বৈষ্ণব এবং শৈব ধর্মের সমন্বয়কেই সূচিত করে। অতএব বলা যায় এ মন্দির একাধারে শাক্ত, শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্মের মিলনতীর্থ। আবার ভূত-প্রেত, দেব-দানব-মানব, জীব-জন্তুর সমভিব্যাহারে সাম্যের বাণীই যেন অনুরণিত হচ্ছে সাম্যের দেবতা শিবের প্রভাবে। আর দেবী দুর্গার অনুরাগে এবং অনুশাসনে বুঝিবা লালিত পালিত এবং শাসিত হচ্ছে আপামর দেব-দানব ও জীবকুল এবং হরি অর্থাৎ বিষ্ণুর প্রভাবে বোধকরি প্রতিপালিত হচ্ছে কোটি কোটি জীব। শাক্ত, শৈব এবং বৈষ্ণব ধর্মের সুষ্ঠু সমন্বয়ই হল বিষ্ণুপুরের অধ্যাত্মচেতনার মূল সুর। আর সেই সমন্বয়ের সুরটিই যেন অনুরণিত হয়েছে মা কৈলাসেশ্বরীর শ্রীমন্দিরে। তবে কি বিচক্ষণ শিল্পী নবকুমার সূত্রধর এরকম কিছু একটা পরিকল্পনা করেই নির্মাণ করেছিলেন এই কৈলাসধাম? —এ প্রশ্নের উত্তরে আমি এবং আমরা নীরব। শুধু বলতে পারি, "তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি।"

* * *

শক্তিস্বরূপিণী মা কৈলাসেশ্বরী এখানে স্নেহময়ী জগজ্জননীরূপেই প্রতিভাত। তাই দেখি, ভক্ষ এবং ভক্ষক তাদের সহজাত হিংসা ভুলে গিয়ে সহাবস্থান করছে মায়ের ছত্রছায়ায়। বিষধর এক সর্পকে নির্ভয়ে স্তন্য পান করাচ্ছে এক নারীমূর্তি—সহমর্মিতার এ দৃশ্যটি নিঃসন্দেহে সুষ্ঠু সহাবস্থানের সূচক। **দক্ষের মাথায় ছাগমুণ্ড এবং অন্য একটি প্রাণীর মুখমণ্ডলের ঊর্ধ্বাংশ বানরের মতো এবং নিম্নাংশ সিংহ-সদৃশ—এতাদৃশ মূর্তিগুলি পৌরাণিক যুগের শল্য চিকিৎসার সার্থক প্রতিফলনের প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলেই প্রতীত হয়। ভারতবর্ষের এবং প্রাচীন গ্রীসের এইসব অদ্ভুত মূর্তিগুলি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের দেহব্যবচ্ছেদের ক্ষেত্রে আলোক-দিশারী বললেও অত্যুক্তি হবে না নিশ্চয়।**

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি কৈলাস তলায় আমার মাতুলালয়। মাতুলালয়ে প্রতিপালিত **হওয়ার সূত্রে মা কৈলাসেশ্বরীর স্নেহচ্ছায়ায় লালিত পালিত বর্ধিত হতে হতে মা হয়েছেন আমার একান্ত আপনজন। স্মৃতিকে একটু পিছন দিকে ঠেলে দিতেই আমি এবং আমরা কয়েকজন বন্ধু হঠাৎ করে যেন হয়ে যাই অবোধ শিশু কিংবা দুরন্ত অবাধ্য কিশোর। মন চলে যায় ঢাকের কাঠিতে, পটকা ফাটানোর অজানা আতঙ্কে, তারাবাতি, তুবড়ি, রঙীন দেশলাই আর আতসবাজীর আলো ঝিলমিল্ স্বপ্নীল দিনগুলিতে। আনন্দ! আনন্দ! আনন্দ! মা আনন্দময়ীর আগমনে আমি, আমার বাল্যবন্ধু অশোক, অজিত, দেবী, শান্তি, শঙ্কর, করুণার দল আনন্দের জোয়ারে ভেসেছি ; আনন্দ-সাগরে অবগাহন করেছি, নির্মল আনন্দকে আস্বাদন করেছি আকণ্ঠ।**

মা আসছেন, মা আসছেন রব। শিউলী ঝরা ভোরের হিমেল বাতাসে আগমনী গানের সুর। কলাবৌ-এর দোলার পিছনে নাচতে নাচতে আর গাদা-গেঠে দাগতে দাগতে আমরা ছেলের দল তখন হয়েছি মায়ের 'আপন অনুচর'।

'দুর্গা এল দুর্গা এল জয় জয় রব গিরিরাণী শুনিয়ে।
অমনি এলোকেশে ধায়, পাগলিনীর প্রায়, মা মা বুলিয়ে।'

আনন্দের 'হড়কা বান' নিয়ে মা এলেন, দিন তিনেক থাকলেন—এবার চলে যাবেন। মনের কোণে জলভরা মেঘ। নিশুতি রাতে ছাদে বসে কাঁদি—'ও নবমী নিশিরে তোর দয়া নাই রে, তোর দয়া নাই।' রাত পোহাতেই কানে বাজে 'বিসর্জনী গীত'—

'তোরা আয় গো প্রতিবেশী, আমার উমা ছেড়ে যায়,
উমা ছেড়ে যায় গো, আমার গৌরী বিদায় চায়—'

দুঃখ লাগে এই ভেবে যে বস্তুবাদের প্রভাবে এবং ভাববাদের ভাবালুতার অভাবে আমরা আর তেমন ধারা হাসতে বা কাঁদতে পারি না, ডাকতে পারি না মা মা বলে—তাই মা বোধ করি দূরে সরে যাচ্ছেন ক্রমশঃ। **বাহ্যাড়ম্বরের আতিশয্যে এবং শ্রদ্ধাভক্তি ও আন্তরিকতার অভাবে মৃন্ময় প্রতিমা বোধ করি চিন্ময় সত্তায় হচ্ছেন না সত্ত্বান।** থাক সে সব কথা, এখন মা কৈলাসেশ্বরীর শ্রীচরণে প্রণাম জানিয়ে পাড়ি দেবো কৃষ্ণগঞ্জ অভিমুখে। যাওয়ার পথে বিষ্ণুপুরের অম্বরী তামাকের মাদকতায় আচ্ছন্ন হ'ব অল্প সময়ের জন্য।

অধ্যায় - ১০০

বিষ্ণুপুরের অম্বরী তামাক

গান বাজনা মোতিচুরের মতোই একদা বিষ্ণুপুরের তামাকও ছিল সুপ্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপুরের তামাক শিল্পের সাথে যাঁর নামটি জড়িয়ে আছে ওতঃপ্রোতভাবে তিনি হলেন ৺**শ্রীপতি চরণ কর**, কারণ তিনিই বিষ্ণুপুরের বহু সমাদৃত অম্বরী তামাকের প্রবর্তক। বিষ্ণুপুর ঢেলাদুয়ার মহল্লা নিবাসী ৺গঙ্গানারায়ণ করের জ্যেষ্ঠ পুত্র ৺শ্রীপতি কর বাংলা ১২৫০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার আর্থিক দুরবস্থার জন্য ভালভাবে লেখাপড়া শেখার সুযোগ হয় না তাঁর। কিন্তু অভিনয়, হাস্যকৌতুক এবং সঙ্গীতে সহজাতভাবেই পারদর্শী ছিলেন তিনি। এছাড়া আগমনী গানের রচয়িতা এবং সুরকার হিসেবেও সুপ্রসিদ্ধ ছিলেন তিনি।

তৎকালে বিষ্ণুপুরে কয়েকটি বিখ্যাত নাট্যকোম্পানী ছিল। বাংলা ১২৭৯ সালে শ্রীপতি কর একটি নাট্যকোম্পানীতে যোগ দেন এবং পঞ্চকোটের রাজধানী কাশীপুরে যাত্রাভিনয় করতে যান রাজ-আমন্ত্রণে। কর মহাশয়ের যাত্রাভিনয়ে মুগ্ধ হন স্বয়ং পঞ্চকোটাধিপতি এবং খুশী হয়ে উপহার দেন তামাক প্রস্তুত প্রণালী। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি ঐ সময় কাশীপুরের তামাক ছিল খুবই জনপ্রিয়।

কাশীপুর থেকে ফিরে এসে ১২৮০ সালে ৺শ্রীপতি কর শুরু করেন তামাক ব্যবসা। তামাকের গুণমাধুর্যে ও অপূর্ব সুরভিতে অচিরেই দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে কর মহাশয়ের তামাকের সুখ্যাতি। বর্ধমান, কোলকাতা, মেদিনীপুর, ঘাটাল প্রভৃতি অঞ্চলে দ্রুত প্রসার

লাভ করে তামাকের ব্যবসা। অতি অল্প সময়েই লক্ষ্মীলাভে পরম সৌভাগ্যের অধিকারী হন তিনি। কিন্তু সে সৌভাগ্য-সুখ বেশী দিন সয় না। নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে মাত্র ৫২ বছর বয়সে বাংলা ১৩০২ সালের ৮ই শ্রাবণ লোকান্তরিত হন তিনি। শ্রীপতি করের লোকান্তরের পর তাঁর সহোদর ছোট ভাই ঁকেশবচন্দ্র কর তামাক ব্যবসার হাল ধরেন শক্ত হাতে। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে কেশব করের মৃত্যুর পর তাঁর সাতপুত্র যথা ঁহেমচন্দ্র কর, ঁজ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর ও অন্যান্য ভাইগণ যৌথভাবে পরিচালনা করেন পারিবারিক ব্যবসা।

তামাক তৈরীর উপাদান হিসেবে উৎকৃষ্টমানের তামাক পাতা আসতো বিহার থেকে। উত্তর প্রদেশের লক্ষ্ণৌ, জৌনপুর এবং গাজিপুর থেকে আসতো সুগন্ধি তেল, সুগন্ধি আতর এবং সুগন্ধি জল। আর সুগন্ধি মশলা আসতো কোলকাতা থেকে।

তামাক পাতাগুলিকে ভালভাবে ঢেঁকিতে কুটে ছোট বড় মাঝারি মিহি ও খুবই মিহি ছিদ্র বিশিষ্ট চালুনি দিয়ে চেলে নিয়ে গুঁড়ো তামাকের আকৃতি প্রকৃতি এবং গুণগত মান অনুসারে সেগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে তার সাথে পরিমাণ মতো উৎকৃষ্টমানের গুড় এবং লবঙ্গ, এলাচ, জায়ফল প্রভৃতির সুগন্ধি গুঁড়োমশলা, সুগন্ধি তেল এবং সুগন্ধি জল মিশিয়ে খুব ভাল করে চটকে নিয়ে তৈরী করা হত তামাক। এই সব তামাকের কোনটি হত দানা দানা 'ঘি'য়ের মতো। কোনটি হত মাখনের মতো মোলায়েম। খুব ভালভাবে চটকে দেওয়ার আদব কৌশলে তামাক স্বাদে গন্ধে এবং বর্ণে হয়ে উঠতো অনুপম। এজন্যই বোধ করি একটি দেশীয় প্রবাদবাক্যে বলা হয়েছে—

'তেল তামাক ময়দা
যতই মাখবে ততই ফয়দা।'

সাধারণ মানুষের জন্য স্বল্পমূল্যের তামাক থেকে ধনাঢ্য জমিদার এবং নবাব বাদশাগণের ব্যবহারোপযোগী মহামূল্য তামাক তৈরী হত বিষ্ণুপুরে। তৎকালে তামাক-বিলাসী মানুষের অভাব ছিল না দেশে। সমাজের প্রায় সর্বস্তরের পুরুষ মানুষের ছিল তামাক-দুর্বলতা, তামাক সেবনের উগ্র প্রবণতা। তামাকের আভিজাত্যের গুণে তামাকের মর্যাদাও ছিল তুঙ্গে। সাধারণ মানুষেরা নিম্নমানের তামাক খেতেন হুঁকা-কলকাতে, নবাব বাদশা এবং জমিদারগণ সোনা রূপার পাতে মোড়া ধাতু নির্মিত গড়গড়া বা হাবুল-বাবুলের নলে মুখ রেখে সিংহাসনে বসে বা পালঙ্কের উপর পাশ বালিশে ঠেস দিয়ে উচ্চমানের তামাক খেতেন মৌজ করে। তৎকালে বাঈজী মহল থেকে শুরু করে উৎসব অনুষ্ঠানাদি, বিবাহবাসর এবং হালখাতার মহরৎ উৎসবেও তামাক সেবন এবং তামাক দিয়ে অতিথি অভ্যাগতের আপ্যায়নের রীতিটি ছিল গৌরবজনক। তৎকালে বাউরী, ডোম প্রভৃতি মনুষ্য সমাজে বিবাহ-বাসরে কনেপক্ষ এবং বরপক্ষের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে তর্জার অনুকরণে বিভিন্ন বিষয়ে ছড়া কাটার বহুল প্রচলন ছিল। কনেপক্ষ বরপক্ষকে বসবার জন্য খেজুর পাতার তালাই বা চাটাই পেতে দিয়ে তামাক, হুঁকো-কলকে, পান বিড়ি ইত্যাদি দিয়ে অভ্যর্থনা করতেন। কনেপক্ষ বরপক্ষকে ছড়ার মাধ্যমে নানা প্রশ্ন করতেন। প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তর দিয়ে আসন শুদ্ধি, তামাক শুদ্ধি, হুঁকো শুদ্ধি, কলকে শুদ্ধি করে বরপক্ষ আসন ও অন্যান্য জিনিস গ্রহণ করতেন। তামাকের জনপ্রিয়তার জন্য হুঁকো-কলকে এবং তামাককে নিয়ে মুখরোচক ছড়ার প্রচলন ছিল। এখন তামাক শুদ্ধি, হুঁকো শুদ্ধি এবং কলকে শুদ্ধির একটি ছড়া শোনাই আপনাদের।

'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীচিগুলি
লম্বা লম্বা পাতা
শুন শুন মহাশয় তামাকের কথা
এক ছিলিম তামাক বানাইলে সর্বলোকে খায়
পথের পথিক গেলে ফিরি ফিরি চায়।

উত্তম গাছের ফল আনয়ে নারকল
তাই দিয়ে গঙ্গার জল
বসাইয়া ঝারির নল,
হুঁকো করে ভুড়্ ভুড়্, কলকে করে সাঁই
ধরিলাম হুঁকো, মারিলাম ফুঁক
শুদ্ধ করিলাম কল্‌কের মুখ।'

কারো কারো মতে মহারাজ বীর হাম্বীরের রাজত্বকালে মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি মানসিংহ ও তাঁর পুত্র জগৎসিংহের সাথে সৌহার্দ্যের ফলে অম্বরী তামাকের বিলাসের ঢেউ এসেছিল বিষ্ণুপুরের মল্লরাজ-পরিবারে। জনৈক অভিজাত ব্যক্তি বা রাজা পালঙ্কে হেলান দিয়ে গড়্‌গড়ায় তামাক খাচ্ছেন মৌজ করে—এরকম একটি টেরাকোটা ফলক জোড়বাংলা মন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালের নীচের সারিতে লক্ষ্য করা যায়। উক্ত ফলকটি বিষ্ণুপুরে তামাক শিল্পের ঐতিহ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয় পুনঃ পুনঃ।

এ প্রসঙ্গে মদনমোহন মন্দিরের সম্মুখস্থ নাট-মন্দিরের একটি শিকার-প্যানেলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। উক্ত "শিকার-প্যানেলে শিবিকারোহী সম্রাট বা রাজাকে গড়গড়ায় তাম্রকূট সেবন-রত অবস্থায় দেখা যায়। অনেকে মনে করেন ষোড়শ-শতকের শেষে অথবা সপ্তদশ শতকের প্রথমে আকবরের দরবারেই তামাকের প্রথম প্রচলন হয়। অনেকের মতে তার পূর্বেই পর্তুগীজরা এদেশে তামাকের আমদানী করে; কোন কোন গ্রন্থের সূত্র ধরে আবার কেউ কেউ বলেছেন যে পর্তুগীজদের পূর্বেই এদেশের মুসলমানদের মধ্যে তামাক সেবনের রীতি প্রচলিত ছিল। তামাক আমদানী বা প্রচলনের আদি-ইতিহাস যাই-হোক, মোগলযুগে এর বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়; এসময়ের সাহিত্যে, চিত্রে, ভাস্কর্যে তামাক সেবনের প্রচুর সাক্ষ্য রয়েছে। বিষ্ণুপুর বাংলাদেশের মধ্যে তামাক প্রস্তুতের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র; এখানের বিখ্যাত অম্বরী তামাক মোগল সেনাপতি অম্বররাজ মানসিংহের সঙ্গে বিষ্ণুপুর রাজদরবারের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কেরই আভাস দেয় বলে অনেকে মনে করেন।" শ্রদ্ধেয় চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত মহাশয়ের 'বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটা' গ্রন্থের ১১৫ পৃষ্ঠাতে লিখিত এই উদ্ধৃতিটি পূর্বোক্ত বক্তব্যকেই সমর্থন করে।

শুধুমাত্র বাংলা নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে রপ্তানী হত বিষ্ণুপুরের তামাক। এক্ষেত্রে স্মরণীয়, বিষ্ণুপুরের তামাক 'অম্বরী তামাক' নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। এক সময় এই তামাকের এতই চাহিদা ছিল যে ১০/১২ টি ঢেঁকিতে সদাসর্বদা তামাক পাতা কুটেও তামাকের চাহিদা পূরণ করা যেত না। তামাকের এই আশাতীত চাহিদা পূরণের জন্য করেরা তাঁদের নতুন পুকুরের পশ্চিম পাড়ে স্টীম ইঞ্জিনের সাহায্যে তামাক কুটার ব্যবস্থা করেছিলেন কারখানার প্রসার ঘটিয়ে। বিষ্ণুপুরের তামাক **'শ্রীপতি করের তামাক'** নামেই প্রসিদ্ধি অর্জন করে প্রথমে। পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুরের কেদারনাথ মুখোপাধ্যায়, বিপিনবিহারী

খাঁ, নফর মুদী প্রমুখ ব্যবসায়ীগণও তামাক ব্যবসায় প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। শ্রীপতি করের পরলোক গমনের পর কর পরিবারের এবং বিষ্ণুপুরের পূর্বোক্ত ব্যবসায়ীগণ তামাক ব্যবসায় সুনাম অর্জন করার ফলে বিষ্ণুপুরে উৎপাদিত তামাক সামগ্রিকভাবে **'বিষ্ণুপুরী তামাক'** নামেই সমাদৃত হয় সর্বত্র।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য বিষয়টি হল, অবিভক্ত বাংলার পূর্ববঙ্গে ছিল তামাকের ভাল বাজার। স্বাধীনতার প্রাক্কালে দেশ বিভাগের দরুন স্বাধীন ভারতে দেশবাসীর রুচির আমূল পরিবর্তনের কারণে এবং ধূমপানের সহজ সরল বিকল্প হিসেবে বিড়ি, সিগারেটের ব্যাপক প্রচলনের ফলে ব্যয়-বহুল ও ঝামেলা বহুল তামাকু সেবনের প্রবণতার অপমৃত্যু হয় আজ থেকে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর পূর্বে। ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হতে হতে নিজেরই অজান্তে নিভে যায় তামাকের ব্যবসা—বিষ্ণুপুরের অম্বরী তামাকের শেষ দীপশিক্ষা।

অধ্যায়-১০১

শ্রীশ্রীরাধালালজীউ ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জীউ

কৃষ্ণগঞ্জ

অধুনালুপ্ত অম্বরী তামাকের কথায় মন ভেজাতে ভেজাতে আমরা এসে পড়েছি বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লায়। এখানে অধিষ্ঠিত রয়েছেন কৃষ্ণগঞ্জের কৃষ্ণরায় এবং কৃষ্ণগঞ্জবাসীর প্রাণ-প্রদীপ স্বরূপ শ্রীশ্রীরাধালালজীউ শ্রীবিগ্রহ। কৃষ্ণগঞ্জে অবস্থিত এই দু'জোড়া বিগ্রহ এতোই মনোরম এবং দৃষ্টি-সুখকর যে তাঁদের রূপ দর্শনে ভাবোম্মাদনায় আচ্ছন্ন হয় হৃদয়; কৃষ্ণপ্রেমের জোয়ার আসে শিরা, উপশিরা আর ধমনীতে ধমনীতে। শোধিত হয় রক্ত, পবিত্র হয় অন্তরাত্মা তথা জীবাত্মা। **বৈশাখ, কার্তিক ও মাঘ মাসের মঙ্গল আরতির মাঙ্গলিক মুহূর্তে এবং পূণর্যাত্রার রাত্রি-নিশীথে রাজবেশে সুসজ্জিত হয়ে এই বিগ্রহ দু'জোড়া যখন শোভাযাত্রা সহকারে নগর ভ্রমণে বাহির হন তখন ভক্ত- হৃদয়ে প্রতিবিম্বিত হয় তাঁদের প্রাণবন্ত রূপ।** দিব্যভাবাবিষ্ট হন ভক্তগণ। আসুন, দর্শন করুন সেই নয়ন-জুড়ানো রূপ-মাধুরী। ধন্য করুন জীবন।

আমাদের সম্মুখে অবস্থিত তুলনামূলকভাবে বৃহদাকৃতির রাধা-কৃষ্ণের যুগল মূর্তি হলেন শ্রীশ্রীরাধালালজীউ। এই রাধালালজীউ বিগ্রহের কথা বলতে গিয়ে আমার শিক্ষাগুরু তথা সহকর্মী ভক্তপ্রবর শ্রীগুরুপ্রসাদ সরকার মহাশয় তাঁর 'মল্লসংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের রাসোৎসব' গ্রন্থে লিখেছেন—

"মদনমোহন জীউ-এর পরেই যে বিগ্রহের প্রাধান্য ছিল এই দেশে তিনি হলেন লালজীউ। লালজীউকে এখানে আনেন মহারাজ বীরসিংহ। মহারাজ বীরসিংহের ইচ্ছা হোল তিনি বৃন্দাবন থেকে কৃষ্ণ বিগ্রহ আনবেন তা সে যত মূল্যবান হোক না কেন।

বৃন্দাবন যেয়ে বলেন, 'আমি সেই বিগ্রহকেই বিষ্ণুপুরে নিয়ে যাব যে তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু প্রমাণ দিতে পারবে।' রাজা কৃষ্ণের কাছে প্রমাণ চান যে তিনি আছেন। এই প্রমাণ দিলেন লালজীউ বিগ্রহ। লাল অর্থে বালক। বৃন্দাবনে কিশোরকে বলে লাল। রাত্রিতে রাজা যখন নিদ্রামগ্ন তখন শুনলেন কে তাঁকে যেন নাম ধরে ডাকছে। স্বপ্নে তিনি ঐ সুরে অনেকটা বংশীধ্বনির মাধুর্য উপলব্ধি করলেন। বাইরে এসে কণ্ঠস্বরের

অধিকারীকে ধরবার জন্য তিনি ছুটে বেরিয়ে এলেন। কিছুদুর যেয়ে তিনি এক কুঞ্জে এলেন। তখন ভোরের আলো ফুটে উঠেছে। রাজা কুঞ্জে প্রবেশ করে দেখলেন সুঠাম লালজী বিগ্রহ। এই লালজীকে তিনি আনলেন বিষ্ণুপুরে। রাজার পরীক্ষায় লাল উত্তীর্ণ হলেন। এঁর উদ্দেশ্যে এক বিশাল মন্দির নির্মাণ করলেন মহারাজ বীরসিংহদেব।" সে মন্দির আপনাদের আমি ইতিমধ্যেই দেখিয়েছি। আপনাদের হয়তো মনে প্রশ্ন জাগতে পারে রাজার ঠাকুর রাজদরবারের স্বীয় মন্দির পরিত্যাগ করে কেন এলেন এখানে? সে সব কথা শোনাব ঠিক সময়ে, এখন শুনুন গুরুপ্রসাদ বাবুর কথা। তিনি বলেছেন, "এই বিগ্রহ যেমন সুঠাম তেমনি সুন্দর। এঁর ত্রিভঙ্গঠাম বাস্তবিকই মনোজ্ঞ। শ্রীমতীও বেশ বড় সড় এবং নয়নাভিরাম। কৃষ্ণগঞ্জের অধিবাসীগণ এই বিগ্রহকে নানা পালাপার্বণে উত্তমরূপে সজ্জিত করেন। বিশেষ করে রথের উপর ইনি যখন রাজপথে শোভা পান তখনই দর্শক ও ভক্তগণের চোখে ইনি অতি অপরূপ হয়ে উঠেন। **লালজী বিগ্রহের নামানুসারে লালবাঁধ নামকরণ হয়েছে হ্রদ সদৃশ এই বাঁধটির।** লালজী বিগ্রহেরও মদনমোহনের মতই নানা লীলা ও কাহিনী মল্লভূমে ছড়িয়ে আছে। একবার একটা খুব মজার ব্যাপার ঘটেছিল লাল বিগ্রহকে কেন্দ্র করে। গঙ্গাধর নামে এক ব্যক্তি লালজীর পুরোহিত ছিলেন। ঐ পুরোহিত খুব পবিত্রভাবে চলতেন না। সেটা ছিল গোপাল সিংহের রাজত্বকাল। মহারাজ গোপাল সিংহ অম্বরী তামাক খেতে খুব ভালবাসতেন। তিনি ঐ পুরোহিতের দেওয়া লালজীর ভোগ প্রতিদিন গ্রহণ করতেন।। সমস্ত দিন উপবাসে কাটিয়ে গোপাল সিংহ ঐ ভোগ খেতেন খুব তৃপ্তি ক'রে। একদিন মহারাজা ভোগের মধ্যে অম্বরী তামাকের গন্ধ পেয়ে খুব বিরক্তি বোধ করলেন। তিনি মনে করলেন ঐ ব্রাহ্মণ নিশ্চয়ই তামাকখোর এবং সে তামাক খেয়ে ঐ উচ্ছিষ্ট হাতে ভোগ জুগিয়েছে তাই এই উৎকট অনাচারের কাণ্ডটি ঘটেছে। ব্যাপারটির মধ্যে সত্য ছিল। ঐ পুরোহিত রাজবাড়ীতে এসে গোপনে তামাক খেত; সেদিন সে ভোগ জুগিয়েছিল হাত ধুয়েই, কিন্তু ভাল করে হস্তমার্জন হয়নি তাই এই গণ্ডগোল। ভোগে অম্বরী তামাকের গন্ধ ছড়িয়ে পড়ল। যাইহোক্ রাজা ব্রাহ্মণকে ডেকে পাঠালেন অন্তঃপুরে। তিনি তাঁর অপরাধ স্বীকার করতে বল্লেন। ব্রাহ্মণ বাঁচবার শেষ উপায় স্থির করলেন—ভক্ত রাজার ধর্ম বিশ্বাসকে কাজে লাগিয়ে। তিনি বল্লেন, 'মহারাজ! সাহস দেন তা বলি, লালজী আজকাল তামাক খান।' এই কথা শুনে মহারাজ গোপাল তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলেন। তিনি আদেশ দিলেন সোনার কলিকাতে যেন অম্বরী তামাকু সেজে দেওয়া হয় এবং পরদিন যেন গুড়গুড়িতে তা বসিয়ে যোগান হয় ভগবান লালজীকে। তিনি ব্রাহ্মণের কথার সত্যতা পরীক্ষা করবেন। যদি দেখেন ব্যাপারটির মধ্যে চালাকি আছে তবে তিনি নিজের হাতে ঐ বামুনের মাথা কাটবেন। ভগবানের নামে কোন ভণ্ডামী তিনি বরদাস্ত করবেন না। এবার ব্রাহ্মণ বড় বিপদে পড়লেন। ব্রাহ্মণ কাতর প্রাণে লালজীকে ডাকতে লাগলেন, 'হে প্রভু, রাখ মান, রাখ জীবন, তুমি ক্ষমা কর এ যাত্রা।' ইত্যাদি বলে ব্রাহ্মণ মন্দিরের দেউলীর উপর পড়ে কাঁদতে লাগলেন। বাইরে মহারাজ গোপাল কৃপাণ হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন। যথানিয়মে ভোগ জোগান হ'ল। ভোগের পরেই যাতে তামাক খেতে পারেন ভগবান, তারও ব্যবস্থা হ'ল। লালজী ভোগের পরে তামাক সেবা করেন আর তারই গন্ধে ভোগের অন্নতে তামাকের গন্ধ পাওয়া যায়—এটা পরীক্ষা করবার দিন ছিল সেটা। ব্রাহ্মণ বন্ধ দরজার কাছে কাঁদতে কাঁদতে অচৈতন্য হ'লেন। হঠাৎ একটা সোরগোল

উঠলো। সকলে বাইরে থেকে শুনতে পেলে গুড়্‌গুড়ির শব্দ। মন্দিরের ভিতরে কে তামাক খায়। মহারাজ গোপাল সিং দরজা খুলতে আদেশ দিলেন। কি আশ্চর্য! মন্দিরের ভিতরটা ধুঁয়ায় আচ্ছন্ন। অম্বরী তামাকের সুগন্ধে আকাশ বাতাস আমোদিত। **দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কৃষ্ণ, নিষ্ঠাহীনতার জন্য ক্ষমা করলেন কিন্তু এই ক্ষমাই হোল তার কাল—চোখের জলে ভাসতে ভাসতে তিনি সংসার ত্যাগ করলেন—হলেন বৃন্দাবনবাসী। আর মহারাজা গোপাল সিং ব্রাহ্মণের বংশধরদের দান করলেন প্রচুর জমি-জমা। ভক্তের ত্রুটিবিচ্যুতি গায়ে মেখেই তো তিনি কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ভক্তগণের কালিমা মেখেই এত কালো। নইলে প্রথমে তিনি ছিলেন তপ্ত কাঞ্চনবৎ।** ভগবান লালজীর মত সুঠাম, উজ্জ্বল এবং মাধুর্যমণ্ডিত কৃষ্ণবিগ্রহ মল্লভূমে খুব অল্পই আছেন। রাধাভাবের অঙ্গীকার করেই তিনি এত সুন্দর—এটা চোখে না দেখলে বুঝা যায়না। সুদুর বৃন্দাবন থেকে তিনি এসেছিলেন আপন শক্তির পরিচয় দিয়ে। রাজা তাঁকে পরীক্ষা করলেন। তিনি ইচ্ছে করে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন—এখানে আরও কিছু লীলা করবেন বলে। শেষে মল্লভূমের মাটিতে এসে তিনি হলেন আরও লীলাময়। বিষ্ণুপুরের লালজী ভক্তগণের সঙ্গে অনেক লীলা করেছেন। এই বিগ্রহকে রাসপর্বের সময় নানা বেশে সাজানো হয়। কৃষ্ণের রাজবেশ, রাখালবেশ প্রভৃতিতে এঁকে দেখায় অপরূপ।" (পৃঃ—২৯-৩৩)

গুরুপ্রসাদ বাবুর জবানীতে শোনালাম বৃন্দাবন বিহারী লালজীউ-এর কথা। এবার দেখুন রাধা-লালজীউ-এর পাশেই রয়েছেন কৃষ্ণ-রায় বিগ্রহ। কৃষ্ণরায় মানে রাধাকৃষ্ণ নয়। কৃষ্ণরায় মানে 'রাজা কৃষ্ণ'। **ব্রজধামের কিশোর কৃষ্ণ, গোপালক কৃষ্ণই হলেন লালা জীউ, অপভ্রংশে লালজীউ।** আবার এই গোপালক কিশোর কৃষ্ণই পরিণত বয়সে প্রজাপালকের ভূমিকাতে দ্বারকাধিপতি হয়ে সারা ভারতের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালন করতে থাকেন রাজরূপে। কৃষ্ণগঞ্জের এই কৃষ্ণরায় হলেন দ্বারকা ও মথুরাধিপতি শ্রীকৃষ্ণ। বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যদি আপনারা খুব ভালভাবে লালজীউ এবং কৃষ্ণের মুখাবয়ব লক্ষ্য করেন। দেখুন, লালজীউ-এর মুখমণ্ডলে কিশোর বালকের তারুণ্যের ছাপ অথচ শ্রীকৃষ্ণের মুখাবয়বে গাম্ভীর্যের পাশাপাশি চাপা বয়সের ভারিক্কীভাব প্রকটিত। সুতরাং এই কৃষ্ণই রাজরাজেশ্বর কৃষ্ণ, এই কৃষ্ণই রাধাকান্ত কৃষ্ণ।

বিষ্ণুপুরে বিষ্ণু, কৃষ্ণ, এবং রাধাকৃষ্ণের ছড়াছড়ি। রাজা, প্রজা সকলেই ছিলেন কৃষ্ণ, বিষ্ণু উপাসক। কৃষ্ণ প্রেমের বাঁধভাঙা জোয়ার এসেছিল বিষ্ণুপুরে। কিন্তু কেন এই কৃষ্ণ প্রেম? কি আছে কৃষ্ণের মধ্যে? শুনুন তবে সংক্ষেপে শোনাই কৃষ্ণতত্ত্ব ও কৃষ্ণকথা।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন

কৃষ্ণ—সূর্যসম; মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ, তাঁহা নাহি মায়ার অধিকার।।
(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পৃঃ-৩১১ মধ্যলীলা—২২/৩১)

ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে উল্লেখ আছে—

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, হর,—এই স্রষ্ট্যাদি-ঈশ্বর।
তিনে আজ্ঞাকারী কৃষ্ণের, কৃষ্ণ-অধীশ্বর।।

আবার দেখি স্বয়ং ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব উদঘাটন করতে গিয়ে ব্রহ্মসংহিতায় বলেছেন—

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্বকারণকারণম্।।

উপরোক্ত শ্লোক তিনটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কৃষ্ণ হলেন সূর্যের মতোই শুভ্র তেজোদৃপ্ত জ্যোতিস্বরূপ। পক্ষান্তরে মায়া হল অন্ধকার স্বরূপ। সূর্যের প্রকাশে অন্ধকার নাশ হয়। অনুরূপভাবে কৃষ্ণের প্রভাবে মায়ার নাশ হয়। জীব মায়াপাশ থেকে মুক্ত হয়। দ্বিতীয় শ্লোকটিতে বলা হয়েছে, জীব ও জড় জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের দেবতা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিনজনই শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞাবহ। কৃষ্ণই একমাত্র অধীশ্বর। তৃতীয় শ্লোকটিতে বলা হল, শ্রীকৃষ্ণই হলেন গোবিন্দ এবং তিনিই পরম-ঈশ্বর। তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ। তিনিই সবকিছুর উৎস স্বরূপ কিন্তু তাঁর কোন উৎস নেই। কেননা তিনিই সমস্ত কারণের কারণ স্বরূপ।

আবার দেখুন, কৃষ্ ধাতু ষ্ণ প্রত্যয় যোগে হয়েছে 'কৃষ্ণ'। কৃষ্ মানে কর্ষণ করা। অর্থাৎ যিনি জীবাত্মার হৃদ্ভূমিকে কর্ষণ করে ঈশ্বর-সাধনার তথা পরমার্থ লাভের উপযোগী করে তোলেন তিনিই কৃষ্ণ। অন্য অর্থে বলা চলে মায়াপাশে বদ্ধ জীবকে মায়ামুক্ত করার অভিপ্রায়ে পরম কারুণিক কৃষ্ণ সদাসর্বদা জীবাত্মাকে আকর্ষণ করেন বলেই তিনি কৃষ্ণ। বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমবাসীগণকে তিনি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেন বলেই এখানে এতো কৃষ্ণ-উপাসনার সমারোহ। কৃষ্ণের পাশে রয়েছেন রাধা। আরাধয়তি যা সা রাধা। অর্থাৎ যিনি ঈশ্বর-গত-প্রাণ-হয়ে ঈশ্বর আরাধনা করেন তিনিই রাধা। আবার রাধা মানে ধারা; কৃষ্ণ-প্রেমের, ঈশ্বর-প্রেমের আনন্দধারা। তাইতো তিনি শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়ী সত্তা বা হ্লাদিনী শক্তি। এই হ্লাদিনী শক্তির সার অংশ বা বস্তু হচ্ছে প্রেম, আবার প্রেম বলতে বোঝায় আনন্দচিন্ময় রস বিশেষ। তাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে—

হ্লাদিনীর সার অংশ, তার 'প্রেম' নাম।
আনন্দচিন্ময়রস প্রেমের আখ্যান।।
(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পৃঃ—৫৪০ মধ্যলীলা, ৮/১৫৯)

আবার প্রেমের নির্যাস হল 'মহাভাব'। প্রেমের গহীন গভীরতায় ডুব দিয়ে রাধারাণী হয়েছেন মহাভাব স্বরূপিণী। তাই উল্লেখ আছে—

প্রেমের পরম-সার 'মহাভাব' জানি।
সেই মহাভাবরূপা রাধা-ঠাকুরাণী।।
(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত পৃঃ-৫৪১ মধ্যলীলা, ৮/১৬০)

বৈষ্ণব ধর্ম-গ্রন্থে কৃষ্ণ-উপাসনার জন্য শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—এই পঞ্চভাবের উল্লেখ করা হয়েছে। এই পাঁচটি ভাবের যে কোন একটিকে অবলম্বন করে কৃষ্ণ-কৃপা তথা ভগবৎ-কৃপা লাভ করা যায়। যেমন শান্তভাবে মুনিঋষিগণ, দাস্যভাবে (রামলীলাতে) হনুমান, সখ্যভাবে অর্জুন, বাৎসল্যভাবে মা যশোদা এবং মধুর ভাবে শ্রীরাধা কৃষ্ণলাভ করেছিলেন।

পরমেশ্বরের করুণা ও সাধন অবস্থায় সিদ্ধি লাভ এবং জীবাত্মার পরমাত্মায় গতি লাভের উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবতে নববিধাভক্তির উল্লেখ করা হয়েছে।

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেহধীতমুত্তমম্।। (শ্রীমদ্ভাগবতম্)

অর্থাৎ—"শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য, আত্মনিবেদন—এই নব লক্ষণ সম্পন্ন ভক্তি শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত হয়ে সাধিত হলে সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। এইটিই শাস্ত্রের নির্দেশ।"

শ্রীবিষ্ণুর মহিমা-কথা শ্রবণে মহারাজ পরীক্ষিৎ, কীর্তনানন্দে শুকদেব গোস্বামী, স্মরণ মননে ভক্ত প্রহ্লাদ, শ্রীবিষ্ণুর পাদপদ্ম সেবায় লক্ষ্মীদেবী, তাঁর পূজাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পৃথু মহারাজ, অভিবন্দনে অক্রুর, দাস্যে হনুমান, সখ্যে অর্জুন এবং আত্মনিবেদনের মাধ্যমে বলি মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করে ধন্য হয়েছিলেন।

পূর্বোক্ত পঞ্চভাব এবং নববিধাভক্তি-রসে আপ্লুত হয়ে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিষ্ণুপুরবাসীগণ কৃষ্ণ, বিষ্ণু উপাসনা করেছেন। করছেন আজও। ভক্তের ভক্তিডোরে বাঁধা পড়ে বৃষভানুপুর থেকে এলেন মদনমোহন, বৃন্দাবন থেকে এলেন রাধালালজীউ, জনৈক সিদ্ধ সাধক নিয়ে এলেন ডেঙোরামকৃষ্ণ জীউ। প্রতিষ্ঠিত হলেন কালাচাঁদ, রাধা মদনগোপাল, রাধামদনমনোহর, রাধামুরলীমোহন, রাধাগোপীনাথ, রাধাশ্যামচাঁদ, রাধাবল্লভ, রাধাজীবনজীউ। উপাসিত হলেন রঘুনাথ, গৌরকিশোর, লক্ষ্মীজনার্দন, বেণীমাধব, ষড়ভুজ, সাক্ষীগোপাল, গৌরাঙ্গমহাপ্রভু-জীউ প্রমুখ। এরকম শত শত শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত, পূজিত এবং উপাসিত হতে হতে মল্লভূমের জলে স্থলে বায়ুমণ্ডলে রচিত হল ঈশ্বর উপাসনার, ঈশ্বরানুভূতির এবং ঈশ্বরাস্বাদনের এক স্বর্গীয় পরিবেশ। সেই স্বর্গীয় পরিবেশের দিব্য-আবেশে অভিভূত হয়ে শ্রীনিবাস আচার্য, জয়ানন্দ স্বামী এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ—এই মহাপুরুষ ত্রয় বিষ্ণুপুরকে **'গুপ্তবৃন্দাবন'** আখ্যায় ভূষিত করেছেন। অতীতের বন-বিষ্ণুপুর হয়েছে 'গুপ্তবৃন্দাবন'। তাঁদের পদরেণুতে বিষ্ণুপুরের রজোরাজি হয়েছে পূত-পবিত্র।

এখন চা-পানের বিরতি। বিরতির পরে থাকছে রাজদরবার মহল্লায় নির্মিত স্বীয় মন্দির ছেড়ে রাধালালজীউ এবং জোড়া-বাংলা নামে পরিচিত 'কেষ্টরায়ের মন্দির' ত্যাগ করে স্বয়ং কৃষ্ণরায়জীউ কৃষ্ণগঞ্জে এলেন কেমন করে? এবং কেমন আছেন এখানে?

অধ্যায়-১০২

শ্রীশ্রীরাধালালজীউ ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়জীউ-এর কৃষ্ণগঞ্জে আগমনের কাহিনী এবং কৃষ্ণগঞ্জে কেমন আছেন এই দু'জোড়া বিগ্রহ

প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে বলি, নীলমণি সিংহদেব তখন রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে তাঁর রাজত্বকালের সময় তিনি তাঁর ভাগ্নে দিবাকর সিংহদেবকে রাধালালজীউ শ্রীবিগ্রহ সহ শ্রীবিগ্রহের সমস্ত ভূ-সম্পত্তি দান করেন। এই ভূসম্পত্তির অন্তর্গত বর্তমানের কৃষ্ণগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, রসিকগঞ্জ, রক্ষাকালী প্রাঙ্গণ, কুড়চিবন, যোগীপাড়া, কামারপাড়া, কুমোরপাড়া, কৈলাসতলা, কুসুমতলা, মলডাঙা যমুনাপাড়া, পাটরাঙা লেন, গড়গড়ান, রুদ্রগলি প্রভৃতি স্থান ছিল লালজীউ-এর মৌজা। দিবাকর সিংহদেব রাজবংশের সন্তান হিসেবে বাবুসাহেব উপাধিতে সম্মানিত ছিলেন। এইসব অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করতেন তিনি। খাজনা আদায়ের সূত্র ধরেই বর্তমান কৃষ্ণগঞ্জ আটপাড়া মহল্লার সর্বসাধারণের সাথে তাঁর গড়ে

ওঠে বেশ সুসম্পর্ক। সেই সুসম্পর্কের হাত ধরেই তাঁর চরম আর্থিক দুরবস্থার সময় তিনি উক্ত বিগ্রহ যুগলের সেবাকার্য চালানোর জন্য কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লার অধিবাসীদের অনুরোধ করেন। কৃষ্ণগঞ্জবাসীদের পক্ষ থেকে তখন জানানো হয়, যুগল বিগ্রহ যদি আমাদের দিয়ে দেন তাহলে আমরা ঠাকুরের সমস্ত দায়িত্ব নিতে রাজী আছি। এই উত্তম প্রস্তাবে সম্মত হতেই শ্রীশ্রীরাধালালজীউ বিগ্রহদ্বয় হস্তান্তরিত এবং স্থানান্তরিত হয়ে চলে আসেন কৃষ্ণগঞ্জে এবং কৃষ্ণগঞ্জের জনৈক ব্যক্তি প্রদত্ত এই দালান ঘরটিতে স্থাপিত হয়ে পূজিত হয়ে আসছেন অদ্যাবধি। কথিত আছে এই ঘটনার বেশ কয়েক বছর পর বাবুসাহেব দিবাকর সিংহদেব কৃষ্ণগঞ্জবাসীর কাছে রাধালালজীউ বিগ্রহের জন্য অর্থমূল্য দাবি করেন। পল্লীবাসীগণ বাবুসাহেবের এই প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করায় তিনি বিগ্রহদ্বয় ফেরৎ নিয়ে চলে যান। রাধালালজীউ-এর বিরহে ব্যথিত কৃষ্ণগঞ্জবাসীগণ তখন শ্রীবিগ্রহ যুগল ফিরে পাওয়ার আর্জি পেশ করে মামলা দায়ের করেন আদালতে। দীর্ঘমেয়াদী এই মামলার নিষ্পত্তি হতে সময় লাগবে বেশ কয়েক বছর। এদিকে রাধালালজীউ বিহনে ফণী-হারা-মণির অথবা মা-হারা শিশুর মতোই মনমরা হয়ে পড়েন পল্লীবাসীগণ। দেবালয়ের শূন্যস্থান পূরণ করার সদিচ্ছায় কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লার মুখ্যাজাতীয় ব্যক্তিবর্গ যেমন অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র দত্তমুখ্যা, ধরণীধর পাল, জগবন্ধু চন্দ্র প্রমুখ ছুটে যান রাজা কালীপদ সিংহ ঠাকুরের কাছে। রাজা বাহাদুরের কাছে এক জোড়া রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রার্থনা করেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, সুগায়ক অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়দের পরিবারের সাথে রাজপরিবারের সম্পর্ক ছিল খুবই অন্তরঙ্গ। বাবুসাহেব প্রভাবিত এলাকা বশতঃ কৃষ্ণগঞ্জবাসীদের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন রাজা-বাহাদুর কৃষ্ণগঞ্জবাসীদের বিগ্রহ দিতে অস্বীকার করলেও অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর্জি উপেক্ষা করতে পারেননি পারিবারিক সুসম্পর্কের খাতিরে। রাজগৃহে রক্ষিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহগুলির মধ্যে তাঁর পছন্দসই একজোড়া বিগ্রহ নিয়ে যেতে অনুমতি দিয়েছিলেন। অতুলবাবু এবং তাঁর সঙ্গীগণ তখন দেববিগ্রহগুলি পুনঃপুনঃ নিরীক্ষণ করেও রাধালালজীউ বিগ্রহ যুগলের ন্যায় সুঠাম এবং বৃহদাকার বিগ্রহ আর খুঁজে পাননি। কেননা অতীব নয়নাভিরাম রাধালালজীউ বিগ্রহের প্রায় সমকক্ষ বিগ্রহ না হলে মন ভরবে কেন? দেখতে দেখতে নজরে পড়ে কৃষ্ণরায় বিগ্রহ জীউ। উচ্চতায় একটু কম এবং রাধালালজীউ-এর মতো সুঠাম এবং শ্রীদর্শন না হলেও দুধের সাধ ঘোলে মেটানোর মতো অবশ্যই বটে। সুতরাং কৃষ্ণরায়জীউ বিগ্রহদ্বয় আনয়ন পূর্বক রাধালালজীউ-এর শূন্যস্থান পূর্ণ করা হয়। এদিকে দেখতে দেখতে গড়িয়ে যায় বছরের পর বছর। রাধালালজীউ-বিগ্রহের দাবি-দাওয়া নিয়ে মোকদ্দমা ওঠে হাইকোর্ট পর্যন্ত। অবশেষে কৃষ্ণগঞ্জের পক্ষেই রায় দেন মহামান্য উচ্চ আদালত। বাবু সাহেবের বাড়ি চিরতরে পরিত্যাগ করে রাধালালজীউ ফিরে আসেন কৃষ্ণগঞ্জে। রাধলালজীউকে ফিরে আসতে দেখে স্বীয় রাধাকে একটু বামে ঠেলে দিয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও সরে যান বাম দিকে। তাই দেখে মুচকি হেসে স্বীয় শক্তি-স্বরূপিণী শ্রীরাধাকে বামে নিয়ে কৃষ্ণরায়ের ডান দিকে উঠে দাঁড়ান তিনি। সেই থেকেই অগ্রাধিকার সূত্রে দক্ষিণে রাধালালজীউ এবং বামে কৃষ্ণরায়জীউ অবস্থান করছেন অদ্যাবধি। আর লালজীউ বিগ্রহের রাঙা ঠোঁটে সেই মধুমাখা হাসিটি অম্লান হয়ে আছে আজও। মতান্তরে অবশ্য বলা হয়েছে মোকদ্দমায় বাবু সাহেবের জয় হয়। কিন্তু আর্থিক দুরবস্থার কারণে বাবুসাহেব দেব বিগ্রহের সেবাপূজা ঠিকমতো করতে পারতেন না। এমতাবস্থায় তিনি

স্বেচ্ছায় রাধা-লালজীউ বিগ্রহ যুগল কৃষ্ণগঞ্জবাসীদের দিয়ে দেন।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলতেই হয় এবং সেটি হল অনেকেই মনে করেন 'কৃষ্ণগঞ্জ' মহল্লার নামকরণ হয়েছে কৃষ্ণরায় ঠাকুরের নামানুসারে, কিন্তু তা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ কৃষ্ণগঞ্জে কৃষ্ণরায় বিগ্রহ এসেছেন প্রায় একশত বছর পূর্বে। তার পূর্ব থেকেই মহল্লাটি কৃষ্ণগঞ্জ নামে পরিচিত। ইতিহাস বলে বিষ্ণুপুরের জমিদারী যখন নিলামে বিক্রয় হয়ে যাচ্ছিল তখন বর্ধমান থেকে জনৈক কমলাকান্ত মুখোপাধ্যায় ১২৪টি মৌজা ক্রয় করে কৈলাসতলা মহল্লাতে বসবাস শুরু করেন। সে প্রায় ২৫০/৩০০ বছর আগের কথা। **উক্ত কমলাকান্তের পুত্র প্রভাব প্রতিপত্তি সম্পন্ন কৃষ্ণমোহনের নামানুসারেই পল্লীটির নাম হয় কৃষ্ণগঞ্জ—ঠিক যেমন রসিক বিশ্বাসের নামানুসারে বিষ্ণুপুরের একটি পল্লীর নাম হয়েছে রসিকগঞ্জ।** বিষ্ণুপুর কৃষ্ণগঞ্জ কৈলাসতলা নিবাসী গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং বর্তমানে বিষ্ণুপুর সেখপাড়া নিবাসী মেজর ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ষষ্ঠতম পূর্বপুরুষ ছিলেন উক্ত কৃষ্ণমোহন।

কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লায় রাধালালজীউ এবং কৃষ্ণরায় যুগল-বিগ্রহ-দ্বয়ের আগমনের ইতিকথায় ছেদ বসিয়ে এখন আসি দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তরে। **কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লাতে কেমন আছেন এই দুজোড়া বিগ্রহ?** এ প্রসঙ্গে আমি থাকবো নীরব। স্বয়ং লালজীউ-এর শ্রীমুখেই শুনুন সেই কথা।

হাসিখুশী মুখে লালজীউ ঠাকুর কি বলেন তাই শুনুন মনোযোগ সহকারে।

"বেশ আছি, ভালো আছি। রাজার ঠাকুরের রাজকীয় সমাদার না পেলেও, রাজার হালে না থাকলেও এ অঞ্চলের খেটে-খাওয়া অভাবী মানুষজনের সমাদরে আমি এবং আমরা খুবই সন্তুষ্ট। পেটের ভাতে টান পড়া সত্ত্বেও আমাদের অন্য কোন ধনী ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়া বা অন্যত্র পাঠিয়ে দেওয়ার কথা চিন্তাই করতে পারে না এখানের ভক্তবৃন্দ তথা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা। তাই দেখি ১৩৫০ বঙ্গাব্দের, ইংরাজী ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের মন্বন্তরের সময় যখন পশ্চিমবঙ্গেই প্রায় ১৫ লক্ষ লোক মারা যায় সেই সময় এবং বিংশ শতাব্দীর ছয়-এর দশকে দেশজুড়ে যখন চরম খাদ্যাভাব—অর্ধাহারে, অনাহারে মরছে মানুষ, লঙ্গরখানার মাইলো ঘাঁটা এবং আমেরিকার 'পি. এল. ফোর এইটটি' গম খেয়ে যখন বেঁচে থাকার প্রাণান্ত প্রয়াস তখনও এরা আমাকে ত্যাগ করার কথা ঘূণাক্ষরেও চিন্তা করতে পারেনি। অত্যন্ত সৎ, সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরের মতোই সত্যনিষ্ঠ, নির্লোভ এবং নিঃস্বার্থ **সতীশচন্দ্র দত্ত মুখ্যা** এ অঞ্চলের প্রধান ব্যক্তি হিসেবে দীর্ঘকাল আমার সেবাকার্যের দায়িত্ব পালন করেছে অতীব ইষ্টনিষ্ঠা সহকারে। অতঃপর **শঙ্কর নারায়ণ দত্ত** সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়ে কমিটির সদস্যদের নিয়ে সকলের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সমৃদ্ধির জন্য একাদিক্রমে প্রায় ৩৫ বছরেরও বেশী কাজ করেছে। মনে পড়ে ১৯৬৪-'৬৬ খৃষ্টাব্দের হা-অন্ন হা-অন্ন হাহাকারের সময় আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য তাদের সিদ্ধান্ত হল পল্লীর অবস্থাপন্ন ব্যক্তিদের এক এক জনকে মাসে একদিনের নিত্যসেবা-খরচ (তখনকার বাজারে ৬টাকা ৪ আনা) দিতে বলা হবে। হয়েছিলও তাই। এভাবেই চলেছিল বছর দুই। পল্লীবাসীদের এই অকৃত্রিম আন্তরিকতায় স্বীয় দারিদ্র্য মোচনে সক্রিয় হয়ে উঠে আমরা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করে আমাদের অঙ্গশোভাবর্দ্ধক স্বর্ণালঙ্কারগুলি খুলে দিলাম। প্রেরণা দিলাম ওগুলো বিক্রী করে যমুনাবাঁধ সংলগ্ন বায়েনকোন্দা পুষ্করিণী কাটাতে। পুষ্করিণীটি একটি মোটা অঙ্কের

স্থায়ী আয়ের উৎস হল। শঙ্কর দত্তের আমলে মন্দির সংস্কার, রথঘর সংস্কার, ১৩০৬ বঙ্গাব্দে রথটির শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে রথসংস্কার, বায়েনকোন্দা পুষ্করিণী খনন ও সংস্কার, সেবা-প্রকল্পের প্রচলন ছাড়াও আমাদের জন্য বেশ বড় সড় এক মন্দিরের অবয়বগত রূপদানের প্রয়াস তার উল্লেখযোগ্য কীর্তি। বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত করণিক তথা বিষ্ণুপুর পৌরসভার ২২ বছরের কমিশনার এবং পাঁচ বছরের চেয়ারম্যান শঙ্কর দত্ত মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ করার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে আমারই ইচ্ছায়। কারণ ১০ই আষাঢ়, ১৪০৭ বঙ্গাব্দ বা ২৫শে জুন ২০০০ খৃষ্টাব্দ থেকে নব-নির্বাচিত সম্পাদক ভাস্কর দত্ত তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। ভাস্কর দত্ত ও তার কমিটির সদস্যবর্গ ইতিমধ্যেই নিত্যসেবা প্রকল্প প্রচলন, সমারোহ সহকারে রাস-উৎসব ও অসম্পূর্ণ মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ করতে প্রয়াসী হয়েছে।

জমি-জমা থেকে প্রাপ্য ফসলের পরিমাণও কমেছে। দারিদ্র্য এবং নানান অসুবিধা সত্ত্বেও আমাদের নিত্যসেবা থেকে শুরু করে উৎসবাদির কোন অঙ্গহানি করে না এরা। সাধ্যমত চেষ্টা করে আমাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দে রাখার। রাজকীয় মর্যাদায় না থাকলেও শ্রীদাম, সুদামের অকৃত্রিম ভালবাসার মতোই এদের নির্ভেজাল ভালবাসা, আন্তরিকতা এবং সর্বোপরি ভক্তি অর্ঘ্যে তুষ্ট এবং পরিতৃপ্ত আমি এবং আমরা সকলেই। এজন্যই বলেছিলাম বেশ আছি, ভালো আছি আমরা। আশীর্বাদ করি, প্রাণভরে আশীর্বাদ করি ভালো থাকুক আমার ভক্তবৃন্দসহ সকলেই।"

কৃষ্ণগঞ্জবাসীদের মনের ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর, হৃদয়ের ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধালালজীউ শুধু তাঁর ভক্তদের আর্শীবাদ করেই ক্ষান্ত থাকেন না, স্বীয় পুরোহিতের উপর রাজরোষ প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে, পুরোহিতের জীবন রক্ষার জন্য 'Tobacco smoking is injurious to health' জেনে শুনেও সেদিন কিন্তু স্বাস্থ্যহানির কথা না ভেবে তামাক খেয়েছিলেন হাবুল-বাবুলে। কর পরিবারের শ্রীসমীরকুমার করের প্রস্তুত করা তামাক আজও খান প্রতি বছর অন্নকূটের দিন।

অধ্যায়-১০৩

বিষ্ণুপুরের রথযাত্রা, উল্টোরথ ও অন্নকূট উৎসব

এবার প্রসঙ্গ রথযাত্রা। রথ উৎসবের প্রথম দিনটি রথযাত্রা এবং রথযাত্রার সাত দিনের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত উৎসবটি পুনর্যাত্রা বা উল্টোরথ নামেই প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপুরে রথযাত্রা বা সোজারথ উদযাপিত হয় খুবই সাদামাটাভাবে। উল্লেখ করার মতো দর্শনধারী বৃহদাকার তিনটি রথ আছে বিষ্ণুপুরে। এর মধ্যে একটি হল বাহাদুরগঞ্জ মহল্লার চৌধুরী পরিবারের পারিবারিক কুল-দেবতা শ্রীশ্রীরাধাদামোদর জীউ-এর রথ। সিংহাসনোপবিষ্ট শ্রীশ্রীরাধাদামোদর (শালগ্রাম শিলা) জীউকে রথারোহণ করিয়ে সকালে ও সন্ধ্যায় রথ টেনে ভোগরাগ, আরত্রিক অনুষ্ঠান এবং নাম সংকীর্তনের মাধ্যমে উদযাপিত হয় রথযাত্রা এবং পুনর্যাত্রা উৎসব।

বিষ্ণুপুরের অপর দুটি অত্যন্ত বৃহদাকার রথের মধ্যে একটি হল মাধবগঞ্জের শ্রীশ্রী রাধামদনগোপাল জীউ-এর রথ। ১৬টি লোহার চাকার উপর দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১৫ফুট ৬ ইঞ্চি

মাপের বর্গাকার একটি লৌহ কাঠামোর উপর কারুকার্য খচিত পিতলের পাতে মোড়া উন্মুক্ত বারান্দা চত্বর সহ দ্বিতল প্রকোষ্ঠের আদলে নির্মিত ত্রিতল পঞ্চরত্ন বিশিষ্ট এই রথটির উচ্চতা প্রায় ৩৩ ফুট ১ ইঞ্চি। পক্ষান্তরে ১৩০৬ বঙ্গাব্দে প্রতিষ্ঠিত কৃষ্ণগঞ্জের রথটি অনুরূপ ধাতু ও অনুরূপ পদ্ধতিতেই নির্মিত। ১৪টি চাকা বিশিষ্ট দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ১৪ফুট ১ ইঞ্চি মাপের বর্গাকার এই রথটির সর্বসাকল্যে উচ্চতা ২৯ ফুট ৫ ইঞ্চি। বিষ্ণুপুরের তিনটি রথের মধ্যে এটিই সর্বাধিক কারুকার্য সমন্বিত এবং সর্বাধিক নয়নাভিরাম। এ ছাড়া মাধবগঞ্জে ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি বর্গাকার বেদীর উপর পঞ্চরত্ন বিশিষ্ট আর একটি রথও আছে। চার-চাকা-ওয়ালা এই রথটির উচ্চতা প্রায় ১১ফুট। রথযাত্রা বা সোজা রথের দিন সকালে এই রথে একটি শালগ্রাম শিলা এবং বড় রথটিতে আর একটি শালগ্রাম শিলা সহ রাধামদনগোপাল জীউকে রথে চড়িয়ে রথ টানা হয়। রাত্রিবেলাতে শুধুমাত্র রাধামদনগোপাল জীউকে রথে চড়ানো হয়। পক্ষান্তরে কৃষ্ণগঞ্জে সকাল বেলা রাধালালজীউ-এর ভাইপো নামে কথিত ক্ষুদ্রাকৃতির গোবিন্দজীউকে এবং রাত্রিবেলাতে রাধালালজীউ এবং কৃষ্ণরায়জীউকে রথারোহণ করিয়ে রথ টানা হয়। রথ টানার পর নাম সংকীর্তন এবং আরত্রিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে খুবই সাদামাটাভাবে বিষ্ণুপুরের সোজারথ সাঙ্গ হয় সে বছরের মতো। কৃষ্ণগঞ্জের সোজারথ উপলক্ষ্যে হোম-যজ্ঞও হয়। সাদামাটা এই সোজারথে কিন্তু দোকানদানীর সমারোহের পাশাপাশি কচিকাচাদের আনন্দ-উদ্দীপনার সীমা থাকে না।

রথযাত্রা উপলক্ষ্যে বিষ্ণুপুরের সোজারথের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। এক্ষণে রথযাত্রার পুণ্যলগ্নে আপনাদের শোনাই রথযাত্রার তত্ত্বকথা।

আমরা বছরে বছরে রথ দেখি, রথের দড়ি টেনে পুণ্য সঞ্চয়ের পিপাসা চরিতার্থ করি। রথারূঢ় দেব-দেবীকে করজোড়ে প্রণাম করে শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করি শ্রীবিগ্রহের শ্রীচরণে। ব্যাস-এই পর্যন্ত। কিন্তু রথ কি? রথযাত্রার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যই বা কি? এসব আমরা অনেকেই জানি না। জানবার আগ্রহবোধ করি না। কিন্তু আমার মনে হয় ঠিক এই মুহূর্তে আপনারা রথের ব্যাখ্যা ও রথযাত্রার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য শোনার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন ভিতরে ভিতরে। আপনাদের কৌতূহল প্রশমনার্থে বলি,—

রথ হল জীবাত্মা অর্থাৎ জীবদেহ। রথের চারটি চাকা চারযুগ—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি যুগের প্রতীক। রথারূঢ় দেবতা হলেন পরমাত্মা অর্থাৎ পরমেশ্বর। রথের ছয়টি অশ্ব হল ইন্দ্রিয়-তাড়িত ছ'টি রিপু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য; অশ্ববল্গা হল বিবেক। রথের গতিবেগ হল অসংযত মন। রথের সারথি হল জ্ঞান। শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়-সুখকর বিষয় সমূহ হল অশ্বগণের বিচরণ পথ।

এক্ষণে দেখা যাক রথযাত্রার সামগ্রিক অর্থ কি দাঁড়ায়। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি অর্থাৎ কিনা যুগ যুগ ধরে জীবাত্মাগণ ইন্দ্রিয়-সুখকর বস্তু সমূহের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে অসংযত এবং নিম্নগামী মনের বশবর্তী হয়ে মায়াপাশে আবদ্ধ হয় এবং বিপথে কুপথে বিচরণ করে। যম-যন্ত্রণার শিকার হয়। পুনর্জন্মের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরপাক খেতে থাকে বারংবার।

পক্ষান্তরে রথরূপী জীবাত্মার হৃদয়-কন্দরে যে পরমাত্মা বা পরমেশ্বর উপবিষ্ট আছেন জ্ঞানীরূপী সারথির বেশে তিনিই পরম ও চরম সত্যের সন্ধান দিয়ে জীবকে ঈশ্বর চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সদা সচেষ্ট। আমাদের অসংযত মন ইন্দ্রিয়-সুখকর অনিত্য বস্তুর পশ্চাতে ধাবমান হলেই রিপু তাড়িত মনের উপর বিবেক, বৈরাগ্যের কশাঘাত হানে এবং জ্ঞানরূপী সারথি জীবাত্মাকে ঈশ্বরমুখী হবার প্রেরণা দেয়। যে সমস্ত জীবাত্মা

বিবেক-বৈরাগ্যের তাড়নায় ঐশী পথে বিচরণ করে, পরিণামে তারাই পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়ে মোক্ষলাভ করে। **সুতরাং রথযাত্রার সার কথা হল পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মহামিলনের উদ্দেশ্যে শুভযাত্রা।** আরো বলা হয়েছে—

'রথস্থং বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্মং ন বিদ্যতে'—উক্তিটির স্থূল অর্থ হল রথোপরি উপবিষ্ট বামনদেব বা শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবকে দর্শন করলে পুনর্জন্ম হয় না। শ্লোকটির অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক অর্থ হল, দেহরূপ রথে আসীন অন্তরাত্মা বা পরমেশ্বর হরিকে দর্শন করলে আর পুনর্জন্ম হয় না। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, 'বামন' অর্থে ক্ষুদ্রাকৃতি মানব। ইনিই উপনিষদের 'অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষম্।'

রথযাত্রার তত্ত্বকথা শোনালাম। এবার শোনাই পুনর্যাত্রার কথা। জগদ্বিখ্যাত জগন্নাথদেব রথযাত্রার পুণ্যলগ্নে সুভদ্রা, বলরাম সমভিব্যাহারে নিজ নিজ রথে আরোহণ করে নিজ মন্দির থেকে মহাসমারোহে মাসীর বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। আবার সাতদিনের মাথায় পুনরায় স্ব স্ব রথে আরোহণ করে নিজ মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব, বলরাম ও সুভদ্রা দেবীর স্বীয় মন্দিরে প্রত্যাবর্তনের মহাসমারোহপূর্ণ ঐ শুভানুষ্ঠানটিই হল পুনর্যাত্রা। জগন্নাথ দেবের এই প্রত্যাগমনকে 'উল্টোরথ' বলা হয় কোন কোন স্থানে।

বিষ্ণুপুরের রথযাত্রার উৎসবটি যেমন 'সোজারথ' নামে সুবিদিত তেমনি পুনর্যাত্রার মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানটি 'উল্টোরথ' নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপুরের উল্টোরথের ইতিহাস কিন্তু উত্তেজনাপ্রবণ আনন্দোৎসবের ইতিহাস। উল্টোরথের চমকপ্রদ বর্ণনা শোনানোর আগে শোনাই প্রাচীন বিষ্ণুপুরের জনবসতির অবয়বগত গঠন প্রণালী। সেদিনকার বিষ্ণুপুর ছিল বাংলা বর্ণমালার ঠিক 'চন্দ্রবিন্দু' আকৃতির। খড়বাংলা থেকে শুরু করে, শাঁখারীবাজার, মল্লেশ্বর, কাদাকুলি বিশ্বাসপাড়া, সত্যপরীতলা, বোলতলা, রঘুনাথসায়র, বড়-কালীতলা, মাধবগঞ্জ, বসুপাড়া, যমুনাপাড়া, কৃষ্ণগঞ্জ, কৈলাসতলা, তেঁতুলতলা, কামারপাড়া, কুমোরপাড়া, যোগীপাড়া, গোপালগঞ্জ, এগুলি সামগ্রিকভাবে যেন একটি দ্বিতীয়ার চাঁদ অথবা অর্ধচন্দ্রাকৃতি চাঁদের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। অর্ধচন্দ্রাকৃতির এই জনবসতিবহুল এলাকার মধ্যস্থলে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতোই শোভা পেত বীরবাঁধ বা পোকাবাঁধ এবং রাজবাড়িটি চন্দ্রবিন্দুর 'বিন্দু'র রূপ পরিগ্রহ করেছিল বিচ্ছিন্নতা বশতঃ। এজন্যই বলছিলাম তৎকালীন বিষ্ণুপুর ছিল বাংলার 'চন্দ্রবিন্দু'র মতো দেখতে। একচল্লিশটি পল্লী ওরফে পাড়া নিয়ে গঠিত সেদিনকার ঈশ্বর অধ্যুষিত বিষ্ণুপুরের চিত্রটি নিম্নরূপ। মদনমোহন অধ্যুষিত শাঁখারীবাজার মহল্লাটি গঠিত হয়েছিল ২২টি পল্লীর সমন্বয়ে। পক্ষান্তরে মদনগোপাল অধ্যুষিত মাধবগঞ্জ মহল্লার অন্তর্ভুক্ত হল ১১টি পল্লী আর রাধালালজীউ-এর কৃপাপুষ্ট কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লার অন্তর্ভুক্ত হল ৮টি পল্লী।

কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রবাদ-প্রতিম শ্রীশ্রীমদনমোহন ঠাকুরের নেই কোন রথ। হয় না রথযাত্রার মহোৎসব। কিন্তু মাধবগঞ্জ এগার পাড়া যোলআনার উপাস্য দেবতা শ্রীশ্রী রাধামদনগোপাল জীউ এবং কৃষ্ণগঞ্জ আট পাড়া যোলআনার আরাধ্য দেবতা শ্রীশ্রী রাধালালজীউ এঁদের উভয়েরই আছে এক একটি বৃহদাকার দৃষ্টিনন্দন রথ। সেগুলি তো আপনারা দেখেছেন ইতিমধ্যেই।

উল্টোরথের দিন সকালে রথগুলিতে বিগ্রহ সংস্থাপন করে রথ টানা হলেও বিষ্ণুপুরের উল্টোরথ কিন্তু আক্ষরিক অর্থে রথযাত্রা উৎসব নয়। শিখণ্ডিকে সামনে রেখে অর্জুন যেমন যুদ্ধ করেছিলেন কুরুক্ষেত্রে তদনুরূপে মাধবগঞ্জ এবং কৃষ্ণগঞ্জ উভয় পক্ষই ক্ষুদ্রাকার দুটি রথকে শোভাযাত্রার পুরোভাগে প্রতিষ্ঠাপন করে শোভাযাত্রার পশ্চাদভাগে

শকট বাহিত চৌদালে শ্রীশ্রীরাধামদনগোপাল জীউকে এবং সুসজ্জিত জীপগাড়িতে শ্রীশ্রীরাধালালজীউকে চড়িয়ে পুনর্যাত্রার দিন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হন সদর্পে।

হ্যাঁ, প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতাই এই উৎসবের প্রাণ, স্পন্দন এবং অনুরণন। নিজ নিজ এলাকার শ্রীবিগ্রহদের সাজসজ্জা, রূপমাধুর্য, জাঁকজমকত্ব এবং আভিজাত্য নিয়ে সে কি উদ্দাম উত্তেজনা! সে কি রোমাঞ্চকর শিহরণ! সে কি উত্তাল প্রাণস্পন্দন! না হবেই বা কেন? সব মা-ই মা। সব শিশুই শিশু। তবুও নিজ নিজ শিশু সন্তানের জন্য যেমন প্রতিটি মাতৃহৃদয়ে জমে থাকে অফুরন্ত স্নেহভালবাসা, পর্যাপ্ত মায়ামমতা, তেমনি অবচেতন মনে জমে থাকে নিজ নিজ সন্তানের জন্য সীমাতীত গর্ববোধ—অর্থাৎ কিনা আমার সন্তান সব থেকে বড়, সবার চেয়ে ভাল, নয়নের মণি।

হ্যাঁ, কৃষ্ণগঞ্জবাসীগণের নিকট নয়নের মণি হলেন শ্রীশ্রীরাধালালজীউ, আর মাধবগঞ্জবাসীগণের হৃদয়ের খনি হলেন গিয়ে শ্রীশ্রীরাধামদনগোপালজীউ।

লালজীউ এবং মদনগোপালজীউ উভয়েই কিন্তু কৃষ্ণরূপী ভগবান। সাজ-সজ্জা আকার-প্রকার সবই অনুরূপ। নামে মাত্র ভিন্ন সেই একই ভগবান একইরূপে একই আঙ্গিকে পূজিত হয়ে আসছেন কৃষ্ণগঞ্জে এবং মাধবগঞ্জে। এক কথায় বলা যায় উভয় গঞ্জের আপামর জনগণই নামান্তরে কৃষ্ণভক্ত। তথাপি পুনর্যাত্রার দিন সেই একই মুরলীধারীকে নিয়ে কি ভীষণ উত্তেজনা—রেষারেষির মৌতাত! প্রতিযোগিতার প্রাবল্য!

এই প্রতিযোগিতার মনোভাবটিই কিন্তু উৎসবের প্রাণস্পন্দন, উৎসবের প্রেমবন্ধন কিংবা স্নেহবন্ধন। আত্মীয়স্বজন, কুটুম-বাটুম এবং দর্শনার্থীদের সমাগমে থৈ থৈ করে বিষ্ণুপুর। থিক্ থিক্ মানুষের ভিড়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে শোভাযাত্রা। সারিবন্দি ঢাকে কাঠি পড়ে সরবে—'ডেংটি প্যাটেং, ড্যাডেং ড্যাডেং ডেংটি প্যাটেং'। ব্যাঞ্জো, সানাই, তাসা, ইসারা-বাজনা আরো কত কি! হাউই, রোশনাই, আলোর ফুলকি, আতসবাজীর রং-বাহারি আলোর ফোয়ারা, রাস্তায় রাস্তায় বৈদ্যুতিক আলোর বাহার আর সুগন্ধি-পুষ্প ও সুশোভিত পল্লবে সে কি আনন্দের আমেজ! আলো ঝলমল আলোয় আলোয় আলোকিত পরিবেশে দৃপ্ত এক রাজবেশে, রাজকীয় মহিমায় একদা দ্বারকার রাজা জ্যোতির্ময় পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধা সমভিব্যাহারে নগর পরিক্রমায় বের হন তখন তাঁদের নয়নসুখকর ভুবনমোহন রূপ যেন উপচে পড়ে কানায় কানায়। সেই ভুবনমোহন রূপ দেখে ভক্তবিলাসী-রাধাকৃষ্ণের গুণগান করে ভক্তকণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে—

রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়
শ্রীরাধে গোবিন্দ জয়।
একবার হের রে নয়ন, ঐ আমাদের—
ঐ আমাদের মদনগোপাল বৃন্দাবনচন্দ্র জয়
রাধে গোবিন্দ জয়
একবার চরণে চরণ দিয়ে, ঐ আমাদের—
বামে চূড়া হেলাইয়ে, ঐ আমাদের—
গলে দুলে বনমালা, ঐ আমাদের—
ঐ আমাদের মদনগোপাল বৃন্দাবনচন্দ্র জয়
রাধে গোবিন্দ জয়, রাধে গোবিন্দ জয়
শ্রীরাধে গোবিন্দ জয়।
ঐ আমাদের—
ঐ আমাদের মদনগোপাল বৃন্দাবনচন্দ্র জয়।

সুরারোপিত হ'য়ে ভক্তবৃন্দের সুললিত কণ্ঠে কণ্ঠে সুমধুর ঐ হরিনাম-কীর্তন যখন ঝরতে থাকে অঝোর ধারায়, তখন যে ঐশী আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, তখন যে স্বর্গীয় পরিবেশ রচিত হয় গুপ্ত-বৃন্দাবনের রজোরাজিতে তার মাধুর্য, তার মহিমা বর্ণনা করতে আমি অক্ষম, আমি অপারগ।

বিষ্ণুপুরের উল্টোরথকে কেন্দ্র করে বছরে বছরে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলিকে যদি শ্রেণীবদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করা যেত তাহলে **'বিষ্ণুপুরের উল্টোরথ'** নাম দিয়েই সুন্দর একখানা বই লেখা যেত অবলীলাক্রমে। আমি সেই বাহুল্যে না গিয়ে উল্টোরথের স্মৃতিচারণ করব অতি সংক্ষেপে।

লোকশ্রুতি বলে এমন একটা দিন ছিল—হতে পারে ৮০/৮৫ বছর আগের কথা—যখন নাকি কৃষ্ণগঞ্জ এবং মাধবগঞ্জের মধ্যে রথযাত্রার ঠাকুর নিয়ে ছিল না কোন প্রতিযোগিতা। তৎকালে উভয়গঞ্জের শ্রীবিগ্রহগুলি একসাথে শোভাযাত্রায় সামিল হতেন। কৃষ্ণগঞ্জের ঠাকুরকে মাধবগঞ্জে, মাধবগঞ্জের ঠাকুরকে কৃষ্ণগঞ্জে আরত্রিক অভিনন্দনে বরণ করা হত। সন্ধ্যারাত্রে পরব বেরত এবং রাত্রি বারটা, সাড়ে বারটায় শোভাযাত্রার সমাপন হত। রেড়ির তেলের মশালের আলো শোভাযাত্রার অঙ্গ ছিল। পরবর্তীকালে এসেছে কেরোসিন, হ্যাজাক, ডে-লাইট এবং গ্যাসের বাহারি আলো। এখন তো বিদ্যুতের আলোর জৌলুস, আলোক-সজ্জার কারুকার্যই উল্টোরথের প্রধান অঙ্গ। তখন শোভাযাত্রার মিছিলের অগ্রভাগে থাকত হাতি, ঘোড়া, উট, পিতলের দণ্ডে রঙীন পতাকাবাহীদের পদযাত্রা। আর থাকতো কাড়া-নাকাড়া, আতসবাজীর বৈচিত্র্য, ঘন ঘন গর্জে উঠতো বিষ্ণুপুরের ছোট ছোট কামানগুলি। রাতের আকাশে উড়তো কর্পূরের মশালবাতি দেওয়া ঢাউস আকৃতির অগণিত ফানুস। উৎসবের মেজাজ থাকতো মাসভর, কারণ কাজের যাঁতাকলে তখন পিষ্ট হত না মানুষ। হিসেব করে তখন কেউ খরচ করতো না সময় কিংবা টাকা। কারণ তৎকালে সঞ্চয়-প্রবৃত্তি আর হিসেবি-বুদ্ধি গ্রাস করেনি মানুষকে কিংবা মানুষের মনুষ্যত্বকে। তাই তখন উৎসব মানে বোঝাত আনন্দের হাট। উৎসব মানে বোঝাত হৃদয় খোলা আহ্বান। উৎসব মানে বোঝাত ভগবানের পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ। উৎসব মানে বোঝাত উদাত্ত কণ্ঠে ভগবানের জয়গান গাওয়া। ভাবভক্তিতে কিছুটা ভাটা পড়লেও এখনো শোনা যায় সেই সুমধুর জয়গান। মাধবগঞ্জের ভক্তগণ যেমন তাঁদের প্রাণের ঠাকুর, হৃদয়ের ঠাকুরের জয়ধ্বনি দিয়ে গাইতে থাকেন—'ঐ আমাদের মদনগোপাল বৃন্দাবনচন্দ্র জয়........', কৃষ্ণগঞ্জের রাধালালজীউ ও কৃষ্ণভক্তদের কণ্ঠে কণ্ঠে ভক্তিরসধারায় বিগলিত হয়ে ঝরতে থাকে—

রাধালালজীউ কি নাম একবার বল্ রে,.
(ও) রাধালালজীউ কি রূপ একবার হের্রে।
(জয়) রাধালালজীউ কি নাম একবার বল্ রে,
রাধালালজীউ কি রূপ নয়নে হের্ রে।।

রাত্রির প্রথম প্রহর থেকে সারা রাত্রি রথের শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে পরের দিন প্রাতঃকালে স্বীয় মন্দির প্রাঙ্গণে প্রত্যাবর্তন করে বিগ্রহাদি সহ শোভাযাত্রার সহচরগণ। কৃষ্ণগঞ্জ এবং মাধবগঞ্জ উভয় পক্ষের তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সে বছরের মতো শেষ হয় উল্টোরথ।

রথযাত্রা প্রসঙ্গে আরো দু'চার কথা না বললে বক্তব্য অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। এজন্যই বলি

যে গত ১৪০৭ বঙ্গাব্দ. বা ২০০০ খৃষ্টাব্দ থেকে রাজপরিবারের শ্রীপার্থ সারথি সিংহদেবের উদ্যোগে এবং জনসাধারণের সহযোগিতায় দরবারপল্লীতে সোজারথ সহ উল্টোরথ উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে। উল্টোরথের দিন রাত্রির প্রথম প্রহরে শ্রীশ্রীগিরিধারীলাল জীউ, শ্রীশ্রীরাধা-কুঞ্জবিহারীজীউ, শ্রীশ্রীবিনোদবিহারী জীউ ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণবলরাম জীউ পুষ্প ও অলঙ্কারাদিতে সুসজ্জিত হয়ে নাম-সংকীর্তন, বাজনাবাদ্যি এবং আলোকসজ্জা সহ নগরভ্রমণে বেরিয়ে পড়েন। রাজদরবার থেকে কলেজ মোড়, বৈলাপাড়া, রবীন্দ্রস্ট্যাচু, মটুকগঞ্জ, কুন্দকুন্দার বাজার, হাজরাপাড়া, মাড়ুইবাজার ও গড়দরজা পল্লী পরিক্রমা করে শোভাযাত্রাটি রাত্রির শেষ প্রহরে রাজদরবার মহল্লায় ফিরে আসে। **রাজ-দরবারের রথযাত্রা বিষ্ণুপুরের রথ উৎসবকে এক বিশেষ মাত্রা দিয়েছে।**

আষাঢ় মাসে রথযাত্রা এবং উল্টোরথ উৎসবের পর শ্রাবণে ঝুলনযাত্রা এবং কার্তিকের দীপাবলী উৎসবের পরের দিন শ্রীশ্রীরাধালাল জীউ, শ্রীশ্রীরাধামদনগোপাল জীউ ছাড়াও বিষ্ণুপুরের আরো অন্যান্য দেব-মন্দিরে **'অন্নকূট উৎসব'** অনুষ্ঠিত হয় মহাসমারোহে। শুক্লা প্রতিপদে কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দিরে অন্নকূট উৎসবের অনুকরণেই ভারতের বিভিন্ন দেব-মন্দিরে অন্নকূট উৎসবের প্রচলন হয় বলেই প্রতীত হয়। এই সময় থেকেই ধান কাটা শুরু হয়, অর্থাৎ দেশের শস্যভাণ্ডার পরিপূর্ণ হতে শুরু করে। **অন্নগত-প্রাণ কলির মানুষের। তাই এই সময় শস্য তথা অন্নের প্রাচুর্য কামনা করে বছরে বছরে অন্নদাতৃ-দেবীর অন্নকূট উৎসবের সমারোহ।** শুধু দেবী অন্নপূর্ণাই নন, বৈষ্ণবীয় দেব-মন্দিরে এই সময় এবং বৈষ্ণব-সাধক জয়দেব প্রমুখ সাধকদের তিরোধান তিথি উপলক্ষ্যে অন্য সময়েও অন্নকূট উৎসব পালিত হয়। মূলতঃ এটি গোবর্ধন পূজা। এ পূজাতে গোময় বা অন্নের দ্বারা গোবর্ধন গিরির প্রতীক নির্মাণের প্রথা প্রচলিত। পর্বত প্রমাণ অন্ন-ব্যঞ্জন নিবেদন পূর্বক দেব-দেবীর পূজা ও আরত্রিক অনুষ্ঠানের পর ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ এবং যৎসামান্য মূল্যে প্রসাদ বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে এখানে এবং অন্যত্রও।

কার্তিক মাসে অন্নকূট উৎসবের পর কার্তিক/অগ্রহায়ণের রাসপূর্ণিমাতে হয় রাস-উৎসব ফাল্গুন বা চৈত্রে দোলযাত্রা উপলক্ষ্যে এই কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লাতে দেবী অন্নপূর্ণার পূজার চল কিন্তু একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত। এখন আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব কৃষ্ণগঞ্জের অন্নপূর্ণা পূজার দিকে।

অধ্যায় - ১০৪

শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা প্রসঙ্গ

কৃষ্ণগঞ্জ রথতলার পশ্চিমদিকে রয়েছে জোড়া শিবমন্দির। উক্ত শিবমন্দির দ্বয়ের উত্তর দিকেরটি হল বিষ্ণুপুর ঢেলাদুয়ার মহল্লা নিবাসী ৺শচীন্দ্রনাথ কর মহাশয়ের পারিবারিক মন্দির এবং দক্ষিণ দিকেরটি হল বিষ্ণুপুর গন্ধবণিক ষোলআনার শিবমন্দির। গন্ধবণিকগণ শিবমন্দিরের সম্মুখে তৈরী করেন একটি নাটমন্দির। পরবর্তীকালে উক্ত নাট মন্দিরটি রূপান্তরিত হয় একটি একতলা দালান বিশিষ্ট দেব-মন্দিরে। উক্ত মন্দিরে গন্ধবণিকগণ ৺গন্ধেশ্বরী দেবীর পুজো করে থাকেন বছরে বছরে। আর কৃষ্ণগঞ্জ ষোল-আনার পক্ষ থেকে উক্ত শ্রীমন্দিরেই দোলপূর্ণিমার দিন মা অন্নপূর্ণার মৃন্ময় মূর্তি পূজিত হয় যথা নিয়মে।

এখানের দেবীচালের উপরের মধ্যস্থলে সিংহাসনোপবিষ্টা মা অন্নপূর্ণার দক্ষিণে দণ্ডায়মান ভিখারী ভোলানাথকে মা ভিক্ষা দিচ্ছেন প্রসন্ন বদনে। বামে দেবীর সহচরী দেবীকে ব্যজনরত অবস্থায় রত। নীচের সারিতে বাম থেকে দক্ষিণে যথাক্রমে উপবিষ্ট রয়েছেন গাঁজা-কল্কে হস্তে শিবানুচর নন্দী, সুদর্শন চক্রধারী শ্যামবর্ণের বিষ্ণু, সর্বাঙ্গে চক্ষুবিশিষ্ট পীতবর্ণের দেবরাজ ইন্দ্র এবং রক্তবর্ণের চতুরানন, চতুর্ভুজ ব্রহ্মা। স্বয়ং শিব সহ বিশ্বের অন্নজীবীদের মুখে মা অন্নপূর্ণার অন্ন তুলে দেওয়ার মাহাত্ম্য দর্শনের অভিমানসে দেবরাজ সহ ব্রহ্মা, বিষ্ণুর উপস্থিতি শিল্পী শ্রীতুলসীচরণ দে মহাশয়ের সুনিপুণ শিল্প-রূপায়ণে হয়ে উঠেছে দৃষ্টিনন্দন।[১]

চৈত্র মাসের শুক্লা অষ্টমীতে অন্নপূর্ণা পূজা বিধেয়, দোল পূর্ণিমাতে নয়। কিন্তু কৃষ্ণগঞ্জে মায়ের এই অকাল-বোধন কেন? এ বিষয়ে দু'টি লোকশ্রুতি প্রচলিত।

প্রথম লোকশ্রুতি বলে, গন্ধবণিক পরিবারের কোন গৃহবধূর প্রতি দেবী অন্নপূর্ণার স্বপ্নাদেশ অনুসারেই দোলপূর্ণিমা তিথিতে দেবী অন্নপূর্ণার পূজার প্রচলন।

দ্বিতীয় লোকশ্রুতি বলে, মাধবগঞ্জ এগার পাড়া ষোলআনার রঘুনাথ সায়র মহল্লার বকুল তলায় ৺গিরীশ চন্দ্র কিত মহাশয় অতীব নয়নাভিরাম কারুকার্য খচিত এক শ্রীমন্দিরে দেবী অন্নপূর্ণাকে প্রতিষ্ঠা করেন। তাই দেখে কৃষ্ণগঞ্জ আট পাড়া ষোলআনার তৎকালীন পরিচালক ৺সূর্যকুমার মুখোপাধ্যায় ও ৺গোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের মনে কৃষ্ণগঞ্জ আট পাড়া ষোলআনাতেও দেবী অন্নপূর্ণার পূজা প্রচলনের দিব্য অনুপ্রেরণা দেখা দেয় এবং তারই ফল হিসেবে দোলপূর্ণিমার পুণ্য লগ্নে মা অন্নপূর্ণার পূজা প্রচলিত হয়।

কৃষ্ণগঞ্জে শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা পূজা প্রচলনের ইতিকথা শোনালাম। এবার মা অন্নপূর্ণার তত্ত্বকথা শোনাই সংক্ষেপে।

অন্নগত প্রাণ আমাদের। অন্নপ্রাশনের পর থেকে মৃত্যুর দিন অবধি অন্নছাড়া গতি নেই মানুষের। মানবজীবনে অন্নের অপরিহার্যতা উপলব্ধি করেই বোধ করি উপনিষদের ঋষি তৈত্তিরীয় উপনিষদে মন্তব্য করেছেন, 'অন্নং ব্রহ্মেতি'। অর্থাৎ অন্নই ব্রহ্ম। আর এই অন্ন-ব্রহ্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন মা অন্নপূর্ণা। দেবী অন্নপূর্ণা, দেবী দুর্গার দশমহাবিদ্যার মতোই আর এক পৃথক রূপ। বলা চলে দেবীর শক্তি ভেদে ভিন্নরূপ মাত্র।

শিব, দুর্গা মূলতঃ পৌরাণিক দেবতা হলেও বাঙালীর বাৎসল্য প্রেমে আপ্লুত হয়ে তাঁরা হয়েছেন বাঙালী পরিবারের সদস্য-সদস্যা। হয়েছেন একান্ত আপনজন। নানান লোকাচারের নিগড়ে হয়েছেন লৌকিক দেবদেবী। তাই শিব-দুর্গার সহজ সরল অনাবিল জীবনযাপনে ফুটে ওঠে অভাব অনটন পীড়িত বাঙালী মধ্যবিত্ত ঘরেরই প্রতিচ্ছবি। কবি ভারতচন্দ্রের **'অন্নদামঙ্গল'** কাব্যে সেই সুরই অনুরণিত হয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। আসুন, এক্ষণে কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের কাহিনী অবলম্বনে শোনাই 'অন্নপূর্ণা' উপাখ্যানের তত্ত্বকথা।

মহাদেব শুনতেই দেবাদিদেব মহাদেব—আসলে কিন্তু ভিখারী। পরনে নাম মাত্র বাঘছালটি পরে, সর্ব্বাঙ্গে চিতাভস্ম মেখে, গলাতে দু-চারটে বিষধর সাপ জড়িয়ে, মাথাতে পাহাড়-পর্বতের মতো জটাজুট নিয়ে এক হাতে ত্রিশূল আর হাতে ডমরু এবং কাঁধে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে ভিক্ষে করা আর সময়ে অসময়ে শ্মশান-মশানে ঘুরে বেড়ানোই তাঁর প্রধান

১. অন্নপূর্ণার দেবীচাল দেখা যায় এখানের অন্নপূর্ণা পূজার সময়।

কাজ। গাঁজা, ভাঙ পেলে তো আর কথাই নেই। চোখ বুঁজে বসে থাকেন বুঁদ হয়ে, না ধ্যান করেন কে জানে। এদিকে বয়সের গাছ পাথর নেই, তাই আবার বিয়ে করেছেন গৌরীকে। এসে গেছেন কার্তিক, গণেশ। সংসার বেড়েছে, বেড়েছে অভাব, নেই কোন আয়। ভিক্ষাই একমাত্র সম্বল। গৌরীর সাথে খিটির মিটির লেগেই থাকে অহর্নিশি। কথায় বলে, 'পেট বড় মুদ্দাই'। জীব-জন্তু, পাখ-পক্ষী, মানুষ তো দূরের কথা দেব-দানবেরও মুক্তি নেই ক্ষুধার হতে থেকে। তাই দেখি—

শঙ্কর কহেন শুন শুনহ শঙ্করি।
ক্ষুধায় কাঁপয়ে অঙ্গ বলহ কি করি।।
নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া যোগাই।
সাধ করে একদিন পেট ভরে খাই।।
সকলের ঘরে ঘরে নিত্য ফিরি মেগে।
সরম ভরম গেল উদরের লেগে।।

* * *

কিবা শুভ ক্ষণে হৈল অলক্ষণা ঘর।
খাইতে না পানু কভু পুরিয়া উদর।।
আর আর গৃহীর গৃহিণী আছে যারা।
কত মতে স্বামীর সেবন করে তারা।।

মহাদেবের গঞ্জনা বাক্যে জর্জরিত হয়ে মহাদেবী ক্রোধে ফেটে পড়েন। শুনিয়ে দেন মুখে যা আসে তাই। দেবীর বাক্যাঘাতে আহত হয়ে 'অদ্যাবধি ছাড়িনু কৈলাস'— বলে ভিক্ষের ঝুলি কাঁধে নিয়ে ঘর থেকে পথে বেরিয়ে পড়েন মহাদেব। যাবার সময় পুনরুক্তি করেন,—

যত আনি তত নাই না ঘুচিল খাই খাই
কিবা সুখ এ ঘরে থাকিয়া।
এত বলি দিগম্বর আরোহিয়া বৃষবর
চলিলেন ভিক্ষের লাগিয়া।।

মহাদেব কৈলাস ছেড়ে চলে গেলে মহাদেবী চোখে অন্ধকার দেখেন। ভাবেন কৈলাসে থেকে আর লাভ কি! কার্তিক, গণেশকে নিয়ে বাপের বাড়ি যেতে উদ্যত হন। এমন সময় বুদ্ধিমতী সখী জয়া পার্বতীকে শান্ত করেন। বলেন, "কাঙালীর বেশে বাপের বাড়ি গিয়ে সে অনাদৃতা হবে, অবজ্ঞা এবং উপহাসের পাত্র হবে। ভাজের সাথে কোন্দল হবে। আত্মসম্মানে লাগবে।" অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন জয়া আরো বলেন, "দেবী আজ অত্যন্ত ক্রোধবশতঃ নিজের স্বরূপ সম্বন্ধেও আত্মবিস্মৃত। আত্মবিস্মৃত দেবীকে তিনি স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করার অভিপ্রায়ে বলেন,—

অন্নপূর্ণা হয়ে অন্ন দেহ কয়ে
দাঁড়াবে কাহার কাছে।
দেখিয়া কাঙ্গালী সবে দিবে গালি
রহিতে না দিবে নাছে[১]।।

* * *

১. সদর দরজায়

যা বলি তা কর নিজ মূর্ত্তি ধর
বস অন্নপূর্ণা হয়ে।
কৈলাস শিখর অন্নে পূর্ণ কর
জগতের অন্ন লয়ে।।
তিন ভূমণ্ডলে যে স্থলে যে স্থলে
যত যত অন্ন আছে।
কটাক্ষ করিয়া আনহ হরিয়া
রাখহ আপন কাছে।।

* * *

ফিরি ঘরে ঘর হইয়া ফাঁপর
কোথাও অন্ন না পেয়ে।
আপনি শঙ্কর আসিবেন ঘর
তোমার এ গুণ গেয়ে।।

বুদ্ধিমতী জয়ার উপদেশ মতো কাজ করেন দেবী। স্মরণ করেন দেবশিল্পী বিশ্বকর্মাকে। মুহূর্তে দেবীর সম্মুখে এসে দাঁড়ান বিশ্বকর্মা এবং দেবীর ইচ্ছানুসারে দেবীকে অন্নপূর্ণা সাজে করেন সুসজ্জিতা।

মর্ম্ম বুঝি বিশ্বকর্ম্মা আজ্ঞা পাবামাত্র।
রতননির্ম্মিত দিলা হাতা পানপাত্র॥
রতনমুকুট দিলা নানা অলঙ্কার।
অমূল্য কাঁচলি শাড়ী উড়নি যে আর।।
বসিবারে মণিময় দিলা কোকনদ[২]।
আশিস করিলা মাতা হও নিরাপদ।।

দেবীকে অন্নপূর্ণা সাজে সুসজ্জিত করে মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে বিশ্বকর্মা ফিরে গেলেন স্বধামে। দেবী অন্নপূর্ণা তখন জয়ার পূর্বপরামর্শমতো মহামায়ার মায়িক শক্তিতে 'হরিলা যতেক অন্ন আছিল সংসারে।' নিমেষে কৈলাস পর্বত হয়ে উঠল ত্রিভুবনের খাদ্য-ভাণ্ডার। সেই সুষম খাদ্যভাণ্ডারের বর্ণনা করতে গিয়ে কবিবর লিখেছেন,—

অন্নের পর্ব্বত পরমান্ন সরোবর।
ঘৃত মধু দুগ্ধ দধি সাগর সাগর।।
কে রান্ধে কে বাড়ে কেবা দেয় কেবা খায়।
কোলাহল গণ্ডগোল কহা নাহি যায়।।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কলরব এক ঠাঁই।
জয় জয় অন্নপূর্ণা বিনা শব্দ নাই।।

এদিকে ভাঙড়-ভোলা ভিখারী মহাদেব এক মুঠো ভিক্ষের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ান ত্রিভুবন। গৃহস্থের বাড়িতে যেখানেই যান শুনেন একই কথা,—

কি জানি কি দৈব আজি হৈল প্রতিকূল।
অন্ন বিনা সবে আজি হয়েছি আকুল।।
কান্দিছে আপন শিশু অন্ন না পাইয়া।
কোথায় পাইব অন্ন তোমার লাগিয়া।।

---

২. পদ্ম

ঘরে ঘরে দ্বারে দ্বারে ঘুরে ঘুরে কোথাও ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র এক দানাও অন্ন না পেয়ে ভিক্ষার আশায় অবশেষে মহাদেব এলেন বৈকুণ্ঠে স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর কাছে,—'আস লক্ষ্মী অন্ন দেহ ডাকেন শঙ্কর।' কিন্তু মা লক্ষ্মীর ঘরেও অন্ন নেই আজ। কারণ মহাদেবী মহাদেবকে জব্দ করার অভিপ্রায়ে ত্রিভুবনের সমস্ত অন্ন হরণ করেছেন তাঁর মায়িক শক্তিতে। তাই অসহায় লক্ষ্মীদেবী অনুশোচনা করেন,—

কহিতে না বাক্য সরে অন্ন নাহি মোর ঘরে
আজি বড় দৈবের দুর্গতি।।
আমি লক্ষ্মী সর্ব্ব ঠাঁই মোর ঘরে অন্ন নাই
ইহাতে প্রত্যয় কেবা করে।

স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীর মুখে একথা শুনে অনুশোচনায় ভরে যায় মহাদেবের হৃদয়। তিনি নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করেন বারংবার। বলেন, "আমার এমনই দুর্ভাগ্য যে গলাতে বিষধর সর্প থাকা সত্ত্বেও তারা আমাকে দংশন করছে না। আমার কপালের ত্রিনয়নের অগ্নি কামদেবকে ভস্মীভূত করলেও আমাকে ভস্মীভূত করছে না। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা যার অন্নকষ্টে জর্জরিত তার আর বেঁচে থেকেই বা লাভ কি? শান্তি কোথা?' ইত্যাদি ইত্যাদি।

শিবের দুঃখে করুণায় বিগলিত হয়ে লক্ষ্মীদেবী শিবকে উদ্দেশ্য করে বলেন,—

অন্নপূর্ণা যার ঘরে সে কান্দে অন্নের তরে
এ বড় মায়ার পরমাদ।।
গৌরী অন্নপূর্ণা হয়ে জগতের অন্ন লয়ে
কৈলাসে পাতিয়াছেন খেলা।
যতেক ব্রহ্মাণ্ড আছে সকলি তাঁহার কাছে
তাঁরে কেন করিয়াছ হেলা।।
আমার যুকতি ধর কৈলাস গমন কর
আমি আদি সকলি সেখানে।

মা লক্ষ্মীর পরামর্শ মতো শিব ঠাকুর অনতিবিলম্বে ছুটলেন কৈলাসে এবং গিয়ে দেখেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, আদি দেবগণ দেবী অন্নপূর্ণার স্তবস্তুতি করছেন। এদৃশ্য দেখে তিনি বিস্মিত হলেন, স্তম্ভিত হলেন। দেবীর অসাধারণ শক্তি সামর্থ্যের পরিচয় পেয়ে লজ্জিত হলেন নিজের তুচ্ছ শক্তি-সামর্থ্যের কথা ভেবে। মহাদেবের এতাদৃশ শোচনীয় অবস্থা দেখে যার-পর-নাই ব্যথিত হয়ে করুণাময়ী জননী ক্লান্ত শ্রান্ত ক্ষুধার্ত মহাদেবকে অন্ন দেন পরমানন্দে।

অন্নপূর্ণা দিলা শিবেরে অন্ন।
অন্ন খান শিব সুখসম্পন্ন।।
কারণ-অমৃত[১] পূরিত করি।
রত্ন-পানপাত্র দিলা ঈশ্বরী।।
সঘৃত পলান্নে পূরিয়া হাতা।
পরশেন[২] হরে হরিষে মাতা।।
পঞ্চ মুখে শিব খাবেন কত।
পুরেন উদর সাদের[৩] মত।।

১। অমৃতসুরা ২। পরিবেশন করেন ৩। সাধের

এইরূপে দেবী অন্নপূর্ণা পরিবেশিত চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় পরম উপাদেয় খাবার খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে অল্পে তুষ্ট আশুতোষ হয়ে ওঠেন আনন্দে আত্মহারা। দেবীর দিব্য মহিমা দর্শনে মহিমান্বিত হয়ে দেবীর নামে বারংবার জয়ধ্বনি দিয়ে নাচতে থাকেন—

জয় জয় অন্নপূর্ণা বলিয়া।
নাচেন শঙ্কর ভাবে ঢলিয়া।।

দেব-মহিমায় মাধুর্য-মণ্ডিত পৌরাণিক যুগে নিরন্ন মহাদেবকে পরমান্ন দান করে দেবী গৌরী সেদিন অন্নপূর্ণারূপে হয়েছিলেন প্রকট। সেই থেকেই তিনি অন্নপূর্ণারূপে পূজিতা হয়ে আসছেন। দোলপূর্ণিমার পুণ্যলগ্নে দোলযাত্রার আনন্দ মুখরিত দিন থেকে গন্ধেশ্বরী পূজার পূর্বকাল পর্যন্ত দেবী অন্নপূর্ণা কৃষ্ণগঞ্জ রথতলা মহল্লায় পূজিতা হন ফি-বছর। এই দেবীর অসীম করুণাতেই লালিত পালিত হচ্ছেন দেব-দানব-মানব তথা আপামর জীব-জগৎ। কাশীধামে দেবী অন্নপূর্ণা সশরীরে রয়েছেন প্রতিষ্ঠিতা। মা অন্নপূর্ণার কথা শুনলেন। এবার শোনাই বিষ্ণুপুরের দোল উৎসব তথা হোলি উৎসবের কথা।

অধ্যায় - ১০৫

দোলযাত্রা বা হোলি উৎসব

রাধাকৃষ্ণকে উপলক্ষ্য করে অনুষ্ঠিত প্রধান তিনটি উৎসব হল ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা ও দোলযাত্রা। তন্মধ্যে দোলযাত্রা সর্বভারতীয় উৎসব। ভারতের বিভিন্ন স্থানে উৎসবটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। বাংলায় দোলযাত্রা, উড়িষ্যায় দোলোৎসব, দক্ষিণ ভারতে মদন-দহন বা কামায়ন, উত্তরপ্রদেশে হোলি উৎসব এবং অন্যত্র ফাগুয়া, বসন্তোৎসব, শস্যোৎসব প্রভৃতি নামে এর প্রসিদ্ধি। এসব নামকরণের পিছনে বিভিন্ন পৌরাণিক ঘটনার প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়।

দোল-পূর্ণিমার দিন শালগ্রাম শিলারূপী বিষ্ণুকে দোলনায় চাপিয়ে দোল খাওয়ানোর আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠানটিকে বলা হয়েছে দোল। দোল-এর সাথে যাত্রা শব্দটি সংযোজিত হয়েছে অন্য কারণে। যাত্রা শব্দের অর্থ যাওয়া বা গমন করা। দেবতার গতিপথকে বলা হয় যাত্রা। শ্রীকৃষ্ণের উৎসবগুলি যাত্রা নামে অভিহিত। কৃষ্ণ তথা বিষ্ণু হলেন জগৎ প্রতিপালক শক্তি। এই শক্তির প্রকাশ ঘটে সূর্যের মাধ্যমে। ফাল্গুনী পূর্ণিমাতে সূর্যরূপ বিষ্ণুর উত্তরায়ণ তথা উত্তরাভিমুখে যাত্রার সূচনা হয়। এজন্যই এ উৎসবকে দোলযাত্রা বলে। শিবের ধ্যানভঙ্গ করতে গিয়ে দোল-পূর্ণিমার বিশেষ দিনটিতে রুষ্ট শিবের তৃতীয় নয়নের অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়েছিলেন কামদেব। এ কারণে দক্ষিণ-ভারতে এ উৎসব কাম-দহন বা কামায়ন নামে সুবিদিত। কথিত আছে দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর ভগ্নী হোলিকা নাকি আগুনে দগ্ধ হত না। হরিভক্তি পরায়ণ প্রহ্লাদকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলার উদ্দেশ্যে বিষ্ণু-বিদ্বেষী হিরণ্যকশিপু তাঁর পুত্র প্রহ্লাদকে কোলে নিয়ে ভগ্নী হোলিকাকে আগুনে প্রবেশ করতে আদেশ দেন। হোলিকা দাদার নির্দেশ মতো তাই করে এবং আগুনে পুড়ে মরে। বেঁচে যান প্রহ্লাদ। ভাগবত ও পুরাণে বলা হয়েছে নরমাংসভোজী রাক্ষসদের মধ্যে হোলিকা ছিল অন্যতমা। শিশুমাংস ছিল তাঁর খুবই প্রিয়। এজন্য সে অবাধে শিশু হত্যা করত। শিশুকুলকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ হোলিকাকে বধ করেন। রাক্ষসী

হোলিকার মর্মান্তিক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তর প্রদেশে এ উৎসবের নাম হয়েছে **হোলি**। উত্তর প্রদেশ ছাড়া গুজরাট এবং বিহারেও হোলি উৎসবের রমরমা খুব বেশী। আবার ফাগুয়া কথাটি এসেছে 'ফাগগু' থেকে। 'ফাগগু' শব্দের অর্থ পুষ্পরেণু। পুষ্পরেণু ছড়িয়ে এবং ছুঁড়ে রাধা-কৃষ্ণের যে লীলাখেলা তা **ফাগুয়া** নামে নামাঙ্কিত। বসন্তকালে উদযাপিত হওয়ার সুবাদে এ উৎসব **বসন্তোৎসব** রূপেও চিহ্নিত। হোলি উৎসবের সঙ্গে 'ফার্টিলিটি কাল্ট্' ওতপ্রোতভাবে জড়িত। "প্রাচীন মানুষ সন্তান কামনায় বসন্তকালে নারী পুরুষের অবাধ মেলা মেশার একটি দিনকে নির্ণয় করত। সেই সুপ্রাচীন প্রথার উপরে আধুনিকতার প্রলেপ দিয়ে রচিত হয়েছে আজকের দোল।"[১] দোলে অপরিচিত, অপরিচিতাকেও রঙ দেওয়া যায় অনায়াসে।

নির্দয়, নিষ্ঠুর দৈত্যরাজ কংসকে বধ করে তার রক্ত নিয়ে খেলা করেন শ্রীকৃষ্ণ। রক্তের রঙ লাল। পক্ষান্তরে আবীরের রঙও লাল। **বর্তমানের আবীর-খেলা কংসবধের বিজয়োৎসবের প্রতীক। সুতরাং হোলিকা বা কংস বধের মাধ্যমে একটি অশুভ শক্তিকে বিনাশের আড়ম্বর-পূর্ণ বিজয়োৎসবটি হল দোলযাত্রা।**

দোল পূর্ণিমার দিনটি বৈষ্ণবদের কাছে এক বিশেষ পবিত্র তিথিরূপে পরিগণিত হয়েছে। "বিশেষ করে এই দিন বাংলার মাটিতে শ্রীচৈতন্যের জন্ম হওয়ায় দিনটি একটি পৃথক মাত্রা লাভ করেছে। ফাল্গুনী পূর্ণিমায় এখন দোল উৎসবের রূপটি হয় এমন, বিষ্ণুমন্দির থেকে একটি মণ্ডপ তৈরি হয়, এই মণ্ডপের বেদীতে শালগ্রাম শিলারূপী বিষ্ণুকে বসানো হয়। এর পর পূজা ও হোমের পর বিগ্রহকে তিনবার আন্দোলিত করা হয়। তারপর বিগ্রহের গায়ে আবীর স্পর্শ করে সকলে দোল খেলে। বৈষ্ণবদের কাছে দোল অতি পবিত্র তিথি। ধ্যান, ধারণা, উপবাস ও কৃচ্ছ্রতায় এই দিনটিকে তাঁরা উদ্‌যাপিত করেন।"[২]

ভারতের দোলযাত্রার পটভূমিকায় এবার আসা যাক বিষ্ণুপুরের দোল-উৎসব প্রসঙ্গে। বিষ্ণুপুরের দোলযাত্রা হোলি উৎসব নামেই সমধিক সমাদর লাভ করেছে। বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের মন্দিরে মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের ছড়াছড়ি। উত্তরপ্রদেশের মথুরা জেলার বারসানা গ্রামের মেয়ে রাধা। বারসানা গ্রাম সংলগ্ন নন্দগাঁও ছিল শ্রীকৃষ্ণের বাসভূমি। হোলি উৎসবের দিন বারসানা গ্রামের মহিলাগণ নন্দগাঁও গিয়ে ঐ গ্রামের পুরুষ পুঙ্গবদের রঙ ও ফাগ মাখিয়ে বল্গাহীন আনন্দে গা ভাসিয়ে দিত। শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে রঙ ও আবীর খেলায় মাতোয়ারা হয়ে উঠতেন। হোলি উৎসবের দিন বিষ্ণুপুরেও অনুরূপ প্রতিচ্ছবি প্রতিফলিত হয়। জ্যান্ত রাধা-কৃষ্ণের পরিবর্তে দেবালয়ে দেবালয়ে প্রতিষ্ঠাপিত রাধা-কৃষ্ণের বিগ্রহগুলিকে ঐদিন নতুন বেশবাসে সুসজ্জিত করা হয়। ক্ষেত্রবিশেষে রং খেলার জন্য নির্ধারিত পাগড়িসহ সাদা পোশাক পরিয়ে রাধাকৃষ্ণের হাতে রঙের পিচকারী ধরিয়ে দিয়ে আবীর ও ফাগের বর্ণাঢ্য রঙের উজ্জ্বলতায় মন্দিরস্থ দেবদেবীগুলির ক্ষেত্রে রঙ খেলার মনোজ্ঞ পরিবেশ রচনা করা হয়। বিশেষ পূজানুষ্ঠানের পর ভক্তগণ কৃষ্ণ, বিষ্ণুর শ্রীচরণে ক্ষেত্রবিশেষে কুলদেবতার চরণে ও শ্রীঅঙ্গে আবীর দিয়ে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই মেতে ওঠেন রং খেলার নেশায়। তরুণ-তরুণী এবং যুবক যুবতীদের মধ্যে রং খেলার আবেগ ; উচ্ছ্বলতার প্রাধান্য লাভ করে।

১.২. দোল পূর্ণিমা, পূর্বা সেনগুপ্ত। সুখী গৃহকোণ, মার্চ, ২০০১ সংখ্যা, পৃঃ-১৫

দোল উৎসবের মর্মমূলে রাধাকৃষ্ণের চিত্র বিধৃত থাকলেও বিষ্ণুপুর কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লাতে দোল উৎসবের দিন অন্নপূর্ণা পূজার রীতি একটি ব্যতিক্রমী চিরাচরিত প্রথা। দোল উৎসব উপলক্ষ্যে নির্মিত মা অন্নপূর্ণার মৃন্ময় মূর্তির চালাটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চালার মধ্যস্থলে সিংহাসনে উপবিষ্টা দেবী অন্নপূর্ণা ভিখারী শিবকে ভিক্ষা দিচ্ছেন হাসিমুখে। মায়ের সখী জয়া অথবা বিজয়া দেবীকে ব্যজনরত অবস্থায় দণ্ডায়মান। দেবীর পদমূলে নীচের স্তবকে যথাক্রমে শিব-সহচর নন্দী, জগৎ প্রতিপালক বিষ্ণু, দেবরাজ ইন্দ্র এবং সৃষ্টিকর্তা চতুর্ভুজ চতুরানন ব্রহ্মাকে উপবিষ্ট থাকতে দেখা যায়।

দোল পূর্ণিমার দিন মা অন্নপূর্ণার যথাবিধি পূজা অর্চনার মাধ্যমে হোলি উৎসব উদযাপিত হয়। চৈত্র মাসের শুক্লা-অষ্টমীতে অর্থাৎ বাসন্তী-অষ্টমীতে অন্নপূর্ণা পূজা বিধেয়, দোল-পূর্ণিমাতে নয়। কৃষ্ণগঞ্জে মায়ের এই অকাল-বোধন প্রসঙ্গে পূর্বে দুটি লোকশ্রুতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষণে মায়ের এই অকাল বোধনের তত্ত্বকথা শোনাই সংক্ষেপে। পূর্বেই বলেছি, দোলযাত্রার আর এক নাম শস্যোৎসব। প্রকৃতি স্বরূপিণী মা অন্নপূর্ণা হলেন শস্য-সমৃদ্ধির দেবী। কৃষিজীবী মানুষের প্রতিভূ হিসেবে শিব যেন দেবীর নিকট শস্য-সমৃদ্ধি যাচ্ঞা করছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও দেবরাজ ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণ জগৎ প্রতিপালনার্থে মায়ের কাছে প্রত্যাশিত শস্য কামনার আর্জি পেশ করার ক্ষেত্রে দেবাদিদেব মহাদেবের অনুগামী হয়েছেন বলেই অনুমিত হয়। সুতরাং সামগ্রিকভাবে চিত্রটি 'ফার্টিলিটি কাল্ট' তথা উর্বরতাবাদের প্রতীক।

দোল পূর্ণিমার দিন বিষ্ণুপুরের মন্দিরে মন্দিরে বিশেষতঃ নগর-দেবতা মদনমোহন, রাধামদনগোপাল এবং রাধালালজীউ অধ্যুষিত কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লার অন্নপূর্ণা মন্দির-প্রাঙ্গণে সারা রাত্রি ব্যাপী চলে হরিনাম সংকীর্তন এবং হোলির গান। হোলিগানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গীতিকার শ্রদ্ধেয় **বিভূতিভূষণ গোস্বামী (হাবু মাস্টার)**-এর কণ্ঠে শোনা যায়—

রাঙ্গা পায়ে রং দিয়ে রাঙাব রাধারমণ।
একবার যুগল বেশে দাঁড়াও হরি আলো করি কুঞ্জবন॥
প্রেম ভক্তি অনুরাগে, অঙ্গরাগ করিব ফাগে
মরমিয়া যেন মরমে লাগে হয়না বৃথা আভরণ।।

অথবা—

গোকুলে যমুনাকুলে যুগলে শ্যামকিশোরী—
দোলেরে কদম্বমূলে মোহন বংশীধারী।
দোলায় যত সখীগণ।
রাধার আনন্দিত মন।।
শ্যাম অঙ্গে অঙ্গ দিয়ে রাইকিশোরী—
আবার অষ্টসখী ঘিরি ঘিরি মারিছে পিচেকারী।।

অথবা—

ছলা ছাড় হে ছলনাময়—
রং দিও না বসনে, ধরি ও চরণে
মিনতি হে দয়াময়—।
তোমার আমার এই যে বিরহ—
জনমে জনমে সহি অহরহ........

তুমি জান আর আমি জানি বন্ধু
সে কথা ভুলিবার নয়।। ইত্যাদি, ইত্যাদি।

আবার অরুণ দাস বাউলের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে—

অবেলায় রং কেন দিলে তুমি গায়েতে
ননদীটা দেখলে পরে গালি দিবে আমাকে।
আর কত জ্বালা সইব হে কালা
শাশুড়ি যে গঞ্জনা দেয় রোজ দুবেলা।
তবু আমি বেঁচে আছি তোমার ভালবাসাতে
অবেলায় রং কেন দিলে তুমি গায়েতে.......।

অথবা—

আজকে হোলিতে, শ্যামকে নিয়ে নাচব সবাই মধু-রাতে।
আমি ফুল-সাজে সেজেছি, মালা গেঁথে রেখেছি
মালা দিয়ে করব বরণ রাজগলেতে, আজকে হোলিতে।।.....

রাধাকৃষ্ণের লীলা, রং খেলা এবং রঙের গান ছাড়াও সমসাময়িক কালের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটেও রচিত হয় হোলি-গান। যেমন আমাদের দেশে এক সময় চিনির দারুণ অভাব দেখা দিয়েছিল। তখন শ্রীকৃষ্ণকে উদ্দেশ্য করে বাৎসল্য রসে অভিষিক্ত হয়ে পূর্বোক্ত বিভূতিভূষণ গোস্বামী গেয়েছিলেন—

ও বাপ নীলমণি রে,
কোথা পাব চিনি, বল, কোথা পাব চিনি,
হোলির দিনে ভেলিগুড় দিয়ে বাপ্
খেয়ে যা নবনী।
নীলমণি রে
উপানন্দ তোর যে চাচা
সকালে খায় নুন দিয়ে চা।....

অবিভক্ত পাকিস্তানে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর অত্যাচারে সমবেদনা জানিয়ে হোলি গায়কেরা সহানুভূতির সুরে গেয়ে উঠেছিলেন—

পাকিস্তানে যে হিন্দু আছে
তাদের কথা কেউ ভেবেছে কি? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

পশ্চিমবাংলায় বিধানসভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু হলে তৎকালীন এম. এল. এ.-দের কটাক্ষ করে পূর্বোক্ত হাবু মাস্টারের কণ্ঠে শোনা গিয়েছিল—

এম. এল. এ. নয় লে মেরে লে, করিছে, রোদন।
রাষ্ট্রপতির শাসন শুনি, মাথায় অশনি পতন।।
ভোটের সাগর হইয়া পার, কত কষ্টে পেলাম চেয়ার
আর কি করিবে কেয়ার, কর্মচারীগণ।
যথা পূর্বং তথা পরং যদু মধু নীলরতন।।
এম. এল. এ নয় লে মেরে লে, করিছে রোদন।........

প্রখ্যাত গায়ক ভূপেন হাজরিকার 'মানুষ মানুষের জন্যে' এই সর্বজনপ্রিয় গানটির সুরের অনুকরণে **গোপাল গোস্বামী** গেয়েছিলেন—

দেশ আমাদের জন্য, সরকার নেতাদের জন্য
একটু সহানুভূতি কি জনগণ আশা করে না?
ও বন্ধু! দেশ আমাদের জন্য, সরকার নেতাদের জন্য।
হ্যারিকেনে লম্ফয় নেই কেরোসিন
সারাদিন চা খাই চিনি বিহীন
ও তাতে লজ্জা কি তুমি পাবে না?
ও বন্ধু! লজ্জা কি তুমি পাবে না?
ও বন্ধু! বল কি দোষী মোরা?
চাই মোটা ভাত, মোটা কাপড়
চাই নাকো অন্য কিছু, ভোট দেব বছর বছর
ভোটের সময় দাদাদের দেখা পাওয়া যায়
ভোট চুকে গেলে দেখি কোন শালা নাই।........

আবার জামাইকে উদ্দেশ্য করে শেলোজের কণ্ঠে শোনা গেল প্রতিবাদের সুর—

ব্যালাউজে রঙ দিও না ভাই
জামাই শালা হুঁশিয়ার..........

ঘন ঘন লোড্‌শেডিং-এর ফলে উদ্ভূত লজ্জাকর পরিস্থিতির প্রতি কটাক্ষ করে গাওয়া হয়েছে—

লোড্‌শেডিং-এর জ্বালায়
বউ-এর বদলে আমি টেনে ধরি শাশুড়ি
ঐ লোড্‌শেডিং-এর জ্বালায়।

পূর্বোক্ত হোলি গানের প্রাধান্য, মাধুর্য এবং জনপ্রিয়তার গুণে বিষ্ণুপুরের দোলযাত্রা হোলি উৎসব নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করে। দোল-পূর্ণিমার নির্ধারিত দিনের মাস দেড় দুই আগে থেকেই বিষ্ণুপুরের বিশেষ বিশেষ পল্লীতে এবং বিষ্ণুপুরের আশে পাশের গ্রামে গ্রামে হোলি গান রচনা, সুরারোপণ এবং সমবেতভাবে সমস্বরে গান গেয়ে চলতে থাকে মহড়া। মূল গায়েন থাকেন একজন। ঠেকা দেন অন্যেরা। এভাবেই গ্রামে গঞ্জে গড়ে ওঠে এক একটি দল। এসব দলগুলি কখনো বা মূল-গায়কের নামে, কখনো বা পল্লীর নামে প্রাধান্য ও পরিচিতি লাভ করে। যেমন মূল গায়েনের নামে **হাবু মাস্টার, অশ্বিনী মাস্টার, গোপাল গোস্বামী, পঞ্চু হাড়ী, অরুণ দাস, দিবাকর দে**-র দল। আবার পল্লী ও গ্রামের নামে যেমন **শাঁখারীবাজার, মনসাতলা, রাসতলা, তেজপাল, চৌকান. মধুবন, গোপালপুর, কাঁটাবাড়ি, মাঝিপাড়া কামারপাড়া, কুমোরপাড়া, যমুনাপাড়া** ও **ভালুক-খুলার** দল প্রভৃতি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি জনপ্রিয় ওস্তাদ গায়কদের মাস্টার বলে অভিহিত করা হত। এরকম আর একজন মাস্টার তথা ওস্তাদ গায়ক হলেন কাদাকুলি মনসাতলার কালীপদ সাউ।

বিষ্ণুপুরের হোলি উৎসবের সূচনা হয় দোলযাত্রার দিন, শেষ হয় চৈত্র মাসের শেষ শনি অথবা মঙ্গলবার। কৃষ্ণ, বিষ্ণুর মন্দির ছাড়াও দুর্গা, কালী, চণ্ডী, মনসা প্রভৃতি দেবালয়েও শনি, মঙ্গলবার ধরে দিবাভাগে বিশেষ পূজানুষ্ঠানের মাধ্যমে নিশাভাগে নাম-

সংকীর্তন এবং হোলির গানের আসর বসে। পারিবারিক দেব-দেবীর ক্ষেত্রেও অনুরূপ অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

পূর্বোক্ত হোলির দলগুলিকে নির্ধারিত পূজার দিন, রাত্রি বেলায় গান গাওয়ার জন্য মন্দির কর্তৃপক্ষ অথবা গৃহস্বামীর পক্ষ থেকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হয়। নির্ধারিত সময় দিয়ে আসে না ঐসব দল। আসে যখন তখন। কখনও আসর ফাঁকা আবার কখনো বা একসাথে দু'তিনটি দল। ১৫/২০ জনের এই দলগুলি মাত্র তিন চারটি সঙ্গীত পরিবেশন করে। শ্রোতাদের নাছোড়বান্দা অনুরোধে আরো দু'এক খানি গান গেয়ে থাকেন। আবীর চুয়া-চন্দনের ফোঁটা দিয়ে গায়কদলকে বরণ করা হয়। মাখানো হয় আবীর। গানের ফাঁকে ফাঁকে চলতে থাকে রঙ খেলা। অনেক সময় দুই দলের মধ্যে সৌহার্দ্যমূলক প্রতিযোগিতা ছাড়াও তাৎক্ষণিকভাবে মুখে মুখে সঙ্গীত রচনা করে শিল্পীগণ নিজেদের সহজাত প্রতিভা এবং উদ্ভাবনী শক্তিরও পরিচয় দিয়ে থাকেন। শ্রোতাদের দেন এক ঝলক ঝক্‌ঝকে নির্মল আনন্দ। বিনিময়ে পান শ্রদ্ধা, ভালবাসা, খ্যাতি এবং ফল-মিষ্টান্ন সহ দুধ-চিঁড়ে, দই-চিঁড়ে বা লুচি-মিষ্টির প্রসাদ। আর পান পাঁচ, দশ, বিশ টাকা বখশিশ। গান চলে সারা রাত্রি ব্যাপী।

এক কালে এসব হোলি-গানের জনপ্রিয়তা ছিল তুঙ্গে। গায়কদের সুললিত গায়ন-ভঙ্গিতে গানগুলি শ্রোতৃমণ্ডলীর হৃদয়ে গেঁথে যেত স্থায়ীভাবে। পরবর্তীকালে কামারশালে কর্মরত কামার, কাঠ কুঁদতে কুঁদতে ছুতোর, হাঁড়ি-কলসী গড়তে গড়তে কুমোর, তাঁত বুনতে বুনতে তাঁতী, গহনা গড়তে গড়তে স্যাকরা, কাঠ কাটতে কাটতে কাঠুরিয়া, গাড়ি চালাতে চালাতে গাড়োয়ান, রান্না করতে করতে গৃহবধূ, উদাস উদাস যুবক-যুবতী, এমন কি আপনভোলা ক্রীড়ারত শিশু, আনমনা পথিক প্রমুখ সর্বস্তরের মানুষের মুখে মুখে নিজেদের অজান্তেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে গুঞ্জরিত হত হোলি-গানের মনে ধরা, প্রাণ-জুড়ানো, মিষ্টি-মধুর কলিগুলি।

দুঃখের বিষয় মরমে প্রবেশ করে প্রাণ আকুল-করা লোক-সঙ্গীত-ধর্মী ঐসব হোলিগানের আকর্ষণ কমেছে এবং কমছে দিনে দিনে। হোলির দলকে ক্রমশঃ হটিয়ে দিয়ে এখন সেখানে এসে গেছে টি. ভি., ভি. ডি ও., আর কর্ণবিদারী মাইক ও বক্স। **তুষু, ভাদুর মতোই হোলি উৎসবও তার প্রভাব প্রতিপত্তি এবং বৈচিত্র্য হারিয়ে ইতিহাসের পাতায় আত্মগোপন করছে নিঃশব্দে, নীরবে—হারিয়ে যাচ্ছে রাধা-কৃষ্ণের দোল উৎসবকে কেন্দ্র করে রচিত মন-প্রাণ উদাস করা এ ধরনের মর্মস্পর্শী কল-কাকলী তথা সুর-মাধুরী—**

হে শ্যাম সুন্দর গিরিধারী নটবর
হে চির কিশোর শ্রীনিবাস।
(মম) অন্তরে খেল হোলি বাঁকাশ্যাম বনমালী
পুরাও মনের অভিলাষ।

অথবা—

হে-গোবিন্দ মুকুন্দ মুরারী সুন্দর নবঘনশ্যাম।
হোলি খেলত বিহারুত মন-মন্দিরে—
প্রেমময় প্রাণাভিরাম — সুন্দর নবঘনশ্যাম
বৃন্দাবন ধন বন বন দেবা মনলোভা রূপ-গুণধাম।
শ্রীরাধারমণ রমণী মনমোহন পীতবসন বাঁকাঠাম।।

অধ্যায়-১০৬

বিষ্ণুপুরের বাসন শিল্প

এবার প্রসঙ্গ বিষ্ণুপুরের অন্যতম ঐতিহ্যবাহী তৈজসপত্র শিল্প বা বাসন শিল্প। ধাতুজাত তৈজসপত্র উৎপাদনে সিদ্ধহস্ত ব্যক্তিগণই কর্মকার বা কামার নামে পরিচিত। বিষ্ণুপুরে কর্মকার জাতির আগমন ঘটে আজ থেকে প্রায় সাড়ে চার শত বৎসর পূর্বে। এ প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত মাণিকলাল সিংহ মহাশয় লিখেছেন, "বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুর সহরের মটুকগঞ্জ এবং কৃষ্ণগঞ্জে রাণা কর্মকারদের বসবাস রহিয়াছে। কথিত আছে যে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা ময়ূরভঞ্জ হইতে কয়েকঘর রাণা কামারকে নিজ রাজধানীতে আনয়ন করেন। প্রায় সাড়ে চারিশত বৎসর পূর্বে কাঁসারি পদবীর এক রাণা কর্মকার পরিবার সর্বপ্রথম আসিয়াছিলেন।..... অনুসন্ধান করিয়া দেখা যায় যে বিষ্ণুপুর সহরে আগত রাণা কামারদের পূর্বপুরুষগণও পিতলের আংটি, আংগট (পায়ের আঙুলে পরিবার অলংকার), হার, কঙ্কন, নূপুর ইত্যাদি তৈয়ারী করিতেন। নানান্ জীবজন্তুর আকারের 'মানি-বক্স' ও পানের মুখডিবা (নারী মুখ সম্বলিত) এবং হুঁকো রাখিবার জন্য পরীর মূর্তি সমন্বিত স্ট্যাণ্ড ইত্যাদিও প্রস্তুত করিতেন।"[১] এছাড়া এঁরা 'lost wax' অর্থাৎ 'মোম গলানো' পদ্ধতিতে পিতলের নানা বস্তু সামগ্রী তৈরী করতেন। এক্ষেত্রে স্মরণীয়, বিষ্ণুপুরের অষ্টধাতু নির্মিত অনুপম দেব-বিগ্রহগুলিও 'lost wax' পদ্ধতিতেই প্রস্তুত করা হয়েছিল।

হিন্দু-বর্ণবিভাগে নবশাখার অন্তর্ভুক্ত কর্মকার জাতির মধ্যে আটটি শ্রেণীর কর্মকার সম্প্রদায়ের সন্ধান মেলে রাঢ়বঙ্গে। "**লোহার-কামার**, লোহা নিয়ে কাজ করেন, **পিটুলি-কামার**, পিতলের বাসনপত্রের নির্মাতা, কাঁসা নিয়ে কাজ করেন **কাঁসারি**, **স্বর্ণকামার** সোনার গয়না তৈরি করতেন, **ঘাতরা-কামার** লোহার ফলফুল, কাজললতা ইত্যাদি তৈরি করতেন, পিতলের আরশি বানাতেন **চাঁদ-কামার**। এছাড়া ছিলেন **ঢোকরা** ও **তামার**। কামারদের একেবারে নিচের থাকে তাঁদের স্থান। রাঢ়ের কামাররা চারভাগে বিভক্ত। **রাণা**, **কুলটি**, **অষ্টলই** ও **বিরালই**।"[২]

অষ্টলই ও বিরালই কর্মকারদের উৎপত্তি বিষয়ে একটি বেশ চিত্তাকর্ষক কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি নিম্নরূপ। পৌরাণিক যুগের কথা। লোহাসুরের অত্যাচারে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল—ত্রিভুবনের সকলেই জর্জরিত। স্বর্গের অসহায় দেব-দেবী, মর্ত্যের নিপীড়িত নর-নারী, পাতালের অত্যাচারিত আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই এক যোগে লোহাসুরের বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ নিয়ে হাজির হন দেবাদিদেব মহাদেবের সকাশে। অপরাজেয় লোহাসুরের অকথ্য নির্যাতনের কথা শুনে রুষ্ট শংকর রোষকষায়িত নেত্রে দুই বাহু উত্তোলন পূর্বক সৃষ্টি করেন অত্যন্ত বলশালী দুই পুরুষ। এঁদের একজনের নাম অষ্টলই অন্যজনের নাম বিরালই। মহাদেবের বাহুদ্বয় থেকে উদ্ভূত এই দুই পুরুষ তখন দেবাদিদেবের আদেশে লোহাসুরকে প্রবল পরাক্রমে আক্রমণ করেন এবং মহাদেবের নির্দেশেই মহাদেবের ত্রিনয়নের অগ্নিপ্রবাহে লোহাসুরকে গলিয়ে দিয়ে দেবাদিদেবের

---

১. রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (২য় খণ্ড) পৃঃ-২০৬, ২০৭
২. পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া :—২১৫

মাথাটিকে নেহাই হিসেবে ব্যবহার করে গলিত লোহাসুরকে হাতুড়ির আঘাতে পিটিয়ে পিটিয়ে তার শেষ চিহ্নটিও মুছে দেন ত্রিভুবন থেকে। অষ্টলই এবং বীবালই নামক এই দুই পুরুষ কর্মকার জাতির আদি পুরুষ রূপে স্বীকৃত।

অষ্টলই কর্মকারগণ কাঁসা, পিতল, ভরণ, নিকেল বা জার্মান-সিলভার প্রভৃতি সঙ্কর জাতীয় ধাতুর সাহায্যে নিত্য ব্যবহার্য তৈজসপত্র তৈরী করেন। পক্ষান্তরে বিরালই কর্মকারগণ মূলতঃ কৃষিকার্যে সহায়ক যন্ত্রপাতি যেমন লাঙ্গলের ফলা, কোদাল, কাস্তে, কুঁড়ুল, নিড়ানি, শাবল, গাঁইতি, কাটারি জাতীয় লোহার জিনিস তৈরী করেন। তামার কর্মকারগণ তামার তৈজসপত্র নির্মাণেই বিশেষ পারদর্শী। আর ঢোকরা কর্মকারগণ বালির ছাঁচে এবং 'সিরে পার্দ্যু' অর্থাৎ মোম গলানো (lost wax) পদ্ধতিতে ধান, চাল শস্যাদি ও ঘি, দুধ, তেল মাপবার জন্য পাই, কনা, চৌঠি, মৌঠি, লক্ষ্মীর সাজ, প্রদীপ, পিলসুজ এবং নানারকম মূর্তি ছাড়াও গৃহসজ্জার সৌখিন বস্তুও তৈরী করে থাকেন। বাঁকুড়া শহরের রামপুর ছাড়াও বিকনা গ্রামে ঢোকরা শিল্পীদের বসবাস। মৃতপ্রায় ঢোকরা শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে **'ঢোকরা শিল্পী সমবায় সমিতি'** গঠিত হয়।

অতীতে এক একটি শ্রেণীর কর্মকার সম্প্রদায় এক একটি বিশেষ মিশ্র ধাতু নিয়ে নিত্য ব্যবহার্য তৈজসপত্র তৈরী করতেন। বর্তমানে সে নিয়ম নিগড়ে শিথিলতা এসেছে। বাজারে যখন যে সব জিনিসের চাহিদা থাকে শিল্পীদের মধ্যে সে সব জিনিসই তৈরীর প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়।

বিষ্ণুপুর ছাড়াও বিষ্ণুপুর মহকুমা এবং বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানেও কাঁসা-পিতলের বাসন-কোসন তৈরী হয়। এ বিষয়ে অযোধ্যা, চুয়ামসিনা, পাত্রসায়ের, কেঞ্জাকুড়া, কুলবন লক্ষ্মীসাগর, ময়নানগর, মদনমোহনপুর জোড়সা, গদারডিহি, বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

তৈজসপত্র তৈরীর উপাদান হিসেবে প্রধানতঃ তামা, দস্তা, নিকেল এবং রাং বা টিন— এই চারটি ধাতুর ব্যবহার হয় বহুল পরিমাণে। ক্ষেত্রবিশেষে সীসা (lead) বা লেড্ এর ব্যবহারও হয় যৎসামান্য পরিমাণে। পূর্বোক্ত ধাতুগুলির পারস্পরিক সংমিশ্রণে তৈরী হয় সঙ্কর জাতীয় নতুন ধাতু। সেই সঙ্কর ধাতুর উপাদানে প্রস্তুত হয় নানান ধরনের বাসন-কোসন তথা দ্রব্যরাজি। যেমন ৭ কে.জি. তামার সাথে ২ কে.জি. রাং মিশিয়ে তৈরী হয় ৯ কে.জি. কাঁসা বা খুঁট। ১ কে.জি. তামার সাথে ১ কে.জি. দস্তার মিশ্রণে উৎপন্ন হয় ২ কে.জি. পিতল। ১ কে.জি. তামা, ১ কে.জি. দস্তা ও ২৫০ গ্রাম নিকেলের মিশ্রণে পাওয়া যায় ২ কে.জি. ২৫০ গ্রাম জার্মানি সিলভার। আবার ১ কে.জি. তামা, ৮০০ গ্রাম দস্তা ও ২০০ গ্রাম কাঁসাভাঙার মিশ্রণে তৈরী হয় ভরণ। ভরণের রং সোনার মত উজ্জ্বল। ভরণের বাসন-কোসন শুধুমাত্র বিষ্ণুপুরেই তৈরী হয়।

মাটির ছাঁচ তৈরী করে ভাটিশালের গন্‌গনে আগুনে ধাতু গলিয়ে নির্মিত হয় হরেক রকমের থালা, বগিথালা, বাটি, ঘটি, গাড়ু, লোটা, ভৃঙ্গার, পানের ডাবর, জাতীয় তৈজসপত্র। নির্ধারিত সময়ের ব্যবধানে শাল ঠাণ্ডা হলে মাটির ছাঁচ যুক্ত তৈজসপত্রগুলি শাল থেকে বের করে পোড়ামাটি ছাড়িয়ে ধাতুজাত দ্রব্যগুলিকে উখা দিয়ে ঘসে, কুঁদে, পালিশ করে প্রয়োজনে ফুল-লতাপাতার নক্সা ছাড়াও রামায়ণ, মহাভারত সহ পৌরাণিক কাহিনীর বিশেষ বিশেষ দৃশ্যাদি খোদাই করে বিক্রয়োপযোগী করা হয়।

বিচিত্রসব নাম আছে এসব দ্রব্যগুলির। যেমন, থালার ক্ষেত্রে ছক-কটকী, নথ-কটকী, মনোহরা, কংসেশ্বরী, গয়েশ্বরী। বগিথালার ক্ষেত্রে গ্যাসবগি, বিলতবগি, প্লেনবগি,

কাঁকরিবগি, খাগড়াইবগি। আকৃতি অনুসারে বাটিগুলি বাটি (ছোট), জামবাটি (মাঝারি) রামগণ্ডি (বড়) শ্রেণীতে বিভক্ত। আবার গঠন-প্রকৃতি বা নক্সা বোঝাতে প্লেন, কানাউল্টো, চিকন, চিন-পেয়ালা, বহুপল, রকমপল, আটপল, কুচিপল, মিহিপল বাটি আখ্যায় ভূষিত হয়। গ্লাসের ক্ষেত্রে প্লেন, খেজুরছড়ি, আয়নাপল, সরপোল নাম প্রচলিত। ঘটিগুলি আবার হাম্বু, কাশীয়াল, বলরামী, পাটনাই প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ।

বিষ্ণুপুরের বাসনশিল্প মূলতঃ মহাজনী-ব্যবসা। বিত্তবান মহাজনগণ কর্মকার শিল্পীদের কাঁচামাল দিয়ে ফেরৎ নেন বিক্রয়যোগ্য উৎপাদিত পণ্য। বিনিময়ে শিল্পীগণ পান বানি বা মজুরী। শিল্পীগণ আবার ঘরে কারিগর রেখে, প্রয়োজনে ঘরের বউ, ঝি ও ছেলে মেয়েদের সাহায্য নিয়ে শ্রমবিভাজন পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত শ্রম, উদ্যোগ এবং তত্ত্বাবধানে তৈরী করেন ঐসব মহামূল্য দৃষ্টিনন্দন ধাতব দ্রব্যাদি।

অতীতে কাঁচামাল আসত দক্ষিণ ভারত থেকে কোলকাতা বন্দরে। কোলকাতা থেকে নদীপথে রাণীগঞ্জ বাজার। রাণীগঞ্জ থেকে উটের গাড়িতে আসত বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুরের মহাজনদের ঘরে ঘরে। আবার অনেকে বলেন জার্মান-সিলভার আসত জার্মানী থেকে। এখন এসব ধাতু আসে সরাসরি কোলকাতা থেকে। অতীতে বিষ্ণুপুরে বস্তাবন্দী হয়ে যে সব scrap material অর্থাৎ ভাঙা ধাতুখণ্ড আসত, স্তূপাকৃতি সেসব ধাতুখণ্ডের মধ্যে হামেশাই পাওয়া যেত ভগ্ন, অভগ্ন, স্বদেশী, বিদেশী মহামূল্য ধাতুমূর্তি, পিল্‌সুজ এবং নিত্য ব্যবহার্য বিচিত্রসব জিনিসপত্র। কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লার রাধালালজীউ মন্দিরে করজোড়ে প্রণাম-মুদ্রার ভঙ্গিমায় নতজানু হয়ে উপবিষ্ট অতীব সুশ্রী এবং সুঠাম যে গরুড় মূর্তিটি রয়েছে সেই দুর্লভ মূর্তিটি কিন্তু পূর্বোক্ত scrap material থেকে পাওয়া গিয়েছিল। বিদেশী দ্রব্যের মধ্যে রূপার সিগারেট কেস্‌, কেটলি ইত্যাদি ছিল।

বিষ্ণুপুরের বাসন শিল্পে মহাজনী ব্যবসার দ্বারা যাঁরা শিল্পটিকে সুসমৃদ্ধ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ˚হীরালাল কুচল্যান, ˚হৃদয়নাথ কুচল্যান, ˚রজনীকান্ত কুচল্যান, ˚রাধানাথ কাইতি, ˚অখিল চন্দ্র কাইতি, ˚কেশব চন্দ্র কর, ˚হেমচন্দ্র কর, ˚বিশ্বেশ্বর ব্যানার্জী, ˚অমূল্যরতন চৌধুরী, ˚রামনলিনী চক্রবর্তী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। ইদানীংকালেও পূর্বোক্ত কুচল্যান, কাইতি ও চৌধুরী পরিবারের উত্তরপুরুষগণ শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখতে সদাসচেষ্ট আছেন। তথাপি এক্ষেত্রে পরেশনাথ চৌধুরী এবং তৎপুত্র চন্দনকুমার চৌধুরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

বর্তমানে, চিনামাটি, অ্যালুমিনিয়াম, স্টেনলেস স্টীল, প্লাস্টিক ও ফাইবারের ফ্যান্সি জিনিসপত্রের অত্যধিক জনপ্রিয়তা এবং বহুল প্রচলনের ফলে মহার্ঘ কাঁসা, পিতল, ভরণের তৈজসপত্র ব্যবহার প্রায় অবলুপ্তির পথে। মাত্র বছর চল্লিশ পূর্বেও শুধু বঙ্গদেশ নয়, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষতঃ বিহার, উড়িষ্যা, অসম সহ পূর্ব ভারতে বিষ্ণুপুরের বাসনের যেমন ছিল সমাদর, তেমনি ছিল কদর। বাজার ছিল একচেটিয়া। এখন অনাদরে দিনে দিনে ক্রমশঃ সংকুচিত হচ্ছে বাজার। ঐতিহ্যমণ্ডিত এই শিল্পটির সাথে মল্লভূমের প্রায় ৭০/৮০ হাজার মানুষের জীবন-জীবিকা জড়িয়ে রয়েছে। মৃতপ্রায় এই শিল্পটি যেন অন্তিম লগ্নের প্রহর গুণছে পলে পলে।

শিল্পটির সমূহ দুরবস্থার কথা চিন্তা করে প্রতিভাবান তথা সৃজনশীল শিল্পীগণ রুজি-রোজগারের তাগিদে নতুন নতুন দ্রব্যাদি উৎপাদনে প্রয়াসী হয়েছেন। যেমন শহরের মিউনিসিপ্যাল অঞ্চলের রঞ্জিত কর্মকার মহাশয় মন্দির-নগরীর ঐতিহ্যমণ্ডিত দলমাদল

কামান, মদনমোহন মন্দির, জোড়বাংলা, শ্যামরায়ের মন্দির, রাসমঞ্চ প্রভৃতি পুরাকীর্তিগুলির ধাতুনির্মিত 'পেপার ওয়েট' তৈরী করে যদিও সাতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তথাপি ঘোচেনি দারিদ্র্য।

তবুও আশার কথা, একান্ত অবহেলিত, উপেক্ষিত, দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত এই শিল্পী-সমাজ সুস্থভাবে বেঁচে থাকার তাগিদে সংঘবদ্ধ হয়েছেন। বঙ্গীয় কর্মকারগণ সম্মিলিতভাবে কর্মকারদের মধ্যে শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সুষ্ঠু সমন্বয়ে উন্নত জীবনবোধ সম্পন্ন একটি সমাজ গঠনে প্রয়াসী হয়ে তাঁদের মুখপাত্র হিসেবে প্রকাশ করে আসছেন, **'সমাজশ্রী'** নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। বছরে বছরে পত্রিকাটির বয়স হয়েছে ৪৩ বছর।

উক্ত পত্রিকার পরিচালক-মণ্ডলীর উদ্যোগে কর্মকার সম্প্রদায়ের দুঃস্থ কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মাসিক বৃত্তি, পুস্তকাদি দান, বিনামূল্যে চিকিৎসা, কন্যাদায়গ্রস্ত অসহায় পিতাকে অর্থ সাহায্য, কর্মকার সমাজকে ও.বি.সি. তালিকাভুক্তিকরণ প্রভৃতি জনকল্যাণ-মূলক কাজ করা হয়।

এছাড়া আরো একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বঙ্গীয় কর্মকারগণ প্রতি একশ বছর অন্তর একটি করে সম্মেলন করে থাকেন। একশ বছর অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত হওয়ার সুবাদে অনুষ্ঠানটি **'শতেকী'** নামেই প্রসিদ্ধ।

এই সম্মেলনে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে নিজ সমাজের নানান অভাব অভিযোগের আলোচনার মাধ্যমে বহুবিধ উন্নয়নমূলক কর্মসূচী গ্রহণ এবং বাস্তবক্ষেত্রে কার্যে রূপায়ণের খসড়াও রচনা করা হয়। বিগত ১২৫৫ বঙ্গাব্দে বিষ্ণুপুর কামারপাড়াতে এবং গত ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানার গদারডিহি গ্রামে 'শতেকী' সম্মেলন সুসম্পন্ন হয়। কর্মকার সমাজের বিভিন্ন থাকের মধ্যে অবাধ বিবাহের অনুমোদন এই সভায় স্বীকৃতি লাভ করে। **'শতেকী'কে কর্মকার সমাজের উর্বর মস্তিষ্কের একটি উৎকৃষ্ট ফসল বললেও আশা করি অত্যুক্তি করা হবে না।** দিনে দিনে কর্মকার সমাজের শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে বিষ্ণুপুরের বাসন শিল্পের অধ্যায়ের ইতি টানলাম এক্ষণে।

অধ্যায় - ১০৭

ষষ্ঠীবটতলার ষষ্ঠীপূজা

কামারপাড়া অতিক্রম করে কুমোরপাড়া এবং যোগীপাড়াকে আমাদের ডান পাশে ফেলে রেখে আমরা এখন সরাসরি যে স্থানটিতে হাজির হয়েছি তার নাম ষষ্ঠীবটতলা। স্থানটির নামকরণ থেকেই বুঝতে পারছেন এখানের এই বটবৃক্ষমূলে বিশেষ বিশেষ তিথিযোগে ষষ্ঠীপূজা হয় শুদ্ধাচারে। কিন্তু কে এই ষষ্ঠী? কেনই বা তাঁর পূজার এত ছড়াছড়ি?

উত্তরে বলতে হয় ইনি দেবসেনাপতি কার্তিকের পত্নী এবং উর্বরতাবাদের দেবী অর্থাৎ 'গডেস অফ্ ফার্টিলিটি'। পুত্র-কন্যা-দাত্রী এই দেবীর পূজা-প্রচলন সম্পর্কে ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে একটি বেশ শ্রুতিমধুর কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি এরূপ—

স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে প্রিয়ব্রত নামে এক মহাধার্মিক রাজা ছিলেন। তিনি সদাসর্বদা ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। বংশরক্ষার্থে সন্তান লাভের জন্য স্বয়ং ব্রহ্মা এঁকে বিবাহ করতে

আদেশ দেন। বিবাহ হ'ল। দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল বহু বছর। কিন্তু ছেলে-পিলে হয় না একটিও। অবশেষে কশ্যপ ঋষির পরামর্শে রাজা পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন ধুমধাম করে। যজ্ঞের পরই সন্তান-সম্ভবা হন রাণী এবং যথাসময়ে একটি মৃত পুত্র প্রসব করেন। মৃত-পুত্রের সৎকারের জন্য রাজা হাজির হন শ্মশানে। এমন সময় দেখেন জ্যোতির্ময় এক দিব্যরথে চড়ে তাঁর সম্মুখে হাজির হন এক দেবী। রাজার দুঃখের কথা শুনে দেবী স্বীয় পরিচয় দিয়ে বলেন, **'তিনি সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার মানসকন্যা, দেবসেনাপতি কার্তিকেয়র পত্নী, মাতৃকার মধ্যে তিনিই প্রধানা এবং প্রকৃতির ষষ্ঠাংশ সম্ভূতা বলে তাঁর নাম হয়েছে ষষ্ঠী।'** এই বলে স্বীয় দৈবশক্তির সাহায্যে তিনি রাজার মৃতপুত্রের প্রাণ দান করে জীবন্ত শিশুকে নিয়ে চললেন স্বর্গাভিমুখে। রাজা তখন দেবীর স্তব স্তুতি করতে আরম্ভ করেন খুবই ভক্তিভরে। রাজার ইষ্টনিষ্ঠা দেখে এবং ভক্তিভাবে বিগলিত হয়ে ষষ্ঠী দেবী পুনরায় রাজার কাছে ফিরে আসেন এবং নিয়মিতভাবে ষষ্ঠী-পূজা করার শর্ত সাপেক্ষে প্রাণবন্ত শিশুটিকে রাজার ক্রোড়ে দিয়ে ফিরে যান স্বস্থানে।

ষষ্ঠীদেবীর এই মাহাত্ম্য-কাহিনী লোকমুখে প্রচার হতেই মৃতবৎসা রমণীকুল নিঃসন্তান এয়োতীগণ এবং সন্তান-সন্ততি সম্পন্ন মায়েরাও ষষ্ঠীদেবীর প্রতি বিশেষ আসক্ত হয়ে পড়েন। **ষষ্ঠীদেবীর অপর নাম 'গৃহদেবী'**। মহাভারতের আদিপর্বে উল্লেখ আছে, যে ব্যক্তি এঁর মূর্তি ঘরে রেখে পূজা-আর্চা করেন তাঁর গৃহ চিরকাল ধন-ধান্য ও পুত্র-কন্যাদিতে পরিপূর্ণ থাকে। বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন নামে এই দেবী পূজিতা হয়ে থাকেন।

নবজাতকের কল্যাণার্থে জাতকের জন্মের ষষ্ঠ দিনে এবং একুশ দিনে **সূতিকা-ষষ্ঠীর** পূজা প্রথাসিদ্ধ। প্রচলিত বিশ্বাস ষষ্ঠ তারিখের রাত্রিতে আঁতুড় ঘরে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠী পূজার পর ষষ্ঠীদেবী স্বয়ং নিশুতি রাতে নবজাতকের ভাগ্যলিপি লিখে দেন স্বহস্তে। বিষ্ণুপুরের ভাষায় এটি **'সেঁটারা পূজা'** নামে অভিহিত। আর একুশ দিনের ষষ্ঠী পূজা হয় পুকুর ঘাটে বা কোন বটবৃক্ষমূলে। যেমন এই অঞ্চলের মানুষেরা একুশ দিনের পূজা করিয়ে থাকেন এই বটবৃক্ষমূলে। এ পূজা হয় দিবাভাগে।

সন্তান কামনা ছাড়াও সন্তান-সন্ততি সহ সন্তানতুল্য জামাই এবং স্বীয় আত্মীয়-স্বজন সহ পরিবারের সামগ্রিক কল্যাণার্থে বছরের বিভিন্ন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে সধবা-বিধবা রমণীগণ নিম্নোক্ত নামে ষষ্ঠীদেবীর পূজা করে থাকেন শাস্ত্রীয় বিধান মতে। যেমন বৈশাখে অশোক ষষ্ঠী বা চন্দন ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ়ে অরণ্য ষষ্ঠী বা জামাইষষ্ঠী, শ্রাবণে কর্দ্দম ষষ্ঠী ও লুণ্ঠন ষষ্ঠী বা লোটন ষষ্ঠী, ভাদ্রে মন্থান ষষ্ঠী বা চাপড়া ষষ্ঠী, আশ্বিনে দুর্গাষষ্ঠী, কার্তিকে নাড়ীষষ্ঠী, অগ্রহায়ণে গুহ ষষ্ঠী বা মূলা ষষ্ঠী, পৌষে পাটাইষষ্ঠী বা অন্নরূপা ষষ্ঠী, মাঘে শীতল ষষ্ঠী, ফাল্গুনে গোরূপিণী ষষ্ঠী, চৈত্রে স্কন্দষষ্ঠী এবং চৈত্রসংক্রান্তিতে নীলষষ্ঠীর ব্রত ও পূজা করে থাকেন মল্লভূমের মহিলা সম্প্রদায়। এদের মধ্যে অশোক ষষ্ঠী, জামাই ষষ্ঠী, মন্থান ষষ্ঠী, দুর্গা ষষ্ঠী ও শীতল ষষ্ঠীর প্রভাব বেশী হলেও জামাই ষষ্ঠী, দুর্গা ষষ্ঠী এবং শীতল ষষ্ঠীর প্রভাব একেবারে তুঙ্গে। উপরোক্ত ষষ্ঠীপূজাগুলি ছাড়াও জীতাষ্টমীর দিন এখানে জীমূতবাহনের পূজার সাথে জীতাষষ্ঠীর পূজার বহুল প্রচলন পরিলক্ষিত হয়। তিথির অবস্থান ও মলমাস জনিত মাসান্তরে হয় সেই মাসের ষষ্ঠীপূজা। পূর্বোক্ত তিথিগুলিতে পৌরাণিক দেবী ষষ্ঠীর ব্যাপক পূজা প্রসারের মূলে রয়েছে মহিমাময়ী ষষ্ঠীদেবীর মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক পৃথক পৃথক উপভোগ্য কাহিনী।

ষষ্ঠীবটতলার বৃক্ষমূলে জামাইষষ্ঠীর পূজা হয় দারুণ উৎসাহে। এজন্য জামাইষষ্ঠী

এখানে **'দারুণ ষষ্ঠী'** নামেই বিশেষ জনপ্রিয়। ঐদিন ষষ্ঠীদেবীর তুষ্টির জন্য পূজা করেন তিনজন পুরোহিত। এঁরা হলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যানার্জী, শ্রীশিবপ্রসাদ চক্রবর্তী ও শ্রীশ্যামল গোস্বামী। জামাইষষ্ঠীর দিন ছাড়াও অন্নপ্রাশন, উপনয়ন ও বিবাহাদি শুভ-অনুষ্ঠানের মানসিক পূজা সুসম্পন্ন হয় এই বটবৃক্ষমূলে। ষষ্ঠীপূজার আধিক্য বশতঃ বটবৃক্ষটিই যেন হয়ে গেছে ষষ্ঠীবট-ঠাকুর, আর পল্লীটির নাম হয়েছে ষষ্ঠীবটতলা।

ছত্রাকার বৃক্ষটির বৃত্তাকার বেদীতে বসে বিশ্রামের অবকাশে শুনিয়ে দিলাম ষষ্ঠীবটতলার ষষ্ঠীপূজা তথা ষষ্ঠীদেবীর মাহাত্ম্য-কথা। এবার যাবো মা দশভুজার মন্দিরে।

অধ্যায় - ১০৮

মা দশভুজা প্রসঙ্গ

ফুলের মধ্যে যেমন সৌন্দর্য ও সৌরভ ওতপ্রোত, তদনুরূপে মল্লভূমের সর্বত্র ঈশ্বর এবং ঈশ্বরানুরাগ বিশেষভাবে প্রকটিত। তাই দেখি কখনো তিনি (ঈশ্বর) পুরুষরূপে, কখনো বা প্রকৃতিরূপে পূজিত হন মল্লমাটিতে। কখনো তিনি শৈবের শিব রূপে, কখনো বৈষ্ণবের কৃষ্ণ, বিষ্ণু, রাম, নারায়ণ রূপে আবার কখনো বা শাক্তের দুর্গা, কালী, মৃন্ময়ী, বিপৎতারিণী, সঙ্কটতারিণী, চণ্ডী, চামুণ্ডা, চতুর্ভুজা, অষ্টভুজা, দশভুজা, অষ্টাদশভুজা, রূপে উপাসিতা হন বিষ্ণুপুরে তথা মল্লভূমের সর্বত্র। এখানে অনেকানেক ছোটখাটো মন্দিরে, আকৃতিতে ছোটখাটো এমন সব দেব-বিগ্রহ রয়েছেন যাঁরা চিন্ময় সত্তায় অধিষ্ঠিত এবং সময়ের মাপকাঠিতে যাঁদের বয়স কয়েকশ বছর, হতে পারে হাজার বছর কিংবা তারও বেশী। অনেক দেব-বিগ্রহের উৎসমূলে পৌছানোও প্রায় অসম্ভব। সেক্ষেত্রে অনুমান-নির্ভর উত্তরই গবেষকদের একমাত্র ভরসা। যেমন ধরুন মা দশভুজার কথা। ইনি বিষ্ণুপুরে এসেছেন বর্তমান বাংলা দেশের সুদূর যশোহর থেকে। এসেছেন রাজা বীর হাম্বীরের রাজত্বকালে—অর্থাৎ ১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। তার আগে তিনি যশোহর রাজের কুলদেবী রূপে পূজিতা হয়েছেন। কিন্তু তারও আগে তিনি কোথায় ছিলেন? বা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন?—এসব প্রশ্নের উত্তরে নীরবতাই পাথেয়। এজন্যই বলছিলাম উৎসমূলে যাওয়া অসম্ভব।

ইতিহাস বলে মোগল সেনাপতি মানসিংহের প্রবল আক্রমণের মুখে তৎকালীন যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য পরাজিত হন। যশোহর জয় করে মানসিংহ যশোরেশ্বরী দশভুজাকে নিয়ে যান অম্বরে। সেখানে অম্বর পাহাড়ের উপর আজও তিনি পূজিতা হন। প্রতাপাদিত্যের গৃহদেবী মা দশভুজাকে নিয়ে যেতে কিন্তু তাঁর হিন্দু সংস্কারে বাধে। বাধে তাঁর বিবেকে। এজন্যই বোধ করি মানসিংহের প্রচ্ছন্ন ও পরোক্ষ সহযোগিতায় প্রতাপাদিত্য রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র রাজীবলোচন কুলদেবী মা দশভুজাকে বক্ষে ধারণ করে মোগলসৈন্য পরিবেষ্টিত যশোহর ত্যাগ করেন ব্যথিত হৃদয়ে। তা-র-প-র?

এই তারপর?—প্রশ্নের উত্তরে 'দশভুজা মাহাত্ম্য' পুস্তিকার অন্তর্গত, মাতৃভক্ত বিশ্বনাথ রায় বিরচিত 'মাল্যচন্দন' নিবন্ধের অংশবিশেষ পড়ে শোনাই আপনাদের। তিনি লিখেছেন, "কয়েকজন অনুচর ও পুত্র রাজ্যধরকে নিয়ে রাত্রির অন্ধকারে (রাজীবলোচন) মুর্শিদাবাদে আসেন। শোনা যায় তাঁর রাজপুরুষোচিত দেহকান্তি সকলকে আকর্ষণ করত।

মুর্শিদাবাদের নবাবের রাজহস্তী পথিমধ্যে চলার পথে তার মাথার মালা শুঁড় দিয়ে রাজীবলোচনের মাথায় অর্পণ করেন। নবাব এই কথা জেনে তাঁকে দরবারে আনেন এবং তাঁর বাগ্মীতায় মুগ্ধ হয়ে তাঁকে উচ্চ সরকারী পদে নিযুক্ত করেন। আরও শোনা যায় রাজীবলোচন ছিলেন সভার কবি ও মায়ের প্রিয় ভক্ত।

নবাব কয়েকদিনের মধ্যে, নবাবের ঘনিষ্ঠ রাজকর্মচারী হিসাবে রাজঅন্তঃপুরে তাঁকে 'নবাব-পাঞ্জা' দান করেন।

কিন্তু এই 'পাঞ্জা-দান' নবাবী প্রথায় উচ্ছিষ্ট হাতে দেওয়া হয় বলে রাজীবলোচন ঠিকভাবে মেনে নিতে পারেননি। এরপর আরও ঘনিষ্ঠ হবার আশঙ্কায় হিন্দু রাজপুত্র প্রধানতঃ তাঁর ইষ্টদেবী মা দশভুজার মর্যাদা রক্ষার জন্য ও ঠিকমতো সেবাপূজার ব্যবস্থার ত্রুটি হতে পারে ভেবে মুর্শিদাবাদ থেকে তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে পদব্রজে শ্রীক্ষেত্র (পুরীধাম) রওনা হন মা দশভুজাকে বুকে নিয়ে। পথে মল্লরাজভূমি বিষ্ণুপুরের নিকট একটি 'চটি'তে আশ্রয় নেন।'' এ প্রসঙ্গে উক্ত পুস্তিকাতেই ভক্তবর গোপালচন্দ্র সিংহ লিখেছেন, ''মল্লরাজ বীরহাম্বির দূত মারফৎ সংবাদ পান, সঙ্গে এক জাগ্রত দেবীকে নিয়ে কয়েকজন সাথীসহ অভিজাত এক যাত্রী 'চটি'তে বিশ্রাম করছেন। তিনি রাজীবলোচনকে (রাজীবলোচন কবিও ছিলেন) দরবার কক্ষে আমন্ত্রণ জানিয়ে দেবী-মাহাত্ম্য শ্রবণ করার পর বিনয় সহকারে অনুরোধ করেন, রাজ্যের দেওয়ানী পদ নিয়ে মাকে প্রতিষ্ঠিত করে মল্লভূমে অবস্থান করার জন্য। রাজার প্রস্তাবে রাজীবলোচন মাকে নিয়ে বসবাস করতে চাইলেও দেওয়ানের পদ নিতে অস্বীকার করেন। পরে তাঁর ছেলে রাজ্যধন রায় রাজাকে জানালেন, মায়ের নিত্য ভোগরাগ যেভাবে যশোহরে হয়ে এসেছে সেইরূপ সুব্যবস্থা করলে তিনি দেওয়ানী পদ নিয়ে বিষ্ণুপুরে অবস্থান করবেন।''

দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের পরামর্শ মতো রাজেচ্ছায় সর্বপ্রথম বিষ্ণুপুর বসুপাড়াতে মায়ের পূজা হয় এবং অনতিবিলম্বে বিষ্ণুপুর গোপালগঞ্জ মহল্লার ষষ্ঠীবটতলা পল্লীতে পর্ণকুটীর বিশিষ্ট মাতৃমন্দির নির্মিত হয়। নিত্যভোগরাগের পাশাপাশি আমিষভোগের জন্য পুষ্করিণীর বন্দোবস্তও হয় রাজাদেশে।

প্রত্যুষে প্রাতঃরাশ, মধ্যাহ্নে ঘি-কাগজী ব্যঞ্জন ও মাছের তরিতরকারী সহ সিদ্ধচালের অন্নভোগ এবং সন্ধ্যাতে মিষ্টান্ন সহ গো-দুগ্ধ মায়ের নিত্যসেবায় নিবেদিত হয়ে আসছে দেবীর বিষ্ণুপুর আগমনের পুণ্যলগ্ন থেকেই।

অষ্টধাতু নির্মিত অতি ক্ষুদ্রাকৃতি এই মাতৃমূর্তি প্রসঙ্গে উক্ত পুস্তিকাতে আরো বলা হয়েছে, ''মা হচ্ছেন বৈদিক যুগের অসুরনাশিনী চামুণ্ডারূপিণী দশভুজা দুর্গা। ওঁনার পাশে লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্তিক কেউ নেই। অসুর সংহারে দেবতারা ওঁনাকে রণক্ষেত্রে পাঠাবার জন্য যেভাবে সজ্জিত করেছিলেন, সেই রূপই ওঁনার বর্তমান। **এই মায়ের পূজা-অর্চ্চনা করা মানে 'কালসর্প'কে নিয়ে ঘর করার মত। ত্রুটি হলে ওঁনার কাছে ক্ষমা নেই।** তার অনেক প্রমাণ রয়েছে।.......পাঠক প্রশ্ন করতে পারেন মা কি শুধু শাস্তিই দেন? না, কৃপাময়ী মা বহু ভক্তের বাসনা ও ইচ্ছে পূর্ণ করেছেন।''

মা দশভুজার অনেকানেক অলৌকিক কাহিনী ছড়িয়ে আছে মুখে মুখে। **এইসব অলৌকিক ঘটনার মধ্যে যে সত্যটি প্রতিধ্বনিত হয় তার মূল সুর হল 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন'।**

'চাঁদের হাট' বলে একটা কথা আছে। মা দশভুজার কথা লিখতে গিয়ে কেন জানিনা

সেই 'চাঁদের হাট' কথাটাই আমার মনে আসছে বারবার। 'চাঁদের হাট' বলতে গুণিজনের সমাবেশকে বোঝায়। গুপ্তবৃন্দাবন বিষ্ণুপুরেও দেখি গুণিজনদের মতোই দেব-দেবীদের বিপুল সমাবেশ। বৃষভানুপুর থেকে এখানে এসেছেন শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউ, বোঁয়াইচণ্ডী থেকে দিদিঠাকুরাণী মাতা, খোদ বৃন্দাবন থেকে লালজীউ, যশোহর থেকে রাজকুলদেবী মা দশভুজা, চেতুয়াবরদা থেকে মা বিশালাক্ষ্মী। **যুগে যুগে কত সিদ্ধসাধক ও মহাপুরুষ এখানে এসেছেন কত কত জাগ্রত দেব-বিগ্রহ নিয়ে। এঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল সাবড়াকোণের ডেঙোরামকৃষ্ণ। ডেঙোরামকৃষ্ণের কথা শুনিয়েছি ইতিপূর্বেই।**

এইসব দেখে মনে হয় চাঁদের হাটের মতোই বিষ্ণুপুরেও যেন দেবদেবীর হাট বসেছে; হয়েছে বিচিত্র সব দেব-দেবীর অভিনব সমাবেশ, এ কারণেই বিষ্ণুপুর হয়েছে '**গুপ্তবৃন্দাবন**'। আর ঐসব দেব-দেবীদের কৃপাধন্য হয়ে মল্লভূমের মাটিতে জন্মগ্রহণ করেছেন দিক্‌পাল মনীষী ও সাধক-সাধিকাগণ। এঁদের মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ, মা সারদা, সোনামুখীর হরনাথ-কুসুমকুমারী ও মনোহর দাস, ছাতনার বড়ু চণ্ডীদাস প্রমুখ সাধক-সাধিকার পাশাপাশি মনে পড়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, আচার্য যোগেশ চন্দ্র রায় (বিদ্যাপতি) এবং যামিনী রায় ও কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। আনুষঙ্গিকভাবে উল্লেখ করি বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রাম নিবাসী শিল্পী যামিনী রায় হলেন পূর্বোক্ত যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য রায়ের বংশধর এবং মা দশভুজার কৃপাধন্য বংশানুক্রমিক ভক্ত।

অতীতের পর্ণকুটীরের পরিবর্তে মা এখন থাকেন একটি দালান-মন্দিরে। দালান-মন্দিরের সাথে সংযুক্ত হয়েছে একটি নাটমন্দির। উক্ত নাটমন্দিরে প্রতিদিন রাত্রির প্রথম প্রহরের শেষভাগে ভক্ত-সমাগমে ঝংকৃত হয় মধুর মধুর হরিনাম সংকীর্তন। ধ্বনিত হয় রাধা নাম, ধ্বনিত হয় রাম ও কৃষ্ণের নাম। শক্তিস্বরূপিণী দেবী দশভুজার মন্দিরে গীত হয় বিনয়-বিগলিত বৈষ্ণবীয় কীর্তন। মা দশভুজার শ্রীমন্দিরটি যেন তাই শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার এক অপূর্ব মিলনতীর্থ। শক্তি ও ভক্তি উপাসনার এ যেন এক প্রাণকেন্দ্র।

মাতৃ-চরণে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করে বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত লণ্ঠন শিল্পের হাত ধরে চলুন যাই নিকটস্থ বুড়োশিবের শ্রীঅঙ্গনে।

অধ্যায়-১০৯

বিষ্ণুপুরের লণ্ঠন শিল্প

বিষ্ণুপুরের একটি নিজস্ব কুটীর শিল্প হল লণ্ঠন শিল্প। শহর এবং গ্রামে যাদের বাড়িতে বৈদ্যুতিক আলো নেই, নিম্নবিত্ত সম্পন্ন সেই সব মানুষের কাছে লণ্ঠনই একমাত্র আশা-ভরসা। লণ্ঠনই তাদের নয়নের জ্যোতি, আলোর দ্যুতি। কেরোসিন তেলের জ্বালানি বিশিষ্ট এই আলোটির দাম কম, তেল পুড়ে কম, অথচ টেকসই এবং মজবুত। বাতাসের ঝাপটায় নিভে না সহজে, জলের ছাঁটে ফাটে না হ্যারিকেনের চিমনির মতো। জ্বলন্ত অবস্থায় স্থানান্তরে নিয়ে যাওয়ার সুবিধাও অনেক। তাই হ্যারিকেনের চিমনির তুলনায় আলো কম হওয়া সত্ত্বেও এর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে।

গ্যাল্‌ভানাইজড্‌ শীট কেটে, ভাঁজ, চাপজোড় এবং ঝালাই-সোল্ডার পদ্ধতির সাহায্যে

তৈরী মূলতঃ চৌকা আকৃতির এই বাতিটির চারটি পায়ার উপর থাকে তৈলাধার। তৈলাধারের উপর কপাটযুক্ত কাঁচের ফ্রেম। কাঁচের ফ্রেমের উপর কার্নিশ বিশিষ্ট ছাদ, ছাদের উপর শোভা পায় মন্দিরের চূড়ার আদলে তৈরী 'কলস' আকৃতির কদম ফুল। কদম ফুলের অভ্যন্তরভাগে থাকে ধোঁয়া নিষ্কাশনের নল এবং কদমের উপরিভাগে থাকে বৃত্তাকার হাতল। হাতে যাতে তাপ না লাগে তার জন্য হাতলের নীচে আছে তাপ নিবারক চাকি। মাঝে মধ্যে মোছামুছি করার জন্য এবং তৈলাধারে তেল ভরার উদ্দেশ্যে বাতিটি খোলা ও বন্ধ করার জন্য আছে সহজ ব্যবস্থা। তৈলাধারের মধ্যস্থলে শোভা পায় বার্নার। বার্নারের ভেতর কাপড়ের পলতে। জ্বলতে থাকে পলতে আর কাঁচ ভেদ করে ছড়িয়ে পড়ে আলো। লম্ফ থেকে এর জন্ম হওয়ার সুবাদেই এর নাম 'লণ্ঠন'।

গঠন-প্রণালীর দিক থেকে লণ্ঠনগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ চারকোণ বিশিষ্ট চৌকোণা লণ্ঠন, দ্বিতীয়তঃ ছয় কোণ বিশিষ্ট ছ'কোণা লণ্ঠন এবং তৃতীয়তঃ ডিস্‌কো লণ্ঠন। ডিস্‌কো লণ্ঠনের নীচের অংশ সংকীর্ণ উপরের অংশ হয় প্রশস্ত। এ ছাড়া রয়েছে মাত্র ৭´´ উচ্চ 'মিনি লণ্ঠন'।

চৌকা লণ্ঠন ছোট, বড় ও মাঝারি আকৃতির হয়। এর মধ্যে এক ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট বড় লণ্ঠনটিই ব্যবহারের উপযোগী এবং এটির চাহিদাই সর্বাধিক। ছ'কোণা লণ্ঠনের প্রচলন নেই বললেই চলে। ডিস্‌কো লণ্ঠনের চাহিদাও খুবই কম। তবে এটি আকৃতিতে বড়সড় হওয়ার ফলে এর জ্যোতি বেশী। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগে প্রায় দু'ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট বেশ বড় আকৃতির ডিস্‌কো লণ্ঠন বিষ্ণুপুর শহরের স্ট্রীট লাইটের কাজে ব্যবহৃত হত। কয়েকজন পৌর কর্মচারী কাঁধে সিঁড়ি, পিঠে তেলের টিন এবং হাতে টুকরো কাপড় নিয়ে সন্ধ্যার প্রাক্কালে সিঁড়িতে চেপে আলো মুছে তেল ভ'রে লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিত প্রতিদিন। সারা রাত জ্বলতো সেই আলো। কালক্রমে রাস্তায় রাস্তায় লণ্ঠনের পরিবর্তে এসেছে বৈদ্যুতিক আলো। লণ্ঠন লুকিয়েছে গৃহকোণে, আশ্রয় নিয়েছে মালদহ মুর্শিদাবাদের আম গাছে আর মুজফ্‌ফরপুরের লিচু গাছে— নিশাচর পাখির উৎপাত থেকে আম ও লিচুকে বাঁচাতে। আম ও লিচু পাকার সময় গাছে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয় দশ বিশটা করে লণ্ঠন।

আলো ঝলমল বৈদ্যুতিক বাতির দৃষ্টিনন্দন উজ্জ্বলতার প্লাবনে লণ্ঠনের আলো নিষ্প্রভ হলেও যখন তখন লোড্‌শেডিং-এর দাপটে একেবারে গুরুত্ব হারায়নি লণ্ঠন। স্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত লণ্ঠন শিল্পের ঐতিহাসিক কাহিনীটিও বেশ উপভোগ্য।

আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে বিষ্ণুপুরে রেলগাড়ি যাতায়াত শুরু হলে রেলগাড়িতে চড়ে আসতে থাকে 'বার্মা সেল কোম্পানী'র সূর্য মার্কা এবং 'স্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়াম্ অয়েল কোম্পানী'র হাতি মার্কা কেরোসিনের টিন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি কেরোসিন আমদানীর পূর্বে রেড়ির তেলের আলোর প্রচলন ছিল দেশজুড়ে। তখনকার দিনে কেরোসিন তেলের কেনেস্তা তৈরী হত ঝালাই পদ্ধতিতে। বিষ্ণুপুর আঁইশবাজার মহল্লা নিবাসী শ্রীশঙ্করচন্দ্র গরাই (পিতা ৺গৌরমোহন গরাই)-এর পিতামহ ৺রাইচরণ গরাই তাঁর সৃজনী প্রতিভার নিষ্ঠা দিয়ে প্রথমে ঐ কেরোসিনের টিনপাত এবং উক্ত ঝালাই টিনের রাং বা ঝালাই-সোল্ডারের সাহায্যে তৈরী করেন লম্ফ। পরবর্তীকালে বেলজিয়াম থেকে আগত ত্রুটিযুক্ত (রিজেক্ট) আয়নার পারা ধুয়ে সেই কাঁচ দিয়ে তৈরী করেন কাঁচের ফ্রেম। গ্রেট বৃটেন থেকে আসতো রাং। রাং-এর সাথে আনুপাতিক হারে সীসা মিশিয়ে

ঝালাই কার্যের উপযুক্ত করে তৈরী করা হয় 'ঝালাই-সোল্ডার'। এসব উপাদানে এবং বুদ্ধিবৃত্তির পারম্পর্যে পূর্ণতার পথে পা বাড়ায় লণ্ঠন শিল্প।

৩৪, ৩৬ গেজের গ্যাল্‌ভানাইজড্‌ শীট, ১৬, ১৭ নম্বর লোহার তার, কাঁচ, ঝালাই-সোল্ডার, মিউরিক অ্যাসিড্‌ প্রভৃতি উপাদানে এবং প্লাস, কাতুরি, হাতুড়ি, কাঠের মুগুর (হাতুড়ি), লোহার কড়ির টুকরো, তাতাল, বাটালি, ও কাঠকয়লার চুল্লী ইত্যাদি উপকরণের সাহায্যে ঁরাইচরণ গরাই-এর শিল্প প্রতিভার মননশীলতার গুণে আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে বিষ্ণুপুরের বুকে জন্ম নিয়েছিল লণ্ঠন। বিষ্ণুপুরের অধ্যাত্ম-সাধনার দিব্যজ্যোতির সাথে লণ্ঠনের স্নিগ্ধ আলোর দ্যুতি মিশে গিয়ে বিষ্ণুপুর হয়েছে পারমার্থিক এবং কায়িক তথা চর্মচোখের আলোর দিশারী।

আর একটি কথা যেটি না বললেই নয়, সেটি হল কলের তেল বা তেল-মিল চালু হওয়ার সাথে সাথে অচল হয়ে যায় কলুর ঘানি। এমতাবস্থায় ঁরাইচরণ গরাই-এর স্বজাতিবর্গ তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে লণ্ঠন শিল্পে আত্মনিয়োগ করে পেটের টানে। বর্তমানে ভয়াবহ বেকারত্বের যুগে উক্ত শিল্পটি কলু (বৈশ্য তিলি) সম্প্রদায়ের সীমানা ছাড়িয়ে কর্মকার, কুম্ভকার, সুত্রধর প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কুটীরশিল্প রূপে চিহ্নিত হয়ে বিষ্ণুপুরের অন্ততঃ দেড় শতাধিক পরিবারের হাজার বারশ শ্রমজীবী নর-নারীর মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে যন্ত্রোৎপাদিত হ্যারিকেনের সাথে সমানে পাল্লা দিয়ে। **কুটীরশিল্পজাত হাতে তৈরী লণ্ঠন যন্ত্রদানবের যুগে নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখেছে সগৌরবে। বিষ্ণুপুরের আর্থ-সামাজিক পরিকাঠামোতে অর্থের আগমনকেও কিয়দংশে সুনিশ্চিত করেছে এই কুটীরশিল্প।**

অধ্যায়-১১০

গোপালগঞ্জের বুড়োশিব

লণ্ঠন-শিল্পের পাত্‌তাড়ি গুটিয়ে এই মুহূর্তে আমরা দর্শন করব গোপালগঞ্জ মহল্লার বুড়ো শিবঠাকুর। 'বুড়ো শিব' নামের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে এই দেবতার প্রাচীনত্ব। প্রসঙ্গতঃ বলি ইং ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে মন্দির সংস্কার করতে গিয়ে দেবালয়ের প্রাচীনত্ব আরো প্রকটিত হয়। বুড়ো শিবের গর্ভ-মন্দিরের ছোট প্রবেশদ্বারটিকে বড় করার প্রয়োজনে দেওয়াল ভাঙতে গিয়ে দেখা গেল চুন-সুরকির মশলা কালের প্রকোপে তার অটুট আঁঠালো শক্তি হারিয়ে হয়ে পড়েছে একেবারে ধুলোর মতো। ঝুর্‌ঝুরে বালির মতো ঝরতে থাকে নিস্তেজ চুন-সুরকির মশলা। আরো লক্ষণীয় বিষয় হল সুদূর অতীতে মন্দিরের উপরে গজিয়ে ওঠা গাছের শিকড়-বাকড় যা দেওয়াল ভেদ করে নেমে গিয়েছিল মৃত্তিকাতে, সেই সব শিকড়-বাকড়গুলিও একেবারে গুঁড়ো চা পাতার মতো গুঁড়ো হয়ে যেতে থাকে অল্প একটু চাপে। উপরোক্ত দুটি দৃষ্টান্ত থেকে আমরা সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে এই শিবমন্দির এবং শিবঠাকুর বেশ সুপ্রাচীন। মন্দির-গাত্রে কোন প্রতিষ্ঠা-ফলক না থাকলেও একথা মানতেই হয় যে তৎকালীন স্থানীয় অধিবাসীগণ হয় ব্যক্তিগত উদ্যোগে, নয় সমষ্টিগত উদ্যোগে, নয়তো বা রাজানুকূল্যে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই দেবালয় এবং দেব-বিগ্রহ।

লক্ষ্য করার বিষয় বুড়ো শিব-মন্দির ছাড়াও এখানে রয়েছে আরো তিন তিনটি

শিব-মন্দির। এদের মধ্যে পশ্চিম দিকের শিবমন্দিরের শিবলিঙ্গটি শান্তিনাথ শিব নামে খ্যাত। শান্তিনাথ শিবমন্দিরের উত্তরে রয়েছে মহাসাধক মৌনীবাবার সাদামাটা শ্রীমন্দির। অবশ্য পূর্বদিকে অবস্থিত দুটি মন্দিরের শিবলিঙ্গদ্বয়ের নাম আজও রয়েছে অজানা।

বুড়ো শিবের মন্দিরটি একেবারে সাদামাটা। মন্দির সংস্কারের ফলে অবশ্য গর্ভমন্দির এবং নাটমন্দিরটি মার্বেল পাথরের বনেদী আভিজাত্যে, পোর্সেলীন টালির চাক্‌চিক্যে ও মোজাইক শিল্পের উজ্জ্বলতায় নবসাজে হয়েছে নয়নাভিরাম।

বুড়ো শিব সত্যই বুড়ো শিব এবং এঁর মহিমাও অপার। গোপালগঞ্জ পল্লীবাসীদের ইনি শুধু আরাধ্য দেবতাই নন—ইনি পল্লীবাসীদের অভিভাবক স্বরূপ। তাই পল্লীবাসীদের সুদিনেও তিনি নমস্য, দুর্দিনেও নমস্য।

এই দেবতার অপার মহিমার আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে বিষ্ণুপুরের প্রবাদপুরুষ মহাসাধক মৌনীবাবা সুদূর পাঞ্জাব থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন এই দেবতার পদপ্রান্তে। শিবকল্প এই সাধুর অলৌকিক লীলা সন্দর্শনে ধন্য হয়েছিলেন তৎকালীন ভক্তমণ্ডলী। আজ থেকে ৯০ বছর আগে বুড়ো শিবের 'গাজন উৎসব' প্রচলন করেছিলেন পুর্বোল্লিখিত মহাসাধক মৌনীবাবা। গাজনের শোভাযাত্রার অগ্রভাগে থাকতেন তিনি। আস্কন্ধবিলম্বিত জটাজুট, কৌপীন পরিহিত ত্রিশূলধারী সাক্ষাৎ শিবসম দীর্ঘাঙ্গ এই ধ্যানী সাধককে দেখে শিবদর্শনের পিপাসা চরিতার্থ হত শিবভক্তদের। দুঃখের বিষয় মৃত্যুর অমোঘ নিয়মে আজ আর তিনি নেই আমাদের মাঝে ঠিকই কিন্তু তাঁরই প্রবর্তিত গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে বছরে বছরে আজ ৯০ বছর ধরে। গাজন উৎসবের প্রবর্তক-পুরুষের অক্ষয় স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনার্থে আজও মৌনীবাবার আলোকচিত্র থাকে উৎসবের শোভাযাত্রার অগ্রভাগে। মৌনীবাবা নেই, কিন্তু লোকমুখে ছড়িয়ে আছে তাঁর দিব্যজীবনের দিব্যকথা। সেসব কথা শোনাব হরিতপোবন আশ্রমে উপনীত হয়ে। এখন আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি শিব ঠাকুরের গাজন উৎসবের প্রতি। প্রথমে বলি গাজন কি এবং কেন?

শিব ঠাকুরের গাজনের কথা বলতে গেলেই এসে যায় ধর্মঠাকুরের কথা। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত সাহিত্যিক সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'কালের কাণ্ডারী'তে লিখেছেন,—

"এক সময় বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে কচ্ছপরূপী ধর্মঠাকুরের পুজো হত। খুব জোরে ঢাক ঢোল পিটিয়ে। ধর্মঠাকুর এক অপূর্ব সমন্বয়। বৌদ্ধধর্মের বিকৃতি আবার শিবঠাকুরের জনগণ জীবনরূপ। দরিদ্র চণ্ডালের বন্ধু। সেই শিব যে শিব ছাই ভষ্ম মেখে শ্মশানে বসে থাকেন। সংসারের দায়ে ভিক্ষা করেন। প্রয়োজনে হলকর্ষণ করেন। বুদ্ধদেবের অনেক বিশেষণের একটি হল ধর্মধাতু। এক সময় চড়ক অনুষ্ঠান ধর্মঠাকুরেরই উৎসব ছিল। বর্ষশেষের গাজন এক সময় ধর্মঠাকুরেব উৎসবই ছিল। রাঢ় দেশের গ্রাম্য দেবতা ধর্মঠাকুর। তাঁর গ্রাম্য লোকোৎসবের নাম ছিল গাজন। ক্রমে ব্রাহ্মণ পুরোহিতরা এই গাজনকে শৈব উৎসবে পরিণত করেছেন। শিব ক্রমে প্রধান গ্রাম দেবতা হয়েছেন বলে ধর্মের গাজন সহজে শিবের গাজনে পরিণত হয়েছে। ধর্মপূজার পুঁথির রচয়িতা রামাই পণ্ডিত। বৌদ্ধধর্মই শেষকালে ধর্মপূজায় পরিণত হয়েছিল।" (শারদীয়া বর্তমান, ১৪০৮, পৃঃ-১৩৮)

এরপর আসি গাজন প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক কথায়। শ্রাবণ মাস শিবের জন্ম মাস, আর বিয়ের মাস নাকি চৈত্র মাস। বিয়ে হয়েছিল নীল চণ্ডিকার সাথে। এই বিয়েতে সন্ন্যাসী ভক্তগণ ছিলেন বরযাত্রী। বরযাত্রীরা গম্ভীর স্বরে বাবার নাম ডেকে গর্জন করতেন

মাঝে মাঝে। **সন্ন্যাসীদের গর্জন থেকে হয়েছে 'গাজন'**। গাজনের শেষ দিনে হয় চড়ক। চড়ক উৎসবে শাল বা গজারি বা গর্জন গাছের খুঁটি পুঁতে তার উপরিভাগে আড়াআড়িভাবে বাঁশ বেঁধে বাঁশের প্রান্তভাগে সন্ন্যাসীরা পিঠে লোহার বঁড়শি বা হুক বিঁধিয়ে বাবার নাম ডাকতে ডাকতে ঘুরপাক খান অবিরত। **গর্জন গাছের উপর এতাদৃশ লোমহর্ষক অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হওয়ার সুবাদেই উৎসবের নাম 'গাজন'**। আবার দেখুন, শিব হলেন সাম্যের দেবতা। তাঁর কাছে শত্রু মিত্র নেই, নেই কোন বাছবিচার। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে গাজনের সন্ন্যাস ভক্ত হতে পারেন। সার্বজনীন এই ভাবনা থেকে উৎসবটি হয়েছে সর্বসাধারণের। **গ্রামের সকলে জনে জনে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেন তাই উৎসবের নাম 'গাজন'। গ্রাম+জন=গাঁ+জন=গাজন।** আবার অনেকে মনে করেন সার্বজনীন এই উৎসবে এত ভিড় হত যে মানুষের গায়ে চিটিয়ে যেত মানুষ। **গায়ে গায়ে জন—এই অর্থে হয়েছে, 'গাজন'**। 'গাজন' শব্দের অর্থ নিয়ে বহুমুখী আলোচনান্তে ফিরে আসি গাজন উৎসবের কৃচ্ছ্র-সাধনের ইতিকথায়। দৈহিক নির্যাতনের কথকতায়।

"রাঢ় অঞ্চলের শিব ঠাকুর আর্য-অনার্য সভ্যতার তথা ধর্মচিন্তার এক সমন্বিত রূপ। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দৈহিক নির্যাতন অনার্য সভ্যতার একটি প্রধান এবং অপরিহার্য অঙ্গ। সেই সূত্রে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দৈহিক নির্যাতন শিব ঠাকুরের গাজন উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। নানা রকম কৃচ্ছ্র-সাধনের দ্বারা শিব ঠাকুরের সন্তোষ বিধানই এর উদ্দেশ্য। তাই দেখি অনাহারক্লিষ্ট উপবাসী ভক্তগণ মাটির উপর গড়িয়ে গড়িয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করেন অথবা প্রণাম সেবা খাটতে খাটতে পৌছে যান বাবার মন্দির পর্যন্ত। আবার আয়তাকার লম্বা পাটা মাথায় করে ভক্তেরা যেমন করেন নৃত্য তেমনি কয়েকজন ভক্ত মিলে কাঁধে করে নিয়ে যান অন্য কোন ভক্তকে, যিনি মানত অথবা ব্রত অনুসারে শুয়ে থাকেন ঊর্ধ্বমুখ বিশিষ্ট সূচাল পেরেক পোঁতা মন্ত্রপূত পাটার উপর। আবার আগুন-সন্ন্যাসের অনুষ্ঠানে দেখা যায় মন্ত্রপূত গন্‌গনে আগুনের উপর সন্ন্যাস-ভক্তদের হেঁটে যেতে, লাফালাফি করতে কিংবা হাতে করে গন্‌গনে আগুনের স্তূপকে ভেঙে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়ে **'লাপরা ভাঙা'** অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন করতে। আবার বাবা ঁবসন্তরায়ের গাজন উৎসবে দেখা যায় গাছের ডালে দোলনা বেঁধে এবং তারই নীচে মাটিতে মশালের মত আগুন জ্বেলে নীচের দিকে মাথা করে সেই লেলিহান আগুনের ওপর দোল খেতে। আর গ্রাম-রাধানগরে দেখেছি কোমর এবং পিঠের চামড়া ফুটো করে হুক লাগিয়ে গামছা সহযোগে চড়কে ঝুলে ভক্তদের ঘুরপাক খেতে খেতে ফুল ছড়াতে।

পাগলা বাবা শিব ঠাকুরের গাজন উৎসবের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হল **বাণ-ফোঁড়া**। সাধারণতঃ জিভেই বাণ ফোঁড়া হয় প্রায় সর্বত্রই। জিহ্বা-বাণ ছাড়াও হস্তবাণ, পৃষ্ঠবাণ, বক্ষবাণ, পঞ্চমুখী-বাণ এবং অষ্টাঙ্গিক-বাণ ফোঁড়ার প্রচলনও খুব একটা কম নয় রাঢ়-বাংলার গাজন উৎসবের প্রেক্ষাপটে।

এতাদৃশ দৈহিক নির্যাতনের দৃষ্টান্তগুলি আইনের চোখে বে-আইনী অপরাধমূলক প্রাণঘাতী কার্যকলাপ বলে চিহ্নিত হয়েছে। আইনের কড়া নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এইসব কার্যকলাপ কিন্তু চলে আসছে যুগ যুগ ধরে। চলে আসছে শিব-ঠাকুরের সংবিধানের অলিখিত আইন অনুসারে। চলে আসছে দেবাদিদেব আশুতোষের তুষ্টি বিধানার্থে।"

"কিন্তু শিবের গাজনে এসব দৈহিক নির্যাতনের পন্থা এবং পদ্ধতি চালু হল কেমন করে? কিভাবে?

...আপনাদের কৌতূহল নিবারণার্থে তাই বলি বাণাসুর রাজার কথা। পৌরাণিক যুগের পুরানো দিনের কথা। বাণ নামে পরম শিবভক্ত এক রাজা ছিলেন। তিনি প্রতি বৎসর চড়ক উৎসবের সময় বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে শিবঠাকুরের ভক্ত হতেন এবং দেবাদিদেব মহাদেবের প্রীতি কামনায় শিব-ভক্তি-সূচক নৃত্য গীতাদিতে প্রমত্ত হয়ে থাকতেন। আর নানা রকম কৃচ্ছ্রব্রত সাধনের দ্বারা নিজ দেহের রক্ত উৎসর্গ করতেন। এইরূপ কঠোর তপস্যায় শিব ঠাকুরের সন্তোষ বিধানে তিনি সচেষ্ট ছিলেন। সেই থেকেই উপরিউক্ত কৃচ্ছ্রসাধন ধারা প্রচলিত হয়েছে এবং চলে আসছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে।

ভক্তদের এই কৃচ্ছ্র সাধনে কৃপাসিন্ধু দেবাদিদেব মহেশ্বর কিন্তু থাকতে পারেন না নিস্পৃহ কিংবা উদাসীন হয়ে। ভক্তদের কষ্ট তাঁকেও স্পর্শ করে। ভক্তদের কষ্টে বিচলিত হন তিনি, হন সমব্যথী। উক্তিটির সত্যতা প্রমাণার্থে আমার শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধেয় ৺মাণিকলাল সিংহ মহাশয়ের 'পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি' পুস্তকের 'নিবেদন' অংশ থেকে তুলে দিলাম নীচের অংশটি, **'আমাদের উদার দেবতা মহাদেব—ভক্তেরা যখন তাঁহার গাজনে চৈত্র সংক্রান্তির খর রৌদ্রে চড়কে ঝোলে, অষ্টাঙ্গ বাণে বিদ্ধ করে, আগুন সন্ন্যাস করে, তখন পাষাণ মহাদেবের গা দিয়ে দর দর ধারায় ঘাম ঝরিতে থাকে।'**"[১]

এবার আসি বুড়ো শিবের গাজন উৎসবের কথায়। বুড়ো শিবের গাজন উৎসব বিষ্ণুপুর শহরের একটি বিশেষ উৎসব। সাধারণতঃ চৈত্রসংক্রান্তিতেই গাজন হয়। চৈত্রসংক্রান্তি ছাড়াও রাঢ়-বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন সময়ে, যেমন—অক্ষয় তৃতীয়া, বৈশাখী পূর্ণিমা, বৈশাখ সংক্রান্তি ছাড়াও বিশেষ বিশেষ তিথিযোগে অনুষ্ঠিত হয় শিব-ঠাকুরের গাজন উৎসব। এই শিবঠাকুরের গাজন উৎসব অনুষ্ঠিত হয় বৈশাখ সংক্রান্তিতে। মহাসাধক মৌনীবাবা প্রচলিত এই গাজন **'আবাল গাজন'** এবং **'আবরার গাজন'** নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। আবাল শব্দের অর্থ বালক। বয়স্কদের সাথে সাথে কচি-কাঁচা বালকগণও এই গাজনের সন্ন্যাস ভক্ত হতে পারে বলেই বোধ করি এই গাজনের নাম হয়েছে 'আবাল-গাজন'। বিষ্ণুপুরের রূপকথা সিনেমা হল সন্নিকটস্থ আবরা পুকুর সংলগ্ন আবরার মাঠে 'রাত্রি-গাজন' সুসম্পন্ন হওয়ার সুবাদে এটি 'আবরার গাজন' নামেও সুবিদিত। অন্য একটি গবেষক দৃষ্টিকোণ থেকে বলা হয়ে থাকে 'আবার গাজন' কথাটি অপভ্রংশে হয়েছে 'আবরার গাজন'। 'আবার গাজন' মানে পুনরায় গাজন। চৈত্র সংক্রান্তির পর কেন বৈশাখ সংক্রান্তিতে আবার গাজন হয় তাই নিয়ে একটি বেশ উপভোগ্য কাহিনী মুখে মুখে প্রচলিত আছে।

চৈত্র সংক্রান্তির গাজন উৎসবে ভক্ত-সন্ন্যাসীদের তর্জন গর্জনে এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার বেত্রাঘাতে অতিষ্ঠ হয়ে পাগলা বাবা ধ্যানী ভোলানাথ লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গিয়ে আশ্রয় নেন কুমোরের চাকার নীচে। কাজ বন্ধ হয়ে যায় কুমোরের। শিবঠাকুর প্রায় মাস খানেক অবস্থান করেন সেখানে। অতঃপর স্বীয় আবাসস্থল কৈলাসে ফিরে এলে দেবী দুর্গা দেবাদিদেবের এই দীর্ঘ অনুপস্থিতির কারণ জানতে চান। মহাদেব তখন গাজনের গালভরা গপ্পো শোনান মহাদেবীকে এবং ভক্তদের উৎপাতে কুমোরের চাকার তলে লুকিয়ে থাকার কথাটিও বলেন প্রসঙ্গক্রমে। মহাদেবী কিন্তু স্বামীর এসব কথায় বিশ্বাস

১. ষাঁড়েশ্বর-মাহাত্ম্য পৃঃ—১৩৭, ১৩৮, ১৩৯

করেন না বিন্দুমাত্র। পরন্তু স্বামীর চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। শিবঠাকুর অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়েও শান্ত করতে পারেন না দেবীকে। দেবী বলেন—'ওসব কথায় আমি বিশ্বাস করি না, আমি গাজন দেখতে চাই। গাজন দেখলে তবেই আমি বিশ্বাস করব তোমার কথা।' সুতরাং গাজনের ঢাক বেজে ওঠে আবার। অনুষ্ঠিত হয় **'আবার গাজন'**। বালক বালিকাদের কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—

"গাজনের বাদ্যি বাজে ঐ,
মাগো মা গাজনের বাদ্যি বাজে ঐ,
ঘরে মন টিকে কই,
ঘরে মন টিকে কই?

আজ আমাদের ছুটি,
চুটিয়ে মজা লুটি,
আনন্দেতে থৈ থৈ,
সারাদিন শুধু হৈ হৈ,
মাগো মা গাজনের বাদ্যি বাজে ঐ।"[১]

বাবা বুড়ো শিবের চরণ-কমলে ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করে গোপালগঞ্জ মহল্লা পরিত্যাগ করে আমরা রওনা হব শহরের দক্ষিণে অবস্থিত রসিকগঞ্জ মহল্লা অভিমুখে। অহল্যাবাঈ রাস্তা মাড়িয়ে যাওয়ার সময় পথের ডান দিকে অবস্থিত 'ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ্ ইণ্ডিয়া', বাম দিকে অবস্থিত 'ব্যাঙ্কুরা ডিস্ট্রিক্ট সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক', 'পি. ডবলিউ. ডি. অফিস' ও 'মহকুমা জেলখানা' ডান দিকে 'পুলিশ. বি. ফাড়ি', 'মহকুমা হাসপাতাল, তারপর বাম দিকে 'মহকুমা আদালত', 'রসিকগঞ্জ বাস স্ট্যাণ্ড', 'স্টেডিয়াম,' নির্মীয়মান 'যদুভট্ট মঞ্চ', 'মহকুমা শাসকের কোয়ার্টারস্' সহ 'প্রশাসনিক ভবন,' 'চিল্‌ড্রেন্ পার্ক' প্রভৃতি অতিক্রম করে এবং পাশে রেখে পৌঁছে যাবো রসিকগঞ্জ মহল্লার দক্ষিণে অবস্থিত অতীব জাগ্রতা দেবী মা রক্ষাকালীর দিব্যাঙ্গনে। এই পথে পদচারণা করার সময় সংক্ষেপে শোনাবো বিষ্ণুপুরের **'রামশরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়'** প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক কথা।

অধ্যায়-১১১

রামশরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়

বিষ্ণুপুর

সঙ্গীত এবং বিষ্ণুপুর, বিষ্ণুপুর এবং সঙ্গীত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটির কথা চিন্তা করা যায় না। এরা যেন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। বিষ্ণুপুরের কথা বলতে গেলে তাই অবশ্যম্ভাবীরূপে এসে যায় সঙ্গীত-প্রসঙ্গ। আর সঙ্গীত প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবেই শোনাতে হয় বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত বিদ্যালয় ও 'রামশরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়' প্রসঙ্গে দু'চার কথা।

---

১. ষাঁড়েশ্বর মাহাত্ম্য, পৃঃ—১৬৫

রাজা দ্বিতীয় গোপাল সিংহদেবের পুত্র সঙ্গীত-অনুরাগী-রাজা রামকৃষ্ণ সিংহদেব তাঁর রাজত্বকাল ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে **'বিষ্ণুপুর সঙ্গীত বিদ্যালয়'** প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত বিদ্যালয়ের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন সঙ্গীতকেশরী **অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়**। রাজা রামকৃষ্ণ সিংহদেব এবং অধ্যক্ষ অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পর সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে প্রতিষ্ঠানটি হতশ্রী হয়ে পড়ে। এই ঘটনার বহু বছর পর রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মেদিনীপুর রাজদরবার থেকে অবসর নিয়ে ফিরে আসেন বিষ্ণুপুরে এবং পূর্বোক্ত বিদ্যালটিকে **'অনন্ত বিদ্যালয়'** নাম দিয়ে হতচেতন প্রতিষ্ঠানটির পুনরুজ্জীবনে ব্রতী হন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়ে সমৃদ্ধি আসে শীঘ্রই। বিদ্যালয়টি প্রথমে পোকাবাঁধের পশ্চিমপাড়ের মেছোবাজারের নিকট অবস্থিত ছিল। পরবর্তীকালে বিষ্ণুপুর পৌরসভা প্রদত্ত পোকাবাঁধের উত্তরপাড়ের জায়গার উপর নির্মিত নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয়। উত্তরণের পথে সঙ্গীতাচার্য যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা এবং শিক্ষাদানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। 'বটুবাবু' নামে সর্বসাধারণ্যে খ্যাত যোগেশবাবুর সময় থেকেই উক্ত প্রতিষ্ঠানটির খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে দূর-দূরান্তে। বহু ছাত্রের সমাগম হয়। তৎকালীন বাঙালা সরকারের 'District Board Municipality'-র কাছ থেকে কিঞ্চিৎ আর্থিক সাহায্য আসে। প্রতিষ্ঠানটি টিকে থাকে মন্দের ভাল অবস্থায়। এদিকে এসে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকের কথা, জাপানীরা বোমা ফেলেছে কোলকাতায়। সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বোমাতঙ্কে কোলকাতা ছেড়ে চলে আসেন বিষ্ণুপুরে এবং পূর্বোক্ত বিদ্যালয়টির দায়িত্বভার গ্রহণ করে বিদ্যালয়টিকে মহাবিদ্যালয়ে উত্তীর্ণ করার চিন্তাভাবনা শুরু করেন। মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাদান সম্ভবতঃ ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দেই শুরু হয়ে যায়। ১৯৪৭-এ দেশ স্বাধীন হবার পরই তৎকালীন গভর্ণর ডঃ কাট্‌জু ঐতিহাসিক শহর বিষ্ণুপুর পরিদর্শনে আসেন এবং বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় স্থাপনের চিন্তাধারার কথা অবগত হয়ে তিনি বিষ্ণুপুরের তৎকালীন মহকুমা শাসক এবং বাঁকুড়ার জেলা শাসককে বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হওয়ার সুপরামর্শ দেন। মহাবিদ্যালয় স্থাপনের বিষয়টিকে পুরোভাগে রেখে বিষ্ণুপুর পৌরসভা প্রদত্ত জমির উপর মহকুমা শাসক 'আলি সাহেব' সহ শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের প্রচেষ্টায় এবং আর্থিক সাহায্যে একটি মহাবিদ্যালয় সহ 'টাউন হল' নির্মাণের কাজ শুরু হয়। কিন্তু অর্থাভাবে মাঝপথে বন্ধ হয়ে যায় কাজ। এমতাবস্থায় বিষ্ণুপুর রঘুনাথসায়র পল্লীর মুখোপাধ্যায় বংশের সন্তান প্রয়াত রামশরণ মুখোপাধ্যায়ের অনুজ ভ্রাতৃত্রয়—কৃত্তিবাস মুখোপাধ্যায়, ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় দাদার স্মৃতিরক্ষার্থে ২৫ হাজার টাকা দান করেন। সেই টাকা দিয়ে অসম্পূর্ণ কাজ সম্পূর্ণ করা হয়। হলঘর আদলের মহাবিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয় 'রামশরণ মিউজিক কলেজ'। রাজা রামকৃষ্ণ সিংহদেব প্রতিষ্ঠিত 'বিষ্ণুপুর সঙ্গীত বিদ্যালয়'টিও পোকাবাঁধের উত্তরপাড় থেকে স্থানান্তরিত হয়ে ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত মহাবিদ্যালয়টির সাথে হয়ে যায় একাত্মা। বিষ্ণুপুর পৌরসভার নিকট স্থাপিত রামশরণ মিউজিক কলেজের প্রথম অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন গীত-সম্রাট গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সহ অধ্যক্ষের পদে আসীন হন সঙ্গীত রত্নাকর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। রামশরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় স্থাপনের মূলে সর্বশ্রী বঙ্কিমচন্দ্র রাহা (মোক্তার), বসন্তকুমার দত্ত (মোক্তার), গোকুলচন্দ্র ঘোষ (প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক, বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়), অরুণপ্রসাদ ঘোষ (কে.জি.ই.আই-

এর অধ্যক্ষ), ডঃ গোবিন্দচন্দ্র মণ্ডল, ভূদেবচন্দ্র মণ্ডল, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের প্রয়াস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে চিৎপুরে **'বেঙ্গল মিউজিক স্কুল'** প্রতিষ্ঠা করেন এবং ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে **' বেঙ্গল একাডেমি অব্ মিউজিক'** নামে আর একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানগুলির কোন অস্তিত্ব নেই। এতদর্থে **'বিষ্ণুপুর সঙ্গীত বিদ্যালয়'** তথা **'রামশরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়'**টিই ভারতে বিদ্যমান সঙ্গীত বিদ্যালয়গুলির মধ্যে অন্যতম আদি সঙ্গীত বিদ্যালয়রূপে চিহ্নিত। সুতরাং বলা যায় বিদ্যালয় স্থাপন করে সর্ব-সাধারণের মধ্যে সঙ্গীত-শিক্ষা প্রচার-প্রসারের চিন্তাধারা একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বহিরাগত ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাস এবং বিনা ব্যয়ে থাকা খাওয়ার সুব্যবস্থাও ছিল এখানে।

মহাবিদ্যালয়ের বর্তমান অধ্যক্ষ **শ্রীসুজিত গঙ্গোপাধ্যায়** বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতে নবপ্রাণের জোয়ার এনেছেন। বিশেষতঃ খেয়াল ও ভজন গানে তাঁর নব নব অবদান এবং অনন্যসাধারণ গায়নভঙ্গী চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সুজিতবাবু সহ সর্বশ্রী মথুর দত্ত, অশোক দত্ত, শিবপ্রসাদ গোস্বামী, বামাপদ চক্রবর্তী, সেবক চট্টোপাধ্যায়, রাসবিহারী শর্মা, সুব্রত ব্যানার্জী, প্রদীপ ব্যানার্জী ও শ্রীমতী গৌরী ব্যানার্জী এই ১০ জন সঙ্গীত শিক্ষক-শিক্ষিকা বর্তমানে ১২০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে শিক্ষাদানে ব্রতী আছেন। শিক্ষাসহায়ক কার্যে নিযুক্ত আছেন ৩ জন অশিক্ষক কর্মচারী এবং ১জন করণিক।

শিক্ষার মূল বিষয় হিসেবে বিষ্ণুপুর ঘরানার পাশাপাশি ভারতের কয়েকটি ঐতিহ্যপূর্ণ ঘরানার ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, ঠুংরী, ভজন ছাড়াও রাগপ্রধান সঙ্গীত, রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুলগীতি, দ্বিজেন্দ্রগীতি, অতুলপ্রসাদী, কান্তগীতি, কীর্তন, লোকসঙ্গীত প্রভৃতিও শেখানো হয় যত্ন সহকারে। যন্ত্রসঙ্গীতের ক্ষেত্রেও অনুরূপ শিক্ষা-ব্যবস্থা প্রচলিত। সঙ্গীতের ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং নন্দনতত্ত্বও পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

ছ'বছরের শিক্ষাবর্ষের মধ্যে প্রথম চার বছর বিদ্যালয় বিভাগ এবং শেষের দু'বছর মহাবিদ্যালয় বিভাগরূপে নির্ধারিত। বাৎসরিক পরীক্ষার পাশাপাশি 'ফাইন্যাল পরীক্ষা' গ্রহণের ব্যবস্থা আছে এখানে। বিদ্যালয় এবং মহাবিদ্যালয় বিভাগের ফাইন্যাল পরীক্ষাতে বহিরাগত পরীক্ষক এবং আভ্যন্তরীণ পরীক্ষকদের প্রদত্ত নম্বরের ভিত্তিতে পরীক্ষার্থীদের মূল্যায়ন করা হয়। এই মহাবিদ্যালয়ে শিক্ষা গ্রহণান্তে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের Senior Diploma পরীক্ষাতে সরাসরি বসা যায়। অবশ্য সেক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা হিসেবে মাধ্যমিক পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হওয়া চাই।

এই মহাবিদ্যালয় থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের যে ডিগ্রী বা উপাধি দেওয়া হয় তা **'তীর্থ'** নামে অভিহিত। সঙ্গীতের বিষয় অনুসারে উপাধিগুলি হয় নিম্নরূপ। যেমন কণ্ঠ-সঙ্গীতে **'সঙ্গীত-তীর্থ'**, তবলা পাখোয়াজে **'সঙ্গততীর্থ'**, এবং সেতার, এস্রাজ, বেহালা প্রভৃতিতে **'ঝঙ্কার-তীর্থ'**।

বর্তমানে বিষ্ণুপুর পৌরসভা মহাবিদ্যালয়টির সার্বিক দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং শিক্ষাকর্মীদের বেতনও বিষ্ণুপুর পৌরসভা দিয়ে থাকে। বেতন মানে বলার মত কিছু নয়—যৎসামান্য। সরকারের এই ঔদাসীন্যকে আত্মস্থ করে গান-বাজনার-বিষ্ণুপুর ন্যুব্জ দেহে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সগৌরবে, না—কোনরকমে।

রামশরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ছাড়াও বিষ্ণুপুর শহরের বুকে ব্যক্তিগত উদ্যোগে

এবং ক্ষেত্রবিশেষে সমষ্টিগত উদ্যোগে গড়ে উঠেছে আরো কয়েকটি সঙ্গীত বিদ্যালয়। একান্ত অনাড়ম্বরভাবে ঘরোয়া পরিবেশে গভীর আন্তরিকতার সাথে এসব প্রতিষ্ঠানে সঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত এবং ক্ষেত্রবিশেষে নৃত্যকলাদিও শিক্ষা দেওয়া হয়। সঙ্গীত বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশই কোলকাতার **'বঙ্গীয় সঙ্গীত পরিষদ'** দ্বারা অনুমোদিত। অবশ্য চণ্ডীগড়ের **'প্রাচীন কলা কেন্দ্র'** এবং এলাহাবাদের **'প্রয়াগ সঙ্গীত সমিতি'**র অনুমোদন প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানও রয়েছে এর মধ্যে।

রাজদরবার অঞ্চলের ডঃ দেবব্রত সিংহঠাকুরের 'গোপেশ্বর সঙ্গীত মহাবিদ্যালয় ও বাহাদুর খাঁ স্কুল অব মিউজিক', বি. এড্. কলেজ-রোডের ধারে শ্রীবামাপদ চক্রবর্তীর 'যদুভট্ট সঙ্গীত বিদ্যালয়', মটুকগঞ্জ মহল্লার শ্রীসুভাষ কর্মকারের 'গীতাঞ্জলি সঙ্গীত সমাজ', রসিকগঞ্জ মহল্লার শ্রীমতী সুপর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গীত ও নৃত্যশিল্প প্রতিষ্ঠান 'বলাকা' এবং সমষ্টিগত উদ্যোগে গঠিত হলেও বর্তমানে শ্রীঅশোক দত্ত দ্বারা পরিচালিত শাঁখারীবাজারের 'সুরতরঙ্গ' প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এবং বিষ্ণুপুরের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ সঙ্গীত-পিপাসু ও সঙ্গীত-গুণিজনদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার 'দরবারী সঙ্গীত সংস্থা' বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যমণ্ডিত সুর ও সঙ্গীত প্রবাহের গতিকে অব্যাহত রাখার সাধনায় নিয়োজিত আছে।

এছাড়া বর্তমানে 'বিষ্ণুপুর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এ বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রচার প্রসার কল্পে স্থাপিত হয়েছে একটি 'ধ্রুপদ চর্চা কেন্দ্র'। সাহিত্য পরিষদের সঙ্গীত বিভাগ এই ধ্রুপদ-চর্চা কেন্দ্রটি পরিচালনা করেন। সম্পূর্ণ অবৈতনিক এই সঙ্গীত শিক্ষা বিভাগে বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদ, ধামার, ইত্যাদি শেখানো হয় শিক্ষক সর্বশ্রী জগন্নাথ দাশগুপ্ত, বামাপদ চক্রবর্তী, সনাতন ভুঁইয়া প্রমুখের তত্ত্বাবধানে।

'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে।'—কবি গোলাম মোস্তাফার এই উক্তিটির প্রতিধ্বনি করে তাই বলতে ইচ্ছে করে সঙ্গীত জগতের উত্তরসূরী তৈরী করার ক্ষেত্রে রামশরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের মতোই এসব ঘরোয়া প্রতিষ্ঠানগুলির এবং আজকের সঙ্গীতাচার্যদের অবদান অনস্বীকার্য।

সঙ্গীত বিদ্যালয়ের কথা শেষ করলাম এখানেই। ইতিমধ্যেই আমরা এসে গেছি মা রক্ষাকালীর মাড়োতে। মায়ের মাড়োতে বসে আগামীকাল শোনাব মায়ের কথা। এদিকে সন্ধ্যা সমাগত। সুতরাং চতুর্থদিনের পরিক্রমার সমাপ্তি ঘোষণা করছি এখানেই। শুভ সন্ধ্যা।

পঞ্চম দিনের পরিক্রমা

অধ্যায়-১১২

মা রক্ষাকালী

রসিকগঞ্জ

আজ আমাদের গুপ্তবৃন্দাবন পরিক্রমার শেষ দিন। শেষ দিনের পরিক্রমার শুভারম্ভের শুভ-লগ্নে মা রক্ষাকালীর শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন আপনাদের সকলকে বিপদ-আপদ থেকে সদাসর্বদা রক্ষা করেন। এখন মনোযোগ সহকারে শুনুন মায়ের কথা।

মহাকালের আঙ্গিনায় খুব বেশী দিন নয়। প্রায় একশ বছর আগের কথা। বিষ্ণুপুরে এত জনবসতি ছিল না তখন। ছিল না থিক্ থিক্ মানুষের ভিড়। ছোট্ট শহরটির ধারে পাশে ছড়িয়েছিল ধূ ধূ উন্মুক্ত প্রান্তর, সবুজ শ্যামল শস্যক্ষেত্র, বিস্তীর্ণ বনভূমি, থৈ থৈ জলরাশি আর সমাহিত স্তব্ধতার এক দিব্য আমেজ। বর্তমান রসিকগঞ্জ মহল্লার চিঁড়াকলের সন্নিকটে ছিল মল্লভূমের রাজধানী মন্দির-নগরী বিষ্ণুপুর শহরে ঢোকার প্রবেশ তোরণ—নাম তার 'বীর দরজা'। বীর দরজার পশ্চিমদিকে ছিল শ্মশান, তারপর উন্মুক্ত মাঠ এবং যমুনাবাঁধ। যমুনাবাঁধের থৈ থৈ জলরাশির উপর দিয়ে ভেসে আসত প্রস্ফুটিত পদ্মগন্ধ সুরভিত বাতাস। এখন যেখানে ধুমধাম সহকারে মা রক্ষাকালীর পূজা হয় হেমন্তের হিমেল অমারাত্রিতে, অতীতে সেই স্থানটি ছিল বিপদসঙ্কুল ভয়াবহ স্থান—ডাকাতদের আস্তানা। একটি বেল গাছের নীচে ঘট স্থাপন করে মা কালীর পূজা হত। কিন্তু জনমানবশূণ্য উন্মুক্ত মাঠের উপর বেদী স্থাপন করে কেন এই কালীপূজা?

অন্বেষা বলে, বিষ্ণুপুর রেলস্টেশন থেকে মেঠোপথে অনেক যাত্রী যাতায়াত করতেন বর্তমানের রক্ষাকালীর মাঠ নামে চিহ্নিত মাঠের উপর দিয়ে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে এবং রাত্রিনিশীথে শোনা যেত, 'রক্ষা কর, রক্ষা কর, কে কোথায় আছো বাঁচাও, বাঁচাও।' পরদিন সকাল বেলায় দেখা যেত রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়ে আছে রক্ষাকালীর মাঠে। এভাবে দিনের পর দিন হৃতসর্বস্ব হয়ে খুন হত যাত্রীসাধারণ।

একদিনের কথা বিষ্ণুপুর কৃষ্ণগঞ্জ কৈলাসতলা নিবাসী জনৈক চট্টোপাধ্যায় উপাধিধারী ব্রাহ্মণ রাত্রির প্রথম প্রহরে ট্রেন থেকে নেমে হাঁটা পথে পূর্বোক্ত মাঠের উপর দিয়ে বাড়ি ফিরছেন একা একা। আলো-আঁধারী পরিবেশ। ঝিঁ ঝিঁ ডাকা গা ছম্‌ছম্ ভয়-ভূতুড়ে নির্জনতা। হঠাৎ ব্রাহ্মণের নজরে পড়ে এক নারীমূর্তি।

"কে তুমি মা? একা একা। রাত্রি নিশীথে ..."—প্রশ্ন করেন ব্রাহ্মণ।

কোনরকম উচ্চবাচ্য না করে নিঃশব্দে এগিয়ে চলে নারীমূর্তি।

"একা একা যেও না মা, একটু দাঁড়াও, আমার সাথে যেও"—মিনতি করেন ব্রাহ্মণ।

কিন্তু কে কার কথা শুনে। দ্রুতগতিতে হাঁটতে থাকে মেয়েটি। ব্রাহ্মণও পিছনে পিছনে হাঁটতে থাকেন ক্ষিপ্রগতিতে। ব'য়ে যায় বেশ কিছুটা সময়। পিছনে পড়ে থাকে

অনেকখানি মেঠোপথ। ব্রাহ্মণ এসে গেছেন নারীমূর্তির কাছাকাছি। পূর্বোক্ত বেল গাছের সন্নিকটে এসে মুহূর্তে মেয়েটি হয়ে যায় অদৃশ্য। অজানা আতঙ্কে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে বৃক্ষমূলে লুটিয়ে পড়েন ব্রাহ্মণ। যখন জ্ঞান ফিরলো তখন স্বপ্নাদেশের সুস্পষ্ট বাণী হৃদয় মাঝে আনন্দের শিহরণ তুললো। ভয়ে ভক্তিতে স্বপ্নাদিষ্ট স্থানটিতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম জানিয়ে বাড়ি ফিরলেন ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ। অতঃপর যে স্থানটিতে জ্ঞান হারিয়েছিলেন, দেবী নির্দেশিত সেই স্থানটিতেই মাটির বেদী নির্মাণ করে বেদীর উপর ঘট স্থাপন করে মা কালীর পূজা করলেন। মায়ের নির্দেশমতো নাম হল 'রক্ষাকালী'। দেখতে দেখতে এসে গেল কার্তিক মাসের কালীপূজার অমারাত্রি। দেবীর ইচ্ছামতো নির্মিত হল দেবীর মৃন্ময় মূর্তি। ব্রাহ্মণের কথামতো মূর্তি গড়লেন বিষ্ণুপুর কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লা নিবাসী মাধব দে সূত্রধর। রক্ষাকালী পূজার বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণ এক রাত্রির কালীপূজা করলেন মূর্তি স্থাপন করে। রাত্রির চতুর্থ প্রহরের প্রারম্ভে প্রতিমা নিরঞ্জন করলেন নিকটস্থ 'পোদার পুকুরে'। এইভাবে চলতে থাকে বছরের পর বছর। সব কিছুই হয় মায়ের নির্দেশানুসারে।

রাত্রি-নিশীথে ডাকাতের দলও বোধ করি মাতৃবন্দনা করে নিজেদের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করে লেগে পড়ত ডাকাতি করতে। এভাবে স্থানটির বৈশিষ্ট্য হল রাত্রি-নিশীথে ডাকাতের আস্তানা, দিবাভাগে সাধারণ মানুষের জন্য মায়ের সাশ্রয় সান্ত্বনা।

দিন যায়। এদিকে রসিক বিশ্বাস মহাশয়ের জামাতা কার্তিক সরকার ও তাঁদের বংশধরগণ রক্ষাকালী মাঠের সন্নিকটে বসবাসের উদ্দেশ্যে বাড়ি নির্মাণ করেন একটি একটি করে। গড়ে ওঠে হালকা হালকা জনবসতি। পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণ এবং ডাকাতদের মাতৃভক্তি দেখে স্থানীয় বাসিন্দাগণও মায়ের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন দিনে দিনে। দিবাভাগে স্থানীয় ভক্তগণ, নিশাভাগে ডাকাতগণ মাতৃবন্দনা করেন মায়ের কৃপালাভের উদ্দেশ্যে। এভাবে গৃহীভক্ত এবং ডাকতভক্ত উভয়েরই মাতৃরূপে প্রতিভাত হন মা রক্ষাকালী। তাই রক্ষাকালীর কথা লিখতে গিয়ে বারবার আমার স্মৃতিপটে ভেসে আসছে মা সারদার সেই চিরস্মরণীয় উক্তি—আমি সতেরও মা, অসতেরও মা। আমার শরৎ (স্বামী সারদানন্দ) যেমন, আমজাদও (দুর্ধর্ষ ডাকাত) তেমন। আমার ছেলে যদি ধুলো কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ঝেড়ে কোলে নিতে হবে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মা রক্ষাকালীর অবস্থাটাও হল ঠিক মা সারদার মতো। তাই দেখি মা আমার দুষ্ট প্রকৃতির ডাকাতেরও মা, আবার শিষ্ট প্রকৃতির সাধারণ মানুষেরও মা। মা ডাকে যেন স্বয়ং মহামায়া মোহিতা। সেখানে দুষ্ট বা শিষ্টের বাছ-বিচার নেই। আছে শুধু অকৃপণ হস্তে কৃপা বর্ষণ। অভয় হস্তে বরাভয়মুদ্রা। শরণাগতকে রক্ষা করার রক্ষাকবচ স্বরূপিণী রক্ষাকালী তিনি।

সময় বয়ে যায় সময়ের নিজস্ব ধারায়। গড়িয়ে যায় আরও কয়েক দশক। মাতৃঅঙ্গনের ধারেপাশে এবং রসিকগঞ্জ ও উকিলপাড়া মহল্লায় গড়ে ওঠে জনবসতি। বেগতিক দেখে ডাকাতেরাও সরিয়ে নেয় আস্তানা। তখন থেকে মা শুধু আর্ত গৃহীভক্তদের মঙ্গল-সাধনে ব্রতী হন। অনেকের অনেকানেক মনস্কামনা পূর্ণ হতে থাকে দিনে দিনে। মায়ের মাহাত্ম্য-কথা ছড়িয়ে পড়ে শহর জুড়ে।

তৎকালে বর্গী-হানার মতো হঠাৎ হঠাৎ এসে যেত কখনো কলেরা, কখনো বসন্ত বা প্লেগ। শহর জুড়ে মানুষ মরত কাতারে কাতারে। স্তূপাকৃতি মরদেহগুলি মাটি খুঁড়ে পুঁতে দেওয়া হত শ্মশান-প্রাঙ্গণে। আর্ত-অসহায় নর-নারী 'রক্ষা কর, রক্ষা কর মা রক্ষাকালী' চিৎকার করতে করতে লুটিয়ে পড়ত মায়ের পদপ্রান্তে। পূজাপাঠ চলত। তুষ্ট হতেন মা।

মড়ক-মহামারী গা ঢাকা দিত নিমেষে। মা রক্ষাকালীর কৃপায় রক্ষা পেত শহরবাসী। মায়ের মহিমা মুখরিত হয় মুখে মুখে। এরূপে রসিকগঞ্জ উকিলপাড়ার সীমানা ছাড়িয়ে, সমগ্র বিষ্ণুপুরবাসীর অভিভাবিকারূপে প্রতিভাত হন তিনি। এজন্যই বোধ করি দীপান্বিতা কালীপূজার অমারাত্রির বিশেষ পূজানুষ্ঠানে বিষ্ণুপুরবাসীগণ দলে দলে ছুটে আসেন মায়ের পদপ্রান্তে। বছরের এই বিশেষ দিনটিতে মা রক্ষাকালীর পুজো করিয়ে রক্ষাকবচ লাভের অভীপ্সা পরিলক্ষিত হয় ভক্তহৃদয়ে। ক্রমে ক্রমে করুণাময়ী মায়ের সাথে দেওয়া নেওয়ার, চাওয়া পাওয়ার একটি মিষ্টি-মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে মাতৃভক্ত সন্তান-সন্ততির। মায়ের কাছে অনেক পেয়েছি, অতএব দিতেও ইচ্ছে করে কিছু না কিছু। শুধুমাত্র ভক্তি-অর্ঘ্য আর ফল, ফুল, মিষ্টান্ন দিয়ে পুজো-আর্চা করে তুষ্ট হয় না মন। আরো কিছু, আরো কিছু দিতে ইচ্ছে হয়। এতাদৃশ ভাবনায় ভাবিত হয়ে বিষ্ণুপুর গোপালগঞ্জ নিবাসী কাদম্বিনী নাম্নী মায়ের কৃপাধন্য জনৈক বারবনিতা মাটির বেদীর স্থলে গড়িয়ে দেন সিমেন্টের বেদী। বিষ্ণুপুর স্টেশন রোডের বড় তেলকলের মালিক নিঃসন্তান রামপ্রতাপ রুংটা নামক জনৈক মাড়োয়ারী মায়ের কৃপাতে সন্তান লাভ করেন। স্বীয় মনোবাসনা পূর্ণ হওয়ায় পূর্বোক্ত বেদীকে কেন্দ্র করে মোটামুটি বড় আকৃতির চৌচালা বিশিষ্ট করুগেটেড্ টিনের আচ্ছাদন সমন্বিত নাটমন্দির আদলের একটি সুশ্রী কাঠামো তৈরী করিয়ে দেন পরবর্তীকালে। না-মন্দির, না-আটচালা রূপে প্রতিভাত উক্ত স্থানেই দেবী অধিষ্ঠিতা আছেন চিন্ময়ী সত্তায়। শোনা যায় উক্ত স্থানে পঞ্চমুণ্ডির আসনও বিদ্যমান। উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ সহ দেবীস্থানটি সামগ্রিকভাবে 'রক্ষাকালীর মাড়ো' নামেই সুবিদিত। বিষ্ণুপুর আঁইসবাজার মহল্লার জমিদার বংশীয় ঁরসিক বিশ্বাসের মৌজা ছিল রক্ষাকালীর মাঠ সহ সমগ্র রসিকগঞ্জ এলাকা। ঁরসিক বাবুর নামানুসারেই উক্ত পল্লীটির নাম হয়েছে রসিকগঞ্জ এবং মা রক্ষাকালীর মাড়োটি রসিকবাবুর স্মৃতি বিজড়িত জমির উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

বেদী ও আটচালা নির্মাণ করিয়ে দেওয়া ছাড়াও অনেক ভক্ত মায়ের কৃপালাভে ধন্য হয়ে মাকে উপহার দিয়েছেন বহু স্বর্ণ-রৌপ্য অলঙ্কার। এতটুকু মা—উচ্চতায় বড় জোর ফুট দেড়েক হবে। কতই বা গয়না পরবেন। গয়নায় গা ঢাকা যায় মায়ের।

এইটুকু মা, কিন্তু এঁর মহিমা অপার। পূজা এবং প্রতিমা তৈরীর নিয়ম কানুনও সাংঘাতিক। বিষ্ণুপুর কৃষ্ণগঞ্জ নিবাসী পূর্বোল্লিখিত ঁমাধব দে সূত্রধরের বংশধরগণই মাতৃ আদেশে মায়ের মৃন্ময় মূর্তি তৈরী করে আসছেন তিন পুরুষ ধরে—দেবী প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভিক কাল থেকে। বর্তমানে প্রতিমা তৈরী করেন ঁমাধব দে সূত্রধরের নাতি শ্রীতুলসী-চরণ দে সূত্রধর। অতীব শুদ্ধাচারে এবং নির্জলা উপবাসে থেকে স্নানাদি সমাপনান্তে সূর্যোদয়ের পর শুরু হয় প্রতিমা তৈরীর কাজ। শেষ হয় ঐ দিনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে। অনন্তর অলঙ্কারাদি সাজ-সজ্জায় সজ্জিতা হয়ে বাজনাবাদ্যি সহ শোভাযাত্রা সহকারে মাকে নিয়ে আসা হয় মায়ের মাড়োতে। অমাবস্যা তিথিযোগে যথাবিধি নিয়মানুসারে পূজা পাঠ ছাগবলি ও আরত্রিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মাতৃ-উপাসনা পরিসমাপ্ত হয় রাত্রির তৃতীয় প্রহরে এবং রাত্রির চতুর্থ প্রহরের প্রথম-যামে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয় পূর্বোল্লিখিত পোদার পুকুরে। এক রাত্রের পূজার সুবাদেই মা **'একরেতা কালী'** বলেও সুবিদিত। প্রাসঙ্গিকভাবেই উল্লেখ করি যে দীপান্বিতা কালীপূজার দিন দিবাভাগে মাতৃমন্দিরে মঙ্গলঘট স্থাপন করে দেবীর পূজা-অর্চনা, চণ্ডীপাঠ ও হোমযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হয় ইষ্টনিষ্ঠা সহকারে। বছরের অবশিষ্ট সময়ে শুধুমাত্র অমাবস্যা ও শনি মঙ্গলবারে মায়ের পূজা হত। হত না নিত্যপূজা।

বছর পঁচিশ আগের কথা। মাতৃগতপ্রাণ বিজয় সরকার মহাশয়ের বাড়িতে একদিন অজানা অচেনা এক বুড়ি এসে বললে, 'তোরা তো প্রতিদিন খাচ্ছিস্, মাকে খেতে দিসনি কেন?' বিজয়বাবু বুড়ির কথা ঠিকমত অনুধাবন করতে না পেরে বুড়িকে প্রশ্ন করেন, 'তার মানে?' উত্তরে বুড়ি বলেছিল, 'ঐ যে মা রক্ষাকালীর নিত্যি-পূজা দিস না কেন?' বুড়ির কথা শুনে টনক নড়ল বিজয়বাবুর। সাথে সাথে তিনি পুরোহিত ডেকে প্রত্যহ মায়ের নিত্যপূজার ব্যবস্থা করেন। সেই থেকে নিয়মিত চালু হয় নিত্যপূজা।

আপনাদের নিশ্চয় মনে আছে বিষ্ণুপুর বড়কালীতলার দিদিঠাকুরাণী তাঁর ঈপ্সিত জিনিস চেয়ে নিতেন সশরীরে আবির্ভূত হয়ে কিংবা স্বপ্নাদেশের মাধ্যমে। এখানেও মা রক্ষাকালী বোধ করি বুড়ির ছদ্মবেশে নিত্যপূজা পাওয়ার বাসনা চরিতার্থ করেছেন প্রকারান্তরে। ভেবে দেখুন, স্বর্গের দেব-দেবীদের সাথে কামনা বাসনা জর্জরিত মর্ত্যের মানুষের কি ঘরোয়া সম্পর্ক! কি মিষ্টি-মধুর আত্মিক সম্পর্ক! চাওয়া পাওয়ার কি নিবিড় সম্পর্ক!

এ প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ না করে পারি না। মাত্র বছর চারেক আগের কথা। আমার বন্ধু অসীম সরকার মায়ের একনিষ্ঠ ভক্ত। বিষ্ণুপুরের কালিন্দীবাঁধ সংলগ্ন শ্মশানকালীর মন্দিরে অনুষ্ঠিত মায়ের সন্ধ্যারতি দেখে দিব্যানন্দে অনুপ্রাণিত হয়ে মা রক্ষাকালীর মন্দিরেও নিয়মিতভাবে অনুরূপ সন্ধ্যারতির প্রচলন করার দিব্য প্রেরণা ঘনীভূত হয় অসীমের হৃদয়-কন্দরে। কিন্তু মায়ের আদেশ বা ইঙ্গিত ছাড়া কিছু করার উপায় নেই। মাঝে মধ্যে রাত্রি-নিশীথে মায়ের মাড়োতে গিয়ে নিজের মনের কথা মাকে জানিয়ে আসেন প্রায়ই। তথাপি মায়ের আদেশ ইঙ্গিত মেলে না কিছুই। সন্ধ্যারতির বাসনাটা বুকভরা ব্যথায় রূপান্তরিত হয় ক্রমশঃ। ঠিক এমনই এক দ্বান্দ্বিক মুহূর্তে ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। এক অমানিশার প্রত্যূষে দেবীস্থানে দেখা গেল মায়ের চরণচিহ্ন। ঘটনাটি দ্রুতগামী সংবাদের মতো মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে শহরময়। হৈ হৈ ব্যাপার, রৈ রৈ কাণ্ড। হাজার হাজার মানুষ সেদিন বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে দেখেছিলেন মায়ের পদচিহ্ন। মাতৃভক্ত অসীম সরকারের বারবার মনে হল মা তার আবেদন-পত্রে চরণচিহ্নের ছাপ দিয়ে সন্ধ্যা-আরতির প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন সানন্দে। অতএব আর দেরী নয়। সেদিন থেকেই শুরু হয় সন্ধ্যারতি।

চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী প্রতি বৎসর ১লা মাঘ দিবাভাগে মাতৃঅঙ্গনে মাকে পায়েস সহযোগে খিচুড়ি-ভোগ নিবেদনান্তে নরনারায়ণ সেবা করানো হয় সমষ্টিগত উদ্যোগে। মায়ের প্রসাদ প্রত্যাশী হাজার হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটে। রটন্তী কালীপূজা উপলক্ষ্যে ঘট স্থাপন করে রাত্রি-গভীরে মায়ের বিশেষ পূজা হোম যজ্ঞাদিও অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া শুভ অক্ষয় তৃতীয়া তিথিযোগে মাতৃ-অঙ্গনে মহাপ্রভুর মূর্তি সহকারে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে উদযাপিত হয় চব্বিশপ্রহর।

মা রক্ষাকালীর সেবাইত হিসেবে সরকার পরিবারের ৺চণ্ডীচরণ সরকার, তৎপুত্র ৺হরপ্রসাদ সরকার এবং বর্তমানে তৎপুত্র শ্রীঅসীম সরকার—পুরুষানুক্রমে তিন পুরুষ যাবৎ মায়ের সেবাদি কাজ করে আসছেন একান্ত নিষ্ঠা সহকারে। ৺ভগবতী চট্টোপাধ্যায়, তৎপুত্র ৺শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় এবং বর্তমানে তৎপুত্র শ্যামল চট্টোপাধ্যায়—পুরুষানুক্রমে তিন পুরুষ যাবৎ মায়ের পুরোহিতের কাজ করে আসছেন ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে। এছাড়া বিষ্ণুপুরের ময়রাপুকুর মহল্লা নিবাসী গোপাল চন্দ্র পুরোহিতও মায়ের পূজাদি করে থাকেন বর্তমানে।

মা রক্ষাকালীর মহিমার কথা আজ শুধু বিষ্ণুপুর নয়, ছড়িয়ে পড়েছে দূর-দূরান্তরে। বহু, বহু দূরে। এজন্যই বোধ করি কার্তিক মাসের কালীপূজার দিন ছাড়াও প্রতি অমাবস্যা এবং শনি মঙ্গলবারে মাতৃঅঙ্গনে ভক্ত সমাগম ও পূজারিণীদের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। হবেই না বা কেন? ভক্তমণ্ডলীর ভক্তি-চন্দনে চর্চিতা হয়ে মা যে এখানে সদা প্রকটিত, সদা বিরাজিত। মাতৃ-চরণে সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদনান্তে আমরা চলে যাব বিষ্ণুপুর শহরের একেবারে শেষপ্রান্তে। সেখানের দ্রষ্টব্য জিনিসটি হল নব-নির্মিত **'দেব-দেবেশ্বর মন্দির'**। সোজা দক্ষিণমুখী এই পথের ডান দিকে রয়েছে রেল স্টেশন যাওয়ার পথ, তারপর ময়রাপুকুর পল্লী ও বাম দিকে হরিতপোবন আশ্রম এবং মাঠ-ঘাট। পথের ক্লান্তি অপনোদনার্থে অবতারণা করব **'রত্নগর্ভা মল্লভূম'** প্রসঙ্গ।

অধ্যায়-১১৩

রত্নগর্ভা মল্লভূম

রুক্ষ, শুষ্ক, কাঁকুরে লালমাটির দেশ মল্লভূম। তথাপি অনুর্বর নয় এ মাটি। সাগরের অপরিমেয় নোনাজলের গভীরতায় যেমন থাকে মহামূল্য রত্নরাজি, তদনুরূপে রুক্ষ, শুষ্ক মল্লমাটির গর্ভে রয়েছে অমূল্য রত্নসমূহ। অবশ্য এসব রত্ন মণি-মুক্তা নয়, এসব রত্ন হল দেহধারী মানবরত্ন। মল্লমাটি-উদ্ভূত এসব মানবরত্নের মধ্যে কতিপয় সৃজনশীল মানুষ সাহিত্য ও শিল্প-চর্চায় মনোনিবেশ করে মল্লাকাশে শোভা পাচ্ছেন ভাস্বর নক্ষত্রের মতোই। কতিপয় সঙ্গীত-পিপাসু মানুষ আবার সঙ্গীত-সরস্বতীর সাধনায় নিবেদিত-প্রাণ হয়ে আপাত-কর্কশ মল্লমাটির উপর বর্ষণ করেছেন সঙ্গীত-সুধা। সুরের পরশে মল্লমাটি হয়েছে সুষমা মণ্ডিত, হয়েছে সুধাসিক্ত। স্বদেশ-প্রেমী কিছু বিপ্লবী বীর ব্রিটিশের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে গর্জে উঠেছেন হু-হুঙ্কারে। শৃঙ্খলিত ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনে আত্মাহুতি দিয়েছেন নশ্বর জীবন। নশ্বর জীবন দান করে লাভ করেছেন অবিনশ্বর অমরত্ব। আর এক শ্রেণীর মহামানব ঈশ্বর-সাধনায় তন্ময় হয়ে, ঈশ্বরগত প্রাণ হয়ে করেছেন ঈশ্বরের ঘর-সংসার। ঈশ্বরের সাথে হয়েছেন একাত্মা। হয়েছেন ঈশ্বর-কল্প। অর্জন করেছেন দেবত্ব। মল্লভূমোদ্ভূত দেবোপম ওই সব মানুষের পাশাপাশি আবার দেখি এ মাটির দুর্বার আকর্ষণে উড়োপাখির মতই উড়ে এসেছেন কিছু কিছু মহামানব। মল্লমাটি, মল্লসংস্কৃতি ও মল্লচেতনার সাথে মিশে গিয়ে হয়েছেন একাত্মা। হয়েছেন আত্মস্থ, হয়েছেন আপনজন।

'রত্নগর্ভা মল্লভূম' অধ্যায়টিকে সাহিত্য সাধনার আসরে, সঙ্গীত সরস্বতীর আরাধনায়, শিল্পকলার আঙ্গিনায়, ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনে, তেভাগা থেকে বাঁধগাবা ও নকশাল আন্দোলন, ঈশ্বরের ঘর সংসার ও নানাগুণে গুণিজন—এই সাতটি উপশিরোনামে বিভক্ত করে খুবই সংক্ষেপে শোনাব তাঁদের জীবনালেখ্য, অতি অল্পকথায় গাইব তাঁদের জয়গান, দেখাব তাঁদের সাধনৈশ্বর্য আহৃত সম্পদরাশি। এ প্রসঙ্গে বলে রাখি, যাঁদের কথা ইতিমধ্যে আলোচনা করেছি পুনরাবৃত্তির কারণে তাঁদের কথা আর উল্লেখ করা হবে না।

সাহিত্য-সাধনার আসরে

মল্লভূমের সাহিত্য প্রসঙ্গে আলোচনার পূর্বে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের পাতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করার বিশেষ প্রয়োজন। দশম হতে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অর্থাৎ এগারশ

বছরের বাংলা সাহিত্যকে আদি, মধ্য ও আধুনিক এই তিনটি যুগে বিভক্ত করা হয়েছে। দশম হতে দ্বাদশ শতাব্দী আদিযুগ, ত্রয়োদশ হতে অষ্টাদশ শতাব্দী মধ্যযুগ এবং উনবিংশ শতাব্দী থেকে আধুনিক যুগের সূচনা। চর্যাপদ ও দোঁহাকোষের মাধ্যমে ধর্মতত্ত্বের অন্তরালে লোক-জীবনকে কেন্দ্র করে বাঙালীর ঘরোয়া জীবন-চিত্রই বিকশিত হয়েছে আদিযুগে। দশম শতাব্দীতে রচিত **'চর্যাচর্য বিনিশ্চয়'** বাংলা সাহিত্যের আদি গ্রন্থরূপে চিহ্নিত।

প্রাসঙ্গিকভাবেই বলি প্রাচীন আর্যদের লিপির নাম ছিল ব্রাহ্মী। ব্রাহ্মী লিপির তিনটি রূপ ছিল। ভারতের পূর্বাঞ্চলের ব্রাহ্মী লিপি একাদশ শতাব্দীতে বঙ্গ লিপির রূপ পরিগ্রহ করে এবং ক্রমশঃ রূপান্তরের মাধ্যমে সেনযুগে বাংলা লিপি পূর্ণতা লাভ করে। **শুশুনিয়া পাহাড়ে খোদিত সংস্কৃত ভাষায় রচিত ব্রাহ্মী লিপিটি অনার্য অধ্যুষিত এই অঞ্চলে আর্য-সভ্যতা প্রসারের একটি জাজ্বল্য প্রমাণ।** চন্দ্রবর্মার রাজ্য পুষ্করণায় ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রভাবে এ অঞ্চলে জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের বহুল প্রচার সত্ত্বেও এই দুই ধর্ম মানুষের মর্মমূলে প্রবেশ করেনি। পক্ষান্তরে বিষ্ণুপুরে ধর্মপ্রাণ মল্লরাজাদের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেব-দেবীর উপাসনা ও গুণকীর্তনের মাধ্যমে মল্লভূমে সাহিত্য সাধনার সূত্রপাত। মল্লভূম নিবাসী **রামাই পণ্ডিত** ধর্মঠাকুরের মহিমা প্রচারক কাব্য **'শূন্যপুরাণ'** রচনা করেন একাদশ শতাব্দীতে। শূন্যপুরাণ রচয়িতা রামাই পণ্ডিত বিষ্ণুপুর মহকুমার ময়নাপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রামাই পণ্ডিতের জন্ম এবং শূন্যপুরাণের রচনাকাল সম্পর্কে নানা জনের নানামত। মতান্তরে তিনি একাদশ, ত্রয়োদশ বা সপ্তদশ শতাব্দীর কবি ছিলেন। সূর্য পূজারী রামাই পণ্ডিতের ধর্মঠাকুরের নাম **'যাত্রাসিদ্ধি'**। রামাই পণ্ডিতের মতে **'ধর্মঠাকুর শূন্যমূর্তি, নিরঞ্জন, নিরাকার প্রভু।'** রামাই পণ্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনার্থে চাতরা গ্রামের কলেজটির নামকরণ করা হয়েছে 'চাতরা রামাই পণ্ডিত মহাবিদ্যালয়'।

শূন্যপুরাণ রচয়িতা রামাই পণ্ডিতের পরই এসে যায় বড়ু চণ্ডীদাসের কথা। মল্লরাজাদের প্রত্যক্ষ প্রভাব-মুক্ত সামন্তভূম তথা ছাতনার **বড়ু চণ্ডীদাস** ছিলেন বাসুলী সাধক। সংস্কৃতজ্ঞ ও সঙ্গীতবেত্তা চণ্ডীদাস ছিলেন অসাধারণ কবিত্বশক্তি সম্পন্ন সর্বজনপ্রিয় এক ব্যক্তিত্ব। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ মতান্তরে পঞ্চদশ শতকের এই কবি "রচনা করেছেন বাংলা ভাষায় কৃষ্ণকথার প্রথম কাব্য **'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ব'** তথা **'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ'** বা **শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন**। দু'শ ছাব্বিশ পাতার তুলট কাগজের এই পুঁথিটি তেরো খণ্ডে বিভক্ত ৪১৭টি পদে রাধাচন্দ্রাবলী, কৃষ্ণ ও বড়াই এই তিন চরিত্রের গীতিময় সংলাপে রচিত এক অতুলনীয় সাহিত্য সম্পদ। পুঁথিটি এই জেলারই বিষ্ণুপুর সন্নিকটস্থ কাঁকিল্যার দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের ঘর থেকে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে উদ্ধার করেন বেলিয়াতোড় নিবাসী পণ্ডিত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ। সাত বছর পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে ভূমিকা ও টীকা টিপ্পনী সহ প্রকাশিত হয়। আদি ও মধ্যযুগের সেতুবন্ধনে ভাষার ইতিহাসে, ব্যাকরণ বিচারে, সাহিত্যের আনুষঙ্গিক আলোচনায় এই অদ্বিতীয় গ্রন্থটি সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। **তাই পণ্ডিতদের অভিমত 'বাংলা ভাষাভাষী মানুষ, বাংলা সাহিত্য, বাঁকুড়ার নিকট অনেকাংশে ঋণী'।**"[১]

দেবদেবীর উপাসনা, রামাই পণ্ডিতের শূন্য-পুরাণ রচনা এবং বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনার মাধ্যমে মল্লভূমে সাহিত্য সাধনার যে ক্ষীণ স্রোতটি প্রবাহিত ছিল,

১. বাঁকুড়ার ইতিবৃত্ত—শ্রীহরিদাস চট্টোপাধ্যায়। 'বাঁকুড়ার ভাষা, শিক্ষা-সাহিত্য সংস্কৃতি' অধ্যায়।

বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস আচার্যের আগমনের ফলে সেই ক্ষীণ স্রোতে আসে ভরা গাঙের বাঁধভাঙা প্লাবন। অবশ্য শ্রীনিবাস আচার্যের পূর্বে পরমেশ্বর নামক জনৈক বৈষ্ণব সাধক ও পদকর্তা শান্তিপুর নিকটস্থ পিলখাঁ গ্রাম থেকে বিষ্ণুপুরে এসে বসবাস ও ধর্মপ্রচার শুরু করেছিলেন। কিন্তু তিনি বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে আশানুরূপ সফলকাম না হওয়ায় রয়ে গিয়েছেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। এদিকে পুঁথি লুণ্ঠনের অপ্রীতিকর ঘটনার সূত্র ধরে শ্রীনিবাস আচার্য বিষ্ণুপুরের স্থায়ী অধিবাসী হয়ে ওঠেন মল্লরাজা বীর হাম্বীরের রাজানুকূল্যে এবং সদিচ্ছায়। আচার্যের প্রভাবে মল্লভূমে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্লাবন আসে আশাতীতভাবে। বৃন্দাবনের রাধাকৃষ্ণ মল্লভূমের জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে অবস্থান করেন সতত। রাধাকৃষ্ণের উপাসনার সাথে সাথে ব্যাপকভাবে শুরু হয় ধর্মভিত্তিক সাহিত্য-সাধনা। সাধক-কবি **শ্রীনিবাস প্রভু** স্বয়ং খুব বেশী পদ রচনা করেননি ঠিকই তথাপি তাঁকে মধ্যমণি করে মল্লভূমে গড়ে উঠেছিল একটি কবিমণ্ডলী। এই কবিমণ্ডলীর মধ্যে মল্লরাজবংশের সদস্য সদস্যাবৃন্দ ছাড়াও স্বয়ং শ্রীনিবাস ঠাকুরের পুত্র-কন্যা, শিষ্য-শিষ্যা এবং ভক্তবৃন্দও হয়ে পড়েন অন্তর্ভুক্ত। স্বতঃস্ফূর্ত কাব্যভাবনায় ভাবিত হয়ে শ্রীনিবাস কন্যা **হেমলতা দেবী** লিখেছিলেন **'মানবী-বিলাস'** কাব্যগ্রন্থ। একাধারে সাধিকা, কবি ও আচার্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য **যদুনন্দন দাস 'কর্ণানন্দ'** কাব্য, **নিত্যানন্দ দাস 'প্রেমবিলাস'** ও **'প্রেমামৃত'** কাব্য রচনা করেন। শ্রীনিবাস আচার্যের দ্বিতীয়া পত্নী **গৌরাঙ্গ প্রিয়ার** সন্তান **গতিগোবিন্দ** রচনা করেন **'বীররত্নাবলী'** গ্রন্থ। এই গতিগোবিন্দই নাকি বিষ্ণুপুরকে **'বন-বিষ্ণুপুর'** আখ্যায় ভূষিত করেছিলেন। মল্লভূমে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার ও ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে যে গ্রন্থগুলির সন্ধান পাওয়া যায় তার মধ্যে **'প্রেমবিলাস'**, **'কর্ণানন্দ'** ও **'ভক্তিরত্নাকর'** বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এদিকে মহারাজ **বীর হাম্বীর** স্বয়ং বৈষ্ণব ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অসি ফেলে তুলে নিলেন মসি। কৃষ্ণবিরহিনী রাধার ব্যথা কাব্যরূপ পরিগ্রহ করে বীর হাম্বীরের লেখনীতে।

> শুন গো মরমীসখী কালিয়া কমল আঁখি
> কিবা হৈল কিছুই না জানি।
> কেমন কেমন করে মন সব লাগে উচাটন
> প্রেম করি খোয়ানু পরানি।।

মহারাজ বীর হাম্বীর ছাড়াও মল্লরাজবংশের অন্যান্য রাজা, রাণী এবং পুত্র-কন্যাগণও বহুপদ রচনা করেছিলেন। বীর হাম্বীর পুত্র **ধাড়ী হাম্বীর** রাধাকৃষ্ণের লীলাকীর্তন করে পদ রচনা করেন। মল্লরাজা **গোপালসিংহ** ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ, উদার প্রকৃতির এবং জ্ঞানীগুণী অনুরাগী। তিনি নিজেও ছিলেন কবি। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন—

> গাইল গোপাল সিংহ মল্লাবনীনাথ
> শ্রীগুরু পদারবিন্দে করি প্রণিপাত।

'গোপাল সিংহের পট্টমহাদেবী **রাণী শিরোমণি 'প্রেমবিলাস'** গ্রন্থ রচনা করেন।' মল্লরাজ **চৈতন্য সিংহও** রচনা করেন কয়েকটি পদ। নৃপবর গোপাল সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় মল্লরাজ্যে বহু পদকর্তা, কবি এবং রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, ধর্মমঙ্গল, শীতলা-মঙ্গল, সত্যপীরের পাঁচালী রচয়িতা এবং অনুবাদকের সমাবেশ ঘটে। মল্লরাজ্যে সাহিত্য

সৃষ্টির মূলে মল্লরাজাদের অবদান ও পৃষ্ঠপোষকতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন কবির ভণিতায় এই সত্যটিই যেন বিধৃত হয়েছে পুনঃপুনঃ। নবাসনের কবি **দ্বিজ রামচন্দ্র** তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে লিখেছেন—

রাজা গোপাল সিংহ কৃষ্ণপদে ভৃঙ্গ
প্রসাদ ভকত সমান
তস্য দেশে বাস ধর্ম ইতিহাস
দ্বিজ রামচন্দ্র গান।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কবি **প্রভুরাম** ছিলেন ক্ষুদিরাম নামক ধর্মঠাকুরের উপাসক। মল্লভূমের কবি **প্রভুরাম** তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি সুপরিচিত নাম। তাঁর কাব্যগ্রন্থে লিখিত আছে—

গোপাল সিংহ নৃপবর তস্য দেশে করি ঘর
করি তার পুত্রের কল্যাণ
তাহার তনয়ে দয়া কর্যা দেহ পদছায়া
মুখপাদ্য প্রভুরাম গান।

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের প্রথমার্ধের কবি রামায়ণ রচয়িতা **দ্বিজ সীতাসুতের** দুটি ভণিতায় উক্ত সুরই প্রতিধ্বনিত হয়েছে।

বাল্মীকি আদেশে দ্বিজ সীতাসুত গায়।
মহারাজ গোপাল সিংহ নাথের জয় জয়।।

আবার গোপাল সিংহের পৌত্র চৈতন্যসিংহের কল্যাণ কামনা করেও কবি তাঁর 'বাল্মীকি-পুরাণ'-এ লিখেছেন—

দ্বিজ সীতাসুত কহে বাল্মীকি পুরাণ।
মহারাজা চৈতন্য সিংহের জয় কর রাম।।

মধ্যযুগে সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বিষয় ছিল ধর্ম। বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব ধর্ম ছাড়াও ধর্মঠাকুর ছিলেন সাহিত্যের মূল উপাদান। ধর্মমঙ্গল কাব্য রচয়িতা হিসেবে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি **গোবিন্দরাম** একটি উজ্জ্বল নাম। গোবিন্দরামের মতোই মল্লভূমের ইন্দাস থানার অন্তর্গত সুখসায়র বা সুখসাগর গ্রাম নিবাসী **সীতারাম দাস** (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী) ধর্মঠাকুরের দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্য রচনা করেন। **'ধর্মমঙ্গল'** ছাড়াও তিনি **'মনসামঙ্গল'** পুঁথি রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের আর এক প্রোজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক **কবিচন্দ্র**। কবিচন্দ্রের প্রকৃত নাম **শঙ্কর চক্রবর্তী**। কবিচন্দ্র মল্লরাজার দেওয়া উপাধি। তাঁর জন্মস্থান বিষ্ণুপুরের পূর্ব দিকে অবস্থিত জয়পুর থানার পানুয়া বা পেনো গ্রামে। পিতার নাম মুনিরাম, মাতার নাম চন্দ্রাবতী। অত্যন্ত দীর্ঘায়ু এই কবির সাহিত্য-সাধনা শুরু হয় মল্লরাজা বীরসিংহের আমলে, শেষ হয় রাজা গোপাল সিংহের রাজত্বকালে। এর থেকে বোঝা যায় তিনি বীর সিংহ, দুর্জন সিংহ, দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ ও গোপাল সিংহ— এই চারজন রাজার রাজত্বকালে সাহিত্য সাধনা করেছিলেন এবং মল্লরাজা গোপাল সিংহের সভাকবি ছিলেন। তিনি শিবমঙ্গল বিষয়ক **'শিবায়ন'**, **'গোবিন্দমঙ্গল'**, ভাগবত পুরাণের অনুকরণে

'গোবিন্দবিজয়' এবং দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় **'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'** ও মহাভারতের ভাবধারায় **'ভারত পাঁচালী'** রচনা করেন। ভারত পাঁচালীর ভণিতায় কবিচন্দ্র লিখেছেন—

তারপর মহারাজ দিয়া ভূমিদান
আদেশিলা রচ মহাভারত পুরাণ।
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদ করিয়া ভাবনা
দ্বিজ কবিচন্দ্র কৈল ভারত বর্ণনা।

কবিচন্দ্রের রামায়ণ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে ডক্টর সুকুমার সেন লিখেছেন, "কৃত্তিবাসী রামায়ণের কয়েকটি বিশিষ্ট অংশ (যেমন অঙ্গদ রায়বার ও তরণী সেন বধ ইত্যাদি কবিচন্দ্রেরই রচনা।"

মেজিয়া সন্নিকটস্থ বাঁকুড়া জেলার ভুলুই গ্রাম নিবাসী অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি **জগদ্রাম রায়** তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদের সহযোগিতায় তথা যৌথ প্রচেষ্টায় রচনা করেন **'অদ্ভুত রামায়ণ'**। অদ্ভুত রামায়ণে আছে ন'টি কাণ্ড। এই রামায়ণে 'অদ্ভুত' অংশের অবতারণা হয়েছে 'পুষ্কর কাণ্ডে'। সেখানের ঘটনা বিন্যাস নিম্নরূপ—

"দশানন নিহত, সীতাকে নিয়ে রাম ফিরে এসেছেন অযোধ্যায়। সেখানে সিংহাসনে আরূঢ় রাম, পাশে সীতা। মুনি-ঋষিরা রামের গুণকীর্তনে মুখর অথচ সীতার অধরে বক্র হাসি। হাসির কারণ জানতে চাইলে সীতা সহস্রস্কন্ধ রাবণের কথা বললেন। যিনি দশাননের চেয়ে শতগুণ বলশালী, থাকেন পুষ্কর দ্বীপে।

অসংখ্য সৈন্য ও চার ভাইকে সঙ্গে নিয়ে রাম বেরুলেন সন্ধানে। সীতাও চললেন সঙ্গে। দেখা মিলল সহস্রস্কন্ধের, যুদ্ধও সুরু হল। একে একে পরাজিত হলেন চার ভাই, রামও মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তখন রণচণ্ডী মূর্তি ধরলেন সীতা, তার মধ্যে সমন্বিত হলেন দুর্গা, কালী ও চণ্ডী। নগ্ন দেহ, আলুলায়িত কেশ, গলায় মুণ্ডমালা, জিহ্বা রুধিরলিপ্ত। ভয়ংকরী মহাকালীর রূপে নিহত করলেন রাবণকে। তারপর পৃথিবী কাঁপিয়ে চলল নৃত্য।"[১]

১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত অদ্ভুত রামায়ণ এই অভিনবত্বের কারণে সত্যই অদ্ভুত।

দুর্গাপূজার পাঁচদিনে গাওয়ার উপযোগী করে পিতা-পুত্রে লিখেছিলেন **'দুর্গাপঞ্চরাত্রি'**। ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমী এই তিন দিনের গান রচনা করেন স্বয়ং জগদ্রাম, নবমীও দশমী দিনের গান রচনা করেন জ্যেষ্ঠ পুত্র **রামপ্রসাদ**। বারোটি উল্লাসে বিভক্ত জগদ্রামের **'আত্মবোধ'** গ্রন্থটি উচ্চাঙ্গমানের আধ্যাত্মিক রূপক কাব্য। এখানে "মনের দুই পত্নী সুমতি ও কুমতি ও তাদের সন্তান সন্ততির জন্ম ও দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে মানুষের চেতনার রূপান্তর বর্ণিত হয়েছে। বিষয়বস্তু যেমন অভিনব, আধ্যাত্মিক উপলব্ধি ও কাব্যিক চেতনাও তেমনি উঁচুমানের।

দেহালয় দেবালয় বেদে সত্য কয়
এ দেহ যে জানে সেই আনন্দে ভাসয়।

অথবা,

প্রকৃতি স্বরূপে রাম দেখ বিদ্যামান
রসরাজ স্ত্রীপুরুষ দেহে অধিষ্ঠান।"[২]

---

১. পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃঃ—২৯৪-২৯৫. ২. ঐ- পৃঃ- ২৯৫.

একাধারে বৈষ্ণব সাধক ও পদকর্তা হিসেবে মল্লভূমে চারজন মনোহর দাসের সন্ধান মেলে। বীর হাম্বীরের সমসাময়িক বলে কথিত **মনোহর দাস** '**পদসমুদ্র**' ও '**নির্যাসতত্ত্ব**'-র সংগ্রাহক এবং '**দিনমণি চন্দ্রোদয়**' গ্রন্থপ্রণেতা হিসেবে সমাদৃত। কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা এই কবি ছিলেন চৈতন্য পার্ষদ রামানন্দ রায়ের বংশধর। ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত '**অনুরাগবল্লী**' গ্রন্থপ্রণেতা **মনোহর দাস** ছিলেন রামশরণ চট্টরাজের শিষ্য। অজ্ঞাত পরিচয় তৃতীয় **মনোহর দাস** ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে '**বৈদগ্ধবিলাস**' গ্রন্থ রচনা করেন। গীতগোবিন্দের আদলে রচিত '**গীতপুষ্পাঞ্জলি**' গ্রন্থ রচয়িতা চতুর্থ **মনোহর দাস** মল্লরাজ চৈতন্য সিংহের সমসাময়িক কালের পদকর্তা ছিলেন। এই চারজন মনোহর দাসের মধ্যে প্রথম মনোহর দাসকে স্মরণ করেই সোনামুখীতে বছরে বছরে অনুষ্ঠিত হয় মহোৎসব এবং বাউলমেলা।

বিষ্ণুপুর সন্নিকটস্থ গোপালনগর গ্রামের জনৈক **মোহন পূজারী** সুবৃহৎ '**ভক্তিমালা**' গ্রন্থ তিন খণ্ডে অনুবাদ করেন। ভক্তিমালা গ্রন্থের অন্ত্যখণ্ডে তিনি লিখেছেন—

> বিষ্ণুপুরে জন্মস্থান মোহন পূজারী নাম
> আছিলাম গোপাল নগরে
> ....
> পাঁচালী প্রবন্ধে আমি ভক্তিমালার ভাকাখানি
> রচিলাম সামর্থানুসারে।

মল্লরাজাদের ছত্রছায়ায় আরো অনেক কবি কাব্য ও পদ রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্জে গোকুলনগরের শঙ্খসুর ঠাকুরের কৃপাধন্য হয়ে **ধর্মমঙ্গল** রচনা করেন। 'কবি বল্লভ' উপাধিধারী **রসিক মিশ্র** ও **দ্বিজ বানেশ্বর** উভয়েই রচনা করেন মনসামঙ্গল কাব্য। বিষ্ণুপুর নিবাসী কবি **উত্তম দাস রাঘব** রচিত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্ন'-এর বঙ্গানুবাদ করেন। উত্তম দাসের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ '**রসতত্ত্বসার**'। কবি **প্রাণবল্লভ দাস** ওরফে **পরাণ দাস** লিখেছেন '**রসমাধুরী**'। **দ্বিজ বাসুদেব** লিখেছেন '**একাদশীর পাঁচালী**', **কবিচন্দ্র মিশ্র** লিখেছেন '**একাদশীর ব্রতকথা**'। **কৃষ্ণদাস** লিখেছেন '**নারদ সংবাদ**'। এছাড়া **রতন কবিরাজ** '**মদনমোহন বন্দনা**', **ফকির রামদাস** '**সত্যনারায়ণের পাঁচালী**, **শঙ্কর আচার্য** '**সত্যপীরের পাঁচালী**,' **শিবরাম গঙ্গোপাধ্যায়** '**লক্ষ্মণের শক্তিশেল**', কবি **সাফল্যরাম** ও **ধনঞ্জয়** যুগ্মভাবে '**রামকথা**', **বিশ্বম্ভর দাস** '**জগন্নাথ মঙ্গল**', কবি **রাজীবলোচন** '**শিবদুর্গার বিবাহ**', কবি **মধুসূদন** '**জিতাষ্টমীর পাঁচালী**' রচনা করেন। মল্লরাজা **দুর্জন সিংহের** রাজত্বকালে **রামতরণ চক্রবর্তী** মহাভারতের '**অশ্বমেধ পর্ব**' অনুবাদ করেন।

মল্লরাজা চৈতন্য সিংহের রাজত্বকালে (১৭৪৮—১৮০১ খ্রীঃ) ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রূপান্তরিত হয় নির্মম শাসনদণ্ডে। খণ্ড-বিখণ্ডিত অবস্থায় নীলাম হয়ে যায় মল্লরাজ্য। ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার্থে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করার অভিপ্রায়ে তৈরি করা হয় রাস্তাঘাট। মাঠে ঘাঠে কর্মরত চাষী ও কোড়া উপজাতির শ্রমজীবী মানুষদের হঠাৎ করে ধরে ফেলে জোর করে কাজে লাগানো হত দিনান্তে যৎসামান্য খাদ্যের বিনিময়ে। প্রায় বিনা পারিশ্রমিকের এই কাজকে '**বেগার**' বলা হত। অমানুষিক পরিশ্রম এবং অমানবিক অত্যাচারের ভয়ে '**বেগার ধরা**' বাহিনী দেখলেই সকলে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে পালাত। চারদিকে বেড় দিয়ে ঘিরে ফেলে ধরা হত বেগার খাটুয়েদের। কবি **দ্বিজ**

রাধামোহনের বর্ণনায় বক্তব্য বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত—

ফেলাএ লাঁগল মাঠে পালায় ছুটে যত চাষিগণ
বেগার ধরিতে আইল কত শত জন।

আবার কাজ করতে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের পিঠে পড়ত বেতের বাড়ি।

হাতে করে বেতের বাড়ি তাড়াতাড়ি মারে পিঠে
বেতের ভয়ে যত কোড়া চতুর্দিকে ছুটে।

ইংরেজ রাজত্বের অভ্যুদয়ের অশুভলগ্ন থেকেই মল্লরাজাগণ নিস্তেজ এবং নির্ধন হয়ে পড়েন ক্রমশঃ। বৈষ্ণবধর্মের উজ্জ্বলতাও নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে দিনে দিনে। রাজসভার আড়ম্বর হয় স্তিমিত বা অস্তমিত। তখনকার দিনে স্থানীয় রাজা এবং অভিজাত সম্প্রদায় ছিলেন কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক। কোম্পানীর আমলে দেশীয় রাজা, জমিদার এবং অভিজাত সম্প্রদায় তাঁদের প্রভাব প্রতিপত্তি হারিয়ে হয়ে পড়েন হীনবল এবং হৃতশ্রী। তখন রাজ-দরদী কবি সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজদ্বার বা রাজসভার বর্ণনা ও রাজস্তুতি বিষয়ক 'রায়বার' রচনার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। মল্লভূমের অনেক কবি যেমন **ফকিররাম কবিরাজ, কাশীরাম, রামচন্দ্র, রামনারায়ণ** ও **জগন্নাথ দাস** রায়বার রচনা করেন। রায়বারগুলির ভাষা ছিল হিন্দী-বাংলা মিশ্রিত এক সঙ্কর জাতীয় ভাষা। হিন্দুমুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের জন্য রচিত এ রকম একটি রায়বারে **'কবিভূষণ'** উপাধিপ্রাপ্ত **ফকিররাম কবিরাজ** লিখেছেন—

অঙ্গদ হামারা নাম, মেরে নাথ প্রভুরাম।
ইএ রাম কোন হোত্র, নাহি জান সম্পদ সোহে।।
তঞিও সীতা করকে চোরি, তোম লায়া লঙ্কাপুরী।
হাম দেখে ওঝকো তঙ্কা, ক্যাকর রাখে লঙ্কা।।

মহারাজ বীর হাম্বীরের রাজত্বকাল থেকেই মল্লভূমে মুসলমান সম্প্রদায়ের আগমন ঘটে ব্যাপকভাবে। হিন্দু কবিদের মতোই মুসলমান কবি সম্প্রদায়েরও অভ্যুত্থান ঘটে। অষ্টাদশ শতকের শেষার্ধের কবি দেশড়া গ্রাম নিবাসী **আরিফ** সত্যপীরের মহিমা গাথা নিয়ে রচনা করেন **'লালমোনের কথা'**। আর একজন মুসলমান কবি **ফৈজুল্লা** হিন্দু দেবদেবী ও গাজীর বন্দনা করে রচনা করেছেন নিম্নলিখিত ভণিতা—

তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ
শুন গাজী আপনি আসরে দেহ মন।

উক্ত ছত্রদ্বয়ে ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দুমুসলমানের সমন্বয়ের সুর স্পন্দিত।

"উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকে জেলায় সাহিত্য সৃষ্টির ধারাবদল সুরু হয়েছিল। বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গি বদলে যাচ্ছিল দ্রুত। যুক্তিবাদী চিন্তা, ব্যক্তিগত বোধ ও উপলব্ধি ধর্মের স্থান অধিকার করে নিতে সুরু করেছিল। সুললিত পয়ারের বদলে উদ্ভূত হয়েছিল, গদ্য, সাহিত্য ক্ষেত্রে তা যুগান্তরের সৃষ্টি করেছিল।"[১]

এই শতকের বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস থানার **গোপাল চন্দ্র সরকার** (১৮৪৬-১৯১৫ খ্রীঃ) একটি স্মরণীয় নাম। সংস্কৃত সাহিত্যে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত প্রখ্যাত আইন বিশেষজ্ঞ সরকার মহাশয় হিন্দু আইন বিষয়ক বহু গ্রন্থ রচনা ও সেগুলির ইংরাজী

১. পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃঃ—২৯৭

অনুবাদ করেছিলেন। আইনের অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ফ্যাকালটির ডীন, সিনেটের সদস্য, স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্রে পণ্ডিত তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন এই লেখক তাঁর **বীরমিত্রোদয়, দায়ভাগ, দায়তত্ত্ব** এবং **বিবাদ রত্নাকর** প্রভৃতি গ্রন্থের জন্য বিশেষ সমাদৃত।

বিষ্ণুপুর মহকুমার ময়নাপুর গ্রামের **অক্ষয়কুমার সেন** (১৮৫১-১৯২৩ খ্রীঃ) মল্লভূমের সাহিত্য জগতের এমনই একটি নাম যাঁর সাথে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামী বিবেকানন্দের নাম ও স্মৃতি জড়িয়ে আছে মহিমান্বিত ভাবে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির গৃহশিক্ষকের সূত্র ধরে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসেন এবং তাঁর অশেষ কৃপা লাভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের খুবই কাছের মানুষ ছিলেন অক্ষয় কুমার। বিবেকানন্দ তাঁকে সস্নেহে **'শাঁকচুন্নী'** সম্বোধনে আপ্যায়ন করতেন। মান্যবর অক্ষয় কুমারের অক্ষয়-কীর্তি হল **'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি'**। শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে লেখা তিনটি আকর গ্রন্থের মধ্যে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি' অন্যতম। অন্য দুটি আকর গ্রন্থ হল শ্রীম কথিত **শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত**, এবং স্বামী সারদানন্দ রচিত **'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'**।

তন্ত্রশাস্ত্রের বিজ্ঞান-ভিত্তিক অনুশীলনের কার্যে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করে বিষ্ণুপুরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত রামসাগর গ্রামের **অটলবিহারী ঘোষ** (১৮৬৪-১৯৩৬খ্রীঃ) বিচারপতি স্যার জন উড্রফের সাহায্যে দুষ্প্রাপ্য কিছু তন্ত্রশাস্ত্র উদ্ধার করেন। তন্ত্র সম্পর্কে খান কুড়ি গ্রন্থ ও কিছু লুপ্ত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ, সংকলন ও প্রকাশ করেন। **কুলার্ণব, তন্ত্ররাজ, তন্ত্রাভিধান, প্রপঞ্চসার, সারদাতিলক** প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করে তিনি মল্লমাটির সাহিত্য সম্ভারকে করেছেন সুসমৃদ্ধ।

ভারতের ইতিহাসের এবং বৈদিক সংস্কৃতির উপর মৌলিক গবেষণার জন্য পি. এইচ. ডি. উপাধিতে ভূষিত বাঁকুড়ার নতুনচটী নিবাসী **অবিনাশচন্দ্র দাস** (১৮৬৭-১৯৩৬ খ্রীঃ) তাঁর **Rig-Vedic Culture, Rig-Vedic India**-ছাড়াও **সীতা, পলাশবন, কুমারী** প্রভৃতি উপন্যাস এবং নাটক ও জীবনীগ্রন্থ রচয়িতা হিসেবে একটি অবিস্মরণীয় নাম।

হিন্দু জ্যোতিষশাস্ত্র ও বেদ বিশেষজ্ঞ হিসেবে বাঁকুড়া শহরের **অমরনাথ ভট্টাচার্য, 'বিদ্যার্ণব'** উপাধিতে ভূষিত এমনই একটি নাম যিনি মনুসংহিতার টীকাকার ও মহানির্বাণতন্ত্রের ভাষ্যকার রূপে সমধিক প্রসিদ্ধ।

একাধারে অসাধারণ মেধাবী ছাত্র, নির্ভীক দেশপ্রেমিক, দরদী মানব প্রেমিক, সুসাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক বাঁকুড়ার পাঠকপাড়া মহল্লার সুসন্তান **রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়** এক সর্বজনপ্রিয় নাম। জগদীশচন্দ্র বসু ও শিবনাথ শাস্ত্রীর ছাত্র, ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত এই মানুষটি বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রম্যাঁ রলাঁ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে আসেন। **দাসী, মুকুল, প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ, বিশাল ভারত** প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ ও সম্পাদনা করেন। **'India in Bondage'** বইটি প্রকাশ করে তিনি ব্রিটিশ সরকারের কুদৃষ্টিতে পড়েন। **Rammohan and Modern India, A Plea for Religion, Towards Home Rule** প্রভৃতি পুস্তক রচনা ছাড়াও ব্রেইল বর্ণমালার প্রচলন এবং 'সচিত্র বর্ণ পরিচয়' প্রকাশ তাঁর অমর কীর্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাঁকুড়ার দুর্ভিক্ষে সেবামূলক কাজের মাধ্যমে তাঁর হৃদয়বত্তার পরিচয় সুস্পষ্ট। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এবং বাঁকুড়া, বাঁকুড়া এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় যেন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

রামাই পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণ' রচনার মাধ্যমে মল্লভূমে সাহিত্য সাধনার যে বীজটি

অঙ্কুরিত হয়েছিল উত্তরণের পথে বিংশ শতাব্দীতে তা কাব্য, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ নাটক, উপন্যাস, রম্যরচনা, ইতিহাস এবং গবেষণাধর্মী লেখার মাধ্যমে বিশাল মহীরূহের রূপ ধারণ করে রুক্ষ্ম, শুষ্ক, নীরস বাঁকুড়ার লাল মাটির বুকে পরম উপাদেয় সরস ফসল রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই শতকের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য লেখকের পরিচয় দিয়ে সাহিত্য আসর থেকে বিদায় নেবো আমরা।

কথায় বলে সাত রাজার ধন এক মাণিক। আমার শিক্ষক এবং সহকর্মী **মাণিকলাল সিংহ** (১৯১৬-১৯৯৪ খ্রীঃ) যেন মল্লভূমের মাণিক স্বরূপ। প্রায় সাড়ে ছ'ফুট উচ্চ পাতলা ছিপছিপে তামাটে কৃষ্ণবর্ণের এই মানুষটির চোখে ছিল জ্ঞান-তৃষ্ণা, মনে ছিল জ্ঞান-পিপাসা আর মাটির তলে তলিয়ে যাওয়া অজানাকে আবিষ্কার করার অদম্য বাসনা। বিষ্ণুপুর মহকুমার জয়কৃষ্ণপুর গ্রামে জন্ম হলেও কর্মসূত্রে তিনি ছিলেন বিষ্ণুপুরের অধিবাসী। বিষ্ণুপুর উচ্চবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার ফাঁকে ফাঁকে বাঁকুড়া, বর্ধমান, বীরভূম, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর জেলার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে কখনো বাসে চড়ে এবং প্রায় ক্ষেত্রেই পায়ে হেঁটে একটানা চল্লিশ বছর ধরে এই চলমান-গবেষক ঘুরে বেড়িয়েছেন গ্রামবাসীদের ঘরে ঘরে। নানান তথ্য সংগ্রহের পাশাপাশি সংগ্রহ করেছেন হাজার সাতেক প্রাচীন পুঁথি, শতাধিক প্রাচীন মূর্তি এবং কৌতূহলোদ্দীপক বহু পুরাবস্তু সহ তাম্রযুগের ধ্বংসাবশিষ্ট বস্তুসমূহ। জন্ম দিয়েছেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের (বিষ্ণুপুর শাখা) আবার স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশীদার হিসেবে তিনি কারাবাস করেছেন মেদিনীপুর এবং ময়মনসিংহের জেলে। লিখেছেন **দীপশিখা, অনাবশ্যক** (কবিতার বই), **হ্যামার** (নাটক), **শালফুল** (উপন্যাস) আর লিখেছেন গবেষণামূলক গ্রন্থ, যেমন **কাঁসাই সভ্যতা, পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি, রাঢ়ের মন্ত্র যান, রাঢ়ের জাতি কৃষ্টি সংস্কৃতি** (তিন খণ্ড) **সুবর্ণরেখা হইতে ময়ূরাক্ষী** (৬ খণ্ড) প্রভৃতি।

সাহিত্য সাধনা ও গবেষণা কর্মের জন্য পেয়েছেন 'মাইকেল মধুসূদন অ্যাওয়ার্ড', 'রামকুমার ভুয়ালকা অ্যাওয়ার্ড', বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্মানিক ডি. লিট. এবং ভারত সরকার প্রদত্ত জাতীয় শিক্ষকের সম্মান। মাণিক থেকে বিচ্ছুরিত হয় আলো। মল্লভূমের মাণিকলাল সিংহের গবেষণাকর্ম থেকে সদা বিচ্ছুরিত হচ্ছে জ্ঞানের আলো। সেই আলোকে আলোকিত আমরা এবং গবেষকেরা।

একাধারে, কবি, নাট্যকার অভিনেতা, স্বদেশ-প্রেমিক, মানব-প্রেমিক ও তন্ত্রসাধক **চারণ-কবি বৈদ্যনাথ** (১৯৩২-২০০০ খ্রীঃ) ছিলেন বিষ্ণুপুর কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লার মলডাঙা পল্লীর অধিবাসী। **'মল্লভূমের নজরুল'** রূপে আখ্যায়িত জ্যোতিষশাস্ত্র বিশেষজ্ঞ প্রতিবাদী এই সাধক-কবির অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, বুদ্ধিদৃপ্ত বাচনভঙ্গি, কোন বিষয়ের উপর তাৎক্ষণিক বক্তৃতার ক্ষমতা, সহৃদয় ব্যবহার, আবৃত্তি-নিপুণতা, আধ্যাত্মিক-গভীরতা, চণ্ডীপাঠে প্রাণবন্ততা মানুষকে মুগ্ধ না করে পারে না। অত্যন্ত জেদী প্রকৃতির এই মানুষটি দারিদ্র্য, শাসন ও শোষণযন্ত্রের কাছে মাথানত না করে হয়ে উঠেছেন বিদ্রোহী এবং সংগ্রামী। থামেনি কলম। লিখেছেন **'আম-কাঁঠালের ভোজ,' 'জমি দখলের কবিতা', 'খাদ্য দে', 'পোস্টার কবিতা', 'সূর্যশপথ', 'দিগন্তে মৃণাল হৃদয়,' 'রূপশালী মেয়ে', 'দিবারাত্রির কাব্য', 'বাংলা মা'** প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ, **'রক্তসন্ধ্যা', 'রেণু নেই', 'বসন্ত নেই'** উপন্যাস, **'রঙের গোলাম'** নাটক। সম্পাদনা করেছেন **ফল্গু, খড়গ** প্রভৃতি পত্রপত্রিকা। সাংবাদিকতা করেছেন **'স্বাধীনতা'** পত্রিকায়। অভিনয় করেছেন **'লালকমল নীলকমল'** চলচ্চিত্রে। আমি লিখি তোমরাও লেখো। Live and let live'—নীতিতেই তিনি ছিলেন সমধিক বিশ্বাসী। গুণীজন সুলভ

সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে বিরাজ করতেন তিনি—এখানেই তাঁর বিশেষত্ব, এখানেই তাঁর মহত্ত্ব।

মল্লভূম এবং মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুরের সাহিত্য সাধনা প্রসঙ্গে কোন কথা বলতে গেলে আরো যেসব লেখকদের নামোল্লেখ না করলেই নয় তাঁদের মধ্যে **'মল্লভূম বিষ্ণুপুর'** পুস্তিকা-প্রণেতা **শিবদাস ভট্টাচার্য**, **'HISTORY OF BISHNUPUR-RAJ'** গ্রন্থ প্রণেতা **অভয়াপদ মল্লিক**, **'মল্লভূম কাহিনী'**র গ্রন্থকার **গঙ্গাগোবিন্দ রায়**, **'চিত্রে ও গল্পে বিষ্ণুপুর'** পুস্তক রচয়িতা **বিভূতিভূষণ ঘটক**, **'মল্লসংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের রাসোৎসব'** গ্রন্থের গ্রন্থকার **শ্রীগুরুপ্রসাদ সরকার**, **'বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা**, ও **'ভারতের শিল্প সংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটা'**, গ্রন্থ রচয়িতা তথা গবেষক তথা শিক্ষাবিদ **শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত**র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ প্রসঙ্গে আরো একজন বিষ্ণুপুর দরদী মানুষের কথা মনে পড়ে বারংবার। ইনি হলেন **ফকির-নারায়ণ কর্মকার** (জন্ম ৪ঠা চৈত্র ১৩১৩, মৃত্যু ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭) —Son of the soil. মাত্র চতুর্থ শ্রেণীর পুঁথিগত বিদ্যাকে পাথেয় করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বিষ্ণুপুর এয়ারোড্রোম-এর অস্থায়ী কর্মী, বিষ্ণুপুরের কাঁসা পিতলের বাসন ও তামাক ব্যবসায়ী ফকিরনারায়ণ কর্মকার বিষ্ণুপুরবাসীকে এবং বিষ্ণুপুর-প্রেমিক মানুষদের উপহার দিয়েছেন **'আদিমল্ল'**, বীর হাম্বীরের যোদ্ধৃজীবনের উজ্জ্বল আলেখ্য নিয়ে লেখা **'বাংলার শের' 'পতিঘাতিনী সতী'**, **'গুপ্তবৃন্দাবন তীর্থ'**, **'বিজয়ের পথে'**, **'সর্বহারা সাধক'** প্রভৃতি নাটক, **'পুণ্যশ্লোক'**, **'চিরকুমার'**, **'শব্দভেদী' 'শোণিত উৎসব'** চারখানি পৌরাণিক নাটক, **'মায়ের প্রাণ'**, **'বীরের পূজা'** চিত্রনাট্য, **'বিখ্যাত দেবতা মদনমোহন'** এবং **'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী'** নামক সর্বজনপ্রিয় গ্রন্থ। কোলকাতার স্টার থিয়েটারে মঞ্চস্থ **'পতিঘাতিনী সতী'** নাটকটি একদা দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল এবং বিষ্ণুপুরকে গৌরবের মহিমায় মহিমান্বিত করেছিল। এই লেখকের ভাষার প্রাঞ্জলতা, দৃষ্টিকোণের গভীরতা, লেখার মাধ্যমে বিশ্বদরবারে বিষ্ণুপুরকে তুলে ধরার প্রাণান্ত প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ না করে পারেনি। তাঁর এই সব কাজে যিনি সর্বোতভাবে সাহায্য করেছিলেন তিনি হলেন বিষ্ণুপুরের বড় কালীতলা মহল্লা নিবাসী অভিজাত বংশীয় **ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়** —এজন্য তিনিও স্মরণীয় এবং বরণীয়।

পরিশেষে বলি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' (বিষ্ণুপুর শাখা)-এর গর্ভগৃহে সংরক্ষিত মল্লভূমের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর লেখা হাজার সাতেক পুঁথি এ অঞ্চলের সাহিত্য সাধনা ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানচর্চার সাক্ষ্য বহন করে।

শুধু কি সাহিত্য! সঙ্গীত-জগতেও মল্লরাজ্যের অবদান কম নয়।

অধ্যায়-১১৪

রত্নগর্ভা মল্লভূম

সঙ্গীত-সরস্বতীর আরাধনায়

মণীষীগণ বলেন, 'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা, ন পরতরং হি'। অর্থাৎ সঙ্গীতই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, তারপর আর নেই। এই শ্রেষ্ঠ বিদ্যার আরাধনায় বিষ্ণুপুর সুদূর অতীতকাল থেকেই আত্মসমর্পিত। বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের সঙ্গীত, সঙ্গীতের ইতিহাস এবং ঐতিহ্য

প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক কথা বলতে গেলেই মনের পর্দায় রেখায় লেখায় সুর হয়ে ভেসে ওঠে সেই বহুল প্রচলিত প্রবাদ—

গান বাজনা মতিচুর
তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর

মুক্তোদানার মতো ঝক্‌ঝকে অতীব সুস্বাদু আসল মতিচুরের অপমৃত্যু হয়েছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে। কিন্তু বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত আজও সুরে সুরে সুরভিত করছে দিকদিগন্ত, দেশ-দেশান্ত। এখানের সঙ্গীত এবং সঙ্গীতের উৎস নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক গ্রন্থ, নিবন্ধ ও প্রবন্ধ। সঙ্গীত সরস্বতীর আরাধনায় নিবেদিত প্রাণ এতদঞ্চলের সঙ্গীত সাধকগণ ছিলেন আত্মপ্রচার বিমুখ। প্রাক্ বিংশ শতাব্দীর সঙ্গীতজ্ঞগণ রেখে যাননি কোন লিখিত নথিপত্র বা আত্মজীবনী। তাই সাম্প্রতিক কালে রচিত, বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতের ইতিহাস হয়েছে মূলতঃ কিংবদন্তী নির্ভর। এজন্যই গবেষকদের মনে নানা সন্দেহ, মতভেদ এবং মতবিরোধ। সঙ্গীত সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত। ঐক্যমতে পৌঁছানো প্রায় দুঃসাধ্য। মতবিরোধের ঘূর্ণাবর্তে ঘুরপাক না খেয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে সহজ কথায় শোনাব সা রে গা মা পা ধা নি—এই সপ্ত স্বরে বাঁধা সুর ও সঙ্গীতের কথা এবং ইতিকথা। উপনীত হব বিষ্ণুপুর ঘরানার জলসা ঘরে। আস্বাদন করব ধ্রুপদের দিব্য মাধুরিমা, স্বর্গীয় সুষমা।

ইতিহাস বলে মল্লরাজ্য প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই রাঢ়বঙ্গে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার লাভ করে। তুর্কী বিজয়ের পর আর্য-অনার্য সংস্কৃতির মিলনের ফলে অনার্য লৌকিক দেব-দেবীর পাশাপাশি আর্য দেব-দেবীগণও পূজা পেতে থাকেন মল্লভূম সহ রাঢ়বঙ্গের সর্বত্র। পূজা অর্চনায়, যাগযজ্ঞে দেব-দেবীগণের সন্তোষ বিধানার্থে সুরারোপিত মন্ত্রগুলি উচ্চারিত হত গানের সুরে। আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলেই মল্লমাটিতে সঙ্গীত সাধনার সূচনা।

খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের আদিযুগ রূপে চিহ্নিত। এই সময় গীতিধর্মী চর্যাপদ এবং দোঁহাকোষ রচনার মাধ্যমে ধর্মতত্ত্বের অন্তরালে লোকজীবনকে কেন্দ্র করে বাঙালীর ঘরোয়া জীবন সুরের পরশে স্পন্দিত। সেই সুরের পরশে মল্লভূমও হয়েছে হিন্দোলিত। গানের আদলে রচিত চর্যাপদগুলি রাগ প্রধান। "চর্য্যায় ব্যবহৃত রাগের মধ্যে 'পটমঞ্জরী' রাগের সংখ্যা অনেক বেশী। মল্লারী, ভৈরবী, কামোদ, বরাড়ী, গুর্জ্জরী, গৌড়ী, দেশাখ, রামশ্রী, ধানশ্রী মালশ্রী প্রভৃতি রাগগুলির নাম পাওয়া যায়। এইসব রাগরূপের চর্চা, ধারাবাহিকতার মধ্যে দিয়ে চলে এসেছিল। চর্য্যাগানে কয়েকটি বাদ্যের উল্লেখ আছে, যথা—ডমরু, পটহ, বাদল, করটা, কশালা ইত্যাদি।"[১] ৯৫০-১২০০ খ্রীষ্টাব্দের অন্তর্বর্তীকালীন চর্যাপদ রচয়িতাদের মধ্যে বৌদ্ধশিষ্য লুইপাদ বৌদ্ধধর্ম প্রভাবিত মল্লভূমের অধিবাসী ছিলেন বলে কোন কোন গবেষক অভিমত পোষণ করেন। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের লোচন পণ্ডিত ছিলেন শাস্ত্রীয় সংগীত বিশারদ। মল্লভূম ধর্মঠাকুরের পীঠস্থান তথা লীলাভূমি। লুইপাদ প্রবর্তিত ধর্মঠাকুরের পূজারীদের পদবী 'পণ্ডিত'। এতদর্থে লোচন পণ্ডিত মল্লভূমের মানুষ ছিলেন—এরূপ সিদ্ধান্তে আসা যায়। তাছাড়া বিষ্ণুপুর শহরের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত বাসুদেবপুর গ্রামের একটি শিলালিপিতে

১. বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রকৃত ইতিহাস ও রাগরূপের সঠিক পরিচয়, পৃঃ—৮

'লোচনপুর' নামটি পাওয়া গেছে। গবেষক মাণিকলাল সিংহের মতে বাসুদেবপুরের আদি নাম ছিল হয়তো লোচনপুর। লোচনপুর নামটি মল্লভূমে লোচন পণ্ডিতের অস্তিত্বকেই স্বীকৃতি দেয়। ভারতের মার্গ সঙ্গীতের নব্য রূপকার রূপে আখ্যায়িত খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের সাধক কবি জয়দেব গোস্বামী মল্লভূমের কোন সঙ্গীতজ্ঞের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন বলে জানা যায়। খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ (মতান্তরে পঞ্চদশ) শতকের কবি ছাতনার বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ' বা 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' রচনার মাধ্যমে কীর্তন-গানের প্রচলন মল্লরাজ্যে কীর্তন সঙ্গীতের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। ''এঁর রচিত বিখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন গ্রন্থে তেত্রিশটি রাগ ও অনেকগুলি তাল সংযোজিত হয়ে আছে। ...এতগুলি রাগ তালের উপর চর্চার পরিচয় রাগ সংগীতের বিশেষ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার এক বিরাট নিদর্শন হয়ে আছে।''[১] খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুর মহকুমার ময়নাপুর গ্রাম নিবাসী রামাই পণ্ডিতের 'শূন্য পুরাণ' কাব্যের কাব্যরস পরিবেশনার মাধ্যমে লোক-সঙ্গীত চর্চার আর একটি জাজ্বল্য প্রমাণ। এসব ছাড়াও 'বাংলার বাউল', তুষু, ভাদু, ঝুমুর, তর্জা, কথকতা, পাঁচালী, কৃষ্ণযাত্রা, খেউড় জাতীয় সঙ্গীত ও লোক-সঙ্গীতের প্রচলন মল্লভূমের প্রাচীন ঐতিহ্য। লক্ষণীয় বিষয় হল রাগপ্রধান চর্যাপদের সূচনাকাল থেকেই মল্লভূমে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পাশাপাশি অশাস্ত্রীয় সঙ্গীত তথা লোক-সঙ্গীতের প্রচলন মল্লভূমকে সুর-সাধনার তীর্থস্থানে উত্তীর্ণ করেছে।

সুর-সাধনার এই ঐতিহ্যের হাত ধরেই মল্লরাজাদের রাজদরবারে কালক্রমে প্রবেশাধিকার লাভ করেছে সঙ্গীত, অধ্যাত্ম-রস-সমৃদ্ধ মার্গ সঙ্গীত। এ প্রসঙ্গে **'সঙ্গীততীর্থ বিষ্ণুপুর'** গ্রন্থের গ্রন্থকার ফকিরনারায়ণ কর্মকারের অভিমতটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি লিখেছেন, ''খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষের দিকে বিখ্যাত বিষ্ণুপুর নগরের প্রতিষ্ঠা। একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ গতে চতুর্দশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুর রাজবংশের বিয়াল্লিশ সংখ্যক অধিপতি শিবসিংমল্ল ব্রাহ্মণদের মন্ত্র, স্তোত্র প্রভৃতির ভেতর দিয়ে প্রচলিত বিষ্ণুপুরের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিজে তা শিক্ষা করেন এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠান ব্যতীত মানুষের চিত্ত বিনোদনের জন্য বিষ্ণুপুর রাজসভায় সভাগায়কের পদের প্রবর্তন করে সেখানে তাকে স্থান দেন। **সেই থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় বিষ্ণুপুরী সঙ্গীত।**'' (পৃঃ—১৬)

শারদীয়া দুর্গোৎসব উপলক্ষ্যে রাজকুলদেবী মা মৃন্ময়ীর মহাসপ্তমীর মহাপূজার দিন 'নব পত্রিকা' তথা কলাবউ আনয়নের দিব্য অনুষ্ঠানে আটটি ঘট বরণ করে পূজা করার বিধি ছিল। উক্ত অষ্ট কলস বরণ করার সময় বিশুদ্ধ রাগ তালসহ সুসমৃদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণের পাশাপাশি শাস্ত্রীয় রাগ তাল সমন্বিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হত স্বর্গীয় সুষমায়। পূর্বোক্ত অষ্ট কলস ক্রমানুসারে মালব, ললিত, বিভাস, ভৈরব, কোড়া, বরাড়ী, বসন্ত, ধানসী রাগে বরণ করা হত। বিষ্ণুপুর 'মহাপাত্র' পাড়ার 'মহাপাত্র' উপাধিধারী বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এ কাজ সুসম্পন্ন করতেন।

বৈদিক ও পৌরাণিক দেব-দেবীদের পূজা-উপাসনায় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত যেমন প্রাধান্য লাভ করে, অনুরূপভাবে পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে মল্লভূমে ধর্ম, মনসা ও চণ্ডী প্রমুখ দেবদেবীর মাহাত্ম্য বিষয়ক মঙ্গলকাব্যের বহুল প্রচার প্রসার ঘটে। মঙ্গল রাগে গাওয়া হত ঐসব মঙ্গলকাব্য সমূহ। গীতিধর্মী কাব্যগুলির সুর-মূর্ছনা

১. বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রকৃত ইতিহাস ও রাগরূপের সঠিক পরিচয়, পৃঃ—১২

সর্বসাধারণের সঙ্গীত পিপাসা চরিতার্থ করত। সুতরাং মল্লভূমের সঙ্গীত সাধনায় পালাগানমূলক মঙ্গল কাব্যের অবদানও কম নয়।

এদিকে বীর হাম্বীরের রাজত্বকালে (১৫৬৫-১৬২০ খ্রীঃ) বৈষ্ণব পুঁথি লুণ্ঠনের মাধ্যমে বৈষ্ণব সাধক **শ্রীনিবাস আচার্যের** আগমন ও বাসস্থান হয় বিষ্ণুপুর। শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্মের পীঠস্থানে পর্যবসিত হয় বিষ্ণুপুর। শ্রীবৃন্দাবনের ধ্রুবপদাঙ্গ কীর্তনের কলরোলে মুখরিত হয়ে ওঠে মল্লরাজ্য। শিবসিং মল্ল প্রবর্তিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চাও চলতে থাকে বৈদিক ব্রাহ্মণদের ইষ্টনিষ্ঠায়, রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতায়। এই সময় মল্লরাজ্যে বহু পদরচয়িতা, কবি ও সুরকারের আবির্ভাব হয়। মল্লভূমের কবিচন্দ্রের 'শিবমঙ্গল', 'অন্নদা মঙ্গল' ও 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ' এবং জগদ্রাম রায়ের 'অদ্ভুত রামায়ণ' ও 'দুর্গা পঞ্চরাত্রি' এই অঞ্চলের সঙ্গীত সাধনায় এক নতুন মাত্রা এনে দেয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবনে সংরক্ষিত হাজার সাতেক পুঁথির মধ্যে মল্লার, গৌরী, টোড়ী, মারু, ধানশ্রী, দক্ষিণশ্রী, কৌ, কেদার, সিন্ধুড়া প্রভৃতি রাগ-রাগিণী সমৃদ্ধ পুঁথির সংখ্যাও প্রায় শ' দুয়েক। এর মধ্যে ভারতের সাধক, ভক্ত, সুগায়ক ব্রহ্মদাস, সুরদাস, হরিদাস, জানকীদাস, তুলসী দাস, পরমেশ্বর, পরমানন্দ প্রমুখের নাম ও গানের সন্ধান মেলে। সম্রাট আকবরশাহ এবং জাহাঙ্গীরের প্রশস্তিমূলক সঙ্গীতও আছে সযত্নে সংরক্ষিত। এসব দৃষ্টান্ত থেকে সহজেই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মল্লভূমে সঙ্গীত সাধনার এক নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা বজায় ছিল ঐতিহাসিক যুগ থেকে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ছিল স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত। কালক্রমে সুরসাধনার উত্তরণের পথে এসেছে ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ। ধ্রুব শব্দের অভিধানগত অর্থ—নিত্য, সত্য, শাশ্বত। পদ অর্থে চরণ বা গান। নিত্য, সত্য, শাশ্বত পরমেশ্বরের প্রশস্তি মূলক গানই ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ সঙ্গীত।

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ পঞ্চদশ শতকে বৈজুবাওরা, নায়ক গোপাল ধ্রুপদ সঙ্গীতে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন। আমীর খসরু ছিলেন ধ্রুপদী সঙ্গীতের পৃষ্ঠপোষক। আকবরের আমলে তানসেন, রামদাস, হরিদাস প্রমুখ সঙ্গীত সাধকগণের সাধনায় ধ্রুপদ পুষ্টি, পূর্ণতা এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। মোগল সাম্রাজ্যের পতন এবং আওরঙ্গজেবের সঙ্গীত-বিদ্বেষ ও সঙ্গীতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারির ঘটনা পরম্পরায় মোগল দরবারের সঙ্গীত বিশারদগণ বিষ্ণুপুর, বেতিয়া, ত্রিপুরা সহ ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। সঙ্গীতের অন্যতম পীঠস্থান গোয়ালিয়রের মহারাজা মানসিংহ তোমর ছিলেন খ্যাতনামা ধ্রুপদ শিল্পী। আকবরের সভাগায়ক হিন্দুব্রাহ্মণ রামতনু পাঁড়ে মানসিংহের ধ্রুপদকে আরো আরো শ্রীমণ্ডিত এবং সমৃদ্ধ করেন। রামতনু পাঁড়ের সঙ্গীতের অসাধারণত্বে মুগ্ধ হয়ে মহামতি আকবর শাহ তাঁকে 'তানসেন' উপাধিতে ভূষিত করেন। রামতনু পাঁড়ে নামটি বিস্মৃতির অন্তরালে অন্তর্হিত হয় ক্রমশঃ। হিন্দু ব্রাহ্মণ মুসলিম ধর্মাবলম্বনে হয়ে পড়েন মিঞা তানসেন। এই তানসেনের অষ্টম পুরুষ ওস্তাদ **বাহাদুর খাঁ** মল্লরাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের (১৭০২-১৭১২ খ্রীঃ) রাজ্যাভিষেকের বছরই দিল্লী থেকে বিষ্ণুপুর আসেন। আসেন মার্দঙ্গিক ওস্তাদ পীরবক্সও। মহারাজ দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ ছিলেন সুর-সাধক ও সঙ্গীতজ্ঞ। রাজ্যাসক্তি অপেক্ষা সঙ্গীতাসক্তিই ছিল তাঁর মধ্যে প্রবল। সঙ্গীতই ছিল তাঁর ধ্যান, জ্ঞান, জীবন ও জীবনীশক্তি। তাই তৎকালের বাজারে মাসিক ৫০০ টাকা বেতন দিয়েও বাহাদুর খাঁকে বিষ্ণুপুরে আনয়ন করে রাজ্যে সঙ্গীত শিক্ষার

ঢালাও ব্যবস্থা করেন। দরিদ্র ছাত্রদের ভরণ-পোষণেরও ব্যবস্থা করেন তিনি। বাহাদুর খাঁর কৃতী ছাত্রদের মধ্যে 'বিষ্ণুপুরের পাঠকপাড়া মহল্লার অধিবাসী **গদাধর চক্রবর্তী, অনন্তলাল চক্রবর্তী, দ্বারিকানাথ চক্রবর্তী** আর বিষ্ণুপুরের বুড়া ধর্মরাজতলার অধিবাসী **নিতাই নাজির ও বৃন্দাবন নাজির** অন্যতম।' এঁদের মধ্যে গদাধর চক্রবর্তী ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় বিষ্ণুপুরের বাহাদুরগঞ্জ মহল্লা বাহাদুর খাঁয়ের স্মৃতিস্মারক স্বরূপ।

একাধারে সুগায়িকা, নর্তকী এবং লাবণ্যময়ী ললনা লালবাঈয়ের রূপলাবণ্যে রঘুনাথ নিজেকে আত্মাহুতি দিলে মনোদুঃখে বিষ্ণুপুর ছেড়ে চলে যান বাহাদুর খাঁ। বাহাদুর খাঁর অবর্তমানে তাঁর যোগ্য শিষ্য গদাধর চক্রবর্তী বিষ্ণুপুর রাজদরবারের সভাগায়ক ও সঙ্গীতাচার্যের পদে আসীন হন। গদাধর চক্রবর্তীর অকালমৃত্যুতে তাঁর শিষ্য **কৃষ্ণমোহন গোস্বামী** রাজদরবারের শূন্যপদ পূর্ণ করেন। তানসেনের সৃষ্ট "সেনী ঘরানার প্রভাবিত গদাধর চক্রবর্তীর ছাত্র হলেও তিনি ছিলেন মহারাজ শিবসিংমল্ল প্রতিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের নিজস্বতার আদি সঙ্গীতের একজন ভক্ত। তার চর্চাও তিনি করতেন। সঙ্গীতের মধ্যে যেমন ছিল তাঁর সাধকসুলভ ভক্তিনম্র ভাবধারা, সেইমত আবেগ ও নিষ্ঠা। সেই কারণেই তরুণ শিক্ষার্থী **রামশঙ্কর ভট্টাচার্য** মশায় তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।"[১]

রামশঙ্কর কার শিষ্য ছিলেন, এ নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। কারও মতে তিনি গদাধর চক্রবর্তীর শিষ্য, কারও মতে তিনি কৃষ্ণমোহন গোস্বামীর শিষ্য আবার কারও কারও মতে তিনি হলেন আগ্রা মথুরা থেকে আগত কোন পশ্চিম দেশীয় গুরুর শিষ্য। রামশঙ্করের পিতা গদাধর ভট্টাচার্য দ্বিতীয় মল্লরাজা গোপাল সিংহের সভাপণ্ডিত ছিলেন। সেই সূত্রে রাজ দরবারে যাতায়াত ছিল রামশঙ্করের। বিষ্ণুপুর রাজসভায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের জ্ঞানী, গুণী ও সঙ্গীতজ্ঞদের সমাবেশ হত। অসাধারণ স্মৃতিশক্তি সম্পন্ন সঙ্গীত প্রেমিক রামশঙ্কর ছিলেন শ্রুতিধর এবং সুকণ্ঠের অধিকারী। কথিত আছে ছাত্রাবস্থায় তিনি সংস্কৃত সাহিত্যে বিশেষ পাণ্ডিত্য অর্জনের জন্য কাশীবাসী হন। সেখানে তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত সুখশ্রাব্য গান শুনে মোহিত হন তাঁর শিক্ষাগুরু। তিনিই তাঁকে সঙ্গীত সাধনায় উৎসাহিত করেন। সংস্কৃত-শিক্ষাগুরুর উপদেশ মতো তিনি বিষ্ণুপুরে ফিরে এসে সঙ্গীত সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। গান হয়ে ওঠে তাঁর প্রাণ। সুরে সুরে সুরভিত হয় জীবন। সঙ্গীত-সিন্ধু মন্থন করে লাভ করেন সিদ্ধি—জন্ম লাভ করে বিষ্ণুপুর ঘরানা। রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গীত প্রতিভা-প্রসূত বিষ্ণুপুর ঘরানার মধ্যে একাধিক ঘরানার সংমিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে সঙ্গীত বিশারদ ডঃ অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মূল্যবান মন্তব্যটি বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। তিনি লিখেছেন, "বিষ্ণুপুরের মত স্বাধীন রাজ্যের রাজদরবারে নানা গায়কের উপস্থিতি ঘটতেই পারে এবং সেদিক থেকে একথা বলার অবকাশ আছে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতে একাধিক ঘরানা এসে মিশেছিল। বিষ্ণুপুরে প্রচলিত ধ্রুপদ সঙ্গীতকে বলা হয় বিষ্ণুপুর ঘরানার গান, গাইবার ভঙ্গীকে বলি বিষ্ণুপুরী চাল। উত্তর ভারতের কোনো বিশেষ ঘরানা যদি বিষ্ণুপুরের উৎস হতো তাহলে বিষ্ণুপুর ঘরানা না বলে সেনী ঘরানা বা অন্য কোনো ঘরানার নামেই বিষ্ণুপুর সঙ্গীতের নামকরণ হতো। কিন্তু তা হয়নি, কারণ, বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

---

১. সঙ্গীততীর্থ বিষ্ণুপুর, পৃঃ—৩৪

নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। আমরা মনে করি একাধিক ঘরানার সমন্বয়ই বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতকে একটি নতুন রূপ দিতে সাহায্য করেছিল। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত সুনির্দিষ্ট ধারা নিতে পেরেছিল রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের আমল থেকে।"

ঘরানা শব্দটি এসেছে ঘরোয়ানা শব্দ থেকে। কোন বিশিষ্ট ওস্তাদ বা সঙ্গীতজ্ঞের প্রবর্তিত সঙ্গীতধারাটি বংশ পরম্পরায় বা শিষ্য পরম্পরায় অনুসৃত হয়ে কখনো তা ওস্তাদের নামে আবার কখনো তা ওস্তাদের সাধনভূমির নামে পরিচিতি লাভ করে, যেমন—ওস্তাদের নামে তানসেন ঘরানা, ইমদাদখানি ঘরানা, বাদল খাঁ ঘরানা, মৌলাবক্স তবলা ঘরানা আবার সাধনভূমির নামে বিষ্ণুপুর ঘরানা, গোয়ালিয়র ঘরানা, জয়পুর ঘরানা, উদয়পুর ঘরানা, আগ্রা ঘরানা, লক্ষ্ণৌ ঘরানা ইত্যাদি। এভাবেই সঙ্গীতাচার্য রামশঙ্কর প্রবর্তিত বিশিষ্ট সঙ্গীতধারাটি তাঁর বংশ পরম্পরায় এবং শিষ্যপরম্পরায় অনুসৃত হয়ে বিষ্ণুপুর ঘরানা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

সঙ্গীত সাধনায় সিদ্ধিলাভের পর বিষ্ণুপুর ঘরানাকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর বাসস্থান বিষ্ণুপুর মল্লেশ্বর মহল্লায় নিজ বাসভবনে গড়ে তোলেন ধ্রুপদ চর্চার পীঠস্থান। প্রাচীন ভারতের গুরুগৃহে শিক্ষালাভের আদর্শে গঠিত তাঁর শিক্ষায়তনে ছাত্রেরা বিনা বেতনে শিক্ষালাভ করতেন। দরিদ্র এবং দূরাগত ছাত্রগণের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল বিনামূল্যে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা সঙ্গীত জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন তাঁরা হলেন **রামকেশব ভট্টাচার্য** (পুত্র), **ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, দীনবন্ধু গোস্বামী, কেশবলাল চক্রবর্তী যদুভট্ট, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকন্ন মুখোপাধ্যায়** প্রমুখ।

বিষ্ণুপুর রাজসভার সঙ্গীতাচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্য সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীতগুরুই ছিলেন না, ছিলেন সঙ্গীত রচয়িতাও। তাঁর রচিত তাঁর খুবই প্রিয় গানটি হল—

অজ্ঞানতম নিকরে গাঢ়ময়ী পতিতে
জ্ঞান কিঞ্চিত বিতর জগদম্বে॥
কলুষ পূরিত মম কলেবর অশেষ কুৎসিত কর্ম্মতৎপর
স্থিরমতি সংসার জলবিম্বে॥
তব মায়াময় মোহগর্তে অন্ধ অতিশয় নয়ন সত্ত্বে
শর্করা সম বাস বিষয় নিম্বে॥
তব চরণে কভু মননে নাহি ধরে এমন দুর্ম্মতি রামশঙ্করে
কুরু কৃপাময়ী কৃপা অবিলম্বে॥

শোনা যায় 'মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তাঁকে বাড়ি থেকে মল্লেশ্বর মন্দিরে নিয়ে যাবার সময়ে তিনি মৃদুস্বরে এই অসামান্য গানের কয়েকটি কলি গেয়েছিলেন।' তিনি ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ৯২ বছর বয়সে নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। সঙ্গীতাচার্য রামশঙ্কর আজ আর নেই আমাদের মাঝে, কিন্তু তাঁর জীবন ব্যাপী সাধনার উৎকৃষ্ট ফসল বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদের আজ জয় জয়কার। রামশঙ্কর প্রবর্তিত বিষ্ণুপুর ঘরানার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সঙ্গীত বিশারদদের মধ্যে মতৈক্য পরিলক্ষিত হয়। বলা হয়, বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ সহজ, সরল। এতে অত্যন্ত পরিমিত অলংকার প্রয়োগ করা হয়, এই গান আমাদের মধ্যযুগীয় ডাগর-বাণীর ধ্রুপদের কথা মনে করিয়ে দেয়। "বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের সহজ-সরল অথচ ভাবগম্ভীর চাল অনেকটা হিন্দু মন্দিরের প্রার্থনা-সঙ্গীতের মতন। হয়তো বা বৈষ্ণব

সম্প্রদায়ের হাভেলি-সঙ্গীতের অনুরূপ বিষ্ণুপদ গানের প্রভাব থাকতে পারে তাতে।" একটি উদ্ধৃতিতে বলা হচ্ছে, "বিষ্ণুপুরের গায়নভঙ্গি সহজ সরল, অলঙ্কারে ভারাক্রান্ত নয়। রাগের বিশুদ্ধতার দিকেই এই ঘরানার মূল দৃষ্টি। প্রাচীন বন্দিশগুলিই ধ্রুপদগানের প্রাণস্বরূপ বলে মনে করা হয়। প্রতিটি ধ্রুপদ চার তুকের অর্থাৎ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগযুক্ত চারটি তুকের মধ্যেই রাগের পূর্ণ অভিব্যক্তি।"

বিষ্ণুপুর ঘরানার উৎস সন্ধানে ব্রতী হয়ে সঙ্গীতাচার্য সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, "আগে অনেক সাধু মহাত্মা ব্যক্তি ধ্রুপদগান সৃষ্টির পর সেই গান শিক্ষা করে তার আধ্যাত্মিক প্রভাবে আকৃষ্ট হয়ে সুরব্রহ্মের সাধনায় নিমগ্ন হয়ে থাকতেন। যেমন তানসেন গুরু হরিদাস স্বামী, ব্রহ্মানন্দ স্বামী, স্বামী সত্যানন্দ, যুগরাজ, সুরদাস প্রভৃতি। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ পরিব্রাজক সাধুও থাকতেন।

তার মধ্যে **স্বামী সত্যানন্দই** আমাদের ঘরানার ধ্রুপদ গানের প্রতিষ্ঠাকর্ত্তা। ...তাঁর মুখে ধ্রুপদগান শুনে রাগরূপের অপূর্ব রচনাশৈলী ও ভাষার ভাবে মুগ্ধ হয়ে এই গানের প্রতি অতিশয় আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। নূতন পদ্ধতির এই গান শুনবার ব্যবস্থা করেন রাজ দরবারে। সেই আসরে রাজা প্রভৃতি সমগ্র শ্রোতারা সাধুর গানে অতিশয় আনন্দ পান। সকলের একান্ত অনুরোধে সাধু কিছুদিন সেখানে থেকে যান। আমাদের সেই পূর্বপুরুষ সবিনয়ে আগ্রহ প্রকাশ করায় স্বামী সত্যানন্দ—অর্থাৎ ঐ সাধু আনন্দ সহকারে কয়েকটি আদি রাগের ধ্রুপদ শিক্ষা দেন। গানগুলির সবই **নায়ক গোপাল** ও **বৈজুবাওরার** রচিত ছিল। ...

এরপর থেকেই অল্প অল্প করে ধ্রুপদ গানের চর্চা এবং প্রচার প্রদ্যুম্নপুরে আমাদের বংশের গায়কদের দ্বারা হতে থাকে।" তিনি আরও লিখেছেন, "তারপর বিষ্ণুপুর যখন অচিরে নগরের মত গড়ে উঠল এবং রাজধানী নামে পরিচিত হল, তখন থেকে নানান দেশের মানুষ পুরী যাত্রার পথে বিশ্রাম মানসে এখানে আসতে থাকে। ... সেই সময় থেকে যে সব সঙ্গীতজ্ঞ, সঙ্গীতসাধক-সাধু-সন্ত বিষ্ণুপুরে বিশ্রাম ইচ্ছায় আসতেন, তাঁদের উপস্থিতির সংবাদ পেয়ে আমাদের ঘরানার পূর্ব পুরুষরা তাঁদেরকে শ্রদ্ধাসহকারে গৃহে আনয়ন করে অতি আগ্রহের সহিত অনুরোধ জানিয়ে দু'চার দিন রেখে দিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ধ্রুপদাদি গান শিখে নিতেন। তাঁরাও সানন্দে বিতরণ করে যেতেন। এইভাবে গানের চর্চা ও সংগ্রহ বৃদ্ধি পেতে থাকে।"

বিষ্ণুপুরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রাচীনত্ব প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "বিষ্ণুপুরে কয়েকশ' বছর আগে থাকতে গীত, বাদ্য, ও নৃত্যচর্চার আর এক সাক্ষ্য এখনও বিদ্যমান। তা হ'ল প্রাচীন মন্দির। যে সময় হতে মন্দির নির্মিত হয়েছে, তখন থেকেই মন্দির-গাত্রে উৎকীর্ণ হয়েছে গীতরত, সরোদ, বীণা, সুরমণ্ডল, সেতার, মৃদঙ্গ, খোল প্রভৃতি বাদ্যরত এবং নৃত্যরত বহু মূর্ত্তি। তখন এ সবের চর্চা বহুল পরিমাণে ছিল বলেই এর প্রভাব তখনকার রাজাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল, মন্দির গাত্রে ওই সব শিল্পমূর্তির মধ্যে দিয়ে সুসজ্জিত, সুন্দর ও স্থায়ী করে রাখবার জন্য। একথাও সহজেই মনে আসে, মন্দির নির্মাণকারী শিল্পীদেরও সঙ্গীতের ওই সকল বস্তুর উপর বহুল পরিমাণে দর্শন ও শ্রবণ অভিজ্ঞতা নিশ্চয়ই ছিল। নতুবা এই সকল মূর্ত্তিকে তারা এমনভাবে প্রাণবন্ত ও সুন্দর করে ফুটিয়ে তুলতে পারত না এবং তেমন প্রেরণাও আসত না। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত চর্চার প্রাচীন পরিচয়ে এটিও একটি বড় রকমের প্রমাণ।"

'বিষ্ণুপুর ঘরাণা' পুস্তকের লেখক তথা গবেষক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 'বিষ্ণুপুর ঘরানার' উৎস প্রসঙ্গে লিখেছেন, "আগ্রা মথুরা অঞ্চলের কোন সঙ্গীতগুণীর কাছে প্রাপ্ত সঙ্গীত সম্পদ থেকেই বিষ্ণুপুর ঘরাণার উৎপত্তি। এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করলে বিষ্ণুপুর ঘরাণার উৎপত্তি বিষয়ে সব দিকে সামঞ্জস্য থাকে। বাহাদুর খাঁ, গদাধর চক্রবর্তী প্রভৃতিকে বিষ্ণুপুর ঘরাণার উৎসমূলে স্থাপন করলে সমস্ত বিষয়েই অসঙ্গতি ও প্রমাদের সম্মুখীন হ'তে হয়।

গত পৌনে দু'শ বছরের বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতচর্চার বিষয়ে অনুধাবন করলে দেখা যায়, সেখানে একটি বিশিষ্ট সঙ্গীতধারা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে। বিষ্ণুপুরের এই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সঙ্গীতধারা "বিষ্ণুপুর ঘরানা" নামে সুপরিচিত। এই সঙ্গীতধারার প্রবর্তন হয় আচার্য রামশঙ্করের সময় থেকে এবং তাঁরই দ্বারা। আমাদের আলোচ্য পর্বের আদিযুগে তিনি ছিলেন বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতক্ষেত্রে বিরাট পুরুষ। বিষ্ণুপুরে এ বিষয়ে তাঁকে সম্প্রদায় প্রবর্তনকর্তারূপে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হবে না। কারণ, তিনি সত্যই এক সঙ্গীতসম্প্রদায় প্রবর্তন করেছিলেন কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিষ্য গঠন করে।" (বিষ্ণুপুর ঘরাণা, পৃঃ—১০৯-১১০)

মোদ্দা কথা "বিষ্ণুপুর ঘরাণার বেশ কয়েকটি সুর নিজস্ব রূপ ও কাঠামো নিয়ে অন্যান্য ঘরাণার প্রচলিত সুর থেকে আংশিক পরিবর্তিত হয়েছে। হিন্দুস্থানী পদ্ধতির বিভিন্ন সুরে স্বর প্রয়োগের নির্দিষ্ট ধারাকে এখানকার সঙ্গীতশিল্পীরা সম্পূর্ণ মেনে না নিয়ে সুরের আঙ্গিক-পরিবর্তন এনেছিলেন। সুদীর্ঘকাল সুরসাধনার ফলস্বরূপ বৈচিত্র্যের এই বিস্ময়কর স্বাক্ষর তাঁরা রেখে যেতে পেরেছেন তাঁদের সঙ্গীতের মাধ্যমে। বিষ্ণুপুর ঘরাণার যে সমস্ত রাগে এই পরিবর্তিত রূপ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাদের মধ্যে ভৈরব, পূরবী, বিভাস, আশাবরী, ছায়ানট, রামকেলী, কামোদ, শঙ্করা, বৃন্দাবনীসারংগ, ভীমপলশ্রী, বসন্ত অন্যতম। সুরের নবরূপায়ণেব স্রষ্টা বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতসাধকরা আরও একটি বিশেষ গুণের অধিকারী ছিলেন। এঁরা অনেকেই ছিলেন সার্থক গীতিকার। অসংখ্য গান রচনা করে পরিবর্তিত সুরের মাধ্যমে নতুন রূপ প্রদান করেছেন এবং সুরাশ্রিত সঙ্গীতকে তাঁরা স্বরলিপির সাহায্যে স্থায়িত্বের আসনে বসিয়েছেন। সুরকে লিপিবদ্ধ করতে হলে স্বরলিপির প্রয়োজন। এঁরা ছিলেন স্বরলিপিরও উদ্ভাবক।" (বিষ্ণুপুর মেলা স্মরণিকা—১৯৯৫)

বিষ্ণুপুর ঘরানা প্রসঙ্গে ইতি টেনে এবার মল্লভূমের সেইসব গুণী সন্তানদের সংক্ষিপ্ত জীবনীর উপর আলোকপাত করব, যাঁরা তাঁদের নিরলস প্রচেষ্টায় বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বিশ্বদরবারের আঙ্গিনায়।

রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের তৃতীয় পুত্র **রামকেশব ভট্টাচার্য** (১৮০৯-১৮৫০ খ্রীঃ) ধ্রুপদী সঙ্গীতে বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেন। সঙ্গীতে তাঁর অসাধারণ প্রসিদ্ধির কথা শুনে কুচবিহারের মহারাজা তাঁকে রাজসভায় সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য আহ্বান জানান এবং তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত সুরলহরীতে এতই মোহিত হন যে তাঁকে পাঁচ হাজার রৌপ্য মুদ্রা ও একটি হাতি উপহার দিয়ে সম্মানিত করেন বলে কথিত আছে। কোলকাতার স্বনামধন্য ধনী ব্যক্তি সাতুবাবু ও লাটুবাবুদের সভাগায়ক ছিলেন রামকেশব। রামকেশবের সুর মূর্ছনায় পরিতৃপ্ত লাটুবাবু সাতুবাবু কোলকাতা মহানগরীতে একটি মনোরম বাড়ি উপহার দিয়ে তাঁকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেন। মাত্র ৪১/৪২ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে সঙ্গীত জগতের বিরাট সম্ভাবনাময়, এস্রাজ ও তাউজ যন্ত্র বিশারদ এই ব্যক্তি-মানুষটি অকালে ঝরে পড়েন মৃত্যুর বিস্তীর্ণ আঙ্গিনায়। সঙ্গীত সাধকদের জন্য রেখে

যান কিছু স্বরচিত গান। যেমন—

ভীষ্ম জননী ভাগীরথী গঙ্গে
তারণ কারণ ভব ভয় বারণ
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গে॥
হরিদ্বারবতী অতি দ্রুতগতি
জহ্নু মুনির ধ্যান ভঙ্গে
সাগর সন্ততি তাদের মা দিতে গতি
মিলিত সাগর সঙ্গে॥

জন্মসূত্রে চন্দ্রকোনার মানুষ সুরসাধক **ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর** (১৮১৩-১৮৯৩ খ্রীঃ) কর্মক্ষেত্র ছিল কোলকাতা। কোলকাতার পাথুরিয়াঘাটায় রাজা **যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর** পরিবারের আজীবন সভাগায়ক পদে অভিষিক্ত ছিলেন। যতীন্দ্রমোহনের ভ্রাতা প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের তিনি ছিলেন সঙ্গীতগুরু। শৌরীন্দ্রীমোহন প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গসঙ্গীত বিদ্যালয়' ও 'বেঙ্গল অ্যাকাডেমি অফ্ মিউজিক' বিদ্যালয় দুটির প্রধান শিক্ষকের পদ অলংকৃত করে সঙ্গীত শিক্ষাদানে ব্রতী থাকেন জীবনভোর। 'সঙ্গীত-সার' 'কণ্ঠ কৌমুদী', 'ঐকতানিক স্বরলিপি', 'যন্ত্র ক্ষেত্র দীপিকা', ও 'আশুরঞ্জনীতত্ত্ব', সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থরচনা, বাংলা ও হিন্দী ধ্রুপদ রচনা, অক্ষরমাত্রিক স্বরলিপি রচনা, ঐকতান বাদন এবং সঙ্গীত বিষয়ক মাসিক পত্রিকা প্রণয়ন তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। এঁর রচিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্তুতিবাচক সঙ্গীতটি বেশ সমাদর লাভ করে। দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপির স্রষ্টা হিসেবে সঙ্গীত জগতে তিনি অমরত্বের আলোকে উদ্ভাসিত।

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কর্মক্ষেত্র ছিল কোলকাতা, পক্ষান্তরে তাঁরই সমসাময়িক কালের শিল্পী **দীনবন্ধু গোস্বামীর** শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র ছিল বিষ্ণুপুর। ধ্রুপদ, ধামার, ঠুমরী জাতীয় সঙ্গীতে তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী।

বিষ্ণুপুরের কৃতী সন্তান **কেশবলাল চক্রবর্তী** কোলকাতার ধনাঢ্য ব্যক্তি তারকনাথ প্রামাণিকের সঙ্গীতসভার সভাগায়ক থাকাকালীন অবস্থায় বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রচার-প্রসারে ছিলেন নিবেদিত প্রাণ।

এবার প্রসঙ্গ সঙ্গীতের যাদুকর **যদু ভট্ট** (১৮৪০-১৮৮৩ খ্রীঃ)। **'বাংলার তানসেন'** উপাধিতে ভূষিত ক্ষণজন্মা এই মানুষটি ছিলেন বিষ্ণুপুর কাদাকুলি বিশ্বাসপাড়া মহল্লার অধিবাসী। শৈশবে ইনি পিতা মধুসূদন ভট্টের নিকট তারের যন্ত্রে তালিম নেন। কৈশোরে বিষ্ণুপুর ঘরানার জনক রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের কাছে কণ্ঠ-সঙ্গীতের কারুকার্য আয়ত্ব করেন। যৌবনে প্রখ্যাত ওস্তাদ কোলকাতার গঙ্গানারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের পদপ্রান্তে বসে সুর সাধনায় মগ্ন হয়ে সিদ্ধিলাভ করেন এবং গমক-যুক্ত খাণ্ডার বাণীর গায়করূপে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। "তবে একথা স্বীকার করতে বাধা নেই তাঁর কৈশোরের অবচেতন মনে বিষ্ণুপুর ঘরানার সহজ সরল প্রকৃতি বিশিষ্ট এবং ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ সঙ্গীতের যে গভীর ছাপ পড়েছিল তা ডাগর-বানের ধ্রুপদেই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাঁর জীবনে এর প্রভাব ছিল সুদূরপ্রসারী। পরবর্তীকালে তাঁর গানে গমক-রেরকের সঙ্গে রাগের ভাব ও ভাষার মধ্যে একটি মিলনসেতু রচিত হয়েছিল। গুণীজনের মতে সম্ভবতঃ এ কারণেই রবীন্দ্রনাথের কাছে যদু ভট্টের কণ্ঠসঙ্গীত এত সমাদৃত হয়েছিল। সঙ্গীত রচয়িতা যদু ভট্টের কয়েকটি গানের সুর নিয়ে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে 'ভাঙা গান' রচনা করেছেন।" (শিক্ষা-সেমিনার স্মরণিকা, পৃঃ—৪৭-৪৮)

অত্যন্ত চঞ্চল প্রকৃতির এই মানুষটি সুরের পরশে হয়েছেন শান্ত, সমাহিত। সুরের মায়াজাল বিস্তার করে আপন করেছেন কবিগুরুকে, বশীভূত করেছেন সঙ্গীত রসিকদের। দিগন্ত প্রসারী সুর-ঝংকারে দিগ্বিজয় করেছেন। মাত্র ৪৩ বছরের জীবনে 'পঞ্চকোট, ত্রিপুরা, বর্দ্ধমান, বিষ্ণুপুর, কুচিয়াকোল প্রভৃতি বহু রাজসভার সঙ্গীতাচার্যের আসন অলঙ্কৃত করেছিলেন।' পঞ্চকোটের রাজা যদুভট্টের সুরেলা কণ্ঠস্বরের সুরমাধুরীতে মোহিত হয়ে তাঁকে '**রঙ্গনাথ**' আখ্যায় আখ্যায়িত করেন। ত্রিপুরাতে অবস্থানকালে যদুভট্ট একদিন আপন বাসায় সুর-সাধনায় মত্ত। এমন সময় রাজকীয় জুড়িগাড়িতে চড়ে রাজপথ দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিলেন ত্রিপুরাধিপতি বীরভদ্র মাণিক্য। পথরোধ করল যদুভট্টের সুরেলা সঙ্গীত। মহারাজ গাড়ি থামিয়ে দেওয়ানজীকে অদেশ দেন সঙ্গীতশিল্পীর খোঁজ খবর নিয়ে তাঁকে সসম্মানে রাজসভায় নিয়ে যেতে। রাজ-আদেশ প্রতিপালিত হয় অক্ষরে অক্ষরে। ত্রিপুরার রাজসভায় সঙ্গীত সুধা বর্ষণ করে মহারাজের হৃদয় হরণ করেন যদুভট্ট। লোকে বলল, '**তুমি যদু নও যাদু।**' তরুণ শিল্পীর সুর-সাধনাব কথা পৌঁছে যায় তৎকালীন ঢাকার নবাবের কানে। নবাবের দরবারে গান শোনানোর আহ্বান আসে ত্রিপুরা বিজয়ের পরই। ত্রিপুরা থেকে তিনি চলে যান ঢাকায়। সপারিষদ নবাব বাহাদুর তাঁর গানের যাদুমন্ত্রে বশীভূত, মুগ্ধ, উচ্ছ্বসিত। মনঃক্ষুন্ন হলেন নবাব দরবারের সরোদ বাদক **সাদিক আলি**। বলেছিলেন, ''কণ্ঠসঙ্গীত সাধনা সহজ, সিদ্ধিলাভও হয় অনায়াসে। পক্ষান্তরে যন্ত্রসঙ্গীত জটিল, সিদ্ধিলাভ সুদূরপরাহত।'' যদুভট্ট বলেছিলেন, ''নবাব বাহাদুর, দয়া করে আমাকে একটা সরোদ দিন, আর দিন মাত্র পনের দিন সময়।'' তা-র-প-র ....?

নবাব বাহাদুর নিজে সরোদ বাজাতেন। নিজের সরোদটি তিনি তুলে দিলেন সুধাবর্ষী সুরসাধকের হাতে। তারপর ঠিক পনের দিনের মাথায় সরোদ বাজানোর সভা বসল নবাব দরবারে। ''প্রথমে দরবারী কানাড়ায় একঘণ্টা ধরে আলাপ, পরে গৎ একঘণ্টা ধরে। তাতে বিভিন্ন বৈচিত্র্যের ওপর তানালঙ্কার ও ছন্দের ক্রিয়া এমন অভিনবভাবে দেখান, যার তুলনা বিরল। সাদিক আলির সারা জীবনের সাধনা তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়।'' শৈশবে পিতার কাছে তারের যন্ত্রে তালিম নেওয়ার ফল ফলল এতদিনে।

বিষ্ণুপুরের যদুভট্টর জীবনের এরকম অনেক ঘটনা রূপকথার রঙে ঢঙে উদ্ভাসিত আজ। দ্বিতীয় গোপাল সিংহ (১৮০৯-১৮৭৬ খ্রীঃ) তখন বিষ্ণুপুরের রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত। সঙ্গীতে বিষ্ণুপুরের ভারতজোড়া নাম শুনে অজ্ঞাত পরিচয় হিন্দুস্থানী এক ওস্তাদ রাজদরবারে এসে গোপাল সিংহকে এক বিস্ময়কর প্রস্তাব দেন। বলেন, 'আমি আপনার জলসাঘরে সুরের ঝংকার তুলে বন-বিষ্ণুপুরের এক বুনো হরিণকে নিয়ে আসব সঙ্গীত বাসরে, পরিয়ে দেব আমার গলার মালা। তারপর পালিয়ে যাবে হরিণ। আপনার সভাগায়কদের মধ্যে এমন কেউ সঙ্গীত বিশারদ আছেন কি যিনি ঐ হরিণকে সুরের আকর্ষণে রাজসভায় ফিরিয়ে এনে খুলে নিতে পারবেন সেই মালা? যদি না পারেন তাহলে জয়পত্র লিখে দিতে হবে আমাকে।' অসম্ভব প্রস্তাব শুনে চিন্তায় পড়লেন মহামান্য মহারাজ। গানের টানে হরিণকে রাজসভায় আনা অবাস্তব ভেবে তিনি তাঁকে গাইতে অনুমতি দিলেন। ওস্তাদজী তানপুরা সহযোগে কণ্ঠে সুর চড়ালেন। বাতাসের হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হতে হতে রাজপ্রাসাদ ভেদ করে সুর ছড়িয়ে পড়ল বনমর্মরে। সময় বয়ে গেল নিঃশব্দে। গান চলল সশব্দে। যথাসময়ে সঙ্গীতাসরে হাজির হল এক বুনো হরিণ। ওস্তাদজী তাঁকে স্বীয় কণ্ঠস্থিত মালা পরাতে উদ্যত হলে রাজা গোপাল সিংহ ওস্তাদকে নিবৃত্ত করে নিজের রত্নহার পরিয়ে দেন হরিণের গলায়।

থেমে যায় গান। পালিয়ে যায় হরিণ। এবার হরিণকে ফিরিয়ে এনে হার খুলে নেওয়ার দায়িত্ব বিষ্ণুপুরের সভাগায়কদের। রাজার মান রক্ষা করতে ডাক পড়ল সঙ্গীত জগতের প্রবাদ-পুরুষ যদু ভট্টের। পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা শুনে ছোট্ট মন্তব্য করেন তিনি, 'এত বড় গায়ক বিষ্ণুপুরে নেই। আপনি হরিণকে ফিরিয়ে এনে মহারাজের রত্নহার উদ্ধার করুন। 'জয়পত্র' নিয়ে খুশী মনে বিদায় হন।' উল্লসিত ওস্তাদ সুরের আকর্ষণে পুনরায় ফিরিয়ে আনেন সেই হরিণকে, কিন্তু দুরন্ত চঞ্চল বুনো হরিণের কণ্ঠ থেকে কিছুতেই খুলতে পারেননি সেই রত্নহার। কাছে এসেও ধরা দেয় না চপল হরিণ। প্রাণান্ত চেষ্টার পর ক্ষান্ত হন তিনি। এবার গান ধরেন যদুভট্ট। যদুভট্টের সুরের স্পন্দনে সম্বিত হারায় হরিণ। মহারাজ তাঁর রত্নহারটি হরিণের গলা থেকে খুলে নিয়ে পরিয়ে দেন সঙ্গীতের যাদুকর যদুভট্টের গলায়। বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্য রক্ষা করেন বিষ্ণুপুরের গৌরব যদুভট্ট। লোকে বলল, 'তুমি যদু নও যাদু।' গুণগ্রাহী মহলে 'বাংলার তানসেন' আখ্যায় ভূষিত হলেন তিনি।

যদুভট্টকে নিয়ে আর একটি কিংবদন্তী নিম্নরূপ। তাঁর গুরু রামশঙ্কর তখন বৃদ্ধ এবং অসুস্থ। রামশঙ্করের সঙ্গীতের সুখ্যাতি শুনে দূর দূরান্ত থেকে অনেক গুণিজন আসতেন তাঁর গান শুনতে। একদিনের কথা জনৈক মুসলমান ওস্তাদ দূর থেকে এসেছেন তাঁর গান শোনার অভিপ্রায়ে। শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনিচ্ছা সত্ত্বেও ওস্তাদের পীড়াপীড়িতে গান ধরলেন সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর। কিন্তু জমল না আসর। বিরক্ত হয়ে সঙ্গীতের আসরে জরিদার নাগরা ছুঁড়ে দিয়ে চলে গেলেন উগ্র ওস্তাদ। গুরুর অপমানটা শেল হয়ে বিঁধল সেখানে উপস্থিত যদুভট্টের বুকে। নাগরা জুতোখানা ঘৃণাভরে তুলে রাখেন সযত্নে। ওস্তাদের খোঁজ নিয়ে জানলেন, তিনি এক দেশীয় রাজার সভাগায়ক। অত্যন্ত দাম্ভিক প্রকৃতির এই ওস্তাদ রাত্রি-নিশীথে সঙ্গীত-সাধনা করেন সংগোপনে। নিজের অধিগত বিদ্যা কাউকে শেখাবার মানসিকতা নেই তাঁর। এজন্যই এই গোপনীয়তা এবং সাবধানতা। যদুভট্ট সেখানে গিয়ে অতি সংগোপনে রাত্রি-গভীরে শোনেন তাঁর গান। সুর-সাধনার গভীর তত্ত্ব করায়ত্ব করেন অনায়াসে। স্মরণ রাখা দরকার যদুভট্ট ছিলেন অত্যন্ত শ্রুতিধর এবং স্মৃতিধর। যা একবার শুনতেন তাই টেপ করে নিতেন স্মৃতির টেপরেকর্ডে। ওস্তাদের ওস্তাদী আয়ত্ব করে সেখানের রাজসভায় গিয়ে নিজেকে উজাড় করে শুনিয়ে দেন সেই গান। ওস্তাদের ওস্তাদীও হার মানে তাঁর সুর-লালিত্যে। রাজসভার সকলেই তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বিস্ময়ে বিস্ফারিত নেত্রে সেই মুসলমান ওস্তাদ তখন তরুণ শিল্পীকে প্রশ্ন করেন, 'কেমন করে শিখলে আমার গান? কি তোমার পরিচয়?' প্রথম প্রশ্নটির উত্তরে নীরব থেকে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে সরব হলেন যদুভট্ট। জরিদার নাগরা জুতোটি বের করে দিয়ে বলেছিলেন, 'সেদিন আপনি যাঁর গানের আসরে এই জুতো ছুঁড়ে যাঁকে অপমানিত করেছিলেন আমি তাঁরই এক নগণ্য শিষ্য। তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভার সিন্ধুবৎ বিশালত্বের কাছে আমি বিন্দুবৎ।' এর বেশী বলতে হয়নি যদুভট্টকে। নিজের ভুল স্বীকার করে রামশঙ্করের কাছে ক্ষমা চেয়ে একটি পত্র লিখে দিয়েছিলেন যদুভট্টের হাতে। যদুভট্ট সেই পত্রটি উপহার দিয়েছিলেন গুরুকে। তাঁর এই অসামান্য কৃতিত্বে গর্বিত রামশঙ্কর সেদিন অশ্রুসজল আঁখিতে আশীর্বাদ করেছিলেন শিষ্যকে।

এসব কথা বিশ্বাস করলে সত্য, নয়তো গল্প। সে যাই হোক, রামশঙ্করের সর্বাধিক যশস্বী শিষ্য যদুভট্ট কিন্তু অল্প ছিলেন না আদৌ। যদুভট্টের যখন তের বছর বয়স

তখন মারা যান রামশঙ্কর। পনের বছর বয়সে ভাগ্যান্বেষণে যদুভট্ট যান গুণীবরণের মহাতীর্থ-কোলকাতা। অল্পদিনেই মহানগরীতে ছড়িয়ে পড়ে মহাগায়কের সুখ্যাতি। সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যদুভট্টের সুর-মাধুর্যে বিশেষভাবে প্রভাবিত হন এবং তাঁর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। **'বন্দে মাতরম সঙ্গীতের সার্থক সুরকার যদুভট্ট।** মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একান্ত ইচ্ছায় এবং অনুরোধে তিনি কবিগুরুর সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত হন। 'আজু বহত সুগন্ধ পবন সুমন্দ মধুর বসন্ত মেঁ ...' যদুভট্টের এই বিখ্যাত ধ্রুপদটির সুর ও তালের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন 'আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে ...।' **কবি তাঁর সঙ্গীতগুরু যদুভট্টের সঠিক মূল্যায়ন করতে গিয়ে লিখেছেন, "তিনি (যদুভট্ট) ওস্তাদ জাতের চেয়ে ছিলেন অনেক বড়। তাঁকে গাইয়ে বলে বর্ণনা করলে খাটো করা হয়। তাঁর ছিল প্রতিভা অর্থাৎ সঙ্গীত তাঁর চিত্তের মধ্যে রূপ ধারণ করত। তাঁর রচিত গানের মধ্যে যে বিশিষ্টতা ছিল, তা অন্য কোন হিন্দুস্থানী গানে পাওয়া যায় না। যদুভট্টের মত সঙ্গীতভাবুক আধুনিক ভারতে আর কেউ জন্মেছেন কি না সন্দেহ। ওস্তাদ ছাঁচে ঢেলে তৈরী হতে পারে। যদুভট্ট বিধাতার স্বহস্ত রচিত।"** বিধাতার স্বহস্ত রচিত ধ্রুপদ সঙ্গীতের দিকপাল তথা ভারতের সঙ্গীতাকাশের দীপ্তিমান সূর্য যদুভট্ট মাত্র ৪৩ বছর বয়সে শাশ্বত মৃত্যুর আহ্বানে অকালে চলে যান অমরধামে। হ্যাঁ, অমর ধামে। তাঁর অমরত্বকে মহিমান্বিত করার মহৎ উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপুর মেলাতে বছরে বছরে নির্মিত হয় যদুভট্ট স্মারক মঞ্চ। তাঁর অক্ষয় স্মৃতিকে সদা জাগরুক রাখার অভিপ্রায়ে বর্তমানে বিষ্ণুপুর স্টেডিয়ামের পূর্ব দিকে নির্মিত হচ্ছে **'যদুভট্ট মঞ্চ'। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' গানটিতে যদুভট্টই প্রথম সুরারোপ করেন।**

বিষ্ণুপুরের কথকতা ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত-সাধক বংশের সন্তান **অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়** (১৮৩২-১৮৯৬ খ্রীঃ) প্রথম জীবনে কথকতা অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন। পরবর্তীকালে পিতা গঙ্গানারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত-সাধনায় আকৃষ্ট হন। সঙ্গীতের প্রতি অসীম অনুরাগ ও সহজাত প্রতিভার গুণে তিনি অল্প সময়েই সাধনায় সিদ্ধকাম হয়েছিলেন। তাঁর অসাধারণ সঙ্গীত প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে মল্লরাজা দ্বিতীয় গোপাল সিংহ তাঁকে **'সঙ্গীত কেশরী'** আখ্যায় ভূষিত করে রাজসভার সঙ্গীতাচার্যের স্বীকৃতি দেন। গোপাল সিংহের দুই পুত্র **রামকৃষ্ণ সিংহদেব** ও **রামকিশোর সিংহদেব** অনন্তলালকে সঙ্গীতগুরু হিসেবে বরণ করেন। গোপাল সিংহের দেহান্তরের পর রামকৃষ্ণ সিংহদেব বিষ্ণুপুরের রাজা হন। তিনি বিষ্ণুপুর ঘরানার দ্রুত প্রসারের উদ্দেশ্যে বিষ্ণুপুরে একটি সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তাঁর গুরু অনন্তলালকে বিদ্যালয়ের আচার্য পদে সম্মানিত করেন। অনন্তলাল সেই গুরুদায়িত্ব পালন করেন অত্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে। তাঁর সঙ্গীতনিষ্ঠায় প্রসন্ন হয়ে তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তাঁকে বৃত্তি দিয়ে সম্মানিত করেন। অনন্তলালের সুর সাধনার ফল হিসেবে বিষ্ণুপুরের বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারে সঙ্গীত সাধনার জোয়ার আসে এবং বিষ্ণুপুরে গড়ে ওঠে এক বিশাল সঙ্গীত-সাধক গোষ্ঠী। তাঁর প্রথিতযশাঃ ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন ভারত বিখ্যাত **সঙ্গীতজ্ঞ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী** এবং তিন পুত্র **সঙ্গীত-রত্নাকর রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীত-সম্রাট গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়** ও **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।** এছাড়া সাধকশিল্পী

অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সঙ্গীতাচার্য হারাধন চক্রবর্তী, বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী, রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কেশবলাল কর, কালিচরণ শাঁখারী, হারাধন দাশগুপ্ত, প্রসন্নকুমার দাশগুপ্ত, নিত্যানন্দ মোদক বিশেষ উল্লেখ্য। একাধারে সঙ্গীত সাধনা, সঙ্গীত পরিবেশনা, সঙ্গীত রচনা ও শিক্ষাদানে রত অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরানার ধারক ও বাহক। এতদর্থে তিনি স্মরণীয় এবং বরণীয়।

সঙ্গীত-শাস্ত্রে বহুমুখী প্রতিভায় ভাস্বর ভারত-বিখ্যাত-সুরকার **রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী** ছিলেন প্রখ্যাত মৃদঙ্গবাদক জগৎচাঁদ গোস্বামীর সুসন্তান। নিরলস সাধনার ফলে শৈশবের রুক্ষ্ম কণ্ঠস্বরকে উত্তরকালে সুকণ্ঠে রূপান্তরিত করে তিনি এমনই একজন সুকণ্ঠ গায়কে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন যে তাঁর গান শোনার জন্য শ্রোতৃবর্গ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতেন। তাঁর সুরেলা গলার স্বাদ আস্বাদন করে মহর্ষি **দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর** অভিভূত হন এবং তাঁকে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তাঁর প্রতিভার সুষ্ঠু বিকাশ ও প্রসিদ্ধির সুযোগ করে দেন। কবিগুরু **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** তাঁর অসামান্য প্রতিভায় মুগ্ধ ও বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী তাঁর সঙ্গীত-মুখর কর্মজীবনে কোলকাতাস্থ **'ভারত সঙ্গীত'** প্রতিষ্ঠানের আচার্য, কাশিমবাজারে মহারাজ **মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী** মহাশয়ের সঙ্গীত-সভার সভাগায়ক এবং তাঁরই প্রতিষ্ঠিত বহরমপুর সঙ্গীত বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছাড়াও মুক্তাগাছার রাজসভায় সভাগায়কের পদ অলংকৃত করেন।

বিষ্ণুপুর ঘরানার পাশাপাশি তিনি রেওয়া, বেতিয়া প্রভৃতি ঘরানাতেও ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। কথিত আছে, জনৈক ভৈরবী বাঈজীর নিকট তিনি টপ্পা শিখেছিলেন। শোরি মিঞার টপ্পা শেখার উদ্দেশ্যে তিনি সারা উত্তর ভারত চষে বেড়িয়েছিলেন। "রবীন্দ্রনাথের টপ্পা-অঙ্গের গানগুলি রাধিকাপ্রসাদের গায়কীতে বসান। **রাধিকাপ্রসাদকে বাঙ্গালা-টপ্পার জনক বলা যায়।** হিন্দি টপ্পাকে বাংলা ভাষার ভাব রসে সিঞ্চিত করে তিনি এক অপূর্ব লালিত্য সৃষ্টি করেন সঙ্গীত জগতে। রাধিকা প্রসাদ গোস্বামীর একখানি রেকর্ড এখনও শুনা যায়—'সোহাগে মৃণালভুজে, বাঁধিল শ্রীরাধা শ্যামে ...' এই গানখানি শুনলেই বুঝা যায়, কি মনোমুগ্ধকর এই গান।"[১]

পণ্ডিত ভাতখণ্ডে মহাগুণী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে **'সঙ্গীতের মহামহোপাধ্যায়'** উপাধিতে ভূষিত করেন। এতাদৃশ ভাতখণ্ডেজীও রাধিকাপ্রসাদের কাছে ধ্রুপদ শিক্ষার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং রাধিকাপ্রসাদকে একটি উচ্চ প্রশংসাপত্র লিখে দেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর শুধু যে কেবল গানের সংগ্রহ ও রাগরাগিণীর রূপ জ্ঞান ছিল তাই নয়, তিনি গানের মধ্যে একটা বিশেষ রস সঞ্চার করতে পারতেন। **সেটা ওস্তাদের চেয়ে কিছু বেশী।**"

বহু প্রথিতযশাঃ সঙ্গীত শিক্ষকের জন্মদাতা রাধিকা গোস্বামী সম্বন্ধে **সুকুমার রায়** লিখেছেন, "সে সময় তাঁর সমকক্ষ সঙ্গীতজ্ঞ কোলকাতায় ছিল না। উত্তর ভারতীয় সঙ্গীত, বিশেষ করে ধ্রুপদে তিনি বিশিষ্ট আসন অধিকার করেছিলেন। সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনে তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তাঁকে কেন্দ্র করে বাংলা গানের নব রূপায়ণ ঘটেছিল। ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মহাপ্রয়াণের বৎসর লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে তাঁর বিশিষ্ট সঙ্গীতকলার ঐতিহাসিক স্বাক্ষর তিনি রেখে আসেন।" 'ভ্রাম্যমাণ' গ্রন্থের গ্রন্থকার দিলীপকুমার রায় কোলকাতার একটি সঙ্গীত সভার প্রেক্ষাপটে রাধিকা গোস্বামীর

১. মল্লসংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের রাসোৎসব, গুরুপ্রসাদ সরকার পৃঃ—৭১

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন "সেদিন সন্ধ্যায় কলিকাতার বিখ্যাত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মশায় গেয়েছিলেন। বাংলার নাম ইনিই রেখেছিলেন। এঁর মৃত্যুতে বাংলা আজ মুকুটহীন হয়েছে, একথা নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে।"

একান্ত নিরহঙ্কার, নির্লোভ, উদারচেতা, নির্জনতা-প্রিয় সঙ্গীত-ভারতীর সুসন্তান **রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়** ছিলেন কণ্ঠসঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীতে সমান পারদর্শী। বাদ্যযন্ত্রের সুর-ঝংকারে আর কণ্ঠসঙ্গীতের স্বর্গীয় সুষমায় তিনি সঙ্গীতপ্রেমিকদের হৃদয় হরণ করেছেন। **সরোজিনী নাইডু** তাঁর গান শুনে মন্তব্য করেছিলেন—'শুনে আশা মিটল না। মনে হচ্ছে সারা রাতভোর শুনি।' গীতসম্রাট **গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়** ও সঙ্গীতরত্নাকর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুশোচনা করেছেন, **'ওঁর বিস্ময়কর প্রতিভার অর্ধেকও আমরা পাইনি।'** একটানা এগার বছর নিরলস সাধনার ফলে তিনি যে সাধনৈশ্বর্য আহরণ করেন তাতে মুগ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁকে বিশ্বভারতীর সঙ্গীতাচার্যের পদ অলংকৃত করার জন্য পুনঃপুনঃ আহ্বান জানান। বরোদার মহারাজা শ্রেষ্ঠ বাদ্যযন্ত্র বিশারদের সম্মান দিয়ে তাঁকে নিয়ে যেতে চান নিজ রাজসভায়। অবশ্য কারো আশাই পূর্ণ হয় না। ধরা দেননি তিনি কাউকে। অথচ খুবই সহজ-স্বচ্ছন্দে বাঁধা পড়লেন কুচিয়াকোলের রাজা যোগেন্দ্রনাথ সিংহদেবের বিনম্র শ্রদ্ধা ভালবাসায়। তাঁর গুণমুগ্ধ রাজা তাঁকে **'সঙ্গীত নায়ক'** আখ্যায় অভিহিত করেন, শিল্পীকে সানন্দে দান করেন বনগেলিয়া নামক জঙ্গলমহল। যুবরাজ বসন্তকুমার সিংহদেব তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করে শিক্ষান্তে সুগায়কে পরিণত হন। গুরু শিষ্যের মধ্যে গড়ে ওঠে সুমধুর আত্মিক সম্পর্ক। বসন্তকুমারের অকাল মৃত্যুতে শোকাহত গুরুর মনে আসে চাঞ্চল্য। এই সময় নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খানের সাদর আমন্ত্রণে তিনি চলে যান সেখানে। নরেন্দ্রলাল খান তাঁকে গুরুবরণ করে শুরু করেন সঙ্গীত-সাধনা। ইতিমধ্যে ব্রিটিশ শাসিত ভারতে শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলন। স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লবী সন্দেহে ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে পাঠিয়ে দেয় মেদিনীপুরের জেলে। জেল কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে শিষ্য-বৎসল গুরু সুরবাহার যন্ত্র নিয়ে দেখা করতে যান জেলখানায়। সুরবাহারে তুলেন সুরের ঝংকার। সঙ্গীতের সুরে সাপের মতোই আকৃষ্ট হন জেল কর্তৃপক্ষ। স্তম্ভিত হয়ে শুনতে থাকেন গান। জেলখানা হয়ে ওঠে আনন্দধাম। প্রাণ জুড়ানো সুর-সলিলে অবগাহন করেন কারাবন্দী আসামী কয়েদী এবং কর্তৃপক্ষ।

সেতার, সুরবাহার, এসরাজ, বীণা, জলতরঙ্গ, নৌকাতরঙ্গ, ন্যাসতরঙ্গ, মৃদঙ্গ ও তবলা বিশারদ **প্রসন্ন ওস্তাদ** ছিলেন বড় মাপের ঠুমরী, টপ্পা, খেয়াল, ও ধ্রুপদ গাইয়ে। ইমন রাগে তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী এবং অতুলনীয়। 'সঙ্গীত মঞ্জরী', 'এসরাজ তরঙ্গ', 'মৃদঙ্গ দর্পণ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি তিনি সুর তাল সমন্বিত বহু সঙ্গীতও রচনা করেন। তাঁর একটি জনপ্রিয় ভক্তিগীতি হল—

তুমি ভুবন মোহিনী তারা
কেন ভীষণ রূপ ধরি মগন রণরঙ্গে?
তুমি নিখিল বিশ্বমাতা
সমর সাজে কি সুত সঙ্গে॥
সুজন দুর্জন মার সকাশে কি ভিন্ন?
তবে রোষ কর কি প্রসঙ্গে?
জ্ঞান হীন তব সুত রামপ্রসন্নে
চাও গো করুণা অপাঙ্গে॥

সঙ্গীত এবং যন্ত্রসঙ্গীতের যাদুকর প্রসন্ন ওস্তাদ মাত্র ৫৭ বছর বয়সে বাংলা ১৩৬৬ সালের ১৭ই বৈশাখ পৃথিবী ছেড়ে চলে যান, রেখে যান এক বিরাট শূন্যতা।

সেই শূন্যতাকে পূর্ণতা দান করেন তাঁরই যোগ্য ভাই **গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়।** এখন গল্প-ছলে বলি গোপেশ্বরবাবুর কথা। ছোট বেলায় পড়েছি ক্ষীরের পুতুল, ননীর পুতুলের কথা। আর বড় হয়ে শুনলাম, সুরে সুরে ভরপুর সুরের পুতুল গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা। স্রষ্টা যেন সুরের উপাদানে গড়েছিলেন তাঁকে। তাইতো তিনি 'সুরের পুতুল'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন **'স্বরসরস্বতী'**, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর **'সঙ্গীত নায়ক'**, টিকারারাজ **'অদ্বিতীয় গায়ক'**, ময়ূরভঞ্জের রাজা **'গীত সম্রাট'**, মীর্জাপুর সঙ্গীত সম্মেলন **'সঙ্গীত ভাস্কর'**, কুচিয়াকোলের রাজা **'সুররাজ'**, পুরুলিয়া সঙ্গীত সভা **'সুরসাধক'**, নাড়াজোলের রাজা **'তানরাজ'**। কেউ বললেন, **'ডক্টর অফ্ মিউজিক'**, কেউ বললেন, সঙ্গীতের **'জীবন্ত অভিধান'**। বিশ্বভারতী দিলেন সর্বোচ্চ সম্মান **'দেশিকোত্তম'**। গুণবাচক বিশেষণগুলো উপাধিপুষ্পের মালা হয়ে দুলতে থাকলো গোপেশ্বর বাবুর গলায়। কিন্তু কেন এই মালা পরানো? কি ছিল তাঁর মধ্যে? দেখতে শুনতেই বা ছিলেন কেমন?

শান্ত, সৌম্য, ধীর, স্থির, ভাবগম্ভীর। উদারচেতা। 'Live and let live' আদর্শে বিশ্বাসী। আমি গাই, তোমরাও গাও—সঙ্গীত-সরস্বতীর উপাসনা চলতে থাকুক দেশ জুড়ে। বিংশ শতকের চারের দশকের কথা। তখন অল ইণ্ডিয়া রেডিও কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত রাগ-রাগিণীতে গাইতে হত শিল্পীদের। সঙ্গীত জগতের রথী মহারথীরা পড়তেন বিপদে। জানা নেই সেই সব রাগ-রাগিণী। ছুটে আসতেন বিষ্ণুপুরের গোপেশ্বর বাবুর শাঁখারীবাজারের বাড়িতে। গোপেশ্বর বাবু হয়তো তখন তেল মেখে গামছা পরে স্নান করতে যাবেন। সেই অবস্থাতেই তিনি শিল্পীকে রাগ-রাগিণীর নির্দেশ এবং তালিম দিয়েছেন অনায়াসে। কী অসাধারণ প্রতিভা! পুস্তক নির্ভর বিদ্যা ছিল না তাঁর। তাঁর কণ্ঠে সুর, স্মৃতিতে রাগ-রাগিণী সহ হাজার তিনেক কেউ বলেন হাজার পাঁচেক গান ক্যাসেট করা ছিল। বিষ্ণুপুরের শিক্ষাবিদ এবং সঙ্গীতজ্ঞ গুরুপ্রসাদ সরকার তাই তাঁকে বলেছেন, **(সঙ্গীতের) 'জীবন্ত অভিধান'**। কত বড় কথা!

তা 'জীবন্ত অভিধান' হলেন কেমন করে? অভ্যাস। 'অভ্যাসাৎ জায়তে সিদ্ধিঃ।' জন্মাবধি একটানা তেইশ বছরের নিরলস সাধনায় এসেছিল এই সিদ্ধি। শুধু অভ্যাস, শুধু সাধনা করলেই কি আসে সিদ্ধি? আমরাও কি অভ্যাস এবং সাধনার হাত ধরে গোপেশ্বর বাবু হতে পারব? বোধ হয় না। কাঁচা লোহাকে ঘষলে ধার হবে, কিন্তু ইস্পাতের ধারের মতো হবে না। আসল কথা, কিছু থাকতে হবে, ভেতরে কিছু থাকতে হবে। গোপেশ্বর বাবুর সেটা ছিল। কি ছিল? দেবদত্ত মেধা ও প্রতিভা। দেবতায় আপত্তি থাকলে বলুন সহজাত অথবা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত। মাত্র দশ বছরের গোপেশ্বর। গেছেন কোলকাতায়। গান গাইলেন রথী মহারথীদের আসরে। এমন গাইলেন যে তিনি সকলের আলোচনার বস্তু হয়ে উঠলেন। এই সভায় ছিলেন একজন ইউরোপীয়ান। তিনি তাঁর গান শুনে এতোই মোহিত হলেন যে মিনার্ভা থিয়েটার মঞ্চ ভাড়া নিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে গোপেশ্বরকে নিয়ে একটা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠান করেন। গান শুনে মহারাজা দুর্গাচরণ লাহার মতো আরো অনেকেই তাঁর বশীভূত হলেন। **মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর তো বলেই ফেললেন, "এই সামান্য বয়সে আশ্চর্য দক্ষতা। ওকে না দেখে চোখ বন্ধ করে গান শুনলে মনে হবে কোন উচ্চমানের বিশিষ্ট শিল্পী সঙ্গীত পরিবেশন করছেন।"**

কোলকাতা জয় করে ফিরে এলেন জন্মভূমি বিষ্ণুপুরে। তারপর একটানা তের বছরের সাধনা। সিদ্ধি লাভ করে বেরিয়ে পড়লেন দিগ্বিজয়ে। দিগ্বিজয়ী হলেন। বর্ষিত হল পূর্বোল্লিখিত উপাধি সমূহ। সুরভিত উপাধি কুসুমের মালা পরে ঠাকুর হয়ে বসে রইলেন না হাত গুটিয়ে। হাতে কলম তুলে নিলেন। লিখলেন, 'গীত দর্পণ', 'গীতমালা', 'গীত প্রবেশিকা', 'সঙ্গীত চন্দ্রিকা', 'সঙ্গীত লহরী' নামক সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ। এর মধ্যে ধ্রুপদ, খেয়াল সবই আছে। আর লিখলেন সুর তাল সহ বহু গান। লক্ষ্ণৌয়ের মরিস কলেজে তাঁর গ্রন্থ পাঠ্য-পুস্তকের স্থান পেয়েছে। 'সঙ্গীত সুধা' নামক হিন্দী পত্রিকা তাঁর বহুগান ছেপে ধন্য হয়েছে।

একটা কথা যথাস্থানে বলা হয়নি। না বললে অঙ্গহানি হবে। তাই বলেই ফেলি। **হীরাবাঈ বরদেকর** খুব বড় নামজাদা গাইয়ে। ঠুম্‌রি গাইছেন এক আসরে। গোপেশ্বরবাবু এক কোণে বসে বসে স্বরলিপি লিখে নিচ্ছেন। গানের ব্রেক কষে হীরাবাঈ বললেন, 'ওস্তাদজী এসব গানের স্বরলিপি ঠিক ঠিক হয় না।" কিন্তু ঠিক হয়েছিল। এই ঘটনার কিছুদিন পর এক সঙ্গীত প্রতিযোগিতার আসরে জনা পনের শিক্ষার্থী সুর তাল সহ একেবারে নির্ভুলভাবে গেয়েছিলেন ঐ গান। হীরাবাঈ বিচারকের আসনে উপস্থিত ছিলেন। সব দেখে শুনে গোপেশ্বর বাবুকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "এসব আপনার কাজ। আপনার সামনে কোন খানদানি চিজ্ আর বের করব না।" গোপেশ্বর বাবুকে বড় ভয় হীরাবাঈয়ের। হবেই না বা কেন? কেমন সব গুরুর শিষ্য দেখতে হবে তো। ঘরেই ছিলেন পিতা সঙ্গীত-কেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সঙ্গীত-সাধক রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘরে বসেই পেয়ে গেলেন তাবৎ তাবৎ গুরু। তারপর প্রখ্যাত গায়ক **নুলোগোপাল ও গুরুপ্রসাদ মিশ্র** শিখালেন খেয়াল গান। ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা, ঠুমরী, খেয়াল সব কিছুতেই ওস্তাদ। ভৈরবী এবং ছায়ানট রাগে দেখা গেল অতুলনীয় ওস্তাদী। একটানা ঊনত্রিশ বছর বর্ধমানের রাজাবাহাদুর বিজয়চাঁদ মহাতাবের সভাগায়ক, পরবর্তীকালে কোলকাতা 'সঙ্গীত সংঘের' প্রধান অধ্যক্ষ এবং বিষ্ণুপুর রামশরণ মিউজিক কলেজের প্রথম অধ্যক্ষের পদ অলংকৃত করেন। এসব করতে করতে ৮৫টি বসন্ত সরে যায় জীবন থেকে। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুর শাশ্বত আহ্বানে নিভে যায় জীবনদীপ। পরপারে চলে যান গোপেশ্বর বাবু, রেখে যান বহু গুণমুগ্ধ ব্যক্তি এবং অসংখ্য কৃতী ছাত্র-ছাত্রী। ছাত্র পরম্পরায় আজও বেঁচে আছেন তিনি, বেঁচে আছে তাঁর সুরসাধনা, বিষ্ণুপুর-ঘরানা।

বিষ্ণুপুর সঙ্গীত ঘরানার সুবর্ণযুগের আর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক রূপে চিহ্নিত **সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** ছিলেন তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতোই কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শী। সেতার, সুরবাহার, এসরাজ, পাখোয়াজ, ব্যাঞ্জো, জলতরঙ্গ, নৌকাতরঙ্গ, ন্যাসতরঙ্গ, রবাব, তবলা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রগুলি তাঁর আনুগত্য মেনে নিয়ে তাঁরই ইচ্ছেমত সুর-তরঙ্গে মুখরিত হয়ে উঠত। "সুরবাহার যন্ত্রে দক্ষতা ছিল তাঁর অতি উচ্চ স্তরের। ধ্রুপদাঙ্গের রুদ্রতাল, ব্রহ্মতাল, বীরপঞ্চক, সাত্তি, মোহন, দৌবাহার লক্ষ্মী প্রভৃতি তালকে ধরে উক্ত যন্ত্রে তা পরম সুন্দরভাবে বাজাতে পারতেন। এরূপ ভাবে লুপ্তপ্রায় তালগুলির উপর অধিকারের পরিচয় আমি অন্য কোথাও দেখিনি।" সুরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে এই কথাগুলি বলেছেন বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। আর রবীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—**'তুমি স্বরলিপির যাদুকর'**।

কিন্তু কেন বলেছিলেন?

বয়সে ছোট সুরেনকে একদিন রবীন্দ্রনাথ বললেন, "সুরেন, আমার কতকগুলো গানের স্বরলিপি তোমাকে তৈরী করে দিতে হবে।" সুরেন্দ্রনাথ বলেন "শুভস্য শীঘ্রম্।" কাজ শুরু হয়েছিল। অতি অল্প সময়েই খান কয়েক গানের নির্ভুল স্বরলিপি তৈরী হল। বিস্ময়াবিষ্ট কবিগুরু বলেছিলেন, 'তুমি স্বরলিপির যাদুকর।' রবীন্দ্রনাথ এবং সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন খুবই অন্তরঙ্গ। রবি ঠাকুরের কয়েক শ গানের স্বরলিপি রচনা করেছেন সুরেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের 'জয় তব বিচিত্র-আনন্দ', 'তোমারি মধুর রূপে' প্রভৃতি ধ্রুপদাঙ্গের গানগুলি প্রায় সময়ই তাঁর জিহ্বাতরঙ্গে সুরের পরশে নৃত্য করত আনমনে। টেগোর ইন্‌স্টিটিউটের পক্ষ থেকে তাঁকে **'রবীন্দ্র তত্ত্বাচার্য'** উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। সঙ্গীতময় কর্মজীবনের প্রথম দিকে বর্ধমান রাজদরবারের সভাগায়ক, অতঃপর কোলকাতার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর পরিবারের সভাগায়ক এবং পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে এবং অনুরোধে আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গীতাচার্যের পদ এবং ব্রাহ্ম গার্লস স্কুলের সঙ্গীত শিক্ষকের পদ অলংকৃত করেন। ব্যক্তি উদ্যোগে 'সঙ্গীত ভারতী' বিদ্যালয় স্থাপন ও পরিচালনার পাশাপাশি 'গীত পরিচয়' 'এসরাজ মুকুল', 'নবপদ্ধতি সেতার শিক্ষা' প্রভৃতি গ্রন্থ এবং বহুগানও তিনি রচনা করেন। শেষ জীবনে বিষ্ণুপুরে ফিরে এসে বিষ্ণুপুরের রামশরণ মিউজিক কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ এবং পরে অধ্যক্ষ পদে আসীন থাকেন। শুধু রবীন্দ্র সঙ্গীত নয়, অতুল প্রসাদের অনেক গানের স্বরলিপিকারও তিনি।

পিতা অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সুর-সাধনার সূচনা হয়েছিল। পিতার মৃত্যুতে গুরুর অভাব পূরণ করেছিলেন সহোদর দুই ভ্রাতা পূর্বোল্লিখিত রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। রামানুজ লক্ষ্মণের মতোই ভ্রাতৃভক্ত ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। পিতা ও ভ্রাতাদ্বয়ের মতোই বহুগুণে গুণান্বিত সুরেন্দ্রনাথ শেষ জীবনে **'পদ্মশ্রী'** উপাধিতে ভূষিত হয়ে বিষ্ণুপুরের গৌরব বৃদ্ধি করে ৮৫ বছর বয়সে চলে যান পরলোকে।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাস। মাত্র ৪৫ বছর বয়সে বাংলা তথা ভারতের সঙ্গীতকাশের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হঠাৎ খসে পড়ল। দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, **'সুরের তাজমহল** চলে গেল।' কথায় বলে, 'জহুরী চেনে মণি, গুণী চেনে গুণী।' যাঁর সম্পর্কে কথাটা বলা হল তিনি হলেন প্রফেসর **জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী**। বিষ্ণুপুরের গেনু গুঁসাই। 'সুরের তাজমহল' মাত্র এই দুটি শব্দ প্রয়োগে গেনু গুঁসাই সম্পর্কে এত বড় কথা বলা হয়েছে যে এরপর আর কিছু না বললেও চলে। কিন্তু গুণিজনের গুণগান করতে ভাল লাগে। দু-চার কথা না বলে তৃপ্তি পাচ্ছি না। বলার তাগিদেই বলি দু-চার কথা। গেনু বাবু থাকতেন কোলকাতায়। পূজার সময় আসতেন বিষ্ণুপুরে। খবরটা মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ত শহরময়—'গেনু গুঁসাই আইছে রে!' গেনু গুঁসাই-এর গানের আসরে এত ভিড় হত যে তিল ধারণের জায়গা থাকত না। শ্রীনিবাস আচার্যের উত্তর পুরুষ জ্ঞান গোস্বামী যখন গান ধরতেন তখন মনে হত "বৈষ্ণবের পীঠভূমিতে সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেন অবতীর্ণ আর সামনে উপবিষ্ট শ্রোতৃবৃন্দ যেন কৃষ্ণপ্রেমে আবিষ্ট এক একটি শ্রীরাধিকা।" অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে উৎসারিত হত 'দুর্গা দুখহারিণী', 'মা, মা বলে ডাকে কালী', 'বাজিল শ্যামের বাঁশী', 'বাজে মৃদঙ্গবীণা', 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা', 'মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়', 'পিউ পিউ বিরহী পাপিয়া বোলে' প্রভৃতি তাঁর প্রিয় গানগুলি। এ ছাড়া নজরুলের

'শূন্য এ বুকে পাখী মোর আয় ফিরে আয় ফিরে আয়' এই বিখ্যাত গানটি তিনি যে মর্মস্পর্শী বেদনাবিধুর সুরবিন্যাসের মাধ্যমে পরিবেশন করেন তা অতুলনীয়। আজকের কোন গায়ক সেই বেদনাবোধকে স্পর্শ করতে পারেন বলে মনে হয় না। এখানেই তাঁর কৃতিত্ব, বিশেষত্ব এবং অমরত্ব।

গানের টানে নজরুল বার কয়েক বিষ্ণুপুরে এসেছেন। জ্ঞান গোঁসাই-এর সাথে তাঁর বিশেষ অন্তরঙ্গতা ছিল। 'শ্মশানে জাগিছে শ্যামা', 'শ্যামা মায়ের কোলে চড়ে' এই দুটি গান কবি নজরুল প্রথমে কৃষ্ণচন্দ্র দেকে দিয়ে রেকর্ড করান। কিন্তু মনঃপূত হয় না। ঐ রেকর্ড বাতিল করে গান দুটি জ্ঞান গোঁসাইকে দিয়ে রেকর্ড করিয়ে পরিতৃপ্ত হন। **'নজরুলের গানকে তিনি জাতে উঠিয়েছেন।'—মন্তব্য করেছেন সঙ্গীতজ্ঞ গুরুপ্রসাদ সরকার।**

গায়কের 'মন বলে তুমি আছ ভগবান' গানটি শান্ত স্নিগ্ধ ভক্তিরস সমৃদ্ধ, 'বাজিল বাঁশের বাঁশী' গানটি একটি অত্যুৎকৃষ্ট টপ্পা, 'বাজে মৃদঙ্গ বীণা' গানটির গাম্ভীর্য এবং গায়নভঙ্গী অতুলনীয়, 'ছন্দে ছন্দে নাচে নন্দদুলাল' গানটি হৃদয় মথিত করা সুরের হিন্দোলে স্পন্দিত। মেগাফোন কোম্পানীর একটি রেকর্ডে সংকলিত এইসব গানগুলি সম্পর্কে ১৩৮৩ সালের ১৯শে আষাঢ় সংখ্যার দেশ পত্রিকাতে বলা হয়েছে, "জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর দুর্লভ মেঘমন্দ্রিত কণ্ঠের ১২ খানি সুনির্বাচিত গান আমাদের মুগ্ধ করেছে। গানগুলির মধ্যে রয়েছে ভৈরবী, বৃন্দাবনীসারং, নটমল্লার, দেশ, দুর্গা, আড়ানা, দরবারী কানাড়া, ছায়ানট, ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, বাগেশ্রী এবং ললিত।........এই গানগুলির মধ্যে জ্ঞানবাবু একটি আর্টকে বাংলা গানে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। **সেটি হচ্ছে বাংলা ভজন**। স্বর্গত পালুসকারের ভজনে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু এই ভজনগুলির ঐশ্বর্য্য আর এক ধরনের। এক অতুলনীয় রাগ সঙ্গীতের গাম্ভীর্য এবং শুদ্ধতা এগুলিকে অনন্য-সাধারণ করে তুলেছে। বিশুদ্ধ রাগ সঙ্গীতে বাংলা গান যে কত মনোহারিত্বের সঞ্চার করতে পারে, তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন রেখে গেছেন জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ।"

সঙ্গীতজ্ঞ দিলীপকুমার রায় লিখেছেন, "জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ গোস্বামীর গান শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। অকুণ্ঠেই বলব তাঁর সমকক্ষ কণ্ঠ বাংলা দেশে এখনো আমি আর শুনিনি।.......গানে মিষ্টতা, মাধুর্য্য, ভঙ্গি বৈশিষ্ট্য ও ওজস, চারটি প্রধান গুণই *প্রধানতঃ মনকে মুগ্ধ করে। জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদের সবচেয়ে বড় সম্পদ ছিল তাঁর ওজস।...... জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদের অলোকসামান্য গীতি প্রতিভা ও ওজঃশক্তি শ্রোতার মনকে পুলকিত করে তুলত মুহূর্তে।"*

সঙ্গীত ও সাধক পরিবারের এই সুসন্তান বাল্য বয়েসেই তানপুরাতে নিখুঁত সুর বেঁধে মন জয় করেছিলেন কাকা রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর। সঙ্গীত সাধনার গুরু হিসেবে *তিনি পেয়েছেন কাকা রাধিকাপ্রসাদকে। কাকার মৃত্যুর পর সেই স্থান পূরণ করেছেন* রাধিকাপ্রসাদের বন্ধু পাথুরিয়াঘাটার **ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ**। জ্ঞান গোস্বামীর প্রতিষ্ঠার মূলে ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষের অবদান অসামান্য। পরবর্তীকালে **বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্কর, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী** এবং ভারতবিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ **ফৈয়াজ খাঁ** তাঁকে আরো আরো সমৃদ্ধ করেছেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিষ্ণুপুরে কংগ্রেসের এক বিরাট সভা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ফৈয়াজ খাঁ জ্ঞান গোস্বামীর গান শুনে অভিভূত হয়ে ভূয়সী প্রশংসা করেন। সেই সূত্র ধরেই তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠে গুরু শিষ্যের মধুর সম্পর্ক। জ্ঞান গোঁসাই রবীন্দ্রনাথকে বলতেন কাকা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপস্থিতিতে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীকে **'প্রফেসর'** উপাধিতে ভূষিত করা হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, বিষ্ণুদিগম্বরের ছাত্রদের মধ্যে অনুষ্ঠিত এক সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় জ্ঞান গোঁসাই নারায়ণ ব্যাসকে হারিয়ে স্বর্ণপদক লাভ করেন। ভীষ্মদের চট্টোপাধ্যায়ের মতো বাংলা গানে মাধুর্য সৃষ্টিকারী 'কিন্নরকণ্ঠ' এই গায়ক "শুধু ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি রাগসঙ্গীতই নয়, মাতৃসঙ্গীত, কীর্তন, ভজন প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের সঙ্গীতই গাইতে পারতেন সমান দক্ষতার সঙ্গে। ফলে সঙ্গীততীর্থ বিষ্ণুপুরের সঞ্চয়ের ভাণ্ডার তিনি বহু দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করে গেছেন।"[১] তাইতো তিনি, "বাঙ্গালী শ্রোতার পিয়াসী হৃদয়ে এক বিশিষ্ট মহিমময় সিংহাসনে বিরাজমান। বাংলাদেশের সঙ্গীত জগতে জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ বা জ্ঞান গোঁসাই একটি জনগণমন চিত্ত হরণকারী নাম তথা এক প্রবাদ পুরুষ।"[২] এজন্যই তার অকাল মৃত্যুতে শোকাভিভূত গোপেশ্বর বাবু অস্ফুটে উচ্চারণ করেছিলেন, **'একটা সুরের তাজমহল চলে গেল।'**

অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৭-১৯৬২ খ্রীঃ)—উপনিষদের আরুণির মতো গুরুভক্তি পরায়ণ, আত্মপ্রচারবিমুখ এই মানুষটি ছিলেন আগ্রা ঘরানার ছাত্র। অহোরাত্র গুরু সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায় গুরু তসদ্দুক হোসেন খাঁ সাহেবকে স্বগৃহে রেখে অনন্যচিত্তে গুরুসেবা করে ইনি লাভ করেন গুরুকৃপা এবং অধিক বয়সে সঙ্গীত-সাধনা শুরু করেও অতি অল্প সময়েই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে হয়ে ওঠেন সঙ্গীত-বেত্তা তথা সঙ্গীতাচার্য। এঁর গুরুভক্তির নমুনা স্বরূপ দু-চারটি কথা স্মরণ করা যেতে পারে। গুরুদেব অসময়ে আম খাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তৎকালে তিনি বহু কষ্টে কোলকাতা থেকে সুস্বাদু আম আনিয়ে পূজ্যপাদ গুরুর মনোবাসনা পূর্ণ করেন। পিক্ ফেলার প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে পিক্‌দানির অভাবে ইনি স্বীয় দক্ষিণহস্তে গুরুদেবের পিক্ গ্রহণ করতেন। গুরুদেবের নির্দেশমত ইনি বিনা পারিশ্রমিকে আজীবন সঙ্গীত-শিক্ষা দান করেন সঙ্গীত-শিক্ষার্থীদের। তাঁর উল্লেখযোগ্য ছাত্রদের মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্র দিগবসন বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও জীবন বন্দ্যোপাধ্যায়, মদনমোহন রায়, নীলমণি সিংহ, চিত্তরঞ্জন পাত্র এবং বাঁকুড়া শহর নিবাসী, 'ভুয়ালকা পুরস্কার' প্রাপ্ত শ্রীগোকুল নাগ মহাশয়গণের নাম রয়েছে পুরোভাগে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য গোকুলবাবুর অন্যতম শিষ্যদ্বয় হলেন তাঁর পুত্র মণিলাল নাগ মহাশয় এবং আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সেতার বাদক শ্রদ্ধেয় রবিশঙ্কর মহাশয়।

১৯৬২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রায় ৭৫ বছর বয়সে নিভে যায় তাঁর জীবনদীপ, নিভে যায় বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-জগতের আর এক জাজ্বল্যমান জ্যোতি।

বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত জগতে সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এমনই একটি নাম যাঁর কথা না বললে আলোচনা রয়ে যায় অসম্পূর্ণ। অন্যান্য সুর-সাধকদের মতোই তিনিও ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা ভজন সবকিছুতেই বিশেষ দক্ষ ছিলেন। দক্ষ ছিলেন কণ্ঠ এবং যন্ত্র সঙ্গীতেও। সফল শিল্পী হিসেবে তিনি বিশেষ সমাদরসহ **'গুণসমুদ্র', 'সঙ্গীত ভাস্কর', 'সঙ্গীত সুধাকর'** প্রভৃতি সম্মানজনক উপাধিতে শ্রীমণ্ডিত হয়েছেন। এসবের জন্য তাঁর যতটা প্রসিদ্ধি, তার থেকেও বেশী প্রসিদ্ধি অন্য একটি বিশেষ কারণে। 'দ্বিতীয় রামপ্রসন্ন' আখ্যায় ভূষিত এই মানুষটি ছিলেন অত্যন্ত রাশভারী প্রকৃতির। বেলেল্লাপনা এবং চটুলতা ছিল তাঁর পছন্দের তালিকার বাইরে। শিখবার আগ্রহকে ভালভাবে যাচাই করেই শিষ্যত্বে বরণ করতেন। 'সেই যখন গাইছ একটু ঘরওয়ানা গান শিখো' এই বলে ছাত্রদের রাগপ্রধান শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের পিপাসা বাড়িয়ে দিতেন। দুর্বাসার মতো ক্রোধ অথচ সুরের কোমলতায় কোমল এবং অত্যন্ত জেদী প্রকৃতির সত্যকিঙ্কর বাবু রেডিওতে গাইতেন প্রায়শই। বিশেষ একটি কারণে আত্মসম্মানে আঘাত লাগার ফলে তিনি রেডিওতে সঙ্গীত পরিবেশন বন্ধ

১. সঙ্গীততীর্থ বিষ্ণুপুর, পৃঃ— ৫৮, ২. ভারতীয় ধ্রুপদ সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য, পৃঃ-১১৫

করে দেন। কারণটি তাঁর বাঙলা ভাষা প্রীতি। বাঙলা খেয়াল এবং ধ্রুপদ রচনা করে আকাশবাণী থেকে প্রচারের জন্য তিনি বৈপ্লবিক ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় স্থানাধিকারী বাংলা ভাষায় রচিত খেয়াল ও ধ্রুপদকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে না কেন? যে ভাষায় জাতীয় সঙ্গীত রচনা হতে পারে, যে ভাষার অমূল্য সম্পদ 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি একটি জাতিকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে পারে, সে ভাষাতে রচিত খেয়াল ও ধ্রুপদকে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ প্রচারে বাধা দেন। বঙ্গভাষা-দরদী, বাঙলা মায়ের এই একনিষ্ঠ সাধক-সন্তান তারই প্রতিবাদে আকাশবাণী ভবন ত্যাগ করেন নাম, যশ, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠার মোহ বিসর্জন দিয়ে। পরবর্তীকালে জনতা সরকারের আমলে কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতারমন্ত্রী এল. কে. আদবাণী সাহেব কোলকাতায় এসে বাংলা ধ্রুপদ ও খেয়াল সঙ্গীত তাঁকে দিয়ে গাইয়ে তা রেকর্ড করে দিল্লীতে নিয়ে যান। এতে আংশিক স্বীকৃতি মিললেও পরিতৃপ্ত হননি তিনি। **তাই বলতে ইচ্ছে করে যদি কোন দিন বাংলা খেয়াল ও বাংলা ধ্রুপদ জাতে ওঠে তাহলে যে মানুষটি পরলোকের অমরধাম থেকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ করবেন তিনি হলেন বিষ্ণুপুরের গৌরব, এই মল্লভূমের গৌরব সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়**—বিষ্ণুপুর ঘরানার আপাততঃ শেষ জ্যোতিষ্ক রূপে অনুমিত সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

গীত সম্রাট গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র সঙ্গীতাচার্য **রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** তাঁর ক্ষুদ্র জীবনে আকাশবাণী কোলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত ধ্রুপদ, ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশন, রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড ও স্বরলিপি রচনা, **'বিষ্ণুপুর দ্বিতীয় দিল্লী'** পুস্তক রচনা বিশ্ববিদ্যালয়ে সঙ্গীতে এম. এ. ক্লাস প্রবর্তন এবং এম. এ. ডিগ্রী প্রণয়নে সক্রিয় ভূমিকা পালন, সঙ্গীতে বিচারকের আসন অলংকরণ ছাড়াও 'অ্যাকাডেমি অফ মিউজিক'-এর ডিন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। **তাঁর সব থেকে উল্লেখযোগ্য কীর্তি হল তিনি ভারতে এবং বহির্ভারতে বিশেষ করে পশ্চিম জার্মানীতে ভারতীয় ধ্রুপদ সঙ্গীত ও বিষ্ণুপুর ঘরানার বহুল প্রচার করে বিশ্বদরবারে ভারতীয় সঙ্গীতকে মহিমময় মর্যাদায় উত্তীর্ণ করেছিলেন।**

সঙ্গীত ও সৌন্দর্যবোধের গবেষণায় পি. এইচ. ডি. উপাধি প্রাপ্ত **অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়** সঙ্গীতাচার্য সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় আকাশবাণী থেকে নিয়মিতভাবে সঙ্গীত (খেয়াল) পরিবেশন, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষের পদ অলংকরণ ছাড়াও ভারতের দিল্লী, মুম্বই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বহু স্থানে সঙ্গীত পরিবেশন করে বিষ্ণুপুর ঘরানার গৌরব তথা মল্লভূমের মুখোজ্জ্বল করেছেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রত্নগর্ভা মল্লভূম প্রসব করল একটি মোহর। মোহর মানে মহামূল্য স্বর্ণমুদ্রা নয়। মোহর মানে কবিগুরুর **কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়**। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার সোনামুখীতে মায়ের মামাবাড়িতে ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর অণিমা বন্দ্যোপাধ্যায় পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেন। বাবা সত্যচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেওয়া 'মোহর' নামের মাধুর্যে অণিমা নামটি আত্মগোপন করে ক্রমশঃ। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে দাদামশাই রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মস্থল শান্তিনিকেতনে সপরিবারে আসেন মোহরদি এবং লাভ করেন 'নব জন্ম'। শুরু হয় 'নব জীবন'। কবিগুরুর দেওয়া কণিকা নামেই উত্তরজীবনে আসে প্রতিষ্ঠা এবং প্রসিদ্ধি। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের জগতে কিংবদন্তীতে পরিণত হন তিনি। মোহরদির এই বিশাল প্রতিষ্ঠার মূলে রয়েছেন শিক্ষাগুরু স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও শৈলজারঞ্জন মজুমদার, দিনেন্দ্রনাথ, ইন্দিরাদেবী চৌধুরাণী, শান্তিদেব ঘোষ, অনাদি দস্তিদার, রমা কর, হেমেন্দ্রলাল রায়, অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভি. ভি, ওয়াজেলওয়ার, হরেন চট্টোপাধ্যায়, কমল দাশগুপ্ত, জ্ঞানপ্রকাশ

ঘোষ প্রমুখ বিশিষ্ট সঙ্গীতবিদগণ। রবীন্দ্র সঙ্গীত ছাড়াও মার্গসঙ্গীত, নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদী সঙ্গীত এবং ভজন গানে নিজেকে সুসমৃদ্ধ করেন।

অসুর বিনাশের উদ্দেশ্যে দেবতাগণ যেমন দশপ্রহরিণী দুর্গার দশ হাতে দশটি মোক্ষম অস্ত্র ধরিয়ে দিয়েছিলেন, তদনুরূপেই বোধ করি অ-সুরকে বিনাশ করে সুরের জয়যাত্রা ঘোষণা করার মহৎ উদ্দেশ্যেই পূর্বোক্ত গুরুগণ তাঁদের প্রিয় শিষ্যা কণিকা দেবীকে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর অদৃশ্য অস্ত্রসম্ভারে সুসজ্জিত করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দিগ্বিজয়ে। মাভৈঃ রবে তিনি যেন ১৯৫৩তে পাকিস্তান, ১৯৭২, ১৯৭৩, ১৯৭৪, ১৯৮৬ ও ১৯৯৪-এ বাংলাদেশ, ১৯৭৪, ১৯৭৮, ১৯৮৪তে আমেরিকা ও কানাডা, ১৯৭৬. ১৯৮০, ১৯৮৬ তে ইংল্যাণ্ড ছাড়াও জার্মানী, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে রবীন্দ্র-সঙ্গীতের জয়পতাকা উড়িয়ে দেন অনায়াসে।

শিল্পী জীবনের সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে তিনি বি. এফ. জে. এ. অ্যাওয়ার্ড (১৯৭৩), ই. এম. আই-এর গোল্ডেন ডিস্ক (১৯৭৮), সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার (১৯৭৯), পদ্মশ্রী (১৯৮৬), এশিয়ান পেইন্টস শিরোমণি পুরস্কার (১৯৯৬), বিশ্বভারতীর সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' (১৯৯৭), পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র প্রদত্ত সম্মান (১৯৯৮), আলাউদ্দিন পুরস্কার (১৯৯৯), এবং টেগোর রিসার্চ ইনস্টিট্যুট প্রদত্ত 'রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য' উপাধি ও সম্মানে সম্মানিত হন।

মাত্র তের বছর বয়সে আধুনিক গানের প্রথম ও শেষ রেকর্ড প্রকাশিত হয়। ঐ বছরই হিন্দুস্থান কোম্পানী থেকে কণিকা দেবীর প্রথম রবীন্দ্র সঙ্গীতের রেকর্ড বের হয়। 'মনে কি দ্বিধা রেখে গেলে চলে সে দিন ভরা সাঁঝে', 'না না না, ডাকব না, অমন করে বাইরে থেকে', 'ও গো তুমি পঞ্চদশী', 'ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে', 'ওই মালতী লতা দোলে' এবং 'এস শ্যামল সুন্দর'—এসব গানের রেকর্ড রবিঠাকুর শুনে গেছেন।

১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুলাই বোলপুর টেলিফোন কেন্দ্রের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে কবির একান্ত ইচ্ছায় সেদিনের পঞ্চদশী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় গেয়েছিলেন 'ও গো তুমি পঞ্চদশী পৌঁছিলে পূর্ণিমাতে।'

"১৯৪৩-এ সঙ্গীত ভবনে যোগ দেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্যের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। অধ্যক্ষ হিসাবে অবসর নেন ১৯৮৪তে। তিনি বিশ্বভারতীর এমিরিটাস অধ্যাপক। স্বামী বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যুগ্মভাবে রবীন্দ্র সঙ্গীতের বিষয়ে তিনটি বই লেখেন। বইগুলির নাম—রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভূমিকা, রবীন্দ্র সঙ্গীতের নানা দিক ও রবীন্দ্র সঙ্গীত কাব্য ও সুর। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর গৌতম ঘোষের 'মোহর' তথ্যচিত্রটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছে। দেশে ও বিদেশে তাঁর অনেক ছাত্র-ছাত্রী আজও সুপ্রতিষ্ঠিত।"[১]

২০০০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল রত্নগর্ভা মল্লভূমের 'মোহর', কথাশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আকবরী মোহর' তাঁর শান্তিনিকেতনের নিজ বাড়ি 'আনন্দধারা'কে নিরানন্দ করে দেবদত্ত কণ্ঠের অধিকারী রবীন্দ্র সঙ্গীতের গান্ধর্বী, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় পাড়ি দেন পরপারে।

খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর অন্তর্বর্তী সময়ে গীতিধর্মী চর্যাপদ এবং দোঁহাকোষ রচনার মাধ্যমে ধর্মতত্ত্বের অন্তরালে বাঙালীর লোকজীবনকে কেন্দ্র করে মল্লভূমে শুরু হয়েছিল সুরসাধনা। সা রে গা মা পা ধা নি —এই সপ্ত স্বরেই বাঁধা আছে সুর। সুরে বাঁধা আছেন সুরলোকের সুর এবং অসুর দুইই। সুরের এই ঐন্দ্রজালিক শক্তির

১. বর্তমান (দৈনিক) ৯.৪.২০০০. পৃঃ-১০, বিষয়—কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বপনকুমার ঘোষ।

জন্যই সুর হয়েছে 'সুর-ব্রহ্ম', শব্দ হয়েছে 'নাদ-ব্রহ্ম'। সুরারোপিত শব্দরাজি হয় সঙ্গীত। সঙ্গীতের প্রভাব শাশ্বত এবং সুদূর প্রসারী। সঙ্গীত পরকে করে আপন, আপনকে করে অন্তরঙ্গ। ব্যথিত হৃদয়ে বর্ষণ করে শান্তি-সুধা। আত্মাকে করে উন্নত এবং মহিমান্বিত। সঙ্গীত পরমার্থ তথা ঈশ্বর লাভে সহায়ক। সঙ্গীত তাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা, সঙ্গীত পরাবিদ্যা। বলা হয়েছে —'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ পরা, ন পরতরং হি।'

কথার সাথে সঙ্গীত তথা গানের পার্থক্য প্রসঙ্গে কবিগুরু বলেছেন "কথা জিনিষটা মানুষেরই, আর গানটা প্রকৃতির। কথা সুস্পষ্ট এবং বিশেষ প্রয়োজনের দ্বারা সীমাবদ্ধ, আর গান অস্পষ্ট এবং সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত। সেইজন্যে কথায় মানুষ মনুষ্যলোকের এবং গানে মানুষ বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে মেলে।" **স্বামী বিবেকানন্দ সঙ্গীতের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন, "ধ্যানের দ্বারা যে ফললাভ হয়, সঙ্গীতেও তাহাই হইয়া থাকে।"**

সঙ্গীতের মায়াজালে আবদ্ধ মানুষ, সর্পাদি মনুষ্যেতর প্রাণী, স্বর্গের দেব-দেবী, ঈশ্বর এবং স্বয়ং ব্রহ্ম। ব্রহ্মোপাসনার উদ্দেশ্যেই বৈদিক যুগে সঙ্গীতের সূত্রপাত। সাম বেদই সঙ্গীতের আদি উৎস। সাম মন্ত্রগুলি বৈদিক যুগে যাগ-যজ্ঞের সময় সুরারোপিত হয়ে সঙ্গীতের রূপ পরিগ্রহ করে। মল্লরাজবংশে সুরারোপিত মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমেই শুরু হয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত-সাধনা। উত্তরণের পথে জন্ম নেয় ধ্রুপদ বা ধ্রুবপদ। পূর্বেই বলেছি ধ্রুব শব্দের অর্থ নিত্য, সত্য, শাশ্বত। পদ অর্থে চর্বণ বা গান। নিত্য, সত্য, শাশ্বত পরমেশ্বরের প্রশস্তিমূলক গানই ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদ সঙ্গীত। **নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে গুণান্বিত বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ সঙ্গীত 'বিষ্ণুপুর ঘরানা' নামে প্রসিদ্ধ।**

বিষ্ণুপুর "ঘরানার সঙ্গীতসম্পদ অতুলনীয়। শিল্পীরা লিখেছেন অসংখ্য গান, সংগ্রহ করেছেন তার চেয়েও বেশী এবং সব কিছু সযত্নে রক্ষার দায়িত্ব যথাসাধ্য পালন করেছেন। এই সংগ্রহশালায় পাওয়া যায় বহু রাগ সমন্বিত বড়বাণীর চারপদী চৌতাল তালের গান প্রায় তিনশ, ধামার দুশ এবং পঞ্চম সওয়ারী, আড়াচৌতাল, সুরফাঁকতাল, ব্রহ্মতাল, ঝাঁপতাল, রূপক, তেওরা প্রভৃতি তালের গান প্রায় শতাধিক। পাওয়া যায় ধারু, প্রবন্ধ, যুগলবন্ধ, কলকলওয়ানা, হপ্তরঙ্গ, স্বররঙ্গ, তালফেরতা অষ্টাদশ কানাড়া, দ্বাদশ মল্লার, ত্রয়োদশ তোড়ী, নয় প্রকার নট এবং সপ্ত/সারঙ্গের ধ্রুপদাঙ্গের গান। এ ছাড়া বহু রাগের ওপর রচিত বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল যার সংখ্যা তিনশর অধিক। সংগৃহীত হয়েছে তেলানা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ, রাগমালা, রাগের স্বরগ্রাম প্রভৃতি যার সংখ্যা সব মিলিয়ে শতাধিক। আছে টপ্পা, ঠুমরী, হোরী ঠুমরী, ভজন, ঝুলন, কাজরী প্রভৃতি ধারার অনেক গান। এ ছাড়া রয়েছে সেতার, সুরবাহার, বীণা, শরোদ এসরাজ ইত্যাদি বহু যন্ত্রের অনবদ্য গৎ যার মিলিত সংখ্যা তিন শতাধিক। 'বিষ্ণুপুর ঘরানার' এই বিপুল সংগ্রহ উত্তর ভারতের আর কোন ঘরানাতে আছে বলে আমার জানা নেই।' বলেছেন যশস্বী সঙ্গীত-সাধক সত্যকিংঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।"[১]

এতাদৃশ একটি সুসমৃদ্ধ ঘরানার কাছে সুর-সাধক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশেষ ঋণী। উক্তির সত্যতা প্রমাণার্থে ডঃ মণীন্দ্রনাথ সান্যাল বিরচিত 'বিষ্ণুপুর ঘরানা ও রবীন্দ্রনাথ' নিবন্ধের কিয়দংশ উদ্ধৃতি হিসেবে ব্যবহার করলাম। তিনি লিখেছেন, **"রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরপ্রবাহের মূল উৎস ছিল বিষ্ণুপুর ঘরানার সুরসম্পদ। প্রথম জীবনে এই ঘরানাকে আশ্রয় করে তাঁর জীবনসাধনা সঙ্গীতের বিচিত্র ধারায় প্রবাহিত হয়েছিল।**

---

১. শিক্ষা-সেমিনার স্মরণিকা, নিখিলবঙ্গ শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া পৃঃ—৪৮

রবীন্দ্রনাথ কৈশোর থেকেই বিষ্ণুপুর ঘরানার শিল্পীদের সংস্পর্শে এসেছিলেন। ঠাকুরবাড়ীতে বিভিন্ন সময়ে যদুভট্ট, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী প্রমুখ শিল্পীরা সঙ্গীত শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হয়েছিলেন।.......... কবির সঙ্গে শিল্পীদের যোগাযোগ ছিল এবং বিষ্ণুপুর ঘরানার অসংখ্য গান তিনি তাঁদের কণ্ঠে শুনেছেন। সেই সব সঙ্গীত সাধকদের সংস্পর্শে এসে ঘরানার ধ্রুপদ সম্বন্ধে কবি ক্রমশঃ শ্রদ্ধাশীল হয়ে ওঠেন। বিষ্ণুপুর ঘরানার বিভিন্ন সুরের পরিবর্তিত রূপ, ধ্রুপদের সহজ, সরল গায়নভঙ্গি, রাগের বিশুদ্ধতা এবং গীতিকারদের বাণীর উৎকর্ষ তাঁকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। **স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ বলেন, 'রবীন্দ্রনাথের ধ্রুবপদ ও ধামারের ঘরোয়ানা ছিল বিষ্ণুপুর ধারার অনুবর্তী।'........**

বিষ্ণুপুরের প্রাচীন সঙ্গীতজ্ঞদের স্বরচিত কিছু গান কবির খুবই প্রিয় ছিল। সেই গানের সুর ছন্দ এবং বাণীর অংশবিশেষ নিয়ে পরবর্তীকালে তিনি ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীত রচনা করেছেন। সেই সঙ্গীতে তাঁর নিজস্ব ভাবধারা এবং বৈচিত্র্যময় সুরের হয়েছে যথাযথ মিশ্রণ এবং তাঁর এই সৃষ্ট গান আপন উৎকর্ষে স্থায়িত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, **"বিষ্ণুপুর ঘরানার হিন্দী ধ্রুপদ ভেঙে বাংলায় আনুমানিক দেড় শতেরও অধিক ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীত রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন।**

তাঁর এই মহান অবদান বাংলার গর্ব, বাঙ্গালীর গর্ব, বিষ্ণুপুর ঘরানাকে করেছে আরও সমৃদ্ধ, শ্রীমণ্ডিত ও মহিমান্বিত।"[১]

বিষ্ণুপুর ঘরানার এই মহান ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রাখার মহতী উদ্দেশ্যে সঙ্গীত ভারতীর আরাধনায় যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পূর্বসূরীদের বংশ পরম্পরায় এবং শিষ্য পরম্পরায় আগত সঙ্গীতকেশরী অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের চতুর্থ পুত্র **রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়**, সঙ্গীতাচার্য সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র 'সরিসা রামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠের সঙ্গীতাচার্য এবং ডায়মণ্ড হারবার সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ' **চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**, চতুর্থ পুত্র রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক তথা শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সঙ্গীতে শীর্ষস্থান অধিকারকারী রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত **নীহাররঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়**, প্রতিভাধর শিষ্য **বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী, গদাধর দাশগুপ্ত, হারাধন চক্রবর্তী** প্রমুখ। এ ছাড়া সাধক-শিল্পী **অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়**, সঙ্গীতাচার্য **রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়**, সঙ্গীতাচার্য **হলধর গোস্বামী, মাধবলাল গোস্বামী, মামুদমিঞা, দিগ্বসন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ গোস্বামী** (হাবু মাস্টার), **মদনমোহন রায়, অরবিন্দ বিশ্বাস, ওঙ্কারনাথ চট্টোপাধ্যায়, গোকুলচন্দ্র নাগ**, ও তাঁর পুত্র **মণিলাল নাগ**, মহিলাশিল্পী **করুণাময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়**, আত্মপ্রচার বিমুখ সঙ্গীত-সাধক **অমরনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ভোলানাথ চট্ট, দুর্গাদাস দেউঘরিয়া, হরিপদ কামিল্যা, নিত্যানন্দ গোস্বামী** এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের গৃহে সঙ্গীত শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত **কালীচরণ শাঁখারীর** নাম উল্লেখ্য। এতদ্ব্যতিরেকে এ সময়ে বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষ মল্লভূমে সুর-সরস্বতীর আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। সুরে সুরে সুরভিত হয়ে উঠেছিল বিষ্ণুপুর। যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পে যাঁরা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন তাঁরা হলেন নীলমাধব চক্রবর্তী, মধুসূদন ভট্ট, গণেশ ভট্টাচার্য, রামকেশর ভট্টাচার্য, কৃষ্ণলাল চক্রবর্তী, রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরহরি কবিরাজ, হরিদাস কবিরাজ, মধু নাগ প্রমুখ। আবার মৃদঙ্গ, তবলা প্রভৃতি চর্মবাদ্য-যন্ত্রে **রামমোহন চক্রবর্তী, কীর্তিচন্দ্র গোস্বামী, অনন্তলাল মুখোপাধ্যায়, শ্রীপতি অধিকারী, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কমল চক্রবর্তী, উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ব্রজলাল মাঝি, ঈশ্বরচন্দ্র সরকার, বিজন নন্দী, কেশব চট্টরাজ, নগেন্দ্র নন্দী, সুবোধ নন্দী** প্রমুখ শিল্পীগণ বিশেষ উল্লেখ্য।

১. সঙ্গীততীর্থ বিষ্ণুপুর, পৃঃ—১০৪

এঁদের 'রিলে রেস'-ধর্মী নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গীত সাধনার ফলে গান আর বাজনায় মুখরিত হয়ে উঠল বিষ্ণুপুর। জন্ম নিল পূর্বোল্লিখিত মুখরোচক প্রবাদ—

গান বাজনা মতিচুর
এই তিনে বিষ্ণুপুর।

বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত শুধু মাত্র গান বাজনা তথা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, শাস্ত্রীয় সঙ্গীত এবং ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। এর ক্ষেত্র ছিল বহু বিস্তৃত। কথিত আছে— **'গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমচ্যুতে।'** অর্থাৎ গান, বাজনা ও নৃত্য এই তিন শিল্পকলার সমাহারই সঙ্গীত। বিষ্ণুপুরে গান, বাজনা ও নৃত্যধর্মী সঙ্গীতের প্রচলন ছিল সর্বসাধারণের চিত্ত বিনোদনার্থে।

কথকতা, কীর্তন, তর্জা, ঝুমুর, লোকসঙ্গীত, নটীসঙ্গীত, ঢুলিসঙ্গীত, তুষু ও ভাদু-গীত সমাজের বিশেষ বিশেষ মানুষের বিশেষ ধরনের সঙ্গীত পিপাসা চরিতার্থ করে বিষ্ণুপুরের নৃত্য গীত অধ্যায়কে একটি বিশেষ মাত্রা দান করেছিল।

সঙ্গীত প্রধান **কথকতা** শব্দের অর্থ হল সর্বজন সমক্ষে অভিনয়ের মাধ্যমে পৌরাণিক উপাখ্যান পরিবেশন। লোকশিক্ষার কাজে কথকতার ভূমিকা ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কথকতা গাইয়েদের একাধারে শাস্ত্রজ্ঞ, সংস্কৃত ভাষায় পাণ্ডিত্য, পৌরাণিক কাহিনীতে স্মৃতিধর এবং সুকণ্ঠের অধিকারী হতে হত। সুর তাল সমন্বিত বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণী সংযুক্ত কথকতা-সঙ্গীতে ভক্তিরসের প্রাবল্যও পরিলক্ষিত হয়। বিষ্ণুপুরের কথক চূড়ামণি হিসাবে খ্যাত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি স্বরচিত কথক-সঙ্গীত হল—

ভবসাগর হতে পার কর হরি,
তোমা বিনে কে তরিবে দিয়ে চরণ তরী।।
নিশিদিন মিছে চিন্তা কেন করে মরি
তব নামে কবে মতি হবে বল দয়া করি।।

পূর্বোক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পীই ছিলেন না, ছিলেন একজন উঁচু দরের কথকতা শিল্পী। এছাড়া হাতের তালুকে মুষ্টিবদ্ধ করে ফুঁ দিয়ে বাঁশীর সুর সৃষ্টির মাধ্যমে রাগ-রাগিণীর সঞ্চার করে মন মাতিয়ে দিতেন শ্রোতৃবর্গের। রামকুমারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও ছিলেন একজন অনন্যসাধারণ কথকতা শিল্পী। ময়ূরভঞ্জের রাজা রামচন্দ্র ভঞ্জদেবের আমন্ত্রণে রাজবাড়ির দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে তিনি গেছেন কথকতা সঙ্গীত পরিবেশন করতে। ওখানে দেবী-পূজাতে শত শত পশুবলি দেওয়া হত। একথা শুনে ব্যথিত হলেন উমেশচন্দ্র। জগজ্জননীর সম্মুখে অবাধে অসহায় পশুহত্যার নিষ্ঠুর প্রথাকে কেন্দ্র করে তাৎক্ষণিকভাবে রচিত একটি কথকতা গাইলেন অশ্রু বিগলিত মরমী কণ্ঠে। রাজার চৈতন্যোদয় হয় নিমেষে। বলিদান প্রথা বন্ধ করে দেন সাথে সাথে। উমেশচন্দ্রের কথকতার মাহাত্ম্যে রক্ষা পায় শত শত নিরীহ পশু। বিষ্ণুপুরের অপরাপর কথকতা সঙ্গীত শিল্পীদের মধ্যে রয়েছেন অম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বনমালী চক্রবর্তী, উদ্ধব দেউঘরিয়া প্রমুখ।

কথকতার পর আসা যাক কীর্তনের কথায়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভক্তিরসাশ্রিত ধর্মীয় সঙ্গীতের নাম **কীর্তন**। বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব-সাধক শ্রীনিবাস আচার্যের শুভাগমনের ফলে বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূম হয়ে ওঠে বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম পীঠস্থান। সুললিত কীর্তনের কলরোলে মুখরিত হয়ে ওঠে মল্লভূমের আকাশ বাতাস। বিষ্ণুপুরের উল্লেখযোগ্য কীর্তনীয়াদের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং শ্রীনিবাস আচার্য, তাঁর ভক্তিমতি কন্যা হেমলতা দেবী,

শ্রীনিবাস শিষ্য রাজা বীর হাম্বীর, মহারাজা প্রথম গোপাল সিংহ, শশিভূষণ গোস্বামী, রামধন শাঁখারী ও শ্রীকান্ত বৈষ্ণব।

গানের সুরে দুই ব্যক্তি বা দুই দলের মধ্যে পৌরাণিক বা সামাজিক বিষয় নিয়ে বুদ্ধিদীপ্ত বাক্‌চাতুর্যের নামই তর্জাগান বা তর্জালড়াই। তর্জাগানে তাৎক্ষণিক বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তির সুষ্ঠু ও সময়োচিত প্রয়োগেই আসে শিল্পীর সাফল্য। মল্লভূমে বহু তর্জাগানের দল ছিল। তর্জা গাইয়ে হিসেবে নটু মাঝির নাম বিশেষ স্মরণীয়। তর্জাগান শ্রোতাদের বুদ্ধিবৃত্তির উন্মেষে বিশেষ সহায়ক।

অভিধান বলে নৃত্যগীত প্রধান অশ্লীল কবিগানের নাম ঝুমুর। সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ এবং সাধারণ মানুষের কাছে ঝুমুর গানের জনপ্রিয়তা এক সময় ছিল তুঙ্গে। হালকা রসাত্মক শব্দ সংকলনে রচিত ঝুমুর গানের বিষয়বস্তু কিন্তু অনেক সময়েই মনের গভীরে নাড়া দিত। চটুলতার পাশাপাশি, আধ্যাত্মিক চিন্তা এবং জীবন-দর্শন-মূলক ঝুমুর সঙ্গীতও পরিবেশিত হত বিষ্ণুপুরের ঝুমুর সঙ্গীতে। নৃত্য প্রধান ঝুমুর, সঙ্গীতে এক বিশেষ মাত্রা এনে দিত। কৃষ্ণলীলা, গৌরাঙ্গ লীলা এবং জনশিক্ষামূলক ঝুমুর সঙ্গীতের ছত্রগুলি এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়।

(ক) চরণ দাও হে গৌরহরি
আমি পড়েছি ভবসাগরে উপায় না হেরি। (গৌরাঙ্গ লীলা)

(খ) পোড়ার মুখী কলঙ্কিনী রাইলো।
তোর মত কেউ গোকুলেতে কুল-মজানি নাইলো......(কৃষ্ণলীলা)

(গ) জান না ভাই সেদিন কবে হবে
সময় বুঝে শমন রাজা নিদান শমন দেবে।। (শিক্ষামূলক)

জনৈক দামোদর গুপ্ত ঝুমুর গানের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে যা বলেছেন তার অর্থ হল—"ঝুমুর গানের অঙ্গে থাকবে সখী সংবাদ বা ব্রজলীলা আগম বা ভবানী বিষয়ক লহর বা শ্লেষব্যঙ্গ এবং খেউড় বা আদিরসাত্মক, উত্তর প্রত্যুত্তরে সংলাপিত গান।

কখন কখন এই খেউড় শ্রোতাদের চটুল করতালি চাহিদায় শালীনতার সীমা ছাড়িয়ে যেত। চতুর্দশ শতাব্দীতে রাঢ়ের বহু বিত্তবানের মণ্ডপে সংযত রসাস্বাদে ঝুমুর গানের আসর বসত। বড়ু চণ্ডীদাস তাঁর শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন রচনার আঙ্গিক নির্মাণ বা তার পরিকাঠামো এই ঝুমুর গান থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

সমগ্র রাঢ় পরিমণ্ডলে রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক এই গান অর্থাৎ ঝুমুর বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।" বর্তমানে বিষ্ণুপুরের ঝুমুর এবং ঝুমুর দলগুলি ইতিহাসের পাতায় ক্রমশঃ আত্মগোপন করলেও এ অঞ্চলের লোকসঙ্গীতের প্রভাব এবং প্রেক্ষা এখনও বিশেষভাবে প্রকটিত। সাধারণ ভিক্ষাজীবী মানুষ, মাধুকরী বৈষ্ণব, চারণ গায়ক এবং বাউল বৈরাগীদের দ্বারা গীত লোকসঙ্গীতের বিষয়বস্তু বহু বিস্তৃত। একাধারে পৌরাণিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক, আর্থসামাজিক এবং দেহতত্ত্ব বিষয় ছাড়াও সমাজ-সংস্কার-মূলক লোকসঙ্গীতগুলি মানুষের কর্ম এবং ধর্মজীবনের উৎসমূলে অনান্দধারার রস সিঞ্চনে বিগলিত। বিষ্ণুপুর রঘুনাথসায়র মহল্লা নিবাসী ভোলানাথ দাস বৈষ্ণব বাবাজীর সুললিত কণ্ঠে গাওয়া ভক্তিরসঘন প্রভাত-ফেরি সঙ্গীতের স্বর্গীয় মাধুর্য ভক্তিমার্গের যে কোন মানুষকে আপ্লুত না করে পারে না।

ভজ গোবিন্দে পরমানন্দে
কহ গোবিন্দে রামাজী।
রামকৃষ্ণ গোপাল দামোদর
হরে মাধব মধুসূদন জী।।

....

কীর্তন ও বাউল সঙ্গীত মল্লভূমের বিশেষ সম্পদ, বাংলার নিজস্ব সম্পদ। তাই কবি সত্যেন্দ্রনাথ গেয়েছেন,—

কীর্তনে আর বাউলের গানে আমরা দিয়েছি খুলি।
মনের গোপনে নিভৃত ভুবনে দ্বার ছিল যতগুলি।।

বলতে দ্বিধা নেই, ভারত কেন পৃথিবীর কোথাও এ সম্পদের সন্ধান পাওয়া যায় না। বাউল-সঙ্গীত মূলতঃ নৃত্য-প্রধান। তাই বলা হয়েছে, **'গেয়ে গান নাচে বাউল'**। বাউল শব্দের অর্থ বাতুল, বায়ুগ্রস্ত বা পাগল অর্থাৎ 'ঈশ্বর প্রেমে পাগল'। বাউলেরা হলেন জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায়ের উর্ধ্বে বিচরণকারী উদাস মুক্তপুরুষ। সহজিয়া বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বাউলদের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে। দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবীভাবধারার সাথে ইরানের সুফী সাধনতত্ত্ব মিশে গিয়ে বাংলার বাউলকে দিয়েছে পূর্ণতা। **হিন্দু বাউল সম্প্রদায়ের পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম। বীরভূমের কিয়দংশ মল্লরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পক্ষান্তরে মুসলমান বাউল সম্প্রদায়ের পীঠস্থান ছিল বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলা।**

দেহতত্ত্বমূলক বাউল সঙ্গীতের মধ্যেই থাকে বাউল সাধনার সার কথা তথা গুহ্যতত্ত্ব। ধর্মীয় আচার-আচারণ, জপতপ, তন্ত্রমন্ত্র, শাস্ত্রবিধি-বহির্ভূত বাউল সাধকেরা সংসারের কামনা-বাসনা ও দুঃখ কষ্টের মধ্যে বাস করেই খোঁজ করেন ঈশ্বরকে তথা তাদের মনের মানুষকে। বাউল সাধক তাই গেয়েছেন—

আমি কোথায় পাব তারে,
আমার মনের মানুষ যে রে।

লোভ-লালসা-জর্জর দেহের 'জড়সত্তার প্রাধান্য দূর করে দেহে মনে পরমার্থ-সন্ধানী হওয়াটাই বাউল সাধনার মূল কথা।' বাউল সাধনতত্ত্বের দিকটি জটিল হলেও এ সঙ্গীতের সুর বেশ উপভোগ্য, উন্মুক্ত, উদার এবং সহজ ও সুন্দর। বীরভূমের মতোই বিষ্ণুপুর মহকুমার সোনামুখী শহরেরও বাউল সাধনায় অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

মল্লভূমের সঙ্গীত-জগতে ঢুলি সম্প্রদায়ের অবদানও কিছু কম নয়। সাধারণতঃ ঢোল বাজান যাঁরা তাঁরাই **'ঢুলি'** নামে পরিচিত। লক্ষ্মী পূজা, সরস্বতী পূজা, বিবাহ, অন্নপ্রাশন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ঢোল ও সানাই সহযোগে বিশুদ্ধ রাগ-রাগিণীতে সুরমাধুর্য সৃষ্টি করে পূজাদি অনুষ্ঠানের পবিত্রতার পাশাপাশি মাঙ্গলিক বাতাবরণ তৈরী করার উদ্দেশ্যেই বোধ করি ঢুলি সম্প্রদায়ের বিশেষ সমাদর। মন্দির-নগরী বিষ্ণুপুরের মন্দিরস্থ দেব-দেবীদের সন্তোষ বিধানার্থে আরতি ও সন্ধ্যারতির সময় নিয়মিতভাবে ঢোল সানাই-এর সুমিষ্ট সুরধ্বনি পরিবেশিত হত মন্দির প্রাঙ্গণে। উক্ত প্রথা আজও অল্পমাত্রায় বিদ্যমান। এসব সুর-সাধনারই অঙ্গ-বিশেষ।

ঢুলি সম্প্রদায়ের মতো বিষ্ণুপুরের **নটী** সম্প্রদায়েরও সঙ্গীতে অবদান অসামান্য। এখানের নটী বা নর্তকীগণ ছিলেন রাজনটী। বাঈজী আখ্যায় পরিচিত এইসব রাজনটীগণ ছিলেন মল্লরাজাদের আশ্রয়পুষ্ট। রাজপরিবারের অন্নপ্রাশন, বিবাহ, রাজ্যাভিষেক প্রভৃতি

মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান ছাড়াও পূজাপার্বণ যেমন শারদীয় দুর্গা পূজা, বাসন্তী পূজা, বিশেষতঃ ইন্দ্‌পরবে নৃত্য গীতাদি পরিবেশন করে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মঙ্গল বিধানের পাশাপাশি দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলের চিত্ত বিনোদনে এঁরা থাকতেন সদা সচেষ্ট। রাজবাড়ি ছাড়াও বিষ্ণুপুর তথা মল্লরাজ্যের অভিজাত বংশেও পূর্বোক্ত অনুষ্ঠানে এঁদেরকে সাদর আমন্ত্রণ জানানো হত। এখানের বাঈজী পল্লীর নাম ছিল 'ইন্দ্‌কুড়ি'। "যুদ্ধযাত্রা, বিজয়োৎসব, শিকারোৎসব প্রভৃতিতেও পরিবেশ উপযোগী সঙ্গীতের মাধ্যমে তারা জনমনে যথেষ্ট উন্মাদনার সঞ্চার করত। তাই বিষ্ণুপুর রাজদরবার থেকে তাদের বহু ভূসম্পত্তিও দেওয়া ছিল। তার সাক্ষ্য স্বরূপ 'নটীহিড়' নামক মৌজা আজও বর্তমান।" (সঙ্গীততীর্থ বিষ্ণুপুর, পৃঃ- ৯১) খেয়ালে অসাধারণ দক্ষতা সম্পন্ন ভৈরবী বাঈজী এবং তাঁরই শিষ্যা লক্ষ্মীবাই, যোগীবাঈ ও কুমুদবাঈ এঁদের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

সঙ্গীতপ্রধান **পুতুলনাচে** সুরারোপিত কাহিনী ও সংলাপের মাধ্যমে এক অন্য স্বাদের সঙ্গীত পরিবেশনের প্রথা জনমনে, বিশেষতঃ শিশুমনে গভীর রেখাপাত করত। পুতুল নাচে দক্ষ তথা সঙ্গীতজ্ঞ বিষ্ণুপুরের দুঃখীরাম শাঁখারীর নাম আজ বিস্মৃতির স্মৃতিরেখায় স্থলাভিষিক্ত। পুতুলনাচ প্রসঙ্গে গীতিধর্মী নাটকের হাত ধরে সঙ্গীত অধ্যায়ে এসে যায় নাটকের কথা।

এখনকার মতো তখনকার দিনে চিত্তবিনোদনের উপকরণ হিসেবে সিনেমা, রেডিও, ভি.ডি.ও., টি.ভি. ছিল না। ছিল কতকগুলো **নাট্যসংস্থা** এবং রঙ্গমঞ্চ। বিষ্ণুপুরের পাড়ায় পাড়ায় যেমন রঘুনাথসায়র, মল্লেশ্বর, মাধবগঞ্জ, কৃষ্ণগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, বড় কালীতলা, নিমতলা, শাঁখারীবাজার ও মাড়ুইবাজারে অস্থায়ী রঙ্গমঞ্চে সংলাপ মুখর গীতিধর্মী নাটক ও যাত্রাভিনয়ের মাধ্যমে জনসাধারণের মনোরঞ্জনের পাশাপাশি সুর সাধনার ক্ষেত্র হত প্রশস্ত। বিষ্ণুপুর-দরদী লেখক ফকিরনারায়ণ কর্মকার বিরচিত 'দেবী মৃন্ময়ী', 'মদনমোহন', 'পতিঘাতিনী সতী' প্রভৃতি নাটক ছাড়াও কৃষ্ণলীলা, গৌরাঙ্গলীলা, মনসা মঙ্গল, চণ্ডী মঙ্গল ও ধর্ম মঙ্গলের পালাগান অভিনীত হত। অভিনয় ও পরিচালনা করতেন স্থানীয় শিল্পীগণ। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্রাভিনেতা রাধামোহন ভট্টাচার্য এবং 'সতী সীমন্তিনী' চলচ্চিত্রের নায়কের ভূমিকায় অভিনেতা ছিলেন বিষ্ণুপুর প্রেমিক ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়। তৎকালে বিষ্ণুপুরের এসব নাট্যসংস্থাগুলি এতো বেশী জনপ্রিয়তা অর্জন করে যে বঙ্গদেশের বিভিন্ন স্থানে আমন্ত্রিত হয়ে, এমন কি শিল্পনগরী কোলকাতাতেও অভিনয় প্রদর্শন করে যশস্বী হয়ে ওঠে। 'পতিঘাতিনী সতী' নাটকটি কোলকাতার স্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়ে কোলকাতার নাট্যামোদী নর-নারীর হৃদয়ে বিষ্ণুপুরকে গৌরবের আসনে অধিষ্ঠিত করে। বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী রাধানগর গ্রামের রামেশ্বর শর্মা পরিচালিত এখানের সর্বপ্রাচীন নাট্যসংস্থাটিও কল্লোলিনী কোলকাতায় প্রশংসার কলস্রোত আনে। বাঁকুড়া জেলার "বিষ্ণুপুরের ভট্টাচার্য পরিবারের মেয়েরা সম্ভবত জেলায় শুধু মেয়েদের দ্বারা অভিনীত নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন (১৯৩৭-৩৮)। নাটকটি ছিল 'তাসের দেশ'।"... "জেলায় অভিনীত প্রথম একাঙ্ক নাটক ছিল 'ঠাকুরদাদার সংসার'। লিখেছিলেন ভট্টাচার্য পরিবারের জামাই মোহিত বাগচী।" কথাগুলি লিখেছেন 'পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া' পুস্তকের লেখক তরুণদেব ভট্টাচার্য। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন, "মল্লশ্বরের ভট্টাচার্য পরিবারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত থিয়েটার সম্ভবত ছিল প্রাচীনতম। অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯১৬ সালে, কাদাকুলি-মল্লেশ্বর পাড়ায় চণ্ডীমণ্ডপের সামনে। নাটক ছিল দুটি, একটির নাম 'ডিস্‌মিস', ব্যঙ্গনাটক, অপরটি 'ঠাকুরদাদার সংসার' প্রহসন। দুটিই ছিল একাঙ্ক।" (পৃঃ-৩৩২, ৩৩৩, ৩৩০-৩৩১)। নাট্যভিনয়ের ক্ষেত্রে কবিরাজপাড়া, বসুপাড়া,

বিশ্বাসপাড়া, কামারপাড়ার নামও উল্লেখযোগ্য। পারিবারিক নাট্যসংস্থা ছাড়াও 'মোহন-বক্ত থিয়েটার', 'ফ্রেণ্ডস ইউনিয়ন', 'রামধনু সংঘ', 'রবীন্দ্র সংসদ,' 'সুভাষ ক্লাব', 'গোল্ডেন স্টার', 'শিল্পীগোষ্ঠী', 'সৌরভ নাট্যসংস্থা, 'প্রগতি সংঘ' এবং 'বিষ্ণুপুর কোরাস' প্রভৃতি দলগত নাট্যসংস্থাগুলির নামও স্মরণীয়। এদের মধ্যে অনেকগুলি এখনও তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছে সগৌরবে।

বিষ্ণুপুরের ঝাঁপান উৎসবকে কেন্দ্র করে মনসা দেবীর পূজাতে দেবীকে আবাহন, বন্দনা এবং বিসর্জন ছাড়াও প্রতিযোগী সাপ-খেলুড়েদের মধ্যে পারস্পরিক আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণের উদ্দেশ্যে এবং বিষধর সাপ নিয়ে খেলা দেখানোর সুযোগে নিজের নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের উদ্দেশ্যে সুরারোপিত **মন্ত্র-সঙ্গীতে** মারণ, উচাটন অর্থাৎ কাটান মন্ত্রের মধ্যে ভীতি মিশ্রিত যে সকরুণ রাগ-রাগিণীর সঙ্গীত পরিবেশিত হয় তা মল্লভূমের সঙ্গীতে এনে দেয় এক নতুন মাত্রা। রাধা-কৃষ্ণের দোলযাত্রা তথা হোলি উৎসবে পাড়ায় পাড়ায় জন্ম নিত হোলি গানের দল। দোলযাত্রা বা হোলির দিন ঐসব হোলি গানের দল আমন্ত্রিত হয়ে সারা রাত্রি ব্যাপী গানে গানে ভরিয়ে দিত বিষ্ণুপুরের অলি গলি সর্বত্র। হোলি গানের আনন্দ হিল্লোলে আবালবৃদ্ধবনিতার, বিশেষতঃ তরুণ-তরুণীদের হৃদয় কন্দরে দাপিয়ে বেড়াত অবাধ্য আনন্দের ফল্গুধারা। রাধাকৃষ্ণের লীলা বিষয়ক সঙ্গীতের মাঝে মাঝে দেশাত্মবোধক, আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত সহজ সরল এইসব গানগুলি ছিল বিষ্ণুপুরের একান্ত নিজস্ব সম্পদ। যোগীপাড়ার হাবু মাস্টার এবং সঙ্কটতলার অশ্বিনী মাস্টার এসব গান রচনায় এবং গায়নভঙ্গীর উৎকর্ষে বিষ্ণুপুরের প্রবাদপুরুষ ছিলেন। আজও এখানে হোলিগান হয়, কিন্তু হারিয়ে গেছে প্রাণস্পন্দন, হারিয়ে গেছে আনন্দধারায় অবগাহনের অনিয়ন্ত্রিত উন্মাদনা। হোলি-গান-পিয়াসীদের অন্তরে রেখে গেছে এক বেদনাতুর অভাববোধের স্মৃতি।

'সঙ্গীত সরস্বতীর আরাধনা' অধ্যায়ের প্রান্ত রেখায় এসে গেছি কথায় কথায়। আপনাদের মনে হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে, বর্তমানে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতের হাল-হকিকৎ কেমন? উত্তরে বলি, নিকষ কালো অমারাত্রিতে ঊর্ধ্বপানে তাকাবেন। দেখবেন, আকাশ-ভরা অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র। অনুরূপভাবে মল্লমাটিতে পা রেখে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাকাশে অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন, দেখবেন সঙ্গীত-শিল্পীর এক ছায়াপথ রচিত হয়েছে সেখানে। মুক্তাদানার মতো নক্ষত্রগুলি যেমন ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে মহাকাশের মহাশূন্যে, তেমনি বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-সাধকগণ আজ শুধু বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ নয় ভূ-ভারতে তথা স্বদেশে বিদেশে ছড়িয়ে রয়েছেন গানে ভুবন ভরিয়ে দেওয়ার মহৎ উদ্দেশ্যে। সঙ্গীত এবং যন্ত্র-সঙ্গীতের সুরের নেশায়, কেউবা পেশায়, অনেকেই আবার অসীম অনুরাগে কিংবা হৃদয় মথিত শ্রদ্ধা ভালবাসায় অভিষিক্ত হয়ে সামগ্রিকভাবে সঙ্গীত গ্যালাক্সিতে হয়েছেন সামিল। এঁদের মধ্যে সঙ্গীতাচার্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা বিন্ধ্যবাসিনী দেবী, ছাত্র গজানন নন্দী ও নির্মল নন্দী, গীতসম্রাট গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিণী অশীতিপর বৃদ্ধা গৌরীবালা দেবী, ছাত্র অহিদাস চক্রবর্তী, অবনীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, পুত্র নেপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ; সঙ্গীতাচার্য ডঃ দেবব্রত সিংহঠাকুর, গুরুপ্রসাদ সরকার, তারাপদ গোস্বামী, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিষ্ণুপুর রামশরণ সঙ্গীত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সুজিত গঙ্গোপাধ্যায়, মধুসূদন নাগ, অনাদি ভট্টাচার্য, ইন্দিরা চট্টোপাধ্যায়, অন্ধশিল্পী সুভাষ কর্মকার উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সাধনার উচ্চাসনে উপবিষ্ট। কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতে শান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, জগন্নাথ দাশগুপ্ত, বামাপদ চক্রবর্তী ; সেতারে মধুসূদন নাগ ; সেতার ও গীটারে হীরক নন্দী (প্রিন্সিপ্যাল—স্কুল অফ্ মিউজিক, দুর্গাপুর) ; বিশিষ্ট পাখোয়াজ শিল্পী শিবপ্রসাদ

গোস্বামী ; তবলা ও মৃদঙ্গে রবি রাহা, বুদ্ধদেব সরকার, বালক নন্দী, বগলারঞ্জন দত্ত, সুবীর নন্দী, সুদীপ নন্দী, অশোক দত্ত, রঘুনাথ নন্দী, সোমনাথ নন্দী, প্রমুখ শিল্পীগণ স্মরণীয়, বরণীয় এবং আদরণীয়।

ছোট বড় বা প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তির মানদণ্ডে নয়, সুর-সাধক রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি 'তোরা হাতে হাতে ধর গো' এই মন্ত্রেই যেন দীক্ষিত হয়ে বিষ্ণুপুরের তথা মল্লভূমের সঙ্গীত-ভারতীর সন্তান সন্ততির দল অশীতিপর বৃদ্ধা গৌরী দেবী থেকে শুরু করে বর্তমান প্রজন্মের তরুণ শিল্পী জগন্নাথ দাশগুপ্ত প্রমুখ সকলেই যেন বিষ্ণুপুর ঘরানাকে, বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতকে সমৃদ্ধির শীর্ষাসনে পৌঁছে দিতে সদা প্রয়াসী, তার ঐতিহ্য বজায় রাখতে বদ্ধ-পরিকর। প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য তথা সরকারী অনুদান ও উৎসাহ পেলে বিষ্ণুপুর ঘরানা হয়তোবা 'জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন' লাভ করত। এ প্রসঙ্গে 'HISTORY OF BISHNUPUR-RAJ' গ্রন্থের গ্রন্থকার শ্রদ্ধেয় অভয়াপদ মল্লিকের নিম্নোদ্ধৃতিটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, " 'Bishnupur Gharana' is still un-rivalled in the realm of the musical world. Many brightest stars shone in the said firmament and there are still luminious stars therein. If properly encourged this 'Gharana' can challenge any other 'Gharana' of India. (Conclusion chapter).

মল্লভূমের সাহিত্য ও সঙ্গীত সাধনার স্মৃতিচারণ করার অবকাশে একাদিক্রমে অনেকখানা পথ অতিক্রম করে এই মুহূর্তে আমরা এসে গেছি বিষ্ণুপুরের তুড়কী সীতারামপুর মৌজায় প্রতিষ্ঠিত নবনির্মিত **দেব-দেবেশ্বর মন্দির**-চত্বরে। এখন দেখুন এই অনুপম দেব-মন্দির, শুনুন এর প্রতিষ্ঠা কাহিনী। তার পূর্বে একটা কথা বলে নিই যে আপনাদের ইচ্ছানুসারেই আজ আমরা শ্রীশ্রীদেব-দেবেশ্বর মহাদেবের পূজা দিয়ে প্রসাদ গ্রহণ পূর্বক প্রাতঃকালীন জলযোগের কাজ সারবো।

অধ্যায়-১১৫

মন্দির-নগরী বিষ্ণুপুরের নব-নির্মিত দেব-দেবেশ্বর মন্দির

ভগবান যাকে ধন দেন, তাকে মন দেন না; আবার যাকে মন দেন, তাকে দেন না ধন। যেমন হতভাগ্য আমাকে বিষ্ণুপুরে বিশাল এক মন্দির ও আশ্রম করার মন দিয়েছেন কিন্তু দেননি ধন—তাই আমার ব্যর্থতার ব্যথা গুমরে মরে নীরবে। অশ্রুপাত করে একান্তে, অঝোরে। অবশ্য কদাচিৎ কতিপয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে পূর্বোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখা যায়। যেমন রাণী রাসমণির ধন ছিল, ছিল মন, তাই হয়েছিল দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির সহ দ্বাদশ শিবমন্দির। বিষ্ণুপুরের রাজন্যবর্গের ধন ও মন দুইই ছিল, সেজন্যই বিষ্ণুপুরের বুকে গড়ে উঠেছিল শত শত দেবমন্দির। অনুরূপভাবে বিষ্ণুপুরের 'মণ্ডল আইস অ্যাণ্ড কোল্ড স্টোরেজ' এর মালিক **নিরঞ্জন মণ্ডল** মহাশয়ের ধন-মন দুই-ই আছে, আর সর্বোপরি আছে ঈশ্বরকৃপা। এজন্যই তিনি অকাতরে অর্থ ব্যয় করে নির্মাণ করতে পেরেছেন প্রায় আগাগোড়া মার্বেল পাথরে মোড়া অতীব শ্রীদর্শন এক শিব-মন্দির এবং মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন কষ্টিপাথরের যোনিপট্টের উপর আলোক-বিচ্ছুরণকারী স্ফটিকমণি বা সূর্যকান্তমণির শিবলিঙ্গ। এই ধরনের অত্যাশ্চর্য শিবলিঙ্গ সচরাচর দেখা যায় না। দক্ষিণ

ভারতের রামেশ্বর শিবমন্দিরে জ্যোতির্বিকিরণকারী যোনিপট্টসহ শিবলিঙ্গ দর্শন করেছিলাম ১৯৯০ খৃষ্টাব্দে। দর্শন-দক্ষিণা ছিল জনাপ্রতি পাঁচ টাকা। পর্বত গর্ভে হাজার হাজার বছর ধরে জমে থাকা বরফ থেকে নাকি জন্ম হয় স্ফটিকমণির। স্তূপাকৃতি রাশি রাশি বরফের চাপে ঘনীভূত হয়ে বরফ হয়ে ওঠে পাথরের মতো শক্ত এবং তা আর উত্তাপেও গলে না। এই ধরণের বরফ থেকেই তৈরী হয় শুভ্র-স্বচ্ছ স্ফটিকমণি। মণির কথায় ছেদ বসিয়ে ফিরে আসি মন্দির তৈরীর কথায়।

এক সাক্ষাৎকারে নিরঞ্জন বাবুকে প্রশ্ন করেছিলাম, "আপনার দেশের বাড়ি তো বাঁকুড়ার এক গণ্ডগ্রামে। কোলকাতায় বিরাট ব্যবসা এবং উল্টোডাঙায় বাড়ি। মানে এখন আপনি পুরোদস্তুর কোলকাতার মানুষ। গড়বেতাতে রয়েছে আপনার আদি কোল্ডস্টোর, বিষ্ণুপুরেরটি তো হয়েছে হালে হালে। মানে বিষ্ণুপুরের সাথে আপনার পরিচয় অল্প দিনের। তথাপি জন্মস্থান গৈরা গ্রাম, গড়বেতা কিংবা কোলকাতায় মন্দির না করে বিষ্ণুপুরে করলেন কেন? এবং মন্দির-নির্মাণের বাসনা হলই বা কেন?"

দুটি কোল্ডস্টোর, দুটি বিস্কুট ফ্যাক্টরী এবং একটি ফুড প্রোডাক্টস কারখানার মালিক ৫৯ বছর বয়স্ক নিরহঙ্কার নিরঞ্জন বাবু আমার প্রশ্ন দুটির উত্তরে বলেছিলেন, "দৈবাদেশ এবং স্থানমাহাত্ম্যও বলতে পারেন।"

"তার মানে!" সবিস্ময়ে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছিলাম আমি।

সুদক্ষ গোলকীপারের মতো প্রশ্নটা লুফে নিয়ে তিনি বলেছিলেন, "বিষ্ণুপুরের মাটির একটা বিশেষ গুণ আছে। এখানের মানুষের মুখ দিয়ে দেব-দেবীরা তাঁদের ইচ্ছা প্রকাশ করে নিজ নিজ বাসনা চরিতার্থ করেন।"

"ঠিক বুঝলাম না," বলেছিলাম আমি। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "১৯৮৫ খৃষ্টাব্দে এই কোল্ডস্টোর চালু হয়। ১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে স্টোরের এক্সটেনশনের জন্য থার্ড চেম্বারের কাজ চলছিল দ্রুতগতিতে। একদিনের ঘটনা। কনস্ট্রাক্শনের কাজে কর্মরত এক কামিনের হঠাৎ করে ভর আসে ঠিক বেলা তিনটের সময়। ভরগ্রস্ত অবস্থায় কামিনটি বার বার বলতে থাকে, 'এখানে মন্দির কর্। মন্দির কর্ তোদের ভাল হবে, ভাল হবে।' এই বলে মেয়েটি কোথায় মন্দির তৈরী করতে হবে সেই বিশেষ স্থানটিও দেখিয়ে দেয় নিমেষে।"

ভক্ত নিরঞ্জন বাবু বোধ করি এরকম একটি সুযোগেরই অপেক্ষা করছিলেন। কারণ অল্প বয়স থেকেই তাঁর মনের গভীরে নিভৃতে নীরবে একটি দেব-মন্দির নির্মাণ করার দিব্য-বাসনা দানা বাঁধছিল দিনে দিনে। যেন একটি সুগন্ধি ফুলের কুঁড়ি প্রস্ফুটিত হবার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছিল পলে পলে।

ভরপ্রাপ্ত কামিনটির কথাকে দৈবাদেশ ধরে নিয়েই শিবভক্ত নিরঞ্জন বাবু মহিলাটির নির্দেশিত বিশেষ স্থানটিতেও ছোটখাটো একটি শিবলিঙ্গ স্থাপন করে নিয়মিত পূজা-আর্চার ব্যবস্থা করেন সাথে সাথে। অতঃপর ২০০০ খৃষ্টাব্দের শুরুতেই শুরু করেন মন্দির নির্মাণের কাজ। শেষ হয় ২০০২ খৃষ্টাব্দের জুন মাস নাগাদ। অনন্তর ২০০২ খৃষ্টাব্দের ১৫ ই জুলাই তথা ১৪০৯ বঙ্গাব্দের ৩০শে আষাঢ় দেবদেবেশ্বর শিবলিঙ্গ সহ এই শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন তিনি। পূর্বমুখী এই দেবালয়টির দৈর্ঘ্য ৩৯´ ১০ ইঞ্চি, প্রস্থ ৩৪ ফুট ২ ইঞ্চি এবং উচ্চতা প্রায় ৩৫ ফুট।

১১ই জুলাই থেকে ১৫ই জুলাই পর্যন্ত রুদ্রযজ্ঞ সহ মন্দির প্রতিষ্ঠার যাবতীয় শাস্ত্রীয় বিধানসমূহ যথাযথভাবে উদযাপন করে নিরঞ্জন বাবুর পরমারাধ্য গুরুদেব জ্যোতিঃ পীঠাধীশ্বর ও দ্বারকা-সারদা পীঠাধীশ্বর জগৎগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী শ্রীস্বরূপানন্দ সরস্বতী

মহারাজ স্বয়ং পৌরহিত্য কর্ম সুসম্পাদন পূর্বক এই শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা করান। ১১ থেকে ১৫ই জুলাই এই পাঁচদিন প্রতিষ্ঠাপর্বের অঙ্গ হিসেবে তাঁর গুরুদেবের নির্দেশানুসারে রাজভোগ বিতরণ করা হয়। হাজার হাজার ভক্ত ও দর্শনার্থীগণ প্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হন। প্রতিষ্ঠাপর্বের আগাগোড়া ছিল রাজকীয় ব্যাপার। মন্দির-গাত্রে নিবদ্ধ প্রতিষ্ঠালিপিতে লেখা আছে—পরম আরাধ্য পিতৃদেব ৺বিভুতিভূষণ মণ্ডলের অমর স্মৃতিতে নির্মিত ও জনগণের হিতার্থে এই মন্দির উৎসর্গীকৃত। বিনীত, সেবাইত নিরঞ্জন মণ্ডল। ৩০শে আষাঢ়, ১৪০৯। আনুষঙ্গিকভাবেই বলি, নিরঞ্জন বাবুর গুরুদেবই শিবলিঙ্গের নামকরণ করেন **'দেবদেবেশ্বর'**—একারণেই এটি **'দেবদেবেশ্বর মন্দির'**।

জনগণের হিতার্থে উৎসর্গীকৃত এই মন্দিরটির গঠন-শৈলীর মধ্যে প্রতিবিম্বিত হয়েছে আধুনিক যুগের স্থাপত্যশৈলীর নিদর্শন। ৮৪ ফুট ৮ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য ও ৬৪ ফুট প্রস্থ বাউণ্ডারী দেওয়া এক উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বর্গাকৃতির গর্ভমন্দিরটিকে ঘিরে ১৪টি অষ্টপল বিশিষ্ট মনোরম স্তম্ভের দেওয়ালের উপর নির্মিত হয়েছে বারান্দাযুক্ত ছাদ। দেখুন, সুউচ্চ বেদী বিশিষ্ট এই দেবালয়ের গর্ভমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন পূর্বোক্ত সূর্যকান্তমণির শিবলিঙ্গ। দক্ষিণ দিকের দেওয়াল সংলগ্ন অবস্থায় রয়েছেন গণেশ, পার্বতী ও একই অঙ্গে ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর মূর্তি। গর্ভমন্দিরের উত্তর দিকের প্রবেশ-দ্বারের দুপাশে দুই দ্বাররক্ষী এবং সম্মুখে উপবিষ্ট দক্ষিণমুখী কালো পাথরের ষাঁড়টি শিবের বাহনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় আমাদের। পক্ষান্তরে দেবালয়টির দক্ষিণ দিকের উন্মুক্ত আঙ্গিনায় প্রতিষ্ঠিত ক্ষুদ্রাকৃতির সবৃষ শিবলিঙ্গটিই হল দৈবনির্দেশে প্রতিষ্ঠিত আদি শিবলিঙ্গ।

দেবালয়টির বাইরের দেওয়ালের উপরিভাগের অভ্যন্তরভাগে মা ছিন্নমস্তা সহ দশ-অবতার ও কৃষ্ণলীলার ছবিসমূহের পাশাপাশি বহির্ভাগে সিদ্ধিদাতা গণেশ সহ বহুপূজ্য পৌরাণিক দেবদেবীদের দেওয়ালাবদ্ধ মূর্তিগুলি সমাগত ভক্তবৃন্দের নজর কাড়ে সদ্য অঙ্কিত রঙের জৌলুসে।

এগারোটি স্তবকে নির্মিত ক্রমশঃ সংকুচিত বৃত্তাকার একমাত্র চূড়াটির নীচের স্তবকে একটি প্রস্ফুটিত পদ্ম, পদ্মের উপর বেলুন আকৃতির তিনটি চক্রের নীচেরটিতে উর্ধ্বমুখী বিল্বপত্রের, মাঝেরটিতে ধুতরা ফুলের এবং উপরেরটিতে শ্রেণীবদ্ধ ঝোলানো চাঁদমালার নক্সা পরিলক্ষিত হয়। পঞ্চম, সপ্তম ও অষ্টম স্তবকে কদ্‌মা জাতীয় গোলাকার স্থাপত্যশৈলীর মধ্যস্থলে রয়েছে একটি গোলাকার স্থাপত্য-নিদর্শন। সর্বোপরে ধাতু-নির্মিত দু'টি কলসের উপর ফুলদানী-আদলের একটি শিল্পকর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে প্রোথিত রয়েছে দেবাদিদেবের বিধ্বংসী আয়ুধ ত্রিশূল। আলো ও ঝাড়বাতির আলোক-সজ্জায় উদ্ভাসিত, মন্দিরগাত্রে নিবদ্ধ অল্পস্বল্প টেরাকোটা চিত্র ও দেব-দেবীদের মূর্তিসহ ছিম্‌ছাম অলংকরণে সুশোভিত, নানা বর্ণের মার্বেল পাথরের নয়নাভিরাম মসৃণ উজ্জ্বলতায় দৃপ্ত নব-নির্মিত এই দেব-দেবেশ্বর মন্দিরটি 'মন্দির-নগরী' বিষ্ণুপুরের মন্দির-তালিকায় এক অপূর্ব সংযোজন এবং অবশ্য-দর্শনীয় একটি শিল্পকর্ম।

মন্দিরটির সীমানার বাইরের দক্ষিণ, পূর্ব ও পশ্চিম দিকের লতাগুল্ম বৃক্ষাদি সহ নানান মরশুমী ফুলের শোভা একদিকে যেমন সৃষ্টি করেছে নান্দনিক সৌন্দর্য, তেমনি উত্তর দিকের প্রবেশ-তোরণের উপর মুখোমুখিভাবে উপবিষ্ট বৃহদাকার দুই সিংহের মধ্যস্থলে ধ্যানী শিবের মূর্তিটি বুঝি দেবাদিদেবের শান্ত-সমাহিত মঙ্গলমূর্তিকেই চিত্রিত করেছে। প্রবেশ-তোরণের পার্শ্ববর্তী দুই স্তম্ভে নিবদ্ধ মঙ্গলশঙ্খ বাদ্যরতা দুই ললনার

অস্তিত্ব, অবাঙালী পুরোহিত ঠাকুরের ভাব-গম্ভীর মন্ত্রোচ্চারণ, জয়ঘণ্টার গুরুগম্ভীর ঘণ্টাধ্বনি—এ সব দেখে শুনে মনে হয় দেবাদিদেবের জয়গানের সাথে সাথে আপামর বিশ্ববাসীর মঙ্গল কামনাই যেন বারংবার ঘোষিত হচ্ছে—শুভমস্তু! শুভমস্তু! শুভমস্তু!

দেবালয়ের দেব-দেবীসহ দেব-দেবেশ্বর শিবঠাকুরের চরণ-কমলে ভক্তি-অর্ঘ্য উপহার দিয়ে চলুন লঘু-ছন্দে অগ্রসর হই এই মন্দিরের পূর্বদিকে অবস্থিত অনুকূল ঠাকুরের আশ্রম অভিমুখে। পথ চলার অন্তবর্তী সময়ে **'রত্নগর্ভা মল্লভূম'** অধ্যায়ের **'শিল্পকলার** আঙ্গিনা'য় উঁকি মারি এখন।

অধ্যায়-১১৬

রত্নগর্ভা মল্লভূম

শিল্পকলার আঙ্গিনায়

শিল্প ও শিল্পীর দেশ মল্লভূম। মল্লমাটির বালুচরী বস্ত্র, কাঁসা, পিতল, মাদুলী, বেলমালা, টেরাকোটা, ঢোকরা, লণ্ঠন, প্রভৃতি শিল্প প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি ইতিমধ্যে। এবার প্রসঙ্গ মল্লভূমের কয়েকজন বিশিষ্ট শিল্পী।

মল্লভূমের বেলিয়াতোড় গ্রামের **যামিনী রায়** (১৮৮৭-১৯৭২ খ্রীঃ) একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন শিল্পী। ভাইসরয় প্রদত্ত **'স্বর্ণপদক'** এবং ভারত সরকার প্রদত্ত **'পদ্মভূষণ'** সম্মানে সম্মানিত এই শিল্পী রূপসী বাংলার সফল রূপকার। তাঁতী, কামার, কুমোর, ছুতোর প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষের এবং আদিবাসী নর-নারীর কর্মময় জীবনের বাস্তবচিত্র রূপায়ণে, ভাগবৎ, পুরাণ, রামায়ণ ও মহাভারতের কাহিনী চিত্রায়ণে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। তন্বী নারী, সমর্থ পুরুষ, সংকীর্তন দৃশ্য, সাঁওতাল নাচ প্রভৃতি ছবির অমর শিল্পী যামিনী রায় মল্লভূমের এক অম্লান গৌরব।

বৃষ্টি ধোয়া মোরামের মাটি থেকে মাটি নিয়ে মূর্তি গড়তে গড়তে আর ক্যালেণ্ডারের ছবি দেখে ছবি আঁকতে আঁকতে যে শিশুটি ক্রমশঃ একজন ভারত বিখ্যাত ভাস্কর্যের স্তরে উন্নীত হয়েছিলেন তিনি হলেন বাঁকুড়া শহরের যুগীপাড়ার দরিদ্র সন্তান শিল্পী **রামকিঙ্কর বেইজ** (১৯০৬-১৯৮০ খ্রীঃ)। বাঁকুড়ার কৃতী সন্তান রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরেই তিনি আসেন শান্তিনিকেতনে। সেখানেই তাঁর শিল্প-প্রতিভা পুষ্টি ও পূর্ণতা লাভ করে। খেটে খাওয়া মানুষের ক্ষুধা-তৃষ্ণা, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার বাঙ্ময় রূপায়ণে তিনি এক সফল শিল্পী। একদা বিশ্বভারতীর কর্মপরিষদের সদস্য ও ললিতকলা একাডেমির সদস্য রামকিঙ্কর বেইজ রবীন্দ্রভরতী প্রদত্ত সাম্মানিক ডি. **লিট**., বিশ্বভারতী প্রদত্ত **দেশিকোত্তম** এবং ভারত সরকার প্রদত্ত **পদ্মভূষণ** উপাধিতে ভূষিত এই ব্যক্তিটি বাঁকুড়া তথা রত্নগর্ভা মল্লভূমের এক উল্লেখযোগ্য রত্নবিশেষ। **"প্রকৃত অর্থে, ভারতীয় আধুনিক ভাস্কর্য ও চিত্রকলার তিনি ছিলেন পথিকৃত।"**

বিষ্ণুপুর মহকুমার চুয়ামসিনা গ্রামের **সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়** ছিলেন প্রকৃতি প্রেমিক এবং প্রকৃতির নয়নলোভা রূপের পূজারী। রূপতাপস আখ্যায় ভূষিত "সত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর তুলির স্পর্শে ফুটিয়ে তুলেছেন দৈনন্দিন ঋতুবৈচিত্রময় গ্রাম বাংলার সুষমাভরা শাশ্বতজীবন। তাঁর উল্লেখযোগ্য শিল্পকর্মের মধ্যে পিতা কণ্ব, দিলীপের

অস্ত্রপরীক্ষা, মা ও ছেলে, দাদু ও নাতনী, বাঙলার বিয়ে, সাঁওতাল ছেলে, বর্ষা, বাউল, রাখাল মিস্ত্রী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।"[১]

বিষ্ণুপুর শহরের মল্লেশ্বর মহল্লার ভট্টাচার্য পল্লীর **রাধামোহন ভট্টাচার্য** (১৯০৮-১৯৮৩ খ্রীঃ) মল্লভূমের এক বিস্ময় মানুষ। একাধারে মেধাবী ছাত্র, আইনজীবী, সুগায়ক, বাদ্যযন্ত্র-শিল্পী, অভিনেতা, লেখক, সৃষ্টিধর্মী সমালোচক বহুভাষাবিদ এই ব্যক্তিটি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। পাটনাতে আইন বিভাগে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার পরই পাটনাতেই ওকালতি পেশার মাধ্যমে কর্মজীবনের সূচনা। পরবর্তীকালে পাটনা থেকে মেদিনীপুর কোর্টে যোগদান করেন আইনজীবী রূপে। কিন্তু আইনের বাঁধনে বাঁধা না পড়ে তিনি বেরিয়ে পড়েন ভারত ভ্রমণে। বাংলা, ইংরাজী, সংস্কৃত, ফরাসী, জার্মানী ও রাশিয়ান ভাষাতে পারদর্শী ভট্টাচার্য মহাশয় আনন্দবাজার, স্টেটস্ম্যান হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড প্রভৃতি জনপ্রিয় পত্রিকাগুলিতে লিখতেন নিয়মিতভাবে। লেখালেখির সূত্রে অল্প-স্বল্প অর্থাগম হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। এমতাবস্থায় জনৈক কাষ্ঠ ব্যবসায়ীর ম্যানেজার পদে নিযুক্ত হন।

আইনের কচ্‌কচানি আর কাঠ ব্যবসার নীরস লেন-দেনের মাধ্যমে তাঁর অন্তর্নিহিত অবদমিত শিল্প সত্তাটি যেন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে নিজেরই অজান্তে। ওসব ছেড়ে ছুড়ে শেষমেষ তিনি দেখা দিলেন রূপকথার রূপালী পর্দায়। প্রথমে 'অপরাধ' ছবিতে ভিলেনের ভূমিকায়, পরে বোম্বে থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত 'তমন্না' ছবিতে অভিনয় করেন। দুটি ছবিই ফ্লপ্ করে। দুর্ভাগ্যের হাত ধরে সেদিন তাঁর জীবনে সৌভাগ্য-সূর্য উদিত হয়েছিল অসিতরঞ্জন ঘোষ পরিচালিত **'স্বর্ণসীতা'** এবং বাংলা সিনেমা জগতের 'মাইলস্টোন' রূপে চিহ্নিত **'উদয়ের পথে'** চলচ্চিত্রদ্বয়ে নায়কের ভূমিকায় অভিনয়কে কেন্দ্র করে। উদয়ের পথে ছবিটিতে আশাতীত সাফল্যের পর তিনি 'জীবন সৈকতে', 'অভিযাত্রী', 'ভুলি নাই', 'সুধার প্রেম', 'শঙ্খবাণী', 'রাণী ভবানী', 'মানদণ্ড', 'ডাউন ট্রেন', 'দর্পচূর্ণ' 'আঁধি', 'আকালের সন্ধানে,' 'কাবুলিওয়ালা', 'ক্ষুধিত পাষাণ,' 'ঝিন্দের বন্দী' প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করে দর্শক-মনে গভীর রেখাপাত করে সিনেমা জগতের এক সার্থক অভিনেতা হিসেবে পরিগণিত হন। শুধু সিনেমা নয়, স্টার থিয়েটারে নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমেও এই শ্রীদর্শন অভিনেতা নাট্যামোদী মানুষের মনে আনন্দের উৎসধারা রূপে প্রতিভাত হন এবং 'ক্ষুধিত পাষাণ' ছায়াছবিটিতে অসাধারণ অভিনয়ের জন্যে চলচ্চিত্রের 'জাতীয় সম্মান' লাভ করেন।

বাংলা চলচ্চিত্র জগতের আর একটি প্রায় সর্বজন বিদিত নাম **সুমিত্রা দেবী**। সুমিত্রা দেবীর আসল নাম **নীলিমা চট্টোপাধ্যায়**। জন্ম ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলার মালিয়াড়া গ্রামে। পিতা মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয়ে তীব্র নেশা ছিল। পিতার উৎসাহেই তাঁর অভিনয় জগতে আত্মপ্রকাশ ঘটে। অভিজাত ও রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে হিসেবে চলচ্চিত্রে অভিনয়ের ক্ষেত্রে তাঁকে তীব্র বাধার সম্মুখীন হতে হয়। এজন্য 'সুমিত্রা দেবী' ছদ্মনামে চলচ্চিত্র জগতে তাঁর আবির্ভাব। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সন্ধি' ছায়াছবিতে তিনি প্রথম অভিনয় করেন এবং বি. এফ. জে. এ. র প্রদত্ত শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর সম্মানে ভূষিত হন। পরবর্তীকালে তিনি 'পথের দাবী', 'প্রতিবাদ', 'অভিযাত্রী', 'দেবী চৌধুরাণী', 'সাহেব বিবি গোলাম', 'সমর', 'স্বামী', 'দস্যুমোহন', 'অসবর্ণা', 'আঁধারে আলো', 'একদিন রাত্রে' প্রভৃতি বাংলা ছবিতে অভিনয় করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর অভিনীত হিন্দী ছবিগুলির মধ্যে 'জাগতে রহো', 'আনটাচেবল্', 'মাই সিস্টার', 'মশাল', 'রাজযোগী',

১. বাঁকুড়া পরিচয়—শ্রীস্বপনকুমার খাঁ, পৃঃ—৯২

'উঁচ্ নীচ্' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুমিত্রা দেবীর মতো এক সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা সিনেমায় অভিনয় করে চলচ্চিত্র জগতে মহিলা অভিনেত্রীদের পথ সুগম করেছিলেন। এজন্য তিনি বিশেষভাবে স্মরণীয়।

অনিলকৃষ্ণ কর্মকার (১৯৩৪-১৯৮৫ খ্রীঃ)—বিষ্ণুপুরের অনিলকৃষ্ণ কর্মকার একাধারে কবি, সাহিত্যিক, স্থপতি ও শিল্পী। কৈশোর থেকে যৌবন অবধি নানান প্রতিকূলতাকে জয় করে অবশেষে বাস্তুকলাবিদ্যায় স্বর্ণপদক লাভ করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি সহজাত দুর্বলতা ছিল ছোটবেলা থেকেই। তাঁর সেই সহজাত প্রতিভার স্ফুরণ ঘটে কর্মজীবনে প্রবেশ করে। বিষ্ণুপুর 'কে. জি. ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউটে' অধ্যাপনার পাশাপাশি শিল্প, সাহিত্য ও স্থপতি-বিদ্যায় মৌলিক চিন্তাধারার হাত ধরেই নেমে আসে তাঁর সৃজনীশক্তির জনপ্রিয়তা। বিষ্ণুপুরের মন্দির-স্থাপত্য বিষয়ক টেরাকোটা রীতির ছবি আঁকায় নিমগ্ন থাকেন বেশ কয়েক বছর। নিমগ্ন থাকেন সাহিত্য সাধনায়। বাংলা ভাষার নামীদামী পত্র-পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা লিখেছেন। পরবর্তীকালে ছোটদের পত্র-পত্রিকাগুলিতে লিখেছেন গল্প ও ছড়া। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান গৌতমের 'ছবিতে গল্প-র' জন্য সুপ্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির অসংখ্য গল্পের 'চিত্রনাট্য-সংলাপ' তৈরী করেছেন। বিশ্ব-সাহিত্যের বারোটি 'বিদেশী কমিক্স বই'-এর সুখপাঠ্য এবং রসঘন অনুবাদ করে পাঠক-হৃদয়ের নিভৃত আসনে উপবিষ্ট আছেন আজও। তাঁর সাহিত্য ও শিল্পসত্তার সৌরভে সুরভিত দশদিক।

শিল্পকলার আঙ্গিনা ছেড়ে এই মুহূর্ত আমরা এসে হাজির হয়েছি অনুকূল ঠাকুরের স্নেহাঙ্গনে তথা পুণ্যাঙ্গনে তথা সৎসঙ্গ কেন্দ্রে।

অধ্যায়-১১৭

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুরের আশ্রম—সৎসঙ্গ, উজালা কারখানা ও লাইট হাউস

'সৎসঙ্গ' নামে পরিচিত শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল চন্দ্রের এই আশ্রমটি গত ১৯৯৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই জুন জন্ম লাভ করে বিষ্ণুপুর সংলগ্ন ঘুগীমুড়া মৌজায় এবং সৎসঙ্গ কেন্দ্রের যথাবিধি নিয়মানুসারে ভক্তের ভগবান শ্রীশ্রীঠাকুর এখানের একটি উপাসনা কক্ষে আপাত প্রতিষ্ঠিত হন সাড়ম্বরে ও ইষ্টনিষ্ঠা সহকারে। শুভ প্রতিষ্ঠা দিবস থেকে অদ্যাবধি ত্রিসন্ধ্যা ভোগরাগ এবং প্রার্থনা উপাসনাদি সহ শ্রীশ্রীঠাকুর এখানে পূজিত হয়ে আসছেন ভক্তবৃন্দের ভক্তিঅর্ঘ্য দিয়ে। বাউগুরী দেওয়া ত্রিভুজ আকৃতির পাঁচ বিঘা জমির উপর এই সৎসঙ্গ কেন্দ্রটিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের মন্দির নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ার কথা শীঘ্রই। গত ২০০৩ খৃষ্টাব্দের ১৯শে জানুয়ারী এখানেই বাঁকুড়া জেলার সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলির **'জেলা উৎসব'** ধুমধাম সহকারে পালিত হয়। উক্ত উৎসবে ৪০-৫০ হাজার ভক্ত-অনুরাগীর সমাবেশ হয়। বিষ্ণুপুর ছাড়াও বাঁকুড়া, কমলপুর, ছাতনা, সারেঙ্গা, খাতড়া, সোনামুখী, ইন্দাস, পাত্রসায়ের, কোতুলপুর, ময়নাপুর প্রভৃতি স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সৎসঙ্গ কেন্দ্র এবং ছড়িয়ে রয়েছে ঠাকুরের হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ। শুধু বাঁকুড়া বা পশ্চিমবঙ্গ নয় সারা ভারতে এবং বাংলাদেশে ঠাকুরের জন্মস্থান সহ বিভিন্ন স্থানে সৎসঙ্গ কেন্দ্র রয়েছে। রয়েছে ঠাকুরের গুণমুগ্ধ অসংখ্য, অগণিত শিষ্য। কথায় বলে 'সৎ সঙ্গে

স্বর্গ বাস, অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ'। আসুন, এক্ষণে আমরা একটু সৎসঙ্গ করি। মহাপুরুষ-মুখনিঃসৃত মহাবাণী শুনে অন্তরাত্মা পবিত্র করি।

- ধর্ম্ম কখনও বহু হয় না, ধর্ম্ম একই আর তার কোন প্রকার নেই।
- যার-উপর যা'-কিছু-সব দাঁড়িয়ে আছে তাই ধর্ম্ম, আর তিনিই পরমপুরুষ।
- অহংকে যত দূরে রাখবে তোমার জ্ঞানের বা দর্শনের পাল্লা তত বিস্তার হবে।
- যা' তুমি জান না, এমন বিষয়ে লোককে উপদেশ দিতে যেও না।
- দিয়ে দাও, নিজের জন্য কিছু চেও না, দেখবে, সব তোমার হ'য়ে যাচ্ছে।
- যত পার সেবা কর, কিন্তু সাবধান, সেবা নিতে যেন ইচ্ছা না হয়।
- কখনও নিন্দা ক'রো না, কিন্তু অসত্যের প্রশ্রয় দিও না।
- বীর হও, কিন্তু হিংস্রক হ'য়ে বাঘ-ভালুক সেজে ব'স না।
- স্থিরপ্রতিজ্ঞ হও, গোঁয়ার হ'য়ো না।
- নিজেকে নিজে প্রশংসা দিতে কৃপণ সাজ, কিন্তু অপরের বেলায় দাতা হও।
- বন্ধুত্ব খারিজ ক'রো না, তাহ'লে শাস্তিতে সমবেদনা ও সান্ত্বনা পাবে না।
- নিজের মৃত্যু যদি অপছন্দ কর তবে কখনও কাউকে 'মর' ব'লো না।
- স্পষ্টবাদী হও, কিন্তু মিষ্টভাষী হও।
- সাধু সেজো না, সাধু হ'তে চেষ্টা ক'র।
- সাধু মানে যাদুকর নয়কো, বরং ত্যাগী, প্রেমী।
- অন্তরে যা' গোপন করবে তা'ই বৃদ্ধি পাবে।
- অপরের মঙ্গল-কামনাই নিজ মঙ্গলের প্রসূতি।
- ধনী হও ক্ষতি নাই, কিন্তু দীন এবং দাতা হও।
- অভাবে পরিশ্রান্ত মনই ধর্ম্ম বা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করে, নতুবা করে না।
- শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দুই ভাই, একটি আসলে আর একটি আসবেই।
- বিশ্বাস পেকে গেলে কোন বিরুদ্ধ ভাবই তাকে টলাতে পারে না।
- বিষয়ে মন সংলগ্ন থাকাকে আসক্তি বলে, আর সৎ-এ সংলগ্ন থাকাকে ভক্তি বলে।
- অসৎ-এ আসক্তি থেকে ভয়, শোক ও দুঃখ আসে।
- অসৎ পরিহার কর, সৎ-এ আস্থাবান হও, ত্রাণ পাবে।
- সৎ-চিন্তায় নিমজ্জিত থাক, সৎ-কর্ম্ম তোমার সহায় হবে এবং তোমার চতুর্দ্দিক সৎ হ'য়ে সকল সময় তোমাকে রক্ষা করবেই করবে।
- সদ্‌গুরুর শরণাপন্ন হও, সৎ-নাম মনন কর, আর, সৎসঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ কর— আমি নিশ্চয় ব'লছি তোমাকে আর তোমার উন্নয়নের জন্য ভাবতে হবে না।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুরের সদুপদেশ শুনে সৎ-সঙ্গ করার সময় সাঙ্গ হল। ঠাকুরের চরণযুগলে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে পড়ি এখান থেকে। এই অবকাশে বলি, আশ্রমের পিছনের দেওয়াল ঘেঁসে যে বিরাট শেড দেখা যাচ্ছে ঐটি হল 'উজ্জালা কারখানা'র একটি শাখা। ২৪.১২.১৯৯৯ খৃষ্টাব্দে কারখানাটি চালু হয়। এই কারখানায় বর্তমানে

১৫ জন পুরুষ ও ১৭০ জন মহিলা কাজ করেন। কলকারখানা বিহীন বিষ্ণুপুর বাঁকুড়ার ভয়াবহ বেকারত্বের যুগে ১৮৫ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়ে কারখানাটি বিষ্ণুপুরের মানুষজনের, বিশেষতঃ কর্মীদের নয়নমণি রূপে প্রতিভাত হয়েছে আজ।

আশ্রম থেকে বেরোতেই আমাদের নজরে পড়ে তারকাঁটা দিয়ে বেড়া দেওয়া বিশাল এক প্রাঙ্গণ যার মধ্যে দেখা যাচ্ছে জনমানবহীন খান দশ এগারো কোয়ার্টারস্ টাইপের বিল্ডিং। প্রাঙ্গণে প্রবেশ-পথের দুপাশের দেওয়াল-লিপি থেকে জানা যায় এটি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থা। **'লাইট হাউস'** নামে পরিচিত এই প্রতিষ্ঠানটির কাজ ছিল সমুদ্রে ভাসমান জাহাজগুলিকে বিশেষ যান্ত্রিক-পদ্ধতিতে সংকেত পাঠানো। সংকেত পাঠানোর কাজে ব্যবহৃত খুবই সুউচ্চ একটি টাওয়ার ছিল এখানে। ভারতের পূর্ব উপকূলের সমুদ্রে ভাসমান জাহাজগুলিকে ডেকা (DECCA) যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংকেত পাঠানোর জন্যই এটি 'EAST COAST DECCA NAVIGATOR CHAIN GREEN SLAVE STATION' নামে আখ্যায়িত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের ডায়মণ্ড হারবার, উড়িষ্যার বালেশ্বর ও পাটপুর এবং গুজরাটের কয়েকটি স্থানে এধরনের লাইট হাউস আছে। এগুলিকে ভাষান্তরে LORAN–C STATION বলে। LORAN হল 'Long Range Navigation'—এর সংক্ষিপ্ত রূপ। বর্তমানে অত্যাধুনিক LORAN-C পদ্ধতি প্রচলিত হওয়ায় DECCA যান্ত্রিক পদ্ধতি অচল হয়ে পড়েছে। LORAN-C পদ্ধতিতে সমুদ্রতট থেকে স্টেশনটির দূরত্ব কম হওয়া বিজ্ঞান সম্মত কিন্তু বিষ্ণুপুরের দূরত্ব বেশী হওয়ার ফলে এটি কাজের অনুপযোগী হয়ে পড়ে। তাই এটি আপাততঃ বন্ধ রাখা হয়েছে।

ভারতের সমুদ্র উপকূলে এবং সমুদ্র উপকূলবর্তী পাহাড়ের উপরে আর এক ধরনের লাইট হাউস দেখা যায়। সুউচ্চ স্তম্ভাকৃতির ঐসব লাইট হাউসগুলির প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক রঙে রঞ্জিত থাকে। দুটি রঙের ডুরেকাটা ঐ স্তম্ভগুলির রঙ দেখে সাগরের বুকে ভাসমান জাহাজের ক্যাপ্টেন বুঝতে পারেন তাঁর জাহাজ কোন বন্দরের কাছাকাছি এসেছে। দিনের বেলা স্তম্ভের রঙ দেখে এবং রাত্রিবেলা উক্ত স্তম্ভের উপর প্রোথিত ঘূর্ণায়মান সার্চলাইটের আলো দেখে ক্যাপ্টেন তাঁর যাত্রাপথ নির্ধারণ করতে পারেন সহজেই। সাগরদ্বীপ, পারাদ্বীপ, মাদ্রাজ, কেরল, মুম্বই ও আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে এ ধরনের লাইট হাউস আছে।

লাইট হাউসকে বিদায় জানিয়ে অহল্যাবাঈ রাস্তার বুকে পা রেখে রেখে আমরা এখন এগিয়ে যাবো আসার পথে ছেড়ে আসা তুড়কী আশ্রম বা হরিতপোবন আশ্রম অভিমুখে। যাবার পথে আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠবো পরাধীন ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনে।

অধ্যায়-১১৮

রত্নগর্ভা মল্লভূম

ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনে

আজ আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক। ১৯০ বছর ১ মাস ২২ দিনের পরাধীনতার গ্লানি মুছে ব্রিটিশ সরকারকে দূর-হটিয়ে অহিংস ও সহিংস আন্দোলনের হাত ধরে এসেছে বহু ঈপ্সিত স্বাধীনতা। অহিংস অসহযোগ (১৯২০-২২ খ্রীঃ), আইন অমান্য (১৯৩০-৩৪ খ্রীঃ), ভারত ছাড়ো (১৯৪২ খ্রীঃ) প্রভৃতি আন্দোলনের কথা লেখা আছে ইতিহাসে।

লেখা আছে ঐ সব আন্দোলনের পুরোভাগের নেতৃবৃন্দের কথা। ভারতব্যাপী এই সব আন্দোলনের নীচের তলার মানুষেরা স্থান পায়নি দেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে। তাঁদের কথা লেখা হয়নি স্বর্ণাক্ষরে। কবিগুরুর ভাষায় তাই বলি—

"কথা কও, কথা কও।
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী, অচেতন তুমি নও—
কথা কেন নাহি কও?
যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই,
তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই,
বিস্মৃত যত নীরব কাহিনী স্তম্ভিত হয়ে রও।
ভাষা দাও তারে, হে মৌন অতীত, কথা কও, কথা কও॥"

সোনার কাঠি রূপার কাঠি ছুঁইয়ে রূপকথার রাজকুমারীর ঘুম ভাঙানোর ঐন্দ্রজালিক কৌশলে যদি সেই মৌন অতীতকে প্রাণবন্ত করা যায়, যদি সেই মৌন অতীত হয়ে ওঠে মুখর তাহলে ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচনে আরো অনেক অনেক বীর সন্তান- সন্ততি জেগে উঠবে ভারতের আনাচে, কানাচে, প্রত্যন্ত অঞ্চলে। গগনচুম্বী বহুতল অট্টালিকার শীর্ষতলার গুরুভার যেমন নিভৃতে নীরবে বয়ে চলে মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা ইষ্টকরাজি, অনুরূপভাবে ভারতজোড়া স্বদেশী আন্দোলনের শীর্ষস্তরের নেতৃবর্গের শক্তি-সামর্থ্যের গুরুভার বহন করেছেন দেশের অগণিত উপেক্ষিত সাধারণ মানুষ। প্রাসাদের শীর্ষদেশ দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিকট ও দূরের মানুষের তথা সর্বসাধারণের। পক্ষান্তরে নীচের তলার ইঁটগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন বাস্তুবিশারদগণ এবং প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ; অনুরূপভাবে ভারতের গ্রামে-গঞ্জে, পল্লীতে পল্লীতে, জেলায় জেলায় লুকিয়ে থাকা বিস্মৃতপ্রায় সেই সব সংগ্রামী মানুষেরা আজ গবেষকমহলের গবেষণার বিষয়ে পর্যবসিত।

দেশ-মাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল উত্তাল, হয়ে উঠেছিল অগ্নিগর্ভা। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অত্যাচারের ঊষালগ্ন থেকেই বাংলার মাটিতে জ্বলে উঠেছিল বিদ্রোহের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ; আকাশে, বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছিল বিদ্রোহের দাবানল।

ইতিহাস বলে, মোগল সম্রাট জাহাঙ্গীরের (১৬০৫-১৬২৭ খ্রীঃ) অনুমতিক্রমে ইংরেজ বণিক টমাস রো ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে শুরু করেন ব্যবসা। কালক্রমে কোলকাতা হয়ে ওঠে ইংরেজ বণিকদের ব্যবসার প্রধান কেন্দ্র। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জুন পলাশীর প্রান্তরে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় সিরাজদ্দৌলার মর্মান্তিক পরাজয়ের মাধ্যমে সেদিন অস্তমিত হয়েছিল বাংলা তথা ভারতের স্বাধীনতা-সূর্য। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসার নামে শোষণ-যন্ত্রে নিষ্পেষিত হচ্ছিল আপামর ভারতবাসী। স্বাধীন মল্লরাজ্যেও থাবা বসিয়েছিল কোম্পানী। বাংলার নবাব মীরকাশেমের (১৭৬০-১৭৬৪ খ্রীঃ) কাছ থেকে কোম্পানী জঙ্গলমহলের রাজস্ব আদায়ের অধিকার অর্জন করে। জঙ্গলমহলের অন্তর্ভুক্ত মল্লভূমের শ্রমজীবী, কৃষিজীবী ও নিম্নবর্গের মানুষেরা করভারে প্রপীড়িত হয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়েন। স্থানীয় রাজন্যবর্গ রাজত্ব হারিয়ে করদ জমিদার গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হন ক্রমশঃ।

সমসাময়িক কালে মল্লভূমের মল্লরাজ্যের ইতিহাসের আয়নায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে একটি করুণ চিত্র প্রতিবিম্বিত হয়। বর্গী আক্রমণে পরাজিত না হলেও দারুণভাবে বিধ্বস্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন মল্লরাজা গোপাল সিংহ (১৭১২-১৭৪৮ খ্রীঃ)। গোপাল সিংহের পর চৈতন্য সিংহ বসেছিলেন রাজ-সিংহাসনে। কোম্পানীর দাপটে রাজার পরিবর্তে করদ জমিদারে পরিণত হয়েছিলেন তিনি। রাজ্যশাসন করতে গিয়ে ছিয়াত্তরের (১৭৭০ খ্রীঃ

১২৭৬ বঙ্গাব্দ) মন্বন্তরে নিষ্পেষিত হয়েছেন। কোম্পানীকে চুক্তিমতো কর দিতে ব্যর্থ হয়ে কারাবাস করেছেন বারংবার। কোলকাতার গোকুল মিত্রের কাছে বন্ধক পড়েছে বিষ্ণুপুরের নগর-দেবতা শ্রীশ্রী মদনমোহন জীউ।

মল্লরাজাদের রাজত্বকালে নিষ্কর, চাকরান, পাইকান, ঘাটোয়ালী ও মোকরারী স্বত্বভোগী জমির মালিকগণ ও কৃষিজীবী মানুষজন ছিলেন সুখী ও স্বচ্ছল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নামক রক্ত-চোষা জোঁকের শোষণে শোষিত রাজা, প্রজা, জমিদার সকলেই ভিতরে ভিতরে ক্ষুব্ধ।

১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী জমি বন্দোবস্তের ফলে পূর্বোক্ত পাইক, ঘাটোয়াল, বরকন্দাজদের নিষ্কর ও স্বল্প করের জমি-ভোগ-স্বত্ব থেকে উচ্ছেদ করা হয়। জমিদার সম্প্রদায়ের উপর নির্ভরশীল, কুটীরশিল্পী এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সঙ্কট কানায় কানায় ফেনিল হয়ে ওঠে। তারই ফল হিসেবে ১৭৮৯-৯১ খ্রীষ্টাব্দে **'পাহাড়ীয়া বিদ্রোহ'**। ১৭৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া ও উত্তর পশ্চিম মেদিনীপুরে **'চুয়াড় বিদ্রোহ'** এবং ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে **গঙ্গারামের হাঙ্গামা** বিপ্লবের রূপ পরিগ্রহ করে।

কোম্পানীর নির্যাতনে প্রপীড়িত চৈতন্য সিংহের পৌত্র মল্লরাজা মাধব সিংহ (১৮০২-১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ) ইংরেজ বিতাড়নের জন্য অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তাঁর সীমিত ক্ষমতা নিয়ে বাঁকুড়ার সদর ট্রেজারি আক্রমণ করেন এবং কোম্পানীর ফৌজের হাতে ধরা পড়ে কারাবন্দী হন। বকেয়া রাজস্বের দায়ে মল্লরাজ্য ক্রমে ক্রমে নিলাম হয়ে যায়। তৎকালে মল্লভূম ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে "বড় ও মান্য জমিদার বলতে ছিলেন তিনজন। মেদিনীপুরে কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি, ঘাটশীলার রাজা জগন্নাথ ধল ও মল্লরাজা চৈতন্য সিংহ।"[১] অত্যন্ত সাহসী ও বুদ্ধিমতী **রাণী শিরোমণি** ইংরেজদের উপর প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিলেন। কিন্তু তাঁর বিচক্ষণ নায়েবের আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি হতবুদ্ধি এবং অসহায় হয়ে পড়েন। রায়পুরের জমিদার **দুর্জন সিংহ** ও ঘাটশীলার রাজা **জগন্নাথ ধল** রাণী শিরোমণির সাথে যোগাযোগ করে কোম্পানীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করার পরিকল্পনা করেন। কোম্পানী দুর্জন সিংহের নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করে এবং তাঁর জমিদারী নীলাম করিয়ে দেন। দুর্জন সিংহ শ'পাঁচেক বিদ্রোহীকে সঙ্গে নিয়ে রায়পুর আক্রমণ করেন। কোম্পানীর সিপাই ও বরকন্দাজেরা নিহত হয়। বেকায়দায় পড়ে কোম্পানী রায়পুরের জমিদারী ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

রায়পুরে কোম্পানী ধাক্কা খেলেও অন্যত্র তাদের অত্যাচার চলতে থাকে অব্যাহত গতিতে। কোম্পানীর কর্মচারীদের নির্মম অত্যাচারে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বহু ছোটখাটো বিদ্রোহ মাথাচাড়া দেয়। তন্মধ্যে ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে ভেলোরে সিপাহী বিদ্রোহ, ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে বেরিলি বিদ্রোহ, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুর বিদ্রোহ, ১৮৩১-৩২ খ্রীষ্টাব্দে কোল বিদ্রোহ, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে বারাসতের তিতুমিরের বিদ্রোহ, ১৮৫১-৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মোপ্‌লা বিদ্রোহ, ১৮৫৫-৫৬ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা বিহারের সাঁওতাল বিদ্রোহ, উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাস বিদ্রোহ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিষ্ণুপুর, জয়পুর, তালডাংরা অঞ্চলের লায়েক বিদ্রোহ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্রোহ ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহকে ত্বরান্বিত করেছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের জন্য বিলাতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুশাসনকে দায়ী করা হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন পাশ করে ভারতের

১. পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া, পৃঃ—১৩৫

শাসনভার সরাসরি গ্রহণ করেন ইংলণ্ডের রাণী ভিক্টোরিয়া। **এভাবেই ইংরেজ বণিকের মানদণ্ড রূপান্তরিত হয় রাজদণ্ডে।** ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসন তথা অপশাসনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে বাঙালী। বিদ্রোহী বাঙালী জাতির মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার অসৎ উদ্দেশ্যে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করেন। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদে শুরু হয় **'বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন'**।

বঙ্গভঙ্গ রোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বাংলার **'মুকুটহীন রাজা' সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়**। বঙ্গভঙ্গ রোধ করার উদ্দেশ্যে বিদেশী দ্রব্য বয়কট ও স্বদেশী দ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহারের উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। বয়কট আন্দোলনের পরিপূরক হিসেবে স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত। স্বদেশী আন্দোলনের হাত ধরেই বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমে জেগে উঠেছিল জাতীয় চেতনা। এই সময় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি, স্বামী বিবেকানন্দের সেই অভীক বাণী, **"ভুলিও না জন্ম হইতেই তুমি দেশ মাতৃকার জন্য বলি প্রদত্ত।"**—মন্ত্রের মতো কাজ করেছিল। মল্লভূমের শিক্ষিত যুব-সমাজের রক্তে বিদ্রোহের বীজ বপন করেছিল।

মল্লভুমে স্বদেশী আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করতে গেলে **মা সারদার** কথা না বললে আলোচনা হয়ে যায় অসম্পূর্ণ। রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্ঘ-জননী আদ্যাশক্তি-স্বরূপিণী মা ছিলেন বিপ্লবীদের সাহস, শক্তি ও অনুপ্রেরণার উৎসস্থল। ব্রিটিশ-অক্টোপাসের স্বৈরাচারী শাসনে মা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ ছিলেন। ইংরেজ শাসনকে কখনই সুনজরে দেখতেন না তিনি। বিলেতের কলে বোনা কাপড় বিক্রীর উদ্দেশ্যে দেশীয় তাঁতীদের ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল কেটে দিয়ে অকেজো করে দেওয়া হয়েছিল তাঁদের। চরকা কাটা, সূতো তৈরী করা এবং স্বদেশী বস্ত্র উৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হয়েছিল। অর্থাভাবে বিদেশী বস্ত্রও কেনা সম্ভব হয়ে উঠত না সকলের পক্ষে। লজ্জা নিবারণের "বস্ত্রাভাবে নারীদের আত্মহত্যা ও অপরাপর কাহিনী শুনে শ্রীমা অবোধ বালিকার মতো উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন শুরু করেন এবং ক্রমাগত বলতে থাকেন ঃ 'পরনের কাপড় না পেলে মেয়েরা কি করবে! লজ্জা-শরম বাঁচাতে গিয়ে আত্মহত্যা ছাড়া আর উপায় কি।' সেদিন সমবেত ভক্তমণ্ডলীর সামনে অধীরভাবে মা বার বার বলতে থাকেন ঃ **'ওরা কবে যাবে গো, কবে যাবে গো।'**[১] এমতাবস্থায় মা নিজে বারংবার চরকা কাটার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন এবং অন্যান্যদেরও উৎসাহিত করেছিলেন। ফলে শুরু হয়েছিল চরকা কাটা এবং কাপড় বোনা। এই সময় কলে প্রস্তুত বিদেশী মিহি বস্ত্র পরিত্যাগ করে হাতে বোনা স্বদেশী মোটা কাপড় ব্যবহার করার জন্য কবি রজনীকান্ত সেন দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন—

> মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
> মাথায় তুলে নে রে ভাই
> দীন দুঃখিনী মা যে তোদের
> তার বেশী আর সাধ্য নাই ....

শুধু বস্ত্র নয়, খাদ্যাভাবও দেখা দিয়েছিল দারুণভাবে। জয়রামবাটি সন্নিকটস্থ বদনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইউরোপীয় যান্ত্রিক সভ্যতা যেমন রেলপথ, টেলিগ্রাম ইত্যাদির প্রশংসা করে মায়ের কাছে বলেছিলেন, 'ইংরেজ সরকার

---

১. শতরূপে সারদা, পৃঃ—৪৫০

আমাদের দেশের অনেক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বাড়িয়েছে?' একথা শুনে মা বলেছিলেন, 'কিন্তু বাবা, ঐসব সুবিধা হলেও আমাদের দেশের অন্নবস্ত্রের অভাব বড় বেড়েছে। আগে এত অন্নকষ্ট ছিল না।' অপরাপর একটি ঘটনায় ইংরেজদের অত্যাচারে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ মা বলেছিলেন, **'আগে ওদের ধ্বংস হবে—নিজেদের রাজ্য নিজেদের হবে।'**

মা শুধু মুখে একথা বলেই ক্ষান্ত ছিলেন না। কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় তিনি স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লবী সন্তানদের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অবিভক্ত বাংলার ছোট বড় বিশিষ্ট বিপ্লবীগণ মায়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছেন। নিবেদিতার লেখা থেকে জানা যায় স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে দেশপ্রেমিকেরা শ্রীমাকে প্রণাম করে, মায়ের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে 'রণং দেহি' মনোভাব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তেন ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের কাজে। পুলিশের সন্দেহভাজন বিপ্লবীদের মা আশ্রয় দিতেন শত বিপদের ঝুঁকি নিয়ে। **মায়ের বৈঠকখানা নামে পরিচিত কোয়ালপাড়া আশ্রমটি স্বদেশী আন্দোলনের সময় এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।** "আশ্রমের উপরে তখন পুলিসের কড়া নজর এবং নতুন কোন আগন্তুক সেখানে এলে পুলিস তার নামধাম সব লিখে নিয়ে যেত।"[১]

অনুশীলন এবং যুগান্তর দলের সশস্ত্র বিপ্লবীগণও মায়ের আশ্রয়-পুষ্ট ছিলেন। "স্বামীজীর রচনাবলী সম্পর্কে পুলিসের একটা প্রচণ্ড ভীতি ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের অবর্তমানে শ্রীমা ছিলেন বহু দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতা-সংগ্রামীর আশা-আকাঙ্ক্ষা ও অনুপ্রেরণার উৎস, তাঁদের তাপদগ্ধ, নির্যাতিত ও অন্তরীণ জীবনে শান্ত স্নিগ্ধ মরূদ্যান। সঙ্ঘজননীকে প্রাণের ভক্তি জানিয়ে তাঁরা যোগ দিতেন দেশমাতৃকার মুক্তিযজ্ঞে বা হতাশাময় জীবনে শান্তিলাভের আশায় ছুটে আসতেন মায়ের কাছে।"[২] **ঋষি অরবিন্দ** থেকে শুরু করে প্রখ্যাত গান্ধীবাদী জননায়ক **ডক্টর প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ** (পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী) ছিলেন মায়ের কৃপাধন্য। বিপ্লবী **বাঘাযতীন**ও মায়ের কাছে হামেশাই যাতায়াত করতেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় মা ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবর্গের প্রাণপ্রদীপ বা প্রদীপের তৈলাধার স্বরূপ। মায়ের মতোই **"জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবীদের হৃদয়ে যুগাচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ গভীর শ্রদ্ধার আসনে সমাসীন ছিলেন। বিপ্লবী সমিতিতে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি পূজা পেত এবং বিপ্লবীরা রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নির্দেশিত পথে আত্মগঠনে প্রয়াসী হতেন।"**[৩] প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় বিপ্লবীদের অনেকেই পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী হয়েছিলেন।

"ভারতীয় চরম্‌পন্থী (Extremists) নেতৃবৃন্দের কাছে আধ্যাত্মিকতাই ছিল ভারতীয় জাতীয়-আন্দোলনের মূল ভিত্তি এবং জাতীয়-মুক্তি সংগ্রাম ছিল স্পষ্টতই একটি আধ্যাত্মিক আন্দোলন। প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্য, ইতিহাস, গীতা, বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি ছিল চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের অনুপ্রেরণার উৎস।"[৪]

বিষ্ণুপুরের ঢেলাদুয়ার মহল্লার ব্যবসায়ী ও জমিদার পরিবারের সুরেন্দ্রনাথ কর ছিলেন মায়ের মন্ত্রশিষ্য। ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনের মহৎ উদ্দেশ্যে সমৃদ্ধ পরিবারের সুখ-সম্ভোগকে উপেক্ষা করে কোলকাতায় বি. এস. সি. পাঠরত অবস্থায় তিনি হয়েছিলেন বিপ্লবী। অবিবাহিত সুরেন করকে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে ব্রিটিশ পুলিশ গ্রেপ্তার করে পাঠিয়ে দেয় কাকদ্বীপের অন্তরীণ কারাগারে। সেখানে সব রকম প্রলোভনের মুখেও বিপ্লবী দাদা-ভাই ও বন্ধুদের নাম বলতে অস্বীকার করায় তাঁর উপর প্রচণ্ড নির্যাতন হয়। নির্যাতনের অসহ্য যন্ত্রণায় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে গলায় ফাঁস দিয়ে

---

১. ২. ৩. ৪. শতরূপে সারদা, পৃঃ— যথাক্রমে ৪৫২, ৪৫৫, ৪৫৪, ৪৫৪

তিনি আত্মহত্যা করেন। অবশ্য অনেকের ধারণা এটা আত্মহত্যা নয়, তাঁকে মেরে ফেলা হয়েছিল। **মল্লমাটির প্রথম শহীদ "সুরেন করের আত্মহত্যার খবরে গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মা বলেন ঃ হে ঠাকুর, আর কতদিন তুমি এই সরকারের অনাচার সইবে?"**[১] বাঁকুড়া জেলার স্বদেশী আন্দোলনে মায়ের ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি বিষ্ণুপুরের **অবনীভূষণ ঘোষ** (পরবর্তী জীবনে **স্বামী প্রভবানন্দ** নামে প্রসিদ্ধ), এবং **গোকুলচন্দ্র ঘোষ** (মায়ের মন্ত্রশিষ্য) এই দুই সহোদর ভ্রাতাও সুরেন্দ্রনাথ করের বৈপ্লবিক কার্যের সহকর্মী ছিলেন।

১৮৮৫-১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয় কংগ্রেসে নরমপন্থীদের প্রাধান্য ছিল। কংগ্রেস ব্রিটিশ সরকারের সাথে সরাসরি সংগ্রামে না গিয়ে অনুনয় বিনয় ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমে স্বায়ত্বশাসন আশা করেছিল। সেই আশায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯১৪-১৯১৯ খ্রীঃ) ব্রিটিশ সরকারের আপৎকালে স্বরাজের শর্ত সাপেক্ষে জাতীয় কংগ্রেস অর্থ, সামর্থ্য ও সৈন্য দিয়ে ব্রিটিশের যুদ্ধ জয়কে সুনিশ্চিত করেছিল। বিনিময়ে পেয়েছিল বিশ্বাসঘাতকতা। ভুল ভাঙে কংগ্রেসের। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসে যোগ দিলে গান্ধীজীর প্রভাবে দেশের কৃষক, শ্রমিক ও অন্ত্যজবর্ণের অগণিত মানুষ কংগ্রেস আন্দোলনের সামিল হয়। কংগ্রেস দল 'সামুদ্রিক গভীরতা' (Sea Depth) লাভ করে এবং সমগ্র জাতির মুখপাত্রে পরিণত হয়। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীর নেতৃত্বে 'অহিংস অসহযোগ' আন্দোলন শুরু হয়।

১৯২০-২১ খ্রীষ্টাব্দে অধ্যাপক অনিল বরণ রায়ের নেতৃত্বে বিষ্ণুপুর কংগ্রেস দল আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। "**বিপ্লবী বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী**, ২-এর দশকে বিষ্ণুপুরে আসেন ও **ভূদেবচন্দ্র মণ্ডল, ভুজঙ্গভূষণ মণ্ডল** মহাশয়দের পৈতৃক বৈঠকখানায় আতিথেয়তা গ্রহণ করেন ও তৎকালীন কর্মীদের জাতীয় চেতনায় আলাপ আলোচনার মাধ্যমে উদ্বুদ্ধ করেন। স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিদ ও সাম্যবাদী নেতা **ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত** বিষ্ণুপুরে এসেছেন একাধিকবার ও স্বদেশী কর্মীদের মধ্যে সমাজতন্ত্রের আদর্শ গড়ে তোলার চেষ্টা চালিয়েছেন।"[২] ফলস্বরূপে বলবতী হয়েছে আন্দোলনের রূপরেখা। সংগ্রামী চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়েছেন মল্লভূমের মানুষজন।

পঞ্চম জর্জ নামে পরিচিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পুত্র Prince of Wales ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতা আসেন। তাঁর কোলকাতা আগমনের প্রতিবাদে ভারতব্যাপী আন্দোলন হয়। সেই আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে বাঁকুড়া জেলা তথা মল্লমাটিতে। বাঁকুড়া জেলা থেকে শতাধিক সত্যাগ্রহী কোলকাতায় গিয়ে কারাবরণ করেন। জেলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এটাই বোধ হয় কংগ্রেসী আন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকার প্রথম দৃষ্টান্ত।

স্বদেশী আন্দোলনের শুভ সূচনা থেকেই বাংলার কবি-সাহিত্যিক সম্প্রদায় অসির পরিবর্তে তুলে নিয়েছিলেন মসী। জ্বালাময়ী বক্তৃতা ও দেশাত্মবোধক সঙ্গীত সংলাপে বিদ্রোহের হলকা আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সুপার সাইক্লোনের ক্ষিপ্রতায়। **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর** দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়ে লিখলেন—

চল্ রে চল্ সবে ভারত সন্তান
মাতৃভূমি করে আহ্বান ...

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিন্দুমাত্র দেরী না করে সকলকে দেশের জন্য আত্মদান করতে, উৎসাহিত করলেন—

---

১. শতরূপে সারদা, পৃঃ—৪৬৪

২. বিড়াই (প্রসঙ্গ বিষ্ণুপুর) ৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৯৯৭ ডিসেম্বর, পৃঃ—৪৪

"এখন আর দেরী নয়, ধর্ গো তোরা
হাতে হাতে ধর্ গো।
....
আত্মদানের উৎসধারায়
মঙ্গল ঘট ভর্ গো।"

বিদ্রোহী কবি নজরুল যুদ্ধযাত্রার বিপদ আপদ সম্পর্কে সচেতন হয়ে এগিয়ে যেতে বললেন—

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁশিয়ার ...

অতুলপ্রসাদ সেন অভয়বাণী শুনিয়ে গেয়ে উঠলেন—

হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর
হও উন্নত শির নাহি ভয়...

বাঁকুড়া খ্রীষ্টান কলেজের অধ্যাপক **অনিল বরণ রায়** কর্মজীবনের বন্ধন ছিন্ন করে বহু ছাত্র নিয়ে সদলবলে গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। সংগঠনের কাজে তিনি ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি থাকাকালে ইনি ছিলেন দলের সম্পাদক। ১৯২৪ থেকে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও সুভাষ বসুর সাথে কারাবাস করেন। অনিলবাবু দলের বৃহত্তর স্বার্থে প্রাদেশিক স্তরে যোগ দিলে 'বাঁকুড়ার গান্ধী' নামে পরিচিত **গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ** জেলা কমিটির সভাপতির পদ অলংকৃত করেন। গোবিন্দ প্রসাদের নেতৃত্বে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে 'ইউনিয়ন বোর্ড' বর্জনের আন্দোলন শুরু হয় বাঁকুড়া জেলায়। এই সময় ইন্দাস সহ বাঁকুড়া জেলার বিভিন্ন স্থানের চৌকিদারগণ ইউনিয়নবোর্ডের কর্ম ত্যাগ করে দেশপ্রেমের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীর কারাবরণের প্রতিবাদে ভারতব্যাপী আন্দোলনের অংশ হিসেবে বাঁকুড়া জেলাতেও সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়।

বিষ্ণুপুরে **রাধাগোবিন্দ রায়, রামনলিনী চক্রবর্তী**, আইনজীবী **ভূপতি সরকার, সরোজ সরকার**, ইন্দাসের **বঙ্কিমচন্দ্র দাস, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, উমেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়** প্রমুখের নেতৃত্ব এবং সক্রিয় ভূমিকায় কংগ্রেসী আন্দোলনের ব্যাপক প্রসার ঘটে। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নজরুলের সাথে মহাত্মা গান্ধী বাঁকুড়াতে আসেন ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে। মহাত্মা গান্ধীর বাঁকুড়া আগমনের ফলে আন্দোলনে আসে গতি। ১৯২৫-এর পর হয় সঙ্গীতের টানে, নয়তো বা আন্দোলনের সংগঠনের স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণে নজরুল বার বার এসেছেন বিষ্ণুপুরে, বাঁকুড়ায়। শোনা যায় বিষ্ণুপুর নতুনমহল শ্মশানকালীমাতার প্রাঙ্গণে বসে রচনা করেন এই কবিতাটি—

আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলা মূর্তি আড়াল
স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল,
দেব শিশুদের মারছে চাবুক বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি
ভূ-ভারত আজ কসাইখানা আসবি কবে সর্বনাশী।

চকবাজারের জনসভায় নজরুল স্বরচিত কবিতা পড়ে এবং দেশাত্মবোধক গান গেয়ে প্রাণে প্রাণে জ্বালিয়ে দেন বিদ্রোহের মশাল। ১৯২৮, ১৯৩১ ও ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নেতাজী আসেন বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুরের মিউনিসিপ্যাল ময়দানে দাঁড়িয়ে অগ্নিগর্ভ ভাষণ প্রসঙ্গে

তিনি বলেছিলেন—"**যে দেশে দলমাদলের মত কামান তৈরী হয়, আবার মদনমোহনের মত বিগ্রহের বাসস্থান রচিত হয়, যেখানে ভগবানের নামে লোকের চোখে জল পড়ে, যেখানে দেশপ্রেম ও ভক্তির এমন সমন্বয় ঘটে, সে দেশ নিশ্চয়ই বাংলা তথা ভারতকে প্রেরণা দিতে পারে।**" ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের তিলবাড়ি অঞ্চলে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের প্রাদেশিক সম্মেলনের আয়োজন দেখে অভিভূত নেতাজী ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। বলেছিলেন, "**এ যেন বিষ্ণুপুরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরই একটি সাধারণ অধিবেশন চলছে।**"

আন্দোলনের "উন্মেষপর্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন—বিষ্ণুপুরের **বৈকুণ্ঠ** রায়, **গোবিন্দ কর্মকার** (১৮৯১-১৯৬২ খ্রীঃ), অকৃতদার গান্ধীবাদী ব্যক্তিত্ব **ঋষিকেশ মণ্ডল** প্রমুখ। এই জাতীয়তাবাদী ও স্বাধীনতা আন্দোলনকে বেগবতী করতে এগিয়ে এলেন আরো অনেকেই, এই পর্য্যায়ে **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কর** (১৮৯৩-১৯৭২ খ্রীঃ), বিখ্যাত গায়ক **অতুলকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়**, নিষ্ঠাবান গান্ধীবাদী **শ্রীদাম দাশগুপ্ত, ভবতারণ চক্রবর্তী, রামনলিনী চক্রবর্ত্তী** প্রমুখ"[১] বিশেষ উল্লেখ্য।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আইন অমান্য আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে গান্ধীজীর ত্রয়ী বর্জন (শিক্ষা, খেতাব ও দ্রব্য) আহ্বান বাঁকুড়া জেলাকেও গভীরভাবে নাড়া দেয়। স্কুল কলেজ থেকে ছাত্ররা বেরিয়ে আসেন দলে দলে। বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর আদালতের উকিলরা আদালত বর্জন করেন। জেলার পাঁচটি স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জ্বলন্ত উদাহরণ রেখেছিলেন কুচিয়াকোল স্কুলের ছাত্রগণ। তাঁরা বিদেশী চিনির বস্তায় কেরোসিন ঢেলে দিয়ে বিদেশী চিনি বিক্রয় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। গান্ধীজীর লবণ সত্যাগ্রহের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাঁকুড়া জেলাতেও বহু লোক কাঁথির নিকটবর্তী পিছাবনি নামক গ্রামে লবণ সত্যাগ্রহ সম্পন্ন করেন। বাঁকুড়া জেলা থেকে বহু মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেন। সোনামুখীর **সত্যরাণী হালদার**, বেতুড়ের **শান্তশীলা পালিত**, ও তাঁর পুত্রবধূ **সুষমারাণী পালিত, রামনলিনী চক্রবর্তী, গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ** প্রমুখ নেতা ও নেত্রীবৃন্দের পরিচালনায় লবণ সত্যাগ্রহে হাজার হাজার মানুষ পায়ে হেঁটে পিছাবনিতে উপস্থিত হয়ে আন্দোলনের সামিল হয়েছেন। **সংগ্রাম থেকে পিছাব নি এতদর্থে গ্রামটির নামকরণ হয়েছিল 'পিছাবনি'**। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনে বিষ্ণুপুর মহকুমার যে সব সন্তান এগিয়ে এসেছিলেন অকুতোভয়ে তাঁরা হলেন—**ভূদেব মণ্ডল, ভুজঙ্গভূষণ মণ্ডল, বঙ্কিমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিতোষ রায়, চন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, রণছোড় দাস রাঠী, গোকুল চন্দ্র রাঠী, সুষেণ চক্রবর্তী, সতীশ চন্দ্র দত্ত মুখ্যা, গোরাচাঁদ বোস, বিমল দাশগুপ্ত, গণেশ ভকত, সুধীর ব্যানার্জী, পঞ্চানন ব্যানার্জী, গোবিন্দ সরকার, গোপাল দাস** ও **হাবু মাস্টার** নামে পরিচিত **বিভূতিভূষণ গোস্বামী** প্রমুখ। চারণ কবি মুকুন্দদাসের মতোই স্বরচিত দেশাত্মবোধক গান গেয়ে গেয়ে বিদ্রোহের লেলিহান আগুন ছড়াতেন হাবু মাস্টার। আর পূর্বোক্ত মণ্ডল পরিবার ও রাঠী পরিবারদ্বয় দূরাগত স্বদেশ প্রেমিকদের আতিথেয়তায় আপ্যায়িত করতেন। জাতীয় আন্দোলনের এই পর্যায়ে আর একটি শ্রদ্ধেয় নাম **প্রিয়নাথ সিংহ**। দূরাগত খর্বাকৃতি এই মানুষটির অন্তরে ছিল স্বদেশ প্রেম, সমাজ সেবা ও আত্মত্যাগের সুমহান আদর্শ। অকৃতদার নির্মোহ এই মানুষটি ছিলেন ভারতমাতার চরণে নিবেদিত প্রাণ। তাঁর কণ্ঠে প্রায়ই শোনা যেত—

---

১. বিড়াই (প্রসঙ্গ বিষ্ণুপুর) ৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৯৯৭ ডিসেম্বর, পৃঃ—৪২

মা মা বলে কাঁদলে ছেলে মা কি ওপারে রইতে পারে?
জাগিছে জননী কুলকুণ্ডলিনী জাগিছে রে
মা মা বলে কাঁদলে ছেলে মা কি ওপারে রইতে পারে? ...

ভিক্ষান্নে এবং স্বতঃস্ফূর্ত দানে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতোই জীবন যাপন করতেন তিনি। সমাজসেবার মহৎ উদ্দেশ্যে **'হিন্দু সৎকার সমিতি'** তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিষ্ণুপুরবাসীদের শক্তিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার অভিমানসে তিনি বিষ্ণুপুর শহরের মধ্যস্থলে মটুকগঞ্জ মহল্লায় সার্বজনীন দুর্গা পূজার প্রচলন করেন। এই পূজা প্রিয়বাবুর দুর্গা পূজা নামেই সর্বজনবিদিত। এই সময় ইংরেজের 'গোলামখানা' বর্জনের আহ্বানে বিষ্ণুপুরের বুকে **'বিবেকানন্দ পাঠাগার'** নামে একটি জাতীয় বিদ্যালয় ধাঁচের বিদ্যালয়ও গড়ে ওঠে।

১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে পিছিয়ে থাকেনি মল্লভূমবাসীগণ। সারদা মায়ের মন্ত্রশিষ্য **গোবিন্দ প্রসাদ সিংহের** নেতৃত্বে আন্দোলনের সর্বাত্মক প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে ৮ই আগস্টের গভীর রাত্রিতে গোবিন্দ প্রসাদ সহ বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, খাতড়া, গঙ্গাজলঘাটি, রায়পুর প্রভৃতি স্থানের কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। চারিদিকে শুরু হয় পুলিশের দমন-পীড়ন। প্রথম দিকে দলের সাধারণ কর্মীগণ বিভ্রান্ত হলেও পুলিশি নির্যাতন সত্ত্বেও তালডাংরা, রায়পুর, সিমলাপাল, খাতড়া, বিষ্ণুপুর, কোতুলপুর, সোনামুখী, ইন্দাস প্রভৃতি স্থানে মদের দোকান লুট হয়। কোতুলপুর ও ইন্দাসের ডাকঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। বিষ্ণুপুর আদালতে এবং গঙ্গাজলঘাটি, জয়পুর, কোতুলপুর ও ইন্দাস থানায় জাতীয় পাতাকা উড়িয়ে দেওয়া হয়।

অসহযোগ আন্দোলন ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনের গতি-সঞ্চারী ব্যক্তি ছিলেন বিষ্ণুপুরের **রামনলিনী চক্রবর্তী**। ব্যবসায়িক বাতাবরণের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করলেও তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক। তাঁর সাংগঠনিক ক্ষমতা, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং সৃজনশীল চিন্তাধারা উদারতা ও বদান্যতা তাঁকে নেতৃত্বের মহিমায় উন্নীত করেছিল। তিনি দীর্ঘকাল বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস সভাপতি ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী হিসেবে ৩ বৎসর কারাবাসও করেছিলেন। বিষ্ণুপুরে রামানন্দ কলেজ এবং কে. জি. ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউট ছাড়াও **'বাংলা কংগ্রেস'** রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই পর্যায়ে বিষ্ণুপুরের প্রাক্তন এম. এল. এ. **ভবতারণ চক্রবর্তীও** একটি স্মরণীয় নাম। নির্লোভ, নির্মোহ, অকৃতদার, বসনে ভূষণে অতি সাধারণেরও সাধারণ এই মানুষটি ছিলেন ঠিক যেন মাটির মানুষ। তাঁর অন্তরে ছিল গভীর দেশপ্রেমের ফল্গুস্রোত। আত্মত্যাগী এই মানুষটি স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় বীর সৈনিকের ভূমিকা পালন করেন এবং কারাবরণ করেন বারংবার। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময় আরো যাঁরা ইংরেজের ভীতির কারণ হয়ে উঠেছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন **ডঃ শশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, মতি মহাপাত্র, ভূদেব কবিরাজ, সরোজ সরকার** এবং সোনামুখীর গান্ধীবাদী নেতা **কৃষ্ণচন্দ্র চন্দ্র** প্রমুখ।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের পাশাপাশি বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে সহিংস আন্দোলন সুস্পষ্টরূপে আত্মপ্রকাশ করে। অনুশীলন ও যুগান্তর দলের কর্মীরা এখানে সক্রিয় ছিলেন। মালিয়াড়া ছিল তাঁদের প্রধান ঘাঁটি। যুগান্তর গোষ্ঠীতে ছিলেন **বিমল সরকার, সুরেন সরখেল, ষষ্ঠী সরকার, সিদ্ধেশ্বর সাঁই, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। অনুশীলন দলে ছিলেন নিরোদ দত্ত, বিজয় তেওয়ারী, চিন্তাহরণ তেওয়ারী, ক্ষেত্রমোহন**

দত্ত, প্রভাকর বিরুনী, দিবাকর দত্ত, চারুবিকাশ দত্ত, প্রফুল্ল কুণ্ডু, রঞ্জিত ব্যানার্জী প্রমুখ। বিষ্ণুপুরের যুগান্তর গোষ্ঠীর সাথে বিপিন বিহারী গাঙ্গুলীর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। বেলিয়াতোড়ের দাশরথি মিত্রের সহযোগিতায় এই জেলার সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে মাস্টারদার দলের অম্বিকা চক্রবর্তী ও সুবোধ চৌধুরীর মতো নেতাদের নিবিড় যোগাযোগ ছিল। ছেন্দাপাথরে সশস্ত্র বিপ্লবীদের একটি গুপ্ত ঘাঁটি ছিল। ছেন্দাপাথরের গুপ্ত ঘাঁটিতে ক্ষুদিরাম বসুর যাতায়াত আছে সন্দেহ করে পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট এক সময়ে এই গুপ্ত ঘাঁটির সন্ধানে পুলিশি অভিযান চালিয়েছিল। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে যুগান্তর দলের কর্মীরা বিষ্ণুপুরের তৎকালীন অত্যাচারী মহকুমা শাসক নেপাল সেনকে হত্যার পরিকল্পনা করেন। প্রশাসন গোপন সূত্রে খবর পাওয়ায় তাঁদের উদ্দেশ্য ভেস্তে যায়।

আন্দোলনের জন্য অর্থের প্রয়োজনে যুগান্তর দলের কর্মীরা জয়পুর থানার ভগলদীঘি গ্রামে ডাকাতি করতে যান। কাঞ্চনপুরের জঙ্গলে মেল ডাকাতি করেন। রায়পুর থানার দারোগার বাড়ি থেকে একটি রিভলবার খোয়া যায়। যুগান্তর দলের কর্মীরা এতে জড়িত ছিলেন। বিষ্ণুপুরের **সুধাংশু দাশগুপ্ত** (ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায়) যুগান্তর দলের অ্যাকশন কমিটির অনুরোধে একটি পিস্তল স্থানান্তরিত করার সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। দেশ থেকে ব্রিটিশ বিতাড়নের উদ্দেশ্যে ক্রমাগত সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য এঁরা মেল ডাকাতি করেছেন, ধনী গৃহস্থের বাড়িতে ডাকাতি করেছেন ঠিকই কিন্তু কোন সময়েই তাঁরা মেহনতি মানুষের সমর্থন হারাননি। স্বদেশী ডাকাত আখ্যা দিয়ে ব্রিটিশ সরকার এঁদেরকে জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়েছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি, বিষ্ণুপুরের রাস উৎসবের সময় দেব বিগ্রহগুলির অলঙ্কার লুট করতে গিয়ে বিপ্লবী গোষ্ঠীর মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, সিদ্ধেশ্বর সাঁই, বিমল সরকার, ষষ্ঠীদাস সরকার ধরা পড়েন এবং চার পাঁচ বৎসর করে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। (সূত্রঃ—বিড়াই, ৭ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ১৯৯৭ ডিসেম্বর, পৃঃ—৪৮-৪৯)

শ্রী সঙ্ঘ নামে সশস্ত্র বিপ্লবীদের আর একটি শাখা বাঁকুড়ায় সক্রিয় ছিল। বাঁকুড়ার বিভিন্ন স্থানে এঁদের শাখা সঙ্ঘ ছিল। ভ্রাতৃসঙ্ঘ নামে পরিচিত আর একটি বিপ্লবী সংগঠন বাঁকুড়ায় নিজেদের কার্যকলাপ ছড়াতে প্রয়াসী হয়েছিল কিন্তু জন সমর্থনের অভাবে অনুশীলন বা যুগান্তর দলের মতো সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি।

অনুশীলন ও যুগান্তর দলের সশস্ত্র বিপ্লবীরা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে দেশের বিভিন্ন জেলে কারারুদ্ধ থাকেন এবং নির্বাসিত হন আন্দামানের সেলুলার জেলে। বাঁকুড়া জেলা থেকে যাঁরা আন্দামানে নির্বাসিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন বিমল সরকার, মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাকর বিরুনী, সুধাংশু দাশগুপ্ত, ভবতোষ কর্মকার, দ্বিজেন্দ্রনাথ বারিক প্রমুখ।

১৯৪২ এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন দিনে দিনে ভারতব্যাপী সার্বজনীন আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করার উদ্দেশ্যে সক্রিয় হয়ে ওঠে ব্রিটিশ সরকার। বিপ্লবীদের কপালে ছিল দ্বীপান্তর, কারাবাস এবং প্রাণদণ্ড। বিদ্রোহী কবি নজরুলের এই গানটি বিপ্লবীদের বিপুলভাবে উৎসাহিত করল—

কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী ....

রক্ত গরম হয়ে উঠল। 'Do or die.' দেশকে স্বাধীন করব অথবা মরব—এই উন্মাদনার শিকার হল ভারতবাসী। বিষ্ণুপুরে এই সময় দেবীপ্রসাদ সরকার ওরফে ভোলা সরকার, সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন্দ্র সিংহদেব, রামদাস চক্রবর্তী, দীনেশ দে, দেবীপ্রসাদ বিশ্বাস, কমলাকান্ত বিশ্বাস, ভবতোষ কর্মকার (বিপ্লবীদের জন্য দেশী পিস্তল তৈরী করতেন), শম্ভু কর্মকার, গোপাল গোস্বামী, গুণময় চৌধুরী, কালীকমল বসু, প্রমুখ ব্যক্তিগণ ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনে ঝাঁপিয়ে পড়েন বীরবিক্রমে, এবং অনেকেই কারাবরণ করেন। বিষ্ণুপুরের রাজপরিবারের **বীরেন্দ্র সিংহদেবের** বাড়িতে চলত নিয়মিত ব্যায়াম, কুস্তি, লাঠি-খেলা ও ছোরা-খেলা। পিস্তল ধরা ও লক্ষ্য চর্চা চলত লালবাঁধের পাড়, জয়পুর জঙ্গল ও সাতমৌলীর জঙ্গলে।

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের রণদামামা বেজে ওঠে। ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষকে 'পূর্ণ স্বাধীনতা' দেওয়ার কোনরূপ আশ্বাস না দেওয়ায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশকে সহযোগিতা করার পরিবর্তে বিরোধিতা করে। এদিকে ঐ খ্রীষ্টাব্দেই ত্রিপুরী কংগ্রেসে গান্ধীজীর সাথে সুভাষ বসুর মতবিরোধের ফলে তিনি কংগ্রেস ত্যাগ করেন। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতাকে সুনিশ্চিত এবং করায়ত্ত করার অভিপ্রায়ে তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামে একটি নতুন দল গঠন করেন। ফরওয়ার্ড ব্লক দল গঠিত হলে বাঁকুড়া জেলাতে **অশোকানন্দ বসু** ও **ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের** নেতৃত্বে ঐ দলের শাখা গঠিত হয়। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে বিহারের রামগড় কংগ্রেসের অধিবেশনের পাশে সুভাষ বসুর আহুত আপোষ-বিরোধী সম্মেলনে বাঁকুড়া জেলা থেকে শ'পাঁচেক কর্মী যোগদান করেছিলেন। ঐ সময় **বীরেশ্বর ঘোষ** নেতাজীকে বাঁকুড়াতে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানান। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের শেষ দিকে নেতাজী বাঁকুড়াতে আসেন এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের অনেকগুলি সভা করেন। বাঁকুড়া, কেঞ্জেকুড়া, খাতড়া, ছাতনা, ইন্দপুর, সোনামুখী, বেলিয়াতোড়, পখন্না, রাধানগর, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে তিনি জনসভা করেন। যুদ্ধ ও ব্রিটিশ বিরোধী প্রচারের জন্য নেতাজীকে কোলকাতায় বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হয়। সুভাষ বসুর কারারুদ্ধের ঘটনায় বাঁকুড়া বিষ্ণুপুরে আংশিক হরতাল পালিত হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 'আজাদ হিন্দ্ ফৌজ' আন্দোলনের সুভাষবাদী ধারা কংগ্রেসীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বাঁকুড়া জেলায় একটি উল্লেখ্য মতবাদ হিসেবে প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বিষ্ণুপুর বসু পাড়ার **গোপালচন্দ্র সিংহ** একজন সৈনিক হিসেবে আজাদ হিন্দ্ ফৌজে যোগদান করে ব্রিটিশের হাতে বন্দী হন। সিঙ্গাপুরের 'চাঙ্গী' জেলে বন্দী থাকাকালে স্বাধীনতার প্রাক্কালে নেহরুর উদ্যোগে মুক্তিলাভ করেন।

অনুশীলন ও যুগান্তর দলের সশস্ত্র বিপ্লবীরা ভারতের বিভিন্ন জেলে এবং আন্দামানের সেলুলার জেলে বন্দী থাকাকালে মার্কসবাদের সাথে পরিচিত হন। এঁদের মধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন জেলে ছিলেন জেলার দিবাকর দত্ত, প্রফুল্ল কুণ্ডু, বীরেশ্বর ঘোষ, অশোকানন্দ বসু, বীরেন্দ্র সিংহদেব প্রমুখ। ১৯৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এঁরা জেল থেকে মুক্তি পেয়ে জেলায় পার্টি ইউনিট গড়ে তোলেন এবং পার্টির হাত শক্ত করেন।

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে পাত্রসায়ের থানার হাট-কৃষ্ণনগরে সারা ভারত কৃষক সমিতির প্রাদেশিক সম্মেলনে অবিভক্ত বাংলার কুড়িটি জেলার ৮০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে মুজফ্ফর আহ্মদ, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, সৈয়দ আহম্মদ খান, সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার এবং নাসিরুদ্দিন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। বাঁকুড়া জেলার প্রতিনিধি ছিলেন

অমলকৃষ্ণ রায়, বিমল মুখোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ দাস, ক্ষেত্রনাথ দত্ত, রমেন্দ্র দত্ত, ভবতারণ চক্রবর্তী, জগদীশ পালিত প্রমুখ। বাঁকুড়ার প্রখ্যাত সাংবাদিক এবং দেশপ্রেমিক **রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়** কৃষি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। এজন্য সম্মেলনের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। সভায় মুজফ্‌ফর আহ্‌মেদের সম্পাদিত দলিলটি সাদরে গৃহীত হয়। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের ফলে যে জমিদারী প্রথা ও মহাজনী ব্যবসার উদ্ভব হয় তাতে দেশের কৃষক ও কৃষিজীবী মানুষেরা শোষিত হন নির্মমভাবে। এই সম্মেলনে শোষিত কৃষক, ক্ষেতমজুর ও শ্রমজীবী মানুষদের ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানানো হয়। কৃষকদের স্বার্থে স্লোগান দেওয়া হয়—**'ধর কৃষক ডাণ্ডা, হোক জমিদার ঠাণ্ডা,' 'লাঙ্গল যার জমি তার'**, ইত্যাদি, ইত্যাদি। জমিদাবী প্রথা ও বেগার প্রথা বিলোপের দাবির পাশাপাশি ঋণ ও তার সুদের হার হ্রাস করার দাবিও উত্থিত হয় শোষিত মানুষের স্বার্থে। তৎকালে জেলার বিড়ি শিল্পীদের সংগঠনটিকেও মজবুত করতে প্রয়াসী হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি। সম্মেলনে বিষ্ণুপুরের **বিমল সরকার** বাঁকুড়া জেলা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাংলার গভর্নর স্যার জন হারবার্ট যুদ্ধ তহবিলে অর্থ সংগ্রহ করতে এলে বর্তমান খ্রীষ্টান কলেজের (ভূতপূর্ব ওয়েসলিয়ান কলেজ) ছাত্ররা বি. পি. এস. এফ. এর ব্যানারে কমিউনিস্ট পার্টির মদতে 'গভর্নর ফিরে যাও' পোস্টারে পোস্টারে শহর ভরিয়ে দেয়। **ক্ষেত্রগোপাল চট্টোপাধ্যায়, শান্তব্রত চট্টোপাধ্যায়, উদয়ভানু ঘোষ, মাণিক দত্ত** প্রমুখ ছাত্রদের নেতৃত্বে বিরাট প্রতিবাদী শোভাযাত্রা বের হয়। পুলিশ গুলি চালায়। খ্রীষ্টান কলেজের ছাত্রনেতারা বহিষ্কৃত হন। এই সময়ে কলেজের অধ্যাপক **নীহার সরকার** কমিউনিস্ট পার্টির গঠনপর্বে এক সুদূরপ্রসারী ভূমিকা গ্রহণ করেন।

১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর ফ্যাসীবাদী হিটলার রাশিয়া আক্রমণ করেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মানবতাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এটিকে 'জনযুদ্ধ' বলে আখ্যাত করেন এবং রাশিয়াকে সমর্থন করেন। অন্যদিকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। কমিউনিস্টদের মধ্যে মতভেদ মাথাচাড়া দেয়— একদল জনযুদ্ধের পক্ষে, অন্যদল ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পক্ষাবলম্বন করে।

এদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ দারুণভাবে বিপর্যস্ত হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের বোম্বাইয়ের 'তলোয়ার' জাহাজে নৌসেনাদের বন্দেমাতরম ধ্বনি সহযোগে ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বোম্বাই সহ করাচী, মাদ্রাজ ও কোলকাতায় অবস্থিত নৌসেনাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহ। নৌ-বিদ্রোহ, আজাদ হিন্দ ফৌজ এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সমষ্টিগত জনরোষে শঙ্কিত হয়ে ওঠে ব্রিটিশ সরকার। ক্ষমতা হস্তান্তর বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের সাথে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের আলোচনা শুরু হয়। মুসলিম-লীগ বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলি নিয়ে পাকিস্তান নামে পৃথক রাষ্ট্র দাবি করেন। কংগ্রেসের 'অখণ্ড ভারত' এর দাবীকে কেন্দ্র করে মুসলিম লীগের নির্দেশে বাংলা ও পাঞ্জাবের মুসলমান প্রধান অঞ্চলে ভয়ঙ্কর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা ও হত্যাকাণ্ড শুরু হয়ে যায়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুনে লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট নিযুক্ত হন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের নেতাদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে তিনি ভারত ব্যবচ্ছেদের খসড়া রচনা করেন। জাতীয় কংগ্রেস অখণ্ড ভারতের দাবি থেকে সরে আসে। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত স্বাধীনতা আইন

পাশ হয় এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের ভিত্তিতে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট আসে স্বাধীনতা। দ্বিখণ্ডিত স্বাধীনতা। ভ্রাতৃরক্তে রঞ্জিত স্বাধীনতা। আর আকাশে বাতাসে ভেসে আসে করুণ সুরমূর্ছনা—

মুক্তির মন্দির সোপান তলে
কত প্রাণ হল বলিদান
লেখা আছে অশ্রুজলে
মুক্তির মন্দির সোপান তলে...

অবশেষে কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা এলো অহিংস এবং সহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে। আমরা স্বাধীন হলাম। কিন্তু এই স্বাধীনতা লাভের পিছনে বাঁকুড়া তথা মল্লভূমের মাতৃজাতির অবদানও কিছু কম নয়। ১৯০৫-এর বয়কট আন্দোলন, ১৯২০-র অহিংস অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০-এর আইন অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে মল্লভূমের অন্তঃপুরচারিণী, অবগুণ্ঠিতা নারীজাতি কখনো নিভৃতে নীরবে, কখনো সরোষে-সরবে, সক্রিয়ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন বিপ্লবে। উৎসাহ এবং ইন্ধন জুগিয়েছেন পতি, পুত্র, দাদা, ভাইয়ের পৌরুষত্বে, শৌর্যে, বীর্যে। ভারতের যে নারীজাতি স্বামীর চিতায় জ্যান্ত পুড়ে মরতে ভয় করে না, সেই নারীজাতি দেশমাতৃকার দুর্দিনে হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে, এটা ভাবা যায় না। তাই দেখি অজস্র বিপদের ঝুঁকি নিয়ে ভয়-ভীতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছেন অকাতরে, গোপন খবর এবং অস্ত্র-শস্ত্র পৌঁছে দিয়েছেন গোপনে, প্রয়োজনে অস্ত্র তুলে নিয়েছেন হাতে। **"যে হাত শিশুর দোলনায় দোলা দেয়, সেই হাতে স্বাধীনতা আসতে পারে।"**— এই বিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে এয়োরা আদ্যাশক্তি মহামায়ার তেজস্বিতায় অনুপ্রাণিত হয়ে রণচণ্ডীর রূপ ধারণ করে ব্রিটিশরূপী অসুরবাহিনীকে খতম করার কাজে ব্রতী হয়েছেন, স্ত্রী হয়েছেন স্বামীর সহযোদ্ধা, বোন হয়েছেন দাদা ভাইয়ের সহযোদ্ধা। নির্যাতিতও হয়েছেন, হয়েছেন কারাবন্দী। ইন্দাস থানার যোতবিহার গ্রামের বিপ্লবী দেবেন্দ্রনাথ ঘোষের স্ত্রী ও ভগিনী দুই সিন্ধুবালা দেবীকে আন্দোলনে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে গ্রেপ্তার করে ব্রিটিশ পুলিশ। অন্দরমহল-নিবাসী পর্দানসীন এই দুই মহিলাকে ইন্দাস ও বাঁকুড়ার পথে পথে হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় এবং অকথ্য নির্যাতনও করা হয়। **বাঁকুড়া জেলার প্রথম এই দুই মহিলা রাজনৈতিক বন্দীদের উপর লাঞ্ছনার কথা শুনে সারদা মা বলেছিলেন, "কোম্পানীর আর বেশী দেরী নয়। সেখানে এমন কোন ব্যাটাছেলে ছিল না যে দু-চড় দিয়ে মেয়ে দু'টিকে ছাড়িয়ে আনতে পারতো।"** দুই সিন্ধুবালা দেবীর উপর বর্বরোচিত ব্যবহারে বাঁকুড়াবাসীগণ সেদিন গর্জে উঠেছিল, 'ধ্বংস হোক, ধ্বংস হোক, ব্রিটিশরাজ ধ্বংস হোক।' বাঁকুড়ার বেতুড় গ্রামের পালিত পরিবারের **শান্তশীলা পালিত, সুষমারাণী পালিত (পুত্রবধূ), কমলকুমারী পালিত, বিভাবতী পালিত, নন্দরাণী পালিত**—এই পাঁচজন মহিলা ছাড়াও শান্তশীলা পালিতের পাঁচ-পুত্র এবং জামাইও স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে কারাবরণ এবং আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। কোতুলপুরের **কামিনী ভদ্র** "অসহযোগ আন্দোলনে, বিলাতী দ্রব্যবর্জনে, সাদা-চিনি বর্জনে, ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৪৪ ধারা অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ ও ছয় মাস জেলে ছিলেন।" বিদেশী দ্রব্য বর্জনের নমুনা হিসেবে সুভাষ বসুকে গুড় মিশ্রিত চা দিয়ে তিনি 'গুড়ে-

কামিনী' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। জয়পুর থানার ময়নাপুর গ্রামের **সরযূবালা বাগদী** বিলাতী দ্রব্য বর্জন, মদ ও গাঁজার দোকান অবরোধ, খাজনা বন্ধ প্রভৃতি আন্দোলনের অংশীদার হয়ে ছ'বার গ্রেপ্তার এবং দু'বার কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনে বাঁকুড়া জেলার আরো যে সব বীরাঙ্গনা দেশ-মাতৃকার চরণে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন তাঁরা হলেন মাকুই গ্রামের **ননীবলা গুহ, কিরণবালা কর্মকার**, বাঁকুড়ার মাতঙ্গিনী নামে খ্যাত সোনামুখীর **সত্যরাণী হালদার**, বেতুড়ের **কনকলতা সর্বাধিকারী**, রামসাগরের **সত্যবাণী দেবী** (প্রায় দশ বৎসরেরও অধিককাল জেলে ছিলেন), কোতুলপুরের **চারুবালা দেবী** ও **সাবিত্রী দেবী** পাত্রসায়রের **শতদল** বাসিনীদেবী, বিষ্ণুপুরের **শতদল ব্যানার্জী, পারুলবালা ব্যানার্জী, নন্দরাণী সরকার**, গঙ্গা দেবী, ভৈরবী **দেবী, রাণী দেবী, মোহিনী দেবী** প্রমুখ।

আরো উল্লেখ্য বিষয় হল ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলনে বাঁকুড়ার বারবনিতাদের অবদানও কম নয়। **'পতিতা নও, নারী মাতৃজাতি'** এই আহ্বানে বাঁকুড়ার বারাঙ্গনারা মুক্ত হস্তে অর্থ, অলঙ্কার, সোনা-দানা দিয়ে পুষ্ট করেছেন আন্দোলনকে। **পীরবালা, কমলাদাসী, নৃত্যকালী গরাই, আহ্লাদিনী দাসী** এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। বাঁকুড়া বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও এগিয়ে এসেছিলেন আন্দোলনের হাতকে শক্ত করতে। এই পর্যায়ে নবম শ্রেণীর ছাত্রী **রেণু বিশ্বাস** এবং **ভ্রমর ঘোষ** উল্লেখ্য।

আন্দোলনের প্রভাব নারী সমাজে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে **'নারী সত্যাগ্রহ কমিটি,' 'মহিলা কর্মী সংসদ,' 'নিখিল ভারত জাতীয় নারী সংঘ'** প্রভৃতি সংগঠন গড়ে ওঠে। এই সব সংগঠনের ডাকে **'আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান'**-এর প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। অগ্নিগর্ভা হয়ে ওঠে বাঁকুড়া জেলা। বিশেষতঃ ১৯৩০-৩২-এর আইন অমান্য আন্দোলনের সময় "বিষ্ণুপুর মহাকুমার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই আন্দোলনে। তৎকালীন (অবিভক্ত বাংলা) বাংলাদেশের কারাদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত মহিলা কর্মীগণের তালিকায় বিষ্ণুপুর মহকুমা তৃতীয় স্থান অধিকার করে।" মল্লভূমের রমণীকুলের এই আত্মত্যাগের কথা স্থান পায়নি ইতিহাসে। স্বাভাবিকভাবেই মনে পড়ে যায় দরদী নজরুলের কথা—

> "কত বীর রণে দিল প্রাণ, লেখা আছে ইতিহাসে,
> কত নারী দিল সিঁথির সিন্দুর লেখা নাই তারি পাশে।"

মল্লরাজাদের ক্ষাত্রতেজের ওজস্বিতা এবং বৈষ্ণব-ভাব-ধারার বিগলিত কোমলতায় গঠিত মল্লমাটি। মল্লমাটির নরনারীগণও তাই কোমলে কঠোরে পূর্ণ, অহিংসের পাশাপাশি সহিংস। অহিংস এবং সহিংস আন্দোলনের পথে চার অক্ষরের 'স্বাধীনতা' শব্দটিকে করায়ত্ব করতে গিয়ে রত্নগর্ভা মল্লভূমের সন্তান-সন্ততিগণ আত্মাহুতির যে মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা ভারতের ইতিহাসের না হলেও জেলার ইতিহাসের এক অমূল্য সম্পদ। ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনে নিবেদিত প্রাণ শহীদ ও বিপ্লবীদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে জানাই সশ্রদ্ধ ভক্তি-অর্ঘ্য।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরেই বিষ্ণুপুরে একটি গণ-আন্দোলন হয়েছিল। **'তেভাগা থেকে বাঁধগাবা ও নকশাল আন্দোলন'** নামে কথিত সেই আন্দোলনের কথায় আসি এই পর্যায়ে।

অধ্যায়-১১৯

রত্নগর্ভা মল্লভূম

তেভাগা থেকে বাঁধগাবা ও নকশাল আন্দোলন

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়ে আসে স্বাধীনতা। ভ্রাতৃরক্তে রঞ্জিত স্বাধীনতা। কিন্তু যাঁদের হাতে বৃটিশ সরকার ভারতের শাসনভার দিয়ে গেল তাঁরা খেটে খাওয়া শ্রমিক-কৃষকের প্রতিনিধি ছিলেন না। টুপি বদল হয়েছিল ঠিকই কিন্তু শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেতমজুর যে তিমিরে ছিলেন, রইলেন সেই তিমিরেই। তাই কমিউনিস্ট পার্টি ঐ সময়ে 'এ আজাদি ঝুটা হ্যায়'—বলে সদ্য স্বাধীন দেশের শাসকবৃন্দের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দেয়। ফলে কৃষকদের স্বার্থে গড়ে ওঠে তেভাগা আন্দোলন। জমিদারী প্রথায় জমিদারের মালিকানাধীন জমিতে ভাগচাষী নিজ খরচে ও পরিশ্রমে জমি চাষ করে উৎপাদিত ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ পেতেন। তেভাগা আন্দোলনের দাবি ছিল ঠিক তার উল্টো। বলা হয়েছিল চাষের খরচের জন্য একভাগ ও শ্রমের জন্য একভাগ অর্থাৎ দুভাগ পাবেন ভাগচাষী এবং জমির মালিকানা স্বত্বের জন্য জমিদার পাবেন মাত্র একভাগ। এর সাথে আর একটি দাবি ছিল। সেটি হ'ল 'নিজ খোলানে (খামারে) ধান তোলা'। মানে জমিদারের খামারের পরিবর্তে চাষীর খামারে তুলতে হবে উৎপাদিত ফসল।

পশ্চিম দিনাজপুরে এই আন্দোলনের তীব্রতা পরিলক্ষিত হয়। উত্তর বাংলার কয়েকটি জেলাতেও ছড়িয়ে পড়ে বিদ্রোহ। বাঁকুড়া জেলাতে তেভাগা আন্দোলনের তীব্রতা ছিল না, ছিল মেদিনীপুরের কিয়দংশে। পরবর্তীকালে বাঁকুড়াতে আছড়ে পড়ে এই আন্দোলন।

বিষ্ণুপুর মহকুমার জয়পুর থানার ক্ষিরাইবনী গ্রামের কৃষক সংগঠনকে মধ্যমণি করে গড়ে ওঠে কৃষক আন্দোলন। বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর-জয়পুর অঞ্চলে গোঁসাইপুর, কামারপুকুর, নতুনগ্রাম, বনগেলে, শিবের ডাঙা, চৌবেটা, পানশিউলি, মান্‌সাপাড়া, মাগুরা, পঁচাডহরা ইত্যাদি গ্রামে কমরেড **মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়**, কমরেড **বিমল সরকার, কমরেড মাণিক দত্ত** ও স্থানীয় কৃষক সমিতির সদস্যদের সহযোগিতায় জোতদার পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন ছিল মুখ্যতঃ জমিদারদের বিরুদ্ধে। 'হাল (লাঙ্গল) যার জমি তার'—দাবিতে কৃষক সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ করার চেষ্টা হয়। এ ছাড়া বনের সম্পদে আদিবাসীদের স্বত্ব বজায় রাখার দাবিটিও প্রাধান্য লাভ করে। এই দাবি-দাওয়ার সঙ্গে যুক্ত হয় তেভাগা ফসলের দাবি, মজুরি বৃদ্ধির দাবি, জমিদারের বেগার প্রথা উচ্ছেদের দাবি। চড়া হারে সুদ আদায়ের প্রতিবাদও এই আন্দোলনে গভীরতা আনে আশাতীত ভাবে। পাত্রসায়ের থানার হদল-নারায়ণপুরকে কেন্দ্র করে **ননী রায়, আশু রায়, উদয়ভানু ঘোষ** প্রমুখ নেতার নেতৃত্বে **'জাল যার পুকুর তার'** দাবিকে সামনে রেখে জমিদার শ্রেণীর শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে অনুরূপ আন্দোলন গড়ে ওঠে। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট প্রায় হাজার দশেক সশস্ত্র মানুষ বিষ্ণুপুর থানার বাসুদেবপুর গ্রামে জমায়েত হন। সশস্ত্র মানুষের ঐ মিছিলটি বিষ্ণুপুর শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে বিষ্ণুপুর থানার সম্মুখ দিয়ে এগিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ে কৃষ্ণবাঁধের পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে। সেদিনের সেই মহামিছিলের নেতৃত্ব

দেন কমরেড মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী দিবস উদযাপনই ছিল এই মিছিলের উদ্দেশ্য। অবশ্য দয়ার দান তথা ভিক্ষালব্ধ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে শাসক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পাশাপাশি সাম্রাজ্যবাদের সাথে গাঁটছড়া বাঁধা দেশের শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোও ছিল এই মিছিলের অন্যতম উদ্দেশ্য।

১৫ই আগস্টের সশস্ত্র মানুষের মহামিছিল দেখে অজানা আশঙ্কায় ১৬ই আগস্ট সাবধানী প্রশাসন কৃষ্ণবাঁধ সংলগ্ন বাঁধগাবা অঞ্চলে পুলিশ মোতায়েন করে। কিন্তু মিছিলের বহরের কথা শুনে আত্মগোপন করে পুলিশবাহিনী। ১৮ই আগস্ট, ১লা ভাদ্র পুনরায় সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যায়। ঐদিন পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে বিষ্ণুপুর শহরের বাজারগামী মহিলাদের প্রতি পুলিশের অশালীন আচরণের প্রতিবাদে মহিলাগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ফিরে যান গ্রামে গ্রামে। মহিলাদের মানহানিকর স্পর্শকাতর ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে সাথে সাথে সমবেত হয় উত্তেজিত জনতা। পুলিশের মুখোমুখি হওয়ার মানসিকতা নিয়ে কাড়া, নাকাড়া, মাদল, শাঁখ, ঘণ্টা, ঝাঁঝ বাজাতে বাজাতে মহিলাদের সম্মান রক্ষার্থে এগিয়ে আসে ক্ষিপ্ত জনতা। পর পর গর্জে ওঠে পুলিশের বন্দুক। সেই অসম সংঘর্ষে মুহূর্তেই ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়েন বৃন্দা বাউরি, শরৎ লোহার, সহদেব টাঙ্গি, বাঁকু লায়েক, পশুপতি লোহার ও সুরধনী দাসী। পুলিশী অত্যাচারে, স্বাধীন ভারতের পুলিশী তাণ্ডবে বিপর্যস্ত হন সংশ্লিষ্ট গ্রামবাসীগণ। চলে ঢালাও ধরপাকড়। সদ্য স্বাধীন দেশের সরকার জমিদার জোতদারদের স্বার্থে বেপরোয়া আক্রমণ শুরু করে কৃষক ও শ্রমজীবী মানুষের উপর। তাই এই আন্দোলনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নিভে যায় তাৎক্ষণিকভাবে। অবশ্য শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে বছরে বছরে আজও ১৮ই আগস্ট (১লা ভাদ্র) শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ও ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে। স্মৃতিচারণ করা হয় তঁদের সংগ্রামী জীবনের। **এই জঙ্গী কৃষক আন্দোলন মল্লভূমের ইতিহাসে 'বাঁধগাবা আন্দোলন' বা ১৯৪৮-৪৯ খ্রীষ্টাব্দের কৃষক আন্দোলন নামেও সুবিদিত।**

নকশাল আন্দোলন—কমরেড চারু মজুমদারের নেতৃত্বে ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কৃষক অভ্যুত্থানের ভিত্তিতে দার্জিলিং জেলার নকশাল বাড়ি গ্রামে জন্ম হয় নকশাল আন্দোলনের। পরবর্তীকালে এ আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও ছড়িয়ে পড়ে ভারতের কয়েকটি প্রদেশে। বাদ থাকে না মল্লভূমও।

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে বাঁকুড়া জেলা তথা মল্লভূমে নকশালপন্থীদের কার্য-কলাপ মাথা চাড়া দেয়। স্কুল কলেজ বন্ধ, অফিস আদালত পোড়ানো, পরীক্ষা ভণ্ডুল, পুলিশ হত্যা, পুলিশের বন্দুক ছিনতাই, যত্র তত্র যখন তখন বোমা বিস্ফোরণ প্রভৃতি কার্যকলাপ শুরু হয়ে যায়। রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের যৌথ উদ্যোগে আন্দোলন দমনের উদ্দেশ্যে পুলিশ ছাড়া সেনাবাহিনীও নামানো হয়। **অসীম চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ রাণা, ভোলানাথ শীট** প্রমুখের নেতৃত্বে মল্লভূমে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নকশাল কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায় ব্যাপক ভাবে। **"বিশেষত, বাঁকুড়া সদর, ওন্দা, বড়জোড়া ও রায়পুর থানায়। রায়পুর ব্লকের ফুলকুসুমা রেঞ্জের বীট অফিসারের বন্দুকটি খোয়া যায় হঠাৎ। পুলিসের চেষ্টায় জঙ্গলের ভেতর থেকে সেটি উদ্ধার করা হয়। বাঁকুড়া সদর ও ওন্দা থানা থেকে পরপর আটটি বন্দুক ছিনতাই হয়। পুলিশ ও নকশালে বন্দুকের লড়াই বাধে জোড়াশালের জঙ্গলে ও বিক্রমপুর গ্রামের পাশে কানাজোড়ের ধারে। প্রকৃতপক্ষে ওন্দা থানার বিক্রমপুর গ্রামটিকে কেন্দ্র করে**

ভোলানাথ শীট একটি ঘাঁটি এলাকা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। শ্রী শীট চারুমজুমদার পন্থী ও জেলার অন্যতম নকশাল নেতা। বিক্রমপুরে একটি ইঁটের পাঁজা থেকে পুলিস ছ'টি বন্দুক উদ্ধার করে। বাকি দু'টি উদ্ধার করা হয় বড়জোড়া থানার এক মন্দির থেকে। শ্রীশংকর মিত্র সহ ভোলানাথ শীট গ্রেপ্তার হন বড়জোড়ায়।"[১]

সি. পি. আই. এম, এল, (ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদ ও লেনিনবাদ) দলের সদস্যদের ধারণা ছিল দেশের কৃষক, ভূমিহীন কৃষক, কুটির শিল্পী ও শ্রমজীবী মানুষের দল তাঁদের পাশে থাকবে। আধা সামন্ততান্ত্রিক ও আধা ঔপনিবেশিক শাসন তথা শোষণ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে শোষিত সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ করে শ্রেণীশত্রু নিধন করে শোষণহীন শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনে তাঁরা সক্ষম হবেন। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। হিংসাত্মক কার্য-কলাপের জন্য নকশাল দল জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে ক্রমশঃ এবং পুলিশি পীড়নের মুখে দীর্ঘ-মেয়াদী এই আন্দোলন তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে ব্যর্থতার বেদনা বুকে নিয়ে।

ভারতমাতার শৃঙ্খল মোচনে মল্লভূমবাসীদের ভূমিকা এবং শৃঙ্খল-মোচনের অব্যবহিত পরই অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের পরই মল্লরাজ্যে ঘটে যাওয়া **'তেভাগা থেকে বাঁধগাবা ও নকশাল আন্দোলন'**-এর ইতিহাস হৃদয়ঙ্গম করার ফুরসতে চলার পথে বিষ্ণুপুরের 'চিলিং প্ল্যাণ্টটিকে পাশে রেখে আমরা উপনীত হয়েছি তুড়কী-সীতারামপুর মৌজায় অবস্থিত ধবাডাঙা পল্লীর আদিবাসীদের অঙ্গনে। এখন এঁদের মাটির প্রলেপ দেওয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন মাটির ঘরের মাটির দাওয়ায় বসেবসে শোনাব মল্লভূমের আদিবাসীদের কথা।

অধ্যায় - ১২০

মল্লভূমের আদিবাসী অঙ্গনে কিছুক্ষণ

ধবাডাঙা, তুড়কী-সীতারামপুর মৌজা

বিষ্ণুপুর শহরের এই অঞ্চলটি এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ যেমন তুড়কী সেনহাটি কলোনি, শালবাগান এবং মড়ার ও বেনাচাপড়া অঞ্চল সবই ছিল শাল, পিয়াল, মহুয়ার ঘন জঙ্গলে ঢাকা। বাঘ, ভালুক, নেকড়েবাঘ, শিয়াল, শশক, সরীসৃপ দাপিয়ে বেড়াত এখানে। সেনহাটি এবং শালবাগান অঞ্চলে কয়েক বছরের মধ্যেই গড়ে উঠেছে জনবসতি। আর এই ধবাডাঙা এবং ধবাডাঙার পূর্বে শিয়ালমারা এবং দক্ষিণপূর্বে বেনাচাপড়া এলাকায় দলবদ্ধভাবে সুদুর অতীতকাল থেকেই বসবাস করছেন সাঁওতালেরা। এখন এখানের এবং মল্লভূমের **সাঁওতাল** জাতি সম্বন্ধে বলব দু'চার কথা। মল্লভূমের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সাঁওতাল সম্প্রদায় জেলার জনসংখ্যার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। অরণ্যজীবী এই জাতির মানুষেরা অরণ্য, নদী, ক্ষেত্রবিশেষে পাহাড়িয়া অঞ্চলে এবং শহর বা গ্রামের ছুঁই ছুঁই দূরত্বে বসবাস করতে ভালবাসেন। গোষ্ঠীবদ্ধভাবে থাকা, দলবদ্ধভাবে কাজ করা, স্বল্পভাষী এই মানুষেরা মূলতঃ শ্রমজীবী। একান্ত একগুঁয়ে প্রকৃতির এঁরা 'বাং কানা' অর্থাৎ 'কাজ ছুটি' বলে দিলে আর কারো সাধ্য নেই এঁদের কাজ করতে বাধ্য করে। কৃষিকার্য, ক্ষেতমজুর এবং দিনমজুর এঁদের পেশা, শিকার এঁদের বংশগত নেশা। মল্লরাজাদের সেনাবাহিনীতে যোদ্ধার বেশে এঁদের দেখা

---

১. পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া—তরুণদেব ভট্টাচার্য, পৃঃ—১৮৫

গিয়েছে বিপুল সংখ্যায়, দেখা গিয়েছে অসমসাহসিক যোদ্ধা হিসেবে। কালো শ্লেট পাথরের মতো গায়ের রং, সাড়ে পাঁচ থেকে ছ'ফুট দীর্ঘ, বলিষ্ঠ পেশীবহুল চেহারা, পুরু ঠোঁট, মাথায় ঘন চুল, তার উপর পাগড়ি; পরনে কাচা ধুতি, হাতে তীর, পিঠে তূণীর, চোখের দৃষ্টিতে অব্যর্থ লক্ষ্য। আজ থেকে ৩০/৩৫ বছর পূর্বে শিকারীর এই রূপে প্রায়ই দেখা যেত সাঁওতালদের। জঙ্গলের পশুপাখী শিকারের পাশাপাশি কাঠবিড়ালী এবং ঢ্যামনা সাপ কাঁধে ঝুলিয়ে দলবদ্ধভাবে ঘোরা-ফেরা করতে দেখেছি তাঁদের। এ-রূপ আজ আর খুব একটা চোখে পড়ে না। যেমন চোখে পড়ে না এক একটিতে দশ বারো ভরি ওজনের রূপার মল, অনুরূপ ওজনের গামখারু; আঙ্গঠ বা হার পরা সাঁওতাল রমণী। ফেন-ভাত, জল-ছাঁকা ভাতের পুষ্টিতেই পুষ্ট এঁরা। এঁদের প্রত্যাশা যেমন কম, জীবনযাপনের পদ্ধতিটিও তেমনি সাদাসিধে। অল্পেই তুষ্ট, অন্যায় আচরণে সহজেই রুষ্ট, বিশ্বাসী এবং সৎ ও একগুঁয়ে প্রকৃতির এই সাঁওতাল জাতির মানুষের মাটির সাথে সম্পর্ক বেশ গভীর। মাটি চাষ, মাটি কেটে পুকুর বানানো, বাড়ির ভিত কাটা ছাড়াও গবাদি পশু প্রতিপালন এঁদের প্রধান কাজ। খড়ের ছাউনী দেওয়া স্বল্পোচ্চ মাটির ঘরে বসবাস করা এঁদের সহজাত ধর্ম। ঘরগুলিকে গোবর-মাটির প্রলেপ দিয়ে তাতে খড়িমাটি বা গিরিমাটির দেওয়ালচিত্র ও আলপনা কেটে নয়নাভিরাম করে তোলার মানসিকতা এঁদের সুরুচির পরিচায়ক। আবার ঘরের বাইরের দেওয়ালের ফুট দুই-তিন উচ্চতায় গোবর-বেড়ি দেওয়ার প্রথাটি এঁদের সর্পভীতি এবং অপদেবতা-ভীতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। প্রচলিত বিশ্বাস—ঘরের চারপাশে এরূপ বেড়ি দিলে সাপ, বিষাক্ত পোকা-মাকড় বা অপদেবতা আসতে পারবে না ঘরের কাছাকাছি। মূলতঃ প্রকৃতির কোলে-পিঠে বসবাসকারী এই সম্প্রদায়ের মানুষেরা প্রথমে ছিলেন প্রকৃতিপূজারী। পরে ভীতি থেকে এল দেবপ্রীতি। শক্তির ক্রম-অনুসারে **'সিঞ বঙ্গা'**, **'জমসিম বঙ্গা'**, **'মারাং বুরু'**, **'জাহের এরা'**, **'মড়েঁকো'**, **'গোসাঁএ এরা'**, **'পারগানা বুড়া'**, **'মাঝি হাড়াম বঙ্গা'**, **'অড়ার বঙ্গা'**, **'আবগে বঙ্গা'**, প্রভৃতি বিচিত্র নামধারী দেবতাদের জন্ম হল। চলল পূজা উপাসনা। 'সিঞ বঙ্গা' হলেন সূর্য-দেবতা, ঞিন্দা চাঁদো তাঁর স্ত্রী এবং নক্ষত্ররাজি তাঁদের সন্তান-সন্ততি। 'মারাং বুরু' হলেন বনদেবতা। আমাদের গণেশ-দেবতার মতোই সাঁওতালদের 'সিঞ বঙ্গা'র পূজা করেই ধর্ম-কর্ম শুরু হয়। আবার 'অড়ার বঙ্গা' ঘরের দেবতা, 'আবগে বঙ্গা' হলেন গোত্রের দেবতা ইত্যাদি, ইত্যাদি।

উর্বরতাবাদের উৎসব হিসেবে আষাঢ় মাসে সাঁওতালদের **'বীচ-পুহা'** বা বীজ-পূজা উল্লেখযোগ্য। এ পূজাতে কৃষি জমিতে ছাগল ও মুরগী বলি দিয়ে ছাগ-মুরগীর রক্তের মাধ্যমে জমির প্রাণশক্তি বৃদ্ধি করার প্রয়াসে চালিকা-শক্তি তত্ত্বই নিহিত। **'সেন্দ্রা রেয়ান্'** শিকারোৎসব উপলক্ষ্যে **'মারাং বুরু'** বনদেবতার পূজা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজের মুখ্য ব্যক্তি মাঝি বা মুখিয়া, নামান্তরে হয়েছে মণ্ডল থেকে মোড়ল। পুরোহিতরূপে মোড়লের নাম হয় 'লায়া'। পূজাদি কার্যে তাঁর সহায়ক হন জগমাঝি, পরামাণিক ও কোটাল। পুরুষাণুক্রমে চালু রয়েছে এইসব পদ-পদবী। উপরোক্ত পূজা-পার্বন ছাড়াও এঁদের **'কাড়া এবং বলদ খুঁটা পর্ব'** এবং **'ভ্যাজা বিঁধা'** (লক্ষ্য ভেদ) পর্বও বিশেষ আকর্ষণীয়। গ্রামের উন্নতি, অবনতি, সুখ-সমৃদ্ধি, সামাজিক আচার অনুষ্ঠান, শিকারযাত্রা, পালা-পার্বণ, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার সব কিছুর দায়িত্বে থাকেন মাঝি বা মোড়ল। তাঁর কথাই শেষ কথা। নারী-পুরুষের অবৈধ সম্পর্ক এবং সাওঁতাল সমাজের রীতি-নীতি

লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত শাস্তি হ'ল **'বিটলাহা রেয়ান'** অর্থাৎ জাতিচ্যুতিকরণ। হাঁসদা, মুর্মু, কিস্কু, হেমব্রম, মাণ্ডি ও টুডু এইসব আদি গোত্রগুলির সাথে পরবর্তীকালে বাস্কে, বেশরা, পাঁউরিয়া, চঁড়ে ও বড়য়া প্রভৃতি গোত্রগুলি সংযোজিত হয়েছে। পিতৃতান্ত্রিক সাঁওতাল সমাজে বরপণের পরিবর্তে কন্যাপণ প্রচলিত। বিবাহে মেয়ের বাড়িতে বরপক্ষের খাওয়াও নিষিদ্ধ। সংসার পরিচালনার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের ভূমিকা প্রায় সমান সমান। অরণ্যজীবী সাঁওতাল জাতির অরণ্যসম্পদ যেমন আয়ের উৎস তেমনি আনন্দেরও উৎস। বসন্তোৎসবে, চাঁদনি রাতে, অথবা বিবাহ-অনুষ্ঠানে সাঁওতাল পুরুষ ও মহিলার মাদলের বোলে, গানের তালে তালে স্বতঃস্ফূর্ত সমবেত নৃত্য আর আড়বাঁশীর মিঠেলি সুর মিলেমিশে প্রকৃতির দৃশ্যপটে যে নৈসর্গিক সৌন্দর্য ও ছন্দ-মাধুর্য সৃষ্টি করে তা নিঃসন্দেহে জেলার সংস্কৃতি চর্চাকে এক অভিনব মাত্রা দিয়েছে। মল্লসংস্কৃতিকে করেছে সুসমৃদ্ধ।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে গ্রাম বাংলাতে জনসংখ্যা হ্রাস পায় বিপুলভাবে। সেই অবলুপ্ত জনসংখ্যার শূন্যস্থান পূরণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন সাঁওতালেরা। শিকার ও কৃষিজমির সহজ প্রাপ্যতাও তাঁদের আকৃষ্ট করেছিল।

আহিড়ী-পিপিড়ী ও চাইচম্পা এঁদের আদি বাসস্থান। আহিড়ী বা হিহিড়ী পিপিড়ী হল প্রজাপতির দেশ। সাঁওতালী ভাষাতে পিপিড়ীআম মানে প্রজাপতি। চাইচম্পা মানে ফুলে ফুলে বিকশিত ফুলের দেশ। হাণ্টার সাহেবের অনুমান এগুলি ব্রহ্মপুত্র নদের উপত্যকা অঞ্চলে অবস্থিত। পক্ষান্তরে রিসলে সাহেবের মতে এগুলি হাজারিবাগ আহুরি, চাই ও চম্পা পরগনাতে অবস্থিত। আবার ডালটন সাহেবের মতে মেদিনীপুর জেলার শিলদা অঞ্চলের প্রাচীন নাম সাঁওত। এই সাঁওত থেকেই সাঁওতাল জাতির নামকরণ। অনেকের ধারণা শিখরভূম (বর্তমানে পুরুলিয়া) থেকে এই আদিবাসী জাতিটি সাঁওত পরগনাতে বসবাস শুরু করেন সুদূর অতীতে। পরে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের সময় বাঁকুড়া জেলায় এঁদের ব্যাপকভাবে আগমন ঘটে। অবশ্য তারও বহু পূর্ব থেকেই এঁরা মল্লভূমের অধিবাসী—মল্লরাজা আদি মল্লের আমলে সাঁওতাল সর্দারের সহযোগিতার কথা এবং মল্লরাজাদের সাথে শিকারযাত্রা—এই সত্যকেই প্রমাণিত করে। আরো উল্লেখ্য সাঁওতালদের সাথে **কুর্মী-মাহাতো** সম্প্রদায়ের আত্মিক সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয়। **কথিত আছে আদি সাঁওতালের প্রথমা পত্নীর সন্তান সাঁওতাল এবং দ্বিতীয়া পত্নীর সন্তান কুর্মি। অর্থাৎ এঁরা বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।** এজন্যই বোধ করি সাঁওতালেরা অন্য আদিবাসীর রান্না গ্রহণ না করলেও কুর্মীদের রান্না করা খাবার এঁদের গ্রহণ করতে বাধে না। কুর্মী-মাহাতোর বিবাহে সাঁওতাল পরিবারের **'শিরি বারি ভালা'** অর্থাৎ **'এক কলসী জল'** না হলে বিবাহ-অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয় না। আবার কুর্মীর বিবাহে সাঁওতাল পরিবারের পান্তাভাত অপরিহার্য। এঁদের বিবাহে সাঁওতালদের মতো বিয়ের পূর্বে বরের 'আম-বিহা' এবং কনের 'মহুল-বিয়া' দেওয়ার নিয়ম প্রথাসিদ্ধ। এছাড়া সাঁওতাল ও মাহাতো পরিবারের মেয়েদের মধ্যে ফুল-পাতানোর দৃষ্টান্তটিও উভয় সম্প্রদায়ের ঘনিষ্ঠতা তথা আত্মীয়তার তথ্যকেই সমর্থন করে। বর্তমানে এসব নিয়ম পালনে শৈথিল্য পরিলক্ষিত হয়।

দীর্ঘদিন হিন্দুদের সংস্পর্শে বসবাসের ফলে হিন্দুভাবাপন্ন সংস্কৃতির ছোঁয়া লেগেছে এঁদের জীবনযাত্রায়। জাতিগত বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিলে তিলে বিসর্জন দিয়ে আধুনিক সভ্যতার আলোকে আলোকিত হতে চাইছেন এঁরাও। তাই আর কাড়া-নাকাড়া বাজিয়ে

দলবদ্ধভাবে শিকারযাত্রার দৃশ্য খুব একটা চোখে পড়ে না। সাঁওতাল পল্লীর পাশ দিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে যেতে হয় না মাদল আর বাঁশীর সুরে সুরভিত গানের সুরে,—

অকয় হালে চিয়ালেৎ হুড়ুমা গেলে
হুড়ুমা গেলে লুকুই লুকুই?
মারাং বুরুই চিয়ালেৎ হুড়ুমা গেলে
হুড়ুমা গেলে লুকুই লুকুই.....

অর্থাৎ এই যে নয়নাভিরাম লিক্‌লিকে ধানের শীষ — কে এসব সৃষ্টি করেছেন? উত্তরে বলা হয়েছে, এ সব লিক্‌লিকে ধানের শীষ সমূহ মারাং বুরুই তৈরী করেছেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে গানের মধ্যে তাঁদের ইষ্ট দেবতার জয়গানই গীত হয়েছে। দুঃখের বিষয় এসব বৈচিত্র্য হারিয়ে যাচ্ছে ক্রমশঃ। অবশ্য হারিয়ে যায়নি উপজাতিগুলি। সাঁওতালদের মতই ভূমিজ সম্প্রদায়ের মানুষেরাও জেলার জনসংখ্যার একটি বিশেষ অংশ হিসেবে পরিগণিত। বেঁটেখাটো, হৃষ্টপুষ্ট চেহারা। বর্ণহিন্দুদের জীবন-যাপনের ভাবধারায় প্রভাবিত ভূমিজ জনগোষ্ঠীর বসবাস জেলার খাতড়া, রাণীবাঁধ ও রায়পুর থানাতে। ভূমিজদের অন্যতম প্রধান উৎসব হ'ল ভাদ্রমাসের করম গাছের পূজা। গ্রামের মধ্যস্থলে 'আখড়া'তে ভাদ্র মাসের শেষের দিকে একটি করম গাছের ডাল পুঁতে দেন 'লায়া' বা পুরোহিত। উৎসবের প্রথম দিনে কুমারী মেয়েরা করম ডালের নীচে বীজ ছড়িয়ে দিয়ে জল-সিঞ্চনে যত্নআত্তি করতে থাকেন। বীজ থেকে অঙ্কুরোদ্গম হয় ঠিক ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির পূর্বেই। সংক্রান্তির দিন অঙ্কুরিত চারা খোঁপায় গুঁজে সারারাত্রি ব্যাপী নাচগান চলে আখড়াতে। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ করম উৎসবটি হল শস্যের সুফলন এবং কুমারী তথা নারীর উর্বরতাবাদের উৎসব।

এই ভূমিজ সম্প্রদায়ের মানুষেরা এককালে ধলভূম, সিংভূম, শিখরভূম, মালভূম, বাগমুণ্ডি প্রভৃতি অঞ্চলের রাজা, জমিদার, ঘাটোয়াল সর্দার হিসেবে প্রভূত্ব করেছেন দাপিয়ে। নির্ভীক, বলশালী, যোদ্ধা-জাতিরূপে সমাদৃত আত্মাভিমানী এই ভূমিজ মানুষদের সেন্টিমেন্টে সুড়্‌সুড়ি দিয়ে কাজ আদায় তথা উদ্দেশ্য সিদ্ধি করা যায় সহজেই।

'দে ভূমিজকে ফুলাই, যাক ভূমিজ তলাই।'

—প্রবাদটি উপরোক্ত তথ্যকেই সমর্থন করে। ভূমিজদের পর বলি জেলার কোড়া বা কোড়ো জাতির কথা। জীবনযুদ্ধে ক্লান্ত, অপুষ্ট, বেঁটে-খাটো শরীর কালো মলাটে মোড়া কোড়ো উপজাতির মানুষেরা একাধারে যেমন মাটির মানুষ তেমনি তাঁদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মাটির সাথে। কারণ একটি কোড়ো জাতির মানুষকে যদি প্রশ্ন করা হয়, 'আপে অকয়' সাথে সাথে উত্তর আসে, 'মুণ্ডা কোড়া', অর্থাৎ মুদিকোড়া। মুদিকোড়া শব্দটির মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে মাটি খোঁড়া বা মাটি কাটা। অর্থাৎ পথ, ঘাট, পুকুর-ডোবা, পরিখা, বাঁধ প্রভৃতির মাটি কেটে এঁদের জীবন-জীবিকা নির্বাহ হয়। কাজের খোঁজে এখানে ওখানে ভ্রাম্যমাণ জীবনযাপনে অভ্যস্থ এই জাতিটি 'যখন যেমন, তখন তেমন'—ভাবেই কোদাল, গাঁইতি, ঝুড়িকে সঙ্গী করে অস্থায়ী ঘর বাঁধেন নীল আকাশের সামিয়ানার নীচে। এস. সি. রায় কোড়ো জাতির সাথে ওঁরাওদের সাদৃশ্য খুঁজে পেলেও রিসলে সাহেবের মতে এঁরা মুণ্ডাদের উপশাখা মন্তব্যটিই গ্রহণীয় বলে বিবেচিত হয় 'মুণ্ডাকোড়া' আত্মপরিচয়াত্মক

শব্দটি থেকে। পশ্চিমবাংলাতে ছড়িয়ে থাকা কোড়ো জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশের বসবাস বাঁকুড়াতে। শালতোড়া, রায়পুর, রাণীবাঁধ, খাতড়া ও ছাতনা অঞ্চলে ছড়িয়ে রয়েছেন এঁরা। গঙ্গাজলঘাটির কোড়োপাহাড় ও তৎসংলগ্ন গ্রামগুলিতে হয়তো একদিন এঁরা বসতি স্থাপন করেছিলেন—কোড়োপাহাড় নামটি যেন তারই নীরব-সাক্ষী। শ্রদ্ধেয় তরুণদেব ভট্টাচার্য এঁদের কথা বলতে গিয়ে তাঁর 'পশ্চিমবঙ্গ দর্শন বাঁকুড়া' পুস্তকের ২৩২ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন, "মূল গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন। মুখের ভাষাও বদলে যাচ্ছে। তবু স্বভাবে স্বাধীন ও দাসত্ব মেনে নিতে রাজী নন। সমবেত গানে, ঝুমুরের মধ্যে ধ্বনিত হয়ে ওঠে সেই স্বাতন্ত্র্য।

পরোয়া করিনে উঁচু জাতপাত, পদসেবা কারো করবো না
নোয়াবো না মাথা, ঝড়ে ঝঞ্ঝায়, নাগপুর নয় চলে যাবো।
সাথে নেব ঝুড়ি কোদাল গাঁইতি, খড়্গপুরেই তুলবো বসতি
বাটি বাটি মদ ছেলে আর বুড়ো, মাথা উঁচু করে থাকবো।"

মল্লভূমের আদিবাসী-অঙ্গনে কিছুক্ষণ কাটিয়ে আমরা এই মুহূর্তে হাজির হয়েছি চলার পথে পাশে রেখে যাওয়া হরিতপোবন আশ্রমে বা তুড়কী আশ্রমে।

আজ আমরা সকলেই পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা মোতাবেক এই আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা তথা সিদ্ধ-সাধক মৌনীবাবার প্রসাদ পাব এখনই। প্রসাদ পাওয়ার পর আশ্রমের শান্ত পরিবেশে বটবৃক্ষমূলে উপবেশন করে জিরিয়ে নেওয়ার অবকাশে শোনাব এই আশ্রমের ইতিকথা, শোনাব মহাসাধক মৌনীবাবার মাহাত্ম্য-গাথা।

অধ্যায়-১২১

হরিতপোবন আশ্রম

তুড়কী

এই আশ্রমটির খেতাবী নাম 'হরিতপোবন আশ্রম' হলেও এটি 'তুড়কী আশ্রম' নামেই সমধিক পরিচিত। ১২০১-১২০৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গে তুর্কী আক্রমণ হয়। ঐ সময় বিষ্ণুপুরের এই অঞ্চলে তুর্কি সৈন্যেরা বিষ্ণুপুর আক্রমণের জন্য ঘাঁটি বা সেনা শিবির করে। সেই থেকেই অঞ্চলটি তুড়কীর ডাঙা নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে এবং আশ্রমটিও লোকমুখে তুড়কী আশ্রম নামেই বিশেষ পরিচিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে এটি কিন্তু উদাসীন সাধু সম্প্রদায়ের আশ্রম। বাংলা সন ১৩২০ সাল, বৈশাখ মাসের মধ্যভাগ, ইংরাজী ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের একেবারে শেষের দিকের কথা। সুদূর পাঞ্জাব থেকে অবিভক্ত বাংলার বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর শহরের উদ্দেশ্যে পদব্রজে এগিয়ে চলেছেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। সর্বাঙ্গে বিভূতি, আস্কন্ধপ্রলম্বিত জটাগুচ্ছ, বাম করে কমণ্ডলু, দক্ষিণ করে একটি সুশোভন যষ্টি।

সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে জ্যোতিমূর্তি অবশেষে এসে গেছেন মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা গ্রামে। ক্ষণকাল থমকে দাঁড়ালেন পথিক। অতঃপর পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে দেন স্বীয় হস্তস্থিত যষ্টিখানি। গড়বেতা হাইস্কুলের তদানীন্তন অন্যতম শিক্ষক পথচারী রামকৃষ্ণ দে মহাশয় সকৌতুকে লাঠিটির অগ্রভাগের দিকে দৃষ্টিপাত

করেন। দেখেন যষ্টি-সংলগ্ন একটি কাগজের উপর দেবনাগরী হরফে যা লেখা রয়েছে, তার বিষয়বস্তু—ইনি মৌনী, বিষ্ণুপুর যাইতে চান, পথিকজন ইঁহাকে সাহায্য করিবেন।

রামকৃষ্ণ দে মহাশয়ের ভগ্নিপতি প্রাণবল্লভ দে মহাশয়ের বাড়ি বিষ্ণুপুরের বুড়ো শিবতলা পল্লীতে। ভগ্নিপতির উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রসহ উক্ত মৌনী-সাধুকে তিনি বিষ্ণুপুরের পথ-নির্দেশ দেন সানন্দে।

চলমান সেই জ্যোতিমূর্তি অবশেষে সমাগত হলেন তাঁর গন্তব্যস্থল গুপ্তবৃন্দাবন বিষ্ণুপুরে। এদিকে প্রাণবল্লভ বাবু তখন স্কুলে। বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাকালীন অন্যতম শিক্ষক ছিলেন তিনি। 'ড্রইং মাস্টার' নামেই তাঁর বিশেষ পরিচিতি। স্কুল থেকে প্রত্যাগমন করে তিনি অভ্যাগত সাধু-মহারাজের আদর আপ্যায়ন করেন যথাযথ। অহল্যাবাঈ রোডের পূর্ব দিকে অবস্থিত বর্তমান ডিস্ট্রিক্ট সেণ্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পশ্চিম দিকে বিষ্ণুপুর মহকুমা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকাতে ছিল একটি পান্থশালা। পান্থশালার ভগ্নাংশ আজও অল্পস্বল্প বিদ্যমান। পরিব্রাজক সাধু-সন্ন্যাসী এবং অতিথি অভ্যাগতেরা রাত্রি যাপন করতেন সেখানে। কিন্তু তৎকালে উক্ত পান্থশালাটি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়ায় সাধুজী বুড়া-শিবতলার শিবমন্দির সংলগ্ন নাটমন্দিরেই অবস্থান করতে থাকেন সারাক্ষণ। নির্বিকার এবং নির্বাক। কিন্তু কেন তিনি নির্বিকার? কেন তিনি মৌন?

উত্তর খুঁজতে গিয়ে স্মরণের মণিকোঠায় উদ্ভাসিত হয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সেই পুণ্য শ্লোক—

"............

মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্।।১০/৩৮

অর্থাৎ—"শ্রবণ, মনন এবং ধ্যান আদি গুপ্ত কার্যকলাপের মধ্যে মৌনতাই হচ্ছে সব চেয়ে গূঢ়, কারণ মৌনতার মাধ্যমে অতি শীঘ্র পারমার্থিক উন্নতি লাভ করা যায়। জ্ঞানী তাঁকে বলা হয়, যিনি জড় পদার্থ এবং চেতন আত্মার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন অর্থাৎ যিনি ভগবানের উৎকৃষ্টা এবং অনুৎকৃষ্টা প্রকৃতির পার্থক্য নিরূপণ করতে পারেন।" আর একথা সত্য যে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ সেই জ্ঞানরূপে প্রতিভাত।

মৌনীবাবার মধ্যে ছিল দিব্যজ্ঞান। ছিল সেই সাধন-নিষ্ঠা—তাই তো তিনি মৌন। তাইতো মৌনব্রতধারী এবং সাধনৈশ্বর্যে সমৃদ্ধ এই দিব্যকান্তি সন্ন্যাসীর দেহপুঞ্জে ফুটে উঠেছিল বাঙ্ময়তা। অমল-ধবল গৌরবর্ণ বিশিষ্ট সৌম্যকান্তি দৃষ্টিনন্দন সর্বত্যাগী ঐ তরুণ সন্ন্যাসীর দুর্বার আকর্ষণে ঈশ্বর-প্রেমিক মানুষজনের ভিড় জমে যেত তাঁর চারপাশে এবং তাঁরই নির্দেশে সন্ধ্যা সমাগমে চলতো হরিনাম-সংকীর্তন—

ওঁ শ্রী বাহে গুরু বোল।
ওঁ শ্রী হরি হরি বোল।।

তদীয় গুরুমহারাজের নির্দেশে সুদূর পাঞ্জাব থেকে মৌনীবাবার আগমন ঘটে বিষ্ণুপুরে। কিন্তু মনে প্রশ্ন জাগে তাঁর এই শুভাগমনের উদ্দেশ্য কি? কেনই বা তাঁর গুরুদেব তাঁকে পাঠিয়েছিলেন বিষ্ণুপুরে?

বিষ্ণুপুর গুপ্তবৃন্দাবন—এজন্য? মল্লভূম-বিষ্ণুপুর শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পীঠস্থান—এজন্য? না কালের প্রকোপে ক্ষয়িত ধর্মপ্রবাহকে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য?

শতাব্দীর পটভূমিকায় দেখা যায় বিংশ শতাব্দীটি বিজ্ঞান সাধনার চরম উৎকর্ষের যুগ বলে চিহ্নিত হলেও অধ্যাত্ম-সাধনা এবং মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে এটি চূড়ান্ত বিপর্যয় তথা অবক্ষয়ের যুগ। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ভারতবর্ষের মাটিতে যে অধ্যাত্মচেতনা, মানবিক মূল্যবোধ এবং শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতি সৃষ্টিধর্মী সূক্ষ্ম কলাবিদ্যার স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ পরিলক্ষিত হয় সেটি যেনবা বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নিষ্প্রভ এবং ম্রিয়মাণ হয়েছে অবক্ষয়ের ক্ষয়িত স্রোতে। পুকুরের পাড় এবং নদী তীরবর্তী তৃণ, লতাগুল্ম, বৃক্ষরাজি যেমন করে পাড় ও তীরবর্তী মাটিকে আঁকড়ে ধরে রাখে সযত্নে—অবক্ষয় রোধের জন্য থাকে সদা সচেষ্ট, অনুরূপভাবে মহাবীর জৈন, বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্য, গুরুনানক, চৈতন্য মহাপ্রভু ও শ্রীচন্দ্রদেব প্রমুখ ধর্মাচার্যগণ অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ তথা দুর্বার অবক্ষয় রোধের জন্য শিষ্য প্রশিষ্য মাধ্যমে ধর্মপ্রচার এবং অধ্যাত্ম জীবনধারার গতি প্রবাহকে অব্যাহত রাখার জন্য থাকেন সদাসচেষ্ট। এই সুমহান উদ্দেশ্যেই বোধ করি মল্লভূমের মাটিতে পদার্পণ করেন নির্বাক উদাসীন সাধু মৌনীবাবা। হ্যাঁ, মৌনীবাবা হলেন উদাসীন সাধু সমাজের একজন সিদ্ধ সাধক।

সাধারণতঃ উদাসীন বলতে বোঝায় সংসারের মায়াপাশ-মুক্ত আসক্তি-শূন্য বৈরাগী। (উৎ-আস্ + শানচ্ কর্তৃ = উদাসীন) উদাসীন শব্দটির আর এক প্রকার ব্যাখ্যা প্রচলিত। **উদ্ অর্থে বলা হয়েছে ব্রহ্ম, আর আসীন অর্থে স্থিত। সুতরাং উদাসীন অর্থে বোঝায় 'ব্রহ্মে স্থিত'। অতএব উদাসীন সাধু বলতে বোঝায় ব্রহ্মচিন্তায় বিভোর, সমজ্ঞানী স্থিতপ্রজ্ঞ সাধু।** আবার 'স্থিতপ্রজ্ঞ' সম্বন্ধে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে অর্জুনকে বলেছেন,—

প্রজাহতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে।। (২/৫৫)

অর্থাৎ — হে পার্থ! যখন সাধক তার সমস্ত মনোগত কামনা সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে আপনাতেই আপনি সন্তুষ্ট থাকেন, তখন তাঁকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয়।

'উদাসীন' শব্দটি এক্ষেত্রে গীতার 'স্থিতপ্রজ্ঞ' শব্দের সমার্থক।

উদাসীন সাধু সমাজের উৎপত্তি সম্পর্কে একটি মনোগ্রাহী পৌরাণিক কাহিনী প্রচলিত। কাহিনীটি নিম্নরূপ—

একদা ভগবান ব্রহ্মার চার মানসপুত্র সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎ কুমারের মনে ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ে কতিপয় প্রশ্ন উদিত হয়। তখন ব্রহ্মজ্ঞান পিপাসু পুত্রগণ পিতা ব্রহ্মাজীর কাছে গিয়ে ব্রহ্মতত্ত্ব বিষয়ক প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেন। কিন্তু ব্রহ্মাজী নিরুত্তর থাকায় স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু হংসরূপ ধারণ করে সেই প্রশ্নগুলির সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎ কুমারকে প্রীত এবং অভিভূত করেন। কথিত আছে হংস জল মিশ্রিত দুগ্ধ থেকে দুগ্ধ পান করে জল ত্যাগ করে। অর্থাৎ হংসের কাজ হল অসার বস্তু ত্যাগ করে সার বস্তু গ্রহণ করা। ভগবান বিষ্ণু হংসরূপ ধারণ করে ব্রহ্মার চারপুত্রকে জাগতিক অসার বস্তু ত্যাগ করে সার বস্তু গ্রহণ করতে শিক্ষা দিয়েছিলেন। আর এতাদৃশ সারবস্তুটি হ'ল ব্রহ্মজ্ঞান। ব্রহ্মচিন্তায় বিভোর সনক, সনন্দন, সনাতন ও সনৎ কুমার — এই চার ব্রহ্মজ্ঞানী মহাযোগী হলেন চারজন আচার্য এবং তাঁদের দীক্ষিত সাধু-সমাজ উদাসীন সম্প্রদায় নামে চিহ্নিত। এ তো গেল পৌরাণিক যুগের কথা। বর্তমানে কলিযুগের পাপ-তাপ প্রপীড়িত বুদ্ধিজীবী বস্তুবাদী মানুষকে ধর্মতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব এবং ব্রহ্মতত্ত্ব শোনানোর জন্য এলেন জন্মসিদ্ধ সাধক সাক্ষাৎ শিবরূপী স্বয়ং

শ্রীচন্দ্রদেব। শ্রীচন্দ্রদেব হলেন গুরুনানকের জ্যেষ্ঠ পুত্র। গুরুনানকের স্ত্রী সুলক্ষণা দেবী ছিলেন পরম শিবভক্ত। দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপাতেই তিনি শিবতুল্য শ্রীচন্দ্রদেবকে পুত্র রূপে লাভ করে হয়েছিলেন ধন্য। স্বামী শ্রীচন্দ্রদেব ধর্মতত্ত্বকে কলির মানুষের সাধনোপযোগী করে উদাসীন সম্প্রদায়ের মধ্যে নতুন করে প্রাণসঞ্চার করেন। এতাদৃশ উদাসীন সম্প্রদায়ের কোন একজন গুরুমহারাজের মন্ত্রশিষ্য হলেন মৌনীবাবা।

মৌন থাকতেন বলেই তিনি মৌনীবাবা—একথা আগেই বলেছি, নতুবা শ্রীহরির চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকা এই সাধুর আসল নাম **হরিভজন দাস উদাসীন**। তাঁর শ্বাসে-প্রশ্বাসে অহর্নিশি চলতো ইষ্টমন্ত্র জপ এবং দেহাভ্যন্তরে শরীরের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অনুরণিত হত—

ওঁ শ্রী বাহে গুরু বোল।
ওঁ শ্রী হরি হরি বোল।।

গুরু ব্রহ্মা, গুরু বিষ্ণু, গুরুদেব মহেশ্বর—অর্থাৎ গুরুর মাধ্যমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের উপাসনার পাশাপাশি শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাবে প্রভাবিত হরিভক্ত পরায়ণ বাঙালী হৃদয়ে ঈশ্বরভক্তির জোয়ার আনার মহৎ উদ্দেশ্যে 'ওঁ শ্রী বাহে গুরু বোল' এই পদের সাথে যুক্ত হল 'ওঁ শ্রী হরি হরি বোল'— এই মহাপদ।

মৌনীবাবার দিব্য আকর্ষণে বুড়োশিবতলাতে ভক্ত সমাগম হয় কাতারে কাতারে। আকাশ বাতাস মুখরিত করে ধ্বনিত হয় হরিনাম সংকীর্তন। এইভাবে অতিবাহিত হয় কয়েকমাস। এমন সময় মৌনীবাবা একদিন আকারে ইঙ্গিতে ভক্তদের বুঝিয়ে দিলেন যে তিনি কয়েকদিনের জন্য মন্দির অভ্যন্তরে অবস্থান করবেন একাদিক্রমে। স্বেচ্ছায় বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত কেউই যেন তাঁকে বিরক্ত না করে বা শ্রীমন্দিরের দরজা না খোলে। মন্দিরগর্ভে প্রতিষ্ঠিত শিবঠাকুরের পুজো হবে কিভাবে? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বুঝিয়ে দেন, বন্ধ দরজার সম্মুখে ঠাকুরের উদ্দেশ্যে ফুল, ফল, নৈবেদ্য, শীতলাদি নিবেদন করেই পুজো হবে যথা নিয়মে। সাধু-মহাপুরুষের নির্দেশে এইভাবেই চলতো পূজাদি কর্ম এবং অহোরাত্রের সারাক্ষণই ভক্তগণ উপস্থিত থাকতেন মন্দির-সংলগ্ন নাট-মন্দিরে।

বেশ কয়েকদিন এইভাবে অতিক্রান্ত হওয়ার পরও যখন সাধুজী মন্দির থেকে বেরিয়ে এলেন না তখন অনেকেই কিছু একটা অঘটনের আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে যখন মন্দিরের দরজা খোলার কথা ভাবছেন ঠিক সেই সময়ে তুড়কী অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী গ্রামের কয়েকজন গ্রামবাসী যাঁদের মধ্যে দুধ-বিক্রেতা গোয়ালাও ছিলেন, তাঁরা জানালেন যে মৌনীবাবাকে এইমাত্র তাঁরা তুড়কীর জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে দেখে এসেছেন এবং মৌনীবাবা তাঁদের কাছ থেকে অঞ্জলি পেতে জলপানের ভঙ্গিমায় দু-হাত জোড় করে দুধ পান করেছেন আকণ্ঠ।

গ্রামবাসীদের কথায় বিশ্বাস না করে মন্দিরের দরজা খোলা হলে মৌনীবাবা বেরিয়ে এলেন মন্দিরগর্ভ থেকে এবং বিস্ময়ের বিষয় এই যে, দেখা গেল তখনো তাঁর শ্রীহস্তদ্বয়ে কাঁচা দুধের দাগ সুস্পষ্ট।

সূক্ষ্ম দেহে স্থানান্তরে বিচরণ করার এতাদৃশ অলৌকিক ঘটনার কথা লোকমুখে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের ভিড়ে বুড়োশিবতলা হয়ে ওঠে লোকে • লাকারণ্য।

লোকারণ্য এড়াতে তিনি হলেন অরণ্যচারী। চলে গেলেন তুড়কীর জঙ্গলে। আজ থেকে আশি নব্বই বছর আগে এই তুড়কী অঞ্চলটি ছিল ভয়াবহ জঙ্গল এলাকা। বাঘ,

ভালুক, হায়না, নেকড়ে-বাঘ, বুনো-শুয়োর প্রভৃতি শ্বাপদ জন্তু জানোয়ার এবং ভয়ঙ্কর সব বিযাক্ত সরীসৃপ দাপাদাপি করতো শাল, পিয়াশাল, মহুয়া, হরীতকী, আমলকী, আম, জাম, নিম, খেজুর, কুচলা, পুতলা, বহেড়া, কসাই, তাল, বেল, বকুল, বট, অশ্বত্থ, বনফুল, ক্ষীরকুল, শিঁয়াকুল, কেন্দ, ভুড়ুর প্রভৃতি লতাগুল্ম ও বৃক্ষাদি পরিবৃত বনভূমিতে। উক্ত বনভূমির আভূমি-ঝুরি-প্রলম্বিত সুপ্রাচীন এক বটবৃক্ষমূলে বসে ঈশ্বর সাধনায় তন্ময় হয়ে থাকতেন মৌনীবাবা। আর তাঁরই পদপ্রান্তে অশীতিপর বৃদ্ধও বসে থাকতেন নিঃশব্দে। নীরবে বয়ে যেত সময়। ঘটে যেত কিছু দেওয়া নেওয়ার কাজ। এ দৃশ্য দেখে তাই তাৎক্ষণিকভাবে হৃদয়বীণায় ঝংকৃত হয় —

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ।

ধ্যানমগ্ন মৌনীবাবার রূপবর্ণনা করতে গিয়ে আমার মানসপটে ভেসে উঠে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই অজর, অমর, ভাস্বর চিত্ররূপ —

" ....নবীন গৌরকান্তি—
সৌম্য সহাস তরুণ বয়ান,
করুণাকিরণে বিকচ নয়ান,
শুভ্র ললাটে ইন্দু-সমান ভাতিছে স্নিগ্ধ শান্তি।।"

* * *

মৌনীবাবাকে কেন্দ্র করে তুড়কীর বনাঙ্গনে রচিত হল ধর্মক্ষেত্র। বটবৃক্ষ সন্নিকটে তাঁর জন্য নির্মিত হল পর্ণকুটীর। মাতৃক্রোড়ে যেমন শিশু, বনে যেমন বন্যপ্রাণী, তুড়কীর বটবৃক্ষমূলে ঠিক তেমনি শোভা পেতে থাকেন মৌনীবাবা। এদিকে মৌনীবাবা বিহনে বুড়োশিবতলার মন্দির-প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে হতশ্রী। মৌনীবাবাকে ফিরিয়ে আনার সানুনয় চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। তবে ভক্তবৃন্দের আন্তরিকতায় এবং শিবঠাকুরের আকর্ষণে মাঝে মধ্যে তাঁর শুভাগমন ঘটতো বুড়োশিবতলার দেবাঙ্গনে।

বৈশাখ মাসের তৃতীয় সপ্তাহের প্রথম ভাগে সুদূর পাঞ্জাব থেকে তাঁর শুভাগমন হয় বিষ্ণুপুরে। তাঁর দৈবনির্দিষ্ট শুভাগমনের পুণ্য লগ্নটিকে ভক্ত হৃদয়ে সদা জাগরূক রাখার জন্য তাঁর শুভাগমনের পরের বছর অর্থাৎ ১৩২১ সালে বুড়ো-শিবকে কেন্দ্র করে বৈশাখ মাসের সংক্রান্তি তিথিযোগে উদযাপিত হয় গাজন উৎসব। সেই থেকে বছরে বছরে আজ ৯০ বছর যাবৎ অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে 'বুড়ো শিবের গাজন' উৎসব— যা 'আবাল গাজন' নামেই সুবিদিত। আবাল গাজনের মধ্যমণিরূপে এবং শোভাযাত্রার অগ্রভাগে সাক্ষাৎ শিবরূপে শোভা পেতেন মৌনীবাবা।

মৌনীবাবার দিব্য আকর্ষণে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই আকৃষ্ট হতেন। সাধু-সঙ্গের আশায় সময়ে অসময়ে দলে দলে দলবদ্ধ মানুষ ছুটতেন শ্বাপদসংকুল তুড়কী আশ্রমে। গৃহীশিষ্যভক্তদের পাশাপাশি তাঁর কাছে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বনে ঈশ্বর উপাসনাতে জীবন উৎসর্গ করেন অনেকেই। এঁদের মধ্যে রয়েছেন সন্ত মোহন দাস, ব্রহ্ম দাস, সাগর দাস, শান্তি দাস, ভগবান দাস, জগদীশ দাস, মহাদেব দাস, জ্ঞান দাস, বুদ্ধম দাস, বৃহস্পতি দাস, শুক্রদাস, সন্তরণ দাস ও শিব দাস উদাসীন প্রমুখ।

গৃহীশিষ্যভক্তগণের সমাগমে এবং সন্ন্যাস ভক্তদের উপস্থিতিতে ক্রমে ক্রমে জম-জমাট হয়ে ওঠে হরিতপোবন আশ্রম। চলতে থাকে নিষ্ঠা সহকারে ঈশ্বর আরাধনা, ধর্মচর্চা এবং হরিনাম সংকীর্তন।

দিন যায়। জীবনের গতি-প্রবাহে আসে পরিবর্তন। অতীতের স্থূল সত্য কথাগুলো হয়ে ওঠে স্মৃতিকথা। স্মৃতিকথার সাথে সংযুক্ত হয় কিছু মুখরোচক সংলাপ। দিনে দিনে মুখে মুখে পরিবর্তিত হতে হতে এসে যায় অতিরঞ্জন। জন্ম হয় কিংবদন্তী। মহাসাধক মৌনীবাবার বিষ্ণুপুরে প্রত্যাগমনের ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে শোনা যায় ভিন্ন মত — আর এক কিংবদন্তী।

মৌনীবাবার অন্যতম শিষ্য এবং হরিতপোবন আশ্রমের প্রয়াত আচার্য সাগর স্বামী দাস উদাসীন তাঁর **'লীলাস্মৃতি'** পুস্তিকাতে মৌনীবাবার বিষ্ণুপুরে পদার্পণ প্রসঙ্গে যা লিখেছেন এবং তাঁর দিব্যজীবনের যে সব অলৌকিক ঘটনারাজির উল্লেখ করেছেন তাই শোনাই এক্ষণে।

তিনি লিখেছেন, "কোন এক সময়ে পাঁচজন সন্ত ভারতের উত্তরাঞ্চল হতে তীর্থ-পর্যটন-মানসে ঘুরতে ঘুরতে মল্লভূমে এসে উপস্থিত হন। তাঁদের অভিপ্রায় ছিল দক্ষিণ ভারত গমন, জগন্নাথধাম দর্শন বা দক্ষিণ ভারতের তীর্থস্থান ও মন্দিরাদি দর্শন করা। এই পাঁচজন সন্তের মধ্যে একজন হলেন আমাদের মৌনীবাবা। অপরাপর চারজন এখান হতে দক্ষিণ ভারত অভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন। কিন্তু মৌনীবাবা তাঁদের সঙ্গে আর গেলেন না। বিষ্ণুপুরের প্রান্তসমূহ তখন ছিল অরণ্যসঙ্কুল। ..... মৌনীবাবা তাঁর সঙ্গীদের ছেড়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করেন এবং তুড়কীর অরণ্যে সাধনায় নিবিষ্ট হ'ন। কত বৎসর তিনি এই অরণ্যে সাধনা-মগ্ন ছিলেন তাও আমরা স্থির করে কিছু বলতে পারি না। আজ থেকে প্রায় ১১০/১১৫ বৎসর আগে এই অরণ্যের এক বটবৃক্ষের নীচে তাঁর সাধনাবস্থায় **পীতাম** নামে এক সাঁওতাল তাঁকে প্রথম লক্ষ্য করে। সে এক আশ্চর্য ঘটনা।

তুড়কীর আশে-পাশে তখন ছিল সাঁওতালদের বাড়ি। একদিন কোন এক কাজে জঙ্গলের ভিতরে এসে অত্যন্ত বৃষ্টির জন্য পীতাম ঐ বটবৃক্ষের তলায় আশ্রয় নিতে যায়। সেখানে পীতামের চোখে পড়ে একটা উইঢিবির মধ্যে একটা লোক রয়েছে। ইনি যে কোন সাধু-সন্ত পীতাম তা বুঝতে পারে না। সে মনে করে কোন ভূত-প্রেত বা অপদেবতা হবে। সঙ্গে সঙ্গে সে গ্রামাঞ্চলে খবরটা জানায়। গ্রামের লোক এসে দেখে উইঢিবির মধ্যে এক তপস্বী। সমস্ত দেহ উইঢিবিতে আবৃত। অত্যধিক বৃষ্টিপাতে উইঢিবির উপরিভাগ গলে গলে ছেড়ে পড়ায় তাঁর জটাজুট মস্তক ও মুখমণ্ডল দেখা যাচ্ছে। গ্রামস্থ প্রবীণ ব্যক্তিরা সেই দৃশ্য দেখে বুঝতে পারে ইনি একজন মহাতপস্বী। বাস্তবিক তাই। কেন না, তিনি একেবারে সমাধিস্থ। দীর্ঘদিন একাসনে সাধনায় মগ্ন হওয়ার ফলে তাঁর সর্বাঙ্গ ঘিরে বিরাট উইঢিবির উদ্ভব হয়েছে। প্রবীণেরা তাঁর সমাধি ভাঙ্গাবার জন্য তাঁকে ঘিরে নাম-সংকীর্তনের অয়োজন করে। কয়েকদিন ধরে অবিরত নাম-সংকীর্তনের ফলে তাঁর চৈতন্য ফিরে আসে এবং সমাধি অবস্থা থেকে চোখ মেলে তাকান। কিন্তু কোন কথা বলেন না। গ্রামের লোকেরা তাঁর সেবার জন্য দুধ, ফল ইত্যাদি নিয়ে আসে। অতি দ্রুতভাবে এই ঘটনার কথা বহু দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ে। দিনের পর দিন বেড়ে ওঠে অগণিত দর্শকের ভীড়। বেড়ে ওঠে ভক্তের সমাগম। প্রচারিত হয়

মৌনীবাবার মহিমা। তিনি কখনও কথা বলতেন না বলে তাঁর নাম হয়েছিল মৌনীবাবা।

ক্রমান্বয়ে সে অরণ্য আর অরণ্য রইলো না। সেই বটবৃক্ষকে ঘিরে পরিণত হল সুরম্য আশ্রম। এই হ'ল আমাদের মৌনীবাবা এবং হরিতপোবন আশ্রমের ইতিবৃত্ত। যে তারিখে তাঁর প্রথম সমাধি ভঙ্গ হয় সেদিন ছিল শ্রীরাম নবমী। তাঁর সেই পুণ্য-স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই তিথিকে কেন্দ্র করে আজও এখানে উদযাপিত হয় মেলা ও মহোৎসব।"

সর্বপ্রথম বাংলা ১৩২১ সালের শ্রীরাম নবমীর পুণ্য লগ্নে কোন এক অধ্যাত্ম আবেশে মৌনীবাবার উৎসাহ উদ্দীপনায় **'ওঁ শ্রী বাহে গুরু বোল, ওঁ শ্রী হরি হরি বোল'**, — এই যুগ্ম নামে অনুষ্ঠিত হয় ভগবৎ সংকীর্তন মেলা। সেই থেকে এই মেলা বছরে বছরে অদ্যাবধি অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে যথানিয়মে। তৎকালে এই মেলার বহর ছিল বিশাল। মেলাটি হয়ে উঠেছিল সার্বজনীন, চিত্তাকর্ষক এবং জনপ্রিয়। শুনেছি 'ডিস্ট্রিক্ট সেন্সাস্ হ্যাণ্ডবুক' (বাঁকুড়া-১৯৫১)-এর 'ফেয়ারস্ অ্যাণ্ড ফেস্টিভ্যাল্স' অধ্যায়ে বাঁকুড়া জেলার সর্বাধিক লোক আকর্ষক মেলা হিসেবে যে দুটি মেলার কথা উল্লেখ আছে তার মধ্যে একটি হল বারুণী তিথিযোগে শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে পূত-পবিত্র ধারা-স্নানের মেলা এবং অন্যটি হ'ল তুড়কীর অরণ্যাঙ্গনে শ্রীরাম নবমী তিথিযোগে হরিনাম সংকীর্তন মেলা। কিন্তু দুঃখের কথা এই মেলার সেই অতীত ঐতিহ্য আজ আর নেই। নেই সেই জৌলুস, জাঁক-জমকত্ব কিংবা প্রাণবন্তরূপ। মেলার সেই প্রাণস্পন্দন এবং হার্দ্যিক মেল-বন্ধন আজ বুঝি লুপ্ত হয়েছে হৃদয়বৃত্তি এবং ভক্তি-ভাবালুতার দীনতার দরুন। তাই বেদনাতুর হৃদয়ে অতীত গৌরবের স্মৃতি-রোমন্থন করে যেটুকু আনন্দ পাওয়া যায় সেটুকুই বোধ করি বাড়তি লাভ, উপরি পাওনা।

আজ আর মৌনীবাবা নেই। নেই সেই ঈশ্বর-উন্মাদনা, কিন্তু আছে তাঁর অক্ষয় স্মৃতি। আছে তাঁর স্মৃতি-সুখকর সিদ্ধাই-এর ঘটনাগুলি অমর হয়ে। তাঁর সিদ্ধাই-এর অত্যাশ্চর্য অলৌকিক ঘটনাগুলি লোক-মুখে প্রচারিত হতে হতে আজও বহন করে চলেছে তাঁরই মহিমা-কথা, তাঁরই পুণ্যগাথা। মৌনীবাবার শিষ্য পূর্বোল্লিখিত আচার্য সাগর স্বামী দাস উদাসীন তাঁর **'লীলাস্মৃতি'** গ্রন্থে অবিশ্বাস্য কিন্তু সত্য সেই সব রোমাঞ্চকর অলৌকিক ঘটনাবলীর বাহারি উপাদানে ছোট্ট একটি মালা গেঁথেছেন।

আসুন তুড়কী আশ্রমের সুন্সান্ ছায়াশীতল পরিবেশে বসে পড়ে শোনাই 'লীলাস্মৃতি' গ্রন্থের বিশেষ বিশেষ অংশ।

তিনি লিখেছেন, "অধুনা যে সাধনা মন্দির রয়েছে তার সম্মুখ প্রান্তরে মৌনীবাবা তপস্যা করতেন। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে উত্তপ্ত হয়ে যেত মাটি। চারদিকে ছুটতো আগুনের মত হলকা। অথচ এই অবস্থায় তিনি আগুনের মত সূর্যের তাপ অগ্রাহ্য করে সাধনায় অবিচল থাকতেন।

যারা তাঁর ভক্ত তারা ছাড়াও নানা লোক নানা সময়ে এসে তাই দেখে আশ্চর্য হয়ে যেত। একদিন সমাগত বহু লোক দেখলো এক অলৌকিক ঘটনা। বাবা সমাধিস্থ হয়ে আছেন এবং একটি পঞ্চমুখী শ্বেতসর্প তাঁর মাথার উপর ফণা বিস্তার করে ছায়া দান করছে। তখন সকলেই উপলব্ধি করে মৌনীবাবা অবশ্যই কোন দৈবীপুরুষ।

এই অপূর্ব দৃশ্যাবলী দেখার পর ভক্তদের মনে তাঁর ঐ সাধনাস্থানে একটি মন্দির নির্মাণের বাসনা জাগে। ভক্তদের আগ্রহে মন্দির নির্মাণের কাজ চলতে লাগলো।

ইত্যবসরে সকলেই বাবাকে সময়ে সময়ে নানারূপে দর্শন করতো। কখনো তিনি

ত্রিশূলধারী ধ্যানরত শিবরূপে, কখনো বা তিনি মদনমোহনরূপে দর্শন দিতেন। এইসব অলৌকিক ঘটনায় মুগ্ধ হয়ে ভক্তদের মনে তাঁর প্রতি এই ধারণা জন্মাতে লাগলো যে, মৌনীবাবা সামান্য পুরুষ নন। তিনি অবশ্যই কোন মহান সাধক বা ভগবৎকৃপা প্রাপ্ত কোন সিদ্ধ মহাপুরুষ বা দৈবীপুরুষ। মন্দির নির্মাণও সমাধা হ'ল। এই মন্দিরের পশ্চাতে একটি গুহার দ্বার আছে। এই দ্বার দিয়ে তিনি গুহায় যেতেন ও একটানা দীর্ঘদিন সমাধিস্থ হয়ে থাকতেন।" (পৃঃ- ৯-১০)

এই পুস্তিকার অন্যত্র তিনি লিখেছেন, আশ্রমের "মহুয়াতল। এখানে থাকতো অখণ্ডধুনি। অর্থাৎ ধুনি কখনও নির্বাপিত হত না। এখানে ভস্মের উপর বসে থাকতেন মৌনীবাবা। সমাধি অবস্থায় কখনো বা ছয়-সাত দিন, কখনো বা আট-দশ দিন এক নাগাড়ে কেটে যেত। কাঙাল নামে একটি যুবক একদিন এলো এই মহুয়াতলে। বাড়ি তার বিষ্ণুপুর। সে দেখলো সাধুবাবা নিশ্চল হয়ে বসে আছেন। সে ভাবলো একটা মজা করা যাক। বদ্‌খেয়ালের কৌতুকে ধুনির জ্বলন্ত কাঠ তুলে নিয়ে সাধুজীর উরুদেশে ফেলে দিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। কয়েক পা আসতে না আসতেই তার মনে হতে লাগলো কে যেন তার সারা গায়ে আগুন ঢেলে দিচ্ছে। আগুনে যেন পুড়ে যাচ্ছে তার সর্বাঙ্গ। দুর্বিষহ জ্বালায় আর্তনাদ করতে করতে বাড়ীতে এসেই বিছানায় শুয়ে পড়লো। হঠাৎ এই অবস্থা দেখে বাড়ীর লোক তো ভেবে অস্থির! কাঙালের কথামত তার গা, হাত, পা ঠাণ্ডা জলে মুছে দিল। সারাক্ষণ মাথায় জল ঢালতে লাগলো, পাখার বাতাস দিতে লাগলো, তবু তার সারা দেহের অগ্নিবৎ দাহ কোন প্রকারে উপশম হল না। বরং বাড়তে লাগলো। পাড়া-পড়শী সবাই এসে জুটলো তাদের বাড়ীতে এবং জিজ্ঞেস করতে লাগলো হঠাৎ এমন হওয়ার কারণ কি? কাঙাল তখন সেই কৌতুক করতে যাওয়ার ঘটনা প্রকাশ করলো। তাই শুনে বাড়ীর লোক ছুটে এল সেই মহুয়াতলে। অধম কাঙালকে সুস্থ করে দেওয়ার জন্যে মহারাজজীর চরণে পড়ে কাঁদতে লাগলো। কাঙালের তো কথাই নেই! দয়াপরবশ প্রভু একটু ভস্ম তুলে নিয়ে কাঙালের গায়ে তা মাখিয়ে দিতে আদেশ করলেন। অমনি কাঙাল সুস্থ হয়ে উঠলো। তার অগ্নিবৎ দাহ তৎক্ষণাৎ নিরসিত হল।

মৌনীবাবার কি অপূর্ব ক্ষমা!" (পৃঃ-১৭)

আর একদিনের কথা "পরিভ্রমণরত পাঁচজন উদাসীন (সাধু) একেবারে অসময়ে, উত্তীর্ণ সন্ধ্যায় আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদের অভিপ্রায় সেদিনের মত এখানেই রাত্রি যাপন করে পরদিন আবার রওনা দেওয়া। আশ্রমের নিয়ম অনুযায়ী মৌনীবাবা আমাদেরকে তাঁদের যথাযথ আপ্যায়নের বন্দোবস্ত করতে নির্দেশ করলেন। তিনি জানালেন এঁরা যা সেবা করবেন তার মত যোগাড় করো। উদাসীন পাঁচ জন জানালেন 'দুগ্ধপায়ী'। অর্থাৎ তাঁরা দুগ্ধ পানে ইচ্ছুক।

মৌনীবাবা তাম্র-কলস হস্তে মৃত্তিকা-কূপ সমীপে উপনীত হলেন। কূপ মধ্যে সেই কলস নিমজ্জনান্তে কলস ভর্তি দুগ্ধসহ উদাসীনদের সম্মুখীন হলেন। উদাসীন পাঁচজন পরমানন্দে সেই দুগ্ধ পান করলেন। কিন্তু তাঁদের বিস্ময়ের অবধি রইলো না।" (পৃঃ-১৫)

আশ্রমের প্রবেশদ্বারের সন্নিকটে উক্ত কুয়াটি আজও বিদ্যমান। কথিত আছে উক্ত কুয়ার জল পান করে অনেকের দুরারোগ্য রোগও হয়েছে নিরাময়। কুষ্ঠব্যাধির মতো

মারাত্মক রোগ-নিরাময় হয়েছে কৃপাবৎসল মৌনীবাবার করুণাধারায়। "একদিন এক কুষ্ঠরোগী এসে মৌনীবাবার শরণাপন্ন হয়। অগতির গতি তিনি। নিঃসম্বলের অবলম্বন। আর্তের সহায়। তাই রোগাক্রান্ত, শোকগ্রস্ত, শান্তিহীন, উদ্‌ভ্রান্ত, মানুষ তাঁর চরণে এসে আশ্রয় করে।

যার কথা বলছিলাম এখন তার কথাই বলি। সে এসেছিল আমলাগোড়া (গড়বেতা) থেকে। নাম তার লক্ষ্মীকান্ত। সে বলে—'প্রভু আমাকে কৃপা করে রোগমুক্ত করে দেন। জীবনের এমন যন্ত্রণা ও বিড়ম্বনায় আমার বাঁচামরা দুই-ই সমান। আপনার কৃপা ভিন্ন আমার আর কোনও উপায় নেই।'

তার সকরুণ প্রার্থনা ও নিদারুণ আর্তনাদে মহারাজজীর অন্তরে দয়ার উদ্রেক হয়। তিনি তার দেহ স্পর্শ করে তাকে তুড়কী-পুকুরে স্নান করতে আজ্ঞা করেন। স্নানান্তে তার দেহে রোগ-মুক্তির লক্ষণ দেখা দেয় এবং অচিরেই সে পূর্ণ সুস্থতা লাভ করে। এরপর সে আশ্রমের সেবাব্রতী হয়ে আশ্রমেই থেকে পড়ে। এমনি বহু অনাহূত, রবাহূত মানুষ আপন আপন সঙ্কট হতে মুক্তি পেয়েছে তাঁর চরণ-প্রান্তে।" (পৃঃ-২৩)

মৌনীবাবা আবির্ভূত হওয়ার অল্প কিছুদিন পরের ঘটনা। চৌকান গ্রামের "লোকেরা বাবাকে ঘিরে নাম-সংকীর্তন করছে। এমতাবস্থায় বাবা সকলকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে একটি বিশেষ দৃশ্য দর্শন করান। সামান্য দূরেই যেন একটি প্রদীপ্ত অগ্নিকুণ্ড! হোম-শিখার মত হিরণ্যবর্ণ সেই জ্বলন্ত অগ্নি কি? তা তাদেরকে দেখার জন্য ইঙ্গিত করেন। তারা নিকটস্থ হয়ে দেখে সেখানে নাম মাত্র অগ্নি নেই। পরিবর্তে রয়েছে একটি মহাবীরের মূর্তি। তিনি পুনরায় নির্দেশ করেন এই মূর্তি আশ্রমে স্থাপন করো। কিন্তু একযোগে সকলে মিলেও সে মূর্তি কেউ তুলতে পারে না। তখন মৌনীবাবা সেই মূর্তি হাতের তালুতে ধারণ করে বটতলার বেদীতে এনে স্থাপন করেন।" (পৃঃ-১২)

পরবর্তীকালে মৌনীবাবার স্বপ্নাদেশে বিষ্ণুপর স্টেশন সন্নিকটস্থ তেলকলের মালিক জনৈক হরিবকস্ মাড়োয়ারী ছোট্ট একটি মহাবীর-মন্দির নির্মাণ করিয়ে দেন। উক্ত মন্দিরেই শ্রীশ্রীমহাবীরজীউ-এর শ্রীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে আজও।

* * *

গুহার মধ্যে অবস্থান করতে ভালোবাসতেন মৌনীবাবা। তাঁরই ইচ্ছায় মাটি খুঁড়ে আশ্রমের ভিতরে বাইরে নির্মিত হয় গুহা এবং গুহাপথ। গুহার মধ্যে একাদিক্রমে দিনের পর দিন ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন মৌনীবাবা। গুহার গহীন অন্ধকারেই শাশ্বত আলোর সন্ধান পেতেন তিনি। মনের অনুরাগ আর প্রাণের আকুতি যখন মিলেমিশে হয়ে যায় একাকার তখনই হয় সেই জ্যোতিঃ দর্শন। হয় সত্য-উপলব্ধি, এসে যায় দিব্যদৃষ্টি এবং দৈবশক্তি। এসব ছিল মৌনীবাবার।

একদিনের কথা। মহুয়াতলার গুহার মধ্যে অবস্থান করছেন মৌনীবাবা। হঠাৎ তিনি তদীয় শিষ্য পূর্বোক্ত সাগর দাসকে নির্দেশ দেন— 'মহুয়া তলায় কি রয়েছে দেখ?' পরে যা ঘটেছিল তাই শোনাই সাগর দাস মহারাজের জবানীতে।

"আমি তাঁর নির্দেশে মহুয়াতলায় এসে দেখি সেখানে একটি শবশিশু। প্রভুকে জানালাম সে কথা। তখন গুরুদেব স্বয়ং গুহার ভিতর থেকে বাইরে এলেন। শবশিশুর অঙ্গে ধুনির ভস্ম মাখিয়ে দিতে আমাকেই পুনরাদেশ করলেন। কথা মাত্র কাজ। ভস্মের স্পর্শ মাত্র মৃতশিশুর ওষ্ঠ দুটি স্পন্দিত হয়ে উঠলো। পর মুহূর্তেই সে আবার জীবন্ত শিশুর মত জেগে উঠলো।

প্রভুর কৃপায় মৃতশিশু পেল পুনর্জীবন।" (পৃঃ-১৯)

শিশুটির নাম রাখা হয়েছিল নারায়ণ। আশ্রমেই থাকত সে। কিন্তু ছেলেটির মা তাকে নিয়ে চলে যায় আশ্রম থেকে। বাড়ি গিয়ে দু-এক মাসের মধ্যে মৃত্যু হয় নারায়ণের।

মৌনীবাবার নাম ছড়িয়ে পড়েছে চতুর্দিকে। শিষ্য-ভক্তে ভরে থাকে আশ্রম। তৎকালে বিষ্ণুপুরের উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদীর কিনারে ফাল্গুন চৈত্র মাসে বারুণী তিথিযোগে অনুষ্ঠিত হত বারুণীমেলা। মেলার সমারোহ এবং আকর্ষণ ছিল দুর্বার। সেবার সমবেত ভক্ত-শিষ্যগণ বাবার নিকট এসে বারুণীমেলা দেখতে যাওয়ার জন্য অনুমতি চেয়ে পীড়াপীড়ি করে বারংবার।

বাবা আকারে-ইঙ্গিতে বলেন—"আমি যদি এখানে তোমাদেরকে সেই মেলা দেখাতে পারি তাহলে তোমরা আর সেখানে যাবে না তো? ভক্ত ও শিষ্য-শিষ্যাগণ সকলেই একটা আশ্চর্যজনক কিছু দেখার জন্য উৎসুক হয়ে রইলো।

বাবা তাদের নিকট থেকে উঠে গিয়ে তুড়কীর পুকুরে নামলেন। খানিকক্ষণ জলক্রীড়া করার পর পুকুরে এমন ডুব দিলেন যে আর উঠলেন না। সমূহ বিপদ মনে করে পুকুরের জল তোলপাড় করে বাবাকে খোঁজা হল, কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর কোন হদিস পাওয়া গেল না। আশ্রমে আগত সকলেই দুঃখে ও শোকে ভেঙে পড়লো। এর ঠিক তিন দিন পর বাবা আবার ঐ পুকুরের জল হতে একটি শিবলিঙ্গ হাতে করে সকলের সমক্ষে উপস্থিত হলেন এবং মহাসমারোহে পুকুরের প্রান্তে শিবস্থাপন করলেন। এমন আশ্চর্য-ব্যাপার কেউ কখনো দেখেনি। সেই পুকুরের পাড়েই জমে গেল অগণিত লোকের ভীড়। বাস্তবিক বারুণীর মেলার চেয়েও আকর্ষণীয় মেলা জমে গেল সেদিন।" (পৃঃ-২১)

কূপের জলকে উপাদেয় দুগ্ধে রূপান্তরিত করা, অসাধ্য-দুঃসাধ্য রোগ নিরাময় করা, সূক্ষ্ম শরীরে স্থান থেকে স্থানান্তরে গমন করা; মৃতের প্রাণদান, দিব্যরূপে ভক্তদের দর্শন দান, অথবা একটি ময়াল সাপের ডিম ভেঙে সমবেত ভক্তদের ইচ্ছানুসারে তাদের কাঙ্ক্ষিত পৃথক পৃথক ফল-মূল-মিষ্টান্ন প্রদান ইত্যাদি ঘটনাগুলি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতে অযৌক্তিক এবং অবিশ্বাস্য মনে হলেও প্রত্যক্ষদর্শীদের কাছে তা ছিল নির্ভেজাল সত্য। আপাতদৃষ্টিতে এসব ঘটনাগুলিকে ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজাল মনে হলেও তা ছিল অলৌকিকতার আলোকে উদ্ভাসিত।

মৌনীবাবার প্রভাব এবং প্রতিপত্তি ছিল সুদূরপ্রসারী। কুম্ভমেলাতে মহা-মণ্ডলেশ্বরের আসনও অলংকৃত করেছিলেন তিনি। উদাসীন সম্প্রদায়ের সাধুগণ মূলতঃ বিষ্ণুর-উপাসক। অবশ্য এঁরা দেবাদিদেব শঙ্কর, পূর্ণব্রহ্ম শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা, নামগান এবং সংকীর্তনও করে থাকেন একই সাথে। নিজেদের রাজার ছেলে বলে পরিচয় দিতেই সমধিক গর্ববোধ করেন এই সম্প্রদায়ের সাধু-মহাত্মাগণ। রাজার ছেলের সুবাদেই মাধুকরী বৃত্তিকে বিদায় জানিয়ে আকাশবৃত্তি বা অজগরবৃত্তি অবলম্বনে সাধন-জীবন উদযাপন করেন তাঁরা। অভাব হয় না কোন কিছুর। হরিতপোবন আশ্রমেরও অভাব ছিল না কোন কিছুর। প্রচুর জমি জায়গা ছিল, ছিল আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু-বাগান। ঘোড়ার গাড়ি, মোটর গাড়ি, স্বর্ণালঙ্কার, রাজসিক আড়ম্বর ও বেশবাস সবই ছিল মৌনীবাবার। সুসমৃদ্ধ ছিল হরিতপোবন আশ্রম। **এসব পার্থিব ঐশ্বর্যের পাশাপাশি**

মৌনীবাবার ছিল অসাধারণ সাধনৈশ্বর্য। যার ফলে পার্থিব ঐশ্বর্যের কালিমা সমদর্শী-মৌনীবাবার সাধন-জীবনকে কলুষিত করেনি কখনো। এহেন একজন সিদ্ধপুরুষকেও মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে বিচারাধীন আসামীর কাঠগোড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিল শেষ জীবনে। সুখ-দুখে, মানে-অপমানে, সুদিনে-দুর্দিনে, প্রাচুর্যে-বিপর্যয়ে সমাসীন এবং নির্বিকার এই মহাত্মা আপন ব্রতে, স্বীয় সাধনায় ছিলেন স্থির-সংকল্প। তাই দেখি আসামীর কাঠগোড়াতে দাঁড়িয়ে সেদিনও তিনি ছিলেন মৌন। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যও ব্রতভঙ্গ করে মুখের কপাট খুলে খরচ করেননি একটিও শব্দ। **মহাসাধকের এই মৌনতার দরুণই মৌনীবাবাকে দোষী সাব্যস্ত হ'তে হয়েছিল আইনের চোখে—আইনের বেড়াজালে। গুহার অন্ধকার থেকে কারাগারের অন্ধকারে নির্বাসিত হয়েছিলেন তিনি।** জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার অব্যবহিত পরেই বাংলা ১৩৪৯ সালের আষাঢ় মাসের শুক্লা সপ্তমীর পুণ্যতিথিতে লোকান্তর প্রাপ্তি হয় মৌনীবাবার।

মৌনীবাবা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। কিন্তু আছে তাঁর স্বহস্তে স্থাপিত শ্বেত পাথরের স্বীয় প্রতিমূর্তি। উক্ত স্মারক মূর্তির মধ্যে সূক্ষ্ম শরীরে আজও তিনি সদা বিরাজমান।

স্থূল শরীরে মৌনীবাবা নেই ঠিকই। নেই আশ্রমের সেই জৌলুস কিংবা আভিজাত্য। কিন্তু আছে তাঁর পুণ্যস্মৃতি, আছে তাঁর অশরীরী উপস্থিতি, আছে তাঁর সুরভিত জীবনের সৌরভ। এই সৌরভটুকুই আমাদের গৌরব। আগামী দিনের পাথেয়।

মৌনীবাবা আজ আর আমাদের মধ্যে নেই স্থূল শরীরে একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য—দিব্য-প্রাণ অজর এবং অমর। মৃত্যুর শাসনে শাসিত নয় সে জীবন। শরৎচন্দ্রের প্রতি কবিগুরুর শ্রদ্ধাঞ্জলি এক্ষেত্রেও সমভাবে প্রযোজ্য।

" যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।"

হ্যাঁ, তুড়কী আশ্রমের ছায়া-শীতল শান্ত পরিবেশে, ঈশ্বর-উপাসনার পীঠস্থান বিষ্ণুপুরের আকাশে বাতাসে, মল্লভূমের মলয়-হিন্দোলে আজও যেন অনুরণিত হয়—

" নয়নসম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই," (বলাকা-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অথবা আরো গভীর অর্থে বলা যায়—

নয়ন-সম্মুখ থেকে নিয়েছ বিদায়,
হৃদয়ের মাঝখানে পেতেছ যে ঠাঁই।

দিব্যপুরুষ মৌনীবাবার মাহাত্ম্য-গাথার স্মৃতিরোমন্থন করার অবকাশে আমরা যেন বিচরণ করছিলাম মন-উদাস করা কোন এক দিব্যজগতে। দিব্যজগতের সেই দিব্য আবেশে অভিভূত হয়ে আমরা এখন শহরের সেনহাটি কলোনি অভিমুখে পা বাড়াব।

যাবার পথে শোনাব মল্লভূমের সেই সব দেবোপম মানুষজনের কথা যাঁরা ঈশ্বরের ঘর-সংসারের মহান সদস্য।

অধ্যায়-১২২

রত্নগর্ভা মল্লভূম

ঈশ্বরের ঘর-সংসার

গুপ্তবৃন্দাবন নামে কথিত বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ঈশ্বর। ঈশ্বরময় বিষ্ণুপুর। ঈশ্বরময় মল্লভূম। অধ্যাত্ম চেতনায় উর্বর রত্নগর্ভা মল্লরাজ্যের মাটিতে বিভিন্ন সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন ঈশ্বর-প্রেমিক কিছু দেব-মানব, ঈশ্বরকে নিয়ে করেছেন ঈশ্বরেরই ঘর-সংসার। তাঁদেরই কথা সংক্ষেপে শোনাব এখন।

বড়ু চণ্ডীদাস — বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের আদিকবিরূপে স্বীকৃত বড়ু চণ্ডীদাস ছিলেন বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ছাতনা গ্রামের বাশুলী দেবীর সেবক। তেরো খণ্ডে বিভক্ত 'শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভ' বা 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' গীতিনাট্য রচনা করে তিনি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। বাশুলী দেবীর সেবাইতের কাজ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচনার পাশাপাশি দিবারাত্র সাধন-ভজনে ব্যাপৃত থাকতেন তিনি। চণ্ডীদাস যৌবনে বাল-বিধবা রামী রজকিনীর অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হন। ভোগের পর আসে ত্যাগ। রামী রজকিনীর সাথে নিষিদ্ধ প্রেমের পথ ধরেই কলঙ্কিত নায়ক চণ্ডীদাসের পরিণত বয়সে এসেছিল অধ্যাত্মচেতনার নিকষিত হেম। ছাতনার বড়ু চণ্ডীদাস উত্তর জীবনে হয়েছেন একনিষ্ঠ ঈশ্বর-সাধক। একাধারে কবি ও সাধক হিসেবে তিনি বর্তমান বাঁকুড়ার সুমহান ব্যক্তিত্ব।

মহাসাধক মনোহর দাস — মল্লভূমের এই মহাসাধকের কথা ইতিপূর্বেই আপনাদের শুনিয়েছি। সুতরাং, পুনর্কথনে সময় নষ্ট করছি না।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ও সারদা মা — উনবিংশ শতাব্দীতে মল্লভূমের মাটি ভেদ করে যুগপৎভাবে বিকশিত হল একই বৃন্তে দুটি কুসুম। দিব্যসৌরভে সুরভিত এই দুটি কুসুমের মধ্যে একটি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ, অন্যটি মা সারদা। অশিক্ষিত কিন্তু সত্যনিষ্ঠ এবং ঈশ্বরনিষ্ঠ ঠাকুর **শ্রীরামকৃষ্ণ** মানুষকে শোনালেন অদ্ভুত অভিনব কথা। বললেন, "ঈশ্বরই বস্তু, আর সব অবস্তু; ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য।' সংসার প্রসঙ্গে বললেন, 'সংসার কেমন? যেমন আমড়া—শাঁসের সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল আঁটি আর চামড়া; খেলে হয় অম্লশূল।' সাধুর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বললেন, 'যাঁর মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে তিনিই সাধু। যিনি কামিনী-কাঞ্চনত্যাগী, তিনিই সাধু।' এরকম অজস্র উপদেশ শোনা যায় তাঁর কণ্ঠে। কামারপুকুরের গদাধর, একদা দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ির পূজারী ব্রাহ্মণ কঠোর সাধনায় সিদ্ধি লাভ করে উত্তর জীবনে হয়েছেন শ্রীরামকৃষ্ণ। **ত্রেতার রাম আর দ্বাপরের কৃষ্ণের সমন্বিত রূপই রামকৃষ্ণ।** রামের তীর ও তূণীর নেই তার হাতে। তথাপি তিনি রাম। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীও নেই তাঁর হাতে। তথাপি তিনি কৃষ্ণ। অশিক্ষিত ছিলেন তিনি। কিন্তু অজ্ঞানী ছিলেন না আদৌ। বেদ, বেদান্ত, গীতা, পুরাণ—এ সবের সার কথা নৃত্য করত তাঁর জিহ্বা এবং ওষ্ঠদ্বয়ে। তাঁর কণ্ঠ-নিঃসৃত ঈশ্বরীয় কথাবার্তা ছিল তীরের থেকেও মারাত্মক তথা মর্মভেদী। মানুষের মর্মমূলে প্রবেশ করে সে সব কথা মানুষের আসুরিক ভাবকে বিনাশ করে সুরলোকের সন্ধান দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুরে গোপনারীগণ ছুটে আসতেন গৃহকর্ম তুচ্ছ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত কথামৃতের আকর্ষণে কাতারে কাতারে ছুটে আসতেন ঈশ্বর-পিপাসু নরনারী। তাই দেখি শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে অদ্যাবধি পুস্তকটির উত্তরোত্তর চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে ও প্রভূত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। পৃথিবীতে অদ্যাবধি যেসব দিব্য-মানুষ জন্মগ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউই এত সহজ, সরল এবং মর্মস্পর্শী

ভাষায় ঈশ্বরীয় কথাবার্তা তথা উপদেশামৃত পরিবেশন করেছেন বলে আমার জানা নেই। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। এখানেই তাঁর দিব্যত্ব। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এসেছিলেন আর চলে গেলেন ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। মাত্র ৫০ বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে তিনি বিশ্ববাসীকে যা দিয়ে গেলেন তার যথাযথ মূল্যায়নের যেটুকু বাকী আছে তা যেদিন পূর্ণ হবে সেদিন মল্লভূমের স্থান-মাহাত্ম্যের বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে গবেষক সুলভ মন নিয়ে।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের লোকান্তরের পর বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠেন সংঘজননীরূপে প্রতিভাত **সারদা মা**। শ্রীশ্রীমায়ের যে দিকটি বিশেষভাবে আমার মনে রেখাপাত করেছে তা হল তাঁর বিশ্বমাতৃত্ব বোধ। মায়ের দু-চারটি বাণী নাড়া চাড়া করলে যে সৌরভ উদগত হয় তা থেকেই বোঝা যায় ঈশ্বর-সাধিকা তথা ঈশ্বর-স্বরূপিণী এই অশিক্ষিতা গ্রাম্য মহিলা কত অন্তরঙ্গ, আপনজন, বুদ্ধিমতী, অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্না এবং উদারচেতা ছিলেন। মা বলেছেন—'আমি সতেরও মা, অসতেরও মা, আমার ছেলে যদি ধুলোকাদা মাখে, আমাকেই তো তা ধুয়ে মুছে তাকে কোলে নিতে হবে।' 'যার উপর যেমন কর্তব্য ক'রে যাবে, কিন্তু এক ভগবান ছাড়া কাউকে ভালবাসো না।' 'দোষ তো মানুষ করবেই। ও দেখতে নেই। ওতে নিজেরই ক্ষতি হয়। দোষ দেখতে দেখতে শেষে দোষই দেখে।' 'যদি শান্তি চাও মা, কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখ, কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার' ইত্যাদি, ইত্যাদি।

শুধু কথার কথা নয়, উপদেশ দেওয়া নয়, মা হৃদয় উজাড় করা ভালবাসা দিয়ে জগৎকে আপন করে নিয়েছেন। তাইতো তিনি সংঘ-জননী, তাইতো তিনি বিশ্বজননী। বাঁকুড়া জেলার গৌরব। মল্লভূমের সৌরভ।

হরনাথ ও কুসুমকুমারী — মল্লভূমের যুগ্ম সম্পদ ঠাকুর হরনাথ ও কুসুমকুমারী। মানব-প্রেম ও ঈশ্বর-প্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত উৎসধারার প্রকৃষ্ট নিদর্শন **ঠাকুর হরনাথ**। বৈষ্ণব ও শাক্ত ভাবধারায় সমৃদ্ধ শহর সোনামুখীর পবিত্র মাটিতে জন্ম ঠাকুর হরনাথ ও কুসুমকুমারী দেবীর। শিবভক্ত পিতা জয়রাম বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাধক সন্তান হরনাথ ছিলেন শিবকল্প। কলকাতায় বি. এ. পাঠরত অবস্থায় তাঁর মধ্যে জেগে ওঠে বিস্ময়কর আধ্যাত্মিক চেতনা। পড়াশুনা অপেক্ষা হরিনাম সংকীর্তনেই হয়ে ওঠেন বিশেষ উৎসাহী। কর্মজীবনের প্রথমে বাঁকুড়া জেলার অযোধ্যা গ্রামের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন কিছুদিন। পরবর্তীকালে সুদূর কাশ্মীরে চাকুরীতে যোগ দেন। সেখানে আকস্মিকভাবে তাঁর মধ্যে দিব্যশক্তির স্ফূরণ ঘটে। দিব্যশক্তির মাধ্যমে অনেকের দুরোরোগ্য রোগ নিরাময় ও বহু মানুষকে সৎপথে আনয়ন করেন এবং করে তোলেন ঈশ্বরমুখী।

হরনাথ ছিলেন কৃষ্ণভক্ত। ভক্তদের তিনি অহরহ কৃষ্ণনাম করতে উপদেশ দিতেন। বলতেন, "কৃষ্ণ নাম কৃষ্ণ অপেক্ষাও মধুর, কৃষ্ণের মধ্যে শঠতা দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু নামে শুধু মধুরতা আছে।" মহিলা ভক্তদের বলতেন, "মা গো তোমরাই কৃষ্ণ বিকি কিনির হাটের মালিক, তোমাদের দয়া না হলে কৃষ্ণকে পাওয়া যায় না, দেখবে মা তোমাদের দয়া যেন কোনদিন না হারাই।" তিনি আরও বলেছেন, "প্রভুর রাজ্যে যেমন কংসেরও প্রয়োজন, আবার তেমনই মধুমঙ্গলেরও প্রয়োজন, না হলে খেলার পোস্টাই হয় না।"

জনৈক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, "বাবা আমার মতে কলিযুগ খারাপ নয়, যে যুগে যাগযজ্ঞ, তপস্যা পূজা-অর্চনা ছাড়াই শুধু নাম করেই শ্রীকৃষ্ণকে পাওয়া যায় বা ভগবান লাভ হয়, তাকে খারাপ বলি কি করে? তোমরা তোমাদের পাপের বোঝা আমার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে হরিনাম করতে করতে চলে যাও, আমি দেখে সুখী

হই। পাপ নিয়ে আমি নরক ভোগ করব—নরক আমার মতে ভাল জায়গা, স্বর্গে আনন্দ আছে, কিন্তু নরক ভোগ কালে আমাদের মন ঈশ্বরমুখী হয়। আমি পাপী, পাপী করে দুঃখ কোরো না। পাপীরা ভাল; তারা Practical Trainers whereas Saints are Theoretical Trainers."

তাঁর অন্তরঙ্গ ভক্তগণ মনে করেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সন্ন্যাস নিয়ে নারীমুখ দর্শন করতেন না। সেই অভাব পূরণের জন্যই গৃহী বেশে ঠাকুর হরনাথ অসংখ্য নারী-পুরুষ উদ্ধার করেন এবং এখনও তাঁর লীলা চলছে।"

অধ্যাত্মচেতনা সম্পন্ন **কুসুম কুমারী** দেবী ছিলেন হরনাথের সহধর্মিণী। এই সাধিকার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনার্থে হরনাথ তাঁর ভক্তদের বলতেন, 'তোমরা হরনাথ না বলে সর্বদা কুসুম-হরনাথ বলবে।' ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে হরনাথের লীলা সংবরণের পর কুসুমকুমারীর মধ্যেই তিনি লীলা করেন।

আজ আর স্থূলদেহে নেই হরনাথ কিংবা কুসুমকুমারী। আছে সোনামুখী শহরে কুসুম-হরনাথের শ্রীমন্দির। আছে শ্রীমন্দির সংলগ্ন একটি মনোরম আশ্রম। আর আছে কোলকাতা, মুম্বই, কাশ্মীর, মাদ্রাজ, গুজরাট, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি প্রদেশে বহু শিষ্যভক্ত। সম্প্রতি উত্তর আমেরিকাতে Haranath Society of North America, (Hara SONA) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কুসুম-হরনাথের জন্মদিনে এবং শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় উৎসব-মুখরিত সোনামুখী হয়ে ওঠে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধাম। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ভক্তগণ ঐ সময় সোনামুখীতে সমাগত হন। কুসুম-হরনাথের নামগানে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা শহর। চলতে থাকে শিবজ্ঞানে জীবসেবা।

স্বামী ভূতেশানন্দ—বাঁকুড়া জেলার সোমসাড়া গ্রামে ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন স্বামী ভূতেশানন্দ। ভূতেশানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল বিজয়কুমার রায়। কোলকাতার সংস্কৃত কলেজে পড়াশুনা করার সময় তিনি প্রায়ই যেতেন বেলুড় মঠে। সেখানে সন্ন্যাসীদের সংস্পর্শে এসে সন্ন্যাস জীবনের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সারদানন্দের কাছে বিজয়কুমারের মন্ত্রদীক্ষা হয়। ব্রহ্মচারী জীবনে তাঁর নাম হয় প্রিয়চৈতন্য। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় সংঘগুরু স্বামী শিবানন্দের কাছে তাঁর সন্ন্যাসদীক্ষা হয়। সন্ন্যাস জীবনে তাঁর নাম হয় স্বামী ভূতেশানন্দ। উত্তরকালে তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের উন্নয়নমূলক কাজে স্বদেশে ও বিদেশে ব্যাপৃত থাকেন জীবনভোর। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মঠ ও মিশন পরিচালন পর্ষদের সদস্য, ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সংঘের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ১৯৮৯ খ্রীষ্টাব্দে একাদশ সংঘগুরু স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজের মহাপ্রয়াণের পর তিনি দ্বাদশ সংঘগুরুর পদ অলংকৃত করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাদর্শ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত প্রসঙ্গ (৫ খণ্ড), কঠোপনিষদ্, মুণ্ডকোপনিষদ্, শরণাগতি, উপনিষদ্ ও আজকের মানুষ, Thoughts on Spiritual Life প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে মানুষের ধর্মীয় চেতনাকে তিনি গভীরভাবে নাড়া দেন। এক লক্ষ একুশ হাজার শিষ্যের দীক্ষাগুরু, অসীম স্নেহ ভালবাসার মূর্ত প্রতীক স্বামী ভূতেশানন্দ ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট দিবাভাগের ২টা ২৮ মিনিটে রামকৃষ্ণলোকে গমন করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করি টরেন্টো রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ তথা ঈশ্বর-সাধক শ্রীমৎ স্বামী প্রমথানন্দজী বাঁকুড়া জেলারই সুসন্তান।

ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়াবাবা (১৩০৮-১৩৯০ বঙ্গাব্দ) — বাংলা ১৩০৮ সালের ৩০শে কার্তিক শনিবার, কার্তিক সংক্রান্তির দিন বিষ্ণুপুরের উত্তরে অবস্থিত ভড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ

করেন মল্লমাটির সুসন্তান ধীরেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী। কৈশোরে পড়াশুনা, খেলাধুলা, দৈহিক শক্তি-সর্ব বিষয়েই তিনি ছিলেন অগ্রণী। বাল্যকাল থেকেই ধীরেন্দ্রমোহনের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার উন্মেষ হয়। পিতা পূর্ণচন্দ্র এবং মাতা ক্ষুদুমণি দেবী উভয়েই ছিলেন অত্যন্ত দানশীল এবং ধর্মপরায়ণ। গৃহদেবতা শ্রীশ্রীদধিবামন এবং জ্ঞাতিবর্গের কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধামাধবের পূজা অর্চনা নিয়েই পূর্ণচন্দ্র ও ক্ষুদুমণি দেবীর সময় কাটতো বেশীর ভাগ। কথিত আছে তাঁদের ইষ্টনিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়ে কুলদেবতা রাধামাধবজী তাঁদের সন্তান রূপে ধরা দেন।

গ্রামের বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনান্তে সংস্কৃত শিক্ষার উদ্দেশ্যে ধীরেন্দ্রমোহন নবদ্বীপে গিয়ে ত্রিপথনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-স্মৃতি-তীর্থ মহাশয়ের টোলে ভর্তি হন। এ সময় তাঁর মধ্যে তীব্র বৈরাগ্য এবং প্রবল ধর্মভাব পরিলক্ষিত হয়। সদ্‌গুরুর কৃপালাভের জন্য মন তাঁর উন্মনা হয়ে ওঠে। ঘটনাচক্রে তিনি চলে যান বৃন্দাবনে। সেখানে গিয়ে সন্তদাস কাঠিয়া বাবার সংস্পর্শে আসেন। অবশেষে ১৩২৯ সালের চৈত্র-পূর্ণিমাতে সন্তদাস তাঁকে সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষা দেন। সন্ন্যাস-জীবনে তাঁর নাম হয় ধনঞ্জয় দাস। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কঠোর সাধন-ভজনে অতিবাহিত হয় তাঁর জীবন, সিদ্ধি হয় করতলগত। পরবর্তীকালে তাঁর গুণমুগ্ধ গুরু সন্তদাসজী তাঁর জীবিতাবস্থাতেই ধনঞ্জয় দাসকে শ্রীবৃন্দাবন আশ্রমের তথা ভারতের নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের প্রধান মহান্তের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। উত্তরকালে তিনি 'শ্রীমহন্ত' উপাধিতে ভূষিত হন। সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ধনঞ্জয় দাস কাঠিয়া বাবার রচিত গ্রন্থাদি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক হিসাবে মনোনীত হয়েছে। অসাধারণ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এই দিব্যপুরুষ বহু মানুষকে ঈশ্বর সাধনার পথ-নির্দেশ দিয়ে ১৩৯০ সালের ২৭ শে বৈশাখ দিব্যধামে গমন করেন। বিষ্ণুপুর সন্নিকটস্থ ভড়া গ্রামের ধনঞ্জয়দাস কাঠিয়াবাবার শ্রীমন্দির আজও তাঁর পুণ্যস্মৃতির ধারক ও বাহক রূপে বিদ্যমান।

গৌরীকান্ত ভট্টাচার্য—রামকৃষ্ণদেবের সমসাময়িক কালের তন্ত্রসাধক গৌরীকান্ত ভট্টাচার্যের জন্মস্থান বিষ্ণুপুর মহকুমার ইন্দাস গ্রামে। উচ্চকোটির গৃহী সাধক গৌরীকান্ত ছিলেন জগন্মাতা অম্বিকা দেবীর উপাসক। তাঁর দুটি সিদ্ধাই ছিল। প্রথম সিদ্ধাই-এর নিদর্শন স্বরূপ প্রতিদিন নিত্যপূজার পর তিনি তাঁর বাম বাহু শূন্যে প্রসারিত করে তার ওপর এক মন কাঠ সাজিয়ে তাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করে যথাবিধি হোম করতেন এবং ডান হাতে আহুতি দিতেন। তাঁর দ্বিতীয় সিদ্ধাইটি ছিল তর্কযুদ্ধে অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। এই দুই সিদ্ধাই হস্তগত হওয়ার ফলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন অত্যন্ত অহঙ্কারী এবং দাম্ভিক। রাণী রাসমণির আমন্ত্রণে একবার তিনি দক্ষিণেশ্বরে যান। সেখানে রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে তর্ক-যুদ্ধে পরাজিত করতে গিয়ে নিজেই মর্মান্তিকভাবে পরাজিত হন। শ্রীরামকৃষ্ণ গৌরীকান্তের তর্কযুদ্ধ বিষয়ক সিদ্ধাইশক্তি হরণ করেন এবং তাঁকে বোঝান সিদ্ধাই ঈশ্বর লাভের পথে বাধা স্বরূপ।' পরমহংসের এ কথায় চৈতন্যোদয় হয় গৌরীকান্তের। তিনি অহঙ্কার ত্যাগ করে হয়ে ওঠেন নম্র এবং বিনয়ী। ঈশ্বর-দর্শনের তীব্র ব্যাকুলতায় তিনি ঘর-সংসার ছেড়ে চলে যান লোকচক্ষুর অন্তরালে।

স্বামী প্রভবানন্দ (১৮৭৩-১৯৭৬ খ্রীঃ) — বিষ্ণুপুরের কৃতী সন্তান স্বামী প্রভবানন্দের প্রভাব বিষ্ণুপুরে নেই বললেই চলে। বিষ্ণুপুর নিবাসী বর্তমান প্রজন্মের অধিকাংশ মানুষই তাঁর নামও জানেন না। প্রভবানন্দের পূর্বাশ্রমের নাম ছিল অবনীন্দ্রনাথ ঘোষ। জন্ম বিষ্ণুপুর সন্নিকটস্থ রামসাগর গ্রামের সুরমানগরে অপভ্রংশে সুরপানগরে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় ইনি একজন সক্রিয় বিপ্লবী ছিলেন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু তাঁর পরম

সুহৃদ ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি দিব্য প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে রামকৃষ্ণ মিশনের সংস্পর্শে আসেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাৎ শিষ্য স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে দীক্ষা নেন। সন্ন্যাস জীবনে তাঁর নাম হয় স্বামী প্রভবানন্দ। সংঘে যোগদানের পর শ্রীরামকৃষ্ণের বহু সন্ন্যাসী-সন্তানের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ-লাভের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। এই সৌভাগ্যই তাঁর অধ্যাত্ম-জীবনকে পুষ্ট করেছিল, দৃষ্টিকে করেছিল স্বচ্ছ। এ প্রসঙ্গে প্রভবানন্দ বলেছেন, "ঐ মহাপুরুষেরা ভগবদ্‌ভাবে বিভোর হয়ে থাকতেন এবং আমাদের শিক্ষা দিতেন কি করে দিব্যানুভূতি বা সমাধিলাভ করা যায়।" ঐ সব মহাপুরুষদের পদতলে বসে তিনি যে অধ্যাত্ম-সম্পদ আহরণ করেছিলেন, সেই পারমার্থিক সম্পদকে পাথেয় করে বেলুড় মঠের নির্দেশে আমেরিকায় রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা প্রচারের মহৎ উদ্দেশ্যে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে স্যানফ্রানসিসকো, পরে পোর্টল্যাণ্ডে পাড়ি দেন এবং রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের ভাবধারা প্রচারের কাজে সর্বান্তঃকরণে আত্মনিয়োগ করেন। পরবর্তীকালে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি হলিউডে 'বেদান্ত সোসাইটি অফ্ সাউথ ক্যালিফোর্ণিয়া' স্থাপন করে মিশনের কাজে জীবন উৎসর্গ করেন। প্রতিষ্ঠা করেন মেয়েদের জন্য আবাসকেন্দ্র তথা সারদা কনভেণ্ট। কোলকাতায় সারদা আশ্রম প্রতিষ্ঠাব মূলে তাঁর অবদান উল্লেখ্য। তাঁর লেখা দুটি বই 'নারদীয় ভক্তি সূত্র' এবং 'বেদান্তের আলোকে খ্রীষ্টের শৈলোপদেশ' দেশে বিদেশে খুবই সমাদর লাভ করে। এছাড়া তিনি গীতা, উপনিষদ, পতঞ্জলির যোগসূত্র এবং শঙ্করের বিবেক চূড়ামণি প্রভৃতি মূল্যবান সংস্কৃত গ্রন্থ সমূহের ইংরাজী অনুবাদ করেন।

আমেরিকাতে তাঁর গুণমুগ্ধ হাজার হাজার আমেরিকান শিষ্য-শিষ্যা আছেন। এঁদের মধ্যে অলডুক্স হাক্সলি, ঈশারউড, ডাঃ জন. এল. (স্বামী বিদ্যাত্মানন্দ), বরদাপ্রাণা, আনন্দপ্রাণা, ব্রজপ্রাণা প্রমুখ বিশেষ উল্লেখ্য। **বিদেশে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-ভাবধারা প্রচারে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন তাঁদের মধ্যে বিষ্ণুপুরের এই প্রাচীন সন্ন্যাসী অন্যতম।** প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তি এই সিদ্ধ মহাপুরুষের ওপরও নজরদারী করে।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মাদ্রাজ নগরে স্বামী বিবেকানন্দের বিশাল মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন। উক্ত খ্রীষ্টাব্দেই তিনি বিষ্ণুপুরে এসেছিলেন। বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের একটি ঘরোয়া সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। উক্ত বিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র হিসেবে মল্লভূমের এই দিব্যপুরুষকে দর্শন করার এবং তাঁর ভাষণ শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। একাদিক্রমে ছাপ্পান্ন বছর আমেরিকায় বেদান্ত ধর্ম প্রচার প্রসারের কাজে অবস্থান করে ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রামকৃষ্ণধামে গমন করেন।

মল্লভূমের স্থান-মাহাত্ম্যের গুণে এখানে বহু সিদ্ধ সাধক ও দিব্য পুরুষের শুভাগমন হয়েছে। এঁদের মধ্যে **কুরবান বাবা** এবং মহাসাধক **মৌনীবাবার** নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। মৌনীবাবার শুভাগমনের ফলে বিষ্ণুপুরের তুড়কী অঞ্চলে গড়ে ওঠে হরিতপোবন আশ্রম। মহাসাধক মৌনীবাবাকে কেন্দ্র করে মল্লভূমে গড়ে ওঠে একটি সাধুসমাজ। মৌনীবাবার কাছে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাসব্রত অবলম্বন করে ঈশ্বর-উপাসনাতে আত্মনিয়োগ করেন অনেকেই। এঁদের মধ্যে সন্ত **মোহন দাস, ব্রহ্ম দাস, সাগর দাস, শান্তি দাস, ভগবান দাস, জগদীশ দাস, মহাদেব দাস, জ্ঞান দাস, বুদ্ধম দাস, বৃহস্পতি দাস, শুক্র দাস, সন্তরণ দাস** ও **শিব দাস উদাসীন** প্রমুখের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। এঁরা মল্লরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আশ্রম নির্মাণ পূর্বক ঈশ্বরের ঘর সংসারের সদস্যরূপে প্রতিভাত হয়ে ঐশী মাধুর্যে শ্রীমণ্ডিত হয়েছেন। রত্নগর্ভা মল্লভূমকে করেছেন আরও আরও সমৃদ্ধ এবং শ্রীমণ্ডিত।

ঈশ্বরের ঘর-সংসারের আরও তিন সদস্যের নাম উল্লেখ না করলে আলোচনা পূর্ণতা লাভ করে না। এঁরা হলেন মল্লভূমের মল্লরাজা বীর হাম্বীর (১৫৬৫-১৬২০ খ্রীঃ), গোপাল সিংহ-১ম (১৭১২-১৭৪৮ খ্রীঃ) এবং চৈতন্য সিংহ (১৭৪৮-১৮০১ খ্রীঃ)। এঁরা শুধু রাজা ছিলেন না, ছিলেন রাজা ও ঋষি ; অর্থাৎ রাজর্ষি। মহারাজ বীর হাম্বীর শ্রীনিবাস আচার্যের দ্বারা এতো বেশী প্রভাবিত হন যে তিনি শেষ জীবনে রাজ্য ছেড়ে বৈরাগী হয়ে চলে যান বৃন্দাবনে এবং সেখানে চৈতন্য দাস আখ্যায় ভূষিত হয়ে সাধন-ভজনে জীবন উৎসর্গ করেন। মহারাজা গোপাল সিংহ ছিলেন আজীবন ঈশ্বরগত প্রাণ। আর চৈতন্য সিংহ তাঁর রাজত্বকালের চরম দুর্দিনেও মদনমোহন-অন্ত-প্রাণ হয়ে বেঁচে ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের ক্রীড়নক রূপে। তাঁদের ইষ্টনিষ্ঠা যে কোন মহাসাধকের সাধনার সঙ্গে তুলনীয়। এতদর্থে এঁরাও ছিলেন মহাসাধক। ঈশ্বরের ঘর সংসারের মহান সদস্য।

ঈশ্বরের ঘর-সংসারের মহান সদস্যদের অল্প একটু সঙ্গলাভে ধন্য হলাম আমরা। এদিকে সেনহাটি কলোনি অতিক্রম করে আমরা এসে গেছি শালবাগান পল্লীতে। ঐ দেখুন, মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে 'ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস'। অফিসের পাশ দিয়ে আমরা এখন এগিয়ে যাব প্রখ্যাত সুর-সাধক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে উৎসর্গীকৃত গোপেশ্বর পল্লী-অভিমুখে। এক্ষণে আমাদের সঙ্গী হবেন 'নানা গুণে গুণিজন'।

অধ্যায়-১২৩

রত্নগর্ভা মল্লভূম

নানা গুণে গুণিজন

দূর থেকে অসীম আকাশের নীলিমায় ভাসমান নক্ষত্রকেও বিন্দুবৎ প্রতিভাত হয়। কিন্তু কাছে যাওয়া সম্ভব হলে বিন্দুবৎ নক্ষত্রের বিশালত্বে আমরা মুগ্ধ হব। অনুরূপভাবে তাচ্ছিল্য এবং অবহেলার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমকে অবলোকন করলে তুচ্ছাতিতুচ্ছ মনে হবে নিশ্চয়। অথচ গবেষক মন নিয়ে, অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে মল্লরাজ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে এর সার্বিক বিশালত্বে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। তাহলে মনে প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, 'কি ছিল এখানে? কি আছে এখানে?' এ সব প্রশ্নের উত্তরে প্রতিপ্রশ্ন হবে, 'কি ছিল না এখানে? কি নেই এখানে?'

কি ছিল এখানে? কি আছে এখানে? এই দুটি প্রশ্নের উত্তরে অনেক কথা শুনিয়েছি আগেভাগে। আর এখন শোনাব নানা গুণে গুণিজনদের কথা।

শুভঙ্কর দাস—মল্লভূমের শুভঙ্কর দাস এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। বিষ্ণুপুর মহকুমার পাত্রসায়ের থানার হদলনারায়ণপুর গ্রামের পাশে রামপুর গ্রামে (মতান্তরে পখন্না গ্রামে) তাঁর জন্ম। মল্লরাজা গোপাল সিংহের অথবা চৈতন্য সিংহের সমসাময়িক কালের গণিতজ্ঞ শুভঙ্কর দাস বিষ্ণুপুরের রাজানুকূল্যেই গণিত-চর্চা করেন। শুভঙ্করের আসল নাম ভৃগুরাম দাস। গণিত সম্পর্কিত তাঁর সহজ সরল সূত্রগুলি শুভঙ্করের আর্যা নামে প্রসিদ্ধ। কাঠাকালি, বিঘাকালি, জমাবন্দী, দ্রব্যমূল্য প্রভৃতি বিষয়ক সূত্রগুলি এককালে এ অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয় ছিল। ছড়া-ছন্দে লেখা তাঁর আর্যাগুলি স্মৃতিতে গেঁথে যায় সহজেই। গাণিতিক সমস্যা-সমাধানের ক্ষেত্রে শুভঙ্করের আর্যাগুলির একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গ্রাম্য উচ্চারণ পদ্ধতির সাথে আরবি ফারসি শব্দ সংযোজনে রচিত এই ছড়াগুলি আনন্দের উৎসধারা রূপে পরিগণিত হত। আর্যাগুলির শেষের দিকে প্রায় ক্ষেত্রেই তাঁর

নাম উল্লিখিত থাকায় সেগুলি যে শুভঙ্করের আর্যা এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। যেমন—

(১) এক কড়ায় কিনলাম খাসি।
লোক জুটেছে বারোশ আশি।।
সবাই বলে খাবে খাবে—
কে কতটা ভাগ পাবে?
ভাগ করে দাও শিশু আনন্দিত মনে।
বুদ্ধির খেলা ভাই শুভঙ্কর ভনে।।

(২) জমি বিঘা যত তঙ্কা হইবেক দর।
তঙ্কা প্রতি ষোল গণ্ডা কাঠা প্রতি ধর।।
যত আনা তত গণ্ডা পাই প্রতি বট।
গণ্ডা প্রতি ষোল তিল ঘুচান্ত কপাট।।
কড়া প্রতি চারি তিল শুভঙ্কর ভনে।
ক্রমাবন্দী কর শিশু আনন্দিত মনে।।

গণিতের আর্যা রচনা ছাড়াও "তিনি জেলার বড়জোড়া, সোনামুখী ও পাত্রসায়ের এই তিন থানার কৃষকদের চাষের স্বার্থে একটি সেচ দাঁড়া খনন করিয়ে জনগণের প্রিয়ভাজন হন। ঐ শুভঙ্করের দাঁড়া আজও বিদ্যমান।.......... জেলার প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ হিসাবে যিনি একদিন সারা বাংলায় সুনাম অর্জন করেছিলেন তাঁর সম্পর্কে ইতিহাস এত নীরব যে জেলাবাসী হিসাবে আমরা তাঁর জন্যে বেদনা অনুভব করি।" শুভঙ্কর সম্পর্কে সহৃদয় মন্তব্য করেছেন **অধ্যাপক মিহিরকুমার রায়।**

গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ (১২৯৪-১৩৬১ বঙ্গাব্দ) — বাঁকুড়া জেলার কনেমারা গ্রামের গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ মল্লভূমের এক প্রবাদপুরুষ। একাধারে দেশপ্রেমিক ও মানব-প্রেমিক এই মানুষটি স্বাধীন ভারতের স্বপ্নে অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন এবং ১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকায় অংশ গ্রহণ করে ব্রিটিশ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়ে কারাবন্দী হন বারংবার। জেলার দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন সেবামূলক মনোভাব নিয়ে। সারদা মায়ের মন্ত্রশিষ্য গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ উত্তরকালে জেলার দরিদ্র গ্রামবাসীদের সার্বিক উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। বাঁকুড়া জেলার অমরকানন ছিল তাঁর কর্মকেন্দ্র। **গোবিন্দপ্রসাদের কর্মস্থল অমরকাননে এসেছেন গান্ধীজী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, কাজী নজরুল ইসলাম এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।** এঁদের সাথে তাঁর বিশেষ যোগসূত্র ছিল। ইনি একাধিকবার জেলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৩৬১ সালে পরলোকপ্রাপ্ত এই মানুষটির স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁর গ্রামের নাম হয়েছে গোবিন্দধাম। বাঁকুড়া শহরের একটি প্রধান রাস্তা এবং বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অঞ্চলটি আজ গোবিন্দনগর নাম ধারণ করে তাঁরই অক্ষয় স্মৃতি বহন করছে। অমরকাননে প্রতিষ্ঠিত 'গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ মহাবিদ্যালয়'টি যেন তাঁর অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ।

সত্যকিঙ্কর সাহানা—অগাধ পাণ্ডিত্য, সাহিত্যসাধনা, সৎকর্মে দান প্রভৃতি বহুবিধ কার্যকলাপের জন্য বাঁকুড়ার সত্যকিঙ্কর সাহানা একটি চিরস্মরণীয় নাম।

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৯০১-১৯৭৯ খ্রীঃ) — মল্লভূমের একটি ছোট্ট গ্রাম

আমরাল। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে আমরালের উর্বর মৃত্তিকা ভেদ করে বেরিয়ে এলেন যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিণত বয়সে ইনি এল. আর. সি. পি., এম. আর. সি. পি., এম. আর. সি. এস. এবং এফ. আর. সি. পি. ডিগ্রীধারী হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ হিসেবে এমনই একজন সুচিকিৎসকে উত্তীর্ণ হন যাঁর খ্যাতি স্বদেশের সীমা ছাড়িয়ে বিদেশ অবধি প্রসারিত হয়েছিল। যোগেশচন্দ্র কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজের মেডিসিনের অধ্যাপক ডিরেক্টর ছাড়াও কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলেজ অব মেডিসিনের প্রধান ছিলেন দীর্ঘদিন। ১৯৬২-তে ইনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মেডিক্যাল শাখার সভাপতি এবং ১৯৬৩-তে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার (W.H.O.) কারডিও-ভাসকুলার কনসালটেন্ট হন। ১৯৬৫-তে 'পদ্মভূষণ' সম্মানে সম্মানিত এই সুমহান চিকিৎসকের জীবনদীপ নিভে যায় ১৯৭৯তে।

ঋষিবর মুখোপাধ্যায় (১৮৫২-১৯৯৩ খ্রীঃ) —একদা জম্মু রাজ্যের শাসনকর্তা এবং কাশ্মীরের বিচারপতি তথা আইনজীবী ঋষিবর মুখোপাধ্যায় ছিলেন বাঁকুড়ার সুসন্তান। বাঁকুড়া মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য নিজ বাড়ি ও জমিদারী এবং কারমাইকেল মেডিকেল স্কুলের জন্য বিপুল অর্থ দান করেন। পরবর্তীকালে এক সুমহান উদ্দেশ্যে একটি ট্রাস্ট গঠন করে আজীবন উপার্জিত অর্থ ও সম্পত্তি দান করে নামমাত্র মাসোহারা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে এই ত্যাগীপুরুষ তাঁর নামের সত্যতা ও যথার্থতা প্রমাণ করেছেন অক্ষরে অক্ষরে।

গুরুসদয় হালদার—বাঁকুড়া জেলার খাতড়ার সুসন্তান গুরুসদয় হালদার একজন আদর্শ শিক্ষাব্রতী, দেশপ্রেমিক, সমাজসেবক, স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপ্লবী ছাড়াও কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারত রক্ষা আইনে' বিনা বিচারে ৬ মাস কারারুদ্ধ থাকেন। কংসাবতী জলাধার নির্মাণের সময় রাজ্য সরকার কর্তৃক অধিগৃহীত জমির ক্ষতিপূরণ আদায়ের আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব স্মরণীয়। এলাকার হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে এঁর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। একদা ভেদুয়াশোল স্কুলের প্রধান শিক্ষক গুরুসদয় হালদার মাত্র ৪৬ বছর বয়সে ইন্দপুরে একটি পথ-দুর্ঘটনায় নিহত হন। তাঁর স্মৃতি রক্ষার্থে খাতড়ার নব-নির্মিত কমিউনিটি হলটি গুরুসদয় মঞ্চ নামে অভিহিত হয়েছে।

দিগম্বর চট্টোপাধ্যায়—মালিয়াড়ার কৃতী সন্তান দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় বাংলা সংস্কৃত এবং ইংরাজী ভাষাতে ছিলেন বিশেষ পারদর্শী। আইনশাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য "কলকাতা হাইকোর্টের প্রথম ভারতীয় বিচারকদের মধ্যে দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম।" একাধারে আইনজ্ঞ, সমাজ-সেবক, অধ্যাত্ম-সাধক এই মানুষটি মল্লভূমের গৌরব স্বরূপ।

প্রমথনাথ ঘোষ (১৮৯৯-১৯৬৩ খ্রীঃ) — স্বাধীনতা সংগ্রামী, কমিউনিস্ট নেতা, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক, সমাজ-সেবক ও দেশপ্রেমিক প্রমথনাথ ঘোষ বিষ্ণুপুর মহকুমার সোনামুখী থানার নাড়ুয়ালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। ঝরিয়ায় কয়লা ব্যবসায় যুক্ত থাকাকালে রাজনৈতিক কার্য-কলাপের জন্য গ্রেপ্তার হন এবং ছাড়া পান। পরবর্তীকালে ঝরিয়ার বোমা মামলায় আবার তিনি গ্রেপ্তার হন এবং হাজারীবাগ জেলে কারাবাস করেন। বোমা মামলার বিচারে তাঁর চার বছর কারাদণ্ড হয়। আন্দামান সেলুলার জেলে বন্দী থাকাকালীন অবস্থায় তিনি মার্কসবাদে দীক্ষিত হন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জেল থেকে ফিরে ট্রেড ইউনিয়নের কাজে হাওড়া যান। শ্রমিক আন্দোলনের উপর একটি বই লেখার অপরাধে 'প্রেস অ্যাক্ট' আইনে তিন মাস জেল খাটেন। উত্তরকালে তিনি আজীবন কমিউনিস্ট পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন এবং কৃষকসভার কাজে যুক্ত থাকার পাশাপাশি

বাঁকুড়া জেলা কমিউনিস্ট পার্টির জেলা সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে বড়জোড়া কেন্দ্র থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদ্য নির্বাচিত সদস্য প্রমথনাথ ঘোষের মৃত্যু হয় তার পরের বছর ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে।

হরিহর মুখোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৯০২ খ্রীঃ) — বাঁকুড়া পুরসভার প্রথম নির্বাচিত সভাপতি হরিহর মুখোপাধ্যায় একাধারে শিক্ষাব্রতী, সমাজসেবী, বিশিষ্ট আইনজ্ঞ এবং সঙ্গীতানুরাগী হিসেবে একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব।

শিবদাস ভট্টাচার্য (১৮৪৫-১৯১৭ খ্রীঃ)—বিষ্ণুপুর মল্লেশ্বর ভট্টাচার্যপাড়া নিবাসী এই মানুষটি শ্রীরামপুর মিশনারী কলেজ থেকে স্নাতক পরীক্ষাতে সসম্মানে উত্তীর্ণ হওয়ার পর বৃটিশ সরকারের অধীনে মোটা মাইনের সওদাগরী চাকুরির সুযোগ গ্রহণ না করে মাতুলালয় শ্রীরামপুর থেকে ফিরে আসেন স্বীয় জন্মভূমি বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুরে এসেই তিনি শিক্ষাবিস্তারের মহৎ উদ্দেশ্যে স্বীয় উদ্যোগে এবং ব্যবস্থাপনাতে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বগৃহে 'Middle English School' প্রতিষ্ঠা করেন। উত্তরণের পথে এই বিদ্যালয়টিই 'বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়'-এ রূপান্তরিত হয়। স্ত্রী-শিক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠা করেন একটি বালিকা বিদ্যালয়। উক্ত বালিকা বিদ্যালয়টিই আজকের সুপরিচিত 'শিবদাস বালিকা বিদ্যালয়'। বিষ্ণুপুরের 'কে. জি. ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউট'-টি যা প্রথমাবস্থায় 'ইণ্ডাস্ট্রিয়েল স্কুল' রূপে আত্মপ্রকাশ করে তা এবং 'বিষ্ণুপুর পাবলিক লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগ স্মরণীয়। বিষ্ণুপুর পৌরসভার ভাইস-চেয়ারম্যান তথা সমাজসেবী তথা শিক্ষানুরাগী এই মানুষটির জীবনদীপ নিভে যায় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে। মৃত্যুর ঠিক আগের বছর অর্থাৎ ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রকাশ করেন স্বরচিত **'মল্লভূম বিষ্ণুপুর'** পুস্তিকা। পয়ার ছন্দে লেখা ৩১২ পঙ্ক্তির এই পুস্তিকাটি তাঁর বিষ্ণুপুর-প্রীতির পরিচয় দেয়।

বাবু রামদীন ভট্টাচার্য—বিষ্ণুপুরের মল্লেশ্বর পরিবারের উদারচেতা তথা শিক্ষানুরাগী রামদীনবাবু বিষ্ণুপুর উচ্চ বিদ্যালয়টির নিজস্ব ভবনসহ ছাত্রাবাস এবং খেলাধূলার মাঠ নির্মাণের জন্য ৯০ বিঘা জমি দান করে দানবীর রূপে প্রতিভাত হয়েছেন। পরবর্তীকালে এই জমির কিয়দংশ তদানীন্তন 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্কুল' (বর্তমানে যা কে. জি. ই. আই. নামে পরিচিত) এবং 'বিবেকানন্দ শিশুনিকেতন ও পাঠভবন' নামক প্রতিষ্ঠান দুটিকে হস্তান্তরিত করা হয়। এরকম এক বিশাল দানকার্যের জন্য রামদীনবাবু অতি অবশ্যই এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব।

হরিপদ দাঁ (১২৮৩-১৩৩৪ খ্রীঃ) — একাধারে শিক্ষানুরাগী, সমাজসেবী, দেশপ্রেমিক হরিপদ দাঁ-এর জন্মস্থান বিষ্ণুপুর মহকুমার সোনামুখী শহর। কিন্তু তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল পুরুলিয়া। ব্যবসার সূত্রে পুরুলিয়াতে থাকাকালে তিনি শিক্ষায় অনগ্রসর পুরুলিয়া জেলাতে শিক্ষা বিস্তারে বিশেষতঃ নারীশিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। শিক্ষা ছাড়াও শারীর শিক্ষা, সঙ্গীত ও শিল্পচর্চার ক্ষেত্র রচনায় তাঁর ভূমিকা ও নিষ্ঠা স্মরণীয়। দুঃস্থ এবং সর্বস্বান্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য নিজ ব্যয়ে 'শিল্পাশ্রম ভবন' নির্মাণ করে তাঁদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিতে উত্তীর্ণ হন।

স্বদেশবান্ধব চট্টোপাধ্যায় — ১৯৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মে পোখরানে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের পর ভারতের সাথে আমেরিকার সম্পর্কে গভীর চিড় ধরে। আমেরিকা ভারতের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে এবং পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা ও উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারতকে নিষ্ক্রিয় করতে প্রয়াসী হয়। ভারতের ক্ষেত্রে এরকম এক জটিল পরিস্থিতিতে আমেরিকায় বসবাসকারী ভারতীয়গণ ইন্দো-আমেরিকা সুসম্পর্ক স্থাপনে সক্রিয় হয়ে ওঠেন।

এক্ষেত্রে "যে-ক'জন ভারতীয়ের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ইন্দো-মার্কিন সম্পর্ক নতুন মাত্রা পেয়েছে, ব্রাগুট ইনস্ট্রুমেন্টস সংস্থার প্রেসিডেন্ট স্বদেশবান্ধব চট্টোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। তাঁর নেতৃত্বেই গড়ে ওঠা লবি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনসভায় ভারতের বিরুদ্ধে যে-কোনও পদক্ষেপ নিয়ে দু'বার ভাবতে বাধ্য করায়। পোখরানের পরে মার্কিন দুনিয়া যখন ভারতকে ধিক্কার দিতে ব্যস্ত, তখন স্বদেশবাবুর প্রচেষ্টাতেই বিদেশমন্ত্রী যশোবন্ত সিংহের সঙ্গে আলোচনায় বসতে রাজি হন মার্কিন সাংসদেরা। বরফ গলতে শুরু করে। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী যান বিল ক্লিন্টনের সঙ্গে বৈঠক করতে।"[১]

বিদেশে স্বদেশের জন্য লড়াই লড়ে অবশেষে বাঁকুড়া জেলার সোনামুখীর ছেলে স্বদেশবান্ধব চট্টোপাধ্যায় স্বীয় নামের যথার্থ্যতা প্রমাণ করে পেলেন ভারত সরকারের দেওয়া 'পদ্মভূষণ' পুরস্কার। ধন্য হল মল্লভূম। (জন্ম—১৯৪৬ খ্রীঃ)

অসিতরঞ্জন ঘোষ (১৯১৯-১৯৬৯ খ্রীঃ) — বিষ্ণুপুরের গৌরব স্বামী প্রভবানন্দের ভ্রাতুষ্পুত্র অসিতরঞ্জন ঘোষ একাধারে গল্পকার, সাংবাদিক ও চিত্রপরিচালক ছিলেন। মাত্র কুড়ি বছর বয়সে আমেরিকার দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. ইন সিনেমাতে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়ে বর্তমানের এম. ফিল. ডিগ্রীর সমতুল্য গবেষণাধর্মী 'The Objective of Burma' তথ্যচিত্র নির্মাণ করে তিনি তৎকালীন সমালোচক ও বুদ্ধিজীবী মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরবর্তীকালে ঐ দেশের 'ওয়ার্ণার স্টুডিও'তে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও পরিচালন কার্যে রত থাকা অবস্থায় সেখানে মোশন পিকচার্সের সাম্মানিক সদস্য হওয়ার বিরল সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল। সম্মান ও সৌভাগ্যের প্রলোভনে প্রলুব্ধ না হয়ে দেশের টানে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফিরে আসেন স্বদেশে। বাংলা তথা ভারতের সমান্তরাল ছবির পুরোধা পুরুষরূপে স্বীকৃত অসিতবাবু নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বিরচিত 'স্বর্ণসীতা' বইটির 'কপি রাইট' কিনে নিয়ে চিত্ররূপ দেন। স্বর্ণসীতা ছবিতে নায়িকার ভূমিকাতে অভিনয় করেছিলেন প্রখ্যাত অভিনেত্রী সন্ধ্যারাণী। বিষ্ণুপুরের অরুণ মণ্ডল (পটলবাবু), ও গোপাল রাঠী এতে অভিনয় করেন। সুরকার ছিলেন বিষ্ণুপুরের কৈলাসতলার প্রখ্যাত গায়ক মদনমোহন রায়। বিষ্ণুপুরের রূপকথা সিনেমা হলে ছবিটির প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। তাঁর 'সুধার প্রেম' ছবিটিও মানুষের মন জয় করে। বাংলায় সাহিত্য-নির্ভর ছবি করার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন পথিকৃৎ স্বরূপ। স্বামী শিবানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ)-এর মন্ত্রশিষ্য, বিষ্ণুপুরের সুসন্তান অসিতবাবু মল্লভূমের এক উজ্জ্বল মুখ।

অনিল মুখার্জী—ওন্দা গ্রামের জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব অনিল মুখার্জী ওন্দা বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী হিসেবে ১৯৬৯ / ৭৭ / ৮২ / ৮৭ / ৯১ / ৯৬ / ২০০১ এর নির্বাচনে জয়লাভ করে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ডেপুটি স্পীকারের পদ অলংকৃত করেন। তাঁর গৌরবে আমরা গৌরবান্বিত।

রাধাগোবিন্দ রায়—(৬.৮.১২৯৭-১৩.৭.১৩৭১ বঙ্গাব্দ, এম. এ.) — বাঁকুড়া জেলার গৌরব, বিষ্ণুপুরের সৌরভ, সর্বজনপ্রিয় জননায়ক, নির্ভীক স্বাধীনতা সংগ্রামী, স্থিতপ্রজ্ঞ, সুশিক্ষিত, আদর্শবাদী এবং ধর্মপ্রাণ এই মানুষটি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী রামানন্দ মহাবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন। ইনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদিবাসী কল্যাণ মন্ত্রী পদে আসীন ছিলেন ১৯৫২-১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। বিষ্ণুপুরবাসীগণ আজও তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

১ 'বিদেশে দেশের লড়াই লড়ে স্বদেশ পদ্মভূষণ', লিখেছেন—সুবর্ণ পাঠক, আনন্দবাজার পত্রিকা, পৃঃ— ১ ও ৬, ২৭.৩.২০০২

পুরবী মুখার্জী— A. I. C. C.-র প্রথম মহিলা সাধারণ সম্পাদকের এবং পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য ও কারাবিভাগের রাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করে ইনি বাঁকুড়ার মুখোজ্জ্বল করেছেন। জেলার মহিলাদের ইনি বিশেষ গর্বের কারণ।

জগন্নাথ কোলে—কোতুলপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে ইনি রাজ্য সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার (Minister of Information) দপ্তরের মন্ত্রী রূপে জেলার সম্মান বৃদ্ধি করেছেন। এক বাক্যে চেনার মতো মানুষ ছিলেন ইনি। ইনি M. P. ছিলেন, ছিলেন কংগ্রেস-নেতা।

আচিন্ত্যকৃষ্ণ রায়—আমার শিক্ষাগুরু শ্রদ্ধেয় অচিন্ত্যকৃষ্ণ রায় কর্মজীবনে বিষ্ণুপুর রামানন্দ কলেজের অধ্যাপক এবং রাজনৈতিক জীবনে বিষ্ণুপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সি. পি. আই. এম. প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হয়ে এ রাজ্যের খাদ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী, পরবর্তীকালে বন বিভাগ এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন। অকৃতদার, সাদামাটা এবং স্পষ্টভাষী এই মানুষটি আমাদের খুব কাছের মানুষ।

পার্থ দে—দূর থেকে দেখেছি বাঁকুড়ার বই মেলাতে। নিরহঙ্কার, সংযতভাষী অধ্যাপক পার্থ দে বাঁকুড়া বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ১৯৭৭/৮৭/৯১/৯৬ এর নির্বাচনে নির্বাচিত হয়েছেন। হয়েছেন এ রাজ্যের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষামন্ত্রী এবং পরবর্তীকালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী। সি. পি. আই. এম.-এর তিনি একজন জেলানেতা।

উপেন কিস্কু—সি. পি. আই. এম.-এর প্রার্থী হিসেবে রায়পুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ১৯৭৭/৮২/৮৭/৯১/৯৬/২০০১ এর নির্বাচনে জয়লাভ করে পিছিয়ে পড়া জাতির এই মানুষটি তপসিল ও আদিবাসী এবং পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের কল্যাণ বিষয়ক মন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হন। জেলার পিছিয়ে পড়া মানুষজনের ইনি মুকুটমণি স্বরূপ।

প্রফুল্লচন্দ্র সেন—অতীত মল্লভূমের স্মৃতি-সৌরভে সুরভিত আরামবাগের সুসন্তান প্রফুল্ল চন্দ্র সেন এককালে রাজ্যের অপ্রতিদ্বন্দ্বী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মল্লভূমের হৃত-গৌরবের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

অশ্বিনী পতি—একাধারে কর্মবীর এবং রামকৃষ্ণ মিশনের দীক্ষিত সন্ন্যাসী অশ্বিনী পতি মহাশয় শালডিহার সৌরভ এবং গৌরব। 'Black diamond' অর্থাৎ 'কালো হীরে' নামে সমাদৃত কয়লার খনিতে কর্মরত অবস্থাতে তিনি কালো হীরের সংস্পর্শে এসে যেন হয়ে গিয়েছিলেন হীরের টুকরো। অকৃতদার, উদারচেতা, মহানুভব এই মানুষটি তাঁর কর্মজীবনে জনসাধারণের সহযোগিতায় স্বীয় জন্মস্থান শালডিহাতে 'শালডিহা হাই স্কুল' (উচ্চমাধ্যমিক), 'শালডিহা বালিকা বিদ্যালয়' (মাধ্যমিক), 'শালডিহা কলেজ' এবং বাঁকুড়ার পোহাবাগান অঞ্চলে রেসিডেন্শ্ল্ 'ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল' স্থাপন করেন। শুভঙ্কর নগর বা পোহাবাগানের 'Bankura Unnayani Institute of Engineering' সংক্ষেপে B.U.I.E. ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে তাঁর আন্তরিক প্রয়াস শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। গত ২০০২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারী এই কর্মবীর-সন্ন্যাসী ৭৩ বছর বয়সে তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'শালডিহা বিবেকানন্দ মিশন' (আশ্রম)-এ পরলোক গমন করেন। বহু শিক্ষা এবং সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত, ঈশ্বর ও মানব-প্রেমিক এই মানুষটি জেলাবাসীর কাছে এক স্মরণীয়, বরণীয় এবং আদরণীয় ব্যক্তিত্ব।

পঙ্কজরঞ্জন বসু—রাহাগ্রামের সুসন্তান প্রফেসার্ পঙ্কজ রঞ্জন বসু দেশ-বিদেশের বহু উচ্চপদে সমাসীন ছিলেন। তিনি ইংল্যাণ্ড থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল এবং ইলেক্ট্রনিক্স্ ইঞ্জিনীয়ারিং-এ উচ্চ শিক্ষার আলোকেই শুধু আলোকিত নন ; 'Vibratory Controlled Conveyor Systems, 'Variable Speed Induction Motor', 'Patent' এবং আরো

অনেক যন্ত্রাদি যা তিনি আবিষ্কার করেছেন, তা কেবল বিভিন্ন দেশে ব্যবহারই হচ্ছে না, বিভিন্ন দেশের পাঠ্য-পুস্তকেও স্থানলাভ করেছে। স্বদেশে ও বিদেশে বহু উল্লেখযোগ্য পুরস্কারে সম্মানিত পঙ্কজ রঞ্জন বাবু গত ২০০১ খ্রীষ্টাব্দে পূর্বোক্ত 'B.U.I.E. ডিগ্রি ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ থাকা কালে 'Millennium Achiever Award' লাভ করেন। এতদর্থে বিষ্ণুপুর নিবাসী ৬৪ বছর বয়স্ক বসু মহাশয় বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের এক বুদ্ধিদৃপ্ত উজ্জ্বল মুখ।

এছাড়া কবি প্রভাকর মাঝি, সাহিত্যিক দেবল দেববর্মণ, দিব্যেন্দু পালিত ; অভিনেতা বিভু ভট্টাচার্য, পার্থ মুখার্জী, শান্তিলাল মুখার্জী; অভিনেত্রী লকেট চ্যাটার্জী সুভদ্রা চক্রবর্তী, রেশমী ভট্টাচার্য; প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় এবং ফুটবল প্রশিক্ষক প্রদীপ কুমার ব্যানার্জী (পি. কে. ব্যানার্জী) ও তাঁর ভ্রাতা প্রসূন ব্যানার্জী প্রমুখ মল্লভূম তথা বাঁকুড়া জেলার মানুষ। এঁরা নিজ নিজ ক্ষেত্রে মল্লভূমকে গৌরবান্বিত করেছেন।

খোঁজ করলে এরকম অসংখ্য গুণিজনের সন্ধান পাওয়া যাবে মল্লভূমে এবং তাঁদের কথা লিখে 'নানাগুণে গুণিজন' নামে একটি পুস্তকও রচনা করা যেতে পারে অক্লেশে। থাক সে কথা।

নানা গুণে গুণিজন অধ্যায়ের মুখে ঘোমটা টেনে এবার আমরা মানস-ভ্রমণ করব 'হাতি-ঘোড়ার দেশে'।

অধ্যায়-১২৪

হাতি-ঘোড়ার দেশে

মল্লরাজাদের হাতিশালে হাতি ছিল, ঘোড়াশালে ছিল ঘোড়া। শুধু মল্লরাজা বা রাজাদের নয়, তখনকার দিনে বড় বড় জমিদারদেরও ছিল হাতিশালে হাতি, অশ্বশালে অশ্ব। আজ সেই রাজা নেই, নেই সেই জমিদার। নেই তাঁদের হাতি-ঘোড়া। তাই বলে হতাশ হওয়ার কিছু নেই, কারণ হাতি-ঘোড়া আছে—আছে অসংখ্য হাতি-ঘোড়া। আরো মজার কথা হল, হাতি, আছে; কিন্তু নেই হাতির বৃংহিত। ঘোড়া আছে; নেই ঘোড়ার হ্রেষা। এ ঘোড়া দানাপানি খায় না, এ হাতি হাতাহাতি করে না। করে নাকো উৎপাত। রণসাজে সজ্জিত সারিবদ্ধ এসব হাতি-ঘোড়ার দল কেমন যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো ধীর, স্থির, নিশ্চল, নির্বাক। গল্পের মতো অবিশ্বাস্য শোনালেও এসব কথা গল্প নয় মোটেই। অক্ষরে অক্ষরে সত্য। নির্ভেজাল সত্য। বিশ্বাস না হয় চলে যান বিষ্ণুপুরের মাত্র মাইল ২০ দূরে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত পাঁচমুড়া গ্রামে। দেখে আসুন পাঁচমুড়ার কুমোরপাড়ার আটান্নটি কুম্ভকার পরিবারের ঘরে ঘরে, ঘরের খোলা বারান্দায়, উন্মুক্ত আঙ্গিনায় এসব হাতি-ঘোড়ার ঠাসাঠাসি ভিড়। শুধুমাত্র স্বদেশী কালা আদমির দলই নয়, সাগর পারের মেম-সাহেবের দলও হামেশা গাড়ি ছুটিয়ে, ধুলো উড়িয়ে খুঁজে খুঁজে এসে পড়েন হাতি-ঘোড়ার দেশে। আসেন, দেখেন, অভিভূত হন। তারপর কার্টুনবন্দী হয়ে এসব হাতি-ঘোড়া মেম ও সাহেবদের সাথে সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে চলে যায় বিশ্বজয় করতে। কিন্তু এমনটা হল কেমন করে?

এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে মাননীয় উৎপল চক্রবর্তীর 'অষ্টাদশ অশ্বারোহীর খোঁজে' নিবন্ধটি'র কথা মনে পড়ে বার বার। প্রবন্ধটিতে তিনি লিখেছেন, "আজ থেকে

ঠিক আটশো বছর আগে এক উচ্চাকাঙক্ষী ভাগ্যান্বেষী দুর্ধর্ষ, তুর্কী সেনানায়ক **মহম্মদ-ই-বখ্‌তইয়ার খিলজী** মাত্র অষ্টাদশ-অশ্বারোহী নিয়ে দখল করেছিলেন গৌড়েশ্বর লক্ষ্মণসেনের লক্ষ্মণাবতী নদীয়া। সূচনা হয়েছিল এক নতুন অধ্যায়ের। বাঁকুড়ার ঘোড়া বিষয়ক তত্ত্বতল্লাশিতে ঘটনাটি মনে পড়ল। হিসেঁবে দেখছি, পাঁচমুড়া, সোনামুখী, বিষ্ণুপুর, হামিরপুর, কামারডিহা, বিবড়দা, স্যাঁদড়া, রাজগ্রাম, কেয়াবতী, জয়কৃষ্ণপুর, নাকাইজুড়ি, জোতবিহার, ইন্দাস, উলিয়াড়া, মেটালি, পাত্রসায়ের এবং মুরলু — বাঁকুড়ার এই সতেরোটি জায়গায় পোড়ামাটির ঘোড়া তৈরী হয় বা হতো। আর একটি ঘোড়া প্রয়োজন। তাহলেই হয়ত এই অষ্টাদশ অশ্বারোহী নিয়ে দখল করা সম্ভব হবে শিল্পের সাম্রাজ্য!"[১]

মল্লরাজ্যের হাটে, মাঠে, ঘাটে, বাটে, ছায়াশীতল বৃক্ষমূলে প্রায়ই দেখা যায় কাঁচা অথবা পাকা বেদীর উপর গ্রাম-দেবতার প্রতীক রূপে বিভিন্ন নামে ঘোড়ার পাশাপাশি হাতিরও পূজা হচ্ছে। মল্লভূমে হাতি-ঘোড়ার ব্যাপক পূজার প্রচলনের উৎস মূলে রয়েছে কয়েকটি লৌকিক সংস্কার। জঙ্গলমহল নামে কথিত অতীতের বন-বিষ্ণুপুরে বন্য হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের পাশাপাশি হাতি-ঘোড়ার অভাব তো ছিলই না, ছিল প্রাচুর্য। হাতি-ঘোড়ার উৎপাতে অতিষ্ঠ মানুষ এদেরকে তুষ্ট করার অভিমানসে সম্ভবতঃ শুরু করেন এদের পূজা-আচ্চা।

ঘোড়ার সুন্দর সুঠাম বলিষ্ঠ গড়নের জন্য ঘোড়া চিরকালই সমাদৃত। পক্ষান্তরে হাতির বিশালতা, হৃষ্ট-পুষ্ট গুরুগম্ভীর ব্যক্তিত্ব মোহিত করে মানুষকে। প্রবল ব্যক্তিত্বপূর্ণ হৃষ্ট-পুষ্ট, সুষ্ঠু-বলিষ্ঠ অবয়ব লাভের আশায়ও হয়তো হাতি-ঘোড়ার পূজার প্রচলন, দেবস্থানে হাতি-ঘোড়া মানত করার রেওয়াজ।

বর্গী আক্রমণের সময় ঘোড়ায় চড়ে আসতো লুঠেরা দস্যুদল। ঝড়ের গতিতে আসত তারা। লুটপাট করে ঘরে ঘরে অগ্নি-সংযোগ করে পালিয়ে যেত নিমেষে। এক্ষেত্রে ঘোড়া হয়েছে অমঙ্গলের বাহক এবং প্রতীক। তাই তো তাকে পূজা করে তুষ্ট করার প্রয়াস।

ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধযাত্রার প্রথা তো ঐতিহাসিক ঘটনা। মল্লরাজাদের যুদ্ধযাত্রা-কালে সমরসজ্জায় সজ্জিত সৈন্যদের মুখে ধ্বনিত হত —

'আগাডোম বাগাডোম ঘোড়াডোম সাজে
ঢাক ঢোল মৃদঙ্গ বাজে ...'

তৎকালে যুদ্ধজয় বহুলাংশেই নির্ভরশীল ছিল অশ্ব, অশ্বারোহী, সৈন্য, গজ এবং গজারোহী সৈন্যবাহিনীর উপর। যুদ্ধজয়ের আশায় শক্তির প্রতীক হিসেবে অশ্ব এবং গজ-পূজার প্রাদুর্ভাব ঘটে বলে অনুমিত হয়।

আবার দেখা যায় খোঁড়া ছেলের আরোগ্য লাভ করে ঘোড়ার মতো দৌড়তে পারার বাসনায় দেবস্থানে ঘোড়া মানত করার প্রবণতা প্রায় প্রথাসিদ্ধ। সর্বোপরি কলিযুগের কল্কি অবতারের বাহন হল ঘোড়া। সুতরাং কলির ঘোড়ার দেব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াটাই প্রত্যাশিত।

পূর্বোল্লিখিত সতেরোটি স্থানের উৎপাদিত ঘোড়াগুলি আবার গঠন বৈচিত্র্যে স্বাতন্ত্র্যের দাবিদার। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় উৎপল চক্রবর্তী লিখেছেন, "সোনামুখীর ঘোড়া .... ভিন্ন গড়নের। খাটো মাপের গলা, লাগাম নেই, কান স্বাভাবিক, লেজ দেহের সঙ্গে জোড়া। দেহে অলংকার পাঁচমুড়ার তুলনায় বেশী। ডঃ সাঁতরার অনুমান, পীর ফকিররা যখন ঘোড়ায় চড়ে আসতেন, তখন সেই ঘোড়ার গলায় নানারঙের পুঁতির মালা থাকত। এই অলংকার হয়ত তারই প্রভাবে।

১. খুশির খেয়ালী, শারদ ১৪০৮, পৃঃ— ৬০

রাজগ্রামের ঘোড়ার আকৃতি স্বাভাবিক, গলা সামান্য বাঁকানো, লাগাম যুক্ত, ছোট লেজ দেহের সঙ্গে সাঁটা, গলায় ও পিঠে নক্সা, স্যাঁদড়ার ঘোড়াও অলংকার বহুল। আবার বিষ্ণুপুরের ঘোড়ার গলা অনেকটা ইংরেজি 'এস' অক্ষরের মতো বাঁকানো, লেজ মোটা। শালতোড়া থানার মুরলু গ্রামের ঘোড়া সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। গলাটি সমুন্নত নয়, নীচু, সামনের দিকে প্রসারিত। লেজ বড় এবং মোটা, গলার কাছে মাথা ও ধড়ের দুপ্রান্তে বেড় দিয়ে পরপর বিন্দু চিহ্নিত। পুরুলিয়ার ঘোড়ার সঙ্গে অনেক সাদৃশ্য আছে কাছাকাছি পুরুলিয়ার অবস্থান বলেই হয়ত।

লোকশিল্পের নিদর্শন হিসেবে প্রতিটি ঘোড়াই তাৎপর্যময় কিন্তু নিছক শৈল্পিক বিচারে পাঁচমুড়ার ঘোড়া তুলনাহীন। বাংলার কোন প্রান্তের কোন ঘোড়াই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এর সমকক্ষ নয়। বস্তুত এই ঘোড়া এখন কারুশিল্পের প্রতীক, বিশ্বপরিক্রমায় রত সেই অশ্বমেধের ঘোড়ার মতোই।"[১]

কখনো ধর্মীয় কারণে, কখনো অনুভবের অনুসরণে, কখনো বা কল্পনার কল্পরেখায় আবার কখনো বাস্তবতার সফল রূপায়ণে মল্লভূমের ঘোড়া হয়েছে অভিনব এবং চিত্তাকর্ষক। "যেমন ফুল, গাছ, নারীদেহ ফর্ম হিসেবে শিল্পীদের কাছে চির-আকর্ষণীয়, প্রাণীদের মধ্যে ঘোড়াও তেমনিই।"[২]

শুধু হাতি বা ঘোড়াই নয়, হাতি-ঘোড়ার পাশাপাশি মনসার চালি বসিয়ে মনসা পূজার প্রচলনও মল্লরাজ্যে তথা বাঁকুড়া জেলায় বিশেষ সমাদৃত।

বাঁকুড়া জেলায় তথা পাঁচমুড়ায় শুধুমাত্র হাতি-ঘোড়া বা মনসার চালিই নয়, তৈরী হয় বহুবিধ শিল্পকর্ম। তার মধ্যে রয়েছে দেব-দেবীর মূর্তি, অজন্তা ইলোরার আর্টের ছবি, নক্সা-টালি, ফুলের টব, অ্যাশ্-ট্রে, শঙ্খ, দৃষ্টিনন্দন ক্রুদ্ধ বৃষ, খোল, মাদল, ডুগি, হার, কানের দুল, বালা, চাল-ভাজা-খাপরি, মুড়ি-ভাজা-খোলা, কুঁজো, কলসী, ঘট, মনসার চালি এবং মনসার বারিঘট প্রভৃতি। এছাড়াও শিল্পীগণ অত্যাশ্চর্য কারুশিল্পের নিদর্শন হিসাবে মাঝে মধ্যে তৈরী করেন নয়নাভিরাম তুলসীমঞ্চ, আলোছায়ার ইন্দ্রজাল রচনাকারী 'ল্যাম্প্ শেড্', কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধস্থলের পাঁচঘোড়ায় টানা কৃষ্ণার্জুনের সুশোভন রথ, বিস্ময়কর ফুলদানী। এ সব হস্তশিল্পের জন্য পাঁচমুড়ার শিল্পীগণ, জেলা স্তরে, রাজ্য স্তরে পুরস্কৃত হয়েছেন বছরে বছরে। বিস্ময়কর একটি ৬ ফুট উচ্চ সাদামাটা (প্লেন) ঘোড়া তৈরী করে ১৯৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারও ছিনিয়ে এনেছেন ঁরাসবিহারী কুম্ভকার। শিল্পী ঁরাসবিহারী কুম্ভকারের পুত্র শ্রীপশুপতি কুম্ভকার ১৯৮২-৮৩ বর্ষে একটি হাতি তৈরী করে রাজ্যস্তরে প্রথম পুরস্কার, পশুপতি বাবুর পুত্র বাউল দাস কুম্ভকার 'ল্যাম্প্শেড্' বানিয়ে জেলা ও রাজ্যস্তরে ১৯৯৭-৯৮ বর্ষে লাভ করেছেন প্রথম পুরস্কার, বাউল দাসের ভাই চণ্ডীদাস কুম্ভকার পাঁচঘোড়ায় টানা কৃষ্ণার্জুনের রথ নির্মাণ করে ১৯৯৮-৯৯ বর্ষে জেলা স্তরে প্রথম এবং রাজ্যস্তরে বিশেষ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। জেলা এবং রাজ্যস্তরে পুরস্কার-প্রাপ্ত এ গ্রামের আরো ১২ জন শিল্পীর নাম জানা যায়। এঁরা হলেন সর্বশ্রী মদনমোহন কুম্ভকার, ধীরেন্দ্রনাথ কুম্ভকার, সুনীল কুম্ভকার, বুদ্ধদেব কুম্ভকার, তারক কুম্ভকার, বৈদ্যনাথ কুম্ভকার, বিশ্বনাথ কুম্ভকার, গণপতি কুম্ভকার, মথুর কুম্ভকার, ব্রজনাথ কুম্ভকার, কাঞ্চন কুম্ভকার ও শ্রীমতী জয়ন্তী কুম্ভকার।

বিশেষ সম্মানে সম্মানিত এই শিল্পীগোষ্ঠী নবপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে আজ তাঁদের শিল্পকর্মের বহুল প্রচার প্রসারে মনোনিবেশ করে কৃষ্ণলীলা, রাসলীলা, রামায়ণ, মহাভারতের সীমা ছাড়িয়ে পাড়ি দিয়েছেন আধুনিক যুগের চিত্র চিত্রায়ণে। মন জয় করেছেন শিল্প-সমঝদার মানুষজনের।

---

১ ও ২. খুশির খেয়ালী, শারদ ১৪০৮ ; সম্পাদনা—গিরীন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তী, পৃঃ— ৬৩ ও ৬৪

সম্মানে মন ভরে, ভরে না পেট। এত সব করেও এই শিল্পীগোষ্ঠীর দুবেলা দু'মুঠো গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হয় কোন রকমে, কিন্তু ধনবর্ষী মা লক্ষ্মীর অকৃপণ হস্তের ধন বর্ষে না এঁদের উপর। তাই এঁরা চিরদুঃখী। অভাবের তাড়নায় শুষ্ক, রুক্ষ্ম, বিবর্ণ, স্বল্পায়ু, কিন্তু অশালীন নন।

মাটির মতো নরম প্রকৃতির সহজ সরল এই মানুষগুলির কারবার হল মাটি, জল আর আগুন নিয়ে। কথায় কথায় মনে পড়ে মা-মাটি-মানুষের কথা। মায়ের মতোই সর্বংসহা মাটি নিয়ে কাজ করতে করতে এই মানুষ-মানুষীর দলও হয়েছেন সহিষ্ণু, এবং সৃজনশীল—কারণ দেখলাম এঁদের মধ্যে রয়েছে প্রাণস্পন্দনের অন্তঃসলিলা উষ্ণ-প্রস্রবণ। সেই উষ্ণ প্রস্রবণের প্রেরণা এঁদের সৃষ্টিকর্মের শাশ্বত উপাদান। আর স্থূল উপাদান হল এঁটেল মাটি। চিট্‌চিটে এঁটেল মাটির সাথে শতকরা ২০ ভাগ মিহি বালি মিশিয়ে মাটির চিট কমিয়ে তৈরী করা হয় কার্যোপযোগী মাটির মণ্ড। অতঃপর 'কুমোরের চাকা'র কেন্দ্রস্থলের উপরিভাগে ঐ ভিজে মাটির মণ্ড সুস্থাপন করে একটি লাঠির সাহায্যে দ্রুতগতিতে ঘুরিয়ে দেওয়া হয় চাকা। মাটি সহ চাকাটি ঘুরতে থাকে বন্‌বন্। সেই সুযোগে শিল্পী মণ্ডের শীর্ষাংশের অভ্যন্তরভাগে দক্ষিণ হস্ত এবং বহির্ভাগে বাম হস্ত রেখে পুরোপুরি হাতের কৌশলে তৈরী করেন হাতি, ঘোড়া থেকে শুরু করে হাঁড়ি, খোলা জাতীয় ফাঁপা বস্তুরাজি এবং বস্তুরাজির অংশ সমূহ। এক্ষেত্রে জেনে রাখা ভাল যে হাতি, ঘোড়া জাতীয় কারুশিল্পগুলি কয়েকটি খণ্ডাংশ জুড়ে জুড়ে হয় পূর্ণাঙ্গ। যেমন একটি হাতির ক্ষেত্রে ৬ খণ্ড, একটি ঘোড়ার ক্ষেত্রে ৭ খণ্ড খণ্ডাংশ মাটি দিয়ে জোড়া লাগিয়ে রূপায়িত হয় পূর্ণাঙ্গ হাতি, ঘোড়া। ঘোড়া তৈরীর পদ্ধতিতে পা ৪টি, গর্দান ১টি, ঘাড় ১টি ও মুখাবয়ব ১টি ঃ মোট এই সাতটি খণ্ড জুড়ে তৈরী হয় ঘোড়া। পৃথকভাবে নির্মিত দুটি কান এবং লেজ 'যখন খুশী জোড়, যখন খুশী খোল' পদ্ধতিতে কান ও লেজের নির্দিষ্ট ছিদ্রে স্থাপন করে সৃষ্টি করা হয় পূর্ণাঙ্গ কলেবরের ঘোড়া। হাতির ক্ষেত্রে পা ৪টি, গর্দান ১টি, শুঁড় সহ মুখাবয়ব ১টি, অর্থাৎ মোট ৬টি অংশ নিয়ে নির্মিত হাতির লেজ, কান ও দাঁত থাকে দেহের সাথে সংলগ্ন অবস্থায়। ফুলের টব রচনার সময় চৌপল টবের ক্ষেত্রে চারটি টালি বা ছাঁচে তোলা নক্সা টালি এবং নিম্নভাগের একটি সাদামাটা (প্লেন) টালি, মানে মোট পাঁচটি অসংলগ্ন অংশের সুসমন্বয়ে প্রস্তুত হয় একটি চৌপল টব। ৬ পল টবের ক্ষেত্রে থাকে সাতটি, আটপল টবের ক্ষেত্রে থাকে নটি অংশ। টবগুলির ক্ষেত্রে যেমন চৌপল, ছপল, আটপল টব বলা হয়, অনুরূপভাবে হাতিগুলির ক্ষেত্রে বলা হয় বণ্ডা হাতি, শুঁড় নামানো হাতি, শুঁড় তোলা হাতি আবার ঘোড়ার ক্ষেত্রে ঝুরি দেওয়া ঘোড়া, ঘাড় বাঁকানো ঘোড়া, চূড়া দেওয়া ঘোড়া, লম্বা ঘাড় ঘোড়া ইত্যাদি নামকরণই পরিলক্ষিত হয়।

উৎপাদিত শিল্পসামগ্রীগুলিকে ছায়াতে শুকিয়ে নিয়ে ভাল করে রোদ খাইয়ে সেগুলির উপর বণক (বর্ণক)-এর প্রলেপ দেওয়া হয় বার তিনেক। পুনরায় ভাল করে শুকিয়ে সেগুলি নিয়ে যাওয়া হয় ভাটিশালাতে পোড়ানোর জন্য। বণক ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করে। প্রথমতঃ, রঙে আনে চাকচিক্য-ঔজ্জ্বল্য, দ্বিতীয়তঃ, উৎপাদিত বস্তুকে করে দীর্ঘায়ু, তৃতীয়তঃ, দৃষ্টিনন্দন সৌন্দর্য সৃষ্টি।

বণক তৈরীর পদ্ধতিটি বেশ কষ্ট-সাধ্য এবং কৌতূহলোদ্দীপক। গত ২৪.০২.২০০২ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচমুড়া গিয়ে এসব দেখতে দেখতে এবং করিতকর্মা এক মহিলার সাথে কথা

বলতে বলতে বণক তৈরীর জন্য নির্দিষ্ট হাঁড়িগুলির মধ্যে একটি হাঁড়ি ছুঁয়ে ফেললাম হাঁড়ির অভ্যন্তরে কি আছে তা দেখার তাগিদে। ভদ্রমহিলা শশব্যস্তে চিৎকার করে উঠলেন, 'ছুঁবেন না, ছুঁবেন না, রং কেটে যাবে।'

অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কেন?'

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি। কুম্ভকার শিল্পীগণের কুটীরের আঙ্গিনায় দেখা যায় সারি সারি মাটির হাঁড়ি। হাঁড়িগুলোতে ভরা থাকে মাটিগোলা জল। খাল, বিল, পুকুর, নদী, নালার রংদার পলিমাটি হল রং তৈরীর মুখ্য উপাদান। এ ধরনের মাটিকে কুম্ভকারদের ভাষায় **'বণক'** বলে। বণক জলে গুলে মাটির কলসীতে কলসীতে ভরে ঢাকা দিয়ে থরে থরে সাজিয়ে রাখা হয় উঠোনে। দিন সাতেক অন্তর পর পর দুবার হাঁড়িগুলির তলে জমে যাওয়া বালি ফেলে দেওয়া হয়। অতঃপর একাদিক্রমে ২/৩/৪ মাস ধরে ঐ রং জল শুকিয়ে ক্রমশঃ কমতে থাকে বিলম্বিত লয়ে। এভাবে জল কমতে কমতে প্রায় দশ হাঁড়ি রং জল থেকে পাওয়া যায় মাত্র এক হাঁড়ি পরিমাণ বণক। প্রচলিত বিশ্বাস কুম্ভকার ব্যতীত অন্য কোন জাতের মানুষ, এমন কি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণও যদি দৈবাৎ স্পর্শ করে হাঁড়ি তাহলে কেটে যায় রং। জল সরে (কেটে) যায় বণকে। কাজ হয় না আর। সমস্ত শ্রম হয় পণ্ডশ্রম। পণ্ডশ্রমের আশঙ্কায় আমি হাঁড়ি ছোঁয়া মাত্রই চিৎকার করে উঠেছিলেন ভদ্রমহিলা। অপ্রতিভ হয়েছিলাম আমি। লজ্জিত হয়েছিল আমার স্ত্রী। থাক সে সব কথা। এবার বলি ভাটিশালের কথা। পূর্বেই বলেছি, উৎপাদিত কাঁচামাটির শিল্প সামগ্রীগুলিকে পাকাপোক্ত করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় ভাটিশালে। ভাটিশালার উর্ধ্বাংশে জিনিসগুলিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজিয়ে মাটির আস্তরণে আচ্ছাদিত করে শালের নিম্নাংশে কাঠ অথবা পাতা জ্বালিয়ে আগুন ধরিয়ে ভালভাবে পুড়িয়ে নেওয়া হয় প্রায় ঘণ্টা চারেক ধরে। ভাটি নিভিয়ে দেওয়ার ১২ থেকে ২৪ ঘণ্টা পর ভাটি থেকে সযত্নে বের করা হয় পোড়ামাটির বস্তুরাজি। যার অপর নাম 'টেরাকোটা'। ভাটিতে পোড়ানোর সময় নির্মাণ পদ্ধতিতে ত্রুটি যুক্ত বস্তুগুলি ফেটে যায় প্রায় ক্ষেত্রেই। হো হো লেলিহান অগ্নিশিখায় দাহ্য জিনিসগুলির রং হয় হালকা লাল। বণকের প্রলেপের জন্য আসে আলোক বিচ্ছুরণের ঝক্‌ঝকে মসৃণ উজ্জ্বলতা।

লক্ষণীয় বিষয় হল টেরাকোটা শিল্প-সামগ্রীর রং হয় লাল, নয়তো বা কালো। কালো রং-এর জন্য কোন রং লাগে না। পোড়ানোর সময় শালের মধ্যে গোবরের ঘুঁটে পুড়িয়ে রাশি রাশি পুঞ্জীভূত ধোঁয়ার প্রলেপে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয় কালো রঙের বস্তুসমূহ। ভাটিশাল থেকে ছাড়পত্র পেয়ে টেরাকোটা-জাত দ্রব্যাদি শোভা পায় শিল্পীদের ঘরে, ঘরের অলিন্দে এবং আঙ্গিনায়। তারপর পণ্যদ্রব্য হিসেবে এসব জিনিস যানবাহনে চড়ে চলে যায় গ্রামে, গঞ্জে, শহরে, নগরে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশ-মহাদেশে। চলে যায় অশ্বমেধের ঘোড়ার মতোই দিগ্বিজয়ে। আসে বিদেশী মুদ্রাও। পুষ্ট হয় ভারত সরকার। কিন্তু কুম্ভকার শিল্পী ভাই বোনেরা থাকেন যে তিমিরে সেই তিমিরেই। ষাটোর্ধ্ব গৌর কুম্ভকার মহাশয়ের কণ্ঠে যেন সেই সুরই প্রতিধ্বনিত হল—

'কতদিন করছেন এ কাজ?'

'বংশপরম্পরায় পাঁচ পুরুষ।'

উত্তর দিয়েছিলেন আধময়লা জামা কাপড় পরিহিত পাকা গোঁফ দাড়ি বিশিষ্ট দুখ্-বুড়ো গৌরবাবু।

'পাঁচ পুরুষ ধরে এ কাজ করে কি পেয়েছেন?'

'অন্ন জুটেছে, মিটে নাই অভাব, ঘুচে নাই দুঃখ-কষ্ট।'

'কেন? যতদূর শুনেছি পাঁচমুড়ার হাতি-ঘোড়ার চাহিদা তো তুঙ্গে।'

'হলে হবেক কি। এটা ত একটা কুটীর শিল্প। ঘরের ছেলে পুলে বউ ঝি সকলকেই লেগে থাকতে হয় এই কাজে। হিসাব করলে কিছুই থাকে নাই।'

শ্রমবিভাজন ভিত্তিক এই শিল্পকর্মে পুরুষদের কাজ হল মাটি আনা, মাটি তৈরী করা, মূর্তি গড়া, ভাটি সাজানো, পোড়ানো এবং বিক্রয়ের জন্য বাজার ধরা ইত্যাদি। পক্ষান্তরে মহিলাদের কাজ হল বালি চালা, ছাঁচ তোলা, বণক তৈরী করা, বণকের প্রলেপ দেওয়া, ঝাড়া-মোছা প্রভৃতি।

এ কাজে ব্যবহৃত হাতিয়ারগুলির নাম 'চিয়াড়ি', 'কাবারি', 'বোলা', 'পিট্‌না', প্লাস্টার অফ্ প্যারিসের ছাঁচ এবং চালনা বা চালুনি ইত্যাদি।

দেবাদিদেব মহাদেবের মানস-পুত্র কুম্ভকার জাতির নর-নারীগণ পরম শিবভক্ত। রাঢ়ের অপরাপর জাতিগুলির মতোই কুম্ভকার জাতির উৎপত্তি বিষয়ে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত। এ প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত মাণিকলাল সিংহ মহাশয় লিখেছেন,—

"শিবচতুর্দ্দশীর পূর্বদিন শিবঠাকুরের বিবাহ উপলক্ষে বিবাহের প্রয়োজনীয় সমস্ত সাজ-সরঞ্জাম একে একে সংগৃহীত হইল, কিন্তু বিবাহের অতি অবশ্য প্রয়োজনীয় মঙ্গল-ঘট মিলিল না ; শিবঠাকুর মহা চিন্তায় পড়িলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর তিনি এক উপায় উদ্ভাবন করিয়া ফেলিলেন। শিবঠাকুর নিজ গলার রুদ্রাক্ষের মালার একটি কাঁঠি লইয়া মাটিতে নিক্ষেপ করিলেন আর তৎক্ষণাৎ এক দিব্যকান্তি পুরুষের আবির্ভাব হইল। এই দিব্যকান্তি পুরুষ দেবাদিদেব মহাদেবের সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বলিল—'প্রভু, কি করিতে হইবে?' দেবাদিদেব বলিলেন—'আমার বিবাহের জন্য মঙ্গল-ঘট নির্মাণ কর।' ঐ দিব্যকান্তি পুরুষ তখন মাটি সংগ্রহ করিয়া ঘট নির্মাণের উপযোগী পবিত্র জায়গা খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু দেবাদিদেবের বিবাহের ঘট নির্মাণের উপযোগী পবিত্র জায়গা মিলিল না। তাই আবার নতজানু হইয়া ঐ দিব্যকান্তি পুরুষ দেবাদিদেবকে বলিলেন—'কোথায় মাটি রাখিয়া ঘট নির্মাণ করিব?' দেবাদিদেব বলিলেন—'বিল্বপত্র দিয়া আমার পূজা কর এবং আমার মাথার উপর মাটি রাখিয়া ঘট নির্মাণ কর।' সেই দিব্যকান্তি পুরুষ তাহা করিলেন। এই দিব্যকান্তি পুরুষই রাঢ়ীয় কুম্ভকারদের আদি পিতা। রুদ্রাক্ষের মালাকাঁঠি হইতে ইঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া এই পুরুষের নাম হইল রুদ্র পাল। রাঢ়ীয় কুম্ভকারগণ ইহারই বংশধর বলিয়া তাঁহাদের মুল পদবী পাল।"[১]

কুম্ভকারদের জাতি-দেবতা শিবঠাকুর। এজন্য কুম্ভকারগণ শিবচতুর্দশীর দিন এবং চৈত্র সংক্রান্তিতে শিবের গাজন উপলক্ষ্যে চড়ক পূজার পূর্ব দিন থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম বিজোড় শনিবারের আগের দিন পর্যন্ত বন্ধ রাখেন কাজ—বিশেষতঃ চাকা ঘুরানোর কাজ। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম বিজোড় শনিবার অর্থে তা ৩, ৫, ৭, ৯, ১১ তারিখ হতে পারে। বিজোড় শনিবারে শিবপূজা করে শুরু হয় কাজ। অন্তর্বর্তী সময়ে চলে চাকাপূজা। চাকার কেন্দ্রস্থলের উপরিভাগে মাটির শিবলিঙ্গ করে শিবপূজা করার ধর্মীয় রীতি প্রচলিত। বৈশাখ মাসে কাজ বন্ধের মনোজ্ঞ তত্ত্বকথা আমি আপনাদের শুনিয়েছি গোপালগঞ্জের বুড়োশিব প্রাঙ্গণে।

১.রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (৩য় খণ্ড), পৃঃ—১২৯

উপরোক্ত দিনগুলি ছাড়াও কুম্ভকার সমাজ জন্মাষ্টমী, রাধাষ্টমী, জিতাষ্টমী, দুর্গাষ্টমী, নাগ-পঞ্চমী, শ্রাবণ-সংক্রান্তি (ঝাঁপানের দিন), দশহরা, খৈ-ধারা, ক্ষীরপিঠে, শ্রীপঞ্চমী ও ষষ্ঠী দিনে কাজ বন্ধ রাখেন। বর্তমানে অবশ্য ধর্মীয় আচার আচরণে এবং কাজ কামাই-এর নিয়ম পালনে শৈথিল্য এসেছে অভাব অভিযোগের তাড়নায়।

আগুন আবিষ্কারের পর কাঁচা মাংস পুড়িয়ে এবং রান্না করে খাবার ইচ্ছা থেকেই প্রস্তর-যুগে পাথরের রন্ধন-পাত্র আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু পাথরের পাত্র তৈরী করা একদিকে যেমন ছিল শ্রমসাধ্য অন্যদিকে তেমনি ছিল ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক। প্রথমতঃ, পাথরের রন্ধন পাত্র হয় ভারী, দ্বিতীয়তঃ, পাত্রটির চারপাশের দেওয়াল এবং তলদেশ যথেষ্ট স্থূল হওয়ায় সহজে উত্তপ্ত হত না, এজন্য মাংসের ঝোল রান্নার সময় আগুনের মধ্যে ছোট ছোট নুড়ি পাথর পুড়িয়ে উত্তপ্ত করে সেই উত্তপ্ত পাথর টুকরোগুলোকে রন্ধনপাত্রে নিক্ষেপ করে জল উত্তপ্ত করা হত। প্রস্তর পাত্রে মাংস রান্নার এ সব অসুবিধার জন্য আদিম মানুষ মৃৎপাত্র নির্মাণ করে রোদে শুকিয়ে উনোনে চাপিয়ে রান্না করতে প্রয়াসী হয় এবং লক্ষ্য করে আগুনে পোড়া পাত্র আরো শক্ত এবং মজবুত হওয়ার পাশাপাশি সহজেই তাপ সঞ্চালনে সক্ষম। এভাবেই জন্ম হয় পোড়ামাটির তৈজসপত্রের। অতঃপর সাদাসিধে তৈজসপত্র তৈরী করেই সন্তুষ্ট থাকে না মানুষ। তৈজসপত্রে আঁকিবুঁকি নক্সা কেটে পোড়ানোর প্রচলন শুরু হয়। সেসব নক্সার স্থায়িত্ব দেখে অভিভূত আদিম মানুষের মনে নিত্যনতুন পোড়ামাটির বস্তু তৈরী করার সদিচ্ছা দেখা দেয়। উত্তরণের পথে এটি টেরাকোটা ভাস্কর্যে উত্তীর্ণ হয়। সুদূর অতীতে রন্ধনপাত্র নির্মাণের মাধ্যমে যে শিল্পের সূচনা হয়, পরবর্তীকালে সেই শিল্প তৈজসপত্রের সীমা অতিক্রম করে মূর্তি গড়া, মন্দির-সজ্জা, গৃহ-সজ্জা, অলংকারাদি নির্মাণের ঐতিহ্যবাহী শিল্প হিসেবে স্বীকৃতি এবং সমাদর লাভ করেছে। সারা পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে এই শিল্পজাত দ্রব্যের ঐতিহাসিক নিদর্শন সমূহ। পোড়ামাটির জিনিসপত্র উৎপাদনে বিশেষ পারদর্শী গোষ্ঠীবর্গ কুম্ভকার জাতি রূপে চিহ্নিত হয়েছে। কুম্ভ অর্থাৎ কলস জাতীয় বস্তু উৎপাদনের মাধ্যমে এই শিল্পের সূচনা হওয়ার সুবাদেই এঁরা কুম্ভকার (কুম্ভ করে যে) নামে পরিচিত। পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে আদিম শিল্পী-জাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে কুম্ভকার বা কুমোর জাতি রয়েছেন সকলের পুরোভাগে।

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত গবেষক মাণিকলাল সিংহ মহাশয়ের উদ্যোগে এবং তত্ত্বাবধানে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের পক্ষ থেকে বিংশ শতাব্দীর সাতের দশকে বিষ্ণুপুর শহরের মাইল ৬ দূরত্বে অবস্থিত দ্বারকেশ্বর নদীর উত্তর তীর সংলগ্ন ডিহর গ্রামের ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর শিবমন্দিরের সন্নিকটস্থ প্রাঙ্গণে প্রায় ১২ ফুট গভীরতা পর্যন্ত খননকার্য চালানো হয়। খননকার্যের সময় মাটির নীচের বিভিন্ন স্তরের গভীরতায় বহুবর্ণ বিশিষ্ট, সাদামাটা (প্লেন) ও কারুকার্য চিত্রিত অসংখ্য কৌলাল (খোলাম কুচি), থালা, বাটি, ভাঁড়, কুঁজো, কলসী জাতীয় বহুবিধ তৈজসপত্র, পোড়ামাটির জালকাঠি, অছিদ্র ও সছিদ্র চাকতি, চৌকা শীলমোহর, উনোনের ভাঙা অংশ, মুখাবয়ব, মনুষ্য দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভগ্নাংশ, শিলীভূত দাঁত ও হরিণের শিং, হারপুন, বুদ্ধমূর্তি এবং বৌদ্ধ-সংস্কৃতির নিদর্শন সমূহ পাওয়া যায়। অমসৃণ, মসৃণ এবং মসৃণতায় অত্যুজ্জ্বল· ঐ সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তুরাজি পর্যবেক্ষণ করে তিনি নিম্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন,—

"...প্রাগৈতিহাসিক, আদি-ঐতিহাসিক, মধ্য-ঐতিহাসিক যুগের অতি সমৃদ্ধ মৃৎশিল্পের পটভূমিতে একদা দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কুম্ভকার জাতির আবির্ভাব ঘটিয়াছে। ডিহর গ্রামের ক্ষয়িত

ঢিবিগুলি হইতে আবিষ্কৃত বিভিন্ন যুগের পটারি এবং কৌলালগুলি কোন এক বিশেষ নর-গোষ্ঠীর নয়। ভারতীয় এবং বহির্ভারতীয় মৃৎশিল্পীরা যে দক্ষিণ-রাঢ়ের কেন্দ্রভূমি ডিহর গ্রামে বিভিন্ন যুগে বসতি স্থাপন করিয়াছিল আবিষ্কৃত পটারি এবং কৌলালগুলি তাহারই পরিচায়ক। এইসব মৃৎশিল্পীদের মিলন-মিশ্রণে একদা দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কুম্ভকার জাতির উদ্ভব হইয়াছিল। রাঢ়-বঙ্গের মাটিতে কবে পেশাগতভাবে স্বতন্ত্র জাতিরূপে কুম্ভকারগণ পরিগণিত হইয়াছিলেন তাহা সঠিকভাবে বলা কঠিন।"[১]

"...ধর্মদাস খৃষ্টীয় একাদশ শতকে (বিদগ্ধ মুখমণ্ডন) নামক একটি হেঁয়ালি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে তিন রকমের ভাষার ব্যবহার হইয়াছে—সংস্কৃত, অপভ্রংশ এবং প্রাচীন বাংলা। এই পুস্তকেও কুমার জাতির উল্লেখ রহিয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ত্রিপিটক এবং ধর্মদাস কৃত বিদগ্ধ মুখমণ্ডনে কুমার জাতির উল্লেখ হইতে রাঢ়ীয় কুম্ভকার জাতির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হয়।"[২]

কুম্ভকার জাতির মৃৎশিল্প প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখেছেন,—

"প্রাগৈতিহাসিক, আদি-ঐতিহাসিক যুগের দক্ষিণ-রাঢ়ের কেন্দ্রভূমি ডিহর পরিমণ্ডলে বসবাসকারী কুম্ভকারদের সেই অত্যুজ্জ্বল মৃৎশিল্প আজ অবলুপ্ত। তাঁহাদের আদিম পূর্বপুরুষগণ যে অতুলনীয় বিদ্যার অধিকারী ছিলেন তাঁহাদের বংশধরগণ সে বিদ্যা বিস্মৃত হইয়াছেন। খনিজ দ্রব্য মিশ্রিত নানান্ রঙের মৃত্তিকা দিয়া তাঁহারা যে বণক (বর্ণক) তৈয়ারী করিয়া মৃৎশিল্পকে নানান্ রঙে রঞ্জিত করিতেন সে বিদ্যা তাঁহাদের বর্তমান বংশধরগণ ভুলিয়া গিয়াছেন।

রাঢ়ের আর পাঁচটি ক্ষয়িষ্ণু শিল্পীজাতির মতই কুম্ভকারগণও আজ হৃতসর্বস্ব, অনাহারক্লিষ্ট। তাঁহাদের সেই অতুলনীয় শিল্প গৌরবের ছিটে-ফোঁটা আজ মাত্র টিকিয়া আছে। বাঁকুড়া জেলার পাঁচমুড়া গ্রামের কুম্ভকারদের তৈয়ারী পোড়ামাটির হাতি, ঘোড়া, মনসার বারি—তাহার ক্ষীণ স্মৃতি রক্ষা করিয়া চলিতেছে। পাঁচমুড়ার মৃৎশিল্প আজ বিশ্বের বাজারে সমাদৃত।

কিন্তু যাহা ছিল, যাহা দিয়া বিশ্বের বাজার মাৎ করা যাইত, যাহা দ্বারা কুম্ভকার জাতির বেকার যুবকদের অন্ন সংস্থান হইত সে বিদ্যা আজ অন্তর্হিত।"[৩]

খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে লৌহ শিল্পের ব্যাপক প্রসার লাভের ফলে লোহার তৈজসপত্র এবং তৎপূর্বে তাম্রযুগে তামার নিত্যব্যবহার্য বস্তু উৎপাদনের ফলে মৃন্ময় তৈজসপত্রের চাহিদা নিম্নমুখী হতে শুরু করে দারুণভাবে। ফলে মৃৎপাত্র উৎপাদনে বীতস্পৃহা থেকে আসে শিল্পকর্মের আদব কলা-কৌশলের বিস্মৃতি। বর্তমানে উন্নতমানের বহু ধাতু এবং মিশ্রধাতুর বহুবিধ তৈজসপত্র ছাড়াও প্ল্যাস্টিক, ফাইবার, কাগজ ও পাতার থালা, বাটি, কাপ, গ্লাস প্রভৃতির ব্যাপক উৎপাদনে নাভিশ্বাস উঠেছে এই শিল্পের। ক্রমশঃ কোণ-ঠাসা হতে হতে বাজার সংকুচিত হয়ে হাতি-ঘোড়া জাতীয় শিল্প, শিল্প-নিদর্শনেই হয়েছে সীমাবদ্ধ। সেখানেও পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় বেঁচে থাকার লড়াই। প্রতিভার সুষ্ঠু বিকাশের সুযোগ কোথা! কথায় বলে,—

'অন্ন চিন্তা চমৎকারা
কালিদাস বুদ্ধিহারা।'

১, ২, ও ৩ রাঢ়ের জাতি ও কৃষ্টি (৩য় খণ্ড), পৃঃ—যথাক্রমে ১২৬, ১২৮ ও ১৩২

অধ্যায়-১২৫

শিল্প-সম্ভারে মল্লভূম তথা বাঁকুড়া

বিষ্ণুপুরের কুটিরশিল্পগুলি ও পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্পের কথা বিস্তারিতভাবে শুনিয়েছি ইতিমধ্যেই ; এখন জেলার কুটিরশিল্প এবং শিল্প-কারখানাগুলির দিকে দৃষ্টি ফেরাব আমরা।

শহর বাঁকুড়ার উত্তরে হাত বাড়ালেই বিকনা গ্রাম। মানে ৪/৫ কিলোমিটারের মধ্যেই রয়েছে বিকনা শিল্পডাঙা। ঢোকরা শিল্পের জন্য বিকনা বিখ্যাত। পিতল দিয়ে শিল্পসুষমামণ্ডিত বস্তুসামগ্রী প্রস্তুতকারী শিল্পীগণ ঢোকরা-শিল্পী নামে পরিচিত এবং শিল্পটি 'ঢোকরা' শিল্প নামে খ্যাত। চারদিক উন্মুক্ত আচ্ছাদিত আটচালা আদলের কর্মশালায় আগুনের তাপে পিতল গলিয়ে এখানের শিল্পী-সমাজ তৈরী করেন লক্ষ্মীর সাজ, প্রদীপ, ঘণ্টা, পিলসুজ, তেল ও শস্য মাপার জন্য পাই, কনা জাতীয় বিভিন্ন একক, হাতী-ঘোড়া, প্রজাপতি, ময়ুর, শামুক, কাঁকড়া, কুমীর, মাছ, ফুল, পাখি, অসুর-নাশিনী দশভুজা দুর্গা প্রভৃতি। হরেক রকমের ছোট আকারের এই সব মূর্তি ছাড়াও অর্ডারমাফিক বৃহদাকার দেব-দেবীর মূর্তিও তৈরী করেন এঁরা। মুখ্য উপাদান হিসেবে পিতল এবং সাহায্যকারী উপাদান হিসেবে মোম, ধুনা ; হাতিয়ার হিসেবে হাতুড়ি, ছেনি, সাঁড়াশি উল্লেখ্য। চাকচিক্যবিহীন অমসৃণ এই অভিনব শিল্পকর্মের পিছনে রয়েছে হাড়ভাঙা পরিশ্রম এবং শিল্পটিকে ভালবাসার নিখাদ আন্তরিকতা। 'সিরে পার্দ্যু' বা মোম গলানো পদ্ধতিতে নির্মিত এই শিল্প-কর্মে নিযুক্ত মাত্র গোটা দশবারো কর্মকার পরিবার এই শিল্প-সামগ্রী উৎপাদনের সময় কঠোর পরিশ্রমের উষ্ণতায় নিজেরাও গ'লে যান সহজদ্রাব্য মোমের মতই। বিনিময়ে কি পান এই শিল্পীগোষ্ঠী?

উঁচুদরের শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি—মানে শিল্প-বিলাসীদের শুকনো বাহবা এবং রাজ্যস্তরের পুরস্কার ছাড়াও গালভরা 'রাষ্ট্রপতি পুরস্কার' পর্যন্ত। এই যেমন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত ন্যুব্জদেহী যুদ্ধ কর্মকার। সারা জীবন অভাব অনটনের সাথে যুদ্ধ করতে করতে আজ যেন বড়ই ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন এবং জীবন-ভোর শিল্প সাধনার কথা ভাবতেই হর্ষ-বিষাদাচ্ছন্ন। দিল্লী গিয়ে বিরাট সম্মানীয় বড় শিল্পীরূপে রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নেওয়ার স্মৃতিতে পুলকিত, আবার 'অন্ন-চিন্তা চমৎকারা কালিদাস বুদ্ধিহারা'—এই নির্মম বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কেমন যেন বিষণ্ণ।

'অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌টস্ বোর্ড' শিল্পটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য কিছু উদ্যোগ নিয়েছিল। ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে 'ঢোকরা শিল্পী সমবায় সমিতি' গঠিত হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত চাহিদা না থাকার জন্য মৃত্যুর সাথে মরিয়া- হয়ে লড়তে লড়তে ঐতিহ্যমণ্ডিত এই শিল্পটি আজ হয়ে পড়েছে মৃতবৎ।

মল্লভূম তথা বাঁকুড়ার ঢোকরা শিল্পের পাশাপাশি আরো কয়েকটি কুটির শিল্পের প্রসঙ্গ এসে যায় স্বাভাবিকভাবেই। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরের চর্মকার বা মুচি সম্প্রদায়ের হাতে তৈরী বুট জুতো, চটি জুতো এবং চামড়ার ব্যাগ নাম কিনেছে ভালই। শুশুনিয়ার পাথর খোদাই করে নানা রকমের ঘর সাজানোর জিনিসপত্র, দেব-দেবীর মূর্তি এবং তৈজস পত্র জাতীয় দ্রব্যাদি তৈরী করে শুশুনিয়ার পাথর খোদাই শিল্পীগণ মন জয় করেছেন পর্যটকবৃন্দের। শাসপুরের ছুরি, কাঁচি, দা, বঁটি প্রভৃতি লৌহ ও ইস্পাত-জাত দ্রব্যের

জনপ্রিয়তা প্রায় সর্বজন-বিদিত। বাঁকুড়া শহরের লোকপুর ও কেন্দুয়াডিহি অঞ্চলের ভেড়িয়াল সম্প্রদায়ের উৎপাদিত কম্বল দামেও সস্তা এবং গুণগত মানেও বেশ উন্নত। কেঞ্জেকুড়া গ্রামের শিল্পীদের তৈরী বাঁশজাত বস্তুসামগ্রী অর্থাৎ বাঁশের থেকে তৈরী ঘরসাজানোর হরেক রকম শিল্প-সামগ্রী যেমন চিত্তাকর্ষক, তেমনি জনপ্রিয়। বাঁকুড়া, কাদাশোল, ঘুটগোড়িয়া ও শুশুনিয়ার বঁড়শি-শিল্প খুবই সমাদৃত। ঘুটগোড়িয়ার বঁড়শি মৎস্য শিকারীদের মন জয় করে শুধু স্বদেশে নয় বিদেশে গিয়েও মাছ ধরে। ফুলকুসুমা ও জগদল্লার কাষ্ঠ-খোদাই শিল্পীগণ জাতশিল্পীর মর্যাদা লাভ করেছেন তাঁদের নিপুণতার গুণে। এছাড়া জেলার প্রায় সর্বত্রই ছড়িয়ে রয়েছেন কাষ্ঠ-খোদাই শিল্পীগণ। দারু-বিগ্রহ, সুসজ্জিত কাঠের রথ ছাড়াও খাট, পালঙ্ক ড্রেসিংটেবিল জাতীয় নিত্য ব্যবহার্য এবং গৃহ-সজ্জার নানান উপকরণের উপর নয়নাভিরাম খোদাই কার্যের শিল্প-বৈভব রূপায়ণে এঁরা অনন্য, অসাধারণ। বিষ্ণুপুরের সাক্ষীগোপাল, গৌর-নিতাই এবং ষড়ভুজ দারুমূর্তিগুলি এই শিল্পের প্রাচীনত্বের জাজ্বল্য প্রমাণ। শিল্পোৎকর্ষের কথা তো বলাই বাহুল্য। পরিশেষে বলি বাঁকুড়ার বিড়ি শিল্পটি জেলায় কর্মসংস্থান রচনার ক্ষেত্রে বোধহয় রয়েছে প্রথম স্থানে। এ ছাড়া মল্লভূমের অন্যান্য কুটির শিল্পের কথা আমরা আলোচনা করেছি ইতিমধ্যেই। এবার কুটির শিল্পের পর্ণ কুটির ত্যাগ করে ঢুকে পড়বো বৃহৎ শিল্পের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে। বড় বা মাঝারি শিল্প মল্লভূমে সেরকম কিছু ছিল না বললেই চলে। **আধুনিক শিল্পের প্রাণ-স্বরূপ তথা জীয়নকাঠি হল বিদ্যুৎ ; এতাদৃশ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য বাঁকুড়া জেলার মেজিয়া অঞ্চলে চালু হয়েছে তিনটি ইউনিটের একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র**। এর ফলে এ জেলাতে শিল্প সম্প্রসারণের পথ সুগম হয়েছে। ইতিপূর্বেই ওন্দা থানার দেশবাঁধ অঞ্চলে **'সারদা ফার্টিলাইজার'** স্থাপিত হয়েছে। এটিই জেলার সর্বাধিক বড় শিল্পসংস্থা। অবশ্য বর্তমানে এটি বন্ধ আছে।

বিষ্ণুপুর শহরের পশ্চিমে যমুনাবাঁধ মৌজায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে **'রাহুল ফুড় প্রোডাক্টস্'** নামে একটি বিস্কুট কারখানা, মৃতপ্রায় কালিন্দী বাঁধের উত্তরে একটি **কার্বন উৎপাদন কারখানা** এবং গাঁতাত বাঁধের উত্তরে শ্যামসুন্দর পল্লীতে **'এক্সোডাস নীটওয়্যার্ প্রাইভেট লিমিটেড'** কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেঞ্জির থান ধোওয়া এবং নানান রঙে রঙ করার কাজ করে আসছে বেশ কয়েক বছর যাবৎ। এইসব রঙীন থান থেকেই তৈরী হয় নামী দামী সব কোম্পানীর গেঞ্জি।

আরো আনন্দের কথা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের **'ওয়েস্ট বেঙ্গল ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনফ্রাস্ট্রাক্চার ডেভেলপ্মেন্ট কর্পোরেশন'**-এর উদ্যোগে বিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে বিষ্ণুপুর শহরের উত্তরে বিড়াই এবং দ্বারকেশ্বর নদীর মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত দ্বারিকা অঞ্চলে গড়ে উঠেছে **'বিষ্ণুপুর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল্ গ্রোথ্ সেন্টার'**। এখানের **'হ্যামকো মাইনিং অ্যাণ্ড স্মেলটিং লিমিটেড'** কারখানাটি একটি সীসা উৎপাদন সংস্থা, **'ক্রেসেন্ট মানুফ্যাকচারিং প্রাইভেট লিমিটেড'** কারখানাটি সিমেন্ট উৎপাদন সংস্থা এবং এ অঞ্চলের **'মেগাসিটি সিমেন্ট'** কারখানাটি যে সিমেন্ট উৎপাদন সংস্থা তা তার নাম থেকেই পরিষ্কার। এছাড়া এখানে রয়েছে **'হাই কার্বণ ফেরো ক্রোম্'** (High Carbon Ferro Chrome) ধাতু উৎপাদনকারী **'শ্রীবাসবী ইণ্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড'** নামের একটি বড় মাপের কারখানা। শুনেছি কারখানাটির মালিকপক্ষ তেলেগু দেশমের (প্রদেশের) লোক। 'হাই কার্বণ ফেরো ক্রোম্' পদার্থটি উচ্চমানের ইস্পাত তৈরীর জন্য অপরিহার্য। এই কারখানার

উৎপাদিত পূর্বোক্ত বিশেষ পদার্থটির ক্রেতা ভারতের এবং বহির্ভারতের ইস্পাত কারখানা সমূহ। ১৯৯৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত এই ফ্যাক্টরীতে বর্তমানে সর্বসাকল্যে প্রায় সাড়ে তিনশত মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। আশার কথা উক্ত পদার্থটির অতিরিক্ত চাহিদা থাকায় এই শিল্পাঞ্চলে **'রোহিত ফেরো টেক্ লিমিটেড'** এবং **'শ্রীগায়ত্রী মিনারেলস্ প্রাইভেট লিমিটেড'** নামে আরো দুটি অনুরূপ সংস্থা তথা কারখানা চালু হওয়ার প্রস্তুতি চলছে প্রায় পুরোদমে। হতাশার কথা, চালু হওয়ার প্রায় দু-চার বছরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে গেছে কয়েকটি কারখানা। যেমন, আপাততঃ বন্ধ আছে রাহুল বিস্কুট কারখানা, কার্বণ ও সীসা উৎপাদন কারখানা এবং সারদা ফার্টিলাইজার। তথাপি পিছিয়ে পড়া বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমাতে শিল্পায়নের উদ্দেশ্যে 'বিষ্ণুপুর ইণ্ডাসট্রিয়্যাল গ্রোথ্ সেণ্টার' গড়ে তোলার শুভ প্রয়াসের জন্য এটির বাস্তব রূপদানে জড়িত সকল ব্যক্তিই ধন্যবাদার্হ।

এছাড়া জেলার বড়জোড়া থানাতে রয়েছে কয়েকটি কারখানা। বড়জোড়া থেকে মালিয়াড়াগামী রাস্তার বাম দিকে নীলকমল গোষ্ঠীর **'নীলকমল কারখানা'**তে প্ল্যাস্টিকের চেয়ার, টেবিল, টুল ইত্যাদি তৈরী হচ্ছে প্রায় ৩/৪ বছর যাবৎ। নীলকমলের কাছে পিঠেই রয়েছে বিড়লা গোষ্ঠীর **'বায়াক্স লিমিটেড'** কারখানা। বছর দশের পুরানো এই কারখানাটিতে পলিথিন-শীট তৈরী হয়। গঙ্গাজলঘাটি থানার মেজিয়ার কাছাকাছি দুর্লভপুর গ্রামে ডি. ভি. সি.-র একটি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে সে কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। প্রায় এক দশক বয়সের এই তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি **'মেজিয়া থার্মেল পাওয়ার্ প্ল্যাণ্ট'** নামে প্রসিদ্ধ। বড়জোড়া থানার আশুড়িয়া মোড়ের নিকটে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে নির্মিত **'কংসাবতী স্পিনিং মিল লিমিটেড'** কারখানাটি একটি সূতা উৎপাদন কেন্দ্র। বছর দশের পুরানো এই কারখানাটি জেলার গৌরব। এছাড়া বড়জোড়া থানাতে রয়েছে আরো কয়েকটি ছোটখাটো কারখানা। এগুলি বেকার সমস্যা-জর্জরিত বাঁকুড়া জেলায় কর্ম-সংস্থানের ক্ষেত্রে আশার দিশারী। এ প্রসঙ্গে পাঁচমুড়া গ্রামের **চীনামাটির পটারি কারখানাটির** কথাও স্মরণ করি আন্তরিকভাবে।

মল্লভূমের শিল্প-সম্ভার অধ্যায়ের ইতি ঘোষণা করে এখন এক ঝলকে দেখে নেবো মল্লভূম তথা বাঁকুড়ার বনজ ও খনিজ সম্পদ।

অধ্যায়-১২৬

মল্লভূম তথা বাঁকুড়ার বনজ ও খনিজ সম্পদ

একদা জঙ্গলমহল নামে খ্যাত মল্লরাজ্যে আজও জঙ্গলের প্রাচুর্য না থাকলেও অভাব নেই জঙ্গলের। ভারী বয়সের জীর্ণতাবশতঃ মাথার চুল যেমন পাতলা হয়ে যায় অনুরূপভাবে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে জঙ্গলমহল জেলার অবলুপ্তির পর দিনে দিনে মানব-সভ্যতার প্রসারলাভের সাথে সাথে নিত্য-নতুন গ্রাম, শহর গড়ে ওঠার ফলে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্যের চাহিদা মেটানোর জন্য ক্রমবর্ধমান কৃষিজমির চাহিদা পূরণের জন্য জঙ্গলের সীমা সংকুচিত হয়েছে ক্রমশঃ, আর নির্বিচারে গাছ কাটার ফলে গাছের ঘনত্ব হারিয়ে মল্লরাজ্য হয়ে গেছে টাকপড়া এবং চুল ওঠা মাথার মতো।

বর্তমানে "এ জেলার ভালো বনভূমির পরিমাণ ৭৫,১৮০ হেক্টারের বেশি নয়। শতাংশের হিসাবে তা এ জেলার মোট ভৌগোলিক এলাকার এগারো ভাগ মাত্র।"

(জেলার নাম বাঁকুড়া, পৃঃ-১২)। বনভূমির এই দুরবস্থা সত্ত্বেও জেলার অরণ্যজাত সম্পদের মধ্যে রয়েছে শাল, পিয়াশাল, সেগুন, গামার, ভুয়াস, পলাশ, বট, অশ্বত্থ, অর্জুন, আম, জাম, নিম প্রভৃতি উন্নত ও সাধারণ মানের কাষ্ঠসম্পদ। উন্নতমানের কাঠ দরজা, জানালা, খাট-পালঙ্ক, চেয়ার, টেবিল, ড্রেসিং-টেবিল আলমারি প্রভৃতি কার্যে ব্যবহৃত হয় এবং অতি সাধারণ নিম্নমানের কাঠ জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ঝরা পাতা পশুখাদ্য এবং জ্বালানির সুরাহা করে, আবার শালপাতা পাতার থালা, খালা ও প্লেট তৈরীর কাজে লাগে। লাক্ষা, মধু, মোম, ধুনো প্রভৃতি অরণ্যসম্পদের পাশাপাশি হরিতকী, বহেড়া, আমলকী, বেল প্রভৃতি হল আয়ুর্বেদিক ওষুধের প্রত্যক্ষ উপাদান। ঠিক অরণ্যজাত না হলেও জনবসতির আশেপাশে গজিয়ে ওঠা তাল গাছের তাল রসের পাটালি এবং খেজুর গাছের রস থেকে নলেন গুড় ও খেজুর পাটালি জেলায় অর্থাগমের পথ সুগম করেছে। কেন্দ, পিয়াল, ভুড়ুর, বৈঁচি, বন-খেজুর এ অঞ্চলের অরণ্যজাত ফল হিসেবে উল্লেখ্য।

'বাঁকুড়া জেলার ভূ-প্রকৃতি ও সপুষ্পক বনজ উদ্ভিদ' নিবন্ধে ডঃ মণীন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়ের বক্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন, "বনের বৃক্ষ আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির পথ সুগম করেছে। এই জেলায় বেশ কয়েক বছর ধরে আকাশমণি এবং ইউকালিপ্‌টাস বৃক্ষের ব্যাপক হারে চাষ হচ্ছে। এই দুটি গাছ এবং ঘোড়া-নিম গাছের কাণ্ড থেকে কাগজের মণ্ড তৈরী হয়। দেশলাই কাঠি হচ্ছে ছাতিম, ঘোড়ানিম ও শিমুলবৃক্ষের কাণ্ড থেকে। বাবলা ভুয়াস থেকে গরুর গাড়ীর চাকা, পিয়াল কাঠে চাষের জোয়াল এবং বহেরা ও শিমুল থেকে ভালজাতের প্লাই উড তৈরী হচ্ছে। কুসুম, কুল ও পলাশ গাছে লাক্ষার চাষ হয় জেলার বিভিন্ন অংশে। বনের ছোট নদীর দুপাশে করোঞ্জ বৃক্ষ। কুসুম, করোঞ্জ ও মহুয়ার বীজ থেকে তৈরী হয় তেল। চল্‌তা কাঠ থেকে তৈরী হচ্ছে পাটের সুতো জড়িয়ে রাখার ববিন বা কাটিম; এগুলি চটকলে সরবরাহ করা হয়। শাল গাছ থেকে পাওয়া যায় ধুনো। কেন্দ গাছের অপরিণত শাখার পাতা বিড়ি তৈরীর জন্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ঘোড়ানিম, ছাতিম ও শিমুলের কাঠ থেকে তৈরী প্যাকিং বাক্সের বাজারে বিশেষ চাহিদা আছে। ....

এই জেলা থেকে বহু প্রয়োজনীয় ভেষজ উদ্ভিদ সংগৃহীত হয়েছে। ভেষজ উদ্ভিদ যেমন বিভিন্ন জঙ্গলে ছড়িয়ে আছে, তেমনি আছে লোকালয়ে, নদীর ধারে ধারে উন্মুক্ত মাঠে এবং শস্যক্ষেতে। এছাড়া কিছু জলজ উদ্ভিদ থেকেও ভেষজ তৈরী হয়। বাঁকুড়ার জঙ্গল থেকে ভেষজ উদ্ভিদের শতাধিক প্রজাতি সংগৃহীত হয়েছে। বেশ কিছু উদ্ভিদ নিয়ে গবেষণাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে এবং প্রয়োজনীয় ওষুধও তৈরী হচ্ছে সেই সঙ্গে।" এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরমূল, অনন্তমূল, শতমূলী, শালপানি, সোমরাজ, আলকুশি, ওকরা, কুঁচ, দাদমারী, গোরাচাঁদ, জটাকাঁসিরা, প্রভৃতির নাম স্মরণ করা যেতে পারে।

সোনামুখী, বড়জোড়া, গঙ্গাজলঘাটি, ওন্দা, রাণীবাঁধ, খাতড়া, সিমলাপাল, ঝিলিমিলি, মুকুটমণিপুর, তালডাঙরা, বিষ্ণুপুর, জয়পুর, তাঁতীপুকুর, বাসুদেবপুর, পিয়ালডোবা, গামারবনী প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে জেলার ৭৫,১৮০ হেক্টর বিস্তীর্ণ বনভূমি। আগে এসব জঙ্গলে দাপিয়ে বেড়াত বাঘ, ভালুক, হাতির দল। এখন ভালুক না থাকলেও নেকড়েবাঘ, হুড়ার, দু-চারটে বাঘ, শিয়াল, বনশুয়োর, অসংখ্য বানর এবং ছোটনাগপুরের জঙ্গল থেকে দলছুট হাতির দল রাণীবাঁধ, বিষ্ণুপুর, সোনামুখীসহ বাঁকুড়া জেলার জঙ্গলে দাপিয়ে বেড়ায় হামেশা। শশক, হরিণ জাতীয় ভীরু জন্তুর পাশাপাশি ময়ূর,

কোকিল, টিয়া, কাঠঠোকরা, পায়রা, ঘুঘু, চিল, শকুন, টুনটুনি, বুলবুল, শালিক এবং শীতকালে মরশুমী পাখির ঝাঁক আসর জমায় এখানে। এছাড়া শুশুনিয়া পাহাড়ের শঙ্খচূড় থেকে গোখরা, চিতি, অজগর, ময়াল প্রভৃতি বিষাক্ত সর্পকূল ছাড়াও কাঁকড়াবিছা, নুঙুস এ অরণ্যের অধিবাসী। হিংস্র জন্তু জানোয়ার এবং বিষাক্ত সরীসৃপকুল আমাদের কাছে জীবন্ত-বিভাষিকা রূপে প্রতিভাত হলেও এরাই অরণ্যের অলঙ্কার; বিশেষ অর্থে অরণ্য-সম্পদ। মল্লভূমের বনজ সম্পদের কথায় বিরতি বসিয়ে এবার আসা যাক মল্লরাজ্যের খনিজ সম্পদের কথায়।

মল্লভূম তথা বাঁকুড়া যথার্থই রত্নগর্ভা। **বাঁকুড়ার মতো খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ জেলা সারা পশ্চিমবঙ্গে আর নজরে পড়ে না বিশেষ**। বাঁকুড়া খৃষ্টান কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক মাননীয় লীলাময় মুখোপাধ্যায় তাঁর 'জেলার নাম বাঁকুড়া' গ্রন্থে এ জেলার খনিজ-সম্পদ সম্পর্কে যা লিখেছেন তার নির্যাসটুকু শোনাব সংক্ষেপে।

এ জেলার মেজিয়া, শালতোড়া, কালিদাসপুর, অর্ধগ্রাম, বড়জোড়া প্রভৃতি অঞ্চলে কোথাও বা অল্প পরিমাণে ; কোথাও বা পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে 'Black Diamond' নামে সমাদৃত **কয়লা**।

মুকুটমণিপুর, খাতড়া, সারেঙ্গা, নীলগিরি, নারায়ণপুর, দামদি প্রভৃতি স্থানে তামার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। "কংসাবতী জলাধার থেকে শুরু করে টানা প্রায় দুই কিলোমিটার পর্যন্ত চ্যুতিগ্রস্থ সিল্ট ও গ্র্যানাইটের মধ্যে তামাযুক্ত খনিজের শিরা অনেকেই লক্ষ্য করেছেন। ছেঁদাপাথর অঞ্চলেও সোনালী রঙের চ্যাঙ্কো—পাইরাইটের দেখা মেলে। ভূবিদ্‌দের মতে এই এলাকায় তামার অস্তিত্বের এটা প্রমাণ।" **তমা** ছাড়া **সীসা** এবং **দস্তার** লক্ষণও এখানে বিদ্যমান।

বৈদ্যুতিক বাল্বের ফিলামেণ্ট তৈরী এবং রকেট, ট্যাঙ্ক, কামান ও মিসাইল তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উন্নতমানের ইস্পাত উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত **টাংস্টেন** নামক মহার্ঘ বিরল ধাতুটি বাঁকুড়া জেলার ছেঁদাপাথর, পোড়াপাহাড়, থানপাহাড়, চেরাডুংরী, পূর্ণপাণি, ধুজুড়ি ও ঘাটুশোল অঞ্চলে সঞ্চিত রয়েছে সুনিশ্চিতভাবে।

কংসাবতী, কুমারী নদী ছাড়াও জেলার কয়েকটি নালার বালির মধ্যে সোনার সন্ধান মেলে। নদীর বালি থেকে এখানের আদিবাসী স্বর্ণসন্ধানী মানুষেরা সোনা খুঁজে রুজিরোজগার করে থাকেন। **ভি. বল** (V. Ball) নামক জনৈক ভূতত্ত্ববিদ এখানের নদী-নালার মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সোনার দানার অস্তিত্ব স্বীকার করেছেন।

উচ্চ তাপ শোষণকারী **কায়ানাইট** নামক আর একটি বিরল প্রজাতির ধাতু মুকুটমণিপুরের কাছাকাছি বলরামপুরে ছড়িয়ে রয়েছে প্রায় ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ অঞ্চল জুড়ে। উচ্চ তাপ উৎপাদনকারী চুল্লী নির্মাণের কাজে এই খনিজ পদার্থটি অপরিহার্য।

কাগজ, সাদা রং, রাবার এবং পোর্সেলিনের তৈরী কাপ-ডিস, বাসনপত্র, মূর্তি, টালি প্রভৃতি তৈরীর কাজে ব্যবহৃত **কেওলিন** বা **চীনামাটি** বাঁকুড়ার জলহরি পাহাড়, ধাতারা, মালতি ও ঠাকুরডুংরীতে প্রচুর পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। তালডাংরা থানার অনেক জায়গাতেই খুবই উন্নতমানের চীনামাটি পাওয়া যায় যথেষ্ট পরিমাণে।

বাঁকুড়া সদর, গঙ্গাজলঘাটি, ছাতনা, ইন্দপুর, খাতড়া, ঝিলিমিলি প্রভৃতি স্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণে না হলেও শ্বেতশুভ্র অভ্র সঞ্চিত রয়েছে ভূস্তরে।

অভ্রের সমপর্যায়ের খনিজ পদার্থ **বায়োটাইট**-এর বিকার ঘটিয়ে যে **ভারমিকিউলাইট**

পদার্থ পাওয়া যায় তা থেকে ধাতু-চুল্লীর জন্য প্রয়োজনীয় খুব হাল্কা ইট, এর তাপ-নিরোধক ক্ষমতার জন্য রেফ্রিজারেটর এবং শব্দ-নিরোধক ক্ষমতার জন্য শব্দ-নিরোধক ঘর-বাড়ি তৈরীর কাজে প্রয়োজনীয় সিমেন্ট উৎপাদনের জন্য ভারমিকিউলাইট ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের কার্যে বহুল ব্যবহারের জন্য এই খনিজ পদার্থটির চাহিদা এখন বিশ্বজুড়ে। প্রখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ **অমল শঙ্করলাল হাণ্ডে** বাঁকুড়া জেলায় ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা চালিয়ে করণজোড়া, ইটাডাংরা, গৌরাংডিহি, মানকানালি এবং খাতড়ার নিকট দাঁতকিগোড়ায় এই খনিজ পদার্থের অস্তিত্বকে সুনিশ্চিত করেছেন।

পৃথিবীর সমস্ত খনিজ পদার্থের মধ্যে সবচেয়ে মোলায়েম, মসৃণ, হালকা, নরম এবং স্পর্শসুখ-জনিত আনন্দ-বিধায়ক খনিজাত বস্তুটির নাম **ট্যাল্ক** (Talc)। ট্যাল্ক থেকেই ট্যাল্কম্ পাউডার এবং খোদাইকার্য সমন্বিত চিত্তাকর্ষক বস্তুরাজিও প্রস্তুত করা যায়। এতাদৃশ একটি মূল্যবান খনিজ পদার্থের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয় বাঁকুড়ার মটগোদা ও রুদ্র গ্রামাঞ্চলে।

এছাড়া পাকা-রাস্তা ও পাকা-ঘরবাড়ি তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় **কালো পাথর (Black Stone)** পাওয়া যায় শালতোড়া অঞ্চলে।

কিন্তু দুঃখ ও অনুতাপের বিষয় উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়াতে এসব খনিজ পদার্থের অস্তিত্ব সত্ত্বেও এগুলিকে কাজে লাগিয়ে বাঁকুড়া জেলায় শিল্পায়নের সম্ভাবনাটি আজও অচেতনতায় আচ্ছন্ন, বুঝিবা গভীর নিদ্রামগ্ন।

কথায় কথায় শালবাগান মহল্লা ত্যাগ করে আমরা এখন এসে গেছি গোপেশ্বর পল্লীতে। গোপেশ্বর পল্লী থেকে আমরা এগিয়ে যাব শহরের অফিস-পাড়া তথা বৈলাপাড়ার দিকে। চলার পথে প্রথমেই আলোকপাত করব মল্লভূমের অবস্থান, আবহাওয়া, ঋতুবৈচিত্র্য, ভূ-প্রকৃতি ও নদ-নদী বিষয়ে।

অধ্যায় - ১২৭

বাঁকুড়া তথা মল্লভূমের অবস্থান, আবহাওয়া, ঋতুবৈচিত্র্য, ভূ-প্রকৃতি ও নদনদী

উত্তর গোলার্ধের ২২°৩৮´ ও ২৩°৩৮´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৬°৩৬´ ও ৮৭°৪৫´ পূর্ব দ্রাঘিমা রেখার মধ্যস্থলে অবস্থিত অতীতের মল্লরাজ্য এবং বর্তমান বাঁকুড়া জেলার মোট আয়তন ৬৮৮২ বর্গ কিলোমিটার। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আকৃতির এই জেলার পূর্বে হুগলী, উত্তর-পূর্বে বর্ধমান, দক্ষিণে পশ্চিম-মেদিনীপুর এবং পশ্চিমে পুরুলিয়া জেলা অবস্থিত। জেলার উত্তর প্রান্তে প্রবাহিত দামোদর নদ বর্ধমান ও বাঁকুড়াকে পৃথক করে রেখেছে। ***প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিচারে জেলাটিকে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়—পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল।*** **বিষ্ণুপুর মহকুমা তথা জেলার পূর্বাঞ্চল পলিমাটি সমৃদ্ধ কৃষিকার্যোপযোগী সমতল ভূমি। পক্ষান্তরে বাঁকুড়া সদর মহকুমা এবং খাতড়া মহকুমা নিয়ে গঠিত পশ্চিমাঞ্চল অসমতল। লাল ও কাঁকুরে মাটিতে পরিপূর্ণ। ছোট বড় টিলা এবং অসংলগ্ন পাহাড়ে সুসমৃদ্ধ। ছোটনাগপুরের মালভূমি অঞ্চলের প্রত্যন্ত অঞ্চল হল পশ্চিম বাঁকুড়া। জেলার দুটি উল্লেখযোগ্য পাহাড়ের মধ্যে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে বিহারীনাথের উচ্চতা ৪৪৭·৭৫ মিটার এবং**

শুশুনিয়া পাহাড়ের উচ্চতা ৪৩৯·৫২ মিটার। জেলার দক্ষিণে প্রবাহিত কংসাবতী নদীর অববাহিকায় বিস্তৃত পাহাড়গুলি সুউচ্চ না হলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অনুপম। সামগ্রিক বিচারে পলিমাটি সমৃদ্ধ বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি, লাল-কাঁকুরে মাটির রক্তিম আভায় উদ্ভাসিত অসমতল ভূভাগ, এবড়ো খেবড়ো ভূখণ্ডের উপর ছোট-খাটো টিলা, অসংলগ্নভাবে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা পাহাড় ও পাথুরে জমির প্রাচুর্যে এক মিশ্র সৌন্দর্যের অভিব্যক্তি ঘটেছে এখানে। ঝিলিমিলি, রাণীবাঁধ, সোনামুখী, জয়পুর, বাসুদেবপুরের জঙ্গলে যে অনুপম অরণ্যশ্রী প্রতিবিম্বিত হয়েছে তাতে যে কোন প্রকৃতি-প্রেমিক মানুষ মধুপানে বিভোর ভ্রমরের মতোই আত্মবিস্মৃত হয়ে থাকতে পারেন অনায়াসে।

উষ্ণ, শুষ্ক, রুক্ষ এই জেলায় গ্রীষ্মকালে ভয়ঙ্কর গরম, বর্ষাতে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত, শরতে বাতাসের হিন্দোলে নৃত্যরত কাশফুলের হাতছানিতে দেবী-আহ্বান এবং শিউলি-বিছানো প্রাঙ্গণে দেবীবরণ, হেমন্তের হিম-ঝরা হিমেল বাতাসে স্বল্পস্থায়ী শীতের আগমন-বার্তা ঘোষণা, শীতে হাড়-কাঁপানো ঠাণ্ডার হুমকি এবং বসন্তে শাল, শিমূল, পলাশ, অশোক, আঁকড় প্রভৃতি ফুলে ফুলে বিকশিত, মলয় সমীরণের সৌরভে সুরভিত প্রাকৃতিক পরিবেশে বৃক্ষশাখে লুকিয়ে থাকা অলিকুলের গুঞ্জনে এবং কোকিলের কুহু ধ্বনিতে মুখরিত মল্লরাজ্য তথা বাঁকুড়া যেন বছরে বছরে হয়ে ওঠে নৈসর্গিক সৌন্দর্যের প্রাণবন্ত প্রতিমূর্তি। বসন্তের শেষে নব-পল্লবে সুশোভিত বৃক্ষরাজি এবং লতাগুল্মসহ বনমর্মর নব সাজে সজ্জিত হয়ে বর্ষ-বরণের জন্য যেন ফুলে ফুলে বরণডালা সাজিয়ে প্রতীক্ষা করে অধীর আগ্রহে।

নদীমাতৃক দেশ ভারতের একটি ক্ষুদ্র অঙ্গরাজ্যের খরাকবলিত ক্ষুদ্র এই জেলাটিও নদীমাতৃক। বিহারের হাজারীবাগ জেলার শৈলমালা থেকে উদ্ভূত **দামোদর নদ** বাঁকুড়ার উত্তর প্রান্ত বরাবর প্রবাহিত হয়ে ঢুকে পড়েছে বর্ধমান জেলায়। পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর থানার পাহাড়ী এলাকা থেকে উদ্ভূত ধলকিশোর নদ ও দুধভিরিয়া নদী পরস্পর মিলিত হয়ে পুরুলিয়ার পূর্ব প্রান্তে **দ্বারকেশ্বর নদ** নামে অভিহিত হয়ে বাঁকুড়া জেলার ছাতনা থানার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছে বাঁকুড়ায়। পরে বাঁকুড়া শহরের দক্ষিণে এবং বিষ্ণুপুর, জয়পুর ও কোতুলপুরের উত্তরে প্রবাহিত হয়ে ঢুকে পড়েছে হুগলী জেলার আরামবাগ শহরে। মধ্যযুগের ধর্মমঙ্গল কাব্যের বহু স্থানে উল্লিখিত সুপ্রাচীন এই দ্বারকেশ্বর নদের দু-পাশেই গড়ে উঠেছে বহু দেব-মন্দির। এর মধ্যে বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর, বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর, ডিহরের ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর এবং নাড়িচার সর্বমঙ্গলার মাড়ো বিশেষভাবে উল্লেখ্য। শুশুনিয়া পাহাড়ের উত্তর-পশ্চিমাংশে জন্ম লাভ করে **গন্ধেশ্বরী** ছাতনা ও বাঁকুড়া শহরের পাশ দিয়ে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার পথ হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পড়ে বাঁকুড়া শহরের নিকটবর্তী বাঁকীগ্রামে এসে গা ভাসিয়ে দিয়েছে দ্বারকেশ্বরের ক্রোড়ে। দ্বারকেশ্বরের প্রধান উপনদী গন্ধেশ্বরী বাঁকুড়ার বড় আদরের নিজস্ব নদী। অনুরূপভাবে দ্বারকেশ্বর নদের আর একটি উপনদী বিড়াই-এর জন্মস্থান বাঁকুড়ার ওন্দা থানার রতনপুর অঞ্চলের বহড়াবাঁধ ও বালিগুমা গ্রাম এবং কল্যাণী অঞ্চলের হয়্যাখী গ্রাম সংলগ্ন বনাঞ্চলের নিম্নভূমি। নদীটির প্রকৃত নাম 'বেত্রাবতী'। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বেত্রাবতীর উল্লেখ আছে। বেত্রাবতী অপভ্রংশে হয়েছে ব্রীড়াবতী। ব্রীড়াবতী হয়েছে বিড়াই। বড় আদরের এই ব্রীড়াবতী বা বিড়াই বিষ্ণুপুরের রাজকাহিনীর সাথে জড়িত এক প্রিয় নদী। বিষ্ণুপুরের উত্তরে প্রবাহিত হয়ে বিষ্ণুপুর শহরকে ছুঁই ছুঁই করে প্রায় ত্রিশ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে চাকদহ

গ্রাম পেরিয়ে মধুবন গ্রামের সন্নিকটে ব্রীড়াবতী নদী দ্বারকেশ্বর নদের সাথে মহানন্দে মিলিত হয়েছে।

দ্বারকেশ্বরের আর একটি প্রধান উপনদী **শিলাবতী** বা **শিলাই** পুরুলিয়ার পুঞ্চা থানার ন'পাড়া মাগুরিয়া গ্রামের কাছে আত্মপ্রকাশ করে বাঁকুড়ার ইন্দপুর থানার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে প্রায় ৫০/৫৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে দ্বারকেশ্বরের সঙ্গে মিলিত হয়েছে মেদিনীপুর জেলায়। মেদিনীপুরে দ্বারকেশ্বর নাম বদলে নাম নিয়েছে রূপনারায়ণ। **কাঁসাচোরা**, ইন্দপুরের **অড়কষা** এবং পুরুলিয়ার জয়চণ্ডীপুরের **ডাংরা**—এই তিনটি জলধারাও বাঁকুড়া জেলায় দ্বারকেশ্বরের সাথে মিলিত হয়ে দ্বারকেশ্বর নদকে করেছে সমৃদ্ধ।

ইন্দপুর থানার চৈতন্যডিহি থেকে জাত **জয়পণ্ডা**, ওন্দা থানার পাশ দিয়ে তালডাংরা ও সিমলাপালের মধ্য দিয়ে প্রায় ৪৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ভূতসহরের কাছে শিলাবতীর সাথে মিলিত হয়েছে পরমানন্দে। **জয়পণ্ডার** মতই **পুরন্দর** এবং **চম্পাখালি** নামক অপর দুটি নাতিদীর্ঘ উপনদী শিলাবতীর সাথে অঙ্গীভূত হয়েছে বাঁকুড়াতেই।

জেলার আর একটি উল্লেখযোগ্য নদী **কংসাবতী** বা **কাঁসাই**। পুরুলিয়ার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত ঝালদা থানার জাবর পাহাড়ে কংসাবতীর জন্ম। পুরুলিয়া জেলায় সুদীর্ঘ পথ পায়ে মাড়িয়ে বাঁকুড়া জেলার খাতড়া ও রায়পুর থানার ভিতর দিয়ে কংসাবতী অবশেষে প্রবেশ করেছে মেদিনীপুর জেলায়। পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড় থেকে আগত **কুমারী নদী** বাঁকুড়া জেলার অম্বিকানগরের কাছে কংসাবতীর ক্রোড়ে আশ্রয় নিয়েছে। রায়পুর থানার দক্ষিণ-পূর্বে **ভৈরববাঁকীর** জন্ম। বাঁকুড়া জেলাতে প্রায় ৩২ কিলোমটার পথ পরিভ্রমণ করে আনমনা এই নদীটি মেদিনীপুর জেলায় কংসাবতীর সাথে হয়ে গেছে একাত্মা। পক্ষান্তরে কংসাবতীর অপর উপনদী **তারাফেণী** মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়ার রায়পুর থানার প্রায় ৮/৯ কিলোমিটার অঞ্চলে ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে গিয়ে ফিরে এসেছে মেদিনীপুরে—তার জন্মস্থানে।

মা সারদার সাধের **আমোদর নদ** জয়পুর থানার সমুদ্র বাঁধ ঢোল সমুদ্র থেকে জন্মলাভ করে আঁকাবাঁকা পথে যেন চলেছে তীর্থ ভ্রমণে। দেশড়া ও জয়রামবাটীর মধ্য দিয়ে চলার পথে মা সারদার পদধূলি সর্বাঙ্গে মেখে কোতুলপুর থানার হলদি গ্রামের কাছে বাঁকুড়া ছেড়ে প্রায় ২৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে ঢুকে পড়েছে পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমায়। আরামবাগ সংলগ্ন কালীপুরের অনতিদূরে কয়েক কিলোমিটার দক্ষিণে আমোদর দ্বারকেশ্বরের সাথে মিলিত হয়েছে।

জেলার আর একটি স্মরণীয় নদী হল **শালি নদী**। গঙ্গালজলঘাটি থানার কেশিয়াড়া মৌজা থেকে উদ্ভূত এই নদীটি প্রবাহিত হয়ে ঢুকে পড়েছে সোনামুখী থানাতে। দীর্ঘপথ পরিক্রমা করে অবশেষে এটি দামোদরের শাখা নদী **বোদাই**-এর সাথে একাত্মা হয়েছে হদলনারায়ণ পুরের কাছাকাছি। **বোদাই** শাখানদীটিও জেলার একটি জলধারা। শালি এবং বোদাই পুনরায় পাত্রসায়ের থানাতে মিলিত হয়েছে দামোদরের সাথে।

এসব নদনদী, উপনদী ছাড়াও বাঁকুড়া তথা মল্লভূমে রয়েছে অনেক খাল-বিল, বাঁধ ও পুষ্করিণী। এগুলি তাদের কুলুকুলু কলতানে অবিরতভাবে গেয়ে চলেছে জেলার জয়গান। আর এদের দুগ্ধসম অমৃতধারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সন্তানসম বাঁকুড়া তথা মল্লভূমকে মমতাময়ী মাতৃস্নেহে যোগিয়েছে পুষ্টি, করেছে সরস ও শস্য-শ্যামলা।

মল্লভূমের ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়া, ঋতুবৈচিত্র্য, ভূ-প্রকৃতি ও নদ-নদীর কথার পর এখন খুবই সংক্ষেপে শোনাব জেলার প্রায় যাবতীয় উল্লেখযোগ্য তথ্য।

অধ্যায় - ১২৮

অতীতের মল্লভূম তথা বর্তমান বাঁকুড়া জেলার প্রায় যাবতীয় তথ্য

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জাত 'ব' আকৃতির বাঁকুড়া জেলার আয়তন ৬৮৮২ বর্গ কিমি., বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৪৩০ মিমি., গড় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৪৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস; গড় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ০৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ১৯৯১-এর জনগণনা অনুসারে জেলার জনসংখ্যা ৩১,৯১,৮৩০ জন, স্ত্রী-পুরুষের অনুপাত যথাক্রমে ৪৮·৭৫ শতাংশ ও ৫১·২৫ শতাংশ। তফসিলি সম্প্রদায় ৮,৩২,৪৬৮ জন, আদিবাসী সম্প্রদায় ২,৮৮,৬০৩ জন এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিমিতে ৪০৮ জন। শহর ও গ্রামে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত যথাক্রমে ৮·২৯ ও ৯১·৭১, সাক্ষরতার হার ৭২·৯৫ শতাংশ। প্রশাসনিক কাঠামোতে রয়েছে বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও খাতড়া এই তিনটি মহকুমা এবং ২২টি পঞ্চায়েত সমিতি—বাঁকুড়া ৮, খাতড়া ৮, বিষ্ণুপুর ৬, মোট ২২টি। পৌর প্রতিষ্ঠান তিনটি—বাঁকুড়া পৌরসভা, বিষ্ণুপুর পৌরসভা, সোনামুখী পৌরসভা। শহর রয়েছে সাতটি—বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর, সোনামুখী, খাতড়া, পাত্রসায়ের, বড়জোড়া এবং বেলিয়াতোড়। থানা আছে ২০টি। মোট গ্রামের সংখ্যা ৫১৮৭টি, এর মধ্যে জনবসতি-পূর্ণ গ্রামের সংখ্যা ৩৫৬৫টি, গ্রাম-পঞ্চায়েত ১৯০টি এবং মৌজা ৩৮২৬টি। বিদ্যুৎতাড়িত মৌজা ২৪০৭টি। মোট বনভূমির পরিমাণ ১০৫৫ বর্গ কিমি., মোট চাষাবাদ যোগ্য জমি ১২৫৯ বর্গ কিমি.। জেলায় রয়েছে ৩৪৬২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১১৩টি জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয়, ২১৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১০২টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ৩টি উচ্চ মাদ্রাসা, ১২টি মহাবিদ্যালয়, ২টি কারিগরি মহাবিদ্যালয়, ২টি ইঞ্জিনীয়ারিং ডিগ্রি কলেজ, ৪টি কমিউনিটি পলিটেকনিক, ১টি পলিটেকনিক ডিপ্লোমা কলেজ, ১৩০টি গ্রন্থাগার, ২২১টি শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ১টি। হাসপাতাল, ডিসপেনসারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ক্লিনিক সব মিলিয়ে মোট ৬৯৬টি, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র ৫১৩টি এবং কুষ্ঠনিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র রয়েছে ৭টি। পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে রাস্তার দৈর্ঘ্য ৬৯১৮ কিমি., বাসরুটের সংখ্যা ১৫১টি, ফেরি সার্ভিস ৩৭টি, রেলপথের দৈর্ঘ্য ৭০ কিমি., রেজিষ্ট্রীকৃত মোটর পরিবহনের সংখ্যা ২৩৫২৪টি, মোট পি. সি. ও ১৩৫, সর্বমোট পোষ্ট অফিসের সংখ্যা হল ৪৭৭টি। শিল্পের ক্ষেত্রে দেখা যায় ৫টি বৃহৎ শিল্প, ৪টি মাঝারি শিল্প এবং ৪৭১১টি ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের অস্তিত্ব। আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে রয়েছে ৯৬টি কমার্শিয়াল ব্যাংক, ৬৯টি গ্রামীণ ব্যাংক, ১৫টি সমবায় ব্যাংক, ১টি ভূমি উন্নয়ন ব্যাংক ও ১টি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য অর্থ নিগমের কার্যালয়। সমাজ কল্যাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্মরণের মণিকোঠায় উঁকি মারে ১টি অনাথ আশ্রম, ২২টি আই. সি. ডি. এস. প্রোজেক্ট, ১৩৬৮টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র, ১টি কুষ্ঠ রোগী পুনর্বাসন কেন্দ্র, ১টি মূক ও বধির বিদ্যালয় এবং ১টি অন্ধ বিদ্যালয়।

৪২ জন নির্বাচিত সদস্য নিয়ে গঠিত একটি জেলাপরিষদ, ৩টি লোকসভা কেন্দ্র, ১৩টি বিধানসভা কেন্দ্র জেলার জনগণশাসনের মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ্য। সুবিচারের আশায় জেলার মানুষ বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও খাতড়ার দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন। এছাড়া জেলাবাসীর সুখ-সমৃদ্ধির জন্য জেলাতে রয়েছে হাট-বাজার, কৃষি ও সেচ, ভূমি এবং ভূমি সংস্কার, মৎস্য চাষ, প্রাণীসম্পদ বিষয়ক সংস্থা ও বহু সমবায় সংস্থা। কৃষি সংক্রান্ত পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে আমাদের নজর কাড়ে ১টি রাজ্য

বীজ ফার্ম, ১টি জেলা বীজ ফার্ম, ৫টি ব্লক বীজ ফার্ম, শালতোড়া ও রাণীবাঁধে ১টি করে দুটি কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, ৭১টি বীজ ফার্ম, জয়রামবাটীর আদর্শ ফার্ম, ২৩টি হিমঘর এবং ২টি খাদ্য সংরক্ষণ ইউনিট। প্রাণীসম্পদ বিষয়ক রাজ্য প্রাণীস্বাস্থ্য কেন্দ্র ৫টি, ব্লক প্রাণীস্বাস্থ্য কেন্দ্র ২২টি, অতিরিক্ত ব্লক প্রাণীস্বাস্থ্য কেন্দ্র ১৬টি, গো-খাদ্য ফার্ম ১টি, দুগ্ধ সমবায় কেন্দ্র ২টি, চিলিং প্ল্যান্ট ৩টি এবং কেন্দ্রীয় গো-বীজ সংগ্রহ কেন্দ্র ৩টি স্মরণীয়। সমবায় সংস্থাগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় সমবায় ৭টি, মার্কেটিং সমবায় ১৪টি, পি. এ. সি. এস. ২৯০টি, ল্যাম্প ১৮টি, পরিবহন সমবায় ১২৫৯টি, আবাসন সমবায় ২৯টি, শিল্প সমবায় ১৪৯টি, দুগ্ধ এবং মুরগী পালন সমবায় ৪০টি, শ্রমিক সমবায় ৯৩টি, মহিলা সমবায় ২টি জেলাবাসীর মঙ্গল বিধানে ব্রতী রয়েছে। উক্ত সমবায়গুলির মোট কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ১৫,৭৯,৬৮০ টাকা।

এবার আসি মল্লভূমের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির খেতাবী নাম প্রসঙ্গে। এঁদের মধ্যে মহারাজ বীর হাম্বীর হলেন 'চৈতন্যদাস', শঙ্কর চক্রবর্তী 'কবিচন্দ্র' এবং 'বীরবৌলীভূষণ', অক্ষয় কুমার সেন 'শাঁকচুন্নী', অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'সঙ্গীত কেশরী', যদু ভট্ট 'তানরাজ', গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 'স্বর-সরস্বতী', গোবিন্দ প্রসাদ সিংহ 'বাঁকুড়ার গান্ধী', সত্যরাণী হালদার 'বাঁকুড়ার মাতঙ্গিনী' প্রভৃতি। জেলার কুটির শিল্প এবং বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের কথা ইতিপূর্বেই শুনিয়েছি।

শুনিয়েছি তুষু, ভাদু, রাবণ-কাটা-নাচ জাতীয় লোক-সংস্কৃতি তথা লোকোৎসবের কথা। এসব ছাড়াও জেলার প্রায় সারাটা বছরই নানান লোকোৎসবের দখলে চলে যায় স্বতঃস্ফূর্ত উৎসবের অনাবিল আনন্দে। এসব লোকোৎসবের মধ্যে আছে আদিবাসী-নৃত্য, মনসামঙ্গল, বাউল, কাঠিনাচ, ঝুমুর, ছৌ-নাচ, রণ-পা নৃত্য, পাতা নাচের গান, বিয়ের গান, হাপু এবং গোয়ালিদের গান। উৎসব ও মেলার কথা খোলা-মেলাভাবে আলোচনা করব এখন। প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করিয়ে দিই এসব তথ্যের সিংহভাগই আপনাদের পরিবেশন করলাম 'পশ্চিমবঙ্গ', বাঁকুড়া জেলা সংখ্যা, ১৪০৯-এর থেকে।

নীরস তথ্যাদির কথা ফাইল বন্দী করে এখন আমরা মনে মনে মনের আনন্দে ঘুরে বেড়াব মল্লভূমের উৎসব ও মেলাপ্রাঙ্গণে।

অধ্যায় - ১২৯

উৎসব ও মেলায় মুখর মল্লভূম

নক্ষত্র-খচিত অমারাত্রিতে আকাশের বুকে অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্র ও তারকারাজির গ্যালাক্সি যেরূপ নৈসর্গিক আনন্দের উৎসধারা, অনুরূপভাবে মল্লভূমের সর্বত্র সারা বছর ব্যাপী উদযাপিত উৎসব এবং মেলাগুলিও দারিদ্র্য-পীড়িত মল্লরাজ্যবাসীদের কাছে যেন অনাবিল আনন্দের ফল্গুধারা। শান্তিপ্রিয় মল্লরাজ্যটিকে বছরের পর বছর নানান উৎসব ও মেলায় মুখরিত হতে দেখে মনে হয় যেন ফি-বছর আনন্দের হাট বসে এখানে।

এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যমণ্ডিত দুর্গাপূজা ও রথযাত্রা; সোনামুখীর কালী, কার্তিক ও মনোহর ঠাকুরের মহোৎসব; ডিহরের ষাঁড়েশ্বর, বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর, পাত্রসায়রের কালীশ্বর, পাঁচালের রত্নেশ্বর, বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর শিবের গাজন ছাড়াও কেঞ্জাকুড়া,

ওন্দা থানার হীরাপুর ও ভোলা, ঝাঁটিপাহাড়ী, পীড়রাবনী, জগন্নাথপুর, রাধানগর, বৈতল, সাসপুর প্রভৃতি স্থানের চৈত্র-বৈশাখ মাসের শিবের গাজন; বেলিয়াতোড়, মেজিয়া, মটগোদা, হরিপুর প্রভৃতি স্থানের ধর্মরাজের গাজন ও ধর্মরাজের পূজা; বাঁকুড়া শহর ও নড়রা গ্রামের রথযাত্রা ; অযোধ্যার দশহরা; রামসাগরের নাগপঞ্চমী ; বিষ্ণুপুরের অম্বুবাচী উৎসব; ছাতনার বাসুলী পূজা ; বহুলাড়া, দুবরাজপুর, গোকুলনগর ও বগড়ীর দোলযাত্রা; ষাঁড়েশ্বর ও এক্তেশ্বর প্রাঙ্গণে মকরস্নানের মেলা; ফাল্গুন-চৈত্রে শুশুনিয়া পাহাড়ের কোলে বারুণীস্নানের মেলা; ভাদ্রে খাতড়াতে ইন্দ্রোৎসব; রাণীবাঁধ সন্নিকটস্থ ভুরকুড়া গ্রামের বামনিসিনী পূজা; পাত্রসায়ের থানার শালখাড়া গ্রামের চৈত্রে মাতঙ্গীপূজা; ইন্দাস থানার ভগিৎপুরে চৈত্রে ভগবতীপূজা; বিষ্ণুপুর মহকুমার নাড়িচা গ্রামের সর্বমঙ্গলা প্রাঙ্গণে ন'দিনের পৌষ মেলা; চৈত্রে বাসন্তীপূজা; সঙ্কটতারিণী পূজা, জয়রামবাটীর দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা ও মায়ের জন্মতিথি-পূজা; কামারপুকুরের শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি উপলক্ষ্যে প্রায় ১৫ দিন ব্যাপী বিশাল মেলা ছাড়াও শ্রীরামনবমী তিথিতে বিষ্ণুপুরের হরিতপোবন আশ্রমের পাঁচদিন ব্যাপী চব্বিশ প্রহর এবং ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসে মল্লভূমের গ্রামে-গঞ্জে, শহরে শহরে রাধা-কৃষ্ণ ও গৌর-নিতাই-আদির এক, তিন, পাঁচ বা নয় দিন ব্যাপী বিরামহীন হরিনাম সংকীর্তনের আসর— নামান্তরে 'চব্বিশ প্রহর' বা 'হরিবোল' আখ্যায় ভূষিত হয়ে এই উৎসব এবং পূর্বোক্ত মেলা ও উৎসবাদি মল্লভূমের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মনে আনে দিব্য আনন্দের জোয়ার, আনে অধ্যাত্ম-চেতনার অনুরণন।

মল্লভূমের মুসলিম সম্প্রদায়ের মহরম, ফাতেহা দোয়াজ দহম, শবে মিরাজ, শবে বরাত, ঈদ্-উল্ ফিত্‌র, ঈদ্-উজ্-জোহা ইত্যাদি ছাড়াও পীর-ফকিরের স্থানে উদ্‌যাপিত পীরের মেলা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এছাড়া রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, গুজরাট, হরিয়ানা প্রভৃতি প্রদেশের অবাঙালী সম্প্রদায়ের মানুষজনের দ্বারা উদ্‌যাপিত দীপাবলী উৎসবও এখানে অনুষ্ঠিত হয় সাড়ম্বরে। দীপান্বিতার অমাবস্যা তিথিযোগে গৃহলক্ষ্মী ও সিদ্ধিদাতা গণেশ ঠাকুরের পূজা উপলক্ষ্যে দীপদান, দোকানের হাল-খাতা পূজা, নব-বর্ষের সূচনা, পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় সহকারে আনন্দোৎসব পালিত হয় মহা উদ্দীপনায়। কথিত আছে কার্তিকের গোপাষ্টমী তিথিযোগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গোমাতার পূজা করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণভক্ত মাড়োয়ারী সম্প্রদায় পূর্বোক্ত তিথিতে বিষ্ণুপুরের গোশালাতে এবং ঘরে ঘরে গো-মাতার পূজা-সেবা করে থাকেন। এবার আসি **ছট উৎসব** প্রসঙ্গে। বিহারী সম্প্রদায়ের এটি একটি বড় উৎসব। বৈদিক যুগ থেকে ভারতে সূর্য, চন্দ্র, জল, বায়ু অগ্নি পূজা-অর্চনার প্রথা প্রচলিত আছে হিন্দু সমাজে। অনন্ততেজ, অনন্তকোটি জীবন ও প্রাণশক্তির উৎস স্বরূপ সূর্য-পূজার মাধ্যমে ছট পূজা যেন তারই বিবর্তিত রূপ। অশ্ববাহিত রথারূঢ় সূর্যদেবতা উর্বরতাবাদের প্রতীকরূপেও পূজিত হয়ে থাকেন। বছরে দু'বার ছটব্রত বা উৎসব পালিত হয়। প্রথমটি কার্তিকের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে, দ্বিতীয়টি চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে। প্রথমটি শারদ-ষষ্ঠী এবং দ্বিতীয়টি বাসন্তী-ষষ্ঠী বা চৈত্র-ষষ্ঠী নামে প্রসিদ্ধ। তিন দিন ব্যাপী এই পূজা বা ব্রতের চতুর্থী তিথিতে ব্রতী আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব পরিবেষ্টিত হয়ে সূর্য ভগবানের মাহাত্ম্য কীর্তন করেন। পঞ্চমীর সন্ধ্যায় আমকাঠের আগুনে গুড়ের পায়েস ও রুটি বানিয়ে সূর্য পূজার পর দেবতার প্রসাদ হিসেবে পাড়া-প্রতিবেশী ও উপস্থিত সকলকে বিতরণপূর্বক ব্রতী নিজেও গ্রহণ করেন। ষষ্ঠীর দিন উপবাসী-ব্রতীগণ বিকেল বেলা জলাশয়ে দাঁড়িয়ে সূর্য-পূজা করেন এবং সূর্যাস্তের পর সূর্যদেবতার উদ্দেশ্যে ফল-মূলাদি অর্ঘ্য দেন। ষষ্ঠীর দিন রাত্রি-শেষে ব্রতী ফল মূলাদি এবং ঠেকুয়া (এক ধরণের খাবার) ভর্তি 'অর্ঘ্যের ঝুড়ি'

মাথায় নিয়ে আত্মীয় পরিজন পরিবেষ্টিত হয়ে ব্রতী পুনরায় পুকুর-ঘাটে গিয়ে জলে দাঁড়িয়ে সূর্য-স্তব করেন এবং সূর্যোদয়ের সাথেসাথে সূর্য-অর্ঘ্য দিয়ে প্রসাদ বিতরণ করে এবং নিজে প্রসাদ পেয়ে ব্রত সাঙ্গ করেন। সাধ্যমত দান-ধ্যানও এই ব্রতের অঙ্গ।

ঐতিহাসিক যুগে মগধ রাজ্যে এই উৎসব বিশেষভাবে অনুষ্ঠিত হত। বর্তমানে বিহারে ধুমধাম সহকারে এবং ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কম-বেশী মাত্রায় এই উৎসব সুসম্পন্ন হয়। সনাতন পরম্পরা সূত্রে আগত এই উৎসব বর্তমানে লোকাচারের সহিত জড়িয়ে গিয়ে বিহারী হিন্দুদের কাছে একটি নতুন আঙ্গিকে উদ্ভাসিত হয়ে সার্বজনীন উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করেছে। মল্লভূমের বিহারী সম্প্রদায়ের মধ্যেও এ উৎসবের সমারোহ এবং গভীর ইষ্ট-নিষ্ঠা পরিলক্ষিত হয়। বিষ্ণুপুরের লালবাঁধ এবং পোকাবাঁধে ছট উৎসবের শোভাযাত্রা নজরে পড়ে ফি-বছর। অবাঙালী ও বিহারীদের এই উৎসবে মহানন্দে বিষ্ণুপুরবাসীদেরও সামিল হতে দেখা যায়।

পূর্বোল্লিখিত উৎসব ও মেলা ব্যতিরেকে আরো উল্লেখযোগ্য মেলাগুলি হল খাতড়া ব্লকের পরকুলের তুসু মেলা, রায়পুর ব্লকের মটগোদা গ্রামের সপ্তাহব্যাপী সুপ্রাচীন মণিমেলা—শুরু হয় মাঘ মাসের শেষ শনিবার, ১লা মাঘ মাত্র একদিনের ফুলকুসুমার মেলা, সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে ১লা জানুয়ারী মুকুটমণিপুরের একদিনের মেলা এবং চণ্ডী দেবীর শিবরাত্রির মেলা বিশেষ আকর্ষণীয়। এছাড়া বছরে বছরে অনুষ্ঠিত জেলার **'বই মেলা'**, **'বস্ত্র মেলা'** এবং ফল সহ **'পুষ্পপ্রদর্শনী মেলা'** জেলার মেলার জগৎকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে।

উৎসব ও মেলায় মুখর মল্লভূমের উৎসব ও মেলার কথা হৃদয়ঙ্গম করার ফুরসতে আমরা উপনীত হয়েছি বিষ্ণুপুরের বধিলা পাড়াতে, অপভ্রংশে বৈলাপাড়াতে। এখানে রয়েছে শিশু-উদ্যান, সহকারী বিদ্যালয় পরিদর্শকের করণ, প্রশাসনিক ভবন, মহকুমা শাসকের বাংলো, ট্রেজারী বিল্ডিং, সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের কার্যালয়, মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার কার্যালয়, জীবন বীমা নিগম কার্যালয় ও মহকুমা দূরভাষ কার্যালয় প্রভৃতি।

বৈলাপাড়ার চৌরাস্তার মোড়ে রয়েছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের স্ট্যাচু। এজন্য স্থানটি রবীন্দ্রস্ট্যাচু-মোড় নামে পরিচিত। এখানে রয়েছে চা-মিষ্টির দোকান। বিষ্ণুপুর পরিক্রমার শেষ দিনে বিষ্ণুপুরের মতিচুর মিষ্টান্ন সহযোগে চা-পান করা যাক। চা-পানের বিরতির পর শুরু হবে আমাদের শেষ পর্যায়ের পরিক্রমা। তখন আমরা কলেজ রোড ধরে এগিয়ে যাব রাসমঞ্চ অভিমুখে। চলার পথে বাম দিকে থাকবে কবরডাঙা, আর ডান দিকে পড়বে ভাটপুকুর শ্মশান ও মালঞ্চ-পল্লী। শেষ পর্যায়ের পরিক্রমার প্রথমেই থাকছে **'দেবভূমি মল্লভূমের দেবদেবী, দেবমন্দির, দর্শনীয় স্থান ও পুরাকীর্তি।'**

অধ্যায় - ১৩০

দেবভূমি মল্লভূমের দেবদেবী, দেবমন্দির, দর্শনীয় স্থান ও পুরাকীর্তি

মল্লভূমের দর্শনীয় স্থান বলতে মনের আঙ্গিনায় প্রথমেই উঁকি মারে মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুরের দর্শনীয় স্থান ও পুরাবস্তুগুলি আমরা স্বচক্ষে দেখেছি এবং মল্লরাজ্যের ইতিহাস পর্যালোচনাকালে আমরা মানস-ভ্রমণ করেছি মল্লরাজাদের স্মৃতিবিজড়িত স্থানগুলিতে। লাউগ্রাম, প্রদ্যুম্নপুর, জয়পুর, কুম্ভস্থলদুর্গ এবং সলদা-

গোকুলনগরে মনে মনে আমরা বেড়িয়ে এসেছি বিষ্ণুপুর পরিক্রমার প্রথম দিনেই। এখন আমরা পাড়ি দেবো মা সারদার জন্মস্থান জয়রামবাটীতে। মায়ের স্নেহধন্য জয়রামবাটী শুধু বাঙালী বা ভারতীয়দের কাছেই নয় বিশ্বের মাতৃভক্ত সন্তানদের কাছেও একটি পূত-পবিত্র তীর্থস্থান। ঈশ্বরগতপ্রাণ, সহজ, সরল সারদা মায়ের পুণ্যস্মৃতিসিক্ত হয়ে অতি সাধারণ জয়রামবাটী পল্লীটি আজ হয়েছে অনন্য, অসাধারণ। জয়রামবাটীতে এলে এবং জয়রামবাটীর মাত্র মাইল তিনেক দূরে মল্লরাজ্যের আর একটি তীর্থস্থান শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামারপুকুরে পা ফেললেই মনের গভীরে নৃত্য করে, 'Plain living and high thinking' প্রবাদ বাক্যটি। যেন বলতে চায়, —দ্যাখো, শেখো। সহজ সরল জীবন-যাপন কর এবং ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন থাকো।

জয়রামবাটী, কামারপুকুর—জয়রামবাটী ও কামারপুকুর, সারদা মা এবং শ্রীরামকৃষ্ণ—কে কার পরিপূরক! না দুজনেই স্বয়ং সম্পূর্ণ? ভাবলেই মনে হয় একজন প্রকৃতি, অন্যজন পুরুষ এবং বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ যেন তাঁদের মানসপুত্র।

মায়ের স্মৃতিধন্য জয়রামবাটীর সমস্ত স্থানই রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক সংরক্ষিত এবং সুপরিচালিত। এখানের দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে রয়েছে মায়ের পুরানো বাড়ি। এই পুরানো বাড়িতেই মা ১৮৬৩ থেকে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ প্রায় ৫৩ বছর বসবাস করেন এবং এখানে বসেই মা ভক্তদের দীক্ষা ও সন্ন্যাসব্রত দান করেন। মায়ের জীবিতকালেই মাতৃগতপ্রাণ স্বামী সারদানন্দ মায়ের জন্মস্থানসহ বেশ কিছু জমি ক্রয় করেন এবং মায়ের অন্তর্ধানের পর ১৩৩০ বঙ্গাব্দে অক্ষয় তৃতীয়া তিথিযোগে এই মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মায়ের মর্মর-মূর্তি সহ নয়নাভিরাম এই শ্রীমন্দিরটিই সব থেকে আকর্ষণীয় দর্শনীয় বস্তু। এছাড়া এখানে রয়েছে মায়ের রন্ধনশালা, মায়ের বৈঠকখানা, পাগলী-মামী নামে খ্যাত সুরবালা দেবীর বাসস্থান ও মাতা শ্যামসুন্দরী দেবীর বসতবাটী, মা সিংহবাহিনীর মন্দির, মায়ের দীঘি, মায়ের বড় সাধের আমোদর খাল বা নদ এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ মিশনের প্রতিষ্ঠিত নর-নারায়ণ মন্দির।

পক্ষান্তরে কামারপুকুরে রয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের মর্মর-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত দৃষ্টিনন্দন শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির। মন্দিরটি যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানের ঢেঁকিশালে ঠাকুর ভূমিষ্ঠ হন। ঠাকুরের জন্মকাহিনীকে হৃদয়ে জাগরুক রাখার উদ্দেশ্যে মর্মরমূর্তির বেদীতে ঢেঁকি, উনুন এবং প্রদীপ খোদাই করা হয়েছে। এই মন্দির ছাড়াও এখানে রয়েছে রামকৃষ্ণ পরিবারের কুলদেবতা শ্রীশ্রীরঘুবীরের শ্রীমন্দির। এই মন্দিরে রঘুবীরশিলা ছাড়াও নারায়ণশিলা, রামেশ্বর শিব, শীতলাদেবী এবং গোপালমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছেন। অবিকৃত অবস্থায় রয়েছে রামকৃষ্ণ ঠাকুরের বাসগৃহ, বৈঠকখানা এবং ঠাকুর ও মায়ের স্মৃতি-সমৃদ্ধ বাসগৃহ আর ঠাকুরের স্বহস্তে রোপিত আম্রবৃক্ষ।

ঠাকুরের শৈশব, কৈশোর ও সাধনজীবনের সৌরভ-সুরভিত দর্শনীয় বস্তু ও স্থানগুলির মধ্যে রয়েছে যুগীদের শান্তিনাথ শিবমন্দির। মাতা চন্দ্রমণি দেবীর শান্তিনাথ শিবলিঙ্গে এক জ্যোতির্ময় দিব্যপুরুষকে দর্শনের পরই গদাধর তথা উত্তর-বয়সের রামকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করেন। আর রয়েছে ঠাকুরের স্নান ও সন্তরণের সুখস্মৃতিপূর্ণ ২৯ বিঘার হালদার পুকুর, গদাধরের বাল্যজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত লাহাবাবুদের বিষ্ণুমন্দির, চণ্ডীমণ্ডপ ও পাঠশালা, শ্রীরামকৃষ্ণের ধাইমা তথা ভিক্ষামা 'ধনীকামারণীর মন্দির', শ্রীরামকৃষ্ণের কৈশোরকালের দিব্যলীলাধন্য পাইনদের বাড়ী ও গোপেশ্বর শিবমন্দির এবং শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যোন্মাদনা-কালে পুত্রের আরোগ্য কামনায় মাতা চন্দ্রমণিদেবীর 'হত্যা' দেওয়ার ঘটনা-সমৃদ্ধ মুকুন্দপুরের শিবমন্দির। কথিত আছে গোপেশ্বর শিবের

নির্দেশমতোই মাতা চন্দ্রমণি মুকুন্দপুরের শিবমন্দিরে হত্যা দেন। এছাড়া সিদ্ধ বৈষ্ণব-সাধক 'চিনু শাঁখারীর ভিটা', 'ভূতির শ্মশান' এবং শ্রীরামকৃষ্ণের কঠোর সাধন-ভজন স্থল হিসেবে 'বুধুই মোড়লের শ্মশান'টিও অন্যতম দর্শনীয় স্থান। পরিশেষে বলি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কামারপুকুর শাখার প্রচেষ্টায় এখানে নির্মিত হয়েছে নাটমন্দির, অতিথিশালা, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, গ্রন্থাগার ও চিকিৎসালয়।

কোতুলপুর —পাঠান সেনাপতি কোতলুখাঁর নামানুসারে পরিচিত কোতুলপুরে রয়েছে বেশ কয়েকটি দেবমন্দির। দেব-দেবীদের মধ্যে যাত্রাসিদ্ধিরায়, ক্ষুদিরায়, বিষ্ণুরায় ও দামোদর উল্লেখ্য। এছাড়াও হালদার পাড়ার বিষ্ণুমন্দির, পূর্বপাড়ার ইষ্টকনির্মিত পঞ্চরত্ন বিশিষ্ট পোড়ামাটির কারুকার্য শোভিত প্রায় ৩২ ফুট উচ্চ বিষ্ণুমন্দির এবং ভদ্রপাড়ার সু-অলঙ্কৃত গিরিগোবর্ধন মন্দির ও পঞ্চরত্ন শ্রীধরমন্দির স্মরণীয় দেব-মন্দির।

মদনমোহনপুর — কোতুলপুর থেকে মাত্র ৬ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে স্থিত মদনমোহনপুর গ্রামে রয়েছে দালাল পরিবারের পারিবারিক দেবতা রাধামদনমোহন জীউর অনুপম শ্রীমন্দির এবং শ্রীবিগ্রহদ্বয়। মদনমোহন জীউর রাসযাত্রা এবং ১২ বছর অন্তর অনুষ্ঠিত দেবাদিদেব মহাদেবের গাজন গ্রামের প্রধান উৎসব।

ময়নাপুর —পশ্চিমবঙ্গের ধর্মরাজ ঠাকুরের পীঠস্থান হিসেবে ময়নাপুরের প্রসিদ্ধি তুঙ্গে। শূন্যপুরাণ রচয়িতা রামাই পণ্ডিতের উপাস্য দেবতা যাত্রাসিদ্ধি, বাঁকুড়ারায়, ক্ষুদিরায় প্রভৃতি ধর্মঠাকুর ছাড়াও চাঁদরায় সহ বহু ধর্মশিলা আছেন এখানে। ধর্মঠাকুরের পাশাপাশি হাকন্দেশ্বর শিব, চণ্ডী, ষষ্ঠী, বড়াম, কুদ্রা, যজ্ঞেশ্বর শিব ও রক্ষাকালী রয়েছেন এখানে। ময়নাপুরের হাটতলার কৈলাসধামের কৈলাসেশ্বরী অতি অবশ্য দর্শনীয় দেববিগ্রহ। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরের 'কৈলাসেশ্বরী'র কথা স্মরণ করা যেতে পারে। বৈশাখ মাসের অক্ষয়-তৃতীয়া তিথিযোগে অনুষ্ঠিত এখানের ধর্মরাজের 'গৃহভরণ গাজন' নানাদিক দিয়ে বৈচিত্র্যপূর্ণ।

রাউতখণ্ড —জয়পুর থানার মধ্যবর্তী রাউতখণ্ড গ্রামটি জাগ্রতাদেবী জগৎগৌরীর জনপ্রিয়তার জন্যই প্রসিদ্ধ। সপ্তনাগছত্র মনসামূর্তিটি জগৎগৌরী রূপে পূজিতা হয়ে আসছেন বহু বছর যাবৎ। সাপে কাটা রোগীদের নিশ্চিত আরোগ্য লাভের মহিমায় মহিমান্বিত এই দেবী। এতদ্‌ব্যতিরেকে গ্রামের পঞ্চরত্ন বিশিষ্ট কালঞ্জয় শিবের মন্দিরটিও বেশ শ্রীদর্শন।

ডিহর —বিষ্ণুপুরের উত্তরে প্রবাহিত দ্বারকেশ্বর নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে সমৃদ্ধ ডিহর গ্রামের ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর শিবের মহিমায় ডিহর বাঁকুড়া জেলার অন্যতম একটি শৈবতীর্থ রূপে পরিগণিত। মহারাজ পৃথ্বীমল্ল প্রতিষ্ঠিত প্রায় ৭০০ বছরের সুপ্রাচীন ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর শিব-মন্দির ও শিবলিঙ্গদ্বয় দর্শন ব্যতিরেকে বিষ্ণুপুর ভ্রমণে পূর্ণতা আসে না বোধ হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর শিবের মহিমা-কাহিনী নিয়ে **'ষাঁড়েশ্বর-মাহাত্ম্য'** নামে ১৮৪ পৃষ্ঠার একটি বই আছে। বইটি অবশ্য আপনাদের টুরিস্ট্‌-গাইডেরই লেখা।

নাড়িচা —বিষ্ণুপুরের উত্তর-পূর্বে প্রায় বারো, চৌদ্দ মাইল দূরে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে বিষ্ণুপুরের রাজন্যবর্গ প্রতিষ্ঠিত নাড়িচা গ্রামের সর্বমঙ্গলা দেবীর জনপ্রিয়তা তুঙ্গে। চৈত্র মাসের শনি, মঙ্গলবার পুণ্যার্থীদের উপচে পড়া ভিড়ে মাতৃঅঙ্গন থাকে মুখরিত। দেবী সর্বমঙ্গলার খালাপোড়া মাছের অন্নভোগের স্বাদই আলাদা। মকর সংক্রান্তির দিন থেকে ন'দিন ব্যাপী এখানে যে মেলা বসে তাতে ঢল নামে মানুষজনের।

অযোধ্যা —বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত ঐতিহ্যপূর্ণ অযোধ্যাগ্রামে জেলার অন্যতম ধনাঢ্য ভূস্বামীদের বাসস্থান। এখন পড়ন্ত অবস্থা। নৃপবর আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন নিষ্ঠাবান, ব্রাহ্মণকে গৌড়ভূমিতে এনেছিলেন ভট্টনারায়ণ তাঁদের অন্যতম। ভট্টনারায়ণের উত্তরপুরুষরূপে পরিচিত বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী এই জমিদার বংশের নির্মিত ও প্রতিষ্ঠিত প্রায় ১৫ ফুট উচ্চ পাশাপাশি অবস্থিত দেউল আকৃতির দ্বাদশ শিবমন্দির এবং প্রায় ২৫ ফুট উচ্চ গিরিগোবর্ধন মন্দির এবং রাসমঞ্চ ও পিতলের রথ পূর্বোক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের ঈশ্বরপ্রেমের প্রতীক রূপে প্রতিভাত। এক্ষেত্রে স্মরণীয় এই পরিবারটি বৃটিশ আমলে নীলের কারবারে জড়িত থাকার কারণে 'নীলকর' নামেও পরিচিত ছিল। এখানের কালীবুড়ি ওরফে মনসার দশহরা উৎসব বিখ্যাত।

পাঁচাল —পাঁচাল গ্রামের রত্নেশ্বর শিবের খ্যাতি জেলা জুড়ে। বহু দুরারোগ্য রোগ নিরাময়ের জন্য অনেকেই হত্যা দেন এখানে। মহিলাদের এই শিবের পূজা নিষিদ্ধ। চৈত্র মাসে অনুষ্ঠিত রত্নেশ্বর শিবের গাজন গ্রামের সব থেকে বড় উৎসব। অতীতে এটি জৈন সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান ছিল।

দেউলপাড়া —পাত্রসায়ের থানার দেউলপাড়া পল্লীর দেউলেশ্বর শিব কুষ্ঠ, বন্ধ্যাত্ব এবং হাঁপানি নিরাময়ের জন্য প্রসিদ্ধ। বৈশাখ মাসে অনুষ্ঠিত দেউলেশ্বর শিবের একদিনের গাজনমেলা এখানের প্রায় ২০০ বছরের সুপ্রাচীন উৎসব।

হদলনারায়ণপুর —বিষ্ণুপুর মহকুমার পাত্রসায়ের থানার হদলনারায়ণপুর শিল্প-সুষমামণ্ডিত কয়েকটি দেবালয়ের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানের নারায়ণেশ্বর শিব ছাড়াও পরিত্যক্ত একটি পঞ্চরত্ন মন্দির, ব্রহ্মানীদেবীর দালান-মন্দির এবং তিনটি অতীব সুন্দর নবরত্নমন্দির রয়েছে। এগুলি বাঁকুড়ার পুরাকীর্তির ঐশ্বর্যভাণ্ডারকে করেছে গৌরবান্বিত। ধর্মরাজ, মনসা, শীতলা, পঞ্চানন্দ এ গ্রামের উপাস্য দেব-দেবী। নারায়ণেশ্বর শিবের গাজন প্রায় তিনশত বছরের ঐতিহ্য বহন করছে। রথযাত্রার জন্য প্রায় দশ ফুট উচ্চ একটি পিতলের রথও বিদ্যমান। এখানের রাসমঞ্চটি অতীব নয়নাভিরাম।

বেলুট —বেলুট পাত্রসায়ের থানার আর একটি গ্রাম। এই গ্রাম বিশ্বেশ্বর শিবমন্দির, রাধারমণজীউ মন্দির, রাসমঞ্চ এবং পাগল হরনাথের আশ্রমের জন্য বিখ্যাত। এ ছাড়া এই গ্রামের পশ্চিমদিকে দৃশ্যমান দুটি মাটির ঢিপির মধ্যে একটি মনসা-মঙ্গল কাব্যের চাঁদসদাগরের স্মৃতি বিজড়িত 'চন্দ্রদ্বীপ ঢিপি' নামে কথিত এবং অন্যটি 'ঠাকুরাণী ঢিপি' নামে পরিচিত।

বালসি —পাত্রসায়ের থানার বেশ বড় আকৃতির গ্রাম বালসি। এখানের প্রায় ৪০ ফুট উচ্চ এবং দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ১৯ ফুট মাপের লক্ষ্মীনারায়ণ জীউ-এর গম্বুজ আকৃতির সুবৃহৎ দেবালয়টি ১৬৫২ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত। এই গ্রামে বালেশ্বর শিব ছাড়াও রয়েছেন মনসা ও শীতলাদেবী। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নির্মিত বিষ্ণুমন্দির ও শ্যামমন্দির এখানের দ্রষ্টব্য দেবালয়।

পাত্রসায়ের —পাত্রসায়েরের মধ্যস্থলে একটি বৃহদাকৃতির রেখ-দেউল মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন কালঞ্জয় বা কালিঞ্জর শিব। জনগণের বিশ্বাস এই শিবের মহিমা অপার। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন থেকে শুরু করে বৈশাখী পূর্ণিমার দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই শিবের গাজন উৎসব খুবই প্রসিদ্ধ। এখানের তাঁতিপাড়ার শিবদুর্গা মন্দির, হাজরাপাড়ার আটটি শিবমন্দির এবং বুড়োরায় নামক ধর্মঠাকুর ও ডামাদীঘির পাড়ে অবস্থিত বসন্তচণ্ডীর শিলামূর্তি বিশেষ উল্লেখ্য। বসন্তচণ্ডীর বার্ষিক পূজা উপলক্ষ্যে

পৌষসংক্রান্তির দিন থেকে এখানে চারদিনের মেলা বসে। মেলাটি 'কেন্দুলীর মেলা' নামে পরিচিত।

বীরসিংহ —বৃন্দাবনচন্দ্র জীউ এবং রাধাদামোদর জীউ, রাধাশ্যামসুন্দর জীউ অরণ্যাচ্ছাদিত বীরসিংহ বা বনবীরসিংহ গ্রামের উপাস্য দেবতা। বৈশাখে বসুধাজাহ্নবী দেবীর মহোৎসব ও শ্রীঅভিরাম গোপালের (গোস্বামীর) আবির্ভাব উৎসব, জ্যৈষ্ঠে চারশ বছরের ঐতিহ্যবাহী গাজন এবং আষাঢ়ের রথোৎসব গ্রামের স্মরণীয় ধর্মোৎসব।

কাস্তোড় —পাত্রসায়ের থানার জামকুড়ি গ্রামের মাইল দুই দূরে দ্বারকেশ্বর নদীর উত্তর পাড়ে অবস্থিত কাস্তোড় গ্রামের চক্রেশ্বরীদেবী বা ষড়চক্রবাহিনী খুবই প্রসিদ্ধ। দেবীর মন্দিরটি দ্বারকেশ্বর গর্ভে বিলীন হয়ে যাওয়ার ফলে দেবী এখন একটি পাথরের বেদীর উপর প্রতিষ্ঠিতা। দেবীর অদূরেই একটি ঢিবির উপর দেবীর ভৈরব অর্থাৎ একটি শিবলিঙ্গ আছে।

ইন্দাস —বর্ধিষ্ণু গ্রাম ইন্দাস (থানা ও সদর) নামটি 'ইন্দ্রহাস' শব্দের অপভ্রংশ। গ্রামের হরিপুর-পণ্ডিতপাড়ার 'বাঁকুড়া রায়' ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য অসীম। কথিত আছে জনৈক চিঁড়া-বিক্রেতা স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বর্ধমানের খণ্ডঘোষ গ্রামের 'উদয়পুকুর' থেকে বাঁকুড়া রায়কে তুলে এনে ইন্দাসে প্রতিষ্ঠা করেন। পৌষ-সংক্রান্তির দিন বাঁকুড়া রায়ের বিশেষ পূজা উপলক্ষ্যে এখানে পাঁচদিন ব্যাপী মেলা বসে। মেলাটি 'কুঁড়চি মেলা' নামে অভিহিত।

সাসপুর —ইন্দাস থানার এই গ্রামের জনৈক হরিহর মিত্র স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ১২৪৯ খৃষ্টাব্দে অনাদিলিঙ্গ 'বুনোশিব' প্রতিষ্ঠা করেন। বুনোশিব ছাড়াও এখানে রয়েছেন রাধাদামোদর জীউ। বুনোশিবের গাজন এবং রাধাদামোদরের রাসযাত্রা সাসপুর বা সাহসপুরের বড় উৎসব।

সিহড়—জয়রামবাটী থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার দূরে অবস্থিত সিহড় গ্রাম শ্রীরামকৃষ্ণ ও মাতা সারদামণির পদধূলিধন্য। এখানের শান্তিনাথ শিব এবং শিবের গাজন খুবই প্রসিদ্ধ।

দেশড়া —কোতুলপুর-জয়রামবাটীর পাকা রাস্তার ধারে অবস্থিত দেশড়া গ্রামের খ্যাতি মূলতঃ মনসাদেবীর জন্য। মনসাদেবী ছাড়াও এখানে পঞ্চানন্দ দেব, শিব ও অনেকগুলি শীতলা দেবী আছেন।

কোয়ালপাড়া —সারদা মায়ের স্মৃতিধন্য কোয়ালপাড়াতে রয়েছে মায়ের বৈঠকখানা। শ্রীমৎ স্বামী গিরিশানন্দ মহারাজ প্রতিষ্ঠিত এখানের 'শ্রীরামকৃষ্ণ বিরজানন্দ আশ্রম'টি সর্বধর্মসমন্বয়ের প্রতীক হিসেবে অবশ্যই একটি দর্শনীয় তীর্থস্থান। কোয়ালপাড়া 'অক্ষয় কুমার কোলে পরিবারের আদি বাসস্থান হিসেবেও সুবিদিত।

লোকপুর —জয়পুর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত লোকপুর গ্রামের ধর্মপ্রচারক ইসমাইল গাজীর সমাধিস্থানটি মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনের কাছে অতি পবিত্র স্থান রূপে বিবেচিত।

এল্যাটি বা বেলাটুকরি —ভেদুয়াসোল থেকে হরিহরপুর গ্রাম হ'য়ে দ্বারকেশ্বর নদী পেরোলেই এল্যাটি গ্রাম। গ্রাম সংলগ্ন অধুনা পরিত্যক্ত শ্যামসুন্দর বিগ্রহের জন্য ইষ্টক নির্মিত দেউলটি স্থাপত্যশৈলীতে অভিনব এবং চিত্তাকর্ষক।

রাজগ্রাম বা রাহাগ্রাম —বিষ্ণুপুর-কোতুলপুর সড়কের ধারে অবস্থিত রাজগ্রাম বা রাহাগ্রামে রয়েছে বিত্তশালী রাহা পরিবারের প্রতিষ্ঠিত দামোদর-মন্দির, গিরিগোবর্ধন মন্দির এবং একটি রাসমঞ্চ। 'ক্ষেত্রপাল' এই গ্রামের গ্রাম-দেবতা। এখানে অবস্থিত কূর্মাকৃতি শীতল-নারায়ণ ধর্মশিলার বার্ষিক পূজা উপলক্ষ্যে মেলা বসে ফি'বছর।

অবন্তিকা, জয়কৃষ্ণপুর, রাধানগর —বিষ্ণুপুর সোনামুখী বাসরুটের মধ্যে অবস্থিত অবন্তিকা গ্রামের একটি নবরত্ন মন্দির, জয়কৃষ্ণপুরের কয়েকটি সুপ্রাচীন মন্দির এবং রাধানগরের দেবাদিদেব শিবের গাজন খুবই বিখ্যাত।

সোনামুখী—বিষ্ণুপুর শহরের উত্তরে প্রায় মাইল কুড়ি দূরত্বে অবস্থিত সোনামুখী থানা। স্বর্ণমুখী দেবীর নামানুসারেই বিষ্ণুপুর মহকুমার এই থানার নামকরণ হয়েছে সোনামুখী। সোনামুখীর শ্রীধর মন্দির এবং সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দির খুবই নয়নাভিরাম এবং প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া এখানে রয়েছে স্বর্ণমুখী দেবীর মন্দির, গিরিগোবর্ধন মন্দির, মনোহর দাসের সমাধি মন্দির এবং হরনাথ-কুসুমকুমারীর মন্দির ও যোগেশ আশ্রম।

পোখন্না —"জেলার প্রচীনতম গ্রাম। শুশুনিয়া-শিলালিপিতে মহারাজ সিংহবর্মা ও চন্দ্রবর্মার কথা বলা হয়েছে। শিলালিপি অনুসারে এঁরা দুজনেই ছিলেন পুষ্করণা বা পোখন্নার অধিপতি। এই গ্রামও একসময় ছিল পুরাকীর্তির রত্নভাণ্ডার। কিন্তু বহু বছর পুরাকীর্তির এই সকল নিদর্শন নিয়ে যাওয়া হয়েছে দেশের বিভিন্ন পুরাবস্তুর সংগ্রহশালায়।" (জেলার নাম বাঁকুড়া, পৃঃ—৩২)

ছান্দাড় —সুদূর অতীতে সাতটি পুষ্করিণী বৃত্তাকার হারের মতোই ঘিরে রেখেছিল গ্রামটিকে। এজন্য গ্রামের নাম হয়েছিল 'চন্দ্রহার'। পরবর্তীকালে চন্দ্রহার অপভ্রংশে হয়েছে ছান্দাড়। (চন্দ্রহার > চান্দার > ছান্দার > ছান্দাড়)। বেলিয়াতোড় থেকে মাইল দুই দূরত্বে অবস্থিত ছান্দাড় গ্রামটি '**অভিব্যক্তি**'র দৃষ্টিনন্দন কলাকেন্দ্রের জন্য বিখ্যাত। এখানে রয়েছে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মঞ্চ, রামকিঙ্কর ভবন। যামিনী রায় ও রামকিঙ্কর বেইজের মূর্তির পাশাপাশি যামিনী রায় ভবনে সুবিন্যস্তভাবে সাজানো রয়েছে চিত্তাকর্ষক লোকশিল্প সম্ভার।

বেলিয়াতোড় —বর্ধিষ্ণু গ্রাম বেলিয়াতোড় বাঁকুড়া শহরের উত্তরে প্রায় মাইল চৌদ্দ দূরে অবস্থিত। স্বনামধন্য শিল্পী যামিনী রায় ও বড়ুচণ্ডীদাস বিরচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির আবিষ্কর্তা ও ভাষ্যকার বসন্তরঞ্জন রায়ের জন্মস্থান হিসেবে এই গ্রাম বিশেষ স্মরণীয়। একটি পঞ্চরত্ন শিবমন্দির, একটি পঞ্চরত্ন দামোদর মন্দির, গোপাল মন্দির এবং ধর্মরাজের একটি মন্দিরছাড়াও এখানে রয়েছে আরো একটি দৃষ্টিসুখকর মন্দির। আষাঢ় মাসের পূর্ণিমা তিথি থেকে তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত ধর্মরাজ ঠাকুরের গাজন খুবই বিখ্যাত তথা এই গ্রামের সব থেকে বড় উৎসব।

নিরিশা—বেলিয়াতোড়ের নিকটবর্তী গ্রাম নিরিশা বা নিরশাতে আছেন ভুবনেশ্বর শিব, বড়কালী, মেজকালী ও ছোটকালী নামে পরিচিতা তিন কালী-মূর্তি। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে অনুষ্ঠিত ভুবনেশ্বর শিবের গাজন 'অকাল-গাজন' নামে কথিত। এখানের বামাকালী ও ভুবনেশ্বর শিব খুবই জাগ্রত এবং সমাদৃত। গাজন, দশহরা, দুর্গাপূজা ও কালীপূজা গ্রামের প্রধান উৎসব। এইসব উৎসবে মেলা বসে গ্রামে, মেলা মুখরিত হয়ে ওঠে কবিগানের কাব্যিক আমেজে।

রণিয়াড়া—বেলিয়াতোড় গ্রামের প্রায় সাড়ে তিন মাইল দূরত্বে শালি নদীর উত্তরে অবস্থিত রণিয়াড়া গ্রাম। এখানের মদনমোহন জীউ খুবই প্রসিদ্ধ দেবতা। মদনমোহন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতার বিষয়ে দ্বিমত পরিলক্ষিত হয়। কেউ বলেন বিষ্ণুপুররাজ বীরসিংহ ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে, ৯৭৬ মল্লাব্দে মদনমোহন দেবের মন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন, আবার কেউ কেউ বলেন ছান্দাড়ের শীতল মল্ল 'দুধ কোঙর' নামক রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ

ও মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে রাজা শীতলমল্লের সাথে রাজা বীরসিংহের যুদ্ধ বাধে এবং শীতল মল্ল পরাজিত হন। তখন বীরসিংহ উক্ত বিগ্রহের নাম পরিবর্তন করে মদনমোহন নাম দেন। মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপিতে অবশ্য বীরসিংহের নামই খোদিত আছে। মদনমোহন জীউ-এর বার্ষিক উৎসব 'পৌষালী উৎসব' নামে প্রসিদ্ধ। সাড়ে তিনশত বছরের পুরানো চার দিনের এই উৎসব বা মেলা 'কেন্দুলীর মেলা' নামেও প্রসিদ্ধ। কথিত আছে অতীতে এখানে একটি সেনাশিবির ছিল। শীতল মল্লের সাথে যুদ্ধ বা পুনঃ পুনঃ সংঘটিত রণের সুবাদে স্থানটি রণ-আড্ডা নামে পরিচিত হয়। রণ-আড্ডা থেকে রণআড়া এবং পরে রণিয়াড়া হয়েছে গ্রামের নাম।

নবগ্রাম—বেলিয়াতোড় গ্রামের প্রায় ৯ মাইল দূরে অবস্থিত নবগ্রাম 'বাঘরায়সিনী' দেবীর জন্য প্রসিদ্ধ। এছাড়া এখানে রয়েছে একটি শিবমন্দির এবং পঞ্চানন্দ বিগ্রহ।

পীড়রাবনী—বাঁকুড়া-দুর্গাপুর রাস্তার উপর অবস্থিত বেলবনী গ্রামের নিকটেই রয়েছে পীড়রাবনী। পীড়রা নামক এক জাতীয় বন্যবৃক্ষের প্রাচুর্য বশতঃ গ্রামের নাম হয়েছিল পীড়রাবনী। এখানে চন্দ্রশেখর শিব, শিবের গাজন এবং 'জাঙ্গাল' পর্ব বিশেষ উল্লেখ্য। চন্দ্রশেখর শিবমন্দির ছাড়াও এখানে রয়েছে বিষ্ণুমন্দির, রাসমঞ্চ, রাধারমণ ও রাধারাণী বিগ্রহ ও বিগ্রহগুলির মন্দির।

মালিয়াড়া—বড়জোড়া থানার বর্ধিষ্ণু গ্রাম মালিয়াড়া দেবভাষা সংস্কৃত সাধনার একটি সুপ্রাচীন পীঠস্থান। এখান থেকে প্রাপ্ত প্রায় দুই শতাধিক পুঁথি পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রহশালাগুলিকে করেছে সমৃদ্ধ। চন্দ্রাধূর্য পদবীযুক্ত কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণ জমিদারেরা এখানে রাজসম্মানে সম্মানিত হয়েছেন বহু শতাব্দী যাবৎ। ব্রিটিশ রাজত্বে কোলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি দিগম্বর চট্টোপাধ্যায় এই গ্রামেরই মানুষ ছিলেন। মালিয়াড়ার দুর্গাপূজা বিখ্যাত। আর বিখ্যাত ছিল অতীব সুন্দর একটি নবরত্নমন্দির। বর্তমানে মন্দিরটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

চূয়াগাড়া — বেলবনীর উত্তরে এক কিমি. দূরত্বে অবস্থিত শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মদাস উদাসীন প্রতিষ্ঠিত চূয়াগাড়া আনন্দ আশ্রম এবং আশ্রমে অনুষ্ঠিত জগদ্ধাত্রী পূজার জন্য জনপ্রিয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি ব্রহ্মদাস উদাসীন বিষ্ণুপুরের মৌনীবাবার শিষ্য ছিলেন, ছিলেন সিদ্ধ-সাধক। হিংস্র বাঘের সাথে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত তাঁকে।

অমরকানন—বাঁকুড়া শহরের প্রায় ১৫/১৬ কিলোমিটার উত্তরে অবস্থিত অতীতকালের মাছরাঙা জঙ্গল বর্তমানে অমরকানন নামে প্রসিদ্ধ। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় জেলার রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রস্থল ছিল মাছরাঙা। আন্দোলনের প্রধান পথপ্রদর্শক ছিলেন গোবিন্দপ্রসাদ সিংহ এবং একনিষ্ঠ কর্মী ছিলেন অমরনাথ চট্টোপাধ্যায়। অমরনাথের অকালমৃত্যুতে দেশমাতার এই ত্যাগী সন্তানের স্মৃতিকে অমর করে রাখার মহৎ উদ্দেশ্যে মাছরাঙা জঙ্গলটির নামকরণ করা হয় অমরকানন। এখানের রামকৃষ্ণ-মন্দিরের উদ্বোধন করেন জাতির জনক মহাত্মা-গান্ধী। সুভাষ বসু, নজরুল সহ অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীর পদধূলিতে ধন্য অমরকানন। কাজী নজরুল ইসলামের অমরকাননকে নিয়ে লেখা গানটি কবির অমরকানন-প্রীতির স্মৃতিস্মারক।

গোংদোয়া—অমরকাননের প্রায় ৬/৭ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে রয়েছে শালিনদীর জলে বাঁধ দিয়ে তৈরী লাবণ্যময়ী ললনার সৌন্দর্যেভরা জল চিক্ চিক্ আলো ঝিক্‌মিক্ এক জলাধার। বৃক্ষ সুষমায় শ্রীমণ্ডিত এই জলাধারটি একটি আদর্শ পিক্‌নিক্ স্পট্ তথা বনভোজনস্থল।

কোড়োপাহাড়—রুক্ষ্ম-শুষ্ক বাঁকুড়ার বুকে কোড়োপাহাড় যেন পাথর আর নুড়ি পাথরের একটি টিউমার বা আব স্বরূপ। দীর্ঘাকার এই পাহাড়টি লম্বায় প্রায় ৮০০ ফুট এবং উচ্চতায় মাত্র ৪০০ ফুটের মত। অমরকাননের খুবই নিকটেই অবস্থিত এই পাহাড়টির উপরে রয়েছে অষ্টভুজা সিংহবাহিনী পার্বতী মূর্তি এবং উক্ত দেবীর শ্রীমন্দির। মন্দিরটির পশ্চাদ্‌ভাগে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে শিবলিঙ্গ। নিঝুম, নির্জন পরিবেশে গাছ-গাছালিতে ভরা এই মন্দিরের উত্তর দিকে রয়েছে একটি আশ্রম। জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিতে এই মন্দির ও আশ্রমের শোভা হৃদয় চুরি করার মত — এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

বিহারীনাথ পাহাড় ও বেহারী গ্রাম —জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে রয়েছে বাঁকুড়ার সর্বোচ্চ পাহাড় বিহারীনাথ। ৪৪৭·৭৫ মিটার উচ্চ বিহারীনাথের পাদদেশে প্রবাহিত দামোদর নদ। দামোদরের ক্রোড়ে অবস্থিত তরঙ্গায়িত শৈলমালার সমন্বয়ে রূপসী প্রকৃতির রূপের পূজার নৈবেদ্য স্বরূপ এই পাহাড়টি জেলার গৌরব। পাহাড়টির উত্তর-পূর্ব-কোণের পদমূলে রয়েছে প্রায় ৫০ ফুট উচ্চ নয় কোণ বিশিষ্ট আধুনিক কালে নির্মিত বিহারীনাথের শ্রীদর্শন শিব-মন্দির। মন্দিরাভ্যন্তরের মধ্যস্থলে পিতলের পাতে মোড়া একটি কুণ্ড বা গর্তের মধ্যে বিহারীনাথ শিবলিঙ্গের শীর্ষভাগ মাত্র দর্শনীয়। বিহারীনাথ-মন্দিরের উত্তর দেওয়ালের একটি প্রকোষ্ঠে বিন্ধ্যবাসিনী দেবীর মূর্তি ছাড়াও মন্দিরে রয়েছে আরো কয়েকটি দেব-দেবী-মূর্তি। প্রাচীর ঘেরা এই মন্দির-চত্বরের পূর্ব দিকের কালীমন্দিরে কালী ঠাকুর এবং পার্বতী-মন্দিরে শ্বেত পাথরের পার্বতী দেবী রয়েছেন প্রতিষ্ঠিতা। মন্দির-চত্বরের উত্তরে রয়েছেন বার হাত বিশিষ্ট, নাগছত্র শোভিত প্রস্তর নির্মিত প্রায় পাঁচফুট উচ্চ লোকেশ্বর বিষ্ণুমূর্তি। এছাড়া মন্দিব-চত্বরের একটি আঁকড় সহ একটি নিমবৃক্ষ মূলের বেদীতে রয়েছেন পাথরের পার্শ্বনাথ মূর্তি। অতীতে বিহারীনাথ ছিল জৈনতীর্থ ও শৈবতীর্থ। বর্তমানে বাবা বিহারীনাথের মাহাত্ম্যগুণে এটি একটি শৈবতীর্থে সমুত্তীর্ণ হয়েছে। বিহারীনাথের সমাদর শুধু বাঁকুড়া জেলা নয়, বাঁকুড়া এবং বাঁকুড়ার পার্শ্ববর্তী পুরুলিয়া জেলা জুড়ে বাবার খ্যাতি। বিহারীনাথ শিবের নামানুসারে পাহাড়টির নাম হয়েছে বিহারীনাথ, আবার বিহারীনাথ মন্দির সংলগ্ন পুকুরটি হয়েছে 'শিবগঙ্গা' কুণ্ড। শিবগঙ্গা কুণ্ডের জল পরম পবিত্ররূপে বিবেচিত হয়। শিশুদের মস্তক মুণ্ডনের পর শিবগঙ্গার জল দিয়ে নবজাতকদের স্নান করানো গ্রামের একটি মাঙ্গলিক ধর্মীয় প্রথা। শিবগঙ্গার জলেই গ্রামের দেব-দেবীগণের পূজা-আর্চা হয়ে থাকে। শিবের গাজন এবং পাঁচদিন ব্যাপী শিবরাত্রির মেলা ও শ্রাবণের জলধারা উপলক্ষ্যে এখানে ভক্তসমাগম হয় কাতারে কাতারে। মেলা বসে পাহাড়ের কোলে। শীতের মরশুমে বসে চড়ুই-ভাতির মেলা। মাইল কয়েক জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এবং জেলার উত্তরে অতন্দ্র প্রহরীর মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকা এই পাহাড়ের নীচে রয়েছে 'Black Diamond' অর্থাৎ কালো হীরে বা কয়লা। বিহারীনাথ থেকে মেজিয়া যাওয়ার পথের বাঁ দিকে শুধু সারিবদ্ধ পাহাড় আর টিলা। "বিস্তীর্ণ পাদদেশ, তীক্ষ্ম চূড়া। রূপান্তরিত হর্ণব্লেণ্ডিক শিলায় গঠিত শরীর। মালিয়াড়া পর্যন্ত এই শিলার ছোটোবড় টিলাগুলো দৃপ্ত ভঙ্গিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকে। ধূসর সাদাটে রঙ শৈলশিরায় দাগ কাটা কাটা।" (পশ্চিমবঙ্গ দর্শন, বাঁকুড়া পৃঃ—২৩-২৪) গাত্রাভরণে বৃক্ষ ও লতাগুল্মের অলঙ্কার। বর্ধমান জেলার বার্ণপুরের ঠিক দক্ষিণে বিহারীনাথ পাহাড় এবং রাণীগঞ্জের সামনা-সামনি দক্ষিণে দাঁড়িয়ে থাকা মেজিয়া পাহাড়ে বিহার করে মন মজানো যায় গবেষণার জারক-রসে।

তিলুড়ি—বিহারীনাথ পাহাড়ের উত্তরে পাহাড়-সংলগ্ন অবস্থায় রয়েছে বেহারী গ্রাম। বেহারী গ্রামের প্রায় তিন কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত তিলুড়ি গ্রাম। 'তিলি' প্রধান এই গ্রামের নামকরণ সম্ভবতঃ 'তিলিডিহি' থেকে 'তিলুড়ি' হয়েছে। গ্রামের একটি সুপ্রাচীন বটবৃক্ষমূলে অবস্থিতা শিলাময়ী উড়েশ্বরী দেবী এই গ্রামের সর্বজনপূজ্য গ্রামদেবী। এছাড়া নটরাজ, বুদ্ধ ও শিব গ্রামবাসীদের উপাস্যদেবতা। রথযাত্রা, চড়কমেলা ও চৈত্রমাসে অনুষ্ঠিত উড়েশ্বরী দেবীর মেলা গ্রামের প্রধান উৎসব।

ঢেকিয়া—ঢেকিয়া গ্রামটি বহু দেব-দেবীর দৈবশক্তির প্রভাব-পুষ্ট। এঁদের মধ্যে বরুণেশ্বর-অনাদিলিঙ্গ, হরপার্বতী, নারায়ণ, ভৈরবরাজ, বিরিঞ্চি, চণ্ডী, কালী, মঙ্গলা প্রভৃতি দেব-দেবী রয়েছেন পুরোভাগে, আর সবার পুরোভাগে রয়েছেন বরুণেশ্বর শিব। গ্রামের প্রধান উৎসব বরুণেশ্বর শিবের গাজন ও গাজন উপলক্ষ্যে দুই দিন ব্যাপী মেলা।

শুশুনিয়া পাহাড় — বিহারীনাথ জেলার বৃহত্তম পাহাড় হলেও শুশুনিয়ার আকর্ষণ অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী। বিহারীনাথের মতই শুশুনিয়া পাহাড়ের অবস্থানও জেলার উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তে। ৪৩৯·৫২ মিটার উচ্চ শুশুনিয়া পাহাড়ের নামকরণ সম্ভবতঃ 'শিশুনগ'-এর রূপান্তর। ৩·২১ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য এই পাহাড়টিকে দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটি ক্লান্ত হাতি তার শুঁড় বিস্তার করে অলস মেজাজে শুয়ে আছে। পরস্পর সংলগ্ন দুটি চূড়ার সমন্বয়ে গঠিত এই পাহাড়টি নানা কারণে ঐতিহ্যপূর্ণ। মারাংঢেরীগুহা, ভালুকগুহা, ভরতগুহা নামক তিনটি গুহা রয়েছে এই পাহাড়ে। একটি গুহার মধ্যে পাওয়া গেছে অনেকগুলি বিষ্ণুশিলা। "প্রত্নপ্রস্তর যুগের অসংখ্য আয়ুধ বা অস্ত্র এবং প্লিস্টোসিন যুগের হস্তী, অশ্ব, মহিষ প্রভৃতি এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগের জীবাশ্ম যথা 'পেলিয়োলোক্সোজেন নেমাডিকাস'-এর শিলাভূত চোয়াল এখানে পাওয়া গেছে।"[১] শুশুনিয়া পাহাড়ের উত্তর-পূর্ব-গাত্রে রয়েছে সুপ্রাচীন শিলালিপি। শিলালিপির পাঠোদ্ধারে জানা যায় খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে সিংহবর্মণ এবং চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে তাঁর পুত্র চন্দ্রবর্মণ এতদঞ্চলে রাজত্ব করেছিলেন। গবেষকগণ মনে করেন শুশুনিয়ার এই শিলালিপিই এযাবৎ প্রাপ্ত বাংলা হরফের আদি-নমুনা। এছাড়া শুশুনিয়া পাহাড়ে আছে তিনটি জলধারা। এর মধ্যে একটি শিলালিপির পাদদেশে, একটি পাহাড়ের পূর্বদিকে আর একটি পশ্চিমে। পশ্চিমের জলধারাটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই জলধারা বা ঝর্ণাটির কাছেই রয়েছে একটি শিবলিঙ্গ এবং প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু একটি পাথরের নৃসিংহ মূর্তি। আর রয়েছে একটি কালী-মন্দির ও সাধু আশ্রম। পর্যটকেরা এখানে পূজা দেন। আশ্রমের সাধুমহারাজ গোপীনাথদা ও শম্ভুদার সাথে ঘনিষ্ঠতার সূত্র ধরে প্রায়ই এখানে এসেছি, থেকেছি এবং অনেক অনেক রাত কাটিয়েছি পাহাড়ে, পাহাড়ের কোলে। পূর্ণিমা রাত্রে শুশুনিয়ার সাথে আমিও স্নিগ্ধ চন্দ্রালোকে অবগাহন করেছি। রোমান্টিক ভাবালুতায় রাত্রি নিশীথে ধ্যানমগ্ন শুশুনিয়ার শান্তসৌম্য ভাবগম্ভীর রূপ দেখে বিস্মিত হয়েছি। এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি, ঈশ্বরীদেবী হলেন গ্রাম-শুশুনিয়ার গ্রাম-দেবী, বহুমান্যা জাগ্রতা দেবী।

শুশুনিয়া, বিহারীনাথ, কোড়োপাহাড় ছাড়াও জেলার খাতড়া থানার মশক ও লেভি পাহাড় এবং রাণীবাঁধ থানার ছেঁদাপাহাড় বিশেষ উল্লেখ্য।

---

১. বাঁকুড়া পরিচয়, পৃঃ—৩৭

কুস্থলিয়া — শুশুনিয়া থেকে ১০/১২ কি.মি. দূরে জেলার উত্তর সীমান্তে অবস্থিত কুস্থলিয়া গ্রামে রয়েছে শ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ মহারাজের যোগ্য শিষ্য স্বামী আত্মানন্দ মহারাজ পরিচালিত কুস্থলিয়া আশ্রম। অতীব মনোরম এই আশ্রমটিতে ওঁ প্রণব মন্ত্রের উপাসনা করা হয়। অ উ ম্ এই ত্রিবর্ণাত্মক ওম্ বা ওঁ শব্দটি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের বীজমন্ত্র স্বরূপ।

অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেণ ত্রয়ো মতাঃ।।

'হরি ওঁ—এই মহামন্ত্র জপ ছাড়াও ধর্মশাস্ত্র পাঠ ও আলোচনার মাধ্যমে আশ্রমটি স্থানীয় এবং দূরাগত ভক্ত-শিষ্যদের হৃদয়কে ব্রহ্ম ও ঈশ্বর উপাসনার উর্বর ক্ষেত্রে রূপান্তর করার ব্রতে বুঝিবা সদা সচেষ্ট। এ ছাড়া প্রবীণ সন্ন্যাসী স্বামী আত্মানন্দ মহারাজ আয়ুর্বেদিক চিকিৎসার দ্বারা মানুষকে সুস্থ-সুন্দর জীবন দানেও যেন সতত নিরত। এতদর্থে তিনি অনুকরণীয় এবং প্রণম্য।

ছাতনা — সামন্ত রাজাদের রাজধানী ছাতনার অপর নাম বাশুলীনগর। কথিত আছে ১৩২৫ শকাব্দে শঙ্খ রায় নামক দিল্লীরাজের জনৈক সামন্ত এই অঞ্চলটি জয় করেন এবং রাজরোষে পড়েন। অনন্তর স্বীয় গ্রাম বেহুলানগরে ফিরে যান। পররবর্তীকালে ঘটনাচক্রে তিনি বাশুলী দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়ে ছাতনা থানার বোলপুকুরিয়া দীঘির নিকট বসবাস শুরু করেন। এখানেই তাঁর সৌভাগ্যের উদয় হয়। পরে তাঁর পুত্র উত্তর হামীর রায় রাজ্য বিস্তার করে রাজা উপাধি লাভ করেন। বাশুলী দেবীর কৃপাধন্য উত্তর হামীর দেবীর জন্য এক বিশাল মন্দির নির্মাণ করেন ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ নাগাদ। ১৮৭১-৭৩ খৃষ্টাব্দে নির্মিত বাশুলী দেবীর পঞ্চরত্ন-মন্দির সহ বাশুলী দেবী এবং বাশুলী-সাধক তথা সেবক বড়ু চণ্ডীদাসের জন্মস্থান হিসেবে ছাতনার বিশেষ প্রসিদ্ধি।

কেঞ্জেকুড়া—ছাতনা থেকে মাত্র ৫/৬ কি.মি.-র মধ্যে রয়েছে কেঞ্জেকুড়া গ্রাম। ভক্তিসারং গোস্বামী প্রভুর শিষ্য কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এখানের শ্রীশ্রীচৈতন্যগৌড়ীয় মঠ একটি আদর্শ দর্শনীয় পুণ্যধাম। মহাপ্রভুর উপাসনার ফলে গ্রামটি যেন আজ বৈষ্ণবীয় ভক্তিরসে জারিত।

কমলপুর, আঁটুড়িবনা, জামতড়া ও বনকাটি—বাঁকুড়া থেকে প্রায় ৩০/৩২ কি.মি. পশ্চিমে অবস্থিত তাম্বুলী প্রধান অঞ্চল **কমলপুরের** শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুরের শ্রীমন্দির এবং কমলপুর থেকে ৬ কি.মি. দূরত্বে উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত **আঁটুড়িবনা** গ্রামের শ্রীশ্রীরাধা-শ্যামসুন্দর জীউর নব-নির্মিত শ্রীমন্দির সহ যুগল বিগ্রহ অবশ্য দর্শনীয় বস্তু। আঁটুড়িবনার ২ কি.মি. পশ্চিমে স্থিত **জামতড়া** গ্রামে ভাদ্র-সংক্রান্তি তিথিযোগে অনুষ্ঠিত 'ছাতা পরব' ও গ্রামের দে পরিবারের কুলদেবতা বিষ্ণুনারায়ণ শিলার রাস উৎসব উপলক্ষ্যে অভিনীত 'দিনযাত্রা' এবং বাবুপাড়ার ক্ষত্রীয় পরিবারের শারদীয়া দুর্গোৎসব বিশেষ উল্লেখ্য। এছাড়া জামতড়া গ্রামের পশ্চিমে প্রায় ৩ কি.মি. দূরে অবস্থিত **বনকাটি** গ্রামে রয়েছে এক বয়োবৃদ্ধ সাধু-মহাত্মা প্রতিষ্ঠিত বৃন্দাবনধাম ও নবকুঞ্জ শ্রীমন্দির। রামনবমী উপলক্ষ্যে এখানে ন'দিন ব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন এবং হাজার হাজার নর-নারায়ণ সেবাও একটি স্মরণীয় উৎসব।

শালতোড়া—জেলার উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত শালতোড়া গ্রাম তন্ত্র-সাধনার পীঠস্থান। স্বাস্থ্যকর স্থান এবং তরঙ্গায়িত শৈলমালার সুষম শ্রেণীবিন্যাসের রূপলালিত্যের মাধুর্যে শ্রীমণ্ডিত হওয়ার সুবাদে গ্রামটির সুখ্যাতি সর্বত্র।

ঝাঁটিপাহাড়ী—ছাতনা থানার অন্তর্গত বর্ধিষ্ণু গ্রাম ঝাঁটিপাহাড়ী শিবঠাকুরের 'হুজুগে গাজন' এবং রথযাত্রার জন্য প্রসিদ্ধ। জ্যৈষ্ঠ মাসের ২৫ ও ২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত এই গাজন উপলক্ষ্যে বিরাট মেলা বসে ফি-বছর।

জিড়রা—ঝাঁটিপাহাড়ীর নিকটবর্তী জিড়রা গ্রাম ক্ষুদেপাড়া শিবঠাকুর ও দক্ষিণাকালীর মাহাত্ম্যগুণের জন্য প্রসিদ্ধ।

মেট্যালা—ছাতনা থানার অন্তর্গত মেট্যালা গ্রামের দর্শনীয় পুরাবস্তু হল শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারয়ণ জীউ-এর পঞ্চরত্ন বিশিষ্ট শ্রীমন্দির। ইষ্টকনির্মিত পূর্বমুখী, সুশ্রী এই মন্দিরটি দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ২২ ফুট এবং উচ্চতায় প্রায় ৪০ ফুট। এখানের দুর্গাপূজা, রাস, দোল, জন্মাষ্টমী ও রামনবমী উৎসবের বেশ নাম-ডাক আছে জেলায়।

মেট্যালা গ্রামের নামকরণের পিছনে রয়েছে একটি উপভোগ্য ইতিহাস। কথিত আছে মল্লভূমের জনৈক মল্লরাজা বর্গী আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য উত্তর-প্রদেশের মৈনপুর থেকে একদল পদাতিক সৈন্য নিয়ে আসেন। উক্ত সৈন্যবাহিনীর জনৈক তিলকচন্দ্র রায় বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় পরিতুষ্ট মল্লরাজা তিলকচন্দ্রকে বর্তমানের মেট্যালা অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে জমি বা মাটি দান করেন। পর্যাপ্ত পরিমাণে ভূসম্পত্তি অর্থাৎ মাটি লাভের সুবাদে হিন্দুস্থানী সৈন্যগণ তিলকচন্দ্রকে 'মাটিওয়ালা' আখ্যায় ভূষিত করেন। 'মাটিওয়ালা'র অপভ্রংশে স্থানটির নাম হয়েছে মেট্যালা।

হাড়মাসড়া — জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত হাড়মাসড়া গ্রামটি সুদূর অতীতে একটি জৈনতীর্থ ছিল বলে মনে হয়। গ্রামের পরিত্যক্ত পঞ্চরথ-শিখর-দেউলটি খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতকের পূর্বে নির্মিত এবং বিশেষজ্ঞদের মতে এটি ছিল জৈনমন্দির, কারণ মন্দিরের পাশের পুকুরেই পাওয়া গিয়েছিল প্রায় পাঁচ ফুট উচ্চ ভগ্ন-নাসিকা বিশিষ্ট দিগম্বর পার্শ্বনাথের একটি প্রস্তর-মূর্তি। বর্তমানে এই নাসিকা-ভগ্ন মূর্তিটি খাঁদুরাণীর মূর্তি হিসেবে পূজিত হলেও গবেষকদের মতানুসারে এটি উক্ত মন্দিরের পার্শ্বনাথ তীর্থঙ্কর। খাঁদুরাণী ছাড়াও রায়পাড়ার লক্ষ্মীজনার্দনের দালান-মন্দির এবং বৈদ্যপাড়ার পোড়ামাটির কারুকার্য সমন্বিত নবরত্ন রাসমঞ্চ উল্লেখ্য। গ্রামের প্রধান উৎসব পৌষমেলা 'নাগর দোলার মেলা' নামে প্রসিদ্ধ।

সিমলাপাল — বাঁকুড়া শহরের দক্ষিণে অবস্থিত সুপ্রাচীন গ্রাম সিমলাপালের সর্বজন উপাস্য দেবতা বলরামজীউ-এর শ্রীমন্দিরটি প্রায় ৩৫ ফুট উঁচু এবং দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় ২২ ফুট। মাকড়া পাথরে তৈরী এই মন্দিরটির অভ্যন্তরভাগে ও বহির্ভাগে রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রস্তর মূর্তি। এর মধ্যে বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ, রাজসভায় উপবিষ্ট রাম-সীতা, অম্বিকাদেবী ছাড়াও জৈন তীর্থঙ্করের মূর্তিগুলি শিল্প-মাধুর্যে নজর কাড়ে পর্যটকদের।

রায়পুর—ইতিহাসের আলোকে ঐতিহ্যমণ্ডিত রায়পুর 'শিখর' উপাধিধারী রাজাদের রাজধানী ছিল। তার নিদর্শন হিসাবে রাজদুর্গ এবং রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে এখনও। কথিত আছে মারাঠা আক্রমণের সময় রাজপরিবারের সকলে আত্মসম্মান রক্ষার্থে শিখর সায়রে প্রাণ বিসর্জন দেন। শিখররাজের সেনাপতি মীরণ সাহ মারাঠাদের সাথে যুদ্ধে নিহত হলে শিখর সায়রের পাড়ে তাঁর সমাধি-মন্দির নির্মিত হয়। উক্ত সমাধি-মন্দিরে লোকে পূজা দেয় এবং মানত করে।

শিখরভূম রায়পুরের মহামায়ার মন্দির অবশ্য দর্শনীয় বস্তু। জাগ্রতা দেবী মহামায়ার অলৌকিক কাহিনী প্রসঙ্গে বলা হয়েছে রায়পুরের একটি জলাশয়ের পাড়ে বিষ্ণুপুরের নফর শাঁখারীকে এক তরুণী একদিন দেখা দিয়ে মন্দিরের পুরোহিতের কন্যার পরিচয়

দিয়ে নফরের কাছ থেকে শাঁখা পরেন এবং কন্যাটি তাঁর পিতার কাছ থেকে শাঁখার দাম নিতে বলেন। নফর পুরোহিতকে ঘটনার বিবৃতি দিয়ে শাঁখার দাম চাইলে পুরোহিত জানান তাঁর কোনো কন্যা-সন্তান নেই। ঘটনার রহস্য উন্মোচনে তাঁরা পুকুরপাড়ে উপনীত হয়ে তরুণীর খোঁজে হাঁক-ডাক করলে পুকুরের জলের উপর ভেসে উঠে শাঁখা-পরা দু'খানি কচি হাত। পরে দেবী মহামায়া পুরোহিতকে স্বপ্নাদেশে জানিয়ে দেন আনুপূর্বিক ঘটনাটি। দেবীর হাতে শাঁখা পরানোর সৌভাগ্যে নিজেকে ধন্য মনে করেন নফর শাঁখারী। পুকুর পাড়ে শাঁখা পরার সুবাদে পুকুরটির নাম হয় শাঁখারিয়া পুকুর। মহামায়ার শিলামূর্তির বামে মহিষমর্দিনী, ষড়ভুজা সর্বমঙ্গলা দেবী, দক্ষিণে 'তুঙ্গবিদ্যা' নামে এক দেবী ছাড়াও গণেশ মূর্তি রয়েছে মন্দিরে। কথিত আছে সুদূর অতীতে মন্দির সম্মুখে প্রোথিত হাঁড়িকাঠে নরবলি হত। আরো কথিত আছে মল্লরাজা দুর্জন সিংহের নিয়োজিত জনৈক চট্টোপাধ্যায় বংশীয় ব্রাহ্মণ পরিবার দেবীর পূজা-আর্চা করেন। পূর্বোক্ত দেব-দেবী ছাড়াও গ্রামে রয়েছেন বাসুলী দেবী।

মটগোদা—রায়পুর গ্রামের প্রায় ৪/৫ কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে মটগোদা। লোককথা এরকম—শ্যামসুন্দরপুরের রাজা সুন্দরনারায়ণ দেও ভগবানবাঁধ পুকুর থেকে স্বরূপনারায়ণ ধর্মশিলা লাভ করেন প্রায় শ'তিনেক বছর পূর্বে। উক্ত স্বরূপনারায়ণ ধর্মশিলা মটগোদা গ্রামের প্রধান দেবতা। স্বরূপনারায়ণের মন্দিরে বাঁকুড়া রায়, বেচা-রায়, ক্ষুদিরায় নামের আরো তিনটি ধর্মশিলা সহ ত্রিনয়না বস্ত্র পরিহিতা সর্বমঙ্গলা; ত্রিনয়না চতুর্ভুজা ষড়চক্রবাসিনী দেবী এবং কালীর ধ্যানে পূজিতা আর এক দেবী রয়েছেন। ফি-বছর মাঘ মাসের শেষ শনিবার থেকে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত স্বরূপ-নারায়ণের বার্ষিক উৎসব গ্রামের সবচেয়ে বড় মেলা। শনিবারে সূচনা হওয়ার সুবাদে এটি 'শনিমেলা' নামেও পরিচিত। সাঁওতালী যাত্রা এ মেলার অন্যতম আকর্ষণ; আবার তার থেকেও বড় আকর্ষণ জাগ্রত দেবতা স্বরূপনারায়ণের দেবমাহাত্ম্য।

মুকুটমণিপুর—এখানে তিনটি পাহাড়ী টিলার কোলে বাঁধ দিয়ে বশে আনা হয়েছে ভরা যৌবনের লাবণ্যে লালিত্য কুমারী এবং কংসাবতী নদীর জলরাশিকে। ৮৬ বর্গ কিলোমিটার বিস্তৃত, ৩৮ মিটার উচ্চ এবং ১০ হাজার ৯৮ মিটার দৈর্ঘ্য এই জলাধারের সূর্যোদয়, সূর্যাস্তই শুধু মনোরম নয়; চার পাশের বন-প্রকৃতি এবং ক্ষেত-খামারের মখমল মোলায়েম সবুজ শ্যামলিমার স্পর্শে, থৈ থৈ জলরাশির জল চিক্‌চিক্ আলো ঝিক্‌মিক্ ঢেউ-ভাঙা কুলুতানে, রাশি রাশি জলচর পাখির অগাধ জলরাশির উপর অলস দেহ-বিভঙ্গিমায় ডানা মেলে বসে থাকা, আবার কখনো বা ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশের বুকে কিচির মিচির বোল তুলে উড়ে চলা, নীল আকাশের বুকে ভাসমান শ্বেতশুভ্র খণ্ড-বিখণ্ডিত প্রতিবিম্বিত মেঘের কংসাবতীর জলরাশিতে অবগাহন করার অপূর্ব আকৃতি—এসব মিলিয়ে মুকুটমণিপুরের দৃশ্যটি যেন এক সুনিপুণ চিত্রশিল্পীর পটে আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য বলেই মনে হয় আপাতদৃষ্টিতে। মুকুটমণিপুরের নিঃস্বর্গীয় সৌন্দর্যের বর্ণনা করতে গিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রবীণ অধ্যাপক তথা 'জেলার নাম বাঁকুড়া' পুস্তক প্রণেতা লীলাময় মুখোপাধ্যায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় কথা না বলে যেন হয়ে উঠেছেন এক রোমাণ্টিক কবি। কাব্যময় ভাষায় মুকুটমণিপুরের জলাধারের বর্ণনা দিতে গিয়ে লিখেছেন, "স্লুইস গেটের মৃদু ধাক্কায় জলোচ্ছ্বাস যখন পাতাল ছুঁই ছুঁই ক্যানেলের মধ্য দিয়ে দু'পাশের পাথরের সঙ্গে এক্‌কা দোক্‌কা খেলতে খেলতে ঝর্ণার মৃদু ঝঙ্কার তুলতে তুলতে এগিয়ে

যায় দূর অজানার দিকে তখন মনে হয় স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তবে তা ঐখানে, ঐখানে, ঐখানে। আঁকা-বাঁকা পায়ে চলা পথে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠুন। নিমেষে উধাও হয়ে যাবেন কোন রহস্যের মায়াবী হাতছানিতে। দিকচক্রবাল রেখা—অনুচ্চ পাহাড়ী টিলায় তাও ঢাকা পড়ে গেছে। মনে পড়ে যাবে কবির বিমুগ্ধ বিস্ময়ের অকপট স্বীকারোক্তিঃ আজ যে কথা গেছে থেকে/পাহাড় উঁচু মনের আড়াল/দু'জনেই গেছি ঢেকে।"

কংসাবতীর জলাধারের বাঁধানো পাড়ের পিচ্ রাস্তা বরাবর প্রায় সাত কিমি. দূরত্বে রয়েছে এক টিলা। টিলার উপরে শিব ও পার্শ্বনাথ তীর্থঙ্করের সহাবস্থান হিন্দু ও জৈন ধর্মের মেল-বন্ধন রচনা করেছে যেন। চন্দ্রালোকিত রাত্রিতে এই টিলার উপর বসে রূপসী মুকুটমণিপুরের দিকে তাকালে বারংবার শুধু মনে হবে—'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে', অথবা তার বিপরীত প্রতিক্রিয়াও দেখা যেতে পারে, মনে হবে, 'এমনই চাঁদের আলো, মরি যদি সেও ভাল, সে মরণ স্বর্গ সমান'। আবার নৌকাবিহার করে গাছ-গাছালির সবুজ-শ্যামল দ্বীপ বনপুকুরিয়ার মায়াময় মৃগদাব, কুমারী এবং কংসাবতীর মিলনতীর্থ মুকুটমণিপুর যেন রূপের পসরা সাজিয়ে পর্যটকদের কাছে টানে আন্তরিক আবেদনে, —'এসো, দেখো, আমার রূপমাধুরী উপভোগ কর।'

অম্বিকানগর —মুকুটমণিপুর সংলগ্ন গোড়াবাড়ি অতিক্রম করে প্রায় চার কিলোমিটারের মধ্যেই রয়েছে অম্বিকানগর। জৈন-সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান অম্বিকানগরের আদি নাম হল আমাইনগর। কথিত আছে ক্ষত্রিয়রাজা জগন্নাথ দেও-এর বংশধর অনন্তধবল দেও আমাইনগরে রাজ্যস্থাপনের পর স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে জয়রামবাটী থেকে অম্বিকা দেবীকে নিয়ে এসে আমাইনগরে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেবীমাহাত্ম্যগুণে গ্রামটির নাম হয় অম্বিকানগর। অতীতকালে অম্বিকানগর শুধুমাত্র একটি গ্রাম নয়, ছিল একটি পরগনা। অম্বিকানগরে প্রায় ৬ ফুট উচ্চ অম্বিকাদেবীর শিলামূর্তি স্থাপিত রয়েছে। দেবীর প্রস্তর-নির্মিত আদি মন্দিরটির ভিত্তিবেদীর উপরেই নির্মিত হয়েছে ইষ্টক নির্মিত নতুন মন্দির। নির্মাতা রাইচরণ দেও। দেবীর মন্দিরের পাশেই দেবীর ভৈরব রূপে আখ্যায়িত শিব ঠাকুর রয়েছেন আর একটি মন্দিরে। বস্ত্রাবৃত এই দেবীর সিন্দুর প্রলিপ্ত মুখমণ্ডল এবং পদযুগলই চোখে পড়ে। অম্বিকানগরের ৩/৪ কিমি.-র মধ্যে রয়েছে পরেশনাথ গ্রাম। জৈনধর্ম-কেন্দ্র পরেশনাথ গ্রামের কোনো জৈন দেবী অম্বিকা দেবীতে উত্তীর্ণ হয়েছেন বলে অনেকেরই ধারণা।

অম্বিকাদেবীর পার্শ্বস্থিত মাকড়া পাথরের সুপ্রাচীন শিবমন্দির-গাত্রে ছত্র-শোভিত পদ্মাসনের উপর দণ্ডায়মান জৈন ঋষভনাথের মূর্তিটি খুবই মনোরম। ঋষভনাথই মন্দিরের আদি উপাস্য দেবতা বলে অনুমিত হয়, কারণ যোনীপট্টহীন শিবলিঙ্গটি যে পরে প্রোথিত হয়েছে, আগাগোড়া পাকা মন্দিরের কাঁচা মেঝে সে কথা বলে দেয়। অম্বিকাদেবীর মন্দিরের দক্ষিণে রয়েছে প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু প্রস্তরখোদিত কালুরায় নামক বীরমূর্তি। কালুরায় ডোম্‌জাতির উপাস্য দেবতা। অম্বিকাদেবী ছাড়াও গ্রামের উপাস্য আর এক দেবী হলেন সাবিত্রী দেবী।

রাণীবাঁধ —প্রকৃতি-মায়ের কৃপাধন্য খাতড়া মহকুমার রাণীবাঁধ সত্যই রূপসী রাণীর মহিমায় মহিমান্বিত। পাহাড় ও অরণ্যাবৃত রাণীবাঁধ কাঁসাই নদীর কোলে বুঝি রাণীর মর্যাদায় বসে আছে পরমানন্দে। নীল-আকাশের অথৈ নীলিমায় উদাসী মেঘের আনাগোনা,

ধ্যানগম্ভীর বিস্তীর্ণ পাহাড়ের সারি, ইতঃস্তত ছড়িয়ে থাকা শস্যক্ষেতের অনাবিল শ্যামলিমা, আর কাঁসাই-এর ঢেউ ভাঙা কুলুকুলু হর্ষধ্বনি — সব মিলিয়ে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের এই উদাত্ত আহ্বান উপেক্ষা করা প্রায় দুঃসাধ্য।

দক্ষিণ বাঁকুড়ার এই রাণীবাঁধ গ্রামটির নামকরণের পিছনে রয়েছে একটি করুণ কাহিনী। কথিত আছে, প্রবল পরাক্রান্ত কোনো রাজা স্থানীয় রাজাকে আক্রমণ করেন। আক্রান্ত রাজা আত্মরক্ষার্থে রাণীকে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেন। কিন্তু আক্রমণকারী রাজা ঘোড়া ধরে ফেলেন। রাজাকে কেটে দেন, রাণীকে বন্দী করে বেঁধে রাখেন এবং নিজের বিজয়বার্তা ঘোষণা করেন। এই চারটি ঘটনা চারটি স্থানে ঘটে। যে যে স্থানে যে যে ঘটনা ঘটেছিল সেই সেই স্থানের ঘটনাকেন্দ্রিক নাম হয়। এগুলি হল ঘোড়াধরা, রাজাকাটা, রাণীবাঁধ ও বীরথাম গ্রাম।

ঝিলিমিলি—মুকুটমণিপুরের রূপচর্চায় কৃত্রিম প্রসাধনীর প্রলেপ পরিলক্ষিত হয়, পক্ষান্তরে সহজাত সৌন্দর্যের সুষমায় শ্রীমণ্ডিত ঝিলিমিলি। ঝিলিমিলি নামটির মধ্যেই কেমন যেন মন-উদাস করা মায়ার বিস্তার। জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের প্রান্তরেখায় অবস্থিত ঝিলিমিলির নামোচ্চারণের সাথে সাথেই 'অরণ্যের অধিকার' শব্দ দুটো নৃত্য করে জিহ্বার ডগায়। চুনা পাথরের শ্বেতশুভ্র পাহাড়ীয়া টিলা, জংলী গাছের দৃষ্টিসুখকর সবুজ শ্যামলিমা, গাছের ফাঁকে ফাঁকে আকাশের নীলিমা, ঝির্‌ঝিরে ঝর্ণার পদধ্বনি, পাখ-পক্ষীর কলকাকলি, দলমা পাহাড় থেকে আগত হস্তীযূথের বৃংহিত, আর জলকেলির দৃশ্য শহর-নগরের কৃত্রিম সৌন্দর্যকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে নীরব ও সরব ভাষায় রূপসী প্রকৃতির বিজয়বার্তা ঘোষণা করছে আজও। উৎকল ব্রাহ্মণ এবং আদিবাসী অধ্যুষিত ঝিলিমিলি জেলার আরও পাঁচটা পর্যটন কেন্দ্র থেকে স্বীয় ব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। কয়েক শতাব্দী পূর্বে আগত উড়িষ্যার উৎকল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় তাঁদের সঙ্গে এনেছিলেন পুরীর মন্দিরের উপাস্য দেবতার অনুরূপ দেব-বিগ্রহ। সেই দেব-বিগ্রহ ঝিলিমিলির উপাস্য দেবতা হিসেবে পূজিত হয়ে আসছেন স্মরণাতীত কাল থেকে। ঝিলিমিলির অরণ্যজীবী আদিবাসী মানুষের দল প্রকৃতির কোলে-পিঠে মানুষ হয়ে এঁরা যেন আজ অরণ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ রূপেই প্রতিভাত। ঝিলিমিলি যাওয়ার পথে অবস্থিত তিন তিনটি 'ওয়াচ্‌ টাওয়ার্‌' থেকে বন-প্রকৃতির রূপমাধুরী দৃষ্টিগোচর করে যে আনন্দানুভূতি সঞ্চারিত হয় হৃদয়ে তার থেকে অনেক বেশী আনন্দ পাওয়া যায় 'ঝিলিমিলি' নামটি উচ্চারণ করে। জেলার মধ্যে কোন গ্রাম বা শহরের এতো সুন্দর কাব্যিক নাম আর শোনা যায় না একটিও।

তালবেড়িয়া—বৃষ্টির জল ও বনের ঢলকে বাঁধ দিয়ে তৈরী করা হয়েছে একটি কৃত্রিম হ্রদ। থৈ থৈ জল, বনজ গাছ-গাছালি আর মহীরুহ নিয়ে গড়ে ওঠা ঝিলিমিলির নিকট তালবেড়িয়া পর্যটন কেন্দ্রটি ভয়-ভূতুড়ে রহস্যে ঘেরা।

ইকোপার্ক—তালডাংরা থেকে নয় কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ইকোপার্ক বাঁকুড়ার পর্যটন-কেন্দ্রের তালিকায় একটি নব-সংযোজন। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে গড়ে ওঠা এই পার্কটিতে রয়েছে একটি জলাশয়, নৌ-বিহারের ব্যবস্থা এবং বিশ্রামাগার।

ছেঁন্দাপাথর— দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামী তথা মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্রশিক্ষার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রস্থল হিসেবে এর প্রসিদ্ধি। বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসু ও তাঁর সঙ্গীরা এখানে অস্ত্র-শিক্ষার মহড়া দিতেন।

বনগোপালপুর—জেলার হিড়বাঁধ ব্লকের বনগোপালপুর গ্রামটি সৌরগ্রাম রূপে

চিহ্নিত। গ্রামের পরিবারগুলির মধ্যে সৌরবিদ্যুৎ সরবরাহ করে গ্রামটি নতুন পথের দিশারী। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বর্তমানে রাণীবাঁধের সাতনালা গ্রামেও সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়েছে।

দেউলভিড়া—ছাতনা থানার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত অড়কষা নদীর তীরে অবস্থিত দেউলভিড়া পল্লীর মহাবিষ্ণুমন্দিরটি অতি অবশ্য দর্শনীয় পুরাবস্তু। ঐতিহাসিক নিদর্শনের সন্ধানে মাটি খুঁড়ে এখানে পাওয়া গিয়েছিল ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর মূর্তি। মূর্তি ত্রয় উক্ত বিষ্ণুমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর চুরি হয়ে যায় কয়েকবছর পূর্বে। মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে তিন দিনের মেলা বসে এখানে। পিক্‌নিক্ স্পট হিসেবেও দেউলভিড়া সমাদৃত।

ব্রজরাজপুর—বাঁকুড়া শহরের দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় ১৪ মাইল দূরত্বে রয়েছে ব্রজরাজপুর গ্রাম। শ্যামসুন্দর বিগ্রহ এবং বিগ্রহের শ্রীমন্দিরের জন্য গ্রামের প্রসিদ্ধি। কথিত আছে আজ থেকে প্রায় চারশত পঁচিশ বছর পূর্বে মহাপ্রভুর পার্ষদ পরমবৈষ্ণব গদাধর দাসের পৌত্র মথুরানন্দ গোস্বামী বৃন্দাবন থেকে রাধা-শ্যামসুন্দর বিগ্রহ যুগল নিয়ে এসে মাকড়কোল গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন প্রথমে। পরে ধলভূমের রাজার সনির্বন্ধ অনুরোধে শ্রীবিগ্রহ যুগল এই গ্রামে স্থানান্তরিত এবং প্রতিষ্ঠিত হন। শ্যামসুন্দর জীউকে কেন্দ্র করে গ্রামের প্রধান উৎসব হয় রাস ও দোল। এ মন্দিরের প্রধান বিশেষত্ব হল অতিথি অভ্যাগতেরা এখানে দিবাভাগে ঠাকুরের অন্নভোগ এবং রাত্রিতে চিঁড়া-মুড়কির প্রসাদে আপ্যায়িত হয়ে থাকেন।

সাহারজোড়া—বাঁকুড়া দুর্গাপুর বাসরুটের ধারেই রয়েছে দুজুড়ি গ্রাম। দুজুড়ি গ্রামের তিন কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত সাহারজোড়া গ্রামটি দেবী মহামায়ার মহিমাতে মহিমান্বিত। মহামায়ার মন্দির ছাড়াও এখানে আছে মদনমোহনজীউ, নন্দলালজীউ ও কালাচাঁদজীউ-এর শ্রীমন্দির। কালাচাঁদ জীউ-এর অষ্টকোণাকৃতি নবরত্নবিশিষ্ট রাসমন্দিরটি দেখার মত। শারদীয়া দুর্গোৎসব গ্রামের প্রধান উৎসব।

গোঁসাইপুর—বাঁকুড়া-রাইনগর (রাইনা) রেলপথে (বর্তমানে রেল চলাচল বন্ধ) প্রায় ২৬ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত গোঁসাইপুর বহু দেব-দেবীর গ্রাম। রাধাগোবিন্দ, গোপাল, দামোদর, শিব, কালী, ভবানী ও ভৈরব এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এখানের প্রধান উৎসব রাসযাত্রা, গাজন এবং বৈশাখ মাসের হরিনাম সংকীর্তন মেলা। এখানের প্রায় দুই শত বছরের পুরানো গাজন উৎসবটি 'গঙ্গাধর গাজন উৎসব' নামে সুখ্যাত।

জগন্নাথপুর—বাঁকুড়া-বেলিয়াতোড় বাসরুটের গদারডিহি মোড় থেকে ৪ কিলোমিটার দূরত্বে রয়েছে জগন্নাথপুর পল্লী। এখানের রত্নেশ্বর শিবের মাহাত্ম্যের জন্যই গ্রামের প্রসিদ্ধি। অনেকের ধারণা বৃক্ষাদি পরিবেষ্টিত ছায়াশীতল নির্জন পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটির নির্মাতা মল্লরাজা বীর হাম্বীর। রাজানুগ্রহে রত্নখচিত অলঙ্কারে সুশোভিত থাকার সুবাদেই মন্দিরটির নাম হয় রত্নেশ্বর-মন্দির। কথিত আছে মহারাজ বীর হাম্বীর দেব-বিগ্রহের সেবা-পূজা এবং মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে মহারাজ গোপাল সিংহ দেব-বিগ্রহের সেবা পূজার জন্য প্রভূত ভূসম্পত্তি দান করেন। মন্দিরাভ্যন্তরে একটি কুণ্ডের মধ্যে অবস্থিত রত্নেশ্বর শিবলিঙ্গটিকে কেউ কেউ অনাদি শিবলিঙ্গ বলেও অভিহিত করেন। রত্নেশ্বর শিবের গাজন খুবই জনপ্রিয়। গাজনের ভক্তদের অষ্টাঙ্গে বাণফোঁড়ার দৃশ্যটি অত্যন্ত আকর্ষণীয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করি,

জগন্নাথপুরের নিকটস্থ হামীরহাটি গ্রামের 'বীর বাঁধ' মল্লরাজা বীর হাম্বীর খনন করান।

জগদল্লা—দুর্গা মন্দির, মনসা মন্দির, সরস্বতী মন্দির, তিন তিনটি সন্ন্যাস ঠাকুর ও দুটি কালভৈরব ঠাকুরের থান সহ পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট রাধামাধব মন্দিরের জন্য জগদল্লা বিখ্যাত। প্রায় চারশত বছরের পুরানো রাস, দোল ও কালীয়দমন উৎসবের মধ্যে ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা-ত্রয়োদশী তিথিতে অনুষ্ঠিত কালীয়দমন উৎসবটি গ্রামের সর্বপ্রধান উৎসব।

আসনাসোল—বাঁকুড়া থেকে রায়পুরগামী বাসরুটের বেনজিয়া গ্রামে নেমে মাইল দুই হাঁটাপথে যেতে হয় আসনাসোল। জাগ্রতা দেবীরূপে খ্যাত আসনাসিনী গ্রাম-দেবীর অবস্থানের সুবাদেই গ্রামটির নাম হয়েছে আসনাসোল। হাতিঘোড়ার মূর্তিতে পূজিতা এই দেবী সুবৃষ্টির দেবী। দেবীর ঘট উল্টে গেলে অতিবৃষ্টি বন্ধ হয়—ভক্তজনের এরূপ বিশ্বাস। গ্রামের প্রধান বার্ষিক উৎসব, আসনাসিনী দেবীর 'দাঁতাল' উৎসব।

রাজগ্রাম—বাঁকুড়া শহরের দক্ষিণে অবস্থিত বর্ধিষ্ণু গ্রাম রাজগ্রাম সূতাজাত বস্ত্র, লুঙ্গি, গামছা, বেড়্শীট, বেড্কভার প্রভৃতির জন্য বিখ্যাত। এখানের ইষ্টক নির্মিত টেরাকোটার শিল্প সুষমায় শ্রীমণ্ডিত নবরত্ন শ্রীমন্দিরটি দর্শনীয়। এছাড়া এখানের বাসুলী ও শালগ্রাম মন্দিরও উল্লেখ্য।

বিক্রমপুর —ওন্দা থেকে ৭/৮ কিমি. দূরত্বে অবস্থিত বিক্রমপুর গ্রামের ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে নির্মিত উড়িষ্যার শিখর দেউল ধাঁচের রাধাকৃষ্ণের দেবালয়টি ছিমছাম সৌন্দর্যে ভরা। জগমোহন সহ মাকড়া পাথরের এ মন্দিরটি জেলার অন্যতম পুরাকীর্তি।

মুক্তাতোড় —সাহারজোড়া গ্রামের ২/৩ কিমি.-র মধ্যে স্থিত মুক্তাতোড় গ্রামের নাড়ুগোপালের দালান মন্দিরটি টেরাকোটা অলঙ্করণে শোভিত। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের উপাস্য দেবতা নাড়ুগোপাল, গ্রামবাসীদের নাড়ুগোপাল তথা বালকৃষ্ণ প্রীতির পরিচয় দেয়।

শহর বাঁকুড়া —বাঁকুড়া শহরের মন্দিরগুলি বয়সের ভারে ভারাক্রান্ত না হলেও জেলার মন্দির স্থপতির ক্ষেত্রে মন্দিরের সংখ্যা-বৃদ্ধির পাশাপাশি শহরটিকে এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। "বাঁকুড়ার মন্দিরগুলির মধ্যে নতুনগঞ্জ মহল্লার 'নিস্তারিণী কালীমন্দির', রায়পুরের 'কালীমন্দির', রামপুরের 'বড়কালীর মন্দির', লক্ষ্মীতোড়ার 'শ্মশানকালীর মন্দির', উমেশ দত্ত লেনের 'দুর্গামন্দির', কুচকুচিয়ার 'পাষাণকালীর মন্দির', 'দশেরবাঁধ শিবমন্দির', পাঠক পাড়ার 'গোপালজীউর মন্দির ও 'রাধাবল্লভজীউর মন্দির', 'ঘটকপাড়ার 'শ্যামসুন্দরজীউর মন্দির', রাসতলার 'রাসমঞ্চ', দোলতলার 'দোলমঞ্চ', রামপুরের 'রঘুনাথজীউ মন্দির', নূতনগঞ্জের 'শনিঠাকুরের মন্দির' ও 'গৌরাঙ্গমন্দির' (নিত্যানন্দ আশ্রমে অবস্থিত) ; রামকৃষ্ণ মিশন রোডের 'রামকৃষ্ণ মন্দির', স্কুল-ডাঙার 'ব্রাহ্মমন্দির', স্টেশন রোডের 'মাড়োয়ারী মন্দির', নতুনপট্টির 'খৃষ্টান চার্চ' ইত্যাদির উল্লেখ করা যেতে পারে।" ভৈরবথানের দুর্গামন্দির এবং ভারত সেবাশ্রম সংঘের আশ্রমও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এছাড়া বাঁকুড়ার উত্তরে অবস্থিত সতীঘাট সতীদাহ প্রথার স্মৃতিস্মারক হিসেবে স্মরণীয়। প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর রামকিঙ্কর বেইজ এবং পণ্ডিতপ্রবর ব্যক্তিত্ব আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, প্রতিভাধর লেখক অবিনাশ চন্দ্র দাস এবং পণ্ডিত অমরনাথ ভট্টাচার্য বিদ্যার্ণব প্রমুখ গুণীজনের জন্মস্থানের গৌরবেও গৌরবান্বিত শহর বাঁকুড়া।

এক্তেশ্বর—বাঁকুড়া শহরের দক্ষিণ-পূর্বে প্রবাহিত দ্বারকেশ্বর নদীর উত্তর তীরে এক্তেশ্বর গ্রাম। বাঁকুড়া থেকে এক্তেশ্বরের দূরত্ব মাত্র তিন কিলোমিটার। গ্রামের উপাস্য দেবতা এক্তেশ্বরের নামে গ্রামের নাম, না গ্রামের নামানুসারে হয়েছে দেবতার নাম? এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর মেলেনি আজও। দ্বি-ধারায় বিভক্ত ঐতিহাসিক ও গবেষকগণের মধ্যে একদল যদি গ্রামের পক্ষে ভোট দেন, অন্যদল তখন ভোট দিয়েছেন দেবতার পক্ষে। আবার এক্তেশ্বর নামের তাৎপর্য নিয়ে নানা জনের নানা মত। **কেউ কেউ বলেন শত শত বছর পূর্বে এই গ্রামের রাজা জাতি-ধর্ম, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষকে একই পংক্তিতে বসিয়ে ভোজন করিয়ে সমস্ত মানুষকে একতা সূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন—এজন্যই গ্রামের নাম হয়েছে এক্তেশ্বর।** আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির মতে **বেদোক্ত একপাদ ঈশ্বরের ক্ষুদ্র সংস্করণ হল এক্তেশ্বর।** অবশ্য এ উক্তির সাথে এক্তেশ্বর শিবের সামঞ্জস্য নেই। আবার গবেষক মাণিকলাল সিংহ থেকে শুরু করে অনেকেই বলেছেন রাজ্যের সীমা নিয়ে সামন্তভূমের রাজা দ্বিতীয় উত্তর হামিরের সাথে মল্লভূমের রাজা বীর মল্লের ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধে একবার। পাঁচ শত বছর পূর্বে সংঘটিত এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের নিষ্পত্তির জন্য স্বয়ং দেবাদিদেব রণক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়ে উভয়কেই মারণাস্ত্র ত্যাগ করিয়ে একতা সূত্রে আবদ্ধ করেন এবং মল্লভূম ও সামন্তভূমের সীমা নির্দেশ করে দেন। **পরস্পর বিবদমান দুই রাজাকে একতা বন্ধনে আবদ্ধ করার সূত্রে একতার ঈশ্বর রূপে তিনি এক্তেশ্বর নাম ধারণ করেন।** মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রতিষ্ঠাকাল সম্বন্ধে গবেষক মাণিকলাল সিংহের বক্তব্য স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন, "১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মল্লভূমের রাজা বীরমল্ল দ্বারকেশ্বর নদের তীরে এক্তেশ্বর শিবলিঙ্গের প্রতিষ্ঠা এবং শিব দেউল নির্মাণ করেন। ...এক্তেশ্বর শিবের নিত্য পূজা এবং উৎসব অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহার্থে বীর মল্ল বাঁকুড়া, এক্তেশ্বর এবং বেলগড্যা নামক তিনটি মৌজা উৎসর্গ করেন। উক্ত মৌজাগুলি হইতে তৎকালে ৩৭২ টাকা ৮ আনা আদায় হইত।"

বেগলার সাহেব প্রশংসিত প্রায় ৪৫ ফুট উঁচু এক্তেশ্বর মন্দিরটির গঠন-বিন্যাস অভিনব। বেশ স্থূল দেওয়াল তুলে তৈরী স্তম্ভসদৃশ এই মন্দিরটি গা ছমছম্ গাম্ভীর্যে ভরা, কারুকার্যহীন তথাপি দৃষ্টিনন্দন। সাদাসিধে অথচ সুন্দর। সারা বাংলায় এধরণের মন্দির আর নেই একটিও।

মন্দিরের উপাস্য দেবতা এক্তেশ্বর শিব প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় প্রলয় সেন তাঁর 'পশ্চিমবাংলার তীর্থ' পুস্তকের ২১২ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন—"মন্দিরের মেঝে থেকে প্রায় ৭ ফুট নীচে এবং দশটি সিঁড়ির ধাপ ধরে নেমে গেলে তবে এক প্রায়ান্ধকার চতুষ্কোণ কুণ্ডের মধ্যে পূর্বে-পশ্চিমে শায়িত প্রায় চৌদ্দ ইঞ্চি লম্বা চতুষ্কোণ নোড়ার মত আকৃতিবিশিষ্ট এক্তেশ্বর শিবলিঙ্গের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। এই শিবলিঙ্গের সঙ্গে সাধারণ শিবলিঙ্গের সবিশেষ পার্থক্য আছে। প্রথমত, এই শিবলিঙ্গটি মহিষের পিঠের মত বক্র আকৃতির। দ্বিতীয়ত, যোনীপট্টভেদকারী শিবলিঙ্গের যে আকার হয়, এটি সেইরূপ আকৃতিবিশিষ্ট নয়। কথিত আছে, এই কুণ্ড থেকে দ্বারকেশ্বর নদ পর্যন্ত মাটির তলা দিয়ে এক সংযোগরক্ষাকারী সুড়ঙ্গপথ আছে। সেই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে দ্বারকেশ্বর নদের জল এসে এক্তেশ্বর শিব-লিঙ্গকে সবসময়েই কিছুটা পরিমাণ নিমজ্জিত করে রাখে। অনেকের ধারণা, অনাদিলিঙ্গ শিব কারুর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নয়।"

পাথরের প্রাচীর ঘেরা এক্তেশ্বর শিব-মন্দিরের চত্বরে রয়েছে কয়েকটি উপমন্দির। এই সব উপমন্দিরে গণেশ, নন্দী-বৃষ, বাসুদেবের ভগ্নমূর্তি ছাড়াও রয়েছে খাঁদারাণী নামে খ্যাত এক দেবীমূর্তি। পদ্মের উপর দণ্ডায়মান, উরুতে সর্পবেষ্টিত, মস্তকে সপ্তফণাযুক্ত নাগছত্র সমন্বিত খাঁদারাণীর মূর্তিটির পরনে সন্ন্যাসীর মতো মুক্তকচ্ছ বস্ত্র। এসব দেখে এটিকে জৈনতীর্থঙ্কর বলে প্রতীত হলেও মূর্তিটির দ্বাদশ বাহু দেখে এটিকে লোকেশ্বর বিষ্ণু বলেই মনে হয়। গলায় উপবীতযুক্ত এই মূর্তিটির হস্তসমূহে জ্ঞানমুদ্রা, বরমুদ্রার পাশাপাশি অস্ত্রশস্ত্রও পরিলক্ষিত হয়। খাঁদারাণী মূর্তিটি সামগ্রিকভাবে জৈন ও হিন্দুধর্মের সমন্বয়কেই সূচিত করে। এক্তেশ্বর-মন্দিরের চৌহদ্দির মধ্যে কালরুদ্র শিবলিঙ্গ এবং মৃত্যুঞ্জয় শিবলিঙ্গদ্বয়ও প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন।

জাগ্রত দেবতারূপে স্বীকৃত এক্তেশ্বর শিবের গাজন বিখ্যাত এবং বহুমান্য। "মল্লরাজ গোপাল সিংহ এক্তেশ্বরনাথের সেবাপূজাদি সু-নিষ্পন্ন করার জন্য একদা বহু ভূসম্পত্তি দেবোত্তর করে দেন।" (পশ্চিমবাংলার তীর্থ, পৃঃ-২১৩)

লোদনা —ভেদুয়াশোল সন্নিকটস্থ লোদনা গ্রামটির নামকরণ হয়েছে লদাসিনী নামক গ্রাম-দেবীর নামানুসারে। লদাসিনী দেবীর মন্দিরে চণ্ডী, শীতলা, মনসা, দুর্গা, বিষ্ণু, কালাচাঁদ, গোপাল, জটাধারী প্রভৃতি দেব-দেবী রয়েছেন। এছাড়া এ গ্রামে রয়েছে একটি পাতালফোঁড় শিব-লিঙ্গ। শিব ছাড়াও বোলতলাদিনী, কুদরাসিনী, কেলাকরাসিনী প্রভৃতি বিচিত্র নামধারী গ্রাম-দেবীর সমাবেশ হয়েছে এখানে। গ্রামে লদাসিনী দেবীর যেমন প্রভাব-প্রতিপত্তি, তেমনি প্রভাব রয়েছে পাতালফোঁড় শিবের। গ্রামের যে কোন পূজানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে লদাসিনীর পূজা করতে হয় সর্বাগ্রে, আর ১৫ই চৈত্র থেকে অনুষ্ঠিত পাতালফোঁড় শিবের গাজনের সমাপ্তি হয় পহেলা বৈশাখ। কথিত আছে মল্লরাজা গোপাল সিংহ পাতালফোঁড় শিব-মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা।

বীরসিংহপুর—ভেদুয়াশোলের নিকটবর্তী গ্রাম বীরসিংহপুরে রয়েছে নিরগিন শাহ পীরের মাজার। বিষ্ণুপুরের কুরবান বাবার মাজারে যেমন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পূজা দিয়ে থাকেন, অনুরূপভাবে নিরগিন শাহ পীরের মাজারকেও সকলেই মান্য করেন। কুরবান বাবার সমসাময়িক কালের এই সিদ্ধ পীর তৎকালের স্বনামধন্য পাঁচজন পীরের অন্যতম। প্রতিবছর মাঘ মাসের প্রথম বৃহস্পতিবারে উক্ত মাজারে পীর সাহেবের বার্ষিক উরুস উৎসব উপলক্ষ্যে হাজার দুই ভক্তের সমাগম হয়। মানত শোধ এবং পূজা দেওয়ার ভিড় জমে ভালই। উরসের পরদিন নরনারায়ণ সেবা হয় সাড়ম্বরে। মেলা বসে দু'দিনের জন্য।

বহুলাড়া—বিষ্ণুপুর-বাঁকুড়া বাসরুটের ওন্দা বাসস্ট্যাণ্ড থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রায় ৬ কিলোমিটার দূরত্বে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে বহুলাড়া গ্রাম অবস্থিত। জৈনেরা রাঢ় শব্দটিকে লাড় বলতেন। লাড় শব্দ থেকেই লাড়া শব্দটি এসেছে। বহুলাড়া বা বাহুলাড়া গ্রামের প্রসিদ্ধি সিদ্ধেশ্বর শিব ও শিব-মন্দিরের জন্য। খৃষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত, ভগ্ন শিখর বিশিষ্ট এই দেবালয়টির দৈর্ঘ্য ২৯ ফুট ৯ ইঞ্চি, প্রস্থ ২৮ ফুট ৬ ইঞ্চি এবং উচ্চতা ৬৩ ফুট। ভগ্ন শিখরটির উচ্চতা আরো ১৮ ফুট ছিল বলে জানা যায় অর্থাৎ মন্দিরটি সর্বসাকল্যে ৮১ ফুট উঁচু ছিল। এ মন্দির প্রসঙ্গে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বাঁকুড়ার মন্দির' পুস্তকের ১৩৭ পৃষ্ঠাতে লিখেছেন, "দেউল পর্যায়ে বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর শিবমন্দিরটিই যে বাঁকুড়া জেলার সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির স্থাপত্যকীর্তি সে

বিষয়ে দ্বিমত নেই।" শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী এ মন্দির সম্পর্কে লিখেছেন, "মন্দিরটির শিখরদেশ অধুনা ভগ্ন এবং অলঙ্করণগুলিও জীর্ণ হয়েছে কালের কষাঘাতে। তবুও অঙ্গ বিন্যাসের মনোহারিত্বে, আকৃতির রম্যতায় ও অলঙ্করণের বাহুল্যবর্জিত সরলতায় এই ইঁটের মন্দিরটিকে সামগ্রিকভাবে সর্বভারতীয় মন্দির স্থাপত্যকলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বলা যেতে পারে।"

ইষ্টক নির্মিত পশ্চিমমুখী এতাদৃশ মন্দিরটি বৌদ্ধ-মন্দির, জৈন-মন্দির, না হিন্দু-মন্দির এই নিয়ে গবেষক মহলের নানা জনের নানা মত। ১৯২২-২৩ খৃষ্টাব্দে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের পক্ষ থেকে মন্দির-চত্বরে খনন কার্য চালিয়ে ১৬টি বৃত্তাকার স্তূপের সন্ধান পাওয়া যায়। মৃত্যুর পর বৌদ্ধ-শ্রমণদের গোলাকার স্তূপে সমাধিস্থ করা হত। স্তূপগুলি দেখে অনেকে মনে করেন অতীতে এটি বৌদ্ধমন্দির ছিল। আবার মন্দিরাভ্যন্তরে জৈন তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের মূর্তি দেখে অনেকে এটিকে জৈনমন্দির রূপে অভিহিত করেছেন। রাঢ় বঙ্গে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের প্রভাব স্তিমিত হয়ে আসে ক্রমশঃ এবং শৈব ধর্মের ব্যাপক জনপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয় পরবর্তীকালে। অনেকের ধারণা ঐ সময় মন্দিরে সিদ্ধেশ্বর শিবলিঙ্গ স্থাপিত হয়েছেন। বর্তমানে এটি সিদ্ধেশ্বর শিবের মন্দিররূপেই স্বীকৃতি লাভ করেছে। দেবালয়টিতে সিদ্ধেশ্বর শিবলিঙ্গ, জৈনতীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথ ছাড়াও রয়েছেন গণেশ ও মহিষমর্দিনী। মন্দিরের আশেপাশে রয়েছে আরো কয়েকটি শিবলিঙ্গ। এগুলি দুয়ারী, পূজারী, খ্যান ভৈরব ও মহেশ্বর শিব নামে পরিচিত। সিদ্ধেশ্বর শিবের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উৎসব চৈত্রের গাজন।

ঘুটগোড়িয়া —গ্রামটি বড়জোড়া থেকে ২$\frac{1}{2}$ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। ঘুটগোড়িয়া গ্রামে রয়েছে বেলে পাথরের উপর সূক্ষ্ম কারুকার্য খচিত উড়িষ্যার রেখ দেউল শৈলীর একটি মন্দির। আনুমানিক সতেরোশ খৃষ্টাব্দে নির্মিত এই মন্দিরটির জন্যই গ্রামের প্রসিদ্ধি। দেবালয়টি মল্লরাজাদের স্মৃতিস্মারক।

সোনাতপল —ওন্দা থানার ভেদুয়াশোল গ্রামের নিকট হামিরাডাঙ্গা গ্রামে রয়েছে জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাবস্তু। প্রাচীন হামিরাডাঙ্গার আধুনিক নাম সোনাতপল। এখানের ইঁটের তৈরি সুবিশাল রেখ দেউলটি সোনাতপলের মন্দির নামে খ্যাত। অতীতে এটি সূর্যমন্দির ছিল মনে হয়। আনুমানিক একাদশ শতাব্দীতে নির্মিত এই মন্দিরটির কাছাকাছি সূর্য-উপাসক শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের বসবাস। মন্দির সন্নিকটস্থ কয়েকটি ঢিবি এবং এই মন্দির শালিবাহন রাজার কীর্তিরূপে কথিত। মন্দিরটি রাজ্য সরকার দ্বারা সংরক্ষিত।

গোড়াশোল—ওন্দা থানার গোড়াশোল বৈষ্ণবপ্রধান সুপ্রাচীন গ্রাম। শ্রীনিবাস আচার্যের পৌত্র বৈষ্ণবসাধক মুরলীধর গোস্বামী মল্লরাজাদের নিকট প্রভূত নিষ্কর ভূসম্পত্তি লাভ করে এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করতে থাকেন। এখানের বংশীবদনজীউ, লক্ষ্মীজনার্দনজীউ ও রঘুনাথজীউ পূর্বোক্ত মুরলী গোস্বামীর বংশধরদের দ্বারা পূজিত হয়ে আসছেন অদ্যাবধি। গ্রামের প্রধান উৎসব শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতা দেবীর পরমারাধ্যা দেবতা রাধারমণজীউর রাস উৎসব। ১৯ থেকে ২১শে অগ্রহায়ণ ফি-বছর এখানে ধুমধাম সহকারে রাস উৎসব পালিত হয় গ্রামের প্রধান উৎসব হিসেবে। ঐ সময় গোস্বামী পরিবারসমূহের এবং গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে নবান্ন-ভোগ নিবেদন করা হয় ঠাকুরকে। এই রাধারমণ বিগ্রহের একটি

অলৌকিক কাহিনী লোকমুখে আজও প্রচলিত। প্রায় ৪০০ বছর আগের কথা হেমলতা দেবী তখন জীবিতা। বিষ্ণুপুরের রাধারমণ বিগ্রহ প্রতি বছরের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে থাকেন গোড়াশোলে। গ্রীষ্মকালে ঠাকুরকে 'রাতভোগ' হিসেবে জল ছাঁকা ভাত দেওয়া হয়। গোস্বামী বংশের শিষ্যত্বের সূত্র ধরে সপার্ষদ সিমলাপালের রাজা হঠাৎ করে এসে গেছেন ঠাকুরের রাতভোগের প্রসাদ পেতে। গুরুদেব তো চিন্তায় অস্থির, কিন্তু সুস্থির থাকেন সিদ্ধ-সাধিকা হেমলতা দেবী। হেমলতা দেবীর নির্দেশে রাজাসহ সকলকেই বসিয়ে দেওয়া হয় খেতে। একটি কাঠের পিঁড়িতে বসে স্বয়ং হেমলতা দেবী জল থেকে ছেঁকে ছেঁকে তুলে দিয়েছিলেন ভাত। সকলের খাওয়ার পরও দেখা গেল সেই স্বল্প পরিমাণ ভাত যেমন ছিল তেমনি রয়েছে—এতগুলি লোক পেটভরে প্রসাদ পাওয়ার পরও। হেমলতা দেবী যে পিঁড়িটিতে বসে ভাত ছেঁকে দিয়েছিলেন সেই পিঁড়িটি আজও সযত্নে সংরক্ষিত। গোস্বামীবংশ সহ গ্রামের লোকেরা অন্নপ্রাশন থেকে বিবাহাদি, যে কোনো মাঙ্গলিক কর্মে এই পিঁড়িটিকে নিয়ে গিয়ে কুবের পাতেন—কুবেরের মতো অফুরন্ত ধন ও শ্রীবৃদ্ধির প্রত্যাশায়। আবার একই দিনে যদি একাধিক শুভানুষ্ঠান হয় গ্রামে, সেক্ষেত্রে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে একজন পান পিঁড়ি, অন্যেরা একটি নববস্ত্র পিঁড়িটিতে ছুঁইয়ে নিয়ে গিয়ে কুবের পেতে শুভকর্ম সুসম্পন্ন করেন।

ক্ষীরাইবনী —বিষ্ণুপুর শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে মাইল ১০ দূরত্বে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে রয়েছে ক্ষীরাইবনী গ্রাম। গ্রামের শ্রীমন্দিরে রয়েছেন কৃষ্ণ, বলরাম, রাধিকা, রেবতী বিগ্রহ। ঠাকুরের ভোগে প্রতিদিন ক্ষীর অর্থাৎ পায়েস নিবেদন করার প্রথাটি সুপ্রাচীন। পায়েস বা ক্ষীর নিবেদনের সুবাদে গ্রামের নাম হয়েছে ক্ষীরাইবনী।

জামকুড়ি —বিষ্ণুপুরের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত জামকুড়ি গ্রামটি সুদূর অতীতে জৈনধর্ম উপাসনার কেন্দ্র ছিল, পরে হয়েছে বিষ্ণু উপাসনাস্থল। মল্লরাজ পরিবারের একটি শাখার এখানে অধিষ্ঠান এবং মল্ল রাজবংশের দ্বারা প্রতিষ্ঠিতা দেবী দুর্গা নামান্তরে 'রাজরাজেশ্বরী' এই গ্রামের গ্রামদেবীরূপে খ্যাতা। দুর্গাপূজা গ্রামের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উৎসব।

বামিরা —পাত্রসায়ের থানার বামিরা গ্রামের নীল মহাদেবের পোড়ামাটির অলঙ্করণ শোভিত নবরত্ন মন্দিরটি জেলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাকীর্তির দাবিদার। এছাড়া ১৭ চূড়া বিশিষ্ট একটি রাসমন্দির এবং বাশুলী দেবীর মন্দিরও রয়েছে গ্রামে। এখানের নীল মহাদেবের চৈত্র-সংক্রান্তির গাজন বিখ্যাত।

বাঁকাদহ —বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পূর্বে ১২ কি.মি. দূরে রয়েছে বাঁকাদহ গ্রাম। এখানের রামেশ্বর শিব এবং জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে অনুষ্ঠিত রামেশ্বর শিবের 'দু' মেসা গাজন' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নিজ নিজ কর্মরত অবস্থায় যাঁদের উপর অকস্মাৎ ঠাকুরের ভর আসে তাঁরা গাজনের ভক্ত হন,—হ'তে বাধ্য। ভরগ্রস্ত অবস্থায় ভক্তের মাথা চালার সুবাদে এই গাজন 'মাথা-চালা গাজন' নামেও খ্যাত।

বৈতল —বিষ্ণুপুরের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত বৈতল গ্রামে রয়েছে প্রথম রঘুনাথ মল্ল নির্মিত পঞ্চরত্ন বিশিষ্ট শ্যামচাঁদের মন্দির ও আঠারো শতকে নির্মিত ধর্মরাজের মন্দির। এছাড়াও রয়েছে প্রথম রঘুনাথ প্রতিষ্ঠিত ঝগড়াইচণ্ডীর ঝগড়াভঞ্জিনী দেবীর পাথরের মন্দির এবং রাধাদামোদরের পঞ্চরত্ন মন্দির।

কুচিয়াকোল —চৈতন্য সিংহের রাজত্বকালে মল্লরাজ্য যখন খণ্ড খণ্ড হয়ে নীলামে

বিক্রী হয়ে যাচ্ছিল সেই সময় চৈতন্য সিংহের দ্বিতীয় পুত্র নিমাই সিংহ ২২টি মৌজা কিনে নিয়ে অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষভাগে কুচিয়াকোল রাজবাড়ির পত্তন করেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পরিবারটির অবদান উল্লেখ্য। সঙ্গীতানুরাগী এই রাজপরিবারে যদু ভট্ট ও রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সভাগায়ক ছিলেন। রাধাবল্লভ সিংহদেব প্রতিষ্ঠিত কুচিয়াকোল হাইস্কুলের ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে শিলান্যাস করেন স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সঙ্গীতপ্রিয় এই পরিবারেরই সুসন্তান প্রখ্যাত সঙ্গীত বিশারদ ডঃ দেবব্রত সিংহঠাকুর। জয়পুর থানার অন্তর্গত কুচিয়াকোল গ্রামে রয়েছে নাটমন্দির সহ বেশ কয়েকটি অনুপম দেবমন্দির এবং দেববিগ্রহ।

মল্লভূমের গ্রামে, গঞ্জে, শহরে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য দেবমন্দির। মন্দিরে মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত রয়েছেন নানান দেবদেবী। সেসব কথা বলতে গেলে স্বাস্থ্যবান একটি পুস্তক জন্ম নেবে। সময়ের অভাবে খুবই সংক্ষেপে এবং এলোমেলো ভাবে শোনালাম মল্লভূমের অগণিত দেব-দেবী, দর্শনীয় স্থান ও পুরাবস্তুর মধ্যে মাত্র কয়েকটির কথা। কথায় কথায় আমরা এসে গেছি বিষ্ণুপুর পরিক্রমার শেষ দ্রষ্টব্য পুরাবস্তু তথা অভিনব এবং অদ্বিতীয় শিল্পসৌধের পাদদেশে।

অধ্যায়-১৩১

রাসমঞ্চ

রাসতলা

ঐ দেখুন, নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে মিশরের পিরামিড আকৃতির এক বিশাল ইমারত। সম্মুখে দৃশ্যমান এই নয়নাভিরাম ইমারতটিই সর্বসাধারণের কাছে 'রাসমঞ্চ' নামে অভিহিত, সুবিদিত এবং সমাদৃত।

ইতিহাস বলে মল্লভূমের মহামান্য মহারাজ বীর হাম্বীর উক্ত রাসমঞ্চটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। মঞ্চটির নির্মাণকাল ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ। সবুজ সবুজ ঘাসের লনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে ৮´ ৬" উচ্চতা বিশিষ্ট ১০৮´ বাই ১০৮´ একটি বেদীর উপরেই ইষ্টক নির্মিত মূল মঞ্চটি অবস্থিত। মূল মঞ্চটি ইষ্টক নির্মিত হলেও নীচের বেদীটি কিন্তু বাঁকুড়ার 'মাকড়া পাথর' বা 'ল্যাটেরাইট স্টোন্' দ্বারা নির্মিত। খোদাই করা পাথরের উপর পাথর বসিয়ে পর পর বার পাট পাথর গেঁথে নির্মিত হয়েছে নিখুঁত চৌকা আকৃতির এই বিশাল বেদীটি।

বেদীটির নীচের অংশে চার পাট জমিন বা পাড়ের উপর প্রত্যেক দিকেই খোদিত হয়েছে ২৬টি করে স্তম্ভযুক্ত খিলান আকৃতির দরজার নক্সা। দেওয়ালের উপরের অংশে রয়েছে পঙ্কা কার্নিশ। বেদীর উত্তর দিকের দেওয়ালে জমিন থেকে প্রায় তিন ফুট উচ্চতায় রয়েছে একটি স্বেদনালী—যেটি গর্ভগৃহের সাথে সংযুক্ত রয়েছে বলে অনুমান করা যায়।

বেদীটির দক্ষিণ পশ্চিম কোণাতে ৮´×১৪½´ মাপের ছোট্ট একটি বেদীকে মঞ্চে আরোহণের সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ছোট আকারের পাঁচটি ধাপ পায়ে মাড়িয়ে ৭´×৮´ মাপের চাতাল বিশিষ্ট ছ'নম্বর সিঁড়িটিতে একটু পা ছাড়িয়ে নিয়ে আবার দু' ধাপ সিঁড়ি ভাঙ্গলেই পৌঁছে যাবেন এই বিশাল বেদীর ছাদের উপরে।

পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ চর্তুদিকেই প্রায় ১০ ফুট চওড়া চাতালের উপর পা রাখলেই মঞ্চ প্রদক্ষিণের জন্য পায়ের তলায় একটা সুড়্সুড়ি অনুভব করবেন আপনা-আপনি।

মঞ্চটি প্রদক্ষিণ করতে করতে লক্ষ্য করবেন সারিবদ্ধভাবে পাশাপাশি দণ্ডায়মান খিলান আকৃতির উন্মুক্ত দরজাগুলি যেন আপনাকে মঞ্চের অন্দরমহলে প্রবেশ করার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। সেই আন্তরিক আমন্ত্রণকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা থাকবে না আপনার। অদম্য কৌতূহল চেপে ধরবে আপনাকে। 'কি আছে ভিতরে? ভিতরে কি আছে?' একথা ভাবতে ভাবতে নিজের অজান্তেই কৌতূহলী হৃদয়ে কখন যেন ঢুকে পড়বেন সারি সারি স্তম্ভে ঘেরা মঞ্চের উদরে। মাতৃজঠরে অবস্থানকালে শিশু যেমন মায়ের সাথে হয়ে যায় একাত্মা, অনুরূপভাবে আপনিও এই রাসমঞ্চটির অভ্যন্তরে বিচরণ-কালে আমার জন্মভূমি বিষ্ণুপুরের সাথে হয়ে পড়বেন একাত্মা। এর দেওয়ালে কান পাতলে শুনতে পাবেন পুরানো দিনের হারানো কথা। গর্ভগৃহের অভ্যন্তরের আলো-আঁধারিতে চোখ রাখলে দেখতে পাবেন অনেক অনেক না-দেখা-দৃশ্য। অবিশ্যি এসব শোনা বা দেখার জন্য প্রয়োজন একটি দূরদৃষ্টিসম্পন্ন গবেষক মন ও মানসিকতা।

আমি অবিশ্যি গবেষক নই, গবেষকের অন্তর্দৃষ্টি নেই আমার। শিল্প এবং সৌন্দর্যের পূজারী আমি—আমার সেই শিল্পসত্তা এবং সৌন্দর্য-পূজার নৈবেদ্য সাজিয়ে হাজির হয়েছি রাসমঞ্চের দ্বারপ্রান্তে। লিপিবদ্ধ করব তাকে লেখনীর আঁকিবুঁকিতে।

চর্তুদিকে প্রায় দশ ফুট প্রশস্ত চাতালের মধ্যস্থলে চাতাল থেকে মাত্র আট ইঞ্চি উচ্চতায় ৮০′ × ৮০′ মাপের নিখুঁত বর্গাকার বেদীটির উপরেই রচিত হয়েছে পিরামিড্ আকৃতির এই অভিনব মঞ্চটি।

মঞ্চটির বহির্ভাগে অর্থাৎ প্রথম সারিতে স্তম্ভের সংখ্যা চল্লিশটি। ৩′ ৪″ × ৩′ ৪″ এক একটি চৌকা বেদীর উপর মধ্যস্থল সংকীর্ণ কিন্তু বার-কোণাকৃতি, কোনো কোনো ক্ষেত্রে চৌকাকৃতি এবং উর্ধ্বাংশে উভয় দিকে ক্রমশঃ ক্রমবিস্তার লাভ করে পাশাপাশি দুটি স্তম্ভ একত্রিত হয়ে যৌথভাবে রচনা করেছে কারুকার্য সমন্বিত এক একটি সুদৃশ্য খিলান দরজা। সম্মুখভাগের এই দরজাগুলির প্রস্থ এবং উচ্চতা যথাক্রমে ৪′ ৪″ × ৬′৬″ । প্রথম স্তবকে স্তম্ভের সংখ্যা ৪০টি এবং দরজার সংখ্যাও ৪০টি। দ্বিতীয় স্তবকে অনুরূপ আকৃতির স্তম্ভ এবং দরজার সংখ্যাও সমান। চতুর্দিকে মোট ৩২টি স্তম্ভ এবং ৩২টি দরজা পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয় স্তবকে পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ প্রত্যেক দিকেই ৫টি করে মোট ২০টি দরজা এবং ২০টি স্তম্ভ রয়েছে। সাদামাটা এই ২০টি স্তম্ভের মধ্যে ১৬টি হল ৪′ × ৪′ চৌকা আকৃতির। অবশিষ্ট চার কোণার দেওয়াল আকৃতির চারটি স্তম্ভ হল ইংরাজী 'এল্' টাইপের। 'এল্' টাইপের এই চারটি স্তম্ভের মাপ হল দৈর্ঘ্যে ৮′ ৩″ + ৮′ ৩″ এবং প্রস্থে ৪′।

চতুর্থ স্তবকে স্তম্ভের পরিবর্তে এসে গেছে ৩২′ ৭″ × ৩২′ ৭″ মাপের বেশ হৃষ্টপুষ্ট দেওয়াল বিশিষ্ট উপকক্ষ বা উপগৃহ। এই উপকক্ষটির পূর্ব, পশ্চিম বা উত্তর দিকে কোনো প্রবেশপথ নেই। শুধু মাত্র দক্ষিণ দিকে রয়েছে তিনটি দরজা বা প্রবেশপথ। সংকীর্ণ অথচ সুউচ্চ এই দরজাগুলি অতিক্রম করলেই এসে যাবেন গর্ভগৃহের সম্মুখে। তারপর কিন্তু 'নো এণ্ট্রি'। দেখবেন তালাবদ্ধ লৌহ-কপাট। লোহার ছাড়ের শক্তপোক্ত এই লৌহ-কপাটে চোখ রাখলে দেখা যাবে রাসমঞ্চের গর্ভগৃহ। আলো-আঁধারি দক্ষিণ

দুয়ারী এই গর্ভগৃহের পূর্ব ও পশ্চিম দেওয়ালে দেখা যায় আর একটি করে দরজা। উত্তর দিকের দেওয়ালের মধ্যস্থলে দেখতে পাবেন একটি প্রমাণ সাইজের কুলঙ্গি। সহজেই অনুমান করা যায় যে এটিই ছিল বিগ্রহ স্থাপনের জন্য নির্ধারিত স্থান বা বেদী। আর পূর্বোক্ত স্বেদনালীটির উৎসমুখ সম্ভবতঃ এই গর্ভগৃহ। স্বেদনালী, বিগ্রহ স্থাপনের কুলঙ্গি এবং পূর্ব ও পশ্চিম দিকের দরজা বিশিষ্ট প্রকোষ্ঠ (যেগুলি পুজোপকরণ রাখার নির্ধারিত স্থান বলে মনে হয়) এ সব দেখে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে রাসমঞ্চটিও কোন এক বিগ্রহের বাসস্থান ছিল মল্লরাজত্বে। সুতরাং বিগ্রহের বাসস্থান হিসেবে গর্ভগৃহটিকে গর্ভমন্দির এবং রাসমঞ্চটিকে রাসমন্দির বললেও ভুল হবে না নিশ্চয়। রাসমঞ্চটিতে মূলতঃ ৯৮টি দরজা আছে। কিন্তু গণনাপদ্ধতির এবং দৃষ্টিকোণের তারতম্য অনুসারে এই সংখ্যা বাড়িয়ে ১১৮ পর্যন্ত করা যায়। কারণ প্রথম এবং দ্বিতীয় সারির স্তম্ভগুলির মধ্যবর্তী অলিন্দ পথে রয়েছে আরো কুড়িটি খিলান। এই কুড়িটি খিলানকে কুড়িটি দরজা ধরলে ৯৮ + ২০ = ১১৮টি দরজা হয়। গর্ভগৃহ, গর্ভগৃহের উপকক্ষ এবং ৯২টি স্তম্ভ মিলে যৌথভাবে পিরামিড আকৃতির এই বিশাল ছাদটির ভার বহন করে আসছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। এই সুবিশাল ইমারতটির নির্মাণ কৌশলে কাঠ, কাঠের বীম, লোহার বীম, অ্যাঙ্গেল কিংবা রড তো দূরের কথা, একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পেরেক পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়নি। চুন-সুরকির গাঁথনি এবং ইঁটের খিলান-ছাদের এই মজবুত মঞ্চটি আধুনিক স্থাপত্য-বিদ্যা-বিশারদ্‌দের কাছেও একটি বিস্ময়ের বিষয়। সারি সারি স্তম্ভ, দরজা এবং তিন প্রস্থ অলিন্দ-পথের ফাঁকে ফাঁকে আলো-ছায়ার মায়াময় পরিবেশে লুকোচুরি খেলার ছোঁয়াচে আবেশে আপ্লুত হয় হৃদয়। থাক সেসব কথা।

মূল মঞ্চ এবং মঞ্চের মেঝে পোড়ামাটির ইঁট দিয়ে তৈরী। বিষ্ণুপুরের আর সব মন্দিরের মতোই পোড়ামাটির ইঁট এবং টালি খোদাই করে করে নির্মিত হয়েছে স্তম্ভ, খিলান এবং বহিরঙ্গের সাজসজ্জা।

অভ্যন্তরভাগের কথা শেষ করে এবার আসি মঞ্চটির বহিরঙ্গের বর্ণনায়। বাইরে থেকে এক নজরে মঞ্চটির স্তম্ভগুলির দিকে তাকালে মনে হয় যেন মল্লসৈন্যেরা সমর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারিবদ্ধভাবে। পাশাপাশি অবস্থিত স্তম্ভগুলির সংযোজনের ফলে রচিত খিলান আকৃতির দরজাগুলির উপরিভাগ লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন খসে পড়া পলেস্তারা, হাল্কা ডিজাইনের পল্কা নক্সার কাজ — যেমন প্রস্ফুটিত পদ্ম, পাখ্‌পক্ষী, কল্কা-নক্সা, গায়েন, বায়েন, নর্তকী এবং কিছু কিছু টেরাকোটার বিশেষ মূর্তি। স্তম্ভগুলির কারুকার্য সাদাসিধে কিন্তু চিত্তাকর্ষক।

মঞ্চটির বহির্ভাগের দরজাগুলির ঠিক উপরে কার্নিশ বরাবর অর্থাৎ ছাদের উপরের প্রান্তভাগে বাংলা দোচাল এবং চার-চাল ঘরের আচ্ছাদনের অনুকরণে নির্মিত হয়েছে মোট কুড়িটি গম্বুজ। এর মধ্যে চার কোণার চারটি চার-চালা গম্বুজের প্রতিটির দৈর্ঘ্য ৬ ফুট, প্রস্থ ৬ ফুট এবং উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণে রয়েছে দোচাল আকৃতির চারটি করে মোট ষোলটি গম্বুজ। এদের প্রতিটির দৈর্ঘ্য ১৪ ফুট, প্রস্থ ৬ ফুট এবং উচ্চতা প্রায় ৪ ফুট।

উক্ত কুড়িটি গম্বুজের গা ঘেঁসে নির্মিত হয়েছে পিরামিড় চূড়ার প্রথম ধাপ। ৩০টি ধাপ রয়েছে এই সৌধটিতে। ধাপে ধাপে ক্রমশঃ সংকীর্ণ হতে হতে সর্বোচ্চ ধাপের ছোট্ট চৌকা বেদীর উপর রচিত হয়েছে উল্টো কড়াই-এর মতো অর্ধবৃত্তাকার একটি গম্বুজ। আমাদের বাল্য বয়সে উক্ত গম্বুজটির মাথায় পা রেখে আমরা এভারেস্ট

অভিযানের আনন্দ অনুভব করতাম মনে মনে। এভারেস্টের চূড়ায় দাঁড়িয়ে আসমুদ্র ভারতবর্ষকে অবলোকন করে তেনজিং নোরগে যেমন আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলেন তাদৃশভাবে রাসমঞ্চের শীর্ষস্থানে পদার্পণ করে আমাদের দৃষ্টিসীমাকে দিগন্তে প্রসারিত করে বনানীর অঞ্চলে মুখ ঢাকা 'বন-বিষ্ণুপুর'-কে দেখে মনের আনন্দে কেঁপে উঠতাম তির্ তির্ করে। দিন চলে যায় বলেই চলে গেছে আপন গতিতে—স্মৃতি শুধু রয়ে গেছে মনের গভীরে।

এ যাবৎ আমরা শুধুমাত্র প্রায় ৩৫ ফুট উচ্চ মঞ্চটির দৈহিক আকৃতি প্রকৃতি এবং গঠন-প্রণালী নিয়ে এক রাশ শব্দ খরচ করেছি অমিতব্যয়ী মানুষের মতো। আসুন এবার রাসমঞ্চটির আন্তর-সৌন্দর্য, আন্তর-প্রকৃতি এবং এটি নির্মাণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণে ব্রতী হই এক্ষণে।

শক্তি সাধনার মাধ্যমেই উত্থান ঘটে বিষ্ণুপুরের। শক্তি উপাসনার মধ্য দিয়েই প্রতিষ্ঠিত হয় মল্লভূমের রাজধানী বিষ্ণুপুর। পরবর্তীকালে শ্রীনিবাস আচার্যের আগমনে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁরই প্রভাবে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচলন এবং প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয় বিষ্ণুপুরে। ফল হিসেবে শাক্ত এবং বৈষ্ণব ধর্মের অপূর্ব সমন্বয় ঘটে বিষ্ণুপুর পরিমণ্ডলে এবং কৃষ্ণ, বিষ্ণুর ছড়াছড়ি লক্ষ্য করা যায় শুধু বিষ্ণুপুরেই নয়, মল্লভূমের সর্বত্রই।

শত শত রাধা-কৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হয় এখানে। মল্লাধিপতিগণ এসব বিগ্রহের জন্য মন্দির নির্মাণ পূর্বক, বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে বিগ্রহের সেবা, পূজা এবং উৎসবাদির জন্য প্রভূত পরিমাণে দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থাদি করেছিলেন। সম্পত্তি দিয়েই ক্ষান্ত ছিলেন না মল্লনৃপতিগণ। পূজারী ব্রাহ্মণ, ভোগ রান্নার জন্য পাচক ব্রাহ্মণ, গায়েন, বায়েন, ঝাড়ুদার, চৌকিদার প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের বেতনভুক কর্মী নিয়োগ এবং তাদের দেখ্ভাল সবই করতেন তাঁরা ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে।

বছরের একটি বিশেষ সময়ে ঃ কার্তিক/অগ্রহায়ণের রাস পূর্ণিমাতে মল্লভূমে ছড়িয়ে থাকা কৃষ্ণ, রাধাকৃষ্ণ, গোপাল, নাড়ুগোপাল, গৌরনিতাই প্রভৃতি বিগ্রহগুলির সমাবেশ ঘটিয়ে মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হত রাস উৎসব। রাসমঞ্চের সুশোভন দরজাগুলিতে বিগ্রহগুলিকে স্থাপন করে পূজা, উপাসনা, ভোগরাগ এবং মধ্যযুগীয় বাজনা-বাদ্যি যথা কাড়া-নাকাড়া, শিঙা, পেঁপা, ঢাক, ঢোল, খোল, করতাল প্রভৃতি বাজনা-বাদ্যি সহযোগে আরত্রিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদ্‌যাপিত হত সেই স্মৃতি-সুখকর পবিত্র রাস উৎসব। মশালের আলোয় আলোকিত হত উৎসব প্রাঙ্গণ। এই সময় বিষ্ণুপুরের রাজা এবং রাজ-পরিবারের লোকজন সকলে মিলে যাত্রা উৎসবে মাতোয়ারা হয়ে উঠতেন। প্রয়াত শিক্ষক ও গবেষক মাণিকলাল সিংহ মহাশয়ের মতে রাঢ়বাংলায় যাত্রা উৎসবের সূচনা সম্ভবতঃ বিষ্ণুপুরেই প্রথম এবং প্রাকৃত ভাষা তথা বাংলা ভাষায় প্রথম অভিনয় হয় এখানেই।

দিন যায়, রাত যায়, সময় বয়ে যায় তার নিজস্ব ধারায়। কাল-প্রবাহের অমোঘ নিয়মে ভবিষ্যৎ হয় বর্তমান, বর্তমান হয় অতীত, অতীত হয় সুদূর অতীত। কথা হয় ইতিকথা, ইতিকথা হয় ইতিহাস।

রাসমঞ্চ আছে, আছে সেই বিগ্রহ কিন্তু আজ আর রাস-উৎসব হয় না। শুধু স্মৃতি হয়ে রয়ে গেছে রাস-উৎসবের রেশ, বেশ, স্বর্গীয় আবেশ। সেই স্বর্গীয় আবেশে আপ্লুত হয়ে সুদূরপ্রসারী অন্তর্দৃষ্টির আলোকে আলোকিত হয়ে আমরা আজ নিরীক্ষণ করবো সেই পুরোনো দিনের হারিয়ে যাওয়া রাস-উৎসব। শুনবো রাস-উৎসবের তত্ত্বকথা। এ

প্রসঙ্গে আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষাগুরু শ্রীগুরুপ্রসাদ সরকার মহাশয় তাঁর 'মল্লসংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের রাসোৎসব' পুস্তকে কি লিখেছেন শুনুন মন দিয়ে। তিনি লিখেছেন,—

"রাসমণ্ডলীর অপ্রাকৃত মহিমা অনুভববেদ্য এবং ভক্তজনের আস্বাদনের বস্তু। যে রাসমণ্ডলে ইন্দ্র-পত্নী শচীদেবী, দুর্গা ও শিব প্রবেশ করবার জন্য লালায়িত এবং প্রবেশ ক'রে ধরাও পড়লেন সে বস্তু সম্বন্ধে ধারণা সাধকের এবং ভক্তের অনুভূতিতেই বিদ্যমান। তবুও প্রাকৃত আয়োজনের মধ্যেও অনেক সময় কিছুটা অপ্রাকৃত ধরা পড়ে। সম্ভবতঃ এই অভিপ্রায়েই মল্লরাজগণ এই রাসলীলার আয়োজন করেন।

রাসমণ্ডলে নৃত্যরতা প্রত্যেক গোপী এটা অনুভব ক'রেছিল যে তাঁর কাছেই কৃষ্ণ রয়েছেন এবং তিনি সবচেয়ে ভাগ্যবতী। মল্লরাজাদের কৃষ্ণ বিগ্রহের অভাব ছিল না। প্রায় প্রত্যেক কৃষ্ণের রাধা আছে। সুতরাং মণ্ডলাকারে ওঁদেরকে সাজালে বৃন্দাবনের রাসমহিমার কিছুটা আভাস পাওয়া যেতে পারে। কৃষ্ণ-প্রেমের চূড়ান্ত পর্যায় হোল রাসনৃত্য। পঞ্চম-পুরুষার্থ লাভ ক'রবার পরে এই রাসমণ্ডলে প্রবেশের অধিকার লাভ হয়। রামচন্দ্রের বনবাসকালে কিছু ঋষি-মুনি তাঁকে ভগবানের অবতার বলে চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁরা আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে তাঁরা তাঁকে কাছে পেয়েও সম্ভোগ ক'রতে পারলেন না। রাম তাঁদিকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন দ্বাপরে আবার লীলা হবে। সেই লীলায় ঐ সহস্র বৎসরের সাধকগণ গোপীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। এবার তাঁরা এলেন অহংকার শূন্য আলাভোলা গোয়ালিনী রূপে। অহংকার থাকতে থাকতে, কোন ঐশ্বর্য নিয়ে, কোন শক্তির দম্ভ নিয়ে রাসমণ্ডলে প্রবেশ করা যায় না। তাই রাসপর্বটি সাধারণ পর্ব নয়। চৈতন্য চরিতামৃতকার বলেছেন—

'অতএব গোপীগণে নাহি কামগন্ধ।
কৃষ্ণ সে সুখ লাগি, কৃষ্ণ সে সম্বন্ধ॥'

শুধু কৃষ্ণের সুখের জন্যই তাঁরা কুলত্যাগী, আত্মহারা।

'আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিবাঞ্ছা ধরে প্রেম নাম॥'

এই প্রেম কৃষ্ণপ্রেম। 'চৈতন্য-চরিত' লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখেছেন—

'কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ॥'

এই বিশুদ্ধ প্রেমের অভিব্যক্তি হোত মল্লরাসে। তাই রাসপর্বে প্রবেশ করলে মনে হোত যেন বৃন্দাবনলীলা দর্শন করছি। উৎসবগুলির মধ্যে মানুষকে জীবন্তধর্মের স্বাদ দেওয়াই ছিল এই রাসপর্বের উদ্দেশ্য। কিন্তু এই পর্বের তত্ত্বগত দিক্ ছাড়াও আরও উল্লেখযোগ্য ব্যাপার আছে। রাসপর্বে যাঁরা বিগ্রহগুলির বেশভূষা ইত্যাদির সজ্জার ভার নিতেন তাঁদের রুচিরও প্রশংসা না করে পারা যায় না। তাঁরা যেভাবে বিগ্রহগুলি সাজান তাতে তাঁদের ভক্তি ও সূক্ষ্ম কলাজ্ঞানের পরিচয় যুগপৎ মিলে।

বিষ্ণুপুরের রাসপর্বে কালাচাঁদ ও ডেঙ্গো-রামকৃষ্ণ বিগ্রহগুলির কোন রাধা নাই। এর কারণ কি? এ সম্বন্ধে একদল পণ্ডিত মনে করেন, ভাগবতে রাধার উল্লেখ নাই। হয়তো সেই কারণে ভাগবতের মহিমাঋদ্ধ কৃষ্ণ বলেই ওঁদের রাধা নাই। আবার কেউ কেউ মনে করেন, কৃষ্ণপ্রেমে অভিমানিনী গোপীদের অহংকার চূর্ণ করবার জন্য কৃষ্ণ রাসমণ্ডল

ত্যাগ করেছিলেন। সেই গোপী পরিত্যাগী কৃষ্ণের প্রতিনিধি ঐ ডেঙ্গো-রামকৃষ্ণ। এ সম্বন্ধে ভাগবতে উল্লেখ আছে —

'কৃষ্ণ সোহাগিনী ভাবি বড় দর্প হয়।
অন্তর্যামী ভগবান্ জানে সমুদয়।।
কৃষ্ণের প্রেমেতে সবে হইয়া মানিনী।
আপনারে শ্রেষ্ঠ ভাবে যতেক গোপিনী।।
প্রসন্ন হইয়া তবে কৃষ্ণ ভগবান।
সহসা সে স্থান হতে করে অন্তর্দ্ধান।।'

এই অন্তর্দ্ধানী কৃষ্ণই বোধ হয় ঐ একক কৃষ্ণবিগ্রহ—প্রতিনিধি। বিষ্ণুপুরের রাসপর্ব মল্লভূমের বৈষ্ণবতার আদর্শ ও রুচিকেই প্রকাশ করে না— এ উৎসব মল্লবাসীদের ধর্মনিষ্ঠাকেও প্রকাশ করে।" (পৃঃ— ১৭-১৯)

বিষ্ণুপুরের রাস উৎসবের কথা শুনলেন। এবার শুনুন রাস উৎসবের উৎস-মূলের কথা।

ফুলে ফুলে হেমন্ত-প্রকৃতি যখন হাস্যময়ী, সৌরভে আমোদিত দশ দিক, কুঞ্জে কুঞ্জে মত্ত অলির গুঞ্জরণে চতুর্দিক যখন মুখরিত তখন নারায়ণ একদিন নিশিযোগে এলেন বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের রাসমণ্ডলের পুষ্পকুঞ্জে প্রবেশ করে শ্রীকৃষ্ণ অনঙ্গশরে হলেন প্রপীড়িত। "তিনি গোপিনীদের নিমিত্ত উন্মত্ত হলেন। গোপীদের কাছে তিনি বস্ত্র হরণ কালে পণ করেছিলেন যে আগামী পূর্ণিমায় তিনি তাদের সঙ্গে পুণ্য বৃন্দাবনে রাসলীলা করবেন। এখন এইসব গোপীকে কীভাবে আকর্ষণ করা যায়? কৃষ্ণের বাঁশী বেজে উঠলো। এই বাঁশীর সুর যতদূর ছন্দিত হোল সমস্তই কৃষ্ণময় হয়ে উঠলো। এই বাঁশী শুনে নিজ পরিজন ত্যাগ করে জ্ঞানহারা গোপীগণ কৃষ্ণের সন্দর্শনে ছুটে এলো। সংসার তাদিকে আর আকর্ষণ করতে পারলো না। ...ভগবানের আহ্বান যার হৃদয়ে পৌঁছেছে সে কি আর ঘরে থাকতে পারে। ' যে বাসে তার হৃদি-বাসে, সে কি বাসে বাস করে।' " (মল্লসংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের রাসোৎসব, পৃঃ-১৭)

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের নিয়ে রাসলীলা করলেন। আর সেই থেকেই প্রচলিত হল রাস উৎসব। রাস উৎসবকে আর এক অর্থে বলা যেতে পারে মিলনোৎসব বা মহামিলনোৎসব। বৃন্দাবনের রাসলীলাতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। রূপকার্থে এর অর্থ হল পরমাত্মার সাথে জীবাত্মার মিলন অর্থাৎ ঈশ্বরের কাছে জীবাত্মার আত্মসমর্পণ।

বিষ্ণুপুরের অভিনব শিল্পকর্ম রাসমঞ্চ দেখলেন, শুনলেন এখানে অনুষ্ঠিত রাস উৎসবের ইতিহাস। এখন ভাল করে শুনুন, ধীর স্থির-ভাবে কান পেতে শুনুন, দেখুন আপনারাও হয়তো শুনতে পাবেন এক চাপা কান্নার নীরব সুর। কিন্তু কে কাঁদে ওখানে? কেনই বা কাঁদে এই মর্মবিদারী করুণ সুরে?

গত ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর থেকে বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা, শ্যামরায়-মন্দির ও রাসমঞ্চ দর্শনের জন্য ভারতীয়দের ক্ষেত্রে জনপ্রতি পাঁচ টাকা এবং বিদেশীদের জন্য ২ ডলার বা ১০০ টাকা প্রবেশমূল্য ধার্য হয়েছে। তার আগে যখন তখন যে কেউ প্রবেশ করতে পারতো এখানে। আরো অনেকের মতই আমিও প্রায়ই এসেছি এখানে। এই মঞ্চের গোলক ধাঁধার মতো প্রকোষ্ঠের ভিতরে ঢুকে চুপ্‌চাপ্ বসে থেকেছি একা একা — আর প্রায়ই, বিশেষতঃ রাত্রিবেলার শুন্‌শান্ পরিবেশে দেওয়ালে দেওয়ালে,

প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে প্রতিধ্বনিত হতে শুনেছি হৃদয়ভেদী চাপা কান্নার গভীর দীর্ঘশ্বাস। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও কাউকে দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হয়েছি। প্রথম প্রথম ভাবতাম মনের ভ্রম, তারপর একদিন উপলব্ধি করলাম, কে কাঁদে, কেন কাঁদে? বুঝতে পারলাম, — এ আর কেউ নয়, নেপথ্যে বিচরণকারী অবহেলিত, অনাদৃত আমার 'বিষ্ণুপুর-জননী'। নিজের শোচনীয় পরিণতিতে মর্মাহত মাতৃস্বরূপা বিষ্ণুপুর-জননী গুম্‌রে গুম্‌রে কান্নায় ভেঙে পড়ে হামেশা। কিন্তু কি তার দুঃখ? কেনই বা নীরবে নিভৃতে অঝোরে অশ্রুপাত করে আমার 'জননী জন্মভূমি স্বর্গাদপি গরীয়সী'? এখন শুনুন আমার জন্মভূমি বিষ্ণুপুর-জননীর আত্মকথা।

অধ্যায় - ১৩২

জন্মভূমি বিষ্ণুপুর-জননীর আত্মকথা, তথা কাঁদে কেন বিষ্ণুপুর?

তোমাদের 'টুরিস্ট্-গাইড্' এই পাঁচদিন ধরে আমার সম্বন্ধে যে কথা শুনিয়েছে সে সবই আমি শুনেছি তোমাদের অলক্ষ্যে থেকে, শুনেছি কায়ার সাথে সাথে ছায়ার মতো অনুসরণ করে। তোমাদের কাছে আমাকে সর্বতোভাবে ওর তুলে ধরার প্রাণান্ত প্রয়াসে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারিনি। তার বাচন-ভঙ্গিমার জীয়ন-কাঠির স্পর্শে আমি হয়ে উঠেছি প্রাণবন্ত। হয়ে উঠেছি বাঙ্ময়। তোমাদের মতো কৌতূহলী শ্রোতা পেয়ে এই মুহূর্তে আমারও কিছু বলতে ইচ্ছে করছে। বুকের মাঝে বছরে বছরে পুঞ্জীভূত হয়ে জমে থাকা দুঃখের কথা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে হালকা হতে চাই একটুখানি। সব কথা সবার কাছে বলা যায় না। কিন্তু আমি উপলব্ধি করেছি আমাকে জানার জন্য তোমাদের রয়েছে অসীম আগ্রহ এবং বুক ভরা ভালবাসা। তাই আমাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে কিছু বলতে চাই তোমাদের। একটু মন দিয়ে শোন সেই কথা। বেশী সময় নেবো না অবশ্যই। ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবো না তোমাদের।

যুগ বদলাচ্ছে। বদলে যাচ্ছে মানুষের ধ্যান-ধারণা, চিন্তাভাবনা। বিজ্ঞানের নিত্য-নতুন আবিষ্কারের ফলে পৃথিবী হয়েছে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র। হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে ধরিত্রী। আর এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বসুধার বুকে বিন্দুবৎ একটি তিলের মতোই বসে আছি আমি। বসে আছি লোলচর্ম, ন্যুব্জ দেহে; বার্ধক্য-বিধ্বস্ত বিষণ্ণ মন নিয়ে। বেঁচে আছি অবহেলা, উপেক্ষা আর তাচ্ছিল্যের ধুলোবালি ও কাদামাটি মেখে। আবে রেনলের 'তিলোত্তমা' আজ কেমন হতশ্রী হয়েছে দেখো; লক্ষ্মীশ্রী হারিয়ে কেমন বিবর্ণ, বিদকুটে হয়ে গেছে দেখো! ২০০১ খৃষ্টাব্দের লোক-গণনার হিসেব অনুসারে ৬১, ৯৪৩ জন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতাকে কোলে নিয়ে বসে আছি আমি। এদের মধ্যে হাজার পঞ্চাশ আমার সন্তান-সন্ততি — বলা চলে আমার বুকের দুধে, আমার জলবায়ু পরিমণ্ডলে মানুষ এরা। অবশিষ্ট হাজার বারো মানুষ, যাকে বলে অতিথি-সদৃশ—ব্যবসা বা কর্মসূত্রে এখানে আসে আবার কর্মশেষে ফিরে যায় স্বস্থানে অথবা মহানগরীর বুকে ফ্ল্যাট কিনে উড়ে যায় এখানের বাড়ি বিক্রয় করে। এদের কাছে আমার কিছু প্রত্যাশা নেই। তথাপি অনাদর করি না এদের। কারণ এরা অতিথি-স্বরূপ। পক্ষান্তরে কিছু মানুষ ব্যবসা বা কর্মসূত্রে এখানে এসে বাসা বেঁধেছে। ভালবেসে রয়ে গেছে বংশানুক্রমে। এরা আমার পরিবারের সদস্য হয়ে গেছে। এদের কাছে আমার প্রত্যাশা কম। কিন্তু আমার গর্ভে জন্মসূত্রে,

আমার কোলে পিঠে, আমার বুকের দুধে, আমার আবহাওয়া পরিমণ্ডলে যারা মানুষ হয়েছে তাদের কাছেই আমার মাতৃত্বের দাবি; তাদের কাছেই আমার চাওয়া পাওয়ার প্রত্যাশা। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বড় লজ্জার বিষয় আমার গর্ভজাত হাজার পঞ্চাশ সন্তান-সন্ততির মধ্যে ক'জনই বা ভাবে আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা, হৃতশ্রী আমার শ্রী ফিরিয়ে দেওয়ার কথা। ভাববেই বা কেন? ভাববার সময় বা মানসিকতা কোথা? শাস্ত্রোক্ত পিতৃঋণ মাতৃঋণের কথা ভুলে গিয়ে জন্মদাতা পিতা এবং গর্ভধারিণী মাতাকেই ভুলে যেতে বসেছে আজকের মনুষ্য-সন্তান। বৃদ্ধ বাবা-মায়েরা আজ অবাঞ্ছিত আবর্জনার মতো মুখ থুবড়ে পড়ে থাকে ঘরের কোণে। আবার অনেক সময় স্থান হয় না ঘরের কোণেও। বোধ করি জন্ম দেওয়ার অমার্জনীয় অপরাধের জন্য নির্বাসনদণ্ডের অনুকরণে তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় কারাগারে—নামান্তরে মার্জিত ভাষায় যাকে বলা হয় 'বৃদ্ধাশ্রম'।

আমার দেহে রক্ত চলাচলের জন্য শিরা, উপশিরা এবং ধমনীর মতো পথ, রাজপথ অলিগলি সমূহ ক্রমশঃ সংকুচিত হচ্ছে। বাস, ট্রাক, ট্যাক্সি প্রভৃতি যন্ত্রযানের অবাধ বিচরণের ফলে আমার দেহের রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়ে দিনে দিনে আমার হৃদযন্ত্র হয়ে যাচ্ছে অকেজো। এবড়ো খেবড়ো রাস্তা এবং রাস্তার পাশে আবর্জনার স্তূপ দেখে ভয় পাই —মনে হয় যেন আমার দেহে হয়েছে টিউমার কিংবা ক্যানসারের মতো দুষ্ট ক্ষত। জলই জীবন। জীবন ধারণের প্রধান উপাদান জল—সেই জলের আধার স্বরূপ জলাধারগুলি সহ বাঁধগুলোর যথোপযুক্ত সংরক্ষণের অভাবে আমার দেহে জলধারণের স্থান সংকোচনের ফলে জলাধারগুলির মতোই আমিও শুকিয়ে যাচ্ছি ক্ষণে ক্ষণে খরাপ্রবণ মল্লরাজ্যের শুষ্ক বায়ুমণ্ডলে। আরো দুঃখ লাগে যখন দেখি আমার জন্মদাতা মল্লনৃপতিগণের নির্মিত ৩৬০টি মন্দিরের অনেকগুলিই ভেঙে পড়েছে, বা অযত্নে অনাদরে গাছ-আগাছার উৎপাতে ভেঙে পড়ছে এবং বিগ্রহহীন পরিত্যক্ত মন্দিরগুলির ইট-পাথর খুলে নিয়ে গিয়ে তৈরী হচ্ছে ঘর-বাড়ির দেওয়াল বা বারান্দা। কেন্দ্রীয় সরকার খান কুড়ি স্থাপত্যশৈলীর দায়িত্ব নিয়েছে, তাই বলে রাজ্য-সরকারের কাছে আমি কি কিছু প্রত্যাশা করতে পারি না? কারণ পশ্চিমবাংলাতে উত্তর ভারত বা দক্ষিণ ভারতের মতো 'টুরিস্ট স্পট' অর্থাৎ পর্যটন কেন্দ্রের বড়ই অভাব। দার্জিলিং, দীঘা, গঙ্গাসাগর, সুন্দরবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সমৃদ্ধ পর্যটন কেন্দ্রগুলি ছাড়া ঐতিহাসিক পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে কলকাতার পরই মুর্শিদাবাদের সাথে সাথে আমার নাম উল্লেখ্য। ভুবনেশ্বরের অনুকরণে আমার দেহের শোভাবর্ধনকারী লালবাঁধের পূর্ব পাড়ের অরণ্যাঞ্চলে একটি ডিয়ার পার্ক, চিড়িয়াখানা সহ সুন্দর একটি 'অভয়ারণ্য' না হোক ; 'আনন্দারণ্য' বা 'আনন্দকানন' তৈরী করা যেতে পারতো। মল্লরাজ্যের অন্তর্গত শুশুনিয়া বা বিহারীনাথ পাহাড়ে উত্তর ভারতের মনসা পাহাড়ের ন্যায় রোপ-ওয়ে তৈরী করা যেতো। আমার বক্ষদেশে অবস্থিত শূন্য মন্দিরগুলিতে দেব-বিগ্রহ স্থাপন করে ধর্ম-বিশ্বাসী ঈশ্বর-বিলাসী পর্যটকদের আরো কাছে টানা যেতো। করার ইচ্ছে থাকলে এরকম অনেক কিছুই করা যায়। ত্যাগের এবং সত্যনিষ্ঠার মনোভাব নিয়ে দেশ এবং দশের জন্য কিছু করার সদিচ্ছা থেকেই মরুভূমিও হয়ে ওঠে মরূদ্যান। পক্ষান্তরে 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা', 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম'—এই দুটি প্রবাদ বাক্যের নির্যাস যদি হয় ইষ্টমন্ত্র তাহলে মানুষ আর মানুষ থাকে না, হয়ে যায় অমানুষ। দেশের দশের কল্যাণের কথা, শ্রীবৃদ্ধির কথা তাদের কাছে বিষবৎ পরিত্যাজ্য। একটি মল্লরাজবংশ আমার বুকে যে অবিস্মরণীয় কীর্তি রেখে গেছে তাই ভাঙ্গিয়ে খাচ্ছি আমি আজও। আজ মল্লরাজা নেই, আছে জনপ্রতিনিধি তথা নির্বাচিত রাজশক্তি—কিন্তু নেই তেমন সদিচ্ছা। মল্লরাজাদের থেকেও অনেক ধনাঢ্য সন্তান রয়েছে আমার। মল্লরাজারা ছিলেন লক্ষপতি। এখন এখানে বহু

কোটিপতির ছড়াছড়ি। কিন্তু কেউ ভাবে না আমার কথা। কেউ স্বপ্ন দেখে না আমাকে নিয়ে। যারা আমাকে ভালবাসে, কিছু করতে চায়—তাদের ক্ষেত্রে হয়েছে 'সাধ থাকলেও সাধ্য নেই।' অতএব আমি ছিলাম যে তিমিরে, রয়ে গেছি সেই তিমিরেই। না, ভুল বললাম, বোধ হয় হারিয়ে যাচ্ছি আরো আরো গাঢ় তিমিরে, কিংবা চলে যাচ্ছি সর্বগ্রাসী 'ব্ল্যাক হোল'এর গর্ভে। এসব কথা ঠিক আমি বলছি না, বলছে ইতিহাস। বলছে আমার ঐতিহাসিকবৃন্দ এবং গবেষকমহল। বিশিষ্ট ঐতিহাসিক 'বাঁকুড়াজনের ইতিহাস-সংস্কৃতি' পুস্তক প্রণেতা স্নেহভাজন শ্রী রথীন্দ্রমোহন চৌধুরী তার পুস্তকের ১৭৫ পৃষ্ঠাতে লিখেছে, "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদের সূচনাকাল পর্যন্ত বাঁকুড়া ছিল নিতান্তই একটি নগণ্য গ্রামবসতি। একটি মৌজা হিসাবে বাঁকুড়ার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে।" উক্ত পৃষ্ঠার মধ্যাংশে লিখিত আছে, "এমন কি ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত অ্যাবি রাইনলের 'History of the East and West Indies' নামক গ্রন্থের মানচিত্রে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের শাসনাধীন বাংলার দুটি বৃহৎ সহর হিসাবে 'বিষ্ণুপুর' ও 'কলকাতা' বড় বড় অক্ষরে উল্লিখিত। কিন্তু বাঁকুড়ার কোন নাম নেই। অবশ্য এর তিন বছর পরে ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে রেনেলকৃত হুগলী নদীর পশ্চিমবর্তী বাংলা প্রদেশসমূহের যে মানচিত্র প্রকাশিত হয় তাতে বাঁকুড়া একটি ছোট গ্রামবসতি হিসাবে চিহ্নিত।" ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে 'নিতান্তই নগণ্য গ্রামবসতি' রূপে উল্লেখিত এবং ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে 'একটি ছোট গ্রামবসতি হিসাবে চিহ্নিত' বাঁকুড়া বৃটিশ সরকারের সুনজরে পড়ে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রশাসনিক জেলা শহরের মর্যাদা লাভ করে। তারপর থেকেই গ্রামটির বৃহস্পতির দশা শুরু হয়—সমৃদ্ধির পাশাপাশি বৃদ্ধি লাভ করে দিনে দিনে। আবার আমার জন্মের প্রায় হাজার বছর পরে 'কলকাতা' নামে যে শিশুটি জন্মগ্রহণ করল, ভাগ্যবান সেই শিশুটি অতি অল্প সময়েই হয়ে উঠল ভারতের রাজধানী, আবার রাহুর দৃষ্টি পড়ে ভারতের রাজধানীর গৌরব হারিয়ে বর্তমানে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। হয়েছে ভারতের পূর্বাঞ্চলের নয়নমণি তথা কল্লোলিনী কলকাতা। হয়েছে ভারতের চার মহানগরীর অন্যতম এক মহানগরী। পক্ষান্তরে কলকাতা থেকে হাজার বছরের বয়োজ্যেষ্ঠ হয়েও, ১৩১০ বছরের বৃদ্ধা হয়েও আমি হতে পারিনি তেমন কিছু। মল্লরাজাদের রাজ্যশাসনের অবলুপ্তির সাথে সাথে শুধু রাহু নয়, রাহু এবং শনির দশা শুরু হয়েছে আমার। তাই ক্রমশঃ উপেক্ষিত হতে হতে, এমনকি একটি জেলা শহর হওয়ার মর্যাদাটুকুও হারিয়ে আর পাঁচটা মহকুমা শহরের মতোই আমি হয়েছি একটি সাদামাটা মহকুমা শহর। আমার শ্রীবৃদ্ধির যেটুকু সম্ভাবনা ছিল তাও স্তিমিত হয়ে পড়ছে দিনে দিনে। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মহকুমা শহর হিসেবে আমি চিহ্নিত হবার পর প্রায় ৫৩ জন মহকুমা শাসক আমার উপর প্রভুত্ব করেছেন এবং ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর পৌরসভার জন্ম হওয়ার পর প্রায় ৩৪ জন পৌরপিতা তথা পৌরপ্রধান আমার কল্যাণ-সাধনে, আমার সুষম উন্নয়নে ব্রতী হয়েছে—করেছে অনেক কিছু এবং করছেও। তথাপি আমার অবচেতন মনে মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে—আমার সার্বিক উন্নয়নে, বিশেষতঃ যুগপরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে আমাকে আধুনিকীকরণের জন্য, বা ন্যূনতম পক্ষে আমাকে একটা আদর্শ পর্যটন কেন্দ্রে রূপায়িত করার জন্য কি করেছে তারা? যদি তেমন কিছু করতো তাহলে এতখানি হতশ্রী হতাম না আমি। হয়ে যেতাম না এতো বেশী সাদামাটা এবং আটপৌরে। মানছি, মহকুমা শাসকেরা না হয় পদাধিকারী বদলির চাকুরীর অতিথি স্বরূপ, কিন্তু পৌরপ্রধান সহ কাউন্সিলারগণ এবং এম. এল. এ.; এম. পি. প্রভৃতি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ তো আমারই সন্তান। তাই তাদের কাছে আমার প্রত্যাশা একটু বেশী। তারাই বা আমার প্রত্যাশা পূরণে প্রয়াসী হয়েছে কতটুকু? ক্ষমতাবান নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ

সহ আমার প্রায় পঞ্চাশ হাজার সন্তানের প্রায় নিস্পৃহ, উদাসীন মনোভাবের দরুন মর্মাহত আমি। অবশ্য এদের মধ্যে এমন কয়েকজন রয়েছে যারা আমার সুখ-সমৃদ্ধি কামনা করে মনে-প্রাণে। ক্ষমতা-শূন্য এরকম সুসন্তান চোখে পড়ে দু-চারজন। এরা অবহেলিত, উপেক্ষিত, মুমূর্ষু এবং ম্লান আমার চেহারাখানা দেখে এদের ক্ষোভ-ভালবাসা-আন্তরিকতা প্রকাশ করেছে হাতে কলম তুলে নিয়ে। যতদূর জানি আমার সন্তানদের মধ্যে আমাকে নিয়ে প্রথম যে লেখনী ধরে সে হল 'শিবদাস ভট্টাচার্য'। তার লেখা পুস্তিকার নাম, 'মল্লভূম বিষ্ণুপুর', প্রকাশকাল ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ। পয়ার ছন্দে লেখা ৩১২ পংক্তির এই কবিতাটির প্রথম কয়েকটি ছন্দ তোমাদের আবৃত্তি করে শোনাই। এখন শোনো—

মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর নগর প্রধান।
কিন্তু কে করেন রাজধানী না দেখি প্রমাণ।।

আদি মল্ল পূর্ব্বে অন্যত্রে করি রাজ্য স্থাপন।
মল্লভূমে মল্ল অব্দের করেন প্রচলন।।

বার শ বাইশ বর্ষ মল্লাব্দের পরিমাণ।
তখনও এদেশে আসেন নাই মুসলমান।।

"মল্ল" "হাম্বীর" ও "সিংহ" করি উপাধি ধারণ।
সিংহাসন প্রাপ্ত হন ক্রমে রাজা বাষট্টি জন।।

আটচল্লিশ মল্ল রাজা হাম্বীর দুই জন।
দ্বাদশ সিংহ রাজায় হয় বাষট্টি পূরণ।।

রঘু নাম আদি মল্ল সেই রূপে রাজা হন।
তাহার বৃত্তান্ত কিঞ্চিৎ অগ্রে করুন শ্রবণ।।

এভাবেই শিবদাস বিষ্ণুপুরের রাজকাহিনী বর্ণনা করেছে। বিষ্ণুপুরের রাজকাহিনী তোমরা ইতিমধ্যেই শুনেছ। সুতরাং পুরো কবিতাটি আবৃত্তি করার দরকার আছে বলে মনে হয় না। প্রথম প্রকাশিত পুস্তিকা হিসেবে-এর গুরুত্ব অপরিসীম। তাই কয়েকটি ছত্র শোনালাম তোমাদের। শিবদাসের পর **'History of Bishnupur-Raj'** লেখে **অভয়াপদ মল্লিক**, প্রথম প্রকাশ ১৯২১ খৃষ্টাব্দ। এর পর কিশোর সাহিত্যের মতো করে **'চিত্রে ও গল্পে বিষ্ণুপুর'** লিখেছে মির্জাপুরের **বিভূতি ভূষণ ঘটক** এবং একই স্টাইলে **গঙ্গাগোবিন্দ রায়** লিখেছে **'মল্লভূম কাহিনী'**। আর অত্যন্ত দরদী এবং মরমী সন্তান **ফকিরনারায়ণ কর্মকার** লিখেছে **'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী'**। জ্ঞানীব্যক্তিবর্গ এবং গবেষক মহলে এটির গুরুত্ব কম হলেও এর জনপ্রিয়তা অসাধারণ। আবার অনেকে আমার এক একটি বিশেষ দিককে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছে। যেমন **মাণিকলাল সিংহ** এখানের মানুষজন ও প্রত্নতত্ত্ব ; **চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত** এ অঞ্চলের টেরাকোটা ভাস্কর্য ও স্থাপত্যশৈলী, **গুরুপ্রসাদ সরকার** অধ্যাত্মচেতনা ও রাস উৎসব, সঙ্গীত সম্বন্ধে **ডঃ সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ দেবব্রত সিংহ ঠাকুর, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** প্রমুখ উল্লেখ্য। এছাড়া গল্প, কবিতা, গান—এসবও অনেকে লিখেছে আমাকে নিয়ে। গবেষণা করছে বছরের পর বছর পড়াশুনা করে। এদেরকে আমার খুব ভাল লাগে। এরা সাধারণ মানুষের কাছে উপেক্ষিত এবং অনাদৃত হলেও এরাই আমার সবচেয়ে আদরের ছেলে। কারণ এদের লেখাগুলি থেকেই দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে আমার খ্যাতি, আমার গাত্রে বিরাজমান শিল্পকলার কথার পাশাপাশি আর সব কিছু।

অথচ দেখ, প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। বিষ্ণুপুরের বাইরের অনেক অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি, জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি আমাকে জানতে প্রবল আগ্রহী। এদের মধ্যে **তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়**,

রমাপদ চৌধুরী, জেলার প্রাক্তন জেলা শাসক **অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়; তরুণদেব ভট্টাচার্য**, 'পশ্চিমবাংলার তীর্থ' পুস্তক প্রণেতা **প্রলয় সেন, ডেভিড ম্যাক্কাচন, হাণ্টার, হলওয়েল সাহেব, আকস অস্টার, লীনা ফ্রুজেটি** এবং **প্রভাতকুমার সাহা**—প্রমুখেরা রয়েছে পুরোভাগে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি থেকে আরো কত তরুণ-তরুণী আসে আমাকে নিয়ে পড়াশুনা করার জন্য। রিসার্চ করার জন্য। অথচ আমার সন্তান সম তরুণ-তরুণীদের আমাকে তেমন জানার আগ্রহ নেই। জানানোর চেষ্টাও করা হয়নি সেরকম। **আমার স্পষ্ট মনে পড়ে আজ থেকে বছর চল্লিশ আগে গঙ্গাগোবিন্দ রায়ের লেখা 'মল্লভূম কাহিনী' বইটি বিষ্ণুপুরের প্রায় প্রতিটি মাধ্যমিক স্কুলে দ্রুতপঠন হিসেবে পড়তে হত বাধ্যতামূলকভাবে। এখনকার ছেলেমেয়েদের দেশ-বিদেশের ইতিহাস পড়ানো হয়। হয় না বিষ্ণুপুরের ইতিহাস পড়ানো।** বিষ্ণুপুরকে নিয়ে লেখা একটি কিশোর সাহিত্য বা শিশু সাহিত্য বাঁকুড়া জেলার, নিদেনপক্ষে বিষ্ণুপুর মহকুমার বিদ্যালয়গুলিতে অন্ততঃ দ্রুতপঠন হিসেবে যদি পড়ানো হত তাহলে বিষ্ণুপুরকে তারা জানতে পারতো ভালোভাবে। জানতো, চিনতো, ভালবাসতে শিখতো। পরিণামে আমার ফল হত শুভ, হয়তো আমার শ্রীবৃদ্ধিও হতে পারতো। **দুঃখের বিষয় এখানের শিক্ষাধিকর্তাগণ এভাবে চিন্তাই করে না। তাই বলছিলাম, প্রদীপের নীচেই অন্ধকার। বিষ্ণুপুরবাসীদের অধিকাংশই বিষ্ণুপুরের ইতিহাস সম্পর্কে প্রায় অনভিজ্ঞ। বিষ্ণুপুরে বাস করব অথচ বিষ্ণুপুরের ইতিহাস জানবো না, বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে উদাস থাকব—ভাবা যায় না!**

অনেক কথা বলে একটু হালকা হলাম। আর সময় নেবো না। আমি কেমন ছিলাম এবং এখন কেমন আছি—এ নিয়ে দুটো কবিতা আবৃত্তি করে শোনাব এখন। প্রথমটিতে আমার প্রিয় সন্তান ফকিরনারায়ণ কর্মকার আমাকে মাতৃজ্ঞানে মাতৃবন্দনার সুরে আমার একটি নিখুঁত ছবি এঁকেছে নিপুণ চিত্রকরের মতোই, অথবা কথাশিল্পী অবন ঠাকুর ওরফে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতোই। এখন শোনো সেই কবিতা —

"স্বর্গপুরী বিষ্ণুপুর প্রণমি তোমারে মাতঃ।
আজিও তব বক্ষে বিরাজে কীর্ত্তি কত শত।।

পূরবে তোমার অমর কীর্ত্তি কৃষ্ণ সরোবর।
দক্ষিণে শোভে বিশাল সরসী লালদীঘি মনোহর।।

পশ্চিমে তব যমুনার বারি মধুর পদ্মগন্ধা।
বহিছে তোমার উত্তরে মাগো ক্ষুদ্র অলকানন্দা।।

চারিদিকে তব নির্ম্মল নীর মাঝে তুমি দ্বীপময়ী।
অতীত গরবে ভূষিতা হয়ে রহিয়াছ মাতঃ অয়ী।।

একদা তোমার নৃপতি-বীরের অতুল ভকতি বলে।
ত্রিদিব জীবন মদনমোহন আসিল তোমার কোলে।।

দেব আখ্যায় হইল ভূষিত তোমার নরপতি।
তোমার নৃপের অমিত প্রতাপ লভিল সিংহ খ্যাতি।।

মোঘল পাঠান কত অরাতির সুবিশাল সেনাদলে।
শস্ত্র তোমার শায়িত করিল বারে বারে অবহেলে।।

কামান তোমার দলমর্দ্দন বরষি ভীষণানল।
একদা দলিল বাংলার ত্রাস ভয়াল মারাঠাদল।।

আরও কত কহিব মাতঃ তোমার কীর্ত্তি কথা।
চিন্ময়ী দেবী মৃন্ময়ী তব বক্ষেতে প্রেমে গাঁথা।।

প্রেমেতে তুমি নদীয়া জননী বীরত্বে রাজপুতানা।
সঙ্গীতে তুমি দ্বিতীয়া দিল্লী সার্থক তব সাধনা।।

অঙ্গে তোমার বৃন্দাবনের সুমধুর মাধুরিমা।
চারিদিকে দেব দেউল তব প্রচারিছে মহিমা।।

মহামহিমায় মণ্ডিতা তুমি তুমি মহিমাময়ী।
বক্ষ তোমার তীর্থ জননী তুমি মা পুণ্যাশ্রয়ী।।

বঙ্গ বীরের অমর কীর্ত্তি বাঙ্গালীর জয় গাথা।
আজিও তব বক্ষ ব্যাপিয়া বিরাজে গো বীর মাতা।।

শত গরিমার লীলাভূমি তুমি মল্লভূম-রাজধানী।
বিশ্ব জুড়িয়া শুনিতেছি আজও তোমার সুযশ বাণী।।

ধর্ম্ম তোমার মর্ম্ম ছিল মা ছিল মহান সংস্কৃতি।
শিল্প ছিল, সাহিত্য ছিল, ছিল অপরূপ ন্যায় নীতি।।

দেশ-বিদেশের কত সুধী আসি করেছে তোমারে নতি।
বলে গেছে তারা তুমি অনন্যা তুমি মা অমরাবতী।।

প্রজার ধর্ম্ম করিতে রক্ষা বলি দিয়া প্রিয় পতি।
লভিলেন খ্যাতি মহারাণী তব পতিঘাতিনী সতী।।

তুলনা তোমার নাহি গো মাতঃ তুমি মা অতুলনীয়া।
সুযশ ধন্যা তুমি গো জননী বিশ্বের বরণীয়া।।

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস একদা বক্ষে তব।
মৃন্ময়ী মায়ে চিন্ময়ী রূপে হেরিলেন অভিনব।।

কত সাধকের পদরেণু মাখা মোদের জনমভূমি।
বাংলা মায়ের বক্ষ উজলি রহিয়াছ আজও তুমি।।"

অতীত ঐতিহ্যের আঙ্গিনায় ফকিরনারায়ণের মাতৃবন্দনার মধ্যেই বুঝতে পারলে আমি কি ছিলাম, কেমন ছিলাম। কিন্তু বড়ই লজ্জার কথা, দুঃখ ও অনুতাপের কথা আমার সেই ঐতিহ্য, আভিজাত্য, জৌলুস কিংবা জাঁকজমকত্ব আজ আর নেই। পুরানো দিনের হারানো কথার স্মৃতি রোমন্থন করতে গিয়ে কবি শক্তিপদ চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠে উৎসারিত হয়েছে বেদনার সুর। এখন লক্ষ্য কর আমি কি হয়েছি। শোনো তার কবিতা—

"কই সে' বিষ্ণুপুর—
যেথায় একদা শোনা যেত শুধু অভয় মন্ত্র সুর!

চারিদিকে আজ ঘোর অনাচার
নাহিক বীরের দল,
ধ্বংসের রূপ হেরিয়া হেথায়,
আঁখি শুধু ছলছল!
দলমর্দন পড়ে আছে আজ
মদন মোহন কই!
হায় হায় রব বাতাসেতে করে
কান পেতে শুন ঐ
কালের করাল গর্ভে আজিকে
সকলি হইল লীন,
বিষ্ণুপুরের সকল কীর্তি
তাই হইতেছে ক্ষীণ।
চরণ-চিহ্ন ফেলে গেছে যারা
গড় দরজার' পরে,
তাহাদের স্মৃতি আমাদের মাঝে
শুধু ক্ষণেকের তরে।
সন্ধ্যার কালে শেয়ালের দল
ঘোষিছে ভয়াল রব,
কালের প্রহরী গণিতেছে আয়ু
—নিঝুম আজিকে সব!
রাত্রি নিশীথে সুনীল আকাশে
নীহারিকা সব গাহিছে করুণ সুর,—
গৌরবময় ইতিহাস খ্যাত
কই সে' বিষ্ণুপুর!"

অশ্রুসিক্ত নয়নে বাক্‌রুদ্ধ-কণ্ঠে একবার অন্ততঃ স্মৃতিচারণ করি আমার গুণমুগ্ধ গুণিজনদের কথা। হাণ্টার সাহেব একদিন আমার বিশালত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন, "It was as big as the kingdom of Wales". বৈষ্ণবসাধক শ্রীনিবাস আচার্য এবং পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েই আমার নাম দিয়েছেন 'গুপ্তবৃন্দাবন'। যে শ্রীরামকৃষ্ণ বিষ্ণুপুরকে ভালবেসে সারদা মাকে বার বার বলেছেন,—বিষ্ণুপুর গুপ্তবৃন্দাবন, তুমি একবার বিষ্ণুপুর দেখো, ইত্যাদি ইত্যাদি;— সেই বিষ্ণুপুরেই রামকৃষ্ণ আশ্রমের এই দুরবস্থা দেখে আমার মনে পড়ে যায় হরিণের শিং-এর প্রশংসার ঘটনা এবং শিং-এর জন্যই ব্যাধের হাতে তার মৃত্যুর কথা। সিদ্ধ-সাধক মৌনীবাবার হরিতপোবন তথা তুড়কী আশ্রমের মর্মান্তিক অবস্থাটিও কম বেদনাদায়ক নয়। মৃন্ময়ীদেবীর প্রতিষ্ঠার হাজার বছর উদ্‌যাপিত হল অত্যন্ত অনাদরে এবং সাদাসিধেভাবে—ভাবতে দুঃখ হয়। আবেগপ্রবণ হয়ে চলে গেছি প্রসঙ্গান্তরে। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম কবি নজরুল বিষ্ণুপুরকে মানে আমাকে ভাল বেসেছে অন্তর উজাড় করে। দলমাদল কামানের গায়ে ঠেস দিয়ে একখানা ছবি তুলিয়েছিল সে। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বা ১৩৩১ বঙ্গাব্দের রাখীবন্ধনের দিন তোলা হয় সেই ছবি। পরনে ধুতি ও হাফহাতা জামা, গায়ে সাদা চাদর, পায়ে চটি জুতো, মাথার মাঝে সিঁথিকাটা ঘন চুল আর উঠতি বয়সের সৌখিন পাতলা গোঁফে শ্রীমণ্ডিত ৩২/৩৩ বছরের বিদ্রোহী যুবকের সেই মুখাবয়ব আজও ভুলতে পারিনি আমি।

সেই ছবিটি সযত্নে সংরক্ষিত আছে বিষ্ণুপুরের বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভবনে। মাঝে মাঝে সকলের অলক্ষ্যে পুত্রাধিক প্রিয় নজরুলের সেই ছবি দেখে আসি আমি। স্মৃতিমেদুর আবিলতায় আপ্লুত হই আমি। মনে পড়ে বিষ্ণুপুর কুরবানতলা মহল্লার প্রখ্যাত ঘোষ পরিবারের তথা স্বামী প্রভবানন্দের পূর্বাশ্রমের বাড়িতে বসে নজরুলের পাতা পেড়ে ভাত খাওয়ার ঘটনা। **খাওয়ার পর বাড়ির ঝি জাতপাতের দোহাই দিয়ে নজরুলের এঁটো পাতা পরিষ্কার করতে অসম্মত হলে স্বামী প্রভবানন্দের মাতা জ্ঞানদাসুন্দরী বলেছিলেন, 'অমূল্য আমার যেমন ছেলে, গোকুলও আমার যেমন ছেলে, তেমনি নজরুলও আমার ছেলে।' এই বলে জ্ঞানদাসুন্দরী ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে নজরুলের মধ্যাহ্ন-ভোজের এঁটো পাতা নিজেই পরিষ্কার করেছিল। জয়রামবাটীর সারদার মতো উঁচু মন ছিল জ্ঞানদার। নজরুল স্বামী প্রভবানন্দের বাড়ি ছাড়াও বিষ্ণুপুর মেন্ পোস্ট অফিসের সম্মুখস্থ ভূদেবচন্দ্র মণ্ডলদের বাড়িতেও এসেছিল। যতদূর মনে পড়ে মৃন্ময়ীদেবী দর্শন করে সে লিখেছিল—**

"মাগো চিন্ময়ী রূপ ধরে আয়।
মৃন্ময়ী রূপ তোর পূজি শ্রীদুর্গা,
তাই দুর্গতি কাটিল না হায়।।"

আবার এখানের মা মৃন্ময়ী এবং রাধাশ্যাম-বিগ্রহযুগল দর্শন করে ভক্তিভাবে আপ্লুত হয়ে রচনা করেছিল—

"(আমার) শ্যামা মায়ের কোলে চ'ড়ে জপি আমি শ্যামের নাম
মা হলেন মোর মন্ত্রগুরু, ঠাকুর হলেন রাধাশ্যাম।"

গান রচনা করেই ক্ষান্ত হয়নি নজরুল। স্বরচিত ভক্তিগীতি দুটি সঙ্গীতাচার্য জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীকে দিয়ে গাইয়ে পরিতৃপ্ত হয়েছিল যার-পর-নাই। কী দারুণ ঈশ্বর-প্রীতি!

নজরুলের কথা বলতে গিয়ে খুব বেশী করে মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথকে। রবীন্দ্রনাথ বাঁকুড়াতে এসেছে কিন্তু আসেনি বিষ্ণুপুরে। তাই রবীন্দ্রনাথকে খুব কাছ থেকে দেখা হল না আমার। বিশ্বজোড়া খ্যাতি যে মানুষের তাকে আপন করে কাছে টেনে নিতে পারিনি বলে দুঃখ হয় আজও।

মনে পড়ে 'কে. জি. ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউট'-এর বনিয়াদ রচনাকারী বিষ্ণুপুর প্রেমিক মহকুমা শাসক **কৃষ্ণগোপাল ঘোষ**-এর কথা, মনে পড়ে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বিষ্ণুপুরের মহকুমা শাসকরূপে আগত অন্নদাশঙ্কর রায়ের কথা। বাংলার সুসাহিত্যিক অন্নদাশঙ্কর রায়কে ভুলতে পারিনি আমি। সাহিত্যিকের কথা বলতে গিয়ে মনের আঙ্গিনায় উঁকি মারে **সমরেশ বসু**। বিষ্ণুপুরের বস্ত্র-শিল্প তথা বালুচরী শাড়ি এবং বালুচরী শিল্পী-গোষ্ঠীকে নিয়ে 'টানা-পোড়েন' উপন্যাসটি লেখার জন্য সে বিষ্ণুপুরে ছুটে এসেছে বারবার, থেকেছে মাসের পর মাস, চিত্ররূপ দিয়েছে শিল্প ও শিল্পী সমাজের। আর বিষ্ণুপুর প্রসঙ্গে উক্ত উপন্যাসের ৬৭ পৃষ্ঠাতে লিখেছে, **"বিষ্টুপুরে আর আছে কি? রথ আর দোল। বাকি সব হরিবোল হরিবোল দিয়ে শেষ।"** কথাগুলোর মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে অবজ্ঞার সুর অনুরণিত, কিন্তু এর মধ্যেই বিষ্ণুপুরের ঈশ্বর-সাধনার, বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণ-বিষ্ণু উপাসনার তথা হরিপ্রেমের জয়-জয়কার ঘোষণা করা হয়েছে। আসলে এটি একটি উত্তম ব্যাজস্তুতির দৃষ্টান্ত। সমরেশ হালকা ছলে, হালকা কথায় শ্রীরামকৃষ্ণের 'গুপ্তবৃন্দাবন'কেই সমর্থন করেছে অন্যভাবে, অন্য ভাষায়। আবার বাংলার বীর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু আমার বুকে দাঁড়িয়ে সোচ্চার কণ্ঠে ঘোষণা করে গেছেন, **"যে দেশে দলমাদলের মতো কামান তৈয়ারী হয়, আবার মদনমোহনের মতো বিগ্রহের বাসস্থান রচিত হয়, যেখানে ভগবানের নামে লোকের চোখে জল পড়ে, যেখানে দেশপ্রেম ও ভক্তির এমন**

সমন্বয় ঘটে, সে দেশ নিশ্চয়ই বাংলা তথা ভারতকে প্রেরণা দিতে পারে।" ভেবে দেখো আমার সম্বন্ধে কত বড় ধারণা ছিল তার। কত প্রত্যাশা ছিল তার। আবার আমার প্রতি চরম উপেক্ষা এবং অনাদর লক্ষ্য করে দুঃখে অভিভূত হয়ে প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ্ এবং **জাতীয় অধ্যাপক ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়** ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন। খেদোক্তি করেছেন, **"আমাদের বাঙ্গালীদের এই হিসাবে দুর্ভাগ্য—কাশী বা মাদুরা, জয়পুর বা আগরার মত একটি কলা-নগরী বাংলাদেশে গড়িয়া উঠিল না। এইরূপ একটি মাত্র নগরী সারা বাংলাদেশের মধ্যে দেখা যায়, সেটি হইতেছে বিষ্ণুপুর; বিষ্ণুপুর প্রাচীন মন্দিরে ও নানাবিধ শিল্পকার্য্যে বাংলাদেশের সমস্ত নগরগুলির শীর্ষস্থানীয়। কিন্তু এই বিষ্ণুপুরকে বাঙ্গালী জনসাধারণ চিনিল না, দেখিল না, আদর করিতে শিখিল না।"**

তাই তোমাদের কাছে আমার মমতা-মাখা আবেদন তোমরা অন্ততঃ আমাকে দেখবে, চিনবে, জানবে এবং আমার কথা ভাববে। তোমাদের সকলের কল্যাণ ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি, মল্লেশ্বরী মা মৃন্ময়ীর কাছে করজোড়ে প্রার্থনা করি তোমরা ভাল থেকো, সুখে থেকো, আনন্দে থেকো। 'বিষ্ণুপুর মেলা'তে আবার যেন পুত্রকন্যাসহ সস্ত্রীক সবান্ধবে দেখতে পাই তোমাদের। মনে রেখো। আবার এসো কিন্তু।

অধ্যায়-১৩৩

বিষ্ণুপুর মেলা ও বিষ্ণুপুর পরিক্রমার সমাপ্তি ঘোষণা এবং বিদায় সম্ভাষণ

হঠাৎ করে কোন কিছু সৃষ্টি হয় না। সৃষ্টির পিছনে লুকিয়ে থাকে সৃষ্টিতত্ত্ব। বিষ্ণুপুর মেলার কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় মেলার সৃষ্টিলগ্নের তত্ত্বকথা। শ্রদ্ধেয় লেখক ও সাংবাদিক ভগীরথ মিশ্র মহাশয়ের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বিষ্ণুপুর মেলার জন্ম। এখন স্বয়ং ভগীরথ বাবুর ভাষাতেই শুনুন বিষ্ণুপুর মেলার সৃষ্টিলগ্নের কথা। এ প্রসঙ্গে তিনি ২৪শে ডিসেম্বর ২০০২-এর 'বর্তমান' পত্রিকাতে লিখেছেন, "১৯৮৮ সালের নভেম্বর। আমি তখন বাঁকুড়ার ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত অফিসার। অর্ধেন্দুশেখর বিশ্বাস জেলাশাসক। অরুণ মিশ্র সবে মাত্র বিষ্ণুপুরের মহকুমাশাসক হয়ে এসেছেন। একদিন জেলাশাসকের বাংলোয় স্রেফ আড্ডা মারছিলাম, তখনই তুলেছিলাম কথাটা। বিষ্ণুপুরে একটা মেলা করলে কেমন হয়?

জেলাশাসক বুঝতে চাইলেন পুরো ব্যাপারটা, মেলা করে কী হবে? আমি বিষয়টা ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করি। ঐতিহ্যমণ্ডিত বিষ্ণুপুর শহর, তার প্রাচীন ইতিহাস, তার ঈর্ষণীয় মন্দির-দেউলের সম্ভার, সাত-সাতটি বিশালকায় জলাশয়, সব মিলিয়ে একটি আদর্শ পর্যটনকেন্দ্র হয়ে উঠতে পারত।

অন্য কোনও দেশ হলে কেবল বিষ্ণুপুরকে দেখিয়ে জেলাটি প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারত। খরাপীড়িত জেলাটির দুঃখ-দুর্দশার অনেক লাঘব হত। আমি জেলাশাসককে বোঝাবার চেষ্টা করি, একটা জায়গায় পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠলে কেমন একটু একটু করে বদলে যেতে থাকে তার অর্থনীতি। কেমন করে একটি চালু পর্যটনকেন্দ্রে অন্তত ২৭ রকমের অর্থনৈতিক ক্ষেত্র চাঙ্গা হয়ে ওঠে। হিসেব করে দেখাই একজনমাত্র মধ্যবিত্ত মানুষ একটি পর্যটনকেন্দ্রে এসে একদিন থাকলে, ঐ এলাকার হোটেল ও লজ-মালিক,

তাদের কর্মচারী, এলাকার পরিবহনশিল্প, মুটে-কুলি, পান সিগারেট মিঠাই তেলেভাজার দোকান, রিকশওয়ালা, ভ্যানওয়ালা, সবাই মিলে প্রায় ৩০০ টাকা মতো পেয়ে যায়। ওই টাকার একটি অংশ চুইয়ে চুইয়ে চলে যায় চারপাশের চাল-ডাল-মশলা-সবজি, মাছ-মাংস-ডিম, সব জাতের উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের হাতে। সবাই দুটো পয়সার মুখ দেখে। অনেক লোক কাজ পায়। বিষ্ণুপুরে মেলাটা করলে বহু মানুষের সমাগম হবে। জায়গাটার রমরমা বাড়বে। আসলে মেলার মাধ্যমে এদেশের পর্যটকদের কাছে জায়গাটাকে তুলে ধরা। জেলাশাসক শ্রীবিশ্বাসের একটি বড় গুণ ছিল, কোনও বিষয় তাঁকে ঠিকঠাক বুঝিয়ে বলতে পারলে তিনি আন্তরিকভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। সব শুনে তিনি বেজায় উৎসাহিত বোধ করলেন। বেশ, লাগাও তবে বিষ্ণুপুর মেলা। ওই এলাকার ২৭টি অর্থনৈতিক ক্ষেত্র চাঙ্গা হোক তবে। সেই শুরু।"

মন্দির-নগরী বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে 'বিষ্ণুপুর মেলা' এক নতুন অধ্যায়। ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মেলার সূচনা। মেলার নির্ধারিত দিন ২৩ থেকে ২৭ ডিসেম্বর। বাংলা ৭ই পৌষ থেকে ১১ পৌষ। স্থান বিষ্ণুপুর রাজদরবার সংলগ্ন পাথর দরজা, লালজীউ ও জোড়বাংলা মন্দির প্রাঙ্গণ। মেলার অনুষ্ঠানসূচীতে স্থানটিকে 'বীরহাম্বির নগর' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। মেলা শুরু হয় বৈকাল ৩টায়, চলে রাত্রি এগারটা পর্যন্ত। বারো বছর বয়সোর্দ্ধ দর্শনার্থীদের জন্য প্রবেশ মূল্য দু টাকা।

"মধ্যভারতে চন্দেল্ল রাজাদের মন্দির-নগরী খাজুরাহোর নৃত্যোৎসব, আর রাঢ়ের অপরপ্রান্তে শান্তিনিকেতনে পৌষমেলায় আঞ্চলিক সংস্কৃতির বিচিত্র প্রদর্শনী—এই দুই পরিকল্পনার সমন্বয়েই বিষ্ণুপুর উৎসবের জন্ম। লক্ষ্য প্রধানতঃ পর্যটক-আকর্ষণ, তারই সঙ্গে জড়িত বাঁকুড়ার হস্তশিল্পের প্রচার। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগ, বাঁকুড়া জেলা প্রশাসন, পূর্বাঞ্চলীয় সংস্কৃতি কেন্দ্র এবং ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দফতর যৌথভাবে ২৩-২৭ ডিসেম্বর এই উৎসবের আয়োজন করেন।"[১] পাঁচদিনের এই মেলার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকেন আপামর শহরবাসী, জেলার পল্লীবাসীবৃন্দ, দূরাগত পর্যটকবৃন্দ এবং কবি, সাহিত্যিক, শিল্পীবৃন্দ। মেলাকে অভিনন্দন জানিয়ে ভ্রাতৃপ্রতিম কবি তারাশঙ্কর চক্রবর্তী লিখেছেন —

> "আসছে মেলা বিষ্ণুপুরে
> দিল-খুশ্-খুশ্ বাঁশীর সুরে
> সম্প্রীতিতে প্রাণের প্রদীপ
> উঠছে বুকে মেতে —
>
> হাত ধরে ফের এলো মেলা
> প্রেমের দোলা খেতে!"[২]

মেলাতে কি দেখেন? কি শুনেন? আর কিসের আকর্ষণেই বা আসেন মেলা-প্রেমিক আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা?

লক্ষ্য করেছি মেলার পোস্টারে স্পষ্টাক্ষরে এবং বড় বড় হরফে লেখা থাকে **'বিষ্ণুপুর মেলা / কুটির শিল্প ও হস্তশিল্প প্রদর্শনী'**। সুতরাং মেলার মুখ্য উদ্দেশ্য যে কুটির শিল্প ও হস্তশিল্প-জাত-বস্তু সমূহের প্রদর্শন, কৌতূহলী দর্শকদের সম্মুখে বিচিত্র সব বস্তুরাজি প্রস্তুত প্রণালীর রহস্য উন্মোচন এবং বিকিকিনি—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মেলার স্টলে স্টলে শোভা পায় এমন সব কুটির-শিল্প-জাত বস্তুগুলি হল বিষ্ণুপুরের

---

১. মল্লভূমে নতুন পার্বণ — ইন্দ্রজিৎ চৌধুরী। আনন্দবাজার পত্রিকা, ৭.১.১৯৮৯
২. স্মরণিকা, বিষ্ণুপুর মেলা—১৯৯৩, পৃঃ—৫

বালুচরী শাড়ী, রেশম ও সূতী বস্ত্র, রেশম ও তসরের চাদর, গামছা, তোয়ালে, লুঙি, বেড্-শীট, বেড্-কভার ইত্যাদি, বিষ্ণুপুরী লণ্ঠন, কাঁসা পিতলের বাসনপত্র সহ মন্দির নগরীর মন্দির ও দলমাদল কামানের অনুরূপ ধাতু নির্মিত দৃষ্টিনন্দন শিল্পকার্য। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত দশ অবতার তাস ও নক্সা তাস, বিষ্ণুপুর ও হাটগ্রামের শঙ্খশিল্প, বিকনার ঢোকরা শিল্প, শুশুনিয়ার পাথরের খোদাই মূর্তি ও নিত্যব্যবহার্য বস্তুসমূহ, পাঁচমুড়ার টেরাকোটা শিল্প ও পটারি সেণ্টারের সেরামিক সামগ্রী, জগদল্লার কাষ্ঠ শিল্পসম্ভার সহ বাঁশ, বাঁশপাতা ও তালপাতার মনোরম শিল্পসম্ভার। এছাড়া কৃত্রিম উপায়ে মৌমাছি প্রতিপালন ও মধু সংগ্রহ, তুঁত চাষ, বনবিভাগের পক্ষ থেকে বহুবিধ ভেষজ লতাগুল্ম ও বৃক্ষাদি প্রদর্শনী, বনবিভাগের 'নগর ও বিনোদন বনাঞ্চল' শাখার পুষ্প, ক্যাকটাস ও পাতাবাহার গাছের সমাবেশ, স্থানীয় অঙ্কন-শিক্ষা স্কুলগুলির চিত্র প্রদর্শনী এবং স্মারক মঞ্চে জেলা, রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে পুরস্কার প্রাপ্ত শিল্পীদের বস্তু তথা সৃষ্টিধর্মী বিস্ময়কর বস্তু সমূহের প্রদর্শনী মেলা প্রাঙ্গণকে করে তুলে মাধুর্যমণ্ডিত। আলো ঝলমল পরিবেশে বাহারি আলোকসজ্জার আঙ্গিনায় শোনা যায় সুরের মূর্ছনা। মেলা-প্রাঙ্গণের মূলতঃ তিনটি মঞ্চে পাঁচদিন ব্যাপী চলতে থাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া, মল্লভূম তথা বাঙালীর সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা বিধৃত।

প্রথিতযশাঃ কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সঙ্গীতগুরুদের স্মৃতিকে জনমনে জাগরুক রাখার মহৎ উদ্দেশ্যে মেলার পাঁচটি দিনকে তাঁদের নামে নামাঙ্কিত করা হয়। যেমন ২০০০ খ্রীষ্টাব্দের মেলার ২৩শে ডিসেম্বর 'চারণকবি বৈদ্যনাথ দিবস, ২৪শে ডিসেম্বর কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় দিবস, ২৫শে ডিসেম্বর চলচ্চিত্র শিল্পী রাধামোহন ভট্টাচার্য দিবস, ২৬শে ডিসেম্বর জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী দিবস এবং ২৭শে ডিসেম্বর শিল্পী সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় দিবস রূপে প্রতিপালিত হল। তিনটি মঞ্চের প্রথমটি বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত বিশারদ যদুভট্ট মহাশয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য স্বরূপ হয়েছে **'যদুভট্ট মঞ্চ'**, দ্বিতীয়টি বাঁকুড়ার প্রখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে সমর্পিত — তাই এটি 'রামানন্দ মঞ্চ' আর তৃতীয়টি 'সুর-সরস্বতী' গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্মানার্থে 'গোপেশ্বর মঞ্চ'। এছাড়া থাকে 'লালন মঞ্চ', 'লোকমঞ্চ', ও 'মুক্ত মঞ্চ'। এসব মঞ্চে ক্রমান্বয়ে যে সব অনুষ্ঠান রূপায়িত হয় তার মধ্যেই নবীন ও প্রবীণ ঐতিহ্যের মিলনতীর্থ রচিত হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুলগীতি, লোকগীতি, কাব্যগীতি, সানাই বাদন, বাউল গান, আধুনিক গান, নাটক, আবৃত্তি, নৃত্যানুষ্ঠান, কাঠিনাচ, ঝাঁপান, ঝুমুর, গণসঙ্গীত, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, রাগপ্রধান গান, বিষ্ণুপুর ঘরানার গান, রাবণ-কাটা নাচ, ছৌনাচ, অসমের বিহু নাচ, রণপা নৃত্য, সাঁওতালী সঙ্গীত ও নৃত্য, মণিপুরী নৃত্য, সম্মেলক নৃত্যানুষ্ঠান, শ্রুতিনাটক, ভজন, ধ্রুপদ, সঙ্গীতালেখ্য, রাজস্থান ও মধ্যপ্রদেশের নৃত্যানুষ্ঠান, পাণ্ডবাণী, সেতার বাদন, এসরাজ বাদন, একাঙ্ক নাটক, পল্লীগীতি. মূকাভিনয়, যোগব্যায়াম, ক্যারাটে, যাদু প্রদর্শন প্রভৃতি। এসব অনুষ্ঠানে বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়ার শিল্পীগণ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ ও বিভিন্ন রাজ্যের শিল্পী ও কোলকাতার নামকরা শিল্পীবৃন্দও আমন্ত্রিত হয়ে অংশ গ্রহণ করেন। এছাড়া কম্পিউটার, নীট (N.I.I.T.), রক্তদান ও রক্তপরীক্ষা শিবির, কুষ্ঠ দূরীকরণ, সাক্ষরতা প্রসার, স্বল্প সঞ্চয় প্রকল্প প্রভৃতি শিক্ষা ও জনসেবামূলক সংস্থাগুলি মেলাকে আরো আরো সমৃদ্ধ করে তোলে। নাচে-গানে মনে-প্রাণে মানুষে মানুষে মেলবন্ধন স্থাপনে মেলা-প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মিলন-মেলা। খেলনাপাতি, নাগরদোলা, পুতুলনাচ আর ম্যাজিক খেলার ইন্দ্রজাল শিশু মনে দেয় দোল দোদুল দুল। মোগলাই পরোটা, চাউমিন, এগরোল, ভেজিটেব্‌ল চপ, কাটলেট, মামলেট, মসলামুড়ি, পাঁপড়ভাজা, ফুচকা, জিলাপি, রসগোল্লা,

পান্তুয়া, মণ্ডা-মিঠাই প্রভৃতি দেশী বিদেশী চর্ব, চোষ্য, লেহ্য, পেয় খাবারের দল বার বার হাতছানি দেয়, ইশারা করে আহ্বান জানায় ভোজন-রসিকদের। স্বাভাবিকভাবেই শিশু সন্তান, কিশোর কিশোরী, যুবক-যুবতী, সুকেশিনী, সুবেশিনী, সুপুরুষ, শ্রীপুরুষে মেলা হয়ে ওঠে জমজমাট। কিন্তু তথাপি ফাঁক ফুঁক রয়ে যায় কোথায় যেন। বৃদ্ধ, বৃদ্ধাদের চোখে পড়ে না খুব একটা। তাঁদেরকে বলতেও শুনেছি —'ঠাকুর-ঠুকুর নাই, কি হবেক ঠাণ্ডাতে কাঁপতে কাঁপতে মেলায় যেয়ে।'

জীবনের সব রঙ খুইয়ে যাঁরা নিজেরাই ফিকে এবং বিবর্ণ হয়ে গেছেন দম-ফাটা বয়সের দাপটে, জীবনের সীমান্ত রেখায় উপনীত হয়ে তাঁরা চান একটু শান্তি, দেহ-মনের রুক্ষ্ম বিবর্ণ ত্বকের উপর একটু আধ্যাত্মিকতার প্রলেপ— সেটা এই মেলায় পাওয়া যায় না বিন্দুমাত্র, এই মেলা দিতে পারে না বিন্দুমাত্র। তাই তো এই অনীহা, এই হতাশার সুর। অথচ মেলার প্রথম দু'তিন বছর এই মেলা তাঁদের কাছেও ছিল নয়নের মণি, হৃদয়ের স্বর্ণখনি। স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন জাগে, কি ছিল তখন? কি নেই এখন?

বিষ্ণুপুরের আর এক নাম 'গুপ্তবৃন্দাবন'। এই গুপ্তবৃন্দাবনে অসংখ্য দেব-দেবী রয়েছেন মন্দিরে মন্দিরে। শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের এমন অপূর্ব সমন্বয় বোধ করি বাংলা তো নয়ই, ভারতের কোথাও আছে বলে মনে হয় না। এখানে এমন সব দেব-দেবী রয়েছেন যেগুলি অত্যন্ত শ্রীদর্শন, অঙ্গকান্তিতে সুঠাম, মহামূল্যবান এবং চেতন। চিন্ময় সত্তায় বিরাজমান ঐ সব দেব-দেবীদের সমারোহপূর্ণ সমাবেশ হয়েছিল মেলা-প্রাঙ্গণ সংলগ্ন মা মৃন্ময়ীর স্থানে। চিন্ময় সত্তায় বিরাজিত বহু-প্রসিদ্ধ ঐসব দেব-দেবীদের দিব্যজ্যোতিতে ভক্ত-হৃদয়ে বর্ষিত হত শান্তিসুধা। রাত্রি ৯টার সময় তোপধ্বনি সহযোগে একসাথে আরত্রিক অনুষ্ঠানটি ছিল দেখার মতো একটি পুণ্যানুষ্ঠান—যা বর্তমান মেলার সবচেয়ে আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানটির চেয়েও ছিল আকর্ষণীয়। মেলা কমিটির সাথে রাস কমিটির মতানৈক্যের ফলে যে বছর থেকে মেলাতে মল্লভূমের দেব-দেবীদের আসা বন্ধ হয়েছে সে বছর থেকেই যেন মেলার জৌলুস কমেছে, মেলার অঙ্গব্যবচ্ছেদ হয়েছে। মেলা আছে, নেই তার প্রাণ কিংবা প্রাণস্পন্দন। কেননা প্রাণের স্থান অনেক গভীরে, সেই গভীরতায় পৌছাতে পারে না এই মেলার গতানুগতিক অনুষ্ঠান। তাই বছরে বছরে এই মেলার আকর্ষণ কমেছে। একদিন যে মেলাকে 'জাতীয় মেলা' আখ্যায় ভূষিত করার চিন্তা-ভাবনা শুরু হয়েছিল, সে আশায় ছাই ঢেলে দিয়ে বছরে বছরে মেলা ক্রমশঃ হচ্ছে সংকুচিত। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, সম্প্রসারণই আয়ু, সংকোচন মৃত্যু। বিবেকানন্দের এই কথা মনে রেখে মেলার সংকোচন রোধে নতুন করে ভাবনা-চিন্তা করার সময় এসে গেছে বোধ হয়। আনন্দের কথা ২০০৩ খৃষ্টাব্দের মেলাতে নব-উদ্দীপনা ও উৎসাহের প্রাবল্য লক্ষ করা গেছে আশাতীতভাবে।

মেলার ইতিহাস অনুশীলন করলে দেখা যায় ভারতবর্ষের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন মেলাগুলির মূলে রয়েছে কোন না কোন পৌরাণিক ঘটনা, পৌরাণিক দেব-দেবী এবং প্রায় ক্ষেত্রেই গ্রাম্য দেব-দেবী। পৌরাণিক ঘটনার সূত্র ধরে, অথবা দেব-দেবীর বিশেষ পূজানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পাহাড়ের কোলে, উন্মুক্ত প্রান্তরে, জলাশয়ের ধারে, নদ-নদীর তীরে খোলা-মেলা স্থানে মানুষে মানুষে মেল-বন্ধন স্থাপিত হওয়ার সুবাদেই সম্ভবতঃ এ ধরনের উৎসবের নাম মেলা। এ প্রসঙ্গে জয়দেবের কেন্দুলি মেলা, গঙ্গাসাগর মেলা, শোনপুরের মেলা, এলাহাবাদের মাঘ-মেলা ও কুম্ভমেলার কথা বিশেষ স্মরণীয়।

বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে শিল্পজাত পণ্যসামগ্রী প্রদর্শন ও বিপণনের উদ্দেশ্যে জন্ম নিয়েছে, শিল্প-মেলা, পুস্তক-মেলা, বস্ত্র-মেলা, চর্মশিল্প-মেলা, ডাকটিকিট-মেলা প্রভৃতি। এসব মেলাতে প্রাণ থাকলেও থাকে না প্রাণস্পন্দন। কোথায় যেন একটা শূন্যতা

রয়ে যায়ই যায়। সেই শূন্যতাকে পূর্ণতা দিতে পারে একমাত্র আধ্যাত্মিক মেলা। কারণ ভারতবর্ষ অধ্যাত্মচেতনার লীলাস্থল। ভারতের জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে ঈশ্বর, ঈশ্বরীয় আবেশ। ভারতের মানুষের রক্তে, অস্থি-মজ্জাতে ঈশ্বর ও আধ্যাত্মিক চেতনা। দেব-দেবীর লীলাস্থল বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের মানুষের তো বটেই। এজন্যই বোধ করি বিষ্ণুপুরে মেলা হচ্ছে, অথচ দেব-দেবীরা অনুপস্থিত — এটাকে ঠিক মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেন না বিষ্ণুপুরবাসীগণের অনেকেই। বিস্বাদ লাগে মেলা।

তথাপি স্বাদে-বিস্বাদে এই মেলা বিষ্ণুপুরবাসীদের কাছে আনন্দের উৎসধারা। একটি বিশেষ আকর্ষণ শক্তি আছে এই মেলার। শক্তিশালী চুম্বক যেভাবে বহুদূরের লৌহখণ্ডকে কাছে টানে অথবা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি যেরূপে এক একটি গ্রহ, নক্ষত্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিমণ্ডলে স্থিত বস্তুরাজিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করে ঠিক তদনুরূপেই এই মেলা আকর্ষণ করে শুধু বিষ্ণুপুর বা বিষ্ণুপুরের পার্শ্ববর্তী গ্রামের মানুষজনকেই নয়, কাছে টানে দূর-দূরান্তের পর্যটকবৃন্দ তথা বিষ্ণুপুর-প্রেমী আপামর জনগণকে।

এজন্যই বিষ্ণুপুরবাসীদের পক্ষে, বিষ্ণুপুর মেলা কমিটির পক্ষে মেলা দেখার জন্য সবান্ধবে-সপরিবারে আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই সরল অন্তঃকরণে। শুধু মেলা নয়, আপনারা যে কোন সময়ে বিষ্ণুপুরে আসুন, বিষ্ণুপুরকে দেখুন, জানুন, ভালবাসুন; একাত্মা হয়ে যান বিষ্ণুপুরের সাথে। মল্লভূম-বিষ্ণুপুরে যা ছিল এবং নেই নেই করে এখনও যা আছে তা নিয়ে পর্যবেক্ষণ, পড়াশুনা এবং গবেষণা করলে স্বচ্ছন্দে কেটে যেতে পারে চার-পাঁচটা বছর। বিষ্ণুপুর-প্রেমী আপনাদের মল্লভূম বিষ্ণুপুরকে জানার এই অসীম আগ্রহ, অনুরাগ এবং জ্ঞান-পিপাসা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। ড্রামাটিক মনোলগের ভঙ্গিমায় একটানা পাঁচদিন ধরে বকম্ বকম্ পায়রার মতো আমি মল্লভূম বিষ্ণুপুরের গুণকীর্তন করেছি অম্লান বদনে, আপনারাও নীরব শ্রোতার ভূমিকায় থেকে ছায়ার মতো আমাকে অনুসরণ করে আমার বক্তব্যকে স্মৃতির টেপ-রেকর্ডে বন্দী করেছেন বিলক্ষণ। তাই দেখে আমি পরিতৃপ্ত হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি এবং সর্বোপরি বিস্মিত হয়েছি যার-পর-নাই।

রাঢ় এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলি মধ্যযুগে বিভিন্ন সামন্তরাজাদের অধিকারভুক্ত হওয়ায় এক একটি অঞ্চল উক্ত সামন্তরাজাদের পদবী অনুযায়ী এক একটি 'ভূম' রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। যেমন,—**শিখরভূম, তুংভূম, সামন্তভূম, সিংভূম, গোপভূম, শূরভূম, শবরভূম, বীরভূম** ইত্যাদি। অনুরূপভাবে 'মল্ল' উপাধিধারি মল্লরাজাদের মল্লভূমের এবং মল্লরাজ্যের রাজধানী বিষ্ণুপুরের ইতিহাস ও ইতিকথায় ছেদ বসিয়ে এখন বিদায় নেওয়ার পালা।

রাসমঞ্চ ত্যাগ করে বিষ্ণুপুর মেলার স্মৃতিচারণ করতে করতে আমরা ইতিমধ্যেই এসে গেছি বিষ্ণুপুর হাইস্কুলের চৌরাস্তার মোড়ে। নদী যেমন সুদীর্ঘ পথ-পরিক্রমা করে পুনরায় ফিরে আসে তার উৎসস্থলে, অনুরূপভাবে আমরাও আজ নিয়ে ঠিক পাঁচদিন আগে যে স্থান থেকে শুরু করেছিলাম বিষ্ণুপুর-পরিক্রমা; পরিক্রমার প্রান্তরেখায় উপনীত হয়ে এসে গেছি ঠিক সেই স্থানে। এখন বিদায় নেওয়ার পালা। বিদায়-লগ্নে বিষ্ণুপুর সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বহুল প্রচারিত প্রবাদবাক্যটি শুনিয়ে বিদায় নেবো আমি। আপনারাও ফিরে যাবেন যে যাঁর স্থানে। প্রবাদ বাক্যটি হল—

'বিষ্ণুপুরী মধুপুরী ঢুকলে বেরাতে লারি।'

বিষ্ণুপুর-দরদী সুধী পর্যটকবৃন্দ! মধুপুরী বিষ্ণুপুরের মধুপানের জন্য আবার আপনাদের উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাই। রাজরাজেশ্বরী মা মৃন্ময়ী, নগর-দেবতা শ্রীশ্রী মদনমোহনজীউ-সহ মল্লভূমের সমস্ত দেব-দেবীর কাছে আপনাদের সার্বিক কল্যাণ কামনা করে ব্যথিত হৃদয়ে বিদায় নিলাম এই মুহূর্তে। ধন্যবাদ, নমস্কার।

পরিশিষ্ট—ক

এক নজরে মল্লরাজবংশ এবং মল্লরাজাদের কীর্তি-কলাপ

ক্রমিক সংখ্যা	রাজাদের নাম	রাজ্যাভিষেক বর্ষ			রাজত্বকাল বছরের হিসেবে	রাজমহিষীদের নাম / অভাবে পিতৃ-পরিচয়	রাজপুত্রগণের নাম	উল্লেখযোগ্য কীর্তি-কলাপ এবং ঘটনা
		খৃষ্টাব্দ	বঙ্গাব্দ	মল্লাব্দ				
১	আদি মল্ল বা রঘুনাথ মল্ল	৬৯৪	১০১	.১	১৬	চন্দ্রকুমারী দেবী	জয় মল্ল, বিজয় মল্ল, করণ মল্ল, শঙ্কর মল্ল।	মল্লরাজবংশের প্রতিষ্ঠা, দণ্ডেশ্বরী দেবীর কৃপায় রাজ্য লাভ, মল্লাব্দের প্রচলন, বিষ্ণুশিলা লাভ, রাজধানী-লাউগ্রাম।
২	জয় মল্ল	৭১০	১১৭	১৬	১০	দীনু সিংহের কন্যা	বেণু মল্ল (অম্বু মল্ল), ঈশ্বর মল্ল।	দণ্ডেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠা, জয়পুর গ্রাম প্রতিষ্ঠা। রাজস্থানের জয়পুর থেকে আত্মীয়-স্বজন আনয়ন।
৩	বেণু মল্ল (অম্বু মল্ল)	৭২০	১২৭	২৬	১৩	মতিহার সিংহের কন্যা কাঞ্চনমণি	কিনু মল্ল, হীরা মল্ল, জুঝারি মল্ল, বাহু মল্ল।	
৪	কিনু মল্ল	৭৩৩	১৪০	৩৯	৯		ইন্দ্র মল্ল।	৭৩৩ খৃষ্টাব্দে ইন্দ্রহাস গ্রামের রাজাকে পরাজিত করে ইন্দ্রহাস রাজ্য জয় করেন। ইন্দ্রহাসের বর্তমান নাম ইন্দাস।
৫	ইন্দ্র মল্ল	৭৪২	১৪৯	৪৮	১৫		কানু মল্ল (কাউ মল্ল), হীরা মল্ল।	
৬	কানু মল্ল (কাউ মল্ল, কালু মল্ল)	৭৫৭	১৬৪	৬৩	৭		ধ মল্ল (ঝাউ মল্ল), ঝর মল্ল, কঙ্কন মল্ল, বীর মল্ল, অক্ষয় মল্ল, মহেশ মল্ল, কেদার মল্ল, দেবী মল্ল, লক্ষ্মণ মল্ল।	কাকাটিয়া বা কাকটিয়া রাজ্য (বর্তমান পাত্রসায়ের থানা) জয় করে মল্লভূমের রাজ্য বিস্তার করেন।
৭	ধ মল্ল (ঝাউ মল্ল)	৭৬৪	১৭১	৭০	১১		শূর মল্ল, বিনন্দ মল্ল, কিশোর মল্ল।	
৮	শূর মল্ল	৭৭৫	১৮২	৮১	২০		কনক মল্ল, বসুদেব মল্ল, স্বরূপ মল্ল, লহরী মল্ল, রিপু মল্ল, প্রসাদ মল্ল, ভীম মল্ল।	মেদিনীপুর জেলার বগড়ী ভূখণ্ড জয় এবং মল্লরাজ্যের অন্তর্ভুক্তি করণ।
৯	কনক মল্ল	৭৯৫	২০২	১০১	১২		কন্দর্প মল্ল, জগ মল্ল।	

এক নজরে মল্লরাজবংশ এবং মল্লরাজাদের কীর্তি-কলাপ

ক্রমিক সংখ্যা	রাজাদের নাম	রাজ্যাভিষেক বর্ষ			রাজত্বকাল বছরের হিসেবে	রাজমহিষীদের নাম / অভাবে পিতৃ-পরিচয়	রাজপুত্রগণের নাম	উল্লেখযোগ্য কীর্তি-কলাপ এবং ঘটনা
		খৃষ্টাব্দ	বঙ্গাব্দ	মল্লাব্দ				
১০	কন্দর্প মল্ল	৮০৭	২১৪	১১৩	২১		সনাতন মল্ল, জগরূপ মল্ল।	
১১	সনাতন মল্ল	৮২৮	২৩৫	১৩৪	১৩		খড়্গা মল্ল, গন্ধর্ব মল্ল, পরাণ মল্ল, ভরত মল্ল।	
১২	খড়্গা মল্ল	৮৪১	২৪৮	১৪৭	২১		দুর্জন মল্ল (দুর্জয় মল্ল)।	বর্তমানের খড়্গাপুর নামিত ভূখণ্ড অঞ্চল জয়। নিজ নামানুসারে স্থানটির নামকরণ করেন খড়্গাপুর।
১৩	দুর্জন মল্ল (দুর্জয় মল্ল)	৮৬২	২৬৯	১৬৮	৪৪		যাদব মল্ল, মেঘ মল্ল, মল্লার মল্ল, পরাণ মল্ল, কেবল মল্ল, দেবকী মল্ল, অক্রূর মল্ল, সহদেব মল্ল।	
১৪	যাদব মল্ল	৯০৬	৩১৩	২১২	১৩		জগন্নাথ মল্ল, বলাই মল্ল, নিদান মল্ল।	বিষ্ণুপুরের পশ্চিমে নিজ নামানুসারে যাদব নগর গ্রাম ও যাদব নগর সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা।
১৫	জগন্নাথ মল্ল	৯১৯	৩২৬	২২৫	১২		বিরাট মল্ল।	
১৬	বিরাট মল্ল	৯৩১	৩৩৮	২৩৭	১৫		মাধব মল্ল (মাধো মল্ল), কৃষ্ণ মল্ল।	
১৭	মাধব মল্ল (মাধো মল্ল)	৯৪৬	৩৫৩	২৫২	৩১		দুর্গাদাস মল্ল, গঙ্গাদাস মল্ল।	
১৮	দুর্গাদাস মল্ল	৯৭৭	৩৮৪	২৮৩	১৭		জগৎ মল্ল, (জগন্নাথ মল্ল)।	
১৯	জগৎ মল্ল (জগন্নাথ মল্ল)	৯৯৪	৪০১	৩০০	১৩	চন্দ্রাবতী দেবী, পিতা গোবিন্দ সিংহ	অনন্ত মল্ল, বিজয় মল্ল, পাহাড় মল্ল।	মৃন্ময়ী দর্শন, মৃন্ময়ীর আদেশে প্রদ্যুম্নপুর থেকে বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থানান্তর করণ। ৯৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মৃন্ময়ী প্রতিষ্ঠা। মনোরম রাজপ্রাসাদ, রাজপথ, ধনাগার, শস্যাগার, অস্ত্রাগার, সেনানিবাস সহ বিষ্ণুপুরকে সমৃদ্ধ নগরীতে রূপান্তর।

এক নজরে মল্লরাজবংশ এবং মল্লরাজাদের কীর্তি-কলাপ

ক্রমিক সংখ্যা	রাজাদের নাম	রাজ্যাভিষেক বর্ষ			রাজত্বকাল বছরের হিসেবে	রাজমহিষীদের নাম / অভাবে পিতৃ-পরিচয়	রাজপুত্রগণের নাম	উল্লেখযোগ্য কীর্তি-কলাপ এবং ঘটনা
		খৃষ্টাব্দ	বঙ্গাব্দ	মল্লাব্দ				
২০	অনন্ত মল্ল	১০০৭	৪১৪	৩১৩	৮		রূপ মল্ল, জগৎ মল্ল, শূর মল্ল, জেঝি মল্ল।	
২১	রূপ মল্ল	১০১৫	৪২২	৩২১	১৪		সুন্দর মল্ল।	
২২	সুন্দর মল্ল	১০২৯	৪৩৬	৩৩৫	২৪		কুমুদ মল্ল, গম্ভীর মল্ল।	
২৩	কুমুদ মল্ল	১০৫৩	৪৬০	৩৫৯	২১		কৃষ্ণ মল্ল, সুদাস মল্ল, গোবিন্দ মল্ল, নীলু মল্ল, দয়াল মল্ল।	
২৪	কৃষ্ণ মল্ল	১০৭৪	৪৮১	৩৮০	১০		রূপ মল্ল-২য়, (ঝাপ মল্ল)।	
২৫	রূপ মল্ল-২য় (ঝাপ মল্ল)	১০৮৪	৪৯১	৩৯০	১৩		প্রকাশ মল্ল, শ্যাম মল্ল, গোবর্ধন মল্ল, সুমেরু মল্ল।	
২৬	প্রকাশ মল্ল	১০৯৭	৫০৪	৪০৩	৫		প্রতাপ মল্ল, চল্লি মল্ল, পার্বতী মল্ল, কানাই মল্ল, সুরাজ মল্ল।	বিষ্ণুপুর শহরের উত্তর-পূর্ব কোণে দ্বারকেশ্বর নদীতীরে প্রকাশ গ্রাম প্রতিষ্ঠা এবং প্রকাশঘাট বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন।
২৭	প্রতাপ মল্ল	১১০২	৫০৯	৪০৮	১১		সিন্দুর মল্ল।	
২৮	সিন্দুর মল্ল	১১১৩	৫২০	৪১৯	১৬		সুখময় মল্ল (শুক মল্ল), পতিত মল্ল, কেশব মল্ল, নৃসিংহ মল্ল।	
২৯	সুখময় মল্ল (শুক মল্ল)	১১২৯	৫৩৬	৪৩৫	১৩		বনমালী মল্ল, জানকী মল্ল।	
৩০	বনমালী মল্ল	১১৪২	৫৪৯	৪৪৮	১৪		যদু মল্ল।	
৩১	যদু মল্ল	১১৫৬	৫৬৩	৪৬২	১১		জীবন মল্ল, অধর মল্ল, পর্বত মল্ল, বৃন্দাবন মল্ল, কুঞ্জ মল্ল, শিখর মল্ল।	

এক নজরে মল্লরাজবংশ এবং মল্লরাজাদের কীর্তি-কলাপ

ক্রমিক সংখ্যা	রাজাদের নাম	রাজ্যাভিষেক বর্ষ			রাজত্বকাল বছরের হিসেবে	রাজমহিষীদের নাম / অভাবে পিতৃ-পরিচয়	রাজপুত্রগণের নাম	উল্লেখযোগ্য কীর্তি-কলাপ এবং ঘটনা
		খৃষ্টাব্দ	বঙ্গাব্দ	মল্লাব্দ				
৩২	জীবন মল্ল	১১৬৭	৫৭৪	৪৭৩	১৮		রাম মল্ল, ভরত মল্ল।	
৩৩	রাম মল্ল (ক্ষেত্র মল্ল)*	১১৮৫	৫৯২	৪৯১	২৪	সুকুমারী দেবী, পিতা নন্দলাল সিংহ	গোবিন্দ মল্ল, গোকুল মল্ল, ব্রজ মল্ল, হরি মল্ল।	সামরিক শক্তিতে বিষ্ণুপুরকে প্রভূত শক্তিশালী করে তুলেছিলেন।
৩৪	গোবিন্দ মল্ল	১২০৯	৬১৬	৫১৫	৩১		ভীম মল্ল, অর্জুন মল্ল।	
৩৫	ভীম মল্ল	১২৪০	৬৪৭	৫৪৬	২৩		কাটার মল্ল (খট্টার মল্ল)।	পাত্রহাটি গ্রামে শ্যামচাঁদ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা। উত্তরে দামোদর পর্যন্ত মল্লভূমের সীমানা বিস্তার।
৩৬	কাটার মল্ল (খট্টার মল্ল)	১২৬৩	৬৭০	৫৬৯	৩২		পৃথ্বী মল্ল, অজুত মল্ল, সোম মল্ল।	
৩৭	পৃথ্বী মল্ল	১২৯৫	৭০২	৬০১	২৪		তপ মল্ল, জিকা মল্ল।	বিষ্ণুপুরের উত্তরে অবস্থিত দ্বারকেশ্বর নদীর উত্তর তীরে ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর শিবমন্দির-দ্বয় প্রতিষ্ঠা করেন।
৩৮	তপ মল্ল	১৩১৯	৭২৬	৬২৫	১৫		দীনবন্ধু মল্ল, দুজ্জল মল্ল, গোপাল মল্ল, মুকুট মল্ল, বিস্তম মল্ল, ভীমারি মল্ল, শুভ মল্ল।	
৩৯	দীনবন্ধু মল্ল (দীনু মল্ল)	১৩৩৪	৭৪১	৬৪০	১১		কানু মল্ল-২য় (কিনু মল্ল)।	লোচনপুরে শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী বিষ্ণু-বাসুদেব মূর্তি প্রতিষ্ঠা।
৪০	কানু মল্ল-২য় (কিনু মল্ল)	১৩৪৫	৭৫২	৬৫১	১৩		শূর মল্ল, ধনঞ্জয় মল্ল, নন্দ মল্ল।	
৪১	শূর মল্ল-২য়	১৩৫৮	৭৬৫	৬৬৪	১২		শিব সিং মল্ল (বীর সিং মল্ল), মোহন মল্ল।	

*পশ্চিমবাংলার তীর্থ, পৃঃ-২৩০

এক নজরে মল্লরাজবংশ এবং মল্লরাজাদের কীর্তি-কলাপ

ক্রমিক সংখ্যা	রাজাদের নাম	রাজ্যাভিষেক বর্ষ			রাজত্বকাল বছরের হিসেবে	রাজমহিষীদের নাম / অভাবে পিতৃ-পরিচয়	রাজপুত্রগণের নাম	উল্লেখযোগ্য কীর্তি-কলাপ এবং ঘটনা
		খৃষ্টাব্দ	বঙ্গাব্দ	মল্লাব্দ				
৪২	শিব সিং মল্ল (বীর সিং মল্ল)	১৩৭০	৭৭৭	৬৭৬	৩৭		মদন মল্ল, কৃপ মল্ল, বিহারী মল্ল, ভরত মল্ল।	বিষ্ণুপুরে সঙ্গীত বিদ্যার প্রথম প্রচলন।
৪৩	মদন মল্ল	১৪০৭	৮১৪	৭১৩	১৩		দুর্জন মল্ল-২য় (দুর্জয় মল্ল), ভৈরব মল্ল, তারাচাঁদ মল্ল, মুকুট মল্ল, মনোহর মল্ল, ভাগবত মল্ল, গিরিধর মল্ল, সত্যজিৎ মল্ল।	কৃষ্ণনগর গ্রামে মদন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা ও রায়পুর পর্যন্ত মল্লরাজ্যের প্রসার।
৪৪	দুর্জন মল্ল-২য় (দুর্জয় মল্ল)	১৪২০	৮২৭	৭২৬	১৭		উদয় মল্ল।	
৪৫	উদয় মল্ল	১৪৩৭	৮৪৪	৭৪৩	২৩		চন্দ্র মল্ল, সৌম্য মল্ল, মথুর মল্ল, বংশী মল্ল।	
৪৬	চন্দ্র মল্ল	১৪৬০	৮৬৭	৭৬৬	৪১		বীর মল্ল, বিজয় মল্ল, কৃষ্ণ মল্ল, অনুপ মল্ল, কিশোরী মল্ল, ধরণী মল্ল, কুশল মল্ল, মায়ারাম মল্ল, সত্যজিৎ মল্ল।	বিষ্ণুপুর শহরের ১২ মাইল পূর্বে গোকুলচাঁদ শ্রীবিগ্রহ ও শ্রীবিগ্রহের শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা। গোকুলনগর গ্রাম স্থাপন। রাধাকৃষ্ণ পূজার শুভ সূচনা। এঁর রাজত্বকালে বাংলাদেশে শ্রীশ্রী চৈতন্যদেবের শুভাবির্ভাব (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দ।)
৪৭	বীর মল্ল	১৫০১	৯০৮	৮০৭	৫৩		ধাড়ী মল্ল (বাউ মল্ল), জিত মল্ল, হাড়া মল্ল।	
৪৮	ধাড়ী মল্ল (বাউ মল্ল, বায়ু মল্ল, বীড়া মল্ল)	১৫৫৪	৯৬১	৮৬০	১১		হাম্বীর মল্ল, যাদু মল্ল, জগৎ মল্ল, বাহাদুর মল্ল, রসিক মল্ল।	মল্লরাজ্যের মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তি। রাজস্ব ধার্য হয় বাৎসরিক ১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা, মতান্তরে ১ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা। পরাধীনতার গ্লানি মুছতে বন্দুক ও কামান জাতীয় আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণের জন্য 'কামান ঢালা' তৈরি।

এক নজরে মল্লরাজবংশ এবং মল্লরাজাদের কীর্তি-কলাপ

ক্রমিক সংখ্যা	রাজাদের নাম	রাজ্যাভিষেক বর্ষ			রাজত্বকাল বছরের হিসেবে	রাজমহিষীদের নাম / অভাবে পিতৃ-পরিচয়	রাজপুত্রগণের নাম	উল্লেখযোগ্য কীর্তি-কলাপ এবং ঘটনা
		খৃষ্টাব্দ	বঙ্গাব্দ	মল্লাব্দ				
৪৯	হাম্বীর মল্লদেব (বীর হাম্বীরদেব)	১৫৬৫	৯৭২	৮৭১	৫৫	শিরোমণি পট্ট-মহাদেবী, রাণী সুলক্ষণা	ধাড়ী হাম্বীর মল্ল, ধর্মদাস সিংহ, রঘুনাথ সিংহ, বীরবকেতা সিংহ, মাধব সিংহ, রূপ-নারায়ণ সিংহ, প্রতাপনারায়ণ সিংহ, সহদেব কুমার সিংহ, গোপীনাথদাস সিংহ, গগনচন্দ্র সিংহ, পরাণ সিংহ।	মল্লরাজ্যর স্বর্ণযুগ, যমুনা, কালিন্দী প্রভৃতি বাঁধ খনন, হাম্বীর থেকে **'বীর হাম্বীর'** উপাধি লাভ। কালাপাহাড়ি অত্যাচার, শ্রীনিবাস আচার্যের বিষ্ণুপুরে আগমন ও অবস্থান। বৈষ্ণব পুঁথি লুণ্ঠন। বীর হাম্বীরের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ। হরিচরণ দাস, শ্রীচৈতন্য দাস, শ্রীগোবিন্দ দাস নাম হয় দীক্ষোত্তর জীবনে। বিষ্ণুপুর রাজবংশের **'দেব'** উপাধি লাভ। মদনমোহন আনয়ন। বিষ্ণুপুর—**'গুপ্ত-বৃন্দাবন'**, **'বন-বিষ্ণুপুর।'** আউলিয়া মনোহর দাস ও কুরবান বাবার আগমন।
৫০	ধাড়ী হাম্বীর মল্লদেব	১৬২০	১০২৭	৯২৬	৬		কালারাম	এঁর রাজত্বকালে জনৈক বীরসিংহ কর্তৃক মল্লেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হয়।
৫১	রঘুনাথ মল্লদেব (১ম) (পরে রঘুনাথ সিংহদেব) (ক)	১৬২৬	১০৩৩	৯৩২	৩০		বীর সিংহ, ফতে সিংহ, মর্যাদা সিংহ। (ছ)	এঁর আমলে বিষ্ণুপুর রাজ্য নবাব দরবারের স্বাধীন মিত্র রাজ্যে পরিণত হয়। রাজার অলৌকিক শক্তির প্রকাশ। পাঁচটি সায়র প্রতিষ্ঠা। শ্যামরায়ের মন্দির, জোড়বাংলা মন্দির, পাথরের রথ, রঘুনাথ জীউ-এর অস্থল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা। বিষ্ণুপুরের রাজবংশের **'সিংহ'** উপাধি লাভ।
৫২	বীর সিংহদেব	১৬৫৬	১০৬৩	৯৬২	২৬	প্রথমা পত্নী চূড়ামণি বা শিরোমণি, দ্বিতীয়া পত্নী স্বর্ণময়ী দেবী	দুর্জন সিংহ, কৃষ্ণ সিংহ, সুর সিংহ।	'ছোট পাথর দরজা', 'বড় পাথর দরজা' নির্মাণ। রাজ-দরবার অঞ্চলে রাধালালজীউ-এর শ্রীমন্দির স্থাপন ও শ্রীবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা। মাধবগঞ্জে মদনগোপাল মন্দির এবং সাবড়াকোণে ডেঙ্গোরামকৃষ্ণের মন্দির প্রতিষ্ঠা। বিষ্ণুপুরের উত্তরে বীরসিংহ গ্রাম এবং ঐ গ্রামে বৃন্দাবনচন্দ্র জীউ-এর মন্দির প্রতিষ্ঠা। নৃশংস হত্যাকাণ্ড। ভ্রাতৃহন্তা। মুরলীমোহন মন্দির প্রতিষ্ঠা।

এক নজরে মল্লরাজবংশ এবং মল্লরাজাদের কীর্তি-কলাপ

ক্রমিক সংখ্যা	রাজাদের নাম	রাজ্যাভিষেক বর্ষ			রাজত্বকাল বছরের হিসেবে	রাজমহিষীদের নাম / অভাবে পিতৃ-পরিচয়	রাজপুত্রগণের নাম	উল্লেখযোগ্য কীর্তি-কলাপ এবং ঘটনা
		খৃষ্টাব্দ	বঙ্গাব্দ	মল্লাব্দ				
৫৩	দুর্জন সিংহদেব	১৬৮২	১০৮৯	৯৮৮	২০		রঘুনাথ সিংহ, গোপাল সিংহ, চামর সিংহ, গাজী সিংহ, যশোমন্ত সিংহ, অমর সিংহ, গজরাজ সিংহ, নররায় সিংহ, দ্রোণ সিংহ।	মদনমোহন দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠা। নামে দুর্জন কিন্তু প্রকৃতিতে দয়ালু এবং উদারচেতা ছিলেন রাজা। এঁর রাজত্বকালে টাকায় ৪ মণ চাল পাওয়া যেত।
৫৪	রঘুনাথ সিংহদেব -২য়	১৭০২	১১০৯	১০০৮	১০	চন্দ্রপ্রভা	নিঃসন্তান।	সঙ্গীতজ্ঞ বাহাদুরসেনের বিষ্ণুপুর আগমন। সুর-সাধক-রাজার উদ্যোগে সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যাপক প্রসার। শোভা সিংহ ও রহিম খাঁর বর্ধমান আক্রমণ। রঘুনাথের চেৎবরদা জয় ও রাজকন্যা চন্দ্রপ্রভার সাথে বিবাহ। লালবাঈয়ের বিষ্ণুপুর আগমন, রাজার সাথে অবৈধ প্রণয়। পরিণতিতে অবৈধ সন্তানের অন্নপ্রাশনকে কেন্দ্র করে চন্দ্রপ্রভার চক্রান্তে রঘুনাথের মৃত্যু। চন্দ্রপ্রভা সহমৃতা।
৫৫	গোপাল সিংহদেব (খ)	১৭১২	১১১৯	১০১৮	৩৬		কৃষ্ণ সিংহ, গোবিন্দ সিংহ।	ক্ষাত্রশক্তি স্তিমিত হয়ে বৈষ্ণববাদের উদ্ভব। শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীতে প্রভূত উন্নতি। বাধ্যতামূলক হরিনাম সংকীর্তন, ভাস্কর পণ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠা দস্যুর বিষ্ণুপুর আক্রমণ, মদনমোহনের দলমাদল কামান দাগা ও বর্গী দমন। রাজার রাজর্ষির মত জীবন যাপন।
৫৬	চৈতন্য সিংহদেব (গ)	১৭৪৮	১১৫৫	১০৫৪	৫৩	লীলাবতী দেবী (ময়ূরভঞ্জের রাজকন্যা)	মদনমোহন সিংহ, নিমাই সিংহ, গোপীনাথ সিংহ, গৌরমোহন সিংহ, ফতেবাহাদুর সিংহ, ক্ষেত্রমোহন সিংহ, নতুলাল সিংহ, ছোট ক্ষেত্রমোহন সিংহ, লাট ক্ষেত্রমোহন সিংহ।	পিতৃব্যপুত্র দামোদরের চক্রান্তে বিষ্ণুপুরে মারাঠা আক্রমণ ও নবাবী ফৌজের আক্রমণ এবং উভয় শক্তির পরাজয়। মীরজাফরের বিষ্ণুপুর আক্রমণ, রাজশক্তির পরাজয়। দামোদরের সিংহাসন লাভ। আদালতের রায়ে চৈতন্য সিংহের পুনরায় রাজ্য লাভ। কোম্পানীর দেওয়ানী লাভ। রাজসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত। চৈতন্যসিংহ কোম্পানীর করদ জমিদার, কর অনাদায়ে কারাবাস। মদনমোহন বন্ধক, বিষ্ণুপুর রাজ্যের কয়েকটি অংশ নিলামে বিক্রয়। গৃহবিবাদ ও মামলা মোকদ্দমায় চৈতন্য সিংহ সর্বস্বান্ত। রাধাশ্যামজীউ শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা।

এক নজরে মল্লরাজবংশ এবং মল্লরাজাদের কীর্তি-কলাপ

ক্রমিক সংখ্যা	রাজাদের নাম	রাজ্যাভিষেক বর্ষ			রাজত্বকাল বছরের হিসেবে	রাজমহিষীদের নাম / অভাবে পিতৃ-পরিচয়	রাজপুত্রগণের নাম	উল্লেখযোগ্য কীর্তি-কলাপ এবং ঘটনা
		খৃষ্টাব্দ	বঙ্গাব্দ	মল্লাব্দ				
৫৭	মাধব সিংহদেব (ঘ)	১৮০১	১২০৮	১১০৭	৮		গোপাল সিংহ, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ।	ঘাটোয়ালী মহল নিলাম। কোম্পানীর বৃত্তি-ভোগে অনীহা। বাঁকুড়ার সদর ট্রেজারী আক্রমণ। বন্দীদশায় কলকাতার জেলে মৃত্যু।
৫৮	গোপাল সিংহদেব -২য়	১৮০৯	১২১৬	১১১৫	৬৭		রামকৃষ্ণ সিংহ, রামকিশোর সিংহ।	ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৃত্তিভোগী হিসেবে জীবন যাপন। সবচেয়ে দীর্ঘমেয়াদী রাজা। রাজত্বকাল ৬৭ বছর।
৫৯	রামকৃষ্ণ সিংহদেব	১৮৭৬	১২৮৩	১১৮২	৯ + (১৮৭৬ থেকে ১৮৮৫ খৃঃ)	ধ্বজামণি দেবী (১মা) প্রসন্নময়ী দেবী (২য়া)	অপুত্রক।	পাকা ছাদ বিশিষ্ট বৃহদাকার মৃন্ময়ী মন্দির নির্মাণ। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের ১৯শে আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষ্ণুপুরে আগমন। প্রজাবৎসল রাজা হিসেবে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন। বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা থানার রাধামোহনপুরে শ্যামচাঁদ বিগ্রহ ও শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা। রাজবংশের এটি শেষ বিগ্রহ এবং শেষ মন্দির।
৬০	নীলমণি সিংহদেব (ঙ)	১৮৮৯	১২৯৬	১১৯৫	১৪ + (১৮৮৯ থেকে ১৯০৩ খৃঃ)	চূড়ামণি দেবী	রামচন্দ্র সিংহদেব।	সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মহাষ্টমীর সন্ধি-পূজায় কামান দাগা। রাজার বিরুদ্ধে সরকার পক্ষের মামলা। রাজার জয়। কামান দাগার ছাড়পত্র লাভ।
৬১	কালীপদ সিংহ ঠাকুর (চ)	১৯৩০	১৩৩৭	১২৩৬	৫৩ + (১৯৩০ থেকে ১৯৮৩ খৃঃ)	সুবর্ণময়ী (শিরোমণি পট্টমহাদেবী)	দেবেন্দ্র বিজয় সিংহ ঠাকুর, অনিল কুমার সিংহ ঠাকুর, সুনীল কুমার সিংহ ঠাকুর, সলিল কুমার সিংহ ঠাকুর।	১৯৪২ খৃষ্টাব্দে ডি.এম.-এর আদেশ অমান্য করে মহাষ্টমীর সন্ধি-পূজাতে কামান দাগা। রাজ্যপাল এ.এল.ডায়াসকে রাজ-সম্মানের সৌজন্যে রাজপথ ছাড়তে বাধ্য করা। লালবাঁধ হস্তান্তর। রাজ্যহীন অবস্থাতেও রাজার মেজাজ এবং রাজ-আভিজাত্য বজায় রাখা।

এক নজরে মল্লরাজবংশ এবং মল্লরাজাদের কীর্তি-কলাপ

মল্লরাজাদের বংশানুক্রমিক তালিকা সংক্রান্ত পাদটীকা ঃ—

(ক) পঞ্চাশতম রাজা ধাড়ী হাম্বীর মল্ল মাত্র ছয় বছর রাজত্ব করে উন্মাদ রোগে আক্রান্ত হন এবং তাঁর পুত্র কালারাম ছিলেন বোবা ও কালা। এজন্য রাজমহিষী (ধাড়ী হাম্বীরের পত্নী) তাঁর দেবর রঘুনাথ মল্লকে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

(খ) চুয়ান্নতম রাজা, অপুত্রক রঘুনাথ সিংহ (২য়) আততায়ীর অস্ত্রাঘাতে নিহত হন। এমতাবস্থায় তাঁর সহোদর গোপাল সিংহ সিংহাসনে অভিষিক্ত হন।

(গ) মারাঠা দস্যু ভাস্কর পণ্ডিতের বর্গীবাহিনী বিষ্ণুপুর আক্রমণ করে। পলায়নপর ভাস্কর পণ্ডিতকে আক্রমণ করতে গিয়ে মহারাজ গোপাল সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণ সিংহ, ভাস্কর পণ্ডিত নিক্ষেপিত বিষাক্ত ভল্লের আঘাতে আহত এবং পরে অসুস্থ হয়ে অকালে মারা যান। এমতাবস্থায় পঞ্চান্নতম রাজা গোপাল সিংহ কৃষ্ণ সিংহের একমাত্র পুত্র চৈতন্য সিংহকে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজটিকাতে ভূষিত করে নিজে অহরহ হরিনাম করে জীবন উৎসর্গ করেন।

(ঘ) ছাপান্নতম রাজা চৈতন্য সিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র মদনমোহন সিংহের অকালমৃত্যুর ফলে মহারাজ চৈতন্য সিংহ মদনমোহন সিংহের একমাত্র পুত্র মাধব সিংহকে স্বীয় জীবনাবসানের এক বৎসর পূর্বে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন।

(ঙ) মহারাজ রামকৃষ্ণ সিংহ অপুত্রক ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণসিংহের মৃত্যুর পর ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজমহিষী ধ্বজামণিদেবী রাজ্য পরিচালনা করেন। অতঃপর ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্য সিংহের দ্বিতীয় পুত্র নিমাই সিংহের বংশধর নীলমণি সিংহকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজসম্মানে ভূষিত করেন।

(চ) ষাটতম রাজা নীলমণি সিংহের একমাত্র পুত্র যুবরাজ রামচন্দ্র সিংহদেব মাত্র ১৯ বছর বয়সে রোগাক্রান্ত হয়ে ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মল্ল-রাজ্যে রাজ্যাভিষেক হয়নি। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ রামকৃষ্ণ সিংহ ও হিকিম সাহেব রামকিশোর সিংহ মহাশয়ের দৌহিত্র কালীপদ সিংহ ঠাকুরের রাজ্যাভিষেক হয়। ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর তাঁর পরলোক গমনের পর অদ্যাবধি আর রাজ্যাভিষেক হয়নি।

(ছ) ৫১ থেকে ৬০ নম্বর রাজা, রাজভ্রাতা ও রাজপুত্রগণের উপাধি 'সিংহদেব' হবে।

বি.দ্র. ঃ— 'মল্লরাজাদের বংশানুক্রমিক তালিকা' তৈরীর ক্ষেত্রে ফকিরনারায়ণ কর্মকার রচিত 'বিষ্ণুপুরের অমর কাহিনী', নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বাংলা বিশ্বকোষ'—ভলিউম নং-১৯, অভয়াপদ মল্লিক বিরচিত 'History of Bishnupur-Raj', ডঃ প্রভাত কুমার সাহা মহাশয়ের 'Some Aspects of Malla Rule in Bishnupur' এবং প্রলয় সেন বিরচিত 'পশ্চিমবাংলার তীর্থ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

গ্রন্থগুলিতে নিবদ্ধ তালিকাগুলির মধ্যে নৃপতিগণের নাম, রাজত্বকালের সময়-সীমা প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটি ক্ষেত্রে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। নৃপতিগণের নামের মতান্তরের ক্ষেত্রে বন্ধনীর মধ্যে সেগুলি উল্লেখ করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট—খ

১৯৫৩ সালের জমিদারী অধিগ্রহণ আইন (R.S.) ও ১৯৫৫ সালের পশ্চিমবঙ্গ ভূমি সংস্কার (L.R.) আইনে প্রস্তুত ভূমির স্বত্বলিপি অনুসারে বিষ্ণুপুরের বাঁধগুলির তথ্য সম্পর্কিত সারণী। পরিশিষ্ট 'খ' সংক্রান্ত বিশেষ দ্রষ্টব্য অংশ পরের পৃষ্ঠায় আছে।

নম্বর	বাঁধের নাম	অবস্থান বিষ্ণুপুরের	R. S. Record অনুসারে বাঁধগুলির তথ্যাদি			L. R. Record অনুসারে বাঁধগুলির তথ্যাদি		
			দাগ নং	বাঁধের জমির পরিমাণ একরে	মালিকানা স্বত্ব	দাগ নং	বাঁধের জমির পরিমাণ একরে	মালিকানা স্বত্ব
১	চৌকানবাঁধ	দক্ষিণ-পূর্ব কোণে	—	—	বর্তমানে বাঁধটি মজে গেছে।	—	—	বর্তমানে বাঁধটি মজে গেছে।
২	লালবাঁধ	পূর্ব দিকে	১৪১৭৬	৭৪·৭৮	ট্রাস্টীগণ ঃ রামবিলাস চক্রবর্তী, পিং রামনলিনী চক্রবর্তী, শংকরী ভট্টাচার্য্য, পিং মহাতাব প্রমুখ।	৪৩০৫৭	৫১·৭৩	নবোদয় চক্রবর্তী, সুজয় চক্রবর্তী, রামবিলাস চক্রবর্তী, শঙ্করীপদ ভট্টাচার্য্য এবং অন্যান্য।
৩	শ্যামবাঁধ	পূর্ব দিকে	১২৭৯১	১৮·৫০	উপেন্দ্র মণ্ডল, পিং মাখন ; কন্দর্পনাথ দে, পিং গঙ্গাধর প্রমুখ।	২১৮৫৩	১৮·১৫	পশ্চিমবঙ্গ সরকার-পক্ষে কালেক্টর ও অবনীমোহন সিংহদেব এবং অন্যান্য।
৪	কৃষ্ণবাঁধ	উত্তর-পূর্ব কোণে	১২৫০৭	৭৯·২৩	গোকুলচন্দ্র সিংহ, প্রভাকর সিংহ, পিং শ্রীবাস সিংহ ; কন্দর্পনাথ দে, পিং গঙ্গাধর প্রমুখ।	২১৭৬৩	৭৯·২০	অজিতকুমার কাইতি, কন্দর্পনাথ দে, গোকুল সিংহ, তিলকচাঁদ চক্রবর্তী ও অন্যান্য।
৫	পোকাবাঁধ (বীরবাঁধ)	মধ্যস্থলে	৯০০৫	১৬·৬২	কন্দর্পনাথ দে, পিং গঙ্গাধর, গোপাল গোবিন্দ কুচল্যান, পিং রজনীকান্ত, কালিপদ দাঁ, পিং সুরেন্দ্র প্রমুখ।	১১৫৬৮	৯·৪৬	অজিতকুমার কাইতি, কন্দর্পনাথ দে, গোকুল সিংহ, তিলকচাঁদ চক্রবর্তী ও অন্যান্য।
৬	কাজুলিয়া বাঁধ	পোকাবাঁধের উত্তরে	—	—	বর্তমানে বাঁধটি মজে গেছে।	—	—	বর্তমানে বাঁধটি মজে গেছে।
৭	যমুনাবাঁধ	পশ্চিম দিকে	১১৬৯	১০৭·৩৫	অখিলকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, পিং যদুনাথ; সাং নিজ	৫৫০২	৩৯·১০	কাবেরী রায়, শিখীসাথী ভট্টাচার্য্য ও অন্যান্য।
৮	কালিন্দীবাঁধ	পশ্চিম দিকে	১১৫৬	৩১·৮৬	ভাস্করচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, পিং চারুচন্দ্র; সাং নিজ	৪৯৫৯	৩০·৬০	শ্যাম মুখোপাধ্যায়, শোভন মুখার্জী ও অন্যান্য।
৯	গাঁতাইতবাঁধ বা গন্টনবাঁধ	উত্তর-পশ্চিম কোণে	৫৬৯১	১০·৪৬	ফণীভূষণ মুখোপাধ্যায়, পিং কেদারনাথ, সাং রঘুনাথ সায়ের	১৪৪	১০·৪৬	আশিষরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।